হিমালয় দুহিতা
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের
নিবেদিতা

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

প্রকাশ : ১৩৬৬

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার স্বদেশবাসী জনসাধারণকে
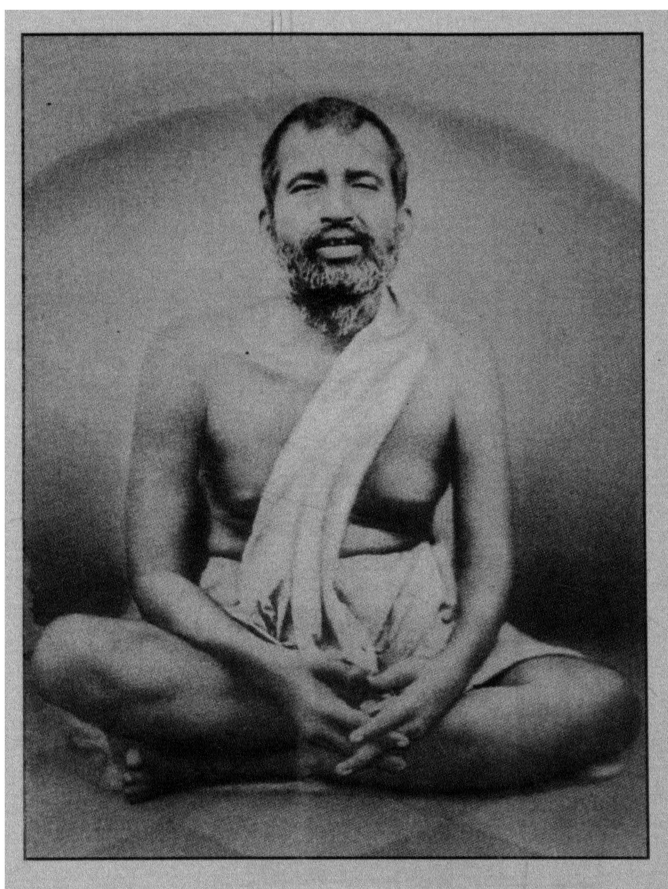
জীবনটা ঘূর্ণাবর্ত্ত। আস্বাদে তা কখনও টক, কখনও ঝাল, কখনও মিষ্টি বা তিতো— চলমান জীবনের অভিব্যক্তি এই। আনুসঙ্গিক পরিবেশ, মনের গহনে মথিত চিন্তাধারায় মিশ্রিত অনুভূতির স্পন্দন, রক্তধারায় প্রবাহিত হয়ে মাতৃজঠরে সৃষ্টি হল রক্তকণিকার সংমিশ্রিত বলয়, (ভ্রূণ) যা ন'-মাস দশদিন পরে মানবাকারে নির্গত হ'ল একটি শিশু। সে পুরুষ বা নারী রূপধারী হতে পারে। তা অমৃতের সন্তান। নিষ্পাপ দেবতা বিগ্রহের-রূপ, ধীরে ধীরে রূপায়িত পৃথিবীর মানুষে। যে মুহূর্তে সে স্পর্শ করে, পৃথিবীর মৃত্তিকা, কেঁদে ওঠে। কারণ স্বর্গ হতে তার আগমন। আর পৃথিবীর বাস্তববাদী মানুষ, শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে, তাকে বরণ করতে উদ্যত নিজ সন্তানরূপে। এটাই আমাদের জন্ম ইতিহাস।

অত্যুক্তি নয়— শোন ধরার ধূলিতে যেদিন সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ, ছিল তার অনন্ত ক্ষুধা, ছিল তার আকাশ ছোঁওয়া আকাঙ্খা, যা পূরণে প্রয়োজন ছিল দৈহিক শক্তি। তা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত, হ'ল কিন্তু প্রত্যক্ষ করলো সে শক্তির ব্যর্থতা। ধীরে ধীরে বুঝলো : সে, শক্তির সংহতির প্রয়োজন। আর সে সংহতিতেই পাওয়া যায় মানসিক তৃপ্তির সন্ধান।

শুরু হল অন্বেষণ : কোথায় সে তৃপ্তি? যেখানে অহরহ দন্দ্ব, চলে সংঘাত, ছাড়িয়ে আছে দ্বেষ, হিংসা, আর হানাহানি। শক্তির ক্ষুধা, জয়ের তৃষ্ণা, কোথায় শেষ, কোথায় এর পরিতৃপ্তি? সেদিন থেকেই মানুষ ভাবতে শুরু করেছে, অনুভব করেছে, হানাহানিটা সুস্থজীবনের লক্ষণ নয়। এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই সংহতি। যা নিয়ে মানুষ মাতামাতি করে, সেটা তার পশুপ্রবৃত্তি— তার নিবৃত্ত রূপই সুস্থ জীবনের স্ফূরণ। দৈহিক শক্তির জয়, সৃষ্টি করে খুনোখুনি, হানাহানি —ঈর্ষা বা ক্রোধের পরিবেশে স্থির থাকতে দেয় না একটিও মুহূর্ত্ত! অথচ জীবনটাকে উপভোগ করতে হলে, প্রয়োজন মানসিক তৃপ্তি। যা মন ভরায়, মেটায় প্রাণের তৃষ্ণা। প্রয়োজন তাই সুস্থ পরিবেশের। সেদিনই মানুষ অনুভব করেছে, সংযত ও সংহত জীবনছাড়া, সেরূপ পরিপূর্ণ নয়। এখান থেকেই মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন শুরু। ফলে, তারা পেল মমত্ববোধ, পেল মানবতার সন্ধান। প্রথমে অরণ্য, পরে এল গ্রাম, এলো বৃহত্তর গ্রাম। প্রয়োজন এল সংহতির। এলো পরিচালক, পত্তন হল সমাজ, রীতিনীতির ডোরে বদ্ধ হল তারা। উদ্ভূত হল সমালোচনা, সৃষ্টি হল নিয়মের শৃঙ্খল। প্রথমে মোড়ল, পরে সংঘপতি, এলো সমাজপতি, এলো সংঘবদ্ধতা, সুখে দুঃখে মানুষ গেল মিশে। জাগলোঃ প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সহানুভূতি— ঘনীভূত হল একত্বের বন্ধন। বুঝলো : তারা প্রত্যেকেই মানুষ, প্রত্যেকেই ভাই ভাই।

তবু শান্তি মিললো না, প্রাণের তৃষ্ণা মেটে না, অপূর্ণ রয়ে যায় আশা। সেই চিরন্তনী হাহাকার। রোগ, শোক, দুঃখ, বেদনা, জরা, মৃত্যু, ঘৃণা, অবহেলা— আঘাতের উপরে আঘাত। মানুষের আশা ব্যর্থ, স্বপ্ন ক্ষণঃভঙ্গুর। সৃষ্টি যত সুন্দরই হোক, সে অপূর্ণ। একজন আসে, একজন যায়— সেই সৃষ্টির ব্যর্থতা, তার জীবনের হাহাকার। সেই অফুরন্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ক্ষণঃভঙ্গুর কাঁচের মত চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায় ক্ষণিকে। কিন্তু কেন? মনের কোণে প্রশ্ন দানা বাঁধে— তবে কি অপ্রত্যক্ষ অজেয় শক্তি, লুকিয়ে আছে তার কর্ম-সাধন পথে?

শুরু হল অন্বেষণ। কোথায় সে শক্তির উৎস! যে দৈহিক শক্তিকে, কেন্দ্র করে শুরু তার জীবন-সাধনা, কেন পরাজিত হয় বারবার? কেন ভেঙে যায় তার মধুর স্বপ্ন? তবে কি মানুষ সত্যই শক্তিহীন? জীবনের যা কিছু, শুধুই কি আড়ম্বর— নিশার স্বপ্নের মত?

শক্তিহীন সে, একথা ভাবতে বুক দুর দুর করে। তার শক্তি, তার বড়াই, সবই কি তবে মিথ্যার ফানুষ? অথচ প্রত্যক্ষ জীবনে, সেটাই সত্য। তাহলে?

অজ্ঞাত মনের কোণে শঙ্কার দানা বাঁধে। তবে পরাজয় কি তার ললাট-লিখন? না-না-না বিদ্রোহী মন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে : অনতিক্রমকে জয়ই তার সাধনা। কিন্তু—

তবে সব ভেঙে পড়ে কেন? অকাল মৃত্যু কেন ছিনিয়ে নিয়ে যায় প্রিয়জনকে? বুকে এত মোচড় কেন? চোখের জলে নিজেকে সিক্ত করে কেন? হারানোর বেদনায় মুষড়ে পড়ে কেন? জীবনের সর্ব্বত্র একটা আশঙ্কার ছায়া, এই বুঝি হারাই.... এই বুঝি হারাই। —বেদনা! হ্যাঁ সে বেদনা থেকেই আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক থেকেই, মানুষের মনে জন্ম নিল ধর্ম্মের প্রেরণা। একটা অজ্ঞাত শক্তি তার ভাগ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

সেই অজ্ঞাত শক্তিকে অবশেষে মেনে নিল, অপদেবতা রূপে। শুরু হল: তাঁকে তুষ্ট করার পদ্ধতি।

প্রথমে মানুষ অপদেবতা অর্থে ভূত, প্রেতকে সন্তুষ্ট করতে, পাহাড়ে, পর্ব্বতের চূড়াকে পূজা শুরু করলো। মাখালো সিন্দুর, আঁকলো বিচিত্র মূর্ত্তি। তারপর গাছ, এলো পাথর, শেষে এলো নুড়ি। অপদেবতা পরিণত হল দেবতায়। রচিত হল স্তোত্র, তাঁকে তুষ্ট করার জন্য। প্রথমে শুরু হল পাঠ, তারপর এলো সাধন ভজন। এমনি করেই সমাজে, সংসারে এসেছে ভক্তির ভাণ্ড। এরপর থেকে প্রতিষ্ঠিত হল মন্দির— সংরক্ষণে এসেছে মঠ, নানা সম্প্রদায়।

মানুষের মন যেদিন ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে, ভক্তিমার্গের দিকে অগ্রসর হয়েছে, সেদিন থেকেই জাগরণ তার আত্মিকচেতনার। পূজা ও পাঠের পরিবর্ত্তন ঘটেছে, দিনের পর দিন। প্রথমে ছিল শ্রুতি, তারপর এলো লিখন। রচিত হল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ। প্রচলিত হল শাস্ত্র। রুচি ভেদে সৃষ্টি হল গোষ্ঠী, চিন্তার প্রসারতায়— এক একটি পথ বেছে নিল সাধন মার্গের পথে। তারা বুঝতে শিখলো : 'সর্ব্বভূতেষু'। সর্ব্বত্রই তিনি। খুঁজে নাও পথ। সবই এক, কেবল বিচিত্র সে ধারা পথ।

বুঝেছে : এক থেকে 'বহুর' সৃষ্টি। তুমি, আমি, সে, একই রক্তের ধারা। পৃথক— তারা মনভেদে, রুচিভেদে, প্রত্যক্ষ করার অবকাশে। বুঝেছে "সোহং"। এ পৃথিবীর পাহাড়, পর্ব্বত, জীব, জন্তু, সবই তাঁর সৃষ্টি। এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর। বাহ্যিক সুখ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যা শুধু মনোজগতে তৃপ্তি সঞ্চার করে —তা ক্ষণস্থায়ী। বাকী জীবনটা— তাই দুঃখ বেদনার ইতিহাস। এরই জ্বালায় জর্জ্জরিত মানুষের জীবন। তাকে জয় করতে হলে সমাহিত হতে হবে—সম অনুভূতি যেখানে। সুখের রূপ যা, দুঃখেরও তাই। উৎস এক, অনুভূতির তুলাদণ্ডে—তা বিচিত্র রূপরেখা মাত্র! পাওয়ার লোভ নেই, হারানোর ভয় নেই। আধ্যাত্মিক জগত ছাড়া বাসনার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। তাই এ তত্ত্বের নাম দেওয়া হল "ধর্ম্ম"। এ পথ অনুসরণ করলেই আসে বাসনা কামনার নিবৃত্তি। এ পথে যাঁরা অগ্রবর্ত্তী, তাঁরা সাধক, দেন পথের সন্ধান, যুগ প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন পথ-নির্দ্দেশে, মানুষের অন্তরজগতকে আলোকিত করেন। এঁদেরই বলি আমরা অবতার। এঁদের আগমন: পথহারা, দিশেহারাকে, দেখানো সত্য পথের সন্ধান।

প্রথম যে দিন শুরু হয়েছিল আধ্যাত্মিক পথের যাত্রা, মানুষ তখন ছিল সঙ্ঘবাসী। তার পরিধি বেড়েছে, সমাজে, সংসারে, দেশ-বিদেশে, রাজ্যে রাজ্যে, সীমাবদ্ধ রীতিতে। পরের পর, এসেছেন এক, একজন মহাপুরুষ, তাঁদের অনুসরণে এসেছে গণ্ডী। এই গণ্ডী থেকেই এসেছে প্রতিযোগিতা, উঠেছে ঝড় : কে বড়, কে শ্রেষ্ঠ— উঠেছে নানা প্রশ্ন। আধ্যাত্মিক আসরেও এসেছে লড়াই। এর জের, আজও চলেছে বিশ্বের দরবারে।

'বেদ' সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিকাশে। সেটাই বৈদিক যুগ নামে অভিহিত। এরপর আগমন ঘটেছে নানা মুনি, নানা ঋষির। এসেছে উপনিষদ, এলো পৌরাণিক

ধারা, এলো তন্ত্রসাধনা, উদ্ভুত হয়েছে নানা 'গুরু'র। বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন সে সুর, কিন্তু তাল লয়ের মাত্রা তার এক। রচিতও হয়েছে নানা গাঁথা। সেই এক সুর— আধ্যাত্মিক চেতনা। এটাই ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস।

এরপর এলো পরাক্রান্তশালী পাঠান, এলো মুঘল সম্প্রদায়। বিপর্য্যস্ত হল দেশ, বিপন্ন হল মানুষ, বিপর্য্যস্ত হল ধর্ম্ম। অধোগতির পথে নামলো সনাতন সেই ধর্ম্মের গণ্ডী। বিদেশী শক্তির ধর্ম্মীয় পেষণে, দলছুট হল তারা। নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে, কেউ কেউ পরধর্ম্ম বরণ করলো, আত্মিক সুখের আশায় নয়— জাগতিক সুখের তৃষ্ণায়। এদের মধ্যে আবার অনেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিমুখ হয়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ করলো কিন্তু যারা স্বদেশের স্বকীয় ধর্ম্মীয় রীতিনীতিকে বর্জ্জন করেনি, সংস্কারের বেড়াজালে নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ করে, জাতীয় সত্ত্বাকে জাগিয়ে রেখেছিল মিট মিট করে জ্বলা প্রদীপের মত। উত্থান পতনে, দানা বাঁধলো নানা কুসংস্কার। দৃঢ়বেষ্টনীতে বদ্ধ করলো তারা সামাজিক গণ্ডী। মাথা চাড়া দিয়েছিল নানা সংস্কার। দৃঢ় হয়েছিল জাতপাতের গণ্ডী, কিন্তু তার আত্মীক সাধনপথ, তার দর্শন— সেই একত্ত্বের বাঁধনকে বিচ্যুত হতে দেয়নি।

পতন হয়েছে পাঠান আধিপত্য, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুঘল সাম্রাজ্য, ভারতীয় সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি। সকল ধর্ম্মকে ঠাঁই দিয়ে, নিজস্ব সত্ত্বাকে পুষ্ট করেছে নিজেকে। উত্থান ও পতনের মত তলিয়ে গেল পাঠান ও মুঘল সাম্রাজ্য। এলো বিদেশী বণিকের দল, নিজেদের পত্তন করে গড়ে তুললো নিজ রাজ্য। সঙ্গে এলো সে-দেশীয় যাজক সম্প্রদায়— সাম্রাজ্যের সেই ভাঙা হাটের যুগে। বিভিন্ন শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখন। তাদেরই সহযোগীতায় বণিকসম্প্রদায় ভিতপত্তন করলো নিজেদের সাম্রাজ্য। তাদের শিক্ষা, তাদের আচার, ব্যবহার, তাদের ধর্ম্ম— আকৃষ্ট করলো এদেশবাসীদের। সে সুযোগ গ্রহণ করে, সুচতুর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, গড়ে তুললো শিক্ষার ব্যবস্থা। তাদের যাজক সম্প্রদায় জোর অপপ্রচার চালাতে লাগলো: কুসংস্কার, গোঁড়ামি আর জাতিভেদের বিরুদ্ধে। ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় পত্তন করলো গীর্জ্জা। সেখান থেকে জোর প্রচার চলতে শুরু হল : "তাদের ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ"।

সাম্রাজ্য পরিচালনে ছিল কিছু শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন। পত্তন হল: সেই মত শিক্ষাব্যবস্থা। এগিয়ে এলো কিছু দেশীয় সম্প্রদায়। তারাই সহযোগীতা করলো সে-সাম্রাজ্যের ভিত দৃঢ় প্রতিষ্ঠায়। প্রচার চলতে লাগলো: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মহিমা। এলো ব্যক্তিত্বের স্থূল আদর্শ, এলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার্ত্তা, এলো আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন। মেরুদণ্ডভাঙা সুদীর্ঘ পরাধীন জাতির মিয়মান ক্ষীণ দৃষ্টিতে, এলো বিভ্রান্তি। পাশ্চাত্যের উজ্জ্বল আলোকে, আপনাকে পর, পরকে আপন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। দীর্ঘকালের সাধনতত্ত্ব ভুলে গেল, ভুলে গেল তার সেই আত্মিক সাধনার আদর্শ। রূপকের ফাঁদে পা দিয়ে, ব্যস্ত হয়ে উঠল পাশ্চাত্যের আভিজাত্যকে বরণ করে নিতে।

তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, পুরুষাকার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, রেল, জাহাজ, বিপণী সম্ভার, চুলচেরা যুক্তি ও বুদ্ধি, তাদের শ্রম ও সাধনা, জ্ঞান ও গরিমা, এমন কি ভোগ সুখের তাৎপর্য্য, আচরণ ও বিচরণ সবই, দেশবাসীর চিত্তে আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। হিড়িক এলো ধর্ম্ম ত্যাগের। গ্রহণ করলো আধুনিক সভ্যতার খোলস, ধরলো মদ, ছাড়লো জাতীয় বেশ, সাজলো সাহেব— মাথায় দিল হ্যাট, ধরলো চুরুট, শূন্যে ছাড়তে শিখলো সিগারেটের ধোঁয়া। অন্তঃপুরবাসী গৃহলক্ষ্মীর দল, ধরলো মেমসাহেবদের গাউন, শিখলো ব্যালেটের নাচ, বলতে শুরু করলো: ডার্লিং, মাই সুইট হার্ট। রাম, কৃষ্ণ নাকচ হল— শুরু হল, 'যীশাস ক্রায়েস্ট' ও 'মাই-গড্'।

এলো নতুন ধারা, বইতে শুরু হলো নতুন স্রোত। উঠে গেল প্রণাম। চালু হল : গুড্মর্নিং, যোগ হল 'এক্সকিউজ মী প্লীজ' কখনও বা 'সরি'। এলো নব্য শিক্ষাধারা, নব্য চেতনা, নব্য

উন্মাদনা— 'থ্যাঙ্ক ইউ', মাত্রায় যোগ পড়ল 'সরি'। ওরা ধলা, আমরা কালা তবুও তো সব সাহেব! চলবে না মায়ের দেখা, বাপের দেখা, নিজের চোখে দেখে তবেই পছন্দ। মাই 'বেস্ট হাফ্', 'মাই লাইফ পার্টনার'। লাইফ : সেটা তুমি আর আমি, জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা 'হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ'। 'মাই' নেক্সট টু 'গড'।

সমাজ! দূর ছাই! সোসাইটি, এসোসিয়েশান, ক্লাব, 'লাইফ নাথিং বাট প্লে'— শুধু খেলা, তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, নাথিং মোর—দ্যাটস ওয়ার্ল্ড। হানি আর মানি, দ্যাটস্ ফর অল।

হিন্দুত্ব,— বন্ধন। মুক্তি— যীশাসক্রাইস্ট, নাম নব্যভারত। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, মনুসংহিতা, উপনিষদ, পুরাণ সব বুজরুকী! চার্চ্চ, গীর্জ্জা, বাইবেল— চরম ও পরম সম্পদ।...

চাল, চলন সব পালটে গেল। হ্যাণ্ডসেক আর গুডবাই।...

শুরু হল নূতন ভাবনা চিন্তা। মরা গাঙে বান : শুধু কাউ, কাউ আর কাউ, কাউ। প্রতিরোধ কর, বাঁধ দাও, একত্রিত হলেন চিন্তাবিদ্‌গণ। মিলিত হলেন পণ্ডিতের দল, ছাড় তর্ক বিতর্ক, খোঁজ নূতন পথ, নচেৎ সব গেল রসাতলে। নব শিক্ষায় শিক্ষিত, নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ, এগিয়ে এলেন রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর, সহযাত্রী আরও অনেকেই। গড়তে হবে সমান্তরাল পথ। পত্তন হল নতুন চিন্তাধারার। সৃষ্টি হল ব্রাহ্মসমাজের। যে স্বাধীন চেতনার নব উন্মেষ, সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক সব। খোঁজ বেদ, উপনিষদ, 'তন্ত্রশাস্ত্র'—! তৈরী হল ব্রাহ্মদর্শন। উন্মুখ দেশ— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে জড় হ'তে শুরু হল নবীন উৎসাহী দল।

ঠিক সেই সময়েই উদ্ভাসিত হল নোতুন আলো। যুগধর্ম্ম সৃষ্টির জন্য : জন্ম নিলেন নোতুন এক মহাপুরুষ।

হুগলী জেলার উত্তর পশ্চিম অংশ, যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে মিশেছে, তার একটু দূরে ত্রিভূজের মত তিনটি আছে গ্রাম। নাম—শ্রীপুর, কামারপুকুর আর মুকুন্দপুর। সে গ্রামগুলোকে সহসা কেউ আলাদা ভাবতে পারবে না। মনে হবে একটাই গ্রাম। আর তা 'কামারপুকুর' নামেই চিহ্নিত। স্থানীয় জমিদার এখানে বাস করেন, ফলে বর্দ্ধমান মহারাজের গুরুবংশীদের লাখরাজ জমি এই জমিদারীভুক্ত ছিল। গোপীলাল, সুখলাল (গোস্বামী), তাঁদেরই বংশধর। এখান থেকে বর্দ্ধমান যাওয়ার রাস্তা ছিল পাকা। এই গ্রামকে বেষ্টন করে পুরীধাম যাওয়ার রাস্তা। ন' দশ ক্রোশ দূরে তারকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ন' ক্রোশ দক্ষিণে ঘাটাল শহর। তেরো ক্রোশ পশ্চিমে বন-বিষ্ণুপুর। জমি খুবই উর্ব্বর, ছোটখাটো শিল্পের ব্যবসা, জিলাপী, মিঠাই ও নবাত প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও সূতা, গামছা, কাপড় প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত ছিল। আবলুস কাঠের হুকার নল ইত্যাদি ব্যবসার জন্য কলকাতার সঙ্গে সংযোগ ছিল সেই সূত্রে। গ্রামের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন। চৈত্রমাসে মনসা পূজা, শিবের গাজন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশপ্রহর সংকীর্ত্তন। জমিদার বাড়ীতে বারমাস পূজা পার্ব্বন, গ্রামবাসীদের ধর্ম্মপ্রবণ করে ছিল। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রীধর্ম। এখানে তিনটি গ্রামে রাজাধিরাজ, যাত্রাসিদ্ধিরায়, সন্ন্যাসীরায় নামে ধর্ম্মঠাকুরের প্রচলন ও পৃথক পৃথক মন্দির আজও বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, সদ্‌গোপ, কামার, কুমোর, জেলে, ডোম, সবরকম জাতের বাস। চলতি কথায় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম— ঐতিহ্য প্রধান। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, স্তূপ ও পরিখা ও শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্ত্তমান। পাঠান রাজত্বের প্রসিদ্ধির পরিচয় এখনও মেলে। মোগলমারির প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রও একদা সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়ে যায়।

এই কামারপুকুরের পশ্চিমে একক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দোর নামে তিনখানা পাশাপাশি ছিল গ্রাম। এখানে রামানন্দ রায় নামে এক প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন। তাঁর কোপে

যে পড়তো, তাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না তিনি। দেরে গ্রামে সত্যনিষ্ঠ, সহিষ্ণু ও ত্যাগী সদাচারী মানিক রাম চট্টোপাধ্যায় নামে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর তিনপুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ ক্ষুদিরাম, রামশীলা (কন্যা), নিধিরাম ও কানাইরাম। তিনি ছিলেন দীর্ঘ, সবল ও প্রিয় দর্শনধারী। বংশপরম্পরায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। পিতার মতই সত্যনিষ্ঠ, ত্যাগী ও ক্ষমাশীল। ঁরঘুবীরের পূজার পর জলগ্রহণ করতেন। নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁকে ভক্তি ও সম্মান করতো। দেবসেবা, সংসার ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে দিন কাটাতেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। চন্দ্রমণি ছিল তাঁর নাম। তাঁর পিত্রালয় ছিল সরাটিমায়াপুর। সংসারে চন্দ্রা নামে পরিচিতা। সুরূপা, সরলা, দেবদ্বিজপরায়না বিশেষ করে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসাই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণ-বিকাশ। আট বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়; (১২০৫ সাল)। ১২১২ সালে প্রথম সন্তান লাভ করেন। নাম তাঁর রামকুমার। পাঁচ বছর পরে কন্যাসন্তান লাভ করেন। নাম তাঁর কাত্যায়নী। ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম নাম রামেশ্বর। ধর্ম্মপথে থেকে সংসার পরিচালনা করতেন ক্ষুদিরাম, কিন্তু কোপে পড়ে গেলেন জমিদার রামানন্দ রায়ের। আদালতে তার পক্ষালম্বনে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ার অপরাধে, জমিদার মিথ্যা অপবাদে নালিশ রুজু করলেন এবং জয়ী হয়ে তার পৈত্রিক সম্পত্তি নিলাম করে নিলেন। গ্রাম ছাড়তে হল ক্ষুদিরামকে।

কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল। বন্ধুর বিপদে বিচলিত হয়ে তিনিই তাঁকে নিজের বাড়ীর একাংশের চালাঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। একবিঘা দশ ছটাক ধান জমি দান করলেন, সংসার প্রতিপালনের জন্য। পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীসহ নিঃস্ব ক্ষুদিরাম গ্রাম ছাড়লেন সঙ্গে গৃহদেবতা ঁরঘুবীর।

কামারপুকুরে পর্ণকুটীরে বসবাস শুরু করলেন ক্ষুদিরাম। সঙ্গে দশবছরের পুত্র রামকুমার ও চার বছরের কন্যা কাত্যায়নী। এই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত আশ্রয় লাভে তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হল। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতায় পূর্ণ ছিল হৃদয়। তা আরও বেড়ে গেল।

কাজ উপলক্ষ্যে একদিন অন্যগ্রামে যাত্রা করলেন। ফেরার পথে শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করতে লাগলেন। নির্ম্মল বাতাসে ক্লান্ত দেহমন, এলিয়ে পড়লো এবং নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন: তাঁর ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র বালকবেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে স্থানবিশেষ নির্দ্দেশ করে বলছেন, 'আমি অনেকদিন অযত্নে অনাহারে আছি। বাড়ী নিয়ে চলো। তোমার সেবা লাভের বাসনা আমার জেগেছে'। একথা শুনে ক্ষুদিরাম বিহ্বল চিত্তে বারবার প্রণাম করে বললেন, 'আমি ভক্তিহীন দরিদ্র, আমার ঘরে আপনার যথাযোগ্য সেবা সম্ভব হবে না। অপরাধে আমাকে নিরয়গামী হতে হবে। উত্তরে বালকবেশী রামচন্দ্র বললেন, 'ভয় নেই, ত্রুটি গ্রহণ করবো না। আমাকে নিয়ে চলো।' ঘুম ভেঙে গেলো। শ্রীভগবানের অযাচিত করুণায় প্রাণের আবেগে কেঁদে উঠলেন তিনি।

একি সত্য? সত্যই কি সৌভাগ্য উদয় হবে? চিন্তা করতে করতে কাছাকাছি ধানের ক্ষেতে দৃষ্টি পড়তেই বুঝলেন, স্বপ্নে ওখানটাই দেখেছেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে ওখানে পৌঁছতেই দেখতে পেলেন, একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলার উপরে সাপ ফনা তুলে পাহারা দিচ্ছে। যেই সেখানে উপস্থিত হলেন, সাপ মিলিয়ে গেল, শুধু বিবর মুখে শালগ্রাম পড়ে রয়েছেন। দেবাদিষ্ট জ্ঞানে 'জয় রঘুবীর' বলে শিলা গ্রহণ করলেন। পরীক্ষা করে বুঝলেন: সত্যই এটি রঘুবীর শিলা। আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। যথাশাস্ত্র সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করে গৃহদেবতা রূপে নিত্য সেবা করতে শুরু করলেন। সুখলাল গোস্বামীর দেওয়া জমিতে ধানের ফসল দ্বিগুণ বেড়ে গেল। দূর হল সংসারের অভাব।

শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বরনির্ভরতায় কেটে গেল তিন বছর। জীবনে নানা দিব্যদর্শন লাভ হ'তে লাগলো। 'গায়ত্রী দেবীর ধ্যানে' যখনই বসতেন বক্ষস্থল রক্তবর্ণ ও মুদ্রিত নয়ন থেকে অবিচল প্রেমাশ্রুধারা বইতে সুরু হত। সকালে যখন ফুল তুলতে যেতেন, দেখতেন : তাঁর আরাধ্যা দেবী শিতলা আটবছর কন্যার বেশ ধরে, হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে চলেছেন, গাছের ডাল ধরে তাঁকে ফুল তোলায় সাহায্য করছেন। এই সব দিব্য দর্শনে তাঁর অন্তর আনন্দ, বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ হয়ে উঠ্লো। গ্রামবাসীরাও সকলে ভক্তি, শ্রদ্ধা, করতে লাগলো। সহধর্ম্মিনী চন্দ্রাদেবীও ভিক্ষার্থী ও সাধুসম্প্রদায়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রাখলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের বয়স তখন ষোল। চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ শেষ করে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। কন্যা কাতায়নী এগারো বছরে পা দিয়েছে। কামারপুকুরের উত্তরে আনুড় গ্রামে কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাত্যায়নীর ও তার বোনের সঙ্গে রামকুমারের বিয়ে দিলেন। তখন বিয়েতে, ছেলেদের পণ দিয়ে বিয়ে করার প্রথা ছিল। সম্পর্কটা পালটা পালটি হলে উভয় পক্ষই নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কাটলো আরও চার বছর। রামকুমার স্মৃতি অধ্যয়ন শেষ করে বাবাকে সাংসারিক সুখে সাহায্য করতে লাগলেন। ইতিপূর্ব্বে অবশ্য ভাগিনেয় রামচাঁদ (রামশীলার পুত্র) মেদিনীপুরে মোক্তারী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকেই মামাকে মাসে দশটাকা করে সাহায্য করে আসছিলেন, তাঁর বাস্তুচ্যুত হওয়ার পর থেকেই। পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা, এখন তিনি স্বচ্ছল হয়ে উঠেছেন। স্থির করলেন : সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে গমন করবেন। পদব্রজে তীর্থ পর্যটনে (১২৩০ সাল) বেড়িয়ে পড়লেন। দাক্ষিণাত্যের সকল তীর্থ দর্শন শেষে বাড়ী ফিরে এলেন। সঙ্গে রামেশ্বর সেতুবন্ধ থেকে বানলিঙ্গ আনলেন। তাঁকে 'রঘুবীর শিলা ও 'শিতলাদেবীর ঘটের' পাশে স্থাপন করলেন। এঁর পরেই লাভ করলেন একটি পুত্র (১২৩২) নাম রাখলেন 'রামেশ্বর'। (রামেশ্বর তীর্থ থেকে ফেরার পর পুত্র হওয়ায় পুত্রের নাম রামেশ্বর রাখলেন।)

রামকুমার স্মৃতির বিধান দিতেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কাজ করতেন। এই সময়ে দেবী শক্তি লাভ করেছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আদ্যাশক্তির উপাসনায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। উপযুক্ত গুরুর কাছে 'দেবী মন্ত্রও গ্রহণ করেছিলেন। অভীষ্টদেবীকে নিত্য পূজার সময় একদিন তাঁর (দেবীর) দর্শন লাভ হল। তিনি অনুভব করেছিলেন দেবী যেন নিজে তাঁর জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রবর্ণ লিখে দিচ্ছে। তারপর থেকেই তিনি রোগী দেখলেই বুঝিতে পারতেন আরোগ্য লাভ করবে কিনা। ভবিষ্যবক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। নিজেও বুঝেছিলেন তাঁর স্ত্রী, সন্তানের জন্ম দেবার পরই ইহলোক ত্যাগ করবেন।

ধীরে ধীরে উপস্থিত হল ১২৪১ সাল। কন্যা কাত্যায়নীর অসুস্থতার সংবাদে আনুর গ্রামে উপস্থিত হলেন ক্ষুদিরাম। তার হাবভাব ও কথাবার্ত্তায় বুঝলেন, কোন অশরীরী তাঁর কন্যার শরীরে অবস্থান করছে। তখন সমাহিত চিত্তে শ্রীভগবানকে স্মরণ করে প্রবিষ্ট জীবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি দেবতা বা উপদেবতা যাহাই হও, আমার কন্যাকে এরূপভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন? অন্যত্র গমন কর। উত্তরে, উক্ত জীব বললো : গয়ায় পিণ্ড দানে আমার কষ্টের লাঘব করার প্রতিশ্রুতি দাও, কন্যা আরোগ্য লাভ করবে।

ক্ষুদিরাম কন্যার আরোগ্য লাভ, ও পিতৃ পুরুষদেবের পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে পদব্রজে গয়া যাত্রা করলেন। ইতিপূর্ব্বে দেরেপুর থেকে শ্রীবৃন্দাবন, 'অযোধ্যা ও বারানসী তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে পুত্র ও কন্যা লাভ করায় নাম রেখেছিলেন রামকুমার ও কাত্যায়নী। এবারও প্রথমে গেলেন বারানসী তার পর গয়া। পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করলেন। 'গদাধরের

শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদানে তৃপ্তি ও শান্তি পেলেন। (চৈত্র মাস, মধুমাস, গয়ায় পিণ্ডদানে সুফল লাভ হয়)। সারাদিন শান্তি ও উল্লাসে ডুবে রইলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন : তিনি শ্রীমন্দিরে গদাধরের পাদপদ্মে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করেছেন। তাঁরা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় শরীরে, তা সানন্দে গ্রহণ করে আশীর্ব্বাদ করছেন। তাঁদের দেখে আত্মসংবরণ করতে পারছেন না, ভাবে গদগদ হয়ে কাঁদছেন আর তাঁদের পদস্পর্শ করে প্রণাম করছেন। এরপরে দেখলেন : মন্দির জ্যোতিতে পূর্ণ। সসম্ভ্রমে করজোড়ে দাঁড়িয়ে পিতৃপুরুষগণ, মন্দিরে বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে উপাসনা করছেন। তাঁর (ক্ষুদিরাম) দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করছেন। তিনিও উপস্থিত হয়ে ভক্তিবিহ্বল চিত্তে প্রণাম করে আবেগে স্তুতি ও বন্দনা করতে লাগলেন। দিব্যপুরুষ তুষ্ট হয়ে তাঁকে. বললেন : ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে প্রসন্ন হয়েছি। পুত্র রূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করবো। "আনন্দে আত্মহারা হলেন কিন্তু পরক্ষণেই নিজ দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে বললেন, কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন। আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়েছি কিন্তু আমি যে দরিদ্র, আপনার সেবা কি দিয়ে করবো? অধিকতর প্রসন্ন হয়ে তিনি বললেন, তুমি যা দেবে তাই গ্রহণ করবো। আমার অভিলাষ অপূর্ণ রেখো না।..." নিদ্রা ভেঙে গেল। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে স্তম্ভিত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে রইলেন। বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাল, দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না। কোন মহাপুরুষ তাঁর ঘরে জন্ম নেবেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রমুখ দেখতে হবে। তবে একথা কাউকেও প্রকাশ করবেন না স্থির করে কামারপুকুরে ফিরে এলেন ১২৪২ সালে।

ক্ষুদিরাম গয়া থেকে ফিরে স্ত্রীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে লাগলেন। এখন তিনি সকল সময় প্রতিবেশীর দুঃখে কাতর। কে অভুক্ত, কার কি প্রয়োজন, দেবদ্বিজে ভক্তি, গৃহদেবতাদের সেবা সকল কিছুতেই তাঁর তন্ময় ভাব। এখন দেবতা যেন দেবতা নন— তাঁর পুত্রগণের অন্যতম। তাদের সেবা, তাদের তৃপ্তি সাধনই যেন জীবনের একমাত্র কাম্য।

কয়েকদিন পরে যখন তিনি গয়াধামে ছিলেন কি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীর কাছে ব্যক্ত করলেন : স্বপ্ন দেখলাম এক জ্যোতির্ম্ময় দেবতা আমার শয্যায় শয়ন করে আছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি, পরে বুঝেছিলাম মানুষের ওরূপ সম্ভব কিরূপে? তুমি তো তখন গয়ায়। ঘুম ভেঙে গেল। তখনও মনে হতে লাগলো তিনি এখনও শুয়ে আছেন, পরক্ষণে মনে হল দেবতারা কি কোনদিন আসেন? আবার মনে হল কোন দুষ্ট লোক ঢুকে নেই তো? ভয়ানক ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখলাম, ঘরে কেউ নেই, কপাটের খিল তেমনি রয়েছে! ভয়ে সেরাত্রি আর ঘুমতেই পারলাম না।... আর একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ধনীর সঙ্গে কথা বলছি, দেখলাম মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে দিব্যজ্যোতি বেরিয়ে মন্দির পূর্ণ হয়ে গেল আর সেই জ্যোতি আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে যেন, আমার ভেতরে ঢুকে গেল। বিস্মিত শুধু নয়, মূর্চ্ছা গেলাম। ধনী শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফেরালো। তাকে সকল কথা বলায় সে বললো : বায়ুরোগ তোমায় পেয়েছে। সেই থেকে কেমন যেন মনে হয় সেই জ্যোতি আমার পেটে আশ্রয় নিয়েছে।

ক্ষুদিরাম তাঁর নিজের স্বপ্নের কথা স্মরণ করে বললেন, কারও কাছে এ দর্শন বা অনুভূতির কথা বলো না। গয়াধামে আমাকেও এই অলৌকিক স্বপ্ন দিয়েছেন। আমাদের পুত্রমুখ দর্শন করতে হবে।

স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। চন্দ্রাদেবীর নিত্য দেবদর্শন হতে লাগলো। দেবদ্বিজে ভক্তি, প্রায় মাতৃস্নেহে আপ্লুত হয়ে উঠতে লাগলো। দেবমূর্ত্তি সকল সহজ অবস্থায় মানুষের মত ঘুরে ফিরে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো। রূপে ফেটে পড়লেন চন্দ্রাদেবী।

কিন্তু চন্দ্রাদেবীর মনের সংশয় কাটে না। বার বার স্বামীকে প্রশ্ন করেন : সব সময়ে ওসব ছবি দেখি, আসে আবার মিলিয়ে যায়, কোন রোগ হয়নি তো?

ক্ষুদিরাম, তাঁকে নিজের স্বপ্নের কথা স্মরণ করে বললেন : আমাদের অশেষ সৌভাগ্য। পুরুষোত্তম আস্‌ছেন। সেইজন্য এসব দিব্য দর্শন।.... কেটে গেল শরৎ, হেমন্ত, শীত, এলো ঋতুরাজ বসন্ত। ফাল্গুন মাসের ছ' তারিখ। রাত্রে আহার শেষ করে ক্ষুদিরাম ও রামকুমার শয়ন কক্ষে আশ্রয় নিলেন। চন্দ্রাদেবী আর ধনী পাশের ঘরে শয়ন করলেন। সারাদিন কাজ করেছেন চন্দ্রাদেবী কিন্তু শরীরের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। পূর্ণমাস কখন কি হয় কে জানে? তারই প্রস্তুতি। রঘুবীরের ঘর ছাড়া বসবাসের জন্য দুটি চালাঘর। পাশে রান্নাঘর তার পাশে ঢেকিশালা। সেখানে ধান সিদ্ধ করার ব্যবস্থা হিসাবে একটি উনুন। সেটিকেই আঁতুড় ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হবে স্থির হয়েছিল।

ভোর হতে আধ দণ্ড বাকী, প্রসব বেদনা সুরু হল। ধনী পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত চন্দ্রাদেবীকে সেখানে নিয়ে এলেন। অল্প পরেই এক পুত্র প্রসব করলেন। ধনী জাতকের কালোপযোগী ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখলো, যেখানে শিশুকে রাখা হয়েছিল সেখানে শিশু নেই। অনুসন্ধানে দেখা গেল উনানের ভেতর বিভূতিভূষিতাঙ্গ হয়ে স্থির হয়ে শুয়ে আছে কোন সাড়া শব্দ নেই। ধনী শিশুকে সযত্নে পরিষ্কার করে, আলোতে দেখলো অদ্ভুত সুন্দর যেন ছ'মাসের সে ছেলে। সংবাদ পেয়ে লাহাবাড়ীর প্রসন্ন দু'চারজন সঙ্গী নিয়ে এসে শাঁখ বাজাতে শুরু করলো।.... (শকাব্দ ১৭৫৭, ১২৪২ সাল/১৮০৬ খৃষ্টাব্দ, ৬ই ফাল্গুণ/১৭ই ফেব্রুয়ারী, শুক্লপক্ষ, বুধবার, শুভা দ্বিতীয়া তিথি, রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হয়ে আধদণ্ড বাকী।)

পুত্রমুখ দর্শনে ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী গয়ার দেবস্বপ্ন, শিবমন্দিরের দিব্যদর্শনের কথা ভুলে গেলেন। শিশুর পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভাগিনেয় রামচাঁদের কাছে শিশুর আগমন বার্ত্তা পাঠানো হল। তিনি (রামচাঁদ) দুধের অভাব মেটানোর জন্য দুগ্ধবতী গাভী পাঠিয়ে দিলেন। নবজাতকের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই নানাদিক থেকে অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ হতে লাগলো।

দিন যত যায়, শিশুর চিত্তাকর্ষন শক্তি বাড়তে থাকে। প্রভাব শুধু মা-বাবার ওপর নয়, পরিবারের ও পল্লীবাসী সকল রমনীদেরও অভিভূত করেছে। তাকে একটি বার না দেখে স্থির থাকতে পারে না। সময় নেই, অসময় নেই, শিশুর জন্য মন কেমন করে। ঘরের কাজ ফেলে ছুটে আসে তারা একে একে।

কাটলো পাঁচ মাস। অন্নপ্রাশন উপস্থিত। ক্ষুদিরাম অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করলেন কিন্তু পরম বন্ধু জমিদার ধর্ম্মদাস লাহা সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে ব্রাহ্মণ ও গ্রামের সকলকে ভুরিভোজে পরিতুষ্ট করলেন। ক্ষুদিরাম শিশুর নাম রাখলেন 'গদাধর'।

গদাধরের বয়স যখন সাত আট মাস, চন্দ্রাদেবী শিশুকে স্তন্যদান করে ঘুমন্ত অবস্থায় মশারীর মধ্যে শুইয়ে রেখে, ঘরের কাজে মন দিলেন। কিছু সময় পরে প্রয়োজনবশতঃ ঘরে ফিরে এলেন। দেখলেন, মশারীর মধ্যে তাঁর শিশুপুত্র নেই, পরিবর্ত্তে দীর্ঘকায় অপরিচিত এক পুরুষ শুয়ে আছে। আতঙ্কে চীৎকার করে ঘরের বাইরে এসে, স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখলেন শিশু তেমনিই ভাবে নিদ্রা যাচ্ছে। মার শঙ্কা দূর হল না, বার বার বলতে লাগলেন আমি স্পষ্ট দেখেছি দীর্ঘকায় এক পুরুষকে শুয়ে থাকতে--- নিশ্চয় উপদেবতা। রোজা ডেকে দেখাও, ছেলের আমার কোন অনিষ্ট হবে নাতো।

ক্ষুদিরাম আশ্বাস দিলেন রঘুবীর স্বয়ং বিদ্যমান। উপদেবতা কি শিশুর অনিষ্ট করতে পারে? নিশ্চিন্ত হও। একথা অন্য কাউকে বলো না। রঘুবীরই রক্ষা করবেন। দিন যায়, দিন আসে। শিশু
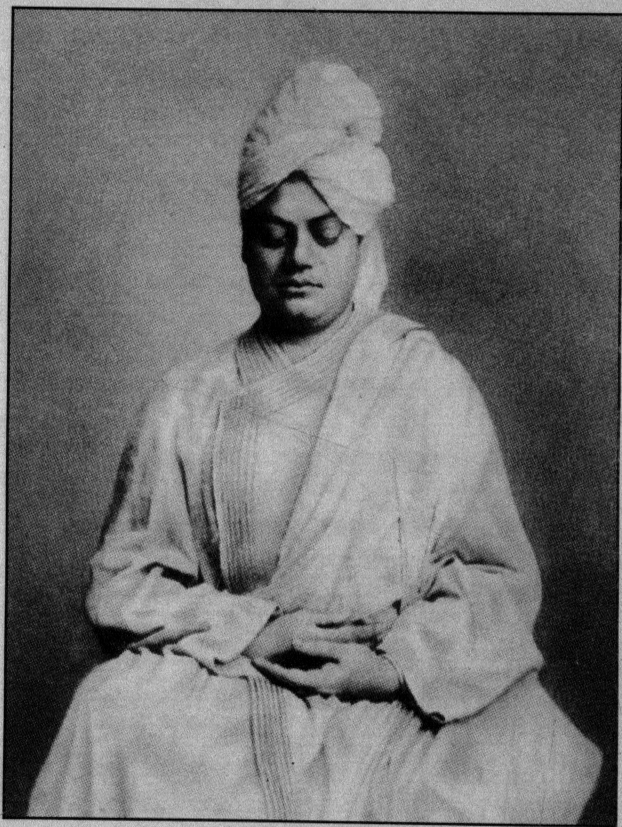
ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তার আকর্ষণ ক্রমেই পাড়াপ্রতিবেশীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে চলে। তাকে ভাল না বেসে থাকা যায় না। কোলে না তুলে নিয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। কেমন যেন অযাচিত স্নেহ ও মমতার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে সকলকে।

ক্রমে বয়স বাড়লো পাঁচ। ক্ষুদিরামের জন্ম নিল একটি কন্যা সন্তান। নাম রাখলেন সর্ব্বমঙ্গলা। গদাধর এখন বাবার সঙ্গে ঘোরে। বাবার কোলে বসে পূর্ব্ব-পুরুষদের নাম শোনে। কখনও বা ছোট ছোট স্তোত্র, প্রণামের মন্ত্র, কখনও বা রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র উপাখ্যান শোনে। বালক গদাধর তা আয়ত্ত করে নেয়। জিজ্ঞাসা করলে, সেই সব কাহিনী আবৃত্তি করে সকলের কাছে। তার মেধা ও প্রতিভা বিকাশে, বিস্ময় বোধ করেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু গণিত শাস্ত্র নিয়ে যে বাস্তব জগত, তার নামতা কিছুতেই তার স্মরণ থাকে না।

চাঞ্চল্য বাড়ে। বিদ্যাশিক্ষা শুরু হল (বয়স তখন পাঁচ)। সঙ্গী পেয়ে খুব খুশী গদাধর। তার স্মৃতি শক্তিতে আকৃষ্ট শিক্ষকও। প্রিয় হয়ে উঠলো কয়েকদিনের মধ্যে।

গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের নাট্যমণ্ডপে, তাঁদেরই ব্যয়ে একজন গুরুমশায় পাঠশালায় শিক্ষা দান করতেন। পল্লীর বালকদের কল্যানার্থে, সকালে, বৈকালে যথাক্রমে দুঘণ্টা ও তিন ঘণ্টা পাঠশালায় পড়তেন। যারা গদাধরের মত ছোট, তাদের পড়াশুনার চাপ বেশী ছিল না। দু'বেলা হাজিরা দিলেই চলতো। পাঠের অভ্যাস ছাড়া— হয় তারা চুপ হয়ে বসে থাকতো, নয় তো কাছাকাছি নিজের জায়গায় তারা পরস্পর খেলাধূলা করতো। অবশ্য নোতুনদের তত্ত্বাবধান করতো পুরানো পড়ুয়ারা। পাঠ দেওয়া নেওয়ার কাজটা তারাই চালিয়ে নিত। তখন যদুনাথ সরকার শিক্ষকতা করতেন। তারপরে এলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকার। এঁরাও তার স্মৃতিশক্তি ও মেধায় চমৎকৃত হলেন।

ক্ষুদিরামের স্বপ্ন ও দর্শন, যেমন শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন করেছিল, তেমনি তার অধীর চঞ্চলতায় বাধা দেওয়া অকিঞ্চিতকর বলে মনে হতো। সকল আবদার হাসি মুখে মেনে নিতেন। কখন কখন পাঠশালায় না গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলা করলে বাধা দিতেন না। যাত্রাগান, গ্রামে কোথাও হলে, তাকে শুনতে যেতে মানা করতেন না। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই গড়ে উঠছিল তার প্রকৃতি। তবে তার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল যে, মিথ্যাচার বা কপটতার ঠাঁই ছিল না। যা সত্য অকপটে মেনে চলতো-কিন্তু বাধা মানা ছিল, তার স্বভাব বিরুদ্ধ। যা ধরবে, তা করবেই এমনই জেদী তার প্রকৃতি। ক্ষুদিরাম সতর্ক হলেন। সরলতা ও অকপটতাকে প্রশয় দিলেও, তাকে এখন থেকে সতর্কভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

পাঠশালে নিয়মিত শিক্ষা শুরু হল। পাঠ ও লেখায় পারদর্শী হলেও অঙ্কে ভীতি সমভাবেই রয়ে গেল। দৃষ্টি বাড়লো অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তির। কুম্ভকাররা দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়ে। যাতায়াত শুরু হল বালকের। দেখে, শুনে, পরামর্শ নিয়ে পাকা পটুয়া হয়ে গেল বালক। পট-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে ভাল চিত্র অঙ্কন করতে শিখলো। গ্রামে পুরাণ কথা বা যাত্রাগান শুনলেই উপস্থিত সকলের আগে। শাস্ত্র উপাখ্যান মন দিয়ে শুনে শিখে নিল অকপটে। শ্রোতাদের কাছে কি রূপে প্রকাশ করলে সকলের প্রীতিকর হয়, লক্ষ্য করে নকল করে নিতো। অপূর্ব্ব তার স্মৃতি, অপূর্ব্ব তার মেধা, একবার শুনেই হৃদয়স্থ করে নেয়। সদানন্দ বালক। রঙ্গরস প্রিয়তায় যেমন অদ্ভুত, অনুকরণ শক্তিও তেমনি প্রবল, যা দেখে তাই শেখে। নরনারীর হাবভাব নকল করতে শিখে নিল। সরলতার মূর্ত্তপ্রতীক, দেবভক্তিও তেমনি। মা-বাবার প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের প্রতি যেমন লক্ষ্য, ভক্তি ও নিষ্ঠাও তার তেমনি সহজসাধ্য। সবকিছুই তার চমৎকার।...

পা দিল ছ'য়ে। আচার-আচরণে, বিচার...বিচরণে... মোহিত করে গ্রামের নারীপুরুষ সকলকে। সকলের প্রিয় সে। যেখানেই যায়, সেখানেই সে আপন হয়ে যায়, আপন করে নেয়ও সকলকে। যে তাকে দেখে, ভুলতে পারে না সহজে। এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী সে।

একদিন বাবার সঙ্গে গেল ভরশোভা গ্রামে, জমিদার মানিকরাজার বাড়ী। ভক্ত ও দাতা হিসাবে পরিচিত সকলের কাছে। ক্ষুদিরামের নিষ্ঠা ও ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে বন্ধুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ হয়েছেন উভয়ে। বালককে দেখেই মুগ্ধ হলেন সকলে। তাঁর ভাই রামজয় বলেই ফেললেন : সখা, ছেলেটি তোমার সামান্য নয় দেবঅংশে জাত বলে মনে হয়। যখনই আসবে একে সঙ্গে করে নিয়ে এসো, দেখলেই আনন্দে প্রাণ আত্মহারা হয়ে ওঠে।

সেদিন থেকেই বালক হয়ে উঠলো তাঁদের একান্ত প্রিয়জন। তাকে না দেখলে, তাঁরা এমন কি বাড়ীর মেয়েরাও স্থির থাকতে পারতেন না। হয় ক্ষুদিরামকে বাধ্য হয়ে আসতে হতো, নয়তো তারাই লোক এমনি কি পরিবারে একজন রমনীকে পাঠিয়ে দিতেন, বালককে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য।

এই সময় থেকেই বালক নারী সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। বাড়ীতে কোন সুখাদ্য হলেই তাকে না খাওয়ালে তাদের তৃপ্তি হত না। সঙ্গীরাও (বালকের বন্ধু সকল) তার ভাগ পেয়ে খুশীতে মেতে উঠতো। তার কণ্ঠ, সঙ্গীত, হাসি— মুগ্ধ — করতো মেয়েদের। তারা (মেয়েরা) যেমন তার দৌরাত্ম সহ্য করতো —বিনিময়ে গাওয়া তার দু একটা গান শুনে মনেপ্রাণে তৃপ্তি বোধ করতো।

সাতে পা দিল বালক। গগনচারী বিহঙ্গের মত স্বাধীন বিচরণ, আর ভাবময় একাগ্রতা প্রভৃতি সহজ আকর্ষণ, তাকে আত্মহারা এক ভাবরাজ্যে টানতে শুরু করলো। মাঠে, আলপথে বন্ধুদের সঙ্গে চলতে চলতে সহসা দৃষ্টি তার পড়লো আকাশে মেঘের কোলে— উড়ে যাচ্ছে সাদা বলাকার দল। মোহিত হয়ে গেল বালক। তন্ময়তায় জ্ঞান হারালো চকিতে। সংজ্ঞাহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো প্রান্তরে। সঙ্গীরা ভয়ে, কেউ বাড়ীতে মা-বাবাকে সংবাদ দিতে ছুটলো, আবার তাদের সঙ্গী কিছু ছেলে, তাকে ধরা ধরি করে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরলো—পূর্ব্বের মতই সুস্থবোধ করলো— কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়লেন ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী। ভাবলেন : মূর্ছাব্যাধির সূত্রপাত। চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্তয়নে উদ্যত হলেন তাঁরা। যদিও বালক সবিস্তারে, তাঁদের সবকথা খুলে বললো, ঐ দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন তার এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবে লীন হয়ে গিয়েছিল। তাই জ্ঞান হারিয়েছিল, কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হল না তাঁদের। ক্ষুদিরাম ভাবলেন, বায়ুর প্রকোপ, চন্দ্রাদেবী ভাবলেন, উপদেবতার নজর লেগেছে। ১২৪৯ সাল। শারদীয় মহাপূজা। ক্ষুদিরামের কৃতী ভাগিনেয় রামচাঁদ কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে, সেখানে সারাবছর অতিবাহিত করলেও, নিজ গ্রাম সোলেমপুরে প্রতিবৎসর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করতেন। এই কয়দিন গীতবাদ্য ছাড়া ব্রাহ্মণ ভোজন, পণ্ডিত বিদায়, দরিদ্রভোজন ও বস্ত্রদান সাড়ম্বরে পালিত হত। ক্ষুদিরামকে (মাতুল) এই সময় আনাতেন। এবছরও আনালেন। কিছুদিন থেকে তিনি অজীর্ণ ও গ্রহণী রোগে ভুগছিলেন। যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও, পাছে যাওয়া আর না হয়ে ওঠে ভেবে, রামকুমারের সঙ্গে যাওয়া স্থির করলেন। সেখানে পৌছবার পরেই গ্রহণী রোগ পুনরায় দেখা দিল। রামচাঁদ চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী কেটে গেল। নবমীর দিন ব্যধি প্রবল রূপ ধারণ করলো। রামচাঁদ বড় বড় বদ্যি আনালেন, হেমাঙ্গিনী (বোন) ও রামকুমার সেবা করতে লাগলেন। রোগের উপশম দেখা দিল না। কোনরকমে রাত্রিটা কাটলো। পবিত্র বিজয়াদশমীর সম্মেলনের দিন সমাগত। ক্ষুদিরাম বাকশক্তি হারালেন, শেষে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে বৈকালে রামচাঁদ মামার কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁর

অন্তিমকাল উপস্থিত। কাঁদতে লাগলেন রামচাঁদ। বললেন, মামা সবসময় তুমি রঘুবীর, রঘুবীর কর এখন বলছো না কেন? নাম শ্রবণে জ্ঞান ফিরে এলো ক্ষুদিরামের। জড়ানো স্বরে বললেন, প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে এসেছো রামচাঁদ! একবার আমাকে বসিয়ে দাও। ধরাধরি করে রামচাঁদ হেমাঙ্গিনী ও রামকুমার শয্যায় অতিসন্তর্পনে বসিয়ে দিলেন। ক্ষুদিরাম তিনবার রঘুবীরের' নাম উচ্চারণ করে দেহত্যাগ করলেন।

অগ্নিসংস্কার শেষে একা ফিরে এলেন রামকুমার। স্তব্ধ চন্দ্রাদেবী। চুয়াল্লিশ বছরের সহযাত্রী আজ আর নেই। একা, নিতান্তই একা। যে রঘুবীরের পাদপদ্ম স্মরণে এ-দীর্ঘদিন কেটেছে, এবার স্থির করলেন : তাঁর কাজেই সমাহিত থাকবেন। ঘর দুয়ার সবই শূন্য। কিন্তু মায়া ছাড়ে কই? পাশে সাড়ে সাত্ বছরের বালক-পুত্র গদাধর, চার বছরের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা, এদের দিকে তাকাবে কে? নিজেকে সংযত করে তুললেন চন্দ্রাদেবী। নিযুক্ত হলেন 'রঘুবীরের' সেবায়। সেই সঙ্গে রইলো পুত্রকন্যার দায়িত্ব।

সংসারে সমস্ত দায়িত্ব চাপলো রামকুমারের ঘাড়ে। শোকের অবসর রইলো না। শোকসন্তপ্ত জননী, বালক ভ্রাতা ও শিশু ভগ্নী, আর আঠারো বছরের ভ্রাতা রামেশ্বর, স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি পাঠ শেষ করে যাতে সংসারে সাহায্য করতে পারে সেই চিন্তায় মগ্ন, তবুও অর্থোপর্জ্জনে মন দিতে হল তাঁকে। আর কর্ম্মকুশলা স্ত্রী তাঁর এগিয়ে এলেন চন্দ্রাদেবীকে সাহায্য করতে।

শৈশবে মার আদর যত্ন, স্নেহ-মায়া জীবনের প্রধান অলম্বন, কিন্তু যখন শিশুমন বাবার ভালবাসার পরিচয় দিন দিন উপলব্ধি করতে শুরু করে, তার সকল অভাব, যা মাতৃস্নেহপূরণ করতে অসমর্থ, পিতার স্নেহে তা পূরণ হয়ে থাকে। সেই অভাবটা পিতৃবিয়োগে অপরিসীম হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃবিয়োগে গদাধর সেই অবস্থার সম্মুখীন হল। প্রতিটি দিনের ক্ষুদ্র ঘটনা, পিতার অভাবকে বার বার স্মরণ করিয়া দিতে লাগলো। বিষাদে পূর্ণ হয়ে রইলো হৃদয়। কিন্তু বুদ্ধিমান গদাধর মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করে তুললো। লোকে দেখলো : সদানন্দ গদাধর সহজাত হাস্যকৌতুকে দিন যাপন করছে। ভূতির খালের শ্মশান, মানিকরাজার আমবাগান, গ্রামের জনশূন্য স্থানে একাকী যাপন, বালসূচক চপলতা বলে মনে হলেও, চিন্তাশীল ও নির্জ্জন-প্রিয় করে তুললো তাকে।

ঘরে ফিরে, মার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। ব্যথার কালিমায় মলিন সে মুখ। বিচলিত হয়ে ওঠে বালক। না—না— নিজের স্বার্থের কথা আর ভাববে না কিছুতেই, বিচলিত হতে দেবে না মনকে! মার প্রতি আকর্ষণ পুনঃ জেগে ওঠে। তাই, দেব সেবা ও গৃহকর্ম্মে মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলো ধীরে ধীরে।

গদাধর পাঠশালায় যায়। পূর্ব্বের মত বিদ্যাভ্যাস করে। পুরাণ কথা, যাত্রাগান শ্রবণ করা, দেব দেবীর মূর্ত্তি গঠন করা তার প্রিয় হয়ে উঠলো। আরও একটা নেশা তাকে পেয়ে বসলো : পুরী যাওয়ার পথে লাহাবাবুদের একটি পান্থনিবাস ছিল, যেখানে যাত্রীদের পথশ্রান্তি দূর করার জন্য আসতো সাধু সন্ন্যাসীর দল। জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া ও ফেরার পথে, সেখানে তাঁদের অনেকেই, আশ্রয় নিত এখানে। সংসার অনিত্য— ইতিপূর্ব্বেই বুঝেছিল— পিতার মৃত্যুতে। সাধুরা সংসার ত্যাগ করে পরমার্থের সন্ধান করে, তাদের সঙ্গ শান্তিদানে কৃতার্থ করে। পুরাণ মুখে একথা জেনে সাধুদের সঙ্গে পরিচয়ের আশায়, সেখানে যাতায়াত শুরু করলো বালক।

এদের মধ্যে যাঁদের যথার্থ সাধু বলে মনে হত, তাদের রান্নার জন্য কাঠ সংগ্রহ, পানীয় জল এনে দেওয়া ইত্যাদি ছোট ছোট কাজে সাহায্য করতে লাগলো। ফলে, ঘনিষ্ট হবার সুযোগ এসে

গেল। তাঁরাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে পরিতৃপ্ত হয়ে ভগবদ্ভজন, সদুপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। প্রসাদী ভিক্ষান্নের কিছু অংশ তাকে দিয়ে নিজেরা গ্রহণ করতেন। যাঁরা বেশী দিন থাকতেন তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ বেশী লাভ করতো।

ক্রমে বয়স যখন তার আট, সাধুদের অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ এসে গেল। কারণ অনেকেই এখানে বেশ কিছুদিন থাকতে সুরু করেছেন। কোন কোনদিন সেখানেই আহার করে বাড়ীতে ফিরতো। মা জিজ্ঞাসা করায় সত্য কথা বলতো। চন্দ্রাদেবী সাধুদের খাবার পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু যেদিন গদাধর বিভূতি ভূষিতাঙ্গ হয়ে বাড়ী ফিরলো বা কোন কোনদিন কৌপিন ও বহির্বাস পরে ফিরে আসতো, তখনই চঞ্চল হয়ে উঠতেন। সশ্রুনয়নে বলতেন : সাধুরা তোকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে যাবে এ আমি সহ্য করতে পারবো না।

গদাধর মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু মার চোখের জল থামে না। পরদিন গদাধর সাধুদের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলো। কারণ জিজ্ঞাসা করায় গদাধর বললো : মার মনের আশঙ্কার কথা। তাঁরা বালকের সঙ্গে চন্দ্রাদেবীর কাছে এসে বোঝালেন, সেরূপ ভয়ের কারণ নেই। পিতামাতার অনুমতি ছাড়া বালককে সঙ্গে নেওয়া, অপহরণ স্বরূপ সাধুবিগর্হিত অপরাধ।

মার মনের আশঙ্কা দূর হল। সাধুদের প্রার্থনা মত তাঁদের কাছে খাওয়ার অনুমতি দিলেন। গদাধরের সাধুসঙ্গের বাধা আর রইলো না।

আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। দেবী সন্দর্শনে চলেছে ভক্তিমতী প্রসন্নময়ী, ধর্ম্মদাস লাহার কন্যা। সঙ্গে গদাধর। কামারপুকুর থেকে উত্তরে একক্রোশ দূর পথ। তন্ময় গদাধর চলছে পাশে পাশে। হঠাৎ পথিমধ্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো। প্রসন্ন তার ভাবাবেশ উপস্থিত হয়েছে বুঝতে পেরেছিল। জ্ঞান ফিরলে, 'কি হল'?.জিজ্ঞাসা করায় প্রসন্নের উত্তরে বললো : দেবীর চিন্তা করতে করতে তাঁর পাদপদ্মে মনটা মিলিয়ে গেল। তাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। সকল কথা শুনে চন্দ্রাদেবী ছেলের বায়ু-রোগ হয়েছে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কেটে গেল দুটো বছর। বালক নিজেকে খাপখাইয়ে নিয়েছে। বাবার অভাব অনেকটা ভুলে এসেছে। পাঠশালার বন্ধু গয়াবিষ্ণু, ধর্ম্মদাস লাহার ছেলে। একসঙ্গে পাঠ ও বিহার। যেন মানিক জোড়, ডাকতো 'সেঙাত' বলে। পল্লীর রমনীদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল পূর্ব্বের মত, ইদানিং একটু বেড়েছে। কাজের ফাঁকে বর্ষয়সীরা আসে চন্দ্রাদেবীর কাছে। উপলক্ষ্য গদাধরের জন্য ভালমন্দ যা কিছু রেঁধেছে নিয়ে আসা। তার কাছে এসে গান শোনা, তাকে খাওয়ানো,... একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। না এলে, না খাওয়ালে, কখনও বা নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তার মুখের গান না শুনলে, কেমন যেন, শূন্যতা অনুভব করে তারা।

ন'বছরে পা দিল গদাধর। রামকুমার ভাইয়ের উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন। সমস্ত ব্যবস্থাপূর্ণ। হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো গদাধর। ধনী তাকে খুব ভালবাসতো। তার স্নেহ, যত্ন ঠিক চন্দ্রাদেবীর মত। গদাধরও তাকে অভিন্ন ভাবতে পারতো না। একদিন ধনী তাকে ধরে বসলো, পৈতের সময়ে সে যেন তার কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে, মা বলে ডাকে। বালক গদাধর রাজী হয়ে গেল। কথা দিল, প্রথম ভিক্ষা তার কাছেই নেবে। ধনীও সেই আশায় যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ করে, সেই দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু প্রথামত তা হওয়া সম্ভব নয়। গদাধর, দাদাকে সব খুলে বললো। সে কথা দিয়েছে, নইলে সত্যভঙ্গের অপরাধে, অপরাধী হবে। মিথ্যাবাদী হ'লে যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারী হবে কেমন করে? কথাটা ধর্ম্মদাস লাহার কানে গেল। বাবার বন্ধু পিতৃস্থানীয়। রামকুমার অসহায়তা বোধ করছিলেন। তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, দেখ

রামকুমার, তোমাদের বংশে হয়তো এ কুলপ্রথা নেই কিন্তু বহুৎ ব্রাহ্মণ ঘরে এব্যবস্থা এখনও চালু আছে। তা ছাড়া ভেবে দেখ, মার গর্ভ থেকে যে মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আলোতে আসি, ধাই তো আমাদের প্রথম ধারণ করে। তাই সে 'ধাইমা', তিনিও আমাদের মাতৃস্থানীয়া। এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণে আপত্তি কোথায়?

রামকুমার আর আপত্তি করলেন না। গদাধরও যথাবিধানে উপবীত ধারণ করে ব্রাহ্মণোচিত কার্যে মননিবেশ করলো। কামার কন্যা ধনী, ধর্ম্মমাতার স্থান অধিকার করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলো।

গদাধরের উপনয়নের কিছুকাল পরে জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসরে মহতী পণ্ডিত সভা ডাকা হল। ধর্ম্মবিষয়ে বাদানুবাদ সুরু হল। কিছুতেই একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান হল না। গদাধর সমস্তই মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ সভায় উপস্থিত হয়ে একটা সুমীমাংসার সূত্র বাৎলে (বলে) দিল। স্তব্ধ হল সভা। খুশী হলেন পণ্ডিত মণ্ডলী। তাঁরা সকলে তার প্রশংসায় মুখর হলেন ও আশীর্ব্বাদ করে বিদায় গ্রহণ করলেন।....

উপনয়নের পর গদাধরের কিছুটা মানসিক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। স্বপ্নে দেখা বাবার প্রতিষ্ঠিত রঘুবীর'সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিল। তাঁর পূজা ও ধ্যানে বহুক্ষণ কাটাতে লাগলো। বাবার মত তাকেও যেন, তিনি দর্শন ও আদেশ দানে কৃতার্থ করেন। সেই চিন্তা ও ধ্যানে এখন মেতে রইলো, অবশ্য সেই সঙ্গে রামেশ্বরের শিব ও শীতলারও পূজা করতে শুরু করলো।

গদাধরের মনের আশা পূর্ণ হতে দেরী হল না। স্বল্পসময়েই ভাব সমাধি বা বিকল্প সমাধির অধিকারী হয়ে উঠলো।

আগত হল শিবরাত্রী। যথারীতি উপবাসী হয়ে মহাদেবের পূজায় নিযুক্ত। বন্ধু গয়াবিষ্ণু ও আরও কয়েকজন বন্ধুও উপবাসী। সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে শিবের যাত্রা হবে। সুতরাং রাতজাগার সুযোগ এসে গেল সকলের। প্রথম প্রহরের পূজা শেষ, তন্ময় হয়ে বসেছিল গদাধর। বন্ধুরা এসে সংবাদ দিল, তাকে শিব সেজে কয়েকটি কথা বলতে হবে। কারণ যে শিবের অভিনয় করে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপত্তি করলো গদাধর। পূজার ব্যাঘাত হবে। বন্ধুরা বোঝালো : শিবের ভূমিকা করলে শিবচিন্তা করতে হবে, সেও তো একরকমের পূজা। তাছাড়া ভেবে দেখো শিব অভাবে যদি যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়, কত লোকের আনন্দে ব্যাঘাত হবে। সকলেই উপবাসী, রাত জাগার ব্রত নিয়েছে— একটু ভেবে দেখো।

শেষ পর্যন্ত রাজী হল গদাধর। জটা, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি ভূষিত হয়ে শিবের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লো। অসরে নামলো গদাধর। কিন্তু বাহ্যসংজ্ঞা হারালো। বহুক্ষণ কেটে গেল একই ভাবে দাঁড়িয়ে গদাধর। প্রথমে সকলে তার শিব সাজে শিবের ভূমিকার তারিফ করলো। কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল, কোন সাড়া শব্দ নেই শিবের, তখন সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। চেতনা আর ফেরে না। যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল।

এখন থেকেই গদাধরের প্রায়ই সমাধি হতে লাগলো। ধ্যানে বসলে, দেবদেবীর মহিমা সূচক গান শুনলে, তন্ময় হয়ে যেতো। এই তন্ময়তা কখনও কখনও এমন ঘনীভূত রূপ নিত যে, বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে, জড়ের মত অবস্থান করতো। জ্ঞান হলে যখন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে— বলতো, এ অবস্থায় দিব্যদর্শন লাভে বিভোর হয়ে যাই।

ভয় পেলেন চন্দ্রাদেবী। স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্ত্তন চোখে না পড়ায়, কর্ম্ম চঞ্চলতার কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর না হওয়ার আশ্বস্ত বোধ করলেন, কোন ব্যাধি নয় নিশ্চয়।

আর গদাধর! অর্ন্তশীলা ফল্গুর মত তার তন্ময়ভাব আছে, তবে ইচ্ছাধীন। দেবদেবী-তত্ত্ব উপলব্ধির অনুভূতি বোধে সে স্থির ও অচঞ্চল। হরিবাসর, শিব ও মনষার গাজন, ধর্ম্মপূজা সকল উৎসবে সমভাবে গ্রামবাসী ও বন্ধুবান্ধবের সহযোগী। পাঠশালায় যায় আসে, কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগী নয়। যে সূক্ষ্মদৃষ্টির জাগরণ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে, তার প্রভাবেই, অনুমান করতে চাইলো পিতা ক্ষুদিরামকে। তাঁর বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি, সত্য, সদাচার, ধর্ম্মপরায়নতাকে। পিতার মৃত্যু চোখ খুলে দিয়েছিল তার। ক্ষণভঙ্গুর এইজীবন, কি হবে ভোগলালসার? কি হবে পাণ্ডিত্যের তকমায়? সে পথের অনুসন্ধান করা ভাল— যা সত্য-সুন্দর নির্ম্মল অক্ষয়। বৈরাগ্য-সুরের জন্ম সেখানেই।

পাঠশালে যায়। মাতৃভাষার লিখন, পাঠন, যত্নসহকারে গ্রহণ করে। রামায়ণ, মহাভারত ধর্ম্মগ্রন্থ, খুব সুন্দর করে পাঠ করে। তা শুনে লোকে মুগ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ডাক পড়ে সকলের ঘরে। এমন কি সীতানাথ পাইন, মধু যুগী সকলে তাকে নিজের বাড়ীতে ধ্রুবোপাখ্যান, কখনও বা রামায়ণ মহাভারত বা অন্য কোন উপাখ্যান পাঠ করায়, তা শুনে ভক্তি ও আনন্দে উৎফুল্লবোধ করতে থাকো সকলে।

গদাধরের সমাদর সকলের বাড়ীতে। যা শুনে, তাই অকপট স্মরণ বা বর্ণনা করতে পারে। এই সময়ে 'তারকেশ্বর মহাদেবের' প্রকট হবার কথা, 'যোগাদ্যার পালা', বণ-বিষ্ণুপুরের মদনমোহজীর উপাখ্যান' আয়ত্ব করে ফেললো, উপাখ্যান বা পুঁথির ছাপা বই পেলে নিজের হাতে লিখে নিল। এমন কি রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা নিজে হাতে লিখে নিয়েছে একে একে। গদাধরের দশবছর বয়স থেকে সমাধির উপস্থিতি। বায়ুরোগ ভেবে তার শিক্ষা ব্যাহত হল দুটো বছর। রামেশ্বরের বয়স তখন বাইশ, কাত্যায়নীর বয়স নয়। রামকুমার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রামকুমার, কামারপুকুরের কাছে গৌড়হাটী গ্রামে, রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাত্যায়নীর ও তার বোনের সঙ্গে রামেশ্বরের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। পনের দাবী থেকে উভয় পক্ষই মুক্ত হল। তাঁর (রামকুমারের) জীবনেও উপস্থিত হল বিশেষ ঘটনা। তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। আনন্দিত হল সকলে, কিন্তু তিনি হলেন শঙ্কিত। কারণ, তিনি জানতেন এর পরই অবধারিত তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু।

এতদিন বেশ দুপয়সা অর্জ্জন করছিলেন। পড়লো ভাটা। শরীরও ভাঙতে শুরু করলো— পূর্ব্বের মত শরীরের বাঁধনে দেখা দিয়েছে শিথিলতা। পত্নীর আচরণও অন্যপ্রকার। যে রঘুবীরের পূজার পূর্ব্বে সংসারে কেউ জলগ্রহণ করতো না— সেই নিয়ম মেনে চলেন না সহধর্ম্মিনী। সামান্য বিষয়ে শুরু করে বিবাদ, সৃষ্টি করে মনোমালিন্য। অনেক বোঝালেন রামকুমার। কিছুতেই বোধ মানানো গেল না। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, সেই ধর্ম্মের সংসারে অশান্তির উদয় হল।

রামেশ্বর কৃতবিদ্য কিন্তু উপার্জ্জনে সফলতা লাভ করলো না। পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি, আয় হ্রাস— সংসারে অনটন দেখা দিল। চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন রামকুমার। নানা উপায় উদ্ভাবন করলেন— কিছুই প্রতিকার হল না। চিন্তায় জীবন তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। পত্নীর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলেন।

আশঙ্কা মিথ্যা হল না। পুত্রের জন্ম দিয়ে সূতিকাগারে ইহলোক ত্যাগ করলো পত্নী। (১২৫৫ সাল)

যে পত্নীর আগমনে এ সংসারে লক্ষ্মীশ্রী পরিস্ফুট হয়েছিল, আজ তা হতশ্রী। বিদায়, আদায় কমলো, সাংসারিক অবস্থার দিনদিন অবনতি ঘটতে লাগলো। বৃদ্ধমাতা, মাতৃহীন শিশুপুত্র

অক্ষয়— তাদের একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। নানা রকমের চেষ্টাচরিত্র করলেন, সবই হল ব্যর্থ। অবশেষে বন্ধুদের পরামর্শ মত বিদেশযাত্রা করবেন স্থির করলেন। তিরিশ বছরের জীবনসঙ্গিনী, সর্ব্বত্রই বিজড়িত তার স্মৃতি, সেখান থেকে দূরে, খাপছাড়া শান্তিলাভের সম্ভাবনা আজ কোথায়?

বৃদ্ধা মা, নিয়েছেন সংসারে যাবতীয় দায়িত্ব ও মাতৃহীন শিশুর লালনপালনের ভার। রামেশ্বরের স্ত্রী, সহায়তায় পাশে দাঁড়িয়েছে তাঁর। এখন তাঁর দায়িত্ব, তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা। পাড়ি দিলেন কলকাতায়। ঝামাপুকুরে খুললেন টোল। নিযুক্ত রইলেন ছাত্রগণের অধ্যাপনায়।

আঠান্ন বছর বয়সে, চন্দ্রাদেবী সংসারের যাবতীয় ভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। এছাড়া অন্যপথও খোলাছিল না। রামেশ্বরের স্ত্রী তখনও নিতান্ত বালিকা। তবুও যা করে, তাও যথেষ্ট। রঘুবীরের সেবা', অক্ষয়কে পালন, ঘরের কাজ, রান্না সবই করতে হয় তাঁকে।

রামেশ্বর দায়িত্ব সংসারের আয়ব্যয়ের। কি উপায়ে উপার্জ্জন করা যাবে পথ ঠিক করা। কৃতবিদ্য কিন্তু অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ সাফল্যলাভ ভাগ্যে তাঁর ছিলনা। পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণ দেখলে, তাদের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁদের অভাব দেখলে, তাঁদের সাহায্য করতেন। ফলে, আয়ের চেয়ে ঋণের চাপে সংসারে স্বচ্ছলতায় বিঘ্ন দেখা দিল। স্থির বিশ্বাস রঘুবীর দিন চালিয়ে দেবেন।

গদাধরকে প্রাণের মতো ভালবাসতেন কিন্তু তার শিক্ষা সম্বন্ধে তেমন লক্ষ্য রাখার অবসর ছিলনা রামেশ্বরের। অর্থচিন্তায় নানা যায়গায় যাতায়াত করতে হতো। তাছাড়া ধর্ম্মবৃত্তির অদ্ভুত পরিণতি দেখে স্থির ধারণা হয়েছিল : সে সুপথে ছাড়া কুপথে যাবেনা। পাড়ার নারীপুরুষ তাকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে, পরমাত্মীয় ভাবে, প্রশংসা করে, তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ তাঁর নেই। গদাধরের বয়স তেরো। রামকুমার কলকাতায়। প্রায় অভিবাবক শূন্য। তার প্রকৃতিই এখন পথপ্রদর্শক। সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে পারিপার্শ্বিক চিত্র তাকে অভিজ্ঞ করে তুলেছিল : অর্থলাভের সহায়তার জন্যই, পাঠশালার বিদ্যা বা টোলের উপাধির প্রয়োজন। তাতে সাংসারিক সুখভোগই সম্ভব, তার বেশী কিছু লাভ হয় না। সুতরাং মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট ও ঈশ্বরলাভের চেষ্টাই উত্তম পথ। সেটাই জীবনের কাম্যবস্তু।.... "রঘূবীরের" দেবসেবা ও মাকে গৃহকর্মে সাহায্য করতেই তৃতীয় প্রহর হয়ে যায়। তারপর প্রতিদিন পাঠশালে একবার না একবার, যাওয়া তাঁর কর্ত্তব্য ছিল। অবশ্য পাঠের চেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করাই থাকতো উদ্দেশ্য।

বাড়ীতে বহুক্ষণ থাকায়, পল্লীর রমনীগণের গদাধরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ এসে ছিল। তারা ঘরের কাজকর্ম্ম শেষ করে সকলে আসতো চন্দ্রাদেবীর কাছে। কেউ গদাধরকে গান শোনাতে অনুরোধ করতো, কেউ বা ধর্ম্মোপাখ্যান পাঠ করতে বলতো। গদাধরও তাদের অনুরোধ পূরণের চেষ্টা করতো। এঁদের কেউ কেউ বা চন্দ্রাদেবীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো। এটাই এখন নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি। আনন্দ উপভোগ করছে সকলেই, কি শ্রোতা, কি পাঠক একটা অদ্ভুত আকর্ষণ।...

গ্রামে তিনটি যাত্রার দল, একটি বাউল দল, দু'একটি কবি দল। পুরাণপাঠ ছাড়া, কোনদিন যাত্রার পালা, কোনদিন বাউল গান, কোনদিন কবির লড়াই, কোনদিন বা সঙ্কীর্ত্তন চলে। কখনও পুরুষ কণ্ঠ, কখনও মেয়েলি সুর। খুশী মনে সবাই শুনতো, হাসাহাসি করতো। খুশী অভিনেতা, খুশী শ্রোতা। আনন্দের মধ্যে সময়টা কেটে চলে।

প্রসন্ন (ধর্ম্মদাস লাহার কন্যা) বর্ষীয়সী, গদাধরের মধ্যে বালগোপালের দিব্য প্রকাশ অনুভব করে পুত্রের অধিক স্নেহ করতেন। যারা স্বল্প বয়স্ক, তারা শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত বলে বিশ্বাস করতো। আবার যারা বৈষ্ণববংশজাত তারা অভেদ দেবদূত বলে বিশ্বাস করতো। মনে তাদের কোন সঙ্কোচ থাকতো না, সরল বিশ্বাসে অবাধে তার সঙ্গে মিশতো; মনের কথা খুলে বলতো

প্রকাশ্য দিবালোকে এমনকি তার মার সামনেই। অবশ্য চন্দ্রাদেবীকে এরা প্রত্যেকেই সরলা সাদাসিধা মানুষ বলে জানতেন— দেবমাতা ভাবে শ্রদ্ধাও করতেন। এদের কারও মধ্যে ছিলনা কপটতা, ছিলনা ছলনা। তাদের অনুরোধে কখনও কখনও নারীচরিত্রের অভিনয় করতে হতো, কখনও বা বৃন্দার অভিনয় চলতো। তারা মেয়েদের সাজে তাকে সাজিয়ে দিতো, আর বালকও তাদের অনুরোধ রাখতো, হাব-ভাব তখন তার মেয়েদের মত হয়ে যেতো। তাকে মেয়ে ছাড়া পুরুষ বলে মানতেই পারতো না কেউ। মা বা অন্য কোন পল্লীবাসিনীর বিমর্ষ মুখ দেখলে নেচে, গেয়ে কখনও বা দেখা যাত্রার পার্ট অভিনয় করে তাদের মুখভার দূর করে, মুখে তার হাসি ফুটিয়ে তুলতো। মুগ্ধতাই তো তার রঙ্গপ্রিয়তায়। এরপর তারা চলে যেতো নিজের কাজে, কেউ জল আনতে, কেউবা স্নান করতে দীঘির দিকে।

গদাধর গ্রামের প্রতিটি ঘরের ছেলে। অবাধ তার গতিবিধি। অবাধ তার মেলামেশা। প্রতি সংসারের আপনজন। বয়স বাড়ছে এ খেয়ালই ছিলনা কারও। কিন্তু চিন্তাধারাতো সবার এক নয়। অনেকে এটা পছন্দ করতো না। সীতানাথ পাইন তাদের একজন। পয়সাওলা লোক, হাঁকডাক বেশী। তার সাত ছেলে, আট মেয়ে— বিয়ে দিয়ে নিজের ঘরেই রেখেছে। আত্মীয় স্বজনের বাস পাশাপাশি। নামটা বণিক পাড়া। গদাধরদের বাড়ীর কাছাকাছি। উভয় সংসারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা চন্দ্রাদেবীর কাছে আসতো। গদাধরকে ডেকে নিয়ে এসে মেয়েদের সাজ সাজিয়ে তার অভিনয় দেখতো কিন্তু যেসব অভিভাবকদের নিষেধ ছিল, সে বাড়ীর পাঠ বা গান শোনার ভাগ্য হতো না। তাই প্রায়ই নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে যেতো। চলতো পাঠ, শ্রবণ ও অভিনয় দর্শনের আনন্দ উপভোগ। খবরটা ছড়িয়ে পড়তো বণিক পাড়ায়, যারা বঞ্চিত ছিল তারাও সেখানে উপস্থিত হয়ে সে আনন্দে যোগদান করতো। পাড়ার সকলেই ভালবাসতো গদাধরকে কেবল আপত্তি করতো দুর্গাদাস পাইন। নিজে ভালবাসতেন কিন্তু অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তন ছিল তাঁর অন্দরমহলে। কারণ কেউ তাঁর বাড়ীর ভেতরের খবর জানুক, এটা পছন্দ করতেন না। মেয়েরা বাড়বাড়ন্ত, গদাধরেরও বয়স বাড়ছে। তার অন্দর মহলে স্বচ্ছন্দ বিহার পছন্দ করেন না তিনি বড়াই করলেন।

গদাধর শুনলো দুর্গাদাসের কথা। উত্তরে সঙ্গীদের বললো,—অবরোধ বেড়ার দ্বারা মেয়েদের কি রক্ষা সম্ভব? তারা সুরক্ষিত, সৎশিক্ষা ও দেবভক্তির প্রভাবে। যদি ইচ্ছা করি অন্দরের সকলকে দেখতে পারি, সব খবরও নিতে পারি।

দুর্গাদাস তাচ্ছিল্যভরে বললেন, কেমন জানতে পারো— জানুক দেখি!

"আচ্ছা"— গদাধর চলে এলো সেদিন। পরদিন সন্ধ্যার একটু আগে মোটা আড়ময়লা শাড়ী, হাতে রূপোর চুড়ি (পৈঁছা) পরে তাঁতী মেয়ের বেশ ধরে মাথায় ঘোমটা, বাঁশের চুবড়ি কোমরে নিয়ে উপস্থিত হল দুর্গাদাসের বাড়ীর সামনে। তখন তিনি বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে বাইরের ঘরে বসেছিলেন। গদাধর নিজ পরিচয় দিয়ে বললো, সুতাবেড়ি হাট থেকে একা ফিরছি, সঙ্গীরা আগেই চলে গেছে। বিপদে পড়ে গেছি, রাতের জন্য একটু আশ্রয় যদি দেন। দুর্গাদাস মেয়েটির অল্প বয়স ও মিষ্টি কথায় মুগ্ধ। কোন গ্রামে বাস! ... কতদূর? দুটি প্রশ্ন করেই বললেন, ভেতরে গিয়ে মেয়েদের বলো।

বাড়ির মেয়েরা চিনতে পারেনি গদাধরকে। তার কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হয়ে, থাকতে দিল মেয়েটিকে। খেতে দিল মুড়ি মুড়কি। গদাধর খেতে খেতে সকল ঘর প্রতিটি মেয়েকে ভাল করে দেখে নিল। তাদের কথা শুনলো। নিজেও উত্তর দিয়ে গেল। কেটে গেল প্রায় একপ্রহর।

এপাশে চন্দ্রাদেবী অনেক রাত হয়ে গেল, ছেলে ফিরছে না দেখে রামেশ্বরকে পাঠালেন বণিক পাড়ায়।

রামেশ্বর প্রথমে সীতানাথের বাড়ীতে খোঁজ নিলেন। সেখানে আসেনি খবর পেয়ে দুর্গাদাসের বাড়ীর কাছে এসে গদাধর, গদাধর ... বলে ডাক দিতে লাগলেন। দাদার ডাক শুনেই বুঝলো গদাধর, অনেক রাত হয়ে গেছে। 'দাদা, যাচ্ছি গো''— বলেই অন্দর মহল থেকে দ্রুত তাঁর কাছে ফিরে গেল।

দুর্গাদাস সকল কথা শুনলেন বুঝলেন, তাঁকে, তাঁর পরিবারবর্গকে ঠকিয়েছে কিন্তু এত সুন্দর তাঁতিনীর বেশ ধরেছে ও চালচলন অনুকরণ করেছে যে, না হেসে থাকতে পারলেন না। বললেন, হ্যাঁ, ছোঁড়াটা সত্যই আমার দর্পচূর্ণ করেছে বটে!... এরপর থেকেই দরজা খুলে গেল দুর্গাদাসের। মেয়েরাও সীতানাথের বাড়ী গিয়ে গদাধরের পাঠ, গান, যাত্রার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো। অবশ্য এখানেও মাঝে মাঝে তার ভাবাবেশ উপস্থিত হতো। তারা গৌরাঙ্গের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে সোনার মুরলী ও অভিনয়ের উপযোগী স্ত্রীপুরুষের বেশ তৈরী করে দিল।....

সর্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রেমপূর্ণ আচরণে গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই আকৃষ্ট ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ ও যুবকগণ মিলিত হয়ে ভগবত বা পুরাণ পাঠ বা সঙ্কীর্তনে যখনই জমায়েত হতো, গদাধর সেখানেই। সে না থাকলে আনন্দ পূর্ণ হতো না। তার মত কেউ পাঠ বা ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে সমর্থ নয়। সংকীর্ত্তনে তার ভাব, আখর দেবার শক্তি আর কারও ছিল না। তার মত কণ্ঠ, রমনীয় নৃত্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সে ছাড়া উৎসব জমে না। সবাই চায় তাকে। তাই পালা করে একদিন এখানে, একদিন ওখানে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে হয় তাকে। যেমন ছিল রঙ্গ পরিহাস, তেমনই ছিল নরনারীর আচার আচরণের অনুকরণ শক্তি। গল্প, গানে, আসর জমিয়ে রাখাতে ছিল অদ্বিতীয়। অনভিজ্ঞ বালক তবুও বিজ্ঞের মত পরামর্শ দেয়। পরিণত বয়স্করা সমস্যার সম্মুখীন হলে, তার কাছে পরামর্শ চাইতে কুণ্ঠাবোধ করে না।... গদাধর ভালো অভিনয় করতে পারে। পাঠশালের বন্ধু ও বয়স্করা ঠিক করলো পাঠশালা থেকে পালিয়ে একটা যাত্রাদল গঠন করবে। রাজী হয়ে গেল গদাধর। অভিভাবকরা জানতে পারলে সমূহ বিপদ। ঠিক হল মানিকরাজার আমবাগানে সকলে মিলিত হবে। বিষয়বস্তু হবে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কোন না কোন ইতিবৃত্ত নিয়ে। পালা রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব রইল গদাধরের উপর। আসল চরিত্রের অভিনয় করবে সে নিজে, অন্যরা অন্য চরিত্রের রূপ দেবে। যেসকল পালা ইতিপূর্ব্বে অভিনীত হয়েছিল, তা সবই প্রায় তার কণ্ঠস্থ। সুতরাং আপন ভূমিকা ও গান কণ্ঠস্থ হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যে। আমবাগান, অভিনয় ও গানে মুখর হয়ে উঠলো। শ্রোতাও ছিল অনেক। নিশ্চিন্ত হল দলের পারদর্শিতায়। এখানেও গদাধরের ভাবসমাধি হল। উৎসাহ একটু থমকে দাঁড়ালো বন্ধুদের।....

ছবি আঁকা বিশেষ করে দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পারদর্শী গদাধর। সেই মূর্ত্তির পূজাও হয় বন্ধুদের সঙ্গে। একদিন কাত্যায়নীকে দেখতে গৌরহাটি উপস্থিত হল। বোনের হাসিভরা মুখ ও স্বামী সেবা দেখে তাদের ছবি এঁকে ফেলল। ছবিতে তাদের উভয়ের মুখের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হল সকলে। রঘুবীরের পূজা, মাকে সাংসারিক কাজ, অক্ষয়ের তত্ত্বাবধান, প্রতিবেশিনীদের গান শোনানো— কখনও বা আবৃত্তি, কখনও পাঠে দিন কাটে গদাধরের।

কলকাতায় রামকুমার টোলে ছাত্রদের শিক্ষা দেন আর স্থানীয় অধিবাসীদের পূজা পাঠে সারাবছর কাটান। গ্রামে একপক্ষের জন্য আসেন। গদাধরের বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতা লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। ভবিষ্যৎ বলে একটা জিনিস আছে! এরূপভাবে দিনকাটানো ঠিক হচ্ছে না ভেবে মা ও রামেশ্বরের সঙ্গে যুক্তি করে কলকাতায় নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন

তিনি। টোলের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, অন্য কাজকর্ম্মও আছে, একটা লোকেরও প্রয়োজন। স্থির করলেন : সাহায্যের লোকের অভাব পূর্ণ হবে, তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থাও নিজের তত্ত্বাবধানে রাখবেন। গদাধরকে ডেকে সবকথা বললেন রামকুমার। দাদাকে সাহায্য করতে হবে— আপত্তি করলো না গদাধর।

শুভদিন দেখে রামকুমার ফিরে এলেন কলকাতায়। সঙ্গে গদাধর।...

দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর কাছে অবস্থিত টোল। সেখানেই ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা। এছাড়া মিত্র পরিবার ও আরও কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেব সেবা। রামকুমার টোলে ছাত্র শিক্ষা ও অন্য কাজে ব্যস্ত রইলেন। গদাধরকে দিলেন নিত্য সেবার কাজ। মনের মত কাজ পেয়ে খুশি হলো। এছাড়া দাদার সেবা ও নিজের কিছু কিছু পাঠ অভ্যাস শুরু করলো। কিছুদিনের মধ্যেই যজমান পরিবারের প্রিয় হয়ে উঠলো। কামারপুকুরের মতই তার কার্য্যদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ, দেবভক্তি, নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা, ভক্তিপূর্ণ মধুর কণ্ঠে ভজন, সকলের চিত্ত জয় করলো কিন্তু যে উদ্দেশ্যে রামকুমার গদাধরকে কলকাতায় নিয়ে এলেন তা বিফল হতে চললো। পড়াশুনায় মন দেবে কখন— সকলের তুষ্টি সাধনেই তার সময় চলে যায়।..... বাবার আদরের প্রিয় সন্তান, মার কোলছাড়া হয়নি কোনদিন। সেই স্নেহসুখ বঞ্চিত করে নিজের সুবিধার জন্যই নিয়ে এসেছেন তাকে। মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক—ভাবলেন রামকুমার, যাদের স্নেহ ভালবাসায় ভাল আছে সে, তাদের আহ্বানে বা নিমন্ত্রণে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। নিজেকে সংযত করে নিলেন রামকুমার। অপেক্ষা করলেন আরও কয়েকমাস। লক্ষ্য করেন বই নিয়ে বসে কিন্তু মন তার থাকে না। কর্ত্তব্যবোধে একদিন মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, এমনি করে দিন কাটালে চলবে কেমন করে? পড়াশুনায় মন দে! বড় হচ্ছিস। সংসারের দায় কাধে নিতে হবে না?

অন্তরের কথা প্রকাশ করল গদাধর : চাল কলা বাঁধা বিদ্যা শিখবো না— যাতে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়— সে বিদ্যাই আমি শিখতে চাই।

রামকুমার চুপ করে গেলেন। ভাবলেন, জীবনে কোনদিন তিরস্কার পায়নি, এ উক্তি তার অভিমান! অনুতপ্ত হলেন। তার মনের ক্ষোভ দূর করার জন্য আদর যত্নের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন।

রামকুমারের আয় দিন দিন ক্ষয়িষ্ণুর পথে। নানা চেষ্টা করেও উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারছেন না। টোল বন্ধ করে, অন্য কিছু কাজ স্বীকার করবেন কিনা চিন্তা করতে শুরু করলেন মনে মনে। কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলোনা। দু'বছর হতে চললো আয় পড়তির পথে। এ অবস্থা আরও কিছুদিন চললে ঋণে ডুবে যাবেন।... এতদিন রঘুবীরের উপর নির্ভর করে চলেছেন, এখন কুলহারা— হতাশা আর হতাশা....

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে টোল পত্তন করেছিলেন কলকাতায় ১২৫৬ সালে। তখন আশা ছিল : শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ব্যবস্থাপত্রদান ও টোলে ছাত্রদের অধ্যাপনায় পারদর্শী করতে পারলে সুপণ্ডিত বলে খ্যাতি লাভ হবে। আয় বাড়বে, এখন সে আশা লুপ্ত হতে বসেছে প্রায়!....

ঠিক এই সময়েই এক অঘটন ঘটলো। জানবাজারে প্রথিতকীর্ত্তি রাণী রাসমণি বাস করতেন। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে চার কন্যা নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। স্বামী রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিনী তিনি। নিজ তত্ত্বাবধানে শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অল্পকালের মধ্যে কলকাতাবাসীগণের সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস, ওজস্বিতা ও দরিদ্রগণের প্রতি সহানুভূতি, অজস্র দান প্রভৃতি কারণে, সকলের প্রিয় হয়ে তাঁর "রাণী" নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণামাতাকে দর্শন ও পূজার বাসনায় কনিষ্ঠ জামাই শ্রীমথুর মোহনের সহায়তায় ১২০৫ সালে কাশী যাত্রার ব্যবস্থা করেন। যাত্রা করার অব্যবহিত

পূর্ব্বরাত্রে দেবীর দর্শন লাভ ও প্রত্যাদেশ পান "ভাগীরথী তীরে আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজা-ভোগের ব্যবস্থা করো, তোমার নিত্য পূজা গ্রহণ করবো।"

রাণী দেবীর নির্দ্দেশ মত মন্দির তৈরীর ব্যবস্থা করলেন। স্থির করলেন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রী জগদম্বার প্রতিষ্ঠা কাজ সম্পাদন করবেন। কিন্তু প্রধান বাধা নিজ জাতি ও সামাজিক প্রথা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে তিনি জগন্মাতাকে অন্নভোগ দানের অধিকারী নন। রাণীর লোক এল রামকুমারের কাছে। তিনি ব্যবস্থা দিলেন "প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দির দেবীপ্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ববস্থা করেন তাহলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হবে ও ব্রাহ্মনাদি উচ্চবর্ণ ঐ দেবালয়ের প্রসাদ গ্রহণে দোষভাগী হবেন না।"

রাণীর হৃদয়ের আশা পূর্ণ হল। নিজ গুরুর পায়ে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর পদ নিজে গ্রহণ করবেন স্থির করলেন। রাণী রামকুমারের পাণ্ডিত্য ও উদারতার পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। গুরুবংশীয়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান দিতে এতটুকুও কুণ্ঠা ছিলনা তাঁর। বুঝেছিলেন তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী নানাশাস্ত্রমত দেবসেবাও তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। ঠিক করলেন তাঁদের সম্মান অক্ষুন্ন রেখে দেবসেবার কাজ অর্পণ করবেন শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের ওপর। সেইভাবে অগ্রসর হতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলেন। অব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবীর সেবা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করতে রাজী নন। এমন কি সেই দেবী-মূর্ত্তিকে প্রণাম ও তাঁরা মর্য্যাদা দানেও তাঁরা পরান্মুখ। হতাশ হওয়ার পাত্রী ছিলেন না রাণী। বেতন ও পারিতোষিকের হার বাড়িয়ে নানা স্থানে উপযুক্ত পূজকপদে সৎ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

সিহড় গ্রামে হেমাঙ্গিনী দেবীর (রামকুমারের বোন) বাড়ী। সেখানে বহু-ব্রাহ্মণের বাস। মহেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক রাণীর কর্ম্মচারী ছিল। ভাল পারিতোষিক লাভের আশায় দেবীর পূজক, পাচক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অধিকাংশই দরিদ্র। তাদের দেবালয়ের পূজার ভার নেওয়াটা অন্যায় নয় বুঝিয়ে, নিজের দাদা ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজীর পূজক পদে মনোনীত করলেন। কিন্তু সুযোগ্য কালিকাদেবীর পূজক যোগাড় করা সম্ভব হল না।

মহেশবাবু হাল ছাড়লেন না। রামকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব থেকেই পরিচয় ছিল। গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়ও বলা চলে। জানতেন তিনি ভক্তিমান সাধক ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁর সংসারের অঘটন সববার্ত্তাই তিনি জানতেন। কলকাতায় এসে দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে পূজকের পদ গ্রহণ করেছেন। রাণী জাতিতে কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য কৃষিসম্প্রদায়ভুক্ত)। তাঁর দেবালয়ে কি পূজা করতে স্বীকৃত হবেন? সন্দেহ ছিল মনে। দেবী প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত— উপযুক্ত পূজকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। মহেশবাবু অনেক চিন্তার পর স্থির করলেন প্রতিষ্ঠার দিনে অন্তত রামকুমার যাতে পূজকের পদ গ্রহণ করে সকল কাজ সম্পন্ন করেন— তার জন্য রাণী যেন নিজেই নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন সেই ব্যবস্থা পাকা করতে হবে। তাঁর কথা না রাখতে পারেন কিন্তু রাণীর অনুরোধ নিশ্চয় প্রত্যাখ্যান করবেন না কারণ তিনিই তো "শাস্ত্র ব্যবস্থার" মত প্রকাশ করেছেন।"

রাণীর কাছে উপস্থিত হয়ে সবকথা নিবেদন করলেন মহেশবাবু। রাণী অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেলেন। রামকুমারের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পূর্ব্বেই দৃঢ় হয়েছিল। তাঁকে যদি দেবীর পূজক রূপে পাওয়া যায়—এতো মহাসৌভাগ্য! রাণী সানন্দে তাঁর দীন বার্ত্তা পাঠালেন মহেশবাবুর মারফত রামকুমারের কাছে : শ্রীশ্রী জগন্মাতার প্রতিষ্ঠা আপনার ব্যবস্থাবলেই অগ্রসর হয়েছি।

আগামী স্নানযাত্রার শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে তাঁর প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজীর পূজক পেয়েছি কিন্তু শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকরূপে যোগ্য ব্রাহ্মণের পদ গ্রহণে সম্মত হয়ে প্রতিষ্ঠার কাজে কেউ আমাকে সহায়তা করছেন না। আপনি এ বিষয়ে শীঘ্র একটা ব্যবস্থা করে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ। পূজকের পদে, যাকে তাকে নিযুক্ত করা চলেনা, একথা আপনাকে জানানো বাহুলতা মাত্র"— বিনীতা নিবেদক (রাণী) রাসমণি।

রাণীর অনুরোধ পত্র নিয়ে মহেশবাবু রামকুমারের কাছে নিজে উপস্থিত হলেন। নানারূপে বুঝিয়ে সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্য্যন্ত পূজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করালেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে যাতে শ্রীশ্রী জগদম্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ না হয় গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তিমান রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করলেন। পরে রাণী ও মথুরমোহনের অনুনয় বিনয়ে সুযোগ্য পূজকের অভাবের জন্য আজীবন ঐ কাজে ব্রতী হলেন।

১২৬২ সালে ১৮ই জৈষ্ঠ্য, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিনে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করলেন রাসমণী। দিবারাত্র 'দীয়তাং ভুজ্যতাং" অজস্র অর্থ ব্যয়ে অতিথি অভ্যাগতকে তুষ্ট করার ত্রুটি করলেন না রাণী। কন্যাকুব্জ, বারানসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি থেকে অধ্যাপক, পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় ও একটি স্বর্ণমুদ্রা সম্মানস্বরূপ দান করলেন। দেবালয়ের নির্ম্মান ও দেবী প্রতিষ্ঠায় প্রায় ন'লক্ষ টাকা ব্যয় করলেন। দেবসেবাার জন্য দুলক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে দিনাজপুর জেলায় বীরপুর গাঁ অধীন শালবাড়ী পরগণা কিনে দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখে দিলেন।

রামকুমারের সঙ্গে গদাধরও দক্ষিনেশ্বরে এলো। সারাদিন দাদাকে সাহায্যও করলো। রামকুমার দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করলেন কিন্তু গদাধর করলো না। আহারে ছিল ভয়ানক নিষ্ঠা। এক পয়সার মুড়ি মুড়কি কিনে খেতে খেতে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠিতে ফিরে এলো। পরদিন পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যেসব কাজ বাকী ছিল তা দেখার জন্য উপস্থিত হল। দাদার সেদিনেও ফিরে যাওয়া সম্ভবনা নেই দেখে পুনরায় ঝামাপুকুবে ফেরার উদ্যোগ করলেন। রামকুমার অনেক বোঝালেন, কিন্তু না খেয়েই ফিরে এলো। দাদা ফিরে আসার জন্য অপেক্ষায় রইলো গদাধর।

একসপ্তাহ অতীত হ'ল। দাদা ফিরলেন না। নানা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলো। শুনলো : রাণী সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি আজীবন দেবীর সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন। বাবার কথা স্মরণ করে দাদাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—তিনি ভুল করছেন। রামকুমার শাস্ত্র ও যুক্তিসহকারে অনেক কথাই বোঝালেন, কিন্তু কোন কথা তার অন্তর স্পর্শ করছেনা দেখে ধর্ম্মপত্র অনুষ্ঠানের কথা পাড়লেন। রাজী হ'ল গদাধর। ধর্ম্মপত্রে দেখা গেল "রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণ স্বীকার করে অন্যায় করেনি, এতে সকলের মঙ্গল হবে"।

নিশ্চিন্ত হল গদাধর। কিন্তু অন্য চিন্তা পেয়ে বসলো : চতুষ্পাঠী তো উঠ্‌লো, এখন কি করবে সে? চিন্তায় কেটে গেল দিন। ঝামাপুকুরে ফেবা হ'লনা। রামকুমার ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। বোঝালেন : দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদ ভোজনে অপরাধ নেই। গদাধরের মন সায় দিল না। রামকুমার বললেন, তাহলে পঞ্চবটীতলে গঙ্গা গর্ভে নিজে রেঁধে খাও। গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত সকল কিছুই পবিত্র, এটা তো মান! গঙ্গা ভক্তিতে সব নিষ্ঠা ধুয়ে মুছে গেল। যা যুক্তি শাস্ত্রে সম্ভব হয়নি, বিশ্বাস ও ভক্তিতে সব দূর হয়ে গেল। রাজী হয়ে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করতে লাগলো।

প্রশস্ত গঙ্গার উপকূলে উদ্যান শোভিত পঞ্চবটীর সুবিশাল দেবালয়ে সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ, দেবদ্বিজ ভক্তিপরায়না রাণী রাসমণি, জামাতা মথুর মোহনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক্রমেই কালীবাটীকে কামারপুকুরের মতই আকৃষ্ট করে তুললো। স্বহস্তে রেঁধে ভোজন করলেও মনের আনন্দে বাস শুরু করলো। গদাধরের বাল্যাবস্থা থেকে, গঙ্গার প্রতি, তার যেমন আকর্ষণ তেমনি গভীর ভক্তি। নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবনকে পবিত্র করার জন্য গঙ্গারূপে প্রবাহিতা দৃঢ় বিশ্বাস তার। উভয় কুলে যত দূর, বায়ু সঞ্চারিত, তত দূর পবিত্র সে ভূমি!...

মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে গদাধরের সৌম্যদর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠরূপে আকৃষ্ট হলেন মথুরমোহন। তখনও স্থির করতে পারেনি কি করা কর্ত্তব্য। অগ্রজের অনুরোধেই বসবাস করছিল দক্ষিণেশ্বরে। দেবীর বেশকারীর জন্য লোক খুঁজছিলেন মথুরমোহন। দৃষ্টি পড়লো গদাধরের ওপর। রামকুমার ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা বলে তাঁকে নিরুৎসাহ করলেন। কিন্তু দমবার পাত্র তিনি নন। অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হেমাঙ্গিনীদেবীর পুত্র হৃদয়রাম কয়েক মাস পরে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হল। সংবাদ পেয়েছিল মাতুলদ্বয় রাসমণির দেবালয়ে সসম্মানে বাস করছে। বয়স ষোল একটা কিছু করার উদ্দেশ্যেই আগমন। হৃদয়কে পেয়ে খুশী হল গদাধর। প্রায় সমবয়সী। ছোট বেলা থেকে চেনা। ছোট মামাকে গভীরভাবে ভালবাসে। তাকে খুশী করতে সে সব সময়ে সচেষ্ট। তবে প্রকৃতিতে উভয়ের আকাশ পাতাল তফাৎ। দেখতে সুপুরুষ। দীর্ঘাকৃতি, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ আত্মকেন্দ্রিক ও অনুকরণ প্রিয় আর গদাধর? সৌম্যদর্শন, কোমল প্রকৃতি, কর্ম্মনিষ্ঠ— যে মূর্ত্তি দর্শন করে মথুরমোহনের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল— বোধ হয়েছিল যেন বহুদিনের পরিচিত কোনজন!

তখন গদাধরের বয়স কুড়ি পেরিয়ে কয়েক মাস। উভয়ে একসঙ্গে ভ্রমণ, শয়ন ও উপবেশন আকর্ষণটা গাঢ়তর হল। কেবল খাওয়ার সময়ে শুধু দু'জন দু'জায়গায়। হৃদয় দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করে। গদাধর স্বপাকে আহার করে, হৃদয় সব যোগাড় করে দেয়, মামাকে সাহায্য করে কখনও বা মামার সঙ্গে ভাগাভাগি করে আহারে বসে। রাত্রে কিন্তু উভয়েই জগদম্বার প্রসাদী লুচি গ্রহণ করে। অন্তরে অভিমান— মা আমাকে কৈবর্ত্তের অন্ন খাওয়ালি।

প্রায় দুমাস কাটলো এরূপভাবে। গদাধরের মনে শিবপূজার ইচ্ছা জাগলো। গঙ্গা থেকে মাটী নিয়ে এসে শিবমূর্ত্তি গড়তে বসলো। একে একে তৈরী করলো বৃষ, ডমরু, ত্রিশূল, শিবমূর্ত্তি। পড়লো রং। ঐ সময় মথুরমোহণ বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত। গদাধর তন্ময় হয়ে পূজায় মগ্ন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন মূর্ত্তিটি বড় না হ'লেও খুব সুন্দর বিশেষ করে দেবভাবাঙ্কিত মূর্ত্তি। হৃদয় সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন— এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে? কে গড়েছে? উত্তরে হৃদয় জানালো, ছোটমামা। মূর্ত্তি গড়তে জানে ভাঙা মূর্ত্তি জুড়তে জানে। খুশী হলেন মথুরমোহন। বললেন, পূজা শেষ হলে মূর্ত্তিটি আমায় দিও!

পূজা শেষ হ'ল। হৃদয় মামাকে জানালো মথুরমোহনের কথা। গদাধর রাজি হয়ে গেল। হৃদয় পৌঁছে দিয়ে এলো মূর্ত্তি। মথুরমোহ মূর্ত্তিটি নিজে দেখলেন। মুগ্ধ হয়ে রাণীকে দেখাতে পাঠালেন। তিনি প্রশংসা করলেন। গদাধরের তৈরী শুনে বিষ্ময় প্রকাশ করলেন। পূর্ব্বেই তাকে দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন এখন সে ইচ্ছা বলবতী হল। রামকুমারের মুখে শুনেছেন "ও বলে ভগবান ছাড়া কারও চাকরি করবে না।" নিজের মনে নিজে চিন্তা করলেন, কথাটা নতুন। দেখা যাক মা'র কি ইচ্ছা!

দাদা রামকুমারের মুখে মথুমোহনের ইচ্ছার কথা শুনেছিল গদাধর। তাই আজকাল তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। সত্য ও ধর্ম্ম পালন, কারও যেমন অপেক্ষা করে না, কাউকে উপেক্ষাও করতে পারে না। মথুরমোহনের ভক্তি, ভক্তের মতই। আন্তরিকতাপূর্ণ। সেজন্য তাকে বা রাণীকে

অন্যচোখে দেখে। তাদের দেখলে সত্যই মনে একটা সম্ভ্রম জাগে। গুণীর গুণ, মানীর মানকে শ্রদ্ধা করা উচিত—এটাই ছিল তার সহজাত প্রকৃতি। তাই তার আত্মগোপনের চেষ্টা।

সেদিন মথুমোহন মন্দিরে মার দর্শনে এসে দূরে হৃদয়ের সঙ্গে গদাধরকে দেখতে পেলেন। গদাধর ইতিপূর্ব্বে মথুরমোহনকে লক্ষ্য করেছিল—তাই আত্মগোপনের চেষ্টায় ছিল, এমন সময় ভৃত্য এসে খবর দিল : আপনাকে ডাকছেন!

গদাধরের ইতস্ততঃ ভাব দেখে হৃদয় জিজ্ঞাসা করলো কি ব্যাপার বলতো?

উত্তরে গদাধর বললো :

গেলেই এখানে থাকতে বলবে, চাকরী করতে বলবে।

তাতো দোষ কি? এমন স্থানে মহতের আশ্রয়ে তোমার ইতস্ততঃ ভাব কেন? হৃদয়ের প্রশ্নের উত্তরে গদাধর বললো : চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ থাকার ইচ্ছা নেই। বিশেষ করে পূজা করতে স্বীকার করলে দেবীর অঙ্গে যে অলঙ্কার আছে তার জন্য দায়ী থাকতে হবে সে বড় হাঙ্গামার কথা। আমার দ্বারা সম্ভব হ'বে না। তবে তুমি যদি এ কাজের ভার নাও, আমার পূজা করতে আপত্তি নেই। হৃদয়ের সেই উদ্দেশ্যেই আগমন। গদাধরের কথায় রাজী হয়ে গেল। গদাধর নিঃশংসয় চিত্তে মথুরমোহনের কাছে উপস্থিত হল। তিনি তাকে দেবসেবার ভার নেওয়ার কথা বললেন। গদাধর তার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। রাজী হয়ে গেলেন মথুরমোহন। সেইদিনই গদাধর কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে ও হৃদয় রামকুমার ও তার সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত হল— দেবী প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে।...

১২৬২ সালের ভাদ্র মাস। জন্মাষ্টমীর পর দিন নন্দোৎসব। দুপুরে ঁরাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগ শেষ হল। পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঁরাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করিয়ে গোবিন্দজীকে শয়ন করানোর জন্য যখন চলেছেন হঠাৎ পড়ে গেলেন। বিগ্রহের পা ভেঙে গেল। রাণী বহু ব্যয়ে নানা পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করলেন। তাঁরা ভাঙা মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে নতুন মূর্ত্তি তৈরীর পরামর্শ দিলেন। সভা ভঙ্গ হলে মথুর রাণীকে ছোট ভট্টাচার্যের (গদাধরের) পরামর্শ নিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলে ভগবৎ প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লো সে। ভাব ভঙ্গ হলে গদাধর বলল, বিগ্রহ মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই। রাণীর জামাইদের যদি কেউ পা ভেঙে ফেলত, তাকে ত্যাগ করে কি একজনকে তার জায়গায় আনতো? এখানেও তাই মূর্ত্তিটিকে জুড়ে যেমন পূজা হতো তেমন পূজা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য? মূর্ত্তিটি যদি গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবে জীবন্ত বলে স্বীকার করতে হয়, সেই আবির্ভাব তো হৃদয়ের গভীরে ভক্তি, ভালোবাসার স্ব-পক্ষে। ভক্তের প্রতি কৃপা, যার করুণায় হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসার যে আবির্ভাব, ভগ্নমূর্ত্তিতেই বা তা না হতে পারবে কেন? ভগ্নদোষ তো সে অধিকারকে স্পর্শ করতে পারে না...

মথুরমোহন হৃদয়ের মুখে আগেই শুনেছিলেন গদাধর মূর্ত্তি জুড়তে জানে। অনুরোধ করলেন জোড়ার জন্য। গদাধর এমন ভাবে জুড়লো, কারও সাধ্য নেই খুঁত ধরার, কোথায় ভেঙেছে ধরে দেওয়ার? ক্ষেত্রনাথের চাকরি গেল অসাবধানতার জন্য। গদাধর নিযুক্ত হল ঁরাধাগোবিন্দজীর পূজার কাজে। হৃদয়কে বহাল করা হল বেশ ও রামকুমারের সহায়তার কাজে।....

রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে দেবীর সেবায় নিযুক্ত হওয়ার পর আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করলেন। সংসার পালনের ক্ষমতায় যতখানি নির্ভরশীল হলেন, কনিষ্ঠের নির্জ্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতায় তেমনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে দূরে গঙ্গাতীরে সকাল সন্ধ্যায় একাকী দীর্ঘ

পদাচরণ, কখনও পঞ্চবটীর মূলে স্থিরভাবে বসে থাকা, কখনও বা তার চারদিকে জঙ্গলপূর্ণ যে স্থান আছে, তার মধ্যে প্রবেশ করে বহুক্ষণ পরে নিষ্ক্রান্ত হওয়া — কেমন যেন খাপছাড়া গতিবিধি, ভাবিয়ে তুললো তাঁকে। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়ত মার কাছে ফিরে যেতে চায়! ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন, কেমন একটা যেন নির্ব্বিকার ভাব! জিজ্ঞাসা করলেন, অমন চুপচাপ থকো কেন? মার জন্য মন কেমন করছে? না হয় বাড়ী থেকে কিছুদিন ঘুরে এসো।

উত্তর দেয় গদাধর : না।....

বয়স হয়েছে। শরীর অপটু হচ্ছে। জীবনমৃত্যুর কথা বলা যায় না। ঠিক করলেন রামকুমার, তার অবর্ত্তমানে যেন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। মথুরমোহন যখন প্রথম তাঁর কাছে গদাধরের কথা তোলেন সেদিন মনে আনন্দবোধ করেছিলেন। আবার যখন তাঁর কথায় বেশকারী পরে পূজকের পদে ব্রতী হল, তখন নিশ্চিত হয়েছিলেন। চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রী কালিকামাতাও অন্য দেবদেবীর পূজা শিখিয়ে দিলেন। শাক্তদীক্ষা না নিলে দেবীপূজা প্রশস্ত নয় বলাতে গদাধর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য তৈরী হল। কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন শক্তিসাধক বৈঠকখানায় বাস করছিলেন। রামকুমারের সগে পরিচয় ছিল। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মাঝে মধ্যে আসতেন। মথুরমোহনের সঙ্গেও পরিচয় ছিল। গদাধরের ইচ্ছা অবগত হয়ে দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। দীক্ষা গ্রহণ করামাত্র গদাধরের ভাবাবেশে সমাধি উপস্থিত হল। কেনারাম তা সেই অবস্থা দেখে, তার ভক্তিবোধে মুগ্ধ হলেন। প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। এইরূপে শিক্ষাদান শেষ করে, দেবী সেবায় পারদর্শী করার জন্য নিজে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজা ও গদাধরকে দেবীর সেবাভার দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মথুরমোহন তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ করলেন। রামকুমারও নিশ্চিন্ত হলেন।

আরও কিছুকাল দেবসেবার পর একবছর পূর্ণ হল। হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করে কিছুদিনের জন্য বাড়ী ফেরার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার উত্তরে শ্যামনগর মুলাজোড়ে কার্য্যোপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য গমন করলেন, সেখানেই হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ১২৬০ সাল।

পিতার মৃত্যুর পর গদাধর জননী চন্দ্রাদেবী ও অগ্রজ রামকুমারের স্নেহে লালিত-পালিত। একত্রিশ বছর বড় ছিলেন তিনি। সহসা তাঁর মৃত্যুতে ব্যথাহত হয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়লো গদাধর। বাবার মৃত্যুতে জগৎ অনিত্য বোধ জেগেছিল, দাদার মৃত্যুতে তাকে বৈরাগ্যের পথে ঠেলে দিল। জগন্মাতার পূজায় তন্ময় হয়ে রইলো। তাঁর দর্শনলাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো তার মন। পূজা শেষ হলে মন্দিরের মধ্যে বসে তন্ময় হয়ে মাকে শুনাতে থাকে রামপাসাদ ও কমলাকান্তের গান। ক্রমে নিজেও বিহ্বল ও আত্মহারা হয়ে পড়ে। রাত্রে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হলে পঞ্চবটির কাছে যে জঙ্গল আছে তার ভেতরে ঢুকে জগন্মাতার ধ্যানে নিযুক্ত করে নিজেকে।

না আছে আহার, না আছে নিদ্রা, সারাদিন মন্দিরে ঠাকুর সেবার পরিশ্রম; যে জঙ্গলে ভুতের ভয়ে কেউ মাড়ায় না, যেখানে বুনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে একটি আমলকী গাছ, একদিন যা ছিল কবরডাঙ্গা— সেখানে রাত্রে আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান ধারণা সুরু করলো। হৃদয়ের ভাল লাগে না। শরীর ভেঙে যাবে, প্রতিবিধান করা উচিত স্থির করে নিল হৃদয়।

রাত্রে শয্যা ত্যাগ করে গদাধর পঞ্চবটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো : হৃদয়ও তাকে অনুসরণ করলো। যেই বনের ভিতরে ঢুকলো, হৃদয় পাছে মামা বিরক্ত হয় ভেবে থমকে দাঁড়ালো। ফিরে এলো নিজের ঘরে। পরের দিন জিজ্ঞাসা করলো, রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে কি করো?

সরল হৃদয় গদাধর বললো, ওখানে একটা আমলকী গাছ আছে। ওর তলায় বসে ধ্যান করলে কামনা সিদ্ধ হয়। আমি ওখানে বসে ধ্যান করি।

হৃদয় চুপ করে শুনে গেল। মনে স্থির করে নিল : ভয় দেখাতে হবে! যাতে আর কোনো দিন না যায় মামা। কয়েকদিন পর থেকে গদাধর পঞ্চবটীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলেই ঢিল পড়তে শুরু হল।

গদাধর বুঝে নিল এটা হৃদয়ের কারসাজী। মুখে কিছু বললো না। নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করে চললো। যখন ভয় দেখিয়েও কাজ হল না স্থির করলো : দেখতে হবে ওখানে মামা কি করে। পরদিন অনুসরণ করে দূর থেকে দেখলো গদাধর পরনের কাপড়, যজ্ঞসূত্র (পৈতে) খুলে ধ্যান করতে বসে গেল। দেখে শুনে হৃদয় ভাবলো : মামা কি তবে পাগল হয়ে গেল? ধ্যান করবি কর কিন্তু উলঙ্গ কেন? পাগলই তো এসব করে! সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, মামা, এ-কি করছো? পৈতে ফেলে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে!

গদাধর ধ্যানস্থ। কয়েকবার ডাকাডাকির পর তার চৈতন্য হল। কাছে হৃদয়কে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে দেখে বললো, তুই কি জানিস? এরূপ পাশ মুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। মানুষ জন্ম থেকে ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্টপাশে বদ্ধ থাকে। পৈতেটো অভিমানের চিহ্ন, আমি ব্রাহ্মণ, সকলের বড়। এটাও একটা পাশ (বন্ধন)। মাকে ডাকতে হলে সব বন্ধন খুলে ফেলে ডাকতে হয়। তাই খুলে রেখেছি। ধ্যান শেষ হলে আবার পরবো।

এসব কথা হৃদয় কোনদিন শুনেনি, তাই অবাক হয়ে ফিরে গেল। বোঝানোও হল না, তিরস্কারও করা হল না।....

ক্রমে আকুলতা এতই বাড়তে লাগলো যে, কেমন করে তাঁর (জগদম্বার) দর্শন পাবে এই চিন্তায়— যে পথ তার কাছে অনুকূল মনে হলো, সে পথেই অগ্রসর হতে লাগলো। পূজা শেষ করে রামপ্রসাদের গান মাকে শোনান পূজার অঙ্গে পরিণত হল। এগানে মুগ্ধ হয়ে, মা তাঁকে (রামপ্রসাদকে) দেখা দিয়েছিলেন। নিশ্চয় এপথে তার দেখা পাওয়া যায়! তাই গান গাইতে গাইতে ব্যাকুল হৃদয়ের আকুতি জানায়, "তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন দেখা দিবি না? ধন, জন, ভোগ, সুখ কিছুই চাই না— আমায় দেখা দে!" নয়নধারায় তার বুক ভেসে যায়। মনে কিছুটা তৃপ্তি বোধ করে, আবার গাইতে শুরু করে। এমনিভাবে পূজা, ধ্যান ও ভজনে কেটে যায় দিনের পর দিন। পূজায় বসে যথারীতি নিজের মাথায় একটি ফুল দিয়ে স্থাণুর মত ধ্যানস্থ হয়ে যায়। অন্নভোগ নিবেদন করে। মা খাচ্ছেন ভেবে বহুক্ষণ বসে থাকে। সকালে নিজে ফুল তুলে মালা গেঁথে দেবীকে সাজাতে কত যে সময় যায় তার ঠিকানা থাকে না। এমনি করে যতই দিন যায়, ততই তার অনুরাগ ও ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে। শরীরে নানা বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ পায়। আহার, নিদ্রা, ভুলে যায়। বুক লাল হয়ে ওঠে, চোখের কোণ জলে ভাসে, ক্ষণে ক্ষণে সিক্ত হতে থাকে চোখের পাতা। সদাই চিন্তা, কি করবে? কেমন করে তাঁকে পাবে। সেই ক্রন্দন : মা, এত যে ডাকছি, তার কিছুই কি শুনছিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস—আমাকে কি দেখা দিবি না?

হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। গামছা নিংড়ানোর মত। হতাশা, বেদনা, এ জীবন রেখে আর লাভ কি? দৃষ্টি পড়লো খাঁড়ার প্রতি। উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে ধরলো সেটি। দর্শন দিলেন মা জগদম্বা! সেদিন কেটে গেল, তারপর দিনও! অন্তরে একটা অনুভূত— জমাট বাঁধা আনন্দের স্রোত। মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি হল তার। জ্ঞান যখন ফিরলো কাতর কণ্ঠে মা-মা অস্ফুট সেই স্বর.... ঘর, দ্বার, মন্দির সব লুপ্ত হয়ে গেল— কোথাও কিছু নেই এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতি : সমুদ্র। যতদূর দেখা যায় স্বচ্ছ উজ্জ্বল উর্মিমালার তর্জ্জন-গর্জ্জন মহাবেগে এগিয়ে চলেছে গ্রাস করতে। দেখতে দেখতে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। হাবুডুবু খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো!

চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয় করা মূর্ত্তি.... জ্যোতিঃ সমুদ্রের দর্শনে বিরাম হল। কিন্তু অবাধ সে দর্শনের তৃষ্ণায় প্রাণটা আকুল হয়ে উঠলো। কখনও চোখে নামে অশ্রুর ধারা, কখনও শুকিয়ে যায়। কখনও "মা কৃপা কর, দেখা দে" মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, কখনও ধূলায় মুখ ঘসে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই দেখা দেন সেই বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্ত্তি। হাসছেন, কথা বলছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন— অনন্তের প্রতীক অনন্তময়ী মা....

দর্শনলাভের পর গদাধর বিভোর হয়ে রইলো। সাধারণ কাজ করার ক্ষমতা হারালো কয়েকদিন। হৃদয় অন্য এক ব্রাহ্মনের সাহায্য নিয়ে দেবী সেবা চালাতে লাগলো। বায়ুরোগ হয়েছে ভেবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। ভুকৈলাসের রাজবাড়ীতে একজন ভাল বৈদ্য ছিলেন, পূর্ব্বে তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁকেই নিযুক্ত করা হল। কিন্তু রোগের কোন উপশম হল না অবশেষে খবর পাঠানো হল কামারপুকুরে।

যেদিন ভগবদ্দর্শনের উদ্দাম ব্যাকুলতায় অস্থির বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতো না, সেদিন পূর্ব্বের মতই পূজা করতো। তবে পূজার রীতিনীতি মেনে চলা সম্ভব হল না। পরিস্ফুট হয়ে উঠলো শরণাগত ভাব। তোমার পূজা, তুমি তোমার মত করিয়ে নাও। যেন তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে একান্তে ডুবিয়ে তাঁর যন্ত্রে পরিণত হওয়া। শ্রীশ্রী জগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘন মূর্ত্তিই তার চোখে একমাত্র সার বস্তু। বাহ্যিকজগত বা লৌকিকাচারের কোন মূল্য, আজ আর তার কাছে ধরা পড়ে না।

হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। গদাধর কিন্তু নির্ব্বিকার। পূজা ধ্যান করতে বসেই দেখে মার হাত, কখনও পদকমল, কখনও সৌম্য হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ মুখ, কখনও সর্ব্বায়বসম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী মা। হাসছেন, কথা বলছেন "এটা কর, ওটা করিস না— তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন। অন্নাদি নিবেদন করলে মার নয়ন থেকে জ্যোতিঃরশ্মি নির্গত হয়ে নিবেদিত আহার্য্যকে স্পর্শ ও তার সারভাগ গ্রহন করে সংহৃত হচ্ছেন। কখনও বা নিবেদনমাত্র শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলোকিত করে আহার করছেন।

এক একদিন পূজায় বসেই তন্ময়। জগদম্বার পাদপদ্মে জবা বিল্বার্ঘ্য দানের পূর্ব্বে চীৎকার করে উঠ্লো : "রোস রোস, আগে মন্ত্র বলি, তারপর খাস্"— পূজা সম্পূর্ণ না করেই নৈবেদ্য নিবেদন করে দিল।

কখন কখন আবার দেখে, সামনের পাষাণী মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত এক জীবন্ত-জাগ্রত মূর্ত্তি। চৈতন্যে যার সমগ্র জগৎ সচেতন, তিনিই বরাভয়কর সুশোভিতা সর্ব্বদা বিরজিতা। পরীক্ষা করে দেখলো গদাধর : মা সত্যই নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। রাত্রে প্রদীপের আলোকে দিব্যাঙ্গের ছায়াপাত নেই.... পাঁইজর পরা বালিকার মত ঝমঝম শব্দ করতে করতে মন্দিরের উপর তলায় উঠছেন, তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো : সত্যই মা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলুলায়িত কেশে গঙ্গা দর্শন করছেন!....

মন্দিরে গদাধর থাকলে দেখা যেত এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ। সহসা কেউ ভেতরে গেলো, গা ছমছম্ করে উঠতো। আবার যখন বেরিয়ে আসতো তখনও সেই পরিবেশ। হৃদয় বিস্ময়বোধ করতো— ব্যাপার কি? এখানে মামা দিনরাত থাকে কি করে? আবার কখনও কখনও পূজার সময় ভেতরে এসে বিস্ময় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠতো। ভাবতে শুরু করলো, মামা কি সত্যই পাগল? রাণী বা মথুরবাবু এসব জানতে পারলে কি মনে করবেন? কোনদিন, কোন অঘটন ঘটবেনা তো!

পূজার সময় মন্দিরে প্রায় প্রবেশ করে, হৃদয় কখনও কখনও ভক্তিতে স্তব্ধ হয়ে যেত। গদাধর জবাবিল্বার্ঘ্য প্রথমে নিজের মাথায়, বুকও দেহের সর্ব্বাঙ্গে এমন কি পদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে

জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করছে। মাতালের মত বুক ও চোখ আবক্ত হয়ে উঠেছে। টলতে টলতে পূজার আসন ত্যাগ করে সিংহাসনের উপর উঠে সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরে আদর, গান ও পরিহাস করছে। কখনও কখনও কথা বলছে আবার শ্রীমূর্ত্তির হাত ধরে নৃত্য করছে।... অন্নাদি ভোগ নিবেদন করতে শুরু করে খা-মা-খা। বেশ করে খা।.... আমি খাবো? আচ্ছা খাচ্ছি— নিজে কিছু গ্রহণ করে মার মুখে দিয়ে বলছে "আমি তো খেয়েছি এবার তুই খা।

কোনদিন দেখা গেল জগদম্বাকে ভোগ দেবার সময় কালী ঘরে একটা বিড়ালকে ঢুকে ম্যাও ম্যাও করতে দেখে গদাধর বলে উঠ্ছে : খাবি মা খাবি মা! তাকে অন্নভোগ খাওয়াতে শুরু করলো। আবার কখনও দেখা গেল রাত্রে জগন্মাতাকে শয়ন দিয়ে 'মা আমাকে কাছে শুতে বলছিস, আচ্ছা শুচ্ছি'! বলেই রূপোর খাটে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো। কোনদিন বা দেখা গেল তন্ময় হয়ে পূজা করছে। ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়লো বহুক্ষণ।... সকালে বাগানে ফুল তুলছে, মালা গাঁথার জন্য। দেখা যেত কারও সঙ্গে যেন কথা বলছে, হাসছে, আদর আবদার করছে, কখনও রঙ্গ পরিহাস করছে।... রাত্রে ঘুম নেই। ভাবের ঘোরে কথা বলছে, কখনও বা পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছে।...

হৃদয় প্রত্যক্ষদর্শী। মনে নানারূপ সংশয়। কারও কাছে একথা প্রকাশও করা চলে না— পরামর্শও নেওয়া যায় না। পাঁচকানাকানি হলেই সমূহ বিপদ। মামার ক্ষতির সম্ভবনা—অথচ ঘটনা ঘটে চলেছে দিনের পব দিন। চাপা দেওয়ারও উপায় নেই!....

সত্যই পালে বাঘ পড়লো। জানাজানি হয়ে গেল। গদাধরের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করে খাজাঞ্চী ও অন্য কর্ম্মচারীদের কাছে আবেদন শুরু হল। তাঁরা নিজের চোখে ঘটনা সত্যাসত্যের যাচাই করে স্থির করলো : ভট্টাচার্য পাগল হয়ে গেছে— নইলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করবে কেন? দেবীর পূজা, ভোগ কিছুই হচ্ছেনা— বাবুদের জানানো উচিত।

সংবাদ গেল মথুমোহনের কাছে। উত্তরে তিনি জানালেন : তিনি স্বয়ং জিনষটা যাচাই করবেন। এখন যা করছে ভট্টাচার্য্য করতে দাও।

জল্পনা কল্পনা শুরু হল। এবার ভট্টাচার্য্যের চাকরী গেল। দেবতার কাছে অপরাধ, কতদিন সইবে বল!...

কাউকে না জানিয়ে পূজার সময় কালীঘরে মথুরমোহন উপস্থিত হলেন। অনেকক্ষণ ধরে গদাধরের কার্য্যকলাপ দেখলেন। ভাবে তন্ময় গদাধর। মাকে নিয়ে ব্যস্ত, মন্দিরে কে আসছে না আস্‌ছে সে খবরে প্রয়োজন কি?

মথুরমোহন উপস্থিত হয়ে সবকিছু লক্ষ্য করলেন। তার বালকের মত আবদার, অনুরোধ দেখে বুঝলেন এটা তার ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তি! অকপট ডাকে মাকে যদি না পাওয়া যায়, কিসে তাঁর দর্শন লাভ হবে? পূজায় রত পূজকের গলদশ্রুধারা, উদ্দাম উল্লাস কখনও সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাহ্য বিষয়ে লক্ষ্যরাহিত্য দেখে তাঁর চিত্ত অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। দেবপ্রকাশে শ্রীমন্দির জমজম করছে। বিশ্বাস করলেন, ভট্টাচার্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও পূজককে বার বার প্রণাম করতে করতে বললেন— "দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হল। জগন্মাতা সত্যই আবির্ভূত হয়েছেন— মার পূজা ঠিকভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে।

কাউকে কিছু না বলে মথুরমোহন বাড়ী ফিরে গেলেন। পরের দিন জানালেন : ভট্টাচার্য্যমশায় যেভাবেই পূজা করুক না কেন, তাকে যেন কোন বাধা না দেওয়া হয়।

গদাধর নিজে কি করছে, না করছে, সঠিক কি অন্যায়, সেবোধ শক্তি অন্তর্হিত হয়েছে। একটা অজ্ঞাত শক্তি, যেন তাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আর ব্যাকুল হৃদয়ে নিবেদন

করছে পূজকঃ মা আমার এরূপ অবস্থা কেন হচ্ছে? আমার বোধশক্তি নেই, যা করার করিয়ে, শিখিয়ে নিয়ে, দেখা দে! সকল সময় আমার হাত ধরে থাক।

মথুরমোহন জানবাজারে ফিরে রাণী-মাকে সব কথা শুনালেন। ভক্তিমতী রাণী সব শুনে পুলকিতা হলেন। দক্ষিণেশ্বরে গোবিন্দ-বিগ্রহ ভগ্নকালে তিনি তাঁর ভাবাবেশ ও ভক্তিপুত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, আজ জগদম্বার কৃপালাভ তার পক্ষেই যে সম্ভব, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। তারপরে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটালো। কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে এলেন রাসমনী। গদাধরকে গান শোনাতে বললেন। গদাধর জানতো কোন গানটি তাঁর বিশেষ প্রিয়। গদাধর গাইছে, রাণী শুনছেন। কিন্তু তিনি একটা মামলার ফলাফল চিন্তা করছিলেন। গদাধর তাঁর মনের কথা জানতে পেরে 'এখানেও ঐ চিন্তা' তাঁর কোমল অঙ্গে আঘাত করে বসলো। রাণী ছিলেন জগদম্বার কৃপাপাত্রী সাধিকা। সচকিত হয়ে নিজের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণে অনুতপ্তা হলেন। তাঁর ভক্তির বাঁধন আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠলো।.....

শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যানে, গদাধরের ভাববেশ ও আনন্দোচ্ছাস এত গভীরভাবে দেখা গেল যে, তারপক্ষে দেবীসেবার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে দেখা দিল ভক্তিপ্রসুত শারীরিক বিকার। শুরু হল গাত্রদাহ। ভাবতে শুরু করলো, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ভিতরের পাপ পুরুষ দগ্ধ হচ্ছে। ক্রমে সে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলো। চিন্তা জাগলো, হয়তো কোন নোতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যায় পঞ্চবটীতে বসে আছে সহসা দেখলো মিস কালো রঙ, আরক্ত লোচন ভীষণাকার এক পুরুষ টলতে টলতে তার নিজের শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সামনে বেড়াতে লাগলো। পরমুহূর্ত্তে আর একজন সৌমমূর্ত্তি পুরুষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করে শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব্বের সেই সবল পুরুষকে আক্রমণ করে নিধন করে ফেললো। এইদিন থেকেই গায়ের জ্বালা দূর হয়ে গেল। কিন্তু সব সময়ে ভাবাবেশে বিভোর। তার যেরূপ ইচ্ছা সেইভাবেই পূজা। দেহের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপ প্রায়। পূজা না করে ভোগ নিবেদন। কখনও বা দেখা গেল দেবীপূজার ফুলে ও চন্দনে— নিজেকে ভূষিত করেছে। তন্ময়তার ক্ষণিক বিরতিতে মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা। আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে ক্রন্দনসহ মুখঘর্ষণ, ক্ষতবিক্ষত শরীর, রক্ত ঝরে পড়ছে। জলে পড়লো বা আগুনে পুড়লো কোন খেয়াল নেই। পরমুহূর্ত্তে মার দর্শন পাওয়া মাত্র আনন্দে দিশেহারা। মুখ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, উল্লাস, উন্মাদ প্রায়। ভক্ত মথুরমোহন এ অবস্থা লক্ষ্য করে তার বায়ুপ্রকোপের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবাদী সাধক হলধর। তাকেই দেবীসেবায় নিযুক্ত করলেন।

গদাধরের পরিবর্ত্তে হলধরকে নিযুক্ত করে মথুরমোহন তার সেবার সমস্ত ব্যবস্থা ও যথারীতি চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিছুদিন যাওয়ার পর ভাবমুখে অবস্থান করতে শুরু করলো গদাধর। এবার নিজ কুলদেবতা রঘুবীরের চিন্তায় আকৃষ্ট হলো। হনুমানের মত ভক্তিপরায়ণ হয়ে দাস্য ভক্তিতে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সবসময়ে মহাবীরের চিন্তায় তন্ময় হয়ে আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব ভুলে গেল। আহার বিহার চলাফেরা সমস্তই হনুমানের মত হয়ে গেলো। ফল খাওয়া, লাফিয়ে চলা নকল নয় সত্য সত্যই সেই প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হল। কোঁচ্ছাটি লেজের মত করে পরলেও সত্যই মেরুদণ্ডের অংশ বেড়ে গেল। গাছের উপর বসে রঘুবীর, রঘুবীর করে চীৎকার করা শুরু করলো বেশ কিছুদিন।

একদিন পঞ্চবটী তলে বসে ধ্যান করতে করতে দেখলো অপরূপ সুন্দরী নারীমূর্ত্তি যেন প্রেম -দুঃখ-করুণা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মোহিত করে ধীর ও মন্থর গতিতে উত্তর থেকে

দক্ষিণে তার নিজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির আলোকে চারদিক আলোকিত। কেবল মূর্ত্তিটিকেই দেখা যাচ্ছে। কে ইনি? চিন্তা শুরু হওয়া মাত্রই উ-উপ শব্দ করে একটি হনুমান সহসা উপস্থিত হয়ে তাঁর (দেবী মূর্ত্তির) পায়ে লুটিয়ে পড়লো। মন ভিতর থেকে বলে উঠলো সীতা, জনমদুঃখিনী সীতা, জনকনন্দিনী সীতা, রামময় জীবিতা সীতা! মা মা শব্দে অধীর হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে চলেছে যখন চকিতে সেই দেবী মূর্ত্তি তার দেহের ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

স্মৃত্যনুসারী সাধকভক্তেরা তন্ত্রের আশ্রয়ে সাধন ভজন করে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিরা পরকীয়া প্রেমে সাধনরূপ পথে অগ্রসর হয়। হলধারী ঁরাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত হওয়ার পর বৈষ্ণব মতে সাধন ভজন শুরু করলেন গোপনে। কথাটা গদাধরের কানে এলো। নানা লোকে নানা কথা নানা আলোচনা চলছে বোঝাতে চেষ্টা করলো। হলধারী ছিলেন বাকসিদ্ধ। রুষ্ট হয়ে বললেন: ছোট হয়ে অবজ্ঞা? মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে!

কিছুদিন পরে একদিন রাত্রি আট-ন'টার সময় মুখ দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হল গদাধরের। রক্ত বন্ধের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। সংবাদ এলো হলধারীর কাছে। তখন মন্দিরে। শশব্যস্তে ছুটে গেল হলধারী। গদাধর বললো : অকারণে তুমি শাপ দিলে দাদা, কি অবস্থা এখন দেখ! কাঁদতে লাগলেন হলধারী।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন এক প্রাজ্ঞ প্রাচীন সাধু। গোলমাল শুনে তিনিও দেখতে এলেন গদাধরকে। রক্তের রং ও মুখের ভেতর পরীক্ষা করে বললেন : তুমি যোগ সাধনা করতে! রক্ত বেরিয়ে ভালই হয়েছে হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়। তোমারও তাই হচ্ছিল। সুষুম্না দ্বার খুলে মাথায় রক্ত উঠেছিল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ভালই হল! জড়সমাধি হলে সমাধি ভাঙতো না। 'তোমার শরীর দিয়ে জগন্মাতার কোন বিশেষ কাজ আছে' তাই তিনি রক্ষা করেছেন।...

হলধারী পরের মাসে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। গদাধরের সাধন বিষয়ে সমস্তই অবগত ছিলেন : বিশেষ করে পঞ্চবটী বনে তপস্যা বিষয়ে। অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক। ব্রাহ্মণকুলজাত বলে ব্রহ্মণত্বকে সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দিতেন। গদাধরের কাণ্ডকারখানাকে ঠিক বিশ্বাস করতেন না, শ্রদ্ধাও করতেন না বরং কতকটা উপেক্ষার চোখে দেখতেন। হৃদয়কে বলতেন : তোমার কথা শোনে, ওকে বোঝাও। আবার কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি এত সেবা কর ওর ভেতর আশ্চর্য্য কিছু কি দর্শন করেছ?

গদাধরের পূজা দেখে কখনও মোহিত হয়েছেন। 'বলতেন' এবার তোকে চিনেছি।

গদাধর উত্তরে সহাস্যে বললো : দেখ, আবার গোলমাল হয়ে যাবে না তো?

না— না— এবার আর ফাঁকি নায় চিনেছি, তোর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে, এখন ঠিক বুঝেছি। বলেই একটিপ নস্যি নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বা আধ্যাত্মরামায়ণাদি শাস্ত্রবিচার সুরু করলেন। অভিমানে ফুলে উঠলেন : শাস্ত্র তুই বুঝবি! গণ্ডমূর্খ, এসব বুঝবি কি?

গদাধর বললো : সত্যি বলচি! এর (দেহের) ভিতরে যে আছে, সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। সব বুঝতে পারি।

অবজ্ঞায় ক্রোধে ফেটে পড়ে ধমক দিয়ে ওঠেন হলধারী : মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া অবতার কোন শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ, তামসী মূর্ত্তির সাধনা করে কি কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে? তমোময়ীর উপাসনা করিস্ কেন?

ইষ্টনিন্দা শুনে ছুটলো গদাধর। মায়ের মন্দিরে গিয়ে সজল নয়নে জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করলো : হলধারী শাস্ত্র পণ্ডিত! মা তোকে বলে তমোগুণময়ী! তুইকি সত্যিই ঐরূপ?

জগন্মাতার মুখে যথার্থ তত্ত্ব জেনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফিরে এলো হলধারীর কাছে। কাঁধে চেপে বসে উত্তেজিত স্বরে বললো, তুই মাকে বলিস তামসী? মা যে সব ত্রিগুণাময়ী আবার

শুদ্ধসত্ত্বময়ী। গদাধরের ভাবাবিষ্ট আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে ফুলচন্দন দিয়ে ভক্তি করে অঞ্জলি প্রদান করলেন হলধারী।

ঠিক এই সময়ে হৃদয় সামনে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলো, মামা, তুমি যে বলতে ওকে ভূতে পেয়েছে— পূজা করলে যে!

কি জানি বাপু! কালীঘর থেকে ফিরে আমাকে কিরকম করে দিলে! ওর ভেতর ঈশ্বরের প্রকাশ দেখলাম। মন্দিরে যখনই যাই, আমাকে কেমন করে দেয়! এ এক চমৎকার ব্যাপার, কিছু বুঝতে পারি না!.... শাস্ত্র বিচারে বসলেই স্বরূপ প্রকাশ পায় হলধারীর। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হলে বাহ্যশৌচ, সদাচার শাস্ত্রজ্ঞান কাজে লাগে না। ঠাকুর বাড়ীতে সমাগত কাঙালীদের নারায়ণজ্ঞানে, তাদের ভোজনাবশেষ গদাধরকে গ্রহণ করতে দেখে হলধারী বিরক্তি প্রকাশে বললেন : তোর ছেলে মেয়ের বিয়ে কেমন করে হয় আমি দেখবো! উত্তেজিত গদাধর বলে উঠলো : তবে রে শালা! শাস্ত্রব্যাখ্যার সময় বলিস জগৎ মিথ্যা, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়। তুই বুঝি ভাবিস আমিও তোর মত জগৎমিথ্যা বলবো অথচ ছেলেমেয়ের বাপ হবো। ধিক তোর শাস্ত্রজ্ঞান!

হলধারীও ছাড়বার পাত্র নন। একদিন বললেন, ঈশ্বর ভাবের অতীত। তুই ভাব সহায়ে যা দেখিস, শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে ওসব অনুভূতি মিথ্যা।

সন্দেহ হল গদাধরের। ছুটলো মার মন্দিরে। মাকে বললেন, এতদিন ভাবাবেশে যা দর্শন করেছি, যা আদেশ পেয়েছি সে সব ভুল। তবে কি আমায় ফাঁকি দিয়েছিস! কাঁদতে লাগলো গদাধর। শুধালো মা, নিরক্ষর মুখখু বলে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়?— সে কান্না আর থামে না গদাধরের। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল মেঝে থেকে কুয়াশার মত ধোঁয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। তার ভেতর আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য একটি মুখ। স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো— ওরে, ভাবমুখে থাক, ভাবমুখে থাক।... তিনবার বলেই কুয়াশা মিলিয়ে গেল। শান্ত হল গদাধর!

আরও একবার হলধারীর কথায় সন্দেহ জেগেছিল গদাধরের মনে। রতির মায়ের বেশে আবির্ভূতা হলেন জগদম্বা। বললেন 'তুই ভাবমুখে থাক।'....

ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্ব্বক সাধক যখন নিজ মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করতে সমর্থ হয়, তখনই মন তার গুরু পদবাচ্য হয়ে ওঠে। সেদিন, মনে যেসব ভাবতরঙ্গ ওঠে, তা বিপথগামী করার পরিবর্ত্তে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছে দেয়। মনের আসক্তিও দূরীভূত হয়। সেদিন টাকা মাটি, মাটি টাকায় রূপান্তরিত হয়। গদাধর এই মন থেকে কাঞ্চন আসক্তি দূর করার জন্য টাকা ও মাটি একত্র করে গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করে কামনার সমাধি ও সাধন পথের দ্বার উন্মুক্ত করে সমুখ পথে এগিয়ে চললো।

১২৬৫ সাল। কার্ত্তিক মাস। গদাধর কামারপুকুরে ফিরে এলো। মা চন্দ্রাদেবী ও ভ্রাতা রামেশ্বর তার বায়ুরোগের খবরে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের অনুরোধে গদাধরের আগমন। তাঁরা ওষুধ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুক, নানারকম ব্যবস্থা করলেন।

গদাধরের তখন ভাবমুখে অবস্থান। সুতরাং অনেকটা প্রকৃতস্থ। মাঝে মাঝে মা-মা করে ক্রন্দন কখনও বা বাহ্যজ্ঞান শূন্য। চালচলন, ব্যবহার কখন সাধারণ, কখন বা বিপরীত। যেমন সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, দেব ও মাতৃভক্তি, তেমনি বাহ্য প্রেমে উচ্ছল প্রকাশ। সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা, আবার অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানলাভের গভীর আকুলতা।...

ওঝা মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুকালো ফল হল না। বাস্তুপূজা ও বলি দেওয়া হল, আদেশ পাওয়া গেল ব্যাধি হয় নাই, ভুতে পায় নাই..... সাধু হতে দাও, সুপারী খাওয়া বন্ধ কর, ওতে কাম বাড়ে।" বয়স তখন তেইশ পূর্ণ! অনেকটা প্রকৃতস্থ। তবে ঠাকুর দেবতা নিয়ে থাকা, শ্মশানে বিচরণ করা, পরিধেয় বসন ত্যাগ করে ধ্যান বা পূজার অনুষ্ঠান নিয়ে দিন কাটতে লাগলো। ছোটবেলাতেও এরূপ অভ্যাস তার ছিল সুতরাং তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। তবে এবারের রোগ আবার উদয় হতে পারে এ আশঙ্কায় স্থির করলেন বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। মেয়ে দেখা শুরু হল। কিন্তু মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। পেলেও পণের টাকা অনেক তা সাধ্যাতীত। চিন্তামগ্ন হলেন চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর। ভাবাবিষ্ট গদাধর একদিন তাঁদের বললেন, সন্ধান বৃথা। জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পাত্রী কুটাবাঁধা আছে।"

বিশ্বাস না হলেও লোক পাঠানো হল। সংবাদ এলো পাত্রীর বয়স পাঁচ, নিতান্ত বালিকা। চন্দ্রাদেবী রাজী হয়ে গেলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গেল। বিবাহের জন্য তিনশো টাকা পণ স্থির হল। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষে রামচন্দ্র মুখুজ্যের পাঁচ বছরের কন্যার সঙ্গে বিয়ে হল। রামেশ্বর জয়রামবাটী থেকে ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন। চন্দ্রাদেবী খুশী হলেন। এবার গদাধর নিশ্চয় ঘর সংসারে মন দিবে। লাহাবাড়ী যথেষ্ট সাহায্য করলো। বৈবাহিকের (বেয়াই) মন রাখা, বাইরের সম্ভ্রম রাখা সম্পূর্ণ হল। আনন্দের মধ্যে সাতদিন কাটলো। এবার ফিরিয়ে দিতে হবে অপরের (লাহাদের) গয়না। চন্দ্রাদেবী ব্যথিত হয়ে পড়লেন। কেমন করে বালিকা বধুর অঙ্গ থেকে গয়নাগুলো খুলে নেবেন? গদাধর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় সমস্ত গয়না খুলে নিয়ে প্রত্যাপর্ণের ব্যবস্থা করলো। শিশু সারদা গয়না কোথায় গেল শুধাতে চন্দ্রাদেবী ভোলালেন, গদাধর তোমায় অনেক গয়না দেবে মা!

সারদার কাকা এলেন কয়েকদিন পর সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে ক্ষুন্ন মনে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। চন্দ্রাদেবী ব্যথা পেলেন, গদাধর পরিহাসচ্ছলে বললো, যাই বলুক, যাই করুক, বিয়ে তো আর ফিরবে না।

প্রায় একবছর সাতমাস কামারপুকুরে কাটালো গদাধর। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে দক্ষিণেশ্বর ফিরলে যদি আবার বায়ুরোগ দেখা দেয়— এই আশঙ্কায় বাধা দিলেন মা চন্দ্রাদেবী। কেটে এলো ১২৬৭ সাল। অগ্রহায়ন মাসে কুলপ্রথা অনুযায়ী জয়রামবাটীতে (শ্বশুরবাড়ীতে) গমন করে জোড়ে ফিরে এলো গদাধর। বালিকাবধুর (সারদার) বয়স তখন সাত। মা ও দাদা আরও কিছুদিন থাকার কথা বললেও সংসারের অভাব অনটনের কথা ভেবে ফিরে এলো দক্ষিণেশ্বরে।

শ্রীজগদম্বার সেবায় মন দিল গদাধর। তন্ময়তা পূর্ব্বের মতই পেয়ে বসলো। ভুলে গেল সংসার, মা, ভাই, স্ত্রীর কথা। সব তলিয়ে গেল। মা শুধু মা! দিনরাত সেই স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যান। বুক রক্তিম (রাঙা) হয়ে উঠলো। সংসার, সাংসারিক বিষয়, প্রসঙ্গ বিষবোধ হতে লাগলো। শুরু হল সেই গাত্রদাহ, সেই আত্মহারা ভাব।

সেই বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা, গাত্রদাহ, চিকিৎসা শুরু হল। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ নানা ব্যবস্থা দিলেন। ওষুধ, তেল সব বৃথা। হৃদয় দমবার পাত্র নয়। সঙ্গে করে নিয়ে গেল কবিরাজের বাড়ী। সেখানে অন্য একজন কবিরাজ ছিলেন (পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী)। তিনি সব কথা শুনে বললেন, এটা যোগজ ব্যধি। ওষুধে সারবেনা।

তাঁর কথা শোনার ধৈর্য্য কারও ছিলনা—চিকিৎসা যেরূপ চলছিল সেইরূপই চলতে লাগলো। চন্দ্রাদেবীর কানে গেল সব কথা। পুত্রের কল্যাণ কামনায় কামারপুকুরের বুড়ো শিবতলার মন্দিরে প্রয়োপবেশন করলেন। জাগ্রত শিব। তিনি প্রত্যাদেশ দিলেন মুকুন্দপুরের

শিবতলায় 'হত্যা' দিলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে। চন্দ্রাদেবী নির্দেশ মত 'হত্যা' দিলেন সেখানে। দু'তিনদিন পরে স্বপ্নে দেখলেন জটাজুট বাঘম্বর রজতদলিত মহাদেব তাঁকে বলছেন, ভয় নেই, ছেলে তোমার পাগল হয়নি, ঐশ্বরিক আবেশে তার ঐরূপ অবস্থা দেখা দিয়েছে। আশ্বস্ত হয়ে পূজা দিয়ে বাড়ী ফিরে কুলদেবতা 'রঘুবীর ও শীতলাদেবীর' সেবায় মন দিলেন....

গদাধরের তন্ময়তা সেইরূপই গভীর। তাঁর ঘরের উত্তরপূর্ব্ব কোণের লম্বা বারান্দায় পায়চারি করছেন। বাবুদের কুঠীতে মথুরমোহন বসে আছেন। হঠাৎ নজর পড়লো। দেখলেন যখনই সামনের দিকে আসছে মন্দিরের দেবীমূর্ত্তি, আবর পিছন ফিরলেই দেখছেন সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রথম মনে হল চোখের ভ্রম, চোখ ভাল করে মুছে দেখলেন, যা দেখছেন তা সত্য, স্পষ্ট দেবমূর্ত্তি। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ছুটে এসে প্রণাম করে পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। নিবেদন করলেন, যা দেখেছি তা মিথ্যা নয়। তুমি মন্দিরে মা ও মহাদেবের প্রতীক সাক্ষাৎ ঠাকুর।

পরিচয়ের প্রথম দিনে মনের কোণে যে পরিচিতির ছাপ আঁকা হয়ে গিয়েছিল, যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ঠাই পেয়েছিল মনের কোণে, যে দুর্ব্বলতা নিহিত ছিল অন্তরের গহনে— আজ তা মূর্ত্ত হয়ে উঠলো, দেবী পুজারী গদাধর নয় তাঁর অন্তরের ঠাকুর উপাস্য দেবতা।....

১২৬৭ সালের শেষে ইংরাজ ১৮৬১ সাল। রাণী রাসমণি হঠাৎ পড়ে গেলেন পরে দেখা দিল জ্বর, সুরু হল অজীর্ণতা— পরিণত হল গ্রহণীরোগে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরেজী ১৮৫৫, দেবীর সেবার জন্য দিনাজপুর জেলায় তিনলাট জমিদারী কিনেছিলেন ১৪ই ভাদ্র ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট ১৮৫৫। তার দানপত্র করতে চাইলেন, কিন্তু শেষ সময়ে, বড় মেয়ে পদ্মমণি সই করতে চাইলো না, ছোট মেয়ে জগদম্বা সই করলো। তাঁর মনের শান্তি ভঙ্গ হল। শেষ পর্যন্ত দেবীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে দানপত্র সমাধা করলেন ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ সাল। শরীর ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল কালীঘাটের আদি গঙ্গার তীরস্থবাটীতে। সামনে জ্বালা অনেক আলো। বলে উঠলেন তিনি : সরিয়ে দে, সরিয়ে দে ওসব রোসনায় আর ভাল লাগছে না এখন আমার মা, আমার মা (জগদম্বা) আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারদিক আলোয় আলোময়!.... কিছু পরে বললেন, মা এলে! পদ্ম যে সই দিলে না মা কি হবে? চারদিক থেকে শেয়ালদল চীৎকার করে উঠলো এটাই যেন তাঁর প্রশ্নের শেষ উত্তর। মহাসমাধীতে শয়ান করলেন রাণী। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, ১৯শে ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৬১।....

মথুরমোহন হাল ধরলেন। দেবসেবার ত্রুটি হল না। ভক্তি, বিশ্বাস তাঁর উথলে উঠ্লো। স্বয়ং দেবতা তাঁর পাশে— ভাবনার প্রয়োজন কি?

গঙ্গাতীর কালীবাটীর পশ্চিমদিকে ফুলের বাগান ছিল। ফুল তুলছিলেন ঠাকুর (গদাধর)। নিজে পূজা না করলেও ফুল তুলে, মালা গেঁথে মনের মতন করে মাকে সাজাতেন। পাশ দিয়ে গঙ্গার বুকে নেমে গেছে সিঁড়ি। ব্যবহারের জন্য বাঁধানো সিঁড়ি মেয়েদের স্নানের ঘাট ও নহবৎখানা। বাঁধের ওপর বড় বকুল গাছ। তাই বকুলতলার ঘাট নামে পরিচিতি।

ঠিক এমন সময়ে ঘাটে একটি নৌকা এসে লাগলো। গৌরিক বস্ত্র পরিহিতা আলুলায়িত দীর্ঘকেশা ভৈরবী বেশধারিনী এক সুন্দরী প্রৌঢ়া রমনী অবতরণ করে চাঁদনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। যৌবনের সৌন্দর্যাভাস তখন ত্যাগ করেনি। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। নিকট আত্মীয়কে দেখলে যেমন একটা আকর্ষণ বোধ করা যায়, তেমনি বোধ করলেন ঠাকুর। ঘরে ফিরে এসে হৃদয়কে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনার জন্যে।

বিস্মিত হৃদয় প্রশ্ন করে বসলো, ডাকলে আসবে কেন?

উত্তরে বললেন গদাধর, আমার নাম করলেই আসবে।

অপরিচিতা রমনীর সঙ্গে আলাপ করার অতিশয্য দেখে অবাক হল হৃদয়। এরূপ ভাবতো মামার কোদিন দেখেনি। চাঁদনীতে ফিরে গিয়ে দেখলো ভৈরবী সেখানেই বসে আছেন। তাঁকে সম্বোধন করে বললো, আমার মামা ঈশ্বরভক্ত, আপনার দর্শনপ্রার্থী।

একথা শুনে ভৈরবী কোনরূপ প্রশ্ন না করে উঠে দাঁড়াতে দেখে আরও বিষ্ময় বোধ করলো হৃদয়।

ঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরকে দেখে ভৈরবী আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সজল নয়নে বলে উঠলেন, বাবা তুমি এখানে রয়েছ! গঙ্গাতীরে আছ জেনে তোমায় খুঁজে বেরিয়েছিলাম, এতদিনে দেখা পেলাম!

জিজ্ঞাসা করলেন গদাধর, আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা?

তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে 'জগদম্বার কৃপায় জানতে পেরেছিলাম। আগে দুজনকে পূর্ব্ববঙ্গে পেয়েছি, আজ তোমার দেখা পেলাম' উত্তর দিলেন ভৈরবী।

আপনজন পেয়ে গেলেন গদাধর। ভৈরবীর কাছে বসে মনের কথা জানালেন, আচ্ছা অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা, শারীরিক বিকার এসব আমার কেন হয়? সত্যইকি পাগল হয়ে গেছি? জগদম্বাকে প্রাণের সঙ্গে ডেকে কি আমার এসব কঠিন ব্যাধি হয়েছে?

ভৈরবী জননীর মত সব শুনতে শুনতে কখনও উত্তেজিত হলেন, কখনও উল্লাসিত হলেন। আবার করুণার্দ্র হয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, কে তোমায় পাগল বলে বাবা? এসব তোমার পাগলামী নয়, তোমার মহাভাব হয়েছে, এঅবস্থায় এরূপ হয়। তোমারও হয়েছে, অপরের হয়। চিনবার সে শক্তি আছে কি সকলের? শ্রীমতী রাধার এ অবস্থা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হয়েছিল! এ সব ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার কাছে যে সব পুঁথি আছে, পড়ে বুঝিয়ে দেবো, যাঁরা একমনে ঈশ্বরকে ডাকেন তাঁদের সকলের অবস্থা এরূপ হয়েছে, হয়ও।

উভয়ের আলাপে বিস্ময়ের অবধি ছিল না। যেন কতদিনের পরিচয়।

অনেক বেলা হয়েছে দেখে গদাধর দেবীর প্রসাদী ফলমুল, মাখন, মিছরী, সব আনিয়ে জলযোগ করতে দিলেন। ব্রাহ্মণী (ভৈরবী) মাতৃভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন। পুত্ররূপে তাঁকে আগে না খাইয়ে জলগ্রহণ করবেন না বুঝে গদাধর নিজেও ঐসকল খাদ্যের কিছু অংশ গ্রহণ করলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ করে নিজে কণ্ঠাগত রঘুনাথ শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাড়ীর ভাণ্ডার থেকে আটা, চাল ভিক্ষা রূপে গ্রহণ করে পঞ্চবটী তলায় রান্নার ব্যবস্থায় নিযুক্ত হলেন।

রান্না শেষ হল। 'রঘুবীরের সামনে খাদ্য দিবেন স্থির করে ইষ্টদেবের চিন্তা করতে করতে গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। অভূতপূর্ব্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হলেন তিনি। তাঁর দুনয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু বইতে লাগলো। গদাধরেরও ঐ সময়ে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা সহসা উপস্থিত হলো। দৈবশক্তি বলে প্রণবাবিষ্ট হয়ে দেখলেন ব্রাহ্মণী নিবেদিত খাদ্যসকল ভোজন করছেন তাঁর গোপাল।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালেন। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ভাবাবিষ্ট গোপালের ঐপ্রকার কার্য্যকলাপ নিজের দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে আনন্দে অধীর হলেন। তার কিছুপরে তাঁর গোপালও জ্ঞানভূমিতে নেমে এলেন। নিজের কাজের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর গোপাল বললেন, কে জানে বাপু আত্মহারা হয়ে কেন এরূপ কাজ করে বসি!"

ব্রাহ্মণী মার মত সস্নেহে বললেন, বেশ করেছ বাবা! একাজ তুমি করনি, তোমার ভেতর যিনি আছেন তিনি করেছেন। ধ্যানে যা দেখেছি, তাতে বুঝতে পেরেছি কে এরূপ করেছে, কেনই

বা করাচ্ছেন! আমার পূজা সার্থক হয়েছে আর বাহ্যপূজার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণী দ্বিধাশূন্য চিত্তে দেবপ্রসাদ জ্ঞানে উচ্ছিষ্ট ভোজ্য খাদ্য গ্রহণ করলেন। তাঁর গোপালের শরীরে ‍রঘুবীরের জীবন্ত রূপ দর্শন করে আনন্দাশ্রু মুছতে মুছতে বহুকাল পূজিত রঘুবীর শিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন।

প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ঘনীভূত ও দৃঢ়তর হয়ে গেলো। অপত্য প্রেমে মুগ্ধ সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন। উভয়েই আধ্যাত্মিক আলাপে নিযুক্ত। দিনের পর দিন কোথা দিয়ে অতীত হতে লাগলো অনুভব করতে পারলেন না। ঠাকুর (প্রথমে ছোট ভটচাজ নামে অভিহিত) নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীয় রহস্য কাহিনী ব্যক্ত করে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন, ব্রাহ্মণী তন্ত্রশাস্ত্র থেকে ঐ সকলের সমাধান ও ঈশ্বরপ্রেমের প্রাধান্য কিরূপ, কেমন করে সকল প্রকাশ পায়, সে বিষয়ে পাঠ করে তাঁর সংশয় দূর করতে লাগলেন।

দিব্যানন্দে পঞ্চবটীতে কেটে গেল ছ'সাত দিন। ঠাকুরের মনে হল ব্রাহ্মণীর এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না। কামকাঞ্চনাসক্ত মানুষের মন, দোষ, অপরের ত্রুটি ধরে— গুণাগুণের বিচার করে না। ব্রাহ্মণীকে বলা মাত্র তিনি তা মেনে নিলেন। গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে অবস্থান করে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন স্থির করে কালীবাড়ী পরিত্যাগ করলেন।

কালীবাড়ীর উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মধ্যে দেবমণ্ডলের ঘাটে গমন করলেন। সেখানে নবীনচন্দ্র নিয়োগীর স্ত্রী তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং ঘাটের চাদনীতে বাস করার মত যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিলেন। লোকনিন্দার অবকাশ আর রইলো না। কালীবাটীতে আসা ও ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলার কোন অসুবিধাই রইলো না। ঠাকুরের কথা শুনে ও মহুর্মুহুঃ বাহ্যচৈতন্যলোপ ও কীর্ত্তনে পরমানন্দ দেখে ধারণা করে নিলেন ইনি সামান্য সাধক নন। তিনি বিদুষী। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে সৌমদৃশ্য খুঁজে পেলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের গাত্রদাহ উপস্থিত হলে স্রক চন্দনাদি প্রয়োগে তা প্রশমিত হয়েছিল। ঠাকুরকে তা প্রয়োগ করে সুফল পেলেন। শ্রী চৈতন্যদেব ভাবাবেশে অপরকে স্পর্শ করে তার মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করতেন, ঠাকুরের মধ্যেও সেই শক্তি প্রকাশিত। তাঁর ধারণা হল শ্রীচৈতন্য ও শ্রী নিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের জন্য ঠাকুরের শরীর ও মনাশ্রয়ে পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সিহড় গ্রামে যাবার সময় নিজ শরীর থেকে কিশোর বয়স্ক দুজনকে যেরূপ আবিভূত হতে দেখেছিলেন, সে কথা স্মরণে তিনি মীমাংসায় স্থির করে নিলেন : 'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব'।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী সাধিকা, সত্যপ্রাণা, সংসারের আকর্ষণ বিকর্ষণের উপরে তাঁর ঠাঁই। আশা, প্রত্যাশা, লোকলজ্জা বিরহিতা নির্ভীকা স্বাধীনা। ব্রাহ্মণীর আসার পূর্ব্বেই ঠাকুরের ঈশ্বরানুরাগ ও ব্যাকুলতা ও উন্মত্ততা, সুরু হয় সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা। মথুরমোহন বায়ুরোগ ধারণায় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। কোন ফল দেখা না দিলেও চিকিৎসা নিয়মিত চলছিল। তাঁর বাড়ীতে একসাধক কবিরাজ সমস্ত ঘটনা শুনে 'যোগজবিকার' বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নাম করা প্রসিদ্ধ বৈদ্য গঙ্গাপ্রসাদ, তাঁর চিকিৎসার ত্রুটি ধরার বা মন্তব্য প্রকাশ করার সাহস কারও ছিল না। ব্রাহ্মণী নির্দেশ করলেন, এটা রোগ নয় সাধনজনিত বিকার। তিনি স্বীয়মত প্রকাশ করলেন : পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগী আচার্যগণের জীবনে প্রকাশ পেয়েছে এ জ্বালাকর ব্যাধি। শ্রীমতী রাধার ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও শারীরিক এই অনুভূতি লাভ করেছিলেন, ভক্তিগ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। তার কথায় ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করলেন কিন্তু মথুরমোহন ও অন্য সকলে এ কথায় আস্থা

স্থাপন করলেন না। চিকিৎসা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণীর কথায় 'স্রক চন্দন(সুগন্ধ ফুলের মালা পরিধান ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন প্রলেপন)' ব্যবহারে তিন দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। এ বিষয়ও প্রত্যক্ষ করলেন মথুরমোহন। ব্রাহ্মণীর কথার এত গুরুত্ব : এ দেহে অবতারের আবির্ভাব, তা যাচায়ে ঠাকুরের আগ্রহ ও ব্রাহ্মণীর উপরোষ শেষ পর্যন্ত তা এড়ানো সম্ভব হল না। ঠাকুর ও মথুরমোহন স্থির করলেন ওষুধে ডাক্তারে খরচা তো হচ্ছেই, পণ্ডিতদের আনিয়ে পরীক্ষাও চলুক, প্রমাণ হয় ভাল, না হলেও ভাল, অন্ততঃ মনের ভুল দূর হবে।

সে সময়ে বৈষ্ণবচরণের পণ্ডিত মহলে সুনাম ও যথেষ্ট প্রতিপত্তি। শ্রীমদ্ভাগবত সুন্দর পাঠ ও ব্যাখ্যায় প্রচুর নাম ডাক তাঁর। ঠাকুর, ব্রাহ্মণী ও মথুরমোহনও তাঁর নাম শুনেছেন। মথুরমোহন স্থির করলেন তাঁকে আর বাঁকুড়ার ঈদ্রেশের গৌরী পণ্ডিতকে আনবেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধন শক্তি। বৈষ্ণবচরণও একজন সাধক। তাঁর ঈশ্বর ভক্তি, দর্শনশাস্ত্রে যেমন পাণ্ডিত্য, বৈষ্ণব সমাজের একজন নাম করা নেতা। ধর্ম্ম বিষয়ে মীমাংসায় উপনীত হতে হলে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় সেদিনের সে সমাজকে। ভক্ত ও সাধক তাঁর পরামর্শ ক্রমেই, গন্তব্য পথে অগ্রসর হন।

ইতিমধ্যে গায়ের জ্বালা দূর হল সত্য কিন্তু দেখা দিল নোতুন রোগ। ক্ষুধায় কাতর সবসময়। যতই আহার করেন কিছুতেই পেট আর ভরে না। পর মুহূর্ত্তেই ক্ষুধার উদ্রেক। সব সময়ে 'খাই' 'খাই'। ব্রাহ্মণী সব শুনে আশ্বাস দিলেন : বাবা, ভয় নেই! ঈশ্বর পথের পথিকদের কখন কখন এঅবস্থা হয়ে থাকে, শাস্ত্রে একথা আছে আমি জানি—এটা রোগ নয় চিন্তা করো না বাবা।

মথুরমোহনকে বললেন : ঘরের মধ্যে চিঁড়ে, মুড়কি, থেকে সন্দেশ, রসোগোল্লা, লুচি, যতরকম খাবার আছে থরে থরে সাজিয়ে রাখ। মথুরমোহনের নির্দ্দেশক্রমে সাজানো হল সেইরকম। ঠাকুরকে বললেন ব্রাহ্মণী, "বাবা, তুমি এই ঘরে দিনরাত্রি থাক, আর যখন যা ইচ্ছা তাই খেও।"

ঠাকুর রইলেন সেই ঘরে। বেড়ান, খাবার দেখেন, নাড়াচাড়া করেন কখনও এটা ওটা খান, এমনি করে কেটে গেল তিনদিন। খাবার ইচ্ছা চলে গেল। ঠাকুরও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি। এটা সাধকের ঈশ্বর যোগ বা তন্ময়ভাব মনে আসার পূর্ব্বাবস্থা, বুঝিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণী।

মথুরমোহনের আমন্ত্রণে উপস্থিত হলেন বৈষ্ণবচরণ। সঙ্গে কতকগুলি ভক্ত, সাধক ও পণ্ডিতমণ্ডলী। বসলো সম্মিলিত পণ্ডিত সভার আসর। গৌরীপণ্ডিত এলেন না, তাঁর শরীর তখন অসুস্থ। সঙ্গে আছেন ব্রাহ্মণী। মথুরমোহন ও সহরের নামকরা সব পণ্ডিত। ঠাকুরও বসলেন সে সভা মধ্যে। শুরু হল আলোচনা। ব্রাহ্মণী যা শুনেছিলেন, যা নিজের চোখে দেখেছেন ব্যক্ত করলেন। এরপর উল্লেখ করলেন : ভক্তিপথে পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ আচার্য্যসকলের জীবন, তাঁদের অনুভূতি, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ যাবতীয় ঘটনা। তিনি ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে প্রমাণ করতে ও নিজস্ব মতামত দর্শন করাতে লাগলেন। বৈষ্ণবচরণের উদ্দেশ্যে বললেন : আপনি যদি অন্যরূপ কিছু বিবেচনা করেন আমায় বুঝিয়ে দিন কেন এরূপ করছেন। মা যেমন সন্তানের পক্ষে অবলম্বন করেন, ব্রাহ্মণীর ব্যবহার ঠিক তেমনি। বীরদর্পে দণ্ডায়মানা, যেন দৈববলে বলিয়ান তিনি। আর ঠাকুর—যাঁর জন্য এত কাণ্ড, তিনি বসে আছেন আলুথালুভাবে যেন আপনাতে আপনি। 'আনন্দ অনুভবে, কখন হাসছেন, কখনও বা বটুয়া থেকে দুটি মৌরি বা কাবাবচিনি মুখে দিচ্ছেন, কখনও বা তাঁদের আলাপ আলোচনা শুনছেন। মাঝে মাঝে 'ওগো, এইরকমটা হয়' বলে বৈষ্ণবচরণের অঙ্গ স্পর্শ করছেন। বৈষ্ণবচরণ ব্রাহ্মণীর সকল কথা মন নিয়ে শুনে ও হৃদয় দিয়ে

তা অনুধাবন ও অনুমোদন করছিলেন। যে প্রধান প্রধান উনবিংশ প্রকার ভাব ও অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্রে 'মহাভাব' নির্দ্দেশ দিয়েছে, যা-একমাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে লক্ষিত হয়েছে, তার সকল লক্ষণগুলিই ঠাকুরের মধ্যে প্রকাশ হয়েছে। মহাভাবের প্রকাশ সাধারণতঃ উনিশ প্রকারের মধ্যে বড় জোর দু'পাঁচটা দেখা যায়, এখানে উনিশটিই প্রকটিত। ভাবের এই উদ্দাম বেগ সকলের পক্ষে সহ্য কররা সম্ভব হয় না কিন্তু সেই বেগের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছেন সকলে। বৈষ্ণবচরণের মন্তব্যে বিস্মিত ও আনন্দে গদগদ হয়ে ঠাকুর বললেন : ওগো বলে কি? যা হোক বাপু রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।....

আর বৈষ্ণবচরণ! শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে দিব্য সুখ লাভের আশায় প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করলেন। কিছুদিন বাসকরে নিজস্ব রহস্য সাধন সমূহের জন্য তাঁর মতামত গ্রহণ করে নিজ সাধন পথ ও ভক্তসকলের যাতে কৃতার্থতা লাভের পথ প্রশস্ত হয়, তার ব্যবস্থায় নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন। কখনও কখনও সাদর সম্ভাসনে তাঁর আখড়ায় (ঠাকুরকে) নিয়েও গেলেন বেড়াতে। এঁদের জীবন ও গুপ্ত সাধন প্রণালী তাঁর দৃষ্টিতে দুষনীয় ও নিন্দার্হ, তবুও তাঁদের ব্যক্তিগত সাধনলাভের পথে আন্তরিকতা দর্শন করে বললেন : এটা হীন অনুষ্ঠান কিন্তু বিশ্বাসে তাঁরা সরল, অশুদ্ধ হলেও একটা তো পথ বটে! যদি মন চায়, বিশ্বাস যদি অটুট হয়, জানবে এটা একটা ভেতরে ঢোকার দরজা। ভেদবুদ্ধির প্রয়োজন কি? প্রবৃত্তিপূর্ণ মানুষের মনকে, সহজে কি নিবৃত্তির পথে নিয়ে যাওয়া যায়? সহজে কি শুদ্ধ সরলভাবে, তাঁকে ডাকা বা তাঁর শ্রীপদ লাভ সম্ভব? শুদ্ধতার সঙ্গেও কিছু কিছু অশুদ্ধতা স্বেচ্ছায় ধরে রাখে যে! কামকাঞ্চন ত্যাগ করেও একটু আধটু গন্ধ তার থেকে যায় বইকি। অশেষ কষ্ট স্বীকার করে, শুদ্ধভাবে জগদম্বাকে পূজা করতে হয়। সেগুলি লিপিবদ্ধ করেও তাঁর সন্তানের জন্য বিপরীত কামভাব সূচক গান গাইবার বিধানও সেখানে দেওয়া আছে। সুতরাং বিস্মিত হবার কারণ নেই, নিন্দা করারও প্রয়োজন নেই। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড নায়িকা মহামায়ার প্রবল প্রতাপে, দুর্ব্বল মানুষ কামকাঞ্চনের বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। এ বন্ধন মুক্তি তাঁর কৃপা ছাড়া, একান্ত অসম্ভব জীবের। তিনি কাকে কোন পথ দিয়ে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে, বন্ধন মুক্ত করবেন তা মানব বুদ্ধির অগম্য।... বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞের সঙ্গে ভোগের মিলন ছিল। রূপরসাদির সকল বিষয়ের নিয়মিত ভোগ, দেবতার উপাসনা-জীবনের উদ্দেশ্য বলে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐসব অনুষ্ঠাণের মধ্য দিয়েই বাসনাবর্জ্জিত হয়ে— উপনিষদের শুদ্ধাভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনায় কৃতার্থ হত। বৌদ্ধযুগে অন্যপ্রকারের চেষ্টা দেখা গেছে। অরণ্যবাসী সাধকদের শুদ্ধভাবে উপাসনা, ভোগবাসনাপূর্ণ সংসারী মানুষকে নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যশাসকও বৌদ্ধযতিদের ঐ চেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। ফলে, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি, প্রবৃত্তি মার্গোস্থিত মনকে নিয়মিত ভোগ দ্বারা ধীরে ধীরে নিবৃত্তিমার্গে চালিত সে পথ, বাইরের উচ্ছেদে, ভিতরে ভিতরে নীরব নিশীথে, জনশূন্য বিভষিকাপূর্ণ শ্মশান চত্ত্বরে অনুষ্ঠেয় তন্ত্রোক্ত 'গুপ্ত সাধনপ্রণালীতে' রূপায়িত হয়েছে। তন্ত্রে প্রকাশ : মহাযোগী মহেশ্বর বৈদিক অনুষ্ঠানসকল নির্জ্জীব হয়ে যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশে, ভিন্নাকারে 'তন্ত্ররূপ' তা পুনঃপ্রকাশ করলেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মতই, তন্ত্রে যোগের সঙ্গে ভোগের সম্মিলন ঘটালেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড থেকে পৃথক, যুক্ত করলেন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে অদ্বৈতজ্ঞানের প্রক্রিয়া অথচ উভয়ের অবস্থিতি রাখলেন সমান দূরত্বে। নির্দ্দেশ দিলেন: প্রথমে কলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে ন পূজ্য ঈশ্বর জ্যোতিঃ ঘনীভূত দেবতাকে গ্রহণ কর। এবার তাঁকে ভেতর থেকে বাইরে উঠিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে অদ্বৈতভাবে নিযুক্ত কর, পরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পূজায় বসে চিন্তা কর।' প্রেমে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার কি সুন্দর ব্যবস্থা। হাজারের মধ্যে একজনও ঠিক ঠিক ভাবে এ সাধনায় ব্রতী হতে পারে কি না সন্দেহ! তবে সাধন পথ যাত্রীরা, অল্প বিস্তর

চেষ্টা করে। তাতে লাভও দেখা যায়। ধীরে ধীরে উন্নত পর্য্যায়ে উপনীত হতে থাকে। এটাই তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী, বৈদিক ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে পার্থক্য এটাই। তন্ত্রসাধনা পথের নোতুনত্ব। এই হেতুই তন্ত্রসাধনায় জনগণের মনে প্রভাব পড়ে বেশী।.... আরও একটা নতুনত্বের কারণ, জগৎকারণ মহামায়ার মাতৃভাবের প্রচার। সেইসঙ্গে যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তির ওপর একটা শুদ্ধভাব সঞ্চারণ। বেদ, পুরাণ ঘাঁটো, এভাবটি কোথাও পাবেনা। এটা তন্ত্রের একেবারে নিজস্বরূপ। বেদের সংহিতাভাগে, স্ত্রীশরীরের উপাসনার একটু আধটু বীজ মাত্র দেখা যায়। যেমন বিয়ের সময় কন্যার ইন্দ্রিয়কে প্রজাপতে দ্বিতীয়াং মুখং' (সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির দ্বিতীয় মুখ)। সুন্দর তেজস্বী গর্ভধারণের জন্য 'গভং ধেহইসিনীবালি' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতাসকলের উপাসনা ও ঐ ইন্দ্রিয়কে পবিত্রভাবে দেখার বিধান আছে। বাবিলবাসী সুথের জাতি, তার শাখা দ্রাবিড় জাতির মধ্যে যোনি লিঙ্গের পূজার প্রচলন থাকলেও তা তাদের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল।

তন্ত্র, বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ভাব আপন শরীরে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সঙ্গে একত্রে সম্মিলিত করেছে। অধিকারী সবিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতি, ঐ উপাসনার ভিতর দিয়ে সহজ হবে দেখে দ্রাবিড় জাতির ভিতরে নিবদ্ধ স্ত্রী-শরীরে উপাসনার স্থূলভাব অনেকটা উল্টে দিয়ে বৈদিক যুগের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাগটি সম্মিলিত করে নিজ অঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে উপাসনার নোতুন ধারা প্রবর্ত্তিত করছে— তন্ত্রে বীরাচার এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল মনে হয়।... তন্ত্রকার কুলাচার্য্যগণ বুঝে ছিলেন প্রবৃত্তিপূর্ণ মানুষের স্থূলমন, রূপ ও রস ভোগ করবেই, সেই ভোগ্য বস্তুর ওপর যদি, শ্রদ্ধার ভাব আরোপিত করা যায়, সেই শ্রদ্ধাবলে অল্প সময়ে সংযম ও আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী করে তোলা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রচার করতে শুরু করেন, নারীশরীর পবিত্র, তীর্থ স্বরূপ, নারীতে মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করে দেবীবুদ্ধি প্রয়োগ ও জগদম্বার বিশেষ শক্তি প্রকাশ ভাবনার ফলে দেখা দিল, উত্তম ও অধম, উচ্চ ও হীন পথক্রিয়া। যে যেরূপ প্রকৃতির, সে সেই পথ অবলম্বন করতে সুরু করলো।... বিকৃতি শুরু : বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন পথক্রমায়। স্ত্রী-মূর্ত্তিতে ভক্তি শ্রদ্ধা আরোপ করবে, ভক্তির সঙ্গে পাদোদক পান ও নারী নিন্দা বা প্রহার করবে না।... কালে, তান্ত্রিক সাধকদের স্তরভেদ দেখা দিল। কেউ ঈশ্বর জ্ঞানলাভ ছেড়ে সিদ্ধাই লাভে ব্যস্ত হ'ল, কেউ অস্বভাবিক সাধন প্রণালী অবলম্বন করলো, কেউ আবার তন্ত্রশরীরে ভুত প্রেত ইত্যাদির সাধনা আরম্ভ করল।

এলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীতে পরিবর্ত্তন শুরু হল। তান্ত্রিক সাধনায় দ্বৈতভাবের মধ্যে মঙ্গল সাধন সম্ভব, অদ্বৈতভাবের ক্রিয়া বাদ পড়ে গেল। চালু হল মন্ত্রশাস্ত্র ও বাহ্যিক উপাসনা। আত্মবৎ সেবা বইল উপাসনা ও পূজায়। প্রাধান্য পেল বাহ্যিক শৌচাচার। আহার, শৌচ, বিহার, সৌধ, সকল বিষয়ে শুচিশুদ্ধ থেকে 'জগৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধিন-সংশয়' নামই ব্রহ্মজ্ঞান—শ্রীভগবানের নামজপ দ্বারাই সিদ্ধিকাম চালু হল। কিন্তু তাঁদের তিরোভাবের পর প্রবৃত্তিপূর্ণ মানুষের মন, তাঁদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধমার্গ, কলুষিতভাবে পূর্ণ হয়ে গেল। সূক্ষভাবের পরিবর্ত্তে এলো স্থুল ভাব। ঈশ্বরের পরিবর্তে পরকীয়া নারীর স্থান প্রবর্ত্তিত হল। শুদ্ধযোগ মার্গের ভিতরেও প্রবৃত্তি মতো কিছু ভোগের বস্তু ঠাঁই পেয়ে গেল। ফিরে এলো যোগ ও ভোগের পূর্ব্বধারা। ভাগ হয়ে গেল কর্ত্তভজা, আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতিতে। চালু হল, নানা মতের উপাসনা ও সাধন প্রণালী। প্রচীন বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রবাহ, যোগ ও ভোগের সম্মিলন। ফিরে এলো, অদ্বৈতজ্ঞানের কিছু কিছু ভাব। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ভাব প্রসারণের জন্য সরল ভাষায় ছন্দোবদ্ধ গীত। সংস্কৃত 'অলক্ষ্য' কথাটি থেকে উৎপত্তি হলো

'আলোক'— তিনি ইশ্বর তথা কর্ত্তা বা গুরু। গুরুভাবে ভাবিত ব্যক্তিই এ সম্প্রদায়ে উপাস্য। 'কর্ত্তাভজা' এ সম্প্রদায়ের নাম। এরা আবেশ সম্বন্ধে বলেন, আলোক আসে, আলোক যায়, আলোকের দেখা কেউ না পায়। আলোককে চিনেছে যেই, তিন লোকের ঠাকুর সেই।

যাঁদের 'সহজ' উপাধি প্রাপ্ত অর্থাৎ কর্ত্তা, তাঁরা বলেন, 'রমনীর সঙ্গে থাকে, না করে রমন।' ....সংসার কামকাঞ্চনের ভিতর অনাসক্তভাবে না থাকলে সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। এরা বলেন, 'রাঁধুনি হইবি, ব্যঞ্জন বাটবি, হাঁড়ি পা ছুঁইবি তায়।' সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচবি, সাপ না গিলিবে তায়। অমিয় সাগরে সিনান করিবি, কেশা না ভিজিবে তায়।...

'এরপর আউল, বাউল, দরবেশ ও সাঁই -- সাঁইয়ের পর নাই।' সিদ্ধ হলেই সাঁই। এঁরা করেন অরূপের ভজন।

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নবন।। (ওরে) খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। (আবার) দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ। ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙায় ডিঙ্গি, চালায় আবার সে কোনজন? কুবির বলে : শোন শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ।।

গুরুর উপাসনা ও সকলে একসঙ্গে ভজনে নিবিষ্ট থাকা— এটাই প্রধান সাধনা। বেদ, পুরাণ কানে শুনতে হয়, তন্ত্রে, কাজে করতে হয়। হাতে করতে হয়।

পঞ্চবটী তলে একদিন ঠাকুর মথুরমোহনের সঙ্গে বসেছিলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে হৃদয়। কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণীর কথা উঠলে ঠাকুর বললেন : ব্রাহ্মণী বলে অবতারের সব লক্ষণ এ শরীরের মধ্যে পেয়েছে, শাস্ত্রে লেখা পুঁথিতেও নজির আছে।

মথুরমোহন ও ঠাকুর উভয়ের সম্বন্ধ এখন নিবিড় থেকে নিবিড়তর। ঠাকুর তাঁর মনের কথা তাঁকে বলেন। মথুরমোহন শোনেন। যুক্তি পরামর্শ দেন, ঠাকুর তা মেনে নেন ঠিক শিশুর মত। মথুর বললেন, তিনি যাই বলুন, অবতার তো দশটির বেশী নেই বাবা! তা সত্য হবে কেমন করে? তবে, আপনার উপর মা কালীর অনন্ত কৃপা, একথা আমি নিজে অকপটে বিশ্বাস করি। তা সত্যই বটে!

ঠিক সেই সময়ে সন্ন্যাসিনীকে সেদিকে আসতে দেখে মথুরমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, উনিই কি তিনি?

ঠাকুর মাথা দোলালেন।

এগিয়ে আসছেন ব্রাহ্মণী। তন্ময় ও অনন্যচিত্ত। হাতে একথালা মিষ্টি। মা যশোদা যেন গোপালের দিকে ধেয়ে চলেছেন। কাছে এসেই মথুরমোহনকে দেখে সচেতন হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলেন। ঠাকুরকে খাওয়াবার জন্য হৃদয়ের হাতে থালাটি তুলে দিলেন। ঠাকুর মথুরমোহনকে দেখিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি আমাকে যা বল, সেই কথাই আজ ওঁকে বলছিলাম। উনি বললেন, অবতার তো দশটি ছাড়া আর নেই!

মথুরমোহন সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করলেন। সত্যই যে তিনি আপত্তি করেছিলেন স্বীকার করে নিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা বলবার পরে ভগবান ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্যবার অবতীর্ণ হবার কথা বলেছেন তো! বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে (ঠাকুরকে দেখিয়ে) এঁর শরীর, মনে প্রকাশিত লক্ষণ সকলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায়। নিজ বক্তব্যকে সমর্থন করে বললেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকেও তাঁর কথা স্বীকার করতে হবে। তাঁদের কাছে নিজ বক্তব্য সমর্থনে সম্মুখীন হতে তিনি প্রস্তুত।

উত্তরে নিজেকে নীরব রাখলেন মথুরমোহন।

কথাটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল কালীবাটীর সকলের কাছে। ব্রাহ্মণী তাঁর বিশ্বাস ও বক্তব্য অকপটে ব্যক্ত করেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি মতামত প্রকাশ করেন তা জানতে উৎসুক হয়ে উঠলেন সকলে। তিনি (ঠাকুর) নিজে মথুরমোহনকে একটা বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করলেন।

বৈষ্ণবচরণ কিছুদিন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করার পরই গৌরীপণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। ইনি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। এঁর তপস্যালব্ধ ক্ষমতা ছিল। সিদ্ধাই ছিল করায়ত্ত। শাস্ত্রীয় তর্কবিচারে যখনই যেতেন, "হারে রে রে নিরালম্বো লম্বোদর জননী কং যামি শরণম্" কথাগুলি উচ্চারণ করে, সে বাটীতে বা সভাস্থলে প্রবেশ করতেন। জলদগম্ভীর স্বরে বীরে ভাবোদ্যতক হারে-রে-রে শব্দ, আচার্যকৃত দেবীস্তোত্রের একপদ তাঁর মুখ থেকে শুনলে সকলের হৃদয় একটা অব্যক্ত ত্রাসে চমকে উঠতো। ফলে, লাভ হতো দুটি। প্রথমতঃ তাঁর ভেতরে শক্তি সম্যক জাগরিত হয়ে উঠত, দ্বিতীয়টিতে শত্রুপক্ষের বল হরণ করা সম্ভব হত! গৌরীপণ্ডিত কালীবাটীতে পদার্পন করেই হারে-রে-রে-রে শব্দ করলেন। ঠাকুর জানতেন না গৌরীর সিদ্ধাই শক্তির কথা। ভিতর থেকে কে যেন ঠাকুরকে দিয়ে আরও জোরে 'হা-রে-রে-রে' শব্দ উচ্চারণ করালেন। উভয় পক্ষের চিৎকারে দারোয়ানরা লাঠি নিয়ে ছুটে এলো। ঠাকুর ও নবাগতের হুঙ্কার জানতে পেরে ফিরে গেল তারা। এপাশে গৌরীপণ্ডিতের শক্তি অপহৃত হওয়ায় বশ্যতা স্বীকার করলেন ঠাকুরের কাছে। মাথা নত করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ধীরে ধীরে। খুঁজে পেলেন সাধন পথের সন্ধান। ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় সালঙ্কারে গৃহিনীকে সাজিয়ে আল্পনা দেওয়া পীঠে বসিয়ে শ্রীজগদম্বা জ্ঞানে তিন দিন পূজা করতেন। এছাড়া আর একটা সিদ্ধাই ছিল তাঁর। নিত্যপূজাও তান্ত্রিক সাধকের রীতি অনুযায়ী হোম করতেন। বাঁ হাতে একমন কাঠ সাজিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে শূন্যে ধরে ডান হাতে আহুতি দান করতেন। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কয়েকদিন পরে মথুরমোহনের আহ্বানে একটি সভার অধিবেশন হল। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে আলোচনা ও নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা। বৈষ্ণবাচরণের আগমনে বিলম্ব হচ্ছে। সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য। গৌরী পণ্ডিত অপেক্ষা করছেন সভায়। ঠাকুর মন্দিরে জগদম্বাকে প্রণাম করে টলমল করতে করতে বেরিয়ে আসছেন। হাসতে হাসতে বৈষ্ণবাচরণ তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে বৈষ্ণবাচরণের কাঁধে বসে পড়লেন। কৃতার্থ জ্ঞানে বৈষ্ণবাচরণ সংস্কৃত ভাষায় ঠাকুরের স্তব করতে লাগলেন। সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত সকলে। কতক্ষণ পরে সমাধি ভাঙ্গলে সভার কাজ আরম্ভ হল। গৌরী পণ্ডিত তর্কে প্রবৃত্ত হলেন না। বললেন, উনি (বৈষ্ণবাচরণ) যা ধারণা করেছেন, আমারও অভিমত তাই। ইনি সামান্য নন— মহাপুরুষ। বৈষ্ণবাচরণ আপনাকে অবতার বলে, আমার ধারণায় আপনি যুগ অবতার। তপস্বিনী যা স্থির করেছেন, তা প্রকাশ্য ঘোষণা করতেন, মীমাংসায় প্রবৃত্ত হতেন না। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন-এ সাধক স্বীয় ঈশ্বরের আবির্ভাব,— নিঃসন্দেহে অবতার। সমস্ত লক্ষণই এঁর মধ্যে পরিস্ফুট।

প্রত্যাদেশ মতই ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরিচয়ের প্রথম সূত্রেই বুঝে নিয়ে ছিলেন কিভাবে তাঁকে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শাস্ত্র নির্দিষ্ট সাধনপথ অবলম্বন না করে, কেবলবাত্র অনুরাগ সহৃদয়ে ঈশ্বর দর্শনে যিনি ব্রতী, তিনি কত উচ্চমার্গের সাধক সে পরিচয় প্রবীনা সাধিকার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠায় সহজাত মাতৃস্নেহ তাঁকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। তাই তিনি তাঁকে সুখী করার উদ্দেশ্যে, তাঁর সাধন পথে অগ্রসরের সহায়তায়

আত্মনিয়োগ করলেন। উত্তম অধিকারীকে শিক্ষার দানের অবসর পেয়ে হৃদয় তাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি অকৃত্রিম বাৎসল্য প্রেমে তাঁর আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল স্বল্পকালের মধ্যে অনুভব করাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

ব্রাহ্মণী তাঁর আগ্রহ তাঁকে জানালেন। ঠাকুর শ্রীজগদম্বার কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি যোগদৃষ্টি প্রভাবে জানিয়ে দিলেন শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে তা প্রত্যক্ষ করার সময় এসেছে। আর সে উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণীর আগমন।

জগদম্বার নির্দ্দেশ। প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্ম্মকুশলা ব্রাহ্মণীর তান্ত্রিকক্রিয়াপোযোগী পদার্থসমূহ সংগ্রহ করে, প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে তাঁকে অশেষ সহায়তা করতে লাগলেন। পঞ্চপ্রাণীর মাথার খুলি গঙ্গাহীন প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনিয়ে নিলেন। ঠাকুর তাঁর নির্দ্দেশ মত ঠাকুরবাটীর উদ্যানে উত্তর সীমান্তে অবস্থিত বিল্বগাছের মূলদেশে স্থাপন কবে., সাধনোপযোগী দুটি বেদী নির্ম্মাণ করলেন। প্রয়োজনমত ঐ মুণ্ডাসনে উপবিষ্ট হয়ে জপ পুরশ্চরণ ও ধ্যানে মগ্ন হলেন। পরে একটি বিল্বমূলে তিনটি নরমুণ্ড প্রোথিত বেদী ও পঞ্চবটী ভেঙে দিলেন ও মুণ্ড কঙ্কালসমূহ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করলেন।)

কেটে গেল কয়েক মাস। দিনের বেলা তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য পদার্থগুলি সংগ্রহ করতেন ব্রাহ্মণী। রাত্রে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটী তলে সমস্ত উদ্যোগ সম্পূর্ণ করে আহ্বান করলেন ঠাকুরকে। যথাবিধি জগদম্বার পূজা সমাপন পরে নিমগ্ন হলেন জপধ্যানে। এত তন্ময় যে, জপে বসেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন ও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এরূপে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব। বিষ্ণুক্রান্তায় চৌষট্টিখানা তন্ত্র একে একে সকল অনুষ্ঠান করালেন ব্রাহ্মণী।

একদিন রাত্রে কোথা থেকে নিয়ে এলেন পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী রমনী। পূজার আয়োজন করে দেবীর আসনে বিবস্ত্রাকরে উপবেশন করিয়ে বললেন, বাবা এঁকে দেবী বুদ্ধিতে পূজা কর। পূজা শেষ হলে বললেন, বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে এঁর কোলে বসে তন্ময় চিত্তে জপ কর। কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। মাকে বললেন, মা তোর শরণাগতকে একি আদেশ করছিস? দুর্ব্বল সন্তানের এরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাবলে হৃদয়পূর্ণ হয়ে গেল। দেবতাদিষ্টের মত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে রমনীর কোলে বসা মাত্র সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান যখন ফিরলো ব্রাহ্মণী বললেন : ক্রিয়াপূর্ণ হয়েছে বাবা! অপার ধৈর্য্যধারণ করে কিছুক্ষণ জপ করেই ক্ষাত হয়ে, তুমি শরীরবোধশূন্য হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছো।... সব শুনে কৃতজ্ঞতায় মাকে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন।

আর একদিন ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে (মাথার খুলি) মাছ রেঁধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অর্পণ করে গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালন করলেন ঠাকুর। কোন ঘৃণার উদয় হলনা। কিন্তু যেদিন আম-মহামাংসখণ্ড এনে অর্পন করে জিভে স্পর্শ করতে বললেন, ঘৃণায় বিচলিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তা কি কখন করা যায়? শুনে ব্রাহ্মণী বললেন, : সে কি বাবা এই দেখ আমি করছি! নিজে গ্রহণ করে বললেন, ঘৃণা করতে নেই। পুনরায় সামনে ধারণ করলেন।

তাঁকে ঐরূপ করতে দেখে শ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা মূর্ত্তির উদ্দীপনা হয়ে গেল। মা- মা বলতে বলতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণী তাঁর মুখে প্রদান করলেন— ঘৃণার উদয় হল না।

এইরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করিয়ে নানারূপ অনুষ্ঠান করালেন। শেষ হল : সুরত ক্রিয়াসক্ত নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনে শিবশক্তির লীলাবিলাসজ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হওয়ার পর। বাহ্যচৈতন্য লাভ করলে বললেন বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে। বীরভাবের এই শেষ সাধন!

এর কিছুদিন পর একজন ভৈরবীকে পাঁচসিকা দক্ষিণা দিয়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিনের বেলায় সকলের সামনে কুলাগার পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করে বীরভাবের সাধন পূর্ণ করালেন। এই সাধন শেষ করতে লাগলো তাঁর দুটি বছর। প্রতিটি সাধনা, সিদ্ধিলাভে লাগলো তিনদিন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর পূর্ব্বস্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিল। দেখলেন : জগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ প্রদান করে জ্ঞানাগ্নি তাঁর অন্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে মস্তকে ওঠার সময়ে মূলধারাদি সহস্রার পর্যন্ত পদ্মসকল উর্দ্ধমুখ ও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হচ্ছে। জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পুরুষমূর্ত্তি সুষুন্নার মধ্য দিয়ে ঐসকল পদ্মের কাছে উপস্থিত হয়ে জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করছে আর প্রস্ফুটিত করছে। দশভূজা থেকে দ্বিভূজা দেবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করলেন। সকল মূর্ত্তিই অপূর্ব্ব সুরূপা। রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তি থেকে রূপ সৌন্দর্য্য চারদিকে বিচ্ছুরিত। ভৈরবাদি দেবমূর্ত্তির দর্শন ঘটে এই সময়ে। অঙ্গে কান্তিও বাড়তে থাকে। এই সময়ে জগদম্বার কাছে প্রার্থনা জানালেন বাহ্যরূপের প্রয়োজন নেই, আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর। দেখলেন, ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা। জানতে পারলেন, ধর্ম্মলাভের জন্য তার কাছে বহুব্যক্তি উপস্থিত হবে।....

রাণী রাসমণির মৃত্যু ১২৬৭ সালের শেষভাগে। মথুরমোহহনও পূর্ণ দেবীসেবার অধিকারী হয়েছিলেন। ঠাকুর তন্ত্রসাধনার শুরু ও শেষ ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত। এসময়ে ঠাকুরকে বার বার পরীক্ষা করে, তাঁর অপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলেন। তাঁর অলৌকিক বিভূতি সকলের প্রকাশ দেখতে পেয়ে ধারণা জন্মেছিল, তাঁকে তিনি সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করছেন। অক্ষুন্ন প্রভুত্ব, মর্য্যাদা, গৌরব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, যে কাজে হাত দিচ্ছেন তাতেই সিদ্ধিলাভ। এসব তাঁরই কৃপা। তিনিও অকৃপণ হাতে সাধনার সকল বস্তুর যোগান দিয়ে চলেছেন। ১২৭০ সালে অন্নমেরু ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। এই ব্রত সোনা রূপা ছাড়া সহস্রমন চাল, তিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দান করলেন। প্রসিদ্ধ গায়িকার গান, চণ্ডী গান, যাত্রায় কালীবাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করলেন। ভক্তিরসাশ্রিত গানে ঠাকুরের মহুঃর্মুহু ভাবসমাধি ও তাঁর পরিতৃপ্তির তারতম্যে তাদের গুণাপনার মাপকাঠি হিসাবে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা প্রদান করলেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুত পদ্মলোচনের পাণ্ডিত্য ও নিরভিমানের কথা লোকমুখে প্রচলিত ছিল। তিনি বেদজ্ঞ ও তন্ত্র-শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে ব্রত অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই দেখতে ও আলাপ করতে গিয়েছিলেন। মথুরমোহনের তাঁকে এই উৎসবে আনা ও দানগ্রহণ করাবার ইচ্ছা ছিল। হৃদয়রামকে পাঠালেন নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু অসুস্থ থাকায় কাশীধাম চলে যান, তাই সেসময় যোগ দেওয়া সম্ভব হলনা।....

এবার তাঁর (ঠাকুরের) বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত পঞ্চভাব সাধনার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তিনি নিজে দাস্যভক্তি অবলম্বনে, মহাবীরকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে জনকনন্দিনী দর্শন লাভ করলেন। এরপর তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত ভাবসাধনে নিযুক্ত হলেন। তাঁর ভেতর পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ভাবের প্রাধান্য দেখা যেত। একদিকে সিংহপ্রতিম নির্ভীক বিক্রমশালী, সর্ব্ববিষয়ে কারণান্বেষী, অপরদিকে ললনাসুলভ কোমল স্বভাববিশিষ্ট। যখন পুরুষ তখন পুরুষের মত সুপুরুষ, আবার যখন নারী বেশধারী তখন পরিপূর্ণ নারী-স্বভাবা।....

রাণী রাসমণির জীবৎকাল, কালীবাটী তীর্থপর্যটনশীল সাধু পরিব্রাজকগণের বিশ্রামলাভের বিশেষ স্থান বলে গণ্য ছিল। তাঁর অবর্ত্তমানে মথুরমোহনের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় সেই সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও তাঁর সেবাই ছিল এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু।

বহু সাধুর তখন সমাগম হতো। তাঁর (মথুরমোহনের) ধারণা হয়ে গিয়েছিল— ঠাকুরের ইচ্ছাপূরণ অর্থ দেবী-সাধনা। তাঁর ইচ্ছানুসারেই সাধুদের সেবায় যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে জটাধারী নামে রামাইত সাধুর আগমন হল। বালক রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ছিল তাঁর প্রিয় এবং তাঁর সাধনাই তিনি করতেন। তাঁর ভক্তিতে শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ঘন বালবিগ্রহ ধারণ করে দর্শনের মধ্যে আবির্ভূত হতেন। পরে তাঁর নিত্য সহচরে পরিণত হন। অবশ্য একথা কারও কাছে প্রকাশ করতেন না। লোকে দেখত, তিনি ধাতুময় বালবিগ্রহকে নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করছেন। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্রই তিনি সমস্ত অবগত হলেন এবং ক্রমে উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠভাব বিনিময় হতে লাগলো। জটাধারী যেমন তাঁকে সবসময়ে খেলাধূলা করতে দেখতেন, আদর আবদার করতে দেখতেন। ঠাকুরও তাঁর কাছে গেলে সেইরূপ আদর, আবদার ও খেলাধূলা করতে দেখতেন শেষে ঠাকুরের সঙ্গে সব সময় ঘুরে, ফিরে, নেচে, খেলে, স্নান করে সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগলো। তিনি তখন লালাকে নিয়ে ব্যস্ত। শেষে দীক্ষা নিলেন।

সে সময়ে তিনি (ঠাকুর) আপনাকে রমনীজ্ঞানে তন্ময় হয়ে আছেন। জগদম্বার নিত্যসঙ্গিনী জ্ঞানে, স্ত্রীবেশ ধারণ করেছেন। ফুল তুলে জগদম্বার বেশভূষা, চামর ব্যাঞ্জন করা, নতুন নতুন গয়না পরানো, তাঁর পরিতৃপ্তির জন্য নাচগান শোনানো, তাঁর নিত্য কর্ম্মে পরিণত। মথুরমোহন তাঁর সব ইচ্ছায় পূরণ করলেন।

রঘুবীরের পূজায় তিনি প্রভুভাবে স্মরণ মনন করেছেন। জটাধারীর বালরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর বাৎসল্যভাব জাগরণে সেই সাধনায় ব্রতী হলেন। তিনি জটাধারীর কাছে দীক্ষা নিলেন। তাঁর ইষ্টমন্ত্র ও প্রদর্শিত পথে সাধনায় মগ্ন হলেন। কয়েকদিনের মধ্যে সেই বালমূর্ত্তির দিব্য দর্শনে সিদ্ধ হলেন। জটাধারী এতদিন রামলালাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে আসছিলেন। কিন্তু তাঁর (রামলালা) ইচ্ছাপুরণেই ঠাকুরের কাছে রেখে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করলেন জটাধারী।

সংসারে পিতামাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখী, সখা, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধির বন্ধনে গঠিত মানবজীবন। সাধক জীবনে, অদ্বৈত্যভাব ও তার দ্বারা নির্গুণব্রহ্মের উপলাব্ধি ছাড়া আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রূপ, পাঁচটি ভাবের প্রকাশ। এভাবের উৎপত্তি এক এক সাধকের দ্বারা সাধন পথের দিকনির্ণয়ে। বৈদিক ও বুদ্ধযুগ শান্তভাব সাধনার সৃষ্টি, ঔপনিষদিক যুগে শান্তভাবের পরিপুষ্টি, অদ্বৈতভাব, দাস্যও ঈশ্বরে পিতৃভাব, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্ম্ম সংযুক্ত দাস্যভাবের, মাতৃভাব ও মধুরভাবের সংযোগ তান্ত্রিক যুগে, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব এলো বৈষ্ণবযুগে। তুমি (সেবা) আমি (সেবক) সম্বন্ধ, আমিত্বের বিলয়, সাধনার পরিসমাপ্তি নাম আত্মদর্শন। শূন্যতা বা পূর্ণতার প্রতিমূর্ত্তি, বুদ্ধের 'শূন্য', শঙ্করের 'পূর্ণ' দিগন্তে বিলয়, নাম 'সমাধি'। ঠাকুরের উপলব্ধিও পূর্ণতা পেল। ব্রাহ্মণী যখন এলেন, ঠাকুর ঈশ্বরে মাতৃভাবে বিভোর। জগতের সমস্ত প্রাণী ও পদার্থে বিশেষ করে স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করছিলেন। ব্রাহ্মণীকে দেখেই মাতৃসম্বোধন করলেন। তাঁর কোলে বসে, তাঁর দেওয়া ক্ষীর মিষ্টি পায়েস যা আনতেন, বাল গোপালের মত খেতেন। তখন ব্রাহ্মণীও ব্রজগোপিকারভাবে আবিষ্ট হয়ে, ঠাকুরের আবদার অনুসারে মধুররসাত্মক নন্দরানী যশোদার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মাতৃভজনে প্রবৃত্ত হতেন। সাধন শেষে দেখা দিল বাৎসল্যভাব সাধনের ইচ্ছা। তন্ত্র-সাধনার সময়ে পরতেন রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিঁদুর, রুদ্রাক্ষ। বৈষ্ণবতন্ত্রোভাব, সাধনের সময় ধারণ করলেন শ্বেতচন্দন, শ্বেতবস্ত্র, তুলসীমালা। আবার

বেদান্তের অদ্বৈতভাব সাধনে শিখাসূত্র ত্যাগ করে কাষায় ধারণ করলেন। ইসলাম সাধনার কালে, লুঙ্গি কখনও বা কাপড় কাঁছা খুলে পরলেন। পুংভাবে সাধনায় পুরুষবেশ, স্ত্রীভাবে রমনীর ভূষণ। সানন্দে মথুরমোহন তাঁর ইচ্ছামত সে বেশ তৈরী করিয়ে নানাভাবে সাজিয়ে দিলেন। সে সময়ে তাঁর চালচলন, হাবভাবের ও পরিবর্তন দেখা যেত। চেনার উপায় থাকতো না তিনি পুরুষ বা নারী। ফুল তুলে মালা গাঁথা, শ্রীরাধা গোবিন্দজীকে সাজানো, কখনও কখনও জগদম্বাকে মনোমত সাজে সাজিয়ে সকরুণ প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী রূপে পাওয়ার একান্ত বাসনা। অনন্যচিত্তে ব্রত হলেন তাঁর (রাধাগোবিন্দজীর) পদসেবায়। প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় কাটাতে লাগলেন দিনের পর দিন। দিন নেই রাত নেই— প্রার্থনা আর ব্যাকুলতা : অনন্ত বিরহ, বেদনা,: এসো প্রিয় দেখা দাও! দেখা দিল : শরীরে তাপ, দেখা দিল জ্বালা। লোমকূপ দিয়ে বেরুতে লাগলো বিন্দু বিন্দু রক্ত। দেহের গ্রন্থীগুলো শিথিল হয়ে এলো। হৃদয়ে শুরু হল যন্ত্রনা। মৃতের মত নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞানশূন্য দেহ। ঠিক ব্রজেশ্বরী রাধারানীর মতই সেই পারাকাষ্ঠা অতীন্দ্রিয় প্রেমের সাধনা। নেই লজ্জা, নেই ঘৃণা, নেই ভয়, নেই লোকলজ্জা, নেই জাতি, নেই কুল, নেই শীল, নেই পদমর্য্যাদা, নেই ভোগ সুখের কামনা। আমি নেই শুধু তুমি, তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার আনন্দে আমার আনন্দ, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ, তুমিময় জগতে সেই আমিত্বের বিলয়।..

রাধারানীর কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণ দর্শন অসম্ভব জেনেই ঠাকুর তদ্‌গতচিত্তে তাঁর উপাসনায় ব্রতী হলেন। তাঁর প্রেম-ঘন মূর্ত্তি স্মরণ, মনন ও ধ্যানমগ্ন হয়ে অচিরে তাঁর (শ্রীমতি রাধারানীর) দর্শন লাভে কৃতার্থ হলেন। পূর্ব্বে যেমন দেব দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন। এবারেও দেখা পেলেন শ্রীমতির। মিশে গেল তাঁর নিজের শ্রীঅঙ্গে।...

এর পরই দেখা পেলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির। বিষ্ণু মন্দিরের দালানে বসে শুনছেন শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ। ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। দেখতে পেলেন সম্মুখস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপদ্ম থেকে দড়ার মত একটা জ্যোতি নির্গত হয়ে প্রথমে ভাগবতগ্রন্থকে স্পর্শ করে তাঁর বক্ষঃস্থল সংলগ্ন হয়ে ওই তিন বস্তুকে একত্র সংযুক্ত করে রাখলো কিছুক্ষণ।

সে সমাধি যখন ভাঙলো — ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান একই পদার্থের প্রকাশসম্ভূত ভাগবত (শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান এক তিন, তিন এক।.....

মধুর ভাবসাধনে সিদ্ধির পর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে অবস্থান করলেন, তার কিছুদিন পরে কালীবাটীতে আগমন করলেন তোতাপুরী। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান ও শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। পুন্য নর্মদা তীরে বহুকাল সাধন ভজনে নিযুক্ত থেকে নির্ব্বিকল্প সমাধি পথে ব্রহ্মসাক্ষাৎ করে ছিলেন। তারপরে তাঁর মনে ভ্রমণের ইচ্ছা সঙ্কল্প উদয় হল। পূর্ব্বভারতে তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করতে করতে তিনদিন অবস্থানের জন্য উপস্থিত হলেন। এখানে অবশ্য সর্ব্বত্রই তিনদিন বাস করেছেন, একই ইচ্ছা এখানেও। প্রথমেই ঘাটের চাঁদনিতে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর তখন অন্যমনে বসেছিলেন একপাশে। তাঁর তপোদ্দীপ্ত ভাবোজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র আকৃষ্ট হলেন শ্রীমৎ তোতা। অনুভব করলেন ইনি সামান্য পুরুষ নন। বেদান্ত সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তন্ত্র-প্রাণ বঙ্গে এরূপ বেদান্তের অধিকারী যে কেউ থাকতে পারে এ কল্পনা তাঁর ছিল না। সবিস্ময়ে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে। তুমি বেদান্তসাধন করবে? জটাজুটধারী দীর্ঘবপু উলঙ্গ সন্ন্যাসী। তাঁর প্রশ্নে ঠাকুর বললেন, : কি করবো, না করবো কিছুই জানি না, আমার মা, জানেন। তিনি আমায় আদেশ করলেই করবো।

শ্রীমৎ তোতা বললেন : যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো। আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকবো না!

ঠাকুর উত্তর না দিয়ে জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে মার বাণী শুনতে পেলেন, যাও শিক্ষা কর। তোমাকে শেখাবার জন্যই এখানে ওঁর আগমন হয়েছে।

অর্দ্ধ-বাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর খুশী মনে ফিরে এলেন। বললেন মা, প্রত্যাদেশ দিয়েছেন।

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীকেই মা বলছেন! তাঁর বালস্বভাব দেখে খুশী হলেন কিন্তু এই আচরণকে তাঁর অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বলেই মনে হল। মুখে তাঁর ব্যঙ্গের হাসি ভেসে উঠলো। তিনি তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন বেদান্ত সাধক, ব্রহ্মগত প্রাণ। একমাত্র ঈশ্বরেই তাঁর বিশ্বাস। ত্রিগুণাময়ী ব্রহ্মশক্তির কাছে, ভক্তি উপাসনার ধার তিনি ধারেন না, স্বীকারও করেন না, এটা তাঁর চোখে মায়া। অজ্ঞান বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সাধকের পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর লাভের অন্য যে কোন পথ আছে সে বিশ্বাস তাঁর ছিল না। ভাবলেন, দীক্ষিত হয়ে জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হলে মনের এ সংস্কার দূর হয়ে যাবে। বললেন, বেদান্তসাধনে উপবিষ্ট ও প্রবৃত্ত হওয়ার আগে তাঁকে শিখাসূত্র পরিত্যাগ করে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে।

ইতস্ততঃ করে ঠাকুর বললেন, গোপনে করলে যদি হয় তাহলে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধ মা প্রাণে বিষম আঘাত পাবেন। সে কাজ তিনি করতে পারবেন না।

শ্রীমৎ তোতা রাজী হয়ে গেলেন। উত্তম কথা! শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হলে দীক্ষা দেবো। পঞ্চবটী তলে এসে আসন স্থাপন করলেন।

ঠাকুর জানালেন : তিনি বিবাহিত।

উত্তরে তোতা বললেন, তাতে কি আসে যায়! স্ত্রী-কাছে থাকলেও যার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান, সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে-ই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে আত্মা বলে সমভাবে দৃষ্টি ও ব্যবহার করতে পারে, তারই যথার্থ ব্রহ্ম লাভ হয়। ভেদ দৃষ্টি সাধক হলে, ব্রহ্ম-জ্ঞান থেকে বহুদূরে সরে থাকলো!

শুভদিনের সমাগম জেনে শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে আদেশ দিলেন। শেষে নিজ আত্মায় তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান করালেন। পৃথিবীর সমস্ত লোকপ্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জ্জন করাই শাস্ত্রের নিয়ম। গুরুপদে যখন বরণ করেছেন, নিঃসঙ্কোচে তাঁর নির্দ্দেশ ও আদর্শ মেনে চললেন ঠাকুর। পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরু নির্দ্দিষ্ট সকল দ্রব্য সংগ্রহ করে সেই শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করলেন।

রাত্রির অবসানে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের উদয় হলে, গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হলেন। হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল, ঈশ্বরের কাছে সকল কিছু ত্যাগের যে ব্রত সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রত অবলম্বনের জন্য পূর্ব্বাচার্য্য মন্ত্রসকল পূত গম্ভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটী উপবন মুখর হয়ে উঠলো।

গুরুকে অনুসরণে মন্ত্রপাঠ উচ্চারণ করতে করতে সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি প্রদান শুরু করলেন। উচ্চারিত হতে লাগলো : পরব্রহ্ম তত্ত্ব আমাতে প্রাপ্ত হউক। পরমানন্দ লক্ষনো পেত বস্তু আমাতে প্রাপ্ত হউক। অখণ্ডৈকরণ মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্যবর্ত্তমান পরমাত্মন দেব-মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণা যোগ্য বালকসেবক। হে সংসার দুঃস্বপ্নহারিণ পরমেশ্বর! দ্বৈতপ্রতিভা রূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মন্। আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া তদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্বপ্রেরক দেব! জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনাদি রহিত তত্ত্বজ্ঞান

যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সূর্য্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্ম্মলবারি অনুকূলপ্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সহায়তা করুণ। হে ব্রাহ্মণ! তুমিই জগতে বিশেষশক্তিমান, নানারূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। শরীর মন শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান ধারণের যোগ্যতা লাভের জন্য আমি অগ্নিস্বরূপ তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি। প্রসন্ন হও।

এরপর বিরজা হোম আরম্ভ হল। পৃথ্বী, অপ, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ রূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চক শুদ্ধ হউক; আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃ স্বরূপ হই স্বাহা! প্রাণ, অপান, সমান, উদ্যান, ব্যানাদি আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক, আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই স্বাহা!

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নামক, আমার কোষপঞ্চক শুদ্ধ হউক, আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা!

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রসূত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কার সমূহ শুদ্ধ হউক। আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা!

আমার মন, বাক্য, কায়, কর্ম্মাদি শুদ্ধ হউক, আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃ স্বরূপ হই—স্বাহা!

হে অগ্নিশারিরে শয়ান, জ্ঞান-প্রতিবদ্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ জাগরিত হও। হে অভীষ্ট পুরণকারিন্! তত্ত্বজ্ঞান-লাভের পথে আমার যতকিছু প্রতিবন্ধক আছে, সেইসকল নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরু মুখে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সম্যক উদিত হয়, তাহা করিয়া দাও; আহুতি দ্বারা রজোগুণ প্রসূত মলিনতা বিদূরিত করিয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই।

'চিদাভ্যাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্য সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতিপ্রদান পূর্ব্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা!

এমন করে বহু আহুতি দান করার পর 'ভুরাদি সকল লোক লাভের প্রত্যাশা আমি এখন হইতে ত্যাগ করিলাম এবং জগতের সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি— বলে হোমের সমাপ্তি হল। এরপর শিখা সূত্রও যজ্ঞোপবীত যথাবিধান আহুতি দিয়ে আবহমানকাল থেকে সাধক গুরু প্রদত্ত কৌপীন কষায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ নামে ভূষিত হয়ে শ্রীমৎ তোতার কাছে উপদেশ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হলেন।

ব্রহ্মজ্ঞ তোতা, ঠাকুরকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতিনেতি' উপায় অবলম্বনে ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। বললেন,: নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মবস্তুই সত্য, বাকী সব মিথ্যা। অঘটন-ঘটন পটীয়সী-মায়া নিজের প্রভাবে নাসের দ্বারা খণ্ড বললেও তা সত্য নয় কারণ সমাধি হলে দেশ, কাল বা নামের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং যা নামধরে, তা নিত্য বস্তু হতে পারে না, তাদের বর্জ্জন কর। সেই গণ্ডীকে ভেঙে ফেল। নিজের মধ্যে আত্মতত্ত্বের সন্ধান কর, তার মধ্যে ডুবে যাও। সমাধিস্থ হয়ে সেখানে অবস্থান কর। দেখবে সেই ক্ষুদ্র 'আমিজ্ঞান' বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হবে, সচ্চিদানন্দকে নিজ, স্বরূপে দেখতে পাবে। যে জ্ঞানে, এক অপরকে দেখে, জানে বা কথা বলে তা অল্প বা ক্ষুদ্র, যা অল্প তা তুচ্ছ, তাতে পরমানন্দ নেই। কিন্তু যে জ্ঞানে অপরকে দেখা যায় না, জানা যায় না বা অপরের বাণী প্রত্যক্ষ করে না, তাই ভূমা বা মহান। তার দ্বারাই পরমানন্দে অবস্থান করা যায়। যিনি সর্ব্বদা সকলের অন্তরে, বিজ্ঞাতা, মনবুদ্ধি, তাকে জানবে কেমন করে?

শ্রীমৎ তোতা নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্ত দিয়ে ঠাকুরকে সমাধিস্ত করার চেষ্টা করলেন, আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধি সমূহ অন্তরে প্রবেশ করিয়ে অদ্বৈতভাবে সমাহিত করতে চেষ্টা করলেন। বার বার উপদেশ দিতে লাগলেন : মনকে নির্ব্বিকল্প করে আত্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু নামের গণ্ডীকে অতিক্রম করতে সমর্থ্য হলেন না। মন সহজেই গুটিয়ে এলো কিন্তু জগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্ত্তি জলন্ত হয়ে নামরূপত্যাগের কথা ভুলিয়ে দিতে লাগলো। তিনদিন অক্লান্ত চেষ্টা করলেন। বার বার হার মানতে হল তাঁকে। শেষে চোখ খুলে শ্রীমৎ তোতাকে বললেন, মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মগ্ন হতে পারছি না। উত্তেজিত হয়ে ভর্ৎসনা করলেন তোতা 'কেঁউ হোগা নেহি'? কি! হবে না এতবড় কথা? বলেই ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা ভাঙা কাঁচ তুলে নিয়ে ভ্রূমধ্যে জোরে বিদ্ধ করে বললেন, এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো।

দৃঢ় সঙ্কল্পে ধ্যানে বসলেন ঠাকুর। জগদম্বার মূর্ত্তি ভেসে উঠলো। জ্ঞানকে আসি কল্পনা করে ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করে ফেললেন। মন হু হু করে নামের গণ্ডী পেরিয়ে সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন শ্রীমৎ তোতা। পাছে কেউ বিরক্ত করে, ঘরে তালা লাগিয়ে পঞ্চবটী তলে আসনে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। আসন ত্যাগ করে তালা খুলে দেখলেন, শিষ্যকে যেমন বসিয় রেখে গিয়েছিলেন তেমনি বসে আছেন। দেহে প্রাণের প্রকাশ নেই, প্রশান্ত মুখ, গম্ভীর জ্যোতিপূর্ণ। বুঝলেন : বহির্জগতে শিষ্য এখনও মৃতকল্প, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ, চিত্ত তাঁর ব্রহ্মে লীন হয়ে অবস্থান করছে। সমাধি রহস্যে তোতা স্তম্ভিত। ভাবতে লাগলেন, যা, দেখছি, তা কি বাস্তব সত্য! চল্লিশ বছর কঠোর তপস্যায় যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাকি তিন দিনে আয়ত্ত করা সম্ভব? পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে থাকেন, শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণ সমূহ। খুঁটিয়ে দেখলেন, পরীক্ষা করলেন, বুকের স্পন্দন, নাকের শ্বাসপ্রশ্বাস। কাষ্ঠখণ্ডের মত অচঞ্চল শরীর। দেহে বিকার বা চেতনার কোন চিহ্ন নেই। বিস্ময়ে, আনন্দে, চীৎকার করে উঠলেন 'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'— সত্য সত্যই সমাধি! বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল নির্ব্বিকল্প সমাধি! তিনদিনে, দেবতার কি অদ্ভুত মায়া!

শিষ্যের জ্ঞান ফেরানোর প্রক্রিয়া আরম্ভ করলেন : "হরি ওম্' মন্ত্রে পঞ্চবটীর স্থল জল ব্যোম পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।...

নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় যখন বাহ্যচেতনাশূন্য, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন এক সাধু। হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি। ওঁর অবস্থা দেখে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছলেন : এই শরীরটা দিয়ে মার অনেক কাজ বাকী আছে। বাঁচালে, লোককল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় হুস আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটু চেতনা হলেই খাবার মুখে গুঁজে দিতে লাগলেন। এমনি করে ছটি মাস কেটে গেল। তারপর নির্দ্দেশ পেলেন: 'ভাবমুখে থাক', লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক!

এই সময়েই মথুরমোহনের স্ত্রী জগদম্বা গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। অনেক চিকিৎসা করালেন মথুরমোহন, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভে সমর্থ্য হলেন না। ক্রমে ডাক্তার বৈদ্যগণ হাল ছেড়ে দিলেন। মথুরমোহন ঠাকুরের সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। কালীবাড়ীতে মা জগদম্বাকে দর্শন করে পঞ্চবটী তলে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের তখন বিভোর তন্ময়ভাব অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। কখনও ধ্যানস্থ, কখনও তন্ময়ভাব। আবার কখনও সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। তবে দর্শনার্থী সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথাবার্ত্তা বলছেন। মথুরমোহনের ব্যথিত ও ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এত উন্মনা দেখাচ্ছে কেন?

মথুরমোহন নিবেদন করলেন, বাবা, আমার যা হবার তা হতে চললো। আর তোমার সেবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবো— তোমার সেবা করতে পারবো না।

সব শুনে ভাবাবিষ্ট হয়ে অভয় দিলেন : ভয় নেই, তোমার স্ত্রী আরোগ্য লাভ করবে।

মথুরমোহন বাড়ী ফিরে গেলেন। রোগ নিরাময়ের সূচনা হয়েছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ঠাকুরের দেখা দিল আমাশয় ও পেটের যন্ত্রণা।

বেদান্তমার্গ বিচরণশীল সাধকসকলের সমাগমে মুখর দক্ষিণেশ্বর, 'নেতি নেতি, অস্তি অস্তি ভাতি প্রিয়' 'আত্মমাত্মা ব্রহ্মতত্ত্ব সকলের বিচার ধ্বনিতে মুখরিত সকল সময়'। উচ্চস্তরের বিচারে যখন কোন সুমীমাংসা সম্ভব হতো না তখন মধ্যস্থ হয়ে মীমাংসার রায় দিতেন ঠাকুর।...

রোগ যাতনা যত বাড়ে, ততই উচ্চমার্গে বিচরণ করেন। সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। লাভ করলেন জাতিস্মরত্ব। বুঝলেন, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবান অধিকারী পুরুষই অবতার। যুগধর্ম্মের গ্লানি দূর করার জন্য দেহধারণ ও তপস্যা। সেই লোককল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁর আগমন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম, স্বল্প অক্ষরাজ্ঞ, আধ্যাত্মিক তরঙ্গায়িত জাগ্রত শরীর মন দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই তাঁর এ জীবন-ব্রত।...

নির্ব্বিকল্প ভাব সমাধির পরই হৃদয় উদারভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো। সাধনার শেষ অদ্বৈতভাব সমাধি। সাধনতত্ত্বের ইতি এখানেই। তারপর আর নেই।

ভাবমুখে অবস্থান করতে লাগলেন ঠাকুর। তোতাও তাঁর প্রতি গভীর আসক্ত। কেমন একটা আকর্ষণ। যিনি তিনদিনের বেশী কোথাও অতিবাহিত করেন নি, দীর্ঘ দুমাসের ওপর দক্ষিণেশ্বরের অধিবাসী। সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন হাসিখুশীর মধ্যে দিন কেটে যায়।

তোতা ছিলেন জ্ঞানমার্গের লোক ভক্তিমার্গকে উপলব্ধির অবসর তিনি পাননি। ভক্তি ভালবাসা সংসারীর ধর্ম্ম। তারমধ্যে দিয়েও যে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব, শুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারীও যে হওয়া যায়, জপ, কীর্ত্তন, ভজন যে, সে সাধনার অঙ্গ এ বোধ তাঁর অগম্য ছিল। সেজন্য ঈশ্বরকে যাঁরা সখা, পুত্র, স্ত্রী, বা স্বামী ভাবে ভজনা করে, আবদার, অনুরোধ, বিরহ, ব্যাকুলতা, অভিমান, অহঙ্কার বা ভাবের উচ্ছ্বাস, হাস্য, ক্রন্দন সব কিছুকেই তিনি উন্মাদের খেয়াল বা প্রলাপ বোধ করতেন।

আর ঠাকুর। সব সাধন পথে, সাধন সমাধা করে উপলব্ধি করেছিলেন সব পথই এক। হৃদয়ের ভক্তি, বা ভক্তি পথের পথিক হয়েও ব্রহ্মশক্তি জগদম্বার সাক্ষাৎ সম্ভব। এই সব নিয়ে তোতাজীর সঙ্গে ঠোকাঠুকি চলতো সকল সময়। ছোটবেলা থেকে সকাল সন্ধ্যা করতালি দিতে দিতে কখনও বা সময়ে সময়ে নৃত্য করতেন— বলতেন, হরিবোল, হরিবোল, 'হরি গুরু, গুরু হরি', 'হরি প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন', 'মনকৃষ্ণ, বুদ্ধিকৃষ্ণ, জ্ঞানকৃষ্ণ, ধ্যানকৃষ্ণ, বোধকৃষ্ণ বুদ্ধিকৃষ্ণ 'জগত তুমি জগত তোমাতে', 'আমি যন্ত্র , তুমি যন্ত্রী'।

সন্ধ্যা সমাগত। ঠাকুর বাক্যালাপ বন্ধ করে করতালি দিতে দিতে ভগবানের স্মরণ মনন করতে আরম্ভ করলেন। তোতা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, বেদান্ত পথের উত্তর অধিকারী যে, তিনদিনে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করলো যে, সে আবার হীনাধিকারীর মত অনুষ্ঠান করে কেন? বিদ্রূপ করে উঠলেন তোতা, আরে, কেউ রোটী ঠোকতে হো''? পশ্চিমাঞ্চলে, হাতে এমনি করেই রুটি তৈরী করে। ঠাকুরর হেসে বোল্‌লেন, ''দূর শালা! ঈশ্বরের নাম করছি, তুমি বলছো কিনা রুটি ঠুকছি।''

পুরীও হাসতে লাগলেন! এ অনুষ্ঠান অর্থশূন্য নয়, নিশ্চয় কোন গূঢ়ভাব আছে! প্রতিবাদ করলেন না।

ধুনি যেমন জ্বলে, তেমনি জ্বলছে। ঈশ্বর প্রসঙ্গে উভয়ের মন খুব উচ্চে, অদ্বৈত-জ্ঞানে তন্ময়। ইতিমধ্যে বাগানের একমালি তামাক খাওয়া ইচ্ছা হওয়াতে ধুনির কাঠ তুলে কলকের ওপর চাপিয়ে মনের সুখে তামাক খেতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ তোতাজীর সে পাশে দৃষ্টি পড়ায় ভীষণ চটে গেলেন। গালিগালাজ এমন কি চিমটে দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। নাগা সাধুরা আগুনকে পূজা করে, বিশেষ সম্মান দেখায়। ঠাকুরের তখন অর্দ্ধবাহ্যদশা অবস্থা। হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, "দূরশালা— দূরশালা!" ঠাকুরের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হয়ে তোতাজী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমন করছো যে! লোকটার কি অন্যায় বলতো?

ঠাকুরের হাসি থামে না। বললেন, তা তে বটে, সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড় দেখছি। মুখে বলছিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্ত্বা নেই। জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, পরক্ষণেই সবকথা ভুলে, মানুষকে মারতে উদ্যত, হাসছি মায়ার প্রভাব দেখে। কথাটা উপলব্ধি করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তোতাজী। পরে বললেন, ঠিক বলেছ! ক্রোধে সব ভুলে গিয়েছিলাম। বড় পাজী জিনিষ এটা! আজ থেকে ত্যাগ করলাম।

তোতাজী পশ্চিমের লোক। পুষ্ট শরীর। আজন্ম জগদম্বার কৃপাপাত্র। অবিদ্যারূপিনী মোহিনী মূর্ত্তির ফাঁদে তাঁকে পড়তে হয়নি। পুরুষকার ও স্বকীয় চেষ্টায় নির্ব্বিকল্প সমাধি, ঈশ্বর দর্শন ও আত্মজ্ঞান দর্শনের পথে অগ্রসর হতে পেরে ছিলেন। বাংলার মাটিতে পা' দিয়ে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। এখানের জলবায়ুতে আসুস্থ হয়ে পড়লেন। পেটের মোচড় আর টনটনানিতে সেই ধীর স্থির সমাধিস্থ মন, শরীরকেন্দ্রিক হয়ে পড়লো। তাঁর সাধনার বিচ্যুতি দেখা দিল। ব্রহ্মনিষ্ঠ মন তাঁকে সতর্ক করে দিল, যেখানে শরীর ভাল থাকছে না, সেখানে থাকা উচিত নয়— কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গ ত্যাগ করে যেতে মন তাঁর চাইলো না। শরীর হাড় মাসের খাঁচা, কটা দিন মাত্র স্থায়িত্ব তার! এই অশেষ আনন্দ প্রসূত দেবমানবের সঙ্গ কি সহসা ত্যাগ করা যায়? দেহটা তো পঞ্চভূতের রাজত্ব, ব্যাধির মন্দির। যেখানে যাবে সেখানেই আক্রান্ত হবে, তার থেকে মুক্তি কোথায়? নিঃসঙ্গ নির্ব্বিকার আত্মা, শরীরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। সেই মনকে ব্যস্ত করে লাভ কি?

কিন্তু মন যখন একান্তই দেহকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো, যন্ত্রনায় যখন তিনি জর জর, স্থির করলেন, দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করতেই হবে তাঁকে। প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে বিদায় নিতে আসেন, তাঁর সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে মেতে ওঠেন, মনের কথাটা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ভাবেন, আজ থাক, কালই বলে যাবে। এমনি করে বেদান্তের আলাপ শেষে পঞ্চবটীতলে ফিরে আসনে বসেন। দিনের পর দিন। শরীর ক্রমশ দুর্ব্বল হতে লাগলো। রোগ জটিল আকার ধারণ করলো। ঠাকুর তাঁর ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন কিন্তু আরোগ্যের পথে না এসে তা ক্রমেই বেড়ে চললো। মথুর মোহন ঠাকুরের কথামত সেবা ও চিকিৎসার ত্রুটি রাখলেন না। রোগ যন্ত্রণায় তিনি (তোতাজি) সমাধি মগ্ন হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

পেটের যন্ত্রণা সেদিন রাত্রে এত প্রবল হল যে তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না। শুতেও পারছেন না, বসতেও পারছেন না, ধ্যানমগ্ন হতে পারছেন না, শেষে শরীরের ওপর বিরক্ত হয়ে ভাবতে শুরু করলেন, শরীরের খাঁচায় মন আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোন মতেই যখন তাকে বশে আনতে পারছেন না তখন, এ দেহ রেখে লাভ কি? রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গায় এ দেহ বিসর্জন দিয়ে যন্ত্রণার অবসান ঘটাবেন।

মনকে ব্রহ্ম চিন্তায় স্থির রেখে, গঙ্গায় অবতরণ করলেন। ক্রমশঃ এগিয়ে চললেন, কিন্তু ভাগীরথীও কি তবে শত্রুতা শুরু করেছে। মৃত্যুর মত জলও কি তিনি বুকে ধারণ করেন নি? ক্রমে ওপারে চলে এলেন, ডুবজল পেলেন না। অন্ধকারের মধ্যে গাছপালা ঘরবাড়ী দেখা যেতে

লাগলো, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তোতাজী, একি দৈবী মায়া! ডুবে মরার মত জলও কি নদীতে নেই? একি ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা।

মন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সেই আলোকের আবর্ত্তে তোতাজী দেখলেন, মা, মা বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্য শক্তিরূপিনী মা, জলে মা, স্থলে মা, মনে মা, যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা, জ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা— যা কিছু দেখছেন, যা কিছু শুনছেন, যা কিছু করছেন, যা কিছু কল্পনা করছেন, সব মা! হয় কে না, নয় কে হয় করছেন তিনি! যতক্ষণ শরীরে ভিতর, ততক্ষণ তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু করার সামর্থ্য নেই— এমন কি মরারও! শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও মা, তুরীয়া, নির্গুণামা। যে ব্রহ্মাকে উপাসনা, ভক্তি ভালবাসা দিয়ে এসেছেন, সেই মা একাধারে শিবশক্তি, হরগৌরী, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি... অভেদ.... ভক্তি-পূরিত চিত্তে, জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপদর্শন, করতে করতে অম্বারবে মুখরিত করে তুললেন। যেমন এসেছিলেন, তেমনি ফিরে এলেন। শরীরে যন্ত্রণা আছে কিন্তু সে অনুভূতি নেই, প্রাণ সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব্ব উল্লাসে আপ্লুত। ধুনি জ্বালিয়ে বাকী রাত্রি জগদম্বার ধ্যানে কাটালেন।

ঠাকুর সকালে কুশল সংবাদ নিতে এসে দেখালেন, তোতাজীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। অধরে হাসি, শরীরে ব্যাধি নেই। ইঙ্গিতে পাশে ঠাকুরকে বসিয়ে গত রাত্রের সব কথা খুলে বললেন। শেষে বললেন, রোগই বন্ধুর কাজ করেছে, জগদম্বার সাক্ষাৎ পেয়েছি, রোগমুক্ত হয়েছি। সত্যই এতদিন অজ্ঞ ছিলাম। বুঝেছি এ শিক্ষার জন্যই এখানে আবদ্ধ ছিলাম। অনেকদিন ধরেই ভাবছি বিদায় নেব কিন্তু তা হয় নি! হাসতে হাসতে ঠাকুর বললেন, মাকে যে আগে মানতে না, ঝুটাবলে তর্ক করতে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ এবার ঘুচালো তো! আমাকে পূর্ব্বেই বুঝিয়েছেন : ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন!

প্রভাতী সুরে নহবত ধ্বনি শুরু হল। গুরুশিষ্য মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন। তার কয়েকদিন পরে বিদায় নিয়ে তোতাজী রওনা হলেন।

জগদম্বার ইচ্ছানুসারে দ্বৈত, অদ্বৈত ক্ষেত্রে অবস্থান করায় দেশ বিদেশের ধর্ম্ম সাধনায় আত্মনিয়োগের ইচ্ছা জাগলো কিছুদিনের মধ্যে। জগদম্বার ইচ্ছায় উপস্থিত হলেন ক্ষত্রিয়জ গোবিন্দ রায়। ছিলেন পারসী ও আরবী ভাষায় পণ্ডিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনায় উদার ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সুফী সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা ও ভাবগ্রহণে, ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে দরবেশদিগের মত সাধন ভজনে দিনরাত নিজেকে রত করলেন। রানী রাসমনীর কালীবাটীতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমভাবে আতিথ্যদানের ব্যবস্থা ছিল। গোবিন্দ রায় পঞ্চবটীর শান্ত ও শীতল ছায়ায় আসন পেতে ইষ্ট চিন্তায় দিন যাপন করতে শুরু করলেন।

ঠাকুর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। আলাপে তাঁর সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুসলমান ধর্ম্মপন্থানুযায়ী বেশ ও খাদ্য গ্রহণ করে ত্রি-সন্ধ্যা নামাজ পড়তে সুরু করলেন। ভুলে গেলেন হিন্দুত্ব। ছেড়ে দিলেন মন্দির। মন থেকে মুছে গেল দেবদেবীর চিন্তা। মথুরমোহন ব্রাহ্মণ পাচক দিয়ে মুসলমান বাবুর্চির নির্দ্দেশ অনুযায়ী মুসলমানী খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতিবাহিত হল তিনদিন। দেখা পেলেন দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের। সগুন বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি পূর্ব্বক তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে মন তাঁর লীন হয়ে গেল। সেই এক অনুভূতি। উপলক্ষ্য এক, যাত্রাপথ শুধু ভিন্ন।

তন্ময়তায় বিভোর ঠাকুর। সর্ব্বত্রই এক সুর, পৃথক অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, সর্ব্বত্রই একই অনুভূতি, সবই একাকার। সর্ব্বত্রই তিনি, তিনি ছাড়া কিছু নেই।

এমন অবস্থা দাঁড়ালো, কেউ যদি দুর্ব্বাদলের উপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যায়, বুকে ব্যাথায় চঞ্চল হয়ে উঠেন। দলিতের ব্যথার অনুভূতি, তাঁর অঙ্গে, তাঁর বুকে। বেদনায় চঞ্চল তিনি। গঙ্গার ঘাটে বাঁধা দুটি নৌকা। গঙ্গা তীরে দাঁড়িয়ে তিনি বিভোর চিত্তে দর্শন করছেন পূণ্যসলিলা গঙ্গা। মাঝিদের মধ্যে দেখা দিল বিবাদ। সুরু হ'ল হাতাহাতি। দুর্ব্বলকে আঘাত করলো সবল। ঠাকুর চীৎকার করে কাঁদতে সুরু করলেন। ছুটে এলো হৃদয়। কালী মন্দির থেকে শুনতে পেল কান্নার সেই সুর। মামাকে কে করেছে আঘাত? অনুসন্ধানে জানা গেল মাঝিদের কলহ কিন্তু আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট ঠাকুরের পিঠে।....

উপনিষদে আছে, সাধনায় সিদ্ধাকল্প হয় সাধক। দেব, পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক দেখার ইচ্ছা জাগে, তখনই মন তার সমাধি বলে ঐ সকল লোক দেখতে সমর্থ হয়। মহামুণি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বলেছেন : এই কালে বিভূতি বা যোগৈশ্বর্যের স্বতঃ উদয় হয়। তাঁরা বাসনাশূন্য, কামনাশূন্য তখন যে কোন অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তদবস্থাতে কালাতিপাত করেন। কেবল সর্ব্বোতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকায়, বহুজন-হিতায় ঐ সকল শক্তি সময়ে সময়ে প্রয়োগ করার অধিকারী হলেন। ঠাকুরও এইকালে বিচিত্র বিভূতি সকলের নিত্য প্রকাশ দেখতে পেলেন। সঙ্কল্প মাত্রেই, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহ প্রত্যক্ষ করার শক্তি সঞ্চারণের অধিকারী হলেন। স্পষ্ট হয়ে উঠলো এতদিনের সাধনা তাঁর সফল। মা-ই চালিত শক্তি— তাঁর ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র তিনি। ভূত ভবিষ্যতের পথিকৃত তিনি, যা করান, তিনিই করান, তিনিই শিখিয়ে দেন। পূর্ণ হল তাঁর সাধন ও সাধনা— 'মা, আমি কি করবো, কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যা শিখাবি, তাই শিখবো, যা করাবি তাই করবো! আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী!....

প্রায় ছ-মাসকাল রোগ ভোগের পর সুস্থ হয়ে উঠলেন। ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈত ভূমিতে অবস্থানে অভ্যস্ত হওয়ায় সহজভাব অনেকখানি প্রতিফলিত হতে লাগলো। শরীর তখন রীতিমত দুর্ব্বল। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার তখনও সম্ভব হয়নি। বর্ষাসমাগম। পেটের পীড়া দেখা দেওয়ার সম্ভবনায় মথুরমোহন স্থির করলেন কিছুদিন অন্ততঃ কামারপুকুরে কাটিয়ে আসুন। স্থান পরিবর্ত্তনে শরীর পুষ্ট হবে, হৃত শক্তি পুরুদ্ধার হবে· ভক্তিমতী জগদম্বা দেশের বাড়ীতে, যাতে ঠাকুরের কোন অসুবিধা দেখা না দেয়, সেই ব্যবস্থা পূর্ণ করার আয়োজন করলেন। ১২৭৪ সালের জৈষ্ঠ্য মাস, ঠাকুর যাত্রা করলেন কামারপুকুরে।

সাড়ে ছবছর পূর্ব্বে গ্রাম ছেড়েছিলেন তারপর আগমন। লোক মুখে নানা কথা শুনেছিল গ্রামবাসী, কখনও স্ত্রীবেশে হরি হরি... কখনও বা সন্ন্যাসী, আবার কখন আল্লা আল্লা রবে নামাজ পাঠ! রটে গিয়েছিল বদ্ধ উন্মাদ— তাই কুতূহল নিয়ে ঠাকুরকে দেখতে ছুটে এলো পাড়া প্রতিবেশী। যে পরিবেশে এতদিন, দক্ষিণেশ্বরে প্রাণের আবেগে করেছিলেন সাধন ভজন, যে তন্ময়তায় ছিলেন ডুবে, ভাব মুখে, সে বিভোর ভাব আর নেই। এখন ডুবে থাকেন মীন রূপে। কখনও ডোবেন, কখনও ভাসেন—সন্তরণশীল সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে। তাই, সব সময়ে মুখে তাঁর হাসিখুশী ভাব, আচার আচরণ স্বাভাবিক। এতদিন যা রটেছিল, শুনেছিল পাড়া প্রতিবেশী, নিজেদের চোখে মিলিয়ে দেখালো : তাদের গ্রামের সেইবালক গদাধর। সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, কুশল বিনিময় করছে, তেমনি সদাহাস্যময়।....

ঠাকুরেরও ভাল লাগলো এই নোতুন পরিবেশ। সেই গ্রাম, সেই প্রতিবেশী, সেই বাল্যের ক্রীড়াভূমি, যেন সাদরে আহ্বান করছে : আয় — আয় — আয়...।

পেয়েছেন নোতুন হাট। চেনা মুখ, চেনা পথ, চেনা মাঠ, ঘাট, মন্দির, চেনা পরিবেশ। সেই বামুন পাড়া, সেই বনিক পাড়া, সেই লাহাবাড়ী, সেই কুমোর পাড়া, সেই রঘুবীরের মন্দির, রামেশ্বর শিলা, শীতলার ঘট যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর বাবা।

নোতুন পরিবেশে শরীর মন ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলো। সকাল, সন্ধ্যায়, দুপুরে, সুরু হয়ে গেল প্রতিবেশীদের সমাবেশ; সকাল সন্ধ্যায় আবালবৃদ্ধদের সমাবেশ, মধ্যাহ্নে মহিলাদের আসর। জমজমাট ঘর, বসেছে আনন্দের হাট।

রামেশ্বর জয়রামবাটী লোক পাঠালেন। খবর গেল, গদাধর ফিরে এসেছে গ্রামে। ফিরে এলো বধূ সারদা। যখন বয়স ছিল তেরো কামারপুকুরে এসে বাস করেছিলেন একমাস। তখন, স্বামী বা শ্বশ্রূমাঠাকুরানী ছিলেন দক্ষিনেশ্বরে। ফিরে গিয়েছিল জয়রামবাটীতে। ছ'মাস পরে এলো পুনরায়। কাটালো দেড়মাস। পুনঃ যাত্রা জয়রামবাটীতে। কাটলো তিন মাস। বয়স হলো চোদ্দবছর সাতমাস দেহমনে ফুটেছে যৌবনরেখা। কল্পনাকুসুম জাগ্রত সবে, হল স্বামীর প্রথম দর্শন। সৌম্য, শান্ত সুন্দর সে মূর্ত্তি। অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে নিল সে দেবতাকে।

মনে ছিল শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা। যে আদর্শের কথা বলেছিলেন দীক্ষাদানের পূর্ব্বে, সে কথার তাৎপর্য্যকে রূপ দিতে অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে মনোনিবেশ করলেন ঠাকুর। পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে যেরূপ ক্রীড়াকৌতুক, হাসিপরিহাসের মধ্যে যে, শিক্ষাসূত্র নিক্ষেপে দেহ মনের গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই সূত্রই নিক্ষেপ করলেন বালিকা বধূর ওপর। স্নেহ-মায়া, ভালবাসায় অন্তরকে তার আপ্লুত করে দীক্ষা সুরু করলেন: নশ্বর মানুষের জীবন। তাকে, সংহত ও সংযত হয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে শিখতে হবে ঈশ্বর-বিশ্বাসে। স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতায় পরস্পরকে আপন করে নিতে হবে। দেবতা, গুরু, অতিথি সেবায় নিষ্ঠাবতী হতে হবে। গৃহকর্ম্মে হতে হবে নিপুণা। শিখতে হবে, টাকা পয়সার সদ্ব্যবহার। দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে করতে হবে সমব্যবহার। হতে হবে সহজ ও অচঞ্চল।

আর বালিকা সারদা। স্বামীর স্নেহ, ভালবাসায় মুগ্ধ ও অভিভূতা। সাতমাস সেই পাঠ গ্রহণ করে নিজেকে গড়ে তুললো ভবিষ্যতের জগৎ-জননী রূপে।...

গ্রামবাসী ফিরে পেয়েছে তাদের বালক গদাধরকে। চলেছে সেই রামায়ণ, মহাভারতের পাঠ, সেই হাসি, সেই ভাবময় তর্জ্জমা, সেই শান্ত সুখস্পর্শী পরিবেশ। কেটে গেল সাতটি মাস। ঠাকুর, হৃদয় ব্রাহ্মণীসহ ফিরে চললেন দক্ষিণেশ্বরে। আর সারদা ফিরে গেলেন জয়রামবাটী, পিতৃগৃহে।....

১২৭৪ সালে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। মথুরমোহন ধরলেন, চলুন দিদিমা ও হৃদয়কে নিয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থক্ষেত্রসকল ঘুরে আসবেন। রাজী হলেন ঠাকুর। মাঘমাসের মাঝামাঝি ইং ১৮৬৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী, মথুরমোহন, ঠাকুর, চন্দ্রাদেবী, হৃদয়, জগদম্বাদেবী সহ প্রায় শতাধিক সঙ্গীসহ তীর্থদর্শনে যাত্রা করলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি, তৃতীয় শ্রেণী তিনখানি বগী স্থায়ী ভাড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কলকাতা থেকে কাশী ইচ্ছামত ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যায়, তারই জন্য এই ব্যবস্থা। প্রথমে দেওঘর। বৈদ্যনাথজীকে দর্শন, পূজা শেষ হল। ঠাকুরের ইচ্ছা মত মথুরমোহন দরিদ্র ভোজন ও প্রত্যেককে কাপড় বিতরণ করলেন। এরপর কাশীধামে উপস্থিত হলেন; পথে একবার অবতরণ করেছিলেন। সে সময় ঠাকুর ও হৃদয় গাড়ীতে ওঠার আগেই গাড়ী ছেড়ে দেয়। মথুরমোহন কাশী পৌঁছেই 'তার' করলেন ষ্টেশনমাষ্টারকে। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাগআঁচড়ার অধিবাসী ও কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ওঁদের নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে কাশী পৌঁছে দিলেন। মথুরমোহন কেদারঘাটে দুখানি বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রতিদিন পালকিতে চেপে বিশ্বনাথজীকে দর্শন করতে যেতেন। এখানেও ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন মাঝে মাঝে। সাধু দর্শন ছাড়া ত্রৈলঙ্গস্বামীর দর্শনে মণিকর্ণিকার ঘাটে গেলেন। তিনিও (ত্রৈলঙ্গস্বামী) প্রথমদিন নস্যদানী দান করে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। ঠাকুর ও পরমহংসের গুণাবলী লক্ষ্য করে বললেন, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।" এই সময় তাঁকে ঘাট

বাধানোর কাজে হৃদয়কে দিয়ে কয়েক কোদাল মাটি তুলে সাহায্য করলেন। একদিন নিজের হাতে 'পায়েস' খাওয়ালেন। পুন্যসংঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রি বাসের পর প্রয়াগ যাত্রা করলেন। সেখান থেকে পুনরায় কাশী ফিরে এলেন ও পনেরো দিন বাস করলেন। এবার চললেন শ্রীবন্দাবনে। নিধুবণে বাস করতে লাগলেন। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন দর্শন করলেন! ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহন করলেন। খ্যাতিনাম সাধক ও সাধিকাদের দর্শন করলেন। নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শন করে পরিতুষ্ট হলেন। পনেরোদিন অবস্থানের পর কাশী ফিরে এলেন। বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দেখার জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করলেন। সোনার অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করলেন। এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন গমন করেন। সেখানেই তিনি (ব্রাহ্মণী) দেহরক্ষা করেন।

যখন বৃন্দাবনে ছিলেন একদিন বীনা শোনার ইচ্ছা হল কিন্তু কোন বীণাবাদকের সন্ধান না পাওয়ায় কাশীতে ফেরার পর আবার সে ইচ্ছা জাগলো। মহেশচন্দ্র সরকার নামে এক বীণাবাদক, তাঁর মদনপুরা রামভজন নিয়ে গিয়ে বীণা শোনালেন। বীণার ঝঙ্কারে ভাবাবিষ্ট হয়ে অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে পড়লেন। জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করলেন "মা আমায় হুঁশ দাও, ভাল করে বীণা শুনবো" প্রার্থনা মত বাহ্যভাবভূমিতে ফিরে সানন্দে বীণা শুনে সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান করলেন। বৈকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত আনন্দে অতিবাহিত করে জলযোগ করলেন মহেশবাবুর অনুরোধে। তারপর ফিরে এলেন মথুরমোহনের কাছে। এরপর প্রতিদিন মহেশবাবু ঠাকুরকে দর্শন করতে এসে বীণা বাজিয়ে শোনাতেন। আর ঠাকুরও মত্ত হয়ে উঠ্তেন।

এখান (কাশী) থেকে গয়া যাবেন স্থির করলেন মথুরমোহন। কিন্তু গয়াধামে তাঁর (ঠাকুরের) দেহত্যাগের সম্ভবনা থাকায় ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। বৃন্দাবন থেকে রাধা কুণ্ড ও শ্যাম কুণ্ডেব রজ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তার কিছু অংশ পঞ্চবটীর চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন বাকী অংশটুকু নিজ সাধনকুটীর মধ্যে নিজের হাতে পুঁতে দিয়ে বললেন,: আজ থেকে এইস্থান শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত হল। মথুরমোহন বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তদের আমন্ত্রণ করে পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করলেন। উৎসবশেষে গোস্বামীদের ষোলটাকা ও বৈষ্ণব ভক্তদের একটাকা দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করলেন।....

তীর্থ থেকে ফেরার কিছুদিন পরে হৃদয়ের স্ত্রী দেহত্যাগ করলো। হৃদয়ের মানসিক পরিবর্ত্তন হল। আত্মকেন্দ্রিক মন তার ভোগবিলাস যাপনে মত্ত ছিল। তার বদ্ধ ধারণা ছিল মামার সেবা করলে পূণ্যের অংশ তাকেও বর্ত্তাবে। সুতরাং সাধন ভজনের প্রয়োজন নেই। পত্নীবিয়োগে তার মনে সাময়িক পরিবর্ত্তন এলো। নিষ্ঠার সঙ্গে জগদম্বার পূজায় মন দিল। মামাকে অনুসরণ করে পরনের কাপড় ও পৈতা ত্যাগ করে ধ্যান শুরু করলো কিন্তু মনের তৃপ্তি বোধ হল না। শেষে ঠাকুরকে ধরলো, তাঁর মত তারও যেন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয় সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঠাকুর তাকে বোঝালেন, সেও যদি দিনরাত্র বিভোর হয়ে থাকে— তাঁকে দেখবে কে? ওসবের প্রয়োজন তার নেই, তাঁর সেবা করলেই সবকিছুই লাভ হবে! কোন কথা কানে না তুলে জিদ ধরলো হৃদয়, তোমাকে দিতেই হবে।

অগত্যা ঠাকুর বললেন, মার যা ইচ্ছা তাই হয়, আমার ইচ্ছায় কি হয়! মাই, আমার উপলব্ধির ব্যবস্থা করেছেন, মার ইচ্ছা হলে তোরও হবে।

সত্যই পূজা ও ধ্যানে দেবদর্শন শুরু হল। ভাবাবিষ্টও হল হৃদয়।

মথুরমোহন তার ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরকে,: হৃদয়ের একি অবস্থা হল, বাবা? উত্তরে ঠাকুর বললেন, ওর মনে একটু ব্যাকুল ভাব এসেছিল, মা তাই ঐরূপ দেখিয়ে শেষে ঠাণ্ডা করে দেবেন।

মথুরমোহন বললেন, এসব তোমারই খেলা বাবা! মনের সাধ মিটিয়েছো—এবার ঠাণ্ডা করে দাও। নন্দী ভৃঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকবো, তোমার সেবা করবো আমাদের এ অবস্থা কেন?

এর কিছুদিন পরেই পঞ্চবটীর দিকে চলেছেন ঠাকুর। হৃদয় গামছা ও গাড়ু নিয়ে পিছু নিল তাঁর। হঠাৎ হৃদয় দেখলো তার মামার শরীর রক্ত মাংসের শরীর নয়। শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে, সারা পঞ্চবটী আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পাদুটো মাটি স্পর্শ করছেনা শূন্যে ভেসে চলেছে। হৃদয় ভাবলো তার মনের ভুল! চোখ বার বার ঘসে নিয়ে দেখলো, সেই একই দৃশ্য। ভাবলো, তাহলে কি আমার ভেতরে কোন পরিবর্তন এসেছে? গাছপালা পথ সব পরিষ্কার অথচ নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সেও দিবদেহধারী, জ্যোতির্ম্ময় দেবানুচর জ্যোতিঘন অঙ্গের অংশ বিশেষ। তাঁর সেবার জন্যই পৃথক শরীর ধারণ। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অর্দ্ধবাহ্যভাবাবেশে চীৎকার শুরু করলো: ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা মানুষ নই! চল দেশে যাই জীবোদ্ধার করি। তুমিও যা, আমিও তাই....

ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, ওরে থাম থাম, অমন করছিস কেন? লোকজন ছুটে আসবে, ভাববে কি? সে কথা কি সে শুনে! চীৎকার তার থামো না। তাড়াতাড়ি তার বুক স্পর্শ করে বললেন, দে মা শালাকে জড় করে দে!

সব দর্শন ও আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেল। পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি অবস্থা ফিরে পেল হৃদয। কিন্তু মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে গেল। বললো, মামা, তুমি অমন করলে কেন? আমি তো এ আনন্দ জীবনে আর পাবো না।

ঠাকুর বললেন : চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আর তুই সামান্য একটু দর্শন করেই হৈ চৈ শুরু করলি, সময় এখনও হয়নি, হলে কত কি দেখবি!

ঠাকুরের কথায় মনের ক্ষোভ দূর হল হৃদয়ের। স্থির করলো : নিজের চেষ্টায় এ দর্শন সে লাভ করবে। ধ্যান ও জপের মাত্রা বাড়িয়ে ঠাকুর যেখানে বসে জপ ধ্যান করতেন, সেখানে বসে ধ্যান করবে। ঠাকুরের হঠাৎ ইচ্ছা হল পঞ্চবটীতলায় গমন করবেন। পথে শুনতে পেলেন হৃদয় চীৎকার করছে : মামাগো পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম। সম্মুখীন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কিরে, কি হয়েছে? হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বললো : এখানে ধ্যান করতে বসামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে, সারা অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে!

ঠাকুর সস্নেহে অঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন : যা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! তুই এরকম করিস কেন? বলেছি তো আমার সেবা করলেই সব তোর হয়ে যাবে।

হৃদয়ের যাতনা দূর হল। বুঝলো, জিদের বসে কোন কিছু করলে তার ভাল হবে না!

অনেকটা শান্ত হলেও ঠাকুরবাড়ীর কাজে তেমন আর মন বসে না। নোতুন কাজে মন দেবে স্থির করে নিল। গঙ্গানারায়ণ ছিল হৃদয়ের বড় বৈমাত্রেয় ভাই। মথুরমোহনের জমিদারিতে খাজনা আদায়ের কাজে বেশ দু পয়সা করেছিল। বাড়ীতে নোতুন চণ্ডীমণ্ডপ তৈরী করে জগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করবেন। সে আশা অপূর্ণ রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছিল। হৃদয় সেই কাজ পূর্ণ করবে স্থির করলো। যদি সে শান্তি লাভ করে তো করুক— মত দিলেন ঠাকুর। মথুরমোহন তার মনের ইচ্ছা অবগত হয়ে আর্থিক সাহায্য করলেন। (১২৭৫ সাল, আশ্বিন মাস) কিন্তু ঠাকুরকে ছাড়লেন না। তাঁর জানবাজার বাড়ীতে পুজো— মার আগমন— ঠাকুরকে তাঁর চাই।

মনক্ষুণ্ণ হল হৃদয়। ঠাকুর তাকে আশ্বাস দিলেন, তুই দুঃখ করছিস কেন? আমি সূক্ষ্মশরীরে তোর পূজা দেখতে যাবো, কেউ দেখতে পাবে না শুধু তুই দেখতে পাবি— অপরকে তন্ত্রধারক রেখে নিজে পূজা করবি, দুপুরে দুধ, গঙ্গাজল, মিছরি খাবি, মা তোর পূজা গ্রহণ করবেন!

কে প্রতিমা গড়বে, কে তন্ত্রধারক হবে, সব নির্দ্দেশ দিয়ে বললেন: মহানন্দে পূজা কর। দেখবি, প্রতিমার পাশে আমি আছি। তবে তিনবছর করবি! যা—

রামকুমারের একমাত্র সন্তান অক্ষয়। জন্মের পরেই মাতৃহীন। শৈশবে চন্দ্রাদেবী ও চার বৎসর পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে মানুষ। ছোটবেলা থেকেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আসক্ত। কুলদেবতা রঘুবীরের পূজায় বহু সময় ব্যয় করতো। যৌবনে পা দিলে দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজী পূজার ভার গ্রহণ করলো। তন্ময় হয়ে দু'ঘণ্টা পূজা পাঠ ছাড়া পঞ্চবটী তলে শিবপূজায় বহুক্ষণ ব্যাপৃত থাকতো। ন্যাস ও প্রাণায়ামের অভ্যাস করতো। ফলে, মাঝে মাঝে তালুদেশ ফুলে উঠে রক্ত ঝরে পড়তো। ঠাকুর তার ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগে খুশী হলেন।

প্রায় আড়াইবছর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের পর রামেশ্বর (ঠাকুরের মেজভাই) উপযুক্ত পাত্রী সন্ধান করে ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিয়ে দিলেন। কয়েকমাস পরেই শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হল। খবর পেয়ে ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, লক্ষণ ভাল নয়। রাক্ষসগণ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, ছোঁড়া যাবে দেখছি!

কামারপুকুরে আনিয়ে অক্ষয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন রামেশ্বর। সুস্থ হয়ে দক্ষিণেশ্বর ফিরে এলো। চেহারা ফিরলো, স্বাস্থ্যের উন্নতিও দেখা দিল। সহসা একদিন জ্বরে আক্রান্ত হল। তিন চার দিনেও জ্বর কমলো না। অক্ষয়কে ডেকে বললেন ঠাকুর: ডাক্তাররা বুঝতে পারছেনা বিকার হয়েছে ভাল করে চিকিৎসা করা— ছোঁড়াকে বাঁচানো যাবে না।

হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, ছি মামা! তোমার মুখ দিয়ে ওকথা বেরুলো কেন?

উত্তরে বললেন, আমার কি ইচ্ছে, অক্ষয় মারা পড়ে? মা যেমন জানান, বলান, তেমনি বলতে হয়!

হৃদয় উদ্বিগ্ন হয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। রোগ বেড়েই চললো। প্রায় একমাস কেটে গেল। কিছুতেই কিছু হলনা। ঠাকুর বুঝলেন, তার অন্তিম কাল উপস্থিত। পাশে গিয়ে বসলেন, বললেন : অক্ষয়, বল গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম। তিনবার বলালেন। অক্ষয় চলে গেল। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবভঙ্গ হল। মৃত্যু অবস্থান্তর প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করেও অক্ষয়ের অভাববোধ করতে লাগলেন।....

রাধাগোবিন্দ জীউর সেবার কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে রামেশ্বর (ঠাকুরের মধ্যমভ্রাতা) দক্ষিণেশ্বরে আগমন করলেন। সংসার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর। তাই মাঝে মাঝে কামারপুকুরে অবস্থানে বাধ্য হতেন। তখন সেবার দায়িত্বে থাকতেন, কখন রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কখনও দীননাথ।

অক্ষয় ছিল বয়সে তরুণ। সকলের প্রিয় বিশেষ করে তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন ঠাকুর। তার অকাল মৃত্যু মথুরমোহনকেও বিচলিত করেছিল। বৈঠকখানা বাড়ীতে থাকতো অক্ষয়। তার দেহত্যাগের পর সে বাড়ীতে বসবাস ছাড়লেন মথুরমোহন। নিজের মনের ক্ষতের কথা বিবেচনা করে শঙ্কিত হলেন তিনি। দেবতাজ্ঞানে যাঁর সকল সময় অনুবর্ত্তী হয়ে চলতেন, সেই ঠাকুরের অভাববোধকে প্রশমিত করতেই তাকে (ঠাকুরের) ও হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে শিবিকায় কখনও বা হাতীর পিঠে চাপিয়ে জমিদারী মহলে যাত্রা করলেন। সে স্থানের পল্লীবাসীদের দুর্দ্দশা ও অভাবের দৃশ্যে কাতর হয়ে মথুরমোহনকে দিয়ে মাথার তেল, নোতুন কাপড় ও পেটভরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করালেন।

চললেন, সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ে মথুরমোহনের পৈতৃক বাটীতে। ঐ গ্রামের কাছাকাছি গ্রামসকল ছিল তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। তার কিছু দূরে ছিল তাঁর (মথুরমোহনের কুল গুরুর

বাড়ী)। তাদের মধ্যে বিষয় নিয়ে চলছিল বিবাদ। মথুরমোহন হাতীর পিঠে ঠাকুরকে চাপিয়ে নিজে শিবিকায় তালামাগরো গ্রামে গুরুপুত্রদের আমন্ত্রণে গমন করলেন। যেখানে দুজনেই, তাঁদের আতিথেয়তায় সাতদিন বসবাস করে বিবাদের মধ্যস্থতা করে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন।

কলুটোলায় কালীনাথ দত্তের (ধর) বাড়ীতে হরিসভার অধিবেশন হত। নিমন্ত্রিত হয়ে ঠাকুর ওখানে উপস্থিত হলেন পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ শ্রীমদ্ভাবগত পাঠে ব্রতী। পাঠ যখন চলছে ঠাকুর উপস্থিত হলেন। উপস্থিত শ্রোতাগণ তন্ময় হয়ে পাঠ শুনছেন, ঠাকুরও একটি আসন করে নিয়ে পাঠ শুনতে লাগলেন। সামনেই একটি খালি আসন সকলেই সেই আসনকে প্রণাম করতেন যা কল্পনা আবির্ভাব (মহাপ্রভুর) রূপে নির্দিষ্ট। পূজা-পাঠ সবই চলতো তাকে কেন্দ্র করে। ফুল, মালায় সাজানো গুছানো। হরিকথা ভক্তিভরে, তাঁকেই শুনানো হচ্ছে। ভক্তের দল সেই কথামৃত পাঠ শুনে ধন্য হচ্ছেন— উল্লাস ও ভক্তি ভাবে জর জর হয়েছেন। সহসা আত্মহারা ঠাকুর। ভাবাবেশে শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর জন্য নির্দিষ্ট আঁসনে দাঁড়িয়ে গভীর সমাধিমগ্ন হলেন। জ্যোতির্ম্ময় মুখে, অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ হাসি, উর্দ্ধোত্তোলিত হাতে অঙ্গুলি নির্দেশ। যেন ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহা প্রভুর সঙ্গে একেবারে তন্ময়।

শ্রোতারা ভয়বিস্ময়ে আভিভূত, মুগ্ধ ও শান্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় একটা অব্যক্ত ভাব প্রেরণায় হরিধ্বনিতে নামসঙ্কীর্ত্তন শুরু করে দিল। সে নাম শুনতে শুনতে হুশ ফিরে পেলেন ঠাকুর। তাদের সঙ্গে ভাবে, প্রেমে বিভোর হয়ে মধুরনৃত্য শুরু করলেন। ভাবের আতিশয্যে সমাধিমগ্ন হয়ে স্থির নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করলেন।

এইভাবে বহুক্ষণ শ্রী হরির ও শ্রী মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের পর জয়ধ্বনি করে সভা শান্ত হল। এর অল্পক্ষণ পরে ঠাকুরও দক্ষিনেশ্বরে ফিরে এলেন।....

এবার তাঁর জাগলো শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনের অভিলাষ। ব্যক্ত করলেন, মনে ইচ্ছা। মথুরমোহন, হৃদয় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন নবদ্বীপ। ১২৭৭ সাল। ঘুরলেন বড় গোঁসায়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালেন— কোথাও তৃপ্তি পেলেন না। ভাবলেন, পুরাণ ভাগবতে কোথাও চৈতন্য অবতারের উল্লেখ নেই, অথচ চৈতন্য প্রেমের অবতার! জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বুকে তুলে নিয়েছেন সকলকে, তবে কি— সন্দেহ দোলা দিল মনে।... ফিরে এসে নৌকায় উঠলেন, দর্শন পেলেন দুটি ছেলের। অপরূপ সুন্দর। তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর, মাথায এক জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে তাঁর দিকে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছে। ঐ এলোরে, ঐ এলোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর। কথা বলতে না বলতে নিকটে এসে তাঁর দেহের ভেতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। নিকটে হৃদয় ছিল। ধরে ফেললো নইলে জলে পড়ে যেতেন। নৌকায় নামকীর্ত্তন শুরু করলো হৃদয়। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন ঠাকুর। মথুরমোহন শুধালেন : সারা নবদ্বীপ ঘুরলেন, অচঞ্চল ছিলেন সর্ব্বক্ষণ, সহসা এখানে এসে—

মাঝপথে স্বভাবসিদ্ধ হাসিভরা মুখে উত্তর দিলেন ঠাকুর : এটাই আসল নবদ্বীপ, গঙ্গাগর্ভে লীন বর্ত্তমানে। এটাই শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি আসল নবদ্বীপ ধাম। তাই এখানে এসে তাঁদের দর্শন পেলাম। ভাবাবেশ এসে গেল। মনের সন্দেহ ভঞ্জন হল, দেখিয়ে, বুঝিয়ে, দিলেন। সত্যই তিনি অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।....

এবার গেলেন কালনায়। শ্রীচৈতন্য পাদস্পর্শে তীর্থ-বিশেষের অন্যতম স্থান। বর্দ্ধমান রাজবংশের অষ্টাধিকশত শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। সাধু, ভগবান দাসবাবাজীকে দর্শন করাই ছিল তাঁর

মনোগত অভিপ্রায়। ইনি ছিলেন বৈষ্ণবকুল চুড়ামণি। আশিবছরেরও বেশী তাঁর বয়স। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভাগবভক্তির জন্য আবালবৃদ্ধ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। জপ-তপ-ধ্যান ধারণাদি করায় তাঁর পা'দুটি অবশ হয়ে পড়েছে তবুও হরিনামে তাঁর উৎসাহ কমেনি। ভগবৎ প্রেমে অশ্রু বর্ষণ ও আনন্দ, দিন দিন বেড়েই চলেছে। শ্রী চৈতন্যের প্রেম ধর্ম্ম-জ্ঞানের জীবন্ত প্রতীক তিনি। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠাকুর আনন্দ উপভোগ করলেন।.....

ফিরে এলেন ঠাকুর। তার কিছুদিন পরে মথুরমোহন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। শরীরের সন্ধিস্থল বিশেষে স্ফোটক। উঠতে বসতে অক্ষম। ঠাকুরকে দেখবার জন্য ব্যাকুল। সংবাদ দিল হৃদয়। উত্তরে বললেন ঠাকুর : আমি যেয়ে কি করবো? ফোড়া আরাম করে দেবার শক্তি আমার নেই।

অগত্যা লোক পাঠালেন মথুরমোহন। তাঁর কাতর প্রার্থনায় ঠাকুর জানবাজারে গেলেন। ঠাকুরকে দেখে মথুরমোহন খুব খুশী হলেন। অনেক কষ্টে উঠে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন। বললেন : বাবা! একটু পায়ের ধূলা দাও।

বললেন, পায়ের ধুলায় কি হবে? তোমার কি ফোড়ার আরামে সাহায্য করবে?

বেদনাক্লিষ্ট হাসি হাসলেন মথুরমোহন। তাঁর শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে আপনাকে কৃতজ্ঞান করলেন। চোখের দুকুল বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগলো।

বললেন ঠাকুর : মথুর, তুমি যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকবো।

আঁৎকে উঠলেন মথুরমোহন। তিনি জানতেন সাক্ষাৎ জগদম্বাই তাঁর শরীর অবলম্বনে তাঁকে, তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করছেন। বললেন, সেকি বাবা! আমার স্ত্রী ছেলে ও মেয়ে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে!

মথুরমোহনকে কাতর দেখে বললেন আচ্ছা, তোমার পত্নী, ছেলে যতদিন থাকবে ততদিন থাকবো!....

মথুরমোহন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসেন। পঞ্চবটী তলে বসে ঠাকুরের কাছে বসে নানা আধ্যাত্মিক আলোচনা শুনেন। একদিন সহসা জিজ্ঞাসা করলেন : কই বাবা তুমি যে বলেছিলে তোমার ভক্তগণ আসবে, তারা এখনওতো এলো না?

ঠাকুর বললেন : কি জানি বাবু! মা তাদের কবে আনবেন! তারা সব আসবে, মা নিজে আমাকে জানিয়েছেন! যা যা দেখিয়েছেন তা একে একে সত্য হয়েছে, এটি কেন সত্য হল না কে জানে? একমনে চিন্তা করতে লাগলেন। তবে কি দর্শনটা ভুল?

মথুরমোহন বুঝলেন : কথাটা পাড়া ঠিক হয়নি। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কথাটা ঘোরাতে চেষ্টা করলেন। তারা আসুক বা না আসুক আমি তো তোমার চিরানুগত ভক্ত রয়েছি, তোমার দর্শন, তাহলে সত্য হলনা কিরূপে? আমি একাই একশত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে।

ঠাকুর বললেনঃ কে জানে বাবু! তুমি যা বলচ তাই বা হবে!....

মথুরমোহন এ প্রসঙ্গ এড়ানোর চেষ্টা করলেন। বললেনঃ মার আরতির সময় হয়ে এলো—মন্দিরের দিকে যাবে না?

উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর— চলো.... মনের কোণে সেই সুর, কেন এলো না!....

১২৭৮ সাল। ঠাকুরের সঙ্গে মথুরমোহনের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক চোদ্দ বছর পূর্ণ হয়ে পনেরো বছরে পড়লো। বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল গত হ'ল আষাঢ়ের পোনেরো দিন। জ্বরে শয্যাগত হলেন মথুরমোহন। ক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে সাত-আটদিনে দাঁড়ালো বিকারে, রোধ হ'ল বাক্‌শক্তি।

ঠাকুর পূর্ব্বেই উপলব্ধি করেছিলেন, মা ভক্তকে স্নেহময় ক্রোড়ে তুলে নিচ্ছেন। ভক্তিব্রত তার উদ্‌যাপন সমাগত। হৃদয়কে প্রতিদিন পাঠালেন নিজে গেলেন না।

অন্তিমকাল উপস্থিত। মথুরমোহনকে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আজ হৃদয়কেও পাঠালেন না। উপস্থিত হ'ল অপরাহ্ন। গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন ঠাকুর। জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্তে দিব্যশরীরে ভক্তের পাশে উপস্থিত হলেন। বহুপুণ্যার্জ্জিত লোকে তাঁকে (মথুরমোহন) স্বয়ং আরূঢ় করালেন। দু'ঘণ্টা পরে ধ্যানভঙ্গ হ'ল। তখন পাঁচঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ডাকলেন হৃদয়কে। বললেন : শ্রীশ্রী জগদম্বার সখীরা মথুরমোহনকে দিব্যরথে চাপিয়ে : শ্রীশ্রীদেবীলোকে চলে গেল।....

চারবছর অতীত হতে চললো। সারদামণি ফিরে গেছেন জয়রামবাটীতে। পূর্ণতা লাভ করছেন ধীরে ধীরে। বিকাশোন্মুখী নবচেতনা উদ্বেলিত করছে তাঁর আচার আচরণকে। চঞ্চলতার ছাপ, চলনে, বলনে, কথনে। স্বামীর দিব্যসঙ্গ, নিঃস্বার্থ আদর, সেই যত্ন, ভালবাসায় যে লাভার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে দেহমনে, তাকে সংযত ও সংহত করে ধৈর্য্যালম্বনে প্রতীক্ষায় বসে আছেন: কখন পড়বে সেই ডাক..... প্রতীক্ষা সেই শুভদিনের ....

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যায়। শান্ত স্বভাবা, চিন্তাশীলা নীরব প্রেমিকা, স্থৈর্য্যচিত্তে প্রতীক্ষারতা জয়রামবাটীতে, আর মন, ঘুরে বেড়ায় দক্ষিণেশ্বরের আনাচে কানাচে।

চারদিকে কানাঘুষা : উন্মাদ তার স্বামী, পরণের কাপড়ে থাকেনা কোমরে। হরি, হরি, করে বেড়ায়। সমবয়স্কা মেয়েরা বলে, পাগলের স্ত্রী। কেউ করে করুণা, কেউ করে উপহাস,—

বেদনা অন্তরে, অশ্রু ঝরে পড়ে দুকুল বেয়ে, "সত্যই কি তিনি সেরূপ আর নেই? যদি বিধাতার নির্বন্ধে সত্যই হয়ে থাকে, তাহ'লে তার তো এখানে থাকা উচিত নয়। তাঁর পাশে থেকে, তাঁর সেবাতেই তো নিযুক্ত থাকার এই সময়। না-না-আর প্রতীক্ষা সম্ভব নয়। স্থির করে নিলেন : তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যেতেই হবে। মেটাতে হবে চক্ষু-কর্ণের বিরোধ!

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমা। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন। দূরসম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয়া চলেছেন গঙ্গাস্নানে, কলকাতায়। স্থির করলেন, সহযাত্রী হবেন তাঁদের। তাঁরা কিন্তু বাবা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে না জিজ্ঞাসা করে একাজে ব্রতী হবেন না স্থির করে নিলেন।

কথাটা উঠ্‌লো বাবার কানে। বুঝলেন, কেন কন্যা এখন কলকাতা গমনে অভিলাষিনী। স্থির করলেন, তিনিই নিয়ে যাবেন। বন্দোবস্ত করলেন শেষপর্য্যন্ত।

'হয় শিবিকা' 'নয় পায়ে হাঁটা' দুটি মাত্র উপায়। দীর্ঘপথ, তবুও স্থির হ'ল যাত্রা। সঙ্গিগণসহ সারদাকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন রামচন্দ্র। তাঁরা চলেছেন গুটিগুটি করে সামনের পথে এগিয়ে। কাটলো তিনদিন। দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন সারদামণি। চিন্তান্বিত রামচন্দ্র আশ্রয় নিলেন এক চটিতে।

জ্বরে বেহুঁশ। যন্ত্রণায় ছটপট করছেন। এমন সময় দেখলেন সারদামণি, একটি মেয়ে এসে পাশে বসলো। গায়ের রং কাল কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। ছিটকে পড়ছে সে রূপের আভা। গায়ে মাথায় তার ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে গেল তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে তুমি আসছ গা? উত্তরে বললো রমণী : আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সারদামণি : দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাবো, তাঁকে (স্বামীকে) দেখবো, তাঁর সেবা করবো, জ্বর হয়ে গেল আমার সে ভাগ্য আর হবে না! মেয়েটি বললো : সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি! ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে, সেখানে আটকে রেখেছি! উত্তরে বললেন সারদামণি— বটে? তুমি আমাদের কে হও গো? মেয়েটি বললো, আমি তোমার বোন হই। খুশীভরা কণ্ঠে বললেন

সারদামণি, বটে? তাই তুমি এসেছো!" গভীর ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলো! অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে জ্বর ছেড়ে গেল। খুশী হলেন রামচন্দ্র। নিরূপায় হয়ে পথে বসে থাকা অপেক্ষা, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। মেয়ের মত চাইলেন। রাত্রে স্বপ্নে দর্শনে উৎসাহিত হয়েছে মন, সবল হয়েছে দেহ। বাবার কথায় সায় দিলেন। সঙ্গীরা এগিয়ে গেছেন। চটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাবা আর মেয়ে। যাত্রা হল শুরু। পথে একটা শিবিকা পাওয়া গেল। জ্বর এলো, তবে বেশী নয়। নিজেকে তত দুর্ব্বল বোধ করলেন না। কাউকে স্বপ্নের 'কথা প্রকাশ করলেন না।

রাত তখন ন'টা। সারদামণি পৌঁছালেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর হঠাৎ তাঁকে রোগাক্রান্তা অবস্থায় পৌঁছতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বাড়তে পারে ভেবে নিজের ঘরে ভিন্নশয্যায় তাঁর শোবার ব্যবস্থা করলেন। বার বার দুঃখ প্রকাশ করলেন, এতদিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু আছে, তোমার যত্ন হবে?

ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে নিজেই সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করলেন। সুস্থ হলে মার কাছে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন নহবত ঘরে।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটলো। সংশয়, আশঙ্কা দূর হল। প্রত্যক্ষ করলেন : স্বামী তাঁর সেইরূপ। স্নেহ, মমতা, ভালাবাসার প্রতীক। ঠিক যেমনটি দেখেছিলেন কামারপুকুরে, ঠিক তেমনই আছেন। যা এতদিন শুনেছেন, তা শুধু রটনা কাল্পনিক কাহিনী!

স্থির করে নিলেন তাঁর কর্ত্তব্য। প্রাণের উল্লাসে নহবতে থেকে প্রাণের দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্ত হলেন। বাবা (রামচন্দ্র) মেয়ের আনন্দে খুশী হলেন। কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করে হৃষ্টচিত্তে নিজগ্রামে ফিরে গেলেন।....

সুস্থ হয়ে উঠলেন সারদামণি। রাতে নিজ শয্যায় শোবার অনুমোদন দিলেন। এবার শুরু সাধনালব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা। (স্মরণে আছে তোতাপুরীজীর উপদেশাবলী) সেই সঙ্গে চললো জীবনসঙ্গিনীকে যথার্থ সঙ্গিনী করার ব্যবস্থা (তাঁর মানসিক শিক্ষা-সাধন প্রণালীর ব্যবস্থা)।

কামারপুকুরে অবস্থানকালে পত্নীর আগমনে নিজ কর্ত্তব্য যাপনে যেরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন, সেরূপ কর্ম্মসাধনে ব্রতী হলেন ঠাকুর। একই শয্যার সঙ্গিনীকে স্নেহ, ভালবাসা ও মমতায় আপ্লুত করে, সুরু করলেন 'দীক্ষা' দান : "চাঁদমামা যেমন সকল শিশুর মামা; তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাকার অধিকার সকলের। যে ডাকবে, সেই তাঁর দর্শনে কৃতার্থ হবে। তুমিও ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে।"

ভালবেসে একান্ত আপনার করে নিলেন, সেইসঙ্গে দিলেন সেবার অধিকার। স্বামী ও স্ত্রী দুইবিন্দু জল মিশে গেল— সব একাকার। কারও পৃথক স্বত্ত্বা নেই, কেউ পৃথক নয়। এমনি গভীর ঘন ভালবাসা, দুটো মন মিশে গিয়ে স্থির, একবিন্দুতে। এক দৃষ্টি, এক আলো। তলিয়ে গেছে, 'আমি', ছায়ার কাল বিন্দু দুটো।

পদসেবা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন সারদামণি, আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?

উত্তরে বললেন ঠাকুর : যে মা মন্দিরে আছেন—তিনিই এই শরীরের জন্ম নিয়েছেন, সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন, তিনিই আমার এখন পদসেবা করছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীরূপ বলে, তোমাকে সকল সময়ে— সেইরূপেই দেখতে পাই।

"আনন্দময়ী" মনটা ভরে গেল সারদামণির। শয্যায় এলিয়ে দিলেন দেহ। ঘুমে অচেতন কয়েক মুহূর্ত পরে।

আর ঠাকুর! ... পাশে নিদ্রিতা স্ত্রী। আপন সাধনবিজ্ঞানের পরীক্ষা শুরু। চললো নিজের

মনের সংযম পরীক্ষা। বিচারে প্রবৃত্ত হলেন : মন! এর নাম স্ত্রী শরীর, লোকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলে জানে, এরজন্য সে লালায়িত সকল সময়। এ বস্তুতে বদ্ধ হলে, দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পড়, আর সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যাবে না। ভাবের ঘরে চুরি করোনা। পেটে মুখে আত্মগোপন না করে, সত্য করে বলো, তুমি কি চাও? এই দেহ, না ঈশ্বর? যদি চাও, গ্রহণ কর সম্মুখে তোমার— বলেই সে দেহ স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন ঠাকুর। মন সঙ্কুচিত হয়ে সমাধি পথে— বিলীন হয়ে গেল। সারা রাত্রি কেটে গেল, সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহন করলো না। ঈশ্বররের নাম কীর্ত্তন করে, বহু কষ্টে, চৈতন্য তাঁর সম্পাদন সম্ভব হ'ল পরদিন।

এইরূপে কাটতে লাগলো দিনের পর দিন। একাদিক্রমে তিনমাস হতে চললো। কি ঠাকুর, কি সারদামণির সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হল না।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের অৰ্দ্ধেকদিন অতীত হল। অমাবস্যা। ফলহারিনী কালিকাপূজার পূণ্য দিবস। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বিশেষ পর্ব্বের আয়োজন চলেছে। ঠাকুর শ্রীশ্রী জগদম্বার পূজার আয়োজন করলেন। মন্দিরে নয়, তাঁর গৃহে, গুপ্তভাবে। পূজার সময় দেবীকে বসানোর জন্য আলিম্পন ভূষিত একটি পীঠ পূজকের আসনের ডানদিকে স্থাপন করা হ'ল। সূর্য্য অস্ত গেল। আমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে সমাগত নিশি। হৃদয়, মন্দিরে দেবীর পূজা করবেন। ঠাকুরকে পূজার আয়োজনে সাহায্য করে মন্দিরে চলে গেল দীনু পূজারী। রাধাগোবিন্দজীর সেবা পূজা শেষ করে ঠাকুরকে সাহায্য করতে ফিরে এলেন। দেবীপূজার প্রস্তুতি শেষ হল প্রায় ন'টা। পূর্ব্বের নির্দেশ মত সারদামণি উপস্থিত হলেন। পূজায় বসলেন ঠাকুর।

পূজার দ্রব্যসকল সংশোধিত হয়ে পূর্ব্বকৃত্য সম্পাদিত হ'ল। আলিম্পনভূষিত পীঠে সারদামণিকে উপবেশনের ইঙ্গিত করলেন। পূজা দেখতে দেখতে অৰ্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হলেন সারদামণি। মন্ত্রমুগ্ধার মত পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের ডানদিকে উত্তরমুখো হয়ে বসলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চনে বারংবার যথাবিধানে অভিষিক্তা করলেন তাঁকে। তারপর প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন:

হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরী-মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। ইহার (সারদামণি) শরীর মনকে পবিত্র করে ইহাতে আবির্ভূতা হয়ে সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর।

তারপর মন্ত্রসকলে যথাবিধানে নাসপূর্ব্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন। ভোগ নিবেদন করলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য সারদামণি সমাধিস্থা হলেন। ঠাকুরও অৰ্দ্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হলেন।

নিশার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেল। সমাধিস্থপূজক সমাধিস্থা দেবী। উভয়ে আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাহ্যসংজ্ঞায় ফিরে এলেন ঠাকুর। আবার অৰ্দ্ধবাহ্য হয়ে দেবীকে আত্মনিবেদন করলেন। নিজের সাধনার ফল ও জপের মালা ইত্যাদি সকল কিছু শ্রীশ্রীদেবী-পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রণাম করলেন :

হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পন্নকারিনি, হে

শরণাদায়িনি ত্রিনয়নে শিব গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।'

পূজা শেষ হ'ল—মূর্ত্তিমতী বিদ্যারূপিনী মানবীর দেহবলম্বণে ঈশ্বরীয় উপাসনা। ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি। দেবমানবত্ব তাঁর সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করলো।

"ষোড়শী পূজার পর মাতাঠাকুরাণী (সারদামণি) পাঁচমাসকাল ঠাকুরের কাছে অবস্থান করলেন। দিনের বেলায় নহবত ঘরে বাস। শ্বাশুড়ীঠাকুরানী ও স্বামী সেবা, রাত্রে একই শয্যায় রাত্রি যাপন। দিনরাত ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম নেই, আবার কখনও কখনও নির্ব্বিকল্প সমাধি, নিস্পন্দ নীথর। স্তিমিত জীবিতের লক্ষণ।। কখন যে সমাধি হবে সে আশঙ্কায় সারারাত ঘুমোতে পারছেন না। একদিন বহুক্ষণ সমাধিস্থ হবার পরও সংজ্ঞা হচ্ছে না দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে হৃদয় ও অন্য সকলের ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তুললেন। হৃদয় বহুক্ষণ নামকীর্ত্তন করে সমাধি ভাঙাতে সমর্থ হ'ল। এর পরই ঠাকুর জননীর কাছে শ্রীমার শোবার ব্যবস্থা করলেন।....

শেষ হ'ল দ্বাদশ (বারো) বছরের সাধনা। শান্তভাবে শুরু হল অবস্থান। ধন, মান, নাম, যশ যাবতীয় ভোগাকাঙ্ক্ষার বিসর্জ্জন দিয়ে হৃদয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মার করাল মুখে আহুতি দিয়ে বিবিধ সাধন পথে নানাভাবে জগন্মাতাকে দেখবেন বলে নিজেকে নিঃশেষে অর্পণ করেছিলেন তাঁর (জগন্মাতার) শ্রীচরণে। প্রাণের আকুলতায় তাঁর দর্শন, সেই সাধন পথের পথপ্রদর্শক, বহু গুণী ও সাধক সমাগত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরিচিত হলেন বিবিধ শাস্ত্রের সঙ্গে। সেই পথ অনুসরণে সাক্ষাৎ পেলেন— মা জগদম্বার। চাক্ষুস করলেন তন্ত্রের চৌষট্টিটি সাধন পথ, বৈষ্ণবতন্ত্রের পাঁচটি ভাবাশ্রিত পথ। মিললো বৈদিক নির্গুণ নিরাকার রূপ দর্শন। নিলেন সন্ন্যাসব্রত। শেষ হল ইসলাম সাধনায়। এখানেই শেষ নয়— মন চায় প্রতিটি সাধনপথে সেই চিন্ময়ীরূপ দর্শন।

শম্ভুচরণ মল্লিক এলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো। তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হলেন ঠাকুর। মা জগদম্বা জানিয়ে দিলেন : মথুরমোহনের পর এবার সেবার ভার গ্রহণ করবেন শম্ভুচরণ।

এই শম্ভুচরণ একদিন শোনালেন বাইবেলের কথা। আকৃষ্ট হলেন ঠাকুর। শ্রীশ্রী ঈশার পূত চরিত্র আকর্ষণ করলো তাঁকে। জগদম্বাও উন্মুক্ত করে দিলেন সেই পথ।

কালীবাড়ীর দক্ষিণে ছিল একটি উদ্যানবাড়ী। তার মালিক ছিলেন যদুনাথ মল্লিক। ওঁর মা ও স্বয়ং যদুনাথবাবু ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। দক্ষিণেশ্বরে এলেই তাঁকে (ঠাকুরকে) তাঁরা উদ্যানবাটীতে নিয়ে যেতেন। বসাতেন তাঁর বৈঠকখানায়। ঠাকুর ও মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যেতেন। কর্ম্মচারীরা তাঁকে চিনতেন, মালিকের অনুপস্থিতিতেও বৈঠকখানা খুলে বসাতো, তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিত। ঘরটি নিপুণভাবে সাজানো। টাঙানো, নানা ছবি, নানা দৃশ্য। তার মধ্যে ছিল মাতৃক্রোড়ে শ্রীশ্রীঈশার শিশুমূর্ত্তি। একদিন একা বৈকালে বেড়াতে গেছেন সে উদ্যানে। মালিরা আদর যত্নকরে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। দৃষ্টি পড়লো সে মূর্ত্তির প্রতি। আকৃষ্ট হলেন। প্রতিভাত হল, যেন ঠিক বাল (গোপাল)। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন সেই ছবি। লক্ষ্য করলেন, মূর্ত্তিটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে। দেবজননীও সেই দেবশিশুর অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা জ্যোতিঃরশ্মি। আর সেই জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হচ্ছে তাঁর শরীরে। তাঁর মনের ভাব ও চিন্তাধারাও নিতে শুরু করছে, একটা নতুন রূপ।

জন্মগত সেই হিন্দু সংস্কার আর ভাবধারা, যেন লীন হয়ে যাচ্ছে সেই জ্যোতিঃতরঙ্গে। কাতর হয়ে উঠলেন ঠাকুর। চীৎকার করে উঠলেন: 'মা, আমাকে একি করছিস'!.... সে তরঙ্গের ঢেউ গ্রাস করলো তাঁর দেহ, মন, ভাব, চিন্তা.....

ভাসতে লাগলো শ্রীশ্রী ঈশার মূর্ত্তি। আকৃষ্ট করলো তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি। দেখতে লাগলেন : খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকদের। মাতৃক্রোড়ে দেবশিশু যীশু (ঈশা)। ভক্তিভরে তাঁরা (যাজকরা) জ্বালাচ্ছে ধূপ ও বাতি । ব্যাকুল অন্তরে নিবেদন করছেন অন্তরের প্রার্থনা।.....

ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। তন্ময় সেই ভাবে। মগ্ন সেই ধ্যানে। ভুলে গেলেন জগন্মাতাকে দর্শনের কথা।...

ডুবে রইলেন তিনদিন এই ভাব তরঙ্গে। ছেড়ে দিয়েছেন মন্দির, প্রাঙ্গণ, দেবীদর্শন। আশ্রয় পঞ্চবটীতল। হঠাৎ দেখলেন, অদৃষ্ট পূর্ব্ব এক সুদর্শন দেবমানব স্থির দৃষ্টে এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। দেহ বৈশিষ্ট্যে বিদেশীয়। বিশ্রান্ত নয়নযুগল, অপূর্ব্ব মুখের শোভা, নাকটা টিকল নয় একটু চাপা, সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নেই। সৌম্য সেই মূর্ত্তি। ভাবতে লাগলেন ইনি কে? ... মূর্ত্তিটি এগিয়ে আসছেন ধীরে ধীরে তাঁর দিকে। সহসা অন্তঃস্থল থেকে ধ্বনিত হল ঈশামসি — ইনিই সেই মাতৃক্রোড়ে ঈশা! জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য হৃদয়শোনিত দান ও অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করেছিলেন— সেই পরম যোগী, প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি।

সামনে এসে আলিঙ্গন করলেন ঠাকুরকে। লীন হয়ে গেলেন তাঁর দেহাঙ্গে। ভাবাবিষ্ট হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারালেন ঠাকুর। সেই দর্শনে, সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে অবস্থান করলেন বহুক্ষণ।

যতদিন ছিল সাধন ভজন, ততদিন সঙ্গী ছিলেন মথুরমোহন। সাধন শেষ, চলে গেলেন তিনি। এলেন পানিহাটিবাসী মণিমোহন সেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, অবিচল ছিল তাঁর ভক্তি, সকল সময়েই আসতেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি কিছুদিন সেবার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরই এলেন শম্ভুচরণ। এলো পরিচিতির অবসর। উপলব্ধি করলেন, ঈশার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যা ইহুদী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত ধারার নবরূপ, নব কলেবর। যে সব সাধক বা মহাপুরুষ স্বকীয় উপলব্ধিতে, রূপ দিয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, ঈশা নিজস্ব উপলব্ধিতে দিলেন নোতুন আলো। পরিবর্ত্তিত হলো শুধু পথের দিশা।

শুরু হল নোতুন অনুভূতি। যোগদৃষ্টি সহায়ে জানলেন, বুদ্ধদেব ছিলেন অন্যতম অবতার। তাঁর প্রবর্ত্তিত পথ আর বৈদিক জ্ঞানমার্গের পথ একই ধারা, কোন প্রভেদ নেই। তাই, তিনি এ দেশীয় শাস্ত্রে, বিশিষ্ট এক অবতার। অন্য দেবদেবীর মত তিনিও পূজ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা ত্রিমূর্ত্তি, শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ। এতীর্থে যাত্রার একান্ত ইচ্ছা থাকলেও জগদম্বার নির্দ্দেশে সে বাসনা, তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু মহাপ্রসাদ (জগন্নাথ দেবের শুকনো ভোগ) ও গঙ্গা জল ছিল একই বস্তু। তিনি বিষয়ী লোকদের সঙ্গে বহুক্ষণ থাকায় নিজেই মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল গ্রহণ করতেন। সমাগত ধর্ম্মান্বেষী বা ভক্তেরদলকে সর্ব্বদা পরামর্শ দিতেন!" বিষয় বাসনা বা ভোগ বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে হলে, নিয়মিত মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল পান করা উচিত।

মা জগদম্বা এবার দৃষ্টি ফেরালেন জৈনধর্ম্ম ও শিখ ধর্ম্ম তত্ত্বের দিকে। যোগ সহায়ে জানলেন ঠাকুর, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তি লাভ করার আগে লোককল্যাণ সাধন করার বাসনা জেগেছিল। তিনিই জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক তীর্থঙ্কর রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। এঁরা ধর্ম্মপ্রচারক। মানুষের মনে ধর্ম্মের উদ্দীপনা ও জ্ঞানার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশগুরু রূপে জন্ম নিয়ে শিখ জাতির মধ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন করে পরব্রহ্মে চিরকালের জন্য মিলিত হয়েছিলেন তিনি (রাজর্ষিজনক)।

ঠাকুরের ঘরের পাশে মহাবীর তীর্থঙ্করের প্রস্তর মূর্ত্তি ও শ্রীশ্রী ঈশার আলেখ্য ছিল। তিনি প্রতিদিন ধূপ ও ধুনা দান করতেন। পথে গুরু গোবিন্দ বা নানকের আলেখ্য দেখলে শ্রদ্ধা জানাতে কোন দিন ভুল করতেন না। এঁরা সকলেই ধর্ম্মপ্রচারক, ধর্ম্মগুরু, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র।

জগতে প্রচলিত সর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ব অবলম্বনে সাধন শেষ করে এবার তাঁরই নির্দ্দেশে (মা জগদম্বার) তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাব মুখে অবস্থান করতে লাগলেন। লোকের আনাগোনা শুরু হল। এর মধ্যে কৌতূহলী সম্প্রদায়, ধর্ম্মপিপাসু, বিষয়বুদ্ধি ও ভেদবিচারী নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম শুরু হল। এঁদের সঙ্গে কথা বলে, ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করে ক্লান্তিবোধ করতে লাগলেন। যাদের সঙ্গে আলাপ, আলোচনা করে তৃপ্তি পাবেন, মনের কথা খুলে বলতে পারবেন তারা কোথায়?

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। মা, যা বলেছেন, যা দেখিয়েছেন সবই তো সত্য! তবে তারা— যাদের মা দেখিয়ে দিয়েছেন, তারা কোথায়? কবে আসবে? আর যে প্রতীক্ষায় থাকা যায় না! বিচ্ছেদ বেদনায় উদ্বেলিত তাঁর হৃদয়।...

লোকের ভিড় বাড়ছে। কিন্তু আসল শ্রোতা? এদের আগ্রহ আছে, শোনেও কিন্তু গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। এরা বিষয়ী। ভোগের বাসনায়, কামনায়— অন্ধ; তারই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে সারাটা জীবন হাতড়ে মরে। এরা শুধু চায় —নিতে জানে, কিন্তু দিতে পারে না।....

এসব তাঁর ভাল লাগে না, এদের সঙ্গ বিষবৎ মনে হয়। প্রাণ তাঁর কাঁদে, তারা আসছে না কেন? কবে আসবে? যাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথায় প্রাণ জুড়াবেন, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলবেন, বোঝাবেন— তারা কোথায়? অন্তরের বোঝা যে লাঘব হচ্ছে না!

ব্যাকুলতা দিনের পর দিন বাড়ে। কাকে কি দেবেন, কাকে কি বলবেন, ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে ওঠেন। শুধু প্রতীক্ষা, দিনের পর দিন!..... সূর্য্য ওঠে, সন্ধ্যা নামে, একটা দিন বৃথা চলে গেল, হতাশায় ভেঙে পড়েন তিনি।.... ধৈর্য্যের বাঁধ ব্যাকুলতার স্রোতে ভাঙতে শুরু হল। মন্দিরে আরতি শুরু হল, কাঁসর ঘণ্টার রোল বয়ে চললো, ঠাকুর বাবুদের কুঠির ছাদে গিয়ে হৃদয়ের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন : তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয়রে! তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারছি না!

ব্যাকুলতায় ভরা সেই ক্রন্দনের রোল, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো সেদিন।.....

সুরু হল আগমন। একের পর এক। উৎসাহিত ঠাকুর। মায়ের দেখানো সেই সন্তানের দল আসছে, সত্যই তারা আসছে কিন্তু বড় দেরী করে, দিন যে বয়ে যাচ্ছে।....

সারদামণি প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁর আত্মভোলা দেবতার স্বরূপ। তাঁর সন্তান কামনা পূর্ণ হতে চলেছে সংসার পূর্ণতায় হয়ে উঠছে ভরপুর!.....

১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাস। কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। তার কিছুকাল পরে রামেশ্বর (ঠাকুরের সেজদাদা) জরাতিসার রোগে ইহলোক ত্যাগ করলেন। তিনি (ঠাকুর) জানতে পেরেছিলেন, এ যাত্রা— তাঁর (রামেশ্বরের) শেষ যাত্রা। দক্ষিণেশ্বরে আর ফিরতে হবে না। তাই তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন : 'বাড়ী যাচ্ছ যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শোবে না! তাহলে তোমার জীবনসংশয়'। কিছুদিন পরে খবর এলো তিনি (রামেশ্বর) পীড়িত। ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, নিষেধ মানে নি— প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়! তার সাতদিন পরেই খবর এলো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন ঠাকুর, তাঁর বৃদ্ধা মা বিষম আঘাত পাবেন।

মন্দিরে প্রবেশ করে জগদম্বার কাছে প্রার্থনা জানালেন : তাঁকে (মাকে) এই দুঃসংবাদ সহ্য করার ক্ষমতা দাও মা!....

মন্দির থেকে ফিরে এলেন মার কাছে। মনে তাঁর কত সংশয়। কিভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন? শুনেই হতজ্ঞান হবেন, নয়ত প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন। সজল নয়নে দুঃসংবাদ নিবেদন করলেন ঠাকুর।

চন্দ্রাদেবী স্থিরভাবে সব শুনলেন। দুঃখ প্রকাশে বললেন, সংসার অনিত্য। সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, শোক করা বৃথা। পুত্রকে শান্ত করতে উদ্যত হলেন তিনি।

আশ্বস্ত হলেন ঠাকুর। মা শুনেছেন তাঁর প্রার্থনা। তাঁর মনকে উচ্চগ্রামে তুলে রেখেছেন— শোক দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না। জগন্মাতাকে বার বার প্রণাম করে নিশ্চিন্ত হলেন।..

রামেশ্বরের মধ্যেও ছিল বংশগত আধ্যাত্মিকতার ধারা। ছিলেন উদার প্রকৃতির, ধর্ম্ম প্রাণ। সন্ন্যাসী ফকির সকলকেই সমভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সংসারে তাঁর কোনদিনই স্বচ্ছলতা ছিলনা, তবুও প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভাব দূর করার চেষ্টা করতেন। বাড়ীর আপত্তি উঠলে, শান্ত ও প্রশান্ত উত্তর ছিল, এসব জিনিষ কত আসবে, ভাবনা কি? সাধুর ব্যক্তিগত অভাব, দিয়ে দাও দেবার মালিক যিনি, তিনিই যোগাবেন।....

মৃত্যুকাল, পাঁচ সাতদিন আগে জানতে পেরেছিলেন। সেইমত দেহ সৎকার থেকে শ্রাদ্ধ ব্যবস্থার সব আয়োজন পূর্ণ করলেন। আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করলেন রাস্তার ধারে তাঁর এই নশ্বর দেহটা যেন দাহ করা হয়, সাধু লোকদের পদরজে তাঁর আত্মার সদগতি লাভ হবে।

১২৮০ সালের ২৮শে অগ্রহায়ন, নামলো সন্ধ্যা। নিশ্চিন্ত রামেশ্বর। শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ মনন শুরু করলেন। গভীর রাত্রি তখনও চলছে নাম সংকীর্ত্তন। সহসা জ্ঞান হারালেন তিনি— সে জ্ঞান আর ফিরলো না। দেহত্যাগ করলেন— কিন্তু তখনও দেবসেবার চিন্তা। দেহত্যাগী আত্মা, বাল্যবন্ধু গোপালের দ্বারে করাঘাত করে জানিয়ে গেলেন, গঙ্গাস্নানে চলেছি, রঘুবীর রইলেন, তাঁর সেবার ব্যবস্থায় ত্রুটি না হয়— লক্ষ্য রেখো!....

১২৮১ সাল বৈশাখ মাসে ফিরে এলেন সারদামণি। পূর্ব্বের মতই চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। খবরটা কানে উঠলো শম্ভুবাবুর। ঐ নহবত ঘরের ক্ষুদ্র বেষ্টনী, তাতে আবার দুজনের বাস অত্যন্ত কষ্টকর অনুমান করে নিলেন মনে মনে। মন্দিরের কাছাকাছি ২৫০ টাকায় কিছু জমি মৌরুশী করে নিলেন। প্রশস্ত একটি চালাঘর তৈরীর সঙ্কল্প করলেন। সেই সময়ে নেপালেরাজের কর্ম্মচারী কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন ঠাকুরের প্রতি। নেপালের রাজসরকারের কাঠের কারবারের ভার ছিল তাঁর ওপর। শালকাঠ তিনি দেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। বেলুড় গ্রামে কাঠেরগদি, তিনখানা শালের চকোর পাঠালেন। কিন্তু গঙ্গার প্রবল জোয়ার ভেসে গেল একখানা। হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে সারদামণিকে ভাগ্যহীনা বলে স্থির করলেন। বিশ্বনাথবাবু সে কথা শুনে আবার একখান চকোর পাঠালেন। ঘর তৈরী হয়ে গেল। সারদামণি সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। চন্দ্রাদেবী গঙ্গাতীরে বাস করাই শ্রেয় স্থির করে নহবত ঘরেই রয়ে গেলেন। ঘরের কাজে সাহায্য ও তাঁর কাছে সব সময়ে থাকার জন্য একজন রমনীকে নিযুক্ত করা হল। তিনি (সারদামণি) নিজের হাতে নানাবিধ খাবার তৈরী করে প্রতিদিন মন্দিরে এসে ঠাকুরকে দুপুরে খাইয়ে ফিরে যেতেন। ঠাকুরও দিনের বেলায় তাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকতেন, পরে ফিরে আসতেন মন্দিরে। চন্দ্রাদেবী জগদম্বার প্রসাদ গ্রহণ করেন, তবুও তাঁর কাছে থেকে কিছু সময় ব্যয় করেন সারদামণি।

১২৮১ সালের চৈত্রমাসের মাঝামাঝি ঠাকুরের মনে, ব্রাহ্মসমাজপতি শ্রীযুত কেশব সেন মশায়কে দেখবার বাসনা জাগলো। যোগারূঢ় অবস্থায় শ্রীশ্রী জগদম্বার নির্দ্দেশ পেলেন। তখন তিনি বেলঘরিয়ায় জয় গোপাল সেনের বাগানবাড়ীতে সশিষ্য সাধন ভজনে নিযুক্ত আছেন। হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে বেলা একটার সময় বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ী করে সেখানে পৌঁছলেন। পরণে তাঁর লাল কাপড়, কোঁচার খুট বা কাঁধের ওপর দিয়ে লম্বা পিঠে ঝুলানো। হৃদয় দেখলো,

কেশববাবু অনুচরবর্গের সঙ্গে বাগানের স্নানবাঁধানো ঘাটে বসে আছেন। এগিয়ে গিয়ে বললো : আমার মামা, হরিকথা ও হরি গুণগান শুনতে বড় ভালবাসেন। মাঝে মাঝে মহাভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আপনার নাম শুনে, আপনার মুখে ঈশ্বর গুণাকীর্ত্তন শুনতে এখানে এসেছেন। আদেশ পেলে, তাঁকে এখানে নিয়ে আসি। কেশববাবু সম্মতি প্রকাশ করলেন। হৃদয় গাড়ী থেকে নামিয়ে ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

কেশববাবু ও তাঁর দলবল তাঁকে দেখতে উদগ্রীব হলেন। কেশববাবু তাঁকে দেখেই বুঝলেন : ইনি সামান্য লোক নন!

ঠাকুর কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করে থাক। ঐ দর্শন কিরূপ জানার বাসনায় এখানে ছুটে এসেছি।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনাকালে ঠাকুর গান ধরলেন : কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন! রামপ্রসাদী গান। গাইতে গাইতে গভীর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

কেশববাবু তাঁর ভাবাবস্থা দেখে, আধ্যাত্মিক ভক্তির অবস্থা বলে ধারণা করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, এটা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকার প্রাপ্তি।

তাঁর (ঠাকুরের) বাহ্য চৈতন্য আনার জন্য হৃদয় তাঁর কানে প্রণব শুনাতে লাগলো। শুনতে শুনতে তাঁর মুখমণ্ডল মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত ঠাকুর, গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সরল ভাষায় বোঝাতে লাগলেন। সকলেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

স্নান, আহারের সময় অতীত হয়ে গেল, সে কথা কারও মনে উদয় হল না।

তাঁদের অবস্থা দেখে ঠাকুর বললেন, গরুর পালে অন্য পশু এলে গুঁতো মারে, কিন্তু গরু এলে গা চাটাচাটি করে। আজকে আমাদের অবস্থাও সেরূপ। সকলে সে কথা শুনে হাসাহাসি করতে লাগলো। বাস্তবিক এই পরিবেশ, তন্ময়তার পরিবেশ। সত্যই মুগ্ধকর।

আলোচনা বেশ চলছিল সহসা ঠাকুর কেশববাবুকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, তোমার ন্যাজ খসেছে!

অনুচরবর্গ এ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। ঠাকুর তাঁদের মুখের ভাবভঙ্গি অনুধাবন করে বুঝিয়ে বললেন, দেখ, ব্যাঙাচিরা জলে ততদিনই থাকে, যতদিন ল্যাজ থাকে। খসে গেলেই জল থেকে উঠে ড্যাঙায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়। মানুষেরও যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ থাকে, সংসার জালে জড়িয়ে থাকে, যেই ল্যাজ খসে যায়, তার চৈতন্য আসে। সংসার ও সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারে। কেশব, তোমার মনের রূপ এখন এমন। তুমি সংসারে থাকতে পার? সচ্চিদানন্দেও বিচরণ করতে পার।

নানা প্রসঙ্গ অনেকক্ষণ অতিবাহিতের পর ঠাকুর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।.....প্রথম দর্শনের পর কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। তিনি তাঁর দর্শন লাভে কৃতার্থ হবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর 'কমলকুটীর' বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করতে আরম্ভ করলেন। সম্বন্ধ, এমন নিবিড়ভাব ধারণ করলো যে, পরস্পর পরস্পরকে না দেখলে একটা অভাব বোধ করতে থাকেন। হয় ঠাকুর, তাঁর নিকটে উপস্থিত হতেন, না হয় তিনি (কেশব চন্দ্র) নিজে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হতে লাগলেন। এছাড়া প্রতিবৎসর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে, তাঁর সঙ্গে ঈশ্বর-প্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে, উৎসবের অঙ্গ বলে তিনি মেনে নিলেন। অনেক সময় জাহাজে করে সদলবলে কীর্ত্তন করতে করতে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। কখনও বা ঠাকুরকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে গঙ্গাবক্ষে তাঁর অমৃতময় উপদেশ শুনতে লাগলেন।— শাস্ত্রীয়-প্রথা অনুসরণ করে, ফল মূল তাঁর সামনে রেখে অনুগত শিষ্যের মত, তাঁর পদপ্রান্তে বসে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হতেন।

একদিন ঠাকুর তাঁকে রহস্য করে বললেন, কেশব এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল!

বিনীতভাবে উত্তরে বললেন : মশায় আমি কি কামারের দোকানে, সূচ বিক্রীর চেষ্টা করবো! আপনি বলুন আমি শুনি। আপনার মুখের দুচারটি কথা লোককে বলামাত্র, তারা মুগ্ধ হয়।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন : দেখ কেশব, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হয়। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সকল সময়ে অভেদভাবে উপস্থিত।

কেশবচন্দ্র এ কথা মেনে নিলেন।

ঠাকুর বললেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তির সম্বন্ধের ন্যায়— ভাগবত, ভক্ত ও ভগবানরূপ— তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান— তিনে এক— একে তিন।

স্বীকার করলেন কেশবচন্দ্র।

ঠাকুর তাঁকে বললেন : গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন —তোমাকে এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বিনয়নম্র বচনে তিনি বললেন, পূর্ব্বে যা বলেছেন তার অধিক এখন আর অগ্রসর হতে পারছিনা।

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বেশ, বেশ, এখন ঐ পর্য্যন্ত থাক।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় গঠিত কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও দীক্ষা। দিব্যসঙ্গলাভে, উপলব্ধিবোধ জাগ্রত হল জীবনে। বৈদিক ধর্ম্মের সার-রহস্য দিনদিন বুঝতে পেরে সাধনায় নিমগ্ন হলেন তিনি। ধর্ম্মমতও, পরিবর্ত্তিত হতে লাগলো দিনের পর দিন। তাঁর প্রবর্ত্তিত সাধন প্রণালীও পরিবর্ত্তন হতে সুরু হল ধীরে ধীরে।.....

একদিন অপরাহ্নে ঠাকুর তাঁর (সারদামণির) কুটিরে গেলেন। শুরু হল মুসলধারে বৃষ্টি। মন্দিরে ফিরে আসা সম্ভব হল না। রাত কাটাতে হল তাঁকে। সারদামণি ঝোলভাত রেঁধে খাওয়ালেন তাঁকে। এমনি ভাবে কাটলো একটি বছর। সহসা আক্রান্ত হলেন কঠিন আমাশয় রোগে। শম্ভুবাবু চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন, কোন সুরাহা হল না। রোগমুক্তির জন্যই তাঁকে যাত্রা করতে হল জয়রামবাটীতে। ১২৮২ সালের আশ্বিন মাস।

পিতা রামচন্দ্র কিছুদিন পূর্ব্বে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তাঁর মা ও ভাই সকলে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। রোগ ক্রমেই বেড়ে চললো। দেখা দিল জীবনহানির সম্ভাবনা। খবর এলো ঠাকুরের কাছে। চিন্তিত হলেন ঠাকুর। হৃদয়কে বললেন, তাইতো রে হৃদে! ও কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্য জন্মের কিছুই করা হবে না।

যখন কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, সারদামণি ঠিক করলেন, দেবীর কাছে হত্যা প্রদান করবেন। পাছে মা বা ভাইয়েরা বাধা দেন, গোপনে গ্রামের দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে প্রায়োপবেশন করলেন। কয়েক ঘণ্টা কাটলো। দেবী প্রসন্না হয়ে তাঁকে ওষুধ নির্দ্দেশ করে দিলেন। সে ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন সারদামণি। দেবীও জাগ্রতা বলে, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো আশে পাশের গ্রামে।

এসময়েই চন্দাদেবী ইহধাম ত্যাগ করলেন। ১২৮২ সাল। সেদিন ঠাকুরের জন্মদিন। বয়স তাঁর পঁচাশি। কিছুদিন থেকেই তাঁর ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি লোপ পেয়েছিল। হৃদয় ছুটি নিয়ে দেশে যাবে ঠিকঠাক, কিন্তু একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঠাকুরকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই ইচ্ছা হচ্ছিলনা। সব কথা শুনে ঠাকুর বললেন, তবে যেয়ে কাজ নেই। তিনদিন পার হয়ে চতুর্থ দিন পড়লো, শরীরে তাঁর কোন অসুস্থতার লক্ষণ নেই। ঠাকুর সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর

পূর্ব্ব জীবনের উল্লেখ ও গল্প করে তাঁকে খুশী করে রাত্রি দুটোর সময় নিজের ঘরে ফিরে এসে শয্যা গ্রহণ করলেন। সকাল হল। আটটা বেজে গেল দরজাটা না খোলায় কাজের লোক, কালীর মা, ডাকাডাকি সুরু করলো, কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় কান পেতে তাঁর গলার বিকৃত শব্দ শোনা গেল। হৃদয় ও ঠাকুরকে খবর দিল। হৃদয় কৌশল করে দরজা খুলে দেখলো, তাঁর জ্ঞান নেই। কবিরাজী ওষুধ তাঁর জিহ্বায় লাগানো হল, ফোঁটা ফোঁটা দুধ ও জল খাওয়ানো চললো। তিনদিন এইভাবে কাটালো। শেষ সময় উপস্থিত দেখে তাঁকে অন্তর্জলি করা হ'ল। ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী নিয়ে তাঁর পায়ে অঞ্জলি প্রদান করলেন। ঠাকুর সন্ন্যাসী। সুতরাং তাঁর নির্দ্দেশেই রামলাল (রামেশ্বরের পুত্র) তাঁর দেহ সৎকার করলেন। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধও শেষ হল। মনে তৃপ্তি পেলেন না। পুত্র হয়েও পুত্রোচিত কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হল না। ঠিক করলেন, তর্পণ করবেন কিন্তু জল অঞ্জলি ভরে তুলতেই অসাড় হয়ে গেল আঙ্গুলগুলো, সব জল পড়ে গেল। বারবার চেষ্টা করলেন, বার বারই ব্যর্থ হলেন। মনে পড়ে গেল এক পণ্ডিতের কথা, সন্ন্যাসীর এ কাজের অধিকার নেই।

ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হল। সারদাদেবী গায়ের বল ফিরে পেলেন। ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

শম্ভুচরণ চারবছর ঠাকুর ও মার সেবা করলেন। শয্যাশায়ী হলেন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে। ঠাকুর দেখতে গেলেন তাঁকে। ফিরে এলেন দুশ্চিন্তা নিয়ে। বললেন, শম্ভুর প্রদীপে তেল নেই।

পরম উদার, তেজস্বী ও ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন শম্ভু চরণ। তাঁর মনের প্রসন্নতা এতটুকুও নষ্ট হল না মৃত্যু যন্ত্রণায়। হৃষ্টচিত্তে বললেন, মরণে ভয় নেই, চিন্তা নেই, প্রস্তুত হয়ে বসে আছি, পুঁটলি পঁটলা বেঁধে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শম্ভুচরণ। যোগারূঢ় হলেন ঠাকুর। দ্বিতীয় রসদদার চলে গেল তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে।

১৩৮৫ সালের শেষ দিক। ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ, কেশবচন্দ্রর মেয়ের বিয়ে দিলেন কুচবিহারের রাজার সঙ্গে। দলে বিক্ষোভ দেখা দিল। ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। দলচ্ছুটেরা গড়লো সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। আর কেশবচন্দ্রের অনুগতরা নাম গ্রহণ করলো 'নববিধান'। বিবাদের কারণ ব্রাহ্মসমাজ বিয়ের বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল। তার পূর্ব্বে কেউ বিবাহ দিতে পারবে না। হিন্দু সমাজের বালবিবাহের ক্রটি মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই বয়স বাড়িয়ে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল চোদ্দবছর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কেশবচন্দ্রের ওপর, সমাজের ভার অর্পণ করে হিমালয় ভ্রমণে যাত্রা করেছিলেন। সুতরাং পরিচালনার দায় দায়িত্ব ছিল কেশবচন্দ্রের উপর। সেই কেশবচন্দ্রই নিজ মেয়ের বিয়ে দিলেন চোদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। বিক্ষোভের শুরু এইখানেই। আঘাত পেলেন কেশবচন্দ্র।

ঠাকুর সমস্ত শুনলেন। বললেন জন্ম, মৃত্যু বিবাহ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। তাকে নিয়মবদ্ধ করা চলে না। কেশব কেন এ নিয়ম করতে গিয়েছিল? অথচ কেউ যদি কেশবচন্দ্রের নিন্দা কবতো, বলতেন, কেশব কি নিন্দনীয় কাজ করেছে? সে সংসারী। নিজের পুত্রকন্যার যাতে কল্যাণ হয়, তা করবে না? পিতার কর্ত্তব্য পালন করেছে, ধর্ম্মে হানি হল কোথায়? নিন্দারই বা কি আছে?

এতে আঘাত পেলেন কেশবচন্দ্র, বুঝলেন, সংসারে বাস করে, ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব ধ্যান বা ধারণ, সম্ভব নয়। আঘাতই মানুষকে সে পথের সন্ধান দেয়। কেশবচন্দ্রও সে পথের সন্ধান পেলেন। আপনাতে, আপনাকে ডুবিয়ে, আত্মপোলব্ধির পথে অগ্রসর হলেন।

পাশ্চাত্য-বিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ, ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও সামাজিক রীতি নীতিকে ভেঙে চুরে নোতুন ভাবধারায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষীগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধর্ম্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। ঠাকুরের নিজ জীবন, ভারতের সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমূহের সাধনা সমাপ্ত করে, বুঝিয়ে দিলেন, ধর্ম্ম ভারতের অবনতির কারণ নয়। সন্ধান করতে হবে অন্যত্র। দেখিয়ে দিলেন : এই ধর্ম্মের ওপর ভিত্তি করেই, ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রাচীনকাল থেকেই তাকে শুধু গৌরবমণ্ডিত করেনি, আত্মিক-যোগে, তাকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। আর সেটাই, তার শুরু থেকে, আজ পর্যন্ত তা সর্ব্ব-ভারতীয়-ঐতিহ্য ও সর্ব্বজনীন গ্রাহ্য বস্তুতে পরিণত। এই ধর্ম্মই তার জীবনী শক্তি। সেই সূত্র ধরেই আসবে এই দেশের জাতীয় জীবনের মুক্তি। সৃষ্টি হবে জাতীয় শক্তির শ্রীবৃদ্ধি, হবে নব-চেতনার জন্ম। সিদ্ধিলাভ হবে, সিদ্ধকামে জয়ী হবে, স্বীকার করে নেবে আমাদের দেহ, মন, আমাদেরই ঐতিহ্য।

কেশবচন্দ্র পেলেন পথের সন্ধান। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও দীক্ষা, যে ভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে স্রোতে ভেসে হয়েছিলেন বাগ্মী, সেই তিনি সিক্ত আজ শ্রীঠাকুরের স্নেহ ভালবাসায়। প্রত্যক্ষ করলেন, তিনি জীবন্ত-জ্ঞান, জীবন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি। নিজ আবাসে নিয়ে গিয়ে, দেখালেন, শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজকল্যাণ চিন্তা ও তাঁর সাধনার পীঠস্থান। শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করলেন পুষ্পাঞ্জলি। জয়, বিধানের জয় বলে, করলেন প্রণাম। কিন্তু বিসর্জ্জন দিলেন না স্বকীয় স্বাধীন স্বত্তা। নিজবুদ্ধি সহায়ে গ্রহণ করলেন সারভাগ, আখ্যা দিলেন নববিধান। প্রচার করলেন সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বিত আংশিক মতামত। যত মত, তত পথ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন না।....

যখন কোন যুগ-মানব আসেন এ পৃথিবীতে, তাঁরা রেখে যান তিনরকমের বাণী। বিধিমূলক বাণী, যা অবলম্বন ও প্রতিপালন করলে হিতসাধন হয় মানুষের মনের, মানুষের জীবন ও সমাজের। দ্বিতীয় বাণী হল নিষেধমূলক বাণী, যা সমাজের প্রচলিত রীতির বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা, নিম্নগামী করে মানুষের মন। তার জন্য, তাঁরা রেখে যান উপদেশাবলী, উপাখ্যান, রূপকথা, যা মনকে আকৃষ্ট করে, চলার পথকে সরল ও সহজ পথে পরিচালিত করে। নিম্নগামী চিন্তাধারায় যা পরবর্ত্তী কালে পরিবর্ত্তন আনতে সমর্থ হয়। এই যে দুটি ধারা, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর আবর্ত্তে গলিত ও পচিত হয়ে ভিন্ন ধারামুখী হয়ে ওঠে। তখনই দেখা দেয় বিশৃঙ্খলতা, দেখা দেয় স্বার্থ গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। তখনই কলুষিত হয় মনের চিন্তাধারা ও পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজ ও সংসারের বাঁধন ও অনুশাসন শিথিল হয়ে পড়ে। সেই সুশৃঙ্খল রূপ বিকৃত হয়ে মানুষের জীবনধারাকে কুসংস্কারের বাঁধনে সঙ্কীর্ণ ও পথভ্রষ্ট করে তুলে। আর যে বাণী তাঁরা রেখে যান, তা শাশ্বত ও সার্ব্বভৌম. যা অনুত্তর, সম্যকসম্বোধিত। বিধি ও নিষেধমূলক বাণী, কালক্রমে লুপ্ত হলেও শেষের নিত্য ও বিশ্বব্যাপী বাণীই হয় চিরস্থায়ী ও কালজয়ী। এই বাণী সকল জায়গায়, সকল দেশ ও সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রযোজ্য।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে সামাজিক পরিবেশ, সংশোধনের জন্য যে বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন বুদ্ধদেব, কালক্রমে তাও গণ্ডীবদ্ধ হয়ে বিকৃত রূপ নিয়েছিল। আবার ইহুদী ধর্ম্মের বিকৃত রূপ সংশোধন করে যীশুখৃষ্ট যে বাণী প্রবর্ত্তন করেছিলেন, পরে মহাত্মা 'পল' স্থবির ও সংকীর্ণ ইহুদী সমাজ ত্যাগ করে গ্রীক ও রোমান সমাজের আচার পদ্ধতি অনুসারে উদারভাব প্রচারের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মকে নোতুন রূপদান করে গেলেন। ভারতের জীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও স্বার্থান্বেষীর পাপ-চক্রের দৃঢ় আবেষ্টনীর মধ্যে কুসংস্কারে আবদ্ধ হল, পাঠান ও মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে, আত্মরক্ষার প্রাচীর তুলে, সেই আবর্ত্তে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেল প্রাচীন ভারতীয় ধারা, তার সংস্কৃতির রূপরেখা, সামাজিক বিধিনিষেধের, গণ্ডীতে বদ্ধ হল। তাদের মন, তাদের চিন্তাধারা,

অস্পষ্টতায় ঝাপসা হয়ে ধর্ম্ম অনুশাসনে রূপান্তরিত হল। জীবনের স্বচ্ছরূপ, বিকৃতির ছায়াপটে নিজেকে আবদ্ধ করে গতিপথের খেই হারিয়ে ফেললো। ফলে ধর্ম্ম, প্রাণের সেই সহজাত স্ফুরণে বঞ্চিত হয়ে সামাজিক রীতিনীতির অনুশাসনে নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে বসলো।

পাঠান সাম্রাজ্যের পতন, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তার দাপট, আর ধর্ম্ম, তার সামাজিক বিকাশ, যেমন আকৃষ্ট করলো স্বার্থান্বেষীদের, তেমনি সৃষ্টি করলো এক একটা পৃথক গোষ্ঠীর। পরস্পর দ্বন্দ্ব ও হানাহানিতে হীনবল হল তারা। গোলামীই রূপান্তরিত হল নবাবীতে। ভ্রষ্ট হল আধ্যাত্মিক চেতনা, ভোগ আর সুখের তৃষ্ণায় অন্ধ হল তারা।... পতন হল মুঘল সাম্রাজ্যের, এলো বণিক সভ্যতা। এলো যাজক-সম্প্রদায়, পত্তন হল বণিক সাম্রাজ্যের।... এলো তাদের শিক্ষা, তাদের দীক্ষা, তাদের ধর্ম্মীয় ভাবধারা।... পত্তন হল নব যুগচেতনার।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত উদার প্রেম, ধর্ম্মে রূপান্তরিত হল। নেড়া নেড়ীর আখড়ার নোতুন সভ্যতা কেন্দ্রীভূত হল ভৈরবীচক্রে। পরে এলো শচীমা ভজা— নবরূপে নব আখ্যায়। একদিকে পাদরীদের অপপ্রচার, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষা, দীক্ষার, নকল নবীন বেশ, ভারতীয় আধ্যাত্মের ভাবধারা, সে স্রোতের আবর্ত্তে আশ্রয় নিল 'ভাতের হাড়ির' গণ্ডীতে। চারদিকে শুধু গেল... গেল... রব। প্রকট হয়ে দাঁড়ালো, জাত আর পাত। কে ব্রাহ্মণ, আর কে শূদ্র, কে ম্লেচ্ছ আর কে যবন, শুধু ঘৃণা আর নিন্দাবাদ। দেখা দিল শিক্ষিত মহলে মদ খাওয়ার প্রচলন। লড়াই পুলিশ আর মিউনিসিপ্যাল জুরিশডিকশন অর্থাৎ শনি, রবিবারে মাতালের লড়াই। কদর্য্য ও অশ্লীল গান হাসিমুখে, সে সব শ্রবণ ও গলধঃকরণ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, জালিয়াতি, বিধবাকে ঠকানো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ালো। লোকঠকানো, জাল করা হল বাহাদুরীর সাক্ষ্য।.... মেয়েদের আট থেকে নয়, ছেলেদের ষোল থেকে সতেরো বিয়ের বয়স ধার্য্য হল, নইলে জাত যাওয়ার প্রশ্ন। বিধবা হলে সহমরণ .. স্বেচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রশ্ন অবান্তর! মেয়েদের পালকি ছাড়া বাহির নিষেধ, গঙ্গার জলে পালকী ধরে বেতের ছাউনির ভেতর দিয়ে যে জলে ঢোকে তাতেই স্নান। বংশ, জাত, নিমন্ত্রণ, আহার সর্ব্বত্রই একটা ঘোরতর সমস্যা।...

ভাগবত গ্রন্থ, হাতে লেখা পুঁথি, চিমটা দিয়ে পাতা উল্টানো, পরেই হাত ধোয়া, ইষ্ট নাম জপ, গোঁসাই এর সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের এক পঙক্তিতে আহার নিষেধ, শ্রাদ্ধবাড়ীতে গোঁসাইয়ের সঙ্গে এক আসনে বসার অধিকার হরণ, এমনি আরও কত কি। তার চেয়েও গোঁড়ামির পরিচয় বৈষ্ণবেরা মাদুর্গাকে হাতিমূখোর মা, বেলপাতাকে তেরকা পাতা, মাকালীকে 'মসী' ইত্যাদি ইত্যাদি...

যাঁরা সভ্য, তাঁরা ইংরাজী ও বাংলা মিশিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতেন। যাঁরা শুধু বাংলায় কথা বলেন, তাঁরা হলেন অসভ্য। 'প্রণাম' কুসংস্কার, 'গুডমর্ণিং'—সাদর সম্ভাষণ। তর্জ্জনী কপালে ঠেকানো সভ্যতার পরিচয়। শ্রাদ্ধ— কুসংস্কার, দেবদেবীর পূজা বা তাদের কথা শুনা, ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয়। কালী পূজা, ভৈরবী চক্র— একে বর্জ্জন কর। সরস্বতী আর কার্ত্তিক বেশ্যাপল্লীর পূজা, পূজা মানে পুতুল পূজা অবিবেক মনের পরিচয়। কথকতা, পালা গান, শুনতেন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। প্রচলিত যাত্রা, কথকের কথা— অবিশ্বাস্য রূপক গাঁথা মাত্র। হিন্দুদের ধর্ম্ম, সমাজব্যবস্থা, কুৎসার বস্তু। গঙ্গাস্নান, তেল মাখা, দাড়ি কামানো যা কিছু হিন্দুর আচার বা আচরণ (আধুনিক সমাজে) সবই ভুলে ভরা। তার সব কিছু— ভুল আর গোঁড়ামিতে ঢাকা। ইংরাজ পাদরী বা সহকারী এদেশীয় পাদরীর দল, হাটে বাজারে ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রচার চালাতেন। হিন্দু ধর্ম যে কি বস্তু, তা অনেকেই বুঝতো না, পড়াশুনাও করতো না। টোলের পণ্ডিত, সমাজের কচকচানি ছাড়া তখন কোন সাহায্য পাওয়াও সম্ভবও ছিল না। সুতরাং পাদরীদের বক্তব্যের উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। তার ওপর ছিল তারা গোরা, জগতে সুসভ্য জাতিরূপে পরিচিত এ সমাজসংসারে। উত্তর দেওয়া মানে হাঙ্গামা, প্রতিরোধ শক্তি বা সাহস ছিলনা কারও।

নরেন্দ্রনাথ ছিল শিমলার ডানপিটে ছেলে। বয়স অল্প, ধী শক্তি সম্পন্ন, নাম করা ধনী আইনজীবি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে। কাশীর বীরেশ্বরের পূজা করে, তার মা, তাকে কোলে পেয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন বীরেশ্বর, ডাক নাম ছিল বিলে। যেমন সাহসী তেমনি শক্তিশালী। পাড়ার যুবসমাজের সর্দার, সবাই তার অনুগত। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করে, দেখতে শুনতে সুন্দর, পাঠে মনোযোগী। সর্ব্বত্র তার বিচরণ। শবদাহকে সৎকাজ বলে মনে করে। হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ তখন দুষ্প্রাপ্য ছিল কিন্তু হার্বাট স্পেনশর, স্টুআর্ট, মিলে, হ্যামিলট, জন লক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র পাঠ ও যুক্তি তার কণ্ঠস্থ। তর্কে পারদর্শী। ভাল ধ্রুপদ-গান গাইতে পারে। সুতরাং পাদরীদের সেই কুৎসার প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হল না। একদিন হেদোর পাশে রীতিমত নাটক জমে উঠলো। দুই পক্ষই তৈরী কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ বেশীদূর এগোলোনা, সংযত হয়ে গেল উভয়পক্ষ।

কলকাতার যখন এরূপ অবস্থা, সেই সময়ে কেশববাবু (সেন) সারা দেশটা যাতে খ্রীষ্টান না হয়ে যায়, তার প্রচার চালাতে শুরু করলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের মাঝামাঝি একটা সেতু তৈরীর চেষ্টায় পাদরীদের মত সভা ও বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। প্রথমে ইংরাজী, পরে বাংলা। যেমন তাঁর লাবণ্য ও মাধুর্যভরা চেহারা তেমনি সুন্দর তাঁর মুখ। যেমন চোখের চাহনী ও মুখভঙ্গী, তেমনি ভক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস ও ওজস্বিতাপূর্ণ বাক্যবিন্যাস। তিনি যীশুকে ওরিয়েন্টাল খ্রীষ্ট, প্রাচ্য দেশীয় যীশু ও তপস্বী যীশু, করে বক্তৃতায়— তাঁর বক্তব্যের রূপ দিলেন। বিলিতি হ্যাট কোট ত্যাগ করে দেশী যীশু হও। যীশু বিহীন যীশুর ধর্ম্ম মানো। হিন্দুধর্ম্মের বিগ্রহ ত্যাগ করে, ভক্তির পথ অবলম্বন কর। কিছু পরিমাণ আচরণে খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে, কিছু পরিমাণ হিন্দু ধর্ম্মের আচার পদ্ধতি মিশিয়ে সৃষ্ট হল ব্রাহ্মধর্ম্ম। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে সে দলে যোগ দিতে সুরু করলো। এঁদের অনেকেরই নিরাকার ব্রহ্ম যে কি বস্তু, সে জ্ঞান ছিল না বা ঠাকুর দেবতার প্রতি আকর্ষণ বা শ্রদ্ধাও ছিল না।

এক নবভাব জাগ্রত করলেন কেশববাবু। নাম দিলেন 'ব্যাণ্ড অফ হোপ'। তারা মদ খাবে না, তামাক খাবে না। নরেন্দ্রনাথ এই দলে যোগ দিলেন।....'নব বৃন্দাবন' নামে নাটক লিখলেন। অভিনয় হল। পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় নামলেন নরেন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগরমশায় চালু করলেন বিধবা বিবাহ। অসবর্ণ বিয়ের প্রচলন করলেন কেশববাবু। মেয়েদের বিদ্যালয়ও স্থাপন করলেন। পাদরীরাও দু'একটা মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করলো। এই সময়ে গৌরগৌবিন্দ রায় তাঁকে (কেশববাবুকে) সাহায্য করতে লাগলেন। সুন্দর ভাগবতের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সাধু অঘোরনাথ সহকারী হলেন। দলে যোগদান করলেন, প্রতাপ মজুমদার, বিজয় গোস্বামী, উমেশ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী। যোগাযোগ হল ঠাকুরের সঙ্গে।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু হ'ল। এলেন কেশবচন্দ্র, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রমুখ। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা সহরে। সুর হল নানা ভক্তের সমাগম। ঠাকুর ও ভক্তদের বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করলেন। প্রথমে ছিল অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব, 'মিরগি ব্যামোয় ভোগে, কি আর দেখবো'? কেশববাবু যখন বললেন, লোকটি ভাল, তখনই মানুষের মনে আগ্রহ জাগলো 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস' সম্বন্ধে। ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্রের মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে ভাঙালো ব্রাহ্মসমাজ। পত্তন হল— 'নববিধান' ও 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন চট্টোপাধ্যায়, উমেশ দত্ত যোগ দিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। কেশব চন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের যোগাযোগ ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। উভয়ের উভয়কে ছাড়া প্রায় চলে না। দু'চার দিনের অসাক্ষাতে কেশবচন্দ্র পাড়ি দেন দক্ষিণেশ্বরে। কোনদিন বা ঠাকুর ছোটেন কেশববাবুর আলয়ে।

যুবসম্প্রদায়ের আকর্ষণ ব্রাহ্মসমাজ। বিশেষ করে নরেন জড়িত উভয় সমাজে। তবে বাড়ীর কাছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। সেখানেই ডাক পড়ে বেশী। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায়ই নরেনের বাড়ীতে

আসেন। মেজভাই মহেন্দ্রনাথকে বলে যান : নরেন যেন সমাজে যায়! উপলক্ষ্য তার ধ্রুপদ সঙ্গীত। কণ্ঠস্বর ভাল। গায়ও দরদ দিয়ে ব্রাহ্ম সঙ্গীত। শরৎ, তারকনাথ, প্রমুখ সবাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনুরক্ত। সকলেরই আনাগোনা ব্রাহ্মসমাজে। তারকনাথ তো সব সময়েই ব্রাহ্ম সঙ্গীত গাইতে ভালোবাসতো!

কেশববাবুর বক্তৃতা থেকে সবাই জানতে পেরেছিল, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন। খুব উচ্চ অবস্থার লোক, অতি সাধু, অমায়িক, বালক স্বভাব, এঁর ট্রান্স (Trance) হয়, যীশুর যেমন হত। 'ট্রান্স' কথাটা নোতুন, মানেও জানা ছিল না— লোক-মুখে শোনা যায় মিরগি রুগী তবে হাত পা খেঁচাখেঁচি করে না, ডাক্তার ডাকতে হয় না। রানী রাসমনীর পুজারী, কালীপূজা করে। তার নাম পরমহংস সে আবার কি!...... অনেকে ব্যঙ্গ করতো, হাসাহাসি করতোঃ পরমহংস গ্রেট গূস (Great Goose) .... চোখে মুখে তাদের কতটা অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধার ভাব..! ... তাকে কেশববাবু বলছেন লোকটি ভাল, কে জানে বাবা!....

১৮৮১ সাল। রামচন্দ্র দত্ত থাকতেন শিমলা ১১ নং মধুরায় লেন-এ। আগে বাড়ী ছিল নারিকেলডাঙ্গায় (কলকাতার পূর্ব্ব প্রান্তে)। সে বাড়ী নষ্ট হয়ে যায়। ছোট বয়সে মাতৃহারা। বাবা নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত ছিলেন ভুবনেশ্বরীর (নরেনের মা) সম্পর্কে দাদামশাই। মাতৃহীন ছেলেটিকে বিশ্বনাথ (নরেনের বাবা)ও ভুবনেশ্বরী নিজের ছেলের মত মানুষ করেন। ডাক্তারী পাশ করান ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে (বর্ত্তমান এন. আর. এস মেডিকেল কলেজ)। বাংলা সরকারের রসায়নিক পরীক্ষকের প্রধান সহকারী ছিলেন। নিজ অধ্যবসায়ে, প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতাও। দয়া ও পরোপকারে ব্রতী। পাড়ায় তিনি 'রামদাদা', বাড়ীরও। কলেরায় সাতদিনের ব্যবধানে মারা গেল বড় মেয়ে ও দুটি ভাগনী। অধীর ও চঞ্চল হয়ে পড়লেন। কোথাও শান্তি পেলেন না। কেশববাবুর মুখে পরমহংসের কথা শুনেছিলেন। ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে যাওয়া তাঁর এই প্রথম। শান্তি পেলেন তিনি। ফিরে পেলেন কাজ করার ক্ষমতা।

পাড়ায় তিনি 'রামডাক্তার'। হামাশা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত। পাড়ায় রটে গেল, ডাক্তারের এক গুরু হয়েছে— কৈবর্তের পূজারী, থাকে দক্ষিণেশ্বরে। গুরু বৈষ্ণববংশীয়, পিতামহ, কুঞ্জবিহারী গোঁসাই, যাঁর বহুশিষ্য ছিল। সেই কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে, অজানা এক কালী উপাসকের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। অসন্তুষ্ট অনেকেই। বিদ্রূপও করলো অনেকেই, একি ঢঙ। পরমহংসই বা কি?...

রবিবারে অবসর। ছুটেন দক্ষিণেশ্বরে। সমবয়সী বন্ধু ও পাড়ার লোক সুরেশ (পাড়ায় সুরেশ বলে পরিচিত ঠাকুরও সুরেশ বলে ডাকতেন, আসল নাম সুরেন্দ্রনাথ) মিত্রিকে বলেন সে সব কথা। সওদাগরী অফিসের বড় কর্ম্মচারী। বিশ্বনাথ দত্তের লাগোয়া বাড়ী। তিন নম্বর। ছিলেন শাক্ত। বিডন বাগানে (গার্ডেন) কেশবধবাবুর বক্তৃতায় খোল বাজিয়ে নাম কীর্ত্তনের সময়— ছুরি দিয়ে খোলের চামড়া কেটে দিয়েছিলেন এমনই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক তিনি। রামডাক্তারের কথা শুনে উপহাস করে উঠলেন, তোমার গুরু পরমহংস যদি আমার কথার উত্তর দিতে পারে, ভাল। নইলে তার কান মুলে দেবো। এই সর্ত্তে যদি রাজী হও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজী।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে সুরেশ (সুরেন্দ্র) মিত্রি শুধু আকৃষ্ট হলেন না, হারিয়ে ফেললেন নিজেকে। অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন কয়েক দিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে একদিন সুরেশ (সুরেন্দ্র) ঠাকুরকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। ঘরোয়া ছোট, খাটো উৎসবের আয়োজন করলেন। ভজন ভাল গায় নরেন। তাকে ধরে আনলেন সুরেশবাবু (সুরেন্দ্র) ১২৮৮, সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগ। ইংরাজী ১৮৮১ নভেম্বর মাস। এফ এ পরীক্ষার জন্য তৈবী হচ্ছে নরেন। দেখেই আকৃষ্ট হলেন ঠাকুর। গান শুনে, তার পরিচয় পেয়ে, রাম ডাক্তারকে তাঁর সঙ্গে একদিন দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। গান শেষ হলে, কাছে ডেকে অঙ্গ লক্ষণ লক্ষ্য করে, দু'চারটি

কথা বলে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন তাকে। রামডাক্তারের দক্ষিণেশ্বর যাওয়া আসা চলছে সমানভাবে। লোকের কথা কান দেবার লোক তিনি নন। [২]এফ. এ পরীক্ষার পর, বাবা বিশ্বনাথ নরেনের বিয়ের তোড়জোড় শুরু করলেন। প্রস্তুতি পর্ব্ব প্রায় শেষ, কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালো নরেন। বিয়ে করবে না সন্ন্যাসী হবে, ঠাকুরদার মত। ঠিক সেই সময়েই একদিন নরেন্দ্রনাথকে বললেন : বিলে, তুই তো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াস, দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন, দেখতে যাবি? চল...।

নরেন্দ্রনাথের কানেও এসেছে অনেক কথা। উত্তরে বললো, সেটা তো মুক্খু, কী সে পেয়েছে, যে তার কাছে নোতুন কথা শুনতে যাবো আমি? স্পেনসার, মিল, হ্যামিল্টন, জন লক সকলের দর্শনশাস্ত্র পড়লুম কিছুই বুঝি না, আর একটা আকাট মুক্খু, কালীর পূজারী, কৈবর্ত্তদের বামুন, তার কাছে শিখতে যাবো? কি জানে? কী জেনেছে যে আমাকে শেখাতে পারে?

দমবার পাত্র নন রাম ডাক্তার। এই বাড়ীতেই মানুষ, নরেন তাঁর আপনজন, ছোট ভাই, বললেন, চল না... চল!

রামদাদা! বাড়ীর বড়ছেলে, রাজী হল নরেন্দ্রনাথ। বললো, হ্যাঁ যেতে পারি যদি সে রসগোল্লা খাওয়াতে পারে। নইলে কান মুলে দেবো, অকাট মুকখুকে সিধে করে দেবো।

"কান মুলে দেবো" কথাটার প্রচলন ছিল উপেক্ষা বা অবজ্ঞাভাব প্রকাশের রীতি।....

শেষ পর্যন্ত কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যেতে হল সুরেন্দ্রনাথ-সহ রামদাদার সাথে তাঁরই গাড়ী করে।

গঙ্গার দিকের দরদা দিয়ে ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন রাম ডাক্তার ও সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে নরেন ও তাঁর বন্ধুবর্গ। মাদুর পাতা ছিল বসলেন সকলে। ঠাকুর লক্ষ্য করলেন বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কত! গাইতে বললেন, গান।

নরেন গাইল ব্রাহ্ম সঙ্গীত 'মন চল নিজ নিকেতনে'... প্রাণমন ঢেলে গাইছে গান। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। গান শেষ হল। সহসা তার হাত ধরে উত্তরে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। শীতকাল, ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা থামের পাশগুলো। ঘর থেকে বেরিয়েই দরজা বন্ধ করে দিলেন ঠাকুর। আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। পরম স্নেহমাখা সুরে বললেন, এতদিন পরে আসতে হয়? তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, একবার কি ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, প্রাণের কথা বলতে না পেরে যে, পেট আমার ফুলে যাচ্ছে। কাঁদতে লাগলেন ঠাকুর। পরক্ষণে করজোড়ে দেব অর্চ্চনার সুরে বললেন, জানি, আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি দূর করার জন্য পুনরায় শরীর ধারণ করেছো!...

ঠাকুরের আচরণে নির্ব্বাক নরেন। মনে মনে ভাবলো! একেবারে উন্মাদ! না হলে বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে আমি, এসব কথা বলে আমাকে? চুপ করে রইলো নরেন। অদ্ভুত সেই পাগল, যা ইচ্ছা বলে চলেছেন!

পরক্ষণেই বললেন, ঠাকুর : একটু অপেক্ষা কর আসছি। ঘরের মধ্যে ঢুকে ফিরে এলেন। হাতে তাঁর মাখন, মিছরি আর কিছু সন্দেশ। নির্দ্বিধায় খাওয়াতে শুরু করলেন।

নরেন বললো, আমায় দিন, আমায় দিন, সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাই! শুনলেন না ঠাকুর। ওরা খাবে, তুমি খাও! একে একে সব খাইয়ে নিরস্ত হলেন। হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, বলো, তুমি শীঘ্র একদিন একা আসবে!

এ অনুরোধ এড়াতে পারলো না নরেন। বললো : আসবো। উভয়েই ফিরে এলেন ঘরে। ঠাকুর সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। নরেন বিস্ময়বোধ করলো তাঁর আচরণে। চাল চলন কথাবার্ত্তায় একেবারে স্বাভাবিক। উন্মাদনার কোন চিহ্ন নেই। স্থির সিদ্ধান্তে এলো নরেন, এই সদালাপ, ভাবসমাধি যথার্থই সত্য। যা বলছেন, তাই নিজে অনুষ্ঠান করছেন। ... ঠাকুর বলে

চলেছেন, তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা বলছি, ঈশ্বরকেও তেমনি দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু কে তাঁকে চায়? স্ত্রী পুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয়, টাকার জন্যে এরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পেলাম না বলে কেউ আকুতি মিনতি করে না। হায়, তাঁকে পেলাম না! ব্যর্থ এজীবন। এমন ব্যাকুলতায় যদি তাঁকে ডাকো, নিশ্চয় দেখা দেবেন তিনি।

নরেন চিন্তার আবর্ত্তে ডুবে যেন প্রত্যক্ষ করছে, এতো ধর্ম্মপ্রচারের কল্পনা বা রূপক সহায়তা নয়, সর্ব্বস্বত্যাগ করে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনে তাঁকে ডাকার পথ, প্রত্যক্ষ করার পথ! স্মরণ হল: এবার, ক্র্যাম্বি প্রমুখ দার্শনিকদের কথা। তাঁরা যে অর্দ্ধোন্মাদের কথা উল্লেখ করেছেন হয়ত ইনিও সেইরূপ... কিন্তু এঁর ঈশ্বর লাভের জন্য অদ্ভুত ত্যাগ, সে কথা তো অস্বীকার করা যায় না!... যদি উন্মাদও হন, সে উন্মাদনা তো ঈশ্বর লাভের জন্য। না, না, কোথাও নেই সে উন্মাদনা, সত্যই ইনি পবিত্র, মহা— পবিত্র... মহাপবিত্র... মহাত্যাগী সত্যই শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী। বিদায় নিল নরেন কিন্তু চিন্তার আবর্ত্তে তলিয়ে গেছে খেই, হারিয়ে গেছে মন।....

আর ঠাকুর : চলে গেল নরেন। প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। একটা ব্যথা বুকের মধ্যে, গামছা নিংড়ানোর মত। নিজেকে সামলাতে পারছেন না তিনি। বাগানের উত্তরে ঝাউগাছের নির্জ্জন তলায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন, ওরে তুই, আয়রে, তোকে না দেখে যে আর থাকতে পারছি না!...

নরেনের ডাক নাম বিলে। কাশী বিশ্বনাথের মানসপুত্র বিরেশ্বর। সংক্ষেপে বিলে। এই নামেই তার বাল্য পরিচয়। বয়স যখন চার কি পাঁচ, বাজার থেকে ছোট ছোট মাটীর দেবদেবীর মূর্ত্তি কিনে এনে ফুলের মালায় সাজিয়ে পূজায় মগ্ন। চোখ বুজে ধ্যান, নিস্পন্দনভাবে বসে থাকা, বাড়ীর বৃদ্ধাদের কাছে মুনিঋষিদের জটার গল্প শুনে ধ্যানের ভানে নিজ জটা বৃদ্ধির দীর্ঘ প্রতীক্ষা। প্রতিবেশী সমবয়সীদের সঙ্গে ধ্যান ধ্যান খেলা, এসবই তার বাল মনের খেয়াল নয়, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

পাঁচ বছর বয়সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রের আবৃত্তি, পিতৃপুরুষের নামাবলী, সমস্ত দেব-দেবী স্তোত্র পাঠ, ছ বছর বয়সে রামায়নের পালা কণ্ঠস্থ। শ্রুতিধরের মত স্মৃতিশক্তির বিকাশ। একবার পড়লে বা একবার শুনলে, সকল কিছুই আয়ত্তাধীন। এমন প্রখর তার মেধা, এমন তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি।....

প্রবেশিকার পূর্ব্বেই ইংরাজী ও বাংলার সমস্ত সাহিত্য ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ শেষ করে ফেললো। পরীক্ষার তিনদিন বাকী, জ্যামিতি পাঠ বাকী। চব্বিশ ঘণ্টায় চারখানা বই আয়ত্ত করে ফেললো। ১৮৭৯ সালে পরীক্ষা দেবার পর ইতিহাস পড়ার বাসনা জাগলো। পড়ে ফেললো, মার্শম্যান, এলফিনস্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকদিগের সব বই। ন্যায়শাস্ত্রের যত বই ছিল, হোয়েটান, জেভনস, মিলের বই একে একে শেষ হল।

বহু বিষয়ে পাঠ ও চিন্তার ফলে তর্ক প্রিয় হয়ে উঠলো। জ্ঞানে যা সত্য বোধ হত, তর্কে তার সমর্থন করতে শুরু করলো। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে বিপক্ষের মত, খণ্ডন করাই প্রধান কাজে পরিণত হল।

যেমন জ্ঞান অর্জ্জনের আগ্রহ, তেমনি ব্যায়াম অভ্যাসেও পটু, ঘোড়ায় চড়া, জিমন্যাস্টিক, কুস্তি, মুগুর ভাঁজা, লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, সাঁতার সব বিষয়ে পারদর্শী, গানবাজনায় তেমনি কুশলী।

বয়স বাড়ার সঙ্গে পরিচিত নরেন। ছোটবেলা থেকেই সত্যনিষ্ঠ। কর্ত্তব্যপরায়ণ, সেবাব্রতে ব্রতী। আপদ বিবাদ সব কাজে অগ্রণী। ব্যায়াম শিক্ষার জন্য কর্নওয়ালিশস্ট্রীটে ছিল

জিমন্যাস্টিকের আখড়া। হিন্দু মেলা প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্র ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। সেখানেই ব্যায়ামের অভ্যাস করতো। তাদের উপরেই পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন তিনি। ট্রাপিজ খাটাবার চেষ্টায় ছেলের দল কাঠের ফ্রেম খাড়া করার চেষ্টায় একজন ইংরাজ 'সেলার' কে নরেন অনুরোধ জানালো। সাহেব খুশী হয়ে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় ফ্রেমটা মাটিতে পড়ে গেল। স্যাহেবের কপালে আঘাত লাগলো। অজ্ঞান হয়ে গেল সাহেব। ক্ষতস্থান দিয়ে এত রক্ত বেরুলো যে, সবাই তাকে মৃত ভেবে পালিয়ে গেল। কিন্তু নরেন কয়েকটি বন্ধু নিয়ে তাকে সেবা করতে লাগলো। জ্ঞান ফিরলো, ক্ষতস্থানটি নিজের কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে... ধরাধরি করে 'ট্রেনিং একাডেমি' স্কুলের ভেতরে শুইয়ে নবগোপাল বাবুর কাছে ডাক্তার আনার জন্য সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করলো। ওষুধ, পথ্য ও সেবা চললো সাতদিন। তাকে সুস্থ করে, চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিল তার আস্তানায়।

করুণায় ভরা ছিল তার অন্তর। কারও দুঃখ সহ্য করতে পারতো না। দীন বা দরিদ্র কেউ বাড়ীতে এসে কাপড় বা প্রয়োজনীয় কিছু চাইলে, অবহেলায় দান করে দিত। জানাজানি হলে বাড়ীর লোকেরা পয়সা দিয়ে জিনিষ পত্তর সব ফিরিয়ে নিতেন। একদিন দোতালা ঘরে তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ভিক্ষার প্রার্থনা শুনে জানালা দিয়ে, মায়ের ভালভাল শাড়ী বিতরণ করে দিল।

কিন্তু দোষ ছিল একটি। রাগ হলেই আত্মহারা। ভেঙেচুরে ঘরের সব জিনিস তচ্‌নচ করে দিত। একমাত্র বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ করে দু একঘড়া জল মাথায় ঢেলে দিলে, তবেই শান্তভাব ধারণ করতো।...

পিতা বিশ্বনাথ বাবু কিছুদিন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে কার্য্যপোলক্ষে দীর্ঘদিন অবস্থান করছিলেন। নরেন নিয়ে চললো বাড়ীর সকলকে। বয়স তখন চোদ্দ। রেলপথ নেই, গরুর গাড়ীতে অতিক্রম করতে হয় বিপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য পথ। পথশ্রমে ক্লান্ত সকলেই কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মাতোয়ারা নরেন, মুগ্ধ একেবারে। অসীম শক্তি ও অনন্তের, সাক্ষাৎ পরিচয়ে। সেদিন তার তরুণ মন জগৎ নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে তলিয়ে গেল। সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেল কিছুকালের নিমিত্ত। যখন চেতনা ফিরে পেল, অনুভব করলো : ধ্যানরাজ্যের নিবিড় সে তন্ময়তা।...

কলকাতার প্রাচীন বংশ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল শিমলার এই দত্ত পরিবার। ধনে, মানে, বিদ্যা, গৌরবে অগ্রণী ছিল এই কায়স্থ পরিবার। প্রপিতামহ রামমোহন দত্ত ওকালতি করে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গৌরমোহন মুখার্জ্জী লেনে বহুগোষ্ঠীপরিবৃত্ত হয়ে সসম্মানে নিজের ঘরে বাস করে ছিলেন। ছেলে দুর্গাচরণ বাবার বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েও সাধুভক্ত হিসাবে পরিচিত ছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নে সুপণ্ডিত দুর্গাচরণের সংসারে আসক্তি ছিল না। পুত্রমুখ দেখার অল্পকাল পরেই গৃহত্যাগ করে চলে যান। তিনবছর পরে কাশীতে স্বামীস্ত্রীতে একবার দেখা হয়, বারোবছর পরে নিজ বাড়ীতে তিনদিন অবস্থানের পর চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ বাবু অবশ্য নাম করা আইন ব্যবসায়ী হয়ে বংশমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন। নরেন সেই বংশের সন্তান।

বিশ্বনাথ ফার্সি ও ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দানশীল ও বন্ধুবৎসল। পাত্রাপাত্র বিচার তাঁর চরিত্রে ছিল না। প্রার্থীকে ফেরাতে তিনি অপারগ, যেমন ছিলেন স্নেহশীল, তেমনি ছিলেন উদার, সঙ্গীত ছিল অবসর বিনোদনের সাথী। নিজেও ছিলেন সঙ্গীত পারদর্শী। নরেনকেও গান শিখিয়েছিলেন। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীও ছিলেন স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গীনী। করুণার প্রতিমূর্ত্তি।

বৈশিষ্ট্য ভরা তাঁর চরিত্র। বাইবেল পাঠ, ফার্সি কবি হাফেজের বয়েৎ আবৃত্তি, তাঁর নিত্য কর্ম্ম। লক্ষ্মৌ, লাহোরে মুসলমান প্রধান স্থানে অবস্থানের ফলে ছিলেন মুসলমানী আচার

ব্যবহারের অনুরাগী। আহারে পলান্নের ব্যবস্থা শুরু সেইদিন থেকেই। যেমন গম্ভীর তেমনি রঙ্গপ্রিয়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থা ছিল অপরূপ। মুখে কোন কথা না বলে তাদের বন্ধু মহলে প্রচার দ্বারা তাদের দোষ ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করতেন। তাদের বিবেককে জাগ্রত করাই ছিল সে শাসনের অঙ্গ।

নরেন রাগলে জ্ঞান থাকে না। তার এই ত্রুটি দূর করার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। যে ঘরে নরেন তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে জটলা করে সেই ঘরের দরজায় লিখে রাখলেন নরেনবাবু আজ মাকে এই কথা বলেছে। লজ্জা ও অনুশোচনায় নিজেকে সংযত করায় সচেষ্ট হয়ে উঠতো নরেন!

বিশ্বনাথ দু হাতে উপায় করেছেন, দুহাতে ব্যায় করেছেন হিসাব নিকাসের ধার ধারতেন না। বহু আত্মীয় স্বজনকে ভরণ পোষণ করতেন। এমন কি তাদের নেশার ব্যবস্থাও করে দিতেন। নরেন বড় হয়েছে। একদিন তাদের প্রকৃতির বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করলো, তাঁর কাছে। উত্তরে বিশ্বনাথ বললেন : মানুষের জীবন যে কত দুঃখময়, তা তুই এখন বুঝবি কি? যখন বুঝতে পারবি, সেই দুঃখের বোঝা থেকে ক্ষাণিক মুক্তির আশায়, তারা নেশা ভাঙ করে, তখন তাদেরও তুই দয়ার চোখে দেখবি!

কলেজের ছাত্র নরেন। ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত বাড়ছে। বিশেষ করে কেশববাবুর 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' দলে নাম লিখিয়ে অনুগত ভক্তে পরিগণিত হয়েছে। জপ ধ্যানের প্রতি আকর্ষণ বাল্যকাল থেকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সে আকর্ষণ বেড়েছে। মাতামহীর দোতালা ঘরে যখন অবস্থান, তার পূর্ব্ব থেকেই নিরামিষ আহার, কম্বলের শয্যায় রাত্রিযাপন শুরু। আত্মীয় স্বজন এমন কি মাবাবাও জানেন পড়াশুনার জন্যই তার নির্জ্জন বাস। তখন থেকেই মেতে আছে ধ্যানাভ্যাস। রক্তের আকর্ষণ। পিতামহের রক্তধারা হাতছানি দিচ্ছে। মোহ নেই সংসার সুখে।

প্রতিদিন উষায় ঘুম থেকে উঠে, দ্বার রুদ্ধ করে বসে ধ্যানে। মগ্ন হয়ে যায় নিজের অজ্ঞাতে। রাতের অন্ধকার যখন ভোরের আলোতে মিলিয়ে যেতো, ভাঙতো সে ধ্যান। এর কিছুদিন আগে বন্ধুদল সহ গিয়েছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তখন তিনি নৌকায় অবস্থান করছেন। প্রশ্ন করে বসলো, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বললেন, যোগই সেই দর্শনের পথ। তোমাতে যোগের লক্ষণ প্রকাশ। যোগ সাধন কর। সফলকাম হবে! তার কিছুদিন পরেই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা সুরেশ মিত্তির বাড়ীতে।....

ফিরে এলো নরেন। কেমন একটা আকর্ষণ! যাকে অবজ্ঞা করে এসেছে, তাকে তো ভোলা যায় না। মনটা ঘুরে ফিরে সেই দিকেই ছুটে চলে।... সুরু হল যাতায়াত।....

রাম ডাক্তার খুব খুশী। সুরেশ মিত্তির, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যায় আসে। বিদ্রূপ কমেছে। আপত্তি আর ওঠে না। বাড়ীটা তাঁর গলির মধ্যে। ১৮৮২ বা ৮৩ সাল। শনিবার কি রবিবার। রাম ডাক্তারের বৈঠকখানার ঘরে জনকুড়ি লোক, বাইরেও জনাকুড়ি একুনে প্রায় চল্লিশ জন সমাগত। ঠাকুর এসেছেন রাম ডাক্তারের বাড়ীতে। সার্সি দেওয়া তাকের কাছে বসেছেন তিনি। পিছনে একটি তাকিয়া তৃতীয় দরজার মাঝখানে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। পাড়ার কালীপদ সরকার (বৃদ্ধ) বাকী সব অন্য জায়গার লোক। সুরেশ মিত্তির ঠাকুরকে প্রণাম করে অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন। গরমকাল। বাইরের ঘরে বসে নরেন্দ্রনাথ। ডাক্তারের মাসতুতোভাই মনোমোহন বাবুও তাঁর ভগ্নীপতি রাখাল ও নরেনের মেজোভাই মহেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। চাক্ষুষ পরিচয় সিমলাবাসিন্দাদের। তাকিয়ার পাশে বসে আছেন যিনি, তিনিই সেই পরমহংস, যাঁর কথা এতদিন শুনে এসেছিল কানাঘুষায়। চেহারায় বৈশিষ্ট্যে নেই সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লোকের মত। কালো নয়, সহুরে লোকেদের চেয়ে একটু মলিন, এক গাল দাড়ি, একটু কপচানো। চোখ দুটি ছোট

বলা যায় 'হাতি চোখ' অনবরত মিট্ মিট্ করছে। ঠোঁট দুটো পাতলা নয়, নীচেরটা পুরু, মাঝের দু'একটা দাঁত একটু বেরিয়ে রয়েছে। গায়ে জামা। গ্রাম্য ভাষা একটু তোতলা। সবলে উচ্চারণ করেন। সামনে রঙিন বটুয়া। মাঝে মাঝে মসলা মুখে নিচ্ছেন। সহরের শিক্ষা, ভাষা, চালচলন সবই পরিবর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত। তাঁর হাব ভাব, ভাষা, চাল চলন-সবই গ্রাম্য। পাগল ঠিক নয়, এলোমেলো ভাব। আফিমখোর নয়, একটা নিঝুম নিঝুম ভাব। মাঝে মাঝে দু'একটি বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরও দিলেন। নিজেই কথা বলছেন। মাঝে মাঝে শ্যামা সঙ্গীত গাইছেন! কখনও বৈষ্ণবদের গানও গাইছেন। শ্রোতারা সব নীরব। কোন চঞ্চলতা নেই, বিরক্তিবোধ নেই, মনের উসখুস ভাব নেই। ঠিক যেন ঠাকুর বাড়ীর ভাব একটা পবিত্র পরিবেশ। নেই পণ্ডিতগিরি, নেই গুরুগিরি, মনটাকে উচ্চস্তর থেকে নামিয়ে এনে যেন কথা কইছেন। স্থির সেই দৃষ্টি। গান গাইছেন সাধারণ চলতি গান কিন্তু সে ভাবটি যেন পরিস্ফুট। সেই টানে, সেই সুরে, ভেসে চলেছে শ্রোতারা। আর তন্ময় হয়ে দেখছেন বক্তা (ঠাকুর) কে।

তর্ক নয়, প্রশ্ন নয়, নিশ্চিত ও নির্দ্দন্দ্বভাব বিরাজ করছে সে বক্তব্যের মধ্যে। সেই শব্দ, সেই ভাব, এত তাড়াতাড়ি আসছে যে মনে রাখার সুবিধা হচ্ছে না, সময়ও পাওয়া যাচ্ছে না। মন বলছে শোন, শুধু শোন, তৃপ্ত হও মিলিয়ে নাও তাৎপর্য্য... কিন্তু কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব, অভিভূত মন। খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, অনেক রাত হয়েছে, বাড়ী ফিরতে হবে... ভরে গেছে মন, দেহ আছে, বোধ নেই, কেমন যেন নিথর, কেমন যেন নিঝুম।....

হঠাৎ দেখতে পেল, বক্তা (ঠাকুর) কথা বলতে বলতে স্থির হয়ে গেলেন। ডান হাতের মাঝের আঙুল বেঁকে গেল। হাত দুটি সিধা ও শক্ত হয়ে গেল।.... এ এক নোতুন দৃশ্য।... মনটা তাঁর উপরে উঠে গেছে। জোর করে নামিয়ে এনে কথা বলছেন। আর শ্রোতা বা দর্শকদের মনকে আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছেন।

সবাই তাকিয়ে তাঁর দিকে। বোধ করছে একটা টান, স্টো ভালবাসা বা স্নেহ মমতা নয়, ভক্তি বা শ্রদ্ধাও নয়, এ টান ভেতরের টান, একটা গভীর আকর্ষণ, তাঁর কাছে থাকতেই ভাল লাগছে সকলের।....

ডাক পড়লো খাবার। ছাতে খেতে গেল সব। কারও জাত পাত নেই। কায়েত বামুন সব একাকার। পাশাপাশি বসে গেছে সকলে। নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ নেই, তৃপ্তি ও তৃপ্ত সকলে। নীচে নেমে এলো একে একে। রাত তখন এগারোটা। ঠাকুরকে নিয়ে যাবার গাড়ী এলো। ফিরে চললেন দক্ষিণেশ্বরে। ফিরে চললো, যে যার বাড়ীর দিকে— তখনও রয়েছে ঘোর, মনটা পৃথক হয়ে রয়েছে, দেহবোধ থেকে।....

রাম ডাক্তারের বাড়ীতে কয়েকবার যাতায়াত করায় অর্ন্তহিত হল পূর্ব্বের সেই বিদ্বেষ ভাব, ভুলে গেছে পরিহাস, নেমেছে শ্রদ্ধাঘন ভাবধারা। স্তিমিত পূর্ব্বের সেই গোঁড়াভাব, শিথিল হয়েছে সামাজিক শৃঙ্খল। ঠাকুর কবে আসছেন খবর নেয় সকলে। শিখেছে প্রণাম করতে, মাথা নোয়াতে। লোকের সমাগম দেড়শতেরও বেশী। তিনি আসেন তাঁর বাণী বিতরণ করেন। শ্রোতাদের টেনে নিয়ে যান এক আনন্দলোকের দেশে।.....

মহেন্দ্র গোঁসাই পাড়ার প্রধান লোক— গোস্বামী। বসার আসন তাঁর ঠাকুরের ডান দিকে জানালা দুটির মাঝখানে। ভাগবত ভক্তি নিয়ে আলোচনা চললো। গোঁসাই আলাপে খুশী হলেন। বললেন, সত্যকার আনন্দ অনুভব করলাম। তবে একটা প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে পাচ্ছি না। ভক্তি বড় না মুক্তি বড়! ... ঠাকুর উত্তর দিলেন : মুক্তি দিতে নারাজ নই, ভক্তি দিতে নারি।... ভক্তিতে তিনি পুরোমাত্রায়, বৈষ্ণব ভক্ত, আবার যখন শ্যামা বিষয়ক গান করছেন মনে প্রাণে তখন তিনি শাক্তভাবে তন্ময়।...

সেদিন পঞ্চবটী তলায় বসে ঠাকুর জগদম্বার ধ্যানে তন্ময়। মা জগদম্বা তাঁর কোলে একটি ছেলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এটি তোমার ছেলে!

সিউরে উঠলেন ঠাকুর। সেকি! আমার আবার ছেলে কী? আমার যে মাতৃযোনী!

মা হাসলেন। বললেন, সাধারণ সংসারীর ছেলে নয় ত্যাগী মানসপুত্র!

মনোমোহন মিত্তের বোনের নাম বিশ্বেশ্বরী। তাঁর বিয়ে হয়েছিল রাখাল ঘোষের সঙ্গে। উনি (মনোমোহন) ছিলেন রাম ডাক্তারের মাসতুতো ভাই, থাকতেন শিমলা পাড়ায়। প্রথম জীবন কেশববাবুর সহযাত্রী। নন্দ চৌধুরীর বাড়ীতে দেশটা যাতে খ্রীষ্টান না হয়ে যায়, না হিন্দু না খ্রীষ্টধর্মের একটা সেতু তৈরীর জন্য সভাও করেছিলেন। পরে অবশ্য এঁদের বাড়ীর সকলে ঠাকুরের ভক্ত হয়ে পড়েন। মা শ্যামাসুন্দরী কোন্নগরে যাওয়াব সময় মেয়ে জামাই (রাখাল ও বিশ্বেশ্বরী) নিয়ে ঠাকুরকে দেখাতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। রাখালকে দেখেই ঠাকুর চিনতে পারলেন— মার দেখানো সেই রাখাল, 'ব্রজের রাখাল' তাঁর মানস পুত্র। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম?

উত্তর দিল রাখাল, 'রাখাল'!

সস্নেহে বসালেন কাছে। নহবতে সারদাদেবীকে বলে পাঠালেন তিনি যেন টাকা দিয়ে পুত্রবধুর মুখ দেখেন!...

এর পর ঠাকুরকে রাখালের দেখা রামদত্তের বাড়ীতে। নরেন তার পূর্ব্ব পরিচিত। গরমকাল তাই বাইরে বসে নরেন। আর লাজুক 'রাখাল' ঘরের ভিতর না ঢুকে আশপাশে কোথায় আত্মগোপন করে রইলো!...

১৮৭৫ সাল। সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিলেন সে উৎসবে। এখানেই দেখা হল গোপালচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। এর জন্ম ১২৩৫ (১৮২৮ সাল) চান্দ্র শ্রাবণী, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। চব্বিশপরগণার রাজপুর গ্রামে। সন্ন্যাসী নাম অদ্বৈতনন্দ, স্ত্রী বিয়োগের পর ঠাকুর ও শ্রীশ্রী মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে এঁরই প্রথম দর্শন। এর পরে এলেন গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (ঘটক) (আহিরিটোলা মামা বাড়ীতে ১২৭১ সালে ১৫ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪) মহালয়া তিথিতে জন্ম। ১৮৭৭ সালে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। সন্ন্যাসী নাম অখণ্ডানন্দ, দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবা করে সারগাছীতে আশ্রম করেন ১৯৩৪। এর পর এলেন রাখতুম, ঠাকুরের দেওয়া নাম 'নটু' সন্ন্যাসী নাম অদ্ভুতানন্দ। প্রথম জীবনে ছিলেন রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীর ভৃত্য। শ্রীশ্রী মায়ের কাজের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ঠাকুর নিজে তাঁর অক্ষর পরিচয়ের চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়েও তাঁর সেবা ও আন্তরিকতায় নিজের পার্ষদ করে নেন। এরপর এলেন হরি প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। মধ্য প্রদেশের এটাওয়াতে (বাবা তারকনাথের কর্ম্মস্থান) ১২৭৫ সালের ১৫ ই কার্ত্তিক বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীতে জন্ম করেন। (১৮৬৮, ৩০শে অক্টোবর)। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৯, বেলঘোরিয়ার বাগান বাড়ীতে (কেশবচন্দ্রকে ঠাকুরের দেখতে যাওয়ার সময়) প্রথম দর্শন করেন। বাল্যকালেই ঠাকুরের সঙ্গ, বি.ই. পাশ করে পাঁচবছর সরকারী চাকরী করার পর আলমবাজার মঠে যোগদান করেন (১৮৯৭)। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১৮৯৯) বেলুড় মঠের নকশা ও মঠ মিশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী নাম বিজ্ঞানানন্দ। এর পরে এলেন তারক ঘোষাল। ২৪ পরগণার বারাসতে ২০শে অগ্রহায়ন ১২৬১ (১৬ই নভেম্বর, ১৮৫৪) চান্দ্র কার্ত্তিকী কৃষ্ণা একাদশীতে জন্ম। রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতেই প্রথম দর্শন (১৮৬০)। নাম শিবানন্দ। এরপর এলেন রাখাল চন্দ্র ঘোষ। জন্ম ১২৬৯, ৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী ১৮৬৩)। ঠাকুরের মানসপুত্র। সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বরে গমন ১৮৮১। এরপর এলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত । জন্ম ১২৬৯, ২৯শে পৌষ, কৃষ্ণাসপ্তমী (১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩)। এরপর এলেন বাবুরাম ঘোষ, জন্ম ১২৬৮, ২৬শে

অগ্রহায়ণ, শুক্লা নবমী (১৮৬১, ১০ই ডিসেম্বর)। বলরাম বাবুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীর ভাই। ঠাকুরের কাছে আগমন ১৮৮১/৮২ খৃষ্টাব্দে। সন্ন্যাসী নাম প্রেমানন্দ। এর পর এলেন যোগীন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী। দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরী বংশ। ১২৭১, ১৮ই চৈত্র কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী (১৮৬১, ৩০শে মার্চ) কেশবচন্দ্রের লেখা পড়ে ঠাকুরকে দর্শন। শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম মন্ত্রসন্তান। ঠাকুর নিজে দীক্ষা না দিয়ে মাকে দীক্ষা দেওয়ার আদেশ দেন। সন্ন্যাসী নাম যোগানন্দ। এরপর এলেন নিত্যরঞ্জন ঘোষ রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে ১২৬৯, শ্রাবণী পূর্ণিমা (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) লোকমুখে ঠাকুরের কথা শুনে আগমন (১৮৮১/৮২)। সরল কিন্তু ক্রোধপরায়ণ। এরপর এলেন কালীপ্রসাদ চন্দ্র। ২২ নিমু গোস্বামী লেনে ১২৭৩ সালে ১৭ই আশ্বিন কৃষ্ণা নবমীতে (২রা অক্টোবর ১৮৬৬) জন্ম। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের কাছে আগমন। সন্ন্যাসী নাম অভেদানন্দ। এলেন শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, হুগলী ময়াল ইচ্ছাপুর গ্রামে ১২৭০, ২৯শে আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে জন্ম (১৩ই জুলাই ১৮৬৩) তান্ত্রিক সাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (গিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর খুড়তোতো ভাই) অনুজ শরৎচন্দ্র ও কয়েকজন বন্ধুসহ আগমন করেন ১৮৮৩ অক্টোবরে। (মঠের নিত্য পূজারী)। সন্ন্যাসী নাম রামকৃষ্ণানন্দ। শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র) ১২৫, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ১২৭২ সালে ৯ই পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী তিথি (২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৫, জন্মগ্রহণ করেন। অনুজ শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী কয়েকজন বন্ধুসহ ঠাকুরকে দেখতে আগমন। সন্ন্যাসী নাম সারদানন্দ (১৮৮৩)। এরপর এলেন হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। বোসপাড়া বাগবাজার ১২৬৯ সালে ২০শে পৌষ শুক্লা দশমীতে (৩রা জানুয়ারী ১৮৬৩) জন্ম। ১৪ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান, কঠোর তপস্যা। প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন ও তীর্থ ভ্রমণ। ১৯০০-১৯০২ আমেরিকায় আধ্যাত্মভাব প্রচার করেন। সন্ন্যাসী নাম তুরীয়ানন্দ। আবাল্যব্রহ্মচারী ও তত্ত্বান্বেষী। এরপর এলেন সারদা প্রসন্ন মিত্র। ২৪ পরগণার নাওরা গ্রামে ১২৭১, ১৮ই মাঘ শুক্লা চতুর্থীতে (৩০শে জানুয়ারী ১৩৬৫) জন্ম। মহেন্দ্র গুপ্তের (মাষ্টারমশাই) ছাত্র। তাঁরই সঙ্গে ঠাকুরকে দেখতে আসেন ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৪। জনহিতকর কাজ ও উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশনের ভার গ্রহণে ১৯০২ নভেম্বর বেদান্ত প্রচারেরকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য আমেরিকা গমন করেন। ভাষন দানের সময়ে উন্মাদরোগগ্রস্ত আততায়ীর বোমায় আহত (২৭শে ডিসেম্বর ১৯১৪) ও ১৯১৫, ১০ই জানুয়ারী দেহত্যাগ) সন্ন্যাসী নাম ত্রিগুণাতীতানন্দ। এরপর এলেন সুবোধচন্দ্র ঘোষ, ২৩ শঙ্কর ঘোষ লেনে ১৮৬৭ জন্ম। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন, সন্ন্যাসী নাম সুবোধানন্দ (পরিচিত খোকা মহারাজ নামে)।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করলেন মথুরমোহন এরপর দশবছর বেঁচেছিলেন জগদম্বা দাসী। ঠাকুরের সেবার ত্রুটি তিনি রাখেন নি। অবিচলিত ছিল তাঁর নিষ্ঠা। অবশ্য মথুরমোহন চলে যাওয়ার পর মণিমোহন সেন (পানিহাটি নিবাসী) ঠাকুরের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। তিনি মথুরমোহনের মতই শ্রদ্ধাবান ছিলেন ও নিয়মিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ কিছুদিন করেছিলেন। সকল সময়েই দক্ষিণেশ্বরে আগমন করতেন। এর পরেই দ্বিতীয় রসদদারের ভূমিকা নেন শম্ভুনাথ মল্লিক। চার বছর সেবার কাজ করে চলে গেলেন। এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ভক্তদের আগমন। কেশববাবু দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেছেন। ব্রাহ্ম ভক্তদেরও যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে। শহরে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা কানাকানি হয়ে চলেছে, জগদম্বারও ব্যারাকপুরে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে (তখনও মন্দির অসম্পূর্ণ) শেষ হল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮২, ৩০শে চৈত্র) ১২ই এপ্রিল। রামলালের পূজক রূপে দক্ষিণেশ্বরে আগমন। শম্ভুবাবু প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজে অনুরক্ত। ঠাকুরকে দর্শনের পর তাঁর একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন। দান ধ্যানের জন্য শহরে পরিচিতি ছিল তাঁর। মথুর মোহন ঠাকুরের সেবা করেছিলেন। শ্রীমার আগমনে তাঁর (মথুরমোহনের) স্মৃতি মনে উদিত হয়েছিল ঠাকরের মনে। সে অভাব পূর্ণ করেছিলেন শম্ভুচরণ।

ঠাকুরকে সম্বোধন করতেন 'গুরুজী' বলে। ঠাকুর বিরক্তি বোধ করতেন। বলতেন : 'কে কার গুরু'? তুমি আমার গুরু! শম্ভুচরণ সে কথা কানে তুলতেন না। তাঁর দিব্যসঙ্গ গুণে যে আধ্যাত্মিক পথের আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাসে যে পূর্ণতা ও সফলতা এনে দিয়েছিল তা বিস্মৃত তিনি হন নি। দেবতাজ্ঞানে তাঁর ও শ্রীমার সেবায় সেই ভক্তির ডালি উৎসর্গ করেছিলেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। মা দক্ষিণেশ্বরে থাকলে জয় মঙ্গলবারে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রীও ষোড়শোপচারে তাঁর শ্রীচরণ পূজা করতেন।

১২৮১ সালে বৈশাখ মাসে শ্রীমা এলেন (দ্বিতীয়বার) দক্ষিণেশ্বরে। তিনি তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহারের ব্যবস্থায় একটি কুটীর নির্ম্মানের ব্যবস্থা করে দিলেন। অসুস্থ হয়ে শ্রীমা চলে গেলেন জয়রামবাটীতে (১২৮২ সাল) : এর কিছুদিন পরেই শম্ভুচরণ অসুস্থ হলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখতে গেলেন। ফিরে এসে বললেন 'শম্ভুর প্রদীপে তেল নেই'। সত্য হল সে কথা। বহুমূত্র রোগে দেহত্যাগ করলেন শম্ভুচরণ। তার কিছুদিন পরে মা চন্দ্রাদেবী দেহত্যাগ করলেন। কেশববাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল ১২৮১ সালের চৈত্র মাসে। একপাশে বিচ্ছেদ, অন্য পাশে যোগাযোগের নোতুন দ্বার উন্মোচিত। পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই। তাঁর সেই আকুল ক্রন্দন : কে কোথায় আছিস আয় রে...." গঙ্গার পবিত্র বুকে আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে পড়লো দিকবিদিকে। আগমন হল সুরু।...

শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এলেন কিন্তু ফিরে গেলেন হৃদয়ের দুর্ব্যবহারে। জগদম্বাদাসী দেহ রাখলেন। (১লা জানুয়ারী ১৮৮১), স্বামীর মৃত্যুর দশবছর পরে। এর পরই নরেনের দক্ষিণেশ্বরে আগমন। পরিচালনার দায়িত্বে ত্রৈলক্ষ্য নাথ। মার মতই রানী রাসমনীর স্টেটের পরিচালক হলেন। রানীর ব্যাবস্থামত দক্ষিণেশ্বরের কাজকর্ম্ম চলতে লাগল। হৃদয়ের স্বভাব ছিল মামাকে অনুকরণ করা। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা তার ছিল, সেবাও করে এসেছে আজ্ঞাবহের মত। ঠাকুরও বারবার বলেছেন আচার অনষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, আমার সেবাই তোমার সাধনার অঙ্গ কিন্তু কে কার কথা শুনে! একদিন ত্রৈলক্ষ্যনাথের স্বল্প বয়সের কন্যার চরণ পূজা করে বসলো। অকল্যাণ হবে ভেবে হৃদয়কে কালীবাড়ীর কাজ থেকে অবসর দিয়ে দিলেন। দক্ষিনেশ্বর থেকে চলে যাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন। কথাটা ঠাকুরের কানে উঠলো। ঠাকুর কালীবাড়ী ত্যাগের উদ্যোগী হলেন। ত্রৈলক্ষ্য নাথ তাঁর পথরোধ করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, আমি আপনাকে চলে যেতে বলিনি। হৃদয়কে অবসর দিয়েছি, চলে যেতে বলেছি সে অপরাধ করেছে বলে। ঠাকুর তাঁর অনুনয়ে ফিরে এলেন কালীবাড়ীতে।....

নরেন দক্ষিণেশ্বর ত্যাগের আগে ঠাকুরকে কথা দিয়েছিলেন আর একদিন আসবে কিন্তু কলকাতায় ফিরে সে কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিল। প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হয়ে ছিল এমন তাঁর আকর্ষণ! কিন্তু দীর্ঘদিনের সঙ্গ সহচর্য ও প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়ার মত আত্মিক আকর্যণ তখনও গড়ে উঠেনি। ব্রাহ্মসমাজে ঘোরা ফেরা করে, তাঁদের অনুসরণে তখন প্রার্থনা, আলোচনা সমিতি গঠনে ব্যস্ত। এর ওপর রয়েছে কলেজের পাঠ, ধ্যানাভ্যাস, সঙ্গীত ও ব্যায়ামচর্চ্চা বয়স্যদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা। পাশ্চাত্য শিক্ষার ছাঁচে ঢালা মন ও দৃষ্টির প্রভাবে সেদিন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, নিজের চোখে যা দেখেছে, সেটা অর্দ্ধোম্মাদের অবস্থা। এসত্ত্বেও তাঁর স্মৃতি ও সত্যনিষ্ঠা আকর্ষণ করেছিল তাকে। সময় পেলেই যাবো এরকম একটা ভাব ছিল মনে। কেটে গেল একটা মাস। আরও কিছুদিন। অবশেষে পাড়ি দিল একা। বরাহনগরে দাসরথি সান্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুদের বাড়ী যাতায়াত ছিল। ঠিক করলো: তাদের বাড়ীর কাছাকাছি রাসমনির বাগান নিশ্চয় হবে। প্রথম যেদিন গিয়েছিল রামদার সঙ্গে সুরেশদার গাড়ীতে। চলেছে

আজ পায়ে হেঁটে। পথ যেন শেষ হতে আর চায় না।... জিজ্ঞাসা করতে করতে পৌঁছালো দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখলো : তাঁর শয্যার পাশের ছোট তক্তপোশের ওপর একা বসে আছেন। তাকে দেখেই ঠাকুর সানন্দে তক্তাপোষেই ডেকে বসালেন। তারপরেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। অস্পষ্টস্বরে নিজের মনে কি বলতে বলতে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

নরেন ভাবছে আবার হয়তো কিছু পাগলামি সুরু হবে।

সে চিন্তার মাঝখানেই ঠাকুর হঠাৎ তার অঙ্গে ডানপাটা স্থাপন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব উপলব্ধি বোধ হল নরেনের। চেয়ে চেয়ে দেখছে দেওয়ালঘর সব জোরে ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্ব, সেই সঙ্গে আমির আমিত্ব। ছুটে চলেছে মহাশূন্যে।.... আমিত্বের নাশ শিউরে উঠলো মন, এত মৃত্যু! আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো নরেন, ওগো! তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাবা-মা আছেন!

ঠাকুর হেসে উঠলেন, উচ্ছ্বাসিত সে হাসি। হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন বুক। বললেন, তবে এখন থাক, একবারে কাজ নেই, কালে হবে।

স্পর্শমাত্র মিলিয়ে গেল সে দৃশ্য। প্রকৃতস্থ হল নরেন। আগে যেমন, এখনও তেমন।... কিন্তু পাল্টে গেল মনের সুর, চিন্তার ধারা। ভাবতে লাগল নরেন, অদ্ভুত এই পুরুষের প্রভাব। চকিতে লয়, চকিতে স্থিতি। বইয়ে পড়েছে Mesmerism (মোহিনী শক্তি) ও Hypnotism (সম্মোহন বিদ্যা)। এটাও কি এইরূপ? প্রাণ সায় দেয় না। তবে কি দুর্ব্বল মনের ওপর প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাব?... আমি বুদ্ধিমান, মানসিক বল সম্পন্ন, এতো আমারই অহঙ্কার! আমিই তো এঁকে অর্দ্ধোন্মাদ বলে স্থির করেছিলাম, তবে আমার এরূপ হবার কারণ কি? মনে পড়লো। মহাকবির কথা : পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন তত্ত্ব আছে যা মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত দর্শনশাস্ত্র, সে স্বপ্ন ও রহস্যভেদের কল্পনা করতে পারে না। ভাবলো : হয়তো এটাও সেরূপ! ... স্থির করে নিল : ভবিষ্যতে এ পাগল যেন নিজের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে— সচেতন থাকতে হবে। ... পর মুহূর্তেই শুরু হল চিন্তা, ইচ্ছা মাত্রেই যদি এই পুরুষ আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, মনের দৃঢ় সংস্কার চুরমার করে কাদার তালের মত নিজের ভাবে ভাবিত করতে পারে, তাকে পাগলই বা বলি কেমন করে? প্রথম দিনের ঘটনাকে ওঁর পাগলামির খেয়াল মনে হলেও আজের এই উপলব্ধির কারণ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তি তর্কের চুলচেরা বিচারের দম্ভ ছিল মনে, তাতে আঘাত লাগলো নরেনের। স্থির করলো : এই অদ্ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তি কথা বোঝার চেষ্টা করতে হবে আজ থেকে।

নিজের চিন্তার জালে জড়িয়ে রইলো নরেন। আর ঠাকুর! অন্য এক মানুষ। বহুকাল পরে কাছে পেয়েছেন পরিচিতকে আপনার কাছে! খাইয়ে, কথা বলে, আদর, পরিহাস করে, আশা যেন আর মিটে না। ক্রমে গড়িয়ে এলো অপরাহ্ন। নরেন বিদায় চাইলো। ক্ষুন্ন হলেন তিনি। আবার শীগ্গির আসবে বলো!— কণ্ঠে গভীর আকুতি।

আসবো! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল নরেন! দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে চললো। ধীরে ধীরে...।

কলকাতায় ফিরে এলো নরেন। সপ্তাহ কাটলো পড়াশুনা ও অন্যকাজে। তার মনে উঠেছে ঝড়। যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় সেদিন পেয়েছে, তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। এটা তার প্রকৃতির রীতি। অনুসন্ধিৎসু তার মন। সে জানতে চায়, উপলব্ধি করতে চায়। আহার, বিহার, বিশ্রাম, মনের চিন্তার গতিতে সব ওলট পালট হয়ে যায়। প্রাণে শান্তি নেই, মনের স্থিতি নেই, জানতে হবে, বুঝতে হবে, কি সেই শক্তি!

ছুটলো নরেন। তবে সে বিশেষ সতর্ক, বিশেষ দৃঢ়, পরীক্ষা নিতে হবে, সত্যই সে শক্তির অধিকারী না সবই তার ভেল্কী।

সেদিন ভিড় দক্ষিণেশ্বরে। বহুলোকের সমাগম। ঠাকুর নরেনকে যদু মল্লিকের বাগানে বেড়াতে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যদুলালের মা, বা তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন। প্রধান কর্ম্মচারীকে আদেশ দিয়ে ছিলেন, তাঁরা কেউ উপস্থিত না থাকলেও ঠাকুর যদি বেড়াতে আসেন গঙ্গার ধারের বৈঠকখানায় তাঁকে বসার জন্য যেন দরজা খুলে দেওয়া হয়। ঠাকুর নরেনবে সঙ্গে নিয়ে নানা কথা বলতে বলতে বাগানে ও গঙ্গাতীরে বেড়ালেন। পরে বৈঠক খানার ঘরে ঢুকে বসলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। নরেন অল্প দূরে বসে স্থিরভাবে ঠাকুরের অবস্থা লক্ষ্য করছে। এমন সময়ে ঠাকুর পূর্ব্বদিনের মত তাকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে পড়লো নরেন। বাহ্যসংজ্ঞা হারালো। যখন চৈতন্য ফিরলো, দেখলো ঠাকুর তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন।...

বাহ্যজ্ঞান লোপ হল নরেনের। ঠাকুর জিজ্ঞাস করলেন তাকে : কে সে? কোথা থেকে এসেছে? কেন এসেছে? কতদিন এ পৃথিবীতে থাকবে? উত্তরও পেলেন তার কাছ থেকে। মিলিয়ে নিলেন ঠাকুর। যে দর্শন তিনি পেয়েছিলেন পূর্ব্বে, মিলিয়ে দেখ্‌লেন : সেই ঋষি, এসেছেন ধরাধামে তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য নোতুন আলোর ধারায় পৃথিবীকে আপ্লুত করতে।....

দ্বিতীয়বার। ভাবান্তরিত হ'ল নরেন। বুঝলো : এ দুরতিক্রমনীয় দৈব শক্তি এর কাছে মন ও বুদ্ধির শক্তি, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইনি অর্দ্ধোন্মদ নয়, দৈবশক্তি সম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। ইচ্ছামাত্র মানুষের মনকে ভাবপথে চালিত করতে পারেন! ভগবৎ ইচ্ছার সঙ্গে এঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণ একীভূত। এঁর অযাচিত কৃপালাভ সৌভাগ্যের বিষয়।....

ব্রাহ্মসমাজে গভীরভাবে মেলামেশা করে যে চিন্তাধারা একদিন দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল, আধ্যাত্ম জগতের পথ প্রদর্শক বা গুরুরূপে গ্রহণ ও তাঁর নির্দ্দেশ অনুসরণে ছিল একান্ত আপত্তি— দুদিনের পর পর ঘটনায় সে চিন্তা তার ধুলিসাৎ হয়ে গেল। বুঝলেন, বিরল হলেও— সত্য সত্যই এমন মহাপুরুষ সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করেন, যাঁদের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা, প্রেমও পবিত্রতা, সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র মনবুদ্ধি প্রসূত ধারণাকে অতিক্রম করে বহু উর্দ্ধে টেনে নিয়ে যেতে পারে! এঁদের গুরুরূপে গ্রহণ করলেও সে এ পথের পথিক নয়, যাত্রা পথ তার আলাদা।

ছোটবেলা থেকেই ধারণা জন্মেছিল 'ত্যাগছাড়া ঈশ্বর লাভ হয় না।' ব্রাহ্মসমাজে মিশলেও তাঁদের দাম্পত্য জীবনসংস্কার ভাল লাগেনি। ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে সেই ত্যাগের ভাব ও প্রেরণা বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করলো।

বুঝলো, মহাপুরুষদের সংস্রবে এসে, পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই কেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে মানুষ। দৃঢ়সংকল্প করলো, নিজে পরীক্ষা বা প্রত্যক্ষ না করে তাঁর অদ্ভুত দর্শন সম্বন্ধীয় কথা গ্রহণ করবে না। আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব তত্ত্ব সকল গ্রহণের জন্য, যেমন যত্নশীল হতে হবে, তেমনি একটি পাথরে ঘসে তাঁর প্রত্যেক অদ্ভুত দর্শনকে নিরীক্ষণ করতে হবে। আগে যাচাই, তারপর গ্রহণ। ভক্তি, বিশ্বাসও একটা অহেতুক আকর্ষণ! মনে তা জেগেছে সত্য, তবুও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো : কেমন করে ঈশ্বর দর্শনে কৃতার্থ হওয়া যায়, প্রথমে সেই শিক্ষাই তাঁর কাছে গ্রহণ করতে হবে।....

পুণ্যসংস্কার নিয়ে জন্মেছিল নরেন। চোখ বুজলে ভ্রূমধ্যভাগে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিবিন্দু দেখতে পেতো। লক্ষ্য করতো তার নানারূপ পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন দেখার সুবিধা হবে বলে ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করার মত অবস্থায় শয়ন করতো। ঐ অপূর্ব্ব বিন্দু নানা রঙে পরিবর্ত্তিত হয়ে বিম্বাকারে পরিণত হয়ে ফেটে গিয়ে শুভ্রতরল জ্যোতিতে আবৃত্ত হয়ে চেতনালোপ করে দিত। ধারণা ছিল প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে। তারপরে, বড় হয়ে যখন ধ্যান অভ্যাস করতে সুরু করলো, সেই জ্যোতিবিন্দু প্রথমে সামনে এসে উপস্থিত হত, চিত্তও একাগ্র হয়ে যেতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের

উপদেশে, কয়েকজন বন্ধু নিয়ে যখন ধ্যানাভ্যাস চলতে লাগলো, তখন দর্শন ও উপলব্ধির আলোচনা শুরু হল। তখনই জানতে পারলো, এদর্শন তাদের হয়না, কেউ ওভাবে নিদ্রাও যায় না।

আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করলো : কোন ব্যক্তি বা স্থান বিশেষ দেখামাত্র মনে হয় যেন বিশেষ পরিচিত বা কোথাও যেন দেখেছে, বা আলোচনা কালে বোধ হত এসব বিষয়ে এখানেই আলাপ হয়েছিল— কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে না, কখন বা কোথায় তা হয়েছিল।

জেনারেল এসেমব্লিস ইন্‌স্টিটিউসনে পড়ার সময় অধ্যক্ষ উদারচেতা সুপণ্ডিত হেরিট সাহেব একদিন ক্লাসে ওয়ার্ডওয়ার্থের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা কালে বললেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভবে কবির ভাব সমাধি হয়েছিল। এটা চিত্তের পবিত্রতা ও বিশেষ বিষয়ে একাগ্রতা থেকেই হয়ে থাকে। আমি দেখেছি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এইসমাধি হয়। তোমরা একদিন দেখে এলে, এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে! একথার প্রথম শোনার পর সুরেশদার বাড়ীতে তাঁকে (ঠাকুরকে) প্রথম দেখার সুযোগ এসে যায়। এর অবশ্য আগেও ব্রাহ্ম সমাজে ওঁর কথা তার কানে এসেছিল। এখন প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তাঁর প্রতি তার আকর্ষণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো।....

আর ঠাকুর! সুযোগ্য শিষ্যকে দেখবামাত্র জীবনের প্রত্যক্ষ বিষয় ঢেলে দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠতে লাগলেন।

একা যেদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে গেল, দৈব প্রেরণায় তিনি তাকে সমাধিস্থ করে ব্রহ্মপদবীতে আরূঢ় করিয়ে একান্ত আপনার করে তুললেন। কিন্তু তার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হতে দেখে নিজেকে নিরস্ত করে নিলেন। তাই তৃতীয় দিনের আগমনে নিজের শক্তি বলে অভিভূত করে তার জীবনের রহস্য কথা জেনে নিয়ে নিজের দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা তখন চলছে উভয়ের মধ্যে। একজন যাচাই করতে চায় তবেই আত্মনিবেদন আর অপরজন যাচাই করছেন তাঁর দর্শন কি তবে সত্য নয়!

এ জগতে যাঁদের মধ্যে একটি বা দুটি শক্তি প্রকাশ থাকে তাঁরা এ জগৎ সংসারে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে, আর নরেনের আগমনে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন সে আঠেরোটি শক্তি প্রকাশের অধিকারী। বুঝেছিলেন ঠাকুর, তাঁকে ঠিকমত পরিচালন করতে না পারলে যে শক্তির অপব্যয় হবে। তাকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চরম সত্য উপলব্ধি করিয়ে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করতে হবে। ফলে জগতের প্রভূত উপকার সাধিত হবে। নইলে নবীন মত ও দল গঠন করে একজন সাধারণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হবে ঠিক গেঁড়ে ডোবার মত। স্রোত নেই শুধু বদ্ধ জল। দল বা গোষ্ঠী তথা উদ্ভিদ-দামের উৎপত্তি, আধ্যাত্মিক জগতের আংশিক সত্যের বিকাশকে পূর্ণ সত্য বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা। ভয়, ঠাকুরের এখানেই। যে অসাধারণ মেধা ও মানসিক গুণ সম্পন্নের অধিকারী, পরিচালকহীন নৌকার মত, পথভ্রষ্ট হয়ে না যায়!.....

নরেনকে ভালবাসা তাঁর শক্তির সমাদর করা। তাঁকে স্নেহ ডোরে বাঁধা, তার পরিচালন শক্তিকে নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা, তাকে স্বধর্ম্মে ব্রতী করা, তার পুঞ্জীভূত শক্তিকে সংহত ও সংযত করে, নব সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা। সে উন্মুক্ত তরবারী, রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে, উদ্ভাসিত করবে নোতুন আলোক। দেখাবে, নোতুনের পথ--- আলোকিত হবে সারা বিশ্ব!

প্রথম দিনের দর্শনেই ঠাকুর নরেনকে আত্মজ্ঞানে বরণ করেছিলেন, ভালবেসেছিলেন আত্মজ্ঞানে। ঠিক পিতা পুত্রের মত, স্বামী স্ত্রীর মত। পিতার আত্মা পুত্র, পুত্র পিতার স্বত্ত্বা। অভিন্ন উভয়ে— এছাড়া গতি নেই কারও। স্বামী স্ত্রীর আত্মা, স্ত্রী স্বামীর দেহ, একই আধার, ভিন্ন শুধু রূপ, একছাড়া গতি নেই কারও। স্বামী নেই, স্ত্রী নেই, শুধু সে নারী। স্ত্রী নেই, স্বামীও নেই, শুধু সে পুরুষ। সেখানে সৃষ্টি নেই, বিকাশ নেই, স্থিতি নেই, পিতৃত্বের পরিচয় নেই, নেই মাতৃত্বের

বিকাশ। দুপাশে দুটি মেরু-সূত্র নেই, যোগাযোগ নেই। দুটি মাত্র বিন্দু। যেই যোগাযোগ হল, সার্থক হল সৃষ্টি, সূচনা জীবনের স্ফুরণ। উভয়ে খুঁজে পেল উভয়ের নিজস্ব সত্ত্বা। আমি মা, আমি বাপ, এটাই বাস্তব পরিচিতি।

নরেনকে ভালবেসেছিলেন ঠাকুর। নরেনও বাঁধা পড়েছে সে আকর্ষণে। ঠাকুর ব্যাকুল হয়েছেন তাঁর অদর্শনে, নরেন নিজেকে সরিয়ে রেখেছে, আত্মনিবেদনের প্রতীক্ষায়। যা দেখেছি, যা পেয়েছি তা কি প্রত্যক্ষ সত্য? ঠিক যেন মান অভিমানের খেলা। যখন চিনলো, জানলো, মিলিয়ে, তলিয়ে গেল উভয়ে।

নরেন আসছে না এক সপ্তাহ বা তারও বেশী। অধৈর্য্য ঠাকুর। ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁর মন। রাখাল (ঠাকুরের মানসপুত্র) বাবুরামকে সঙ্গে নিয়ে আসছে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে। হাটখোলার ঘাটে একই নৌকায় রামদয়াল বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যখন পৌঁছলেন, ঠাকুর তখন মন্দিরে মার (জগদম্বার) দর্শনে গিয়েছেন। রাখাল সঙ্গে নিয়ে এলো ঠাকুরকে। ভাববিভোর বাহ্যসংজ্ঞাহারা। প্রকৃতস্থ হয়ে ঠাকুর রামের পরিচয় নিয়ে মুখ ও হাত-পা পরীক্ষার শেষে, হাতের ওজন নিতে নিতে বললেন, বেশ! পরেই রামদয়ালবাবুর কাছে নরেনের শারীরিক কল্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করে বললেন, সে অনেক দিন আসেনি, তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। একবার আসতে বলো!

ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনায় কেটে গেল বেশ কয়েকটা ঘণ্টা। রাত দশটায় খাওয়া ও শোবার ব্যবস্থা পূর্ণ। রাখাল্ ঠাকুরের ঘরে অন্য শয্যায় ও বারান্দায় রামদয়ালবাবু ও বাবুরাম। ঘণ্টাখানেক পরেই ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানা বগলে করে রামদয়ালবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, ওগো ঘুমুলে? ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে রামদয়ালবাবু বললেন, আজ্ঞে না। ঠাকুর বললেন, দেখ নরেনের জন্যে প্রাণের ভেতরটা যেন গামছা-নিংড়ানোর মত জোরে মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করতে বোলো। সে শুদ্ধ ও সত্ত্ব গুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।"

রামদয়ালবাবু শান্ত করার চেষ্টায় বললেন, রাত পোহালেই নরেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে আসতে বলবো।

বিশ্রামের ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে নিজেই ঘরে ফিরে গেলেন। পরক্ষণেই ফিরে এসে কাতরভাবে বললেন : সে সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাকে না দেখে প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে।....

এখানেও সেই প্রাণের টান। সেই ভয়, যদি সে বে-পথে যায়! সেই ভাব, যদি হারাই হারাই, তাকে দিয়ে যে জগতের অনেক কাজ হবে!

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। নরেন অনেকদিন আসেনি দক্ষিণেশ্বরে। উৎকণ্ঠিত ঠাকুর। বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ঠাকুরের মন সেদিন নরেন্দ্রময় হয়ে রয়েছে। মুখে শুধু নরেনের গুণানুবাদ। বললেন, দেখ, নরেন শুদ্ধ, সত্ত্ব গুণী। আমি দেখেছি, সে অখণ্ডের ঘরের চার জনের একজন-সপ্তর্ষি। তার গুণের ইয়ত্তা হয় না। নরেনকে দেখার জন্য অস্থির ঠাকুর। যেন পুত্র বিরহে কাতর মাতা! কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না। ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় দ্রুত চলে গেলেন। 'মাগো' তাকে না দেখে যে আর থাকতে পারি না! রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন। অনেকটা সংযত হয়ে, ঘরে ফিরে এলেন পুনরায়। বসেই, করুণ স্বরে বললেন,: এত কাঁদলাম নরেন এলো না। তাকে দেখার জন্য প্রাণে যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভেতরটায় মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না। অস্থিরভাবে আবার বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়। ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পরে। বললেন, বুড়ো মিনসে, তার জন্য অস্থির হয়েছি, কাঁদছি, লোক দেখে বলবে কি?

বল দেখি! তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা নেই, অপরে দেখে কি ভাববে বলো দেখি?

ঠাকুরের জন্মতিথি। ভক্তগণ তাঁকে নোতুন কাপড়, চন্দন-ফুল-মালায় সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পূর্ব্ব দিকে বাগানের সামনের বারান্দায় কীর্ত্তন হচ্ছে। কখনও ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন, কখনও বা একটি মুখর আঁখর দিয়ে কীর্ত্তন জমিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আনন্দের ব্যাঘাত হচ্ছে! নরেন এখনও আসেনি। চারদিক তাকাচ্ছেন, আর বলছেন, তাইতো নরেন তো এলো না!

বেলা তখন দুটো নরেন উপস্থিত হয়ে প্রণাম করলো। ঠাকুর তাকে দেখেই লাফিয়ে তাঁর কাঁধে বসে গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। সহজ অবস্থা ফিরে পেয়ে নরেনের সঙ্গে কথায় ও তাকে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কীর্ত্তন শোনা হল না।... এখানেও সেই অবিচলিত শিষ্যের (নরেন) সত্য লাভের আশায় অধীর প্রতীক্ষা আর স্নেহময়, প্রেমময় ঠাকুরের বর্ষিত সেই অমোঘ করুণা বারি 'ওরে আয়.... তোরা আয়, কুড়িয়ে নে, কেড়ে নে' অফুরন্ত প্রেমের এই স্নিগ্ধধারা....

কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম নেতাগণ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। নরেন সেখানে উপস্থিত। ঠাকুর ভাবমুখে রয়েছেন। কেশবচন্দ্র ও বিজয়ের মুখের দিকে তাকালেন। পরে নরেনের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। জীবনের উজ্জ্বল চিত্র সহসা তাঁর চোখের পাতায় ভেসে উঠলো, আবার দৃষ্টি ফেরালেন। শেষে পরম স্নেহে নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সভাভঙ্গ হল। কেশবচন্দ্র ও বিজয় গোস্বামী জাহাজে উঠে গেলেন। ঠাকুর মুখর হলেন, একটা শক্তির উৎকর্ষে, কেশব জগৎবিখ্যাত হয়েছে, তোমার মধ্যে আটারোটা শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কেশব ও বিজয়ের অন্তরে দীপশিখার মত জ্ঞানের আলো আর তোমার মধ্যে জ্ঞানসূর্য্য—

বাধা দিয়ে উঠলেন নরেন : মশায় করেন কি? ও কথা শুনে আপনাকে উন্মাদ বলবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব আর মহামান্য বিজয়— আমি তো নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া! ওঁদের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না।

সন্তুষ্ট চিত্তে ঠাকুর বললেন : কি করবো রে, তুই কি ভাবিস আমি বাড়িয়ে বলছি— মা (জগদম্বা) আমাকে দেখালেন তাই বলছি! মা-সত্য ভিন্ন মিথ্যা দেখান নি, তাই বলেছি! অন্য লোক মার নাম শুনলে চুপ করে যায়— নরেন কিন্তু থামার ছেলে নয়। বললো : মা দেখিয়ে থাকেন, না আপনার মাথার খেয়ালে ঐসকল উপস্থিত হয়, কে বলতে পারে? আমার হলে নিশ্চয় বুঝতাম আমার মথার খেয়ালেই ঐরূপ দেখছি! পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও দর্শন প্রমাণ করে দিয়েছে, চোখ কান অনেক সময় প্রতারণা করে। বিশেষ দর্শনের বাসনা যদি মনে সতত জাগে, কথাই নেই। আপনি আমাকে স্নেহ করেন, সকল বিষয়ে বড় দেখতে ইচ্ছা করেন, তাই এ দর্শন উপস্থিত হয়!

দ্বন্দ্বে পড়লেন ঠাকুর। নরেন কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ, মিথ্যা বলার লোক তো নয়! ছুটলেন, মার কাছে। মা আশ্বাস দিলেন, ওর (নরেন) কথা শুনিস কেন? কিছুদিন পরে ও সব কথা সত্য বলে মানবে!....

কেশববাবু মেয়ের বিয়ে নিয়ে দুটো ভাগ হয়ে গেছেন ব্রাহ্মগণ। কেশববাবুর 'নববিধান' অপরটি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। নরেন দু'জায়গায় যায়। তবে রবিবারে সন্ধ্যায় উপাসনাকালে নিয়মিত যোগদান করে ও ভজনাদি করে।

এই সময় দু-একসপ্তাহ নরেন দক্ষিণেশ্বরে যায় নি। ঠাকুর প্রতিদিন প্রতীক্ষা করেন। নিরাশ হয়ে নিজেই নরেনকে দেখতে যাবেন স্থির করলেন। সেদিন রবিবার, যদি দেখা না হয় কোথাও বেরিয়ে যায়! ঠিক করলেন, সন্ধ্যায় উপাসনাকালে যখন ভজন গায়, তখনই উপস্থিত হবেন। মনে এলো সহসা সমাজে উপস্থিত হলে অসন্তোষের কারণ হবে না তো? পরক্ষণেই মনে হল

কেশববাবুর সমাজের কথা! অসন্তোষ দূরের কথা বরং খুশীই হয়। তাড়াছা বিজয়, শিবনাথ অনেকেই তো সাধারণ সমাজের এখানে অনেক সময় এসেছেন।....

সন্ধ্যা সমাগত। ব্রাহ্মভক্তগণ.... 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মন্ত্র সহায়ে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হতে লাগলেন। উপাসনা ও ধ্যান শেষ হল। ঈশ্বরানুরাগ ও আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতা বৃদ্ধির জন্য আচার্য্য বেদী থেকে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। ঠিক এই সময়ে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর ব্রাহ্মমন্দিরে ঢুকে বেদীকায় উপবিষ্ট আচার্য্যের দিকে এগুতে লাগলেন। তাঁর আগমনবার্ত্তা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই তাঁকে দেখতে উন্মুখ। দাঁড়িয়ে পড়লো বেঞ্চে, চেয়ারে যে যেখানে পারে। বিশৃঙ্খলা চারিদিকে। আচার্য্য বক্তব্য বন্ধ করেদিলেন। ভজনমণ্ডলীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বসেছিল। ঠাকুরকে দেখেই বুঝে নিল, কেন এসেছেন তিনি! তাঁরপাশে নেমে এলো। আচার্য্য বা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি সাদর আহ্বান দূরে থাকুক, বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিভেদের জন্য তিনিই দায়ী নিশ্চয় করে শিষ্ঠাচার প্রদর্শনেও উদাসীন রইলো।

ঠাকুর কোনদিকে লক্ষ্য না রেখে বেদীর কাছে উপস্থিত হলেন ও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সমাধিস্থ হওয়ার কথা অনেকেই শুনেছিল। সে অবস্থায় তাঁকে দেখার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বিশৃঙ্খলতা চরমে উঠলো। সভা ভাঙার জন্য গ্যাসের বাতিগুলো নিভিয়ে দিল। ফলে, মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

এ দৃশ্যে মর্ম্মাহিত হল নরেন্দ্রনাথ। অন্ধকারে তাঁকে বাইরে আনার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লো। সমাধি ভঙ্গ হবামাত্র পিছনের দরজা দিয়ে বার করে নিয়ে এসে গাড়ীতে উঠিয়ে নিজেই দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিতে চললো। ঠাকুরের এ লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহিত হল নরেন্দ্রনাথ। তার জন্যই এ অপমান তাঁকে সইতে হল, এ দুঃখ রাখার স্থান খুঁজে পেল না। ক্ষোভে, দুঃখে, ঠাকুরকে এ কাজের জন্য তিরস্কার করলো কিন্তু ঠাকুর এতটুকুও ক্ষুন্ন হলেন না।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলো। নরেন বললো, আপনি আমাকে ভালবেসে অন্ধ হয়ে গেছেন, নিজের কথা চিন্তা করেন না। বলুনতো আজ কত অপমান আপনাকে সইতে হ'ল।.... পুরাণে আছে রাজা ভরত, হরিণ ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পর হরিণ হয়েছিল। একথা যদি সত্য হয়, আপনার, আমার বিষয়ে অত চিন্তার পরিণাম ভেবে সতর্ক হওয়া উচিত!

উত্তরে ঠাকুর চিন্তামিশ্রিত স্বরে বললেন : ঠিক বলেছিস! তাইতোরে তাহলে কি হবে? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না! ছুটলেন মন্দিরে। কিছুপরে ফিরে এলেন হাসিমুখে। বললেন, যা শালা... আমি তোর কথা শুনবো না। মা বললেন : ওকে (নরেন) তুই নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে না পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতে পারবি না!...

১৮৮৪ সালের জানুয়ারী কেশবচন্দ্র দেহরক্ষা করলেন। ভাব বিনিময়ে ভক্তিরসে উভয়ে উভয়ের ছিলেন অন্তরঙ্গ। তাঁকে ভালবাসতেন, গভীরভাবে মনে করতেন তাঁকে, একান্ত আপন জন। তাঁর বিরহে শয্যাশায়ী হলেন ঠাকুর। তিনদিন উঠতে পারলেন না। বললেন, : কেশব চলে গেল, আমার একটা অঙ্গ পড়ে গেছে।....

বি.এ পরীক্ষার ফলাফল তখনও জানা যায়নি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ। বরানগরে নিমন্ত্রিত হয়ে বন্ধুর বাড়ীতে গেল নরেন্দ্রনাথ। রাত এগারোটা পর্য্যন্ত চললো ভজন গান। আহার শেষে শয়ন ঘরে শুয়ে শুয়ে নানারকম আলোচনা চলছে বন্ধুদের মধ্যে। রাত প্রায় দুটো তখনও মশগুল বন্ধুমহল। দরজায় কড়া নাড়ালো বন্ধু হেমালী। চমকে উঠলো নরেন, এত রাতে তুই?

বিষণ্ণ তার মুখ। একটু জড়তাভার কণ্ঠে বললো হেমালী, হ্যাঁ তোকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে এখুনি।... বাবা খুবই অসুস্থ, চল!—

বাবা! বিস্ময় চোখে মুখে। হেমালীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিল নরেন, বাবা তার নেই!

খুলে বল হেমা— কি হয়েছে বাবার! তিনি কি তবে নেই!— স্তব্ধ নরেন। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, কখন?

অপেক্ষার অবসর নেই নরেনের। বেরিয়ে পড়লো দুজনে।... নিঃশব্দ নিথর রাত। শুধু একটা প্রশ্ন, কখন?

বিমর্ষ হেমালী অস্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল, রাত দশটায়—

ফিরে এলো নরেন। সমস্তই শুনলো নীরবে। ওর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলো নিঃশব্দে। বাকশক্তিহীন নীরব শ্রোতা। সংসারের সব খবর এলো কানে। বাবা তার রেখে গেছেন শুধু ঋণের বোঝা!

বিশ্বনাথবাবু উপায় করেছেন দু হাতে, খরচ করেছেন তার দ্বিগুণ। ছিলেন আমুদে লোক, উদার হৃদয়, অতিথি অভ্যাগত সকলকে নিয়ে শুধু আনন্দ করে গেছেন। ব্যয়ের কথা চিন্তা করেন নি কোনদিন।

যাদের তিনি সাহায্য করেছেন, অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়েছেন, তারাই শত্রুতা শুরু করলো। এমন কি তাঁর নিজের বাড়ী থেকে, স্ত্রী পুত্র সকলকে উচ্ছেদ করতে কৃতসঙ্কল্প তারা। ... আয় নেই অথচ সংসারে পাঁচ সাতটি প্রাণী! তাদের ভরণপোষণ।... চিরসুখে পালিত নরেন্দ্রনাথ। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়... বেরুলো চাকরীর সন্ধানে। .... সময় এখন মন্দ, শত চেষ্টাতেও ফল হল না।— শুধু বিফলতা- আর বিফলতা....

কেটে গেল চারটি মাস। দুর্দ্দিনের অবসান হল না। আশা নেই, ভরসা নেই, নিবিড় অন্ধকার চারিদিকে।

...অশৌচটা, হয়নি শেষ, শুরু কর্ম্মের চেষ্টা। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন নিয়ে দুপুর রোদে অফিসের পর অফিসে হানা... কেটে যায় সারা দিন.... অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কেউ কেউ থাকতো সঙ্গে, কোনদিন বা কেউ নেই, সর্ব্বত্রই বিফলতা....। সংসারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ঃ স্বার্থশূন্য সহানুভূতি বিরল এখানে— দুর্ব্বলের, দরিদ্রের স্থান নেই কোথাও। অভিজ্ঞতা— শুধু তিক্ত অভিজ্ঞতা। একদিন দেখেছিল, কিছু সহায়তার অবসর পেলে এরা ধন্য জ্ঞান করতো, আজ দেখেই মুখ বাঁকায়। সাহায্যের ক্ষমতা থাকলেও পিছিয়ে যায়। মনে হল নরেনের : দানবের রচনা এই সংসার।...

রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, শরীর বইছে না, এত ক্লান্ত, বসে পড়লো মনুমেন্টের ছায়ায়। ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল দু'এক জন বন্ধুর। একজন সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গাইতে লাগলো "বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্ম নিঃশ্বাস পবনে..." কত প্রিয় এই গান, আজ তা যেন মাথায় লাঠির আঘাত বলে মনে হল। মনে পড়ে গেল : অসহায় মা আর ভাইদের মুখ! অভিমানে বলে উঠলো : নে, নে চুক কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাদের আত্মীয়বর্গের কষ্ট পেতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাদের গ্রাহ্য করতে হয় না, টানা পাখার হাওয়ায় বসে থাকে- একল্পনা তাদের ভাল লাগে, একদিন আমারও ভাল লাগতো— কঠোর সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে, এটা ব্যঙ্গ বলে মনে হচ্ছে!...

বন্ধু ক্ষুণ্ণ হ'ল! কি দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে একথা নরেনের মুখ থেকে বেরুলো— সে বুঝবে কেমন করে? সকালে খোঁজ নিয়ে যেদিন বোঝে, ঘরে যথেষ্ট আহার্য্য বস্তুর অভাব, মার হাতে পয়সা নেই, সেদিন কাটে তার অনশনে। মা পাছে কষ্ট পান বলতে হয়, নিমন্ত্রণ আছে।

অভিমানে বুকটা কেটে যায় অথচ তা প্রকাশও করতে পারে না। কয়েকদিন আগেও ছিল ধনীর দুলাল, বন্ধুবর্গও সেই সব ঘরের। তারা আগের মতই ঘরে বা বাগানে গানের আসর বসায়, তাকে গান গাওয়ার অনুরোধ জানায়, এড়াতে না পেরে সে আসরে যোগও দিতে হয়। রক্তে মেশানো তার আভিজাত্য— আত্মপ্রকাশের কোন পথ নেই।

কেউ কেউ শুধায়, তোকে আজ এত বিষণ্ণ, এত দুর্ব্বল দেখাচ্ছে কেন? কেউ বেনামী চিঠির মধ্যে টাকা দিয়ে সাহায্য করে তার মাকে! অভুক্তের লজ্জা নেই, কিন্তু তারা আবদ্ধ করছে চির ঋণে। আশ্বস্ত বোধ করে, ঈশ্বর আছেন!....

যৌবনে পদার্পণ করে পথভ্রষ্ট যে সব বন্ধু অসামাজিক পথে টাকা উপায়ে বাধ্য হয়েছে, তারা তার অবস্থার প্রতি সহানুভতি জানায়। দলে টানার চেষ্টা করে। দৃষ্টি তাঁদের ভ্রষ্ট কিন্তু সত্যই তাদের আন্তরিকতা আছে, সহানুভূতি আছে, মায়ামমতা আছে, দুঃখবোধও আছে। সাহায্যের হাত তারা বাড়ায়, এড়িয়ে চলে না! নরেন ভাবে : মানুষ এদেরই ছোট বলে, ঘৃণা করে, আশ্চর্য্য এই পৃথিবী!....

জীবনে এসেছে দুঃসময়! এ সুযোগ গ্রহণ করবে সকলেই। ব্যঙ্গ হাসি হাসবে অনেকেই! প্রতারণা, প্রলোভন, ছড়ানো আনাচে কানাচে। ঈশ্বরও হবেন বিরূপ।

নরেন দেখলো : অবিদ্যরূপিনী মহামায়াও দাঁড়িয়ে পিছনে। শুরু হল ছলনা। বিত্তশালীর মেয়ে। বহুদিনের চেষ্টা নরেনকে জীবনসঙ্গী করবে। তার এই দুর্দ্দিনের সুযোগে প্রস্তাব করে পাঠালো : আমাকে গ্রহণ করো যাবতীয় এই বিষয়ের বিনিময়ে। তোমাদের সংসারের এ দুঃখ দারিদ্রের অবসান হবো সুখী হবে দুজনে!

সেই সংসারের বন্ধন! রুখে দাঁড়ালো নরেন। বললো : যিনি দুঃখ দিয়েছেন, তিনিই তার অবসান করবেন— মানুষের সাধ্য নেই তা দূর করে। শতচেষ্টাতেও তা সম্ভব হয় না। ...সুখ দেহের, মনের তৃপ্তির, তার শেষ নেই। সামনে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে মৃত্যু। তারজন্য প্রস্তুত হও। হীনবুদ্ধি ছাড়, ভগবানকে ডাক।....

এত দুঃখ-কষ্ট। ঈশ্বর মঙ্গলময়— এ বোধ তখনও জাগ্রত। ভোরে নিদ্রা ভাঙলে তাঁকে স্মরণ মনন করে, আশায় বুক বাঁধে নরেন। তারপর বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। একদিন সকালে উঠে ঠাকুরকে স্মরণ করছে মা শুনতে পেলেন পাশের ঘর থেকে। তাঁর অটুট বিশ্বাসে ভাঙন ধরেছে। ক্ষোভে বলে উঠলেন : চুপ কর ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান — ভগবান তো সব করলেন!

মনে বিষম আঘাত পেল নরেন। স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে বসলো, সত্যই কি ভগবান আছেন? এত প্রার্থনা, এত আকুতি, মিনতি কোন উত্তর নেই— কেন? সত্যই কি তিনি শুনতে পান? শিবের সংসারে, এত অ-শিব কোথা থেকে এলো? মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগরমশায় পর দুঃখে কাতর হয়ে বলেছিলেন : ভগবান যদি দয়াময়, মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হয়ে, লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পেয়ে মরে কেন? কানে তার ব্যঙ্গ স্বর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো! অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। সন্দেহ উঁকি দিতে লাগলো : সবই কি তবে মিথ্যে? সত্যই কি তিনি নেই?....

গোপনতা বলে কিছু ছিল না নরেনের। যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনি নির্ভীক। যা সত্য বলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে, অকপটে প্রকাশ করতে, কোন দ্বিধা থাকতো না মনে। মার কথায় যে চিন্তা জেগেছিল মনে, তার উত্তর খুঁজে পায়নি সে। সুতরাং সিদ্ধান্তে এলো, তিনি থাক বা না থাক, তাঁকে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই। প্রচারও শুরু করে দিল : সেই মত। রটে গেল, নরেন নাস্তিক হয়ে গেছে। দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মিশে মদ খায়, অস্থানে কুস্থানে যায়। .... পরিচিত প্রতিবেশী

এমন কি আশৈশব বন্ধুরাও তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলো। আর নরেন! যুক্তির জাল ছড়িয়ে প্রচার শুরু করলো : দুঃখ কষ্টের সংসারে, নিজের দুরাদৃষ্টের বেদনাকে ভুলতে, কেউ যদি মদ খায়, পতিতালয়ে যায়, আপত্তির প্রয়োজন কি? তাদের মত আমিও যদি নিজেকে ভুলে থাকার ক্ষণিক সুখ ভোগকে শ্রেয় বলে নিশ্চিন্ত হতে পারি, ওপথে হাঁটতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হবো না।

কথা কানে হাঁটে। বিকৃতি হতে, হতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পৌঁছলো। কলকাতার ভক্তদের কানেও উঠলো। তাঁদের কেউ কেউ তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য সিমলা পাড়ায় ছুটলো। কেউ হয়ত মুখোমুখি হল। নরেনের সেই একই যুক্তি। বললোঃ মানুষে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে না, বাধ্য হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মানুষ, নেশা করে, মদ খায়! পতিতালয়ে যায়, নিজেকে ভোলার জন্য, ব্যথা-বেদনা লাঘব করার জন্য! ক্ষণিক তা হোক, তবুও তো ভুলে থাকে কিছুক্ষণ।....

ঠাকুরকে তারা ইঙ্গিতে ইশারায় জানালো, যতটা রটেছে, ততটা নয়। তবে কিছু কিছুতো বটে!

আর নরেন অভিমানে ফেটে পড়লো। পাড়া প্রতিবেশী অপবাদ দিতে পারে। কুৎসা রটায় বিকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু যারা ঠাকুরের কাছে যায়, আশে পাশে ঘোরে, তারা একথা বিশ্বাস করলো কিরূপে? বিতর্ক শুরু করলো, হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রমুখ দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করে : "ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই সুতরাং ভয়ে ঈশ্বর বিশ্বাস করাটা চরম দুর্ব্বলতা।"

একে একে তারা এলো, ফিরেও গেল। নরেন অভিমানে ফুলছে আর প্রতীক্ষা করছে। এদের মুখের কথা শুনে ঠাকুরও কি বিশ্বাস করবেন? যদি করেন? অভিমান উথলে ওঠে : করে, করুক? মানুষের মতামতের মূল্য কতটুকু!

ঠাকুর সব কথা শুনলেন। হ্যাঁ বা না, কোন সাড়া তাঁর নেই। তিনি জানেন, এটা মার চরম পরীক্ষা। নরেন উতরে যাবেই!

শেষে ভবনাথ কাঁদতে কাঁদতে জানালো : ম'শাই নরেন্দ্রের যে এ অবস্থা হবে, তা স্বপ্নের অগোচর!

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ঠাকুর : চুক কর শালারা ! মা বলেছেন, সে কখনও এরূপ হতে পারে না! আর কখন আমাকে এ সব কথা বললে, তোদের মুখ আমি দেখতে পারবো না!....

আজন্ম ঈশ্বর বিশ্বাসী নরেন। অভিমাণে নাস্তিকতার নাচনকোদন, মুখে বলে ঈশ্বর নেই, অন্তর কিন্তু সায় দেয় না। ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর জীবনে যেসকল অনুভূতি উপস্থিত হয়েছিল, সেকথা যখনই স্মরণ হয়, চোখের পাতায় সে চিত্র উজ্জ্বল হয়ে ভাসে। নাড়া খায় মন। নিজের অজ্ঞাতে নিজেই ভাবতে শুরু করে : নিশ্চয় তিনি আছেন। তাঁকে লাভ করার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা প্রাণ ধারণের কোন আবশ্যকতা নেই। দুঃখ কষ্ট যতই আসুক, পথ খুঁজে বার করতে হবেই। দিনের পর দিন যায়, চিত্ত বার বার দোলা খায়, শান্তি না পায় মন, না ঘুচে সংসারের অভাব অনটন।

কেটে গেল গ্রীষ্ম, এলো বর্ষা। পথে ঘোরার শেষ নেই। দিনে উপবাস, আর বৃষ্টিতে ভেজা, রাত্রে অবসন্ন পা, অবসন্ন মন, বাড়ী ফিরছে নরেন। এত ক্লান্ত, চলে না পা, পাশের বাড়ীর রকে জড় পদার্থের মত বসে পড়লো নরেন। চেতনা লুপ্ত প্রায়। বন্ধ হয়ে গেছে চোখ। ... কতক্ষণ কেটে গেছে বুঝতে পারেনি নরেন। তলিয়ে ছিল চিন্তার আবর্তে। কতছবি, এলো, গেল, কত তার বর্ণ, কত তার রূপ। উপলব্ধি হল : কেন শিবের সংসারে অ-শিব, ঈশ্বরের কঠোর

ন্যায়পরায়ণতা, আর অপার করুণার মাধুর্য্য। পর্দ্দার পর পর্দ্দা, খেলে গেল চোখের পাতায়। যে সামঞ্জস্য নির্ণয় করতে না পেরে, মনে সংশয় দানা বেঁধেছিল, দূর হ'ল সব। বাড়ীতে ফিরে এলো নরেন। শরীরে ক্লান্তি নেই, মনে অমিত বল, ও পূর্ণ এখন শান্তি। রাত্রির অবসানে ভেসে আসছে ক্ষীণ উষার আলো!...

মন দৃঢ় হয়েছে, হৃদয় সবল হয়েছে। চোখের কোনে উদাসীর ঝর্ণাধারা, প্রশংসা-নিন্দা, সব একাকার। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনের ধারা। অর্থোপার্জ্জন, পরিজনবর্গের সুখ, ভোগ ও সেবার জন্য জন্ম তার হয়নি। পিতামহের পথ অনুসরণে প্রস্তুত হতে লাগলো।

বিদায়ের দিন এলো। খবর এলো ঠাকুর ভক্তের বাড়ীতে আসছেন কলকাতায়। ভাবলো নরেন, ভালই হল! গুরুদর্শন করে চিরকালের মত গৃহত্যাগ করবে!

দেখা হল ঠাকুরের সঙ্গে। ধরে বসলেন : তোকে আজ আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে!

নানা ওজর তুললো নরেন। ঠাকুর নাছোড়বান্দা। রাজী হতে হল নরেনকে। গাড়ীতে উঠলো নরেন। চললো দক্ষিণেশ্বরের পথে। নীরব উভয়েই। থামলো গাড়ী। ঠাকুরের পিছু পিছু ঘরে মধ্যে অন্যসকলের মধ্যে বসলো নরেন। ঠাকুরের ভাবাবেশ হল। সহসা তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহে নরেনকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সজল নয়নে গাইতে লাগলেন :

কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়,
বুঝি তোমায় হারাই, হা-রাই!

এতক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল নরেন। আর পারলো না। ঠাকুরের মত তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বুঝলো নরেন, ঠাকুর সকলকথা বুঝতে পেরেছেন। স্তম্ভিত সকলে।.... প্রকৃতস্থ হলে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো কয়েকজন : কাঁদছিলেন কেন দু'জনে? মৃদু হাসলেন, ঠাকুর। বললেন : আমাদের ও একটা হয়ে গেল! ক্রমে রাত্রি হল। একে একে সকলকেই সরিয়ে দিলেন ঠাকুর। একা বসে নরেন। নিজের কাছে ডেকে বলেন : আমি জানি, তুমি মার কাজের জন্য এসেছ। সংসারে তুমি কখনই থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, ততদিন আমার জন্য থাক! আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় অশ্রুবিসর্জ্জন করতে লাগলেন।

পরের দিন ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলো নরেন। সংসারের চিন্তা নোতুন করে সুরু হল। পূর্ব্বের মতই নানা চেষ্টা করতে লাগলো। 'এটর্নী' অফিসে কয়েকখানি বই অনুবাদের কাজ পেল। সেই আয়ে কোনরূপে দিন চলতে শুরু হল, তবে স্থায়ী কিছু কাজ পাওয়া গেল না। দিনগুজরানের মত মা ও ভাইদের ভরণপোষণের স্বচ্ছল ব্যবস্থা হল না।

কিছুদিন চললো এরূপভাবে। হঠাৎ মনে হল, ঠাকুরের কথা তো ঈশ্বর শুনেন। তাঁকে অনুরোধ করে, মা ভাইদের খাওয়াপরার কষ্ট দূর হয়, এমন একটা প্রার্থনা করিয়ে নেবো। তিনি আমার কথা কখনও অস্বীকার করবেন না। নরেন ছুটলো দক্ষিণেশ্বরে। ধরলো ঠাকুরকে, মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট দূর করার জন্য মাকে জানাতে হবে আপনাকে!

উত্তরে ঠাকুর বললেন : আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই চা না কেন? মাকে মানিস না— সেইজন্যেই তোর এত কষ্ট!

নরেন বললো: আমি তো মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন! আপনি বললেই হবে, আমি কিছুতেই ছাড়ছিনা।

সস্নেহে বললেন ঠাকুর : ওরে মাকে যে আমি কতবার বলেছি, মা, নরেনের দুঃখ কষ্ট দূর কর! তুই মাকে মানিস না সেজন্যেই মা তা শুনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার আমি বলছি, আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাই বি, মা তোকে তাই দেবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইছায় জগৎ প্রসব করেছেন— তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন!'

দৃঢ়বিশ্বাস হল নরেনের। ঠাকুর যখন বলছেন, তখন নিশ্চয় প্রার্থনা মাত্র সকল দুঃখের অবসান হবে। উৎকণ্ঠায় রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ক্রমে রাত্রি এলো। এক প্রহর অতীত হলে পর ঠাকুর শ্রীমন্দিরে যেতে বললেন নরেনকে।

মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো নরেন। গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন। পা টলছে। মাকে, সত্য, সত্য দেখতে পাবে, মায়ের বাণী শুনতে পাবে! স্থির বিশ্বাসে, একাগ্র হয়ে তন্ময় চিত্তে এগিয়ে চলেছে নরেন। মন্দিরে পৌঁছেই দেখলো, মা সত্যই জীবিতা, চিন্ময়ী তিনি। অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবিনী। ভক্তি প্রেমে উচ্ছ্বসিত হল হৃদয়। বিহ্বল হয়ে বার বার প্রণাম করতে করতে বললো, মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, নিত্য তোমার অবাধ দর্শন লাভ করি... এরূপ করিয়ে দাও! শান্তিতে আপ্লুত হল মন। জগত সংসার অন্তর্হিত হয়ে, মাই হৃদয়ে পূর্ণ হয়ে রইলো।

ঠাকুরের কাছে ফিরে আসা মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, মার কাছে সংসারের অভাব দূর করার কথা প্রার্থনা করেছিস তো?

চমকে উঠলো নরেন! বললো : না ভুলেই গিয়েছি। তাই তো, এখন কি করি? বললেন ঠাকুর : যা- যা- ফের যা। গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়!

ফিরে গেল মন্দিরে। মার কাছে গিয়ে মোহিত হয়ে পড়লো নরেন। বার বার প্রণাম করে বললো : মা- আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও!

ফিরে এলো নরেন। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, এবার বলেছিস্ তো?

চমকে উঠলো পুনরায়। বললো, না। মাকে দেখবামাত্র কি এক দৈবীশক্তির প্রভাবে সব ভুলে গেলাম। কেবল জ্ঞান-ভক্তির কথাই বলেছি। কি হবে?

ঠাকুর বললেন : দূর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সামলে, ঐ প্রার্থনাটা করতে পারলি না! পারিস তো আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়— শীগির যা!

মন্দিরে এলো নরেন। লজ্জা এসে হৃদয় অধিকার করলো। মনটা বললো : একি তুচ্ছ কথা মাকে বলতে এসেছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করে 'লাউ কুমড়ো ভিক্ষা করা'— এটা তো নির্ব্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায়, ঘৃণায় বার বার প্রণাম করতে করতে বললো, আর কিছু চাই না মা কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও!...

মন্দিরের বাইরে এসে নরেনের মনে হল, নিশ্চয় এটা ঠাকুরের খেলা নতুবা তিন, তিনবার মার কাছে এসেও বলা হল না! ফিরে এসে ধরে বসলো ঠাকুরকে : নিশ্চয় আমায় ভুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনাকেই বলতে হবে, মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকবে না।

ঠাকুর বললেন, ওরে আমি যে কারও জন্যে ওরূপ প্রার্থনা করতে পারি না, আমার মুখ দিয়ে একথা বার হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি। তুই চাইতে পারলি না, তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই, তা আমি কি করবো!

নরেন ছাড়বার পাত্র নয়। বললো, তা হবেনা, আপনাকে আমার জন্য বলতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বললেই তাদের আর কষ্ট থাকবে না!

ঠাকুর বললেন, আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।...

নরেন হৃদয়ঙ্গম করলো : ঈশ্বরে মাতৃভাব, আর প্রতীক উপাসনার গূঢ় রহস্য! মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীমূর্ত্তিকে ভক্তি ভরে এতদিন দর্শন করতে পারেনি, আজ সে রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে তাঁর, আধ্যাত্মিক জীবনকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করেদিল। মন্দির, থেকে ফিরে ঠাকুরকে ধরলো, আমাকে মার গাণ শিখিয়ে দাও।

ঠাকুরের আনন্দের শেষ নেই। নরেন মাকে মেনেছে। শুধু তাই নয়, মার কাছে পার্থিব সুখ শান্তির জন্য যে টাকা, তা সে চাইতে পারলো না— চেয়ে নিল জ্ঞান, ভক্তি!

শিখিয়ে দিলেন "মা ত্বং হি তারা" গানটি। আর প্রাণ মন ঢেলে সারারাত জেগে গান করলো নরেন। মার গান, তার ওপর সে কালী মেনেছে। আনন্দে দিশেহারা ঠাকুর।...

বেলা ৪টায় ঘুম থেকে নরেন ঠাকুরের কাছে এসে বসলো। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। ঠাকুর তাকে দেখেই ভাবাবিষ্ট হয়ে গা ঘেঁসে বসলেন। বললেন : দেখছ কি! এটাও আমি, আবার ওটাও আমি, সত্যি বলছি, কিছু তফাৎ বুঝতে পারছি না। গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায়, দুটো ভাগ দেখাচ্ছে সত্যি কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। তা মা ছাড়া আর কি আছে বলো? একথা ও কথার পর বললেন, তামাক খাবো। ভক্ত বৈকুণ্ঠবাবু তামাক সেজে হুঁকাটি এগিয়ে দিতেই কয়েক টান টেনে হুঁকা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কলকেতে খাব। দু চার টান দিয়ে, নরেনের মুখের কাছে ধরে বললেন, খা আমার হাতেই খা। নরেন একটু সঙ্কোচ করায় বললেন, তোর তো ভারী হীন বুদ্ধি। তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি। বলেই পুনরায় নরেনের মুখে হাত দুখানি ধরলেন। অগত্যা, নরেন দু তিনবার তামাক টেনে নিরস্ত হল। ঠাকুর আবার তামাক খাওয়ার উদ্যোগ করলেন। নরেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো : হাতটা ধুয়ে খান। সে কথা কে শুনে? দুর শালা, তোর তো ভারী ভেদবুদ্ধি' বলেই তামাক খেতে সুরু করলেন। ....

রাত ৮টা বাজলো। ভাবের উপশম দেখে নরেন উঠে দাঁড়ালো। কলকাতায় ফিরবে সহযাত্রী হলেন বৈকুণ্ঠ রায় ঠাকুর শুধু বললেন, এসো...

নরেন্দ্রনাথ ফিরলো কলকাতায়। কিছুদিনের মধ্যে কয়েকখানি বইয়ের অনুবাদ করে আর্থিক স্বচ্ছলতার সুযোগ পেয়ে গেল। আরও কয়েকদিন কেটে গেল। তারপরেই বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলের বৌবাজার শাখায়, শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হল নরেন্দ্রনাথ। ধীরে ধীরে মানসিক শান্তি ও আর্থিক সাফল্যে আইন পড়তে মনোনিয়োগ করলো।...

ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের যেমন বেছে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি কে কোন শ্রেণী বা কোন পথের যাত্রী, তাকে তেমনি ভাবেই শিক্ষা দিতে লাগলেন। ঠিক তেমনি, কোন ভক্ত কোন শ্রেণীর, তাদেরও সেই মতই উপদেশ দিতে লাগলেন। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৪ শাল। আবাল-বৃদ্ধবনিতা ভক্তের ভীড় শুরু। তাদের অন্তরের ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করে চললেন। আহার নেই, বিশ্রাম নেই। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে বাজিয়ে দেখছেন, তাদের আন্তরিকতা! কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন : তোরা যে এখানে এসেছিস, আমাকে দেখে, তোদের ধারণা কি রকম হ'ল? কেউ বললো; যথার্থ বন্ধু! কেউ বললো, যথার্থ ঈশ্বরভক্ত! কেউ মত প্রকাশ করলো, মহাগুরু। কেউ বা শুধালো, ঈশ্বরাবতার। কেউ জানালো স্বয়ং চৈতন্য, কেউ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো : সাক্ষাৎ শিব, কেউবা স্বীকার করলো, ভগবান। আবার যাদের ঈশ্বরের অবতারত্বে অবিশ্বাস, তারা স্বীয় মত প্রকাশ করলো, আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, ও শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ভক্তাগ্রহীদের সমতুল্য ঈশ্বর প্রেমিক। খ্রীষ্টান ধর্ম্মবিশ্বাসী উইলিয়ামস্ বললো : নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি। (ইনি ঠাকুরের উপদেশে সংসার ত্যাগ করে পঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে তপস্যায় নিযুক্ত হয়ে শরীর পাত করেছেন।)

মহেন্দ্রবাবু (শ্রীম গুপ্ত) বিদ্যাসাগর মশায়ের শ্যামবাজার শাখার স্কুলমাস্টার, প্রধান শিক্ষক। তিনি যে সব ছাত্রের মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা দেখতেন, তাদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের কাছে আসতেন। তেজচন্দ্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, (ছোট) নরেন, পূর্ণ প্রমুখ। পূর্ণ সবচেয়ে ছোট, বয়সে মাত্র তেরো। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ঠাকুর, তাকে দেখে, নিজের হাতে আদর করে খাওয়ালেন। বললেন, তোর যখনই সুবিধা হবে, চলে আসবি। গাড়ী করে, ভাড়া এলেই দিয়ে দেবো। ঠাকুর পূর্ণকে খুব ভালবেসেছিলেন। সে টানটা ঠিক নরেন্দ্রনাথের মত। যখনই দেখতে ইচ্ছা হত, হয় বলরাম বাবুর বাসা বা অন্য কোথাও উঠতেন দুপুরে। স্কুল থেকে এসে দেখা করে যেতো পূর্ণ। একদিন ঠাকুর পূর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাকে তোর কি মনে হয়? ভক্তি গদগদ হয়ে বললো : আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ... একথা শুনে বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইলো না তাঁর। আশীর্ব্বাদ করে শক্তিপূত মন্ত্র দান করলেন।

বৈকুণ্ঠবাবু প্রায় দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় ক্রমে ঘনীভূত হলে পর একদিন মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের ছবি দেখিয়ে শুধালেন : সকলে কেমন ঈশ্বরীয়ভাবে বিভোর রয়েছে দেখছিস!

উত্তরে বৈকুণ্ঠ বললেন : ওরা সব ছোটলোক মশায়!

সে কিরে? ও কথা বলতে আছে ! বললেন ঠাকুর। পুনরায় জোর দিয়ে বললেন বৈকুণ্ঠ, হ্যাঁ মশায়, আমার নদীয়ায় বাড়ী। জানি, বষ্টুম হয় যত ছোটলোক।

তোর নদীয়ায় বাড়ী, তবে তোকে আর একটা প্রনাম! দেখা হলেই ঠাকুর প্রনাম করতেন— এটা ছিল তাঁর রীতি! অন্য যারা সেখানে বসেছিল তাদের দেখিয়ে বললেন, এরা এঁকে (নিজেকে) দেখিয়ে, অবতার বলে, তোর কি মনে হয় বল দেখি?

এরা তো ভারী ছোট কথা বলে মশায়!

সে কি রে? ভগবানের অবতার বলে, তুই বলছিস্ 'ছোট' কথা বলে!

হাঁ মশায়! অবতার তো ঈশ্বরের অংশ, আপানাকে আমার শিব বলে মনে হয়।

বলিস কিরে?

আমার মনে হয়, কি করবো বলুন। আপনি শিবের ধ্যান করতে বলেছেন, চেষ্টাও করি, হয় না। যখনই ধ্যানে বসি আপনার মুখখানা জ্বল জ্বল করে ওঠে, শিবকে আনতে পারি না। আমি আপনাকে শিব বলে ভাবি।

হাসতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, আমি কিন্তু জানি, আমি তোর একগাছি চুলের সমান। উভয়েই হাস্তে লাগলেন। বললেন, তোর জন্য বড় ভাবনা ছিল আজ নিশ্চিন্ত হলাম!.... ভক্ত চায় কিন্তু সেটা পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারলো কি না চিন্তায় থাকেন ভগবান (গুরু)।....

যোগীন (যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী) সাবর্ণ চৌধুরী বংশের ছেলে। বাবা নবীনচন্দ্র ছিলেন, ধনী জমিদার। পুরুষানুক্রমে দক্ষিণেশ্বরেই বাস। এঁদের বাড়ীতে সকল সময় ভাগবতাদী পাঠ, পূজা ও কীর্ত্তনে মুখরিত থাকতো। সাধনকালে ঠাকুর এঁদের বাড়ীতে হরিকথা শুনতে যেতেন। কর্ত্তাদের সঙ্গেও পরিচয় ছিল ঠাকুরের। যোগীন যখন কিশোর, গৃহবিবাদে এঁদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। শেষে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ছোট বেলা থেকেই ছিল ধীর, বিনয়ী ও মধুর প্রকৃতির। শুভ সংস্কার নিয়ে জন্মেছিল যোগীন। ছোট বেলা থেকে তার মনে হতো : এ পৃথিবীর লোক সে নয়, কোন নক্ষত্রপুঞ্জে তার বাস, সেখানে পূর্ব্বপরিচিত সঙ্গীরা নক্ষত্রলোকেই বাস করছে। ... তখনও যৌবনে পা দেয়নি যোগাযোগ হল কালীবাড়ীতে। ঠাকুর একে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়ে

ছিলেন। জগদম্বা তাঁকে যে ছজনকে ঈশ্বরকোটী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এই যুবকটি তাদেরই একজন।

সুরু হল যাওয়া আসা। ইচ্ছা, সেও হবে সর্ব্বত্যাগী, সাধন ভজনে কাটাবে দিন। তাই অপ্রয়োজনেই আসতো ঠাকুরের কাছে। কিন্তু মায়ের চোখের জলে অভিভূত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করলো মার ইছাপূরণ করার জন্য। ঠাকুরে শিক্ষা ছিল কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। বিয়ে করার পর, মনে হল, এর পর ঈশ্বরলাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র! তাঁর সে শিক্ষা ব্যর্থ! হৃদয়ের কোমলতায় যা নষ্ট করেছি, তা আর ফেরানো যাবে না, যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই মঙ্গল! ছেড়ে দিল ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা। মনস্তাপে দিন কাটাতে লাগলো। ঠাকুর কিন্তু ছাড়লেন না। লোক পাঠাতে লাগলেন। সে ডাকে সাড়া দিল না যোগীন।

বিয়ের আগে কালীবাড়ীতে একটি লোক যোগীনকে কিছু কিনতে কয়েকটি টাকা দিয়েছিল। জিনিষগুলি আনিয়ে দিয়েছে দু চার আনা তার কাছে উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। ফেরৎ দিয়ে যাবে বলেছিল আসেনি বা পাঠিয়েও দেয়নি। ঠাকুর জানতেন এ কথা। লোক পাঠালেন : জিনিষ কিনতে টাকা নিলে তার হিসাব বা ফেরৎ পয়সা দিলে না— কি রকম লোক তুমি?

এ সংবাদে অভিমানে, অপমানে ফেটে পড়লো যোগীন। ঠাকুর তাকে জুয়াচোর ভাবলেন! আজই কোনরকমে কালীবাড়ী গিয়ে হিসাব মিটিয়ে দিয়ে আসবে— আর ওমুখো কোনদিন হবে না। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বৈকালের দিকে কালীবাড়ী গেল যোগীন। দূর থেকে দেখলো পরিধানের কাপড় বগলে নিয়ে ঘরের বাইরে ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখেই এগিয়ে এসে বললেন, : বিয়ে করেছিস, তাতে ভয় কি? এখনকার কৃপা থাকলে লাখটা বিয়ে করলেও ক্ষতি হবে না। যদি সংসারে থেকে ঈশ্বর লাভ করতে চাস, স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসিস, তাকে আর তোকে, সেইরূপ করিয়ে দেবো!

ঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্যদশায় কথাগুলো শুনে হতাশায় আলোর দিশা ফিরে পেল যোগীন। হৃদয়ের সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঠাকুরকে প্রণাম করলো যোগীন। ঠাকুর সস্নেহে হাতে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। যোগীন হিসাবের কথা তুললো, কোন কথায় কান দিলেন না তিনি।

ঘরে ফিরে গেল যোগীন। কোন পরিবর্ত্তন নেই। সেই উদাসীনভাব। মা, বাবার অনুযোগ : সংসার করতে হলে উপার্জ্জনে মন দিতে হবে। ঘর বাঁধতে গেলি কেন?

মাকে বলল যোগীন : আমি তো বার বার বলেছিলাম বিয়ে করবো না, তোমার চোখের জলের জন্যই তো রাজী হয়েছিলাম। উত্তরে মা বললেন : ওটা কি একটা কথা। ইচ্ছা ছিল না অথচ বিয়ে করলি, এটা আবার সম্ভব নাকি?

স্তব্ধ হয়ে গেল যোগীন। যার কষ্ট দেখতে না পেরে ঈশ্বরকে ভুললাম, এটা তাঁরই উক্তি! চোখের পাতায় ভেসে উঠলো ঠাকুরের মূর্ত্তি। মন আর মুখের মিল শুধু ওই একটি মাত্র ব্যক্তির! মনটা তার বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেল সংসারের ওপর। ... মাঝে মাঝে রাতেও থাকতে সুরু করলো ঠাকুরের কাছে।

একদিন সারাদিন কাটালো ঠাকুরের কাছে। দেখলো যোগীন, যেই সন্ধ্যা নামে, একে একে বিদায় নিয়ে চলে যায় নিজের ঘরে। লোকাভাবে ঠাকুরের রাত্রে কষ্ট হতে পারে ভেবে বাড়ী ফেরার সঙ্কল্প ত্যাগ করলো যোগীন। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ঈশ্বরীয় আলাপে কাটলো। ঠাকুর জলযোগ করলেন। যোগীনের খাওয়া শেষ হল। ঘরের মধ্যে তাকে শুতে বলে নিজে শয্যা গ্রহণ করলেন তিনি। ...অতীত রাত্রি দ্বিপ্রহর। ঠাকুরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা হল। উঠে দেখলেন, যোগীন গভীর নিদ্রামগ্ন। ঘুম ভাঙালে পাছে কষ্ট হয় ভেবে একাই চললেন পঞ্চবটীর দিকে।

ঠাকুর চলে যাওয়ার পর ঘুম ভাঙলো যোগীনের। দেখলো, ঘরে সে একা। ঠাকুর নেই শয্যায়। গাড়ু গামছা যেমন থাকে তেমনি আছে। ভাবলো ঠাকুর হয়ত বাইরে পাচারী করছেন। বেরিয়ে এলো যোগীন। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট ও সুন্দর চারদিক। কোথাও দেখতে পেল না ঠাকুরকে। সন্দেহ জাগলো মনে : তবে কি নহবতে পত্নীর কাছে ফিরে গেছেন ঠাকুর? তবে কি মুখে ও কাজে বিপরীত অনুষ্ঠান? এক পাশে সন্দেহ, অন্যদিকে ভয় অভিভূত সে অবস্থা। স্থির করে নিল যাচাই করতে হবে কোনটা ঠিক। এগিয়ে গেল নহবত ঘরের দিকে। লক্ষ্য সেই দরজা। ... কেটে গেল কিছুক্ষণ। পঞ্চবটী দিক থেকে চটি জুতার শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। পরমুহূর্তেই সামনে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। সামনে যোগীনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?... লজ্জায় ম্রিয়মান যোগীন। মুখ দেখেই বুঝে নিলেন ঠাকুর। আশ্বাস দিয়ে বললেন : বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।..... যোগীন সামনে, পিছনে ঠাকুর এগিয়ে চললেন ঘরের দিকে ফিরে।...

পরিতাপে ঘুম হলনা যোগীনের। পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ করলো তাঁর সেবায়।....

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে আসে ফিরে যায় সন্ধায়। স্কুলের শিক্ষকতা, বিষয়ে স্বাধিকার রক্ষায় মামলা পরিচালনা। আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, নানা কাজে জড়িয়ে পড়লেও, আজকাল ঠাকুরকে না দেখে স্থির থাক্‌তে পারে না। এতদিন তিনিই (ঠাকুর) নরেনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। নরেন না এলে কখনও লোক পাঠাতেন, কখনও আকুল হয়ে নিজেই কলকাতায় ছুটতেন, তার আগমনের কালে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, কখনও বা তার উপস্থিতিতে পঞ্চবটীতল থেকে নির্গত হয়ে তাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করতেন। এখন ব্যাকুল হয়ে নরেন আসে, ঠাকুর আদর যত্ন করা দূরে থাকুক, একবার কুশল প্রশ্ন পর্য্যন্ত না করে, সম্পূর্ণ, অপরিচিতের মত দৃকপাত না করে আপন মনে বসে থাকেন। নরেন ভাবে, ভাবাবিষ্ট হয়ে রয়েছেন ঠাকুর। কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাজরামশায়ের সঙ্গে তামাক সেবন ও বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করে। পরে আবার যখন ভেতরে আসে, ঠাকুর কোন কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকেন। সারাদিন কেটে গেল, সন্ধ্যা এলো, নরেন তাঁকে প্রণাম করে কলকাতায় ফিরে চললো। এমনিভাবেই চার সপ্তাহ কেটে গেল। নরেন আসে, আর যায়। প্রণাম করে, সন্ধ্যায় বিদায় নেয়। মনে তার দ্বন্দ্ব নেই, সহজ সরল ভাব, যেমন আসতো, তেমনি আসে, যেমন প্রণাম করে ফিরেও যায় তেমনিই। কোথাও বিরতি নেই, কোথাও ভাটা নেই। মৌনী ঠাকুর সহসা বিচলিত হয়ে ডাকলেন কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটাও কথা কই না, তবু তুই এখানে কি করতে আসিস বল দেখি?

উত্তরে নরেন বললো: আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছা হয়, তাই আসি!

ঠাকুর খুশীতে আটখানা হয়ে উঠলেন। বললেন, তোকে বড়ে (পরীক্ষা করে) দেখছিলাম আদর যত্ন না পেলে, তুই পালাস কিনা! তোর মত আধারই এতটা (অবজ্ঞা ও উদাসীন ভাব) সহ্য করতে পারে, অপর হলে এতদিন পালিয়ে যেতো, এপাশে পা মাড়াতো না।...

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হতে লাগলো। নরেন ধরে বসলো ঠাকুরকে। ঠাকুর তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে পঞ্চবটী তলে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বললেন, দ্যাখ, তপস্যা প্রভাবে আমাতে অনিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার মত লোক, যার পরনের কাপড় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তার এসব ব্যবহার করার অবসর কোথায়? ভাবছি, তোকেই ওসব প্রদান করি। মা জানিয়ে দিয়েছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে, ওই শক্তি যদি তোর ভেতর সঞ্চারিত করি, তাহ'লে ওগুলো ব্যবহার করতে পারবি, কি বলিস?

ঠাকুরের পূণ্যদর্শন লাভ করার দিন থেকেই দৈবী শক্তির প্রকাশ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে আসছে। অবিশ্বাসের কারণ না দেখা গেলেও তার হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ, ওই সকল বিভূতি নির্ব্বিচারে গ্রহণের পরামর্শ দিল না। চিন্তা করে জিজ্ঞসা করলো, ওসকলের দ্বারা কি ঈশ্বর লাভের সহায় হবে?

ঠাকুর বললেন : সহায়তা না হলেও, যখন কাজে নিযুক্ত হবি, তখন তা বিশেষ সহায়তা করবে!

এ কথা শুনে নরেন বললো : ও সকলের প্রয়োজন নেই। আগে ঈশ্বরলাভ হোক, তারপর স্থির করবো, গ্রহণ করা উচিত কিনা! বিচিত্র বিভূতিলাভ করে যদি উদ্দেশ্য ভুলে যাই, স্বার্থ প্রেরণায় যদি অযথা ব্যবহার করি, তাহলে সর্ব্বনাশ হবে যে!

নরেন অসম্মত হওয়ায় খুশী হলেন ঠাকুর। বললেন, যখন তোকে সে শক্তি দিলাম, তুইতো বলেছিলি তোর বাপ-মা আছে, তাদের সেবা করতে হবে! তোর ভয় দেখে, আমাকে নিরস্ত হতে হয়েছিল। মনে নেই কি বলেছিলাম? একবারে কাজ নেই কালে কালে (ধীরে সুস্থে) হবে!

ঠাকুরের ঘরে ভক্তের দল। ফলে, তাঁর ত্যাগী শিষ্যরাও সেখানে উপস্থিত। নরেনও তাদেরই একজন। চলছে সদালাপ, কখনও চলছে রঙ্গরসের কথা। উঠলো, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রসঙ্গ। ঠাকুর বোঝাতে লাগলেন। সংক্ষেপে বললেন : তিনটি বিষয় পালনের উপদেশ আছে এই সাধনতন্ত্রে। যদি নিরন্তর যত্নবান হওয়া যায়, পরমপ্রাপ্তি ঘটে যায়। নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম, সেই ঈশ্বর। নামনামী অভেদ জেনেই সব সময় নাম করবে, ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে, সকল সময় সাধুভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে আর কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করে সর্ব্বজীবে দয়া বলেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্য দশায় উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলেন, জীবে দয়া.... জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করার তুই কে? না—না— জীবে দয়া নয় শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

শুনলো সকলেই কিন্তু গূঢ় অর্থ কেউ উপলব্ধি করতে পারলো না। ঠাকুরের ভাব ভাঙালো। বাইরে বেরিয়ে এলো নরেন। কি অদ্ভুত আলো আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম, বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল ও মধুর আলোক প্রদর্শন করলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে হলে সংসার, লোকসঙ্গ বর্জ্জন করে বনে বনে বাস করতে হবে, ভক্তি ভালবাসা কোমল ভাবসকলকে, হৃদয় থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, শুনে এসেছি এতদিন। আর আজ ভাববেশে যা বললেন, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠলো : বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজেও বেদান্তকে অবলম্বন করা যায়। মানুষ যা করে করুক, কোন ক্ষতি নেই। কেবল প্রাণের সঙ্গে একালে বিশ্বাস ও ধারণা করলেই হল— ঈশ্বরই, জীব ও জগতরূপে প্রকাশ রয়েছে, তার সামনে। জীবনের প্রতিমূহূর্ত্তে, যাদের সম্পর্কে সে আসছে, তাদের ভালবাসছে, সেদিকেই সম্মান, শ্রদ্ধা বা করুণা দয়া প্রকাশ করছে, তারা সকলেই, তাঁর অংশ, সেই তিনি। সংসারের প্রতিটি মানুষকে শিবজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করতে শিখলে, রাগ, দ্বেষ, দম্ভ বা দয়া করার অবসর জীবনে তার, কোথায়? শিবজ্ঞানে সেবায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়ে আপনাকেও চিদানন্দ ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব বলে চিনতে পারে অনায়াসে।

ঠাকুরের ভক্তির পথ, সেই আলোকের প্রকাশ। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন পর্যন্ত দেখতে না পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা ভক্তিলাভ সাধকের কাছে, সুদূর পরাহত। শিব বা নারায়ণজ্ঞানে জীবের সেবা করলে, ঈশ্বরকে সকলের মধ্যে দর্শন করে, ভক্তিলাভে, ভক্ত সাধক কৃতার্থ হবে, নিঃসন্দেহ। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে সাধক যদি অগ্রসর হয়, তারাও সন্ধান

পাবে সেই আলোকের। দেহীর কর্ম্ম যেমন ধর্ম্ম, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, সাধকেরও সেই ধর্ম্ম— আশু লক্ষ্যে পৌঁছাতে, এটাই, একমাত্র পথ। ভগবান যদি কখন দিন দেন, যা আজ শুনলাম, সেই সত্য প্রচার করবো সংসারে। মোহিত করবো, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে!....

ঠাকুরের পূর্ব্ব পরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে ছিল বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও ত্যাগী। সাকার ও নিরাকারের উপাসক। ছিল শাক্ত, বৈষ্ণব ও অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত, নানাবিধ অবস্থা ও অনেক প্রকার ভাবের লোক। বিভেদ থাকলেও সমভাবসম্পন্ন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও পথে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান। কেবল একটি ক্ষেত্রে এক, ঈশ্বরলাভের জন্য অশেষ ত্যাগে তারা প্রস্তুত। ঠাকুর তাদের দেহপাশে বদ্ধ করে, নিজ নিজ ভাবে, নিজ ধর্ম্মমতে পারদর্শী হয়ে ওঠার পথ প্রদর্শন করে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির গণ্ডীকে উদার স্বভাবে পরিণত করে দিলেন।

বাগবাজারের বলরামবসুর জন্ম বৈষ্ণব বংশে। ছিলেন, পরম বৈষ্ণব। সংসারে থেকেও অসংসারী, প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হয়েও নিরহংকারী। চরিত্রে, অভিমানের ঠাঁই নেই। পূজা পাঠে কাটান চার পাঁচ ঘণ্টা। অহিংসা পালনে যত্নবান। এমনকি কীট পতঙ্গকে আঘাত করতেন না। যেদিন এলেন ঠাকুরের কাছে, পূর্ব্ব পরিচিতের মত সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে। অবশ্য উনি ভাবাবেশে জেনেছিলেন: ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম একজন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুপার্ষদের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে হরিপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন।

ঠাকুরকে দেখে বলরামের মনের নানা পরিবর্ত্তন সূচিত হল। আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন। বাহ্যপূজাদি, ভক্তির সীমা অতিক্রম করে ঈশ্বর নির্ভরশীল ও সদাচার জীবন যাপন করে সংসারে বাস করতে লাগলেন। স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, শ্রীপদে নিবেদন করে, তাঁর (ঠাকুরের) আজ্ঞা পালন ও সঙ্গলাভ, জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো। তাঁর কৃপায়, শান্তির অধিকারী হলেন এমন কি আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব সকলকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কৃপাসিন্ধুলাভে পরিতৃপ্ত করতে সচেষ্ট হলেন।

বলরামবাবুর দেহে বৈষ্ণবের রক্ত ছিল। মনের কোনে সেই বৈষ্ণবের সুর। উপাসনা কালে মশার কামড়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, মনোনিয়োগ করা যায় না। অথচ আঘাত করতে পারেন না অহিংসাপালনে ত্রুটি দেখা দেবে, কি কর্ত্তব্য স্থির করতে পারেন না। দ্বন্দ্ব মনের কোনে, কি করা উচিত? চিত্তসংযোগ না অহিংসা ব্রত পালন! ছুটলেন, দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেই সমস্যার সমাধান ঘটবে নিশ্চয়!

সারা পথে একই চিন্তা। ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থাকালে, তাঁকে তো কোনদিন মশা মারতে দেখিনি! দুর্ব্বাদল শ্যামল ক্ষেত্রে পা দিলে তাঁর বুকে আঘাতের বেদনা উপস্থিত হয়, যিনি তৃণরাজির জীবনী শক্তি ও চৈতন্যকে স্বীয় চেতনাভূত করে কেঁদে ওঠেন— তাঁকে বরং দর্শন করে এলেই মন পবিত্র হবে, শান্তির পথ খুজে পাবে।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই দেখালেন: তাঁর বালিশ থেকে ছারপোকা নিধনে নিযুক্ত তিনি। বলরামবাবু প্রণাম করাতে ঠাকুর বললেন : বড় ছারপোকা দিন রাত কামড়ায় চিত্তবিক্ষেপ হয়, ঘুমের ব্যাঘাত করে, তাই বেছে বেছে মারছি!

তন্ময় বলরাম। তাঁর (ভক্তের) মনের সংশয়, তিনি এখানে বসে উপলব্ধি করে, তাঁর সংশয়কে দৃঢ় করবার জন্য একাজে ব্রতী। অথচ দু'তিন বছর যাতায়াত করছেন। সন্ধ্যায় আসেন, রাত দ্বিপ্রহরে ফিরে যান, প্রতিসপ্তাহে। তিনচার বার আসেন, কই কোন দিন ত তিনি একাজ করেননি। একাজ-আজ তাঁকেই শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য!....

একদিন ছিল তাঁর সাধনব্রত, 'যতপথ ততপথে কে' চিনে নেবার একান্ত বাসনা— আজ তিনি শিক্ষা দানে ব্রতী। দক্ষিণেশ্বরে লেগেছে আগমনীর স্রোত। যে আসে তাঁকেই সস্নেহে অভিভূত করেন। উপদেশ দেন। আবার আধার বুঝে, স্পর্শ করে, দিব্যদর্শনের পথ প্রশস্ত করে দেন। লক্ষ্য তাঁর, বালক বা অবিবাহিত যুবক। গড়তে হবে সংঘ, তৈরী করতে হবে তাদের। যে ঐশ্বর্য্য লাভ করেছেন তিনি, ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্বময়।... ষোলআনা মন যাদের, যাদের কোন আকর্ষণ নেই, চাই আজ তাদের। শিক্ষা দিতে হবে একান্তে। আহ্বান করে, তাদের শিক্ষা দেন : যোগ, ধ্যান, ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ বিষয়। শিক্ষা দেন ব্রাহ্মচর্য পালনের। অধিকারী নির্ব্বাচনে, ভিন্ন ভিন্ন পথের উপাস্য পথ ও ধারা নির্ব্বাচন করেন : শান্ত, দাস্য, ভাব, অবলম্বনে, ইষ্টের দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে, জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়ার পথ প্রদর্শনে। আর যারা— স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পতি, যশ,মান পার্থিব সকল বিষয়ে জড়িভূত, দিশেহারা, তাদের মানসিক শিক্ষাদান ও ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার উপদেশ দানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এঁদের বর্ষন করলেন করুণা ও কৃপা। —ত্যাগী ভক্তদের দিলেন ভক্তিমার্গের গোপন তত্ত্ব সমূহ। গৃহীদের বললেন, দু একটি সন্তানের জন্মদান করে চিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ কর, ভ্রাতা ভগ্নীর মত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সংসারে অবস্থান কর, সত্যপথে থাক, সকলের সঙ্গে সরল ব্যবহার কর, বিলাসিতা বর্জ্জনে, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাক। শ্রীভগবানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। সকাল সন্ধ্যায় ঈশ্বরের স্মরণ মনন কর, পূজা, জপ, ধ্যানে নিজেদের নিযুক্ত রাখ। আর যারা এসবের অর্থ বুঝতে অক্ষম, তাদের বললেন, হাত তালি দিয়ে হরিনাম কর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নামকীর্ত্তন কর। নারদীয় ভক্তি, উচ্চরোলে নামকীর্ত্তন— কলির সাধন ব্রত, এ-ও যে পারবে না। দিনের শেষে অন্তত 'মা' বলে ডাকবে!....

১৮৮৫ সাল। আগত গ্রীষ্মকাল। গলায় কষ্ট বোধ করতে লাগলেন ঠাকুর। বরফ ব্যবহারে একটু আরাম (স্বচ্ছন্দ) বোধ করায়, ভক্তরা তাঁকে বরফ খাওয়ার অনুরোধ জানালো। সেই মত ব্যবস্থাও হল। দু এক মাস ব্যবহারের পর বেদনা উপস্থিত হল। উপশমের কোন লক্ষণ নেই। বৈশাখ শেষ হল, জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধেক দিন হতে চললো, নোতুন উপসর্গ দেখা দিল। বেশী কথা বললে বা সমাধি হলেই ব্যথার বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা লেগে কণ্ঠের তালুদেশ ফুলে গেল। শুরু হল চিকিৎসা। প্রথমে দেওয়া হল প্রলেপ। কাজ হল না। বৌবাজারের রাখাল ডাক্তারকে আনলেন এক ভক্ত। তিনি বিজ্ঞ চিকিৎসক। এরূপ রোগ সারিয়েছেন বহুলোকের। রোগ নির্ণয় করে গলার ভেতরে ও বাইরে লাগাবার ওষুধ ও মালিশের ব্যবস্থা করলেন। নির্দ্দেশ দিলেন: বেশী কথা বা সমাধিস্থ হওয়া বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বন্ধ হলেই ভাল হয়। যদি সম্ভব না হয়, একটু আধটু তার বেশী নয়।

এলো জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে পানিহাটিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা (মাঘোৎসব) বলে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ রঘুনাথ গোস্বামীকে স্মরণেই প্রতিবৎসর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন। পরমাসুন্দরী স্ত্রী, পিতার অতুল বৈভব সব ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয়ে প্রথম শান্তিপুর যান। তিনি তাঁর আদেশমত ফিরে আসেন পানিহাটিতে। মনে তাঁর সংসার ত্যাগের প্রবল বাসনা অথচ প্রভুর নির্দ্দেশ। মনের বাসনা লুকিয়ে সংসারে বাস ও বাপ, কাকার সাহায্যে দিন কাটাতে লাগলেন। যখন মনে আকুলতা জাগতো বাবার মত নিয়েই ছুটে যেতেন শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য ও পার্ষদগণকে দেখতে। কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসতেন পানিহাটিতে। শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে চলে গেলেন, শ্রী নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। গঙ্গাতীর খড়দহ গ্রামকে কেন্দ্র করে বাঙলায় প্রচার কাজ চলাতে লাগলো। একসময়ে পানিহাটিতে প্রচারে এলেন নিত্যানন্দ স্বামী সঙ্গে ভক্তের দল। রঘুনাথ এলেন দেখা করতে। তাঁকে, ভক্তমণ্ডলীকে ভোজন করাতে নির্দ্দেশ দিলেন। সমাগত শত শত ব্যক্তিকে

ভাগীরথী তীরে ভোজনে পরিতৃপ্ত করলেন রঘুনাথ। বিদায় গ্রহণ কালে শ্রী নিত্যানন্দ ভাবাবেশে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করে বললেন : কালপূর্ণ হয়েছে। শ্রীমহাপ্রভুর কাছে নীলাচলে গমন কর—তিনি তোমায় গ্রহণ করে সনাতন গোস্বামীর কাছে তোমার শিক্ষার ভার অর্পণ করবেন। নিত্যানন্দ প্রভুপাদের আদেশেই গৃহত্যাগ করলেন রঘুনাথ। বৈষ্ণব ভক্তগণ সেদিনটি স্মরণেই এ উৎসবের আয়োজন করেন। যেহেতু চিড়াদধি দিয়ে ভক্তদের সেবা করেছিলেন তাই 'চিড়ার উৎসব' নামে পরিচিত। ঠাকুরও এ উৎসবে মাঝে মাঝে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু ভক্ত সমাগমে কয়েকবছর যোগদান সম্ভব হয়নি। ভক্তদের বললেন : এ মেলায় হরিনামের বাজার বসে, তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল' কখনও দেখিসনি, চল দেখে আসবি। রাম ডাক্তার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ বাধা দিলেন গলার ব্যথা এ অত্যাচারে বাড়বে।

সব শুনে ঠাকুর বললেন : এখান থেকে সকাল সকাল দুটি খেয়ে যাবে, দু একঘণ্টা পরে ফিরে আসলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। অধিক ভাব সমাধিতে ব্যথাটা বাড়তে পারে একটু সামলে চললেই হবে। ...' এর পর আপত্তি ভেস্তে গেল। যাত্রার তোড়জোড় চলতে লাগলো

দুটো নৌকা ভাড়া করে প্রায় পঁচিশজন ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে গেল নটার সময়। ঠাকুরের জন্য একটা নৌকা ভাড়া করা হল। স্ত্রীভক্তরাও এসে গেছেন। শ্রীমাকে সাহায্য করছেন আহারের ব্যবস্থায়। পায়ে হেঁটেও উপস্থিত আরও অনেকে।

দশটার মধ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত সকলে। ঠাকুর জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বললেন : তোমরা তো যাচ্ছ, যদি ওর (শ্রীমা) ইচ্ছা হয় তো চলুক!

শ্রীমা বুঝে নিলেন ঠাকুরের ইচ্ছা। বলে পাঠালেন : সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে, সেথা ভীড়। নৌকা থেকে নেমে দর্শন করা দুষ্কর হবে, অমি যাবো না।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। নৌকা পানিহাটিতে পৌঁছালো। গঙ্গাতীরে প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ, চারপাশে সমাগত লোকের ভীড়। বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা। কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়েই ঠাকুর মেতে উঠলেন, ভাবাবেশ হবে গলার ব্যথাও বাড়বে, চিন্তা করেই নরেন্দ্র, বলরাম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংযত করার চেষ্টা করলেন। প্রথমে উঠলেন মণিসেন মশাইয়ের বাড়ী। মণিবাবু ও বাড়ীর সকলে তাঁকে প্রণাম করে বৈঠকখানায় বসালেন। ঘরখানি ইংরাজদের অনুকরণে সুসজ্জিত, টেবিল, চেয়ার, সোফা, কার্পেট কোন কিছুর ব্যতিক্রম নেই। দশ পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে পাশেই বাড়ীর ঠাকুর ৺রাধাকান্তজীকে দেখ্‌তে চললেন ঠাকুর। মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দিরে গিয়ে সুন্দর সেই যুগল মূর্ত্তি দর্শন করে প্রণাম করতে উদ্যত একদল কীর্ত্তনীয়া গান শুরু করলো। মেলাতে, যারাই আসে, প্রথমে এখানে কীর্ত্তন করে গঙ্গাতীরে মেলায় গিয়ে যোগদান করে। এরই মধ্যে এক গোস্বামী কাঁধে উত্তরীয় গুছিয়ে ধোপদস্ত রোলির থান ধুতি পরে ভাবাবিষ্টের ভানে অঙ্গভঙ্গী করে হুঙ্কার ও নৃত্য শুরু করলো।

প্রণাম করে নাট মন্দিরের একপাশে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন শুনছিলেন। গোস্বামীর ভান দেখে মৃদু হেসে নরেন্দ্র প্রমুখ ভক্তদের বললেন, ঢং দ্যাখ! হাসির রোল উঠলো। তিনি নিজেকে সামলে চলছেন দেখে সবাই নিশ্চিন্ত হল। পরক্ষণেই ঠাকুর এক লাফে কীর্ত্তনদলের মাঝখানে গিয়ে ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ নাটমন্দিরে নেমে শশব্যস্তে তাঁকে ঘিরে রইলো। কখনও অর্দ্ধবাহ্যদশা লাভ করে সিংহবিক্রমে নৃত্য করতে লাগলেন, কখনও সংজ্ঞা হারিয়ে স্থির হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে কখনও তালে তালে এগুচ্ছেন কখনও পিছু চলে যাচ্ছেন। 'সুখময় সায়রে' মীনের মত মহানন্দে সন্তরণ ও দুটা মেশানো উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ। কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় তাঁকে বেষ্টন করে শতগুণ উৎসাহে কীর্ত্তন করতে লাগলো।

কেটে গেল অর্দ্ধঘণ্টা। কিঞ্চিৎ প্রকৃতস্থ হলেন ঠাকুর। তাঁকে কীর্ত্তনীয়াদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চললো। স্থির হল, অনেক দূরে রাখা হবে পণ্ডিতের বাড়ী গিয়ে যুগল বিগ্রহ ও যে শালগ্রাম শিলার নিত্য সেবা তিনি করতেন, তা দেখেই নৌকায় ফিরে যাওয়া হবে। সম্মত হলেন ঠাকুর। মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী থেকে বার হলেন কিন্তু কীর্ত্তনীয়ার দল সঙ্গ ছাড়লো না। তারা নাম গান করতে করতে পিছু পিছু আসতে লাগলো। ঠাকুরও দু চার পা এগিয়ে ভাবাবেশে স্থির হয়ে যেতে লাগলেন। আবার যেই অর্দ্ধবাহ্য দশায় নামছেন, তাঁকে এগুনোর জন্যে অনুরোধ করছেন ভক্তবৃন্দ। কয়েক পা এগিয়ে পুনরায় ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর শরীরে ছড়িয়ে পড়লো লাবণ্যের ছটা। পরণে গৈরিক গরদ, দীর্ঘ তনু, দিব্যোজ্জ্বল ভরা মুখমণ্ডলে বিকীর্ণ জ্যোতিরেখা, মুখে অনুপম হাসি, দৃষ্টিতে শান্তি ও করুণার ছায়া মন্ত্রমুগ্ধ দর্শন, প্রেরণা মুগ্ধ কীর্ত্তনীয়ার দল গাইছে : সুরধুনী তীরে হরি বলে ফেরে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। ওরে হরি বলে ফেরে, জয় রাধে বলে ফিরে , বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে (আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে (এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। ঠাকুর কে নির্দ্দেশ করে মহানন্দে নাচতে লাগলো তারা।

রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে আসতে তিনঘণ্টা কেটে গেল। মন্দিরে দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রাম করতে আরও আধঘণ্টা অতীত হল। ভীড় তখন কমে এসেছে। নৌকায় উঠলেন ঠাকুর ও ভক্ত বৃন্দ। ছাড়বার উপক্রম করছে নৌকা, কোন্নগর নিবাসী নবচৈতন্য মিত্র এসে পৌঁছালেন। ঠাকুর এসেছেন খবর পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে উন্মত্তের মত ছুটে এলেন তিনি। ঠাকুরের পদপ্রান্তে আছাড় খেয়ে পড়ে আকুল আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কৃপা করুণ!

তাঁর আকুলতা ও ভক্তি দর্শণে, ভাবাবেশে স্পর্শ করলেন ঠাকুর। তার সেই ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষে অসীম উল্লাসে পরিণত হয়ে শুরু করলো তাণ্ডব নৃত্য। স্তব স্তুতি পূর্ব্বক বার বার সাষ্টঙ্গে প্রণাম্ করতে লাগলো। কেটে গেল কিছুক্ষণ। ঠাকুর তাঁর পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। এর আগে তিনি ঠাকুরকে দেখেছিলেন কিন্তু কৃপা লাভ করতে পারেন নি। আজ সার্থক হল তাঁর প্রাণের কামনা। সংসারের ভার ছেলের হাতে সঁপে দিয়ে অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থ অবলম্বনে সাধন ভজন ও ঠাকুরের গুণগানে দিন কাটাবেন স্থির করে নিলেন।

বিদায় নিলেন নবচৈতন্য। ছাড়লো নৌকা। নামলো সন্ধ্যা, ঘাটে এসে পৌঁছালো রাত্রি তখন সাড়ে আটটা। ঠাকুর, ঘরে ঢুকে আসন করলেন। ভক্তবৃন্দ প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

পরদিন স্নানযাত্রা। কালী বাড়ী প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক অনুষ্ঠান। সূচনা হয় জাঁকজমকের সঙ্গে। স্ত্রীভক্তরা রয়ে গেলেন শ্রীমার কাছে। ঠাকুর আহারে বসলেন। পানিহাটির উৎসবের কথা উঠলো। ঠাকুর বললেন, এতভীড় তার ওপর ভাবসমাধির জন্য সকলের দৃষ্টি আমার ওপর। ও সঙ্গে না যাওয়া বুদ্ধিমতীর পরিচায়ক। ওকে সঙ্গে দেখলে বলতো 'হংসহংসী' এসেছে! একটু পরে পুনরায় বললেন,: মাড়োয়ারী ভক্ত (লছমী নারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাইলো, আমার মাথায় যেন কেউ করাত বসিয়ে দিল। মাকে বললাম : এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাতে এলি। মনে হল ওর (শ্রীমার) মন কি বলে জানা দরকার। বললাম, ওগো এই টাকা দিতে চাচ্ছে, আমি নিতে পারবো না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে, তুমি তা নাও না কেন! কি বল? শুনেই ও বললো, তা কেমন করে হবে? তুমি নেবে না, আমি নিলে তো তোমারই নেওয়া হবে। কারণ আমি নিয়ে রাখলে তোমার সেবা বা অন্য কিছু আবশ্যক হলে খরচ না করে পারবো না। ফলে তোমারই গ্রহণ করা হবে। ত্যাগের জন্য তোমায় শ্রদ্ধা ভক্তি করে, অতএব টাকা কিছুতেই নেওয়া চলে না। ওর কথা শুনে আমি হাঁপ ফেলে বাঁচি। অমন না হলে আমায় কি তোরা পেতিস।...

স্ত্রীভক্তগণ ঠাকুরের খাবার পর শ্রীমার কাছে ফিরে গেল। ঠাকুর যা বলেছিলেন, বললো তাঁকে। সহাস্যে বললেন শ্রীমা, উনি যে ভাবে যেতে বলে পাঠালেন, বুঝে নিলাম ওঁর মনের অভিপ্রায়। 'হ্যাঁ যাবে বই কি' এহল ওঁর মনের কথা। মীমাংসার ভার দিয়ে বললেন : 'ওঁর ইচ্ছা হয় তো চলুক'! শ্রীমা বললেন, ওঁর ইচ্ছাই তো আমার ইচ্ছা! সাক্ষাৎ মা কালী!....

গাত্রদাহ উপস্থিত হ'ল। সারারাত্রি ঘুমতে পারলেন না ঠাকুর। নানা চরিত্রের লোক স্পর্শ করেছে তাঁর দেবঅঙ্গ, মনে তাদের কত কামনা, বাসনা, সে জ্বালার ভার তো তাঁকে বইতে হবেই। এ জ্বালা তো প্রথম নয়, যখনই কামনা, বাসনা, রোগ, শোক-দুঃখ বেদনার ভার মুছে দেবার জন্য স্পর্শ করেছে, পদধূলি গ্রহণ করেছে, তখনই দেখা দিয়েছে এ গাত্রদাহ। এ জ্বালা বহন করতে তাঁকে হবেই, এই জন্যই তো আগমন!....

গায়ের ব্যথা বাড়লো। বৃষ্টিতে ভিজেছেন, খালি গায়ে ভাবাবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করছেন, এ অত্যাচার কি রুগ্নদেহ বহন করতে পারে? চিকিৎসকগণ ভয় দেখালেন: এরকম করলে, নিষেধ না মানলে, রোগটা কঠিন হয়ে উঠবে!

ঠাকুরের আজীবন বালভাব। আচার ব্যবহার ঠিক বালকের মত। গতদিনের অত্যাচারের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন, রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদের ওপর। বললেন, ওরা যদি একটু জোর দিয়ে মানা করতো, আমি কি পানিহাটিতে যেতে পারতাম? ও পাশ করা ডাক্তার, চিকিৎসা ব্যবসা না করলেও তো ডাক্তার! ওর কথা কি আমান্য করতে পারতাম?

ডাক্তারের কড়া হুকুম। ঠাকুর গলায় প্রলেপ লাগিয়ে ঘরের মধ্যে, তক্তপোষের ওপর বসে আছেন। মুখখানা ভার। পরিচিত একজন ভক্ত এসে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো : কি হয়েছে? আপনি এমন করে বসে কেন?

গলার প্রলেপ দেখিয়ে মৃদুস্বরে উত্তরে বললেন ঠাকুর : এই দ্যাখনা, ব্যাথা বেড়েছে, ডাক্তার বেশী কথা বলতে নিষেধ করে গেছে।

ভক্ত বুঝলেন ঠাকুরের মনে বেদনার কারণ। বেশী কথা বলা চলবে না। সেটা তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়। তবুও বললেন : শুনলাম সেদিন পানিহাটি গিয়ে ছিলেন? সেইজন্যেই বোধ হয় ব্যথাটা বেড়েছে।

ছোটছেলের মত অভিমান ভরা কণ্ঠে বললেন : হ্যাঁ! একটু টেনে বললেন, দ্যাখ দেখি, উপরে জল, নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি, পথে কাদা, আর রাম কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো। সে পাশ করা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করতো, তাহলে কি আমি সেখানে যাই?

ভক্ত সুরে সুর মেলালেন, রামের ভারী অন্যায়! যা হবার তো হয়েই গেছে, কয়েকটা দিন সাবধানে থাকুন, সেরে যাবে!

খুশীতে মুখর হয়ে উঠলেন ঠাকুর : তা বলে, একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়? এই দ্যাখ দেখি, তুই কত দূর থেকে এলি আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইবনা তাকি হয়?

উত্তরে বললেন ভক্ত : আপনাকে দেখলেই আনন্দ হয়, কথা নাই বা বললেন, আমাদের কোন কষ্ট হবে না। ভাল হয়ে উঠুন, কত কথা শুনবো তখন!

সে কথা কে শুনে? ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কষ্ট সব ভুলে গেলেন ঠাকুর। মেতে উঠলেন আলাপ আলোচনায়!....

আষাঢ় শেষ হল। একমাসের ওপর চিকিৎসা চললো, ঠাকুরের গলার ব্যথার উপশম হল না। অন্য সময় একটু কম বলে মনে হলেও একাদশী, পূর্ণিমা, আমাবস্যা তিথিতে বাড়তে

লাগলো। কঠিন খাদ্য ও তরকারী গলার্ধকরণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। দুধ ভাত, সুজির পায়েস খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে স্থির করলেন ক্লার্‌জিম্যান্‌স্‌ সোর থ্রোট' ধর্ম্মযাজকদের দিবারাত্র উপদেশ দেওয়ার জন্য গলক্ষেতের সৃষ্টি হয়। সেই রোগে আক্রান্ত ঠাকুর। পথ্য মেনে চললেও ব্যতিক্রম দেখা দিল ধর্ম্মচর্চ্চা, ঈশ্বরপ্রেম ও সংসার সন্তপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণা, সমাধি আর বাকসংযমে বিরতি, সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হলেই হারিয়ে ফেলছেন সেই বুদ্ধি, সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন সেই মুহূর্ত্তে। শোক, তাপ, মুহ্যমান সংসারী মানুষ চায় পথের সন্ধান, শান্তির প্রয়াসী তারা। যে মুহূর্ত্তে সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁর মন করুণায় আত্মহারা হয়ে পড়ছে। তিনি উপদেশ দানে কৃতার্থ করছেন তাঁদের।

কেশবচন্দ্রের আগমনের পর থেকেই ভক্তের সমাগম। তার পূর্ব্বে দিনে আসতো পাঁচ কি সাতজন ভক্ত। এখন বিশ্রাম নেই রাত দশটা পর্য্যন্ত। এগারোটায় শয্যায় বিশ্রাম কিছু সময়, পরে ভাবাবেশে পদচারণা দরজা খুলে কখনও পশ্চিম, কখনও বা উত্তর, আবার ফিরে আসছেন শয্যায়, তাও জাগ্রত। যেই বাজলো চারটা, উঠেই শুরু করলেন ঈশ্বরের স্মরণ মনন, নাম গুণ গান। ফুটে উঠলো ঊষার আলো, ডাক দিলেন ভক্তদের।....

সাধনার শুরু থেকে একটানা শরীরের ওপর অত্যাচার, নেই আহার, নেই নিদ্রা, নেই ক্লান্তি, আজ অবসন্ন ঠাকুর। শরীর বইছে না— তবুও পূর্ণ করতে হবে জগদম্বার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পূরণের জন্যই তো তাঁর আগমন। ইচ্ছাময়ী তিনি, তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে এই জগত-সংসার। তবুও তিনি ক্লান্ত নন, মাকে আক্ষেপ করে ভাবাবিষ্ট হয়ে নিবেদন করলেন যত সব এঁদো লোককে আনবি এক সের দুধে পাঁচ সের জল, ফু দিয়ে জ্বাল ঠেলতে আমার চোখ গেল, হাড় মাটি হল অত করতে আমি পারবো না। তোর মন থাকে তুই কর গে যা। ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দু'এক কথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে!... আবার কখনও আবেদন জানাচ্ছেন— বিজয়, গিরিশ, কেদার, রামমাষ্টার এই কয়জনকে একটু শক্তি দে, যাতে নোতুন কেউ এলে, এরা কতকটা তৈরী করবে, তারপর আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে! গলায় প্রথম বেদনা অনুভবের পর মাকে নিবেদন করলেন, এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস! লোকের ভীড়ে যে নাইবার, খাবার, সময় পাই না। একে তো এই ফুটো ঢাক রাতদিন বাজালে আর কদিন টিকবে!...

চার পাঁচ বছর আগে একদিন ঠাকুর শ্রীমাকে বলেছিলেন, যখন আমি যার তার হাতে খাবো, কলকাতায় রাত্রি যাপন করবো, খাদ্যের অগ্রভাগ প্রদান করে অবশিষ্ট গ্রহণ করবো, অধিক লোক যখন দেবজ্ঞানে মানবে, ভক্তি করবে, তখনই জানবে আমার দেহ রক্ষার সময় হয়ে গেছে। ... একথা ভক্তদেরও শুনিয়েছেন, অনেকবার, তবুও জগদম্বার মায়ার প্রভাবে বিস্মৃত প্রায় সকলেই। কেবল ঠাকুরই জানেন, প্রদীপে তেল ফুরিয়ে আসছে, সময় বেশী নেই, শেষ আলো দেওয়ার এই তো সময়! ব্যাধি, দেহ থাকলেই হবে, বেদনা সে তো ব্যাধির ধর্ম্ম--- তাকে ভুলে থাকার জন্যই তো সমাধি। স্মরণ মননে তলিয়ে যাওয়া, দেহবোধ ভুলে থাকা। আর বাকী রইলো যা, সেটার জন্যই নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া জনস্রোতে, যারা, ব্যথা, বেদনায় মুহ্যমান, দিশাহারা, চায় পথের সন্ধান তাদের আর কিছু না হোক এতটুকু আলোর সন্ধান দেওয়া, এটাই জগদম্বার শেষ নির্দ্দেশনামা... এর মানেই তো লোকশিক্ষা!

কথাগুলো স্মরণে ছিল শ্রীমার। বালররামবাবুর বাড়ীতে রাত্রি যাপন, নরেন যখন অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে না আসায় অধীর হয়ে তাকে আনিয়ে নিজের ঝোল ভাতের অগ্রভাগ দান করলেন ঠাকুর। আপত্তি তুলেছিলেন শ্রীমা। নোতুন করে রাঁধার জন্য যখন ব্যস্ত, তখন তাঁকে আশ্বাস দিলেন, নরেনকে অগ্রভাগ দিতে মনে সঙ্কোচ নেই, দোষ হবে না,

তোমার রান্নার প্রয়োজন নেই!... নির্দ্দেশ পালন করে ছিলেন সেদিন। কিন্তু আশঙ্কা রয়ে গিয়েছিল মনে। আজ জনসাধারণের ভিড়, দেবজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করছেন তাঁকে, এ দৃশ্য দেখছেন শ্রীমা, কিন্তু না-না-তিনি তো স্বয়ং মা কালী।

শ্রাবনের শেষ। ঠাকুরের গলার ব্যথা কমছে না বরং দিনের পর দিন বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। দুধ ভাত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারছেন না। এক মহিলা ভক্ত ঠাকুরে দেখতে চলেছেন। ঐ পল্লীর অধিবাসী অন্য এক মহিলা বললেন, ঠাকুরকে দেবার মত কিছু আজ বাড়ীতে নেই। এক ঘটি দুধ দেবো নিয়ে যাবে? ভক্ত মহিলা বললেন : দক্ষিণেশ্বরে দুধের অভাব নেই তাছাড়া ঠাকুরের জন্য তো দুধ বরাদ্দ আছে। নিয়ে যাওয়ারও হাঙ্গামা— থাক প্রয়োজন নেই!

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই জানতে পারলেন গোয়ালিনী আজ দুধ দেয়নি, শ্রীমা ভীষণ চিন্তিত কি খাবেন ঠাকুর! ভক্ত মহিলা মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে, পাড়ায় কোথাও দুধ পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধানে জানতে পারলেন, ঠাকুর বাড়ীর একটু দূরে পাঁড়ে গিন্নী দুধ বিক্রী করে। ছুটলেন তিনি। জানালেন সব বিক্রী হয়ে গেছে, দেড় পোয়া উদ্বৃত্ত হয়েছিল জ্বাল দিয়ে রেখেছে। সেই দুধই কিনে নিয়ে এলেন। সেদিন ঐ দুধেই আহার করলেন ঠাকুর। আচমন করতে উঠলে তিনিই হাতে জল ঢেলে দিতে লাগলেন। ঠাকুর তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, ওগো, গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি যে মন্ত্রটি জান তা উচ্চারণ করে গলায় হাতটা বুলিয়ে দাওতো! স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভক্তটি। মন্ত্র উচ্চারণে গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে শ্রীমার কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি যে মন্ত্র জানি, উনি জানলেন কেমন করে? সকাম কর্ম্ম সাধনে সিদ্ধ জেনে এক ঘোষ বাড়ীর মেয়ের কাছে এমন্ত্র শিখেছিলাম। পরে, নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য জেনে ওটা ত্যাগ করে ছিলাম। ঠাকুর পাছে একথা জানলে ক্ষুব্ধ হন তাই লুকিয়ে রেখেছিলাম— উনি তা টের পেলেন কেমন করে? শ্রীমা সব শুনে হাসতে লাগলেন। বললেন, ওগো, উনি সকল কথা জানতে পারেন! মন মুখ এক করে সৎ উদ্দেশ্যে যে যা করেন, তাকে কোনদিন ঘৃণা করেন না। তোমার ভয় নেই, এখানে আসার আগে, আমিও ঐ মন্ত্র গ্রহণ করেছিলাম। ওঁকে বলতে, বললেন, মন্ত্র নিয়েছ ক্ষতি নেই, ইষ্টপদে ওটা সমর্পন করে দাও।"...

শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্রের কিছুদিন হয়ে গেল, গলার ব্যথা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ভক্তগণ চিন্তিত কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির করতে পারছেন না। বাগবাজার নিবাসিনী এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ীতে ভক্তগণকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন। ঠাকুরকেও আনবার ইচ্ছাছিল, তাঁর শরীরের কথা জানতেন বলে, অন্য এক ভক্তকে পাঠিয়ে ছিলেন যদি কিছুক্ষণের জন্য তাঁর বাড়ী বেড়িয়ে যান। নটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে সমবেত সকলকে ভোজনে বসাতে যাচ্ছেন, তখন সংবাদ এলো তালুদেশ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, সেজন্য ঠাকুর আসতে পারলেন না।

সে কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ বিষন্ন হয়ে পড়লো। অন্য একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলো : মুখটা তোমার এত ভার ভার কেন?

উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললো, "যাকে নিয়ে এত আনন্দ, তিনি বুঝি এবার সরে যাবেন! আমি ডাক্তারী বই পড়ে ও ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, এই রোগ ক্রমে ক্যান্সারে পরিণত হয়। আজকের রক্ত পড়ার কথা শুনে সন্দেহ হচ্ছে। এরোগের ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি।

পরের দিন ভক্তদের মধ্য থেকে প্রবীন কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করলে তিনি সম্মত হলেন। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জ্জী স্ট্রীটের ছোট একটি বাড়ীর ছাদ থেকে গঙ্গাদর্শন হয় দেখে ভাড়া করে ঠাকুরকে আনার ব্যবস্থা হল। তিনি ঐ স্বল্প পরিসর বাড়ীতে বাস করতে পারবেন না বলায় বলরাম ভবনে কয়েকদিন যাপনের ব্যবস্থা হল।

চিকিৎসার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন, যে বিশ্রামের আয়োজন, এখানেও তা সম্ভব হল না। ভীড় কমলো কিন্তু ভক্তের আগমন বন্ধ হল না। দোতলায় বেশ বড় একটি ঘর, পূর্ণ ভক্ত সমাবেশে, চলছে গান। গাইছেন গিরিশবাবু (ঘোষ) ও কালীপদ বাবু (ঘোষ) : আমায় ধর নিতাই। আমার প্রাণ যেন আজকে কেমন করে।..... আর ঘরের পশ্চিম দিকে সমাধিস্থ ঠাকুর। অপূর্ব্ব প্রসন্নতা ঠোঁটে ফুটে আছে অপূর্ব্ব হাসি। চরণ উত্থিত ও প্রসারিত সেটি বুকে ধারণ করে বসে আছেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক নৃত্যগোপাল গোস্বামী। সুপুরুষ, ভক্তিমান ঠাকুরের অসুস্থতার সংবাদে তাঁকে দেখতে এসেছেন।

গান শেষ হল, ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হয়ে বলে উঠলেন বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনবার ঐ নাম উচ্চারণ করে প্রকৃতস্থ হয়ে পড়লেন। বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হলেন অন্য ভক্তদের সঙ্গে।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটের পূর্ব্ব পশ্চিমে ভাড়া নেওয়া হল বাড়ী। প্রথম তলায় ডাইনে ও বাঁয়ে বসার চাতাল ও সরু একটি রক। একটু এগিয়েই দোতালায় ওঠার সিঁড়ি। উঠেই ডানদিকে উত্তর দক্ষিণে চওড়া একখানি লম্বা ঘর। এটা সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হল। বাঁয়ে পূর্ব্ব পশ্চিমে ঘরগুলির পাশ দিয়ে পথ। পড়বে প্রথমে বেশ বড় একটি বৈঠকখানা। ঠাকুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট এই ঘর। দক্ষিণে বেশ চওড়া বারান্দা। পশ্চিমে দুখানি ঘর একটিতে ভক্তদের রাত্রে খাবার ব্যবস্থা, অপরটিতে নির্দ্দিষ্ট শ্রীমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। এছাড়া সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পশ্চিমের অল্প চওড়া বারান্দা। ঠাকুরের ঘরে যাবার পূর্ব্ব দিকে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। আর ছাদে যাবার দরজার পাশে চার হাত আন্দাজ লম্বা ও চওড়া ছাওয়া এটি চাতাল। ওই চাতালটিতেই শ্রীমা সারাদিন অতিবাহিত করে ঠাকুরের পথ্য তৈরীর ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

আনা হল মহেন্দ্রলাল সরকারকে। মথুরমোহনের পারিবারিক চিকিৎসার সময় আলাপ হয়েছিল ঠাকুরের সঙ্গে। এখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। তবুও চিনতে পারলেন তিনি। যত্নসহকারে পরীক্ষা ও ওষুধ ব্যবস্থার পর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী ও ধর্ম্মালাপে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে গেলেন। বলে গেলেন, প্রতিদিন সকালে তাঁকে যেন, ঠাকুরের শরীরের অবস্থার সংবাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়দিন এলেন। যথারীতি পরীক্ষার পর কথায় কথায় জানতে পারলেন ভক্তরা ঠাকুরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম দিনের 'ফি' নিলেও জানিয়ে দিলেন, এরপর তাঁর আর 'ফি' লাগবে না। ভক্তদের সহায়তাকে তিনি সৎকাজ বলে মনে করেন।

সুচিকিৎসকের সহায়তা লাভ হল। শ্রীমাকে আনানো হয়েছে। এখন সেবার লোকের প্রয়োজন। স্কুল কলেজের ছাত্র ভক্তরা এগিয়ে এসেছে। সমস্যা প্রতিদিন রাত্রি কাটানো, তাদের পক্ষে সম্ভব কিনা। অভিভাবকদের কাছ থেকে আপত্তি উঠবে এবং সেটাই স্বাভাবিক।

ঠাকুর বলতেন : যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। যাহাকে যেমন, তাহাকে তেমন। দেশকাল পাত্র ভেদ বিবেচনা করে সংসারে সকল বিষয়ে অনুষ্ঠান করতে ও আপনাকে চালাতে না পারলে শান্তিলাভ বা অভিষ্ট সাধনে সমর্থ হওয়া যায় না। শ্রীমাও এশিক্ষা গ্রহণ করে ছিলেন নিজের জীবনে। লজ্জাশীলা গ্রাম্যমেয়ে নহবত বাসকালে ঠাকুরের বালক ভক্তরাও, তাঁর পা দুটি ছাড়া শ্রীমুখ কোনদিন দেখেনি। সেই শ্রীমা স্বামীর সেবা ও ভক্ত ছেলেদের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস সুরু করলেন শ্যামপুকুরের বাসায়।...

তাঁর ধৈর্য্য, আত্মিক শক্তির পরিচয় ও সাহস বাল্যাবস্থা থেকেই দানা বাঁধতে সুরু করেছিল। কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর পায়ে হাঁটা পথ। সঙ্গী ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা ও

কনিষ্ঠ পুত্র আরও কয়েকজন। আরামবাগের পরই তেলোভোলের প্রান্তর। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে মাঠ অতিক্রম করতে হবে, নইলে আক্রান্ত হতে হবে ডাকাতদের হাতে। শুধু লুটপাট নয় মৃত্যুও সুনিশ্চিত। পথক্লান্ত তিনি। তবুও চলেছেন সহযাত্রীদের সঙ্গে। সমতালে চলতে পারছেন না, পিছিয়ে পড়ছেন বার বার। একই আবেদন, সন্ধ্যার আগেই পার হতে হবে এই মাঠ, নইলে সমূহ বিপদ। সহযাত্রীদের বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি পিছু পিছু।

সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে বহুদূর। তারকেশ্বরে চটিতে অপেক্ষা করবে তাঁর জন্য। শরীর বইছে না তবুও পা চালাচ্ছেন। সন্ধ্যা আগত প্রায়। ক্লান্তিতে অবসন্ন, অর্থাৎ সুনিশ্চিত মৃত্যু। এগিয়ে চলেছেন সমুখস্থ পথে। একমাত্র চিন্তা: অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে, কি করা উচিত! এমন সময় দেখলেন কুচকুচে কাল দীর্ঘাকায় কাঁধে লাঠি নিয়ে একটি লোক দ্রুত পদে এগিয়ে তাঁর পিছু পিছু, তার পিছনেও আছে আরেকজন। চীৎকার বা পালানোর চেষ্টা বৃথা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। শঙ্কিত চিত্ত, তবুও প্রতীক্ষা। রুখে দাঁড়ানো ছাড়া কোন পথ নেই। ... কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এগিয়ে এলো পুরুষটি। কর্কশ কণ্ঠে শুধালো : কে গা এসময়ে দাঁড়িয়ে আছ? তিনি তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য পিতৃ সম্বোধনে শরণাপন্ন হয়ে বললেন, বাবা, সঙ্গীরা চলে গেছে পথ হারিয়েছি, যদি তাদের কাছে পৌঁছে দাও! তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমনীর কালীমন্দিরে থাকেন, তাঁর কাছেই যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে দিলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করবেন! ... ইতিমধ্যে পিছনের লোকটি পৌঁছে গেল। দেখলেন, তিনিও মহিলা। হয়ত তারই স্ত্রী। আশ্বস্ত হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, মা আমি তোমার মেয়ে, সারদা। সঙ্গীরা চলে যাওয়ায় ভীষণ বিপদে পড়েছি! ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে নইলে, কি যে হত জানি না!

তাঁর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে, বিশ্বাস ও মিষ্টি কথায় বাগদী পাইক ও তার স্ত্রী বিগলিত হয়ে নিজ কন্যাজ্ঞানে স্বান্তনা দিতে লাগলো। তাঁর শরীর অবসন্ন দেখে গন্তব্য পথে না গিয়ে তেলোভেলোর কাছাকাছি গ্রামের ছোট একটা দোকানে রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করলো। নিজেই নিজের কাপড় বিছিয়ে শয্যা তৈরী করলো। স্বামীকে মুড়ি মুড়কি কিনতে পাঠালো।

আদর স্নেহযত্নে তারা মেয়েকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, তাকে রক্ষার ব্যবস্থায় স্বামী স্ত্রী উভয়েই পাহারা দিতে লাগলো। সকালে যাত্রা করলো সকলে। চার দণ্ড বেলা, পৌঁছালো তারকেশ্বর। একটা দোকানে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে, স্বামীকে বললো, মেয়ে আমার কাল থেকে কিছু খায়নি। বাবার (তারকনাথের) পূজা দিয়ে মাছ তরকারী নিয়ে এসো, আমি আজ তাকে ভাল করে খাওয়াবো।... ইতিমধ্যে তাঁর গত সন্ধ্যার সঙ্গীরা এসে গেল। পরিচয় করিয়ে দিলেন তাদের সঙ্গে। তারা কিন্তু তাদেরও না খাইয়ে ছাড়লো না।

যাত্রার সময় হ'ল। পাশের ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলে নিয়ে এসে আঁচলে বেঁধে দিয়ে সস্নেহে বললো, মা সারদা, মুড়ির সঙ্গে এগুলো খাস! চোখে তাদের জল!... মাত্র একটা রাত, আপন হয়ে গেছে তারা। ছল ছল চোখে বিদায় নিল তাদের সারদা। পিছনে ভেসে রইলো কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুরোধের সুর : মা তুমি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসো জামাই তোমার খুশী হবে, মাকে ও দেখে আসবে সেখানে। সেদিনের সেই সারদা আজ সবার শ্রীমা। জানেন তিনি অবস্থাকে কেমন করে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।....

ডাক্তারের উপদেশ, সুপথ্য চাই। নইলে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সুবিধা অসুবিধা কোন চিন্তা নেই। হোক সে একমহলা বাড়ী। থাক সেখানে পরিচিত অপরিচিতের সমাগম। শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ, তুচ্ছ এসব। হাল ধরলেন শ্রীমা। আর নরেন্দ্র তুলে নিল রাত্রের সেবার ভার। নিজে রাত্রে অবস্থান করে উৎসাহিত করলো গোপাল (ছোট) কালী, শশী প্রভৃতি কর্ম্মঠ যুবক ভক্তদের।

রোগ হ্রাস দূরের কথা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ ও আতঙ্ক বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কলেজের পাঠ, নিজ গৃহে আহার, বন্ধ করে দিল একে একে। প্রেম, স্বার্থত্যাগ, পূত আলাপ, শ্রীগুরুর সেবা ও ঈশ্বরলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প মন্ত্ররূপে দেখা দিল তাদের জীবনে। এগিয়ে এলেন গৃহী ভক্তগণ। বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ চিকিৎসার ভার নিলেন। প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট চিকিৎসকদের মতামত গ্রহণ ও চিকিৎসার সুব্যবস্থায় নিযুক্ত হলেন তাঁরা। কণ্ঠরোগ কষ্টসাধ্য হলেও আরোগ্য তাঁর সময় সাপেক্ষ, চিকিৎসকদের অভিমত। ভক্তরা আশায় বুক বাঁধলো।

দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়ার অবকাশ যাদের ছিল না, শ্যামপুকুরের অবস্থান করায় তাঁকে দর্শনের সুযোগ এসে গেল। সুতরাং লোকের আগমন পূর্ণ মাত্রায় রইলো। যে বিশ্রাম দেবার আশায় স্থানান্তরিত, তা ব্যর্থ হয়ে গেল। ঠাকুর নবাগতদের গ্রহণ ও উপদেশ বিতরণ সমানে করে চললেন।

যিনি দিব্যভাব প্রভাবে মুগ্ধ করতেন শ্রোতৃবৃন্দের, স্পর্শ মাত্রেই করাতেন দিব্য দর্শন, পলকে দেখামাত্রই কোন আধারের উপযুক্ত ভক্ত, করতেন নির্ণয়, তিনি কলকাতায় পা দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর ভাব প্রচারের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন। মা ভবতারিনী তাঁকে জানিয়ে দিয়ে ছিলেন তাঁর দেহ রাখার দিন ক্ষণ। তাঁর (মার) নিজের কাজের জন্য আসবে তাঁর (ঠাকুরের) পর্ষদবৃন্দ। তারাই সে ভাব প্রচার, দেশ তথা জগতের কালিমা করবেন দূর। আসবে নোতুনের জোয়ার। শ্যামপুকুরে সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রস্তুত হলেন। আশা, আলো, আনন্দ ও শান্তির মেলায় সূক্ষ্ম মায়া ডোরে বাঁধলেন সকলকে। ভাবপ্রচারের যে মূল মন্ত্র দিয়ে ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, সেই ত্যাগ, সেবা, কর্ম্ম ও নিষ্ঠার ভিত্তি করলেন দৃঢ়। ভক্তবৃন্দ ব্রতী হলেন সেবায়। তাদের কাছে ত্যাগ, সেবা, নিষ্ঠা আর কর্ম্মই হল ধর্ম্ম। নরেন্দ্রনাথ হল সেই দলের নেতা। আরেক দলের নেতা হলেন গিরিশচন্দ্র, তাঁর ভাব হল ঠাকুরের অতীত জীবন, শুদ্ধ ভাব ও ভাবনা। তিনি মঙ্গলময়। তিনি অবতার। আরও একটা দল গড়ে উঠলো। তাদের চিন্তাধারা হল : তিনি যা দিয়ে গেলেন, আমরা যে আলো পেলাম তাঁর কাছ থেকে, সেই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে এগিয়ে চলবে সমুখ পথে, প্রচারও করবে, সেই ধারা। এঁরা অধিকাংশ গৃহী সম্প্রদায়। বন্ধনে সূত্রের মূলে ছিল : একটি মাত্র সুর। গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তি ও সম্প্রদায়ের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা। সে বন্ধন প্রেমের, একান্তে ভালবাসার...

ঠাকুর অসুস্থ। এগিয়ে এসেছে সকলে। তাঁকে যেমন করে হোক সুস্থ করে তুলতেই হবে, আবার কেউ ভেবেছে, এ ব্যাধি তাঁর গোপন উদ্দেশ্য সাধনের একটা পথ, সিদ্ধ হলেই রোগ মুক্ত হবেন, আবার কেউ ভেবেছেন, এটা জগদম্বার খেলা। জনকল্যাণ অভিপ্রায় সিদ্ধির একটা সোপান মাত্র। রোগ যিনি দিয়েছেন, তিনিই তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের পর রোগ মুক্ত করে দেবেন তাঁকে।...

তাঁকে সকালে, দুপুরে, বৈকালে যত্ন করে দেখেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ওষুধও পথ্যের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন প্রয়োজন মত। এরপরই মেতে উঠতেন ঠাকুরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনায়। দু চার ঘণ্টা কাটিয়ে ফিরে যান নিজের কাজে। ঠাকুর মুগ্ধ হয়েছেন এঁর ব্যবহারে। ডাক্তার পেশাদার লোক, কিন্তু নিজসঙ্গ দানে রোগীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও তৃপ্তি দানে সচেষ্ট দেখে ঠাকুরেরও কৃতজ্ঞতার অন্ত রইলো না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন, তোমার জন্য কি ভাব এতটা সময় কাটাই, আমারও স্বার্থ আছে। আলাপে, আনন্দ ঘটে পূর্ব্বে দেখেছি, কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে তোমাকে জানবার অবসর পাইনি। এটা করবো, ওটা করবো ছিল সেদিনের ব্যস্ততা। আর এখন? দেখছি, বুঝছি, সত্যের প্রতীক কি? জীবনের স্থির লক্ষ্য হওয়া উচিত কি! খোশামুদ করছি না, এমন চাষাও আমি নই। বাপের কুপুত্র আমি, বাপ অন্যায় করলে তাঁকেও

স্পষ্ট কথা না বলে থাকতে পারি না, এজন্যই দুর্মুখ আমি, জানেও সবাই! হাসতে লাগলেন মহেন্দ্রবাবু।

ঠাকুরও হাসলেন, তা শুনেছি বটে, কিন্তু এতদিন আসছো আমি তো তার পরিচয় পেলাম না।

আবার হাসলেন মহেন্দ্রবাবু, সেটা আমার সৌভাগ্য। তবে বেঠিক দেখলে, চুপ করে থাকার বান্দা নয় মহেন্দ্র সরকার। সত্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলেই, যেটা সত্য বলে বুঝি, সেইটা প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন ছোটাছুটি করছি। এজন্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আরম্ভ, এর জন্যই বিজ্ঞান চর্চ্চার মন্দির নির্ম্মাণ। এরকমই আমার কাজ।

একজন ভক্ত সহসা বলে উঠলেন : সত্যানুরাগ থাকলেও আপনার অপরা-বিদ্যার দিকে দৃষ্টি (আপেক্ষিক সত্য আবিষ্কারের দিকে), আর ঠাকুরের পরাবিদ্যার প্রতি চিরন্তনী ভালবাসায়।

উত্তেজনার সুরে বললেন মহেন্দ্রবাবু, তোমাদের ঐ কথা ! বিদ্যার আবার পরা-অপরা কি? যাতে সত্যের প্রকাশ, তার আবার উঁচু নীচু কি? স্বীকার করতে হবে অপরা বিদ্যার ভিতর দিয়ে পরবিদ্যা-লাভ করতে হবে— বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা যে সত্য প্রত্যক্ষ করি, তা থেকেই তো জগতের আদি কারণের বা ঈশ্বরের কথা আরও বিশেষভাবে বুঝতে পারি ! অবশ্য নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছিনা— তাদের কথাও বুঝতে পারি না— চোখ থাকতেও তারা অন্ধ। তবে যদি কেউ বলে, অনাদি অন্ত ঈশ্বরের সবটা বুঝে ফেলেছে— তাহলে তিনি মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর, তাদের পাগলা গারদে রাখা উচিত।

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক বলেছ। ঈশ্বরের ইতি' যারা করে, তারা বুদ্ধিহীন, তাদের কথা সহ্য করতে পারি না। .... একজন ভক্তকে বললেন : শ্রীরামপ্রসাদের 'কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন' গানটা গাওতো।

গান শুরু হল। ঠাকুর তার ভাবার্থ মহেন্দ্রবাবুকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন : মন তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানতে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বর-কে ধরা তার কর্ম নয়, প্রাণচিন্তা, ঐকথা বুঝতে চায় না— সে কেবলই বলে- "কি করে আমি তাঁকে পাব"।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহেন্দ্রবাবু। বললেন : ঠিক বলেছ, মনব্যাটা ছোটলোক, একটুতেই পারব না, হবে না বলে বসে, কিন্তু প্রাণ ঐ কথায় সায় দেয় না বলেই যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে। গান শুনতে শুনতে দুজন ভক্ত-যুবকের ভাবাবেশে, বাহ্যচৈতন্য লোপ পেল। ডাক্তার তাদের নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, মুর্চ্ছিতের মত, বাহ্যজ্ঞান নেই বলে বোধ হচ্ছে। বুকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে নাম শোনানোর পর তাদের প্রকৃতস্থ হতে দেখে ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললেন, এসব তোমারই খেলা বোধ হচ্ছে!

ঠাকুরও হাসতে হাসতে বললেন : আমার নয় গো, এসব তাঁরই (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়। এদের মন স্ত্রী, পুত্র, টাকা কড়ি, মান, যশে, জড়িয়ে পড়ে নি, তাই নামগুণ শুনে তন্ময়তায় এইরূপ হয়ে যায়"

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পুনরায় ফিরে এলো। একজন ভক্ত বললেন : ঈশ্বরকে মানলেও, তাঁর 'ইতি' না করলেও, যাঁরা বিজ্ঞান চর্চ্চারত, তাঁদের একদল ঈশ্বরকে উড়িয়ে দেন, আবার অপরদল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেও তিনি এরূপ ভিন্ন অপর কোনরূপ হতে পারেন না বলে প্রচার করে থাকেন।

উত্তরে বললেন ডাক্তার : 'হ্যাঁ একথা অনেকে বলে সত্য কিন্তু ওটা কি জান? ওটা হচ্ছে বিদ্যার গরম বা বদহজম,- ঈশ্বরের সৃষ্টির দু'চারটা বুঝতে পেরেছে বলে তারা মনে করে, দুনিয়ার সব ভেদটাই তারা জেনে ফেলেছে। যারা বেশী পড়েছে, দেখেছে, ওদোষটা তাদের হয় না। আমি তো ঐ কথাটা মনে আনতে পারি না।

ঠাকুর তাঁর কথা শুনে বললেন : ঠিক বলেছ, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি পণ্ডিত, আমি যা জেনেছি, বুঝেছি, তাই সত্যি, অপরের কথা মিথ্যা— এরূপ একটা অহঙ্কার আসে। মানুষ নানা পাশে আবদ্ধ— বিদ্যাভিমান তার একটা। এত লেখাপড়া শিখেও তোমার অহঙ্কার নেই এটা তাঁরই কৃপা!"

একটু জোর দিয়ে বললেন ডাক্তার : অহঙ্কার হওয়া দূরে থাক, মনে হয়, যা জেনেছি, যা বুঝেছি তা যৎসামান্য, কিছু নয় বললেই চলে--- শিখবার এত বিষয় পড়ে রয়েছে, মনে হয়, শুধু মনে কেন, আমি দেখতে পাই, প্রত্যেক মানুষেই এমন অনেক বিষয় জানে, যা আমি জানি না। সেজন্য কারও থেকে কিছু শিখতে আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয় এঁদের (ঠাকুরকে দেখিয়ে) কাছে, আমার শিখবার মত অনেক জিনিষ থাকতে পারে, ঐ হিসাবে আমি সকলের পায়ের ধুলা নিতেও প্রস্তুত।

ঠাকুর শুনে বললেন : এদেরও আমি বলি, সখি, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি! ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন : কেমন নিরভিমান দেখছিস্? ভেতরে 'মাল' (শিক্ষা) আছে কিনা — তাই এরূপ বুদ্ধি।...

ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিনের পর দিন বাড়ছে মহেন্দ্রবাবুর। ঠাকুর-ও তাঁকে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যত্নবান হলেন। গুণীর সঙ্গে আলাপে খুশী হন, ভুলে যান দেহগত রোগ যন্ত্রণা। সময় কাটান হাসিখুশীর মধ্যে। মাঝে মাঝে ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ (মাষ্টার) নরেন্দ্রনাথ কে বসিয়ে দেন। ডাক্তার-ও এঁদের সঙ্গে আলাপে তৃপ্তি পান। খুশী হন। আলাপের পর একদিন গিরিশবাবু তাঁকে (ডাক্তারকে)। 'বুদ্ধ চরিত' অভিনয় দেখার আমন্ত্রণ জানালেন। প্রশংসায় শত মুখ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল। আরও কয়েকখানি নাটকের অভিনয় দেখলেন। স্বীয়মত প্রকাশ করলেন : এসব নাটক জাতীয়বোধ শিক্ষার প্ররোচনা দেয়। সত্যই এঁদের গুণে, আলাপে, আমি মুগ্ধ।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপে এত মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, ডাক্তার তাকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। খাওয়ালেন। শুনেছিলেন অপূর্ব্ব ভজন গান করে নরেন্দ্র। অনুরোধ করলেন, একদিন শুনিয়ো কিন্তু!....

বৈকালে ডাক্তারকে দু'তিন ঘণ্টা ধরে ভজন গান শোনালেন। ডাক্তার খুব খুশী। ছেলের মত তাকে আলিঙ্গন করে চুমু খেলেন। ঠাকুরকে বললেন, এর মত ছেলে, ধর্ম্মলাভে ব্রতী হয়েছে দেখে, আনন্দে বুকখানা আমার ভরে গেছে! সুন্দর ছেলে, এটি রত্ন। যাতে হাত দেবে তাতেই দিকপাল পরিণত হবে।

সপ্রশন্ন দৃষ্টিতে নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন : কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর এসেছিলেন, সেরূপ, ওর জন্যই তো সব গো!....

ঠাকুরের অসুখ কখনও বাড়ে, কখনও কমে, ডাক্তার কখনও আশান্বিত হন, কখনও কারণ সন্ধানে ব্যাপৃত হন। চিকিৎসকের ধারাই এই। তাঁরা চিন্তা করেন : রোগ বাড়ার কারণ কি? হয় রোগীর অত্যাচার, অনিয়ম, নয় খাদ্যের গণ্ডগোল। নরেন যথারীতি ভজন শোনালো : উপলক্ষ্য ঠাকুর ও ডাক্তার। এখন চিকিৎসকের 'ফি' হয়েছে নরেনের ভজন। প্রতিদিনই চলছে। তবে আজ বিশেষ চিন্তান্বিত ডাক্তার। বেশতো চলছিল- হঠাৎ বাড়লো কেন? স্থির সিদ্ধান্ত— "নিশ্চয় কোন নিয়মের ত্রুটি হয়েছে।" রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধির মূলে থাকে খাদ্যবস্তু। জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার, আজ কোন আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধা হয়েছিল?

ঠাকুর উত্তরে বললেন "আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দু এক টুকরো ফুলকপি।"

এ্যাঁ-ফুলকপি? এইতো খাবার অত্যাচার। ও বস্তুটা যেমন গরম তেমনি দুষ্প্রাচ্য! ক'টুকরো খেয়েছ? প্রশ্ন ডাক্তারের।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, শুধু ঝোলটুকু খেয়েছি।

ডাক্তার বললেন : ঝোলটাই আসল বস্তু! সেইজন্যেই আজ রোগের বৃদ্ধি।

ঠাকুর বলেন : সে কি গো। কপি খেলাম না- পেটের অসুখ হল না, ঝোলে একটু রস ছিল, তাতেই বাড়লো এ বাপু আমার মনে ধরে না!

ডাক্তার হার মানার লোক নন। বললেন : ওই একটুতেই অপকার হয়। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলছি— শুনলেই বুঝতে পারবে! হজম শক্তিটা বরাবরই আমার কম। দোকানে খাইনা- তেল ঘি বাড়ীতে প্রায় অচল তবুও এক সময়ে সর্দ্দি হয়ে ব্রঙ্কাইটিস হল! সারতেই চায় না। মনে হল : খাবারে কোন গণ্ডগোল হচ্ছে। খোঁজ করে কোন সন্ধানই পেলাম না। হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো চাকরটা গরুকে মাসকড়াই খাওয়াচ্ছে! ওরই দুধ খাই। জিজ্ঞাসায় জানলাম, কয়েক মণ মাষকড়াই পাওয়া গিয়েছিল, সর্দ্দির ভঁয়ে কেউ খাচ্ছে না দেখে, গোরুকে খাওয়ানো হচ্ছে। মিলিয়ে দেখলাম যতদিন সর্দ্দি কাশিতে ভুগছি, গোরুকে ততদিনই খাওয়ানো হচ্ছে। মাষকড়াই বন্ধ করলাম, আমিও সুস্থ হয়ে উঠলাম। অথচ আমার চার পাঁচহাজার টাকা বায়ু পরিবর্ত্তনে ব্যয় হয়ে গেল কোন উপকার পেলাম না।

গল্প শুনে ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, ও বাবা, এ যে তেঁতুলতলা দিয়ে গিয়েছিল বলে সর্দ্দি হল — এও সেরূপ!

হাসিতে ভরে গেল ঘর। ডাক্তারও হাসতে লাগলেন। ঠাকুরও তাঁর নিষেধ মত কপি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।...

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন বুদ্ধিজীবি। চিকিৎসক, বিজ্ঞানজগতের লোক। চুলচেরা বিচার ছিল তাঁর চলার পাথেয়। তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন— তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহারে। তিনি তাঁকে ভক্তি করতেন, বিশ্বাস করতেন, তবে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে মানুষ; পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা লাভ করেছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁকে ভক্তি ও পূজার অর্থবোধে তিনি সমর্থ। তবে, অনন্ত ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন বলতে গেলেই, গোল বাধে! এখানেই তাঁর ঘোর সংশয়। একদিন আলোচনার মাঝে আত্মপ্রকাশ করে ফেললেন, যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন, সবাই এসেছেন একথা স্বীকার করেন। তবে তাঁর চিন্তাধারায়, এই নন্দনের গোষ্ঠীই, দেশকে উচ্ছন্নে পাঠিয়েছে।

ঠাকুর একথায় হেসে বললেন : এ বলে কি! তবে হীনবুদ্ধি গোঁড়ারা, অনেক সময় তাঁদের বাড়াতে গিয়ে, বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলে! এটাও সত্য!.....

ডাক্তার আসা, মানে ঝড় ওঠা। কখনও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে, কখনও বা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। ইচ্ছা করেই লাগিয়ে দিয়ে নীরবে আনন্দ উপভোগ করতেন ঠাকুর। পরিবেশ কখনও গরম, কখনও নরম। কোন রাগ অভিমান নেই, আকৃষ্ট ডাক্তার, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য্য ও প্রেমের আকর্ষণে। মূল্যবান সময়ের অপচয় করেও ছুটে আসেন দিনের পর দিন।....

দুর্গাপূজা। শহরে বিশেষ সমারোহ, অষ্টমী পূজার দিন বৈকালে ডাক্তার মহেন্দ্রবাবু অন্য একজন বন্ধু ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে সদালাপে ব্যস্ত। শুরু হল ভজন। বহুক্ষণ ধরে ভজন গাইলো নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর সঙ্গীতের ভাবার্থ বুঝিয়ে দিতে দিতে ভাবাবেশে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আনন্দ প্রবাহে ঘর জম জম করছে। সন্ধ্যা কখন ঘনিয়ে এসেছে, সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। ভক্তদেরও কারও কারও ভাবাবেশে বাহ্য-চৈতন্য লোপ পেতে লাগলো। ক্রমে আটটা বাজলো। ঠাকুর হাসতে হাসতে উঠে আবার সমাধিমগ্ন হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার সরকার হৃদয়ের স্পন্দন পরীক্ষা করলেন। ওঁর বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত চোখ সঙ্কুচিত হয় কিনা দেখার জন্য আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। শেষে হতবুদ্ধি হয়ে স্বীকার করলেন, এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক-সম্পাত করতে পারেনি। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা একে জড়ত্ব বলে নির্দ্দেশ ও ঘৃণা প্রকাশ করে নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্ব্বস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক কিছুই বিদ্যমান, যাদের রহস্যভেদ, বিজ্ঞান বা দর্শন এখনও করতে পারে নি।

আধঘন্টা অতীত হওয়ার পর সমাধি ভঙ্গ হল ঠাকুরের। ভজন ও শেষ হল নরেন্দ্রনাথের। সস্নেহে তাকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন ডাক্তার সরকার ও তাঁর বন্ধু।

সুরেশ মিত্র আগে দুর্গাপূজা করতেন। বিঘ্নঘটায় তা বন্ধ ছিল এতদিন। ঠাকুরের বলে, বলীয়ান সুরেশবাবু এবার পূজা করবেন স্থির কবেছিলেন। বাড়ীতে বাধা এসেছিল তবু সিদ্ধান্ত বদলালেন না। তবে এ আনন্দে নিরানন্দ তিনি। ঠাকুরের অসুখ তিনি আসতে পারবেন না। গুরু ভ্রাতাদের অবশ্য এ উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। ঠাকুরের সেবার জন্য এখনও তাদের যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সমাধি ভাঙার পর বললেন, সমাধিস্থ হওয়ার পরই দেখলাম এখান থেকে সুরেশের বাড়ী পর্য্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলে গেল। তার (সুরেশের) ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হয়েছে। মা'র ত্রিনয়নে জ্যোতিরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। দালানের ভেতরে দেবীর সামনে দীপমালা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরেশ উঠানে বসে ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা' 'মা' বলে রোদন করছে। তোমরা সকলে তার বাড়ী এখনই যাও, তোমাদের দেখলে তার প্রাণ শীতল হবে!.....

আশ্বিন শেষ হল। কার্ত্তিক এলো। কালী পূজার দিন এগিয়ে এলো। ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হল না, ক্রমেই রোগ জটিল রূপ নিতে সুরু করলো। ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রসন্নতার হ্রাস দেখা গেল না। বরং বাড়তে দেখা গেল। ডাক্তার সরকার ঘন ঘন যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ ওষুধ পরিবর্ত্তন করতে লাগলেন-- কিন্তু আশানুরূপ সুফল পেলেন না। ভাবতে লাগলেন ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্যই কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না, শীত একটু চেপে পড়লে, এ ভাবটা কেটে যাবে।

কালীপূজা এসে গেল। অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ, দুর্গাপূজার মতই উজ্জ্বল, হয়ে উঠলো ঠাকুরের। দেবেন্দ্রনাথ....ঠিক করলেন, ...ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের উপস্থিতিতেই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে কালীপূজা করবেন। ভক্তরা বাধা দিলেন। পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অবসন্ন হতে পারে। সুতরাং একাজ যুক্তিযুক্ত হবে না। সঙ্কল্প ত্যাগে বাধ্য হল দেবেন্দ্রনাথ। ঠাকুর পূজার আগেরদিন, কয়েকজন ভক্তকে বললেন : পূজার উপকরণ সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস, কাল কালীপূজা করতে হবে। সবাই আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করলো কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো— : ষোড়শোপচারে, না পঞ্চোপচারে, অন্নভোগ না অন্যকিছু? পূজকেরপদ কে গ্রহণ করবে কে? সমস্যার মীমাংসা করতে না পেরে স্থির হল, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ফলসমূহ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করে রাখা হোক, পরে যেমন বলবেন করা যাবে। পূজার দিন রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত শয্যায় স্থির হয়ে বসে আছেন তিনি। ভক্তরা তখন তাঁর কাছাকাছি পূর্ব্বদিকে পরিষ্কার করে গন্ধপুষ্পাদি পূজার উপকরণ সাজিয়ে রাখলো।

দক্ষিণেশ্বরের অবস্থান কালে গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ নিয়ে কখন কখন আপনাকে আপনি পূজা করতেন। আজ হয়ত সেইরূপ, নিজ দেহ, মনরূপ প্রতীক অবলম্বনে জগচৈতন্য ও জগৎশক্তি রূপিনীর পূজা করবেন কিংবা জগদম্বার সঙ্গে অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা করবেন, অনুভবে সকল কিছু শয্যার পাশে সাজিয়ে রাখালো।

ধূপ-ধূনা দীপ জ্বালা হল। সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তখনও ঠাকুর স্থির। ভক্তগণ তাঁর পাশে বসলো। কেউবা তাঁর আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলো, কেউবা তাঁকে দেখতে লাগলো, কেউবা জগৎজননীর চিন্তা করতে লাগলো।

তিরিশেরও বেশী লোক বসে তাঁকে ঘিরে। সবাই নীরব। জনশূন্য বোধ হ'তে লাগলো। কতক্ষণ কেটে গেল। ঠাকুর নিজেও পূজা করতে এগুলেন না বা কাউকে আদেশও দিলেন না— পূর্ব্বের মত নিশ্চিন্তভাবে বসে রইলেন।

যুবক ও ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন মহেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র—পাঁচসিকে পাঁচ আনা তাঁদের ভক্তি। অসীম বিশ্বাস তাঁদের। মনে হল, আপনার জন্য ঠাকুরের ঁকালীপূজা করার প্রয়োজন নেই। অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় যদি পূজার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে স্থির হয়ে বসে আছেন কেন? তাঁর শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করে ভক্তগণ ধন্য হবে বলেই এই পূজার আয়োজন! নিশ্চয় তাই। এই ভেবে উল্লাসে অধীর হয়ে সামনের 'ফুল চন্দন' নিয়ে 'জয় মা' বলে তাঁর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করলেন। ঠাকুরের সারা শরীর কেঁপে উঠলো। তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে পড়লেন। জ্যোতির্ময় তাঁর মুখমণ্ডল, দিব্য হাসিতে ভরা। হাতদুটি বরাভয় মুদ্রা ধারণ করে ঁজগদম্বার আবেশের পরিচয় দিতে লাগলেন। তড়িৎ-গতিতে ঘটে গেল সমস্ত ঘটনা। পাশে অন্যসব ভক্তরা ভাবলো : ঠাকুরের ঐ ভাব দেখেই গিরিশ তাঁর শ্রীপদে বার বার অঞ্জলি প্রদান করছেন। যারা দূরে ছিল তারা দেখলো ঠাকুরের শরীর অবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিমা সহসা তাদের সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন। হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হয়ে গেল। ফুল চন্দন সংগ্রহ করে যে যার ইচ্ছা মত মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর শ্রীপদে পূজা করে 'জয়' 'জয়' রবে মুখরিত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ কেটে গেল এমনিভাবে উপশম হল ভাবাবেশের। ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা ফিরে পেলেন। তাঁর সামনে পূজার জন্য সংগৃহীত ফলমিষ্টি রাখা হচ্ছিল। তিনি সেগুলির কিছু অংশ গ্রহণ করে ভক্তি ও জ্ঞান বাড়ার জন্য ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করলেন।.... ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করে গভীর রাত পর্যন্ত দেবীর মহিমাকীর্ত্তন ও নাম গানে মত্ত হয়ে রইলো।

বলরামবাবু ছিলেন ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের ঘনিষ্ঠ একজন। যৌবনে অজীর্ণ রোগে ভুগে একাদিক্রমে যবের মণ্ড ও দুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তখন থেকে শরীরটা ছিল অপটু। তাঁর বাবা ছিলেন জমিদার। তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ঁকৃষ্ণরাম বসু। যৌথপরিবার। খুড়তোতো ভাই (খুল্লতাত) নাম করা লোক, দু ভাই নিমাই ও হরিবল্লভ বসু। জমিদারী দেখাশোনার ভার দিলেন নিমাইবাবুর ওপর। আর হরিবল্লভ ছিলেন কটকের সরকারী উকিল। যৌথ আয়ের অংশ নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতেন বলরাম। ইনি চরিত্রে ছিলেন দয়ালু— বৈরাগ্যের ভাবছিল প্রবল। "জমিদারী পরিচালন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পুরীতে বসবাস করতেন। জপ, পূজা, ভাগবত পাঠ শোনা, জগন্নাথ দেবের দর্শন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ছিল সেদিনের কাজ। বড় মেয়ের বিয়ের জন্য কলকাতায় এলেন, এগারো বছরের পর। সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বিচরণ ও ঘনিষ্ঠতায় গৃহত্যাগের সম্ভবনায়, তার বাবা ও ভাইয়েরা গোপনে ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বাড়ী কিনলেন হরিবল্লভ বাবু টাকায়। বসবাস করার জন্য অনুরোধ করায় সেইখানেই বসবাস করতে লাগলেন। সেই মাসেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়ে গেল। দর্শন করেই তাঁর (ঠাকুরের) প্রতি গভীর আকৃষ্ট হয়ে স্থায়ী বসবাস সুরু করলেন কলকাতায়। ঠাকুর শক্তি উপাসক। আর তাঁদের বংশ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি দীক্ষা নিলেন ঠাকুরের কাছে। আত্মীয় স্বজন ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর নামে নানা অভিযোগ পাঠালেন হরিবল্লভবাবুর কাছে। ক্ষুব্ধ হয়ে

উঠেছিলেন নিমাইবাবু। সব খবর পেয়ে বিরক্তি বোধ করে কলকাতার বাড়ীতে আসবেন স্থির করেছেন হরিবল্লব বসু। ভয় পেয়ে গেলেন বলরামবাবু। যদি হরিবল্লভবাবু তাঁকে তাঁর বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেন বা কোঠারে জমিদারী দেখার জন্য যদি ডাক দেয় নিমাইবাবু! বঞ্চিত হবেন ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গ থেকে! ভয়ে, ব্যাকুলতায় ম্রিয়মাণ বলরামবাবু।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরের আবাসে উপস্থিত হলেন তিনি। বিমর্ষ মুখ, ফেকাসে চেহারা। ঠাকুর তাঁকে দেখেই বুঝলেন বলররামবাবুর আসন্ন কোন বিপদ। জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার চেহারাটা ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে কেন?

বলরামবাবু সব খুলে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর : সে লোক কেমন? একদিন তাকে আনতে পারিস? উত্তরে বলরামবাবু বললেন, লোক খুব ভাল। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও তবে বড়লোকদের যা হয়ে থাকে, বড় কাণ পাতলা, পরের কথায় নাচে। আমি বললে কি আসবে? ঠাকুর বললেন, তবে থাক। তোমার কাজ নেই। গিরিশকে ডাক দেখি। গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের কথা শুনে বললেন : হরিবল্লভের সঙ্গে কিছুকাল সহপাঠী ছিলাম। যখনই কলকাতা আসে, আমি দেখা করতে যাই। এ কাজ আমার পক্ষে কঠিন নয়, আজই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। পরের দিন ঠিক পাঁচটায় হরিবল্লভ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিরিশচন্দ্র হাজির হলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন ঠাকুরের সঙ্গে। আমার বাল্যবন্ধু, কটকের সরকারী উকীল, আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

সাদরে নিজের কাছে বসিয়ে ঠাকুর বললেন : তোমার কথা অনেকের মুখে শুনেছি। তোমাকে দেখার ইচ্ছা হত আবার ভয়ও হতো যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়। গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন : এখন তো দেখছি তা নয়, বালকের মঁত সরল। কেমন চোখ দেখছো? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হলে এমন চোখ হয় না। স্পর্শ করে হরিবল্লভবাবুকে বললেন : ভয় করা দূরে থাক তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে। হরিবল্লববাবু ঠাকুরকে প্রণাম করে পদধুলি গ্রহণ করে বললেন সেটা আপনার কৃপা।

গিরীশচন্দ্র বললেন : যে বংশে জন্ম, ভক্তিমান হওয়ারই কথা। কৃষ্ণরাম বসুর ভক্তি... তাঁকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর কীর্ত্তিতে দেশ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সে বংশে জন্মে ভক্তিমান হবে না তো কে হবে!

ঈশ্বর প্রসঙ্গ উঠলো। ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও ঐকান্তে নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা— ভাবাবেশে তলিয়ে গেলেন ঠাকুর। অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হওয়ায় একটি ভজন গাইতে বললেন। তার মর্ম্ম হরিবল্লভবাবুকে বুঝিয়ে দিতে দিতে আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

এসময় আরও দু' তিনজন ভক্ত উপস্থিত হল। ঠাকুরের ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তি ও মর্ম্মস্পর্শী বাণীতে মুগ্ধ হওয়া হরিবল্লভবাবুর দুচোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। হরিবল্লভবাবু সশ্রদ্ধ হৃদয়ে বিদায় নিলেন সেদিনের মত। এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন : এখানে এসে বলরামবাবু অন্যায় করেননি বরং শ্রেয় কাজই করেছে। এতদিন যে ভাতৃপ্রেমে তাঁরা বদ্ধ ছিলেন, সেই প্রেমহৃদয় তার আরও দৃঢ়তর হয়ে গেল।....

একদিকে ব্যাধির বৃদ্ধি, অন্যদিকে আবারিত কৃপা বর্ষন। এখানে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হলেন হরিশচন্দ্র মুস্তাফি, সারদাপ্রসন্ন মিত্র, মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। অনেকে যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে দু'একবার ঠাঁকুরকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও এইসময় রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেন। প্রকৃতি ও সংস্কার অনুযায়ী নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন 'ভক্তি প্রধান' অথবা 'জ্ঞানমিশ্র ভক্তি' প্রধান। সাধন মার্গ

দেখাতে লাগলেন, সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী নানাপ্রকার আসন ও অঙ্গসংস্থান। পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে বামকরতলের উপর দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক উভয় হস্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন (সাকার ধ্যান)। একই আসনে বসে বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয় বাম ও দক্ষিণ জানুর ওপরে রক্ষাপূর্ব্বক প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুল ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর আঙুল বন্ধ রেখে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির 'নিরাকার ধ্যানের আসন'। দেখাতে দেখাতে সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ভূমিতে নেমে এসে বললেন, আর দেখানো গেল না। ওরূপে বসলেই তন্ময় ও সমাধি এসে যায়, বায়ুউর্দ্ধগামী হয়ে গলার ক্ষতস্থানে আঘাত করে। তাই ডাক্তার বারণ করে দিয়েছেন।

আগত ভক্তের দল কাতর হয়ে বললেন কেন দেখাতে গেলেন? আমরা তো দেখতে চাইনি।

হাস্‌তে হাসতে বললেন তা বটে! কিন্তু তোদের একটু আধটু না দেখিয়ে থাকতে পারি কই?....

একদিন গিরিশবাবুর ভাই অতুল ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরকে দেখতে এলেন উপেনবাবু। অতুলবাবুর বন্ধু ইনি পেশায় মুনসেফ...। বাইরে থাকেন। অতুল বাবুই চিঠিতে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন। ছুটিতে এসে ধরলেন, নিয়ে চল এবার। অতুলবাবু বললেন : ঠাকুরতো এখন অসুস্থ, পরিচিত ছাড়া অন্যলোক কাউকে সেখানে যাওযার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।

হতাশ হলেন না উপেনবাবু। ধরলেন, গিরিশবাবুকে। উত্তরে বললেন গিরিশবাবু, যেওনা অতুলের সঙ্গে। অদৃষ্টে থাকে তিনি নিজেই দর্শন দেবেন, আদর করবেন!

পরদিন অতুলবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ঠাকুরের কাছে। তাঁর বিছানার কাছে বিছানো দুটি চাদর, তাতে বসে আছেন ঘর ভর্ত্তি লোক। বসলেন উভয়েই। ঠাকুর তখন সোনাচুরির গল্প বলছেন। অতুলবাবু মনে সঙ্কোচ, অন্যদিন কত ধর্ম্মকথা হয়, আজ চোরের গল্প! বন্ধু কি ধারণা নিয়ে যাবেন কে জানে? .. মাঝে মাঝে ইশারা করছেন, উঠে এসো, ঠাকুর, আজ অন্য মেজাজে আছেন। উপেনবাবু উঠছেন না গভীর মানোযোগ দিয়ে শুনছেন।

দু'তিনবার ইশারার পর উপেনবাবু উঠলেন। বললেন, বেশ ভাল লাগছিল। পূর্ব্বে Universal love কথাটা শুনেছিলাম। ঠাকুরকে সকলের সঙ্গে আনন্দ করতে দেখে তা আজ প্রতক্ষ্য করলাম। কিন্তু আর একদিন আসতে হবে আমার তিনটি প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করবো।

পরদিন সকালে উপেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন অতুলবাবু। ঘরটি বেশ খালি। দু'এক জন আর তাঁর ভগ্নীপতি 'মল্লিক মশায়'। বার বার শিখিয়ে নিয়ে গেলেন অতুলবাবু যা জিজ্ঞাসা করার নিজেই করবি, কাউকে উকিল ধরার প্রয়োজন নেই! মনের মত উত্তর পাবি।

মুখচোরা উপেনবাবু কিন্তু প্রথম প্রশ্নটি মল্লিক মশায়ের মারফৎ করলেন। মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল উত্তরটি মনের মত হয়নি।

অতুলবাবু চুপি চুপি বললেন, নিজে প্রশ্ন কর?

উপেনবাবু এবার নিজেই প্রশ্ন করলেন : ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? যদি দুইই হন তাহলে একসঙ্গে ঐ বিপরীত ভাবের 'দুই' কেমন করে হতে পারেন?

ঠাকুর উত্তরে বললেন : ঈশ্বর সাকার-নিরাকার দুই-ই যেমন জল আর বরফ। বিজ্ঞানের ছাত্র উপনেবাবু। উত্তরটি ঠিক তাঁর মনের মত। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এরপর আর প্রশ্ন করলেন না। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। অতুলবাবুও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তৃতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলে না? প্রশ্ন করলেন। অতুলবাবু উত্তরে বললেন, উপেনবাবু, ঐ একটি উত্তরে, আমার তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে।....

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে দর্শন করতে ঢাকা থেকে কলকাতায় এলেন। সেখানে যখন তিনি তাঁর ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান করছিলেন, তখন ঠাকুরকে সশরীরে তাঁর সামনে আবির্ভূত দেখেছেন। এমন কি অঙ্গও স্পর্শ করে দেখেছেন। ওটা তাঁর দৃষ্টিভ্রম কিনা জানতে তিনি উৎসুক। গিরিশচন্দ্র বহুদিন থেকেই তাঁকে অবতার বলে প্রচার করে আসছিলেন। বিজয়বাবুর অভিজ্ঞতা, সে বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তুললো। ইনি (বিজয়বাবু) যখন সংস্কৃত কলেজে পড়তেন তখন তাঁর মাথায় দীর্ঘ শিখা, গলায় সূত্র (পৈইতে) হাতে নানা কবচ, মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরেও আসতেন। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। পরে সত্যের অনুরোধে গুরুতুল্য কেশবচন্দ্রের পরামর্শে সে সব ত্যাগ করেন। কন্যার বিবাহ বিরোধে কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে ওঠে। ঠাকুর তখন দুজনের বিবাদ মিটিয়ে দেন এই উপদেশ দিয়েঃ দেখ ভগবান শিব ও রামচন্দ্রের সঙ্গে একদিন লড়াই হয়েছিল। শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব লড়াইটা চেলাদের সঙ্গে। দুজনতো একই পথের পথিক, তোমাদের বিরোধ এখানেই শেষ হোক। সে অনুরোধ মেনে নিয়েছিল শেষপর্যন্ত। এই বিষয়ে একদিন যেভাবে বিশ্বাস করতেন, পুনরায় তাঁর অন্তরের সেই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েই তাঁকে সমাজ ত্যাগে উদ্বোধিত করে। ত্যাগ করলেন ব্রাহ্মসমাজ। ফলে, তাঁকে কিছুদিন অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ঠাকুরের কাছে যে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান পান, সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন। তিনি ঠাকুরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। গয়া ধামে আকাশ গঙ্গার পাহাড়ে এক সাধুর কৃপা লাভ করেন ও তাঁকে গরু পদে বরণ করেন। তিনি যোগশক্তি সহায়ে সমাধিস্থ করে দেন। ঠাকুর বলতেন তার আধ্যাত্মিক চেতনা দিনদিন বাড়তে থাকলো। কীর্ত্তনে ভাবাবিষ্ট হয়ে উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখা দিতে লাগলো। ঈশ্বর সাধনার পূর্ণত্ব লাভ করে যে ঘরে প্রবেশ করে, তার পাশের ঘরের দ্বার খোলার জন্য সে করাঘাত করে। ... (আধ্যাত্মিক লাভের পর তিনি বহু ব্যক্তিকে মন্ত্র শিষ্য করে ছিলেন। ঠাকুর দেহরক্ষার প্রায় চোদ্দবছর পরে দেহ রক্ষা করেন)....

মনে যে সঙ্ঘ বাসনার উদয় হয়েছিল, শ্যামপুকুরে তা পূর্ণ করার প্রস্তুতি। বলতে আরম্ভ করলেন, ইচ্ছা করলেই, সহসা কোন বিষয় স্বয়ংসিদ্ধ হয় না— কালে হয়ে থাকে।” এই কালের দিক নির্ণয়ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ভক্তের দল তাঁকে অবতাররূপী মন্দির বানাতে চায়। যা ছুঁয়েই তারা পবিত্র হতে পারে।... আর নরেন্দ্র প্রমুখ ত্যাগী ভক্তবৃন্দকে চালিত করবেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথে। ধ্যান সহজপথ, যে ধ্যানী সে ধ্যান করুক, কিন্তু তিনি চান সারা বিশ্বে সে ধ্যান ছড়িয়ে দিতে। মুক্তি শুধু মন্ত্রণা, মুক্তির পথপ্রদর্শকই সে মুক্তির যন্ত্র। সে-ই তৈরী করবে মানুষ, দেবে মানুষকে মুক্তির সন্ধান। করবে আলোর পথ প্রদর্শন। উদ্ঘাটিত করবে নোতুন দিশার, নব নব রূপরেখার।... '

নরেন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে বলাতে লাগলেন : ভাবোচ্ছ্বাসে স্থায়ী পরিবর্ত্তন হয় না। মনকে প্রভাবিত ক'রে, ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাকুল করে সত্য কিন্তু ত্যাগের পথে পরিচালিত করতে পারে না। এর গভীরতা নেই এর মূল্য অতি অল্প। এর দ্বারা অশ্রু পুলকাদি বা বাহ্যিক সংস্কার আংশিক লোপ পেতে পারে, পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ লাভে লাভবান হতে পারে না।.... পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি আসে সেই দিন, যে দিন মানুষের প্রাণে জাগে— ত্যাগ, বৈরাগ্য, সেবা, প্রেম ও ভক্তি।...

নরেন্দ্রনাথ হলেন তল্পিবাহক। যা তার প্রাণ মন চাইছে, হৃদয়ে যে সুর বাজছে, ধ্বনিত হল তার কর্ম্মধারায়। যুবক ভক্ত সকলকে দলবদ্ধ করে সংসারের অনিত্যতা, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরভক্তি মূলক গান গেয়ে তাদের প্রাণে— ত্যাগ, বৈরাগ্য, ও ভক্তিভাব অনুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখতে লাগলেন।

কখনও গেয়ে শোনালো 'কেয়া দেলমান তা মিল পেয়ারা আখের মাট্টি মে মিলযানা'.... কখন 'জীবন মধুময় তব নামগানে হয় হে, অমৃতসিন্ধু চিদানন্দনে হে' আবার কখনও "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং নচ শ্রোত্রতি হে'! চ ঘ্রাণ নেত্রে। নচ ব্যোমে ভুর্মিন তেজো নববায়ুশিবন্ধা নন্দরূপ : শিবোহহং শিবোহম্।।... কখন ঠাকুরের ঈশ্বরানুরাগ প্রসূত সাধন কথা ... কখনও বা "ঈশানুশরণ গ্রন্থ" থেকে উদ্ধৃত করতে লাগলো : প্রভুকে, যে যথার্থ ভালবাসবে তার জীবন সর্ব্বতোভাবে শ্রী প্রভুর জীবন অনুযায়ী গঠিত হইয়া উঠবে। অতএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কিনা তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ, তার থেকেই পাওয়া যাবে। আবার ঠাকুরের "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছে তাহা কর" কথা-স্মরণ করে বোঝাতে লাগলো : জ্ঞানকে ভিত্তি করে ভাবের জন্ম। ঐ জ্ঞানকে সকলের আগে আমাদের লাভ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।...

ঠাকুর চেয়েছিলেন তাঁর ভাব প্রচারের জন্য সঙ্ঘ গড়তে হবে। সে সঙ্ঘ এখন প্রস্তুতির পথে। চাই পরিচালক— ধীরে ধীরে এবার তৈরী করছেন তাকে। নরেন্দ্রনাথের কানে এলো ধ্যান বা চিত্তৈকাগ্রতায় নিজের বা অপরের ব্যাধি দূর করা যায়। ঠাকুরকে সুস্থ করা উদ্দেশ্য রুদ্ধদ্বারের মধ্যে বসে ভক্ত সম্প্রদায় সঙ্গে নিয়ে ধ্যানে বসে গেল। এখানেও সেই উদ্দেশ্য যাচাই করা—মূলে সত্যও থাকতে পারে। প্রিয়জনের রোগমুক্তি এটা মানুষ মাত্রেরই কামনা।

মতিঝিলের দক্ষিণ অংশ কাশীপুরের সঙ্গে মিশেছে তার সামনেই বাস করতেন মহিমাচরণ (চক্রবর্ত্তী)। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন, তখন মাঝে মাঝে পঞ্চবটীতলায় দিনের বেলায় একটি বাঘের চামড়ায় বসে সাধন ভজন করতেন। সেটি সন্ধ্যায় ঠাকুরের ঘরে ঝুলিয়ে রেখে চলে যেতেন নিজের ঘরে। লোক ভাল, হয়তো সাধনের চেষ্টা করতেন কিন্তু মূলে ছিল লোকমান্যের আকাঙ্ক্ষা। চাইতেন, লোকে তাঁকে ধনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, দানশীল বলে জানুক। সব কিছুই তাঁর অদ্ভুত। একটা স্কুল খুলেছিলেন। নাম তার 'প্রাচ্য আর্য্য শিক্ষাকাণ্ড করিষৎ'। ছেলের নাম মৃগাঙ্ক মৌলি পুততণ্ডী, বাড়ীতে এক হরিণ পোষা ছিল। নাম তার কপিঞ্জল। সংগ্রহে ইংরাজী, সংস্কৃত নানা ধরনের বই কিন্তু শুধু সাজানো, কোনোটার পাতা কাটা হয়নি। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখে শুনে বুঝে নিয়ে ছিল এগুলো পাঠের জন্য নয় গৃহের শোভাবর্দ্ধন। বলে বেড়ান জ্ঞানমার্গের সাধক। পরণে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে একতারা। গুরুর নাম বলতেন কখনও ডমরুবল্লভ, কখনও বা বলতেন পরমহংস তোতাপুরী, ঠাকুরের মতই পরিব্রাজক তিনি। ঠাকুরের অসুস্থতার খবর পেয়ে দু তিনবার শ্যামপুকুরে এলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কুশল প্রশ্ন বিনিময় করে সাধারণের যেখানে বসার ব্যবস্থা ছিল সেখানে বসে সমবেত ভক্তদের সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ঠাকুর ইন্ধন জাগিয়ে দিলেন : তুমি পণ্ডিত, এদের কিছু উপদেশ দাও তো! ছোট বগি গাড়ীতে আনাগোনা, মাঝে মাঝে তারা তত্ত্বমসি, ত্বমসি তৎ হুঙ্কার গৈরিক বসনে নধরকান্তি বিশালবপু, মুগ্ধকারী বাক্যচ্ছটা—আকৃষ্ট হল অনেকেই। নরেন্দ্রনাথ শ্রোতা। বলতে শুরু করলেন মহিমবাবু : তাঁর সাধন পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ।.... যুবকভক্ত সকল বিনা প্রতিবাদে শুনছে, নরেন্দ্রনাথ রুখে দাঁড়ালো : আপনার মত একতারা বাজিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলেই, ঈশ্বর দর্শন হবে তার প্রমাণ কি? উত্তরে মহিমবাবুর বললেন, নাদই ব্রহ্ম, ঐশ্বর সংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হবে। অন্য কিছু করার আবশ্যকতা নেই! প্রশ্ন করলো নরেন্দ্রনাথ. : ঈশ্বর কি আপনার সঙ্গে ঐরূপ লেখাপড়া করেছেন? না মন্ত্রৌষধি বশ সাপের মত সুর চড়িয়ে হুম হাম করলেই অবশ হয়ে সুড় সুড় করে সামনে নেমে আসবেন? মহিমবাবু তর্ক বাড়ালেন না বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।....

প্রভুদয়াল মিশ্র নামে এক খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক, ঠাকুর কে দর্শন করার জন্য একদিন উপস্থিত হলেন শ্যামপুকুরের বাসায়। পরণে গেরুয়া; — খ্রীষ্টান বলে বোঝা যায় না। কথা প্রসঙ্গে যখন তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করলেন, তখন প্রশ্ন উঠলো : খ্রীষ্টান হয়ে গৈরীক বসন পরেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন : ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছি। ভাগ্যক্রমে ঈশামসির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে নিজের ইষ্ট দেবতারূপে গ্রহণ করেছি বলেই কি আমার পিতৃপুরুষের চালচলন ছেড়ে দিতে হবে? যোগশাস্ত্রে আমার বিশ্বাস, ঈশাকে ইষ্ট রূপে গ্রহণ করলেও প্রতিদিন যোগাভ্যাস করে থাকি। জাতিভেদে বিশ্বাস নেই তবুও স্বপাকে হবিষান্ন খেয়ে থাকি। খ্রীষ্টধর্ম্মালম্বী হয়েও জ্যোতিঃদর্শনাদি আমার একে একে উপস্থিত হয়েছে। ভারতের ঈশ্বর প্রেমিকরা এই গৈরিক পরিধান করে এসেছেন, আমার কাছে অন্য কোন বসন প্রিয়তর হতে পারে কি?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণের সকল কথা জেনে নিয়ে তাঁকে সাধুও যোগীজ্ঞান সম্মান প্রদর্শন করে সকল ভক্তদের সচেতন করে তুললো। অনেকে তাঁর পা স্পর্শ করে প্রণাম করলো ও তাঁর সঙ্গে সকলেই ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি ভোজন করলো। ঠাকুর তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশা বলে নিজ মত প্রকাশ করলেন।

ডাক্তার সরকার প্রথমে যে সকল ওষুধ প্রয়োগে স্বল্পাধিক ফল পেয়েছিলেন তার ফল সুদূর প্রসারী হল না। ব্যাধি বাড়তে লাগলো। চিন্তিত হলেন তিনি। ভাবলেন : কলকাতার রুদ্ধ দুষিত বায়ুর জন্য কোন সুফল দেখা যাচ্ছে না। শহরের বাইরে যদি রাখা যায়, রোগীর স্বাস্থ্য পুণরুদ্ধার হবে, ব্যাধিও হ্রাস পেতে থাকবে। পরামর্শ দিলেন : আলো-বাতাস পূর্ণ ফাঁকা জায়গা বা কোন বাগান বাড়ীতে যদি ওকে রাখা যায় তো ভাল হয়!

অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। সামনে পৌষ মাস। স্থান পরিবর্ত্তন করতে রাজী হবেন না ঠাকুর। ভক্তগণ উঠে পড়ে লাগলেন। বরাহনগরের মতিঝিলের উত্তর দিকে কাশীপুরে, রানী কাত্যায়নীর জামাই গোপালঘোষের বাগানবাড়ীর সন্ধান পেলেন। মালিক ৮০ টাকা ভাড়ায় ছ' মাসের জন্য ভাড়া নেওয়া হল সুরেশ (সুরেন্দ্র) মিত্রের সহায়তায়। চুক্তি হল প্রয়োজনে আরও তিনমাস বাড়ানো হবে। শুভদিন দেখে, বাসা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা চলতে লাগলো। সংক্রান্তির আগের দিন ঠাকুরকে নিয়ে আসা হল, ফল, ফুলে ভরা বাগানবাড়ীর দোতলা বাড়ীতে। নীচে চারখানা উপরে দুখানা ঘর, উপরের পূর্ব্ব দিকের ঘরে শ্রীমার থাকার ব্যবস্থা হল, পূর্ব্ব পশ্চিমের হল ঘরে ঠাকুর ও দক্ষিণদিকের ঘরটিতে সেবক ও ভক্তদের থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হল। সামনে ঘেরা সরু ছাদ, সেখানেই ঠাকুর কখন কখনও পদচারণ ও উপবেশন করবেন। শ্রীমার ঘরের ওপরে একখানি ছোট ঘর ছিল তাতে ঠাকুর স্নান করবেন। অন্য সময় দু একজন সেবক রাত্রিবাস করবে। (১২৯২ সালের অগ্রহায়ন মাস)

প্রায় চৌদ্দবিঘা জমির ওপর বাসা বাড়ীটি বেশ রমনীয় ছিল। চারদিকে প্রাচীর। উত্তর সীমার মাঝখানে তিনচার খানি ছোট ছোট ঘর। ভাঁড়ার ও রান্নাঘররূপে ব্যবহৃত হত। ওঘরগুলোর সামনে উদ্যান পথের পাশে এই দোতালা বাড়ী। নীচে চারখানা ওপরে দুখানা। মাঝে হলের মত ঘর, উত্তরে পাশাপাশি দুখানা ঘর। পশ্চিমের ঘর থেকে কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে দোতলায়। পিছনে একটি ছোট ডোবা। বাগানের উত্তর পূর্ব্ব কোণে ছোট পুকুর। তার উত্তর পশ্চিম কোণে দু'তিনখানি একতলা ঘর। উত্তর পশ্চিম কোণে আস্তাবল। দক্ষিণ সীমার মাঝামাঝি মালিদের থাকার দু'খানি ঘর। সর্ব্বত্রই আম, পনস, লিচুর গাছ। পথের পাশে নানা ফুলের গাছ। ফোরা ও পুকুরের পাশের জমিতে প্রয়োজনীয় শাকসব্জী উৎপাদনের ব্যবস্থা। বড় বড় গাছের মাঝে মাঝে শ্যামল তৃণভূমি।

গৃহী ভক্তের দল এতদিন শ্যামপুকুরে থাকা ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করছিল। কিন্তু কাশীপুরে যখন তাঁর জন্য বাগানে ভাড়া নিয়ে থাকার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা করতে উদ্যত হল তখন ঠাকুর বলরামবাবুকে ডেকে বললেন, দেখ দশজনে চাঁদা করে এ খরচা চালাবে এটা আমার রুচি-বিরুদ্ধ। তবে যদি বল দক্ষিণেশ্বরেও নানা শরিক আমার যাবতীয় ব্যয় বহন করতো। আমি কিন্তু জানি রানীইসমস্ত ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। আমার পূজার জন্য সাত টাকা ও যতদিন ওখানে থাকবো ততদিন দেবতার প্রসাদ দেওয়া হবে। এটাকে তোমরা 'পেন্সিলে' যাচ্ছি ধরে নিতে পার। বাগানের ভাড়াই আশি টাকা, এই ছাপোষা ভক্তরা তা, কতদিন চালাতে পারবে? সুরেশবাবুকে ডেকে বললেন : এরা সব কেরানী ফেরানী, ছাপোষা লোক, চাঁদা সব সময় দেওয়া সম্ভব হবে তার স্থিরতা কোথায়? তুমি বরং এটার ভার নাও। করোজোড়ো সানন্দে স্বীকৃত হলেন সুরেশবাবু : যে আজ্ঞা!

দুর্ব্বলতার জন্য ঘরের বাইরে শৌচাদি অসম্ভব, একটা ব্যবস্থা তো হওয়া চাই। ভক্ত নাটু ও কথা শুনে করজোড়ে বললো : যে আজ্ঞে, হামি তো আপনাকার মেস্তর (মেথর) হাজির আছি! দুঃখের মধ্যে উপস্থিত সকলে হেসে ফেললো। ব্যবস্থা পূর্ণ হল। তবেই পা দিলেন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে।

শ্যামপুকুরে যখন ছিলেন সেবক ভক্তগণ বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে সেবা কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখতো। কাশীপুরে যখন গেলেন নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, নাটু, তারক, গোপাল দাদা, কালী, শশী, শরৎ, (হুটকো) গোপাল ওখানে থাকেতে লাগলেন। হরি, তুলসী, ও গঙ্গাধর, বাড়ীতেই তপস্যা করতো, মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করতো। এছাড়াও অন্য দুজন কয়েকদিন থাকার পর মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতেই থাকতে লাগলো।

এখানে কয়েকদিন থাকার পরই ঠাকুর একদিন নীচে নেমে অনেকক্ষণ পদচারণ করলেন। ভক্তরা খুশী হল। যদি এরূপ করতে পারেন, শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগার জন্য বা অন্য কারণে পরের দিন খুব দুর্ব্বল বোধ করতে লাগলেন। ঠাণ্ডা ভাবটা দু'তিনদিন পর একটু কাটলো কিন্তু দুর্ব্বলতা গেল না। ডাক্তার তাঁকে কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ব্যবস্থায় দুর্ব্বলতা একটু কমলো, স্বাস্থ্যের উন্নতিও দেখা দিল। ডাক্তার সরকার তাঁকে দেখতে এসে খুশী হলেন।

ডাক্তার কে সংবাদ দিতে হবে, মাংস ও প্রতিদিন আনতে হবে, কলকাতায় দু'জনকে ভার দেওয়া হল। বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখা... বরানগর থেকে বাজার আনা, দিনে ও রাতে ঠাকুরের কাছে থাকা ও সেবার ব্যবস্থা করা, সব পালা করে ভক্তদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সেবা গ্রহণ করতে পারতেন না— তাই তাকে নিযুক্ত থাকতে হল তত্ত্বাবধান ও তদারকীতে। শ্রীমা করতেন পথ্যের ব্যবস্থা। যে সব পথ্যের বিশেষ ব্যবস্থার দরকার, গোপালদাদা প্রমুখ তাঁকে বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করতে লাগলো। তিনি (শ্রীমা) দুপুরে ও সন্ধ্যায় নিজে এসে তাঁকে (ঠাকুরকে) ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে সাহায্য করতো ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী, শ্রীমার কাছেই থাকতো। এছাড়াও স্ত্রীভক্তরা সাহায্য করতো, আবার কেউ বা দু একদিন থাকতো। একসপ্তাহের মধ্যে সব ব্যবস্থা পূর্ণ হয়ে গেল।

নরেন্দ্রনাথ আগষ্ট মাস থেকেই শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত ছিল, এখানে এসে বাড়ী যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। অন্য ভক্তরা প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে কলেজ ছাড়লো, বাড়ীতে খেতে যাওয়াও ক্রমে বন্ধ করে দিল। অনেক অভিভাবক ব্যতিব্যস্ত হলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে চিন্তা ও মত পরিবর্ত্তনে বাধ্য করলেন।

যন্ত্রচালিতের মত সব ব্যবস্থা যখন পূর্ণ হল, নরেন্দ্রনাথ দু'এক দিনের জন্য বাড়ী গিয়ে এবার আইনের বইগুলি নিয়ে আসার মনস্থ করলো। সামনে বি. এল (আইন) পরীক্ষা। প্রস্তুত হতে

হবে। ইতিপূর্ব্বে পিতৃবন্ধু এর্টনী নিমাইচরণ বসু ও ব্যারিস্টার উমেশ বাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) সহায়তায় মামলায় জয় হয়েছিল। বাড়ীরও দখল নিয়ে মা ও ভাইদের রামরতন বসু লেন (মামাবাড়ীর) থেকে স্বকীয় বাড়ীতে বসবাসের ব্যবস্থাপূর্ণ হয়েছিল। তার পূর্ব্ব থেকেই আইন পড়া শুরু।

ঠাকুরের সেবাও হবে, অবসর সময়ে পড়াশুনাও চলবে। মনে বাসনা ছিল আইন পাশ করে মা ভাইদের একটা ব্যবস্থা পূর্ণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বাড়ী ত্যাগ করবে। এপাশে এখানে যন্ত্রচালিতের মত কাজ চলছে, অনেকটা নিশ্চিন্ত নরেন্দ্রনাথ। আপাততঃ ঠাকুরের সেবা ও পাঠ একমাত্র লক্ষ্য। গুরু ভাইদের জানিয়ে দিল আগামীকাল কলকাতার বাড়ীতে যাবেন বইপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আসতে। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম এলোনা। দুঃশ্চিন্তা ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, দেহরক্ষার সঙ্কল্প নিয়েছেন কিনা কে জানে? যদি তিনি চলে যান, পরিতাপের অবধি থাকবে না। কিছুক্ষণ পরে উঠে কয়েকজনকে জাগিয়ে বললো, চল বাগানে একটু পায়চারি ও তামাক খেয়ে আসি! বেড়াতে বেড়াতে সঙ্গীদের মনের কথা খুলে বললো। শীতের রাত। নিস্তব্ধ নিঝুম পুরী। আকাশে তারা। বৈরাগ্যপ্রবণ, ধ্যানপরায়ণ মন, প্রকৃতির মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলো। সামনে একটা গাছের নীচে সহসা বসে পড়ে দেখলো সামনে পাতা ও শুকনো ঘাস জমা করা আছে। বললো, সাধুরা গাছের তলায় বসে ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যান করে। এসো আমরা সবাই তেমনি ধুনি জ্বালাই। অন্তরের নিভৃত বাসনাগুলো দগ্ধ করি।

আগুন জ্বালা হল। আশপাশ থেকে শুকনো পাতা জোগাড় করে হোম করছে এই চিন্তায় রত হলো। অনেকটা সুরাহা হবে বাসনাসমূহের আহুতি প্রদান করে, সব ধ্যানে নিযুক্ত হল। সত্য সত্যই যেন বাসনা সকল ভস্মীভূত হয়ে মন প্রসন্ন ও নির্ম্মল হয়ে শ্রী ভগবানের কাছাকাছি বলে অনুভূত হত লাগলো। অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোতে মন অভিভূত হল। এমনি করে কেটে গেল দু'তিন ঘণ্টা। ইন্ধন অভাবে নিভে গেল দীপশিখা। শান্ত মনে সব ফিরে এলো কক্ষে। সকালে সকল ভক্তকে জানলো সে কথা। অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো, আমাদেরও ডাকলে না কেন?

নরেন্দ্রনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বুঝালো : পূর্ব্ব পরিকল্পনা তো ছিল না। এত আনন্দ যে পাওয়া যায় জানাও ছিল না— এখন থেকে সময় পেলেই সবাই মিলে ধুনি জ্বালিয়ে আর ধ্যানে নিজেদের নিযুক্ত করবো।....

এর পরদিন পড়ার বই নিয়ে এলো নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের সেবার পারই, পাঠে ডুবে যাওয়া হল নিত্যকার কাজ। ক'দিন ওপরে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছে না নরেন্দ্রনাথ। বিচলিত হয়ে উঠছেন ঠাকুর। সেদিন সন্ধ্যায় উপরে ঠাকুরকে দেখতে গেল। অসুখটা ক্রমেই বাড়ছে। চিন্তান্বিত নরেন্দ্রনাথ। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই ঠাকুর বললেন, কিরে তুই এ'কদিন আসিস নি কেন?

নরেন্দ্রনাথ বললো : সামনেই তো পরীক্ষা, তাই বই পড়াতে একটু মন দিয়েছি, ওপরে ওঠা হয়ে ওঠেনি।

ঠাকুর অভিযোগের সুরে বললেন, দ্যাখ তুই যদি উকিল হোস, তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারবো না।

নরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে গেল। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালো : আমি কি এমন কাজ করতে পারি পরিবারের জন্য, ঠাকুর আমার হাতে জলগ্রহণ করতে পারবেন না। বই সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল আইন পরীক্ষার কথা। ঐকান্তিকতার সঙ্গে সুরু হল শুধু ঠাকুরের সেবা আর অবসর সময়ে চললো শাস্ত্রচর্চ্চা, জপ, ধ্যান, জ্ঞান বিচার, সংকীর্ত্তন ... দ্বাদশজন সেবকের মনে জাগলো একটা সুর, যে যা পারো সঞ্চয় করে নাও। নিজেকে ডুবিয়ে দাও একান্তে নিভৃতে।....

ঠাকুর শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে একদিন দেখলেন তাঁর সূক্ষ্ম শরীর স্থূল দেহ থেকে বেরিয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। তাঁর গলার সংযোগস্থানে পিঠের দিকে কতকগুলো ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কি ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ে জগদম্বা বুঝিয়ে দিলেন, নানা দুষ্কর্ম করে এসে তাঁকে স্পর্শ করে পবিত্র হচ্ছে নানা লোকে, আর তাদের পাপের ভার তাঁর শরীরে সংক্রমিত হয়ে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করছে।... ঠাকুর শঙ্কিত হলেন না এতটুকু। শরীর ব্যাধিমন্দির। ক্ষয় তার হবেই বরং লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ করে ক্ষয়িষ্ণু এ দেহ ধারণ করতে কুণ্ঠা তাঁর নেই! জনকল্যাণে তবুও ক্ষান্ত হবেন না তিনি।....

কথাটা কানে উঠলো ভক্তদের। তারা স্থির করলো পূর্ব্বমত সুস্থ নয় তাঁর শরীর। নবাগত কে তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে দেওয়া হবে না। বসানো হল নিরঞ্জনকে। গিরিশচন্দ্র তাঁর অতীতকে স্মরণ করে বললেন, তোমরা চেষ্টা কর, সম্ভবপর হবে না— এই জন্যই তো দেহ ধারণ করেছেন উনি। ... দেখা গেল কাকে রেখে কাকে ঠেকাবে? নোতুন মুখকে বাধা দেওয়া সম্ভব, কিন্তু যারা পরিচিত, যারা ভক্ত গোষ্ঠীভুক্ত, তারাই সঙ্গে নিয়ে আসতে লাগলো নোতুন লোক। এমনকি নটী বিনোদিনীও বেশ পরিবর্ত্তন করে ঠাকুরের দর্শনপ্রার্থী হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। তাঁর আত্মপরিচয় যখন তিনি নিজেই প্রকাশ করলেন, রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর, তার ভক্তিশ্রদ্ধার প্রশংসা করলেন। বললেন, যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, যারা শরণাপন্ন, তাদের কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারি!.... রোগ বাড়ছে, যন্ত্রণা সহ্য করে মনকে সমাধি ভূমিতে আবদ্ধ রেখে, যে তত্ত্ব কথা জানতে চায় তার সেই ভক্তি বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলাই তাঁর কাজ। তাদের ফেরাবে কেমন করে? নিরঞ্জন বাধা দিলে কি হবে যিনি করুণার আধার, তাঁর করুণার দ্বার রুদ্ধ করবে কে?

ক্রমশঃ যাতায়াত বাড়ছে। লোক সমাগমের শেষ নেই। ভক্তদের ডেকে বললেন, নিতে পারবে সব কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি? পারবে মান, অপমান, ঘৃণা-জ্ঞান বর্জ্জন করতে?

রাজি হল ভক্তদের দল। ত্যাগ তাদের ধর্ম্ম, ত্যাগ তাদের ব্রত। কাঁধে তুলে নিল ভিক্ষার ঝুলি। কেউ দিল, কেউ মুখ ফেরালো, ভ্রূক্ষেপ নেই ভক্তদের। সংগ্রহ করে নিয়ে এলো ভিক্ষালব্ধ বস্তু। খুশী হলেন ঠাকুর। বল্লেন যাও, শ্রীমাকে দিয়ে এসো। এ অন্ন গ্রহণ করবো আমি। তিনি স্পর্শ করলেন, প্রসাদ পেল ভক্তেরদল, প্রাণে তাদের অফুরন্ত আনন্দ, অফুরন্ত উদ্দীপনা!...

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী। ঠাকুর সুস্থবোধ করছেন। নীচে নেমে একটু বেড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ছুটির দিন। গৃহী ভক্তদের সমাবেশ, ত্যাগী ভক্তদের দল ব্যস্ত ঠাকুরের কাজে। বিছানা রোদে দেওয়া, ঘর পরিষ্কার করা, নানা কাজে ব্যস্ত তারা।

তখন বেলা তিনটা। অপরাহ্ন। ঠাকুর নীচে নামলেন। ভক্তরা উদ্যানের গাছের তলায় বসে আলোচনায় ব্যাপৃত। তাঁকে দেখেই, উঠে এসে প্রণাম করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তিনি নীচের হল ঘরের পশ্চিমের দরজা দিয়ে বাগানের ডানদিকের ফটকের দিকে এগিয়ে চললেন। ভক্তের দল তাঁর পিছু পিছু চললো। ফটকের মাঝামাঝি পৌঁছে ঠাকুর, গিরিশ, রাম, অতুল প্রমুখ ভক্তদের দেখতে পেলেন। তাঁরাও তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রণাম করে তাঁর দিকে এলো। কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঠাকুর গিরিশবাবুকে বললেন : গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ বা বুঝেছ?..... কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর পদপ্রান্তে, নতজানু হয়ে উর্দ্ধমুখে করজোড়ে গদগদ স্বরে বলে উঠলেন: ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি বলতে পারি।....

গিরিশচন্দ্রের আন্তরিকতায়, তার সরল বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে সমবেত ভক্তদের বললেন, তোমাদের আর কি বলবো, আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক! প্রেম ও করুণায় আত্মহারা

হয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ভুলে গেলেন দেশকাল, ভুলে গেলেন আধিব্যাধির কথা, ভুলে গেলেন জ্বালা যন্ত্রণার ব্যথা, এমন কি রোগ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কাউকে স্পর্শ না করার অঙ্গীকারের কথা, স্নেহময়ী মার করুণার ও প্রশন্নতায় আত্মহারা হয়ে দিব্য শক্তি পূত স্পর্শে, কৃতার্থ করতে লাগলেন সকলকে। ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, প্রণাম আর আশীর্ব্বাদী গ্রহণ। কেউ বাকশূন্য, কেউ মন্ত্রমুগ্ধ, কেউ আবার মন্ত্রোচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করলো, কেউ আবার চীৎকার করে অন্য ভক্তদের আহ্বান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে ঠাকুর শান্তভাব ধারণ করে, উদ্যাণ ভ্রমণ শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ভক্তরাও প্রকৃতস্থ হল।.... প্রতিটি ভক্তের মনের কামনা দূর করেছিলেন বলে রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তরা 'কল্পতরু' বলে নির্দ্দেশ করলেন।

ঘরে ফিরে এলেন ঠাকুর। জ্বলে যাচ্ছে তাঁর সর্ব্ব দেহ। বললেন, গঙ্গাজল নিয়ে আয়, ধুইয়ে দে সারা অঙ্গ, সকলের কামনার আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

ভক্তরা গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিল সারা অঙ্গে। শান্ত হলেন ঠাকুর। মন দিলেন, আধ্যাত্মিক আলোচনায়।

কাশীপুর বাগানবাড়ী সেবায় সীমাবদ্ধ নয়। পরিণত মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনন্য চিত্ত নরেন্দ্রনাথ বিসর্জ্জন দিয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থ। গুরুগত প্রাণ। তাঁর প্রদর্শিত পথে, শুরু করেছে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। চলেছে সাধন ভজন। চলছে শাস্ত্রপাঠ, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা। উৎসাহ দিচ্ছে গুরুভাইদের। আবার একই সঙ্গে জপ-ধ্যান। রাত্রের অন্ধকারে চলেছে সাধন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী-তলে। ধ্যান শেষে, ফিরে আসে বাগানে। প্রখর দৃষ্টি গুরুসেবার ব্যাঘাত না ঘটে। ত্রুটি বিচ্যুতির অবকাশ নেই, সকলেই একাত্ম, আধ্যাত্মিক বাঁধনে। প্রেমে, ত্যাগে, বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ তাঁরা। রামকৃষ্ণ পরিবার, ঠাকুরের সন্তান তারা, আদর্শ গুরুও, তাঁর সাধন ও সাধনাতত্ত্বের।

ঠাকুর, ভক্ত বৈকুণ্ঠের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন গৈরিক বসন। স্থির করলেন, সন্ন্যাস দেবেন শিষ্যদের। দায়িত্বের ভার সঁপে দিলেন নরেন্দ্রনাথের ওপর। উপস্থিত শুভদিন। ঠাকুর ডাকদিলেন নরেন্দ্রনাথকে, প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন গৈরিক বসন। বললেন, তোমরা নিরভিমান হয়ে রাজপথে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে, ভিক্ষা করতে পারবে কি?

গুরুর আদেশ। শিরোধার্য্য করে ভিক্ষায় বেরুলো সকলে। ফিরে এলো, একে একে। সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে প্রস্তুত হল অন্ন। ঠাকুরের সামনে বসে তারা গ্রহণ করলো সে প্রসাদ।.... সুরু হল সন্ন্যাসজীবন। যুগপ্রবর্ত্তকদের জীবন ও উদ্দেশ্য আলোচনায় ব্রতী হল নরেন্দ্রনাথ। আলোচনার বস্তু হল: বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও সাধনা, তাঁর করুণা। গুরুসেবার পরে সমবেত সকলে জপ, তপ, ধ্যান ধারণায়। পরে শুরু হলো আলোচনা। জীবের জন্ম, জরা, দুঃখ ও ব্যাধির পেষনে ক্লিষ্ট সেই মুখ, তার হৃদয়মথিত হাহাকারের করুণ চিত্র, বিগলিত রাজপুত্রের হৃদয়। সেই বর্ণনায় চোখে জল এসে যেতো। নরেন্দ্রনাথের মনটা, বিভোর হয়ে উঠতো বুদ্ধদেবের ধ্যানে।... একদিন স্থির হল, যাবে বুদ্ধগয়া দর্শনে।

ঠাকুরের গলক্ষত প্রবল আকার ধারণ করেছে। একপাশে কর্ত্তব্য, অন্য দিকে চিত্তের আকর্ষণ। সকলের অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়লো নরেন্দ্রনাথ। সঙ্গী হল, তারক ও কালী। রাত্রে গঙ্গাপার হয়ে বালী ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠে বসলো তিনজনে (১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে)। ... পরদিন পৌঁছালো গয়ায়। ফল্গু নদীতে স্নান সেরে, ভক্তি ভরে আট মাইল দূর বোধিসত্ত্ব মন্দির অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো তারা।

সকালে নরেনের সন্ধান পাওয়া গেল না। চারদিকে অনুসন্ধান চললো, চিন্তিত সকলে। কোন খবর মিললো না। শেষে ভক্তের দল, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলো, সে কথা।

ঠাকুর সে কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। ফিরে এলো বলে। এখানে তার টিকি বাঁধা, এজায়গা ছেড়ে কি থাকার জো আছে!.....

নরেন্দ্রনাথ বোধিসত্ত্বের মন্দির দর্শন করলো। এখানেই মানুষের দুঃখ নিবারণ-কল্পে সমাধিস্থ হয়ে বোধি-লাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব। বোধিদ্রুম মূলে পবিত্র প্রস্তরাসনে বসে ধ্যানস্থ হলো। সঙ্গী গুরুভাই দুজনও ধ্যানস্থ। তাদের ধ্যান ভাঙলো। চেয়ে দেখলো, নরেন্দ্র নিশ্চল স্পন্দনহীন। বহুক্ষণ কেটে গেল। একবার অর্দ্ধবাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়েই কেঁদে উঠলো, পরক্ষণেই আবার ধ্যানস্থ হয়ে পড়লো। ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ফুটে উঠলো সত্যের বিমলজ্যোতি। ক্রমাগত তিনদিন কঠোর তপস্যায় কাটলো, এবার ফেরার পালা। কিন্তু গাড়ীভাড়া নেই। ভজন গেয়ে মুগ্ধ করলো মঠাধ্যক্ষ্যকে। তাঁর সহায়তায় তিনজনই ফিরে এলো কাশীপুরে।...

সবাই খুশী, গুরুভাই সকলেই বাঁচলো হাঁপ ছেড়ে। ঠাকুরও নিশ্চিন্ত। চপল ছেলে তাঁর, ঘুরে ফিরে, ঘরে ফিরেছে, এবার শান্ত হবে সে। পাবে তার অবিশ্বাসের সমাধান।.... আর নরেন্দ্রনাথ! যে পিপাসায় কাতর হয়ে, অতৃপ্ত সেই বাসনাকে পরিপূর্ণ করার আশায় করলো ছুটাছুটি, সে তৃপ্তির সন্ধান পেল না খঁজে। বুঝলো : একমাত্র তিনিই দিতে পারেন তৃপ্তি, যিনি অকারণে ভালবেসে তুলে নিয়েছেন নিজের কোলে।

ফিরে এলো নরেন্দ্রনাথ। হৃদয় জেগেছে সেই গভীর বিশ্বাস, কিন্তু তার আজীবনের সংস্কার, ভাল করে যাচাই করে, নিজের ব্যক্তিগত বুদ্ধির ছাঁচে ঢালাই না করে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন, না- না- সে অসম্ভব। মাথা নুয়িছে, গুরুর বলে মেনে নিয়েছে, তবুও সাধারণ আত্মসমর্পনে, মনের কোণে লুকিয়ে আছে দ্বিধা, সঙ্কোচের সূক্ষ্ম একটা আবরণ। স্বকীয় শক্তি ওরফে ব্যক্তিগত সাধনায় তা আয়ত্তাধীন করা সম্ভব কিনা, বাকী আছে সেই পরীক্ষা!... সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে! ব্রতী হল তীব্র তপশ্চর্যায়। প্রবল সে উৎসাহ, কঠোর সে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। নরেন্দ্রনাথ মত্ত ধ্যান ও ধারণায়। ঠাকুর এটা-ই চেয়েছিলেন মনেপ্রাণে, তাঁর ইচ্ছা পূরণে উদ্যত হয়েছেন জগদম্বা। তাকে নিয়ে চলেছেন সেই পথে— যে পথে মুক্ত পুরুষগণ, মুক্তির নব নব পথ আবিষ্কারে অবিচলিত থেকেছেন, স্ব স্ব কাজ সম্পাদন করে গেছেন এ জগতে। তাঁদের জপ, তপ, ধ্যান, সাধন, ভজন, যা কিছু, সব পরহিতায়! মুক্তির কামনা নিজের জন্য নয়। ঠাকুর তাকে পরিচালিত করতে লাগলেন সেই পথের সন্ধানে, যা ধর্ম্মজীবনের চরমাদর্শের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জনে সহায়তা করে। বলিয়ান হোক, পরিচয় ঘটুক তার নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে। তবেই তো প্রত্যক্ষ হবে সত্যের পথ! খুঁজে পাবে মুক্তির আলো!....

কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। সামনে ধ্যানে রত নরেন্দ্রনাথ ও অন্যসব ত্যাগী ভক্তবৃন্দ। সহসা অনুভব করলো : তার মধ্যে একটা শক্তির সঞ্চার হচ্ছে। কাঁপছে সারা দেহ। মনে হল এটা বোধ হয় সেই শক্তি, যার প্রভাবে ঠাকুর স্পর্শমাত্র অপরের মনোরাজ্যের আমুল পরিবর্ত্তন আনেন, ধর্ম্মভাব সঞ্চারে বিশেষ সহায়তা করেন। কৌতূহল জাগলো মনে। পাশে ধ্যানরত অপর গুরু ভাই (কালী)। তাকে স্পর্শ করলো। যিনি দ্বৈতবাদী, সাকার ঈশবরে বিশ্বাসী ভক্ত। অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানযোগীর পথ অনুসরণে নিযুক্ত স্বয়ং তিনি।.... ঠাকুর ডেকে পাঠালেন নরেন্দ্রনাথকে। বুঝিয়ে দিলেন : কিরূপে প্রয়োগ করতে হয় এ শক্তি। না জমতেই খরচ? এতে ক্ষতি হয় নিজের ও অপরেরও!

দার্শনিক, তার্কিক, উদ্ধত নরেন্দ্রনাথ এখন গুরুভক্ত সাধক। পাশ্চাত্যদর্শনের যুক্তিজাল, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব, সব মুছে গেছে মন থেকে। এখন ...স্বকীয় বিদ্যার অভিমানকে হেয় জ্ঞান হয়। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে উপনিষদ, সংহিতা, পঞ্চদশী, বিবেকচুড়ামণি নানা শ্রেণীর গ্রন্থ। ঠাকুরের বাণী মধ্য দিয়ে, শিক্ষা নেয় নোতুন পাঠ, অর্জ্জন করে অভিনব জ্ঞান। এখন সে ত্যাগী ভক্তমণ্ডলীর আদর্শরূপে প্রতিভাত। সবাই তাকে অনুসরণ করে, সম্মুখ পথে এগিয়ে চলার দৃষ্টান্ত আজ সে।.....

যাকে দেখার জন্য উন্মত্ত হতেন ঠাকুর, যার গান শোনা মাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মহারা হতেন, যার প্রশংসা পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন, 'ও সাক্ষাৎ নারায়ণ, জীবোদ্ধারের জন্য দেহ ধারণ করেছে'। সেই নরেন্দ্রনাথ, এত কঠোর সাধনা করেও আধ্যাত্মিক পিপাসা মেটাতে সমর্থ হচ্ছে না। দিনের পর দিন চলে যায়, পরিপূর্ণ উদ্যম নিয়েও আকাঙ্খিত বস্তু লাভে সক্ষম হচ্ছে না। .... নির্ব্বিকল্প সমাধি এ লাভ ছাড়া, তৃপ্তি— অসম্ভব জীবনে।

গভীর রাত। কাশীপুর উদ্যানবাটীর দোতালায় রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর। পাশে গিয়ে দাঁড়ালো নরেন্দ্রনাথ। ঘরে আর কেউ নেই। সঙ্কল্প করছে সে, যে কোন উপায়েই হোক নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ তাকে করতেই হবে। পুরুষাকারের উপাসক আজ কৃপাপার্থী। ভয়ে, বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, বাকস্ফূরণ তার হল না। শিষ্যের মনোভাব বুঝলেন ঠাকুর। যে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে অস্বীকার করে বলেছিল : যে বই মানুষকে ভগবান বলতে শিক্ষা দেয়, তা পড়ার প্রয়োজন তার নেই। সোহহং— নিজেকে ভগবান বলার চেয়ে পাপ, কিছু আর নেই। সে-ই বেদান্তের সর্ব্বোচ্চ অনুভূতি লাভের জন্য লালায়িত। ছ'বছর নিরন্তর লড়াই, আর আজ?

সস্নেহে শুধালেন ঠাকুর : তুই কি চাস্ নরেন?

গুরুদেবের মত নির্ব্বিকল্প সমাধি-যোগে, সচ্চিদানন্দ ভবসাগরে ডুবে থাকতে চাই!

চোখে তাঁর অধীরতা। বললেন, বার বার ঐ এক কথা বলতে তোর লজ্জা করে না। কোথায় বট গাছের মত হয়ে শত শত লোককে শান্তির ছায়া দিবি— তা' নয়, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্? তোর আদর্শ এত ছোট!"

নরেন্দ্রনাথের চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। অভিমান ভরে বললো নির্ব্বিকল্প সমাধি ছাড়া মন কিছুতেই শান্ত হবে না। আর যদি না হয় ওসব আমি কিছুই করতে পারবো না।

তুই কি ইচ্ছায় করবি, জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। তুই না করিস, তোর ঘাড় করবে।....

নরেন্দ্রনাথের চোখে মুখে ব্যাকুলতার সুস্পষ্ট ছায়া। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন ঠাকুর, আচ্ছা যা, নির্ব্বিকল্প সমাধি হবে।.....

কাটলো কয়েকটা দিন। অপ্রত্যাশিতভাবে সে তলিয়ে গেল নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সেদিনের সন্ধ্যাবেলায়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সবকিছুই মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। দেশকাল নিমিত্তের বাইরে অবস্থিত যে সত্ত্বা— সেই নিজবোধস্বরূপ আত্মা, বিরাজমান স্বমহিমায়।.....

বহুক্ষণ পরে ভাঙলো সে সমাধি। একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি : একটা অলৌকিক শক্তি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে তাকে নামিয়ে নিয়ে আসছে! অনুভব করলো নরেন্দ্রনাথ : বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়, কর্ম্ম করতে হবে অপারোক্ষানুভূতি লব্ধ সত্য প্রচার করতে হবে!... অতীত যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলের মত তাকেও দুঃখ, দৈন্য প্রপীড়িত মোহগ্রস্ত জীবকুলকে ডাক দিতে হবে :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আযে-ধমানি দিব্যানি তস্যুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্য বণং তমসঃ পরস্তাৎ;
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যপন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।

হৃদয়ের সমস্ত অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে। ব্রহ্ম-বিদের মত দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত তার মুখ। আপ্তকাম সন্ন্যাসী শ্রীগুরুচরণে প্রণত হল। হাসলেন ঠাকুর। বললেন, এখনকার মত, তবে চাবি দেওয়া রইল, চাবি আমার হাতে, কাজ শেষ হলে খুলে দেওয়া হবে।

আনন্দে মুখর সকলে। দিনরাত চলছে ভজন গান। ভাবন্মত্ত নরেন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, চৈতন্যলীলার গান গেয়ে মাতিয়ে তুলছে সকলকে। .... আর ঠাকুর, মা ভবতারিনীকে কাতর কণ্ঠে

নিবেদন করছেন, মা ওর (নরেনের) অদ্বৈত অনুভূতি, তোর মায়াশক্তি দিয়ে আবরণ করে রাখ মা! ওকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।....

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষের দিক। ঠাকুরের গলক্ষত রুদ্র রূপ নিল। খুব আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে দু'চারটে কথা বলতে পারেন। আহার, জল বার্লি, তাও গিলতে পারেন না। তখনও তাঁর কৃপার শেষ নেই। ত্যাগী ভক্তদের উপদেশ দিয়ে চলেছেন। নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে বললেন : নরেন আমার এই সব ছেলেরা রইলো, তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, ওদের রক্ষা করিস, সৎপথে চালাস, আমি শীগ্‌গীর দেহত্যাগ করবো।.... চমকে উঠলো নরেন। অতিকষ্টে পুনরায় ফিস ফিস করে বললেন : যখন যেরূপ তোর মধ্যে দেখেছি, সেই ভাবেই তোকে ডাকছি। কখনও বলেছি ব্রহ্মজ্ঞানী, কখনও বা শুকদেব, কখনও বা শঙ্কর, কখনও বা নারায়ণ ঋষি, তোর মধ্যে আছে সকলের মিলিত সমন্বয়।.... ঋষির মত সমাধি তৃষ্ণা, শুকের মায়ারহিত, শঙ্করের জ্ঞান, নারদের ভক্তি— এটা ছিল তোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য!

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে এলো। ঘরে কেউ নেই। ঠাকুরের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ। সেদিন তাঁর শরীরটা একটু ভাল মনে হচ্ছে। সজল নয়নে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন : বাবা! আজ তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম। নরেন্দ্রনাথ বুঝলো : ঠাকুরের লীলা অবসানকাল আগত প্রায়! কেঁদে ফেললো নরেন্দ্রনাথ। তাঁর বিরহে কেমন করে জীবনধারণ করবে! নিজেকে সামলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে.....

কদিন ধরে গলক্ষত থেকে রক্তপাত শুরু হল। একটু বেশী কোনদিন, কোনদিন বা থাকেন ভাল। দুএকদিন রক্তপাত না হলেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়, আবার যেদিন পড়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। -ঝিমিয়ে পড়ার ভাব। শুরু প্রথম সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে।

রবিবার। পুর্ণিমা। পনেরোই আগস্ট ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। (৩১শে শ্রাবন ১২৯৩) ছুটির দিন ভক্তরা ভীড় করে বেশী। এদিনও ছিল তেমনি। সন্ধ্যার দিকে একবার রক্তক্ষরণ হল। ভীড় কমতে শুরু হল। সামনে থাকলেই কথা বলবেন, উপদেশ দেবেন, বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই সকাল সকাল ফিরে গেল সকলে। ঠাকুরের সামনে বসে নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, কালী প্রমুখ ভক্তগোষ্ঠী। নরেন্দ্রনাথের একটি প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেন। ঠাকুর যদি নিজেই এ সমস্যার সমাধান করে দেন ত, তবেই বিশ্বাস করবো নচেৎ নয়। ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য করুণায় অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁর সমষ্টি রূপ? সত্যই কি যুগ-প্রবর্ত্তক, অবতার পুরুষ? চোখ মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি নরেন এখনও তোর বিশ্বাস হয়নি? যে রাম, সেই কৃষ্ণ — সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ, কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়!.... চমকে উঠলো নরেন্দ্রনাথ! সত্যই তিনি অন্তর্যামী!

আবার বেশ খানিকটা রক্তপাত হল। খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। শুয়েছিলেন এতক্ষণ। ঘড়িতে রাত তখন ১০টা। সহসা তাকিয়ার ওপর ভর দিয়ে কাত হয়ে উঠে বসলেন ঠাকুর। ত্যাগী ভক্তবৃন্দ সকলে ঘিরে বসে আছে। তিনবার কালী নাম উচ্চারণে সমাধিস্থ হলেন ঠাকুর। নাসাগ্রের উপর স্থির দৃষ্টি। নরেন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে 'ওঁকার' ধ্বনি করে উঠলো। সকলেই সমস্বরে 'ওঁকার' ধ্বনি করতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হয়ে চৈতন্য লাভ করেন। এক্ষেত্রে তা দেখা গেল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে লাগলো ভক্তবৃন্দ। তিনদিন, তিনরাতের পরও তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়েছেন.... সেরূপও হতে পারে ক্ষীণ আশা ভক্তদের।... কেটে গেল সারা রাত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সকলে। সকালে খবর দেওয়া হল শ্রীমাকে। তিনি পাশে বসেই ডাকুরে কেঁদে উঠলেন : মা কোথায় গেলি গো!....

হৃদয় বিদারক সে-দৃশ্য। পতিপত্নীর মধুর সে সম্বন্ধ। অপরূপ সে ধারা। ঠাকুর শ্রীমাকে জীবন্ত ভবতারিণীর মূর্ত্তি-জ্ঞান করতেন, আর শ্রীমা তাঁকে সম্বোধন করতেন, 'মা কালি', সাক্ষাৎ তাঁর জীবন্ত প্রতীকরূপে। (শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ১০টা ৬ মিনিটে)।

খবর গেল নেপালের কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের কাছে। শশী তখনও ঠাকুরের মেরুদণ্ডে ঘি মালিশ করেছিল ক্ষীণ আশায় যদি বাহ্যজ্ঞান প্রকাশের চিহ্ন পাওয়া যায়।... খবর ছড়িয়ে পড়লো। ভক্তরা একে একে সমবেত হতে লাগলো।....

· বেলা তখন দশটা। এলেন ডাক্তার সরকার। বহুক্ষণ ধরে ঠাকুরকে পরীক্ষার পর বললেন, আধঘণ্টা আগে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।.....

সব আশা শেষ। অসহায় বোধ করলো ভক্তের দল। সহায় সম্বলহীন হল তারা। আকাশ ভেঙে পড়লো মাথার উপর।

পয়লা ভাদ্র। স্মরণীয় দিন। যে বীজ গ্রথিত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের ভাবতারিনীর পাদপীঠে, ব্যাপ্তি হল তা গোমুখী থেকে গঙ্গার পবিত্র বালুকণার নিবীড় গহ্বরে। পুঞ্জীভূত পুষ্প স্তবক : ফুলচন্দনে সাজানো হল তাঁর দেহ। উঠলো ছবি, মরজীবনের শেষ স্মৃতি।

বাজলো পাঁচটা। সুরু হল সংকীর্ত্তন। শেষ যাত্রা শুরু। সঙ্গে নেওয়া হল প্রতিটি ধর্ম্মের প্রতীক ত্রিশূল, ওঁঙ্কার, খোন্তা, ক্রুশ, ক্রসেন্ট প্রভৃতি, পিছনে জনস্রোত, মাথা শুধু মাথা ... শেষ হল কাশীপুরের শ্মশানঘাটে।... সারা হল স্নান, সারা দেহে মাখানো হল ঘি, পরানো হল মালা, ভূষিত করা হল চন্দনে। জ্বলে উঠলো চিতা। মরদেহ - মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে— বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। আর, শেষ-স্মৃতি যে ভস্ম, তাম্রফলকে স্থাপন করে ত্যাগী ভক্তের দল মাথায় করে নিয়ে এলো ভারাক্রান্ত চিত্তে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে। স্থাপন করা হল অস্থি, তাঁরই শয়নকক্ষে। চললো, তাঁর জীবন আলোচনা। তাঁর আদর্শকে স্মরণ-মনন করে তারা মগ্ন হল ধ্যানে।

বহুক্ষণ পরে ভাঙলো তাদের ধ্যান। নরেন্দ্রনাথ শুরু করলো, তাঁর অহেতুকী কৃপার কথা। সান্ত্বনা- দিতে লাগলো বেদনাকাতর ত্যাগী ভক্তবৃন্দদের.....

ঠাকুর অপ্রকট হবার কয়েকদিন পরেই কাশী ́র উদ্যানবাটী ছেড়ে দিতে হল। নরেন্দ্রনাথ ভেবে স্থির সিদ্ধান্তে এলো : ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যদি চা দিকে বিচ্ছন্ন হয়ে চলে যায়, সেই মহাপুরুষের 'আদর্শ' প্রচারের বিঘ্ন ঘটবে। প্রত্যেকে পৃথক সাধানার যে আদর্শ লাভ করেছে, তা কেন্দ্রে-সংহত করতে হবে। নইলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। কয়েকজন গৃহী ভক্ত এমতকে সমর্থন করলেন। বৈরাগ্য প্রবণ তরুণ সন্ন্যাসীরা আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াক এটা তাঁদেরও মনুঃপুত হল না। উদার গুরুগত প্রাণ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বরানগরে একটি বাড়ী ভাড়া করে দিলেন। কয়েকদিন পরে, তাঁর দেহাবশিষ্ট ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্রকলসীটিকে মাথায় নিয়ে পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত বাগানবাটী ত্যাগ করে নোতুন আস্তানায় আশ্রয় নিল।

দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস ও সাধন ভজনে, যে প্রীতির বাঁধনে পরস্পর আবদ্ধ হয়েছিল, তা ছিন্ন হল না। শ্রীগুরুর আদর্শ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বুঝিয়ে তাদের উৎসাহ দান করতে লাগলো নরেন্দ্রনাথ। অবশ্য গৃহী ভক্তদের কেউ কেউ তাদের বাড়ী ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিতে লাগলেন। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কেউ কেউ বাড়ীও ফিরে গেল। বিধেয় ব্যবস্থা তখনও হয়নি নরেন্দ্রনাথকেও মাঝে মাঝে বাড়ী ফিরে গিয়ে সাংসারিক তত্ত্বাবধান চালাতে হচ্ছিল। সেই সময় দেখা দিল নতুন সংঘাত। রামবাবুর অভিমত : সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত যারা, তারা কোথায় থাকবে তার স্থিরতা নেই, সুতরাং গৃহী ভক্তদের ভস্মকলসটি রক্ষা করার দায়িত্ব থাকা উচিত। তাঁরা সমাহিত করে মন্দির নির্ম্মান করবেন। ত্যাগী ভক্ত শশী ও নিরঞ্জনের ওপর 'তাম্রাধার' রক্ষার

ভার ছিল। তারা রাজী হল না। মধ্যস্থ হল নরেন্দ্রনাথ। তাদের বুঝিয়ে বললো, ওদের মন্দির করার ইচ্ছা, মন্দির করুক। আমরা বৈরাগী, অর্দ্ধেক ভাগ করে নাও। আমরাও তাঁর স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করবো।

শশী নরেন্দ্রনাথের যুক্তি মেনে নিল। দেহাবশিষ্ট 'ভস্মস্থি'র কিছু রেখে, অবশিষ্ট ভাগসহ তাম্রকলসী প্রত্যর্পন করলো। শুভদিন দেখে, গৃহ ও সন্ন্যাসী ভক্ত একত্র হয়ে যোগোদ্যানে পবিত্র কলসীটি সমাহিত করার ব্যবস্থা করলো। গৃহবিবাদ অঙ্কুরেই বিনাশ হল, সুখী হল উভয় পক্ষ। কিন্তু নিশ্চিন্ত হল না নরেন্দ্রনাথ। বাড়ীর প্রয়োজনটুকু শেষ করে প্রতিদিন ফিরে যেতে আরম্ভ করলো বরানগরের মঠে। যারা মঠ ছেড়ে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল : তাদের সঙ্গে দেখা করে বোঝাতে লাগলো, পরীক্ষা শেষ হলেই চলে এসো মঠে। পূর্ণ করতে হবে শ্রীগুরুর ইচ্ছা।

সেই উৎসাহ ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, ফিরে এলো সব একে একে। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ জয়ী হল মামলায় (আপীলে)। ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকে স্থায়ীভাবে বাস সুরু করলো মঠে। বলরাম বসু ও গিরিশচন্দ্র ও সুরেন্দ্র মিত্র মশায় প্রাণপণে সাহায্য করতে ও উৎসাহ দিতে লাগলেন তাদের। .... আহার নেই, নিদ্রা নেই, ভ্রূক্ষেপহীন ত্যাগী সন্ন্যাসীররা দিব্যভাবে বিভোর হয়ে শ্রীগুরুর পবিত্র চরিত্র ও উপদেশ আলোচনা, দর্শন, শাস্ত্র, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবত পাঠ, ধ্যান ও জপে দিনের পর দিন কাটাতে লাগলো। শ্রীগুরুর অদর্শনে ব্যথিত ভক্তদের ভরসা এই নরেন্দ্রনাথ।

শশী ঠাকুরের পূজা, আরতি ও গুরুভাইদের সেবায় নিয়োজিত। একাধারে মঠের মাতা, পিতা, রক্ষক, ভৃত্য ও পাচক। ধর্ম্ম আলোচনায় নিরত ভাইদের, ভয় দেখিয়ে খাওয়াচ্ছে। কাউকে স্নান করাচ্ছে, কখনও সারারাত ধ্যানে নিরত সন্ন্যাসীকে শয্যায় বিশ্রাম নিতে বাধ্য করাচ্ছো। তার সাধনা ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সবল, সচল ও সুস্থরাখা। আর এটাই তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্রনাথের অবসর কোথায়? ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, শয্যা ত্যাগ করে, গুরুভাইদের তুলে জপ ধ্যানে বসানো, জপ শেষ হলে, গীতা, কোনদিন বা টমাস এ কেম্পিসের ঈশানুসরণ পাঠ। কখনও বা কর্মন্যেবাধিকারস্তে 'মা ফলেষু কদাচন' মন্ত্রে আদর্শ কর্ম্মযোগীর মত, বিশ্বমানবের কল্যাণ যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানকল্পে প্রস্তুত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে ব্যস্ত। কখন চলছে গীতা পাঠ। সহসা মুখর হয়ে উঠলো : কি হবে আর গীতা পাঠ করে। ঠাকুর বলতেন : গীতা দশবার বল্লে যা হয় তাই। গীতা... গীতা...গীতা.... ত্যাগী...ত্যাগী.... ত্যাগী! চাই ত্যাগ, কামিনী, কাঞ্চন ত্যাগ। ত্যাগই আদর্শ।

ছ বছর ধরে লড়াই করেছে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রবিদ, সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ, আর আজ সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নেতা! গুরুর পবিত্র জীবনের ভাস্বর দ্যুতিতে, সনাতন ধর্ম্ম আজ তার চোখে মহিমময়, উদার, সার্ব্বভৌমিক। বেদ অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য নিত্যবর্ত্তমান সত্য! উপনিষদের কল্যাণপ্রদ সত্যসমূহের গূঢ় অর্থ আজ সহজসাধ্য। বেদান্ত ও উপনিষদ বোঝার জন্য ভাষ্যকারকে অনুসরণ করার প্রয়োজন আজ নেই। যে গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়েছে, তিনি একদিকে যেমন দ্বৈতবাদী, আবার তেমনি অদ্বৈতবাদী, একাধারে পরম ভক্ত, তেমনি পরমজ্ঞানী। আজ অন্ধভাবে ভাষ্যাকারদের অনুসরণের প্রয়োজন নেই, নিজেই স্বাধীনভাবে অনুভব ও ব্যাখ্যা করতে পারে।...

যে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, সেটাই মঠরূপে ব্যবহার করা হল বরানগরে। উপরে তিনখানা, নীচেও তিনখানা ঘর। নীচের তিনখানা, ব্যবহারের অযোগ্য। উপরের ঘরেই চলে দেবসেবা, ধর্ম্ম আলোচনা। কোনদিন ঠাকুরকে দুটো নৈবদ্য দেওয়া হল, কোনদিন বা কিছুই জুটছে না। থালা বাসন ছিল না। বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে লাউ গাছ, কলাগাছ প্রচুর ছিল, কিন্তু কলাপাতা কাটতে গেলে উড়েমালী গাল দিত। শেষে, মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে খাওয়ার ব্যবস্থা। কোনদিন বা জুটতো তেলাকুচোর পাতা সিদ্ধ আর ভাত। তাও আবার মানপাতায়। গলাকুটকুট করতো তাতেও

ভ্রূক্ষেপ নেই।.... ভক্তের সংখ্যা দু একটি করে বাড়ছে। উৎসাহের শেষ নেই। পূজা, ধ্যান জপ চলেছে সর্ব্বক্ষণ। কখন কীর্ত্তন বন্ধ করতে গেলে বাধা, বাইরে বহু শ্রোতা অপেক্ষারত, চীৎকার শুরু হয় থামলেন কেন? আমরা শুনছি, চমৎকার হচ্ছে, চালিয়ে যান আমরা শুনবো।....

সংঘ-গুরু-ভাইদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথের উপর। ত্রুটি নেই নরেন্দ্রনাথের। উপদেশ দান, উৎসাহিত করা, সবই করে চলেছে নরেন্দ্রনাথ। বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে : মানুষ গড়ে 'তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। মনে রেখো', এই আমাদের একমাত্র সাধনা। বিদ্যার গর্ব্ব, অহঙ্কার ত্যাগ, ঈশ্বরানুভূতি যা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। আমরা সেই আদর্শাজীবনই অনুসরণ করবো। একমাত্র ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বরজ্ঞানে 'জন-সেবাই' হোক আমাদের সাধনার লক্ষ্য বস্তু!.....

সুরেন্দ্রনাথ সংঘপরিচালনার ব্যয় ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায়, সব সময় মঠে তাঁর যাতায়াত সম্ভব ছিল না। আর ত্যাগী ভক্তবৃন্দও তাদের অভাব, অভিযোগও তাঁর কানে তুলতো না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় অযাচিত যা উপস্থিত হতো— তাই ঠাকুরকে নিবেদন করে, নিজেরা গ্রহণ করে, নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে লাগলো।

কিছুদিন পরে, সুরেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন এ সব কথা। ব্যথিত হলেন সুরেন্দ্রনাথ। এরা ঠাকুরের সন্তান, আমার ভাই! এদের যাবতীয় অভাব দূর করা আমার কর্ত্তব্য।— তিনি ভক্ত গোপালের মাও, তাঁর ছোট ভাইদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে, মঠে থাকার ব্যবস্থা করলেন।

মঠে, গৃহী ভক্তের মাঝে মাঝে আগমন হতে লাগলো। ঠাকুরের প্রসঙ্গ, ধর্ম্মালোচনা করে ফিরে যেতো নিজে নিজ ঘরে। মাঝে মাঝে নানা অপরিচিতেরাও উদয় হতে লাগলো। তাদের সঙ্গে ত্যাগী-ভক্তদের নানা মত বিনিময়ের পরীক্ষা চলতে লাগলো। অনেকসময় অশিষ্ট আচরণও উদ্ভূত হল। সে সব গায়ে মাখে না সংঘ-নেতা। ত্যাগী-ভাইদের সহাস্যে বোঝাতে শুরু করলো : ঠাকুর বলতেন : লোক না পোক! ওরে, ওরা কামকাঞ্চনের দাস, ওদের কথায় সন্ন্যাসীদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়—এটা ঠাকুরেরই নির্দ্দেশ!....

মাঝে মাঝে ভক্তভাইদের অভিভাবকরাও হাজির হতে সুরু করলো। তাঁরা তাদের সন্তানদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাঁরা চান, গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরে যাক তারা। পাঁচজনকে উপদেশ দেবে, থাকবে আদর্শপথে নিজেরা আর পাঁচজন, ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে, এটাইতো হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ শিক্ষা! নরেন্দ্রনাথ তাঁদের বুঝিয়ে বললেন : আমরা রামকৃষ্ণতনয়! তাঁর আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি। ত্যাগ ও সেবাই আমাদের ধর্ম্ম। আপনারা যে পথকে শ্রেয় মনে করেন, সে পথ গৃহীর, ত্যাগীদের জন্য নয়। যে আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ, সে পথে যদি দেহপাত হয়, সেও শ্রেয়ঃ! আপনারা আমাদের সেই আশির্ব্বাদ করুণ।... একে একে ফিরে গেলেন অভিভাবকগণ!

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। বাবুরামের মা, আঁটপুরের (হুগলী) গ্রামের বাড়ীতে তাদের সকল গুরু ভাইদের আমন্ত্রণ করায় উপস্থিত হল সকলে। সদর বাটীতে বড় উঠান ছিল। রাত্রে ধুনী জ্বালিয়ে গুরু ভাইদের সঙ্গে ধ্যান সুরু করলো। নিস্তব্ধ পল্লী, ঝলমল করছে আকাশভরা তারা। ধ্যান শেষ হল। নরেন্দ্রনাথ যীশুখৃষ্টের জীবন আলোচনা শুরু করলো। জন্ম থেকে মৃত্যু, অপূর্ব্ব আত্মদান, পুনরুত্থানের কাহিনী বর্ণনা করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উঠলো। একটু হেসে অধীর উৎসাহে ও উদ্দীপনায় বলতে সুরু করলো: যীশুখৃষ্ট আর শ্রীরামকৃষ্ণ! যীশুর দেহ ত্যাগের পর তাঁর শিষ্য পল কি জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে নোতুন ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। সহসা সেই আলোকেই নোতুন দিক উন্মুক্ত হয়ে গেল নরেন্দ্রনাথের ও সমবেত ভক্তমণ্ডলীর। নরেন্দ্রনাথের চোখের পাতায় ভেসে উঠলো ভারতের আদর্শ। আজ সবই বিভক্ত। খণ্ডিত। আংশিক রূপদর্শনে

পরস্পরের সঙ্গে বিবাদরত। বৈষম্য ও ভেদে বিকৃত ও ভ্রষ্টচরিত্র। কলঙ্কিত উচ্চাদর্শ। কর্ম্মহীন তামসিক জড়ত্বের বন্ধনে দিশেহারা।... স্পন্দিত হয়ে উঠলো অন্তর সেই মুহূর্ত্তে। শ্রীরামকৃষ্ণ! ... হ্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে, সকল বিচিত্র ও বিশিষ্ট সাধনা সমন্বিত করে গেছেন নিজের জীবনে। ... ধর্ম্মের নামে, জাতির নামে, দেশপ্রেমের নামে, পৃথিবীকে রক্তস্নাত করে গেছে সবাই। আর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাবাহী ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী, সেই বহুপ্রার্থিত, বহু ইপ্সিত মহা-সমন্বয়ের বার্ত্তা বহন করবো।...

আটপুর থেকে ফিরলো তারকেশ্বর। শিব-আরাধনা শেষ করে, বরানগরে ফেরার পথে জানতে পারলো যীশুখৃষ্ট প্রসঙ্গ ও তাঁর প্রথম প্রচারকের আত্মবিশ্বাসের কথা আলোচনা করেছিল তাঁরা— সেদিনটা ছিল যীশুখৃষ্টের জন্মরাত্রি!....

বেশ চলছিল মঠ বাস, ধ্যান, জপ, তপ,... সহসা তীর্থ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগলো অনেকের মনে। খুঁজতে লাগলো সুযোগের সন্ধান। কাজে, কলকাতা গিয়েছে নরেন্দ্রনাথ। ফিরে এসে শুনলো, সারদা গোপনে মঠ ত্যাগ করে চলে গেছে। চিন্তায় পড়ে গেল নরেন্দ্রনাথ। একেবারে সংসার-অনভিজ্ঞ, বয়স অল্প। কোথায় যাবে, কি বিপদে পড়বে তার ঠিকান নেই। রাখালকে ডেকে বললো, : কেন তুমি যেতে দিলে? সংসার ত্যাগ করেছি সত্য, কিন্তু এ-এক নোতুন মায়ার সংসার পেতেছি। ছেলেটার জন্য প্রাণ চঞ্চল হয়ে ব্যাকুল করে তুলেছে! ঠিক সেই সময়ে, একজন সারদার লেখা চিঠিখানা তার হাতে ধরিয়ে দিল। খুলে দেখলো : লেখা আছে "পদব্রজে বৃন্দাবন চললাম। মা বাবা পরিজন বর্গকে প্রায় স্বপ্ন দেখি, তাদের আকর্ষণে বাড়ী গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেছি। মনের মধ্যে একটা কেমন যেন আকর্ষণ। বলা যায় না মনের গতি, পরিবর্ত্তন করতে পারে। এখানে থাকার চেয়ে, দূরদেশে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই!...

নরেন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। রাখাল বললো, এখন বুঝছি, কেন সারদা মঠ ত্যাগ করেছে। উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললো : কারণটা আমিও অনুভব করেছি।....

সারদার চিঠি ভাবিয়ে তুললো নরেন্দ্রনাথকে৷ সবাই তীর্থ ভ্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করছে। এতে মঠ ধ্বংশ হয়ে যাবে। আমি কে? আমার আদেশ অনুসারে তারা চলবে! ... না! ... এ মধুর মায়ার বাঁধন তাকেও ছিন্ন করতে হবে। কৃতসংকল্প হল : যন্ত্রী তিনি, আমি যন্ত্র। মায়ার বাঁধনে আর জড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়ে পরিব্রাজকের বেশে মঠ ত্যাগ করলো নরেন্দ্রনাথ। (১৮৮৮)। (এর পূর্ব্বে কয়েকবার আঁটপুরে বৈদ্যনাথ ধাম ও শিমূলতলা গিয়েছিল।) সামনে উন্মুক্ত পথ, মাথার ওপর মুক্ত আকাশ। চলেছে পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ.... তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ তনু, তপোজ্জল প্রশান্ত মুখ,- মুধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে পথ, আকর্ষণ করছে মানুষের দৃষ্টি। চলেছেন সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ। ক্রমে বিহার, যুক্তপ্রদেশ.... উপনীত হলেন পবিত্র হিন্দুতীর্থ-ধাম কাশী। আশ্রয় নিলেন দ্বারকদাসের আশ্রমে। ভিক্ষান্নে উদর পূরণ, দেবস্থান দর্শন। শাস্ত্রচর্চ্চা, ধ্যান, জপ, সাধুসঙ্গ প্রতিদিনের কাজ। সন্ধ্যায় ভাগরথীতীরে পাথরের সিঁড়িতে বসে সান্ধ্যকালীন উপাসনা। মন্দির থেকে ভেসে আসা সন্ধ্যারতির শঙ্খ ও কাসর-ঘণ্টার মধুর নিনাদ। তাঁর মন প্রাণ বিভোর করে তুলছে। চোখের পাতায় ভেসে উঠলো: দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতি, শ্রীগুরুর শ্রীমুখ তাঁর অপার স্নেহ করুণার প্রতিচ্ছবি।.....

যে তাঁকে দেখে, সেই মুগ্ধ হয়, তাঁর পাণ্ডিত্যে ঈর্ষা জাগে না শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। একজন একদিন ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজনীতি, দেশপ্রীতি সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা হল, মুগ্ধ হলেন তিনি। মনের কথা প্রকাশ করে ফেললেন : এই তরুণ যুবকের অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা— মহৎ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে চলেছে!

বারানসীর প্রখ্যাত সাধু শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামীর কথা ঠাকুরের মুখে বহুবার শুনেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তিনি (ঠাকুর) বলতেন, ইনি শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বরের বিগ্রহতুল্য। তাঁর ত্যাগ ও তপস্যার তুলনা হয় না। তাঁকে এখানে দর্শন করে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে কৃতার্থ হলেন।....

শুনলেন, শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী। তাঁর আশ্রম আছে। সবসময়েই তিনি শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী পরিবৃত। তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। প্রণাম করে আসন গ্রহণ করলেন। আকৃষ্ট হলেন, ভাস্করানন্দজী। সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন : কেউ সম্পূর্ণরূপে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে না"। বিনীত ভাবে বললেন, নরেন্দ্রনাথ : বলেন কি ম'শায়! এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা সম্পূণ কাম-কাঞ্চনের বন্ধন থেকে বিমুক্ত। কারণ, এটাই সন্ন্যাসজীবনের প্রথম সাধনা। আমি অন্ততঃ এমন একজন ব্যক্তিকে দেখেছি, কাম-কাঞ্চন, স্পৃহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ!

হেসে উঠলেন ভাস্করানন্দজী বললেন : তুমি বালক, এ বয়সে ওসব বুঝতে পারবে না।

গুরুর পবিত্র জীবনের সমালোচনা! দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করে, তেজোগর্ভ যুক্তি প্রদর্শন করলেন। উপস্থিত সকলে, এমন কি ভাস্করানন্দজী নিজেও বিস্মিত হলেন। যাঁর চরণতলে, রাজা, মহারাজা, ধনী, পণ্ডিত, শত শত ব্যক্তি মাথা নত করে, যাঁর পাণ্ডিত্য অপ্রতিরোধ্য, গৌরবে মণ্ডিত, যাঁর জ্ঞান সীমাহীন, তাঁর সঙ্গে তর্ক!..... ক্ষুব্ধ হলেন না ভাস্করানন্দজী। খুশী হলেন। শিষ্য ও উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন : সরস্বতী এঁর কণ্ঠে বিরাজ করছেন। জ্ঞানালোকে এঁর হৃদয় প্রদীপ্ত!.... প্রশংসায় মুগ্ধ হওয়ার লোক নন নরেন্দ্রনাথ। গুরুনিন্দায় ব্যথিত তাঁর হৃদয়। আশ্রম ত্যাগ করে চলে এলেন পরমুহূর্তে।.....

বারানসীধাম হিন্দুভারতের হৃদপিণ্ড। বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন ভাষা, প্রত্যেকে পৃথক। সে মাদ্রাজী হোক, পাঞ্জাবী হোক, বাঙালী হোক, গুজরাটি হোক, মারাঠী হোক, বা হিন্দুস্থানী হোক, একইভাবের ভাবুক: মিলন তাদের 'বিশ্বনাথ মন্দিরে'। একদিকে পথভ্রষ্ট ও আচারপরায়ণ হলেও অন্যদিকে যুগ যুগের সঞ্চিত সেই আধ্যাত্মিক ঐক্য উপলব্ধি করলেন নরেন্দ্রনাথ। ফিরে এলেন, বরানগর মঠে। উৎসাহিত করতে লাগলেন গুরুভাইদের।..... ভারতবর্ষকে দেখতে হবে... বুঝতে হবে কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালী, বুঝতে হবে তাদের বেদনা, খুঁজতে হবে, তাদের অভাব, বুঝতে হবে ভাষা, এদের কল্যাণসাধন, শুধু স্বার্থ ত্যাগ নয়— সর্ব্বত্যাগের কথা! বিস্মৃত হতে হবে নিজ, নিজ মুক্তির কামনা।.....

অশান্ত নরেন্দ্রনাথ আবার মঠ ছাড়লেন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাঁকে আকর্ষণ করছে। উপস্থিত হলেন কাশীধামে। সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও বেদান্তদর্শনে সুপণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন অখণ্ডানন্দজী। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন নরেন্দ্রনাথ। কিছুদিন পরেই আগষ্ট মাসে (১৮৮৮) দণ্ডকমণ্ডলু হাতে উত্তর ভারতে যাত্রা করলেন। নানা স্থানের মধ্য দিয়ে সরয়ু নদী তীরে অযোধ্যায় উপনীত হলেন। এখানে প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে সূর্য্যবংশীয় রাজাদের গৌরব স্মৃতি। স্মৃতিপথে তাঁর উদিত: আদর্শ রাজা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র.... ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের পৌরহিত্য; তপঃ প্রভাবে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞানী মিথিলাধিপতি জনককে। ... পূণ্যভূমিতে পদার্পণ করেই ভেসে উঠলো বাল্যস্মৃতি।..... সেই রামায়ণ প্রীতি, সীতারাম মূর্ত্তির সামনে তন্ময় চিত্তে ধ্যান.... বীরভক্ত হনুমানের প্রতি শ্রদ্ধা... ভাবানন্দে বিভোর হলেন নরেন্দ্রনাথ। কিছুদিন রামাইত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নামকীর্ত্তনে অতিবাহিত করে লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা পথে বৃন্দাবন ধামের দিকে এগিয়ে চললেন।... দেখলেন তাজমহল, ... দেখলেন মোগলদুর্গ... ধরলেন বৃন্দাবনধাম পথ .....

ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, চলেছেন এগিয়ে। সহসা চোখে পড়লো পথের ধারে বসে নিশ্চিন্তে তামাক খাচ্ছে একজন। ছোটবেলা থেকেই ছিল এ নেশা। পথ ক্লান্ত। দু একটান দেওয়ার জন্য হাতখানা বাড়িয়েও দিলেন। লোকটি সঙ্কুচিত হয়ে বলে উঠলো, মহারাজ, মঁয় ভাঙ্গী হ্যাঁয়। আজন্মের সংস্কার। মেথর... অজ্ঞাতসারে হাতটা সরিয়ে নিলেন। সুরু করলেন যাত্রা... কিছুদূর এগিয়েই চমক ভাঙলো : তাইতো আমি সন্ন্যাসী, এখনও জাত্যাভিমান!.... ফিরে এলেন তিনি। তার হাত থেকে তামাক সাজিয়ে কলকেটি তুলে নিয়ে আনন্দে ধূমপান করতে লাগলেন।

পৌঁছলেন বৃন্দাবনে। অতিথি হলেন লালাবাবুর কুঞ্জে। মনে তৃপ্তি পেলেন না— এগিয়ে চললেন রাধাকুঞ্জের দিকে। ভাল লাগলো নন্দী গ্রাম, বর্ষনা, গোকুল। মনোরম বটে! যেমন পল্লীশ্রী তেমন সরল, উদার পল্লীবাসী।.... এলেন রাধাকুণ্ডে। সম্বল কৌপীন। ধুয়ে, তীরে শুকোতে দিয়ে স্নান করার জন্য অবতরণ করলেন রাধাকুণ্ডে। স্নান সেরে তীরে উঠতে গিয়ে দেখলেন কৌপীনখানি একটি বাঁদর তুলে নিয়ে গাছের উপর বসে আছে। অনেক অনুনয় করলেন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য— সে গাছের উপরে বসে ব্যঙ্গ করলে ফিরিয়ে দিল না কৌপিনখানি। নগ্ন অবস্থায় কি করে ভ্রমণ করবেন ভেবে স্থির করতে না পেরে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এটাও কি রাধারাণীর ইচ্ছা? গভীর অভিমানে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। স্থির করলেন, যতক্ষণ না কৌপীনটি ফিরে পান, অরণ্যে প্রয়োপোবেশন করবেন। এমন সময় কে যেন পিছন থেকে ডাকছে, উনি তাকিয়ে দেখলেন, একটি লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ভ্রূক্ষেপ না করে সামনে এগিয়ে চললেন তিনি। ক্ষণকালের মধ্যে লোকটি ছুটে সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতে কিছু খাবার আর একটি নোতুন গৈরিক বসন। তার অনুরোধে উপহারগুলি গ্রহণ করার পর লোকটি বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।... বস্ত্রটি পরে রাধা কুণ্ডে ফিরে এলেন কিন্তু তাঁর কৌপীনটি যথাস্থানে রাখা আছে দেখে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দিব্য আনন্দে মনটা ভরে গেল। তন্ময় চিত্তে প্রেমানন্দে কৃষ্ণ গুণগানে বিভোর হয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে পথের পাশে গাছের তলায় বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ। তখনও প্রভাত হয়নি, পূবের আকাশ লাল হতে, হাতরাস রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার, শরৎচন্দ্র গুপ্ত কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছেন। এমন সময় চোখে পড়লো এক সাধুর প্রতি। তাঁর দিকে তাকিয়ে সহসা চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে, পায়ের ধূলিগ্রহণ করে বললেন : আপনাকে অভুক্ত ও পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে , দয়া করে আমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করবেন চলুন!

নরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্রের পিছু পিছু এগিয়ে চললেন। ... শরৎচন্দ্র প্রথম দর্শনেই মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন। আহার ও বিশ্রামে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে, নিজের মনের অভিপ্রায় ব্যক্তি করলেন : বহুদিন থেকে আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে পাচ্ছি না। যখন দয়া করে দর্শন দিলেন, কৃপা করে আত্মজ্ঞান প্রদান করুণ।

কোন উত্তর দিলেন না নরেন্দ্রনাথ। আপন মনে একটি গান গাইলেন। তার ভাবার্থ হল : যদি তুমি আমার ভালবাসা লাভ করতে চাও, তাহলে তোমার সুন্দর মুখে ছাই মেখে এসো। পারবে কি?

শরৎচন্দ্র উত্তরে বললেন, স্বামিজী! আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। যা আদেশ করবেন, তা নির্দ্ধিধায় পালন করবো। বিষ্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন কিন্তু উত্তর দিলেন না স্বামিজী।

কয়েকদিন ধরেই স্বামিজীকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। শরৎচন্দ্র শুধালেন : আপনাকে এমন বিমনা দেখাচ্ছে কেন স্বামিজী!

উত্তরে বললেন তিনি : মহৎ কাজ সম্পন্ন করার ভার আমাকে দেওয়া আছে। আমার ক্ষুদ্র শক্তি, তার দ্বারা তা সম্ভবপর নয় ভেবেই হতাশা বোধ করছি। যতদিন যাচ্ছে, ততই উপলব্ধি করছি, সনাতন ধর্ম্মের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই তাঁর কাজ। হায়! ধর্ম্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! তার সঙ্গে অন্নক্লিষ্ট ভারতবাসীর কি মর্ম্মভেদী দুরাবস্থা। বৈদ্যুতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করতে হবে সেই সনাতন ধর্ম্মকে, তার আধ্যাত্মিকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে, করতে হবে জগত জয়। কিন্তু উপায় কি; উপায় কি? ব্যথিত করুণায় তাঁর চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

গভীর শ্রদ্ধায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন শরৎচন্দ্র — আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি না?

ফিরে দাঁড়ালেন স্বামিজী। বললেন : এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগের জন্য ভিক্ষাপ্রাপ্ত ও কমণ্ডলুসম্বল করতে প্রস্তুত আছ? তুমি কি প্রকৃত ত্যাগের দুঃসহ কঠোরতা সহ্য করতে পারবে?

আপনার কৃপা হলে আমি নিশ্চয় সহ্য করতে পারবো ! দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র।....

গুপ্ত পরিবারে কিছুদিন যাপন করার পর হাতারাস ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন : সন্ন্যাসীর পক্ষে এক জায়গায় বেশীদিন বসবাস করা উচিত হবে না। তোমাদের প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করছি, সুতরাং সত্ত্বর এ স্থান ত্যাগ করা আমার কর্ত্তব্য!

স্বামিজীর সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বললেন শরৎচন্দ্র : আমাকে আপনার শিষ্য করে সঙ্গে নিন। উত্তরে বললেন স্বামিজী : তুমি কি মন কর যে আমার শিষ্য হলেই তোমার আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হবে? কারও গুরু হওয়ার যোগ্যতা আমাতে আছে কিনা সন্দেহ! ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে, কাজ করে যাও, তিনিই তোমার কল্যাণ বিধান করবেন। আপাতত শ্রীশ্রীবদরী কেদার যাব স্থির করছি, তুমি দুঃখিত হয়ো না, প্রসন্নমনে বিদায় দাও, পুনরায় হাতারাসে ফিরতে চেষ্টা করবো।

শরৎচন্দ্র স্তোক বাক্যে ভোলার পাত্র নন। বললেন : আপনি যাই বলুন না কেন, আপনি যেখানে যাবেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করবো... আমাকে দীক্ষা প্রদান করতেই হবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন : সত্যই কি তুমি আমার অনুগমন করতে প্রস্তুত হয়েছ? শরৎচন্দ্র মাথা দোলালেন। স্বামিজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : উত্তম! এই আমার ঝুলি নাও, তোমার ষ্টেশনের কুলিগণের কুটীর থেকে ভিক্ষা নিয়ে এসো।

দ্বিধাহীন চিত্তে ঝুলিটি কাঁধে ঝুলিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। ভিক্ষালব্ধ বস্তু নিয়ে ফিরে এলেন। স্বামিজী সানন্দে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর মা বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হাতরাস ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে হৃষীকেশ যাত্রা করলেন।

নবদীক্ষিত শিষ্য সদানন্দ গুরু নির্দ্দিষ্ট পথে কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। দৈহিক কঠোরতায় অনভ্যস্ত সন্ন্যাসী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে স্বামিজীকে শিষ্যসহ পুনরায় হাতারাসে ফিরে আসতে হল। স্বামিজী নিজেও অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। স্থানীয় যুববৃন্দ ও গুপ্ত পরিবারের যত্ন ও চেষ্টায় কয়েদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। নভেম্বরে, শিষ্যসহ বরানগর মঠে ফিরে এলেন। স্বামিজীকে নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়ে সকলেই আনন্দে মেতে উঠলেন। সেই সঙ্গে সদানন্দকেও সঙ্ঘভুক্ত করে নিলেন, স্নেহের বাঁধনে।

মঠে ফিরেই নোতুন উদ্যমে সুরু হল বেদান্ত দর্শন আলোচনা। চললো ধ্যান, ধারণা, যোগ সমাধি— সন্ন্যাসের আদর্শ শিক্ষা, অন্যদিকে বিশাল ভারতের জনসমষ্টির দুর্গতি মোচনে সেবাব্রতী হবেন তারা। ধর্ম্ম ও দেশ দুটিকে মিলিয়ে দিতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে। তার ফাঁকে থাকলো সাধন ভজন, শাস্ত্রপাঠ। গুরুভাইদের সঙ্গে করলেন আলোচনা। ভারতের প্রাণবায়ু ধর্ম্মে, পূর্ণ আছে,

তবে তা বিকৃত প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র। সামাজিক ও সাংসারিক দারিদ্র্যই তার দুর্দ্দশার কারণ। ... পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন গ্রামের পর গ্রাম, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে প্রত্যক্ষ। ভ্রমণ করেছেন, তীর্থের সব তীর্থ, চোখের পাতায় ভেসে উঠেছে তার জরাজীর্ণ অবস্থা। অনুরাগ আছে, গতিবেগ নেই, সমাজ আছে, কুসংস্কারে রুদ্ধ— হারিয়ে গেছে তার সেই গতিবেগ। এ সমস্যা, শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর একার নয়, বিশাল জনসমষ্টিরও। বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন, শ্রীগুরুর উপদেশ ও জীবন। বুঝলেন : ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মব্যাবসায়ীর দল, গুরু পুরোহিত, পাণ্ডারা ব্যক্তিগত আধিপত্য বিস্তার করে পঙ্গু করে রেখেছে সমাজ জীবন। বহু শতাব্দীর প্রথা, বিধি-নিষেধ, বংশ ও রক্তের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, হীনতাবোধ, কৃত্রিম জাতিভেদ, জাতির প্রাণবায়ু রুদ্ধ করে রেখেছে। আজ ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করতে হলে আমাদের ওই বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধর্ম্মসাধনা ও সামাজিক সুখ সুবিধা লাভে সর্ব্ব মানুষের সমানে সম অধিকারের মন্ত্র প্রচার করতে হবে।.... এ কাজ সহজ নয়... ঠাকুর আমাদের এই কঠিন ব্রতেই দীক্ষা দিয়েছেন।

প্রায় একবছর মঠ ও বলরাম বাবুর বাড়ীতে শাস্ত্র অধ্যয়নে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। কাশীর প্রমদাদাসবাবুর কাছে বেদান্ত ও অষ্টাধ্যায়ী শিক্ষা লাভ করেছিলেন কাশী থাকাকালীন। এখন গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে বেদান্ত ও পানিনি ব্যাকরণ পড়ায় মন দিলেন। প্রয়োজন মত প্রমদাদাস বাবুর সহায়তা সংগ্রহে নিযুক্ত রইলেন। তিনিও এঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জয়রামবাটীতে কিছুদিন কাটালেন। পরে শিমূলতলায় অবস্থান করলেন। জুলাই মাসে ফিরে এলেন কলকাতায়। তখনও চলেছে উপনিষদ ও শঙ্কর ভাষ্যপাঠ। যখনই সংশয় ও সমস্যা, প্রমদদাসের কাছে চিঠি লিখছেন। খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছেন, পৌঁছাচ্ছেন নিজস্ব সিদ্ধান্তে। ডিসেম্বর এলো— ত্যাগ করলেন কলকাতা। পৌঁছলেন বৈদ্যনাথ ধাম। এরপর মন টানলো কাশীর পথে। কিন্তু চিত্রকূট ওঙ্কারনাথ দর্শন সেরে প্রয়াগে এসে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হল যোগানন্দ। তাঁকে সেবার জন্য কাশী যাওয়া হল না। গুরুভাই সুস্থ হয়ে উঠলে কাশীতে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন পরে জানুয়ারীর ২২ শে তারিখে পৌঁছলেন গাজীপুরে। উঠলেন বাল্যবন্ধু সতীশ মুখার্জ্জীর বাসাতে। সুন্দর জায়গা। ভাল লাগলো তাঁর। উদ্দেশ্য পাওহারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। শুনেছিলেন তাঁর ভক্তি ও যোগশক্তি কথা। স্থির করলেন, যোগশাস্ত্র শিক্ষা করবেন এঁর কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন তিনি। স্বামিজী তাঁরই শিষ্য, অবগত হয়ে আদর করতে লাগলেন। ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চতর অনুভূতি ও জটিল দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও চলল উভয়ের মধ্যে। উপস্থিত ব্যক্তিরা তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন না।

স্বামিজী এখানে আসার পর থেকে গগন রায় ম'শায়ের বাড়ীতে প্রতি রবিবার ছোট ধর্ম্মসভার অধিবেশন সুরু হল। স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই সে সভায় উপস্থিত হতে লাগলেন। আলোচনা ছাড়া রামকৃষ্ণের লীলা সঙ্গীত পরিবেশন করতে লাগলেন স্বামিজী। তাঁর গান ও যুক্তিপূর্ণ কথায় আকৃষ্ট হলেন সবাই। পরিচিত হলেন বাবাজী নামে।

সেদিন সভায় আলোচনা ছিল 'সমাজসংস্কার'। সবাই স্বামিজীর মুখেই শুনতে চাইলেন তাঁর মতামত। বললেন স্বামিজী : আমরা সামাজিক জীব, সুতরাং প্রত্যেকে বুঝি সমাজ-কি, কেন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল আর কেনই বা তার সংস্কারের প্রয়োজন হল। জীবনটাকে সাবলীল গতি দেওয়ার জন্য কতকগুলো নিয়ম তৈরী করেছিল মানুষ আর সেই নিয়মকে পরিচালনার জন্যই তৈরী হয়েছিল সমাজ। এই পরিচালকরা, ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নানা গণ্ডীর সৃষ্টি করলো,

ফলে সেই গতির সহজ রূপরেখা দিনের পর দিন জীর্ণ হতে হতে জীর্ণতর হয়ে পড়লো। তখনই প্রয়োজন হল সংস্কারের। আবার এই সংস্কার বলতে কি বুঝি? কেমন করে তা সম্ভব?

মতভেদ এখানেই। একদল ভাবে, তীব্র প্রতিবাদ করো। যুক্তি দিয়ে মানুষকে সচেতন কর। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও অর্থাৎ সমালোচনা কর, অত্যাচার, অত্যাচার, বলে বিদ্রোহ কর, সব চুরমার করে দাও! .... এখানেই প্রশ্নঃ তাহলেই কি এই মজা নদীতে জোয়ার আসবে?... আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারকগণ কি করেছেন? তাঁরা শুধু সমাজকে অভিশাপ দিয়েছেন, নয় আচার ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেছেন? এতে কি হয়েছে? ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছড়িয়েছে, বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে! মানুষ পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। ঐক্যের বদলে সৃষ্টি হয়েছে অনৈক্য! মজা সে সমাজের গতির সৃষ্টি হয়নি, যে মজা, সে মজাই রয়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে নোতুন গোষ্ঠী। মহান ভারতের 'মানুষ তৈরীর সেই সমাজ' প্রেম ও প্রীতির ফল্গুধারা, পরিণত হয়েছে খানা ডোবায়।

তাকে, সংস্কার করতে হলে অসীম প্রেম ও অনন্ত ধৈর্য্য সহকারে বিস্তার করতে হবে শিক্ষা। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, হিন্দু ধর্ম্মের মহান সার্ব্বভৌমিক আদর্শসমূহ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দৃষ্টি দিয়ে, বিচার না করে, অধ্যাবসায়ের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে— সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব। অন্বেষণ করতে হবে, এই সনাতন হিন্দুজাতির উদ্দেশ্য কি এবং কোথায় এর প্রকৃত জীবনী শক্তি.... আজ সংস্কারকগণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অন্ধ। কল্পনা করেন : ভারতবর্ষে, জাতীয় জীবনের কোন সর্ব্বজনীন আদর্শ নেই, বা জীবনাদর্শ থেকে বহু দূরে তারা সরে গেছে— বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সমন্বয় সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়! এটাই তাঁদের ত্রুটি, এটাই তাঁদের প্রধান দৈন্যতা। তাঁরা, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সভ্যতার প্রকৃতরূপ দেখার সেই দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন।

'আমার বিশ্বাস : আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব — যখন আমরা বৈদেশিক ভাববহুল সংস্কারের হাত থেকে, সমাজকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবো।....

যতদিন যায় মহাতপস্বী পাওহারীবাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলে। মুগ্ধ হতে থাকেন ততই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপার অধিকারী হয়েও তৃপ্তি পাচ্ছেন না কেন? চিন্তা জাগে : হয়তো এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সহায়তায় শান্তি লাভে সমর্থ হবেন।....

প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ। ঘটে গেল আত্মবিস্মৃতি। ভুলে গেলেন শ্রীগুরুর আদেশ বাণী : তোর নির্ব্বিকল্প সমাধি চাবি দেওয়া রইলো, কাজ শেষ হলে তবে পাবি। মুক্তি চাবি রইলো আমার হাতে...

যোগ-মার্গ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন পাওহারী বাবা। মনে, যোগশিক্ষার বাসনা জাগলো। ধরে বসলেন : যোগ শিক্ষা দিতে হবে তাঁকে। আগ্রহাতিশয়ে .. তিনিও আশ্বাস দিলেন। চললো : সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা।... এসে গেল সেদিন। গভীর নিশীথে প্রস্তুত হলেন তিনি। সহসা মনে চিন্তার উদয় হল! শ্রীরামকৃষ্ণ না পাওহারী বাবা? বিহ্বল হল চিত্ত। সংশয়ে দুলতে লাগলো মন। বসে পড়লেন মাটীতে। স্মৃতি পথে উদয় হল : শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা : গভীর ভালবাসা, সস্নেহ ব্যবহার। অন্ধকার কক্ষ। সহসা দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। শশ্রু নয়নে দেখলেন জীবনের আদর্শ, সেই দেবমানব দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চোখে মাখা স্নেহ-করুণা, ব্যথিত ভর্ৎসনা। বসে রইলেন প্রস্তর মূর্ত্তির মত।

সকালে মনে হল : এ দর্শন তাঁর মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা নয় তো! সেই দ্বিধা, সেই দ্বন্দ্ব। সঙ্কল্পচ্যুত হওয়া অসম্ভব। তৈরী করলেন নিজেকে। : এলো রাত্রি, প্রস্তুত তিনি, কিন্তু একি? আবার সেই দর্শন!.... একদিন... দুদিন নয়... পর পর সাতাশ দিন। মর্ম্মবেদনায় লুটিয়ে পড়লেন

মাটিতে। আর্ত্তস্বরে বলে উঠলেন : না - না - না- আমি আর কারও কাছে যাবো না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, তোমার ক্রীতদাস আমি! আত্মহারা দৌর্বল্যকে ক্ষমা করো প্রভু!...

খবর পেলেন কাশীতে কালী অসুস্থ। গাজীপুর ত্যাগ করে ফিরে এলেন কাশীধামে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বাবুরামের ওপর সেবার ভার দিয়ে প্রমদাদাস মিত্র মশায়ের বাগান বাড়ীতে উঠলেন। এখানেই সংবাদ এলো, গৃহীভক্ত বলরামবাবু পরোলোক গমন করেছেন। গুরুভ্রাতা বিয়োগে কাতর হয়ে উঠলেন স্বামিজী। তাঁকে বিলাপ করতে দেখে প্রমদা বাবু বিস্মিত হলেন। বললেন : একি স্বামিজী, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার শোকার্ত্ত হওয়া শোভা পায় না।

স্বামিজী ফিরে এলেন কলকাতায়। শোকার্ত্ত বসু পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন। বরানগরের মঠের ও সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁর নিজের। .... ২৫ শে মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন : সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। চিন্তায় পড়লেন স্বামিজী। পর পর দু'জন মহারথী চলে গেল। যাদের সাহায্য ও সহানুভূতিতে গড়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, তাঁরা চলে গেলেন একে একে। দু'মাস কলকাতা ও বরানগরে অবস্থান করে মঠ চালু রাখার ব্যবস্থা করলেন। একদিকে সঙ্ঘের প্রতি মমত্ব, অন্যদিকে সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ তাঁকে প্রচার করতেই হবে। চাই সেই শক্তি অর্জ্জন, নয় শরীর পতন— এসেছে ডাক, পথ খুঁজে নিতেই হবে।....

শ্রীশ্রীমা, সঙ্ঘ জননী। তিনি তখন গঙ্গার পশ্চিম তীরে ঘুষুড়ীতে বাস করছেন। মঠ ছেড়ে মার কাছে গেলেন। তাঁর আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন। তাঁর চরণ বন্দনা করে বললেন : মা! যে পর্য্যন্ত শ্রীগুরুর কাজ শেষ করতে না পারি, ততদিন আর ফিরবো না। আশীর্ব্বাদ কর : যাতে সঙ্কল্প আমার সিদ্ধ হয়।

করুণাময়ী মা, বীর সন্তানের মাথায় হাত রেখে কল্যাণ কামনা করলেন। ঠাকুরের নাম নিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। সে পূণ্য পরশে দিব্যভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো হৃদয়। মহাশক্তি বলে বলীয়ান তিনি। বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি, সংশয়, দ্বন্দ্ব আজ সমস্তই তুচ্ছ! মৃত্যুও তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।....

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মঠ ছাড়লেন স্বামিজী। ভাগলপুরের উকিল মথুরানাথ সিংহ ম'শায়েব বাড়ীতে প্রথম কয়েকদিন যাপন করলেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গুরুভাই গঙ্গাধরের সঙ্গে দেওঘরে এলেন। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধর্ম্মালোচনা করলেন। সেখান থেকে কাশী এলেন। প্রমদাদাসবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন থেকে, পা বাড়ালেন অযোধ্যার পথে। বিদায় নেবার সময় বললেন, যখন ফিরবো সমাজের ওপর বোমার মত ফেটে পড়বো— সমাজ সেদিন আমাকে অনুসরণ করবে।... সেখান থেকে গেলেন নৈনীতাল... এরপর বদরী, কেদারের পথে... আলমোড়ায় এসে উপস্থিত হলেন। ব্যবসায়ী লালা বদরী সাহা তাঁকে বসবাসের জন্য উদ্যানবাড়ী ছেড়ে দিলেন। কয়েক দিন পরে, সংবাদ পেয়ে উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্র ও কৃপানন্দ। বরানগর মঠের অধিকাংশ সন্ন্যাসীই তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কেউ হৃষিকেষ, হরিদ্বার নানাস্থানে কুটীর নির্ম্মান করে বা গিরিগুহায় বাস করে কঠোর সাধনায় ব্রত। এখানে তাঁর সমাধি পিপাসু মন অন্তর্মুখী হয়ে উঠলো। রাত্রে, সেখানে গিরিগুহায় গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হলেন। এখানেই ভারতের সত্যধর্ম্ম মূর্ত্ত হয়ে উঠলো। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্ত্তা বহন করতে হবে... ভবিষ্যৎ ভারতের সত্ত্ব-রজের মিলন বেদীর ওপর, সেবা-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে... তার আগে নির্ব্বিকল্প সমাধি কোন দিনই সম্ভব নয়! ত্যাগ করলেন গিরিগুহা। ফিরে এলেন আলমোড়ায়।... কিছুকাল পরে গুরু ভ্রাতাগণ সহ পরিভ্রমণে বেরুলেন উত্তরাখণ্ড।.. কর্ণ-প্রয়াগে, অলকানন্দ তীরে, আশ্রম করে হরিনাথ বাবু (তুরীয়ানন্দ) তপস্যা করছিলেন। স্বামিজী গুরুভাইদের নিয়ে উপস্থিত হলেন।

এক সঙ্গে মিলনের সুযোগ এলো। খুশী হলেন সবাই। বেরোলেন বদরীনাথের পথে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ)। ফিরে এলেন দেরাদুনে। তিনি (গঙ্গাধব) সুস্থ হলে হৃষীকেশে এসে সকলে বাস করতে লাগলেন। বেদান্ত চর্চ্চা, শাস্ত্র চর্চা, ধ্যান-জপে দিন কাটতে লাগলেন। পরিবেশ সুন্দর, মনোরমস্থান, তরঙ্গ গিরি গুহায়— হর-হর-হর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি।... স্মরণে উদিত হল শ্রীরামকৃষ্ণের গঙ্গাজল প্রীতি, মহিমাময়ী সেই গঙ্গা, যে বারিতে বৈরাগ্যের উদয় হয়।...

...দীর্ঘ পথ শ্রমে শ্রান্ত দেহ, তার উপর উগ্র তপস্যা। জ্বর ও ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। অবস্থা মন্দ হতে লাগল দিনের পর দিন।... নাড়ীর গতি ক্ষীণ, সেইসঙ্গে প্রচুর ঘাম। গুরু ভাই সকলে তাঁর অন্তিম সময় ভেবে শোকে উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠলেন। কোন উপায় সন্ধান করতে না পেরে সকলে ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগলেন। সেই সময় এক অপরিচিত সন্ন্যাসী উপস্থিত হলেন সেখানে। সকলকে কাঁদতে দেখে কৌতূহল বোধে ভেতরে এসে রোগীর অবস্থা অবলোকন করলেন। অভয় দিয়ে ওষধ খাইয়ে. চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকালেন স্বামিজী। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে এক সন্ন্যাসীকে বললেন : অজ্ঞান অবস্থায় অনুভব করলাম এখনও আমার অনেক কাজ বাকী আছে, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহত্যাগ করা চলবে না।.... অভিজ্ঞতা লাভেব জন্য হিমালয থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত তাঁকে ভ্রমণ করতেই হবে। বৈরাগ্যের পীঠভূমি সেই হিমালয় ত্যাগ করে পঞ্চনদ, আর্যদের আদি বাসে নেমে এলেন তিনি। তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন গুরুভাইগণ। অবশেষে জানতে পারলেন, তিনি অবস্থান করছেন মিরাটে। উপস্থিত হলেন রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), হরিনাথ (তুরিয়ানন্দ), গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) শরৎচন্দ্র (সারদানন্দ), কৃপানন্দ, গোপালচন্দ্র (অদ্বৈতানন্দ)। শেঠজীর বাগানবাড়ী মঠে পরিণত হল। কীর্ত্তন, ধ্যান, জপ, বেদান্ত চর্চ্চা, শাস্ত্রালাপ, উপস্থিত জিজ্ঞাসুদের ধর্ম্মোপদেশ অবিরাম চলতে লাগলো।... হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগলো গুরুভাইদেব স্নেহে মোহে অযথা কালক্ষেপ হচ্ছে না তো? সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে নিলেন : এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। গুরুভাইদের ডেকে মনের কথা খুলে বললেন : একা ভ্রমণ করাই আমার অভিপ্রায়, তোমরা আমার পিছু নিওনা।... গঙ্গাধর অনুরোধ করলেন আমাকে অন্তত তোমার সঙ্গে যেতে যাও। উত্তরে বললেন স্বামিজী, তোমাদের স্নেহবন্ধনে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছি। আজ বুঝছি, তোমাদের স্নেহবন্ধন আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিচ্ছে। এবন্ধন ও মায়া হয়ত তারও বেশী।... মিরাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।....

চোখের দৃষ্টি খুলে গেছে। শ্রীগুরুর ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভারত পরিক্রমায় তাঁকে বেরুতে হবে শিক্ষাদাতা আচার্য্যরূপে।... অতিক্রম করলেন পঞ্চনদ, প্রবেশ করলেন, প্রতাপের দেশ, পদ্মিনীর ভূমি, বীর প্রসবিনী রাজপুতনায়।

১৮৯১ এর ফেব্রুয়ারী মাস। নামলেন আলোয়ার ষ্টেশনে। ঢুকলেন নগরে। রাজার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু গুরু চরণ লস্কর ও তাঁর বন্ধু স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের মৌলবী সাহেব স্বামিজীর থাকার ব্যবস্থা করলেন। শুরু হল লোক সমাগম কিন্তু ঘরটি বড় ছোট। বসার জায়গা হয়না অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজী তাঁর নিজের বাড়ীতে স্বামিজীকে নিয়ে এলেন। প্রতিদিন বেলা ন'টা থেকে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর ধর্ম্মমত শুনতে লাগলো। দার্শনিক আলোচনা বা কূট প্রশ্নের সমাধানে ভাবোন্মত্ত হয়ে জ্ঞানদাস, সুরদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রচিত সঙ্গীত গেয়ে শোনাতে লাগলেন সকলকে। শ্রোতারা ভক্তি আপ্লুত হয়ে উঠতে লাগলো... প্রশ্নোত্তর চলছে, হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে বসলো : বাবাজী আপনি গেরুয়া পরে আছেন কেন?... উত্তরে বললেন স্বামিজী : গেরুয়া ভিক্ষুকের বসন। সাধারণ পোষাক পরে যদি সাধারণের মত ভ্রমণ করি, বিত্তশালী ভেবে ভিক্ষা চাইবে। আমি নিজেই ভিক্ষুক, তাদের নিরাশ করতে হৃদয়ে ব্যথা বোধ করি, এ পোষাকে তারা স্থির করে

নেবে আমি তাদের মতই একজন ভিক্ষুক আর ভিক্ষা চাইবে না। এই সহজ উত্তর শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে পড়লেন।

এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কথা কানে গেল রাজার দেওয়ান বাহাদুরের কাছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় কামনায় তাঁকে নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করলেন। পরিচয়ে মুগ্ধ হলেন দেওয়ান বাহাদুর। তাঁকে নিজের আলয়ে রেখেদিলেন। মহারাজ বাহাদুরের কাছে পত্র লিখলেন : এখানে এক মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী এসেছেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর অদ্ভুত দখল। এঁর সঙ্গে আলাপে আপনিও খুশী হবেন সন্দেহ নেই।

মহারাজ মঙ্গলসিংহ রাজধানী থেকে দু-মাইল দূরে রাজপ্রাসাদে বাস করছিলেন। পরদিন রাজধানীতে ফিরে এলেন। দেওয়ান বাহাদুরের ভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। মহারাজা ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে আসন গ্রহণের অনুরোধ করলেন। দু'চার কথার পরেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামিজী মহারাজ! আমি শুনেছি আপনি বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। ইচ্ছা করলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতে পারেন, তবু আপনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করছেন কেন?

উত্তরে স্বামিজী বললেন : মহারাজ! আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, রাজকার্য্যে অবহেলা করে কেন সাহেবদের সঙ্গে মৃগয়ায় বৃথা আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করেন? রাজানুচরগণ এই দুঃসাহসিক সাধুর অমঙ্গল আশঙ্কা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর মহারাজ বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু কেন করি তা বলতে পারি না। এটা ভাল লাগে নিঃসন্দেহে বলতে পারি!

হাসতে হাসতে স্বামিজী বললেন, ভাল লাগে বলে আমিও ফকিরের বেশে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই।

কিছুক্ষণ আলাপের মাধ্যমে মহারাজ বুঝতে পারলেন এই সন্ন্যাসী সুপণ্ডিত নন, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। আরও একটু যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সহাস্যে বললেন মহারাজ : দেখুন বাবাজীমহারাজ! আমার কিন্তু মূর্ত্তি পূজায় কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমার কি দুর্গতি হবে?

তাঁর মুখের হাসি, স্বামিজীকে সন্দিগ্ধ করে তুললো। বললেন : আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?

সাগ্রহে উত্তর দিলেন মহারাজ, না- না- স্বামিজী! সত্যই আমি কাঠ, মাটি পাথর বা ধাতুর মূর্ত্তিগুলিকে সাধারণ মানুষের মত ভক্তি করতে পারি না। এরজন্য কি পরকালে শাস্তি পেতে হবে?

স্বামিজী বললেন : নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করলে পরলোকে শাস্তি পেতে হবে কেন? মূর্ত্তি পূজায় আপনার বিশ্বাস নেই, মন্দ কি?

স্বামিজীর উত্তরে উপস্থিত সকলে বিস্ময় বোধ করলো। সকলেই তাঁকে শ্রীশ্রীবিহারিজীর মন্দিরে ভজন গাইতে গাইতে ভাবাবেশে, অশ্রুবিগলিত নেত্রে সর্ব্বাঙ্গে প্রণাম করতে দেখেছেন অথচ মূর্ত্তি পূজার সমর্থন করলেন না।

সহসা মহারাজের একটি আলোকচিত্রের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। সেটি তিনি তাঁর কাছে নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। হাতে নিয়ে দেওয়ান বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানি বোধ হয় মহারাজ বাহাদুরের ছবি?

দেওয়ান বাহাদুর মাথা দুলিয়ে সমর্থন করলেন। তখন স্বামিজী সেটি মেঝের উপর রেখে বললেন, দেওয়ান বাহাদুরকে, আপনি এর ওপর থুতু ফেলুন। শঙ্কা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন দেওয়ান বাহাদুর। উপস্থিত সকলেই স্বামিজীর এরূপ অদ্ভুত কাজের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। রুদ্ধশ্বাসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

স্বামিজী তাঁদের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন : আপনাদের মধ্য থেকে যে কেউ থুতু ফেলতে পারেন। এটা তো এক টুকরো কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নয়, আপনারা কেন এগিয়ে আসছেন না? সকলেই একবার স্বামিজীর একবার মহারাজের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

দেওয়ান বাহাদুর বলে উঠলেন : আপনি কি বলছেন স্বামিজী! মহারাজের ছবির ওপর কি আমরা থুতু ফেলতে পারি?

হেসে বললেন স্বামিজী : মহারাজের ছবি তাতে কি আসে যায়? এটা তো মহারাজের মত নড়তে চড়তে পারে না, কথা বলতে পারে না, তথাপি আপনারা অসম্মত হচ্ছেন কেন? একটু হেসে পুনরায় বললেন : থুতু ফেলতে যে পারবেন না, তা জানি। কারণ থুতু ফেললে মহারাজের প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। ঠিক নয় কি? কুণ্ঠিত ও বিচলিত জনগণ সমর্থন জানালেন স্বামিজীকে। এবার মহারাজ কে লক্ষ্য করে বললেন, দেখুন মহারাজ ! একদিক দিয়ে বিচার করলে এটা আপনি নন, অপর দিক দিয়ে দেখলে এই ছবিটির মধ্যেও আপনার অস্তিত্ব বিরাজ করছে। আর সে কারণেই আপনার অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবকরা আপনাকে অপমান করা হয় এমন কাজে ব্রতী হচ্ছে না। আপনাকে ও চিত্রখানিকে, তুল্য সম্ভ্রম দৃষ্টিতে দেখছেন। ঠিক সেইরূপ প্রস্তর বা ধাতুর মূর্ত্তিগুলিও শ্রীভগবানের বিশেষ গুণবাচক মূর্ত্তি। দৃষ্টি পথে পতিত হবামাত্র ভক্তের মনে ভগবানের কথাই উদয় হয়। ভক্ত, মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে ভগবানকে উপাসনা করেন, ধাতু বা প্রস্তরকে পূজা করে না। নানা জায়গা আমি ভ্রমণ করছি, কখনও কোন হিন্দুকে বলতে শুনিনি, হে ধাতু, হে প্রস্তর! আমি তোমাকে পূজা করছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।.... মহারাজ। একই অনন্ত ভাবময় ভগবান, যিনি সর্ব্বজনোপাস্য ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ভক্তগণ তাঁকে স্ব স্ব ভাবানুযায়ী বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করে থাকেন! স্বামিজীর মুখ দিব্যবিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে করোজোড়ে মহারাজ বললেন : স্বামিজী আপনার কৃপায় মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। মূর্ত্তি পূজার রহস্য বুঝতাম না বা চেষ্টাও করিনি। আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন।

বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন স্বামিজী। তাঁর পায়ের ধুলো গ্রহণ করে বললেন : কৃপা করে আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

হাসলেন স্বামিজী। বললেন : একমাত্র ভগবান ছাড়া কারও কৃপা করার অধিকার নেই, সরলভাবে তাঁর শরণাগত হোন, তিনি নিশ্চয় কৃপা করবেন।

ফিরে গেলেন স্বামিজী। মহারাজ বললেন : দেওয়ানজী এরূপ মহাপুরুষের দর্শন লাভ আমি করিনি। এঁকে আপনার বাসায় আরও কিছুদিন রাখার চেষ্টা করুন।

উত্তরে দেওয়ানজী বললেন : অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা সন্ন্যাসী কোন অনুরোধ শুনবেন কিনা সন্দেহ। চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

স্বামিজী অনুরোধ রাখলেন দেওয়ানজীর। কিন্তু একটা সর্ত্ত, প্রয়োজনে সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। রাজী হলেন দেওয়ানজী।

এখানে ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন উৎসাহী ও সেবাব্রতী যুবক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তাঁদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে লাগলেন। ভক্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। শিষ্যবৃন্দও তাঁকে অনুগমন করতে লাগলো।....

তাঁরা পৌছলেন পাণ্ডুপোল গ্রাম। হনুমানজীর মন্দিরে রাত্রিযাপন করলেন। সকালে মহাবীরজীর পূজা শেষে শিষ্যদের আলোয়ারে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। একা উপনীত হলেন জয়পুরে।

অখণ্ডানন্দও পৌঁছলেন জয়পুরে। তিনি তাঁকেই (স্বামিজীকে) খুঁজতে খুঁজতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শুনলেন রাজপ্রাসাদে একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সাধু বাস করছেন। ইংরাজী ও সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলতে পারেন। বুঝে নিলেন তিনিই স্বামিজী। তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন স্বামিজী। বললেন, আমায় অনুসরণ করে ভাল করেননি। তুমি এখান থেকে ফিরে যাও।

ক্ষুণ্ণমনে ব্যথিত চিত্তে ফিরে গেল অখণ্ডানন্দ। আর স্বামিজী। তিনি সভাপণ্ডিত ব্যাকরণবিদের কাছে পানিনি অষ্টাধারী পাঠ আরম্ভ করলেন। তিনদিন কেটে গেল প্রথম সূত্রটি ভাষ্য আয়ত্ত করতে পারলেন না। চতুর্থদিনে পণ্ডিতজী বললেন : আমার কাছে পাঠ নিয়ে আপনার বিশেষ লাভ হবে না। তিন দিন ক্রমাগত চেষ্টা করেও আপনাকে একটি সূত্র বোঝাতে পারলাম না।

লজ্জিত হয়ে পড়লেন স্বামিজী। সঙ্কল্প করলেন, যতক্ষণ না সূত্রের অর্থ আয়ত্ত হয়, ততক্ষণ কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করবেন না। একপ্রহর পরে পণ্ডিতজীর কাছে ফিরে এলেন স্বামিজী। সূত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে শোনালেন। বিস্মিত পণ্ডিতজী। দু'সপ্তাহের মধ্যে শেষ হল অষ্টাধ্যায়ীর সমস্যাগুলির নিরসন। (কিছু কিছু অংশের ব্যাখ্যা)।

এখানে সেনাপতি সরদার হরসিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। তাঁর বাড়ীতেই প্রায় ধর্ম্মালোচনা করতেন। তিনি মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সেদিন কৃষ্ণবিগ্রহের শোভাযাত্রা চলেছে। স্বামিজী তাঁকে স্পর্শ করে বললেন : দেখুন শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ। ভাবান্তর হয়ে গেল সরদারজীর। অশ্রুসিক্ত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দর্শন করলেন সেই বিগ্রহের শোভাযাত্রা। যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন, বিগলিত কণ্ঠে বললেন, স্বামিজী! আজ শেষ আমার দম্ভ। শেষ হয়ে গেল তর্কের ঝুড়ি। আপনার কৃপায় সেই অপূর্ব্ব দর্শন লাভ হল!

অবিশ্বাসী তার্কিকদের জব্দ করে আনন্দ পেতেন স্বামিজী। সেদিন ধর্ম্মালোচনা চলছে, জয়পুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সূরযনারায়ণ উপস্থিত হলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন : আমি বেদান্ত, অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করি না। পৌরানিক অবতারেও আমার বিশ্বাস নেই। আমরা যদি সকলেই ব্রহ্ম হই, তাঁদের সঙ্গে আমার পার্থক্য কি?

স্বামিজী উত্তর দিলেন : আপনার কথাই সত্য। হিন্দুরা মৎসকচ্ছপকেও অবতার বলে, তার মধ্যে আপনি কোনটি। সভায় হাসির রোল উঠলো। অপ্রস্তুতে পড়লেন নারায়ণজী।

জয়পুর থেকে আজমীরে এলেন। আবু পর্ব্বতের এক গুহায় অবস্থান করতে লাগলেন। কোটা দরবারের একজন মুসলমান উকীল স্বামিজীকে সেই অবস্থা দেখে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। উদার ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান তাঁর গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে কোটার প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতেসিংহ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। একদিন তাঁর আহ্বানে ক্ষেতরীর রাজাবাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহণ লাল তাঁকে দর্শন করতে এলেন। কৌপিন পরিহিত স্বামিজী তখন খাটিয়ায় চোখ বুজিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মুন্সী মনে মনে তাঁকে ভেবেছিলেন ভবঘুরে সাধারণ সন্ন্যাসী বা ভেকধারী চোর জুয়োচ্চোর সাধু হতে পারে। স্বামিজী উঠে বসে আলাপ সুরু করলেন। প্রথম প্রশ্ন করলেন জগমোহন : স্বামিজী হিন্দুসন্ন্যাসী হয়ে মুসলমানের বাড়ীতে আছেন, আপনার খাবার বা জল ইনি তো ছুঁয়ে ফেলতে পারেন।

উত্তর দিলেন স্বামিজী : একথা বলার অর্থ কি? আমি সন্ন্যাসী, সকল সামাজিক আচার নিয়মের উর্দ্ধে। একজন মেথরের সঙ্গে বসে আমি আহার করতে পারি। ঈশ্বরের নির্দ্দেশ এই, সুতরাং নির্ভয় আমি। শাস্ত্রের ভয় নেই, কারণ শাস্ত্রও সমর্থন করে। ভয় কিন্তু আমার সবজান্তা ইংরেজীনবিশদের। আপনারা শাস্ত্র বা ভগবানের ধার ধারেন না। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান করি আমি, আমার কাছে উচ্চ নীচ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কি? শিব, শিব, শিব— উচ্চারণ করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়লেন। মুখমণ্ডল তাঁর স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

কিছুক্ষণের আলাপে মুগ্ধ হলেন জগমোহন। রাজা তাঁর কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

মুন্সীজীর সঙ্গে রাজভবনে এলেন স্বামিজী। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। স্বামিজী আসন গ্রহণ করলে পর, রাজা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন : স্বামিজী! জীবনটা

কি? উত্তর দিলেন তিনি : একটা অন্তর্নিহিত শক্তি, ক্রমাগত স্ব স্বরূপে ব্যক্ত হবার অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে আর বহিঃপ্রকৃতি তাকে দাবিয়ে রাখছে। এই সংগ্রামের নাম জীবন। ... রাজা আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। উত্তরও তার যথাযথ। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন রাজা। কয়েকদিন পরে অনুরোধ করে নিজের রাজ্যে নিয়ে গেলেন তাঁকে । ধর্ম্মপ্রাণ রাজা অজিত সিংহ ও তাঁর সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন তাঁর শিষ্যত্বগ্রহণ করলেন। গুরুভক্ত শিষ্যের ব্যাকুলতায় কিছুদিন রাজপ্রসাদে বাস করলেন। সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাস রাজপুতনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁর কাছে পাতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠে নিযুক্ত হলেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভায় বিস্মিত নারায়ণ দাস। বললেন : স্বামিজী, যা শিখাবার ছিল, তা শেষ। এ প্রতিভা মানুষে সম্ভব আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। স্বামিজীও পণ্ডিতজীকে অধ্যাপকের সম্মান দিলেন।

খেতরির রাজা অপুত্রক ছিলেন। তাঁর দুঃখ নিবেদন করলেন গুরুকে। প্রার্থনা করলেন : একটি পুত্র সন্তান লাভ যেন করি— সেই আশীর্ব্বাদ আমায় করুন। রাজার প্রার্থনায় চিন্তিত হলেন স্বামিজী। কিন্তু তাঁর কাতর আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না। বললেন : শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।...

ভ্রমণের জন্য ব্যস্ত হলেন স্বামিজী। রাজা বাহাদুর দুঃখের সঙ্গে তাঁকে বিদায় দিলেন।

পায়ে হেঁটে গুজরাটের মরুময় প্রদেশ, অতিক্রম করে আমেদাবাদ, লিম্বাডি, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস ও সোমনাথের বিশাল মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দর্শন করে পৌঁছলেন পোরবন্দরে। লিম্বাডির মহারাজ বাহাদুর ইতিমধ্যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। স্বামিজীকে পোরবন্দরের রাজপথে ভ্রমণ করতে দেখে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। এখানে বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহোদয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, নোতুন পাঠ নেবেন স্থির করলেন। পণ্ডিতজী তাঁকে মহাভাষ্য পড়াতে শুরু করলেন। ইতিপূর্ব্বে নারায়ণ দাসের কাছে পড়েছিলেন। অবশিষ্ট যা ছিল শেষ করে বেদান্তের ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন ও আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এই সময়ে গোবর্দ্ধন মঠের জগদগুরু শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আগমন করলেন পোরবন্দরে। লিম্বডির রাজভবনে তাঁর সভাপতিত্বে স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর বিচার সভা আহুত হল। পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ স্বামিজীকে সঙ্গে নিয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করলেন। স্বামিজীর খ্যাতি পণ্ডিতমণ্ডলী পূর্ব্বেই শুনেছিলেন, এখন তাঁকে পরীক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত দুজন মণ্ডলীস্থ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রথমে এই মহামহা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে লজ্জা অনুভব করলেন। ধীর ও স্থিরভাবে স্বীয় অধ্যাপকের সম্মতি নিয়ে একে একে মীমাংশা করে দিতে লাগলেন। তাঁর বিনয়, পাণ্ডিত্য ও তেজস্বীতায় মুগ্ধ হয়ে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেন সকলে। শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্য্য মহরাজও তাঁকে কাছে ডেকে আশীর্ব্বাদ ও আপ্যায়ন করলেন।.... তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি ও পবিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গজী একদিন তাঁকে বললেন : এদেশে ধর্ম্ম প্রচারে আপনি বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না। আপনার উদার ভাব আমাদের দেশের লোক অনেক বিলম্বে বুঝতে সুরু করবে। এখানে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করে পাশ্চাত্য দেশে গমন করুন। তাঁরা মহত্ত্ব ও প্রতিভার সম্মান করতে জানে। আমার স্থির বিশ্বাস, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ওপর সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করে, এক অভিনব যুগান্তর আনতে সক্ষম হবেন।

হিঙ্গুলাজ তীর্থে যাবার পথে স্বামী ত্রিগুণাতীত এখানে উপস্থিত হলেন। লিম্বডি রাজপ্রসাদে একজন মহাপণ্ডিত 'পরমহংস' অবস্থান করছেন শুনে দর্শন করতে এলেন। উপস্থিত হয়ে দেখলেন, পরমহংস আর কেউ নন স্বয়ং তাঁদের নেতা নরেন্দ্রনাথ। খুশী হলেন উভয়ে। কথা প্রসঙ্গে স্বামিজী বললেন চপলতাবশতঃ ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণীকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আজ তা ধীরে

ধীরে অনুভব করতে পারছি! আমার ভেতর যে শক্তি আছে, তার দ্বারা জগৎকে ওলট্ পালট্ করে দেওয়া সম্ভব।

ত্রিগুণাতীত যাত্রা করলেন। সংবাদ পেলে অন্য গুরুভাইরা ছুটে আসবে আশঙ্কাবোধ করে, পোরবন্দর ত্যাগ করে পাড়ি দিলেন দ্বারকায়। সেখান থেকে মাণ্ডবী, তারপর পালিটানা। শেষে পৌঁছলেন বরোদায়। অতিথি হলেন বরোদা রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মনি ভাইয়ের। কাটালেন তিন সপ্তাহ। মাঝে দু একদিনের জন্য কয়েকটি স্থান দর্শন করে এলেন। এই সময়ে জনসমষ্টির সঙ্গে পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা শত গুণ বেড়ে গেল। গুজরাট, কাথিয়াবার্ড ও বোম্বাই অঞ্চলের বহু ছোট বড় দেশীয় নৃপতি ও শাসকমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। জনসাধারণের দারিদ্র, দুঃখ ও অজ্ঞতার প্রতিকারে ধনী রাজা মহারাজারা এগিয়ে এলে কাজটা সহজ হবে বলে এ সময়ে তাঁর ধারণা জন্মেছিল। বরোদা থেকে খাণ্ডোয়া হয়ে একজন বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচয়পত্র নিয়ে বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের অতিথি হলেন। এখানে একজন খ্যাতিনামা রাজনৈতিক নেতা কলকাতার একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত, সহবাস সম্মতির বয়স নির্দ্ধারিণ আইন সম্পর্কে বাদানুবাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির পরিচয়ে লজ্জা পেলেন স্বামিজী। শুধু তাই না তিনি বাল্য বিবাহের অসামঞ্জস্য ও কুফলের তীব্র সমালোচনা করলেন। গৈরিক একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর এই উদার ভাব দর্শনে তিনিও বিস্মিত বোধ করলেন।

১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। বোম্বাই থেকে পুনাগামী ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসে আছেন স্বামিজী। পাশে তিনজন মারাঠী যুবক নিজেদের মধ্যে তর্কে নিযুক্ত। বিষয় সন্ন্যাস। দুজন যুবক রানাডে প্রমুখ সংস্কারকগণের প্রতিধ্বনি করে সন্ন্যাসের অকর্মণ্যতা ও নানা দোষ প্রদর্শন করে চলেছে, অপরজন সে মত খণ্ডন করে সুপ্রাচীন সন্ন্যাসের মহিমা প্রচার করতে ব্যস্ত। নাম তার লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। এতক্ষণ সব কথা শুনছিলেন নীরবে। শেষে লোকমান্য তিলকের পক্ষ অবলম্বনে যোগ দিলেন তিনি। ইংরাজী জানা সন্ন্যাসীর প্রখর প্রতিভায় যুবকগণ আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। ধীরভাবে বুঝিয়ে দিলেন : সন্ন্যাসীরাই ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করে জাতীয় জীবনের উচ্চাদর্শ প্রচার করে এসেছে। ভারতীয় সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ অভিব্যক্তি এই সন্ন্যাসই, জাতীয় জীবনের আদর্শকে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়েও এতকাল শিষ্য পরম্পরায় রক্ষা করে এসেছে। ভণ্ড স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে, মাঝে মাঝে সন্ন্যাস লাঞ্ছিত হয়েছে সত্য, ভারতের সমগ্র সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে ব্যক্তিবিশেষের ভণ্ডামীর জন্য দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়।.... সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর বিভূতি ও গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে লোকমান্য তিলক মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। পুণা ষ্টেশনে নেমে স্বামিজীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। স্বামিজীও তিলকমহারাজের প্রখর প্রতিভা ও বেদাদিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখে সানন্দে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করতে লাগলেন। উভয়েই পরাধীন ভারতের সমস্যাগুলির আলোচনায় তৃপ্ত হলেন। কিছুদিন যাপন করে মহাবালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

লিম্বডির ঠাকুর সাহেব স্বীয়গুরুকে রাজপথে দীনবেশে দেখতে পেয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। বোঝাতে চেষ্টা করলেন : অনর্থক ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য করছেন কেন? আর ছাড়বোনা, দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন, লিম্বডিতে থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিই।

উত্তরে বললেন স্বামিজী : একটা অদ্ভুত শক্তি আমাকে জোর করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর আমার কাঁধে এক মহান-ভাব অর্পণ করে গেছেন। যে পর্য্যন্ত না শেষ হবে, ততদিন বিশ্রামের আশা বৃথা। যদি কোনদিন অবসর পাই জীবনে, আপনার সঙ্গে বসবাস করবো।....

ডাকছে পথ— আবার যাত্রা শুরু ... মারমাগোয়া হয়ে বেলগ্রামে উপস্থিত হলেন। এক মারাঠা ভদ্রলোকের অতিথি হলেন। তাঁর সরল উদার অকপট পাণ্ডিত্য, নিরাভিমান বিনয় ও জাতীয়তাবোধে স্থানীয় শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই আকৃষ্ট হতে লাগলেন। বনবিভাগের কর্ম্মচারী হরিপদ মিত্র, সন্ন্যাসীর পরিচয় পেয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুরাগে মুগ্ধ হয়ে, সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এঁর কাছেই প্রথম আমেরিকায় গিয়ে শিকাগো ধর্ম্মসভায় যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। হরিপদবাবু, তখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা তোলার প্রস্তাব তুললেন। তাঁকে নিরস্ত করে সেখান থেকে বাঙ্গালোর উপস্থিত হলেন। ... মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান আর. কে শেষাদ্রি বাহাদুর স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ করে এত মুগ্ধ হলেন যে, মহারাজা চামরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়েদিলেন। মহারাজা তরুণ সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন। রাজভবনে শ্রদ্ধাস্পদ অতিথি রূপে বাস করতে লাগলেন। মহীশূরাধীপ ছিলেন অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতির লোক। স্বামিজী তাঁর কাজের ত্রুটি দেখলে তীব্র সমালোচনা করতেন। মহারাজ ততই আনন্দানুভব করতে লাগলেন। একদিন তাঁর স্নেহভর্ৎসনায় কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন : স্বামিজী, আমি একজন রাজা মহারাজা, আমাকে ভয় করা উচিত, খোসামদ করা উচিত। ভবিষ্যতের জন্য, আপনি সাবধান হবেন নতুবা জীবন আপনার সঙ্কটাপন্ন হতে পারে।

মহারাজার কথা বিশ্বাস করে স্বামিজী বললেন : আপনার অসঙ্গত কাজ ও কথা সমর্থনের জন্য বহু পারিষদ আছে। আমি সন্ন্যাসী। 'সত্যই' আমার তপস্যা। সামান্য জড়দেহের আশঙ্কায়। সত্য পরিত্যাগ করবো? আপনি হিন্দু-রাজা হয়ে একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কি এরূপ হীন-কাজ প্রত্যাশা করেন?.....

স্পষ্টবাদীতা ও সরলতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন উভয়ে। একদিকে বন্ধুবৎ প্রীতি, অন্যদিকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তি কাছাকাছি টেনে এনেছিল উভয়কে।... রাজপ্রাসাদে দার্শনিক বিচার সভা আহূত হল। নানা পণ্ডিতের সমাগম। সুরু হল বেদান্তের বিচার। মহারাজার অনুরোধে স্বামিজীও যোগ দিলেন। বেদান্তের নানা ভাষ্য, নানামত। এক অপরকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপাদন করতে উদ্যত। বয়ে গেল তর্কের ঝড়, সমস্যার সমাধান হল না। 'শষে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সবাই। দেওয়ানজীর অনুরোধে স্বামিজী উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর লাবণ্য মণ্ডিত মুখশ্রী ও বিদ্যুতবর্ষী চোখের দ্যুতি, বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর হৃদয় জয় করে নিল। স্বভাব সুমধুর কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃতে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী বিভিন্ন প্রকার মতগুলি যে পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক, অপূর্ব্ব যুক্তি বলে প্রমাণ করে বুঝিয়ে দিলেন। এগুলি দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নয়, সাধক জীবনের বিভিন্নাবস্থায় অনুভূত সত্যসমূহ। একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। ... এই অভিনব পন্থায় বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনে, চমৎকৃত হলেন সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী। সকলে তাঁকে সাধুবাদ প্রদান করতে লাগলেন।

মহারাজের সঙ্গে বসবাস কালে উভয়ের মধ্যে একটা যোগ সূত্র স্থাপিত হয়ে গেল। একদিন উভয়ে বাক্যালাপে রত। সহসা মহারাজ বললেন, স্বামিজী আপনার জন্যে কিছু করতে পারলে অনেক বেশী আনন্দ পেতাম কিন্তু আপনি তো কিছুই গ্রহণ করবেন না।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ, দেশ, কাল, আচার, বিচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, বুঝেছিলেন : বর্ত্তমান অবস্থায় সবচেয়ে প্রয়োজন কী বস্তু। খুলে বললেন মনের কথা : আমাদের প্রয়োজন পাশ্চাত্যজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু ইউরোপীয়দের দ্বারে দাঁড়িয়ে কেবল কেঁদে বা ভিক্ষা প্রার্থনা করলে, এ উদ্দেশ্য সাধন হবে না। বর্ত্তমানে প্রয়োজন, যেমন ওরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প দেবে, বিনিময়ে আমাদেরও কিছু

দিতে হবে। ভারতবর্ষের দেবার মত এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ছাড়া আর অন্যবস্তু কি আছে? সেজন্য আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম্মপ্রচার করতে পাশ্চাত্য দেশে গমন করি। যাতে, এই আদান-প্রদান সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ কামনার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আপনার মত মহাকুল প্রসূত শক্তিশালী রাজন্যবর্গ যদি চেষ্টা করেন, অল্পায়াসে কাজ আরম্ভ হতে পারে। আপনি এই মহৎ কাজে অগ্রসর হোন, এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

মহারাজা স্বামিজীর কথা মন দিয়ে শুনলেন। বললেন, আপনি যদি পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করতে অগ্রসর হোন, সমস্ত ব্যায়ভার আমি গ্রহণ করবো। আমি এক্ষুনি কয়েক হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত, আপনি গ্রহণ করুন।

উত্তরে স্বামিজী বললেন : এখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি। আমার প্রথম কাজ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা। এ ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজে পা বাড়াবো না। তারপর কি করবো, কোথায় যাবো, এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

একদিন মহারাজ দেখলেন সত্যই স্বামিজী বিদায় নিতে উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁকে বহুমূল্য দ্রব্য সমুহ উপহার প্রদান করলেন। তিনি বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ... চন্দন কাঠের হুঁকা গ্রহণ করলেন। দেওয়ানীজী তাঁর পুটলীর মধ্যে একতাড়া নোট গুঁজে দেবার চেষ্টা করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁকে বিমর্ষ দেখে, বললেন : তা হলে বরং কোচিন পর্য্যন্ত যাওয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে দাও।

দেওয়ানজী কোচিন রাজ্যের দেওয়ানের কাছে একটি পরিচয় পত্র দিয়ে অনুরোধ করলেন : স্বামিজী, আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন। পদব্রজের কষ্ট করবেন না। কোচিন রাজ্যের দেওয়ান আপনার শ্রীশ্রী রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।...

কোচিনের রাজধানী ত্রিচুড়ে কয়েকদিন বিশ্রাম করলেন। রমনীয় মালাবার প্রদেশের ভেতর দিয়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে উপস্থিত হলেন। অধ্যাপক সুন্দরম আয়ার ছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের মহরাজার ভ্রাতস্পুত্রের গৃহশিক্ষক। তাঁকে সমাদরে অতিথি রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর সহযোগীতায় মহারাজা, দেওয়ান বাহাদুর ও প্রিন্স মার্ত্তণ্ড বর্ম্মার সঙ্গে পরিচিত হলেন স্বামিজী। আলাপ চলার মধ্যে উত্তর ভারত, রাজপুতনা এবং পশ্চিমভারতের দেশীয় নৃপতিদের বিষয় এসে গেলেন। স্বামিজী তাঁদের বরোদার গাইকোয়ার্ডের বিদ্যাবত্তা, কর্ম্মকুশলতা ও দেশপ্রীতির কথা উল্লেখ করলেন। স্থানীয় কয়েকজন পণ্ডিত তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। এখানে বসবাস কালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল মহারাজা কলেজের অধ্যাপক রঙ্গচাবিয়ার। ইনি ছিলেন সংস্কৃত ও ইংরাজীতে সুপণ্ডিত। ক্রমে আরও অনেক শিক্ষিত ও পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় হল। কখনও স্পেনসার, কখনও সেক্সপীয়ার, কখনও কালীদাস, কখনও বা ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ, ইহুদীজাতির ইতিহাস, আর্য্যসভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তি, বেদ, ইসলাম ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের আলোচনা চলতে লাগলো। সকলেই তাঁর পাণ্ডিত্য, মহত্ত্ব ও সরলতায় মুগ্ধ হলেন।....

মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে পরিচয় হল। সুপণ্ডিত রাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর জনসাধারণের অবস্থার জন্য, শিক্ষা বিস্তার, কৃষি উন্নয়নের আগ্রহ দেখে বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন, আপনি তো সন্ন্যাসী, ধর্ম্ম ও মোক্ষই আপনার লক্ষ্য বস্তু কিন্তু জনসাধারণের প্রতি এত আগ্রহ কেন?

সহাস্যে উত্তর দিলেন স্বামিজী : মোক্ষ সন্ন্যাসীর লক্ষ্য হলেও ভারতের জনমণ্ডলীর উন্নতি সাধনের চেষ্টাও যে মোক্ষ লাভের সোপান, আমি আমার গুরুর কাছে— এই আদর্শই লাভ করেছি।....

কাটলো কয়েকদিন। যাত্রা করলেন, দক্ষিণ ভারতের বারানসী রামেশ্বরে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিব ও মন্দির দর্শন করে পাড়ি দিলেন কন্যাকুমারী অভিমুখে।

যাত্রা শুরু হয়েছিল বরানগরের মঠ থেকে অশান্ত মনে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। আর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস, এখনও পথে পথে করছেন ভ্রমণ। তখন উদ্দেশ্য ছিল : ভ্রমণ অর্থে ভারতবাসীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পবিচয়, —আর আজ? চোখে তাঁর উদ্ভাসিত জাতীয় সমস্যা। একদিন লক্ষ্য ছিল : মোক্ষ, নির্ব্বিকল্প সমাধি আর আজ দীর্ন, জীর্ণ, সনাতন ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় নবচেতনার উদ্বোধন।

সামনে অনিলান্দোলিত বীচি, বিক্ষোভময়ী উচ্ছ্বাসিত সুনীল জলধি, পশ্চাতে মরুগিরি কাণ্ডার পরিশোভিতা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ তার সর্ব্বশেষ প্রস্তরখানির উপর যোগাসনে বসে নব্য ভারতের মন্ত্রগুরু পরিব্রাজক সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ।...

...কন্যাকুমারীর শ্রীমন্দিরের পাশে প্রস্তরাসন। ধ্যানস্থ হলেন স্বামিজী, সামনে উঠলো শ্রীগুরুর হাতছানি। এগিয়ে চলেছেন তিনি, মহাসমুদ্রের সম্মুখ দিকে.... আর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি মুমূর্ষু ভারতে—রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুঃখ দৈন্য হাহাকারের আঁধার, পিছন থেকে ভেসে আসছে.... দুমুঠো খেতে দাও... একটু পরতে দাও... বাঁচতে দাও... আর মুমূর্ষুর সেই কাতর ক্রন্দন... সামনে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন শ্রীগুরু— আয়, আয়, আয়! হৃদয় বিদীর্ণকারী সেই হাহাকারের গহন অন্ধকারের পিছন থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর.... দুমুঠো খেতে দাও, একটু ছিন্ন বস্ত্র দাও, বেঁচে থাকার মত, দাও একটু ঠাঁই! মুমূর্ষুর সেই কাতর ক্রন্দন, ধ্বনি সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনে তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে, অতি ধীরে।...

ভাঙলো ধ্যান। সূর্য্য ঢলে পড়েছে সুনীল জলধিতে। ছড়িয়ে আছে অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত আভা। সবই দেখছেন সেইসঙ্গে শ্রীগুরুর... প্রতিবিম্বিত সেই হাতছানি.. মৃদুকণ্ঠের সেই ডাক আয়... এগিয়ে আয়...

উঠে দাঁড়ালেন স্বামিজী। মন্দিরে ঘণ্টা ধ্বনি... চিন্তাভারে জর্জ্জরিত হৃদয়। এখন আমি কি করবো! অবশিষ্ট আরও অনেক কাজ ... কিন্তু ... হে গুরু, তোমার আদেশবাণী শিরধার্য্য করে ভ্রমণ করেছি সারা ভারত, গিয়েছি ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ, রাজ, মহারাজা, পণ্ডিত, মূর্খ প্রত্যেকের দ্বারে, দ্বারে। যথাসাধ্য চেষ্ট করেছি অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্যের প্রচার ... এর পর... সহসা সে তন্ময়তার মাঝে ফুটে ওঠে : সারা ভারতের ক্লিষ্ট মুখচ্ছব্যি। তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি! হ্যাঁ, হ্যাঁ,.... আজ থেকে এই তাঁর ধ্যান, এই হোক স্বপ্ন। তাকে, জাগাতে হবে ... জাগাতে হবে.... আজ থেকে তিনি... মোক্ষকামী সন্ন্যাসী নন— মনুষ্যত্ব ও মাতৃভুমির সেবক সন্ন্যাসী।

দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, উপলব্ধি করলেন, : শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ। মেনে নিলেন তা সর্ব্বান্তঃকরণে। অদ্বৈত বেদান্তের ভেরী নিনাদে, ভারতের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, : সমষ্টির মুক্তি ছাড়া, নিজের মুক্তি তুচ্ছ, তুচ্ছ এ জগতে।...

সংসার বিমুখ যোগী স্বদেশবাসীর কল্যাণকল্পে, সত্যের তরবারি তুলে নিলেন হাতে, এগিয়ে চললেন সমুখ পথে।...

ত্যাগ করলেন কন্যাকুমারী। রামনাদের মধ্য দিয়ে উপস্থিত হলেন ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে। অল্প সময়ে শিক্ষিত যুবক সমুদায় তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়লো। পথশ্রান্ত স্বামিজী। বিশ্রাম নিলেন কয়েকদিন। সুরু হল সংগ্রাম। একপাশে অনুবর্ত্তী যুব সম্প্রদায়, অন্যপাশে দক্ষিণী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাঁদের মতে : গোঁড়ামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ যাকিছু, সেটাই হিন্দুধর্ম। তার আচার, সংস্কার, বলে কি? স্বামিজীর উন্নতিমুখীন প্রস্তাবগুলির পরিবর্ত্তে বর্ষিত হতে লাগলো গালি গলাজ আর অভিসম্পাত। পণ্ডিতের দল অগ্নিশর্ম্মা।.. স্বামিজী বললেন, শাস্ত্রে, সমুদ্রযাত্রায় সঙ্গত কোন বাধা নেই। ঘৃতে আহুত পড়লো। অঙ্গভঙ্গী করে শিখা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'কদাপি

ন' ...'কদাপি ন'। বিচার সভার পরিণতি দেখে শিক্ষিত যুবকদের বললেন, ধর্ম্ম বলে, যে আচার, ব্যবহার প্রচারিত, তা সত্য ধর্ম্ম কিনা পরীক্ষার দায়িত্ব আজ তোমাদের উপর নির্ভর করছে। অতীত ও প্রচলিত প্রথার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে উন্নতিশীল জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সমাজের বিকাশ ও পরিপুষ্টির পথে যা প্রতিবন্ধক, যা অন্তরায়, তা ত্যাগ করে আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে হবে।

তাঁর 'বাণী' প্রত্যাদেশের মত ধ্বনিত হল। তিনি সতেজ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : আমাদের সামনে সেইদিন আগত, যারা উপেক্ষিত, ঘৃণায় যাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে দূরে, তাদের বিদ্রোহের দিনও সমাগত। প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্ত্তব্য, জনসমষ্টির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সমাজজীবনে সমানাধিকারের আদর্শ প্রচার, পুরোহিতদের অত্যাচার নির্ম্মূল করে, গুণগত, বর্ণ বিভাগের বিকৃতি যে কৃত্রিম জাতিভেদ, যা জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ, বেদান্তের উচ্চতত্ত্বগুলির সাহায্যে তা দূর করা।....

মাদ্রাজের ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এই সময়ে সরকারী কাজে পণ্ডিচেরী এসেছিলেন। তিনি দণ্ডকমণ্ডলু হাতে স্বামিজীকে রাজপথে দেখেই চিনতে পারলেন। ত্রিবান্দমে অধ্যাপক সুন্দর আয়ারের বাড়ী থেকে এসে, তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন বাস করলেন। সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে, কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শেষ করে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মাদ্রাজে পৌঁছাবার কিছুদিন পরেই স্বামিজীর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র, অধ্যাপকগণ তাঁর কাছে ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনার জন্য সমাগত হতে লাগলেন। অনেকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের যুক্তিজাল বিস্তার করে, তাঁর সঙ্গে তর্কে অগ্রসর হলেন কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে সমর্থ হলেন, এঁর বেদান্তমতের কাছে এসব যুক্তি একান্তই অকিঞ্চিৎকর। ফলে, মন্মথবাবুর ভবনটি ধর্ম্ম আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হল। তাঁর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিহীন উদার ধর্ম্মমত, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করলো। তারা তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিলেন।

তাঁর গুণগাথা শুনে, সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক খৃষ্টীয়ান কলেজের অধ্যাপক সিঙ্গারভেলু মধুলিয়র একদিন সদলবলে স্বামিজীকে তর্কে আহ্বান করলেন। স্থির বিশ্বাস ছিল, তাঁর যুক্তি ছিন্ন করার শক্তি কারও আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরব হতে হল তাঁকে।

স্বামিজীর স্বচ্ছ প্রশান্ত ললাট, মহিমার বিচ্ছুরিত দ্যুতি, শান্তোজ্জ্বল দুটি চোখে করুণার চিরবিগলিত অমৃতানির্ঝর, বিস্ময়াভিভূত মধুলিয়র কি দেখলেন, কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। উপস্থিত সকলে দেখলো, গণ্ডে তাঁর অশ্রুধারা। নাস্তিকতা অন্তর্হিত। অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আর তিনি আদর করে নাম দিলেন ''কিডি'। আজীবন সংযমী দৃঢ়চেতা মধুলিয়র 'নব নারায়ণ' সেবায় আত্মসমর্পণ করলেন।

যুক্তরাজ্যে, শিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন চলেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে উপযুক্ত প্রতিনিধি যোগ দিতে পারবেন ঘোষিত হয়েছে। স্বামিজীর কয়েকজন মাদ্রাজী উৎসাহী শিষ্য, তাঁকে হিন্দুপ্রতিনিধি রূপে ওই সভায় পাঠাতে কৃত সঙ্কল্প হলেন। একদিন সত্যসত্যই তাঁরা পাঁচ শতটাকা সংগ্রহ করে স্বামিজীর হাতে তুলে দিলেন। সমস্যায় পড়লেন স্বামিজী। এই বিরাট মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা সত্যই কি তাঁর আছে? প্রতীক্ষা করলেন সেই প্রত্যাদেশের। শিষ্যদের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, বৎসগণ আমি শ্রীশ্রীজগন্মাতার হাতের যন্ত্র। তাঁর ইচ্ছা হলে তিনিই আমাকে সেখানে প্রেরণ করবেন। তোমরা এই টাকায় দরিদ্রসেবায় ব্যয় কর। দেখি মার ইচ্ছা কি!

শিষ্যরা দমে গেলেন। স্বামিজী শিষ্যদের সান্ত্বনা দিলেন: আমি সন্ন্যাসী, সঙ্কল্প করে কোন কাজ করা উচিত নয়। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তিনিই উপায় নির্দ্ধারিণ করবেন। তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।

সহসা হায়দরাবাদ থেকে মন্মথবাবুর বন্ধু ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার মধুসূদন চ্যাটার্জ্জীর কাছ থেকে তাঁকে পাঠানো জন্য একটি চিঠি এলো। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁকে সেখানে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত। মন্মথবাবু স্বামিজীর শিষ্যমণ্ডলী ও তাঁর সম্মতি নিয়ে জানিয়ে দিলেন ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা হায়দরাবাদে যাচ্ছেন। ষ্টেশনে নেমে দেখলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিপুল জনসঙ্ঘ অপেক্ষা করছে। রাজা শ্রীনিবাস রাও, মহারাজা রম্ভার ও পণ্ডিত রতনলাল, শ্যাম-সুল-উলেমা সৈয়দ আলি বিলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নেওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, রায় হুকুম চাঁদ, এম. এ. এল. এল.ডি শেঠ চতুর্ভুজ, শেঠ মতিলাল, ক্যাপ্টেন রঘুনাথ প্রভৃতি হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্ল্যাটফরমে উপস্থিত। মধুসূদন চ্যাটার্জ্জী তাঁর হাত ধরে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁকে ফুলমাল্যে বিভূষিত করে মধুসূদনবাবুর বাঙলোতে নিয়ে গেলেন।

নিজামবাহাদুরের শ্যালক নবাব স্যার খুরসিদ জঙ্গ বাহাদুর তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন তিনি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সমূহ দর্শন করে ছিলেন। তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে নিজের পাশে বসালেন। আগ্রহের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে স্বামিজী সমন্বয় ভূমি দেখিয়ে দিলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন: সভ্যজগতের সামনে বেদান্ত শাস্ত্র সহায়ে ধর্ম্ম সমন্বয় প্রচার করার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন, তাতে ধর্ম্ম বিরোধ কমবে।.... মানুষ স্ব-স্বভাবানুযায়ী ঈশ্বরের উপাসনায় সক্ষম হবে। নবাব বাহাদুর তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথাশুনে আনন্দিত হলেন এবং পাশ্চাত্য দেশে গমনের জন্য এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করতে চাইলেন।

স্বামিজী বিনীতভাবে নিবেদন করলেন : নবাববাহাদুর, ইতিপূর্ব্বে আমার পরমবন্ধু মহীশূরের মহারাজ বাহাদুর এবং শিষ্য রামনাদের রাজা আমাকে পাশ্চাত্য দেশে গমনের জন্য অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, এখনও সময় উপস্থিত হয়নি। যদি কখনও পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার জন্য ভগবানের আদেশ পাই, নবাব সাহেবকে আমি নিবেদন করবো।

স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আগ্রহে, মহবুব কলেজে একটি সভার আয়োজন করা হল। এক সহস্রেরও বেশী শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিলেন : 'পাশ্চাত্য দেশে আমার বার্ত্তা''। সভাপতি হলেন পণ্ডিত রতনলাল। হৃদয় গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনে সকলেই মুগ্ধ হল।....

প্রায় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে স্বামিজী হায়দরাবাদের বন্ধু ও ভক্ত মণ্ডলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন মাদ্রাজে। তিনি শিকাগো ধর্ম্মসভায় যাবার চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী সে সঙ্কল্প, ত্যাগ করলো না। তাঁরা মিলিত অর্থ সংগ্রহ করতে রামানাদ, মহীশূর ও হায়দরাবাদে গমন করলেন। মহামতি আনন্দচালু, মাননীয় জাষ্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ অনেকেই তাঁকে ধর্ম্মসভায় প্রেরণ-কল্পে বদ্ধপরিকর দেখে চিন্তিত হলেন স্বামিজী। একদিন অন্যতম শিষ্য মিঃ আলসিঙ্গা পেরুমলকে ডেকে বললেন, যদি আমার আমেরিকা গমন মায়ের ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্যই আমায় যেতে হবে। তোমরা আমাকে হিন্দুপ্রতিনিধি রূপে পাঠাতে চাচ্ছ! আমিও জনসাধারণের মুখপাত্র স্বরূপেই যেতে ইচ্ছা করি। কিন্তু জনসাধারণের সম্মতি আছে কিনা অবগত হওয়ার একটি প্রয়োজন। কেবলমাত্র রাজা, মহারাজারদের কাছ থেকে সাহায্য না গ্রহণ করে জনসাধারণের কাছ থেকে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করো।

তাঁরা গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে নিয়ে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লাগলেন। স্বামিজীও স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীগুরু দিব্যদেহে সমুদ্রকূল থেকে পদব্রজে সমুদ্রের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁকে অনুসরণ করার জন্য হস্ত সঙ্কেতে ইঙ্গিত করছেন। কন্যাকুমারীতে যে ইঙ্গিত দেখেছিলেন, আবার সেই ইঙ্গিত .... দূর হল দ্বিধা সঙ্কোচ, তৈরী হতে লাগলেন এই অবসরে। প্রয়োজন শ্রীমার আশীর্ব্বাদ। তাঁর আদেশ ছাড়া বিদেশ যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবনা নয়। চিঠি লিখলেন মার কাছে।

প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের স্নেহের 'নরেন' শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নেতা, রাজাধিরাজ সেবিত বীর সন্ন্যাসী, তাঁর দৃষ্টিতে সংসারানভিজ্ঞ বালকমাত্র, তাকে কোনপ্রাণে সুদুর বিদেশযাত্রায় অনুমতি দেবেন! এলো ঠাকুরের আদেশ— সব সমস্যার সমাধান, সেইমুহূর্ত্তে। সন্তানের কল্যাণ কামনায় মুগ্ধ জননী সম্মতি দিলেন : প্রাণের আশীর্ব্বাদ বর্ষণে।

পত্র এলো। শ্রীমা পাঠিয়েছেন আশীর্ব্বানী। ভক্তিভরে মাথায় ধারণ করে, সাশ্রুনয়নে আনন্দবিহ্বল চিত্তে ভাবাবেগে নৃত্য করতে লাগলেন। উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত করার জন্য সকলের অলক্ষ্যে চলে গেলেন সমুদ্র তটে।

মন্মথবাবুর বাড়ীতে সমবেত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ। নিজেকে সামলে নিয়েছেন স্বামিজী। ফিরে এলেন সকলের সামনে। বললেন : শ্রীমার আদেশ পেয়েছি, সমস্ত সংশয় ভাবনা থেকে মুক্ত আমি, আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। করুণাময়ী জননী আদেশ দিয়েছেন, আর চিন্তা কি?

আনন্দে, বিস্ময়ে, উৎসাহে, উদ্দীপ্ত শিষ্যবৃন্দ। কয়েক দিনের মধ্যেই যাত্রার সুবন্দোবস্ত করে ফেললেন সকলে।.....সব প্রস্তুত, এমন সময় খেতরি রাজভবন থেকে মুন্সী জগমোহনলাল এসে সমস্ত ব্যবস্থার ওলট পালট করে দিলেন।

দু'বছর আগে খেতবিপতি, রাজা মঙ্গল সিংহকে পুত্র প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করে এসেছিলেন, গুরুর কৃপায় সন্তান লাভ করেছেন রাজা, পুত্রের অন্নপ্রাশন, শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ চাই। মুন্সীজী স্বামিজীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন মাদ্রাজে। জগমোহন বললেন : গুরুজি! অন্ততঃ একদিনের জন্য খেতরিতে যেতে হবে আপনাকে, নইলে রাজাজী দারুণ আঘাত পাবেন। কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই, রাজা সমস্তই বন্দোবস্ত করবেন, আপনি আমার সঙ্গে খেতরি চলুন।

অগত্যা রাজী হতে হল স্বামিজীকে। স্থির হল... বোম্বাই থেকে আমেরিকা যাত্রা করবেন। শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললেন, খেতরির পথে।

শুভ অন্নপ্রাশনোৎসব সমাধা হল। স্বামিজী রাজাশিষ্যের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। জগমোহন রাজগুরুর যোগ্য পোষাক তৈরী করে আনলেন। স্বামিজীর ঘোরতর আপত্তি। অভ্যস্ত তিনি গৈরিক বসনে, দণ্ডকমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্রে। এসবের তাঁর কি প্রয়োজন। জগমোহন বোঝালেন : তিনি রাজগুরু। সেই ভাবেই সজ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। বক্তৃতা করার জন্য মহার্ঘ রেশমের আলখেল্লা ও পাগড়ী। শিষ্যের সদিচ্ছা— বাধা দিলেন না। নাম নিলেন "বিবেকানন্দ"।

যাত্রার শুভমুহূর্ত্ত সমাগত। জগমোহন জাহাজে একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। মিঃ আলসিঙ্গা পেরুমল ইতিপূর্ব্বেই গুরু দর্শন কামনায় মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই এসে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। স্বামিজী অশ্রুপূর্ণ লোচনে শিষ্যদ্বয়ের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করলেন। .... তীব্র বাঁশী বেজে উঠলো। হৃদয় আলোড়িত হল স্বদেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ, সে বেদনায়। জাহাজ এগিয়ে চললো মন্থর গতিতে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল স্বদেশের শ্যামল ছবিখানি। শেষ ধূসর রেখাটিও মিলিয়ে গেল দিকচক্রবালে। ডেকের ওপর প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসী। উদ্বেলিত হৃদয়, ঠোঁটের পাতা দুটো কেঁপে উঠলো :

হে রহস্যময় গুরু। তুমি তো নিষ্কৃতি দিলে না। আজ সত্য সত্যই ত্যাগপুত ভারতবর্ষ থেকে ভোগবিলাসের লীলাভূমি পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে চললে! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!...(১৮৯৩ সাল ৩১শে মে)।

জাহাজ ছাড়লো বিব্রত হলেন স্বামিজী। এতদিন সম্বল ছিল দণ্ড, কমণ্ডলু আর গেরুয়া মোড়া দুচারখানা পুঁথি। এখন বাক্স, পেঁটরা, কাপড় চোপড় সামলানো দায় হয়ে উঠলো। এদের তত্ত্বাবধানেই শক্তি ও সময় অযথা ব্যয় হতে লাগলো। মনে পড়লো ঠাকুরের কথা "যতদিন বাচি, ততদিন শিখি'। অভিনব খাদ্য, ইয়োরোপীয় আচার, ব্যবহার ধীরে ধীরে আয়ত্তাধীন হয়ে গেল। অন্য যাত্রী ও কাপ্তেনের সঙ্গে ভাব করে নিলেন। সাতদিন কাটলো। জাহাজ কলম্বো বন্দরে ভিড়লো। বৌদ্ধ ধর্ম্মের দেশ, সিংহলের রাজধানী। গাড়ী করে দেখলেন শহর। বুদ্ধ মন্দিরে গেলেন। শয়ানো বৃহৎ মহা নির্ব্বাণ মূর্ত্তিটি দেখলেন। পুরোহিতদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন- তাঁরা সিংহলী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না- অগত্যা জাহাজে ফিরে এলেন। জাহাজ তার চিরন্তনী বিদায় বাঁশী বাজিয়ে বিক্ষুব্ধ জলরাশি ভেঙে এগিয়ে চললো।... এলো মালয় উপদ্বীপের পিনাং, সিঙ্গাপুর, দূরে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা সুমাত্রা।.... এলো হংকঙ। জাহাজ থাকবে তিনদিন। সিকিয়াঙ নদীর মোহনা থেকে আশি মাইল দূরে দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যান্টন সহর গেলেন। কতকগুলি মঠ ও সবচেয়ে বড় প্যাগোডা দর্শন করলেন। চোখে পড়লো প্রাচ্যের দারিদ্র্য আর পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ ও বণিককুলের শোষণ। দেখলেন : মানুষ আজ ভারবাহী পশু। ভারতবর্ষ ও চীন, প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী, দুই মহাজাতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করলেন। দুই দেশের সভ্যতা, আধুনিক জগতের চোখে ম্লান। পরিবেশ এক, দারিদ্র্যই তার একমাত্র কারণ।..

জাহাজ এসে ভিড়লো ইয়াকোহামায়। স্বামিজী খুশী হলেন জাপানের সহর, রাস্তা, কর্ম্মচঞ্চল অধিবাসীদের দেখে। তাদের বর্ত্তমানের কি প্রয়োজন বুঝে প্রতিটি জাপানী। যেমন তাদের সাহস, তেমনি তাদের উদ্যম।... মুগ্ধ নেত্রে ঘুরে দেখলেন, নাগাসিকি, কোচি বন্দর, ইয়াকোহামা, ওসাকা ও টোকিও। সর্ব্বত্রই একটা জাগরণের সাড়া, কি কর্ম্মে কি ব্যবহারে, কি আদব কায়দায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগরী, বাস করার ঘরগুলো যেন ছবি! মনোহর উদ্যান, কৃত্রিম জলাশয়, চওড়া রাস্তা ও সিধা।... চোখে বিস্ময়, দর্শনে পলক, হৃদয়ে বেদনা হায় ভারতবাসী!

১০ই জুলাই মাদ্রাজী শিষ্যদের চিঠি দিলেন : জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে, সংক্ষিপ্ত চিঠিতে প্রকাশ করা যাবে না। তবে এটুকুই বলতে পারি আমাদের দেশের যুবকদের দলে, দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক। বিশেষ দরকার জাপানে যাওয়ার। জাপানীদের কাছে ভারত সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ।

... আর তোমরা কি করছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোকছো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর ফিরে গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোওগে।.... ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা, ভীমরতি ধরেছে। তোমাদের দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে জাত যায়! এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ। হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তি ক্ষয় করছো! পৌরোহিত্যের আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ। শত সাত যুগের অবচ্ছিন্ন সামাজিক অত্যাচারে, তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের কি আছে বল দেখি? আর তোমরা করছোই বা কি? তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারী করছো! ইউরোপীয় মস্তিষ্ক প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র, তাও খাঁটি জিনিষ নয়— সেই চিন্তার বদহজম, খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেরানীগিরীর সর্ব্বোচ্চ দূরাকাঙ্ক্ষা!.... প্রত্যেক ছেলের আশপাশে একপাল ছেলে, তার বংশধর, চীৎকার তুলছে, বাবা,

খাবার দাও, খাবার দাও!! বলি সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা সব ডুবিয়ে ফেলতে পারো না?

এস, মানুষ হও। দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। ওই মস্তিকেহীন লোকগুলো কখনো ভাল কথা শুনবে না— হৃদয় তাদের শূন্যময়, তার প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্য তাদের জন্ম, আগে তাদের নির্মূল কর। এসো মানুষ হও। সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবোসো? তাহলে এস, ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পিছনে চেয়ো না, অতিপ্রিয় আত্মীয় কাঁদুক, পিছনে চেয়ো না, এগিয়ে যাও সামনে। ভারতমাতা অন্তত এরূপ এক হাজার বলি চান! মনে রেখো মানুষ চাই —পশু নয়।

ইয়াকোহামা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে জাহাজ বঙ্কুবর বন্দরে নোঙ্গর করলো। এখান থেকে রেলপথে কানাডার মধ্য দিয়ে তিনদিন পর শিকাগো সহরে প্রবেশ করলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত সে নগরী। বিস্ময় বিহুল স্বামিজী, বালকের মত বিচরণ করতে লাগলেন। একে পরিধানে গৈরিক সন্ন্যাসীর বেশ, তায় নবাগত। কৌতূহলী জনতা তাঁকে উত্যক্ত করতে লাগলো। বালকের দল, বিদ্রূপ করতে করতে পিছু নিল। বস্কুবর থেকে প্রতারণার সূচনা, এখানেও সেই একই অবস্থা। অসম্ভব দাবী করে ঠকিয়ে চলেছে। এ এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। একে ব্যবহারিক জীবনে অনভিজ্ঞ, কুলিদের তেমনি অবান্তর দাবী, যাকে চলতি কথায় জুলুম বলা চলে। শেষে এক হোটেলে উঠে সেদিনের মত পরিত্রাণ খুঁজে পেলেন। পরদিন প্রদর্শনী দেখতে গেলেন। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের নমুনা। ছোট বড়, নানা ধরনের যন্ত্র। বিচিত্র পণ্য সম্ভার, শিল্পকলার কত বিচিত্র সমাবেশ—পাশ্চাত্যের গরিমায় মুগ্ধ হলেন স্বামিজী। লক্ষ্য করলেন এদের আত্মবিশ্বাস, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্লভের সন্ধানে জীবন-মরণ-পণই এদেশের ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। বেগবান করেছে সভ্যতার স্রোত, জীবনে এনেছে উন্নতির ক্রমবিকাশ। আর ভারত! ক্ষীণ বিশীর্ণ তার জীবন, তুলনায় ব্যর্থতার সাক্ষ্য, প্রতিটি পদে পদে। ক্ষুন্ন মন, ক্লান্ত পা, ফিরে এলেন হোটেলে।....

আগুন ছাই চাপা থাকে না। অদ্ভুত সেই পোষাক, জ্যোতির্ম্ময় ললাট, আয়তলোচন— মর্ম্মভেদী সে দৃষ্টি.... আকৃষ্ট করলো মানুষকে। তারাই আবিষ্কার করলো স্বামিজীকে। সংবাদ পত্রের রিপোর্টাররা বাদ গেল না।

কিন্তু সমস্যা, দেখা দিতে লাগলো একটার পর একটা। বরদা রাও যে মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন— তিনি ও তাঁর স্বামী শিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান ব্যক্তি। তাঁরা তাঁর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন। তার বাইরের যে গণ্ডী, তাঁদের আচার ব্যবহার শুধুই উচ্ছ্বাস, আন্তরিকতা শূন্য। সুতরাং অর্থ খরচ হতে লাগলো জলের মত। চিন্তিত হলেন স্বামিজী। এর পর যে উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন, সেই মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি রূপে গৃহীত হবার সুযোগ তাঁর নেই, যেহেতু সভার নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিচয় পত্র সঙ্গে তিনি আনেননি।.... যে সামান্য অর্থ তাঁর এখনও অবশিষ্ট আছে তাও হোটেলের দাবী মেটাতে, একপক্ষকালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এখানে অযথা সময় নষ্ট না করে, বোষ্টন অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পথিমধ্যে রেলগাড়ীতে এক বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। তাঁর পোষাকে আকৃষ্ট হয়েই তিনি তাঁর পরিচয় জানতে ব্যগ্র হয়েছিলেন। যখন তিনি শুনলেন, এই প্রাচ্য দেশীয় সন্ন্যাসী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করতে আগমন করেছেন তখন তিনি কৌতূহলবশতঃ তাঁর নিজের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করলেন, সেই সঙ্গে আশা দিলেন তিনি স্বামিজীর প্রচার

কাজের সুবিধা করে দেবেন। আপাততঃ এ সুযোগ তিনি হাতছাড়া করলেন না। আর যাইহোক, অন্ততঃ প্রতিদিনের হোটেল খরচা এক পাউণ্ড বেঁচে যাবে আর অদ্ভুত পোষাকের জন্য রাস্তায় লোকের বিদ্রূপ এড়িয়ে চলতে পারবেন কিছুদিন!

উঠলেন তাঁর ভবনে। অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। স্থির করলেন : কয়েক মাস চেষ্টা করে যদি আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের সুবিধা করে উঠতে না পারেন তাহলে এখান থেকে লণ্ডনে চলে যাবেন। কোন সুবিধা যদি না হয় দেশে ফিরে গিয়ে শ্রীগুরুর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করবেন।

শিকাগো ধর্ম্মসভায় প্রতিনিধি রূপে গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন, তবুও বিচলিত হলেন না। তিনি বাধা ও বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁর ধর্ম্ম, প্রতিভাত হল অন্তরে। ঐশ্বরিক শক্তি বলে বলীয়ান — আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে চান— শ্রীগুরুর ইচ্ছা কি —কেনই বা টেনে নিয়ে এলেন এখানে।... আদেশ যখন পেয়েছেন, লক্ষ্যের ... বহির্ভূত হতে পারে পথ— উদ্দেশ্য কিন্তু কখন ছাড়া যেতে পারে না!— স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন স্বামিজী।

মহিলাগণের পরামর্শে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করলেন স্বামিজী। সকল সময়ের জন্য তৈরী করালেন কালকোট, গৈরিক পাগড়ী ও আলখেল্লা কেবলমাত্র বক্তৃতাকালে ব্যবহারের জন্য রেখে দিলেন।

ঘটনাচক্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার প্রখ্যাত অধ্যাপক মিঃ জে. এইচ রাইট মহোদয়ের সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় হ'ল। তিনি স্বামিজীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে বললেন, : আপনি শিকাগো মহাসভায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিনিধি রূপে গমন করুণ। তাহলে বেদান্ত প্রচার কার্য্যে অধিকতর সাফল্য লাভ করবেন। স্বামিজী সরলভাবে প্রকৃত অসুবিধা খুলে বললেন। অধ্যাপক আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন : To ask you Swami, for your credentials is like, asking the sun to state its night to shine ! রাইট সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত মহাসভা সংশ্লিষ্ট বন্ধু মি. বনি সাহেবকে একখানি পত্র লিখে স্বামিজীর হাতে দিলেন। তার মধ্যে অন্যকথার সঙ্গে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল : দেখলাম এই অজ্ঞাতনামা —হিন্দুসন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতগুলি এক করলে যা হয় তার চেয়েও বেশী পণ্ডিত।" এই পত্র ও অধ্যাপক প্রদত্ত একখানি রেলওয়ে টিকিট নিয়ে পুনরায় শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করলেন।

যে উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে বোষ্টন থেকে যাত্রা করলেন, শিকাগো রেলওয়ে ষ্টেশনে নেমে তা মিলিয়ে গেল। এই বিরাট সহরে, তিনি কেমন করে ডাক্তার ব্যারেজ সাহেবের অফিস খুঁজে বার করবেন। পথে দু'চাব জনকে জিজ্ঞাসা করলেন বটে, তাঁরা স্বামিজীকে নিগ্রো মনে করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। এমন কি রাত্রে থাকার জন্য হোটেলের সন্ধান নিতে গিয়েও বিফলকাম হলেন। অবশেষে কোথাও কোন আশ্রয় না পেয়ে রেলওয়ে মালগুদামের সামনে পড়ে থাকা প্রকাণ্ড একটি প্যাকিং কেসের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। বাইরে তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। শীতের তীব্রতা, প্যাকিংকেসের মধ্যে ঘন অন্ধকার। দুঃসহ সে শীত। তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মত শীত বস্ত্র সঙ্গে নেই! অসীম উৎকণ্ঠায় রাত কাটিয়ে, সকালে আশা ও উদ্যম নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন। সমস্ত রাত্রি অনাহার, ক্ষুধার তাড়নায় শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, পা আর চলে না। অন্য উপায় না দেখে শেষে খাবারের আশায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লাগলেন। মলিন বসন: যাতনা ক্লিষ্ট মুখ দেখে কারও করুণা হলনা। কেউ তিরস্কার করলো, কেউ বা দরজা থেকে চলে যাবার জন্য বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হল, কেউ বা ঘৃণা প্রকাশ করলো। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ, রাজপথের পাশে বসে পড়লেন। মনের বল তখনও ক্ষুন্ন হয়নি, শ্রীগুরুকে স্মরণ করতে লাগলেন।

সহসা তাঁর সামনে অবস্থিত প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে অপূর্ব্ব এক সুন্দরী মহিলা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, মশায় আপনি কি ধর্ম্ম মহাসভার একজন প্রতিনিধি? স্বামিজী বিস্ময়ে অভিভূত স্বরে সংক্ষেপে নিজ দুঃখের কথা ব্যক্ত করলেন। আরও বললেন তিনি ব্যারেজ সাহেবের অফিসের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন। মহোদয়া মহিলা তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভৃত্যদের তাঁর সেবা করার আদেশ দিলেন। প্রাতঃভোজ শেষ হলে তিনি নিজেই তাঁকে ধর্ম্মসভায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।....

ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাস জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হল। সরু হল দ্বিতীয় অধ্যায়ের। ভদ্র মহিলার নাম মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেইল। অযাচিত মাতৃস্নেহে, তাঁকে তাঁর প্রচার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। শ্রান্ত শরীরে একটু বল ফিরে পাওয়ার পর, সঙ্গে নিয়ে চললেন ধর্ম্ম মহাসভার অফিস। হিন্দু প্রতিনিধি রূপে পরিগৃহীত হলেন। প্রতিনিধি বর্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে অতিথি রূপে অবস্থান করার অবকাশ পেলেন।

●

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যদেশের প্রতিটি ধর্ম্মের প্রতিনিধি যাঁরা নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই সমবেত হয়েছিলেন প্রতিনিধি আবাসে, তাঁরা সকালে অধিবেশনের জন্য নির্ম্মিত অস্থায়ী একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "হলে" উপস্থিত হলেন খুব ধুমধামের সঙ্গে 'শিল্প প্রসাদে'। বলা চলে সর্ব্বজাতি সমন্বয়ের সমাবেশ সেটি। ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, বোম্বাইয়ের নগরকার, বীর চাঁদ গান্ধী, জৈন সমাজের প্রতিনিধি রূপে, এনি বেসান্ট ও আর চক্রবর্ত্তী থিয়জফির প্রতিনিধি রূপে। স্বামিজীকে চিনতেন প্রতাপ মজুমদার। আর চক্রবর্ত্তী স্বামিজীর নাম জানতেন। বড় হল ঘরে প্রকাণ্ড গ্যালারী। ঘেঁসাঘেঁসি বসে ছয়শত হাজার আমেরিকার সুশিক্ষিত নরনারী। প্ল্যাটফর্মের উপর বসে সর্ব্বজাতির পণ্ডিত মণ্ডলী। এঁদের সামনে বক্তৃতা করতে হবে। এর পূর্ব্বে জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন নি স্বামিজী। এই প্রথম। প্রথমে হল সঙ্গীত। এরপর বক্তৃতা। এক একজন প্রতিনিধিকে সভার সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া হল। তারপরে তাঁরা কিছু কিছু বললেন। প্রথমে স্বামিজীর একটু ইতস্ততঃ ভাবে এলো। জিভও শুকিয়ে যেতে লাগলো। তখন তিনি দর্শক। প্রতাপবাবু উঠে ভালই বক্তৃতা দিলেন। তারপর এলেন চক্রবর্ত্তী। তিনি আরও সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। খুব হাততালি পড়তে লাগলো। সকলেই প্রস্তুত করে এনেছেন বক্তব্য। স্বামিজী কোন কিছুই করেন নি। ব্যারোজ মহোদয় পরিচয় করিয়ে দিলেন স্বামিজীর। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম ও গুরুকে স্মরণ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর গৈরিক বসনে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকৃষ্ট হল। আরম্ভ করলেন :

আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী—

দু'মিনিটের তালি ও সাধুবাদে হলঘর ভরে গেল। শুরু করলেন স্বামিজী, হে, আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী, আজ আমাদিগকে, আপনারা হৃদয়ের সহিত যে প্রগাঢ় অভ্যর্থনা করেছেন তার প্রতিদানের জন্য আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। কি বলবো, হৃদয় আমার আনন্দে উচ্ছ্বসিত। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের মুখস্বরূপ হয়ে আপনাদের আমি সাধুবাদ দিচ্ছি। সর্ব্বধর্ম্মের প্রসূতি স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম তার প্রতিনিধি হয়ে আমি আপনাদের ধন্যবাদ প্রদান করছি। পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর মুখ স্বরূপ হয়ে আমি আজ আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই মঞ্চে কতিপয় সুবক্তা, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, অতিদূর দেশনিবাসী জাতিসকলের মধ্য থেকে, যাঁরা আজ এখানে সমাগত হয়েছেন, তাঁরাও যে সর্ব্বত্র সমদর্শনের ভাব ঘোষণা করে মহিমান্বিত হতে পারেন, এটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। যাঁরা এ কথা বললেন, তাঁদের

আমি সাধুবাদ প্রদান করছি। যে ধর্ম্ম, জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ব্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়ে এসেছে, সেই ধর্ম্মভুক্ত বলে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখি, তা নয়, সকল ধর্ম্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে 'ধর্ম্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায়, ইংরেজী এক্সক্লুশন (হেয় বা পরিতাজ্য) শব্দটি কোনমতে অনুবাদিত হতে পারে না, আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত, উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়ে এসেছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। যে বৎসর রোমকদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে য়াহুদীয় জাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়— সেই বৎসর তাদের কিয়দংশ দক্ষিণভারতে আশ্রয় লাভের জন্য আসেন। এই অস্মজাতীয়েরাই, তাঁদের সাদরে হৃদয়ে ধারণ করে ছিলেন। আমি; সেইজন্যও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। জোরোয়াস্তরের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্ঠাংশকে যে ধর্ম্ম, আশ্রয় দান করেছিল এবং আজও পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম তাঁদের প্রতিপালন করছে— আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত। কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, এবং আমি যা বাল্যাবস্থা থেকে আবৃত্তি করে আসছি, আমি সেই শ্লোকার্দ্ধটি আজ আপনাদের কাছে বলি : "রুচিনাং বৈচিত্র্যাদ্বিজু কুটিল নানা পথে জুষাং। নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়মার্মর্ণব ইব।" অর্থাৎ — হে প্রভো, ভিন্ন ভিন্ন রুচিহেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদের— নদীসমূহের সাগর তুল্য, তুমিই একমাত্র গম্য স্থান। বর্ত্তমানের ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহতা ধর্ম্মসমিতি গীতার প্রচারিত সত্যেরই পোষকতা করে চলেছেন। সে মতটি এই— যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" অর্থাৎ যে যেরূপ মত আশ্রয় করে আসুক না কেন আমি তাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করে থাকি। হে অর্জ্জুন! মানুষ সর্ব্বতোভাবে আমা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথই অনুসরণ করে চলে। সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, ও তার ফলস্বরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে আয়ত্ত্ব করে রেখেছে। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা জগতে মহা উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে, কতবার নরশোনিতে সিক্ত করেছে এই ধরনী। সভ্যতারে করেছে নিধন, যাবতীয় জাতিকে ভাসিয়ে দিয়েছে হতাশার সাগরে। এই ভীষণ পৈশাচিক শক্তি যদি জাগ্রত না থাকতো, মানব সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নতির স্তরে উপনীত হতো। আজ তার মৃত্যুকাল উপস্থিত। আমি সর্ব্বোতভাবে আশা করি এই ধর্ম্মসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হল— সেই ঘণ্টাধ্বনিই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মোন্মত্তা, তরবারি অথবা কুর্তকাদি দ্বারা উদ্ঘাটিত যথাবিধ নির্য্যাতন পরম্পরার এবং একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্ববিধ অসদ্ভাবের, সমূলে নিধন সমাচার ঘোষণা করুক।

পরদিন সব খবরের কাগজ জয়গান সুরু। প্রতিটি কাগজের সুর হৃদয়গ্রাহী মর্ম্মস্পর্শী ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের ইতিবৃত্ত! চমৎকার হিন্দুধর্ম্ম প্রতিনিধির বক্তৃতা। সমগ্র আমেরিকার কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিনিধি গৈরিক ভূষণে ভূষিত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ!

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো তাঁর স্বদেশেও। কিন্তু সেদিন কেউ বুঝতে বা চিনতে পারলো না কে এই বীর সন্ন্যাসী— কে এই স্বামী বিবেকানন্দ।.... চির পরিচিত তাঁর গুরুভাইরাও রইলেন অন্ধকারে। সূর্য্য উদিত— আমেরিকায়, রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা তখন লাঞ্ছিত শৃঙ্খলিত তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষ। নিদ্রামোহে তখনও সে সুপ্ত, তখনও নীথর।....

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। শুক্রবার অপরাহ্ন। ধর্ম্ম সমিতির পঞ্চম দ্বিতীয় অধিবেশন। স্ব, স্ব প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মালম্বিগণ নিযুক্ত বাগবিতণ্ডায়— উঠে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ : আপনাদের আমি একট ছোট গল্প বলবো : আরম্ভ করলেন —'এসো আমরা

পরস্পরের নিন্দাবাদ থেকে বিরত হই।'— বলেছেন আমাদের মধ্যেই একজন সুবক্তা। অথচ দেখলাম, আমাদের মধ্যে কত না মতভেদ, আমাকে সত্যই দুঃখ দিয়েছে। সেই গল্পটিই এখানে বলছি— মনে হয় এই এত মতভেদের কারণ কি তা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

একটি ভেক (ব্যাঙ) কোন এক যুগে কূপে বাস করতো। বহুকাল ধরে সে সেখানে বাস করতো। যদিও জন্ম তার এখানেই, প্রতিপালিত সেখানেও, আকার তার ছিল খর্ব্ব। অবশ্য সে সময়ে ক্রমবিকাশবাদীরা সেখানে কেউ ছিলেন না। সেই কূপে চিরকাল বাস করায় সে দৃষ্টিশক্তি বিরহিত হয়েছিল কিনা সে বিষয় জ্ঞাপন করারও কেউ নেই। এই গল্পটি সুবিধার জন্য আমরা ধরে নেবো— ভেকটি চক্ষুষ্মাণ। প্রতিদিন উৎসাহের সঙ্গে কূপের মধ্যে যে সব কীট থাকতো, তা কবলিত করে সে কূপের জল পরিষ্কার রাখতো। এই উৎসাহটা তার এতই উগ্র যে, বর্ত্তমান কালের কীটানুতত্ত্বলিপ্সু পণ্ডিতগণেরও শ্লাঘার বিষয়।... যাই হোক, এইরূপ সে ক্রমে ক্রমে কিছু স্থূল দেহ হয়ে উঠলো। ঘটনাক্রমে একদিন সমুদ্রতীরবাসী কোন এক ভেক সেই কূপে এসে উপস্থিত হল।

কূপমণ্ডুক জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথা থেকে এলে?

উত্তর : সমুদ্র তীর থেকে আসছি।

সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমাদের কূপের মত বড়?

এই বলে কূপমণ্ডুক এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে লাফিয়ে পড়লো।

সাগরতীরের ভেক বললো, ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করলে কিরূপে?

কূপমণ্ডুক একথা শুনে আর একবার লাফ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো : তোমার সমুদ্র কি এত বড়?

সমুদ্রের সঙ্গে কূপের তুলনা করে মূর্খের মত প্রলাপ বকছো কেন ভাই। উত্তর দিল সাগরবাসী 'ভেক'।

ক্রুদ্ধ হল কূপমণ্ডুক। বললো, আমার কূপের মত কিছুই বড় হতেই পারে না। এর চেয়ে বড় কিছু থাকতে পারে না। নিশ্চয় এ মিথ্যাবাদী। একে তাড়িয়ে দাও।

হে ভ্রাতৃগণ এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু, আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসে আছি। আর সেটাই সমগ্র জগত বলে মনে করছি। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী, তাঁর নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসে আছেন ও তাকেই ভাবছেন সমগ্র জগৎ। মুসলমান ধর্ম্মীও আপনার ক্ষুদ্র কূপে বসে আছেন আর ভাবছেন, সেটাই তার সমগ্র জগত। হে আমেরিকাবাসীগণ! আপনারাও যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতগুলোর অবরোধ ভেঙে দেওয়ার জন্য বিশেষ যত্নশীল হয়েছেন, সেজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই! আশা করি, ঈশ্বর ভবিষ্যতে আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনে সহায়তা করবেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর। নবম দিনের অধিবেশন শুরু হল। হলে তিলার্দ্ধ ঠাঁই নেই। উন্মুখ হয়ে বসে সহস্র সহস্র নরনারী.... সভামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। বলতে আরম্ভ করলেন:

বর্ত্তমান কালে প্রচলিত তিনটি ধর্ম্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বেও জগতে বিদ্যমান ছিল। সে ধর্ম্ম হিন্দু, পারসিক ও য়াহুদী। প্রত্যেকেই মহা মহা বিপত্তি পরস্পর সহ্য করে এসেছে। তবুও লুপ্ত হয়নি তারা। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, এসবের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এক মহতী শক্তি। একদিকে য়াহুদিধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্মকে আপন অঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পারায়, নিজেই নিজ সর্ব্ববিজয়িনী নন্দিনী কর্ত্তৃক স্বীয় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হল, আবার অতি অল্পসংখ্যক পারসীক, তাদের সেই মহান ধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই বর্ত্তমান জগতে। আর ভারতে হিন্দুধর্ম্ম — সম্প্রদায়ের পর

সম্প্রদায় উঠে তার বেদোক্ত ধর্ম্মের ভিত্তি বিচলিত করেছে, কিন্তু মহাভূমিকম্পের সময়ে সাগর সলিল যেমন কিছু পিছিয়ে সহস্রগুণ প্রচণ্ড প্রতাপে সম্মুখস্থ সমুদয় পদার্থকে গ্রাস করে ফেলে, ঠিক তেমনি হিন্দুদের জননী স্বরূপ বেদান্ত ধর্ম্ম, বিপ্লবের কোলাহল অবসানে সর্ব্বোতভাবে কবলিত করেছে সেই সব সম্প্রদায়কে। পুষ্টি করেছে আপনার দেহ।

আধুনিক বিজ্ঞানের নতুনতম আবিষ্ক্রিয়া সমূহ, বেদান্তের সেই মহোচ্চভাবের প্রতিধ্বনি। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান থেকে মূর্ত্তি পূজা, তদানুষঙ্গিক পৌরানিক গল্প, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ ও জৈনদের নিরশ্বরবাদ প্রত্যেকটি হিন্দুধর্ম্মে স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ভিন্ন ভিন্ন ও আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী ভাবসমূদয়ের সাধারণ ভিত্তি-মূল কোথায়? কোন সাধারণ কেন্দ্রের আশ্রয় করে এরা অবস্থান করছে?

হিন্দুদের আপ্ত বাক্য বেদ থেকে নিজেদের ধর্ম্মলাভ করেছেন। তাঁরা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলে বিশ্বাস করেন। এই অনাদি ও অনন্ত কথাটা শ্রোতৃমণ্ডলীর হাস্যের বিষয় হতে পারে, কিন্তু 'বেদ' এই শব্দ দ্বারা কোনও পুস্তক বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করে গেছেন, বেদ সেই সত্যসমূহের ভাণ্ডার স্বরূপ। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের পূর্ব্বেও নিজস্ব নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, সমস্ত মনুষ্য সমাজ তা ভুলে গেলেও সেই সকল রীতি সর্ব্বত্রই যেমন বিদ্যমান থাকবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও ঠিক সেইরূপ। আত্মার সঙ্গে আত্মার যে পবিত্র ও সাধু সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সঙ্গে সর্ব্বজন পিতা, পরমাত্মার যে সমুদয় দিব্য ও বিশুদ্ধ সম্বন্ধ, তা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বেও ছিল, মনুষ্য সমাজ তা বিস্মৃত হলেও ঠিক থাকবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম ঋষি। আমরা তাঁদের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী বলে ভক্তি ও মান্য করি। এই সাতিশয় উন্নত ঋষিগণের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ঋষিও ছিলেন। আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী অখণ্ড, অবশ্য আদিও আছে তার। বেদ বলেন, সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞান শাস্ত্রও প্রমাণ করেছেন সৃষ্টি শক্তির সমষ্টি, সর্ব্বকালেই সমান। যদি বল — এমন একসময় ছিল যখন কিছুই ছিল না, জিজ্ঞাস্য— এই সকল শক্তি তখন কোথায় ছিল? কেউ হয়তো বলবেন— ঈশ্বরেই সে সমুদয় অন্তর্নিহিত ছিল। তা হলে ঈশ্বর কখনও সক্রিয় কখনও নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। কিন্তু বিকারশীল পদার্থ মাত্রই মিশ্র পদার্থ। আর মিশ্র পদার্থ মাত্রই বিনাশশীল। তখন ঈশ্বরও বিনাশশীল। ইহা কখনও হতে পারে না। সুতরাং এমন এক সময় ছিল না, যখন কিছুই (অর্থাৎ সৃষ্টি) ছিল না। কাজেই সৃষ্টি অনাদি। উপমা দিয়ে বলা চলে, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, অনাদি ও অনন্তের মতই দুটি সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর নিত্য-মহাশক্তি স্বরূপ সর্ব্ববিষয়ের বিধান কর্ত্তা। প্রলয়সাগর থেকে নিত্যকাল ব্রহ্মাণ্ড সমূহ সৃজন করছেন। কিছুকাল পালন করছেন আবার ভেঙে ফেলছেন। এরূপ নিত্যকালের। হিন্দুসন্তান গুরুর সঙ্গে প্রতিদিন পাঠ করেন 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম কল্পয়াৎ'' অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র সৃজন করলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রও বলছে ঠিক তাই।

আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। যদি চোখ বুজিয়ে আমার সত্ত্বা সম্বন্ধে চিন্তা করি— 'আমি' 'আমি' 'আমি'— তাহলে আমার ভাবের কি উদয় হয়? এই দেহই আমি— এই ভাবই মনে আসে। তাহলে আমি কি জড় না— না জড়ের সমষ্টিভূত দেহস্বরূপ? বেদ বলছেন 'না', আমি দেহমধ্যস্থ 'আত্মা', আমি দেহ নহি। দেহ নষ্ট হবে কিন্তু 'আমি' নষ্ট হবে না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করবে, তখনও আমি বিদ্যমান থাকবো এবং এই দেহ গ্রহণের পূর্ব্বেও ছিলাম আমি। আত্মা কোন পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়নি। কারণ সৃষ্টি শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ। এই সংযোগ ভবিষ্যতে বিয়োগহীন। আত্মা যদি সৃষ্ট হন, তাহলে ইহা

নিশ্চয়ই বিনশ্বর। কাজেকাজেই আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন। কেউ কেউ জন্ম থেকেই সুখভোগ করছে, স্বাস্থ্য ও উৎসাহপূর্ণ মন, কোন কিছুরই অভাব তার নেই। কেউ আবার জন্ম থেকেই দুঃখ ভোগ করছে, কারও হাত পা নেই, কেউ বুদ্ধিহীন, কেউ অতিকষ্টে জীবনতরী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ন্যায়বান ও দয়াবান ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়ে কেউ সুখী আবার কেউ দুঃখী হল কেন? ভগবান কি পক্ষপাতী? যদি বলেন, যারা এ জন্মে দুঃখভোগ করছে, পরজন্মে সুখ ভোগ করবে। তাহলে হল কি? দয়াবান এবং ন্যায়াবানের রাজ্যে কেন একজনও দুঃখ ভোগ করবে? এর দ্বারা অসঙ্গতির কিছু ব্যাখ্যা হল না। শুধু এক শক্তিমান স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কথা উল্লেখ করা হল। অতএব স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়ে জন্মাবার পূর্ব্বে বহুবিধ কারণ ছিল। যাতে সে সুখী না দুঃখী হয়েছে। তার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহই, সেই সমুদয়ের কারণ।

মানুষের দেহ ও মন পিতৃপিতামহাদির দেহ ও মনের সাদৃশ্য লাভ করে থাকে। একথা বললে, এর সমুচিত উত্তর দেওয়া হল না। জীবনস্রোত জড় ও চৈতন্য, দুই ধারায় প্রবাহিত। যদি জড় ও জড়ের বিকার আত্মা, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি কাজ সংসাধিত করে, তাহলে আর স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করার অবশ্যকতা নেই। কিন্তু জড় থেকে যে চৈতন্য শক্তি উদ্ভূত হয়েছে তা কোনমতে প্রমান করার যায় না। সুতরাং এক জড় পদার্থ থেকে সুমদয় সৃষ্টি হয় স্বীকার করতে হলে, এ একমূল চৈতন্য থেকেই, যে সমুদয় সৃষ্টির কাজ নির্ব্বাহ হচ্ছে, এটা স্বীকার করা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত, এমন কি প্রার্থনীয়ও বলা চলে।

একথা অবশ্যই অস্বীকার করা চলে না যে, মানবদেহে পিতৃপিতামহাদির অনেক স্বভাব সংক্রমিত হয়। কিন্তু সেই স্বভাব সর্ব্বোতভাবে দৈহিক, এছাড়াও মানবের ব্যষ্টি আত্মারও বিশেষ বিশেষ ভাব থাকে। যে আত্মা যাদৃশ স্বভাবাপন্ন, সেই আত্মা ঠিক তদৃশ দেহকেই আশ্রয় করে। তার স্বভাব কিন্তু আত্মার ও তৎ স্বভাব ও আবার কোনও পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্যই হয়ে থাকে। যে আত্মা, যে বিষয়ে প্রবল, সেই আত্মা যোগ্যং যোগ্যে ন যুজ্যতে। এই নিয়মানুসারে তদুনোপযোগী দেহে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এটা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কারণ বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে : স্বভাব অভ্যাস থেকে হয়। আর অভ্যাস তার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল। যেহেতু তার পক্ষে বর্ত্তমান জীবনে সেই স্বভাব লাভ করা অসম্ভব সুতরাং তা অবশ্যই পূর্ব্বজন্ম থেকে এসেছে।

স্বীকার করা গেল পূর্ব্বজন্ম আছে। তাহলে পূর্ব্বজন্মের কথা আমাদের মনে থাকে না কেন? বোঝানো সহজ। এই যে আমি কথা বলছি ইংরাজীতে, এটা আমার মাতৃভাষা নয় অথচ এখন আমার মাতৃভাষার একটি অক্ষরও মনে আসছে না, যদি চেষ্টা করি, তাহলে এখনই তা মনের পর্দ্দায় ভেসে উঠবে। এখন বোঝা যাচ্ছে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগে যা থাকে তাই আমাদের বোধগম্য আর আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরাশি সেই সমুদ্র গর্ভে নিহিত থাকে। চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা তা উপরে আনা যেতে পারে। এমন কি পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণজ্ঞানও মনে ভেসে উঠতে পারে। এটাই পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ। কার্য্যক্ষেত্রে যখনই তা মিলিয়ে যায়, তখনই মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ঋষিগণ সমস্তজগতে এই বাক্য ঘোষণা করেছেন স্মৃতিসাগরের গভীরতম প্রদেশে কিরূপে আলোড়িত করতে হয় সেই গূঢ় বিষয় আমরা আবিষ্কৃত করেছি। তাঁদের অনুসরণ কর, সাধনা কর, তোমরাও পূর্ব্বজন্মে সমস্ত কথা মনে করতে পারবে।"

হিন্দুরা আপনাকে আত্মা বলে বিশ্বাস করেন। সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করতে পারে না। আগুন দগ্ধ করতে পারে না। জলে আর্দ্র করা যায় না, বায়ুতে শুকনো করা যায় না। আত্মা একটি বৃত্তস্বরূপ, যার পরিধি অনির্দ্দেশ্য অথচ যার কেন্দ্র শুধু দেহমধ্যে অবস্থিত। সেই কেন্দ্রের দেহ থেকে দেহন্তরে গমনের নামই মৃত্যু। জড়নিয়মের বশীভূত নয় এই আত্মা— নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, স্বভাব ইনি। কারণবশতঃ, জড়ে আবদ্ধ হয়েছেন, আপনাকে জড় বলে মনে করছেন।

যে আত্মা বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও বিমুক্ত, তিনি জড়ের দাসত্ব করছেন কেন? পূর্ণ হয়েও আপনাকে কেন অপূর্ণ মনে করছেন? অনেকে মনে করেন : হিন্দুগণ এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করতে পারবেন না বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কেউ কেউ বা আত্মা ও জীব এই দুয়ের, মধ্যপ্রদেশে, কতকগুলো পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেন। বহুবিধ বৈজ্ঞানিক দীর্ঘকার সংজ্ঞা দ্বারা আখ্যাত করেন। কিন্তু সংজ্ঞা দিয়েই কি মীমাংসা সম্ভবপর? প্রশ্ন, প্রশ্নই রয়ে গেল। যিনি পূর্ণ, তাতে কিরূপে পূর্ণতার অনুমাত্রও লাঘব সম্ভব? যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব তাঁর স্বভাবের অনুমাত্র ব্যতিক্রম হয় কিরূপে?

হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী। তাঁরা বলেন, আমরা জানি না। জানি না কেমন করে পূর্ণ আত্মা আপনাকে অপূর্ণ ও জড়ের নিয়মাধিন বলে মনে করেন। তবে প্রত্যেকেই আপনাকে দেহস্বরূপ বলে মনে করেন। এটাই সর্ব্বতোভাবে সত্য। কেন দেহে আত্মা এসেছেন, তার ব্যাখ্যার চেষ্টা তাঁরা করেন নি।

মানুষের আত্মা অনাদি, অমর ও পূর্ণ। দেহান্তর গমনের নামই মৃত্যু। বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কর্ম্মের ফলস্বরূপ। আত্মা, জন্ম ও মৃত্যুচক্রে ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হচ্ছেন। প্রশ্ন উঠে, প্রচণ্ড বায়ু মুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষদেশ আশ্রয় করে, পরক্ষণেই যেরূপ তরঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্নদেশে গমন করে, আত্মাও কি ক্রমাগত কর্ম্মের একান্ত বশবর্ত্তী হয়ে একবার উর্দ্ধগামী আবার অধোগামী হচ্ছেন? আত্মা কি নিত্য প্রবাহিত, প্রচণ্ড, ভীষণ ও গর্জ্জনশীল কার্য্যকারণ স্রোতে দুর্ব্বল অসহায় অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাড়িত হচ্ছেন? আত্মা কি ক্ষুদ্র কীটের মত নিয়মিত পরিভ্রমণশীল কর্ম্মচক্রে স্থাপিত হয়ে, ওই চক্রের সম্মুখে, যা পাচ্ছেন তাকে পেষণ করে ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হচ্ছেন? পতিশোকে বিধুরা বিধবারা ক্রন্দন শুনছেন না? পিতৃমাতৃবিয়োগে কাতর বালকের দিকেও ফিরে তাকাচ্ছেন না? প্রকৃতির নিয়মই এই। চিত্ত বিহ্বল হয়, তবে কি কোন উপায় নেই? পরিত্রাণের কি পথ নেই? হতাশ হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে করুণ ক্রন্দনধ্বনি উঠলো মানবের। করুণানিধান, বিশ্বপিতার সিংহাসন সমীপে পৌঁছালো সে ক্রন্দন রোল। আবির্ভূত হলেন, আশা ও সান্ত্বনার বাণীরূপে, এক বেদবিত্ত ঋষির হৃদয়ে। ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মহর্ষি, অমনি দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চৈঃস্বরে, জগতে সেই আনন্দের সমাচার ঘোষণা করলেন : 'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যলোকনিবাসী ত্রিদশমণ্ডলী, তোমরা শোন, আমি সেই অনাদি, পুরাতন, মহান পুরুষকে জেনেছি। আদিত্যের মত রং, অজ্ঞান স্পর্শ করতে পারেন না তাঁকে। তাঁকে জানলেই মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবে, মুক্ত হবে, তাছাড়া অন্যপথ আর নেই।

হে ভ্রাতৃগণ। এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই। তোমরা সেই অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলতে অস্বীকার করেন। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পূর্ণ পবিত্র। তোমরা এই মর্ত্তের দেবতা। তোমরা পাপী? অসম্ভব। মানবকে, পাপী বলাই মহাপাপ। বিশুদ্ধ মানবাত্মায়, এই মিথ্যা কলঙ্কারোপ মাত্র। হে ভ্রাতৃগণ, তোমারা সিংহস্বরূপ হয়ে, নিজেদের মেষতুল্য বোধ কর কেন? এই ভ্রমজ্ঞানকে দূর করে দাও। তোমরা জরামরণরহিত, মুক্ত ও নিত্যানন্দময় আত্মা। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও, জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।

বেদ বলেন : সৃষ্টি ব্যাপার কতকগুলি, ভয়াবহ, নির্দ্দয় ও নির্ম্মম নিয়মাবলীর প্রবাহ স্বরূপ নয় বা অনন্ত কার্য্যকরণের বন্ধন নয়, অথচ এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে, প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে এক মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন, যাঁর আদেশে বায়ু প্রবাহিত হয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, মেঘ বারি বর্ষন করে, মৃত্যু জগতী তলে পরিভ্রমণ করে।

সেই পুরুষের স্বরূপ কি? তিনি সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্ব্ব শক্তিমান, সকলের উপরেই তাঁর পূর্ণ দয়া। বেদবিৎ ঋষিগণ গান করছেন: তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পরম প্রেমাস্পদ, তুমি সমস্ত শক্তির মূলাধার, তুমি অগণন ভূষণের ভার ধারণ করে আছ। হে প্রভোঃ, এই ক্ষুদ্রজীবনের ভার গ্রহণ করার শক্তি আমায় দাও। আমরা তাঁকে কি দিয়ে পূজা করবো? প্রীতি দিয়ে, প্রেমাষ্পদরূপে, ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয়বস্তু হতে প্রিয়তমরূপে। শুদ্ধ প্রেমের শিক্ষাই বেদের শিক্ষা।

হিন্দুগণ ভুভারহারী হরির অবতার বলে, যাঁকে বিশ্বাস করেন সেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমকে কিরূপে পূর্ণতায় এনেছিলেন ও সে সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়েছেন? পদ্মপত্রে জলে থাকলেও তাতে যেমন জল লাগে না, মানুষ এই সংসারে সেইরূপ ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পন করে, কর্ম্মে হস্ত বিনিয়োগ করে নির্লিপ্তভাবে থাকবেন, শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়েছেন। ইহ ও পরকালে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা মন্দ নয়, কিন্তু তাঁকে ভালবাসতে হয় বলেই ভালবাসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁর কাছে প্রার্থনা করা উচিত, হে ভগবান, আমি তোমার কাছে ধন, সন্তান বা বিদ্যা কিছুই চাই না, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত শত নরকেও যাবো, কিন্তু হে প্রভোঃ, এই কর যেন সকল অবস্থাতেই পুরস্কার প্রত্যাশা না করে নিঃস্বার্থভাবে তোমায় ভালবাসতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য স্বরূপ ছিলেন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির। সিংহাসনচ্যুত হয়ে যখন তিনি রাণী সহ হিমালয় পাদবর্ত্তী বনপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, একদিন রানী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাথ, আপনি এতদূর ধার্ম্মিক যে, লোক আপনাকে 'ধর্ম্মরাজ' আখ্যা দিয়েছে, কিন্তু আপনি এরূপ হয়েও এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছেন কেন? উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির, প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চেয়ে দেখ, আহা! কি সুন্দর ও মহান! আমি এই হিমালয়কে বড় ভালবাসি। যদিও পর্ব্বত আমাকে কিছুই উপহার দেয় না, তবুও সুন্দর ও মহান বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব বলে আমি, আপন করে ভালবাসি এই পর্ব্বতকে। ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্যই ভালবাসি, নিখিল সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের মূল যিনি। তিনিই ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র। তাঁকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, সুতরাং ভালবাসি। আমি তাঁর কাছে কিছুই চাই না। তাঁর যথায় ইচ্ছা হয়, তিনি আমায় তথায় রাখুন, সর্ব্ব অবস্থাতেই আমি তাঁকে ভালবাসবো। আমি ভালবাসার বিনিময় চাই না, আমি ধর্ম্ম বণিক নই।

বেদ বলেন, আত্মা ব্রহ্ম স্বরূপ, কেবলমাত্র পঞ্চভুতে বদ্ধ হয়ে আছেন। যখন এই বন্ধন থেকে মুক্ত হন তিনি, তখনই প্রাপ্ত হন পূর্ণত্ব। এই অবস্থার নাম মুক্তি অর্থাৎ অপূর্ণতা, জন্ম, মৃত্যু, আধি ব্যাধি, থেকে নিষ্কৃতি। ঈশ্বরের কৃপা হলেই এই বন্ধন মোচন হতে পারে। আর পবিত্র স্বভাব লোকের উপরেই তাঁর কৃপা হয়। এই পবিত্রতাই, তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্তির উপায়। যখন তাঁর কৃপা হয়, তখন শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন। সেই নির্ম্মল বিশুদ্ধ মানুষই জীবনে তাঁর দর্শন লাভ করেন। তখনই, কেবল তখনই, তাঁর সমুদয় কুটিলতা নাশ পায়, সন্দেহ বিদূরিত হয়। তিনি, কর্ম্মফলের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন। হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষ্য হল এই, আসল ভাব হল এই। হিন্দুগণ শুধু মত বা শাস্ত্র বিচার নিয়ে মেতে থাকতে চান না। যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা যা কিছু থাকে, তাঁকে, তাঁরা সাক্ষাৎ করতে চান। কারণ, দর্শন না করলে, সন্দেহ দূর হয় না। আমি আত্মাকে দর্শন করেছি, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছি, এটাই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধুমণ্ডলীর আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সবোর্বৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ। এরূপ না হলে কোন মানুষ পূর্ণ হতে পারে না। অপরোক্ষানুভূতিই এর মূল মন্ত্র, শুধু বিশ্বাস করা নয় জীবনে পরিণত করা।

ক্রমাগত অধ্যাবসায় ও যত্ন দ্বারা পূর্ণতালাভ করা, দেবতা হওয়া, ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁর দর্শন লাভ করাই হিন্দুদের সমুদয় সাধন প্রণালীর লক্ষ্য। আর এমনি করে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করে, তাঁকে দর্শন করে, সর্ব্বলোক পিতা ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়াই হিন্দুধর্ম্ম।

পূর্ণ হলে মানুষ কিরূপ হয়? নিত্য আনন্দ, তিনি উপভোগ করেন। সমুদয় লাভ অপেক্ষা পরম লাভস্বরূপ, সেই পরমানন্দ ধাম ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়ে পরমানন্দের অধিকারী হন তিনি। সমগ্র হিন্দুমগুলীই এ বিষয়ে একমত। সকল সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে একই বাক্য। তুরীয় যা নির্ব্বিকল্প অবস্থার নাম পূর্ণাবস্থা। সেই নির্ব্বিকল্পাবস্থা, একমাত্র অদ্বিতীয়, গুণাতীত। সেখানে ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই যখন, কোন আত্মা সেই নির্ব্বিকল্পাবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হন। দ্বৈতজ্ঞান পরিশূন্য হওয়ায় সেই আত্মায়, আপনিই সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হয়ে যান। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত তাঁদের পুস্তকে আত্মার এই ব্যক্তিত্বনাশকে জড়াবস্থা বলে নির্দ্দেশ করেছেন। সেখানে তাঁদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ যিনি কখনও আঘাত, বেদনা, উপলব্ধি করেন নি, তিনি অন্যের ক্ষতচিহ্ন দেখে পরিহাস করবেন।

আমি বলছি যে, এই মহোচ্চ অবস্থা, জড়াবস্থা নয়। যখন আমি এই একটি ক্ষুদ্র দেহে আত্মজ্ঞান স্থাপন করে, সুখবোধ করেতে পারছি, তখন যদি আমি দুইটি দেহে এরূপ করতাম, তাহলে আরও সুখবোধ করতে পারতাম। এমনি তিনটি, চারটি, পাঁচটি ইত্যাদি দেহ সংখ্যা যতই বাড়বে, আমার সুখও সেই অনুপাতে তত অধিক পরিমাণে বাড়তে থাকবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বেই আমার আত্মবোধ হবে তখনই আমি আনন্দের পরকাষ্ঠায় উপনীত হবো। অতএব, উক্ত বিশ্বদেহ লাভ করতে গেলে, এই সামান্য ক্ষুদ্রদেহ অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। আমি যখন প্রাণময় হয়ে যাবো, তখনই মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাবো। যখন জ্ঞানময় হয়ে যাবো, তখনই আমি অজ্ঞানের হস্ত অতিক্রম করবো। বিজ্ঞানও অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রমাণ করেছেন যে, আমরা যে দেহকে, প্রত্যক্ষ ও একাভাবাপন্ন বলে মনে করেছি, বাস্তবিক তা নয়। সে বোধ, ভ্রম মাত্র। কারণ, এই নিরবিচ্ছিন্ন জড় সমুদ্র, তরঙ্গরাজির মত, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই নূতন রূপ ধারণ করছে। সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ কখনও পরিবর্ত্তনশীল বা ভ্রমণাত্মক নয় বলে সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং তজ্জন্যই আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা। এই অদ্বৈত জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞান একমূল বস্তু বা শক্তির অন্বেষণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যখনই কোনবিজ্ঞান তা আবিষ্কার করবে, তখনই সে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হবে। যেমন, রসায়ণ শাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যা থেকে অন্য সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হতে পারে, চরম উন্নতি লাভ তখনই সম্ভব। পদার্থবিদ্যা যদি এমন এক শক্তির তত্ত্ব জানতে পারে, তা থেকে অন্যান্য শক্তি উদ্ভূত হচ্ছে, তা হলেই তা সম্পূর্ণ। আর ধর্ম্ম বিজ্ঞানও যখন সেই একমাত্র মূল কারণকে দেখতে পায়, যিনি এই মর্ত্তলোকে একমাত্র অমৃতস্বরূপ, যিনি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতের একমাত্র অচল, অটল, ভিত্তি মূল, যিনি একমাত্র পরমাত্মা,— অন্যান্য আত্মা যার প্রতিবিম্ব স্বরূপ, তখনই তা পরিপূর্ণ। এইরূপেই বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে অদ্বৈতবাদে উপনীত হলে ধর্ম্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হতে পারে না।

বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও চরম এই। সকল বিজ্ঞানকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'সৃষ্টি' আখ্যা দিতে চায় না। তারা বলেন, ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন আকার ধারণ করে জগৎ প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব রূপ বিকাশ করছে মাত্র। হিন্দু সন্তান চিরকাল এইভাব হৃদয় পোষণ করে এসেছেন। বৈজ্ঞানিকগণও নানাবিধ প্রমানাদি সহায়ে সেই মতের পোষকতা করতে সুরু করেছেন।

ভারতবর্ষে, বহু ঈশ্বরবাদ নেই। প্রতি দেবালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে যদি কেউ কান পেতে দাঁড়ান, শুনবেন পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমনকি সর্ব্বব্যাপিত্ব পর্যন্ত আরোপ করছেন।

একে বহু ঈশ্বরবাদ বা কোন বিশেষের প্রাধান্যবাদ প্রভৃতি কোন বাদই বলা চলে না। গোলাপকে যে কোন নাম দাও না কেন, তাতে তার গন্ধের হানি হবে না। কোন একটা নাম দিলেই যে জিনিষটা ঠিক বুঝানো হল তাও বলা চলে না।

ফল দ্বারা বৃক্ষের গুণাগুণ জানা যায়। যখন আমি দেখি, যাদের পৌত্তলিক বলা হয়, তাদের মধ্যেও এমন লোক আছেন তাঁদের তুল্য চরিত্রবান আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ ও প্রেমিক কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন এই প্রশ্ন মনে আপনা আপনি জাগে, পাপ হতে কখন কি পবিত্রতা জন্মাতে পারে?

কুসংস্কার মানুষের শত্রু। কিন্তু সংকীর্ণতা তার চেয়েও ঘোরতর শত্রু। ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী তবে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ কেন এক স্বতন্ত্র স্থলে আরাধনা করতে যান? কেন তাঁরা ক্রুশকে এত পবিত্র বলেন? প্রার্থনার সময় কেন তাঁরা উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন? ক্যাথিলিক সম্প্রদায়ভুক্ত দিগের ধর্ম্ম মন্দিরে এত মূর্ত্তি স্থান পেয়েছে কেন? প্রার্থনাকালে প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ীদের হৃদয়ে এত ভাবময়ী মূর্ত্তির বিকাশ হয় কেন? হে ভ্রাতৃগণ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করে জীবন ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, চিন্তাকালে মূর্ত্তিবিশেষের সাহায্য না নেওয়াও আমাদের পক্ষে সেই রূপ অসম্ভব। স্মৃতির উদ্দীপক ভাব পরস্পরানুক্রমে জড়মূর্ত্তি দর্শনে, মানসিক ভাব বিশেষের উদ্দীপন হয় অথবা মনে মূর্ত্তিবিশেষেরও আবির্ভাব হয়ে থাকে। জগতে প্রায় সকল মানুষই সর্ব্বব্যাপী শব্দের যথাযথ ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? যদি স্বীকার না কর, 'সর্ব্বব্যাপী' শব্দটি আবৃত্তি করলে, আমাদের মনে বড়জোর বিস্তৃত আকাশ বা এই বিশাল ভূমি খণ্ডের জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই উদয় হয় না।

মানুষের স্বভাবই এই যে, তার অনন্তের ভাবোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশ বা অপার সমুদ্র আপনাআপনি মনে এসে পড়ে। কেউ কেউ আবার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও পবিত্রভাব স্ব স্ব স্বভাব অনুসারে গির্জ্জাঘর, মসজিদ বা ক্রুশের সঙ্গে সম্মিলিত করে রাখেন। হিন্দুরাও পবিত্রতা, নিত্যত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলোকে নানা দেববিগ্রহে সম্মিলিত করে রেখেছেন। ধর্ম্ম, কতিপয় মতের পোষকতা করা আর লোকের উপকার করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু হিন্দুরা অপরোক্ষানুভব ধর্ম্মকেই প্রধান ও চরম লক্ষ্যরূপ ধরে রেখেছেন। মানুষকে ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হতে হয়। কাজে কাজেই দেববিগ্রহই হোক, দেবালয়ই হোক, বা ধর্ম্মশাস্ত্রই হোক, এইসব তার ধর্ম্মজীবনের বাল্যাবস্থার সহকারী মাত্র। এসকল তাঁর চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়, তাঁকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। কোথাও থামলে চলবে না। বাহ্যপূজা, মূর্ত্তিপূজা— প্রথমাবস্থার কাজ, পরে কিছু উন্নত হলে মানসিক প্রার্থনা, কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চরম ব্যবস্থা। হিন্দুশাস্ত্র একথাই প্রকাশ করেছেন। যে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি, কিছুকাল পূর্ব্ব করজোড়ে জানু পেতে দেববিগ্রহের সামনে পূজায় বসে থাকেন, জ্ঞানলাভের পর তিনি বলেছেন, সূর্য্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারেন না, চন্দ্র, তারা, আর সমুদয় বিদ্যুৎও তাঁর প্রকাশক নয়। সুতরাং অগ্নি তাঁকে কিরূপে প্রকাশ করবেন? এঁরাই তো তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকেন।

এখন তাঁর বাহ্যপূজা ত্যাগ হয়ে গেছে বলে, ভিন্ন ধর্ম্মীদের মত বিগ্রহ সেবাকে তিনি পাপজনক বলে ঘৃণা করেন না। তিনি এই পথকে তাঁর জীবনের এক অত্যাবশ্যক অবস্থা বলে বুঝে থাকেন। বাল্য, যৌবনোদির জন্মদাতা। বৃদ্ধ যদি বাল্য ও যৌবনাবস্থাকে পাপের অবস্থা বলে ঘৃণা করেন, তা হলে কি তিনি হাস্যস্পদ হবেন না? বিগ্রহসেবা যে হিন্দু ধর্ম্মে সকলের পক্ষেই বিধিবদ্ধ এ কথাও ঠিক নয়। যদি কেউ বিগ্রহ সাহায্যে সহজে আপনার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন, তাকি পাপ বলে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত? এই অবস্থা অতিক্রম করে গেলেও তাঁর পক্ষে এই পথকে ভ্রমাত্মক বলে নির্দেশ করা সঙ্গত নয়। হিন্দু বলেন, মানুষ ভ্রম থেকে সত্য গমন করছে, না, সত্য থেকে সত্য, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে গমন করেছে মাত্র। হিন্দুর পক্ষে ক্ষুদ্র অজ্ঞানীদের

ধর্ম্ম থেকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত যাবতীয় ধর্ম্মই অনাদি, পরব্রহ্ম উপলব্ধির সাধনা বা সোপান স্বরূপ। জন্ম ও অবস্থাভেদে যাঁর পক্ষে যা উপোযোগী, তিনি সেইটিকে আশ্রয় করে অপরটিতে উত্থিত হবেন। অতএব প্রত্যেক মানব-আত্মাই ঈগল পাখীর সন্তানের মত ক্রমে ক্রমে অধিকতর উচ্চে উঠতে থাকে। এমনি করে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলশালী হতে হতে পরিশেষে, সেই মহান সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হয়।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই, প্রকৃতির নিয়ম। হিন্দুগণ বিশেষরূপে তা উপলব্ধি করেছেন। অন্য ধর্ম্ম, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতবাদ লিপিবদ্ধ করে সমগ্র সমাজকে বলপূর্ব্বক মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেন— একমাপের জামা রেখে সকলকেই পরতে হুকুম করেন। কারো জামা গায়ে না লাগলেই, থাকতে হয় খালি গায়ে। আর হিন্দুগণ বুঝেছেন, সাপেক্ষকে আশ্রয় করেই কেবল নিরপেক্ষ তত্ত্বের ধারণা, উপলব্ধি বা প্রকাশ সম্ভব। তাঁদের মত হল : হিন্দুর দেববিগ্রহ, খ্রীষ্টীয়ানদের ক্রুশ, মুসলমানদের চন্দ্রকলা, আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়স্বরূপ। তাঁরা বলেন না উক্ত প্রকার আশ্রয় সকলের পক্ষেই আবশ্যক। তবে অধিকাংশ লোকই যে, এতে পরম উপকার লাভ করতে পারেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাঁদের আবশ্যকতা নেই, তাঁদের অপরকে এটা অন্যায়, একথা বলার কিছুমাত্র অধিকার নেই। ভারতবর্ষে, মূর্ত্তিপূজা, একটা ভয়ানক ব্যাপার নয়। দুষ্কর্মের অনুশীলনের প্রশ্রয়ও দেয় না। বরং দুর্ব্বল অধিবাসীদের ধর্ম্মের উচ্চভাব ধারণা করতে সক্ষম করে। হিন্দুদের অবশ্য অনেক দোষ আছে। তাদের আত্মদেহ পীড়নেই, নর-নারীর কেহ কেহ, ধর্ম্মোন্মাদ হয়ে অগ্নিকণ্ডে দেহপাত করেন বটে, কিন্তু কখনও বিধর্ম্মিবিনাশের জন্য আগুন জ্বলে না। যদি একে তাদের দুর্ব্বলতা বলো, সে দোষ হিন্দুধর্ম্মের নয়। খ্রীষ্টীয়গণ, ডাকিনী বলে যে, কত শত স্ত্রীলোককে পুড়িয়ে মেরেছে, তা কি খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ না তাঁদের নিজেদের?

হিন্দুর পক্ষে, সমস্ত ধর্ম্মজগতটা, নানা রুচিবিশিষ্ট নরনারীর, নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে সেই একমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির পথে, অগ্রসর হওয়ার উপায় ছাড়া অন্যকিছু নয়। প্রত্যেক ধর্ম্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষকে ব্রহ্মে পরিণত করতে নিযুক্ত এবং সেই এক ঈশ্বরই সকল ধর্ম্মপথ প্রকাশ করেছেন। তবে ধর্ম্মগুলি, এত পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কেন? হিন্দুরা বলেন, আপাতদৃষ্টিতে ওরূপ বোধ হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। ভিন্নাবস্থাপন্ন বিভিন্ন প্রকৃতি লোকের উপযোগী হবার জন্য এক সত্যই, পরস্পর বিরুদ্ধভাব ধারণ করে।

একই আলোক, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্য দিয়ে এসেছে বলে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, প্রত্যেক স্বভাবের উপযোগী হবে বলে, এই সকল বিভিন্নতার প্রয়োজন আছে। অথচ সকলের অন্তঃস্থলে, প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই, সেই এক সত্য রাজত্ব করছে। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ঈশ্বর বলেছেন, মুণিগণ যেরূপ সূত্রকে আশ্রয় করে অবস্থান করে, সমস্ত ধর্ম্মই তেমনি আমাকে আশ্রয় করে আছে। যা কিছু অতিশয় প্রভাবশালী বা অতি সুন্দর ও পবিত্র, তা আমার শক্তিসম্ভূত বলে জানবে।

এ শিক্ষার ফল কি? আমি সাহস করে বলছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে—হিন্দুই একমাত্র মুক্তির অধিকারী আর কেউ নয়, এভাবে কেউ দেখাতে পারবে না। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলেছেন— ভিন্নজাতীয় ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখতে পাই। প্রশ্ন উঠতে পারে : সর্ব্বতোভাবে আস্তিক্যবুদ্ধি বিশিষ্ট হিন্দুগণ, অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত, কিরূপে বিশ্বাস করতে পাবেন? বৌদ্ধ ও জৈনেরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না সত্য, কিন্তু মানুষের ভেতর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব আনয়ন করাই তাঁদের ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। ওঁরা স্বতন্ত্র ভগবান মানুন বা না মানুন, আপনাকে দেবতা করাই ওঁদের মূল উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্যও তাই। তাঁরা জগৎপিতা জগদীশ্বরকে দেখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁর পুত্র স্বরূপ, আদর্শ মানুষ বুদ্ধদেব বা জিনকে দেখেছেন। পুত্রকে দেখলেই পিতাকে দেখা হয়।

হিন্দুগণ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে, অনেক বিষয়ে হয়তো সফলকাম হতে পারেন নি। কিন্তু যদি কখনও এক সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, তা কখনও দেশ কাল দ্বারা পরিছিন্ন হবে না। যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ দান করবে, সে তদ্রুপ অনন্ত হবে, সেই ধর্ম্ম-সূর্য্য, কৃষ্ণভক্ত বা খ্রীষ্টভক্ত, সাধু, বা অসাধু সকলের ওপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করবে। সে ধর্ম্ম, শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম বা খ্রীষ্টানধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম হবে না। সকলের সমষ্টি স্বরূপ হবে, অথচ তাতে উন্নতির অনন্তপথ মুক্ত থাকবে। সে ধর্ম্ম, এতদূর সার্ব্বভৌম হবে যে, তা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে, যাদের বুদ্ধি পশুতুল্য বললে অত্যুক্তি হয় না, এরূপ মানুষ থেকে যাঁরা স্ব স্ব হৃদয় মনের উৎকৃষ্ট গুণরারশি দ্বারা সমস্ত মানবজাতির ওপর স্থান পেয়েছেন, সমাজ যাঁদের সাধারণ মানুষ বলে না, দেবতার মত পূজা করে থাকেন, সেই সমুদয় নরপুঙ্গগণ পর্য্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করবে। সেই ধর্ম্ম এরূপ হবে, যাতে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবস্বভাব বলে স্বীকার করবে। তার সমুদয় শক্তি, সমস্ত মানবজাতির স্ব স্ব দেবস্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করবার জন্য নিযুক্ত থাকবে।

এরূপ সার্ব্বভৌম ধর্ম্মদান কর, সমস্ত জাতিই তোমার অনুবর্ত্তী হবে। অশোকের ধর্ম্মসভা কেবল মাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য হয়েছিল। আকবরের ধর্ম্মসভায় যদিও সকল ধর্ম্মের স্থান ছিল কিন্তু একটি ক্ষুদ্র গৃহেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ধর্ম্মেই ঈশ্বর আছে— সমস্ত জগতে ঘোষনা করার ভার আমেরিকার জন্যই ছিল।

যিনি হিন্দুদিগের ব্রহ্ম, পারসী দিগের আহুরমজদা, বৌদ্ধ দিগের বুদ্ধ, মুসলমানদিগের আল্লা, য়াহুদীদিগের জিহোবা, খ্রীষ্টিয়ানদিগের স্বর্গস্থ পিতা। তিনি আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করার শক্তি প্রদান করুণ। পূর্ব্বে গগনে নক্ষত্র উদিত হল, কখনও উজ্জ্বল, কখনও হীনপ্রভ হয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে গমন করলো। ক্রমে সমস্ত জগৎ প্রদক্ষিণ করে সহস্রগুণ উজ্জ্বল ভাবে পুনরায় পূর্ব্বগগনে উদিত হচ্ছে। স্বাধীনতার মাতৃভূমি দেবী কলম্বিয়া, তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোনিতে নিজ হস্তকে কলঙ্কিত কর নাই। প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, আপনি সহজে ধনশালিনী হওয়ার চেষ্টাও পাও নাই। সুতরাং তুমি সভ্য জগতের পুরোভাগে গমন করে, শান্তি পতাকা ওড়াবার অধিকারিনী।

২০শে সেপ্টেম্বর বুধবার। অধিবেশনের দশম দিন। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, : খ্রীষ্টীয়গণের সর্ব্বদাই সৎসমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত এবং আমার বোধ হয় যে, যদি আমি তোমাদের কোনও ভ্রম প্রমাদ দেখিয়ে দিই, তোমরা তাতে কিছু মনঃক্ষুন্ন হবে না। হে খ্রীষ্টিয়গণ, তোমরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করার জন্য তাদের কাছে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাতে ব্যস্ত, কিন্তু বল দেখি, অনাহারের হাত থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য কোনরূপ যত্ন কর না কেন? ভারতবর্ষের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময়, সহস্র হিন্দু ক্ষুধায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কিন্তু হে খ্রীষ্টিয়গণ, তোমরা সে বিষয়ে কোন মনোযোগ কর না! তোমরা সমুদয় ভারতবর্ষে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ব্যস্ত কিন্তু ভারতবাসীদের ধর্ম্ম, প্রচুর পরিমাণে আছে। তারা শুষ্ক কণ্ঠে, কেবলমাত্র অন্নের জন্য লালায়িত হয়ে রয়েছে। তারা অন্ন চাইছে, তোমরা তাদের প্রস্তর খণ্ড দিচ্ছো। ক্ষুধার্ত্ত লোকেদের ধর্ম্মের কথা বলা বা তাদের দর্শন শাস্ত্র বোঝানোর চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র! ভারতবর্ষে যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারক পারিশ্রমিক নিয়ে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহলে তাকে জাতিচ্যুত ও সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত হতে হয়। আমি আমার গ্রাসাচ্ছাদনহীন স্বদেশীয়গণের জন্য তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানমণ্ডলীর কাছে, পৌত্তলিকদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করছি....

২২শে সেপ্টেম্বর। শুক্রবার। দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্ম্মের বিষয় বললেন। কৌতূহলী নরনারীর ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করলেন। তবুও শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিসাধন হল না। তাঁর সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করলেন। তিনিও স্বীকৃত হলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর। ষোড়শ দিবসের অধিবেশন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন : সভাপতি মহাশয়! ভ্রাতৃমণ্ডলী ও উৎসাহদাতৃগণ, আপনারা সকলেই শুনেছেন আমি বৌদ্ধ নই। কিন্তু আমি বৌদ্ধ বললেও দোষ হয় না। চীন, জাপান, ও সিংহল সেই লোকগুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করতে পারেন, কিন্তু ভারত তাঁকে ঈশ্বরাবতার বলে পূজা করেন। আপনারা ইতিপূর্ব্বে শুনেছেন আমি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করতে প্রস্তুত হয়েছি। কিন্তু তার অর্থ দোষ দেখানো নয়। যাঁকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে পূজা করি, তাঁর দোষ দেখানোর অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে সম্যক বুঝতে পারেন নি। য়াহুদী ধর্ম্মের সঙ্গে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দু ধর্ম্মের অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় সেই সম্বন্ধ। যীশুখ্রীষ্ট য়াহুদী জাতীয় ও শাক্য মুণি হিন্দু জাতীয় ছিলেন। প্রভেদ এই যে, য়াহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করলেন। এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করলেন। হিন্দুগণ কিন্তু শাক্যমুণিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়ে এখনও তাঁর পূজা করে থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধদেবের যথার্থ শিক্ষার পার্থক্য আমরা প্রধানতঃ এই দেখাতে চাই যে, শাক্যমুণি নতুন মত প্রচার করতে আসেন নি। যীশুর মত তিনিও পূর্ণ করতে এসেছিলেন, ধ্বংস করতে আসেননি। প্রভেদ এইটুকু যে, প্রাচীন য়াহুদীগণ নোতুন ধর্ম্মপুস্তককে, প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু এদিকে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণই, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মস্থ সত্য সমূহের পরিণতি তা বুঝতে পারেন নি। আমরা পুনর্ব্বার বলছি, শাক্যমুনি পূর্ণ করতে এসেছিলেন ধ্বংস করতে নয়। হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি, স্বাভাবিক বিকাশ হলে যা হয় তিনি তাই দেখিয়ে গেছেন।

হিন্দুধর্ম্ম দুটো ভাগ। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করে থাকেন। জ্ঞানকাণ্ডে জাতিভেদ নেই! অতি উচ্চবর্ণের লোকের সন্ন্যাসে যেরূপ অধিকার, অতি হীনবর্ণের লোকেরও সেইরূপ অধিকার— সন্ন্যাসী হলে উভয়েই সমান। যথার্থ ধর্ম্মে জাতিভেদ নেই। জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে হয়ে থাকে। শাক্যমুণি নিজে সন্ন্যাসী ছিলেন, বেদে যে সমুদয় সত্য সুযুপ্ত ছিল, তাঁর উদার হৃদয় সেই সমুদয় সত্যকে পৃথিবীর যাবতীয় জনসাধারণের গোচর করে দিয়েছিল। জগতে কার্য্যতঃ ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে তিনিই সকলের আদি গুরু, তিনিই প্রথমে অন্য ধর্ম্ম থেকে স্বীয় ধর্ম্মে বহুলোক আনয়ন করে, লোকদিগকে ধর্ম্ম থেকে ধর্ম্মান্তরে আনার পথ দেখিয়েছিলেন।

সকলের প্রতি, বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি, অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁর গৌরব প্রতিষ্ঠিত। কতিপয় ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। যে সময়ে বুদ্ধ স্বীয় মত প্রচার করতেন, সে সময়ে সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষে কথিত হত না। সে সময়ে সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতের পুস্তকের ভাষা। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য, তাঁর উপদেশ সকলকে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে চাইলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, আমি দরিদ্রের জন্য ও জনসাধারণের জন্য এসেছি, আমি চলতি ভাষায় উপদেশ দেবো। আজ পর্য্যন্তও তাঁর অধিকাংশ উপদোবলী সেই সময়কার চলতি ভাষায় লিখিত।

দর্শনশাস্ত্র যত উচ্চ আসন গ্রহণ করুক ও যাই বলুক না কেন, জতদিন জগতে মৃত্যু বলে কোন ব্যাপার থাকবে, যতদিন মানব হৃদয়ে দুর্ব্বলতা বলে কোন একভাব থাকবে, যতদিন মানব স্বীয় দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল থেকে তার রোদন ধ্বনি উত্থিত হবে, ততদিন

ঈশ্বরেও বিশ্বাস তার থাকবে। দর্শন শাস্ত্রের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন অচলের ওপর বজ্রবেগে আক্রমণ করলেন কিন্তু তার কিছুই করতে পারলেন না। অপর দিক দিয়ে দেখলে, সমুদয় নরনারী যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাদরে আশ্রয় করে থাকেন, সেই সনাতন পুরুষকে সমগ্রজাতির কাছ থেকে অপহরণ করলেন। ফলে, ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্মের মৃত্যুই স্বাভাবিক হয়েছিল এবং বর্ত্তমান কালে সেই বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একটিও পুরুষ বা স্ত্রী নেই, যিনি আপনাকে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, এঘটনায় হিন্দুধর্ম্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সেই সমাজ সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্ব্বসাধারণের ভেতর যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছিল, যা ভারতবর্ষীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান করেছিল যে, কোন গ্রীসদেশীয় পুরাতত্ত্ব লেখক তদানীন্তন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে লিখবার সময় বলেছিলেন কোনও হিন্দু মিথ্যা কহেন না, কোন হিন্দু রমনী অসতী নহেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিরোধানে হিন্দুগণ এগুলি হারালেন।

সভামঞ্চে উপবিষ্ট বৌদ্ধগণের দিকে ফিরে বললেন স্বামিজী : হে বৌদ্ধগণ! তোমাদের পরিত্যাগ করে আমরা উন্নত হতে পারি না আর আমাদের ছেড়ে তোমরাও উন্নত হতে পারো না। অতএব নিশ্চয় জেনো আমাদের পরস্পরের অসম্মিলেন স্পষ্টই দেখিয়ে দিচ্ছে, তোমরা ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করে, দৃঢ়তা লাভ করতে পার না, আমরাও তোমাদের ন্যায় উচ্চ হৃদয় না পেলে উন্নত হতে পারি না।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। সেই হেতু আজ ভারতবর্ষ ত্রিংসাৎকোটি ভিক্ষুকের অবাসভূমিতে পরিণত। আর সহস্র বছর ধরে তারা বিজাতীয় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অতএব এসো, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব্ব ধী শক্তির সঙ্গে লোকগুরু বুদ্ধের উচ্চ হৃদয়, মহান আত্মা ও অসাধারণ লোকহিতকারিতা শক্তির সম্মিলন করিয়ে দিই।

২৭ সেপ্টেম্বর। সপ্তদশ দিবস ও শেষ অধিবেশন। স্বামিজী মহাসভা ও শ্রোতৃবৃন্দদের সম্বোধন করে বললেন : জগতে সর্ব্ব-ধর্ম্ম মহাসমিতির সম্ভবপরতা আজ সর্ব্বতোভাবে সত্য নিদ্ধারিত হল। যাঁরা এই মহাসভা গঠনের জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করেছিলেন, পরম কারুনিক পরমেশ্বর তাঁদের সহায়তা করেছেন ও তাঁদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমকে শুভময় ফলদ্বারা ভূষিত করেছেন।

যাঁদের প্রশস্ত হৃদয় ও সত্যানুরাগ এই স্বপ্নের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ডকে প্রথমতঃ কল্পনা করে, পরে কার্য্যে পরিণত করেছেন, আমি সেই মহানুভবগণকে ধন্যবাদ দিই। এই সভামঞ্চ যে সর্ব্ববাদি সম্মত ভাবসমূহের বর্ষণ দ্বারা পরিপ্লুত হয়েছে, আমি সেই সকল উদারভাবকে ধন্যবাদ দিই। এই জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল শ্রোতৃমণ্ডলী, আমার প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করে এসেছেন ও যে ভাবগুলি দ্বারা ধর্ম্ম সমূহের পরস্পর বিবাদ কমে যায়, সেই সকলভাব ধারণা ও অনুমোদন করেছেন, সেজন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিই। এই সুবিন্যস্ত স্বর শ্রেণীর ন্যায় শৃঙ্খলার মধ্যে সময়ে সময়ে কিছু বিশৃঙ্খলভাব দেখা গিয়েছে। যাঁরা সেইরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করেছেন, তাঁদের আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই, কারণ তাঁরা ক্ষণিক বিশৃঙ্খলা দ্বারা এখানকার স্বাভাবিক শৃঙ্খলাকে মধুরতর করে তুলেছিল।

ধর্ম্মসমন্বয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি এখন সে বিষয়ে নিজমত প্রকাশ করছি না। কিন্তু যদি এখানে কেউ এরূপ আশা করেন যে, উক্ত সমন্বয় এইসকল বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা সংসাধিত হবে, তাঁকে আমি বলি : ভ্রাতঃ "তোমার আশা ফলবতী হওয়া অসম্ভব"। আমি কি ইচ্ছা করি যে, খ্রীষ্টীয়ান হিন্দু

হোন? ঈশ্বর তা প্রতিরোধ করুন। বীজ ভূমিতে রোপিত হল। মৃত্তিকা, বায়ু, জল তার চতুর্দ্দিকে রয়েছে। সেই বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হয়ে থাকে? না সেই বীজ থেকে ক্ষুদ্র বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ক্রমে আপনার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হতে থাকে এবং মৃত্তিকা, বায়ু, ও জলকে ভিতরে গ্রহণ করে সেই সকল উপাদান দ্বারা স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবর্দ্ধিত করে বৃক্ষাকারে পরিণত হয়।

ধর্ম্মও সেইরূপ! খ্রীষ্টীয়ানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না। কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টিয়ান হতে হবে না; অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মই অন্যান্য ধর্ম্মের সারভাগ গুলিকে ভিতরে গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করুক। আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করে, নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্দ্ধিত হোক।

যদি এই ধর্ম্ম মহাসমিতি জগতে কিছুপ্রমাণ করে থাকেন, তা এই সুন্দর রূপে প্রমাণও করেছেন যে, পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য, অতি মহানুভব উদার চরিত্র নরনারী প্রসব করেছেন।

এসকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ এরূপ কল্পনা করেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মের বিনাশ হয়ে, তাঁর ধর্ম্মই আর সকলকে অতিক্রম করে জীবিত থাকবে, তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র, তাঁর জন্য আমি বড়ই দুঃখিত। তাঁকে আমি স্পষ্টাক্ষরে বলছি যে, তাঁর ন্যায় লোকেরা, বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্ম্মের পতাকার ওপর লেখা থাকবে "বিবাদ করো না, পরস্পর সহায়তা কর, পরস্পরকে বিনাশের চেষ্টা না করে, পরস্পরের ভাব গ্রহণ করে, ধারণা কর। কলহ, ছেড়ে মৈত্রী ও শান্তির আশ্রয় গ্রহণ কর।

জয় গুরু.... জয় গুরু.... জয় গুরু....

মহাসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পূর্ব্বে স্বামিজী গুরুকে স্মরণ করেছিলেন জয় গুরু, শেষেও সেই জয় গুরু, জয় গুরু.... তাঁর আশীর্ব্বাদে ঝড় উঠলো। উঠলো তুফান। বিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝে হাল ধরে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভরসা, তাঁর গুরু জয়, জয় রামকৃষ্ণ!

সম্মোহিনী শক্তির মত মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল ধর্ম্মমহাসভার শ্রোতৃবৃন্দ ও সর্ব্বধর্ম্ম মহাসমিতির উদ্যোক্তাগণকে। তার সেই গণ্ডীর বাইরে যারা আছেন, তাঁদের কাছে মতামত প্রকাশে অগ্রগণী হলেন সংবাদপত্রসমূহ। Newyork Herold মতামত প্রকাশ করলেন সভা অধিবেশনের পরের দিন : চিকাগো ধর্ম্মমহাস[illegible] 'বিবেকানন্দ'ই শ্রেষ্ঠতম বিগ্রহ। তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করে, মনে হয়— ধর্ম্মমার্গে এহেন সমুন্নত জাতির কাছে আমাদের ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা। The Press of America মতামতে বললেন : হিন্দুদর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, সমবেত পরিষদবর্গের অগ্রগণ্য, প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অভিভাষণ দ্বারা বিরাট সভাকে সম্মোহিনী শক্তিবলে যেন মোহিত করে রেখেছিলেন। বর্ত্তমান প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান চার্চ্চের অন্তর্গত ধর্ম্মযাজক ও প্রচারকগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বামিজীর বাগ্মিতার ব্যাত্যারঙ্গে তাঁদের বক্তব্য বিষয়সমূহ ভেসে গিয়েছিল। তাঁর জ্ঞানপ্রদীপ্ত সৌম্যমুখমণ্ডল নিঃসৃত বক্তৃতাপ্রবাহে ,ইংরেজী-ভাষার মাধুর্য্যে, সুপরিস্ফুট হয়ে, তাঁর চিরাচরিত ধর্ম্মবিশ্বাসগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গভীর রেখাঅঙ্কিত করে দিয়েছিল।

.... তুফান উঠলো জনসমুদ্রে ১৯ সেপ্টেম্বর "হিন্দুধর্ম্ম" বক্তৃতায়। কিন্তু ঝড় তুললো সভ্যমণ্ডপে। ধর্ম্মসভার প্রতিনিধি বর্গের মধ্যে কয়েকজন একটা গুজব তুললেন : বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম তা নয়, যা বিবেকানন্দ— যেভাবে আত্মার মহিমা ঘোষণা করছেন, অধিকাংশ হিন্দুই সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। সূক্ষ্ম তর্ক যুক্তির দিক দিয়ে, যে মূর্ত্তি পূজার দার্শনিক ব্যাখ্যা করছেন তা পাশ্চাত্য জগতের চোখে ধূলি নিক্ষেপ, জড়োপাসক পৌত্তলিক হিন্দুগণের ঐপ্রকার ব্যাখ্যা স্বপ্নেরও অগোচর। বিশেষতঃ বিবেকানন্দ অতি-নীচ বংশোদ্ভব এবং সমাজচ্যুত, ও জাতিচ্যুত নগন্যব্যক্তি,

ধর্ম্মালোচনা এঁর পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। স্বদেশবাসী রেভারেণ্ড প্রচারক, ধর্ম্মসভার কর্তৃপক্ষকে, উক্ত অশান্ত চরিত্রহীন বালককে সভা থেকে বার করে দেওয়া পরামর্শ দিলেন।

ধর্ম্মসভার সুবিবেচক কর্তৃপক্ষ একথা বিশ্বাস করলেন না। তবে তাঁরা প্রতিবাদীপক্ষের উত্থাপিত আপত্তিগুলি খণ্ডন করার জন্য আহ্বান করলেন।

২২শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে স্বামিজী বেদান্তদর্শনের সঙ্গে বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কি সম্বন্ধ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় আলোচনা করলেন। প্রতিবাদীগণের উত্থাপিত বিদ্বেষপূর্ণ যুক্তিগুলি, দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করে, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও বিশালতা প্রতিপন্ন করলেন। ২৫শে তারিখে 'হিন্দুধর্মের সার' নামক বক্তৃতা প্রদান করে প্রশ্ন করলেন : ঐ সভামধ্যে যাঁরা হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত : তাঁরা হাত তুলুন। প্রায় সাত হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীয় মধ্যে তিন চারটে হাত উঠলো। 'যোদ্ধাসন্ন্যাসী' বিবেকানন্দ তাঁর গৈরিক উষ্ণীষমণ্ডিত শির ঊর্দ্ধে তুলে দৃঢ়, সম্বদ্ধ বাহুদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপন করে, ভর্ৎসনা দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, তবু তোমরা আমাদের ধর্ম্ম সমালোচনা করার স্পর্দ্ধা রাখো?

কুণ্ঠিত হল সমগ্র সভা। স্বামিজী মৃদু হেসে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন পুনরায়....

ধর্ম্মসভার অবসান হল। অপরিচিত সন্ন্যাসীর নাম সমগ্র সভ্যজগতে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুৎপ্রবাহের মত।....

একটি বক্তৃতা কোম্পানী স্বামিজীকে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নগরে বক্তৃতা প্রদান করার জন্য আহ্বান করলো। সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন স্বামিজী। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নগর বক্তৃতা করতে লাগলেন। আমেরিকাবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগলেন তাঁর অভিনববার্ত্তা। প্রত্যেক নগরে সসম্মানে অভ্যার্থিত হতে লাগলেন। সাগ্রহ আহ্বান আসতে লাগলো বহু স্থান থেকে।

মিশনারী প্রভুগণের কৃপায় : ভারতবাসী ছিল উলঙ্গ, নরমাংসাহারী, অসভ্য, স্বামিজী খুলে দিলেন সেই মুখোস। বুঝিয়ে দিলেন : ভারতের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সকল দিক। অনেক সুবিজ্ঞ স্বজাতি হিতৈষী পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজক বিবেকানন্দের কথার সত্যতা উপলব্ধি করলেন। মনে প্রাণে বুঝলেন : প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণের দিন সত্যসত্যই উপস্থিত হয়েছে। অর্থলোলুপ, জড়োপাসক, দেহাত্মবাদী পাশ্চাত্য জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে, বেদান্তের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম যে কোন আকারে-হোক গ্রহণ করতে হবে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিনগরে যেখানেই গেলেন স্বামিজী, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠলেন। এমনকি অনেক ধর্ম্মযাজক পর্য্যন্তও তাঁর ধর্ম্মব্যাখ্যায় চমৎকৃত হয়ে, তাঁকে নিজ নিজ ভজনালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বাম করতে লাগলেন। আর স্বামিজী তাঁর বেদান্তবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বেদান্তনিহিত সারসত্যগুলি আধুনিক মনের উপযোগী, যুক্তি-মণ্ডিত করে সরলভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। দেশাচার বা লোকাচারের সঙ্গে কোন আপোষ রফা করলেন না। সাধারণে তাঁর বার্ত্তা কি ভাবে গ্রহণ করবে বা সে আলোচনা শুনে তাদের মনে কি ভাবের উদয় হবে কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর উপদেশ-এর প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ ত্রুটি ও ভণ্ডামীগুলিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করতে লাগলেন, তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম্ম কোথায়? এই স্বার্থ সংগ্রাম, অবিরাম ধ্বংসের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের স্থান কোথায়?

এই নির্ভীক সমালোচনায়, চিন্তাশীল ভাবুকের দল সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু সকলেই তো উদার হৃদয় ও সৎ-সমালোচনা শোনার পাত্র নন। সমগ্র যুক্তরাজ্যব্যাপী অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা, অর্থোপার্জ্জনের পথে অন্তরায় তিনি। কিছু কিছু হীনচেতা খৃষ্টান মিশনারী, নগরে নগরে তাঁর কুৎসা রটিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটি বন্ধুকে শত্রুরূপে পরিণত করার চেষ্টা করতে

লাগলেন। এমনকি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকগণকে অর্থপ্রদানে বশীভূত করে তাঁকে প্রলোভিত করতে চেষ্টা করলেন। থিয়োজফিস্ট নেতাগণ এই মিশনারীগণের পিছনে থেকে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন।

বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন : ভারতীয় ঋষিগণের কোন গুপ্ত বিদ্যা নেই। আকাশে উড্ডীয়মান খেচরবৃত্তি অবলম্বনকারী কোন মহাত্মার সঙ্গে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেও সাক্ষাৎ লাভ তাঁর হয়নি। হিন্দুধর্ম্মে গুপ্ত বা গোপনীয় কিছু নেই, যুক্তিসহ সত্য সমষ্টি, প্রকাশ্য দিবালোক অনায়াসে সহ্য করতে পারে।

থিয়োজফিষ্টদের কাছে এটাই তাঁর মহাপরাধ। এই ভীতি তাঁদের এমন পেয়ে বসলো যে তাঁরা প্রচার সুরু করলেন : সমিতির সভ্যগণ যদি কেউ ভ্রমেও বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে যায়, তারা সমিতির সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি হারাবে। এর সঙ্গে যোগ দিলেন ভারতীয় খ্যাতনামা 'রেভারেণ্ড ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, প্রচারক। সেই সঙ্গে যোজনা করলেন, স্বকপোলকল্পিত জঘন্য অপবাদ, যাতে অপদস্থ হন জনসাধারণের কাছে। এমন কি এঁরা স্বামিজীকে প্রকাশ্যে ভয় দেখাতে লাগলেন যাতে, তিনি প্রচার-কার্য্য থেকে নিরস্ত হন।

অটল অচল স্বামী বিবেকানন্দ! তাঁর স্বকর্ম্মে বাধা দেওয়ার মত প্রাচীর, আজ তুচ্ছ। স্বকার্য্য সাধনে মৃত্যু-সেও বরং শ্রেয়ঃ। সাধন করতে হবে তাঁর শ্রীগুরু আদেশ! পাঠিয়েছেন তিনি, সম্মুখে তিনি, পথরোধ করে কার সাধ্য! .... নির্ব্বিকার চিত্তে পরিচালনা করতে লাগলেন তাঁর প্রচার কার্য্য। আত্মরক্ষা দূরের প্রশ্ন। ঘোষণা করলেন : সাধারণ মানুষের কর্ত্তব্য, তাঁর ঈশ্বরস্বরূপ সমাজের আদেশ পালন করা, আর যাঁরা জ্যোতির তনয়গণ (Children of Light) কখনও সেরূপ করেন না। সনাতন নিয়মই এই। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নানা প্রকার সুখ সুবিধা আদায় করে নেয়। অপরদিকে তিনি একা দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে, সমাজকে তাঁর দিকে তুলে ধরেন। আমি আমার অন্তরলোকের সত্যের বাণী না শুনে, কেন বাইরের লোকের খেয়াল অনুসারে চল্তে যাবো? এই নির্ব্বোধ জগৎ, আমাকে যা করতে বলছে, তাতে আমি এক নিম্নস্তরের জীবে পরিণত হবো, তার চেয়ে মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়ঃ। আমার যা কিছু বলার আছে, তা নিজের ভাবেই বলবো। তাকে হিন্দুর ছাঁচেও ঢালবে না, খৃষ্টানী ছাঁচেও ঢালবো না, শুধু নিজের ছাঁচেই ঢালবো। সম্মিলিত এক ষড়যন্ত্র দেখে বন্ধুবান্ধবগণ ভীত হলেন। তাঁরা সাবধান হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। নিষেধ করলেন, সামাজিক ব্যবহারের সমালোচনা করতে। উপদেশ দিলেন : মিষ্ট কথায় সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে। চরিত্র গঠিত হয়েছে যার, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলে, সেই নির্ভীক সন্ন্যাসী কি হীন ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন? জনৈকা সহৃদয়া মহিলাকে লিখলেন.... কি? সংসারের ক্রীতদাস সমূহ কি বলছে, তা কানে নিয়ে নিজের হৃদয়ের বিচার করতে বসবো? ছিঃ ভগ্নী, তুমি সন্ন্যাসীদের চেন না। বেদ বলেন : 'সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ' কারণ তিনি গীর্জ্জা, ধর্ম্মমত, শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারে ঋষি (Prophet) কোন ধার ধারে না, মিশনারী বা অন্য যে কেউ হোক, তারা যথাসাধ্য চীৎকার বা আক্রমণ করুক আমি তাদের গ্রাহ্য করি না।

ভর্ত্তৃহরির ভাষায়—

"চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোহ-থবা তাপসঃ
কিংবা তত্ত্ববিবেক পেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোহপি কিম্।
ইত্যুৎপন্ন বিকল্প জল্পমুখরৈঃ সম্ভাষ্য মানা জনৈ...
নক্রুদ্ধাঃ পথি নৈবঃ তুষ্ট-মনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ।।"

ইনি কি চণ্ডাল অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর? এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা করলেও যোগীগণ রুষ্ট হন না, তুষ্টও হন না, তাঁরা আপন মনে চলে যান।

"হাথী চলে বাজার মে, কুত্তা ভোঁখে হাজার;
সাধওঁকা দুর্ভাব নহী যব নিন্দে সংসার।"

যখন হাতী বাজার দিয়ে চলে যায়, হাজার হাজার কুকুর পিছু পিছু চীৎকার করতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী ফিরেও তাকায় না। সেরূপ, সমাজে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত যখন হন, তখন একদল সংসারী লোক তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমাগত চীৎকার করতে থাকে....।

দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের মত স্বামিজীর সুদৃঢ় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ত্যাগপূত মহিমা, একান্ত অপরিচিত ব্যক্তির স্থূলদৃষ্টিতেও অনড়াম্বর প্রতিভাত হতে লাগলো। কাজেই এই সমস্ত কল্পিত নিন্দায় জনসাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলো না। পরীক্ষা করতে এসে, বন্ধু হয়ে পড়লেন। অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত ও নিন্দিত হয়েও কাউকে অভিশাপ দিলেন না। গালি দিলেন না, "শিব" "শিব" বলে উপেক্ষা করতে লাগলেন। কেউ প্রতিবাদ করতে বললে সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'এ সবতো শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী!'

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর। মঠ তখন বরানগর থেকে আলমবাজারে স্থান পরিবর্ত্তন করে উঠে গেছে। একটি ইংরাজী কাগজ, মঠে ত্যাগী-রামকৃষ্ণ-ভক্তের হাতে এলো। সে কাগজে, মারউইন মেরী স্নেল নামে একজন আমেরিকান স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু কার্য্যাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সঙ্গে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামেরও উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান বা ভক্তদের এই বিবেকানন্দ নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। স্বামী অভেদানন্দ যখন বোম্বাই অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলেন তখন স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম নিয়ে আত্মগোপন করে পরিব্রাজক জীবনযাপন করছিলেন স্বামিজী। স্বামী কথাটা প্রথমে থাকায় প্রথমে অনুমান করেছিলেন তাঁরা হয়তো মাদ্রাজের কোন ভদ্রলোক— এই নামে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচার করছেন। কিন্তু তাঁরাতো, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত নন, সুতরাং তাঁরা সন্দেহ করতে লাগলেন... ইনি তাঁদের গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ নয়তো?

ঠিক সেইসময়েই : শিকাগো ধর্ম্মসভায় তাঁদের আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়বার্ত্তা পৌঁছে গেল দক্ষিণভারতে। রামনাদাধিপ রাজা ভাস্কর বর্ম্মা সেতুপতি ও খেতরীর রাজা বাহাদুর রাজ শিষ্যদ্বয় প্রকাশ্যে দরবারে আড়ম্বরের সঙ্গে প্রজাবৃন্দকে আহ্বান করে, ভারতবাসী শ্রীগুরুর প্রশংসা ঘোষণা করলেন। তাঁকে শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় তাঁর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য ভারতবাসীর তরফ থেকে ধন্যবাদ পত্র পাঠালেন।... মাদ্রাজে স্যার রামস্বামী মধুলিয়ার ও দেওয়ান বাহাদুর স্যার সুব্রাহ্মণ্য আয়ারের নেতৃত্বে এক মহতীর সভা ডাকলেন। সেখানে খ্যাতিনামা পণ্ডিতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়ে, তাঁর (স্বামিজীর) প্রচার কার্য্যে, তাঁকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে পত্র পাঠালেন। সংবাদ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে গেল। গুরুভ্রাতারাও তাঁদের অনুমান সত্য জেনে, আনন্দে দিশেহারা হলেন। তার কিছুদিন পরে স্বামিজীর পত্র এলো মঠে। তাতে তিনি সবিস্তারে জানিয়েছেন, তাঁর অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুদের সাহায্যে আমেরিকায় এসেছেন এবং ঐ ধর্ম্মসভায় যোগ দিয়েছেন। তিনি শ্রীগুরুর উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী এবং সারা আমেরিকায় একটা আলোড়নের সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছেন। সে সভায় অনাগরিক ধর্ম্মপাল, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, মাননীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও আমেরিকার খ্রীষ্টান মিশনারীগণ, তাঁর বিরুদ্ধে ভ্রান্তি ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে চলেছেন। এঁরা প্রচার করছেন, তিনি হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নন, তাঁর ব্যাখাত ধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম নয়। ... এখন তিনি এই সুদুর ও অপরিচিত দেশে একা ও বিপদাপন্নও। তোমরা কলকাতায় একটা সাধারণ সভার আয়োজন করে, আমার কাজের সমর্থন ও আমি যে ধর্ম্মসভায়

হিন্দুদের প্রতিনিধি, তার উল্লেখ করে ডক্টর ব্যারোজ প্রভৃতি ব্যক্তিদের ধন্যবাদ দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে দাও। আর তার একটা কপিও আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।... চিঠি পেয়েই, কালী, শশী ও শরৎ গুরু-ভ্রাতাগণ আলোচনা বসে গেলেন। তাঁরা কলকাতার টাউন হলে মহতী সভার আয়োজন করলেন। বাগবাজারে, বলরামবাবুর বাড়ী থেকে বিশিষ্ট নাগরিক ও ঠাকুরের ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থায় তিনজনে উদ্যোগী হলেন। ঠাকুরের গৃহী ভক্তরা নরেন্দ্রনাথের খবর পেয়ে উৎসাহে, তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। মনোমোহন মিত্র তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলেন। সহযোগী হলেন হরমোহন মিত্র। সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হল। প্রথমে সভাপতিত্বের জন্য গুরুদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেলেন। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সব কথা শুনে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করে বললেন: প্রথমত বিবেকানন্দ নাম গুরু প্রদত্ত নয়, তাছাড়া শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের সন্ন্যাস দীক্ষার অধিকার নেই—সবটাই শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যাপার— সভাপতিত্ব সম্ভব নয়। অবশেষে জমিদার রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে ধন্না দিলেন উদ্যোক্তারা। তিনি বিবেকানন্দ প্রেরিত সংবাদপত্রে গুরুর মন্তব্য শুনেই সানন্দে সে সভায় যোগ দিতে রাজী হলেন। বললেন, সুদূর আমেরিকা গিয়ে .. হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের সম্মান রক্ষা যিনি করেছেন, তার জন্য India should remain eternally grateful to him. বার বার বলতে লাগলেন সত্যই : it is foolishness to send christian missioneries to this learned Indian nation.

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, কলকাতার টাউন হলে সাধারণ সভার অধিবেশন হল। গণ্যমান্য লোক ও বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও দর্শক প্রায় চার হাজারেরও বেশী লোকের সমাবেশ হল। উপস্থিত হলেন পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, (সি, এস,আই; সভাপতি) বিশিষ্ট নাগরিক, পণ্ডিত ও সাংবাদিক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, কামাক্ষানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, মহেশচন্দ্র শিরোমণি, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, তারাপদ বিদ্যাবাগীশ, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, শিবনাথ শিরোমণি, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতিনামা পণ্ডিতবর্গ, মহারাজ কুমার বিনয় কৃষ্ণদেব, বিচারপতি গুরুদাস ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, (সম্পাদক, Indian nation) নরেন্দ্রনাথ সেন (Indian Mirror), বিচারপতি গনেশচন্দ্র চন্দ্র, কুমার দীনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধাপ্রসাদ রায়, ডাক্তার জে. বি. ডেলি (Indian daily News), ভুপেন্দ্রনাথ বসু, (এটর্নী) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম.এ, বি. এল, (ঢাকা) জমিদার রাখালচন্দ্র চৌধুরী, (বরিশাল) ব্যারিষ্টার মন্মথ মল্লিক, ক্ষেত্র ব্যানার্জ্জী, প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও বিদ্ব-মণ্ডলী। প্রত্যেকেই তাঁদের মন্তব্য ও স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করলেন। মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন সভাসমক্ষে মন্তব্য উপস্থাপন করলেন ও উপস্থিত সকলে তা সমর্থন করলেন। দুটি মন্তব্য সমর্থন লাভের পর বাবু শালিগ্রাম সিংহ তৃতীয় মন্তব্য উত্থাপন করলেন "That this meeting requests the chairman to forward to Sreemat Vivekananda Swami Dr. Barrows and Mr. Snell, addressed to Swami Vivekananda :

"As Chairman of a large representatives and influential meeting of Hindu inhabitants of Calcutta and the suberbs, held in the Town Hall of Calcutta, on the 5th of September 1894, I have the pleasure to convey to you the thanks of the local Hindu Community for your able

represantation of their religion at the Parliament of Religions that met at Chicago in September 1893.

The trouble and sacrefice you have incurred by your visit to America as a representative of Hindu Religion are profoundly appriciated by all whom you have done the honour to represent. But the special acknowledgements are due to you for services you have rendered to the cause, they hold so dear, their sacred Arya Dharma by your speeches and your ready responses to the questions of enquires. No exposition of the general principles of Hindu Religion could within the limits of lecture be more accurate and lucid than what you gave in your address to the Parliament of Religions on Tuesday the 19th September 1893. And your subsequent utterances on the same on other occassions have been equally cleared and precise. It has been the misfortune of Hindu to have their Religion misunderstood and misrepresented through ages, and, therefore, they cannot but feel. specially grateful to one of them who had had the courage and the ability to speak the truth about it and dispel illusions among the strange people, in a strange land, professing a different religion. Their thanks are due on less to the audiences and the organisers of meetings who have received you so kindly, and given you oppertunity for speaking, encouraged you in your work and heard you in a patient and charitable spirit. Hinduism has for the first time in its History and found a missionary and by a rare good fortune it has found one so able and accomplished as yourself. You fellow countrymen fellow Citizens and fellow Hindus feel that they would be wanting in an obvious duty if they did not convey to you their hearty sympathy and earnest gratitude for all your labours in spreading a true knowledge of their ancient faith. May god grant you strength and energy to carry on the good work you have begun!"

Yours faithfully
(Sd) Peary Mohan Mukherjee (Chairman)

সভার রিজিলিউশনগুলি, সভার কার্য্যাবলী ও স্বামিজীর উদ্দেশ্যে পত্রটি ছাপিয়ে সভায় বিতরণ করা হল ও তিনটি কপি ডক্টর ব্যারোজ, মেরী হেল ও স্বামিজীকে হিন্দুজাতির পক্ষ থেকে আমেরিকায় পাঠালেন গুরুভাইরা। উত্তরে স্বামিজী ভারতের বিশেষ করে কলকাতাবাসীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

এপাশে ইণ্ডিয়ানা এভেনিউ, শিকাগো থেকে জন হেনরী ব্যারোজ সাহেব ১২ই অক্টোবর রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জী সি. এস. আইকে উত্তরে জানালেন : প্রিয় মহাশয় কলকাতার টাউনহলে বিরাট সভার বিবরণ সহ যে পত্র লিখেছেন তা এই মাত্র পেলাম। আমি এতে সাতিশয়

সম্মানিত হয়েছি। শিকাগোর ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে আপনার বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হয়েছিলেন। তিনি বাগ্মিতাশক্তিতে সকলকেই চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছিলেন। নিজ ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর যত্নে, ধর্ম্মানুশীলনে লোকের চিন্তা ও আগ্রহ বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হয়েছে। প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা হচ্ছে, আমেরিকার জনমণ্ডলী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করছেন। আমাদের বিশ্বাস, আপনাদের সুপ্রাচীন পবিত্র সাহিত্য থেকে আমাদের অনেক বিষয় গ্রহণ করতে হবে।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

জন. হ্যেনরী ব্যারোজ

১৮ই নভেম্বর, নিউয়র্ক থেকে স্বামিজী, রাজা প্যারীমোহনকে উত্তরে জানালেন :

" আমি নিশ্চিতরূপে বুঝেছি, কোন ব্যক্তি বা জাতি, অন্য সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অথবা পবিত্রতাবোধ থেকে, যেখানেই এরূপ চেষ্টা চলেছে, সেখানেই ফল অতি শোচনীয় হয়েছে। আমার মনে হয়, অপরের প্রতি ঘৃণার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রথার প্রাচীর তুলে, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনই ভারতের পতন ও দুর্গতির কারণ। বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির সংমিশ্রণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। ঘৃণায়, ঘৃণা বাড়ে হৃদয় জয় করা যায় না, ফলে যে প্রাচীন জাতি ছিল সর্ব্বত্রগামী, আজ তা পরিণত জনশ্রুতিতে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ভ্রান্তনীতির জন্যই আমাদের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

আদান প্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যদি আবার উঠতে চায়, তার গুপ্ত ভাণ্ডারে যা সঞ্চিত আছে, তা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে। বিনিময়ে অন্যে, যা দেবে, তা গ্রহণ করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু, প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। আমরা সেদিন থেকেই মরেছি, যেদিন আমরা অন্যজাতিকে ঘৃণা করতে শিখেছি। সম্প্রসারণ ছাড়া আমাদের এই মৃত্যু, কেউ রোধ করতে পারবে না। আমাদের সকল জাতির সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। যে কোন হিন্দু, যে বিদেশে যায়, সে গৌণভাবে দেশের উপকার করে। তুলনায় সে শত শত কুসংস্কার ও স্বার্থপরতার সমষ্টি মূর্ত্তি ব্যক্তি, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, ঐ লোকগুলো নিজেও জড়বৎ থাকবে, অপরকেও কিছু করতে দেবে না। পাশ্চাত্য জাতিগুলি, জাতীয় জীবনের যে আশ্চর্য্য সৌধ গড়ে তুলেছে, তা চরিত্ররূপ দৃঢ় স্তম্ভগুলির ওপর রক্ষিত। যতদিন আমরা ঐরূপ চরিত্র সৃষ্টি করতে না পারছি, ততদিন এদের বিরুদ্ধে চিৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বাধীনতা লাভের যোগ্য! অনাবশ্যক হা হুতাশ ও বিলাপ না করে, আসুন আমরা দৃঢ় চিত্তে মানুষের মত কাজে লেগে যাই। আমি বিশ্বাস করি, যে বস্তু যার সত্যকার প্রাপ্য, তা কেউ তাকে, বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের অতীত মহৎ ছিল কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্তর হবে, সন্দেহের অবকাশ কিছু নেই। শঙ্কর আমাদের পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।"....

১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ যে যাত্রা সুরু, .. বিরাম তার নেই। ১৮৯৪ ফেব্রুয়ারী, স্বামিজী ডিট্রয়েটে, মিশিগণের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর পত্নী, বিদুষী, মিসেস জন, জে. ব্যাংলো মহোদয়ার অতিথি হয়ে বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিলেন ডিট্রিয়েটের ইউনিটোরিয়ান চার্চ্চে। এরপর ছুটলেন চিকাগো মহামেলা কমিশনের সভাপতি যুক্তরাজ্যের অন্যতম সেনেটর মাননীয় টমাস ডব্লিউ পামার মহোদয়ের ভবনে। অবস্থান করলেন দু'সপ্তাহ।.... মার্চ্চ, এপ্রিল, মে, ও জুন চললো অবিরাম বক্তৃতা। চিকাগো, নিউইয়র্ক ও বোষ্টনের চার পাশের ছোট বড় নগরীতে। জুন মাসে এলেন নিউ ইংলণ্ডের আর্ন্তঃপাতী 'গ্রীণ একারে' একটি কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে। এখানে

কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র, বেদান্ত শিখার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হলেন। শুরু করলেন তাঁদের শিক্ষা প্রদান। ভারতীয় রীতি অনুসরণ করে গাছের তলায় বসে, আচার্য্যদেবকে ঘিরে অধ্যয়ন শুরু হল। .... সমস্ত শরৎকাল বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে অক্টোবরের শেষের দিকে বাল্টীমোর ও ওয়াশিংটন নগরে বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। একটি পারিবারিক সভায় 'ব্রুকলীন—নৈতিক সভা'র সভাপতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ লুইস, জি, জেমস, শুনলেন স্বামিজীর বক্তৃতা। মুগ্ধ হলেন তিনি। উক্ত সভায় 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করলেন তিনি। 'পউচ ম্যানসন' নামে একটি সুবৃহৎ বাড়ীতে সহস্র সহস্র শ্রোতার সামনে প্রতিদিন 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে ধরাবাহিক বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এই বক্তৃতাগুলিই স্বামিজীর বেদান্ত প্রচারের সূচনা। স্থায়ীভাবে বেদান্ত ও যোগ শিক্ষার ক্লাস করবেন স্থির করলেন। পরিত্যাগ করলেন বক্তৃতা কোম্পানীর সংস্রব। বক্তৃতা দিয়ে অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছাটা আর মনঃপুত হল না। ঘোষণা করলেন, বিনামূল্যেই তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পাবেন সকলে।

ব্রুকলীন ও গ্রীন একারে কয়েকজনকে শিষ্যপদে বৃত করেছিলেন। তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে নব প্রতিষ্ঠিত ক্লাসে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু হল। স্থির করলেন, আর বক্তৃতা দেওয়া নয়, ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা ভঞ্জন করা, শিষ্যগণের মনকে ভারতীয় সাধনার উপযোগী করা।.... জনসাধারণের কাছ থেকে আসতে লাগলো সাদর আহ্বান। নিষ্কৃতি পেতে বেগ পেতে হল যথেষ্ট, তবু সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না। বুঝেছিলেন, বক্তৃতায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, উৎসাহ দেখা দেয়, তাতে স্থায়ী ফল প্রসব করে না। যদি সত্যিই ধর্ম্মলাভের আগ্রহ কারও দেখা দেয়, ভারতীয় শিষ্যের মত গুরুগৃহে আগমন করুক।

বক্তৃতা দিয়ে তিনি এতদিন প্রচুর অর্থ পেলেন। সেইসঙ্গে আমেরিকা ও ভারতের অনেক দাতব্যভাণ্ডারে সাহায্য ও দান করে চলেছেন সেইমত। বিলাসের মোহ বা অর্থলিপ্সা তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। যে সমাজে, প্রতি পদক্ষেপে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেই সমাজে, কাল কোথায় থাকবেন, কি খাবেন, সে চিন্তার অবকাশ তখনও তাঁর ছিল না। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে, বন্ধুভাবে, দেখেছেন, ভালও বেসেছেন আমেরিকার অধিবাসীগণ, কিন্তু গুরুরূপে বা আচার্য্য রূপে তখনও তাঁকে ভক্তি করেনি। তাই তাঁর আচরণে তাঁরা বিস্মিত হলেন। যখন বুঝলেন আদর, প্রতিপত্তি, সম্মান, যশ, অর্থ কোন কিছুতেই চিত্ত তাঁর বিচলিত নয়, তিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের কল্যাণ কামনায়, হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্মের অগাধ সমুদ্র মথিত সুধা, 'অদ্বৈতামৃত' নিয়ে উপস্থিত, তখনই তাঁর পদতলে বসে ধর্ম্ম শিক্ষায় অগ্রসর হলেন তাঁরা।

পৃথিবীর সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতির সমবায়ে গড়ে উঠেছে মার্কিন দেশ। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই অন্ধসংস্কার, অহঙ্কার, উদ্দাম, ভাবপ্রবণতা, অব্যবস্থিত চিত্ততা লাভ করেছেন তাঁরা। তাই, যে কোন নোতুন মতবাদ বা ধর্ম্ম, যুক্তিপূর্ণ হোক বা ভ্রম প্রমাদের সমষ্টিই হোক, তার সমর্থকের অভাব দেখা যায় না। যে কোন প্রভাবেই হোক, জনকতক লোকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারলেই অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হয়ে যায়। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, ভৌতিক কাণ্ড, মহাত্মাগণের জলে, স্থলে, শূন্যে অবাধ বিচরণ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় মতবাদ প্রচার করে প্রচুর অর্থ উপায় করেছেন। সেখানে প্রকৃত সত্যতত্ত্বান্বেষী ও ঈশ্বর লাভেচ্ছু লোক বেছে নেওয়া যে কি কষ্টকর, তা উপলব্ধি করলেন স্বামিজী। ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন, উদ্দেশ্য সাধনের পথে।

যাঁরা বৈচিত্র্যময় মতবাদ প্রচার করার জন্য, সমিতি গঠন করে, অবাধে অর্থ উপায় করে চলেছিলেন, তাঁরা প্রথমে তাঁকে প্রলোভন দেখালেন, পরে অনুরোধ করলেন, শেষে ভয় দেখাতে শুরু করলেন। দৃঢ়-চিত্ত স্বামিজী ঘোষণা করলেন, আমি সত্যাশ্রয়ী, সত্যের উপাসক, কোন

অবস্থাতেই মিথ্যার সঙ্গে আপোষ সম্ভব নয়। সমগ্রজগৎ যদি এক হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে, তবুও সত্যে বলবত্ থাকবেন তিনি।

পিছনে লাগলেন, খৃষ্টান মিশনারীগণ। তাঁর ধর্ম্মমত, তর্ক ও যুক্তিকে খণ্ডন করতে না পেরে প্রতিপদে তাঁর চরিত্রের সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। কেউ বন্ধু হলে, তাঁকে শত্রু করতে চেষ্টা করলেন। কোন পরিবারে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার জন্য আহুত হয়েছেন জানতে পারলে, পূর্ব্বেই উপস্থিত হয়ে বোঝাতে শুরু করলেন, লোকটার কথা ও কাজের মিল নেই। তাছাড়া চরিত্রও এই প্রকার.... ইত্যাদি। চিঠি দ্বারা আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হতে লাগলো। কেউ কেউ আবার দরজা বন্ধ করে অন্যত্র আত্মগোপন করলো। বিস্মিত হলেন, ফিরে এলেন বার বার।

স্বাধীন চিন্তাবাদীরদল (free thinkers) যাঁরা নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী, যুক্তিবাদী, অথচ ধর্ম্ম বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারকে জুয়াচ্চুরী ও কুসংস্কার জ্ঞানে উপেক্ষা করেন, এঁরা দম্ভভরে তাঁকে, তাঁদের সমাজ ঘরে, বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করলেন স্বামিজী। স্বাধীন যুক্তিবাদীদের যুক্তি খণ্ডিত হল। এঁদের অনেকেই তাঁর উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। যাঁরা নিমন্ত্রণ করে দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করেছিলেন, অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলেন একে একে। গ্রহণ করলেন শিষ্যত্ব। চলার পথ কন্টকমুক্ত, অদ্বৈতবাদের অভিযান এগিয়ে চললো অপ্রতিহত গতিতে। ধারাবাহিক জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন নিউইয়র্কের প্রশ্নোত্তর ক্লাশে। নাতিবৃহৎ কক্ষ। যথেষ্ট স্থানাভাব। উৎসুক ছাত্রছাত্রীগণ। ভারতীয় প্রথামত পা মুড়ে কষ্ট স্বীকার করে, প্রিয় আচার্য্যকে ঘিরে বসতে শুরু করলেন। রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি, তাঁদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিল। তাঁরা স্বামিজীর কাছে যোগ শিক্ষা করতে শুরু করে দিলেন। সফলতা লাভের আশায়, শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য, সাত্ত্বিক আহার ইত্যাদি নিয়মগুলি মেনে চলতে লাগলেন। স্বামিজীও যোগীর দৈহিক কঠোরতা অবলম্বন করলেন। তিনিই জীবন্ত আদর্শ। নিউইয়র্ক আবাসটি তাঁর মঠে পরিণত হল।

রাজযোগ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। যে দিন রাজযোগ বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট দিন থাকলো, সেদিন নগরের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকগণ, কক্ষটিকে পূর্ণ করে ফেলতে লাগলেন। আগ্রহের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হতে লাগলেন। জুন মাসের মধ্যে সব বক্তৃতা এক যোগে 'রাজযোগ' নামে বই বার করা হল। তার সঙ্গে পাতঞ্জল দর্শনের সুবিস্তৃত ও ভাষ্য যোগ করে দিলেন। পরিশিষ্টে, উচ্চমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও ভক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে, বইখানি মনীষি পাঠক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। জগদ্বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত প্রফেসর জেমস সাহেব বইখানি পড়ে এত মুগ্ধ হলেন যে, স্বামিজীর বাসায় গিয়ে নিজে পরিচয় করলেন। শেষে তাঁর অকপট বন্ধু হয়ে পড়লেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বইটির তিনটি সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দিল।

ম্যাডাম মেরী লুইস (স্বামী অভয়ানন্দ), ডাক্তার স্যাণ্ডাস্বার্গ (স্বামী কৃপানন্দ), মিসেস ওলি বুল, ডাক্তার এলেন ডি, মিস্ ওয়াল্ডো, প্রফেসর ওয়েম্যান ও রাইট, ডাক্তার ষ্ট্রীট, প্রভৃতি স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। অনেক খৃষ্টান মিশনারী ও সাধারণ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামিজীর শিক্ষায় আকৃষ্ট হলেন। সুবিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম কালভে, কিছুদিন পরে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। নিউইয়র্কের ধনী সমাজের মিঃ ও মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট ও মিস জে. ম্যাকলাউডও স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁকে বিবিধ প্রকারে প্রচার কার্য্যে সাহায্য করতে লাগলেন। ডিক্সন্

সোসাইটির মেম্বারগণ তাঁর বক্তৃতা শুনে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে হিন্দু আদর্শে জীবন গঠন করার জন্য উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

আমেরিকায় বিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। অদম্য কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে পড়তে লাগলো। জীবনের বিগত দিনগুলির স্মৃতি মনের কোণে উঁকি দিতে লাগলো : I long, oh long for my rags, my shaven head, my sleep under trees and my food from begging'...

অবিশ্রান্ত উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ, বক্তৃতা দান ও শিক্ষাদানে পরিশ্রান্ত হয়ে কিছুদিন বিশ্রাম লাভের একান্ত প্রয়োজনবোধ করলেন তিনি। তাঁর এক শিষ্যার সেন্ট লরেন্স নদীর ওপর সহস্র দীপোদ্যান নামে একটি মনোরম কুটীর ছিল। তিনি স্বামিজীকে ব্যবহারের জন্য ঘরখানি অর্পণ করলেন। স্বামিজী রাজী হলেন সে প্রস্তাবে। কতিপয় একান্ত অনুরাগী শিষ্য ও শিষ্যা সমভিব্যাহারে যাত্রা করলেন।

সেখানে সাতটি সপ্তাহ বাস করলেন তিনি। নগরীর কোলাহল, প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘর্ষ, বক্তৃতা প্রদান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁপ ছাড়লেন। প্রচার কার্য্যের জন্য কয়েকজন শিষ্যকে গড়ে তোলার আশায় তাঁদের দিবারাত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন।

ছিলেন বালকের মত ক্রীড়াশীল, কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয়। অথচ জাগ্রত তিনি মূলমন্ত্রে। এসেছিলেন মনের মত করে শিষ্যদের তৈরী করে নেওয়ার বাসনায়। শিক্ষা দিতে লাগলেন, উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়ে, হিন্দু পৌরাণিক গল্প থেকে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে। গল্পের অন্তরালে যে সত্যনির্হিত আছে, দেখিয়ে দিতে লাগলেন দিনের পর দিন।

ডিট্রয়েট থেকে দুজন নবাগতা, ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে এলেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের আশায়। বহু শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করে, বক্তব্য স্থির করে এসেছিলেন। মুখোমুখি হতেই গুলিয়ে গেল সব। একজন কোনরকমে বললেন : আমরা ডিট্রয়েট থেকে এসেছি, মিসেস— আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। অন্যজন বললেন : ভগবান ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকলে যেরূপে আমরা তাঁর কাছে যেতাম, ও উপদেশ ভিক্ষা করতাম, ঠিক সেইভাবেই আপনার কাছে এসেছি।

স্বামিজী তাঁদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে মৃদুস্বরে বললেন : শুধু ভগবান খৃষ্টের মত তোমাদের এই মুহূর্ত্তে মুক্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো!....

সুদীর্ঘ সাতটি সপ্তহ ধরে তিনি যে অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান করেছিলেন— 'Inspired Talks' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। 'দেববাণী' তারই বাংলা অনুবাদ। এখানে পাঁচজন ব্রহ্মচর্য্য ও দুজন কে সন্ন্যাস প্রদান করলেন।... নোতুন উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। ব্রতী হলেন পুনরায় প্রচার কার্য্যে।

মে মাসে মিস হেনরিএটা মুলার ইংলণ্ডে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। মি: ই, টি, ষ্টাডি মহোদয়, বার বার লণ্ডনে যাওয়ার জন্য পত্র দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বন্ধু নিউইয়র্কের জনৈক ধনকুবের, নিজে তাঁকে নিয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। রাজীও হলেন তিনি। ক্রমাগত দু বছর অবিশ্রান্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর সমুদ্রযাত্রা তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায়। 'গুরুগতপ্রাণ' শিষ্যবৃন্দও রাজী হলেন সে প্রস্তাবে। প্রচার কার্য্যের ভার স্বামী অভয়ানন্দ, কৃপানন্দ ও মিষ্টার হরিদাসীর (মিস ওয়াল্ডো) হাতে সমর্পণ করে, আগষ্টমাসের মধ্যভাগে নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করলেন, ফ্রান্সের প্যারী নগরী। এখানে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করে, ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করলেন।....

আমেরিকা ত্যাগের সময় সংবাদ পেলেন, ভারতবর্ষে তাঁর সম্বন্ধে নানা অপপ্রচার শুরু হয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় ও তাঁর মাদ্রাজী ও অন্যান্য ভারতীয় শিষ্যবৃন্দ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্রে 'বঙ্গবাসী' তাঁর নিন্দাবাদ শুরু করেছেন— মিশনারী পরিচালিত সংবাদ পত্র সঙ্গে তো আছেই। অসভ্য, নরমাংসভুক, বন্য বর্ব্বর হিদেনদিগের অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার অন্তরায় স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁদের পক্ষে কুৎসা রটানো স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর স্বদেশীয় ও স্বজাতির ব্যবহারে, তিনি ক্ষুব্ধ হলেন মনে প্রাণে। ওপাশে কলকাতায় প্রকাশ্য সভায় রেভাঃ কালীমোহন ব্যানার্জ্জী তাঁকে রাজনৈতিক বক্তা বলে উল্লেখ করায়, শিষ্যদের প্রতিবাদ করার আদেশ পাঠালেন। রেভাঃ ব্যানার্জ্জীকে সংবাদপত্রে তাঁর স্বমত সমর্থন করার জন্য আহ্বান করতে নির্দ্দেশ করলেন। শিষ্যগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য লিখলেন : আশ্চর্য্য হচ্ছি যে তোমরা মিশনারীগণের প্রচারিত আহম্মকিগুলি শুনে বিচলিত হয়েছে! কোন হিন্দু যদি আমাকে গোঁড়া হিন্দুর মত আহার প্রণালী অবলম্বন করতে অযাচিত পরামর্শ দেয়, তাঁদের বলো, তাঁর যেন ব্রাহ্মণ, পাচক ও তার সঙ্গে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয়! একপয়সা সাহায্য করার ক্ষমতা নেই, বিজ্ঞের মত উপদেশ দেবার বেলায় যোগ্যতা দেখায়! দেখে হাসি সম্বরণ করতে পারি না। আর যদি মিশনারীগণ বলে থাকেন 'কামকাঞ্চন' ত্যাগরূপ সন্ন্যাস জীবনের মহান ব্রত ভঙ্গ করেছি, তবে তাঁদের বলো যে, তাঁরা ঘোর মিথ্যাবাদী, জীবনের উদ্দেশ্য আমার, আমি ভালরূপেই জানি। কোনপ্রকার হট্টগোল, নিন্দা ... আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। আমি কি কোন ব্যক্তি বিশেষের বা জাতি বিশেষের ক্রীতদাস? তোমরা কি বলতে চাও যে, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দুর্ব্বলচেতা, নাস্তিকভাবাপন্ন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বাস করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি? আমি সর্ব্বপ্রকার কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি! ঐ সমস্ত কাপুরুষ ও রাজনৈতিক আহম্মকদের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। ঈশ্বর এবং সত্যই আমার রাজনীতি। বাদবাকী যাকিছু সব আবর্জ্জনা মাত্র।

জাহাজ ঘাটে তখনও ভিড়েনি। স্বামিজীর মনে সন্দেহের দোলা। ইংলণ্ড ভারতের প্রভু। প্রভুত্বের অহমিকায় স্ফীত, সাম্রাজ্য-গর্ব্বী ইংরাজ, অর্দ্ধবর্ব্বর পরাধীন জাতির একজন ধর্ম্মপ্রচারব সন্ন্যাসীকে কি ভাবে গ্রহণ করবে, কে জানে!

দ্বিধা-সঙ্কুচিত-চিত্তে লণ্ডনে নেমে দাঁড়ালেন তিনি। শিক্ষিত, অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সর্ব্বসাধারণ, সর্ব্ব-শ্রেণীর ইংরাজের সঙ্গে হল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আবিষ্কার করলেন ইংরাজ চরিত্রের মহত্ত্ব। মুগ্ধ হলেন ইংরাজ চরিত্রের ক্ষত্রিয়, শৌর্য্য, আত্মসংযম, উদ্যম, অধ্যবসায় ও লঘু ভাবাবেগহীন গাম্ভীর্য্য। মুগ্ধ হলেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা দেখে। বুঝলেন, ইংরাজ সহজে কোনভাবে গলে পড়ে না। অথচ যা, একবার সত্য বলে জানে, মনে-প্রাণে তা আঁকড়ে ধরে নেয়।

যেখানে চলেছেন তিনি, আন্দোলন সেখানেই। পাশ্চাত্যবাসীরা নাম দিলেন 'Cyclonic Hindoo'। এখানে এসেও তুললেন সেই তুফান। সকালে, দিতে লাগলেন প্রশ্নের উত্তর। বৈকালে, বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, চালালেন প্রচার।...

...পিকাডেলী প্রিন্সেস হলে সহস্রাধিক শ্রোতার সামনে 'আত্মজ্ঞান' বিষয়ে গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। পাশ্চাত্যের বহির্ম্মুখ দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ জীবনের ওপর করলেন যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা। সংবাদপত্র ও সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন প্রথম আবর্ভাবে। মুগ্ধ হলেন তাঁরা, তাঁর বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে। শিক্ষিত নরনারী দলে দলে তাঁর উপদেশ শোনার আকাঙ্ক্ষায় আগমন সুরু করলেন।

বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলিতে বিস্তৃত বিবরণ ও আলোচনা বার হতে লাগলো। "রামমোহনের পর একমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে বাদ দিলে, প্রিন্সেস হলের বক্তা হিন্দুর মত, আর কোন শক্তিশালী

ভারতীয় ইংলণ্ডের বক্তৃতা-মঞ্চে অবতীর্ণ হয়নি।.... বক্তৃতা মুখে, তিনি কারখানা, ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও পুঁথি পুস্তকের দ্বারা মনুষ্য জাতির কতটুকু হিত হয়েছে, বুদ্ধ ও যীশুর কয়েকটি বাণীর সঙ্গে তার তুলনা করে অতি নির্ভীক তীব্র, তাচ্ছিল্যপূর্ণ সমালোচনা করলেন। বক্তৃতাকালে তিনি কোন স্মারকলিপি ব্যবহার করলেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, আড়ষ্টতাহীন, দ্বিধাহীন—The Standard.

জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আবয়বে, বুদ্ধদেবের চিরপরিচিত মুখের সৌ-সাদৃশ্য অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। আমাদের বণিক সমৃদ্ধি, আমাদের শোনিত লোলুপ যুদ্ধ, আমাদের ধর্ম্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার তীব্র সমালোচনায় তিনি বলেন এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের শূন্যগর্ভ আস্ফালন পূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হবে না। The London Daily Chronicle.

'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটে'র একজন প্রতিনিধি স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে লণ্ডনে 'ভারতীয় যোগী' নামে স্বামিজী সম্বন্ধে নানা তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তাঁর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে স্বামিজী বললেন— গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছ থেকে যে বার্ত্তা পেয়েছি, তা প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য। কোন নোতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা, আমার অভিপ্রেত নয়। আমার বিশ্বাস, বেদান্তের উদার জ্ঞান-সমষ্টি, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গ্রহণ করতে পারেন।"... তাঁর যোগদৃষ্টিতে, ভাবী শতাব্দীর ভয়াবহ ধ্বংসের করাল ছায়া তিনি দেখতে পেয়েছেন। তাই বার বার তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন, সাবধান! আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, সমগ্রপাশ্চাত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যে কোন মুহূর্ত্তেই অগ্নি উদ্গীরণ করে পাশ্চাত্য জগতকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এখনও যদি তোমরা সাবধান না হও, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধ্বংশ তোমাদের অবশ্যম্ভাবী।"

একমাসের মধ্যেই তিনি লণ্ডনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। এই সময় একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বক্তৃতা সভায় মিস মারগারেট-ই নোবেল, স্বামিজীর সঙ্গে পরিচিতা হলেন। তিনি ছিলেন একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। অসাধারণ বিদূষী। পণ্ডিত সমাজে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। স্বামিজীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্না হলেও তিনি সহসা তাঁকে আচার্য্য বলে সম্বোধন করতে পারলেন না। প্রতিদিন বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাশে নিয়মিত আসাযাওয়া শুরু করলেন। শেষে স্বামিজীর পবিত্র নিঃস্বার্থপর চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন স্থির করলেন কিন্তু মনোভাব প্রকাশ না করে নীরবে এই অদ্ভুতকর্ম্মা সন্ন্যাসীকে নানাপ্রকারে পর্য্যালোচনা করতে লাগলেন। যেখানে স্বামিজীর বক্তৃতা, সেখানেই তিনি। শুধু তাই নয়— পরিচিত, অপরিচিত সকলকে প্ররোচিত করতে লাগলেন, তাঁদের সেই বক্তৃতা শুনতে।....

ইংলণ্ডে তাঁর প্রচার-কার্য্য আমেরিকার মতই সাফল্যলাভ করলো। আমেরিকার শিষ্য ও ভক্তগণ বার বার ডাক দিতে লাগলেন : 'তাঁর ফিরে আসার— একান্ত প্রয়োজন, প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্যে। বার বার চিঠি আসতে লাগলো— তাঁর উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন।' এপাশে লণ্ডনের পরিচিত ও ভক্তবৃন্দ তাঁকে আরও কিছুদিন থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বোষ্টন নিবাসীনী জনৈকা ধনাঢ্যা মহিলা স্বামিজীর প্রচার কাজের জন্য সমস্ত ব্যায়ভার বহন করবেন বলে অঙ্গীকার করে একটি পত্র দিলেন। অনুভব করলেন স্বামিজী, সবই প্রভুর লীলা। আমেরিকা ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। গঠন করলেন, একটি শিষ্যমণ্ডলীর সমিতি। তাঁদের নিয়মিত শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র আলোচনার উপদেশ ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে ইংলণ্ড ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জনৈক শিষ্যকে লিখলেন : প্রচারের কাজ আশাতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ইংলণ্ডে। আগামী সপ্তাহে আমেরিকা ফিরে যাচ্ছি শুনে বিষণ্ণ হয়েছেন অনেকে। যে কাজটুকু হয়েছে তার ফল, আমি চলে গেলে, অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাবে

এরূপ আশঙ্কাও অনেকে করছেন কিন্তু কোন মানুষ বা বস্তুর উপর নির্ভরের আশা আমি রাখি না- আমার আশ্রয় একমাত্র সেই প্রভু! যিনি আমাকে যন্ত্ররূপে নিয়োজিত করে, তাঁর কাজ, নিজেই তিনি করিয়ে নিয়ে চলেছেন।

৬ই ডিসেম্বর— পুনরায় ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। এতদিন স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও মিস হরিদাসী (ওয়াল্ডো) প্রচারের কাজ সুচারু রূপে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরাও যে কোন নগরে যেতেন, স্বামিজীর মতই শত শত উৎস্যুক শ্রোতাকে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করে, তাঁদের শ্রদ্ধা ও মন জয় করে চলেছিলেন। এছাড়া আরও দুটি প্রচার কেন্দ্র খুলেছিলেন। স্বামিজী যোগ দিলেন তাঁদের কাজে। বোষ্টনবাসিনী মহিলার সাহায্যে ২০ সংখ্যক ষ্ট্রীটে, দুটি প্রশস্ত ঘর ভাড়া নিলেন। স্বামী কৃপানন্দ, স্বামিজীর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। দেড়শত ছাত্রেরও বেশী সংখ্যক ছাত্রের স্থান হল। ধারাবাহিক 'কর্ম্ম-যোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সঙ্কলিত হল 'কর্ম্ম-যোগ'। এসময়ে 'সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ' নামে প্রসিদ্ধ একটি বক্তৃতা দিলেন।.... এগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন। শিষ্যগণ ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কয়েকজন সঙ্কেতিককে নিয়োগ করা হল কিন্তু তাঁরা স্বামিজীকে অনুসরণ করতে সমর্থ হলেন না ঠিক এই সময়েই অভিজ্ঞ সাঙ্কেতিক লিপিবিদ মি. জে. জে. গুডউইন নিউইয়র্কে উপস্থিত হলেন। তাঁকে নিযুক্ত করা হল একাজে। অধিকাংশ সময় থাকতেন স্বামিজীর সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মনের ভাবে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তিনি স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। স্বামিজীর বক্তৃতাবলী তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফসল। এঁকে তিনি (স্বামিজী) 'বিশ্বস্ত গুডউইন' বলে ডাকতেন। রাজযোগ তিনি এক শিক্ষক দিয়ে লিখালেন কয়েকটি প্রবন্ধ। এ ছাড়া সমস্তই তাঁর বক্তৃতা।

খৃষ্টমাস পর্ব্ব উপলক্ষ্যে মিসেস ওলিবুল কর্ত্তক নিমন্ত্রিত হয়ে বোষ্টনে ফিরে গেলেন। কেমব্রিজের মহিলা মহলে আহুত হয়ে 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ' সম্বন্ধে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন।... সেখান থেকে ফিরে নিউইয়র্কের হের্ডিম্যান হোমে প্রতি রবিবার বিনা পারিশ্রমিকে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন।.... ব্রুকলিন মেটা ফিজিক্যাল সোসাইটি-ও নিউইয়র্ক পিপলস্ চার্চ্চে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি শোনার জন্য প্রত্যহ দলে দলে নরনারী সমাগত হতে লাগলো। এছাড়াও প্রতিদিন দুবার করে প্রশ্নোত্তর ক্লাশে উপস্থিত থেকে জিজ্ঞাসুমাত্রেরই ধর্ম্মসমস্যাগুলি সাগ্রহে ভঞ্জন করে দিতে লাগলেন। রাজযোগ বা বিশেষ সাধন প্র লীসমূহ ব্যক্তিবিশেষকে যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন নামক প্রকাণ্ড হল ঘরে 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন। এগুলি এত সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হল যে প্রতিদিন দু'হাজার শ্রোতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। এমাসেই আহুত হলেন হার্টফেড মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে। বক্তৃতা দিলেন 'আত্মা ও ঈশ্বর'। ব্রুকলীন নৈতিক সভাতেও দিলেন কয়েকটি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক বক্তৃতা।

বহু নরনারী তাঁর ধর্ম্মব্যাখায় আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। ডাক্তার ষ্ট্রীট নামে জনৈক ভক্তিমান শিষ্য, তাঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। নাম দিলেন স্বামিজী 'যোগানন্দ'। এক বছরের মধ্যে তিনজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সুপণ্ডিত শিষ্যকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করে তাঁদের সাহায্যে বেদান্ত ও যোগের ক্লাশ চালাতে লাগলেন। দলে দলে নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেদের বৈদান্তিক বলে প্রচার করতে লাগলেন। এই সময়ে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখিকা মিসেস এগ্না হুইলার উইলকক্স ও তাঁর স্বামী মি. ইউলকক্স তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থান ভ্রমণ করে ডিট্রয়েটে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে 'বিশস্ত গুডইন। 'রিশলু' একটি ফ্যামিলি

হোটেলে কয়েকখানি ঘর ভাড়া নিয়ে বৈঠকখানায় ক্লাশে নেওয়া ও বক্তৃতা দেওয়ার কাজ শুরু করলেন। প্রচুর লোক সমাগম সুরু হল। স্থানাভাব— বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে লাগলেন অনেকে। তখন তিনি একেবারে 'ভক্তিমাখা'। ভগবৎ প্রেমই ছিল, সেদিন তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা স্বরূপ!...

ডিট্রয়েটে বেথেল মন্দিরে সাধারণের সমক্ষে তাঁর শেষ উপস্থিতি। রবিবার সন্ধ্যা। উৎসুক জনতায় পরিপূর্ণ সে মন্দির। ভক্ত রাবি লুইস গ্রোসম্যান সেখানকার যাজক। বক্তৃতা দিলেন 'পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বাণী' ও 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ' হৃদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হল সে বক্তৃতা। বৃহৎ সেই শ্রোতৃসঙ্ঘ মন্ত্রবৎ হয়ে শুনলেন, তা গভীর আগ্রহে।

ক্ষেপে গেলেন গোঁড়া খৃষ্টান মিশনারীর দল। শুরু করলেন, নানা প্রকারের নিন্দা রটাতে। তাঁর বক্তৃতা শুনতে নিষেধ করলেন জনসাধারণকে। ধর্ম্মযাজক রাবি লুইস গ্রোসম্যান প্রতিবাদ করলেন সঙ্কীর্ণ হৃদয় মিশনারীদের। স্থানাভাব, হুতাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগলো শত শত লোক। কয়েকজন হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণাভিলাষী ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়ে তিনি ফিরে চললেন বোষ্টনে। স্বামী কৃপানন্দ প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন ডিট্রয়েটে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মি. কক্স, দর্শনশাখার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের সম্মুখে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। সম্মত হলেন তিনি। বিবিধ দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ও শত শত গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের সামনে ২২শে মার্চ্চ, বেদান্ত সম্বন্ধে গভীরতত্ত্ব সমন্বিত বক্তৃতা দিলেন। ওই বক্তৃতাটি ছাত্রদের আগ্রহে, পুস্তকারে ছাপানো হল। অধ্যাপক রেভাঃ. এভারেট, আনন্দের সঙ্গে ভূমিকা লিখে দিলেন।

ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। বেদান্ত আলোচনা ও যোগ শিক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্র গঠন করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এদিকে ইংলণ্ড থেকে বার বার আহ্বান আসতে লাগলো। স্থির করে নিলেন ইংলণ্ড হয়ে ফিরবেন ভারতবর্ষে। শিষ্য ও ভক্তবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থায়ী 'বেদান্ত সোসাইটি' স্থাপন করলেন। প্রসিদ্ধ বিত্তবান মি. ফ্রান্সিস, এইচ, লিগেট তাঁর সম্মতি-ও ইচ্ছাপূরণের জন্য সমিতির সভাপতি পদে গ্রহণ করলেন। সিষ্টার হরিদাসীকে, আশীর্ব্বাদ ও শক্তি সঞ্চার করে যোগশিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত করলেন। স্বামী কৃপানন্দ। অভয়ানন্দ, যোগানন্দ ও কতিপয় ব্রহ্মচারীকে বেদান্ত প্রচারক রূপে নির্দ্দিষ্ট করলেন। দানশীলা মিস মেরী ফিলিপ, মিসেস আর্থার স্মিথ, মি. ও মিসেস ওয়াল্টার গুডইয়ার ও প্রসিদ্ধা গায়িকা মিস, এমা, থার্সবি প্রভৃতি নিষ্ঠাবান ও প্রতিষ্ঠিত শিষ্য ও শিষ্যা উৎসাহের সঙ্গে সমিতির কাজ চালাতে উদ্যোগী হলেন। এঁদের অনুরোধ ও সম্মতি অনুসারে, গুরুভাই সারদানন্দজীকে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রার জন্য পত্র দিলেন। ইংলণ্ড থেকে তাঁকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন আশ্বাস দিয়ে ১৮৮৬ সালের ১৫ই এপ্রিল লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলেন। শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ তাঁকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন নিউইয়র্কে। এঁদের মধ্যে উপস্থিত চিকাগো বিদুষী সমাজের অন্যতমা নেত্রী মিসেস লিগেট সাশ্রুনয়নে বলেই ফেললেন : জীবনে দুজনকে প্রত্যক্ষ করলাম, যাঁদের ব্যক্তিগত মর্য্যাদা কোন অবস্থায় ক্ষুণ্ণ হয় না। একজন জার্ম্মান সম্রাট আর স্বামী বিবেকানন্দ! এঁরা স্বতঃই ভাস্বর!

লণ্ডনে পৌঁছে উঠলেন ষ্ট্যাডি-সাহেবের ভবনে। স্বামী সারদানন্দ তাঁর চিঠি পেয়েই উপস্থিত হয়েছেন ষ্টার্ডি-সাহেবের ভবনে। এপ্রিলমাসের প্রথম থেকেই বাস করছেন এঁর অতিথিরূপে ও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে চলেছেনও নিয়মিত। উভয়ে উভয়কে দেখেই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রথমেই খবর নিলেন আলমবাজারের মঠ ও গুরুভাই সহ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ভক্তগণের। সমস্ত কুশল অবগত হয়ে নিশ্চিন্ত ও খুশী হলেন।

লণ্ডনে সেন্ট জর্জ্জেস লেনে মিস মূলার ও মি. ষ্ট্যার্ডির অতিথি রূপে সারদানন্দ ও তিনি উৎসাহের সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে প্রচারের কাজ শুরু করলেন। এখানে স্বামিজী ফিরে এসেছেন, খবরটা ছড়িয়ে পড়লো সারা ইংলণ্ডে। দলে দলে শিক্ষিত নরনারী, তাঁর দর্শন কামনায় বা উপদেশ লাভের আশায় আগমন শুরু করলেন। সংবাদপত্রেও তাঁর কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা প্রকাশ হতে লাগলো। মে মাসের প্রথম থেকে নিয়মিত শিক্ষাদান ও প্রশ্নোত্তর ক্লাস চলতে লাগলো। 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান শুরু করলেন। ক্লাব, সভা, সমিতি, ড্রয়িংরুম এ বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হতে লাগলেন। মিসেস আনি বেশান্ত তাঁর আভিনিউ রোডস্থ ভবনে তাঁকে নিয়ে এলেন। এখানে তিনি 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। কর্নেল অলকটও সেখানে উপস্থিত হলেন।...

মিঃ ক্যানন হাওইস 'এ্যাংলিকান চার্চ্চের' অন্যতম নেতা। চিকাগো মহামেলাতে তাঁর সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় থেকেই তিনি তাঁকে ভালবাসতেন। ক্লাসে তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলেন। Sesame Club এ 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্লাবটি। বক্তৃতায় তিনি প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে 'আধুনিক' শিক্ষা প্রথার তুলনা করলেন। মানুষ গড়ে তোলাই ছিল সেদিনের সে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন বিবিধ তথ্য দ্বারা মস্তক-পূর্ণ করা ছিল না সে শিক্ষার অঙ্গ। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মানুষের মনই অনন্ত জ্ঞানের খনি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত জ্ঞানই ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে অবস্থিত রয়েছে সেখানে। অন্তর্নিহিত ঐ জ্ঞানের বহির্বিকাশের সাহায্য করাই প্রত্যেক শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উপমা দিলেন : 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' বিষয়ক জ্ঞান পূর্ব্ব থেকেই মানুষের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। আপেলের পতনটি নিউটনের কাছে উক্তজ্ঞান বিকাশের সহায়তা করেছিল মাত্র।...

মিসেস মার্টিন নামে জনৈকা বিদূষী ধন্যাঢ্যা মহিলা তাঁকে তাঁর বাড়ীতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। এখানে তিনি 'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। সেদিন ছিল দুর্য্যোগ-ভরা রাত্রি। তা সত্ত্বেও বহু ভদ্রলোক ও মহিলা মিসেস মার্টিনের আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। এমনকি রাজপরিবারের কয়েকজন গোপনে সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২৮শে মে, তিনি অক্সফোর্ডে, আচার্য্য ম্যাক্স মূলারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত হলেন। ইতিপূর্ব্বে 'নাইটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় 'প্রকৃত মহাত্মা' শীষক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা পড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে স্থির করেছিলেন স্বামিজী। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে, কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমতের সহসা পরিবর্ত্তনই সর্ব্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন থেকেই ওই মহাত্মার জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে যতটুকু পাই, আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে তাই পাঠ করে আসছি। যদি স্বামিজী আবশ্যক মত উপাদান সংগ্রহ করে দিতে পারেন, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী লিখতে তিনি প্রস্তুত আছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামিজী বললেন : আজকাল শ্রীরামকৃষ্ণ সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপাসিত হচ্ছেন। উত্তরে, তিনি বললেন : যদি এরূপ মহানপুরুষ উপাসিত না হন, উপাসনা কার হবে? আপনারা তাঁকে জগতের কাছে পরিচিত করার জন্য কি করছেন?

প্রচার কার্য্যের কথা বললেন স্বামিজী। অধ্যাপক সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। আহার শেষ হলে পর স্বামিজী ও মিঃ ষ্ট্যার্ডিকে সঙ্গে নিয়ে নগর ভ্রমণে বেরুলেন। দেখালেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও Bodleian Library. ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর অসীম দরদ, অফুরন্ত আগ্রহ, তার চেয়েও বেশী তাঁর জ্ঞান। মুগ্ধ স্বামিজী। উল্লাসে প্রশ্ন করলেন, আপনি কবে ভারতে যাবেন? আনন্দে মুখখানা, তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চোখের পাতাগুলো তাঁর অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। বললেন, তা হলে হয়তো আমি আর ফিরবো না। আমার দেহ আপনাদেরই সৎকার করতে হবে।

বিদায়ের সময় হয়ে এলো। সুরু হল ঝড়বৃষ্টি। ষ্টেশনে এলেন স্বামিজী। বৃদ্ধ অধ্যাপকও তাঁকে বিদায় অভিনন্দনের জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত। সলজ্জ স্বামিজী বললেন, এত কষ্ট করে এ দুর্য্যোগে আমাকে বিদায় জানাতে না এলেই পারতেন।

প্রীতি-ছলছল চোখে উত্তর দিলেন অধ্যাপক : শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য প্রত্যহ উপস্থিত হয় না!...

স্বামিজী অধ্যাপকের অনুরোধ অনুসরণে সানন্দে তার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে তথ্য যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ নামে বিখ্যাত একটি বই প্রকাশ করলেন। এই বইটি পাশ্চাত্য দেশে তাঁর প্রচারের যথেষ্ট সুবিধা করে দিল।

এরপর অবশ্য অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের অবকাশ ঘটেনি পত্রের যোগাযোগে পরস্পরের কুশল বিনিময় ও মানসিক যোগাযোগ রয়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত।

এই সময়ে ক্যাপটেন সেভিয়ার ও শ্রীমতি সেভিয়ারকে দীক্ষা দিলেন স্বামিজী। তাঁরা আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত ভারতের কাজে। মিসেস সেভিয়ার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন তাঁর মাতৃস্থানীয়া। তাঁকে মাতৃসম্বোধন করতেন তিনি (স্বামিজী)। এ সময়ে তিনি নোতুনভাবে তন্ময়। ৬ই জুলাই জনৈকা শিষ্যাকে লিখলেন : শুনে সুখী হবে, সহানুভূতিও ধৈর্য্যে, প্রতিদিন নোতুন নোতুন শিক্ষা লাভ করছি। উদ্ধত প্রকৃতির 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের' মধ্যেও 'দেবত্ব' উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছি। বোধ হচ্ছে, একদিন এমন অবস্থায় উপনীত হবো, যখন 'শয়তান' বলে কেউ আমার কাছে থাকবে না, সকলকেই সমচোখে দেখতে ও ভালবাসতে পারবো!.... বিশ বছর বয়সে, যেমন গোঁড়া, তেমনি একগুঁয়ে ছিলাম, সহানুভূতি প্রকাশ সম্ভব ছিল না সেদিন। কলকাতার যে দিকে 'থিয়েটার' হতো, তার সামনের ফুটপাত দিয়েও হাঁটতাম না— আজ তেত্রিশ বছর বয়সে পতিতাদের সঙ্গে একই বাড়ীতে অবস্থান করতে পারি, মুহূর্তের জন্যও তাদের ভর্ৎসনা করার কথা মনে উদয় হয় না। তবে কি আমি দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছি, না বিশ্বপ্রেমের দিকে এগিয়ে চলেছি— যা প্রভু স্বয়ং! শুনেছিলাম, যে তার চারদিকে মন্দ দেখতে পায় না, সে কখনও ভাল কাজ করতে পারেনা। কই আমি তো কিছু বুঝছি না। বরং দেখছি কাজ করার শক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোন কোন দিন ভাব সমাধি উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় সব জিনিষকে আশীর্ব্বাদ করি, ভালবাসি, আলিঙ্গন করি।... দেখছি, মন্দ বলে যা মনে করি— তা ভ্রান্তি মাত্র!

এসময়ে শিষ্যদের কাছে প্রায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতেন। "আমেরিকা যাওয়ার সময় খেতরী থেকে জয়পুরে এলাম। খেতরীর মহারাজা, জয়পুর পর্য্যন্ত এলেন তাঁকে বিদায় দেবার জন্য। এক সন্ধ্যায়, সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এক নর্ত্তকীকে আহ্বান করলেন মহারাজা। তিনি গান শোনার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন। উত্তরে জানালাম, সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্ত্তকীর নৃত্যগীতের আসরে যোগদান করা অন্যায়। একথা শুনে নর্ত্তকী মর্ম্মাহত হল। মহারাজের গুরু তাকে অবজ্ঞা করেছেন, এতই কি সে ঘৃণ্য! নারীসুলভ অভিমানে তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। চাপাকান্না সুরে গান গাইলো :'প্রভু, মেরা অবগুণ চিতে না ধরো। সমদর্শী হৈ নাম, তিহারো চাহে তো পার করো'। এই অকৃত্রিম আকুতি আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো। 'এক লোহা পূজামে রাখত, এক রহত ব্যাধ ঘর পর পরশকে মন দ্বিধা নঁহি-হৈ দুহু এক কাঞ্চন করো। এক নদিনয়া এক নীর কহবত মৈলী নীর ভরো। জব মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো, সুর-সুরি নাম অর, এক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগেরো। অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।।"

গণিকার কণ্ঠে সাধক সুরদাসের সে বাণী আমার চিত্তকে আকুল করে তুললো : জ্ঞানী কাহে ভেদ করো। হায় আমি অদ্বৈত বেদান্ত-বাদী সন্ন্যাসী অথচ ভেদবুদ্ধি এত তীব্র যে, বেশ্যা বলে ঘৃণায়

দর্শন পর্যন্ত করলাম না। আমার চোখের সামনে থেকে, একটা পর্দা উঠে গেল, অনুতপ্ত চিত্তে সেই নর্ত্তকীর কাছে দুর্ব্যবহারের জন্য লজ্জা প্রকাশ করলাম, এই ভেদবুদ্ধি দূর না হলে দৃষ্টি খুলে না, তাঁর অপার এই সৃষ্টির মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। ভালবেসে একান্ত আপন করে নেওয়াও যায় না।

আচার্য ম্যাক্সমূলার 'রামকৃষ্ণ জীবনী' প্রকাশ করলেন। রেভাঃ মজুমদার-মশাই আপত্তি তুলে পত্র দিলেন : শ্রীরামকৃষ্ণের নৈতিক চরিত্র তাদৃশ উন্নত ছিল না— যেহেতু তিনি বেশ্যাদের ঘৃণা করতেন না।

ম্যাক্সমূলার এসব নীতি তত্ত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে না পেরে নরম গরম জবাব দিয়ে দিলেন। তারপরেই এক আদর্শ ও নীতিবাদীর কাছ থেকে স্বামিজী পত্র পেলেন : দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে, অনেক বেশ্যা যায়, সেইহেতু অনেক ভদ্রলোকের, সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা কমে যাচ্ছে। উত্তরে তিনি জানালেন : আমেরিকায় ঠিক এমনি প্রশ্ন তুলে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, অপবিত্রতার ঘনীভূত প্রতিমারূপ বেশ্যাগণ দ্বারা সমাজের অমঙ্গল ছাড়া আর কিছু কি সাধিত হয়? তাঁকে যা উত্তর দিয়েছিলাম, আজও ঠিক তাই দিচ্ছি: পথের উপর যাদের দেখে ঘৃণায় নাক সিটকোও, তারাই বর্ম্মের মত দাঁড়িয়ে শত শত সতীকে লম্পটের অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা করে চলেছে। তাদের ধন্যবাদ দিও, ঘৃণা করো না। আরও বলি : বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যেতে না পারে, তো কোথায় যাবে? পাপীদের জন্যই প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নয়।...

...ঠাকুর ঘরে গিয়েও যারা ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ছোটলোক ভাবে, তাদের (সেই ভদ্রলোকের দলের) সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল! যারা, ভক্তের, জাতি বা যোনি বা ব্যবসা দেখে, তারা আমাদরে ঠাকুরকে কি বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক, তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজন ভদ্রলোক না আসে আসুক!.... বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত আসুক, অবারিত তাঁর দ্বার!....

কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন স্বামিজী। বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করলেন। সেভিয়ার দম্পতি ও ম্যাক্স মূলার তাঁকে সুইজারল্যাণ্ড নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। রাজি হলেন তিনি।... জুলাই মাসের শেষের দিকে শিষ্য ও বন্ধু সমভিব্যবহারে যাত্রা করলেন তিনি। পৌঁছলেন জেনেভা নগরীতে। সেখানে একটি প্রদর্শনী চলছিল। সেখানের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ দেখে খুশী হলেন। উৎসাহভরে দেখতে লাগলেন সব। শেষে বেলুন দেখে, বেলুনে উঠবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সূর্য্যাস্তরের পূর্ব্বে উড়বে না শুনে শিশুদের মত প্রশ্ন করলেন, এখনও সময় হয় নি? আকাশ ভ্রমণ নিরাপদ নয় ভেবে মিসেস সেভিয়ার বাধা দিলেন। সে কথা কানেই তুললেন না। তাঁকে বেলুনে উঠতে বাধ্য করলেন।

পরিষ্কার ছিল আকাশ। সূর্য্যাস্তের মনোহর শোভায় গভীর আনন্দ অনুভব করলেন। বেলুন থেকে নেমে ফটো তুলে হোটেলে ফিরে এলেন।.... Castle of Chillo. দেখতে সদলবলে গেলেন। তিনদিন থেকে Mount BlanC.এ ফিরে এলেন। সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদমালা পরিশোভিত মনোরম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভ্রমণ করে পরিব্রাজক জীবনের মধুর স্মৃতি ভেসে উঠলো। হিমালয়ের শান্ত শীতল কোলে, আশ্রয় রচনা করে অবশিষ্ট জীবন যাপনে আগ্রহ তাঁর বহুদিনের। ইচ্ছা ছিল এখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে অবশিষ্ট জীবন ধ্যান ও তপস্যায় কাটিয়ে দেবেন। সেখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ তাঁর সঙ্গে বাস করবেন। তাঁদের তিনি আদর্শ কর্ম্মী গড়ে তুলবেন। পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করবে ভারতীয়গণ আর ভারতের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন

পাশ্চাত্য শিষ্যগণ। সে কথা শুনে উৎসাহিত হলেন তাঁরা। তাঁরা ভবিষ্যৎ কাজের জন্য এরূপ একটি মঠের সত্যই প্রয়োজন আছে, তাঁরা সমর্থন জানালেন।... আরও কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে পার্ব্বত্য গ্রামে দু'সপ্তাহ বাস করলেন। তুষার মণ্ডিত 'আল্পস' পর্ব্বত শৃঙ্গমালা বেষ্টিত স্তব্ধ গ্রামে এসে তিনি কর্ম্ম কোলাহল, প্রচারের কাজ, দার্শনিক বিচার সব কিছুই বিস্মৃত হলেন। অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। পরিপূর্ণ বিশ্রামে তাঁর দীর্ঘ তিনবছরের শ্রম ও ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

জার্মানীর কীল নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পালডয়সন তাঁকে চিঠিতে আহ্বান করলেন। চিঠিখানা লণ্ডন হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের বাসায় পৌঁছালো। তিনি জার্ম্মানী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। পথে প্রখ্যাত নগর দেখলেন, শেষে রাজধানী কীল নগরে (Kiel) উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমন সংবাদে, অধ্যাপক তাঁদের প্রাতঃভোজের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। পরের দিন সকাল ১০টায় তিনি সদলবলে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সস্ত্রীক তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রচার কার্য্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করে. নিজে বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে একখানি বই রচনা করেছেন তা তাঁকে শোনাতে লাগলেন। বললেন : বেদ ও বেদান্তের এমনই মোহিনী শক্তি যে ক্ষণকালের মধ্যে বাহ্যজগৎ ভুলিয়ে দেয়। মনকে এক উন্নত আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে টেনে নিয়ে যায়। তাঁর অভিমত: সত্যের অনুসন্ধানে রত হয়ে মানুষ যে সব সত্যের আবিষ্কার করেছে— উপনিষদ, বেদান্ত দর্শন ও শঙ্কর ভাষ্য, তাঁদের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি, তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত সেই বেদান্ত চর্চ্চা। স্বামিজী এঁর সঙ্গে বেদান্ত ও উপনিষদ আলোচনা করে খুশী হলেন। অধ্যাপক ডয়সন বেদান্ত ও উপনিষদকে দর্শন শাস্ত্র না বলে উচ্চতম ও পবিত্রতম নৈতিক জীবন যাপনের একমাত্র অবলম্বনীয় পথ বলে নির্দ্দেশ করলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে (বোম্বাই শাখা) বেদনান্ত সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা আবৃত্তি করে শোনালেন : And so the Vedanta in its unfalsified form, is the strongest support of pure morality, is the greatest consolation in the sufferings of life and death. Indians keep to it (অবিকৃত বেদান্তদর্শন, পবিত্র নীতিসমূহের দৃঢ়ভিত্তি এবং জীবন ও মৃত্যুর দুঃখ সমূহের পরম সান্ত্বনার স্থল। হে ভারতবাসী? ইহাকে দৃঢ় রূপে ধরে থাক।)

স্বামিজী তাঁকে স্বীয় উপলব্ধি থেকে উপনিষদের কতকগুলি জটিল ও দুর্ব্বোধ্য শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শোনালেন। প্রাতঃভোজন শেষ হল। কিন্তু অধ্যাপক তাঁকে ছাড়লেন না। মধ্যাহ্ন ভোজন করার জন্য অনুরোধ করলন। সেদিন কন্যার জন্মতিথি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তাঁকে বিদায় দিতে পারেন না। তাঁদের ভারত ভ্রমণ কাহিনী শোনাতে লাগলেন অধ্যাপক দম্পতি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের হৃদয়জয় করে নিলেন তিনি।

আলোচনা চলছিল, অধ্যাপক অন্য কাজে উঠে যেতে বাধ্য হলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখলেন; তিনি একটি কবিতার বইয়ের পাতা উল্টে চলেছেন। এত অভিনিবেশ সহকারে পড়ছিলেন যে, অধ্যাপকের ডাক তাঁর কানে পৌঁছালো না। বইখানি শেষ হল। অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন তিনি বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করছেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে নিলেন। বললেন, বইখানা পড়ছিলাম। আপনি তো বহুক্ষণ এসেছেন! অধ্যাপক কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখে মুখে তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বইটিতে যা পড়েছিলেন তা অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। বিস্মিত অধ্যাপক। শুধালেন, নিশ্চয় পূর্ব্বে এ বইখানা পড়েছিলেন— নইলে আধঘণ্টায় চারশো পাতা কি শেষ করা যায়? অসাধ্য!

উত্তরে মৃদু হাসলেন, তিনি। বললেন : সংযতমনা যোগীর পক্ষে তা অসম্ভব নয়। আমার মনে হয়, এ ক্ষমতা সকলেই লাভ করতে পারে। আপনি জানেন, আমি কামকাঞ্চন, ত্যাগী

সন্ন্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের ফল স্বরূপ এ ক্ষমতা আমাতে উপস্থিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে অনেকে বিশ্বাস না করতেও পারেন, কিন্তু ভারতে ব্রহ্মচর্য্য বলে, এ প্রকার স্মৃতি শক্তির অধিকারী, বিরল হলেও একেবারে অদৃশ্য হয়নি।

অধ্যাপক মেনে নিলেন তাঁর যুক্তি। মনের মত সঙ্গী পেয়েছেন তিনি। আলাপ আলোচনায় কাটলো কয়েকটা দিন। স্বামিজী লণ্ডনে ফিরে যাবেন শুনে আরও কিছুদিন সেখানে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি জানালেন : ইংলণ্ডে প্রচারের সুব্যবস্থা করে ভারতে ফিরে যাবেন। এখন সেই ব্যবস্থার প্রয়োজন।

তাঁর অভিপ্রায় অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নিলেন। বেদান্ত আলোচনায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে আরও কিছুদিন অতিবাহিত করতে পারবেন এই আশায় উপস্থিত হলেন লণ্ডনে।

জুন মাসের শেষে, সারদানন্দজীকে পাঠালেন আমেরিকায়। অভয়ানন্দজী ভারত থেকে এসে গেলেন ইতিমধ্যে। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রচারের কাজের দায়িত্ব বহনে সমর্থ হন, আবশ্যক মত তাঁকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে লাগলেন।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করে কতকগুলি বক্তৃতা দিলেন। কর্ম্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ শীর্ষক বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক মহান আদর্শের অনুগামী হবার ইঙ্গিত করলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে ইয়ুরোপ যে আাদর্শে পৌঁছাবার চেষ্টা করছে, কাজে পরিণত করতে হলে, তাকে হিন্দুর অদ্বৈতবাদও বেদান্ত গ্রহণ করতে হবে। অন্ধের মত জড়বিজ্ঞানের অনুসরণ করে ইউরোপ যে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, সেই জ্বালাময়ী বিশ্বশোষী তৃষ্ণা নিবারণ করতে হলে, প্রয়োজন তার প্রাচ্যের প্রাচীন দর্শন, ধর্ম্ম ও অপূর্ব্ব অদ্বৈত বেদান্ত। উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : তোমাদের আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির জ্বালাময় আগ্নেয়গিরির ওপরে যে চাকচিক্যময়, বাহ্য সম্পদশালী সভ্যতার স্বর্ণপুরী নির্ম্মাণ করেছ, যে কোন মুহূর্ত্তেই গৈরিক নিশ্রাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে! যদি তোমরা এই অভিনব বার্ত্তাকে অস্বীকার কর, তাহলে ভাবী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধ্বংস তোমাদের অবশ্যম্ভাবী।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে ভারতে ফেরার অভিপ্রায় প্রকাশ করতে লাগলেন। আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দ ও ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত ক্লাসের ছাত্রসমাজে গৃহীত হয়েছেন দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি ভারতে ফিরতে উদ্যত জেনে মিসেস ওলি বুল, ভারতীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে চাইলেন। "তিনি যে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের জন্য একটি স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেছেন সে কাজে তিনিও সহমত। যদি তিনি ইচ্ছা করেন প্রয়োজন মত অর্থ এখনই গ্রহণ করতে পারেন" চিঠিটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। আড়ম্বরের সঙ্গে কোন কাজ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ধীরে ধীরে, মাদ্রাজ, কলকাতা ও হিমালয়ে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করবেন। মিসেস বুলকে জানিয়ে দিলেন ভারতে গিয়ে তাঁকে সবিস্তারে জানাবেন, আপততঃ অর্থ গ্রহণে ইচ্ছা তাঁর নেই।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, ভারত যাত্রা করবেন শুনে ইংলণ্ডের বন্ধু ও শিষ্য মণ্ডলী ১৩ই ডিসেম্বর Royal Society of Painters সমিতির প্রকাণ্ড হলে একটি সভার আয়োজন করলেন। তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য বিরাট জনসঙ্ঘ নীরব বিষাদ গম্ভীর। আচার্য্যদেবকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন ভাবের আতিশয্যে। সজল তাঁদের চোখের পাতা। অস্ফুট তাঁদের কণ্ঠস্বর।

এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন স্বামিজী। বললেন : হয়তঃ আমি শ্রেয়ঃ মনে করে, এ দেহবন্ধন ছিন্ন করতে পারি, —একে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করতে পারি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেকেই উচ্চতম সত্য উপলব্ধি করতে না পারছে, ততদিন মানবজাতির কল্যাণ কামনায় ধর্ম্ম প্রচারে বিরত আমি হবো না।....

কয়েকদিন পরে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলেন : অবতার ও মুক্ত পুরুষের মধ্যে প্রভেদ কি?

প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে বললেন : আমার মনে হয়, 'বিদেহ মুক্তি'ই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। সাধন অবস্থায় যখন ভারত ভ্রমণে রত ছিলাম, দিনের পর দিন নির্জ্জন গিরি গুহায় ধ্যান করে কাটিয়েছি, মুক্তি লাভ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে সময় সময়, অনাহারে তনুত্যাগ করার সঙ্কল্প করেছি, এখন মুক্তি লাভের কোন কামনাই আর নেই! যে পর্য্যন্ত একজন মায়ায় বদ্ধ থাকবে, সে পর্য্যন্ত মুক্তি কামনা আমি করি না।

... তিনি পাশ্চাত্য দেশে এসেছেন, প্রচারকার্য্য চালিয়েছেন, সফলতার দিকে কোন লক্ষ্য তাঁর ছিল না। প্রতি সপ্তাহে বারো চোদ্দঘণ্টা বা কখনও তারও বেশী বক্তৃতা দিয়ে গেছেন, কোথায় কি বলবেন, বা বলার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে ছিলেন যন্ত্রচালিতের মত। যিনি তাঁকে পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে গেছেন, তিনিই সব জুগিয়েছেন। পরিচালক সেই রামকৃষ্ণ। তিনিই সে শক্তি সঞ্চার করছেন। তিনি শুনেছেন, গভীর রাতে আগামী দিনের বক্তৃতা, কে যেন অনর্গল বলে চলেছেন। নোতুন তত্ত্ব ও নোতুন ভাবেভরা বাণী যে তাঁর গুরুর, তাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নেই। শুধু সে বাণীই প্রচার করে চলেছেন। ঐশী শক্তির বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। লোকের মনের গুপ্ত কথা জানতে পারছেন, স্পর্শ করে অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দিতে পারছেন ঠিক তাঁর গুরুদেবের মত।

অনুকম্পায় উচ্ছল ছিল অন্তর। মানুষকে আশার বাণী শোনানোর আগ্রহে থাকতেন উন্মুখ, অপমানিত বা উৎপীড়িত হলেও আশীর্ব্বাদ করতেন সকল সময়। অপামর জনসাধারণকে সমর্থন, অসহায়ের পক্ষ অবলম্বন, দুর্ব্বলের হয়ে লড়াই ছিল, তাঁর সেদিনের সে সাধনা। তাঁকে অদ্ভুত প্রতিভাশালী পণ্ডিত বলে তাঁরাও তাঁকে ভালবাসতেন। সতত করুণায় দ্রব সেই হৃদয়ের জন্য তারা আকৃষ্ট হতেন। সত্যিই যেন প্রত্যক্ষ জীবন্ত করুণার প্রতিমূর্ত্তি তিনি!....

রুশ দেশ যাবার জন্য ডাক এলো— কানে বাজছে তখন মাতৃভূমির আহ্বান। এক বন্ধুকে জানালেন : অন্তরের নিভৃত নিরালয়ে শুনতে পাচ্ছি জন্মভূমির ডাক-' রুশদেশ যাবার প্রস্তাব মুলতবী রইলো।..... যাত্রা এবার ইতালী অভিমুখে।

১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগের আয়োজন পরিপূর্ণ। সঙ্গে চলেছেন সেভিয়ার দম্পতি। মিঃ গুডউইন তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন নেপলসে। সাউদাম্পটন থেকে যাত্রা করেছেন ইতালির অভিমুখে। এক ইংরাজ বন্ধু জিজ্ঞাস করলেন : চার বছর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী এই পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর, আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগবে?

উত্তরে বললেন : পাশ্চাত্য ভূমিতে আসার পূর্ব্বে, ভালবাসতাম আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে। তার প্রতিটি ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার কাছে পবিত্র। বাতাস পবিত্রতামাখা, আমার তীর্থ স্বরূপ— আমার জন্মভূমি!

ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে ; আল্পস পর্ব্বতমালা পিছে রেখে মিলান ও পিশা নগরী পরিদর্শন করে সেভিয়ার দম্পতিসহ উপনীত হলেন ফ্লোরেন্স নগরীতে। ইতালীর চারুকলাললিতার কেন্দ্রস্থল। দেখলেন নগরীর চিত্রমালা। পরিদর্শন করলেন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি। ভ্রমণ করলেন পার্কে। দেখা হয়ে গেল মি. ও মিসেস হেইলের সঙ্গে। যদিও অপ্রত্যাশিত, তবুও আনন্দিত হলেন মনে প্রাণে। ইনিই সেই মিসেস হেইলেই, যিনি মহামেলার অব্যাবহিত পূর্ব্বে তাঁকে আশ্রয় প্রদান ও নানাপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। প্রচারের জন্য যতবার চিকাগো গিয়েছেন তাঁকে হোটেলে বাস করতে দেননি।

ফ্লোরেন্স থেকে এলেন রোমে। প্রাচীন রোমকজাতির কীর্ত্তিকলাপের গৌরবময় শ্মশানভূমি মহানগরী। এখানে মিস এড্‌সওয়ার্ডস ও তাঁর শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের ভ্রাতষ্পুত্রী মিস্ এলবার্টা ষ্টারগিস বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লেন। এক সপ্তাহ এখানে থেকে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করে নিলেন। এখান থেকে নেপলসে এলেন। জাহাজ বন্দরে আসার দেরী আছে। ঘুরে এলেন ভিসুবিয়স আগ্নেয়গিরি ও পম্পাই নগরী। ইতিমধ্যে সাউদাম্পটন থেকে ভারতগামী জাহাজ (Print Regent Luitpold) এসে পড়লো। ৩০শে ডিসেম্বর সদলবলে যাত্রা করলেন ভারত অভিমুখে।

জাহাজ এগিয়ে চলেছে। মধ্য রাত্রি। সবেমাত্র ঘুমিয়েছেন তিনি। স্বপ্নে দেখলেন : এক শ্বেত শ্মশ্রু শোভিত দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, ঐ ক্রীট দ্বীপ। এখান থেকে উত্থিত হয়ে জগতে প্রচারিত হয়েছিল খ্রীষ্টধর্ম্ম। খোঁড়—খুঁড়লেই সন্ধান পাবে। .... মিলিয়ে গেল স্বপ্ন। ঘুম ভেঙে গেল সেই মুহূর্ত্তে। বেরিয়ে এলেন কেবিন থেকে। সামনে পড়লো জাহাজের এক কর্ম্মচারী। জিজ্ঞাসা করলেন রাত্রি এখন কত?

উত্তর এলো—বারোটার কিছু বেশী।

কোথা দিয়ে চলেছি আমরা? শুধালেন তিনি।

ক্রীট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইল দূর দিয়ে (fifty miles off Crete). উত্তর দিল সংক্ষেপে।

বিস্মিত হলেন তিনি। স্বপ্নের এই বাণী গভীরভাবে রেখাপাত করলো তাঁর মনে। (তাঁর দেহত্যাগের পরে খোঁড়া হয়েছিল ক্রীটদ্বীপ। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবিধ মূল্যবাণ উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছিল এইখানে।)....

...ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। দুজন ইংরাজ খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক চলেছেন প্রচারের উদ্দেশ্যে। সহসা আলাপ হয়ে গেল তাঁদের সঙ্গে। একদিন, হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম নিয়ে শুরু হল আলোচনা। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে হার মানলো যাজকদ্বয়। মনের ক্ষোভ চাপতে না পেরে অভদ্র ভাষায় গালি দিতে সুরু করলো হিন্দুধর্ম্মকে। আক্রমণ করলো হিন্দু জাতিকে। তাঁরা দুপাশে দুজন, মাঝে স্বামিজী। ডেকের উপর দিয়ে চলেছেন হেঁটে। প্রতিবাদ করলেন তিনি। ধর্ম্মযাজক সংযত হলেন না। রুখে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, আমার ধর্ম্মকে ফের যদি গালি দাও, সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেবো আমি। সাবধান—!

তাঁর সেই রুদ্র মূর্ত্তি দেখে উদ্ধত যাজকদ্বয় শান্ত হয়ে পড়লেন। দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন— ভিক্ষা করলেন বন্ধুত্ব!....

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী। রাতের আধার মিলিয়ে গিয়ে ঊষার আলো ফুটে উঠলো। কলম্বো বন্দরের চিত্র ভেসে এলো চোখের পর্দ্দায়। তিনি ডেকে দাঁড়িয়ে বেলাভূমির দিকে তাকালেন। দূর দিগন্তে অস্পষ্ট চক্ররেখায় বিলীন প্রায় ভারতমাতার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন, হে আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী দেশমাতৃকা —দীন সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার হৃত-গৌরবে ব্যথিত হয়ে, সহায় সম্পদহীন এই অকিঞ্চন সন্তান তোমার, ভোগৈশ্বর্য্যের কেন্দ্রভূমি আমেরিকা যাত্রা করেছিল। তোমার মুক্তি পথের সন্ধান লাভের জন্য উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করেছে সমগ্র পৃথিবী —সফলতা লাভ হয়েছে কিনা ভবিষ্যৎ তার সাক্ষী হয়ে থাক! হে দেবলীলাস্থল পুণ্য জন্মভূমি, লহ আজ আমার অকুণ্ঠ প্রণতি!....

একটানা চার বছর চরখীর মত ঘুরেছেন, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে, ভূমি প্রস্তুত করতে হবে, 'স্বীয় জন্মভূমি' সাধনাকে কেন্দ্র-পীঠ করে। দৃষ্টি এবার ফিরে দাঁড়ালো পিছনের দিকে। কাজ এবার করতে হবে, স্বদেশে— ভারতবর্ষে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছিল জননী— পাঠান, হুণ, মোগল সাম্রাজ্য পত্তনের দিন থেকে। তারা এসেছে, গেছে, তাদের গ্রাস করেছেন নিজের ক্রোড়ে তুলে নিয়ে। ভেঙে দিয়েছেন তাদের বিষ দাঁত, সাম্রাজ্য পত্তনের নেশায়

বিভোর, স্বকীয় দ্বন্দ্বের আবর্ত্তে। আর আজ? যারা শাসন করছেন, তাঁর বুকের রক্ত অপহরণ করে, তাঁর সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। যাদের রক্তে মেশানো নেই রাজরক্ত। এদের হৃদয় নেই, বুঝে শুধু : শোষণ আর পেষন। তাদের লুণ্ঠন থেকে, তাঁকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন আজ— খাঁটি অকপট সেই সব মানুষ, যারা আত্মবলি দেবে, তাকাবে না পিছনের দিকে। তাদের অঙ্গে থাকবে না মায়ার বন্ধন!.... চাই সেই আত্মত্যাগী পুরুষের দল।....

চারপাশে সুনীল জলধি, মাথার ওপর সুনীল আকাশ, তুষার ধবল আছড়ে পড়া ঢেউ এর পর ঢেউ। জাহাজ এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তিনি, ঘিরে আছে অফুরন্ত অবসর। সামনে খোলা দুটি চোখ, তাকে কেন্দ্র করে বিস্তার করে আছে চিন্তার আবর্ত্ত!... হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ .. সে হিসাব চায়— কি দিল, কি পেল! খেই যেন হারিয়ে ফেলেছে, সে যেন নিজেকে, হারিয়ে ফেলছে নিজেরই আবর্ত্তে!— হিসাব-নিকাশের এইতো অবসর।.... কি দেখে এলেন— পিছনে ফেলে আসা পাশ্চাত্যের সভ্যতার আলোকে?... সেখানে আছে : সাহস, শক্তি, প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার— তার পিছনে লুকিয়ে আছে কুটিল রাজনীতির খেলা। আর আছে উৎকাচ দিয়ে ভোট গ্রহণের প্রচেষ্টা, ব্যালটের সাহায্যে আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, বণিকের শোষণ নীতি, সাম্রাজ্যবাদীর সাম্রাজ্যলিপ্সা আর সংসার সমুদ্রে সর্ব্বজয়ী বৈশ্য শক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন... ইশামশি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিনী ভুজবলের ভুকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর... কলের চিমনি, বাহিনী, পোত, যুদ্ধক্ষেত্র, জগতের পাণ্যবীথিকা... সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী..... আর কিছু?... যা ধরা পড়েছে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণে বৈশ্যশাসিত ইউরোপের বুকে ধূমায়িত শূদ্রের বিদ্রোহ?.... ভেসে উঠছে সেই দৃশ্য: সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন..... সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ— সমষ্টি ছেড়ে ব্যষ্টির অস্তিত্ব অসম্ভব.... এ অনন্ত সত্য। জগতের মূলভিত্তি এই। ... প্রকৃতির চোখে ধূলি— কোথায় সে শক্তি!— সমাজের চোখে ধূলি— ব্যর্থ সে ছলনা! সর্ব্বংসহা ধরিত্রী— সমাজও তাই কিন্তু সেখানেও জাগরণের চেতনা আসে! সেই উদ্বোধনের বীর্য্যে— যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতা, স্বার্থপরতারাশি ধুয়ে মুছে যায়!... সে সুদিন বহুদূরাগত!... তবে কি যাত্রা তাঁর বিফল? ... অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার!.... দেখা গেছে উষার আলো... তাহলে!... আশা তাঁর পূর্ণ হয়নি। তাঁর স্বদেশবাসীর জন্য যে সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন, তা তিনি পাননি। স্পর্ধিত ভোগলোলুপ, আত্মপরায়ণ পাশ্চাত্য জগত— তারা অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক— তাঁর ভিক্ষাপাত্রে দিয়েছে মুষ্টি ভিক্ষা। দারিদ্র, পীড়িত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাঁর স্বদেশবাসী, তাদের ভ্রষ্ট জীবনের হৃত গৌরব উদ্ধারই ছিল তাঁর ব্রত,— হয়েছেন কি সফল? চিন্তা স্রোতে হাত বাড়ালেন তিনি!.... পরমুহূর্ত্তে দৃষ্টিশক্তি তাঁর স্বচ্ছ হয়ে উঠলো : ভারতীয় চিন্তাসম্পদ, ইউরোপের দর্শন ও সাহিত্যে পরিপুষ্ট। তার ঐশ্বর্য্য, অপহরণেই সে ঐশ্বর্য্যশালী। বিশ্লেষণ করলেন নিজের মনে:, মহান সে উদ্দেশ্য তাঁর সফলতা লাভ করেনি। নোতুন আশায় বুক বাঁধলেন : নোতুন কাজে এবার নামতে হবে, জাতীয় জীবনকে সুসংগঠিত করতে হবে। ধর্ম্মকে জীবন্ত, সমাজকে গতিশীল করে, সৃষ্টি করতে হবে সৎসাহসী ও বীর্য্যবান মানুষ। স্থির করে নিলেন : এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। এমন ধর্ম্মপ্রচার করতে হবে, যাতে তৈরী হবে সত্যকার মানুষ।....

১৫ই জানুয়ারী নোঙ্গর করলো জাহাজ কলম্বো বন্দরে। গুরুগম্ভীর বংশীধ্বনিতে ঘোষণা করলো তাঁর আগমন বার্ত্তা। উন্মেষিত হল নব যুগ।

অস্তগামী সূর্য্য হেলে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিম আকাশে। বিপুল জনসমাবেশ সমুদ্রকূলে। গৈরিক উষ্ণীষমণ্ডিত শির, চোখে পড়লো জনতার। জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল আকাশ বাতাস। কলনিনাদ প্রতিবিম্বিত হল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে।....

কলম্বোর হিন্দু সমাজের মুখপাত্র-স্বরূপ মাননীয় কুমার স্বামী প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এগিয়ে এসে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন তাঁকে। তিনি বুঝলেন, এ অভ্যর্থনার আয়োজন তাঁরই জন্য।... যুগলাশ্বযোজিত শকটে আরোহন করে প্রবেশ করলেন নগরে। পত্র-পুষ্প পল্লব রচিত তোরণদ্বার অতিক্রম করে চললো শোভাযাত্রা। পতাকা ও পুষ্পমালাশোভিত রাজপথ বেয়ে 'দারুচিনি উদ্যান'। সম্মুখে এসে থামলো গাড়ী। নেমে দাঁড়ালেন তিনি। শত শত লোক তাঁর পদধুলি গ্রহণ করলো। কুমারস্বামী তাঁর সামনে প্রণত হয়ে অভিনন্দন পত্র প্রদান করলেন।

সমবেত জনতার আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তিনি অভিনন্দন পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : আমি কেন মহারাজা বা ধনকুবের বা প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা নই, কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী! আপনারা আমাকে যে সাদর অভ্যর্থনা করলেন, তাতে এটুকুই বুঝলাম, হিন্দুজাতি এখনও তার আধ্যাত্মিক সম্পদ হারায়নি। নইলে একজন সন্ন্যাসীর প্রতি এত ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রদর্শন করতে যাবেন কেন? অতএব হে হিন্দুগণ, তোমরা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হারিও না। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধর্ম্মাদর্শনকে দৃঢ়বলে আঁকড়ে ধরে রাখো!....

১৬ই জানুয়ারী বক্তৃতা দিলেন 'ফ্লোরেন্স হলে'। পাশ্চাত্য থেকে ফিরে প্রথম বক্তৃতা 'পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে'। পরদিন দর্শকবৃন্দের সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনায় কাটালেন। অপরাহ্নে স্থানীয় শিবমন্দির দর্শনে গেলেন। পথে দলে দলে নরনারী তাঁকে ফল, ফুল ও মালা উপহার দিতে লাগলো। নগরীর সৌধবাতায়ন থেকে পুরনারীগণ ফুল ও গোলাপজল বর্ষণ করতে লাগলেন। মন্দির দ্বারে সমবেত জনতা তাঁকে 'জয় মহাদেব' ধ্বনি সহকারে অভ্যর্থনা জানালেন। মন্দির দর্শন করে পুরোহিতগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে বাসায় ফিরে এলেন। কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে রাত আড়াইটা পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনা করলেন। পরদিন সকালে কলম্বোর পাবলিক হলে 'বেদান্ত দর্শন' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

১৯শে জানুয়ারী কলম্বো 'স্পেশাল ট্রেণে' কাণ্ডি যাত্রা করলেন। স্থির করেছিলেন কলম্বো থেকে জাহাজে মাদ্রাজ যাবেন কিন্তু সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রমাগত টেলিগ্রাম আসতে থাকায় সে সংকল্প ত্যাগ করলেন। স্থির করলেন, স্থলপথেই মাদ্রাজ যাবেন। কাণ্ডিতে হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হল। সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে অগ্রসর হলেন 'জাফনা' অভিমুখে। বৌদ্ধযুগের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের জন্য বিখ্যাত অনুরাধাপুরম নগরীতে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনুরোধে 'উপাসনা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের শাখা থেকে উৎপন্ন সুপ্রাচীন পবিত্র অশ্বত্থ গাছের তলায় সে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুরাধাপুরম থেকে জাফনা একশো কুড়ি মাইল পথ। গরুর গাড়ীতে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। গ্রাম থেকে শত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ তাঁকে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করলেন। রক্তের সঙ্গে জড়ানো এদের ধর্ম্ম। চিকাগো বক্তৃতার সাফল্যের সংবাদ এরাও রাখে— হলই বা তারা গ্রাম্য কৃষক সম্প্রদায়!

সন্ধ্যার সময় জাফনায় পৌঁছুলেন। সুসজ্জিত রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চললো শোভাযাত্রা। স্থানীয় হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণে তৈরী ছিল মনোরম একটি মণ্ডপ। নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। অভিনন্দন পত্র দিলেন জাফনা অধিবাসী। সংক্ষেপে তার জবাব দিলেন তিনি। পরদিন দিলেন 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা। সেখান থেকে একটা ষ্টীমার ভাড়া করা হল। শিষ্যবর্গ, গুরুভ্রাতা নিরঞ্জানন্দ সহ যাত্রা করলেন ভারত অভিমুখে। রামনাদাধিপ রাজা ভাস্কর বর্ম্মা সেতুপতি সদলবলে পাম্বানে উপস্থিত ছিলেন। বিপুলজনসঙ্ঘ সমুদ্র তীরে প্রতীক্ষা করছিল। রাজকীয় সুসজ্জিত 'বোটে' অবরোহন করে ভারতের মাটিতে পদার্পন করলেন তিনি। জয়ধ্বনি দিলো জনতা। রামনাদধিপ ভুলণ্ঠিত হয়ে তাঁর চরণে পতিত হলেন। সহস্র সহস্র শির স্পর্শ করলো ভুমি।

আশীর্ব্বাদ করলেন সকলকে। সমুদ্রতীরে বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে নাগলিঙ্গম পিলেমশায়, পাম্বানের অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করলেন। পাম্বানবাসীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন। উপসংহারে বললেন : রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালবাসা দেখিয়েছেন, সে কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। আমার দ্বারা যদি কিছু কিছু সৎকাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে, তার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহাপুরুষের কাছে ঋণী। কারণ তাঁর মনেই আমাকে চিকাগো পাঠাবার পরিকল্পনা, প্রথম উদয় হয়। ঐভাব, আমার মাথায় প্রবেশ করিয়ে কাজে পরিণত করার জন্য বার বার আমায় উত্তেজিত করেন। এখন তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে, আমি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ আরও অধিক কাজে আশা রাখি। যদি এঁর মত আরও কয়েকজন রাজমহারাজ আমাদের মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হয়ে জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করেন, উৎসাহিত হবে দেশ, উৎসাহিত হবে জনগণ। সভা শেষ হল। স্বামিজীকে তাঁর নির্দ্দিষ্ট বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হল। রাজাজীর আদেশে শকট থেকে অশ্ব খুলে নেওয়া হল। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, স্বয়ং রাজা বাহাদুর পর্য্যন্ত সেই শকট টেনে নিয়ে চললেন। পরদিন শ্রীশ্রী রামেশ্বরের মন্দির দর্শনে গেলেন তিনি। প্রায় পাঁচবছর পূর্ব্বে এইস্থানে তাঁর 'পরিব্রাজক' ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। সেদিন ছিলেন অপরিচিত সন্ন্যাসী। রাজকীয় শকট মন্দিরের সমপবর্ত্তী হ'বামাত্র, হাতী, উট, ঘোড়া, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা ও গীতবাদ্যসহ বিরাট শোভাযাত্রা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। মন্দিরে প্রবেশ করে সহস্র স্তম্ভোপরি বিরাজিত চাঁদনি ও মন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সমূহ দর্শন করলেন। দেবদর্শন শেষ হলে, তাঁকে মন্দিরের বহুমূল্য মণি, মুক্তা, হীরক প্রভৃতি দেখানো হল। শেষে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন। মিঃ নাগালিঙ্গম তামিল ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন 'যত্র জীব তত্র শিব!' এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতি নরনারীর সেবায় অগ্রসর হওয়াই যথার্থ শিবভক্তি। কেবল বসে বসে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকার অপরূপ সৌন্দর্য্যের প্রশংসা সহকারে স্তোত্র পাঠে সে প্রতিমা বিশেষের সেবায় নিযুক্ত থাকা— আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। ভক্তি সেখানে পরিপক্ক হয়নি।

সেদিন স্বামিজীর শুভাগমন উপলক্ষে সহস্র সহস্র দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হল। বস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করা হল স্বামিজীর সম্মানে। যে স্থানে তিনি প্রথম পদ স্থাপন করেছিলেন, রামনাদাধিপ সেখানে ৪০ ফুট উঁচু স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে দিলেন।

রামনাদাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন। রাজাবাহাদুরের ব্যবস্থানুসারে অধিবাসীগণ যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন। গেট থেকে হ্রদ তীরে, অবতরণ করামাত্র রাজপ্রাসাদ থেকে তোপধ্বনি করে সম্মান প্রদর্শন করা হল। রাজকীয় শকটে চড়ে তিনি সুসজ্জিত রাজপথ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। রাজাবাহাদুর, রাজভ্রাতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীগণ পায়ে হেঁটে তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন দেশী ও ইংরেজী বাদ্যকরগণ ঐক্যতানে তাঁদের পশ্চাৎ অনুগমন করলো।

অভ্যর্থনা মণ্ডপ জনতায় পরিপূর্ণ। তিনি সদলবলে সমাগত হবামাত্র জয়ধ্বনি সহকারে তাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজাবাহাদুর সভার উদ্বোধন করলেন। রাজভ্রাতা দিনকর বর্ম্মা সেতুপতি, অভিনন্দন পাঠ করলেন। তিনি অভিনন্দন পত্রের উত্তর দিলেন। তাঁর শুভাগমন উপলক্ষ্যে রাজাবাহাদুর মাদ্রাজ-দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের জন্য সাধারণের কাছে চাঁদা তোলার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

পরমকুড়ি, মনমদুরা, মদুরা, ত্রিচিনাপল্লী ও তাঞ্জোর প্রভৃতি সহরে অভিনন্দিত হয়ে কুম্ভকোনমে উপস্থিত হলেন। হিন্দুগণ দুখানি অভিনন্দনপত্র তাঁকে দিলেন। উত্তর 'বেদান্ত' সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনদিন বিশ্রাম নিয়ে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মাদ্রাজে মাননীয় জাষ্টিস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয়ের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল। প্রতি সৌধ চূড়ায় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা হল। তোরণ তৈরী হল রাজপথে। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য সমগ্র মাদ্রাজ নগরী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করলো।

৬ই ফেব্রুয়ারী প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী ষ্টেশনে সমাগত হল। ট্রেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়াবামাত্র সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হল। গাড়ী থেকে নেমে এলেন তিনি। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ অগ্রসর হয়ে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন। উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে কয়েকমিনিট আলাপ করে শকটে আরোহণ করলেন। জাষ্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবান্দ তাঁর পাশে বসলেন। গাড়ী এর্টনী বিলিগ্রামী আয়াঙ্গার মহোদয়ের 'ক্যাসল কারনান' অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হল। দলে দলে নরনারী তাঁর শিরে অবিরত পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলো। যুববৃন্দ গাড়ীর ঘোড়া খুলে নিজেরাই সে স্থান অধিকার করে নিল। কেউ কেউ নারিকেল ও অন্যান্য ফল উপহার দিতে লাগলো। কোন্ কোন পুরনারী রাজপথে তাঁকে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করতে লাগলেন। কেউ বা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ফুল ও চন্দনে অর্ঘ্যদান করতে লাগলেন।

জনৈকা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বৃদ্ধা রমনী, কাঁপতে কাঁপতে গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁকে দেখে ভাবে গদ্গদ হয়ে উঠলেন। দু চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। স্বামিজীকে সাক্ষাৎ শিবাঅবতার ভেবে নিলেন। অনুভব করতে লাগলেন : জীবনের সব পাপ ও মলিনতা দূর হয়ে গেছে। মৃত্যুর পর তাঁর শিবলোক প্রাপ্তি ঘটবে।....

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে পরের দিন (রবিবার) অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হল। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সভা সমিতির পক্ষ থেকে কুড়িখানি বিভিন্ন ভাষায় অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হল। জমায়েত হল, দশ হাজারের বেশী লোক। স্থানাভাব বশতঃ বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো অনেকে। অবস্থার চাপে তাঁকে গাড়ীর কোচবক্সের উপর উঠে দাঁড়াতে হল। গীতা হাতে নিয়ে বক্তৃতার সুযোগ পেয়ে গেলেন কিন্তু জয়ধ্বনি ও হর্ষ কোলাহলে তা সম্ভব হল না। সংক্ষেপে বললেন : জনসঙ্ঘের এই অকৃত্রিম উৎসাহ দেখে খুশী হয়েছেন, তবে এই উৎসাহকে স্থায়ী করা চাই। ভবিষ্যতে দেশের জন্য অনেক বড় বড় কাজে এরূপ প্রজ্জ্বলিত উৎসাহাগ্নির প্রয়োজন হবে। ... পরদিন ভিক্টোরিয়া হলে বক্তৃতা দিলেন, 'আমার সমর নীতি'। ক্রমে ক্রমে বারটি বক্তৃতা দিলেন "ভারতীয় জীবনে বেদান্ত", "ভারতীয় মহাপুরুষগণ", 'আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য' ও 'ভারতের ভবিষ্যৎ'। সানন্দে শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলীর সঙ্গে কাটালেন নদিন। এখানে এক মহাপণ্ডিত তাঁর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করতে এলেন। স্বামিজীর বক্তব্য শুনে বললেন : স্বামিজী! বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও বৈশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাদি সব মতবাদই সত্য এবং চরম উপলব্ধির পথে ভিন্ন ভিন্ন সোপান মাত্র— একথা তো পূর্ব্বে আচার্য্যগণ কেউ বলেন নি।

উত্তরে মৃদু হাসলেন তিনি। বললেন : ওটা আমার জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেজন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

এই নটি দিন চিহ্নিত হল মহোৎসব রূপে। সমিতি ব্যগ্র হয়ে উঠলো একটি স্থায়ী প্রচার কেন্দ্রের জন্য। গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় জনসাধারণ অনুরোধ করলেন আরও কিছুদিন যেন তিনি এখানে অবস্থান করেন। স্বীকৃত হলেন তিনি। প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাঁর সুযোগ্য একজন গুরুভ্রাতাকে প্রেরণ করবেন। তার কিছুদিন পরেই মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উপস্থিত হলেন ও এখানের কাজের ভার গ্রহণ করলেন।

কলকাতা থেকে বার বার ডাক আসতে লাগলো। এসে গেছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। শিষ্য মণ্ডলী ও বন্ধুগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলকাতাগামী জাহাজে আরোহণ করলেন।....

কলম্বো থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বক্তৃতা, কথোপকথন, দেখাসাক্ষাৎ— ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। লোকমান্য তিলক তাঁকে পুনা যাবার জন্য অনুরোধ করে পত্র দিলেন কিন্তু বিশ্রামলাভের আশায় পুনা যাত্রা স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন। মন এবার চাইছে অভিনন্দন সভা আর বক্তৃতার পালা শেষ করে হিমালয়ের ক্রোড়ে বিশ্রাম নিতে।....

দীর্ঘকাল পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন তাঁর জন্মভূমি। গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লী, সহরের পর সহর, কুটীরের পর কুটীর। দেখেছিলেন তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি। অনুভূতির গভীরতায়, অজ্ঞাতে সেদিন চোখের কোলে গড়িয়ে পড়েছিল কয়েক ফোটা জল। এদের উন্নতির আশায় ধর্না দিয়েছিলেন রাজা, মহারাজা, ধনী ও অভিজাতদের দ্বারে, বুঝেছিলেন এঁদের দ্বারা স্থায়ী কোন কাজ সম্ভবপর নয়। এঁরা দাতার আসনে বসে পাশ্চাত্য লোকহিতকর আদর্শবাদে গড়তে চান, স্কুল, কলেজ, আর হাসপাতাল। তার বেশী সম্ভব নয়। তাঁরা সাজতে প্রস্তুত : দাতা বা উদ্ধার কর্ত্তা, উপাধি গ্রহণ করতে চায় না সেবকের রূপ! মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন : অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, জ্ঞান নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাজ করার মত দৃঢ়হৃদয় কর্ম্মীর একান্ত প্রয়োজন। তারই আহ্বান করে বললেন : ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপীগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নেই! হে চরিত্রবান, হৃদয়বান, বুদ্ধিমান যুবকগণ, তোমরা জাগো। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ, তোমাদের ওপরে ক্রমাগত আঘাত করছে, তোমাদের বেদনা, তোমরা অনুভব করছো বিলক্ষণ সে ব্যথা কিন্তু তোমরা জান না, কোথা থেকে ঐ আঘাত আসছে! তোমরা যে মানুষ, তাও তোমরা ভুলে গেছ। এর ফল— দাসত্ব ও পশুত্ব।....

আজ অমি চাই; লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ভগবানে, দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হয়ে, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ণ ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা, দ্বারে দ্বারে সম্প্রীতি প্রচারের বার্ত্তাবাহক হোক সবাই!

স্মরণ করিয়ে দিলেন : গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রেখো না। ভরসা তোমাদেরই ওপর। পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র তোমরা, কিন্তু বিশ্বাসী আমি তোমাদেরই ওপর। ... দ্বাদশ বছর আমি হৃদয়ে— এইভার নিয়ে, মাথায় এই চিন্তার বোঝা নিয়ে বেড়িয়েছি, তথাকথিত অনেক ধনীবড়লোকের দ্বারে ঘুরেছি, তারা আমাকে জুয়াচ্চোর ভেবেছে।....

সুদৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করলেন : প্রায় শতাব্দীকাল ধরে আমাদের দেশ, সমাজ-সংস্কারকগণ ও নানাবিধ সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে, সমগ্রদেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয়নি।..... গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হয়েছে, তা অধিকাংশই পোষাকী ধরনের। এই সংস্কার চেষ্টাগুলি কেবল দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্যবর্ণকে নয়। সংস্কার করতে হলে, ওপর ওপর দেখলে চলবে না, ভেতরে প্রবেশ করতে হবে, মূলদেশ পর্য্যন্ত যেতে হবে।.... দশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সমাজসংস্কার-সভায় পরিপূর্ণ এদেশ। কিন্তু রুধির শোষণের দ্বারা ভদ্রলোক নামে প্রথিত ব্যক্তিরা, 'ভদ্রলোক হয়েছেন ও হচ্ছেন।' শোষিতদের জন্য একটি সভাও চোখে পড়েনি।

পূর্ব্বগামী সংস্কারকগণের ত্রুটি উদঘাটন করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন : সংস্কারকগণ বিফল মনোরথ হয়েছেন। কারণ কি? কারণ তাঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তাঁদের নিজের ধর্ম্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছেন—আর তাঁদের একজনও 'সকলধর্ম্মের প্রসূতিকে' বুঝবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সে সাধনার মধ্য দিয়ে যাননি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করতে সক্ষম বলে দাবী করি।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতের নাগরিক জীবনে যে, চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল, তার ফলে দুচারজন প্রতিভাশালী ও উদার-হৃদয় সংস্কারক প্রাচীন সমাজের বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিদ্রোহ থেকেই, পাশ্চাত্যের বিচারশূন্য অন্ধ অনুকরণ মূলক সংস্কার যুগের সূত্রপাত। এই সংস্কার প্রচেষ্টায় 'ভাব-দাসত্ব' দেখিয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন : এই সংস্কার যুগের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না। কত বড় প্রাচীন সভ্যতার বংশধর এই জাতি, কত সংস্কারের মধ্য দিয়ে যুগে, যুগে কত মহাপুরুষকে বুকে ধারণ করে, আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে এই দেশ। এজাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যে এর অতীত ইতিহাস দ্বারা প্রভূতরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে, একথা সংস্কার-যুগ আদৌ বুঝতে পারেন নি। সংস্কারযুগ একথা চিন্তা করেননি যে, প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে, যার জন্য সে বেঁচে থাকার দাবী করতে পারে। যার অভাবে, তার বিলোপ বা মৃত্যু অনিবার্য্য। হিন্দুজাতীয় বিশেষত্ব কি, তাঁরা বোঝেন নি বা সে বিষয়ে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করেন নি। নিজের দেশ, নিজের জাতি বলে একটি অভিমানও, সংস্কার যুগের ছিল না... সংস্কারক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা 'প্রকাশ্যসভায়' আমি হিন্দু নই একথা স্বীকার্য্য করতে প্রস্তুত আছি' বলতে কিছুমাত্র লজ্জিত হন নি। এই সংস্কারযুগের যেন, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যা কিছু হিন্দুর এবং হিন্দুত্ব, তাই ঘৃণ্য ও পরিত্যজ্য।

ঘোষণা করলেনঃ সংস্কারকগণ সমাজকে ভেঙে চুরে, যেরূপে সমাজ সংস্কারের প্রণালী দেখিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। সংস্কারকগণকে আমি বলতে চাই, আমি তাঁদের চেয়েও একজন বড় সংস্কারক। তাঁরা চেয়েছিলেন একটু আধটু সংস্কার। আমি চাই আমূল সংস্কার। প্রভেদ, আমাদের কেবল সংস্কার প্রণালীতে। তাঁদের প্রণালী ছিল ভেঙে চুরে ফেলা, আমি চাই সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাস করি না, স্বাভাবিক উন্নতিতেই বিশ্বাসী।

আমার দৃষ্টিতে : ব্যাধি ও ব্যাধির লক্ষণ দুই পৃথক বস্তু। আমি বুঝি মূলব্যাধির চিকিৎসা না করে, কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগুলির দূর করার চেষ্টা করলে, ওগুলির প্রকাশ পায় অন্য প্রকারে। সাময়িক প্রতিকারের জন্য, লক্ষণগুলির উপশমের চেষ্টা না করে, মূল ব্যাধি দূর করবার চেষ্টাই সত্যকার গঠমূলক প্রণালী। আমরাই, আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—দায়ী একমাত্র আমরাই। আমাদের অভিজাত পূর্ব্বপুরুষগণ, ভারতীয় জনসাধারণকে, পদদলিত করতে লাগলেন, তারাও ক্রমশঃ অসহায় হয়ে পড়লো। এই অবিরত অত্যাচার, দরিদ্র ব্যক্তিরা, তাঁরা যে মানুষ, ক্রমশঃ তাও ভুলে যেতে বাধ্য হল। শত শত শতাব্দী ধরে তারা ক্রীতদাসের মত, কেবল জল তুললো, কাঠ কাটলো। তাদের এই বিশ্বাস করতে শেখানো হল যে, গোলামী করার জন্যই তাদের জন্ম। তাদের জন্ম জল তোলবার, কাঠ কাঠবার জন্য। যদি কেউ তাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে দুটো কথা বলতে চায়, আধুনিক কালের শিক্ষাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ, এই পদদলিত জাতির উন্নতি-সাধনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।.... বংশানুক্রমিতা বা জন্মগত কৌলিন্য গুণের দোহাই দিয়ে, যে বর্ব্বর ও পাশবিক মতবাদ দ্বারা ...মানুষকে হীন ও অন্তজ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেই মূঢ়তাকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করে বললেন, যদি বংশানুক্রমিক ভাব সংরক্ষণ নিয়মানুসারে, ব্রাহ্মণ বিদ্যা শিক্ষায় অধিকতর উপযুক্ত হয়,তবে ব্রাহ্মণের জন্য অর্থব্যয় না করে অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্ব্বলকে আগে সাহায্য করো। ব্রাহ্মণ যদি বুদ্ধিমান হয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাহলেই তাঁরা অপরের বিনা সাহায্যেই শিক্ষালাভ করবে, যারা বুদ্ধিমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, শিক্ষকগণ তাঁদের জন্যই নিয়োজিত হোক। আমার তো একেই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। অতএব এই দরিদ্র ভারতের পদদলিত জনসাধারণকে, তাদের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে হবে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে

সবলতা, দুর্ব্বলতার বিচার না করে প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক বালিকাকে শোনাও, শেখাও যে, সবল, দুর্ব্বল, উচ্চ, নীচ, নির্ব্বিশেষে সকলের ভেতর সেই অনন্ত আত্মা রয়েছেন, সুতরাং সকলেই মহৎ হতে পারে, সাধু হতে পারে।

বেদান্তের যে সকল তত্ত্বকে পারমার্থিক আখ্যা দিয়ে, ব্যবহারিক জগতে তার প্রয়োগ করতে প্রাচীন ভারত সক্ষম হয়েছিল। মানবআত্মার মঙ্গল মহিমার ওপর, জন্মগত অপবিত্রতা আরোপ করে, গভীর অধঃপতনের কারণ ঘটিয়েছিল পরবর্ত্তীকালে। সেই ত্রুটি সংশোধন করবার জন্য বললেন : বেদান্তের এই সকল মহানতত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরি গুহার আবদ্ধ থাকবে না। বিদ্যালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎসজীবের গৃহে, ছাত্রের অধ্যায়নাগারে, সর্ব্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হোক।

উপলব্ধি করলেন : যে তামসিক জড়বাদ, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ ও বৈষম্যকে চরম করে তুলেছে, কোটি কোটি নরনারীকে হীন, অস্পৃশ্য, অন্তজ ভাবতে শিখিয়েছে, তার প্রতিরোধ-কল্পে, মানবাত্মার মঙ্গল মহিমা, সমাজে, সংসারে প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন। সেজন্যই চাইলেন : আদর্শ চরিত্র মানুষ, প্রচার কববে সে আদর্শ। বিশেষ করে চরিত্রবাণ ও স্বদেশ প্রেমিক শিক্ষিত যুবকগণই 'ত্যাগব্রতে' দীক্ষিত হয়ে, তাদের জীবন করবে উৎসর্গ।

অনুভব করলেন : প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীর দোষে শিক্ষিত যুবকদের বহুসদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। সিদ্ধান্ত নিলেন: নির্ম্মাণ করবেন বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব বিরহিত জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, যা লৌকিক শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শের অনুকূল করার জন্য ভারতের নানা কেন্দ্রে, কতকগুলি শাখা কেন্দ্রে রূপায়িত হয়ে, শিক্ষিত যুবকগণকে দেবে নোতুন শিক্ষা। তারাই আচার্য্য, প্রচারক ও লৌকিক বিদ্যার, শিক্ষাদাতারূপে সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তর থেকে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করবে। একদিকে ব্রাহ্মণ, অপরদিকে চণ্ডাল। চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই হবে তাদের কার্য্যপ্রণালী। উচ্চবর্ণের শিক্ষা ও সদাচার যা নিয়ে তাদের তেজ ও গর্ব্ব, সেই শিক্ষা যাতে নিম্নজাতীয়গণ অবাধে লাভ করতে পারে, নোতুন শিক্ষাপ্রণালী হবে তারই বৈশিষ্ট্য।

আত্মপ্রত্যয়হীন, জাতীয় ঐক্যবোধ বর্জ্জিত, ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত, ম্রিয়মান স্বদেশবাসীকে শোনালেন : আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে তোমরা কেবলমাত্র 'স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমি'র আরাধনা কর, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়বছর ভুললেও ক্ষতির কিছু নেই। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। তোমার স্বজাতিই একমাত্র দেবতা।... তোমরা কেন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হচ্ছ? তোমার সামনে, তোমার চারদিকে যে দেবতাকে দেখছো, সেই বিরাটের উপাসনা কর!... এই সব মানুষ, এইসব পশুই, তোমার ঈশ্বর। তারা তোমার স্বদেশবাসী, তোমার প্রথম ও প্রধান উপাস্য দেবতা।...

ঘোষণা করলেন : 'আমার সমরনীতি 'My plan of compaign' মানুষ চাই— খাঁটি, অকপট মানুষ! আশিষ্ঠ যারা, দ্রবিষ্ঠ, বলিষ্ঠ যারা, অবিচল শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করতে যারা প্রস্তুত, এমন মানুষই আমি চাই!.... এমন একশত যদি খাঁটি যুবক এগিয়ে আসে ... সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসে... তবেই জাগবে ভারতবর্ষ। দুঃখের তমিস্র বিদীর্ণ করে আলোক রশ্মি, তবেই প্রতিফলিত হবে তার আকাশে ও আঙিনায়। ... ধর্ম্মের দেশ আমাদের এই মাতৃভূমি! যুগে যুগে আধ্যাত্ম সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পুষ্ট হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে, তার ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন। সেই ধর্ম্মকে পুনর্বার দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। The country must be flooded with religion and spiritually.

...জ্ঞান দাও, শিক্ষা দাও, রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দাও। শিক্ষার আলোকধারায় দেশের পুঞ্জীভূত গ্লানি বিদূরিত হবে। Education is the panacea of evils.

উপনিষদের প্রাণ মন্ত্রে দিক্ষীত কর, উদ্বুদ্ধ কর, ভীত, আর্ত্ত, অনড় জাতিকে।... The shining, strengthening, the bright philosophy of Upanishad....

তাকে গ্রহণ কর। অনুসরণ কর। ভারতের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। দেশপ্রেম! হে দেশকর্ম্মীগণ, হে সংস্কারকগণ! কাকে বলে দেশপ্রেম? কী তোমার patriotism? I have my own ideas of patriotism.

.... দেশের জন্য, যথার্থই কি তুমি অনুভব কর? তীক্ষ্ণ, তীব্রতরভাবে? গভীর সেই অর্থ: জলের নীচে সবলে চেপে ধরলে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মানুষের যে মর্ম্মান্তিক অবস্থা ঘটে?... দেশের বহুযুগ সঞ্চিত দুঃখ দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে, তেমনই অবস্থা কি ঘটেছে তোমার? তেমনই বেদনায়— মুমূর্ষু? মৃত্যুযন্ত্রণায় তেমনই একান্ত অধীর? তা যদি হয়ে থাকে, তবে দেশ সেবার— প্রথম ধাপে তুমি পা দিয়েছ মাত্র। ... এরপর সেই তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে, বজ্রদৃঢ় নিষ্ঠায় বাধা বিঘ্নের পাষাণ প্রাকার ধুলিসাৎ করে, অদম্য সাহসে এগিয়ে যাবার জন্য কি তুমি কৃত-সঙ্কল্প হয়েছ? যদি হয়ে থাক, তবে দ্বিতীয় ধাপে, তোমার পা দেওয়া হয়েছে।... তারও ওপর, আবার ..... একটি সুচিন্তিত, পুর্ব্বাপর সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা কি আবিষ্কার করেছ তুমি? যদি এই তিনটির যুগপৎ সমাবেশ, জীবন ও চরিত্রে তোমার ঘটে থাকে... তবেই সার্থক হবে তোমার দেশপ্রেম। ফলপ্রসূ হবে তোমার পেট্রিয়টিজম। নতুবা ফাকা কথা আর সংবাদপত্র মারফৎ নিজের ঢক্কানিনাদ! দুর্ভগা, ভারতবর্ষে সে নাটকীয় প্রহসন যথেষ্ট হয়েছে, এবার সেটা বন্ধ কর।.....

আমাদের জাতীয় খেয়া তরীটি, আজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে লক্ষ কোটি নর নারীকে জীবন-জলধি পার করছে। ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে, রৌদ্র-বৃষ্টি, কড়কাপাতের মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ম্ময় সৈকত ভূমিতে তাঁদের উত্তীর্ণ করে গেছে।

আজ দুর্যোগ বিপাকে, জীর্ণ সেই খেয়াতরী আমাদের কল্যাণহস্ত স্পর্শে, আমাদের শ্রম ও সাহায্যে, পুনর্বার কার্য্যক্ষম হবার, নবকলেবর ধারণ করবার অপেক্ষা রাখে।

অভিসম্পাতের মধ্য দিয়ে নয়, দোষত্রুটি উদঘাটনের মধ্য দিয়ে নয়, প্রেম ও প্রীতির অমৃত নিকষে, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার অমোঘ শক্তি তে, সেই পুরাতন জীর্ণ খেয়াতরীটিকে নোতুন করে সাজিয়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ কর। সহায় হবেন ভগবান, সহায় হবেন গণদেবতা!...

জাহাজ খিদিরপুরে এসে ভিড়লো (ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭)। স্বামিজী তাঁর জন্য অপেক্ষারত একখানি স্পেশাল ট্রেনে করে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে পৌঁছলেন। তখন সকাল ৭টা ৩০ মিঃ। সমবেত জনতার মিলিত কণ্ঠে শোনা গেল, 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী জয়, জয় বিবেকানন্দ স্বামিজী কী জয়'।

ট্রেন থেকে নামলেন। সমবেত জনসঙ্ঘকে যুক্ত করে প্রণাম করলেন। নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমূখ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ, পুষ্পমাল্যে তাঁকে ভূষিত করলেন। মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার স্বামিজীসহ চার ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বসলেন। যুবকগণ গাড়ীর ঘোড়া খুলে নিজেরাই টেনে নিয়ে চললো সেই গাড়ী। তিনটি পত্র-পুষ্প-পল্লব পতাকা পরিশোভিত তোরণদ্বার অতিক্রম করে রিপন কলেজে উপস্থিত হলেন। সমাগত সুধীবৃন্দদের সঙ্গে শিষ্টালাপে পরিতৃপ্ত করে, যাত্রা করলেন বাগবাজার পশুপতি বসুর বাড়ী। সেখানে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আহুত হয়েছিলেন। মধ্যাহ্ন কাটিয়ে অপরাহ্নে সদলবলে কাশীপুর গোপালনাথ শীল ম'শায়ের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাগণকে অভ্যর্থনা সমিতিই এভবনটি সাময়িক বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে নরনারী সেখানে উপস্থিত হতে লাগলেন। কেউ কৌতূহলী দর্শক, কেউ বা জিজ্ঞাসু। বিশ্রামের ব্যাঘাত সত্ত্বেও তিনি বিরক্তি বোধ করলেন না। সমাদরে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। রাত্রে আলমবাজারে গিয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা করলেন। ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারস্থ প্রাসাদের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে অভিনন্দনসভা আহুত হল। বিশিষ্ট নাগরিকগণ, পণ্ডিতগণ, ইউরোপীয় ভদ্রলোকগণ বিশেষ করে কলেজের ছাত্রগণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সভায় উপস্থিত হলেন। সমবেত হলেন প্রায় পাঁচ হাজার লোক। স্বামিজী ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র সম্ভ্রমচিত জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

শিষ্টাচার ও কুশল প্রশ্নাদির পর সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব রৌপ্যাধারে অভিনন্দন পত্র তাঁর হাতে অর্পণ করলেন। পাঠ করলেনও।

স্বদেশবাসীর অকৃত্রিম অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে, আবেগপূর্ণ স্বরে তিনি ভারতের শাশ্বত আত্মার প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করে, নবীন ভারতের নোতুন আশায় সঞ্জীবিত করার জন্য অমৃতবাণী, অভয়বাণী উচ্চারণ করলেন।

মানুষ, আপনার মুক্তির চেষ্টায় জগৎ-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করতে চায়। নিজ আত্মীয়, স্বজন, স্ত্রীপুত্র-বন্ধুবান্ধবের মায়া কাটিয়ে, সংসার থেকে দূরে পালিয়ে যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করতে, এমন কি নিজে যে স্বার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহধারী মানুষ, তাও ভুলতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু তার কানে সর্ব্বদা একটি সুর বাজতে থাকে : কে যেন দিনরাত তার কানে কানে বলতে থাকে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

... উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত.... Young men of Calcutta– arise, awoke for the time is propitious, behold and fear not....

তামিস্র রজনীর ভীতি বিত্রস্ত দুর্ব্বলতা দূরে নিক্ষেপ কর।... ঐ শোন 'অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ'।....Think not that you are poor, that you have no friend.... I have faith in my countrymen, and specially in the youth of my country.... The youth of Bengal have the greatest of all tasks that have ever been placed on the shoulder of young men.... সুতরাং উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। Aye, from the youth of Bengal with the immense amount of feeling and enthusiasm in the blood, will come the heroes who with march from one corner of the earth to the other, preaching and teaching the eternal spiritual truths of our forefathers. And this is great work before you.

বাধা যত প্রচণ্ডই হোক, বিপদের ঘূর্ণিবাত্যা যত প্রবলতায়ই আত্মপ্রকাশ করুক— উন্নত মস্তকে ও নির্ভীক প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হও। ভয় নেই। .... Mountain high though the difficulties appear, terrible and gloomy though all things seem, they are but Mayas

Fear not, it is banished. Crush it and it vanishes stamp upon it and it dies....

...... আমি তোমাদের কাছে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়-স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি

গোকুলে দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন, যাও.... তাঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও, তাঁর কাছে এক মহাবলি প্রদান কর। বলি - জীবনবলি, তাদের জন্য— যাদের জন্য, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারাজীবন, এই ত্রিশকোটি ভারতবাসী উদ্ধারে ব্রত গ্রহণ কর, যারা দিন দিন ডুবছে।

আমার এই কার্য্যভার, হে বাঙালী যুবকগণ, তোমরা গ্রহণ কর। এই কার্য্যের উন্নতি ও বিস্তার আমার কল্পনাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হোক। আমি সূচনা মাত্র করেছি— তোমরা পরিপূর্ণ কর। বর্ত্তমান যুগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বুঝে নাও।

... আর কখনো কোন দেশের যুবকদের উপর এত গুরুভার পড়েনি, আমি প্রায় অতীত দশ বছর ধরে সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছি— আমার দৃঢ় সংস্কার হয়েছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভেতর দিয়েই সেই শক্তি প্রকাশ হবে, যা ভারতকে তার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবে।

... কোন মহান আদর্শ বিশেষে, ... অনুরাগী হয়ে, তাঁর পতাকার নীচে দণ্ডায়মান না হয়ে, কোন জাতিই উঠতে পারে না।.... রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক ধর্ম্মবীর, এইরূপ এক আদর্শ পেয়েছি। যদি এই জাতি উঠতে চায়, তবে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছি : এই নামে সকলকে মাততে হবে। এই কারণে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এক মহান আধ্যাত্মিক আদর্শ, তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করছি, এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণ ও দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য, তোমাদের হৃদয় খুলে দিন, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন।

... তোমার আমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, তারজন্য প্রভুর কাজ আটকিয়ে থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি থেকেও তাঁর কাজের জন্য শত সহস্র কর্ম্মী সৃজন করতে পারেন। তাঁর অধীনে থেকে কাজ করা তো আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।....

যাঁরা এতদিন পাশ্চাত্য দেশে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অলীক কুৎসা প্রচার করেছিলেন, এখানেও তাঁরা নীরব রইলেন না। নববিধানের ব্রাহ্ম মিঃ বি. মজুমদার তাঁর আচরণ ও চরিত্র নিয়ে জঘন্য কুৎসাপূর্ণ একখানি বই লিখলেন। খৃষ্টান পাদ্রী ও কোলাহলের সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও দেবভাষায় তাঁর নিন্দা প্রচার করতে লাগলেন। সহকর্ম্মীগণ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, ভাল বলুক, মন্দ বলুক— তবু ওরা আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলুক!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর জন্মোৎসব শেষ হলে পর, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে একটি বক্তৃতা দিলেন 'সর্ব্বাচার বেদান্ত বিষয়ে'। এই বক্তৃতায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় আশ্রিত ভণ্ড ও বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কুযুক্তি ও কুতর্ক খণ্ডন করে, বুঝিয়ে দিলেন : বেদান্ত শাস্ত্রকে এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আচার্যগণ, বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় বহুবিধ দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমে আধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেদান্ত শাস্ত্র, দার্শনিক পণ্ডিতগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কের ব্যায়াম ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। কতকগুলি পুরান, কয়েকখানি আধুনিক স্মৃতিগ্রন্থ ও বিশেষভাবে লোকাচার ও দেশাচারই 'ধর্ম্ম' বলে, যাঁরা ধরে নিয়েছেন, তাঁরা ভ্রান্ত। কারণ বেদান্ত দুর্ব্বোধ্য দর্শন শাস্ত্র নয়। সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি। এ দেশের তথাকথিত সনাতনীরা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন ও খাদ্যের বিচার নিয়ে তুমুল কলরব করছেন, কিন্তু ধর্ম্মকে কেবল রান্নাঘরে ঢুকিয়ে রাখলে বর্ণাশ্রমাচার রক্ষা

পাবে— পাগলের কল্পনা! যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য নেই, প্রাচীন বর্ণাশ্রম বহুদিন লুপ্ত, যেখানে কালক্রমে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, সেখানে যদি কেউ সত্যই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে একই জাতির বিভিন্ন শাখাসমূহকে পুনরায় একত্র করে বর্ণের অবান্তর বিভাগগুলি উঠিয়ে দিতে হবে। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাঙ্গলাদেশে থাকে, তবে তাদের যজ্ঞোপবীত ও বেদপাঠের অধিকার প্রদান করা উচিত। কুলগুরু প্রথা, মুর্খ শাস্ত্র-জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম ব্যবসা, অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয়। তান্ত্রিক সাধনার নামে যে প্রথা প্রচলিত, তা ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার প্রশ্রয় ছাড়া অন্যকিছু নয়। কুসংস্কার ও গোঁড়ামির সঙ্গে আপোষ করতে প্রস্তুত নই। আমার ব্রত অদ্বৈত বেদান্তের অস্ত্রে বর্ত্তমান প্রচলিত বৈষম্যকে বিনাশ করা।

এরপর ব্যক্তি বিশেষকে উপদেশ ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করায় মন দিলেন। ফলে, অনেকে সত্য সত্যই উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। অনেকে আবার, তাঁকে শুধু দেখা বা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে পরীক্ষা করতে আগমন করতে লাগলেন।

এই সময়ে কয়েকজন বেদ ও দর্শনশাস্ত্রবিদ গুজরাটী পণ্ডিত এলেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করতে। সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। তিনিও সংস্কৃততেই উত্তর দিতে লাগলেন। বাদে সিদ্ধান্ত পক্ষ অবলম্বন করলেন তিনি— পূর্ব্ব পক্ষ হলেন পণ্ডিতগণ। একসময়ে তিনি 'স্বস্তি' স্থলে 'অস্তি' প্রয়োগ করলেন। হেসে উঠলেন পণ্ডিতগণ। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: পণ্ডিতানাং দাসোহহং ক্ষান্তব্যমেতং স্খলনং— পণ্ডিতগণের দাস আমি, আমার এই ব্যাকরণ লঙ্ঘন ক্ষমা করুন।

তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন পণ্ডিতগণ। প্রীতি ও সম্ভাষণ করে তাঁরা ফিরে যাওয়ার উপক্রম করলেন, এমন সময় কয়েকজন আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন : স্বামিজীকে কিরূপ বোধ হল? উত্তরে তাঁরা বললেন: ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকলেও স্বামিজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ দ্রষ্টা মীমাংসা করতে অদ্বিতীয়। বাদ খণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ শিষ্য সন্ন্যাসীবৃন্দ তাঁদের প্রিয়তম নেতা নরেন্দ্রনাথকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রচারিত সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ আদর্শকে গ্রহণ করতে চাইলেন না। তাঁদের কাছে ধ্যান, তপস্যা সহায়ে, মুক্তি লাভই ছিল আদর্শ। তাঁরা সেই পথই অনুসরণ করতে চাইলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশগুলি ব্যাখ্যা করে তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন তাঁর উপলব্ধিই 'যুগধর্ম্ম' প্রচার কার্য্যে যদি তাঁরা বদ্ধপরিকর না হন, ঠাকুরের আগমনের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। মন্দির ও প্রতিমার গণ্ডী থেকে ভগবানকে বাইরে এনে 'যত্র জীব তত্র শিব' মন্ত্রে বিরাটের পূজায় অগ্রসর হতে হবে। প্রাচীনকালের মত আজ, আর গিরিগুহায় বা কুটীরের অভ্যন্তরে বসে আত্ম সাক্ষাৎকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকলে চলবে না। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, মানুষকে উচ্চকার্য্যের প্রেরণা দিতে হবে। ভারতের কল্যাণ কামনায় এমন এক অভিনব সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করতে হবে— যাঁরা মানব সেবাব্রতে স্ব স্ব মুক্তির কামনা তো পরিত্যাগ করবেই, প্রয়োজনে সানন্দে নরকে পর্য্যন্ত গমন করতে প্রস্তুত থাকবেন। "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর শিষ্য হয়ে যদি পরার্থে আত্মোৎসর্গ করতে না পারেন, তাঁর প্রচারিত মহান যুগাদর্শকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ হন, তা হলে সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কোথায়?

ক্রমে তাঁর যুক্তির সারবর্ত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেন গুরুভ্রাতৃগণ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রী শ্রী ঠাকুর পূজা, আরতি ও অর্চ্চনা পরিত্যাগ করে বেদান্ত প্রচার কার্য্যের জন্য দাক্ষিণাত্য গমন করলেন। অখণ্ডানন্দজী মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর সেবাকার্য্যে যাত্রা করলেন।

শরীর তাঁর ভাঙতে শুরু হল। সেদিকে কোন দৃকপাত করলেন না। মঠের ব্রহ্মচারী ও নব দীক্ষিত শিষ্যবৃন্দকে গীতা, উপনিষদ ভাষ্যসহকারে পড়াতে লাগলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁকে সকল রকমের মানসিক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে লাগলেন। শেষে তাঁদের যুক্তির সারাবর্ত্তা অনুভব করে, দার্জ্জিলিং যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে চললেন মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, গিরিশচন্দ্র, মিঃ গুডউইন, ডাঃ টার্নবুল, আলসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্য্য ও সিঙ্গারাভেলু মুদলিয়র। বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁর 'রেজাব্যাঙ্ক' ভবনের একাংশ, তাদের বসবাসের জন্য প্রদান করলেন। মিঃ এম. এন. ব্যানার্জ্জী, তাঁকে সশিষ্যদের তাঁর নিজভবনে আতিথ্য গ্রহণ করালেন।

দু'মাস বাস করলেন। স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। তাঁর পক্ষে অলস জীবন যাপন সম্ভব নয় ফিরে এলেন কলকাতায়।

কয়েকজন যুবক আলামবাজার মঠে যোগদান করে ব্রহ্মচারীর জীবনযাবন করছিলেন। তারা দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু এঁদের একজনের পূর্ব্বজীবন উচ্ছৃঙ্খল থাকায় তাঁকে সন্ন্যাস প্রদান করে মঠভুক্ত করার আপত্তি জানালেন গুরুভ্রাতাগণ। উত্তরে তিনি বললেন : আমরা যদি পাপীকে আশ্রয় প্রদান করতে সঙ্কুচিত হই, এঁরা আশ্রয় পাবে কোথায়? যখন উচ্চতর পবিত্র জীবন-যাপন করার সঙ্কল্প নিয়ে সংসার ত্যাগ করেছে, তখন ওকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা যদি উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎচরিত্র ব্যক্তিদের চরিত্র সংশোধন করতে অপারগ হও, তাহ'লে গৈরিক পরিধান করে আচার্য্যত্ব গ্রহণ করেছ কেন?

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। আপত্তি উঠলো না। তাদের সন্ন্যাস দিলেন তিনি। আশীর্ব্বাদ করে বললেন : তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছো, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিনী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। .... সন্ন্যাসাশ্রমের মহাত্ম্য বর্ণন করতে করতে মুখমণ্ডল তাঁর স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন : "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে, যারা এই উচ্চাদর্শ (ideal) ভুলে যায়— বৃথৈব তস্য জীবনং। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্রবিয়োগ বিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ, ইতর, সাধারণকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করতে শা... দেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে ও জ্ঞানালোক দিয়ে, সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করার প্রয়োজন : আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ —আমাদের জন্ম। কি কচ্ছিস সব, বসে? ওঠ, জাগ নিজে। নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর। নরজন্ম সার্থক কর, দিয়ে চলে যা— উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌নিবোধত।

আলামবাজার মঠ ও বাগবাজার বলরাম বসু ম'শায়ের বাসভবনে থেকে যুগধর্ম্ম প্রচার করতে লাগলেন। একাজের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়োজন, বহুদিন থেকেই তা উপলব্ধি করছিলেন। ১৮৯৭ সালের ১লা মে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দদের, বলরামভবনে আহ্বান করলেন। তাঁদের বললেন : নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘছাড়া কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে, প্রথম থেকে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি নিজে কাজ করাটা, তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে, যখন ইতর ও সাধারণ লোক সমাধিক সহৃদয় হবে, যখন 'মত ফতের, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত' করতে শিখবে, তখনই সাধারণ-তন্ত্র-মতে সঙ্ঘের কাজ চলতে পারে। সেইজন্যে এই সঙ্ঘের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে, সকলের মত নিয়ে কাজ করতে হবে।

আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা, যাঁকে জীবনের আদর্শ করে, সংসারাশ্রমে, কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুন্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে.... এইসঙ্ঘ তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস— আপনারা এ কার্য্যে সহায় হোন।

গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহীগণ, এ প্রস্তাবে অনুমোদন করলেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভাবী কার্য্যপ্রনালী আলোচিত হতে লাগলো। সঙ্ঘের নাম রাখা হল 'রামকৃষ্ণ প্রচার' বা 'রামকৃষ্ণ মিশন'।

উদ্দেশ্য : মানবের হিতার্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন ও কার্য্যে, তাঁর জীবনে প্রতিপাদিত হয়েছে, তার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করা এই প্রচারের (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমতকে এক অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র জ্ঞানে সকল ধর্ম্মালম্বীদের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কাজের অবতারনা করেছিলেন, তার পরিচালনই এই প্রচারের ব্রত।

কার্য্যপ্রণালী : মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজিবীদের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব, রামকৃষ্ণ জীবনে, যেরূপ ব্যাখাত হয়েছিল তা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য্য : ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য্য ব্রত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রম স্থাপন এবং যাতে তাঁরা দেশদেশান্তরে গিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করতে পারেন তার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্য্য বিভাগ : ভারতবর্হির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী প্রেরণ এবং তৎপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি বর্দ্ধন এবং নতুন নতুন আশ্রম সংস্থাপন।

সাধারণ সভাপতি হলেন স্বামিজী। স্বামী ব্রহ্মানন্দ হলেন কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি। স্বামী যোগানন্দ হলেন তাঁর সহকারী। নরেন্দ্রনাথ মিত্র হলেন সেক্রেটারী, ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ ও শরচ্চন্দ্র সরকার হলেন আণ্ডার সেক্রেটারী। শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামী-শিষ্য সংবাদ প্রণেতা) নির্ব্বাচিত হলেন শাস্ত্র পাঠকরূপে।

প্রতি রবিবার ৪টার পর বলরামবাবুর বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন বসতে লাগলো। কিন্তু তাঁর এ ধরনের কাজকে কোন কোন রামকৃষ্ণ ভক্ত তাঁর বৈদেশিক ভাব মিশ্রিত বলে সন্দেহ করতে লাগলেন। কারণ এঁরা রুগ্ন দরিদ্রের সেবা, শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে চলেছেন অথচ এই কাজ কর্ম্ম, মনকে স্বতঃই বহির্ম্মুখী করে তোলে। সাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত করে। মঠ, মিশন, বেদান্ত সমিতি, সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেমের মধ্যে দিয়ে মানব সেবাব্রত প্রচার এসবই প্রাশ্চাত্য আদর্শ। শ্রীশ্রী ঠাকুরের মূলমন্ত্রই তো ছিল সর্ব্বত্যাগ! সুতরাং এক গুরুভাই প্রশ্ন তুললেন : শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করা হচ্ছে না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর প্রচারিত আদর্শগুলির সামঞ্জস্য কোথায়?

প্রশ্ন শুনে বিদ্রূপের সুরে বললেন স্বামিজী : লেখাপড়া, সাধারণে ধর্ম্মপ্রচার, আর্ত্ত, রোগী, অনাথদের সেবা করা প্রভৃতি দুঃখ দূর করার চেষ্টা করলেই অমনি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে? 'ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, জগতের উপকার করতে যাওয়া 'অনধিকার চর্চ্চা করা মাত্র' —একথা ঠাকুর ব্যক্তি বিশেষকে বলে ছিলেন বলেই, যদি ঐসমস্ত কাজ মন্দ বলে মনে কর, তাহলে তুমি ঠাকুরের উদ্দেশ্য একবিন্দুও বোঝনি। ব্যঙ্গভাব অন্তর্হিত হয়ে দীপ্ত কণ্ঠে গর্জ্জে উঠলেন : তুমি কি মনে করো যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছ? তুমি কি মনে করো জ্ঞান-"শুষ্ক

পাণ্ডিত্য" মাত্র —যা হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উচ্ছেদ-সাধন করে এক উষর পন্থাবলম্বনে অর্জ্জন করতে হয়? তুমি যে ভক্তিকে লক্ষ্য করছো— তা আহম্মকের ভাবুবকতা মাত্র, যা 'মানুষকে কাপুরুষ ও কর্ম্মবিমুখ করে তোলে।' শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করার কথা বলছো? তুমি, আমি কি তাঁর অনন্তভাবের কতটুকর ইয়ত্তা করতে পেরেছি যে জগৎকে বলতে যাবো? সরে দাঁড়াও! কে তোমার শ্রীরামকৃষ্ণকে চায়, কে তোমার 'ভক্তি' 'মুক্তি' নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ত্র কি বলছে না বলেছে কে শোনে? যদি আমি আমার তমোহ্রদে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্ম্মযোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে, প্রকৃত মানুষের মত, নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তা হলে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাবো। আমি, তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই, যারা নিজের ভক্তি-মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্রনারায়ণ সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে আমি তাদের চেলা, ভৃত্য, ক্রীতদাস। মুখে তাঁর এক স্বর্গীয় করুণার ছবি ফুটে উঠলো। পরাধীনতার পেষণে অপহৃত মনুষত্ব, ভারতবাসীর অসীম দুঃসহ স্মৃতি, তাঁর হৃদয় মথিত করে, উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে নিজের বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলেন। দ্বার রুদ্ধ করে ভূম্যাসনে ভাবসমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পুনরায় ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরে মৌনতা ভেঙে বললেন : যার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হয়েছে, তার স্নায়ুগুলো এত কোমল হয়ে পড়ে যে, সামান্য ফুলের ঘা পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তোমরা জান, আমি আজকাল প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধীয় কোন বই পড়তে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বেশীক্ষণ কথা বলতে গেলেই ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি। অন্তর্নিহিত এইভক্তি প্রবাহের গতিরোধ করতে ক্রমাগত আমি চেষ্টা করছি, কর্ম্মের কঠিন শৃঙ্খলে নিজেকে বেঁধে রেখেছি, কারণ এখনও জগতে, আমার যা বার্ত্তা বহন করার আছে, তা শেষ হয়নি। তাই যদি দেখি, ভক্তির উদ্দাম প্রবাহ আমাকে ভাসিয়ে নিতে চায়, তখনই কঠোর জ্ঞানের রুদ্রদণ্ড তুলে আঘাত করে ঐসব ভাব সংযত রাখি। হায়, মুক্তি নেই! এখনও আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রীতদাস, তিনি যে তাঁর কর্ম্মের ভার আমার কাঁধে নিক্ষেপ করে গেছেন। যে পর্য্যন্ত না সমাপ্ত করতে পারি, সে পর্য্যন্ত তো তিনি, বিশ্রাম দেবেন না।....

প্রতি কাজেই গুরুভ্রাতাদের উপদেশ ও পরামর্শ মত কাজ করতে লাগলেন। ভক্ত কুলচূড়ামণি সাধু নাগ ম'শায়ের সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন : একি ঠিক ঠাকুরের উপদেশমত কাজ হচ্ছে?

নাগ ম'শায় উৎসাহের সঙ্গে তা সমর্থন করলেন।

ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করাচ্ছিলেন শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে, নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্র উপস্থিত হলেন। গিরিশচন্দ্র আসন গ্রহণ করলে পর পরিহাস করে বললেন : জি. সি. তুমি বোধহয় এসব জিনিষ পড়ার কোন দরকার বোধ করো না—চিরকাল কৃষ্ণ, বিষ্ণু নিয়েই কাটিয়ে দিলে!

বিশ্বাসের জ্বলন্ত মূর্ত্তি গিরিশচন্দ্র উত্তরে বললেন : বেদ পড়ে আমার কি হবে ভাই? বেদ বোঝার মত বুদ্ধিও নেই, অবসরও নেই। ওসমস্ত জিনিসকে দূর থেকে প্রণাম করে আমি ভগবান রামকৃষ্ণের কৃপায় ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাবো। তিনি তোমাকে দিয়ে লোকশিক্ষা দেবেন, ধর্ম্ম প্রচার করাবেন, তাই ওসমস্ত জিনিষ পড়িয়েছেন। ঋগ্বেদকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে বললেন : জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।

গিরীশবাবু প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা নরেন, বেদ বেদান্ত তো অনেক পড়েছো! ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ, লাম্পট্যাদি বীভৎস পাপ, আরও কতরকম অন্যায়, অবিচার ও দুঃখ, যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই— তার কোন প্রতিবিধান তোমার বেদ-বেদান্ত লেখে

কি?... অমুক সংসারের গৃহিনী, যিনি প্রতিদিন পঞ্চাশজনকে অন্নবিতরণ করেছেন, আজ তিনি তিনদিন হল, পুত্রকন্যাসহ অন্নাভাবে অনাহারে আছেন, অমুক অমুক সংসারের মহিলাগণ বদমাইসের হাতে লাঞ্ছিতা হয়েছেন, কেউ কেউ উৎপীড়িতা হয়ে অবশেষে প্রাণত্যাগ করেছেন, অমুক বাড়ীর বালবিধবা কলঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ভ্রূণ হত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করে বসেছে— নরেন, বেদ-বেদান্তের মধ্যে এর কি কোন প্রতিকার পেয়েছ?

সংসারের যাবতীয় দুঃখ, অন্যায়, অত্যাচাররূপী হৃদয়ভেদী করুণ কাহিনী শুনে তাঁর চোখে জল এসে গেল। তিনি ভাবাবেগ সম্বরণ করতে না পেরে বিচলিত হৃদয়ে কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন।

গিরীশবাবু শিষ্যগণকে লক্ষ্য করে বললেন : দেখলে তোমাদের গুরুর হৃদয় কি মহান অনুকম্পাপূর্ণ! আমি তাঁকে পণ্ডিত বা প্রতিভাশালী বলে সম্মান করি না, যে মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা শুনলে করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে, সেই অসীম উদার হৃদয়ের জন্যই শ্রদ্ধা করি। দেখলে তো, বেদবেদান্তের যে সব ব্যাখ্যা হচ্ছিল, সে পাণ্ডিত্য, বিচার বিশ্লেষণ, কোথায় অন্তর্হিত হল! তোমাদের স্বামিজী, একেবারে মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত বুঝেছো!

নিজেকে সংযত করে ফিরে এলেন। সদানন্দও ভেতরে এলেন সে কক্ষে। তাঁকে দেখেই, রুগ্ন আতুর, আর্ত্তের সেবার জন্য একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দিলেন। গুরুর আজ্ঞা শিরধার্য্য করে নিলেন সদানন্দজী। গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করে স্বামিজী বললেন, দেখ জি. সি., জগতের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য, এমন কি একজনের বেদনা লাঘব করার জন্য আমি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। নিজের মুক্তি চাই না। আমি প্রত্যেককে মুক্ত হ'বার জন্য সাহায্য করতে চাই!

মাতাজী তপস্বিনী কর্ত্তৃক আহূত হয়ে শিষ্য শরৎবাবু সহ মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শনে এলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা দান প্রণালী দেখে সন্তুষ্ট হলেন তিনি। ফেরার পথে বললেন : পুরুষদের মত, তাঁর একটি নারী মঠও স্থাপন করার ইচ্ছা আছে। সেখানে ব্রহ্মচারিনী ও সন্ন্যাসিনীগণ সুশিক্ষিতা হয়ে নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষাকল্পের চেষ্টা করবেন। তাঁরা সুশিক্ষিতা হলে, নিজেদের ভালমন্দ, নিজেরাই ঠিক করে নেবেন। কার্য্যক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবিক দক্ষতা, স্বাধীনভাবে জাতীয় উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হলে দেশের কল্যাণ হবে।

মঠ, সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা কল্পে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দেহ ভেঙে পড়তে লাগলো দিনের পর দিন। শঙ্কিত হলেন শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণ। ইংলণ্ড থেকে এসে গেলেন মিস্ মূলর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিকিৎসকগণের পরামর্শ ক্রমে আলমোড়া যেতে স্বীকৃত হলেন। ৬ই মে কতিপয় শিষ্য ও গুরুভ্রাতাসহ যাত্রা করলেন আলমোড়া।

সেখানকার হিন্দুসমাজ তৈরী হয়েছিলেন। তাঁরা আলমোড়ার কাছাকাছি লোদিয়ায়, তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। বিরাট শোভাযাত্রা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করলেন। বাতায়ন থেকে পুষ্প ও তণ্ডুল বর্ষন করতে লাগলেন দর্শকবৃন্দ। ... সভামণ্ডপে প্রবেশ করলেন। বিরাট সে মণ্ডপ। প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত সেখানে। পণ্ডিত জাওলাদত্ত যোশী অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন। লালাবদরী সাহার পক্ষ থেকে পণ্ডিত হরেরাম পাণ্ডে অপর একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করলেন। সংক্ষেপে উত্তর দিলেন তিনি।

বহুদিন থেকে হিমালয়ে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম শিক্ষা দানের জন্য একটি মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল তাঁর মনে। তিনি এই সভায় প্রকাশ্যে সে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আলমোড়া থেকে বিশ মাইল দূরে লালাবদরী সাহার বাগানবাড়ী ছিল। সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। হিমালয়ের গম্ভীর

বৈরাগ্যোদ্দীপক মনোহর শ্রী, তাঁর কর্ম্মক্লান্ত মনে অপূর্ব্ব শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে এলো। কিন্তু এখানেও বিশ্রামের অবকাশ পেলেন না। ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত থাকতে হ্ল অধিকাংশ সময়।

দু'সপ্তাহের মধ্যে স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হ্ল। প্রভাত ও রজনীর অধিকাংশ সময় ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলেন।

ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, যশ, আদর, সম্মান দর্শনে মিশনারীরা আমেরিকায় ঠিক এই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করতে আরম্ভ করলেন। এমনকি চিকাগো মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজ সাহেবও নিজের দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর নিন্দা শুরু করলেন : তাঁর অভ্যর্থনার যে বিবরণ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে তা মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত। আমেরিকার রমনীদের আচার ব্যবহারের নিন্দায় তিনি পঞ্চমুখ। অতিনিম্ন শ্রেণীর হিন্দু, সমাজে কোন প্রতিষ্ঠা নেই ইত্যাদি...

বিচলিত হয়ে উঠলেন ভক্ত ও অনুরাগীর দল। রাশি রাশি খবরের কাগজ ও পত্র এসে পৌঁছতে লাগলো। দেখলেন ভয়ানক ষড়যন্ত্র! কিন্তু বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। যাঁরা নোতুন তত্ত্ব, নোতুন নীতি, নোতুন ভাব প্রচার করতে চান—তাঁদের বাধা বিপত্তি, নিন্দা অপবাদের সম্মুখীন হতে হবেই। মানবজাতির যাঁরাই কল্যাণ কামনা করেন, তাঁরা কোনদিন পশ্চাৎপদ হননি, তিনিও হলেন না। উপেক্ষার সঙ্গে অবিচলিত রইলেন।

মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের দুঃখ বিদূরণের জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অক্লান্ত চেষ্টার সংবাদ পেয়ে খুশী হলেন। শিষ্য নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দজীকে পাঠালেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য। উৎসাহ দিয়ে পত্র দিলেন তাঁদের। এমন কি নিজেও যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। বাধা দিলেন চিকিৎসকগণ ও শিষ্যবৃন্দ।

মিশনের কাজও চলছিল ভাল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজে প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দজী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার কার্য্য ভাল রূপেই চালাচ্ছিলেন। নবীন উৎসাহে মুখর হয়ে উঠলেন তিনি। স্থির করলেন এবার আলমোড়া ত্যাগ করবেন। বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে স্থানীয় জিলাস্কুলে সুললিত হিন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসীবৃন্দও তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। ইংলিশ ক্লাবে গুর্খা-সৈন্যদলের কর্নেল পুলি (Col. Pulley) সাহেবের সভাপতিত্বে আহুত হ্ল একটি সভা। স্থানীয় ইংরেজ ভদ্রলোক, মহিলাবৃন্দ ও কয়েকজন গণ্যমান্য দেশীয় ব্যক্তি সে সভায় যোগ দিলেন। 'আত্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ ও উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব এমনভাবে বিবৃত করলেন যে, মুহূর্ত্তের জন্য বক্তা তাঁর বক্তৃতা ও শ্রোতৃবর্গ যেন এক হয়ে গেল। 'আমি' 'তুমি' 'ইহা' কোনো কিছুই নেই। সমাগত ব্যক্তি, ক্ষণকালের জন্য স্বামিজীর দেহ থেকে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশে আত্মহারা ও মুগ্ধবৎ হয়ে রইলেন।

আড়াইমাস আলমোড়ায় যাপন করে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান থেকে আহূত হয়ে ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি বেরিলীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু পদার্পণ করেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। তা সত্ত্বেও তিনি সকালে আর্য্যসমাজের অনাথালয় পরিদর্শন করলেন। স্থানীয় ছাত্রবৃন্দকে বেদান্তের আদর্শ সমূহ কার্য্যে পরিণত করার জন্য উৎসাহ দিয়ে একটি ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন।

১২ই আগষ্ট মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তা উপেক্ষা করে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করলেন। ঐ রাত্রেই বেরিলী ত্যাগ করে

আম্বালা যাত্রা করলেন। একসপ্তাহ এখানে অবস্থানে শরীরটা একটু সুস্থ বোধ করলেন। প্রতিদিন মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী, হিন্দু সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলেচনা করতে লাগলেন। মিঃ সেভিয়ার এই সময়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

আম্বালা থেকে অমৃতসরে যাত্রা করলেন। কিছুদিন এখানে থেকে যাত্রা করলেন রাওয়ালপিণ্ডি। সেখান থেকে মারি ও বারমূলা হয়ে ৮ই সেপ্টেম্বর নৌকা যোগে শ্রীনগর যাত্রা করলেন। চীফ্ জাষ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জলবায়ুর গুণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত হয়ে উঠলেন। স্থানীয় পণ্ডিতগণ, বাঙালী ও কাশ্মিরী ভদ্রলোকগণ তাঁর কাছে নানাবিধ সৎচর্চ্চার জন্য উপস্থিত হতে লাগলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা দুটোর সময়ে তিনি রাজভবনে গেলেন। রাজা রামসিংহ তাঁর যথোচিত সমাদর করলেন। ভারতীয় ধর্ম্ম ও জনগণের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা করে চললেন। রাজাবাহাদুর তাঁর উদার ভাব ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজা অমরসিংহের উজীর সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। নৌ ভ্রমণে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব ভেবে, স্থানীয় ভক্তবৃন্দ হাউসবোটের সন্ধান করছিলেন। উজীর সাহেব সে ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপরাহ্নে তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে বোট পাঠিয়ে দিলেন। নৌভ্রমণে কাশ্মীরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ ও প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখে বেড়াতে লাগলেন।

১২ই অক্টোবর তিনি পুনরায় মারি পাহাড়ে উপস্থিত হলেন। ১৪ই স্থানীয় বাঙালী ও পাঞ্জাবীগণ তাঁকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করলেন। উত্তরে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে এলেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে উকীল হংসরাজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। অপরাহ্নে আর্য্যসমাজী স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনা শুরু হল। খুশী হলেন তিনি। জজ নারায়ণ দাস, ব্যারিষ্টার ভক্তরাম প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হলেন সে আলোচনা সভায়। ১৭ই তারিখে সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে, 'হিন্দুধর্ম্ম' নামে ইংরাজীতে দু'ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। ১৯শে তারিখে কালীবাড়ীতে একটি ছোট খাট সভার আয়োজন হ'ল। সেখানে কি উপায়ে স্বদেশের প্রকৃত কলাণ-সাধন করা যায়, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। ২০শে তারিখে কাশ্মীরের মহারাজ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহূত হয়ে জম্মু ফিরে গেলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নির্দ্দিষ্ট ভবনে নিয়ে গেলেন। পরদিন রাজপ্রাসাদে উপনীত হলেন। মহারাজা, রাজভ্রাতৃদ্বয় ও কর্ম্মচারীগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করালেন। প্রথমে, সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা পাড়লেন মহারাজা। উত্তর দিলেন তিনি। কতকগুলি অর্থহীন বহিরাচারের অসারতা প্রদান করে বুঝিয়ে দিলেন, এই কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকাই ভারতের অবনতির মূখ্য কারণ। ব্যাভিচার, সুরাপান, পরদার গমন ইত্যাদি সকল অনর্থের মূল, অথচ তাতে মানুষ সমাজচ্যুত হয় না। কেবল যত আপত্তি খাওয়া দাওয়ার বেলায়। বললেন : বিদেশে না গেলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার সম্বন্ধে কথা তুললেন। এদেশে, কিভাবে কাজ করার সঙ্কল্প করেছেন, তা ব্যক্ত করলেন।

মহারাজা তাঁর সেই জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ মতামত শুনলেন চারঘণ্টা। মোহিত হয়ে পড়লেন তিনি। পরদিন স্বামিজী একটি বক্তৃতা দিলেন। এত খুশী হলেন মহারাজ যে আরও কিছুদিন থেকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।.... আরও কয়েকটি বক্তৃতা করে ২৯শে তারিখে মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপস্থিত হলেন শিয়ালকোর্টে। এখানে হিন্দী ভাষায় দুটি বক্তৃতা দিলেন। স্ত্রী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত নেই দেখে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। প্রসিদ্ধ উকিল লালা মূলচাঁদ একটি সমিতি স্থাপন করে, নিজেই তাঁর সেক্রেটারী হলেন। ৫ই নভেম্বর উপস্থিত হলেন লাহোরে। সনাতন সভার সভ্যবৃন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।.... রাজা

ধ্যানসিংহের হাবেলীতে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ দর্শকবৃন্দকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। পরে 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গুপ্তের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। প্রতিদিন দলে দলে লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগলো। তিনি হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি সমূহ, 'ভক্তি ও বেদান্ত' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিলেন। এখানে উত্তর ভারতের আচার্য্য দয়ানন্দ স্বরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্যসমাজের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। স্বামী দয়ানন্দ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে শুধু নয়, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মআন্দোলনের বিরুদ্ধে ও পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের অনুকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অস্ত্র ছিল বেদ। তিনি সহজেই আর্য্যসমাজী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ ও মূর্ত্তি পূজাবিরোধী আর্য্যসমাবিদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই তর্ক চলতে লাগলো। তিনি তাঁদের চরিত্র ত্যাগ ও লোকহিত ব্রতের প্রশংসা করলেন কিন্তু প্রতিবাদ করলেন তাঁদের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির।

দয়ানন্দ এ্যাংলো বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রমুখ আর্য্যসমাজিদের তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আধিকারী বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যালম্বনে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। আপনারা বলেন : বেদের কেবল একপ্রকার অর্থই হতে পারে ওটা আপনাদের গোঁড়ামি। ইংরাজীতে বলে fanaticism. আমি জানি সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতি সাধনে এবস্তু বিশেষ উপযোগী। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের গোঁড়ামি (অবতারবাদ) দিয়ে অদ্ভুতরূপেও অতিশীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়-— এও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সে শক্তিও আমার হাতে আছে। আমার গুরুভাইগণও রামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার রূপে প্রচার করতে উদ্যত। কিন্তু আমি একা সেরূপ প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ়বিশ্বাস মানুষকে তার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী উন্নতি করতে দিলে যদিও উন্নতি ধীরে ধীরে হয় কিন্তু সেটা পাকা হয়ে থাকে। আর্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের 'শ্রাদ্ধ' বিশ্বাস করেন না। উপযোগিতাও স্বীকার করেন না। হিন্দুসমাজের তরফ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে আর্য্যসমাজীদের সঙ্গে বাদে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর যুক্তির কাছে আর্য্যসমাজী পণ্ডিতগণকে হার মানতে হল। তাঁদের গোঁড়ামি ও পরমতসহিষ্ণুতার তীব্র সমালোচনা করলেন অথচ তাঁর বক্তব্যে এমন একটা অসম্প্রদায়িক ভাব ফুটে উঠলো যে, সনাতন পন্থী ও আর্য্যসমাজী উভয় দলই তাঁর প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হলেন। উভয় দলের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও বিরুদ্ধভাব বিরাজ করছিল তাঁর মধ্যস্থতায় সে গ্লানি বিদূরিত হল আর্য্যসমাজী, শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের জন্য সকল সমাজের যুবকদের নিয়ে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই ঔষধ, শুশ্রূষা, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা দানের দ্বারা সেবা করার জন্য যুবকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। সেবা ধর্ম্মের উদার নৈতিক আদর্শকে জীবনে পরিণত করাই সকল ধর্ম্মের 'কর্ম্মক্ষেত্র' নির্দ্দেশ করে, সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠলেন।

স্থানীয় কলেজের গণিত অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। অধ্যাপক তাঁর বক্তৃতা ও চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। একদিন তাঁকে তাঁর গৃহে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। উদ্দেশ্য : কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা। যোগ্য অধিকারী দেখে 'বেদান্তপ্রচার' করাব জন্য উৎসাহিত করলেন। এর ফলে তাঁর জীবনে এলো আমূল পরিবর্ত্তন। বেদান্ত প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন স্থির করলেন।

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো। তিনি তাঁর বহুমূল্য প্রিয় সোনার ঘড়িটি তাঁকে উপহার দিলেন। পরমানন্দে তা তিনি গ্রহণ করে পরক্ষণেই আদর করে অধ্যাপকের পকেটে ঘড়িটি ফেলে দিয়ে বললেন, বন্ধু এ ঘড়িটি আমি তোমার পকেটে রেখেই ব্যবহার করবো। রহস্যময় হাসি হেসে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তীর্থররামের দিকে। সে মৌন ইঙ্গিত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলেন তীর্থরাম। তাঁর পদাঙ্কঅনুসরণ করে প্রচার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করলেন।

আর্যসমাজী স্বামী অচ্যুতানন্দ, প্রকাশানন্দ ও আরও কয়েকজন স্বামিজীর জলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে বেদান্ত প্রচার কার্য্যে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর প্রভাব আর্য্যসমাজে এমন কেন্দ্রীভূত হল যে, জনরব উঠে গেল পরিচালনার ভার তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

পুনরায় শরীর ভাঙলো। অসুস্থ হয়ে পডলেন। দেরাদুন চলে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বিশ্রাম পেলেন না। সমাগত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনায় নিযুক্ত রইলেন। এছাড়াও শিষ্যবৃন্দকে আচার্য্য রামানুজের ভাষ্যসহ বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন পড়াতে লাগলেন।

খেতরি থেকে বার বার ডাক আসতে লাগলো। রাজপুতনা যাবার জন্য দেরাদুন থেকে সাহারনপুর হয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। চার পাঁচদিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে সদলবলে আলোয়ারে যাত্রা করলেন।

স্টেশনে অবতরণ করা মাত্র, স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সমুচিত অভ্যর্থনা করলেন। সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছেন, দেখলেন তাঁর এক দরিদ্র শিষ্য মলিন বেশে সতৃষ্ণনয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে আহ্বান করে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন। দরিদ্র শিষ্য ও ভক্তগণের আলয়ে গমন করে পূর্ব্বেমতই সরল ভাবে ভিক্ষা করতে লাগলেন। পরিব্রাজক জীবনে জনৈকা দরিদ্রা ভক্তিমতী এক বিধবার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন একদিন। সে কথা বিস্মৃত হলেন না। সংবাদ দিলেন তাঁর বাড়ীতে পূর্ব্বের মত 'চাপাটী' খাবেন।

বিধবা সাধ্যমত অতিথিদের সেবার আয়োজন করলেন। তিনি শিষ্যবৃন্দসহ আহারে বসলেন। বিধবা 'চাপাটী' পরিবেশন করতে করতে আদ্রকণ্ঠে বললেন, আমি গরীব, ইচ্ছা থাকলেও দেবার মত মিষ্টি জিনিষ কোথায় পাবো, বাবা?

আনন্দসহকারে চাপাটী খেতে খেতে বললেন, 'মা', তোমার এই চাপাটীর মত মধুর খাদ্যদ্রব্য পূর্ব্বে আমি আর আহার করিনি! শিষ্যবৃন্দকে বললেন, দেখলে কি ভক্তিমতী মহিলা! এরূপ সাত্ত্বিক আহার ভাগ্যে আমার অনেক দিন লাভ হয়নি!... জানতেন, তাঁর সাংসারিক দুরাবস্থার কথা। বিধবার অজ্ঞাতসারে বাড়ীর একটি পুরুষের হাতে একখানা একশোটাকার নোট দিলেন। আপত্তি উঠলো কিন্তু কিছুতেই তা শুনলেন না!....

আলোয়ার থেকে জয়পুরে গেলেন। সেখান থেকে রাজাবাহাদুরের ব্যবস্থানুসারে খেতরি যাত্রা করলেন। নয় মাইল পথ ঘোড়া, উট ও রথে চেপে অগ্রসর হলেন। বারো মাইল পথ এগিয়ে এসে রাজাবাহাদুর রাজোচিত সমারোহসহকারে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। নগরে এই আগমন উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। রাত্রিতে আগুনের খেলা দেখানো হল। দরিদ্রনারায়ণদের ভুরি ভোজে আপ্যায়ণ করা হল।

অভ্যর্থনা সভায় স্বামিজী উপবেশন করামাত্র, রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ, সর্দ্দার ও উপস্থিত নাগরিকগণ এঁকে একে তাঁকে পায়ের ধুলো গ্রহণ করলেন। প্রথানুযায়ী প্রত্যেকে দুটাকা করে নজরানা দিলেন। রাজাবাহাদুর তিন হাজার মুদ্রা প্রণামী দিলেন। কেটে গেল দু'ঘণ্টা। পড়া শুরু হল অভিনন্দন পত্র। তাঁর উপদেশ মতো তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করছেন জানতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি বললেন; শিশুগণকে, শিক্ষা দিতে হলে তাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন হতে হবে। প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরের শক্তির আধার। শিক্ষা দেবার সময় আর একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, তারা যাতে নিজেরা চিন্তা করতে শেখে! উৎসাহ দিতে হবে সে বিষয়ে। মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ তারা মানুষ হবে, জীবসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হবে। ২০শে ডিসেম্বর যে বাংলোতে ছিলেন, সেখানে একটি সভা হল। স্থানীয় শিক্ষিত ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলারা সে সভায় উপস্থিত হলেন। সভাপতি রাজা বাহাদুর। দেড়ঘণ্টা

তিনি জ্ঞানগর্ভ একটি বক্তৃতা দিলেন। ভারতের ধর্ম্মজগতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমরা হিন্দুও নই—বৈদান্তিকও নই— আমরা ছুঁৎমার্গীর দল। রান্নাঘর হল আমাদের মন্দির, ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা আর ছুঁয়োনা মন্ত্র। সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার সত্ত্বর দূর করতে হবে। একমাত্র উপনিষদের উদার মতসমূহ প্রচার দ্বারাই তা সাধিত হওয়া সম্ভব।

রাজশিষ্যের আলয়ে কয়েকদিন যাপন করে কিষেন গড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর হয়ে খাণ্ডোয়া উপনীত হলেন। ক্রমাগত বক্তৃতা ও প্রচার কার্য্যে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এখানে এসে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গুজরাট ও বোম্বাই থেকে ডাক এলো কিন্তু তা স্থগিত রেখে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফিরলেন। ভাগীরথী তীরে একটি স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ছিল তাঁর মনে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে তা ব্যক্ত করে ছিলেন গুরুভ্রাতাদের কাছে। উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত বেলুড় গ্রামে। ভক্ত মিস হেনরিয়েটা মূলরের প্রদত্ত টাকায় কেনা হল ওই জমি। পূর্ব্বে এটা ছিল নৌকার আড্ডা। সমতল করে উপরে যে প্রাচীন একতলা বাড়ী ছিল, তা সংস্কার করে দোতালায় ও মঠ তৈরী করতে লাগলো একটা বছর। খরচা বহণ করলেন তাঁর লণ্ডনের শিষ্যবৃন্দ। ঠাকুরের ঘর তৈরীর খরচা বহন করলেন আমেরিকান শিষ্যা মিসেস ওলি বুল। আর মঠ পরিচালনের জন্য পরিচালক বর্গকে দিলেন লক্ষাধিক টাকা।.... ওদিকে মঠ স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে থাকলেন সেভিয়ার দম্পতি। আলাম বাজার থেকে বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাগানবাড়ীতে ভাড়া করে, মঠ অস্থায়ী ভাবে উঠিয়ে নিয়ে আসা হলো। এখানেই গুরুভাই সহ তিনি বাস করতে লাগলেন।

স্বামী সারদানন্দজী কার্য্য প্রয়োজনে আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন। সেখানে বেদান্ত প্রচার সাফল্যের সঙ্গে চালাচ্ছিলেন। স্বামী শিবানন্দজী সিংহল থেকে ফিরে এলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবা ও সাহায্য শেষে ফিরে এলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁর (স্বামিজীর) অনুপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ ভালভাবেই চালাচ্ছিলেন। স্বামী তুরিয়ানন্দজী নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দকে শিক্ষাদানে নিযুক্ত। ফিরে গুরুভ্রাতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ দেখে খুশী হলেন। শিবরাত্রির দিন অপরাহ্নে একটি সভা ডাকলেন। সভাপতি হিসাবে গুরু ভ্রাতাদের বক্তৃতার নির্দ্দেশ দিলেন। তারপরে আধঘণ্টা তিনি উপস্থিত কর্ত্তব্য ও তাঁদের কি হওয়া উচিত সম্বন্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি সমাগত। মহাৎসবের ভার তিনিই নিজে গ্রহণ করেছেন। জানালেন তাঁর অভিপ্রায়। তিনি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ও তাঁর ব্রহ্মানেতর শিষ্যবৃন্দকে উপবীত প্রদান করলেন। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপর উপনয়ণ ও গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করার ভার দিলেন। ঘোষণা করলেন: শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণ প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ। বেদ বলেছেন : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কারের অধিকার আছে। সংস্কার অভাবে এঁরা.... বর্ত্তমানে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি। এই পুণ্যদিনে এঁরা স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব গ্রহণ করুক, কালে এঁদের ব্রাহ্মণ করে তুলতে হবে।

পঞ্চাশজন ভক্ত গঙ্গাস্নান করে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃতির সামনে উপবীত ও গায়ত্রী-মন্ত্র গ্রহণ করলেন। তিনি গৃহীত উপবীত ভক্তগণকে সম্বোধন করে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দান করলেন। প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার আদেশ দিলেন।

ঘা পড়লো গোঁড়া হিন্দুসমাজে। উঠলো তুমুল ঝড়। কিন্তু নির্ব্বিকার তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য সমাজকে আঘাত করা নয়— প্রসুপ্ত হিন্দুজাতিকে আত্মসম্বিৎ দান করা। নানা শাখা উপশাখায়

বিভক্ত হিন্দুগণকে একত্রীভূত করে শাস্ত্রানুশাসনানুযায়ী চারটি মূল বর্ণে ফিরিয়ে আনা। তাহলেই পুনরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।....

☆ ☆ ☆

পূর্ব্ব পুরুষের বাস স্কটল্যাণ্ডে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের রস্ট্রেভর শহরে উঠে গেলেন তাঁরা। জন নোবল আর জর্জ নোবল দু ভাই। বড় জন গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক, আর জর্জ্জ বিধিবদ্ধ পড়াশোনা ছাড়াও খ্যাত হলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পণ্ডিতরূপে, ছিলেন কল্পনাপ্রবণ ও প্রভাবশালী। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের রস্ট্রেভরে এক বন্ধুর বাড়ীতে জনের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো মার্গারেট এলিজাবেথ নীলামের সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ, আর নীলামের বয়স আঠারো। পেশায় পাদরী, তাঁকে দেখে আত্মহারা হলেন নীলাম। বাবার নাম রিচার্ড হ্যামিল্টন। কর্কছিপির ব্যবসায়ী ধনী, রাজনীতিতে উৎসাহী। বিবাহবদ্ধ হলেন জন ও নীলাম। পরিবার থেকে বিতাড়িত হলেন নীলাম। তখন তাঁরা নিঃসম্বল। জন ছিলেন ওয়েসলিয়ান চার্চ্চে। তিনবছর অন্তর এক প্যারিশ থেকে অন্য প্যারিশে বদলী হতেন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যেই। জন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ছাপান্ন বছর বয়সে। তখন নীলামের বয়স পঁয়ত্রিশ। তিনিও হয়ে উঠলেন রাজনীতিক। সমর্থক রক্ষণশীল দলের। সর্ব্বপরিজন পরিচিত হয়ে উঠায় তাঁর বাড়ীতে শলা পরামর্শের জন্য মিলিত হতেন দলের লোকেরা।

নীলাম ছিলেন এগারোটি সন্তানের জননী। তারমধ্যে বেঁচেছিলেন ছয়জন। স্যামুয়েল রিচমণ্ড তাঁর চতুর্থ সন্তান। তাঁকেই সন্তানদের মানুষ করে তুলতে হয়েছিল।

একজন বিখ্যাত প্যাষ্টরের নাম ছিল রিচমণ্ড। নীলাম সন্তানের ভাবী জীবন যাতে ওই নামে প্রভাবিত হয়, তাই ছেলের নাম রাখলেন স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল। বড় ভাই জন তাঁকে মানুষ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। লাগালেন কাপড়ের ব্যবসায়। ধনী কাকা, শেখাতে লাগলেন ব্যবসা। স্যামুয়েল সাফল্যও অর্জ্জন করলেন কিন্তু ছলচাতুরিতে ছিলেন অপটু। ব্যবসায়ী সমাজের এক সমাবেশে মেরী ইসাবেল হ্যামিল্টনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। উভয়েই একেবারে তরুণ। তিন সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটি নীলামকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাই বাড়ীর বধূ হওয়া সহজ হয়ে উঠেছিল। বিয়ের পর সুন্দর গ্রাম সহর ডানগাননে সুখে দিন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অনুভব করতে লাগলেন ব্যবসার চাতুরী তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বামীকে পাদরী জীবন বরণে উৎসাহ দিতে লাগলেন মেরী ইসাবেল। তিনি কবি, চমৎকার বক্তা, ব্যক্তিত্বে তাঁর চৌম্বিক আকর্ষণ। রিচমণ্ডের মনেও ছিল দোটানা ভাব। ওয়েশলিয়ান চার্চ্চের ব্যাপারেও খুশী ছিল না মন। অন্য চার্চ্চ খোঁজ নেওয়া দরকার, তরুণী স্ত্রীও গৃহসুখের সবকিছু বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত— এমন কি সব কিছু বিক্রী করে দিতেও। মার্গরেটের বয়স তখন চার। (১৮৬৭ মাসের ২৮শে অক্টোবর জন্ম। পিতামহীর নামানুসারে শিশুর নাম রাখা হল মার্গারেট এলিজাবেথ।)

আদর্শ বিলাসী সাম্যুয়েল, উজ্জল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। বৈচিত্র ও সংগ্রামহীন জীবনের জড়তা তাঁর জন্য নয়— পিছনে পড়ে রইলো ক্ষুদ্র শহর ডানগ্যানন। চলে এলেন ইংলণ্ডে, ম্যাঞ্চেষ্টারে। কয়েক বছর পরে ধর্ম্ম যাজকের পদ লাভ করে, চলে গেলেন ওল্ডহ্যামে, মা নীলামের কাছে চার বছরের শিশুকন্যা মার্গারেটকে রেখে। যাজকের কাজ ছাড়া দরিদ্রের সেবাও ছিল জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর ভাষণগুলি প্রাণবন্ত করে তুলতে লাগলেন ধর্ম্মবিশ্বাসের সহজ প্রেরণা ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতায়। শরীরের ওপর চলতে লাগলো কঠোর পরিশ্রম। ওল্ডহ্যামে আসার পূর্ব্বেই ভেঙে পড়লো তাঁর শরীর। কাটলো চার বছর। ডেভনের গ্রেট টরেন্টন পল্লীতে নির্ব্বাচন করলেন কর্ম্মকেন্দ্র। ব্যক্তি স্যামুয়েলের মধ্যে ছিল ধর্ম্ম পিপাসু মন, ফলে

চারদিকের পরিবেশ সহজ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হয়ে উঠতো। তখন জীবনযাত্রাও ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। পল্লীর পরিবেশ ছিল শান্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের দানে তখনও বিলাস স্বাচ্ছন্দ্যের উৎকট প্রভাব বিস্তার লাভ করেনি। সেখানে, তাই সহজেই স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের ছাপ আঁকা হয়ে গেল মনের কোণে।

নীলাম যখন চার বছরের, মারা গেলেন তাঁর মা। পালন করেছিলেন ঠাকুরমা। তিরিক্ষিবুড়ি, আধিপত্য করা তাঁর স্বভাব। আদর দিয়ে, প্রশংসা করে, মাথা খেয়েছিলেন নাতনীর। ধনী পরিবারের মেয়ে, পিতৃপরিবারের বসতিও আয়ারল্যাণ্ডে, বহুপূর্ব্বে। মূল মন্ত্র ছিল তাঁদের ফুঁড়ে এগিয়ে যাও। দাদামশায় রিচার্ড হ্যামিল্টন কর্কছিপির ব্যবসায়ী, রাজনীতিতে উৎসাহী। আর মার্গারেটকে চার বছর থেকে পালন করলেন নীলাম নিজে স্বয়ং। পড়াতেন বাইবেল। ফুল পছন্দ করতেন, বাগান তৈরী করতেন, প্রাচীরের গায়ে গায়ে রাশি রাশি ফুল ফুটাতেন সকল সময়। চর্চ্চা করতেন রাজনীতি। ছিলেন রক্ষণশীল দলের অন্তর্ভুক্ত। যাতায়াত নানা লোকের, চলতো শলাপরামর্শ। সর্ব্বজন পরিচিত সে বাড়ী। মার্গারেট শিশুমনে আঁকা হয়ে গেল সেই ছবি। চারদিকে প্রকৃতির, স্নিগ্ধ আবেষ্টনী। সঙ্গীগণের সঙ্গে খেলাধূলা, নিষ্ঠাবতী পিতামহীর অনলস কর্ম্মধারা, সেই সঙ্গে ভগবৎ উপাসনা সৃষ্টি করলো এক স্বপ্নরাজ্য!

ইংলণ্ডে সামুয়েল ব্যবসায়ের টাকা দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন ম্যাঞ্চেস্টারে। সুরু হল কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবন। সামাজিক আমোদ প্রমোদে যার দিন অতিবাহিত হয়েছে, তাঁকেই বরণ করে নিতে হল এই কষ্টকর জীবন। স্বামীর ছিল অদ্ভুত বাগ্মিতা। তাঁকে ওয়েসলিয়ান চার্চ্চ বা চার্চ্চ অব আয়ারল্যাণ্ডে যোগ দিতে বলা হল। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার কন্‌গ্রিগেশনালিষ্টে যোগদান স্থির করে নিলেন। এ আয়ে দিন চলে না, চাই বাড়তি রোজগার। অন্যের ছুটিতে তার হয়ে বেদীতে বক্তৃতা দিয়ে চললেন। ফলে শরীর তাঁর ভাঙলো। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। চরিত্রে তিনি আইরিশসুলভ উৎসাহী রাজনীতিক। যারা আসতো, তাঁরা তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন। দরজা বন্ধ করে আলোচনা সুরু করতেন। ঠাকুরমার কাছ থেকে ফিরে তার বদ্ধজীবন সুরু হলেও বাবার কথা মন দিয়ে শুনতো। 'ভিকার' হলেন স্যামুয়েল। তাঁকে পাঠানো হল দরিদ্র ওল্ডহ্যাম অঞ্চলে। এখানকার অধিবাসী গণ অশিক্ষিত। অতিরিক্ত পরিশ্রমে রোগটা বেড়ে গেল। পাঠানো হল ডেভনশায়ারের গ্রেট টরিংটন নামক গ্রামে। একবছর বাস করার পর মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন— ফুস ফুস ঝাঁঝরা হয়ে। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর দারুণ প্রভাব—সমস্ত প্যারিশ ভেঙে পড়লো তাঁর সৎকার অনুষ্ঠানে। গ্রেট টরিংটন ছোট জায়গা। পুরানো এক দুর্গ প্রাসাদ ছিল। তার গায়ে চরে বেড়াতো বনময়ূরীর দল। ছেলেদের খুশীর সীমা ছিল না। কিন্তু পরিবারের দারুণ আর্থিক কষ্ট। প্রয়োজন ছিল যত্নের, ভাল খাওয়া দাওয়ার, যেটা ছিল সাধ্যারিক্ত। মেরী শিশু সন্তানদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মার্গারেট চেঁচিয়ে বাইবেল পড়তো, বাবার বইগুলি বিন্যস্ত রাখতো। বাবার সঙ্গে তার হৃদয়ের নৈকট্য ছিল। তিনি মেয়ের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করতেন, মন খুলে কথা বলতেন—কথা হত ভারতবর্ষের। ভাবতো মার্গারেট, বড় হলে যে ভারতবর্ষে যাবে। বাবার সেবার আদর্শ তার হৃদয়পটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল সেই ছোট বালিকা বয়সে।

একটু বড় হয়ে যখন মা বাবার কাছে ফিরে আসে মার্গারেট—তখন ওল্ডহ্যামটা একটা অপরিচিত জায়গা। শিশুমনে যে সুর জেগেছিল পিতামহী নীলামের কাছে, জনাকীর্ণ নগরীতে পা দিয়ে, সে সুরটা হারিয়ে গেল। টরেন্টনে আসার পর জীবনের হারানো সুরটি ফিরে পেল, তখন বয়স তার আট। ছিল পিতার প্রিয়পাত্রী। বাবা ও মেয়ের মধ্যে ঘটে ছিল ভাবের বিনিময়। তাঁর উপাসনা পদ্ধতি, অন্তরের ভগবদ্ভক্তি-মাখা ভাষণগুলি তার কিশোর মনকে আকৃষ্ট করলো। বাইবেলের বিচিত্র কাহিনী, কল্পনাপ্রবণ মনের যেমন, খোরাক যোগাতে লাগলো, তেমনি বাস্তব

জীবনের বাইরে একটা রহস্যময় জগতের সন্ধানে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। তাঁর আকুল প্রার্থনা, চিত্তে তার, আবেগ সঞ্চার করতে লাগলো। পারিবারিক এই পরিবেশেই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ। একটা গভীর দাগ কেটে গেল সেই কিশোর বালিকার অন্তরে।

ভাববিনিময়ই আনন্দ। বাবা ও মেয়ে যখন এই ভাব বিনিময়ে মশগুল, সেই সময় ভারত প্রত্যাগত এক ধর্ম্মযাজক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বালিকার সেই বুদ্ধি প্রদীপ্ত কোমল মুখ ও ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরাগ, তাঁকে (যাজককে) আকৃষ্ট করলো। মুগ্ধ হয়ে ভবিষ্যদবানী করলেন, : ভারতবর্ষ তোমায় একদিন ডাক দেবে। তন্ময় বিষ্মিতা বালিকা সেদিন মনের অতলে খোঁজ করে কোথায় সেই ভারতবর্ষ!

মাত্র একবৎসর টরেন্টনে বাস। স্যামুয়েল দেহত্যাগ করলেন ১৮৮৭। বয়স তখন মাত্র চৌত্রিশ। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্ত্রীকে বললেন, মার্গরেটের জীবনে বৃহত্তর আহ্বান আসার সম্ভাবনা— তিনি যেন সেদিন কন্যাকে সাহায্য করেন।

দারিদ্র্য.... কঠোর পরিশ্রম.... অকালমৃত্যু তবুও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, কন্যাই তাঁর জীবনে এনে দেবে এক বিরাট সান্ত্বনা। লক্ষ্য করেছিলেন কন্যার চরিত্রে দুর্লভ গুণের সমাবেশ, হয়ত তাঁর মহৎ সম্ভাবনার স্বপ্ন সফল হবে একদিন!.... ইতিপূর্ব্বে পিতামহীর মৃত্যু কিশোর মার্গরেটের হৃদয়ে গভীর আঘাত হেনে ছিল। পিতাকে শুধু ভালবাসতো বা শ্রদ্ধা করতো না : বিরাট ঐক্য ছিল উভয়ের মধ্যে। তাঁর মৃত্যু শুধু বেদনার দিল না, শূন্যতায় সুখময় স্বপ্নজীবন তার বিষাদে পরিণত হয়ে গেল।

স্যামুয়েল ছিলেন আদর্শের পূজারী। অভাব ছিল সংসারে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবুও মগ্ন ছিলেন রাজনীতির আবর্ত্তে, সেটা উদার নৈতিক রাজনীতি। যারা আসতো তাঁর কাছে — তারা সবাই কলেজের ছাত্র। অনুগত প্রত্যেকেই। বাড়ীতে ছিল একজন আইরিশ পরিচারিকা। নাম ম্যাগী, খুবই বিশ্বস্ত ও অনুগত। মার্গারেট জন্মাবার কয়েকদিন পরে লুকিয়ে ক্যাথিলিক মতে ব্যাপটাইজ করে আসে বাড়ীর এক পাচিকা, অবশ্য মা মেরী তাঁর গর্ভজাত এই প্রথম সন্তানটি নির্ব্বিঘ্নে জাত হলে, তাকে দেবতার কাজে উৎসর্গ করবেন বলে দেবতার চরণে একান্ত প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন ইতিপূর্ব্বে।

ওল্ডহ্যাম ছিল গরীবের শহর। বাস করতো সব শ্রমিক শ্রেণীর লোক। গাছপালা নেই, দূরে দেখা যেতো মাঠ, আর ক্ষেত। শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া। কলকারখানা থেকে দূরে ছিল সব বসতবাড়ী। খুবসকালে ৬টার আগে, শোনা যেতো শ্রমিকদের কাঠের জুতোর শব্দ। আর টরিংটন একটা গ্রাম। বাগানের মেলা। ফলে ফুলে ভরা চমৎকার জায়গা, দৃশ্য ছিল মনোরম। ওল্ডহ্যামে সুরু হল শিক্ষা। স্কুলে পাঠানো হল মার্গারেট ও বোন মে'কে। বাড়ী থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে তিন মহিলার তত্ত্বাবধানে চলতো সে স্কুল। বাগান ছিল, সেখানেই দুপুরের খাওয়া হত। শান্ত রাখার জন্য সেন্টজনের ১৪টি অধ্যায় মুখস্থ করতে দেওয়া হত। দুবোনের নাম দেওয়া হল 'সান' ও 'রেন'।

বাড়ী ফিরে চলতো লুকোচুরি খেলা। রান্নাঘরটি ছিল বড়, তাতে মস্ত চিমনী, ফায়ার প্লেস ছাড়া জায়গাটা অন্ধকার। সেখানেই চলে লুকোচুরি খেলা। পাহারা দিত মা আর ম্যাগী। একটু রাত হলে অগ্নিকুণ্ডের কাছে মা বাবার সঙ্গে শুয়ে পড়তো ভাইবোনেরা। চলতো ঘণ্টাখানেক আজগুবি গল্প।

আবার কখনও চার্চ্চের মধ্যে চলতো খেলাধূলা। সেটা ছিল সকলের প্রিয় জায়গা। মার্গারেট নিত প্যাস্টারের ভূমিকা।— বেদী থেকে চলতো বক্তৃতা— শ্রোতা মে আর অ্যানী। গান, প্রার্থনা অভিনয়। বাইবেলের যে অংশ জানাছিল সেই মজার জায়গাগুলো অভিনয় হতো।

মা বাবা এই খেলার কথা জানতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা আহারের পর পূজা, পড়া, প্রার্থনা। চেয়ারের পাশে নতজানু, সকলে উপস্থিত বাড়ীর ভৃত্যরাও।

প্রতি রবিবার চার্চ্চে যাওয়ার পালা। সেখানে থাকতো শান্তশিষ্ট হয়ে গল্প শোনার জন্যে। বিকালে উপাসনার পরিবর্ত্তে গল্প শুনতো মার কাছে, তাঁর কোলে মুখ লুকিয়ে। গল্প ছিল লোকান্তরিত আত্মাদের নিয়ে, থাকতো ধর্ম্মকাহানীও। মিশর সম্বন্ধে একটা টান দেখা যেতো মার্গারেটের মধ্যে। মিশরও তার শিল্প মনের নিবিড় একটা দাগ এঁকে দিয়েছিল সেই কিশোর মনের প্রান্তে। ক্রমে হিব্রুদের প্রতি সহানুভূতি বেড়েছিল। প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সূচনা এখানেই!

মনটা ছিল করুণাপূর্ণ। অসুস্থ গাঁয়ের লোকেদের কাছে দু'বছর বয়সেই চেঁচিয়ে পড়তো বাইবেল, খুব সুন্দর করে অপরূপ কণ্ঠস্বর মিলিয়ে। খুশী হতো শ্রোতারা। ইচ্ছা শক্তি ছিল দৃঢ়, ধাক্কা খেতেন মা, রাগ করে বলতেন, কী মেয়েই হয়েছে!....

স্বামীর মৃত্যুর পর বিদেশে একা শিশুপুত্র ও কন্যা দুটিকে নিয়ে বাস করা অসম্ভব বিবেচনায় মেরী ফিরে এলেন আয়াল্যাণ্ডে বাবা হ্যামিল্টনের কাছে। তিনি ছিলেন রাজনীতির বিশিষ্ট নেতা।. আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে (স্বায়ত্তশাসন) যোগ দিলেন। দশ বছরের মার্গারেট, আট বছরের মে কে বোর্ডিং স্কুলে পাঠান হল। মেরী নিজে চলে গেলেন সমুদ্রতীরে। তারপর লণ্ডনে। সেখানে দুবছর কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতি শিখলেন কিন্তু ছেলেমেয়েদের পালন করার মত রোজগার করতে সমর্থ হলেন না। ঠিক করলেন, পিতার সাহায্যে তৈরী করবেন একটি অতিথি ভবন। মেয়েরা পড়বে ইংলণ্ডে, স্কুলে। বেলফাস্টের কাছে একটি বোর্ডিং হাউস চালিয়ে অন্নসংস্থান করতে লাগলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ওল্ডহ্যামে। স্বামীর কাজে সাহায্য করতেন, চার্চ্চে যেতেন না বলে সমালোচিত হতেন, তার উপর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল অবিরত সন্তান ধারনের জন্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমে চড়া মেজাজ, তার উপর বাড়তি আলোর অভাব থাকায় (দরিদ্রবশতঃ) অন্ধকারে শোনাতেন বাইবেলের গল্প। সে কাহিনী, ব্যক্ত ভঙ্গিমায় সন্তানরা ভয় পেয়ে যেত। রাজনীতি ও ধর্ম্মকে মিশিয়ে তাতে কল্পনা যোগ দিয়ে ইজিপ্টের জ্বালাযন্ত্রণা, আয়ারল্যাণ্ডের নবজাগরনের কাহিনী শুনে চুল খাড়া হয়ে উঠতো শিশুদের। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয় লাফিয়ে ইচ্ছামত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সন্তানদের মনে রং ধরানোর চেষ্টায় মেতে থাকতেন। দারিদ্রের পেশণে বর্ণ সৌন্দয্যের আকর্ষণ মন থেকে মুছতোনা, সুতো তুলে নানা অলঙ্কার তৈরী করতেন। স্বাচ্ছন্দের মধ্যে পালিত, পিতৃগৃহে কোন কাজ করতে হয়নি। তা স্বত্বেও মানিয়ে নিয়েছিলেন স্বামীর দারিদ্র্য, শ্রদ্ধা করতেন পরস্পরকে মধুময় ছিল সে সংসার।

হালিফ্যাক্সে পড়তে গেল মার্গারেট ও মে। বিদ্যালয় ছিল কংগ্রিগেশনালিস্ট চার্চ্চের অধীনে। পরিবেশ আলাদা। পরিবারিক জীবনের অবকাশ এখানে নেই। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ন্ত্রিত জীবন। লেখাপড়া, খেলাধুলা ও উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়। বুধবার বৈকালটা ছিল প্রান্তর ভূমিতে ভ্রমণ। ঝোপঝাড়, লতাগুচ্ছ, কাঁটা গুল্ম, কালোজামের গাছ, বনগোলাপ, ব্লু-বেল সমাদৃত সেই প্রান্তর। কিন্তু ছিলনা কোন লাইব্রেরী। মার্গট ভালবাসতো ইতিহাস, কবিতা, শেক্সপীয়ার, মিল্টন। নাতনীরা দুটিতে বাড়ী ফিরলে, দাদামশায় উপহার দিতেন বই। শেক্সপীয়ারের একটা গ্রন্থাবলী ছিল তার, তাও শতচ্ছিন্ন, কাছড়াড়া করতো না কোনদিন। ছুটিতে বছরে, মায়ের কাছে ফিরতো দুবার। ধর্ম্মের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারছেনা বলে—শিশুদের মত আক্ষেপ করতেন মেয়েদের কাছে।

ধরা বাধা ছক, সর্ব্বত্র এই নিয়ন্ত্রণ, মার্গারেট শিক্ষয়ত্রীগণের সহযোগীতায় অধ্যয়নের আনন্দ, অনুরাগে পরিণত হল। নানা পাঠ্যপুস্তক তার দৃষ্টিকে বর্ত্তমানের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত

করেদিল। সময় পেলেই আগ্রহের সঙ্গে অন্যান্য পুস্তকও পাঠ করতে লাগলো। ফলে, সাহিত্য ছাড়া কলাবিদ্যাতেও অনুরাগ জন্মালো। পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার প্রতিও ঔৎসুক্যের সঞ্চার করলো। একান্ত করে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা শিশুবয়স থেকে ছিল বলেই, যে কোন বিদ্যায় শীঘ্র পারদর্শী হয়ে উঠলো। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা ও প্রখর কল্পনা শক্তি, যেমন সৃজনী প্রতিভা বিকাশের সাহায্য করলো, তেমনি চরিত্রের ছিল দৃঢ়তা ও অধ্যাবসায়, সেইসঙ্গে একান্ত করে জানার আগ্রহ। শিক্ষা তার কাছে আনন্দ স্বরূপ বলে প্রতিভাত হল। কঠোর নিয়মের গণ্ডী, মাঝে মাঝে তাকে বিদ্রোহী করে তুললেও সংযমের মঙ্গলভাণ্ড, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে যাহায্য করলো। ফলে, সহজেই নেতৃত্ব লাভের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। তীক্ষ্নবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতায় পাঠ্যাবস্থাতেই মার্গারেট পরিণত হল, সহপাঠিনীদের নেতৃত্বদানের অধিকারী। যদিও কেউ কেউ তাকে ভাবতো অহংকারী, জেদী, অসহিষ্ণু ও তার্কিক।

শেষ হল শিক্ষাকাল, সুরু হল কর্ম্মজীবন। শিক্ষার প্রতি ছিল সহজাত আকর্ষণ, স্থির করলো হবে শিক্ষয়ত্রী। জুটেও গেল কাজ। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষয়ত্রীপদ গ্রহণ করে যাত্রা করলো কেসউইকে। বয়স অল্প শিক্ষাক্ষেত্রে নোতুন পদক্ষেপ, উপলক্ষ্য জীবিকা নয়,.... এটা তার জন্মগত অধিকার, সুতরাং গ্রহণ করলো ব্রত হিসাবে। আন্তরিকতা ও উৎসাহ, নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে শিক্ষাদান প্রণালীকে সহজ ও প্রাণবন্ত করে তুললো। এখানেই হাইচার্চের সংস্পর্শে আসার সুযোগ এলো, ঘটে গেল মনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন। আধ্যাত্ম বিষয়ে জাগলো গভীর ঔৎসুক্য। এলো সত্যকে জানার পিপাসা। কেটে গেল একটি বছর।..... কাজ নিয়ে ১৮৮৬ সালে চলে এলো খনি অঞ্চল রেক্সহ্যাম শহরে। সেন্ট মার্কস চার্চ্চ শহরের মাঝখানে। বাবার প্রভাব পড়েছিল মার্গারেটের চরিত্রে। জীবদনাদর্শও সেই ছাঁচের। শিক্ষা কার্য্য ছাড়া অবসর সময়ে চার্চ্চের কর্ম্মী হিসাবে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত রাখলো নিজেকে। কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করলো এখানের কর্ম্মধারা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে। এখানে নিরপেক্ষ মতামতের কোন অবকাশ নেই। চিত্ত তার নির্ব্বিচারে সেবায় উন্মুখ, কিন্তু চলতে হবে চার্চ্চের অনুশাসন অনুযায়ী। ফলে, চার্চ্চের কর্ত্তৃস্থানীয়দের সঙ্গে শুরু হল মনমালিন্য। ছাড়লো সংস্রব। চিত্ত চায় : জনসেবায় স্বাধীনভাবেই নিজেকে নিযুক্ত রাখা উচিত। বিচারশীল মনে তার প্রশ্ন জাগে, সঙ্কীর্ণ হবে কেন? মনের কোণে সেই প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করতে লাগলো পরমপিতা যদি সৃষ্টির মূল হয়, তবে সেখানে এত ভেদাভেদ কেন?

কেসউইকে বসবাস কালেই অধ্যাত্মজীবনে আগ্রহ জেগেছিল। কনভেন্টে যোগ দেবার চিন্তাও তার হৃদয় অধিকার করেছিল, রেক্সহ্যামে জনসেবায়, নিজ শক্তিকে উপলব্ধি করেছিলো। দাম্পত্যজীবনের আগ্রহ লুপ্ত হয়ে গেল। নানা সংগঠনে যোগ দিয়ে তার কর্ম্ম ধারায় নিজেকে নিয়োজিত করে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় আত্মতৃপ্তি বোধ করলো। সেই সময়ে ওয়েলসবাসী তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। পরিচয়টা বন্ধুত্বে পরিণত হল। তখন পর্য্যন্ত লক্ষ্য ছিল আদর্শ, ছিল ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে জনসেবা। তখন মনে ছিল না অসাধারণ জীবনযাত্রার পরিকল্পনা। পিতা, পিতামহ, মাতামহ সংসারী ছিলেন কিন্তু সে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না তাঁরা। ধর্ম্ম ও সেবা-কর্ম্মই তাঁদের সাধারণ গণ্ডীবদ্ধ জীবনের ছত্রছায়া থেকে সাধারণ স্তরের উর্দ্ধে উন্নীত করেছিল। মনে প্রাণে ছিলেন তাঁরা আদর্শবাদী। আদর্শবাদী মন যতদিন পরমার্থকে খুঁজে না পায়, ততদিনই সাধারণ গণ্ডীর মধ্যেও পরিতৃপ্তির সন্ধান করে চলে। আদর্শের স্বরূপ অস্পষ্ট, তবুও অবচেতন মনে একটা সূক্ষ্ম আলোর-রেখা উদ্ভাসিত হয়ে পথের সন্ধানে, উদ্ভ্রান্ত করে রাখে। তারা সব সময়ে হয় আবেগময়ী। একবার আকৃষ্ট হলে, পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ আর তাদের থাকে না, ঝাঁপিয়ে পড়ে পতঙ্গের মত।

তরুণ ওয়েলসবাসীর মধ্যে সম্ভত মার্গারেট এমন একটা কিছু লক্ষ্য করেছিল, জীবনের লক্ষ্যপথে তাকে উপযুক্ত সঙ্গী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল না। পরস্পর বাগদত্তা হবার পূর্ব্বেই অতর্কিত রোগ আক্রমণে সে বন্ধু ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেল। ভাব সুখময় জীবনের কাল্পনিক জাল সহসা ছিন্ন হওয়ায় নিদারুণ মর্ম্মাহত হল মার্গারেট। ১৮৮৯ সালে চাকরী ছেড়ে চলে এলো চেষ্টারে।

কাজ নিয়ে বিচ্ছিন্ন হল পরিবারের সঙ্গে। নিঃসঙ্গতা বেশী করে পেয়ে বসলো। মার কথা বার বার মনে পড়তে লাগলো। আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতার পরিবেশে, দুঃখের বেদনাকে মুছতে চাইছিল মন। ছোট বোন 'মে' লিভারপুলে শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করলো। দুই বোনের উপায়ে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল। মা মেরী চলে এলেন আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে। ছোট ভাই রিচমণ্ড সেখানেই কলেজে যেমন পাঠে নিযুক্ত ছিল তেমনি ব্যবস্থা রইলো। স্থির হল, নিজে যাওয়াআসা করবে। বহুদিন পরে ভাঙা সংসারে জোড়াতালি লাগলো। আনন্দিত হল সকলেই।

শিক্ষাজগতে কুতহলী মন নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নোতুন নোতুন তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত রাখলো নিজেকে। দেশের শিক্ষাজগতে, নোতুন দৃষ্টিভঙ্গী আনছেন পেস্তালৎসি। পুরাতন শিক্ষায় অবহেলিত ছিল শিশুরদল। নোতুন পদ্ধতিতে, তাদের স্থান হল সবার আগে। সেই শিক্ষা বিজ্ঞানকে, আরও উন্নত করলো ফ্রবেল। দু'জনেই নোতুন আলোক সম্পাত করলেন। এককথায় বলা চলে এরা দুজনেই অগ্রদূত। মার্গারেট এঁদের অভিনব চিন্তাধারায় মুগ্ধ হল। তার মধ্যে যে শিক্ষক বাস করছিল, এঁদের চিন্তাধারায় তার জাগরণ ঘটলো। নবশিক্ষা প্রণালী অনুসরণে শিশু মনস্তত্বে জ্ঞান আহরণ পরীক্ষার কাজে, আত্মনিয়োগ করলো। প্রথমে শিশুকে পর্যবেক্ষণ, পীড়ন ছাড়াই, খেলাধূলার মাধ্যমে প্রবর্ত্তিত করা শিশুর মনের স্বাভাবিক গতি। আরও কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে তার আলাপ হল তাঁরাও অনুসরণ করছেন এই পদ্ধতি।

প্রথম আলাপ হল লজম্যানদের সঙ্গে, পরে তাদের সাহায্যে ডাচ মহিলা মিসেস ডি-লীউর সঙ্গে পরিচয় ঘটলো। নব পদ্ধতি আয়ত্ত করার চেষ্টায় মনপ্রাণ সমর্পন করলো। ক্রমে পরিচিতের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। লজম্যানদের সহায়তায় 'গুড সানডে' ক্লাবের সদস্যা হল। ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়া ও রচনা পাঠের সুযোগ এসে গেল। ক্লাবে পরিচিত হয়ে উঠলো লেখিকা হিসাবে। সুচিন্তিত ভাষণে সুপ্ত বাগ্মিতা আত্মপ্রকাশ করলো— সাহিত্যালোচনার সুযোগে মননশক্তির ক্রমবিকাশ ঘটতে লাগলো। পরিচিত হয়ে উঠলো চিন্তাশীলা, উৎসাহী মহীয়সী নারীরূপে।

যখন গবেষণায় রত, ঠিক সেই সময়ে ডাক এলো মিসেস ডি লীউ-এর কাছ থেকে। তিনি লণ্ডনে একটি বিদ্যালয় খুলতে চান— তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে কি?

নোতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে তোলার নেশায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের উইম্বলডনে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করে দিল। লিভারপুল ত্যাগ করে মেরী নোবল চলে এলেন। স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করলেন এখানে। পরীক্ষামূলক কাজ, নোতুন অভিজ্ঞতা, প্রচলিত নিয়ম ভেঙে শিশুর নিজের অভিপ্রায় ও স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষা করবে— তাদের কোমল চিত্ত, পাঠ্যপুস্তকের ভারে, অকারণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে না। শিক্ষয়ত্রীর কাজ : অলক্ষ্যে থেকে তাদের সেইসব উপকরণ সংগ্রহ করে দিতে হবে, আর তারাই (শিশুরাই) নির্ব্বাচন করে নেবে তাদের স্বভাবের উপযোগী বস্তুকে। ঠিক যেমনটি, মালী বাগানে চারা গাছ লাগিয়ে, সযত্নে নিরীক্ষণ করে, প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস ও জলের ব্যবস্থা করে, মাটির কাঁকর বেছে গতি পথের বাধা দূর করে। শিক্ষকের কাজও তাই। শিশুর সহজবৃত্তিগুলি যাতে নিঃসঙ্কোচে স্ফুরণের অবকাশ পায়, তার স্বাতন্ত্রতার সহজ বিকাশ লাভে পুষ্ট হতে পারে। অপরিণত মন যেন চারদিকের যাবতীয় পদার্থের প্রতি বিস্ময় ও ঔৎসুক্য প্রকাশে, জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে।

মার্গারেট শীঘ্রই শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। স্থির করলেন : নিজেই একটি বিদ্যালয় খুলবেন। প্রখর ছিল স্বতন্ত্র্যবোধ, অপরের অধীনে কাজ করা বা কারও সহযোগিতায় কাজ করা সম্ভব ছিল না, কারণ আপস করে চলার ধৈর্য্য ছিল না তার চরিত্রে। ১৮৯২ সালে উইম্বলডনেই আলাদা স্কুল খুললো। যে কজন তাঁর সহযাত্রী হলেন তাঁর মধ্যে শিল্পী এবেনীজার কুক তাদের অন্যতম। কুক রঙ ও তুলির সাহায্যে ফ্রবেল পদ্ধতি অনুশীলন করতেন। তাঁর কাছেই চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করলেন।

ব্যক্তিত্বই, আপন পথ প্রস্তুত করে দেয়। শীঘ্রই লণ্ডনের বিদগ্ধসমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। লেডি রিপন ও লেডি ইজাবেল মার্জেশনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। এঁদের ছোটখাট সাহিত্য' আসর ছিল। সমবেত প্রচেষ্টায় সাহিত্য আসরটি 'সেসেমি ক্লাবে' পরিণত হল। সংগঠনে অত্যতম উদ্যোগী, পরে ক্লাব সেক্রেটারী হলেন। এখানে নিয়মিত শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে নারীজাতির বিভিন্ন সমস্যা ও রাজনীতির তীব্র আলোচনা চলতে শুরু হল। ১৮৯২ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য পার্লামেন্টে 'হোমরুল' উত্থাপন করা হল। উৎসাহী মার্গট সকল তথ্য সংগ্রহ করে অসঙ্কোচে নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করলেন। বার্ণার্ডশ, হাক্সলী প্রভৃতি নামজাদা লেখক ও বৈজ্ঞানিকরাও মাঝে মধ্যে সেসেমি ক্লাবে বক্তৃতা দিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনায় চিন্তাশক্তির প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি পেতে লাগলো। চারপাশে শিক্ষিত, চিন্তাশীল, মাৰ্জ্জিত রুচি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও উৎসাহ পুষ্টিলাভ করতে লাগলো। শিক্ষাকার্য্যে সাফল্য, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ তাঁকে লেখিকা রূপে গণ্য করে তুললো। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, রচনাশক্তি ও বাগ্মীতা লণডনসমাজে শুধু সুপরিচিত নয় সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিলেন নিজেকে। নিত্য নোতুন আলোচনা, চিন্তার অভিনবত্ব, পণ্ডিতমণ্ডলী ও সুধীজনের সাহচর্য্য, তাঁকে টেনে নিয়ে চললো অন্য এক জগতে। যোদ্ধার ন্যায দৃঢ় পদক্ষেপ, সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করার দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা জীবনের যাত্রাপথকে সরল, দীর্ঘ প্রসারিত করে দিল।

১৮৯৫ সাল। লণ্ডনে প্রথম আগমন করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্দেশ্য: বেদান্ত-প্রচার। মার্গরেট জীবনের গতি ঘুরে গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে।

বয়স যখন পনেরো, ইংলণ্ডের চার্চ্চসমূহের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জন ফেবল, ডক্টর পুলি ও ডক্টর নিউম্যানের নেতৃত্বে অক্সফোর্ডে এক ধর্ম্ম আন্দোলন শুরু হয়, এদের মুখপত্র ছিল Tract of time। পরে এটাই Tractorian আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে, রূপান্তর ঘটে চার্চ্চের। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ, বর্ণ সুষমায় উজ্জ্বল রূপ নেয়। বিচিত্র সুর সংযোজনায়, প্রার্থনা-মন্দির সঙ্গীত মুখর হয়ে ওঠে। উপাসনায় নানা প্রতীকের উপর গুরুত্ব আরোপ হল। তপস্যায়— প্রয়োজন, অন্তরের আকুল অনুরাগ, ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা। মার্গটের কল্পনা এই আন্দোলনে প্রভাবিত হল। নীতিবোধ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, চরিত্রের ভবিষ্যৎ কাজের উপযোগী করে তুললো। চার্চ্চ নির্দ্ধারিত ধর্ম্মজীবনের প্রতি অনুরাগ পোষণ করলেও ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক দিকগুলো তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগলো, বয়স বাড়ার সঙ্গে। ধর্ম্মজীবনে এত অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা কেন? হৃদয় অহরহ নিপীড়িত ও ক্লিষ্ট—ধর্ম্মানুভূতির সহযোগী উদার আনন্দের অভাব এখানে! ধর্ম্মজীবনে চলার একটা নির্দ্দিষ্ট পথ দেওয়া আছে, অথচ উদ্যত শাসনদণ্ড হাতে, চার্চ্চ দাঁড়িয়ে। একটু এদিক ওদিক হলেই সর্ব্বনাশ। সেখানে দাক্ষিণ্যের অভাব, অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগলো : যাজকীয় সঙ্কীর্ণতার ওপরে। উদার ও মানবীয় কি ধর্ম্ম নেই তাহলে? অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে গুরুত্ববোধ ও নিষ্ঠা, তাঁকে শিখিয়েছিল প্রচলিত ঐতিহ্যের মূল্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিচিত্র ও বিভিন্ন

অনুষ্ঠানগুলিও তেমনি, সূত্র যা হৃদয়ে আবেগ সঞ্চারে তাঁকে অভিভূত করে তুলে। উত্তরকালে, হিন্দু ধর্ম্মের বিশাল সর্ব্বজনীন বেদান্ততত্ত্ব, তাই তার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করেছিল।

ইংলণ্ডের ব্রড চার্চ্চ স্কুলে যোগদান কালে, এখানের মতবাদ, তার আধ্যাত্মিক পিপাসা দূর করতে পারলো না। শুষ্ক নীতির ব্যাখ্যা, ভক্ত হৃদয় সুলভ আকুল আবেগের অভাবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রাণহীন বলে মনে প্রতিভাত হল। সেই মানবতার প্রতি বিদ্বেষ! অপর ধর্ম্ম মাত্রই কুসংস্কার বা অজ্ঞানমূলক বলে, প্রচণ্ড অবজ্ঞা! তাঁর জিজ্ঞাসু হৃদয়ের অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা— অপূর্ণই রয়ে গেল।

শিশু যিশুর প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল। বিপুল আত্মোৎসর্গের জন্য তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসলেও, মানবজাতির উদ্ধারের জন্য, যীশু যে স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জীবন দান করেছিলেন, তার তুলনায়, তাদের ভক্তি বা পূজা, যথেষ্ট নয় বলে মনে হতে লাগলো সকল সময়। তাঁর বিচার শক্তি ও বুদ্ধির তীক্ষ্নতায় হাক্সলী প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিস্মিত হলেন। যুক্তবাদী হলেই, সংশয়বাদী হতে হয়। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে, সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, তাই খ্রীষ্টান মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে মনে তাঁর সন্দেহ জাগতে শুরু হল। বিশ্বাস ও আচার— মিথ্যা বা অসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হওয়ায়, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা তার শিথিল হতে শুরু করলো। তবে এ সংশয়, আস্তিক্য বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ ধর্ম্ম ছিল তাঁর কাছে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অঙ্গীকারের প্রশ্ন নয়, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে, অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহও নয়, কি তার যথার্থ স্বরূপ, যা জানলে, আপাত বিরোধী বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে।

গীর্জ্জা যাওয়া ছেড়ে দিলেন। প্রাণহীন শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে, সত্যের সন্ধান বিড়ম্বনা। মানসিক যন্ত্রণার তীব্রতা ও নৈরাশ্য হৃদয়েকে আচ্ছন্ন করলো, অভ্যাসবশে গীর্জ্জায় ছুটেন, ভাবেন, অনুষ্ঠানে যোগ দিলে আর কিছু না হোক হৃদয়ের ভার কিছুটা লাঘব হবে। পরমার্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা যাঁর অন্তরে ধূমায়মান, তাঁর স্বস্তি কোথায়? শান্তি কোথায়? অন্বেষণ— সঠিক অবলম্বনের পথ।

গতানুগতিক আধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে সংশয় ও উৎকণ্ঠা, হৃদয়ে পোষণ করলেও লক্ষ্য ছিল সত্যের সন্ধান। যৌবনের প্রারম্ভে, সংসার রচনার স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যাওয়ায়, চিত্ত তাঁর অধিকতর সত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠলো।

সন্দেহ ও সংঘর্ষের মধ্যে কাটলো সাতটা বছর। বহু বই পড়ালেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, দার্শনিক মতবাদের চিন্তা ও গবেষণা সবই বৃথা হল। বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়ত প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে! কারণ, তার ভিত্তি সত্য ও বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠাঁই নেই ভাবুকতা বা কল্পনার! সুরু করলেন বিজ্ঞান সাধনা। সৃষ্টির উৎপত্তি ও সর্ব্ববিধ পদার্থের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে সর্ব্বত্রই একই সঙ্গতি। অসঙ্গতি প্রচলিত ধর্ম্মমতে। অথচ ধর্ম্মেই, জীবন তাঁর প্রতিষ্ঠিত হোক, এই তাঁর বাসনা। সংশয়ে, বিক্ষুব্ধ, কুলহারা তাঁর মন। তাঁকে উদ্ধার করবে কে? কে সে পথের দিশার সন্ধান দেবে?

এই সময়ে হাতে এলো বুদ্ধের জীবনী। 'Light of Asia' আগ্রহ ভরে পড়লেন প্রতিটি অক্ষর। ভাবলেন, এবার হয়তো যথার্থ তত্ত্বের উদ্ঘাটন হবে। সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না। কিন্তু আকৃষ্ট করলো সে-জীবন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম পড়তে শুরু করলেন, সংশয় মুক্ত হতে পারলেন না। তবে দৃঢ় ধারণা হল : বুদ্ধের বাণী, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-যাজকদের 'মুক্তি' ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর সুন্দর। আচরিত-ধর্ম্ম, চিত্তে পীড়া দিলেও, অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি তার ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠলো। স্তিমিত হল ধর্ম্মের আকুতি, আবেগ, জাগ্রত হল সত্যকে জানবার সংকল্প। জীবনের চিররহস্যভেদ করাই হয়ে দাঁড়ালো দুর্নিবার সেই আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম্ম কি তবে সত্য থেকে পৃথক? যুক্তিবাদী মন বলে না। "ধর্ম্ম

ও সত্য এক"। কিন্তু কোথায় সেই ধর্ম্ম? যেখানে হবে সকলের স্থান, যা উদার অকপটে সকলকে আলিঙ্গন করতে পারে? মুক্তি, শুধু নির্দ্দিষ্ট পথালম্বীর জন্য নয়, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে ঠাঁই দেবে সকলকে, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে। ঈশ্বরকে জগৎপিতারূপে উপাসনার বিশ্বাস তিরোহিত হল। বাস্তব সত্তা না থাকলেও, কল্পনা হিসাবে মূল্য থাকতেও পারে হয়ত। সেখানেও হলেন ব্যর্থ। সমস্ত চেষ্টা তাঁর বিফলে পরিণত হল। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাহচর্য্য, বিচারশক্তি ও বুদ্ধি খাদ্য দিতে পারে, অতিন্দ্রীয় সত্যলাভের পিপাসা দূর করতে পারে না। হৃদয়াঙ্গম করলো : দার্শনিক চিন্তাধারায় সত্যের প্রত্যক্ষ সন্ধান নেই। হাক্সলী, টিণ্ডল, স্পেন্সার প্রমুখ মনীষিগণ স্বীকার করেছেন 'মানবতা কোন উর্দ্ধ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন, মৌলিক কারণ নয়। সৃষ্টির আদি কারণ মনোবুদ্ধির অগোচর। নাস্তিবাদ বা অজ্ঞেয়বাদ পরিহার করেছেন সে পথ, প্রকৃত 'সত্তার' আভাস দিতে পারেন নি। অসংখ্য মতবাদ, ঘূর্ণিপাক ও জটিলতাও বটে।

মার্গট জীবন সংগ্রামে অবসন্ন হয়ে, শূন্যতা অনুভব করছেন। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব স্বামী বিবেকানন্দের। সকল সংশয় ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে আলোকের সন্ধান দিলেন তিনি।

শুধু মার্গট নয়, পাশ্চাত্য জগতের বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় সে সময় একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। স্বামিজী তৃষ্ণার্ত্তের কাছে সুশীতল পানীয়ের মত উপস্থিত হলেন, সেই সময়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্রমবিবর্ধমান অনিশ্চয়তা এবং হতাশা, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে য়ুরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছিল। খ্রীষ্টীয় অনুশাসনে আস্থা রাখা যখন অসম্ভব, স্বীয় প্রত্যক্ষ, উপলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে, এইসকল ব্যক্তির যে সন্দেহ ছিল, ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম উদঘাটনে, তাদের কাছে বেদান্তের দার্শনিক ব্যাখ্যা, নোতুন আলোকপাত করলো। তিনি সর্ব্বত্রই পরিচিত ছিলেন 'হিন্দুযোগী' রূপে। লেডি সার্জেসন একদিন ড্রইংরুমে এই যোগীকে কিছু বলার জন্য আহ্বান করলেন। সেখানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে জানালেন সে কথা। তাদের মধ্যে মার্গারেটও একজন। তাঁরা জানতেন এর জীবনে অধ্যাত্মবাদ, বিশেষ স্থান অধিকার করে বসেছে অথচ সত্যাসত্য নির্ণয়ের অক্ষমতায় তিনি হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তাকে আমন্ত্রণ জানানোর পূর্ব্বে লর্ড রিপনের এক দূরসম্পর্কীয় ভাই জানালেন তাঁকে, সত্যান্বেষণের পথে সাহায্য করতে পারেন এই হিন্দুযোগী। লেডি সার্জেসনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন কি? এ পর্যন্ত বহু মতবাদ ও ব্যাখ্যা ধৈর্য্যসহকারে শুনেছেন, অন্তরের পিপাসা মেটানোর জন্য, এখানে গেলে ক্ষতি কি? কুতূহল বশেই হিন্দু সেই যোগীকে দেখতে যাওয়া স্থির করলেন। তখনও জানতেন না সেই শুভলগ্ন সমাগত যাঁর প্রতীক্ষায় তিনি ব্যাকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত।

যখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামিজী শিকাগো ধর্ম্মসভায় যোগ দেন ও বক্তৃতাও করেন, সে সভায় উপস্থিত ছিলেন মিস মূলার। সে বক্তৃতা শুনে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না হয়েছিলেন। মি. স্টার্ডি ছিলেন ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। তিনি ভারতের উত্তরাখণ্ডে বাস করে কিছুদিন তপস্যা করেন ও সংস্কৃত শিক্ষা পাঠ করেন। আমেরিকায় স্বামিজীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, উভয়ে স্থির করলেন লণ্ডনে বেদান্ত প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। যখন টানা দু বছর বেদান্ত প্রচারে আমেরিকায় দীর্ঘ পরিশ্রমে শরীর ও মন তাঁর অবসন্ন, তাঁর অন্যতম গুণমুগ্ধ বন্ধু মি. লিগেট, তাঁর বিয়েতে তাঁকে ইউরোপে আসার আমন্ত্রণ করলেন। সেই সময়েই মিস হেনরিয়েটা মূলার ও মিঃ ই.টি স্টার্ডির কাছ থেকে লণ্ডনে আসার অনুরোধ এলো। সমুদ্র যাত্রায়, তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায় বন্ধুগণও আগ্রহান্বিত হলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি রওনা হয়ে ঐ মাসের শেষে, প্যারিসে অবস্থান করে ১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন রওনা হলেন। বাসস্থান নির্দিষ্ট হল মিঃ ষ্টার্ডির আবাসে। ভারতবর্ষ বিজিত দেশ, এখানে শাসকজাতির বাস, তারা পাঠিয়েছে য়ুরোপীয় সভ্যতা, পাঠিয়েছে যাজকদের, সে দেশের সেখানের অধিবাসীদের সভ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। যদিও ইতিহাস বলে :

জগতের সভ্যদেশ বলে পরিচিত ছিল তাঁরা, পাঠিয়ে ছিল নানা দেশে আধ্যাত্মিক সভ্যতা সেই বুদ্ধের বাণী এশিয়ার পথ ও প্রান্তরে, ভাগ্যের বিড়ম্বনায়, শাসকজাতি আজ পাঠায় তাদের ধর্ম্মযাজকদের তাদের সভ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। আর বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয়, যিনি প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের পুরোহিত রূপে পাশ্চাত্যভূমিতে আগমন করেছেন, বহু শতাব্দী পরে, মুক্তির সন্ধান ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, সারা পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। সংশয় ছিল— মনে, তারা সে বাণী গ্রহণ করবে কি? সহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনবে : কি সে বাণী?

কাজ আরম্ভ করলেন কয়েকদিনের মধ্যে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে ভালবাসতেন; দেখলেন একে একে। প্রচার বাড়তে লাগলো। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ও অভিজাত সম্প্রদায় আকৃষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। আলোচনা সভায় মহিলারাও যোগ দিতে লাগলেন। প্রিয়দর্শন হিন্দু যোগীকে দেখবার ও তাঁর বক্তৃতা শোনার আগ্রহ দেখা দিল বিপুল ভাবে। যোগ দিলেন লেডি ইজাবেল সার্জেশন। দর্শকদের সাড়ায়, হল ঘরে ক্লাসের ব্যবস্থা হল কিন্তু স্থান সঙ্কুলান কঠিন হয়ে পড়লো। ২২শে অক্টোবর পিকাডেলির 'প্রিন্সেস হলে' প্রকাশ্য বৃক্তৃতার জন্য অধিবেশন হল। স্বামিজী বক্তৃতা দিলেন 'আত্মজ্ঞান' বিষয়ে। সেদিন তাঁর বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন শত শত নরনারী। চমৎকৃত লণ্ডনের সুধীবৃন্দ, তাঁর গভীর দার্শনিক তত্বপূর্ণ বক্তৃতায়।

বিখ্যাত সংবাদপত্রে চললো সমালোচনা। রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে হিন্দুযোগীর তুলনা করে লিখলো : "বক্তৃতা মুখে আমাদের কারখানা, ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তকের দ্বারা মানবসমাজের যে সামান্য উপকার হয়েছে, বুদ্ধ এবং যীশুর কয়েকটি বাণীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করে অতি নির্ভীক, তীব্র সমালোচনা করেছেন এই হিন্দুযোগী। —তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও দ্বিধাহীন....."

দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিকল লিখলো : জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অবয়বে বুদ্ধদেবের পরিচিত মুখের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত পরিস্ফুট। আমাদের বণিকসমৃদ্ধি, যুদ্ধ, ধর্ম্মমত সম্পর্কে তিনি তীব্র সমালোচনা করে বলেন : এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা, আমাদের শূন্যগর্ভ আস্ফালন পূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হবে না।

দি ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট লিখলো : 'কথা বলার সময় স্বামিজীর মুখ বালকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠে। .... নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ইনি একজন মৌলিক ভাবপূর্ণ ব্যক্তি।

যখন স্বামী বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়েছে, মার্গারেট তখনও তাঁকে দেখেননি।

নভেম্বর মাসের এক রবিবার। মনোরম অপরাহ্ন। ওয়েষ্ট এণ্ডের (West-End) একটি ড্রইংরুম। অভ্যাগতের সংখ্যা বেশী নয়, মাত্র পনেরো ষোলজন। শ্রোতৃবর্গ অর্দ্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট। স্বামিজী তাঁদের দিকে মুখ করে বসে আছেন। পিছনে অগ্ন্যাধারে প্রজ্বলিত অগ্নি। ঘরোয়া ক্লাস। ভারতের উদ্যানে অথবা সূর্য্য অস্তকালে কূপের সামনে কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে উপবিষ্ট সাধু, চার পাশে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ, যথার্থ প্রাচ্য জীবনের দৃশ্য। প্রাচ্য পরিচ্ছদ। মস্তক মণ্ডিত সন্ন্যাসী, যেন প্রাচ্যজগতের আবেষ্টনী, বিস্ময়কর পরিবেশ : মার্গারেট যথাসময়ে পৌঁছলো এবং নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলো। লক্ষ্য করলো : সন্ন্যাসীর পরণে গৈরিক পোষাক, উজ্জ্বল আকৃতি ও বীরত্বব্যঞ্জক অবয়ব, ব্যক্তিত্বপূর্ণ আয়ত চোখ, প্রশান্ত মুখ, দিব্য শিশুর কমনীয়তা। গোধূলীর আধোআলো, আধো ছায়ার অপূর্ব্ব তন্ময়তা।

অভ্যাগতদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, সংস্কৃত শ্লোকের সুরে আবৃত্তি করে, ঠিক ইংলণ্ডের গীর্জ্জাগুলিতে প্রচলিত গ্রিগরি প্রবর্ত্তিত সুরকে স্মরণ করিয়ে দেয়— অথচ কত ভিন্ন। ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ়তর হল। মাঝে মাঝে 'শিব' 'শিব' বলে উঠছেন। পরিস্থিতি একেবারে নোতুন— পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই, অথচ কি গভীর চিত্তাকর্ষক।

বললেন স্বামিজী : প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের আদর্শ বিনিময়ের সময় এসেছে, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর পাশ্চাত্যে আগমন। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'— ব্যাখ্যা করে বললেন : বিভিন্ন রূপ, সেই এক অদ্বিতীয় সত্ত্বার বিকাশ। গীতা থেকে 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব'— ব্যাখ্যা করে বললেন, সূত্রে গাঁথা মনি-মালার মত এই সমস্ত আমাতে অবস্থিত।

আবার বললেন স্বামিজী : হিন্দুগণ বিশ্বাস করনে, শরীর ও মন এবং তৃতীয় পদার্থ আত্মার দ্বারা পরিচালিত। মার্গারেট বিশেষ করে আকৃষ্ট বোধ করলেন। মনে হল এক নোতুন তত্ত্ব। বিশ্বাসের (faith) পরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষানুভূতি (realisation) শব্দটি ব্যবহার করার আগ্রহ দেখালেন স্বামিজী। এদিন বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে সম্বন্ধেও আলোচনা করলেন।

শ্রোতৃবর্গ সকলেই গভীর আগ্রহ বোধ করছেন। এঁদের মধ্যে এক বৃদ্ধা রমনী ছিলেন। তিনি ফেডারিক ডেনিসন মরিসের শিষ্য ও বন্ধু। শিষ্ঠাচারের সঙ্গে অগ্রণী হয়ে তিনিই প্রশ্ন করছিলেন। অপরিচিত এক নোতুন হিন্দু যোগী! তিনি কি এমন নূতন তত্ত্ব উদঘাটিত করতে পারেন? সকলের মধ্যেই এরূপ একটা উদাসীনতা ও গর্ব্বভাব লুকিয়ে ছিল। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত গিলছিল তাঁর কথা। তিনি বলে চলেছেন অনর্গল, মনে হচ্ছিল তিনি যেন এক দূরদেশের বার্ত্তা বহন করে আনছেন।

সম্প্রদায়ের কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় প্রবাদ উদ্ধৃত করলেন, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভালো কিন্তু সেই গণ্ডীর মধ্যে মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানলাভের তিনটি উপায়। সকল ধর্ম্মের শিক্ষা : ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।

ভবিষ্যৎবাণী করলেন : পাশ্চাত্যের বিশেষ প্রচলিত কয়েকটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় কাঞ্চনাশক্তি বশতঃ অচিরেই বিনষ্ট হবে। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে অগ্রসর হয় না, সত্য থেকে সত্যেই অগ্রসর হয়ে থাকে।' সকল ধর্ম্মই সমভাবে সত্য, সেইজন্য তাঁর পক্ষে কোন অবতারের বিরুদ্ধ সমালোচনা সম্ভব নয়। সকল অবতারগণই সেই এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র। অবশেষে গীতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন:

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং স্বজাম্যহম্।।
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।

বক্তৃতা শেষ হল। সন্ন্যাসীর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর কক্ষের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। যারা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের ধর্ম্মে কারও তেমন আস্থা ছিল না। মনস্তত্ত্বই ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র। প্রচলিত এই আধুনিক আন্দোলনের পক্ষপাতী তাঁরা। এঁদের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মানো কঠিন। তাঁরা গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর কাছে অভিযোগ করে গেলেন : সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে নোতুনত্ব কিছু নেই।

মার্গারেট ফিরে এলেন। কিন্তু একটা আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যক্তিত্ব, বার বার ঘুরে ফিরে মনের দ্বারে আঘাত হানতে লাগলো।...

তার নিজের ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ছিল তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, প্রখর বুদ্ধির অধিকারী ছিল সে, জাগ্রত তার বিচারবোধ.... সদাসতর্ক, সদা সচেতন, অবিবেচনা প্রসূত অনুরাগ যেন হৃদয়কে আভিভূত না করে! নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়, সেই মার্গারেটের চিন্তাধারায় সহসা যেন 'কিন্তু'র একটু ছাপ।... যা নতুনত্ব নয় বলে এড়িয়ে এলো, সেটা কি সত্যই উপেক্ষার বস্তু? মনের কোনে সেই একটা চিন্তার আবর্ত্ত..... না, না, না, যা শুনিনি, যা দেখিনি, যা ভাবিনি, সূক্ষ্ম সেই

আলোক রেখা, যার আকর্ষণ আছে বিকর্ষণ নেই।

এড়িয়েও এড়ানো যায় না! .... কে এই গৈরিকধারী অদ্ভুত, প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী, যার মধ্যে গভীর প্রত্যয়! সুলোলিত কণ্ঠে, প্রাচ্য দর্শন ও বিভিন্ন মতবাদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়, সকলকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করতে পারেন? পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রতিও যার চরম নিষ্ঠা,- সমদর্শন, স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টি, সর্ব্বোপরি, পরিচ্ছন্ন, দেশ, কাল, নিমিত্তের অতীত যে অনন্ত-সত্ত্বা, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক পরম আশ্বাস বহণের শক্তি ধারণ করে। .... স্বীকার করতেই হল, মানতে হল, তাঁর বাণীর মধ্যে একটা শক্তি আছে— একটা আকর্ষণ আছে, আছে নোতুনত্বের সুর, উপেক্ষার বস্তু তা নয়।

একটা সপ্তাহ নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ করতে করতে মার্গট উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন, অপরিচিত সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা নোতুন ধরণের চিন্তাশীল মানুষটি, যে বার্ত্তা বহন করে এনেছেন, তা উড়িয়ে দেওয়া অনুদারতার পরিচয়, না বরং অন্যায়ও। এই হিন্দুযোগী যা বলেছেন, তা পূর্ব্বে হয়ত শুনতেও পারে বা চিন্তা করতেও পারে-- কিন্তু নিজের কাছে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট মনে হয়েছে, একঘণ্টা সময়ের মধ্যে ব্যক্ত করতে পারেন, এরূপ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শন লাভ জীবনে ঘটেছে কি ইতিপূর্ব্বে?

পুনরায়, মনে তাঁর বক্তৃতা শোনার আগ্রহ দেখা দিল। কিন্তু লণ্ডন বাসের সময় তাঁর সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। ১৬ই নভেম্বর ও ২৩শে নভেম্বর তিনি যে দুটি বক্তৃতা দিলেন, মার্গট তার সারাংশ লিখে নিল। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে, বার বার শুনে মনের ওপর যে রেখাপাত করে, বক্তৃতার সারাংশ বার বার পড়তে পড়তে বহুগুণ বিষ্ময়কর মনে হতে লাগলো। শুনতে ভাল লেগেছিল বলেই, সেগুলি সংগ্রহ করে ছিল, তার সার বার্ত্তা, গ্রহণের অবকাশ সেদিন ছিল না- সেগুলি চিন্তারাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু চিন্তাশীল ও সন্দেহবাদীর কাছে তা তখনও গ্রহণ যোগ্য হয়ে ওঠেনি। এ সত্ত্বেও কতকগুলি উপদেশের সত্যতা, সহজ বোধগম্য।

তিনি বললেন, সকল ধর্ম্মই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সমভাবে সত্য। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অনেকেই। মার্গট তা সহজে মেনে নিতে পারলো না। তার বিচার বুদ্ধি সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। স্বামিজীর যে বাণী তা উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দৃঢ়তা ও বিশ্বাস মার্গটকে অভিভূত করছে অথচ সেই কথাগুলি নিজে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করার চেষ্টা করতে লাগলো। তাঁর অবস্থান কালে নিয়মিত ক্লাশে যোগদান করতে লাগলো— অথচ বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করে চললো' কিন্তু....'কেন'। তাঁর মতকে খণ্ডন ও বর্জ্জন কররার চেষ্টা করতে লাগলেন—কিন্তু তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না বা অতিক্রম করতেও পারলেন না। যে অসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ববলে জগৎজয় করেছিলেন, তার দুর্নিবার প্রভাব অতিক্রম করার শক্তি বিদুষী ও বিচারসম্পন্না মার্গটের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বেই তাঁকে আচার্য্য রূপে বরণ করে নিল। এ আনুগত্য স্বীকার, শুধু তাঁর বীরোচিত উদার-চরিত্রের কাছে। বুঝেছিলেন, তাঁর প্রচারিত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন অসংলগ্নতা নেই, দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যকে প্রচারই তাঁর উদ্দেশ্য আর তার জন্যই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ।

২৭শে নভেম্বর স্বামিজী যাত্রা করলেন আমেরিকায়। পরের বছর পুনরায় ফিরে এলেন লণ্ডনে। মার্গট যথেষ্ট সময় পেলেন চিন্তা করার। স্বামিজী যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিল, দীর্ঘ চার মাস চিন্তার ফলে, ভারতীয় ভাবধারার কয়েকটি দিক অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। তাঁর উদার ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা— যা অন্য-ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় তা মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়। তাঁর ভাবগুলির মধ্যে যে যুক্তি বিচার, তার অপূর্ব্ব নোতুনত্ব ও গাম্ভীর্য্য অস্বীকার করা চলে না। মানব প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর— ধর্ম্মের নামে তাকেই যেন তিনি আহ্বান করছেন।

মার্গট এতদিন, বোধ হয় সেই আহ্বানের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, সে ডাকে সাড়া না দিয়ে স্থির থাকা সম্ভব হলনা।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল নিউইয়র্ক ত্যাগ করে পুনরায় লণ্ডন যাত্রা করলেন। তাঁর নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্বামী সারদানন্দ পূর্ব্বেই লণ্ডনে এসে সেন্ট জর্জ্জেস রোডে মিঃ ই.টি. স্টার্ডির আবাসে অবস্থান করছিলেন। লণ্ডনের বন্ধু ও অনুরাগীর দল তাঁর জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। আসা মাত্র সর্ব্বত্র সাড়া পড়ে গেল। স্বামিজীও কাজ আরম্ভ করে দিলেন। মে মাস থেকে ক্লাশ খুলে ধারাবাহিক রূপে, 'জ্ঞান যোগ' ও ওই মাসের শেষ হতেই প্রতি রবিবার পিকাডিলির 'রয়েল ইনস্টিটিউট অব পেন্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স গ্যালারীতে' বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। সাফল্যলাভে, জুন মাসের শেষ হতে জুলাই মাসের গোড়ার দিক পর্য্যন্ত, প্রতি রবিবার "প্রিন্সেস হলে" 'ভক্তিযোগ', 'ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতি' বক্তৃতা দিলেন এছাড়া প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি করে ক্লাশ করতে লাগলেন। শুক্রবার নির্দ্দিষ্ট রাখলেন প্রশ্নোত্তরের জন্য। এছাড়া নিয়মিত ড্রইংরুম, ক্লাব ও বহুলোকের বাসভবনে বক্তৃতা বা আলোচনা করতে লাগলেন। এসময় পুরাতন অনুরাগীদের অন্যতম ছিল মার্গট। সকল ক্লাসেই নিয়মিত ছাত্রী। তিনি (স্বামিজী) যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তার ওপর গভীর চিন্তায় মার্গটের কাছে এক নোতুন জগৎ উদ্ঘাটিত হতে লাগলো। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার পরিমাপ করা সম্ভব ছিল না। তবে, জ্ঞানপিপাসু হৃদয় নিয়ে তার সকল প্রশ্নের উত্তর মিলবে এই আশায় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তার সকল সংশয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে, সত্যের আলোতে হৃদয় তাঁর উদ্ভাসিত হবে, এ আশায় তন্ময় হয়ে রইলেন। শুধু হৃদয়ে, তার অনুরাগ পোষণ করতেন না, স্বামিজীর প্রচারিত বেদান্ত-তত্ত্ব ভাল করে বোঝার জন্য প্রতি কথায়, সংশয় প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রশ্নোত্তর ক্লাসে চেষ্টা করতেন, যুক্তির চোখা চোখা বুলি নিক্ষেপে স্বামিজীর মতবাদকে বিশ্লেষণ করে চললেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মার্গটের ব্যক্তিত্ব, স্বামিজীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বেদান্ত তত্ত্ব গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করার জন্য তিনি যত ছাত্র-ছাত্রী লাভ করেছেন এই তরুণী তাদের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। চোখে মুখে প্রতিভার ব্যঞ্জনা, চালচলনে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তীব্র উৎসাহ, যে কোন গূঢ়তত্ত্ব আয়ত্ত করবার মত মনীষা ও চরিত্রের দৃঢ়তা— তাঁকে মুগ্ধ করলো। বুঝলেন, অতীন্দ্রিয় সত্য উপলব্ধি করার জন্য প্রচণ্ড ব্যাকুলতার সঙ্গে মহান আদর্শের বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, এই তরুণীকে অপর সকলের থেকে পৃথক করেছে। শুধু শোনা বা চিন্তা করা নয়, আদর্শকে বাস্তবজীবনে রূপদান করতে সে অধীর। তাঁর নিজের অতীত জীবনের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

ক্লাসে, নির্ব্বিচারে সবকিছু গ্রহণ, তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন তোলাই যেন তার স্বভাব। একদিন একজন শিষ্য তাঁকে বললেন ..."আমি কিন্তু সকল কথা মেনে নিতে সমর্থ।" সে কথায় কান না দিয়ে একান্তে তাকে বললেন তিনি : (স্বামিজী), আমি দীর্ঘ ছ বছর আমার গুরুদেবের সঙ্গে লড়াই করেছি, ফলে পথের খুঁটি-নাটি আমার নখদর্পণে। তুমি দুঃখ করো না— আমাকেও বুঝার জন্য বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে।

স্বামিজী নিজের অতীত জীবনের কথা স্মরণ রেখে, তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন। উপলব্ধি করলেন : মার্গটের এই দ্বিধা, কোন সংকীর্ণতা বা কোন সংশয় নয়। এর পিছনে রয়েছে, জ্ঞানরাজ্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের তীব্র ব্যাকুলতা।

স্বামিজীর দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আগমন যেন মার্গটকে ভেঙে চুড়ে গড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। অবশ্য তাঁর সকল কথার প্রকৃত 'তত্ত্ব' অনুধাবণ করা, সত্যই ছিল কঠিন।

শৈশবে ধর্ম্মের প্রতি সহজাত আকর্ষণ, ক্রমে স্তিমিত হলেও আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রেখেছিল সে। পরোপকার ছিল তার ধারণায় 'শ্রেষ্ঠ' বস্তু। স্বামিজী বললেন, "ধর্ম্ম দানই শ্রেষ্ঠ"

এর পরে, বিদ্যাদান বা অন্য কোন কিছু দান নিম্নস্তরের। "বিশুদ্ধ বায়ু ও বসতি, যেমন স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়।" পাশ্চাত্যের নীতি : সাধুত্বই অন্যতম লক্ষণ, আর স্বামিজীর শিক্ষা : 'জগতের প্রতি উদাসীন হও'। তাঁর প্রতিটি উক্তি... যেন অভিনব। মার্গট হতাশ হয়ে পড়লেন। এই শিক্ষার রহস্য কি? অসাধারণ কুশলতায় সাংসারিক কাজের সুব্যবস্থায় যাঁরা নিযুক্ত..... মার্গট তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন। আর স্বামিজী বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : আধ্যাত্মিকতায় 'সাংসারিকতার' স্থান নেই! একদিন বললেন : ....ইংরেজররা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের চেষ্টা দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা। বললেন : সত্যকে সজীব করে তোলে চরিত্র, সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের সফলতা নির্ভর করে প্রেমের উপর। যেমন, বার্দ্ধক্যের পিছনে চিত্তের যতটা একাগ্রতা, ততই বাক্যটিকে যুক্তি প্রদান করে সে!

পরে অবশ্য পরবর্ত্তী জীবনে, মার্গটের ইংলণ্ডের মনোবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল— বুঝেছিলেন : কত সঙ্কীর্ণ তারা। অবশ্য তার আগেই স্বামিজীর তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে বুঝেছিলেন এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছেন —যিনি সত্যই সত্যদর্শী। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির তীব্রতা, জন্মগত সংস্কার ও পাশ্চাত্যে পারিপার্শ্বিক শিক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে, যুক্তির চুলচেরা ঝড় তুলে প্রতি পদক্ষেপে, আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন তাঁর মতবাদকে আয়ত্ত করার জন্য।

শ্রোতার পক্ষে বেদান্ত-তত্ত্ব আয়ত্ত করা কঠিন। বিশেষত : পাশ্চাত্য চিন্তাধারায়। সম্পূর্ণ বিজাতীয় বলে বিরাগ সঞ্চার করে বসে। পুনর্জন্ম : দুর্ব্বোধ্য, 'পাপ' অপরিজ্ঞাত। বেদান্তোক্ত মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, আভাষিক সত্তার মধ্যে। আপাত বিরোধ ও তার সমাধান, চিন্তাজগতের সর্ব্বোচ্চে। বেদান্তের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবাণ তত্ত্ব :"সকল ধর্ম্মেই সত্য বিদ্যমান" মার্গটের কাছে এটাই সবচেয়ে মূল্যবান বলে প্রতিভাত হল। তার চিন্তাধারায় প্রতীয়মান হল, যে ধর্ম্ম : বিশ্বজনীন উদারতা প্রচার করে,.... শিক্ষা দেয়— আমরা সত্য থেকে অধিকতর সত্যে উপনীত হই, মিথ্যা থেকে সত্যে নয়'— এরূপ ধর্ম্ম ধারণাই যথেষ্ট। এটাই এতদিন অন্বেষণ করেছিলেন তিনি।

চিন্তাধারার ছাপে মিলিয়ে, একটা আলোর ঝলক স্পষ্টতর হয়ে উঠলো— বেদান্তের এই সর্ব্বজনীনতায়, বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে একটা চমৎকার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা রয়েছে এখানে। যাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, সত্যকে আলিঙ্গন করতে উন্মুখ, তাদের ধর্ম্ম, সম্বন্ধে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, বেদান্তের আলোতে সমুজ্জ্বল। আর যেসব তত্ত্বপিপাসু, অনুরাগের সঙ্গে রহস্যময় কাব্য-সাহিত্য পাঠে এক অতীন্দ্রিয় সত্ত্বার চকিত স্ফূরণ উপলব্ধি করতে সমর্থ, তাঁদের কাছে স্বামিজীর 'সোহহম্' ধ্বনি যেন চিরপরিচিত। মনে হল তাঁর : ধর্ম্ম নিহিত নিঃস্বার্থ সেবা আর প্রচলিত ধর্ম্মের অনুশাসন, উভয়ের সমন্বয়-সাধনের জন্য "মানবের ঐকরূপ- মহান তত্ত্বের" একান্ত প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষাই দেয় বেদান্ত দর্শন।

এই সময়ে স্বামিজী যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তার মধ্যে 'মায়া' সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলিই শ্রেষ্ঠ। ইংরাজীতে মায়বাদ ব্যাখ্যা দুরহব্যাপার। প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, শ্রোতার পক্ষেও অনুধাবন কষ্টকর। তিনি শ্রোতাদের হৃদয়ে তা দৃঢ়বদ্ধ করার চেষ্টা করে চললেন। বললেন : এই জগৎ 'ধোঁকার টাঠি' সুখের লেশ নেই ,পরিশ্রমই সার। এর সম্বন্ধে কিছু জানি বা "জানিনা'ও বলতে পারি না— মতবাদ নয়, বস্তুস্থিতির উল্লেখমাত্র। স্বপ্নের মধ্যে অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগরিত অবস্থার সঞ্চরণ, সমস্ত জীবন অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে যাপন। এটাই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পরিনতি। এর নামই জগৎ।

আর মার্গট বুঝলেন : চকিতে প্রকাশমান, এই আছে, এই নেই, অর্দ্ধসত্য... অর্দ্ধমিথ্যা— ইন্দ্রিয়জগতে নিরন্তর ছুটে চলা। নিশ্চয়তা নেই, তৃপ্তিও নেই, —এরই নাম 'মায়া'। এর মধ্যে ওতপ্রোত যিনি রয়েছেন- তিনিই মহেশ্বর— "মায়ি নন্তু মহেশ্বরম" মার্গট অনুভব করলেন :

স্বামিজীর সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যার মূলে, এই দুটি ভাব পাশাপাশি বিদ্যমান। অন্যান্য উপদেশ ও ভাবগুলি এদের অনুবর্ত্তী মাত্র। মায়াতে ডুবে থাকা বা তন্ময়তার নাম 'বন্ধন'— আর এই গণ্ডীকে অতিক্রমের নামই মুক্তি। বন্ধন যদি ভাঙতে চাও, ভোগের অন্বেষণে বিরত হও। ত্যাগকে জীবনের মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ কর।....

বিচারমূলক ধর্ম্মকে স্বামিজী অস্বীকার করেন নি। জড়বাদী বলেন, জগতে একটি মাত্র বস্তুই বিদ্যমান। পার্থক্য: জড়বাদীমত অদ্বিতীয় বস্তু ও জড়,— স্বামিজীর মতে, তাহাই ঈশ্বর। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। অভিন্না 'তত্ত্বমসি'— তুমিই সেই , হে মানব তুমিই সেই। তিনি বললেন : ধর্ম্মকে পরীক্ষা করে নাও, তার রূপদান কর, যা কিছুতেই, সত্যকে ভয় করবে না। ধর্ম্ম ও সত্য— এক, মনে রেখো 'আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়— প্রকৃতিই আত্মার জন্য।

মার্গট তন্ময় হয়ে শোনে। হৃদয়ের অন্তস্থলে বয়ে চলে অবিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত। সংশয়, কুহেলিকার আচরণ ভেদ করে, ধীরে ধীরে সত্যরূপসূর্য্যের আলো প্রকাশ পায়। বিরুদ্ধ যুক্তির তীক্ষ্নতা মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ, এমনি ভাবেই, হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন করে সকল দ্বন্দ্বের অতীত অনির্ব্বচনীয় সত্ত্বাকে প্রকাশ করেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের মতবাদ প্রতিভাত হয়ে গেল। দুটি সুর। একটি সুর প্রত্যুষে নদী তীর থেকে ভেসে আসছে, বাঁশীর সুরের মত মিষ্টি, জাগতিক অন্যসুরের চেয়ে সুমধুর আর অন্যটি সুরের লহরী, শ্রোতা সেই লহরীতে বিলীন হয়ে পরিণত হয়ে উঠে গায়কে। প্রকাশিত হচ্ছে ত্যাগের মাহাত্ম্য। সেই মুক্ত অসীম, অপ্রতিহত সত্যের আলো, প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় জীবনে। মৌনব্রত অবলম্বনে, কর্পদকহীন সন্ন্যাসীর জীবন যাপনে, তীব্র আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো মার্গটের হৃদয়।...... অনুভূতির পরশে স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ করলো স্বামিজীর উপদেশগুলি, তার পূর্ব্ব-উপলব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভেতর আশ্চার্য্য সমন্বয় সাধন করেছে। পরস্পর বিরুদ্ধভাবগুলো যেন একই সত্তার ভিন্ন রূপ।৮

নোতুন এই অভিজ্ঞতা, নোতুন এক তাৎপর্য— জীবনে নররূপ পরিগ্রহ করলো। জাগতিক সুখ দুঃখের অধিকারী হয়ে, পরাধীন জাতির বেদনায় মার্গট আত্মনিবেদনে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো।

ধারাবাহিক ক্লাস ছাড়া বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন স্বামিজী। মিসেস অ্যানি বেশান্তের আমন্ত্রণে তার লণ্ডনস্থ এভিনিউ রোডের বাসগৃহে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। এই উপলক্ষ্যে মিসেস অ্যানিবেশান্তের কার্য্যধারার সঙ্গে মার্গটের পরিচয় ঘটে গেল। একদিন 'সেসেমি ক্লাবে'ও বক্তৃতা হল। বিষয় ছিল 'শিক্ষা'। ক্লাবের সেক্রেটারী মার্গট। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানার সুযোগ এলো। ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির উল্লেখে দৃঢ় বক্তব্য রাখলেন স্বামিজী : শিক্ষায় ভারতের উদ্দেশ্য ছিল "মানুষ তৈরী, বর্ত্তমানকালের মত কতকগুলো তথ্য মুখস্থ করানো নয়।"...

স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব ও বেদান্তবাদের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। সুদুর আমেরিকা থেকে মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড লণ্ডনে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, শুধু তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর ক্লাশগুলি জমে উঠলো। নিঃসঙ্কোচে সকলেই আপন আপন মতামত ব্যক্ত করতো— স্বামিজী উত্তর দিতেন একে একে। সকলেই সে কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতো। মার্গট সর্ব্বত্রই অগ্রনী।... একদিন এই প্রশ্নোত্তর ক্লাশ বেশ জমে উঠেছে। বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাওয়ার পর সহসা স্বামজী বললেন : জগতে আজ কিসের অভাব জানো? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে, বলতে পারে: 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল'। কে কে যেতে প্রস্তুত? আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বামিজী। শ্রোতৃবর্গের দিকে তাকালেন- ইঙ্গিত কে তাঁর সঙ্গে যোগদান

করতে ইচ্ছুক ! সেই বজ্রগম্ভীর আহ্বানে মার্গটের হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠলো। ভাবালো উঠে দাঁড়াবে সে। আবার ডাক দিলেন : কিসের ভয়? দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : যদি ঈশ্বর আছেন একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেরই বা মূল কী? ক্লাস শেষ হয়ে গেল। মার্গটের কাণে বাজতে লাগলো : যদি একথা সত্য হয় তবে জগতে আর প্রয়োজন কিসের? যদি একথা সত্য না হয় তবে জীবনেরই বা মূল্য কী?

ধীরে ধীরে মার্গটের হৃদয় নোতুন-জীবন গ্রহণ-সঙ্কল্পে দৃঢ় হতে লাগলো। ভাবাবেগে বিচরণ নয়, বিচার ও বুদ্ধির স্থির সিদ্ধান্ত : নিসংশয়ে যা সত্য ও আদর্শ বলে বুঝেছেন, তাব জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতেই হবে। নোতুন পথের দিশায়, পাড়ির-পথ প্রস্তুত! দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, চিন্তা নেই স্বামিজীর বজ্রগম্ভীর সেই আহ্বান প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অন্তরে— দিন নেই, রাত নেই ত্যাগ... ত্যাগ ... ত্যাগ — সর্ব্বস্ব ত্যাগ —এমন কি এ জীবনটাও!... এসেছে আহ্বান এ শুভমুহূর্ত্তকে কি উপেক্ষা সম্ভব?...

'গ্রহণ করতে হবে নোতুন জীবন। পরিনতি কি জানা নেই, অজ্ঞাত সে জীবনধারা, তবুও যেতে হবে, করতে হবে ত্যাগ— জীবনের যতকিছু সম্পদ! এসেছে ডাক ... চিন্তার নাহি অবসর... হলই বা নোতুন .. হলই বা অজ্ঞাত.... লক্ষ্য.... পথ.... সবই নোতুনত্বের....

চোখের পাতায় উদ্ভাসিত একটি মাত্র জ্যোতি, ... নির্ম্মল পবিত্রতামাখা...স্নিগ্ধ সূত্র একটি রেখা— চলে গেছে সোজা দৃষ্টি-পথের বাইরে। শুধু: চলো, এগিয়ে চলো— অজ্ঞাত সেই গন্তব্য-স্থলে। সেখানেই পাবে জীবনের গতি, পাবে জীবনের পূর্ণতা।

সফলতা —কি বিফলতা- চিন্তার নাহি অবকাশ, লক্ষ্য শুধু স্থির, নিদ্ধারিত পথে। যাত্রা, সবে শুরু। পথে আছে— বিফলতা, আছে শ্রান্তি,— আছে নির্ম্মম পরিহাস- সকল কিছুকেই অতিক্রম করে যখন শেষ প্রান্তে এসে থামবে. দেখবে, থেমে গেছে হাতছানি। নির্ম্মল আলোকে জ্যোতির্ম্ময় তুমি নিজেই।

যাঁকে গুরু পদে করেছো বরণ, গণ্ডির গ্রন্থী ছিন্ন করে, করো অনুসরণ, পাবে— পথের সন্ধান। বন্ধনের বেড়ী সেথা নেই, আলোর আলোয় উদ্ভাষিত শুধু প্রাণমন, নিজেকে বিলিয়ে, পাবে অমৃতের সন্ধান। বিধির নির্দ্দেশে— হল এই তব সাধনা"।

শুধু অনুসরণ - শুধু অনুসরণ, চলো— এগিয়ে চলো....

প্রাচ্যের যোগী, সাধক পুরুষ। ব্যক্তিত্বের ছটায়, স্নিগ্ধ দুটি নয়ন- আকর্ষণ করে, পিষ্ঠ করে ...আত্মত্যাগের আহ্বানে, শুধু হাতছানি দিয়ে, ছিন্ন করে ব্যক্তিত্বের বাঁধন। অজ্ঞাত সে পথ, চুম্বুকের আকর্ষণে মনপ্রাণ টেনে নিয়ে যায়— কোথায় কে জানে? চিন্তার বেড়াজালে ছিন্ন ভিন্ন মার্গটের হৃদয়। যেতে হবে ... যেতে হবে.. তাকে অভিসারে.... অভিসারিন্নী বেশে।

কিন্তু দেহ ও বুদ্ধি, পথের অন্তরায়— ব্যাকুল হৃদয়ের আবেগে। বুদ্ধি তথা বিচার-শক্তি আর দেহমন পথ রোধ করে দাঁড়ায়। দেহ চায় আশ্রয়, বুদ্ধি চুলচেরা যুক্তির প্রাবল্যে প্রশ্ন তোলে: অজ্ঞাত স্থান, কাল, পাত্র, যাকে অবলম্বন করে পাড়ি দেবে, তার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কি? এই যে তোমার নবজীবন, তার পরিণতি কি? সামনে যে সংগ্রাম, তার কূল কোথা? যে কর্ণধারকে অবলম্বন করে তোমার যাত্রা, তিনি কতদূর সাহায্য করবেন তোমাকে? তার আহ্বানের যথার্থ স্বরূপ কি?

দ্বন্দ্বের সংঘাতে দগ্ধ হয় মার্গট। যদি সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চাও, মুক্তি লাভ যদি একমাত্র কাম্য হয়,— সেপথের সন্ধান দিতে পারেন একমাত্র স্বামিজী! সেই শ্রেয় লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার মূল্য দেবার জন্য, প্রস্তুত থাকতে হবে। যে আহ্বানের জন্য এতদিন প্রতীক্ষা, এসেছে সেই আহ্বান— উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।' ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের সমীপে

গিয়ে, পরমতত্ত্ব অবগত হও। দিনের পর দিন অস্থির চিত্তে দিনযাপন করতে লাগলো মার্গট..... সে চায়- তাঁর আদর্শের সংজ্ঞা, যাতে সকল বিভ্রান্তি ও যুক্তির অবসান ঘটে।

৭ই জুন স্বামিজী মার্গারেটকে লিখলেন :

প্রিয় মিস নোব্‌ল,

আমার আদর্শকে বস্তুত : অতিসংক্ষেপে প্রকাশ করা যেতে পারে। মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রচার ও জীবনের প্রতি কাজে, সেই দেবত্ব বিকাশের পথ নির্দ্ধারণ।

কুসংস্কারে আবদ্ধ এই সংসার। উৎপীড়িত, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, তাকে আমি করুণা করি। আর যে উৎপীড়ক, সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই ধারণাটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট আমার কাছে। সকল দুঃখের মূল অজ্ঞতা, আর কিচ্ছু নয়। জগতকে আলোকে দেবে কে? আত্মোৎসর্গ ছিল অতীতের নীতি, যুগ যুগ ধরে চলবেও তাই। যাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য 'বহুজনহিতায় বহুজনয় সুখায়' তাঁদেরই আত্মোৎসর্গ করতে হয় জগতে। অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন।

জগতে ধর্ম্মগুলি, আজ প্রাণহীন। ব্যঙ্গমাত্রে পর্য্যবসিত। জগৎ চরিত্র চায়। আজ সেইরূপ লোকদেরই প্রয়োজন, যাদের জীবন প্রেম-প্রদীপ্ত, যারা স্বার্থশূন্য। সেই প্রেমকে প্রতিটি কথার মাধ্যমে বজ্রের মত শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এটা তোমার কাছে নিশ্চয় কুসংস্কার নয়। তোমার মধ্যে, একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসবে। চাই সাহসপূর্ণ বাণী, তারচেয়েও অধিক সাহসের কাজ। হে মহাপ্রাণ, উঠ জাগো। জগৎ যন্ত্রণা দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা আহ্বান করতে থাকি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন। অন্তরে দেবতা এই আহ্বানে যতক্ষণ সাড়া না দেন। জীবনে এর চেয়ে কি বড় আছে? এর চেয়ে কোন কাজ মহত্তর? আমরা অগ্রসর হলেই বিস্তৃত কর্ম্মের পথ মুক্ত হয়ে যাবে। পরিকল্পনা নয়, কর্ম্মপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও কাজ সাধন করে চলে। আমি শুধু বলি—'জাগো, জাগো'। অনন্তকালের জন্য আমার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ।"

চিঠি পড়া শেষ হল। মার্গারেট স্তব্ধ অভিভূত। কত সংক্ষেপে কত উজ্জ্বলভাবে তাঁর আদর্শকে ব্যক্ত করেছেন। কোথাও অস্পষ্টতা নেই "হে মহাপ্রাণ, জাগো। জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? ধর্ম্মের নামে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের নামে, পৃথিবী সর্ব্ব নরনারীর কল্যাণ কামনায়— স্বামিজীর এই বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান। সমস্ত সত্তা একান্তভাবে নাড়া দিল মার্গারেটের। তার ভেতরকার মহাপ্রাণ, ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার বাধাবন্ধন উপেক্ষা করে : ত্যাগ, প্রেম ও করুণার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বামিজীর আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মার্গারেটের দিকে ফিরে বললেন স্বামিজী, 'ভারতের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয় তুমি সেগুলি কাজে পরিণত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।' সাক্ষাৎ আহ্বান। এতদিন প্রতীক্ষা করেছিলেন, তাঁর আহ্বান কোনরূপে প্রকাশ পাবে। আজ বুঝলেন, জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে। ভাবী জীবনের যে চিত্র আঁকা ছিল, তা ত্যাগ করতে কষ্ট হবে সত্য, জানতে চাইলো না, তাঁর সংকল্পের স্বরূপ। অনুমান করে নিলেন, তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। জগৎ সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত ধারণাকে বদলে ফেলতে হবে। তবুও কি সহজ অভ্যস্ত জীবন যাত্রা, জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট গতি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে যাওয়া? যে আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষা, কে জানতো, সেই আহ্বান কত কঠোর!

অত্যাধিক পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হলেন স্বামিজী। মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার, ও মিস মুলারের আমন্ত্রণে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সুইজারল্যাণ্ড ও ইয়ুরোপের অন্যান্য স্থানগুলিতে বেড়াতে

গেলেন। ফিরলেন সেপ্টেম্বরে। কিছুদিন মিঃ সেভিয়ারের হ্যাম্পস্টেডের বাড়ীতে ও পরে রিজওয়ে গার্ডেনসে মিস মূলারের এয়ারলি লজে অবস্থান করলেন। তাঁর অদ্বৈত ব্যাখ্যা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া বহু ধর্ম্ম যাজকের উপরেও বেদান্ত মতবাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর বক্তৃতায় শুধু যোগদান করলেন না, তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা ও বাস্তবজীবনে তা রূপায়িত করার আগ্রহবোধ করলেন। এঁদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলো। এঁদের মধ্যে হেনরিয়েটা মূলার, মিস মার্গারেট নোবেল (মার্গট) মি.. ই.টি স্টার্ডি, মি. গুডইউন ও মি. ও মিসেস সেভিয়ার প্রধান। এঁরা সকলেই স্বামিজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ছিলেন। মিস মূলার প্রভৃতি প্রভূত সম্পদের অধিকারিনী, স্বামিজীর সঙ্গে ভারতে আগমন করে তাঁর কাজে, জীবন ও সম্পত্তি সমর্পণ করতে প্রস্তুত। সেভয়ার দম্পতি তো স্থির করেই ফেললেন ভারতে এসে হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে একটি আশ্রম স্থাপন করবেন ও অবশিষ্ট জীবন তপস্বায় অতিবাহিত করবেন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি স্বামিজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। ভাবী সংকল্প ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছিল। সন্ন্যাসীরূপে আদর্শ প্রচারই ছিল সে উদ্দেশ্য।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনে সঙ্ঘ গঠনের বাসনা দৃঢ় ও পরিস্ফুট হয়। শুধু আদর্শ প্রচার নয়, প্রতিষ্ঠাও। স্বামী রামকৃষ্ণনন্দকে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আগমনের পর স্বামী সারদানন্দের কাছে দেশের বিষদ সংবাদ পেয়ে, গুরুভ্রাতাদের মঠ সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দ্দেশ দিলেন, নিজেও গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতে কাজ পৃথক হবে। জাগতিক অভ্যুদয়ের কেন্দ্রীভূত চিন্তাধারাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে, প্রয়োজন বেদান্ত প্রচারের। দারিদ্র্য ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতেও আবশ্যক বেদান্তের প্রয়োগ। এই কাজে গুরুভ্রাতাগণও সাহায্য করতে প্রস্তুত। কাজটা সীমাবদ্ধ থাকবে পুরুষ শ্রেণীর মধ্যে। নারীদের মধ্যে একাজের ভার কে নেবে? মার্গট শুধু ভাবুক, ও চিন্তাশীল নয় উৎসাহী কর্ম্মী একজন। তার আদর্শ ও অন্তররাজ্যের বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন তিনি। সেই হবে একাজের প্রধান সহায়। ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ ও আমেরিকায় সারদানন্দকে নিযুক্ত করে সেভিয়ার দম্পতি, সেক্রেটারী রূপে মি. জে. জে. গুডউইনকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। মিস মূলার এক সঙ্গিনী মিস বেল সহ কিছুদিন পর যাত্রা করবেন স্থির হল।

মার্গট মন স্থির করে ফেলেছে। কিন্তু এখনই যাওয়া সম্ভব নয়। তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সংসারের দায়িত্ব তার উপর, তারও উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন। পরের বছর যাত্রা করবে স্বামিজীকে জানিয়ে রাখা উচিত কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ তা সম্ভব হল না। মিস মূলারের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য জন্মেছিল। তিনিও মার্গটকে ভারতের আসার জন্য অনুরোধ করলেন। দুজনে একসঙ্গে কাজ করবেন। একদিন সন্ধ্যায় স্বামিজী যখন মিস মূলরের বাসভবনে আগমন করলেন, মিসমূলার তাঁর (মার্গটের) অনুরোধে তাঁর (স্বামিজী) কাজে যোগদানের বাসনা ব্যক্ত করলেন। স্বামিজী বিস্মিত হলেন। নিজেকে প্রস্তুত করছিল মার্গট তা জানতেন কিন্তু সঙ্কল্প যে স্থির, তা জানতেন না। তার ত্যাগ, অন্তর স্পর্শ করলো তাঁর। ধীরে ধীরে বললেন স্বামিজী, স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য যে কাজ হাতে নিয়েছি, তা সম্পন্ন করার জন্য, প্রয়োজনে, দুশোবার জন্মগ্রহণ করবো।

১৬ই ডিসেম্বর যাত্রা স্থির হল। ১৩ই ডিসেম্বর পিকাডিলিতে, 'রয়েল সোসাইটি অব পেন্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স' এ তাঁর বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন হল। প্রায় পাঁচশো শ্রোতার আগমনে সে সভাগৃহ পূর্ণ। সকলের অন্তর বেদনায় রুদ্ধ। অনেকের চোখে জল। সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ

বক্তৃতায় নয়, অপূর্ব্ব মানব-প্রেমের দ্বারাই তাঁদের চিত্ত জয় করেছিলেন তিনি। তাঁর উদারবাণীঃ প্রেম ও শান্তি। এরই বাঁধনে বেঁধেছেন সকলকে।

অভিনন্দনপত্র পাঠ শেষ হলে গম্ভীর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তার উত্তর দিলেন। সমবেত জনতার মধ্য দিয়ে যাবার সময় আন্তরিকতামাখা কণ্ঠে বললেন : হ্যাঁ, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়!'....

ইংলণ্ডে, কাজ পরিচালনা করতে যখন আরম্ভ করেন, তখন মি. ই. টি. স্টার্ডি সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী। মার্গট ধীরে ধীরে তাঁর স্থান অধিকার করলো।

১৫ই জানুয়ারী ১৮৯৭ স্বামিজী কলম্বো পদার্পন করলেন। ভারতের সর্ব্বত্রই তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলেন। কপর্দ্দক শূন্য, পরিচয়পত্রহীন সন্ন্যাসীর, পাশ্চাত্যে বেদান্তদর্শন প্রচার ভারতে অনেকের চোখে ভাল লাগেনি। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছিলঃ তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে সমর্থন করে না। সেই ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার মুহূর্ত্তে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দনে তাঁকে বরণ করে নিল— তাঁর স্বদেশবাসী। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলেন। মঠ তখন আলামবাজারে।

এবার মঠকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের পর কর্ম্মপন্থা স্থির করে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী মিসেস ওলিবুলকে জানালেন : কলকাতা ও মাদ্রাজে মঠ খুলতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। উল্লেখ করলেন, একটি সন্ন্যাসীদের জন্য। অপরটি মেয়েদের জন্য। তার পূর্ব্বে যদি জীবনান্ত হয় ব্রত তাঁর অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

ভারতের নারীর উচ্চ-আদর্শ পুনরায় জাগরিত হোক, নারী তাঁর পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, দেশ জাগরণের সাড়া আনুক, এটাই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। চেতনার জন্ম, নারীর গর্ভে। তিনি আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁর ত্যাগেই, গড়ে ওঠে বীর সন্তান, বীর যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠকর্ম্মী। তাদের মধ্যে প্রাণের স্ফুরণের প্রয়োজন। মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উত্তর ভারতীর জন্ম এদেশেই। তারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। সেই দেবীত্ব, তাঁদের মধ্যে সহজ স্ফুরণে দেশ ও মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনে ব্রতী তারা হোক এই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও আন্তরিক কামনা। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই, মনে তাঁর মঠ প্রতিষ্ঠার বাসনা জেগেছিল। আর সে মঠ পরিচালনার ভার অর্পন করবেন মার্গটের ওপর। ১লা মে ১৮৯৭ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের, বাগবাজারে বলরাম বসুর গৃহে সমাবেশের ডাক দিলেন। যদিও সেটা মিলন সভা, তার পিছনে ছিল তাঁর মানোভাব ব্যক্ত করার প্রথম আয়োজন। সেখানেই গ্রহণ করে নিলেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পূর্ণব্যবস্থা। নামাকরণ হল 'রামকৃষ্ণ মিশন'। উদ্দেশ্য ও আদর্শ : লোকসাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-এর পূর্ব্বেই গঠন হয়েছিল। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথের হাতে তাঁর ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই অর্পণ করে মঠের পত্তন করে যান। বরাহনগরে ও আলামবাজারে তার সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এবার তিনি বুদ্ধযুগের পর ভারতবর্ষে নোতুন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কর্তৃক সেই তাঁর প্রদর্শিত ভাব প্রচারের কাজে ব্রতী হলেন, যার উদ্দেশ্য— আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ— আত্মনিবেদন।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার চারদ্দিন পরে, ৫ই মে মার্গটের পত্রের উত্তরে জানালেন : ভারতে কাজ আরম্ভের সংবাদ। লিখলেন এ পর্য্যন্ত কেবল কাজের কথা গেল।

এখন তোমার নিজের কথা বলছি। প্রিয় মিস নোবল, দেখেছি তোমার মধ্যে যে মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা যদি ঠিক মত পরিশ্রম করে চল, তা শতগুণ প্রতিফলিত হবে। তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল হোক। আমার মাতৃভাষায় বলতে গেলে আমার সারা জীবন তোমারই সেবায় অর্পিত।

তিনি নিজের কাজে এগিয়ে চলেছেন। সেই সঙ্গে মার্গটকেও সে কাজের ধারা ও বিবরণ জানাতে লাগলেন। সে ভারতের একজন ভবিষ্যৎ কর্ম্মী, তাই বিস্তৃত খবরের একান্ত প্রয়োজন। সেভিয়ার দম্পতি হিমালয়ের ক্রোড়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করবেন। আর জীবন উৎসর্গ করে অজ্ঞ জনসাধারনের সেবায় আত্মনিয়োগে আদর্শের পতাকা বহন করে, মিশন প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মজীবনের ওপর, করবেন বেদান্তের প্রয়োগ। তাঁর কর্ম্মপদ্ধতির ধারা, জানানোর জন্য তিনি নিয়মিত পত্র লিখে চললেন মার্গটকে। সেইসঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল মঠের কাজ। জানালেন তাঁকে, ছ'সাত শিলিং ভাড়ায় নিয়েছেন জীর্ণ একটি বাড়ী, চব্বিশ জন যুবক শিক্ষা নিচ্ছে সেখানে। সেই সঙ্গে জানালেন তাঁর অতীত জীবনের কথা। আমি নিজেও যেভাবে শিক্ষালাভ করেছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই, গাছতলা আশ্রয় করে, কোনপ্রকারে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। তাতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছে। আমার চিরকালের ধারণা— এখন প্রত্যাশা করছি, কেবল হৃদয় দিয়েই জগতের মর্ম্ম স্পর্শ করা যায়। বর্ত্তমানের পরিকল্পনা, বহু-সংখ্যক যুবক গড়ে তোলা।.... কয়েকজন ইতিমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি পেয়েছিলাম, বিগত ভূমিকম্পে ভেঙে গিয়েছে। ওটি ভাড়াবাড়ী ছিল বলেই রক্ষা, ভাববার কিছু নেই। বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাজ চলে যাবে। ... এপর্য্যন্ত সম্বল কেবল মুণ্ডিত মস্তক, ছিন্নবস্ত্র, ও অনিশ্চিত আহার। এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পরিবর্তনও নিশ্চয় হবে। কারণ মনে প্রাণে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি।

কলকাতা বিভাগের সভাপতি ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। তিনিই নিয়মিত মিশনের কার্য্যাবিবরণী পাঠাতে লাগলেন। আগ্রহ প্রকাশ করে মার্গট স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন। স্বামিজী তার উত্তর লিখে পাঠালেন ৩০/৯/৯৭। জানালেন : মিশনের কার্য্যের ধারা। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা। অবশ্য এর পিছনে দুটো কারণ ছিল। পরিকল্পনাবিহীন কাজের ওপর পাশ্চাত্যবাসীদের আস্থা নেই, দ্বিতীয় মার্গটের উদ্দেশ্য ছিল: লণ্ডনে, বেদান্ত সমিতিতে মিশনের সুষ্ঠ পরিকল্পনা উত্থাপিত করা, যাতে সদশ্যগণ ভারত সম্বন্ধে উদার ও অনুকুল মত পোষণ করতে পারে।

স্বামী অভেদানন্দকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করছিল মার্গট। উইম্বল্‌ড্‌নে একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপন করা হল। নিয়মিত বেদান্ত প্রচার পত্রিকা-সংবাদ 'ব্রহ্মবাদিন', পাঠাতে লাগলেন। ক্লাশগুলি স্বামী অভেদানন্দ পরিচালনা করতে লাগলেন।

গ্রীষ্মকালে ক্লাশ বন্ধ হল। এটা ক্ষণ বিরতি মাত্র। বেদান্ত দর্শন বিরাট। পাশ্চাত্যে আবার নোতুন শ্রোতাদের ধারণা করা সহজ হয়ে ওঠেনা। তাই অবসরের প্রয়োজন, নির্জ্জন পরিবেশের দরকার।

এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে মিঃ স্টার্ডির মনোমালিন্য ঘটে গেল। তিনি আমেরিকা চলে গেলেন। অবশ্য এটাও একটা প্রধান কারণ। কিন্তু নিরুৎসাহ হল না মার্গট। যাঁদের বিশেষ আগ্রহ, তাদের মধ্যে সম্মিলন, পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের কার্য্যবিবরণী পাঠালেন। সেগুলি সম্মিলনে পড়া হল, ছাপিয়ে লণ্ডন ও আমেরিকায়, বন্ধুবর্গের কাছে বিতরণ করা হল। মার্গট লিখলেন..... রামকৃষ্ণ মিশন একটি ভাব বা আদর্শ, মহাপুরুষের নামানুকরণের জন্য নয়, বা ভালবাসা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয়— এ সঙ্ঘের লক্ষ্য ও উপায়, উভয়ই আমাদের প্রকৃতির অনুকুল ও পরিপোষক। জড়বাদী পাশ্চাত্যে, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনে, এই মিশন ও আলামবাজারে দুর্ভিক্ষের কার্য্য বিবরণী— তার চমৎকার প্রতিবাদ।

ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় শুধু বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা বিদ্বৎসমাজে বেদান্ত প্রচারে ক্ষান্ত ছিলনা মার্গট, নবপ্রতিষ্ঠিত মিশনের আদর্শ ও কাজের প্রতি সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হলেন। তাকে মিঃ স্টার্ডি, মিঃ এরিক হ্যামণ্ড ও মিসেস অ্যাষ্টন জনসন সাহায্য করতে লাগলেন।

লণ্ডনে কাজে ব্যস্ত থাকলেও, মন তার পড়েছিল ভারতবর্ষে। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেই যাত্রা করবেন সেই মুহূর্ত্তে। স্বামিজীও তার কাজের গুণগ্রাহী ছিলেন। তাকে কর্ম্মপ্রেরণা জুগিয়ে, উৎসাহ দিয়ে অকপট প্রশংসায় তাঁর প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরী করতে লাগলেন। ২০শে জুন ১৮৯৭ লিখলেন : তোমাকে অপকটে জানাচ্ছি, তোমার প্রতিটি কথা আমার কাছে মূল্যবান। তোমার প্রত্যেকটি চিঠি বহু আকাঙ্খিত বস্তু। যখনই ইচ্ছা ও সুযোগ পাবে নিঃসঙ্কোচে লিখবে। জেনে রাখ: তোমার একটি কথাও ভুল বুঝবো না— একটি কথাও উপেক্ষা করবো না।.... আজকাল আমার উপর ইংলণ্ড থেকে ভাল মন্দ উভয় প্রভাবের ক্রিয়া চলেছে। তোমার চিঠিগুলি— উৎসাহ ও আলোকপূর্ণ, আমার হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার করে। আমার হৃদয় ও এর জন্য লালায়িত। প্রভুই জানেন।

৪ঠা জুলাই লিখলেন : আমি তোমাদের সমিতির কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে একমত। ভবিষ্যতে যাহাই করনা কেন, ধরে নিতে পার তাতে আমার সম্মতি থাকবে। তোমার ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ইতিমধ্যে আমি তোমার কাছে অশেষ ঋণে বদ্ধ হয়েছি। প্রতিদিন ঐ ঋণের ভার বেড়ে চলেছে। সান্ত্বনা এই যে এসকলই পরের জন্য।

ভারতযাত্রার নির্দ্দেশ না মেলায় মার্গট ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠলেন। শেষে তাঁর হতাশার চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। সান্ত্বনা দিয়ে ২৩ মে জুলাই উত্তর দিলেন স্বামিজী : কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ নিবারণই প্রধান কর্ত্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কাজও চলছে : দুর্ভিক্ষে সেবা, প্রচার আব সামান্য শিক্ষাদান। এ পর্য্যন্ত অবশ্য খুব সামান্যভাবেই কাজ চলেছে। যে সব ছেলেরা শিক্ষাধীন, তাদের সুবিধামত কাজে লাগানো হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে, তোমাকে সমস্ত কাজের একটি করে মাসিক বিবরণী পাঠানো হবে।.... তুমি এখানে এসে যা করবে, ইংলণ্ড থেকে তারও বেশী কাজ করতে পারবে। দরিদ্রভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

চিঠি পড়ে মার্গট হতাশ হয়ে পড়লেন। পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে অধীর হয়ে ভারতযাত্রা নির্দ্দেশের অপেক্ষা করছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর এই প্রস্তাব তাঁকে আহত করলো। তাঁর চরিত্রে যেমন ছিল তেজ, তেমনি ছিল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। অসহিষ্ণু প্রকৃতি, মনোমত পথে অগ্রসরে বাধা পেলে আরও বেশী অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। তাঁকে তাঁর স্বদেশের নারীদের সহায়তার আহ্বান করেছিলেন। স্থির হয়েছিল : কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হলেই যাওয়ার ডাক দেওয়া হবে। অথচ স্বদেশে ফিরে সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। উপরন্তু জানালেন এখানে না এসে ইংলণ্ড থেকেই অধিক কাজ করতে পারবে।

নানা অভিজ্ঞতা থেকে স্বামিজীর ধারণা হয়েছিল : পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষে ভারতে কাজ করা কঠিন। কারণ ভারতের জলবায়ু উষ্ণ, য়ুরোপীয় জীবন যাত্রার অসুবিধা, তাছাড়া পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা বেশী। সেভিয়ার দম্পতি আলমোড়ায় যে আশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী, আদর্শের দিক থেকে উচ্চ হলেও ভারতের জনসাধারণের জন্য নয়। গুড্‌উইন মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে কাজ করছেন, কিন্তু নানা বাধাবিপত্তি তাকে অসহিষ্ণু করে তুলছে।

সুতরাং মার্গট তাঁর আদর্শ প্রচার ও বেশী সাহায্য করতে পারবে, বাগ্মিতা ও লেখনীর সাহায্যে ইংলণ্ডের জনগণকে ভারতের প্রকৃত অনুরাগী করে তুলতে পারবে। এছাড়া ভারতের জন্য অর্থ সাহায্যও তার পক্ষে সম্ভব।

স্বামিজীর উপদেশ তার মনের মত হল না। স্থির করে আছেন— তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করবে! তাঁর এখন একটিমাত্র চিন্তা, কবে ভারতে যাবেন!

সকল বাধা বিপত্তির প্রতিকূলে কাজ করার অদম্য ক্ষমতা ছিল তাঁর চরিত্রের অঙ্গ। আর দুর্দ্দমনীয় শক্তির প্রকাশই ছিল তার চরিত্রের প্রকৃতি। পাশ্চাত্যবাসীকে যা হতাশ করে, পশ্চাৎ অপসারণে বাধ্য করে, তাঁর কাছে সেগুলোই উৎসাহের প্রেরণা যোগায়। ভারতের কাজে ইংলণ্ডে থাকা তাঁর অসম্ভব মনে হল। স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণও জানেন ভারতে আসতে সে কৃতসঙ্কল্প। মিঃ স্টার্ডি ও মিস মূলারের পত্রে জানতে পারলেন, ভারতে এসে মিস মূলারের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রস্তুত। মিস মূলার ইতিমধ্যে ভারতে এসে গেছেন, আলমোড়ায় অবস্থান করছেন। অর্থ সাহায্য তিনি করতে পারেন, আর সে বস্তু উপেক্ষনীয় নয়। দূর-দৃষ্টিতে তিনি বুঝেছিলেন, মিস মূলার অব্যাবস্থিত চিত্ত, তাঁর চরিত্রে নেত্রী সুলভ অহমিকা আছে।

স্বামিজী স্থির করলেন : ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়— তার আগ্রহকে দমন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মিস মূলার সম্বন্ধেও সতর্ক করা প্রয়োজন। ২৯শে জুলাই ১৮৯৭ লিখলেন :

তোমাকে অকপটে বলছি, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভারতের কাজে তোমার সাফল্য লাভ হবে। ভারতের জন্য বিশেষত ভারতীয় নারী সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা একজন প্রকৃত... সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন, এরূপ মহীয়সী নারীর জন্ম দান করতে পারছে না। তাই অন্যজাতি থেকে, তাঁকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীমপ্রীতি, দৃঢ়তা তার উপরে তোমার ধমনীতে বইছে কেল্টিক রক্ত, তোমাকে তৈরী করেছে সেই উপযুক্ত নারী।

কিন্তু 'শ্রেয়াংসী বহুবিঘ্নানি'। এ দেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব কিদৃশ তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। এদেশে আসার পর তুমি নিজেকে অর্দ্ধ উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা। তারা শেতাঙ্গদিগকে, ভয়েই হোক বা ঘৃণায় হোক— এড়িয়ে চলে, তাদের তীব্র ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গেরা, তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে। তোমার প্রতিটি গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখবে।... যদি এসব সত্বেও তুমি কাজে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

...কর্ম্মে ঝাঁপ দেবার পূর্ব্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো, যদি কর্ম্মান্তে বিফল হও কিংবা বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো, আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করবো তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর বা না কর। বেদান্ত-ধর্ম্ম ত্যাগই কর বা ধরে থাক। মরদ্‌কী বাত হাত্তীকে দাঁত— একবার বেরুলে, ভেতরে যাবে না

তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস্ মূলরের কিংবা অন্য কারও আশ্রয় নিলে চলবেনা।

অনন্ত ভালবাসা জানবে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জুন আবেগভরে মার্গটের অন্তর্দেবতা আহ্বান করেছিলেন—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই সেই জাগ্রত দেবতা তাঁকে স্বাগত জানালেন।

প্রত্যাদেশ এসেছে। ভাবী-জীবনকে উপযুক্ত করে তোলায় তৈরী হতে লাগলেন। কেটে গেছে সংশয়!

'এসেছে ডাক, কেটে গেছে সংশয়,' ভাবীজীবনের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার কাজে মন দিলেন মার্গট।

আর স্বামিজী! নিশ্চয়তার অবকাশ তাঁর নেই। দেখেছেন তাঁর প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি। বুঝেছিলেন: সে উত্তেজনা তাকে শান্ত হতে দেয় না। সেই শক্তিকে যথাযথ পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তার সঙ্গে প্রভেদ আছে নিছক সমাজ সেবার। প্রথমটিতে : বলিষ্ঠ কর্ম্মের মধ্য দিয়ে চিত্তের বিশুদ্ধি, কর্ম্মফল অর্পন করা হয় জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে। তার প্রকাশ : কর্ম্মীকে, কর্ম্মের প্রকার ভেদ অস্বীকার করে, পরম ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা। তার প্রকাশ দম্ভে নয়, পৌরুষে নয়, দীন আকুতিতে। দ্বিতীয়টি : কর্ম্মে বিভেদ সৃষ্টি করে। কর্ম্মকে ছাপিয়ে ওঠে কর্ম্মীর আত্মম্ভরিতা। নিজেকে বিলোপ না করে, নিজেকে জাহির করতে সে ব্যস্ত হয়। মার্গটকেও ভারতে এসে, কর্ম্মীর সকল অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে হবে। তাকে ভাবতে হবে,... এটাই আমার সৌভাগ্য, তাঁর অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আমি। মার্গট তাঁর উপর নির্ভর করে, তাঁকেই জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করে ভারতবর্ষে আসছে। এই একান্ত নির্ভরতার পরিবর্ত্তে, যাতে স্বাধীনভাবে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে তুলে, তার নারীসুলভ কোমলবৃত্তি, যা বন্ধনকে লালন করে, তা উপেক্ষা করে, উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে সে, তার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন। সাধারণ নারী নয় সে! অসাধারণ তার বুদ্ধি, যেমন চারিত্রিক দৃঢ়তা, তেমনি প্রতিভার জ্বলন্তমূর্ত্তি। যদিও পাশ্চাত্যের অসহিষ্ণুতা ও অহমিকার ছায়া জড়িয়ে আছে সে চরিত্রের মধ্যে, তবুও সে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ভরা স্রোতস্বতীর মত। ব্যক্তিত্বের পূজার উর্ধ্বে, নৈব্যর্ক্তিক যে সাধনা, জীবনের লক্ষ্য সেই বস্তু, পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে স্বামিজী লক্ষ্য করেছিলেন। একটা আলোর জ্যোতি লুকিয়ে আছে যে চরিত্রের মধ্যে।

বার বার সতর্ক করলেন, ঝাঁপাবার আগে ভাল করে, চিন্তা কর। ১লা অক্টোবর ১৮৯৭ সালে স্বামিজী লিখলেন..... বড় অসুবিধা এই যে, আমি দেখতে পাই, অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু হৃদয় দিয়ে আমায় ভালবাসা অর্পন করে। প্রতিদানে কিন্তু কাউকে সবটুকু দেওয়া চলে না। কারণ তা হলে, একদিনে সমস্তকাজ পণ্ড হয়ে যাবে। অথচ নিজের গণ্ডীর বাইরে দেখতে অনভ্যস্ত এমন লোকও আছে, যারা প্রতিদানই চায়। কাজের সাফল্যের জন্য এটা আবশ্যক বেশী। যত লোক সম্ভব আমাকে মনে প্রাণে ভালবাসুক, অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে থাকতে হবে সকল গণ্ডির বাইরে। নেতা যিনি, তিনি থাকবেন সকল গণ্ডির বাইরে।.... আমার বিশ্বাস, তুমি একথা বুঝতে পেরেছ। আমি বলতে চাইনা, পশুর ন্যায় অপরের শ্রদ্ধাকে, নিজের কাজে লাগাবেন আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই, যা আমার নিজের জীবনে পরিস্ফুট। ভালবাসা আমার একান্তই আপন জিনিস, কিন্তু প্রয়োজন হলে বুদ্ধদেব যেমন বলতেন "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" নিজের হাতেই যেন নিজ হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি। প্রেমে আমি উন্মাদ, তাতে বন্ধনের তিলমাত্র ঠাঁই নেই।

মার্গটের চরিত্রে ছিল অত্যধিক ভাবপ্রবণতা— এটা কর্ম্মক্ষেত্রে অনিষ্টকর। 'বজ্রাদপি কঠোরানি, মৃদুনি ...কুসুমাদপি'—এটাই হবে বীজমন্ত্র। ...স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বার বার। মার্গট এসব পত্রের মর্মার্থ কতখানি গ্রহণ করেছিল জানা নেই— তবে পথ তার নিৰ্দ্ধারিত।

ভারতযাত্রার দিন এগিয়ে এলো। মা মেরী মেয়ের ইচ্ছায় বাধা দিলেন না। স্মরণে ছিল স্বামীর শেষ কথাগুলো। মনের কোনে উঁকি দিচ্ছে, তিনি নিজেই সঁপে দিয়েছিলেন তাকে দেবতার চরণে, যখন সে ছিল গর্ভজাত।

ভারত গমন উপলক্ষ্যে লণ্ডনে এক সম্মিলন আহূত হল। তাঁরা তার ভারত গমনে দুঃখবোধ করলেন। সান্ত্বনা ছিল, ভারতে গিয়ে— সে মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আর তার দ্বারাই সোসাইটিতে সে অভাবের ক্ষতিপূরণ হবে। বিদ্বৎসমাজে তার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল, তাঁরাও যোগ দিলেন সে বিদায় সংবর্দ্ধনায়। প্রার্থনা করলেন : 'যাত্রা যেন তার শুভ হয়!'

মার্গটের অন্যতম বন্ধু ছিলেন মিঃ হ্যামণ্ড। সে চিত্র সুন্দরভাবে এঁকে রেছেছেন তিনি :

"এক অনন্য অসাধারণ জ্যোতির্ময়ী তরুণী। নীল উজ্জ্বলতায় চোখ, বাদামী স্বর্ণাভ ত্বক্, কেশ। গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল। মুখে আকর্ষণীয় মৃদুহাসি, দীর্ঘ অঙ্গের পেশী গতিশীল, আবেগে চঞ্চল। আগ্রহী, উদ্যমে চঞ্চল সে হৃদয়, নির্ভীক চার চাউনী। উত্তরাধিকারিনী, আইরিশ জাতির আবেগ, ও উৎসাহে পূর্ণ গর্ব্বে ভরা তার শির। ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যে, প্রত্যুৎপন্নমতি, যেন কেল্টিক জাতির শ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত সে প্রতিমূর্ত্তি। মণিময় আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ইংলণ্ড ও সেখান থেকে নবলব্ধ মাতৃভূমি ভারতে বহন করে নিয়ে চলেছে সে তার সবকিছু।

অতি প্রত্যুষে ত্যাগ করলো উইম্বল্ডন। কুয়াশায় ঘন যার চারদিক—প্রচণ্ড শীত। আত্মীয় স্বজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ষ্টেশনে। সকলের চোখ, বেদনায় অশ্রুসিক্ত।

বহু প্রচারক পাঠিয়েছে— ইংলণ্ড তার খ্রীষ্টের ধর্ম্মপ্রচারে, সভ্যতাবিহীন, অজ্ঞান, অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতবাসীকে, সভ্যতার আলো ও পাশ্চাত্যজ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে— আর মার্গটের যাত্রা, সেই মূঢ়তার প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্ম্মপ্রচার নয়, কায়মনোবাক্যে ভারতের শাশ্বত সাধনার সঙ্গে অভিষিক্ত করবে জীবনকে, অর্ঘ্য নিবেদনের আকাঙ্ক্ষায়।"

পিছনে পড়ে রইল ইংলণ্ড। জাহাজের নাম 'মম্বাসা'। ত্যাগ করলো উপকূল। যতদূরে যেতে লাগলো, আশা তার অজানা পুলকে স্পন্দিত। অপরিচিত দেশ, তবুও যেন কত পরিচিত, কত আপনার মত হাতছানি দিচ্ছে। অজ্ঞাত তার ধূলি বাতাস, তবুও মনে হচ্ছে যেন বহুদিনের পরিচিত। ডাকছে আপনজনের মত : আয়, আয়, কোলে আয়, আয় আমার কোলে।

৭ই জানুয়ারী সকালে সানাই, সেখান থেকে আরম্ভ প্রাচ্য ভূমি। .... ১২ই জানুয়ারী পৌঁছালো এডেন।... ২৪শে জানুয়ারী সকাল দশটা জাহাজ নঙ্গর করলো মাদ্রাজে। মার্গটের কল্পনার ভারতবর্ষ— ধ্যানের ভারতবর্ষ। ডেকে এসে দাঁড়ালো। সবাই অপরিচিত—তবু যেন আপনার মনে হল।... পরের দিন বেলা দশটায় জাহাজ ছাড়লো। শেষ মুহূর্ত্তে গুড়উইন এসে উপস্থিত হলেন। পরিচিত মুখ... স্বামিজীর কাজে সেও জীবন উৎসর্গ করেছে, একই পথের সহযাত্রী।

যাত্রাপথের শেষ কলকাতা। সহসা মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সবই অজানা, সবাই অপরিচিত, কেমন যেন একা একা... ক্ষণিকের জন্য মনে হল! তবে কি সে ভুল করেছে? দু একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সঙ্গে পত্রবিনিময় হয়েছে, তাঁরাও আশ্বাস দিয়েছেন— চিন্তার কিছু নেই। মিস মূলার এসে গেছেন কিন্তু এখন তিনি আলমোড়ায়। তবুও একটু সংশয় একেবারে একা।!...

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী। জাহাজ ভিড়লো বন্দরে। স্পন্দিত হৃদয়ে মার্গট তাকালো তীরের দিকে। আশা তার ব্যর্থ হয়নি। তাকে অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং স্বামিজী অপেক্ষা করছেন, তারই জন্য! যে ভয় তাকে গ্রাস করতে চলেছিল, পরিচিত সেই মুখ দেখে শুধু সাহস নয় হৃদয়টা দুলে উঠলো পুলকে।

পূর্ব্ব-ব্যবস্থানুযায়ী চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক হোটেলে উঠলো। পরে মিস মূলার ফিরে তার সঙ্গে একত্র হয়ে অবস্থান করবেন। মিস মূলার পূর্ব্বেই একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে ছিলেন। শুরু হল নতুন জীবন। বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা করলেন স্বামিজী। চৌরঙ্গী অঞ্চলে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী বাস করতেন তাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেল। প্রতিদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর ইডেন গার্ডেনে বেড়ানোর সময় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ আরবাথনট কেউ না কেউ তার সঙ্গী হতেন। দেখলেন মিউজিয়াম, ফোর্ট, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি উপাসনায় যোগ দিলেন ক্যাথিড্রাল চার্চ্চে।

সে সময় চৌরঙ্গী ছিল জনবিরল, পরিষ্কার সুসজ্জিত। সেখানে বাস করে ইংরেজ। সে পল্লী দেখে, সম্পূর্ণ কলকাতা বা অধিবাসীদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। পাশ্চাত্যবাসীর,

তার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু মার্গট জানতেন : এদেশে কাজ করতে হলে এখানকার পল্লী সম্বন্ধে পরিচিত হতে হবে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। একাই ঘোড়ার গাড়ী করে সে সব আবিষ্কার করে নিলেন। এদেশের ভাবী জীবনের কাজের জন্য দুটি বিষয়ের জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ বাংলা ভাষা আয়ত্ত করা, দ্বিতীয়তঃ এদেশের শিক্ষাকার্য্য সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা লাভ করা। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যয় করতে লাগলেন বাংলা শিক্ষায় আর তদানীন্তন বিদ্যালয়গুলিতে যাতায়াত করে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশায়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মঠ আলামবাজার থেকে বেলুড় নীলম্বর মুখুজ্জের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হল। মাঝে মাঝে কাজের উদ্দেশ্যে বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরামবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করতেন স্বামিজী। সেই সময় মার্গটের সঙ্গে দেখা করে উৎসাহ দিতেন, বাংলা পড়াশুনা কেমন চলছে খোঁজখবর নিতেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে মিসেস সারা বুল ও মিস্ জোসোফিন ম্যাকলাউড বোম্বাই হয়ে ট্রেনে কলকাতা এলেন। স্বামিজী তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মিসেস বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড হোটেলে উঠলেন। দু একদিন পরে বেলুড়ে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বেলুড়ে তখন মঠের জন্য জমি কেনার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। 'বায়না' সারা। এঁদের নিয়ে জমি দেখতে গেলেন। সমতল করে গৃহনির্ম্মাণ সময়সাপেক্ষ। জায়গাটি উভয়ের খুব পছন্দ হল। এখানে থাকলে, স্বামিজীর প্রতিদিন সঙ্গলাভের সুযোগ পাওয়া যাবে। তাঁরা পুরানো বাড়ীটি সংস্কার করে বসবাসের অভিপ্রায় জানালেন। স্বামিজীও সম্মতি দিলেন। মোটামুটি সংস্কার সাধন করে কিছু আসবাব কিনে বাড়ীটি বাসের উপযুক্ত করে তোলা হল। স্বামিজীর অভিপ্রায় বুঝে মার্গটকেও তাঁদের সঙ্গে বাসের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

মিসেস সারা বুল নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলি বুলের সহধর্ম্মিনী। বস্টনে এঁর বাড়ীতে স্বামিজী আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্বামিজীর চেয়ে বয়সে বড়। ইনি বেলুড় মঠ নির্ম্মাণের জন্য এবং পরবর্ত্তীকালে ভগিনী নিবেদিতার (মিস্ মার্গারেট নোবল বা মার্গট নামে পরিচিত) কাজে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছেন। আমেরিকায় বহু ভারতীয় তাঁর সহৃদয় আতিথেয়তা ও সাহায্য লাভও করেছেন। উদার হৃদয়া মিসেস বুলের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য 'মা' বলে সম্বোধন করতেন।" স্বামিজী।

মিস জোসেফীন ম্যাকলউড শিষ্য ছিলেন না, ছিলেন পরমভক্ত ও পরম সুহৃদ। সমগ্র জীবন স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত। এঁর নাম দিয়েছিলেন 'জয়া'। পত্রে 'জো' বলে সম্বোধন করতেন। ভারতে পা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন স্বামিজী, কিভাবে আমি আপনার সাহায্য করতে পারি? উত্তরে বললেন স্বামিজী, "ভারতবর্ষকে ভালবাস"।

স্বামিজী তাঁকে অর্থাভাবের কথা জানালে তাঁকে প্রতিমাসে পঞ্চাশ ডলার দেবার অঙ্গীকার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনশত ডলার অগ্রিম দিলেন। সেই টাকায় স্বামী ত্রিগুণাতীত নবজাত 'উদ্বোধন পত্রিকা'র কাজে ব্যয় করলেন। উনি বেলুড়ে বহুদিন বাস করেছেন ও নানা ভাবে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে সাহায্য করে চলেছেন মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার হলিউড বেদান্ত সমিতিতে প্রায় নব্বই বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন)। ইতিমধ্যে স্বামিজী মর্গটকে কথা প্রসঙ্গে জানালেন, ধীরামাতার বাড়িটি আগাগোড়া ভালবাসায় মাখা। তোমার, বাড়ীটিকে স্বর্গ মনে হবে। মিসেস বুল যখন তাকে সাদর আহ্বান জানালেন, তা গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন মার্গট। স্বামিজীর লণ্ডনের ক্লাসগুলিতে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে মার্গটের পূর্ব্বেই পরিচয়

হয়েছিল। পত্রে তিনি (স্বামিজী) তাকে জানিয়ে ছিলেন, পরস্পরের ভারত আগমনের সংবাদ। তাঁকে কাছে পেয়ে খুশী হল উভয়েই।

২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পূজা এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সাধারণ উৎসব প্রতিপালিত হল। স্বামিজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে এই উৎসবে উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ জানালেন। এদিন তিনি প্রায় পঞ্চাশজনকে গায়ত্রী মন্ত্র ও উপবীত প্রদান করলেন। এ উৎসব অনুষ্ঠিত হল বেলুড়ের পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুর বাড়ীতে।

এদিন এই উৎসবে যোগদানের পূর্ব্বে মিস মূলার ও মার্গট দক্ষিণেশ্বরে পরিদর্শনে গেলেন। হাওড়া থেকে নৌকা যোগে মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গী একজন বাঙালী ভদ্রলোক, রাখালবাবু নামে পরিচিত। সুপণ্ডিত। সেদিন সেখানেও উৎসব। মহাপুরুষের আবির্ভাব, সাড়া জাগানো উৎসব। চাঁদনীর ঘাটে অবতরণ করে বাঁদিকের সরু রাস্তা ধরে চলার সময় শিবমন্দিরের চূড়ার মধ্যে দিয়ে কালী মন্দিরের চূড়া তাঁদের চোখে পড়লো। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিমার বেদীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর আরাধনার ব্যাকুলতায়, মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়েছিলেন। এখানে খ্রীষ্টান বলে তাঁদের এই মন্দিরের ভেতরে প্রবেশের অধিকার নেই এ সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাসকক্ষ অতিক্রম করে তাঁর সাধনার পীঠস্থান পঞ্চবটীর দিকে এগিয়ে চললেন। গঙ্গার বাঁধানো পোস্তায় কিছুক্ষণ বসলেন। পূণ্যতীর্থে অবস্থানের এই যে স্বল্প একটু সময় মার্গটের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত। তিনি দেখছেন আর ভাবছেন। কিছুদূরে একটি গাছের তলায় দুজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। সঙ্গে তাঁদের লাঠি আর কাপড়ের পুঁটলি। মাথায় জটা, দেখতে জংলী কিন্তু চোখে মুখে পরিস্ফুট অপূর্ব্ব আনন্দের চিহ্ন। সামনে গঙ্গায় উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গমালা। গাছের পাতায় মর্ম্মর শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছে বিহগকূলের বিচিত্র কাকলি। মিস মূলার ও মার্গট পবিত্র এই স্থানের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শুধু মুগ্ধ নন, হৃদয় তাঁদের পূর্ণ হয়ে উঠলো এক স্তব্ধ পরিবেশের আনন্দের মাধুর্য্যে। এই সেই গাছ, এরই পদমূলে বসে ধ্যানমগ্ন হতেন সেই মহাপুরুষ। সত্যকে উপলব্ধির পরম পরকাষ্ঠায়।

ঘণ্টাখানেক প্রায় তন্ময়তার ঘোরে যখন তাঁরা আচ্ছন্ন, ছোটখাটো জনতা তাদের ঘিরে ধরলো। তারই মধ্যে চলেছে তর্ক যুদ্ধ। সঙ্গী সুপণ্ডিত রাখালবাবু শাস্ত্র চরণ উদ্ধৃত করে বোঝাতে চেষ্টা করছেন এঁরা বিদেশিনী হলেও ঠাকুরের ভক্ত। স্থানমহাত্মে আকৃষ্ট এঁরা, পেতে চান এ পূণ্য ধূলির পরশ!

খুলে গেল ঠাকুরের শয়ন ঘরের দরজা। এলো সাদর আহ্বান। ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন দুইজনে। মনে হল মার্গটের শাস্ত্রচর্চ্চায় খোলেনি দ্বার... খুলেছে দরজা হৃদয়ের সহজাত ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রাবল্যে। তাঁবা দেখলেন, সর্ব্বত্র, পরিচর্য্যা পরিস্ফুট, সযত্নে ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ যথাযতভাবে বিন্যস্ত। যেমন ছিল তেমনি আছে সব। দেওয়ালে টাঙানো নানাচিত্র, তার মধ্যে অন্যতম মেরী, ম্যাজডলেনের নির্জ্জন পরিত্যক্ত স্থানে ক্রুশবিদ্ধ ভগবানের পদতলে প্রার্থনারতা।

কি পবিত্র স্থান! সমবেত উৎসুক মুখগুলির মধ্যে অনুভব করলেন নিবিড় স্নেহের বন্ধন।...

দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁরা গঙ্গার অপর পারে পূর্ণচন্দ্রের দাঁর ঠাকুরবাড়ীতে নৌকা যোগে যাত্রা করলেন। ঘাটে উৎসবের কোলাহল শোনা গেল। প্রাঙ্গণে সজ্জিত উৎসব মণ্ডপ, সঙ্গীতে মুখরিত সে প্রাঙ্গণ। শত শত যুবক অপেক্ষা করছে স্বামিজী কখন বক্তৃতা করবেন। প্রান্তে দরিদ্রনারায়ণের সেবার আয়োজনে কর্ম্মরত সন্ন্যাসীগণ।

পূর্ব্বেই উপস্থিত হয়েছিলেন মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড। চন্দ্রাতোপের নীচে ফুলে পাতায় সাজানো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি, শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের বস্তু। সঞ্চারণ শীল জনতা। তার মধ্যে

জীর্ণবস্ত্র পরিহিতা গোপালের মা। শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপালরূপে দর্শন করেছিলেন, তাঁকে গোপাল ভাবেই দেখতেন। পূর্ব্ব পরিচয় অঘোরমনি কিন্তু ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে 'গোপালের মা' রূপেই পরিচিতা। তিনি বিদেশিনীদের সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করে চুম খেলেন। কারও ভাষা কেউ বুঝে না সুতরাং আলাপের প্রশ্ন উঠলো না, প্রয়োজনও ছিল না। কোন কথা না বলে গোপালের মা তাঁদের হাত ধরে অন্তঃপুরিকাগণের নিকট নিয়ে গেলেন। সেখানেও বিস্ময়াভূত সাদর অভ্যর্থনা। মার্গটের মনে হল এভাবেই ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মনীষা পরিমাপ করা যেতে পারে।

একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। দক্ষিণেশ্বর ও উৎসব প্রাঙ্গণে নরনারীর সংস্পর্শ মার্গটের কাছে বিশেষ তাৎপর্য্যে পরিণত হল। এরা আপন পরিবেশে মানুষকে কত সহজে আপন করে নিতে পারে। তাই, প্রথমদিন থেকেই তাদের একান্ত আপনজন বলে গ্রহণ করে নিল মার্গরেট। ভারতবাসী রূপায়িত হল একনিমিষে 'Our people' এ। আর গোপালের মা, হৃদয়ের গভীর অনুরাগে দ্রবীভূত হয়ে, রয়ে গেলেন তাঁর জীবনের প্রাঙ্গণে।....

মার্গট অপেক্ষায় থাকলো এবার স্বামিজী তাকে অভীপ্সিত কাজের ভার দেবেন। ইতিমধ্যে তার পরিচয় ঘটে গেল সরলা ঘোষাল, জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর বোন লাবণ্যপ্রভা বসুর সঙ্গে। আলাপ হল শিক্ষা সম্বন্ধে। নানা আলোচনা হল। তাঁরাও তাঁকে সাহায্য করতে আগ্রহ দেখালেন। শ্রীমতী বসুর স্কুল, বেথুন স্কুল ও মাতাজীর পাঠশালা (কৈলাশবসু স্ট্রীটে) দেখে এলেন। উদ্দেশ্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করা। মিস মূলার অর্থ সাহায্য দানে প্রস্তুত। কিন্তু যিনি কাজের ভার অর্পন করবেন, তিনি নীরব। অপেক্ষা করছেন উপযুক্ত সময়ের। নিযুক্তির পূর্ব্বে প্রয়োজন ভারতবর্ষকে জানার। তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন যাদের উন্নতিকল্পে মার্গট আত্মনিবেদন করবেন, সেই ভারতীয় নারীজগতের সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক। বিদেশের জলবায়ু ও সেই পরিবেশে শিক্ষা ও সংস্কারে গড়ে উঠেছে যে জীবন, তাকে সম্পূর্ণ নোতুন দেশ ও পরিবেশকে আপন বলে গ্রহণ করার অবকাশ দিতে হবে, যত দিন না এই দেশের নারীজাতির মর্ম্মকথা উপলব্ধি করতে পারে, তার হৃদয়তন্ত্রীতে ভারতীয়ের প্রাণের সুরটি ঝঙ্কৃত না হয়, তার দ্বারা কি নারীজাতির কল্যাণ সম্ভব? প্রথমে পরিচিত হতে হবে ভারতীয় আদর্শ, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাবধারার সঙ্গে। মিশিয়ে দিতে হবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সে ভাবধারার মধ্যে, তবেই তো গড়ে উঠবে যোগসূত্র। উৎসরিত হবে প্রীতির পরশ, আপন গণ্ডীর মধ্যে একাঙ্গীভূত হয়ে, যে দিন এগিয়ে আসবে নিজেকে উৎসর্গ করতে, সেদিনই জন্ম নেবে সেবার অধিকার। তাঁর চোখে, সে-উৎসর্গ অনুষ্ঠানের অবকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অথচ পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে, ভারতবর্ষকে যথার্থভাবে জানার জন্য তাঁদের শিক্ষার ভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। যাঁরা নূতন মঠে যোগদান করেছেন, তাঁদেরও নিজতত্ত্বাবধানে নিয়মিত জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চরিত্রগঠনের প্রতি, প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। যাঁরা সুদূর বিদেশ থেকে আগমন করেছেন, সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করে বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক আগ্রহকে পরিচালিত করার দায়িত্ব নিজেই বহন করে চললেন। তাঁদের কাছে, পাশ্চাত্যে সগর্ব্বে ঘোষণা করেছেন, ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা। 'জীবো ব্রহ্মৈব', প্রতি মানবের মধ্যে সেই অব্যক্ত সত্ত্বার বিকাশ। আরও বলেছেন "অভীঃ" ভয়শূন্য হও, বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু, আত্মবিশ্বাসী হও। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : ভারতের শাশ্বত বাণী, আত্মার যে মহিমা ঘোষিত হয়েছিল, যার কল্পনামাত্র মানুষকে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধান দেয়, স্থূল দৃষ্টিতে সেই দেশ বহুশতাব্দী নিপীড়িত, প্রাত্যহিক জীবন তার গ্লানিযুক্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বর্তমানে সে আভাষ তার কোথায়? বিশ্বদরবারে প্রচারিত ভারতের সঙ্গে, বাস্তব ভারতের কত না বিরাট পার্থক্য?

শিষ্যগণের কাছে কি গোপন থাকবে : এদেশের দুঃখ, দারিদ্র, দাসসুলভ মনোবৃত্তি? গোপন থাকবে কি জাতপাতের লড়াই? সে অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। এদেশের প্রকৃত অবস্থা তিনি সকলকে বিশেষ করে মার্গটকে জানিয়েছিলেন চিঠিপত্রে। এই বহির্দৃশ্যের অন্তরালে বিরাজিত মহিমময় তাঁর মাতৃভূমি সনাতন ভারতবর্ষ! যার উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা অনাদিকাল থেকে ধ্যানমগ্ন, সাধুদের অশ্রাখ, কল্লোলধ্বনি স্পর্শ করছে যার পদপ্রান্ত, বহু অভিযানে সর্ব্বরিক্ত হয়েও আধ্যাত্ম সম্পদে যিনি ফল্গুধারা, যার আকাশে বাতাসে মথিত শান্তির বাণী, সেই ভারতবর্ষের বার্ত্তাবহ তিনি। সেরূপ উদ্ঘাটনই তাঁর দায়িত্ব।... মিসেস বুল ও মি ম্যাকলাউড এসেছেন এদেশে, স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে ফিরে যাবেন নিজ নিজ বাসভূমিতে আর মার্গট! সব ছেড়ে এসেছে, এদেশকে নিজস্ব মাতৃভূমি রূপে বরণ করতে। আর প্রতিই তাঁর দায়িত্ব অধিক।

মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে মঠের জমি কেনা হয়ে গেল। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড সেখানে অবস্থিত পুরাতন জীর্ণ বাড়ীটি সংস্কার করে বেলুড়ে চলে এলেন। কয়েকদিন পরে মার্গট ও তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে বসবাস শুরু করলেন।

বেলুড়ের গঙ্গাতীরে এক স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে জীর্ণ ক্ষুদ্র সে বাড়ী। যথার্থই স্বর্গীয়। শ্যামল বিস্তৃত গাছপালা, উন্নত নারকেল গাছের সারি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙের কুটিরগুলি সবই সুন্দর। একটু দূরে একটি গাছের উপর নীলকণ্ঠ পাখীর বাসা যেন সদাশিবের আশীষ বহন করে আনছে । অপর পাড়ে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ঘিরে আছে দীর্ঘ ও আনত শ্যামল বিটপীশ্রেণী, অপূর্ব্ব সে পরিবেশ।... মহাপুরুষের আগমনে, তীর্থে পরিণত সেই কুটীর। এখানেই প্রতিদিন সকালে পাশ্চাত্য শিষ্যগণের সঙ্গে প্রাতঃরাশে যোগ দিতেন স্বামিজী। সমাপ্ত হলে জলযোগ, গাছের তলায় বসে অফুরন্ত ব্যাখা করতেন বহুক্ষণ। উদ্ঘাটিত হতো ভারতীয় আধ্যাত্মজগতের গভীর রহস্য, একের পর এক। আলোচনা করতেন ভারতীতত্ত্বসমূহের ধারা উপধারা। সুললিত সে কণ্ঠ। নির্ঝরিনীর মত ছড়িয়ে পড়তো ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, চলতো বেদান্ত মতবাদের তত্ত্বানুসন্ধান, আধ্যাত্মিক পটভূমিকার ব্যাখ্যা। সে অগ্নিময় বাণীর প্রতিটি অক্ষরে ছড়িয়ে পড়তো ভারতমাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অবুলুপ্ত হতো স্থান, কাল, একাত্ম হয়ে উঠতো বক্তা ও শ্রোতা। সে মুহূর্ত্তে প্রাচীন ভারত মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠতো। মূর্ত্ত হয়ে উঠতো তার আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, সাহিত্য, কাব্য, জাতীয় ভাব। জীবন্ত সে ব্যাখ্যা। প্রাণময় হয়ে উঠতো অদ্বৈত অনুভূতিতে। যে কোন ভ্রান্ত ধারণাকে নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করতেন তিনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদ ছিল না সেক্ষেত্রে। কেউ করুণার চোখে ভারতকে দেখবে, সেটা ছিল তাঁর কাছে ছিল প্রত্যক্ষ অবমাননা। দৃঢ় ধারণা ছিল তাঁর, ভাল না বাসলে, সেবার অধিকার জন্মে না, আবার গেলেই প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ পরিচয়েব। অতীতের গৌরবকে যেরূপ সর্ব্বদা বর্ণনা বর্ত্তমানকেও বর্জন করতেন না কোন মতে। প্রাচীন থেকেই বর্ত্তমানের জন্ম আবার বর্ত্তমানই প্রাচীনকে ম্লান করে সৃষ্টি করবে মহিমময় ভবিষ্যৎ ভারত। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বহুসমস্যা বিজড়িত, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অনগ্রসর ভারতকেও ভালবাসতে হবে। এই জানা, আর ভালবাসা সহজ বস্তু নয়। জীবনযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যের মধ্যে এত পৃথক যে, ভারতীয় ভাবগুলিকে সহজভাবে গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়। এ ক্ষেত্রে অনড় ছিলেন তিনি। কোন আপোষ নয়, ভারতীয় বেদান্তের জ্ঞানলাভের জন্য, প্রয়োজন ভারতীয় বাহ্যজীবন অনুসরণ করা, নতুবা সে ভাবের অনুসরণ করা সহজ সম্ভবপর হতে পারে না। তার কাজ, চিন্তা, আচার ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অধ্যাত্মবাদ। এগুলো হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হলেই, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান কুসংস্কার, ভ্রান্তির তাৎপর্য্য, উপলব্ধি করা সম্ভব। তার জীবনযাত্রাকে অস্বীকার করে, আধ্যাত্মবাদ বোঝার চেষ্টা নিরর্থক। পাশ্চাত্যে তিনি ছিলেন কেবল বেদান্ত প্রচারক ও স্নেহময়

বন্ধু, আর স্বদেশে তিনি স্বদেশ প্রেমিক আচার্য্য। শিক্ষা শুরুতেই মার্গটকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠভাবকে, তিনি কঠোর বিশ্লেষণ করে চললেন। ঘোষণা করলেন: পরোপকার-বৃত্তির সাধন অপেক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনই শ্রেষ্ঠ, শুধু তাই নয় এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। ব্যক্তিত্বের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে হবে, শত্রুর জন্য প্রার্থনা নয়, সাক্ষী স্বরূপ হতে হবে। কারণ শত্রু আছে এই চিন্তাই দ্বেষবুদ্ধির জন্ম দেয়।

মার্গট লক্ষ্য করলেন : জীবাত্মার স্বাধীনত্যই স্বামিজীর মূল লক্ষ্য। তিনি বন্ধনকে ঘৃণার চোখে দেখছেন। যাঁরা শৃঙ্খলকে ধর্ম্মের আবরণে ঢাকতে চায়, তাঁরা তাঁর কাছে ভয়ঙ্কর লোকরূপে প্রতিভাত। দিনের পর দিন ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণে নিজ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা যুক্ত করে যে আলেক্ষ্য রচনা করেছেন, সে আবর্ত্তে মার্গটের শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি ও পরবর্ত্তী জীবনের প্রস্তুতির পথ, প্রশস্ত করে চললো। অবশ্য এর মূলে ছিল পরনির্ভরতা। তখনও মার্গট মিস মূলারের উপর নির্ভরশীল। যুক্ত দায়িত্বে কাজে উন্মুখ। লিখে জানালেন : সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে মার্গট কাজ আরম্ভ করুক, এটাই তাঁর একান্ত বাসনা। সতর্ক হতে হবে মার্গটকে, কাজে নামতে হবে ব্যক্তি স্বাধীনতার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে, কারও উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। সেইসঙ্গে সতর্ক করে দিলেন, মিস মূলার অর্থবলে বলীয়ান। যে কোন কাজে অর্থের প্রয়োজন আর এটাই বাস্তব। মিস মূলার অর্থ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর চরিত্র সে কাজের অন্তরায়। তিনি রুক্ষ মেজাজী, আর অদ্ভুত তাঁর অব্যবস্থিত চিত্ততা। তাকে নির্ভর করতে হবে নিজের উপর, অপরের খেয়াল খুশীর উপর নয়।

শিক্ষা সবে শুরু, চলার পথ দীর্ঘ, সবে স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করে যে উদ্দেশ্যে তার আগমন, এ পরিবেশ ও আবহাওয়ায় নিজেকে তৈরী করে নিতেও তো সময় দিতে হবে কিছু!

নিশ্চেষ্ট ছিলেন না স্বামিজী। জনসাধারণের কাছে মার্গটকে পরিচয় করিয়ে দেবার উদেশ্যে ১১ই মার্চ্চ ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতার আয়োজন করলেন। নিজে সভাপতির পদগ্রহণ করলেন। তাঁর অনুরাগী ও ভক্তগণের কি উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন, তা তাঁরা অবগত ছিলেন। এখন বাকী শুধু জনগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। স্বামিজী যখন সে উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন, জনতা বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করলো। মিস মূলার ও অ্যানি বেশান্তের নাম উল্লেখ করে বললেন: ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়েছে, ইনি সেই মিস মার্গরেট নোবল, এঁরকাছে আমাদের অনেক অনেক আশা। বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই, আপনাদের সঙ্গে মিস নোবেলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

মার্গট উঠে দাঁড়াবামাত্র জনতা পুনঃ পুনঃ হর্ষধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দন জানালো। 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন। এটি তার প্রথম বক্তৃতা। বহু যত্ন করে রচনা করেছিলেন এটি। সুচিন্তিত এই ভাষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের পার্থক্য আলোচনার দ্বারা স্বামিজী যে উচ্চতত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন পাশ্চাত্য জাতির কাছে, নিপুণভাবে তা ব্যক্ত করলেন। ভারত সেবার আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হল এই প্রথম বক্তৃতাতে। সেই সঙ্গে যুক্ত করলেন,

"আপনারা এমন এক রক্ষণশীল জাতি : যে জাতি দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র জগতের জন্য শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আর ঐ কারণেই সেবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভারতকে সেবা করিবার জন্যই আমার এদেশে আগমন"....

নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যেও সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করলেন। তার বাগ্মিতা, বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ জনতা যখন বার বার হর্ষধ্বনি দিতে লাগলো। বক্তৃতার উপসংহার করলেন মার্গট 'শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি' বলে।

সে সময়ের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ সালজার এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। মার্গটের ভারতীয় অদ্বৈতবাদের উচ্চপ্রশংসা তাঁর কাছে প্রীতিপদ হল না। তিনি দু'একটি মন্তব্য করলেন। মার্গট তাঁরও উত্তর দিলেন।

এই বক্তৃতায় স্বামিজী খুব খুশী হলেন। সকলের কাছে উচ্চ প্রশংসা করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, মিস নোবলের কার্য্যকারী শক্তির পরিচয় এর পরে পাবে! মহৎপ্রাণ, ভেতরে কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। হৃদয় যেমন উদার, তেমনি পবিত্র। জানবি এর কথা শুনে সবার তাক লেগে যাবে। প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।"

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস ঘটনা বহুল। মার্গটের জীবনে তা শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় ঘটনা। বাংলা ১৩০৫ সাল। শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে ফিরে বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনে বাস করছেন। স্বামিজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যাগণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর (শ্রীমার) কাছে যাবার ব্যবস্থা করলেন।

শ্রীমার কথা মার্গটের পূর্ব্বেই শুনেছিলেন। নিতান্ত বালিকা। বয়স মাত্র পাঁচ, যুগশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর তিনি কিন্তু গভীর সাধনায় ব্রতী হলেন স্ত্রীর কথা তাঁর স্মরণেই এলো না। আঠারো বছর বয়সে যখন তিনি পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে স্বামী সকাশে উপস্থিত হলেন, তাঁর দাম্পত্য বন্ধনের কথা স্মরণ হল। কিন্তু যে আদর্শে তিনি ব্রতী, সে পথ তো বন্ধনের পথ নয়! তাঁর পত্নী কি তবে তাঁকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যেতে চান? প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন পত্নী, তাঁর ধর্ম্মজীবনে সহায়তা করবেন তিনি। একাধারে সন্ন্যাসিনী ও ধর্ম্মপত্নী। শ্রীরামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই প্রথম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনিই শ্রীসারদা দেবী, ভক্তগণের শ্রীশ্রীমা।

দিনটি ১৭ই মার্চ্চ। সেন্ট প্যাট্রিকের জন্মদিন। মার্গট ডায়েরীতে লিখলো 'day of days' (সেরাদিন)। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে শ্রীমাকে প্রথম দর্শন করলেন।

শ্রীমা 'আমার মেয়ে' বলে সকলকে সস্নেহ অভ্যর্থনা করলেন। কেউ কারও ভাষা বোঝে না ভাবের প্রকৃত বিনিময় ঘটে হৃদয়ে। ভাষায়... কতটুক তার প্রকাশ সম্ভব। শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা অবগুণ্ঠণবতী পবিত্রস্বরূপিণীর কাছে বসে মার্গট, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড অনুভব করলেন তাঁর অপার্থিব স্নেহ ও করুণা। পল্লী-জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যিনি অবাল্য প্রতিপালিত, সুবিস্তৃত জগতের সঙ্গে কোন পরিচয় যাঁর ছিল না, চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছেন, তিনি কেমন করে কত সহজে বিদেশিনীগণকে 'কন্যা' বলে সম্বোধন করে একান্তে আপন করে নিলেন —তা সত্যই বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, মিস ম্যাক্লাউডের অনুরোধে তাদের সঙ্গে বসে একত্রে আহার করলেন পর্য্যন্ত।

বিস্মিত হলেন সবাই। স্বামিজী ও গুরুভ্রাতা সকলেই। খুশী হল পাশ্চাত্য শিষ্যবর্গ। কিন্তু মার রূপই ত এই। তাঁর হৃদয়ের কাছে উন্মুক্ত যে দ্বার, সেখানে সবাই তাঁর সন্তান। সে শিক্ষাই গ্রহণ করেছেন স্বামী তথা পরমগুরুর কাছে, যখন যেমন, তখন তেমন। তিনি (শ্রীমা) জানতেন এই বিদেশীনী মেয়েরা নরেনকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, তারই আকর্ষণে তারা এদেশে এসেছে, কিছু কাজ করার বাসনা নিয়ে, শ্রীঠাকুর তথা নরেনের আদর্শ পুরণের সাহায্য করতে। আর একজন এসেছে নিজেকে উৎসর্গ করতে, এদেশের সেবায়। মা হয়ে তিনি কি তাদের কোলে তুলে না নিয়ে থাকতে পারেন? তাই তাঁর এ আচরণ, অকপট মধুর ব্যবহারে ব্যবধান দুর করে, দেওয়ার এই প্রয়াস। বুকে তুলে না নিলে কি আপন করে পাওয়া যায়? না তারা (যারা আগত) আপন (নিজস্ব) সুরের তালে একাঙ্গীভূত হতে পারে? না আপনজ্ঞানে, আপনভাবে তলিয়ে যেতে পারে! দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ, আচার, বিচার, সবই বহিরাঙ্গ— বেড়া দিয়ে নিজের গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ

করা। সে বেড়ায় কি মার হৃদয় তৃপ্ত হতে পারে? মা— সে তো মুক্ত আকাশ, বায়ু সে তো মুক্তির প্রয়াস, সাগর সে তো সৃষ্টির প্রয়াস, সেখানে বাঁধন, পরিহাস শুধু পরিহাস।....

দেশ ও আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে যেদিন অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল মার্গট, তখন মনে ছিল একটা সংশয়। কি ভাবে, কি রূপে, তাকে গ্রহণ করবে এই দেশ। দানা বাঁধা ছিল একটা সংকোচ, মার স্নেহপরশে তা মিলিয়ে গেল। গর্ভধারিণীকে ত্যাগ করে এসেছেন, মনের কোণে একটা বেদনা লুকিয়েছিল— আজ তা মিলিয়ে গেল মহীয়সীর সহজ-সরল স্নেহের পরশে। একদিন যা শুনে ছিলেন স্বামিজীর কণ্ঠে, নিজের চোখে তাঁকে দেখে, সেই বিশ্বাস, জাগ্রতরূপ ধারণ করলো।.... হ্যাঁ সত্যই, মূর্ত্তিমতি তিনি, শান্তির প্রতীক! সত্যই পরমা তিনি! মনে হল : হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে গেছেন তিনি এই মুহূর্ত্তে! বিদেশিনী এই দেশেরই একজন। এদেশের আকাশ, বাতাস এ যেন একটা মাধুর্য্যের পরিবেশ। এখানে এলে, তলিয়ে যায় সব ব্যবধান। হ্যাঁ সত্যই শাশ্বত দেবভূমির দেশ, ভারতবর্ষ।....

শ্রীমার সঙ্গে দেখা করে স্বামিজীর সঙ্গে বেলুড়ে ফিরে এলেন মার্গট। মঠে পৌঁছানোর আগে তাঁকে স্বামিজী জানালেন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত কববেন তিনি।

২৩শে মার্চ্চ রাত্রে মার্গট পুনরায় বেলুড়ে ফিরে এলেন। এখানে স্বামিজী নিয়মিত সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা বিদেশীশিষ্যগণের সঙ্গে কাটাতেন। ২৫ শে মার্চ্চ শুক্রবারও সকালের দিকে শিষ্যগণের সঙ্গে দেখা করলেন। ফিরে যাওয়ার সময় নিলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এই দিনটি ছিল The day of Anunciation — যেদিন দেবদূত এসে ঈশাজননী মেরীকে তাঁর গর্ভে ভগবান জন্ম নেবেন জানিয়ে গেলেন। মঠে ঠাকুর ঘরে পূজার আয়োজন করা ছিল। স্বামিজী প্রথমে মার্গটকে দিয়ে সংক্ষেপে শিবপূজা করিয়ে, 'ব্রহ্মচর্য্য' ব্রতে দীক্ষিত করলেন। ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়ে শুভ অনুষ্ঠান শেষ করলেন। আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে পাঁচ শতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।' এ উপদেশ, মার্গটকে উপলক্ষ্য করে সকলকে বিতরণ করলেন। দীক্ষার সময়ে মার্গট ওরফে মার্গারেটের নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। নবজন্ম লাভ করলেন মার্গরেট। ভগবচ্চরণে নিবেদিতা (dedicated) হলেন। জন্মপর্ব্বে, মাতৃজঠরে যে নিবেদন ঘটেছিল, স্বামিজী (বিবেকানন্দ) সেই কাজ সম্পূর্ণ করলেন। চিরকালের জন্য ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিতা হলেন তিনি।

নিবেদিতা সেক্ষণের বর্ণনা নিজেই দিচ্ছেন : এ প্রভাতটি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময় দিন।

পূজাশেষে, সকলে উপরতলায় গেলেন। সেদিনটিকে বিশেষ স্মরণীয় করার জন্য স্বামিজী যোগী শিবের বেশধারণ করলেন। জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল ধারণে তাকে শিবের মত দেখাতে লাগলো। তারপর একঘণ্টা তিনি ভারতীয় সঙ্গীত আলাপন করলেন।

আর নিবেদিতা! স্বামিজী যে মুহূর্ত্তে তাঁকে ভগবৎচবণে নিবেদনে নামাকরণ করলেন 'নিবেদিতা' মার্গারেট (চলতি নাম ম্মার্গট) ভারতীয়ভাবে নবজন্ম লাভ করলেন। পূর্ণ সংস্কার তলিয়ে, দেখা দিল ভারতীয় সংস্কার। দেবদেবী—ভারতীয় সর্ব্ববিধ পূজা অনুষ্ঠান নোতুন রূপে প্রতিভাত হল। প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে গভীর অর্থ। অনুষ্ঠানের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর সঙ্কেত। আবেদনে নিবেদনে, সেটি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, সেমুহূর্ত্তে। দীক্ষা কালে শিবপূজা ও বুদ্ধের চরণে অঞ্জলি প্রদান —দুই মহাযোগীকে শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণের অবকাশ এলো তাঁর জীবনে।...

দীক্ষার দিনটি তিনি (স্বামিজী) নিবেদিতার জন্য পৃথক রেখেছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় নৌকায় বসে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর জীবনের দায় সম্বন্ধে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন। তাঁর গুরু দেবের দেওয়া যে গুরুদায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হ'চ্ছে, তার বর্ণনায় বললেন 'আমার উপর তাঁর নির্দ্দেশ: তাঁর দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করব। তাতে যা হবার তা হবে, স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি, যা আসে আসুক, আমি তা বহন করতে প্রস্তুত। তিনি ভার দিয়ে গেছেন, তাঁর ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন— একই মঞ্চে, একই ছায়ায় বিরাজ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপনের মহৎ দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত ছিল। যে সঙ্ঘ শুধু সমগ্র ভারতের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত।

উদ্দেশ্য : ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মঠ স্থাপন করা। যে মঠের সূত্রপাত কাশীপুরে, পরে বরাহনগরে, আলমবাজারে, তা যেন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় বেলুড়ে। তিনিও গুরুভ্রাতা গণ সেই আদর্শকে বাস্তবে যেন পরিণত করতে সমর্থ হন। তার নারীজাতির শিক্ষা ও কল্যাণসাধনের জন্য অনুরূপ আরও একটি মঠ নির্ম্মাণও তাঁর অন্তরের ইচ্ছা। শুধু সময়ের অপেক্ষা অথচ বিলম্বও করাও সম্ভব নয়। প্রয়োজন সে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার, ভবিষ্যতে তার পূর্ণ পরিনতি কিন্তু উদ্বোধনকার্য্য তাঁকে সম্পন্ন করতেই হবে। যেমন সন্ন্যাসী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে, জীবনের আদর্শ ও কর্ম্মপথ নির্দ্ধারিণ করা হয়েছে, নারীজাতির সামনে ত্যাগ ও সেবার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ জীবন স্থাপন করাও তাঁর অন্যতম কর্ত্তব্য। এই আদর্শজীবন যাপনের জন্য তাঁর এরূপ একটি নারীর প্রয়োজন, যিনি বর্ত্তমান যুগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত অথচ প্রাচীন ভাবসম্পদের অধিকারিনী আর ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিতা। আমি তোমার মধ্যেই সেই জীবনযাপনের যোগ্য অধিকারিনীকে দেখতে পাচ্ছি।....

ঠিক তার চারদিন পরেই ২৯শে মার্চ্চ স্বরূপানন্দকে সন্ন্যাস দান করলেন স্বামিজী। ৩০শে অসুস্থতাবশত দার্জ্জিলিং যাত্রা করলেন।

স্বামিজী চলে গেলেন অতিথিদের দেখাশুনার ভার গুরু ভ্রাতাগণ গ্রহণ করলেন। গৃহস্থালীর নিত্য নোতুন সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রতিদিন একজন করে ব্রহ্মচারী মঠে এসে অতিথিদের সুযোগ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তদারকের ভার বহণ করতে লাগলেন। একজনের উপর বাংলা শেখানোর ভারছিল, এছাড়া, স্বামিজী কোন প্রয়োজনে অন্যত্র গমন করলে, সংঘের পুরাতন সাধুগণ উপস্থিত থেকে সে তত্ত্বাবধানের ভার নিতেন, প্রতিদিন চায়ের টেবিলে তাঁর (স্বামিজীর) স্থান অধিকার করতেন। অতিথিদের সৎকার ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করতেন। ফলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্যসব গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে অতিথিদের স্নেহমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলো। বিশেষত নিবেদিতা সকলের স্নেহের পাত্রী রূপে প্রতিভাত হয়ে গেল। এঁদের সঙ্গে আলাপ, আলোচনা ও স্বামী সদানন্দের কাছ থেকে স্বামিজী পূর্ব্ববর্ত্তী মঠ জীবন যাপন সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে চললেন নিবেদিতা। বিশেষ করে স্বামী সদানন্দ ও স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁর ভাবপরিপুষ্টি সাধনে সাহায্য করে চললেন।

২রা এপ্রিল মাতাজী তপস্বিনীর মহাকালী পাঠশালায় পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করলেন নিবেদিতা। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন উদ্দেশ্য এদেশের শিক্ষাপদ্ধতি অবলোকন করা।

ইতিমধ্যে বেলুড় মঠের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ৭ই এপ্রিল শ্রীমা নৌকা করে নীলাম্বর বাবুর মঠ বাড়ীতে এলেন। তিনি ঠাকুর ঘরে পূজা ও ভোগ নিবেদন করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের

অনুরোধে মঠের জমিতে পা দিলেন। মিসেস বুল (ধীরামাতা) ও ম্যাকলাউড (জয়া) সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা করে সমস্ত জমি দেখিয়ে দিলেন। আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন কেটে গেল। রাত্রে চাঁদের আলোতে নৌকা করে কখনও দক্ষিণেশ্বরে গমন, কখনও বা তিনজনে মঠের ঠাকুর ঘরে বসে ধ্যানে বসলেন। মিস মূলার, এরমধ্যে দার্জ্জিলিং-এ গেলেন। নিবেদিতারও থাকার ব্যবস্থা করলেন। স্বামিজী টেলিগ্রাম করে নিবেদিতার যাত্রা বন্ধ করলেন। এঁদের নিয়ে আলমোড়া যাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন।

কলকাতায় প্লেগ রোগ দেখা দিল। সংবাদ পাওয়া মাত্র ৩রা মে স্বামিজী মঠে ফিরে এলেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের শুশ্রুষার ব্যবস্থায় মন দিলেন। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো কলকাতায়। ভয়ে নাগরিকরা দলে দলে সহর ত্যাগের ব্যবস্থা করলো। তিনি তাদের সাহস দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর নির্দেশ মত নিবেদিতা ঘোষণা পত্র রচনা করলেন। স্বামিজীরদ্বারা বাংলা ও হিন্দী অনুবাদ নগরবাসীদের বিতরণ করা সুরু হল। 'রামকৃষ্ণ মিশন পীড়িতদের যথাসাধ্য সেবা করবে।' ইতিমধ্যে সহরে দাঙ্গা হাঙ্গামাও বেঁধে গিয়েছিল। স্বামিজীর আশ্বাস ও ঘোষণায় সহরবাসীর মনে বল ফিরে এল। স্বামিজী এমন কি মঠের জন্য ক্রীত জমি জায়গা বিক্রী করার জন্য প্রস্তুত হলেন। অবশ্য সে প্রয়োজন হল না। তাঁর আবেদনে, 'সেবা কাজের' জন্য নানা দিক থেকে অর্থ সাহায্য আসতে লাগলো।

নিবেদিতার ভারতে আগমন কয়েক মাস পূর্ব্বে। এদেশকে সেবার জন্যই তাঁর আগমন— এই আত্মদান। শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি, ভারতীয় ভাবধারা, তখনও সম্পূর্ণ গ্রহণের অবকাশ আসেনি। ডাক দিল কর্ত্তব্য। স্বামিজীর ডাক— কলকাতার বাগবাজারের রাস্তায় কোদাল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবেদিতা। নিজেই পরিষ্কার করলেন রাস্তার আবর্জ্জনা। লজ্জায় ম্লান পল্লীর যুবকবৃন্দ। তাঁর সাথে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো 'ময়লা মুক্তি যজ্ঞে'। জীবন উপেক্ষা করে নিজেকে নিয়োজিত করলেন পীড়িতদের সেবায়। কোলে তুলে নিলেন প্লেগে আক্রান্ত শিশুটিকে। সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো নিশ্চিন্তে, তাঁর মাতৃত্বের আশ্রয়ে। শহরবাসী প্রত্যক্ষ করলেন সহরের বুকে দাঁড়িয়ে আর একটি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, মূর্ত্তিমতী সেবার প্রতিচ্ছবি— এটাই তাঁর প্রথম পরিচয়।

প্লেগের প্রকোপ কমে এলে। সেবার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ। ১১ই মে বুধবার ৭টা ১৫মি. হাওড়া থেকে ট্রেনে আলমোড়া যাত্রা করলেন স্বামিজী। সঙ্গে চললেন, স্বামী তুরিয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ, মিসেস বুল, মিসেস প্যাটারসন (আমেরিকান কনশাল জেনারেলের পত্নী) মিস ম্যালাউড ও নিবেদিতা। এই সময় স্বামিজী প্রায় সব সময় দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত। অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত নানাস্থান ভ্রমণ করলেন সঙ্গে বিদেশিনী শিষ্যসকল। অপূর্ব্ব সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানের বিশেষত্ব, জ্ঞাতব্য সব কিছু সঙ্গীদের বুঝিয়ে দিয়ে চলেছেন। যেন প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানোই তাঁর উদ্দেশ্য। নিবেদিতা নিরন্তর তাঁর সঙ্গলাভে নিজেকে গড়ে তোলার অবকাশ পেলেন। তেমনি ভারতমাতাকে আবিষ্কারের সুযোগও পেয়ে গেলেন। দীক্ষার পরেও নিজেকে আইরিশ রক্তজাত জেনেও ইংলণ্ডকে তাঁর স্বদেশ বলে পরিচয়ের বৈশিষ্ট্য তখনও ত্যাগ করেন নি। অবশ্য এই ভ্রমণকালেই তাঁর সেই ইংরাজ প্রীতি বিরাগে পরিণত হতে শুরু করলো।

এই ভ্রমণস্মৃতি তাঁর মনে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জাগরুক ছিল। এদিনগুলি যে মধুময় ও প্রেরণাদায়ক! স্বামিজীর উপস্থিতির দ্বারা মহামান্বিত সেই অন্তরঙ্গ পরিধির মধ্যে জ্যোতির্ময় মধ্যবিন্দু; একথা নানা আকারে তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিপটে।

'এ বৎসর, দিনগুলো কি সুন্দর ভাবেই না কেটেছে! আদর্শ এসময়েই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। নদীতীরে বেলুড়ের জীর্ণ ঘর, পরে হিমালয়ের বুকে নৈনীতাল ও আলমোড়া, শেষে কাশ্মীরের নানাস্থান ভ্রমণ কালে, এমন এমন সব মুহূর্ত্ত এসেছিল তা ভোলার নয়— এমন সব কথা শুনেছি সারাজীবন তা প্রতিধ্বনিত হবে, জাগরুক থাকবে সেই চকিতের দিব্যদর্শন।.... সবটাই যেন খেলা। এমন এক প্রেমের বিকাশ দেখেছি, যা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র, অজ্ঞ থেকে অজ্ঞকে আলিঙ্গণে এক হয়ে যায়। সে দৃষ্টিতে তখন সমগ্র জগৎ এক, প্রতিবাদের কিছু থাকে না।.... সেই বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে কৌতুক করেছি। বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হয়েছি এসমস্ত দিব্যলীলায়, মনে হয় বাল্যরূপী ভগবান তাঁর শিশুশয্যা থেকে জাগছেন, আর আমরা সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে তা নিরীক্ষণ করছি।.... মনের কিরূপ অবস্থায় নোতুন নোতুন ধর্ম্ম বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। কোন মহাপুরুষগণ, এই ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা দেন, তার কতকটা প্রত্যক্ষ করেছি। এমন এক দিব্যপুরুষের সঙ্গ লাভ করেছি, যিনি সবরকমের লোককে নিজের কাছে আকর্ষণ করতেন, তাদের বক্তব্য শুনতেন, প্রত্যেকের জন্য সহানুভূতি বোধ করতেন, কাকেও প্রত্যাখ্যান করতেন না। যে দীনতার কাছে সব দৈন্য দূর হয়, সে ত্যাগ, অত্যাচরীর ধিক্কারে ও উৎপীড়িতের প্রতি অসীম করুণায় আত্মবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র উৎপীড়ন ও মৃত্যুর আসন্ন পদসঞ্চারকেও আশীষ বচণে স্বাগত সম্ভাষণ করে। সে দীনতা. সে ত্যাগ, সে প্রেম— আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যিনি শ্রীভগবানের শ্রীচরণ অশ্রুজলে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং নিজ কেশ দ্বারা সেই অভিষিক্ত চরণ মুছে দিয়েছিলেন, সেই সৌভাগ্যবতীর পুণ্যব্রতেও অনুষ্ঠান আমরাও করেছি। এই অবসর আমরা পেয়েছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁর সেই ভাববিহ্বল আত্মবিস্মৃতি কোথায় আমাদের?

যাঁরা এই শুভমুহূর্ত্তের আস্বাদ পেয়েছেন, তাদের কাছে জীবন অধিকতর মূল্যবান, মধুময়। দীর্ঘ, নিরানন্দ নিশীথের তালবনী সঞ্চারী বায়ু ও উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরিবর্ত্তে শান্তির বাণী ধ্বনিত হয় মহাদেব মহাদেব—মহাদেব।

প্রাচীন পাটলীপুত্র (পাটনা) থেকেই ভারত সম্বন্ধে শিক্ষা সুরু। পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করে স্বামিজী দৃষ্টিপথে যা আসতো, তার ব্যাখ্যা করে চলেছেন। কাশীর ঘাটগুলির প্রশংসা করলেন, লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ শিল্প দ্রব্য, বিলাস উপকরণের নাম ও গুণ বর্ণনা করলেন। বিশ্রুত মহানগরী বিখ্যাত কীর্ত্তির ব্যাখ্যা করে চলেছেন, ক্লান্তি নেই একটুকু। তারই মাঝে অসীম উৎসাহে বর্ণনা দিয়ে চলেছেন সে সব স্থানের, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী। সমস্ত আর্য্যবর্ত্তের মহিমা তাঁর কণ্ঠে মূর্ত্ত হয়ে উঠতো। মনে হতো সমগ্রদেশ একখণ্ড সত্তার বর্হিবিকাশ।'

'১৩ই মে পৌঁছলেন কাঠগোদাম। উষার আলোতে অল্পদূরে উন্নত পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের আবির্ভাব বিস্ময়কর সে দৃশ্য। এখান থেকে প্রথমে টাঙ্গা, পরে ঘোড়ার গাড়ী ও ডাণ্ডী করে নৈনীতাল। খেতড়ী রাজার আতিথ্যগ্রহণ করলেন স্বামিজী সঙ্গে শিষ্যবর্গ।'

'১৪ই মে, নৈনীতাল থেকে ঘোড়ার পিঠে আলমোড়া যাত্রা। এসে গেল রাত্রি, পাহাড়ের উঁচু নীচু পথ, কোথাও কোনা বার করা পাহাড় ঘুরে গেছে। চারদিকে বিশাল বৃক্ষছায়া। এগিয়ে চলেছে লোকজন হাতে মশাল, আর লণ্ঠন। দিনের আলোতে গোলাপ বন, ঝর্নার আশেপাশে ফার্ন ও বুনো ডালিমের ঝোপ, বুকে তার ফুটে থাকা লাল লাল কুঁড়ি। রাত্রের অন্ধকারে হানিসাকল ও অন্যান্য ফুলের গন্ধ, গন্তব্যস্থল কত দূর তখনও অজানা। নিস্তব্ধ রজনী ওপরে অস্ফুট নক্ষত্রের মালা, পথে পর্ব্বতমালার গাম্ভীর্য্য, চলেছে যাত্রীর দল, সৃষ্টি হয়েছে অননুভূত আনন্দের স্ফুরণ। ... শেষে সেই পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত একট ডাকবাংলো দেখা গেল— রাত্রির মত বিশ্রাম সেখানে। স্বামিজী অন্য শিষ্যগণের পিছনে ছিলেন। একটু পরে এসে পড়লেন। আনন্দ ও উৎসাহে

অতিথিগণের তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। চারদিকে অন্ধকার সে দৃশ্যাবলীর মাঝে অপার্থিব কবিত্বে ভরপুর। মিট মিট করে জ্বলছে আগুন, পাশে বসে কুলির দল, ঘোড়ার হ্রেষারব, কাছেই পান্থশালা, অরণ্যের গভীর ভাবোদ্দীপক তমিস্রা, বৃক্ষরাজির শন্ শন্ শব্দ, তারমধ্যে স্বামিজীর আনন্দময় উপস্থিতি।'.....

পরের দিন সকালে আবার যাত্রা আরম্ভ— অবশেষে আলমোড়া। সেভিয়ার দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করলেন গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণকে নিয়ে। নিবেদিতা ও তাঁর সঙ্গীগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা হল কিছুদূর একটি বাংলোতে। বাস করলেন প্রায় এক মাস। এখানেও সেই পূরাতন জীবন যাত্রা। প্রতিদিন সকালে শিষ্যগণের সঙ্গে প্রাতঃরাশে চলছে আলোচনা। ট্রেনে যে শিক্ষা সুরু, সে ধারা এখানেও অব্যাহত। চললো সারা গ্রীষ্মকাল। ভ্রমণ আর শিক্ষা। পদ্ধতি ছিল অতিসাধারণ। হয় বারান্দা না হয় বাগান, মনোযোগ সহকারে শুনতেন সবাই। যতটা পারেন গ্রহণ, তারপর ইচ্ছামত স্বাধীন আলোচনা। সে আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল প্রাচ্যের জীবনযাত্রা, তার আদর্শ, প্রতীচ্যের সঙ্গে পার্থক্য। প্রাচ্য সভ্যতা, তার শাসনপ্রণালী, বিভিন্ন যুগের ইতিহাস, আর্য্যজাতি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জাতির কীর্ত্তিকলাপ সবই তথ্যপূর্ণ মূল্যবাণ সে আলোচনা। যেদিন তিনি (স্বামিজী) সমাহিত থাকতেন বিশ্বভাবে, চলে যেতেন চীন ও সুদূর ইটালী। যেমন প্রশংসা মুখর চীনের, তেমনি অনুরাগ প্রকাশ পেতো ইটালীর। ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ইটালী। তার ধর্ম্ম, শিল্প, সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মদাত্রী। উচ্চভাব, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার প্রসূতি সে দেশ। যদি প্রকাশ পেতো পাশ্চাত্য শিষ্যের প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে সংকীর্ণ জ্ঞান, তীব্র প্রতিবাদ উঠতো স্বামিজীর কাছ থেকে।

যখন বর্ণনা মুখর থাকতেন স্বদেশ প্রেমিক ও যোদ্ধ সম্বন্ধে মুখখানা তাঁর জ্বল জ্বল করে উঠতো বিশেষ করে মহাপুরুষ-জীবনী-প্রসঙ্গে। যখনই প্রসঙ্গ উঠতো বুদ্ধ সম্বন্ধে, মূর্ত্ত হয়ে উঠতো সে-মূর্ত্তিও। নিবেদিতার চোখে তখন তিনি জীবন্ত বুদ্ধ।... যখন তিনি "আম্রপালীর কাহিনীতে বুদ্ধদেবকে আহার করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন" বর্ণনা করতেন, মনে পড়ে যেত নিবেদিতার মেরী ম্যাজডলেনের আকুল ক্রন্দনাত্মক বিখ্যাত কবিতাটি।

স্বদেশপ্রেমের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না সে আলোচনা, সেখানে, অবসর ছিল ভক্তির। ভক্তির শেষ পরিণতি প্রেমাস্পদের সঙ্গে পূর্ণতাদাত্ম্য।

শিব ও উমার উপাখ্যান বর্ণনায় : উষালোকে রঞ্জিত তুষার রশ্মির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন : ওই যে উর্দ্ধে শ্বেতকায় তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উনিই সেই শিব আর তার উপরে যে আলোকসম্পাত —তাই জগজ্জননী। ঈশ্বরই জগৎ হয়েছেন, ভিতর বা বাইরে নয়— শিবময় স্বামিজী! চোখে মুখে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল ছটা— যেন সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি।

অক্লান্তভাবে বর্ণনা করলেন হিন্দুধর্ম্মের উপাখ্যান সমূহ, সারা গ্রীষ্মকাল। চরিত্রগঠনের সহায়ক এই কাহিনী। নিবেদিতার সব চেয়ে ভাল লাগলো শুকের কাহিনী। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আলমোড়ার দিগন্তপ্রসারী দৃশ্যাবলী, তার মধ্যে তুষাররূপী শঙ্কর, দৃষ্টিপথে আবির্ভূত শুকের কাহিনী। 'অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি, ব্যাসো বেত্তি না বেত্তিবা" শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ এই শিববাক্য আবৃত্তি করতে করতে স্বমিজীর মুখে যে অপূর্ব্বভাবের বিকাশ, তা যেন আনন্দ বারিধির অতলপ্রদেশে অবগাহন করছেন তিনি। নিবেদিতা ভুলতে পারেননি সে স্মৃতি।...

প্রাচীন ভারত থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান ভারত, এক অখণ্ডভারত, সে চিত্র অবলোকন করেছিলেন নিবেদিতা স্বামিজীর মধ্যে। সেই আলোতেই উদ্ভাসিত নিবেদিতা আলোরবর্ত্তিকা হাতে ছুটেছেন ভারতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত।....

২৫শে মার্চ্চ স্বামিজী দীক্ষা দিলেন নিবেদিতার। পরদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন নিজেকে কোন 'জাতি' বলে চিন্তা কর? ব্রিটিশ 'জাতীয় পতাকার' ওপর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর। অকপটে উত্তরে বললেন, তিনি ইংরেজ! বিস্মিত হলেন স্বামিজী। তাঁর মনোভাব হিন্দু রমনীর অনুরূপ। হিন্দুরমনীর কাছে ইষ্টদেবতা যেরূপ, নিবেদিতাও মনে-প্রাণে খাঁটি ইংরেজ। বুঝলেন স্বামিজী, তিনি অগভীর ভাবে নবজীবন স্বীকার করেছেন। এ ধারায় তাঁর চিন্তা, চলন বলন, পরিবর্ত্তন সাধনে প্রচুর শিক্ষাসাপেক্ষ। সবে ভারতকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন, মনে-প্রাণে ভারতীয় হতে পারেননি। আলমোড়ায় আরম্ভ হল সেই নোতুন ও অণনুভূত সেই শিক্ষা। ইংলণ্ডে ক্লাসে যে যুক্তি তর্ক তুলতেন, এখানে তা কমলেও মানসিক প্রতিক্রিয়া, তর্কের আকারে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাঁর (স্বামিজীর) সংস্পর্শে আসার পর ভাব জগতে আলোড়ন ঘটেছিল। দৃঢ়বদ্ধ, মৌলিক ধারণায় প্রবল আঘাত হেনে ছিল। এখানে সযত্নেপোষিত সংস্কারগুলির উপর নিত্য আক্রমন ও তিরস্কার বর্ষণ চলতে লাগলো। পার্থক্য, লণ্ডনে তিনি প্রচারক, সেখানে আদর্শের ব্যাখ্যাই ছিল তাঁর কাজ! ব্যক্তিগত নিবিড় সম্বন্ধ নয়। আর এখানেও আছে আত্মীয়তা, আপন গণ্ডীর বাঁধন। এখানে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা, ও আলোচনার লক্ষ্য ছিল নিবেদিতা। পাঠগ্রহণে তিনজন পাশ্চাত্য মহিলা, তারমধ্যে তিনিই ছিলেন ইংরেজ। তাঁর স্বদেশের পক্ষপাতিত্ব, ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্বকে, তিনি (স্বামিজী) রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করতে লাগলেন। প্রাচ্য ও য়ুরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ আদর্শের দীর্ঘ আলোচনাকালে মূল্যবান প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করতে লাগলেন। সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা বিষয়ে দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারে, যখনই আঘাত পড়তো, তখনই সংঘর্ষের আঘাত শুরু হত। চীনদেশের প্রশংসায় যখন তিনি (স্বামিজী) পঞ্চমুখ, প্রতিবাদ তুললেন নিবেদিতা— 'কিন্তু স্বামিজী, চীনজাতির অসত্যপররায়নতা একটি সর্ব্বজনবিদিত দোষ'!

উত্তরে স্বামিজী বললেন : অসত্যপরায়নতা! সামাজিক কঠোরতা! এগুলো আপেক্ষিক শব্দমাত্র। অসত্যপরায়নতার কথা বলছো! যদি মানুষ মানুষকে বিশ্বাস না করতো, তার বাণিজ্য, সমাজ বা যেকোন প্রকার সংহতি একদিনও কি টিকে থাকতো পারতো? আর শিষ্টাচারের খাতিরে অসত্যপরায়ণ হতে হয়, পাশ্চাত্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? ইংরাজরা কি যথাযথ স্থানে সব সময়ে দুঃখ বা সুখ বোধ করে? উত্তরে বলবে, মাত্রাগত তারতম্য, কিন্তু শুধু কি মাত্রাগত?

বন্ধনের ঘোরবিরোধী স্বামিজী। এইপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বললেন : বাস্তবজীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য হিন্দুরা যে আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন আমি কিন্তু তা অনুভব করতে পারি না। মনে হয় মুক্তি সাধনের চেয়ে, যে-সকল কাজ আমার কাছে প্রীতিকর, তার সহায়তার জন্য জন্মগ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়!

উত্তরে বললেন স্বামিজী : ক্রমোন্নতির ধারণাটা এখনও বর্জ্জন করতে পারোনি। কোন বাইরের জিনিষ ভাল হয় না— তারা যেমন আছে, তেমনিই থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভালো হয়ে যাই।

এই কথাটিই নিবেদিতার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান হয়ে উঠলো। এ ধারণায় আলোচনার মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বেঁধে যেতো। নিবেদিতা বোঝাতে চাইতেন, ভারতকে বোঝার মূলে, ইংরাজদের পক্ষপাতিত্ব, নিজেদের কীর্ত্তিকলাপ ও ইতিহাস, শ্রেষ্ঠ ধারণার কারণ, নারীজাতি সম্বন্ধে, পাশ্চাত্যের আধুনিক ধারণার বৈশিষ্ট্য এখানে।

উত্তরে স্বামিজী বোঝাতে চেষ্টা করলেন : তোমার যেরকম স্বজাতি প্রেম, ওতো পাপ! আমি চাই, তুমি এটুকু ধারণা কর, অধিকাংশ লোকই স্বার্থের প্ররোচনায় কাজ করে। তুমি এই সত্যটিকে উল্টে দিয়ে প্রমাণ করতে চাও, একটা জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা! অজ্ঞতাকে এরকম আগ্রহের সঙ্গে ধরে থাকা, মন্দবুদ্ধির পরিচয়।

স্বামিজী ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় আচার্য্য। তিনি চেষ্টা করতেন মানসিক শিক্ষার দ্বারা দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। পথ তার নিজস্ব, মত তার নিজস্ব, দৃষ্টিধারা তার নিজস্ব, তার ওপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করে মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করার অবসর দেওয়া। বলপূর্ব্বক কোন মত বা ধারণার বেড়ীতে পিষ্ট করাকে যেমন ঘৃণা করতেন, তেমনি একদেশদর্শিতাকে দূরে রাখাটাও ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। সেজন্য তার অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করতে, ইয়ুরোপীয় সমাজের করলেন তীব্র সমালোচনা। সেই সঙ্গে চেষ্টা করলেন যাতে, তার ভাবাবেগকে, দূরে রেখে মনের গতিকে সত্যের উদঘাটনে উদ্বুদ্ধ করা যায়। শিক্ষার্থীর 'অহং নাশই' ছিল শিক্ষার প্রথম সোপান। সেই সঙ্গে লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর সাহস ও অকপটতার পরীক্ষা।

এ পরীক্ষা নিবেদিতার কাছে তখন ছিল যথেষ্ট ক্লেশকর। কারণ মনে ছিল অনুদারতা। অবশ্য পরে বুঝে ছিলেন সত্যকে গ্রহণ করার প্রেরণা দেয়— উদারতা ও স্বার্থশূন্যতা। সীমাবদ্ধ সহানুভূতি তুচ্ছ এক্ষেত্রে।

চিন্তা ও অনুভূতিরাজ্যে স্বামিজী দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণতা ও সরলতা, নিবেদিতার মানসিক রাজ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ শিক্ষা যেন কঠোর, তেমনি স্বামিজীর কাছ থেকে যে প্রত্যাশা জেগেছিল মনে, যাঁর উপর নির্ভর করে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর ভারতে, তাঁর এই উদাসীনতায় দগ্ধ হতে লাগলেন প্রতিটি মুহূর্ত্তে। একপাশে আশাভঙ্গ, অপর দিকে বিরক্তি ও শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা, অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভেঙে পড়তে সুরু করলেন।

এই যে সংঘর্ষ, এর পিছনে ছিল স্বামিজীর অনন্য সাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। সে আদর্শ ও যুক্তি নির্ব্বিচারে গ্রহণে, মানসিক দীনতা ছিল নিবেদিতার। তিনি নিজেও অসাধারণ। ব্যক্তিত্বও কম ছিল না। তাই সাধারণের মত অনায়াসে গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না তাঁর। নিজেকে বিলুপ্ত করা অসম্ভব। নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ ছাড়া, অন্যকিছু সম্ভব ছিল না সে চরিত্রে।

ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রের কাছে স্বেচ্ছায় পরাভব স্বীকার করা সম্ভব, এটা মানবচরিত্রের দুর্ব্বলতা। তার মধ্যে থাকে তৃপ্তির অনুভূতি তা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, কিন্তু স্বামিজী সে পথ দিয়ে চলার পাত্র নন। তাঁর অভিধানে আপস বলে কোন শব্দ ছিল না। তিনি জানতেন, তাঁর প্রতি যে অনুরাগ নিবেদিতার, তা একান্তে— তাঁরই প্রতি। ব্যক্তিগত বন্ধন নির্ম্মমভাবে ছিন্নই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ফলে, নিবেদিতার অন্তর শূন্যতায় ভরে উঠতে লাগলো। আলমোড়া আগমনের পূর্ব্বে সুখের কত কল্পনা, ঘিরেছিল তাঁর হৃদয়। এ নাম, তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত। মিঃ স্টার্ডি এখানে বাস করে তপস্যা ও অধ্যয়নে কাটিয়েছিলেন। স্বামিজী এখান থেকেই বহুপত্র তাঁকে দিয়েছেন, এমন কি ২৯শে জুলাই এখান থেকেই তাঁকে ভারতে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন, আশ্বাস দিয়েছিলেন আমরণ তাঁকে সাহায্য করবেন!

সেই আলমোড়া! বিশাল দেওদার গাছগুলির ভাষাহীন গভীরতা, সামনে দিগন্ত প্রসারী ধূসর বর্ণের পর্ব্বতমালার উপরে, তুষারমণ্ডিত উত্তুঙ্গ শিখরের মহিমা-আবির্ভাব। যে বারান্দায় বসে চলছে আলাপ আলোচনা, তার চারদিকে গোলাপের বন, তার মাঝে স্বামিজীর উপস্থিতি এইস্থানে, মহিমা শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে তবুও নিবেদিতার অন্তর নিঃসঙ্গতায় আছড়ে পড়ে বার বার!

এই দ্বন্দ্বের কথা তিনিই তাঁর রচনার মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন গুরুর মহিমাও উল্লেখ করেছেন। বলছেন : ভারতবর্ষে পদার্পনের মুহূর্ত্ত থেকে স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর এই ধারণা জন্মে, জালবদ্ধ সিংহের মত। সেই ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশে বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করছে এবং তার জন্য দুঃসহ কষ্ট বোধও করছেন। যে ভাবরাশি জগতকে দেবার জন্য তাঁর আগমন, তার জন্য তিনি ব্যাকুল, কিন্তু সাধারণ নরনারীর— তা গ্রহণের অক্ষমতা। এই ব্যাকুলতা ও অসহিষ্ণুতার আঘাত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও গুরুভ্রাতাদের উপরে

এসে পড়তো। বহু সময়ে তাঁদের তিরস্কার করতেন, ফলে, ঘটলো ধৈর্য্যচ্যুতি, জাগলো ক্ষোভ, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, তাই তাঁরা তাঁর সম্মুখীন হতে সাহসী হতেন না। অথচ তাঁরা এই ক্রোধ বা তিরস্কার এক মুহূর্ত্তের জন্য গায়ে মাখতেন না। এঁদের সঙ্গে তাঁকে (নিবেদিতাকে) সহ্য করতে হতো আরও একটু বেশী— সেটা উপেক্ষা। যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বদেশ, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিষ্ঠা সব বিসর্জ্জন দিয়ে এদেশে পাড়ি দিয়েছেন, সেই সময়ে তাঁর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্ত্তে, একে একে কঠোর সমালোচনায় ব্যথিত করছেন। এই উপেক্ষা সহ্য করার মনোবল তাঁর ছিল। ফলে, সাময়িক বেদনা হয়ত বোধ করতেন, তা মনের উপর স্থায়ী দাগ কাটতো না।.... আর রোম্যাঁ রঁলা লিখেছেন : সেন্ট ক্লারার সঙ্গে সেন্ট ফ্রান্সিসের নাম যেমন জড়িত, তেমনি তাঁর দীক্ষাকালীন ভগিনী নিবেদিতা নামটি তাঁর প্রিয় গুরুর সঙ্গে চিরদিন জড়িয়ে থাকবে। তবে একথাও সত্য, জবর দস্ত বিবেকানন্দের মধ্যে পভেরেলোর মত দীনতা ছিলনা। কাউকে গ্রহণ করার পূর্ব্বে, বিবেকানন্দ তাঁকে কঠিন অন্তঃপরীক্ষার সম্মুখীন করতেন। নিবেদিতার ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, এই রূঢ়তা তাঁকে পীড়িত করে, নৈরাশ্যের অন্ধকারে সাময়িক নিক্ষিপ্ত করেছিল অথচ তা সহজেই বিস্মৃত হয়ে গুরুর মধুর স্মৃতিই বহন করেছিলেন আজীবন। মিস ম্যাকলাউড সেদিন তাঁকে (নিবেদিতাকে) বলেছিলেন, স্বামিজী শক্তির প্রতিমূর্ত্তি! উত্তরে নিবেদিতা বললেন মূর্ত্তিমান স্নেহ। এর উত্তরে মিস ম্যাকলাউড বললেন, আমি কখনও অনুভব করিনি— তার কারণ, তোমার কাছে কখনও সেটি প্রকাশ করেননি। তাঁর স্বভাব ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী যে পথে সে ঈশ্বর লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে, সেই মত, ব্যবহার করেন তিনি তাঁর সঙ্গে।

মানসিক সংগ্রাম যতই কঠোর হোক, জীবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্প প্রত্যাহারের চিন্তা কোনদিন মনে উদয় হয়নি নিবেদিতার। দিন যতই কাটতে লাগলো হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন, এই সেবা কাজ কোন ব্যক্তির মধুর সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়, তাঁর প্রীতির জন্য কর্ম্মসম্পাদন, আনন্দদায়ক নিঃসন্দেহ, তারও উপরে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ব্যক্তি বিশেষের প্রীতির অপেক্ষা না রেখে শুধু কাজের জন্য কাজ করে যাওয়া। সে সাধনাও কি সহজ বস্তু? হৃদয়ে নিরন্তর অব্যক্ত যাতনা, অন্তরায় আত্মগরিমা, গুরুর কাছে নত হতে বাধা দিতে লাগলো। .... আদর্শ জগতে বিপর্য্যয়, স্বামিজীর কঠোর ব্যবহার, দিশেহারা হয়ে পড়লেন নিবেদিতা। সে সময়ে স্বরূপানন্দ তাঁকে বাংলা শেখানো ছাড়া মোটামুটি হিন্দুশাস্ত্রের ধারণা ও নিয়মিত গীতা পড়াতেন। এ সময়েই তাঁর (স্বরূপানন্দর) মনে গীতার ইংরাজী অনুবাদের ইচ্ছা প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হয় আর সেকাজে নিবেদিতা, তাঁকে অনুবাদ ও প্রুফ দেখার সাহায্য করে চললেন।

স্বামিজীর উপস্থিতি, সেসময় একটা জমাটভাব সৃষ্টি করছিল, চিন্তাশক্তির উদ্বোধন হতে লাগলো। সে ভাবাদর্শের সংযোগ সাধনে স্বরূপানন্দ হলেন সেতু। তাঁর (নিবেদিতার) মানসিক অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হয়ে, তাঁকে ধ্যানশিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনিও মনে প্রাণে তা অভ্যাস করতে লাগলেন। ফলে, মনে এলো প্রশান্তি। উত্তেজনাকে অতিক্রম করে, এলো নিস্তরঙ্গ অবস্থা, তখন মনের অবস্থানে, সেমুহূর্ত্তে ঘটে গেল আপাত-বিরোধী সমস্যার সমাধান। ধ্যানই তাঁকে পথ প্রদর্শন করলো। ধীরে ধীরে এই ধ্যানের ভাব তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করলো। সেদিন চারদিকের অদ্ভুত এই নীরবতা, স্তিমিত নক্ষত্রালোকে হিমালয়ের বায়ুমণ্ডল, এক প্রশান্তিতে হৃদয় তাঁর ভরপুর করে তুললো। উপলব্ধির গভীরে ডুবে গেলেন নিবেদিতা। বুঝলেন, গুরু কাছে আত্মোৎসর্গ করাই প্রকৃত

শিষ্যের একমাত্র কামনা। আধ্যাত্মিক উন্নতি গুরুশক্তিরই অলক্ষ্য ক্রিয়া। নিজস্ব অহমিকার উপর আত্মোপলোব্ধির প্রচেষ্টা, শুধু বিড়ম্বনা। ধীরে ধীরে এই তত্ত্ব ... তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হল।

তবুও চললো নিরবিচ্ছন্ন সংগ্রাম। ভারতকে একান্তভাবে গ্রহণের পথে অন্তরায় তাঁর জন্মগত বিদেশী সংস্কার। আর এটাই চূর্ণ করতে চাইছেন স্বামিজী। এর কি উৎপাটন এত সহজ? এর উপরেই ছিল তাঁর (স্বামিজীর) বিরক্তির কারণ। কখন ও কিভাবে তার আবির্ভাব, বুদ্ধির অগোচর ছিল নিবেদিতার।

মানসিক যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত নিবেদিতা। সঙ্গীগণ অবিদিত সকলে। ক্রমে এমন সময় এলো নিবেদিতা একবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হলেন। মিস ম্যাকলাউড বুঝলেন, এ বিষয়ে স্বামিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। আর এঅবস্থা পর্য্যবেক্ষণে, নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি জানতেন, তাঁর (স্বামিজীর) অভিপ্রেত কাজে, নিবেদিতার যোগ দেওয়ার মূল লক্ষ্য কি? উভয়ের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সবই লক্ষ্য করছেন, প্রয়োজনও বোঝেন কিন্তু তারজন্য এত পীড়ন কেন?

প্রতিদিন যেমন স্বামিজী আসেন, তেমনি এলেন। মিস ম্যাকলাউড তাঁকে নিবেদিতার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জানালেন। মর্ম্মবেদনায় তার শরীর মন অবসন্ন। শীঘ্র এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন।

স্বামিজী সব শুনলেন। চলেও গেলেন। সন্ধ্যার সময় আবার ফিরে এলেন। বারান্দায় বসে ছিলেন নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড। ছোটছেলের মত ম্যাকলাউডের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমার কথা ঠিক! এ অবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। আমি একলা জঙ্গলে চলেছি, নির্জ্জনবাসের ইচ্ছা, যখন ফিরবো, শান্তি নিয়ে আসবো।

স্বামিজী আকাশের দিকে তাকালেন মাথার উপর বালচন্দ্রের শোভা। দিব্যভাবে সহসা কণ্ঠ তাঁর আবিষ্ট হয়ে গেল। বললেন : দেখ, মুসলমানরা দ্বিতীয়ার চাঁদকে বিশেষ সমাদরের চোখে দেখে। এস, আমরাও এই নবীন চন্দ্রমার সঙ্গে নবজীবন আরম্ভ করি। হাত তুললেন তিনি। সেই মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী নিবেদিতা, হৃদয়ের গভীর আবেগে, তাঁর পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর মানসকন্যার মাথায় হাত রাখলেন। প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। নিবেদিতা উপলব্ধি করলেন, গুরুর মাহাত্ম্য। সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেল। মাহেন্দ্রক্ষণ, মিলনের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য জীবনে, সমুজ্জ্বল হয়ে রইলো।....

স্বামিজী চলে গেলেন। রাত্রিতে ধ্যানে বসে অনুভব করলেন নিবেদিতা এক অনন্ত সত্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন— সেই গভীর সত্তার স্বরূপ বিচার বুদ্ধির অগম্য। বুঝলেন, হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষানুভূতিতে সত্য। উপলব্ধি করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বানী—নরেনের স্পর্শমাত্র জ্ঞানদান করার জন্মগত শক্তি আছে—তা বিকাশ লাভ করবে। সেইসঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করলেন, শ্রেষ্ঠ আচার্য্য এইরূপেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবসান করেন। সাধনার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। হৃদয়ের তীব্র জ্বালা শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপে জুড়িয়ে গেল। স্থির করে নিলেন, তাঁর সর্ব্ববিধ মতামত অপপটে গ্রহণের প্রস্তুতিই হবে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।২৫শে মে বুধবার স্বামিজী একাকী চলে গেলেন। ২৮শে মে শনিবার অরণ্যবাস শেষে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গলাভের জন্য প্রতিবারই তাঁরা তাঁকে এমনিভাবেই ঘিরে বসতেন। নিবেদিতাও সেভিয়ার দম্পতির বাংলোয় গিয়ে দেখা করলেন। তখন তিনি বাগানের ইউক্যালিপটাস ও ছোট ছোট গোলাপ গাছের নীচে বসে আছেন— সেই প্রতীচ্য বাসের চিত্রপট— এখনও তিনি পরিব্রাজক। অপরূপ প্রশান্তি ও স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল। সত্যই শান্তি নিয়ে ফিরে এসেছেন। নিবেদিতাও শান্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ফিরে চললেন নিজ কুটীর প্রাঙ্গণে।

৩০শে মে সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে যাত্রা করলেন হিমালয় প্রদেশে মঠ স্থাপনের জন্য নির্জ্জন স্থানের অনুসন্ধানে। নিবেদিতা, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড রয়ে গেলেন আলমোড়ায়। দিন কাটতে লাগলো অধ্যয়ন, অঙ্কন, ও গাছপালা সংগ্রহপূর্ব্বক উদ্ভিদ চর্চ্চায়।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের অবসান। হিমালয়ের নির্জ্জনতায় আত্মোপলব্ধির সাধনায় অবগাহন করলেন নিবেদিতা। বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ, তথা অধ্যাত্মজীবনের ধারণা অসম্ভব। এবস্তু উপলব্ধির বিষয়, তা নির্ভর করে গুরুকৃপার উপর। আধ্যাত্মিক জীবনের মূলকথা ভগবানের প্রতি গভীর প্রেম, একনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন থাকা, সেই অনন্তের সাধনায়। বুঝলেন, তাঁর গুরুর বিশেষত্ব এটাই। অপরে যেখানে উপায়ের আলোচনাতে ব্যস্ত, সেখানে আগুন জ্বালানোই তাঁর কাজ। সেখানে নির্দ্দেশ দেওয়া-কাজ, সেখানে বস্তুটিকেই ধরিয়ে দেন তিনি।

আর এই হিমালয়। তার শান্ত পরিবেশ, গভীর এই নির্জ্জনতা মনকে আত্মোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অতীন্দ্রিয় সত্যাপলব্ধির দ্বার-স্বরূপ মৌন ও নির্জ্জন বাসের জন্যই তিনি তাঁদের মধ্য থেকে চলে যান একাকী। ধীরে ধীরে সকল অভিমান চূর্ণ হয়ে এলো। উপলব্ধি হল,আত্মসমর্পন করতে হবে, সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। সকল অহমিকার বিনাশ অন্তরের গভীরতম সত্তার বিকাশ। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত্তে, অন্তর্জগতে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, বর্ত্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক গভীর।

আলমোড়া পর্য্যন্ত তাঁর, স্বামিজীর প্রতি ছিল, একটি বিশিষ্ট অকপট চরিত্রের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধানুরাগ। তা প্রতিদানের অপেক্ষা· করতো, কারণ তিনি ছিলেন বীরত্বের উপাসিকা, আবেগপরায়ণা ও আদর্শবাদী। তাঁর কাছে সাধারণ জীবনযাত্রা ছিল অকল্পনীয়। মহৎ আদর্শের জন্য, দুঃখবরণে, সদাই উন্মুখ। স্বামিজীর সঙ্গে পরিচয়ে, পেয়েছিলেন তাঁর মনের মত চরিত্র, যাঁকে কেন্দ্র করে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করা যায়, যাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁর অভিলাষিত কাজে জীবন সমর্পণে, আনন্দ অনুভব করা যায়। আর স্বামিজী! তিনি জানতেন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাদ এখানেই। ব্যক্তির অন্তর্ধানে আদর্শের পরিণাম কি? প্রয়োজন তাই আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ। এটা তাঁর প্রয়োজন ছিল। সেই ব্যক্তি থেকে মুক্ত হয়ে, নিজেকে জীবনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি (নিবেদিতা) যেন ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ, না থেকে, ব্যক্তির উর্দ্ধে যেঅনন্ত সত্তা, সকল দৃষ্ট বস্তু যার কাছে তুচ্ছ ও বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ— সেই অনির্ব্বচনীয় সত্তার বিমলজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নয়। যতই, সেই গুরু শিষ্যের সম্পর্কটি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো, ততই ঘাত প্রতিঘাতের অবসান ঘটতে লাগলো। স্নিগ্ধ মধুর রসে হৃদয়পূর্ণ হতে লাগলো। তিনি তাঁর মানসকন্যা! তাঁর মনোমত হয়ে ওঠাও আজ, কন্যার একান্ত কাম্য। স্পষ্টতর হয়ে উঠলো— সেই আদর্শ-মানুষটির রূপ। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ক্রমাভিব্যক্তি, যতই উর্দ্ধগামী, সেই আদর্শ মানুষটির স্বরূপও হল স্পষ্টতর। বুঝলেন, নিজের অহমিকার গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে এসেছেন এতদিন। ভারতের প্রকৃত সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হলে, বিসর্জ্জন দিতে হবে বিদেশী সংস্কার। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন চাই, তবেই তা সম্ভব।

স্বামিজীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় ভারতীয় ভাবগুলির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন নিবেদিতা। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণের গভীর তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে সমর্থ হলেন। লাভ করলেন দিব্যদৃষ্টি— চিনলেন ভারতআত্মাকে। ক্ষুরধার ছিল তাঁর বুদ্ধি, তার সঙ্গে যুক্ত হল গভীর অনুরাগ—মনপ্রাণ দিয়ে অনুধাবন করে চললেন স্বামিজীর প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ।....

স্বামিজীও, তাঁর গুরু যে ভাবে, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে রূপান্তরিত করেছিলেন, সেইভাবে নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখে রূপান্তরিত করে চললেন তাঁকে। যে ক্ষোভে, যে অভিমানে নিবেদিতার হৃদয় বিদীর্ণ হতে চলেছিল— প্রশমিত করলেন তাঁকে স্নেহের ফল্গুধারায়।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন : যদিও বহু সময় আমি তোমাদের মনের মত কথা বলি না বা আমার কথার মধ্যে রাগ কর্কশতা প্রকাশ প্রায়— মনে রেখো, প্রেম ছাড়া অন্যকিছু প্রচার করা আমার হৃদয়ের ভাব নয়। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, শুধু একটুকু হৃদয়ঙ্গম করলে এসব বিষাদের অবসান হবে।....

৫ই জুন স্বামিজী প্রত্যাবর্তন করলেন। নিবেদিতা যে বাংলোতে অবস্থান করতেন, তার প্রাঙ্গণে বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন। গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ পৌচেছে— সে দুঃসংবাদ জানানো হল না। ইতিমধ্যে পাওহারী বাবা নিজদেহ যজ্ঞে পূর্ণাহূতি দানের সংবাদ পেয়েছেন। বিষাদে মগ্ন স্বামিজী! পরদিন সকালে নিবেদিতার বাংলোতে এলেন। রাত্রেই গুড উইনের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন। কয়েকঘণ্টা তিনি অটল রইলেন ক্রমে ত্যাগের প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। ত্যাগ, ত্যাগ, মহান ত্যাগের আদর্শ, তাঁর সে ভাষণে যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো। সে চিত্র "চিরদিনের মত নিবেদিতার হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে গেল"

শিষ্যের মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করেছে বোঝা গেল শীঘ্র। তিনি আলমোড়া পরিত্যাগের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। বিশেষতঃ আঘাত পেয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি যে সময়ে টেনিশনের 'ইন মেমোরিয়াল' শোক গীতি কাব্য পড়েছিলেন, মনে তাঁর সে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গুডউইন ইহলোক ত্যাগ করে জ্যোতির্ম্ময়ধামে প্রস্থান করছেন। পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। তাঁকে দেখে, তাঁর (নিবেদিতার) সেদিন কত আশ্বাস লাভ করেছিলেন। সে স্মৃতির উদ্দেশ্যে কয়েক ছত্র রচনা করলেন। স্বামিজী সেটিকে একটি কবিতায় রূপান্তরিত করলেন। নাম দিলেন 'তাঁহার শান্তি লাভ হোক'। তাঁর মার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। নিবেদিতা পাছে ক্ষুণ্ণ হন তাই বোঝাতে লাগলেন : ছন্দ ও মাত্রা মিলিয়ে কবিতা রচনা অপেক্ষা, কবিত্বপূর্ণভাবে তা অনুভব করা অনেক বড় জিনিষ।

১১ই জুন সকলের কাশ্মীর যাত্রা স্থির হল। 'প্রবুদ্ধভারত' সম্পাদক রাজম্ আয়ারের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি উঠে গিয়েছিল। স্বামিজী যাতে তৃপ্তি বোধ করেন, সে উদ্দেশ্যে মি. সেভিয়ার আলমোড়া থেকে পত্রিকা প্রকাশনের ভার গ্রহণ করলেন। সম্পাদনার জন্য রয়ে গেলেন। তাঁর কাছে শেষ বারের মত গীতা অধ্যয়ন করেছিলেন, প্রিয় দেওদার গাছের নীচে বসে শেষে ধ্যান করে নিলেন। মিঃ সেভিয়ারের ঘরে সকলের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু নিবেদিতা গেলেন না। এখানে তাঁর নবজীবন লাভ। প্রাচ্য সংস্কারের জন্ম শুরু। প্রকৃতির নীরব গম্ভীর পরিবেশ, মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন। সকালেই যাত্রা। আবার কাঠগোদাম। পথে অপরূপ সৌন্দর্য্য। নিবিড় অরণ্য, গভীর স্তব্ধ রাত্রি, দীর্ঘ গাছের ফাঁক দিয়ে প্রভাতের আলো নেমে আসা—সবকিছু সুন্দর। চারদিকে নানাজাতীয় 'ফার্ণ', প্রিমরোজ, ভায়লেট জাতীয় ফুল ঘিরে আছে সে পথ। এর একটা নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করতেন তিনি। এই আকর্ষণই তাঁকে পরে জগদীশচন্দ্রবসুর কাজে নিজেকে নিয়োগ সহজ ও প্রীতিকর হয়ে উঠেছিল।

১২ই জুন রবিবার পড়ন্তবেলায় পৌঁছলেন 'ভীমতাল'। একটি হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরে বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হল। এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসে স্বামিজী 'রুদ্রস্তুতি' আবৃত্তি ও অনুবাদ করলেন: 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়,

অবিরাবির্ম— এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম। "অবিরাবির্ম এধি'র অনুবাদ করতে ইতস্ততঃ করলেন। স্বল্প কথায় প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া কঠিন। নিবেদিতা পরে এ তত্ত্বটির যথার্থ অর্থ বোধগম্য করেছিলেন। "হে রুদ্র, তুমি কেবল নিজের নিকটে প্রকাশিত আছ আমাদের কাছেও আত্মপ্রকাশ কর"। শেষে সুরদাসের সঙ্গীতটি গাইলেন — যা তিনি খেতড়ীর রাজার সভায় নর্ত্তকীর মুখে শুনেছিলেন। (প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো....)

অনেক সময় তারা ঘোড়ার পিঠে চললেন। রাত্রে ডাকবাংলোতে অবস্থান করলেন। পিছনে পড়ে রইলো পাইন ও দেওদার বৃক্ষরাজি। চারদিকে নানা জাতের ফার্ণ। তরাই অঞ্চল অতিক্রম করলেন রেলে। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই পবিত্র ভূমিতেই বুদ্ধদেব জন্ম নিয়েছিলেন।

১৪ই জুন পাঞ্জাবে প্রবেশ করলেন। 'ওয়াহ গুরু কী ফতহ?' দ্বারা শিষ্যগণকে অনুপ্রাণিত করলেন, শিখ গুরুগণের ভাবে। প্রতিটি স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করে চললেন স্বামিজী। আর্য্যগণ এই সিন্ধুনদের তীরেই প্রথম বসবাস আরম্ভ করে ছিলেন।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে টাঙা করে ১৫ই জুন মরী পৌঁছলেন। ১৮ই জুন রওনা হয়ে জুলাই-এ ডাকবাংলোতে বিশ্রাম নিলেন। এখানে নদীর স্রোতের বেগ প্রখর। কোহালা থেকে বারমুল্লা পর্য্যন্ত পথ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। পালা করে স্বামিজীর সঙ্গে যাত্রার ব্যবস্থা হল। ক্রমে নিবেদিতার পালা এলো। চললো স্বামিজীর অতীত জীবনের প্রসঙ্গ। এছাড়া ব্রহ্মবিদ্যা— সেই 'একমেবা দ্বিতীয়ম' তত্ত্বের সাক্ষাৎ করা প্রসঙ্গে বললেন : ঘৃণা অপেক্ষা প্রেম বলীয়ান। চিত্ত স্পর্শ করলো নিবেদিতার।

পথে একদল পাদচারীর সঙ্গে দেখা হল। তাদের এই কৃচ্ছ্রসাধনকে বর্ব্বরতা বলে সমালোচনা করলেন। পরমুহূর্ত্তে এর অন্তরালে যে আদর্শ বিরাজ করছে স্মরণ হওয়ায়, বলে উঠলেন 'এইরকম বর্ব্বরতা না থাকলে, বিলাসিতা মানুষের সব মনুষত্বকে হরণ করে নিত।'

তাঁর মুখে পরস্পর বিরোধী ভাব বা আদর্শের কথা বহু সময়ে শিষ্যগণকে বিভ্রান্ত করতো। কিন্তু এভাবের পিছনে, তাঁর ব্যক্তিগত দৃঢ় ধারণা থাকায় কথাগুলো এত শক্তিশালী হত যে অপরের পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। একমাত্র নিবেদিতাই সে ভাব বা কথার সামঞ্জস্যের সন্ধান খুঁজে পেতেন।

২০ শে জুন বারমুল্লা থেকে নৌকো করে শ্রীনগর উপস্থিত হলেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানের ভাব ও রীতিনীতির ভেতরে, প্রবেশের চেষ্টা করতেন। সেটা সম্ভব হতো তাঁর সর্ব্বব্যাপী উদারনীতির জন্য।

শ্রীনগরে থাকলেন ২২শে থেকে ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত। এসময়ে তিনি ছিলেন দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ। যাঁরাই সে সময় তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন তাঁরাই ধন্য। নিজে লিখছেন নিবেদিতা : এই সকল মহান উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার ছাড়া, সমুজ্জ্বল জীবনের সংস্পর্শে বাস করতাম আমরা। তার দিব্যচ্ছটা, কিছু সময়ের জন্য আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হতো।

প্রথম দিন, একটি উদ্যানের পাশে বজরাগুলি রাখার ব্যবস্থা হল। নিবেদিতা ও তাঁর সঙ্গীগণ তীরে বেড়িয়ে এলেন। শিশুদের সঙ্গে খেলা করলেন। 'ফরগেট মি নট' ফুল তুললেন। যেখানে ফসল কাটা হয়ে গেছে, সেখানেই কৃষকদের প্রমোদ অনুষ্ঠান চলছে। পরেরদিন তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতে ঘেরা এক মনোরম উপত্যকায়। কাশ্মীর উপত্যকা নামে পরিচিত হলেও এটাই ছিল শ্রীনগর উপত্যকা। ইসলামাবাদ সহরের নিজস্ব একটা উপত্যকা আছে, সেটিও নদীর আরও উপরে। পথ ঘুরে ফিরে গেছে পর্ব্বতের মাঝখান দিয়ে। উপরে সুনীল আকাশ, নদীর জলও নীল, মাঝে মাঝে পাতার মালা, বড় বড় পদ্ম। দুপাশে ক্ষেত, পর পর সাজানো, ফসল কাটছে কৃষক,

যা কিছু দেখা যায় সবই নীল, হলুদ ও শ্বেতের সমন্বয়। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটে রয়েছে চারদিকে। বজরা করে শ্রীনগরের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো চললো। আগেকার মত প্রতিদিন স্বামিজী বজরায় আসতেন, বহুক্ষণ নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলতে লাগলো।

এখানে বহু ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটেছে। অশোক থেকে কনিষ্কের আমল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি, অবনতি ও ক্রমবিস্তার। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি, শিবোপাসনার ইতিহাস, বিবৃত করলেন স্বামিজী। জীবনের প্রারম্ভে নিবেদিতা এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তখন থেকেই শ্রীবুদ্ধের অনুরাগী। স্বামিজীও বুদ্ধের উপাসক।

২৬শে জুন দর্শন করলেন ক্ষীরভবানী। ছোট প্রস্রবণ চারপাশে রেলিং দ্বারা ঘেরা! জলের রং দুধ, চাল আর ফুলে বেশ গাঢ়। ছোট একটি বাজার। শত শত লোক মালা জপছে আর কুণ্ড প্রদক্ষিণ করছে। সাধু সন্ন্যাসীর প্রচুর সমাগম। ভস্মমাখা জটাধারী এক সন্ন্যাসী আসন করে বসে পিছনে হোমের আগুন জ্বালানো। সন্ন্যাসী ও পুরোহিত তাঁদের প্রসাদ স্বরূপ খানিকটা চিনি দিলেন। আশে পাশে ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে হাসি কৌতুকে সময় বেশ কাটলো। এই স্থানে তপস্যা ও অপূর্ব্ব দর্শনের জন্য ক্ষীরভবানী নামটি তাঁর কাছে পবিত্র বলে মনে হল।

তখ্‌ত-ই সুলেমান অল্প উঁচু পাহাড়ের উপর ছোট একটি মন্দির। এখান থেকে কাশ্মীরের দৃশ্য চোখে পড়ে। ডাল হ্রদ এঁকে বেঁকে চলে গেছে। চারপাশে অপূর্ব্ব শান্ত শ্রী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি হিন্দুদের অকর্ষণ কতদূর, তা মন্দির ও স্মৃতি সৌধের স্থান নির্ব্বাচনে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি (নিবেদিতা) যেখানে যেতেন অভিনিবেশ সহকারে দেখতেন, রীতনীতি লক্ষ্য করতেন, সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে মন্দিরের ছোট নকসা এঁকে রাখতেন। উপস্থিত স্বামিজী, তিনি তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বা তার অন্তর্গত ভাব বিশ্লেষণসহ বুঝিয়ে দিলেন। পরে তাঁর অন্যতম পুস্তক রচনায় সেগুলি বিশেষ সাহায্যে এসেছিল। (Note of some wanderings)

৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আমেরিকান শিষ্যদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে গোপনে নিবেদিতার সঙ্গে একটি উৎসবের আয়োজন করলেন। খাবার নৌকার দরজার উপর ডোরাকাটা ও তারকা চিহ্নিত আমেরিকার জাতীয় পতাকা একটি স্থাপন করে চিরশ্যামল গাছের ডালপালা দিয়ে দরজাটি সুন্দর করে সাজালেন। চা পানের ব্যবস্থা করলেন সেখানে। অভিভাষণের সঙ্গে স্বরচিত একটি কবিতা উপহার দিলেন। (৪ঠা জুলাইএর প্রতি) এই ভ্রমণে চারটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করলেন স্বামিজী (i) Recusant in Peace. (ii) To Prabudha Bharat (iii) To the fourth of July (iv) Kali the Mother

স্বামিজী সকল প্রসঙ্গের মধ্যে ত্যাগের মহিমার উপর বিশেষ জোর দিলেন। আলোচনার মধ্যে জনকরাজার প্রসঙ্গ উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: জনকরাজা হওয়া কি এত সোজা? সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে সিংহাসনে বসা! ঐশ্বর্য্য বা যশ অথবা স্ত্রী পুত্রের জন্য কোন রকম আকাঙ্ক্ষা না রাখা! নিবেদিতাকে লক্ষ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন— এ কথা সদা মনে রেখো এবং মেয়েদের তোমরা শেখাতে কখনও ভুলে যেও না যে : মেরু সর্ষপয়োর্ষৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব
সরিৎসাগরয়োর্যদ যৎ যথা ভিক্ষু গৃহস্থায়োঃ।।

মেরু ও সর্ষপে, সূর্য্য ও খাদ্যতে, সমুদ্র ও গোষ্পদে যে প্রভেদ সন্ন্যাসী এবং গৃহীর মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ।

সর্ব্বং বস্তু ভয়ন্বিতং ভুবি নৃনাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম।।

পৃথিবীর সকল বস্তুতেই ভয়, কেবল মানবের বৈরাগ্যই ভয়রহিত। সকলের শেষে বললেন: নিবেদিতা আমরা যেন কখনও আদর্শ ভুলে না যাই।

৬ই জুলাই কাজের জন্য মিসেস বুল ও মিস মাকলাউডের সঙ্গে তিনি (স্বামিজী) গুলমার্গ গেলেন। সেখান থেকে অমরনাথের পথে যাত্রা। এই সময়ে নির্জ্জনবাসের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে হঠাৎ স্বামিজী একাকী চলে যেতেন আবার কয়েকদিন পরে ফিরে আসতেন অপ্রত্যাশ্যিত ভাবে। নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক জীবন যাপনের প্রবল আগ্রহ, তখন তাঁকে অধিকার করে ছিল। এসময়ে তাঁর শিষ্যদের প্রায় পরিচর্য্যাকারী সেবকদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। কারণ তাঁর নৌকা সেদিন আর প্রত্যাবর্ত্তন করবে কিনা স্থিরতা ছিল না। কখন তাঁর উপস্থিতি, কখন তাঁর নির্জ্জন স্থানের উদ্দেশ্যে গমন, কোন স্থিরতাই সেসময় ছিল না।

তুষারপাতে অমরনাথ যাত্রাপথ বন্ধ। স্বামিজী সোনামার্গের পথে ফিরে এলেন। তখন গাঢ় তন্ময়তা ও অন্তর্মুখীনভাবে তিনি বিভোর। ধীরামাতার সঙ্গে ভক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। এমন তন্ময়তা যে, কোন খাবারই গ্রহণ করলেন না। দু চারদিন পর ইসলামাবাদে গমন করলেন। এখানে ভারী ভারী ধূসর চীনাপাথরের তৈরী বহু প্রাচীন ছোট মন্দির আছে। 'পাণ্ড্রেস্থান' নামে পরিচিত। দর্শনীয় স্থাপত্য শিল্পে মন্দিরটির স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। বাইরে শিক্ষাদান রত বুদ্ধদেব ও একটি গাছের তলায় তাঁর জননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি। সুন্দর সে দুটি মূর্ত্তি। দর্শন শেষে তিনি (স্বামিজী) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি তাঁর চিত্তে এক গভীর 'ভাবের' উদ্রেক করলো। ধীরামাতার নৌকায় বসে নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তার বিষদ আলোচনা করলেন। এরপর অবন্তীপুরের দুটি বড় মন্দির, বিজবেহার মন্দির ও মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে এলেন।

প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে নিখুঁতভাবে পরিদর্শন করা ছিল নিবেদিতার চরিত্রের গভীর বৈশিষ্ট্য। স্বামিজীর প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তার ছবি তাঁর চিত্তে গভীরভাবে প্রথিত হয়ে যেতো। যার ছবি পরবর্ত্তীকালে নিখুঁত ও পারদর্শিতার সঙ্গে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছেন।

২৪ জুলাই গমন করলেন বেরী নাগ। পাহাড়ের পাদদেশে সরল বৃক্ষপরিবেষ্টিত প্রাচীন জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদ দর্শনে মুগ্ধ হলেন। এই নিবিড় অরণ্যে ঘন অন্ধকারে ঢাকা রাত্রির নিবিড় শান্ত পরিবেশের মধ্যে স্বামিজী তাঁর সঙ্গে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

২৫ শে জুলাই অচ্ছাবল গমন করলেন। এখানেই অমরনাথ যাওয়ার সঙ্কল্প তাঁর মনে দৃঢ়বদ্ধ হল। তিনি নিবেদিতাকে জানালেন তাঁর মনের ইচ্ছা। সেখানেই নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথ গুহায় মহাদেবের চরণে তাঁকে উৎসর্গ করলেন। এরপর রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যানে ডুবে গেলেন। সহসা বলে উঠলেন, জগতে যাঁরা বড় কাজ সম্পন্ন করবে, তাদের আমি কখনও উমা ও মহেশ্বরের বিষয় ছাড়া অন্য কথা বলি না। জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীগণই উমা ও মহেশ্বর থেকে সৃষ্ট।"

শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী হবেন নিবেদিতা— তাঁকে মহাদেবের চরণে উৎসর্গের প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যৎ কাজের উপযুক্ত অধ্যাত্মভিত্তি সৃষ্টির জন্য বহুকাল পূজিত এই তীর্থটি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জনের প্রয়োজন ছিল। তিনি জানতেন, ভারতের যে অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে নানাভাবে নিবেদিতাকে পরিচয় করিয়েছিলেন, তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে— ফলে, দেশের ভাবধারার সঙ্গে হৃদয়ের নিগূঢ় সংযোগ সাধনের অবকাশ ঘটে যাবে।

ধীরামাতা এ প্রস্তাবে খুশী হলেন ও সম্মতিও দিলেন। স্থির হল তাঁরা তাঁর প্রত্যাগমণ পর্য্যন্ত পহলগামে অপেক্ষা করবেন।

ফিরে এলেন ইসলামাবাদে। জিনিপত্তর গুছিয়ে সকলে রওনা হলেন বওয়ান। প্রতিদিন নোতুন নোতুন যাত্রীর দল আসছেন। এখানে কতকগুলি পুন্য উৎস আছে— ঠিক পল্লীগ্রামে মেলার মত স্থান। সন্ধ্যায় সেই পরিষ্কার জলে অসংখ্য দ্বীপের প্রতিচ্ছায়া যাত্রীগণের মন্দির থেকে মন্দিরে গমন, চারদিকে একটি ধর্ম্মের ভাবে পরিপূর্ণ। মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা চারদিক ঘুরে বেড়ালেন। এতদিন ছিল শুধু ভ্রমণ, এই প্রথম তীর্থযাত্রা।

২৮ শে জুলাই পৌঁছালেন সকালে পহলগামে। পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর একটি জায়গা। এটি মেষ পালকদের গ্রাম। চারদিকে প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য। ছোট একটি পার্ব্বত্য নদী, প্রস্তর সংঘর্ষে সৃষ্ট ছোট ছোট বালুদ্বীপ। দু পাশে সরল গাছের সারি। সন্ধ্যায় চাঁদ ঠিক মাথার উপর দেখা গেল। মুগ্ধ নিবেদিতা। এখানের প্রকৃতিক দৃশ্য সুইজারল্যাণ্ড অথবা নরওয়ের চেয়েও সুন্দর। দৃশ্যাবলী অধিকতর মনোরম।

তাঁবু ফেলা হল স্বামিজী ও তাঁর বিদেশী শিষ্যদের জন্য। প্রতিবাদ গুঞ্জরিত হল সন্ন্যাসীর মধ্য থেকে। হিন্দুযাত্রীগণের মধ্য শ্বেতাঙ্গদের তাঁবু! সঙ্কীর্ণতা ছিল স্বামিজীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তিনি তাঁদের আপত্তি খণ্ডন করতে লাগলেন। শেষে একজন নাগা সাধু এগিয়ে এলেন স্বামিজীর কাছে। বললেন স্বামিজী, আপনার ক্ষমতা আছে জানি কিন্তু তা প্রকাশ করা আপনার উচিত হবে না। স্বামিজী মন দিয়ে শুনলেন তাঁর কথা। তাঁবু সরিয়ে নিতে আদেশ দিলেন। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিতে হলে এঁদের সহযোগিতার প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে পথও ঠিক করে নিলেন। সেদিনই বিকালে নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীদের তাঁবুর চারদিকে ঘুরে এলেন। তাঁকে দিয়ে সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দেওয়ালেন। লাভ হল তাঁদের আশীর্ব্বাদ। গোলমাল দূর হয়ে গেল। পরের দিন থেকে তাঁদের তাঁবু সাধুদের ছাউনির আগেই ঠাঁই পেতে লাগলো। সামনে খরস্রোতা লীদর নদী, অপরপাড়ে সরল সরল গাছে ঘেরা পর্ব্বতমালা। দেখা যাচ্ছে খুব উঁচুতে একটি রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে তুষারবর্ম্ম।

একদিন বিশ্রাম। যাত্রীদল একাদশী করবে। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড পহলগামেই রয়ে গেলেন।

অমরনাথে চলেছে শত শত যাত্রী, অপরূপ সে দৃশ্য। তাদের মধ্যে আছে যাত্রী আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু। সাধুদের তাঁবু গৈরীক রঙের।

যাত্রীগণের কাজে তৎপরতা ও সংঘবদ্ধতা। সঙ্গে আছে অপূর্ব্ব কুশলতা। বিশ্রামের জন্য যখন থামে, বাসে যায় ছোটখাট শহর। শত শত তাঁবু পড়ে মাঝে চওড়া এক রাস্তা, আবার যখন যাত্রা সুরু করে, পিছনে পড়ে থাকে ভস্মবৃত আগুনের স্থানগুলি, শুধু বিস্মিত নয় মুগ্ধ নিবেদিতা।

শিবময় স্বামিজী। সাধু সঙ্গই তার অভিলাষ। তাঁর তাঁবুর চারদিকে সবসময়েই ভীড়। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অসীম প্রভাব। মহাদেব প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীগণও তন্ময়। স্বামিজী বাহ্যজগত থেকে বহু দূরে সরে গেছেন।

৩০ শে জুলাই, অন্ধকার থাকতে থাকতে, যাত্রীদল প্রাতঃরাশ শেষ করে যাত্রা করলেন। সূর্যোদয় হল, অপূর্ব্ব সে দৃশ্য। এর পরেই চন্দনবাড়ী। গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় ছাউনি পড়লো। শুরু হল, বৃষ্টি। চললো সারা বিকাল। নিবেদিতার ব্যবহার-গুণে প্রিয় হয়ে উঠেছেন যাত্রীদলের। যে মুসলমান তহশীলদারের উপর যাত্রীদের দেখাশুনার ভার ছিল, তিনি বা তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ সকলেই স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, নিবেদিতার উপরেও বিশেষ দৃষ্টি। একজন বিদেশিনী নারী, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁদেরই মত অমরনাথ দর্শনে চলেছেন, তাঁর সৌন্দর্যপূর্ণ আচরণ, সকলেই তাঁর প্রতি প্রীতিমুগ্ধ। নিবেদিতাও মুগ্ধ, সহৃদয় তাদের ব্যবহার, বিদেশী বলে ব্যবধান মুছে গেছে, যাত্রী সবাই, একই পথের পথিক—সবার ওপর অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতির পরিবেশ। বস্তুজগৎ পিছিয়ে গেছে বহুদূরে, বিচরণ এক নোতুন লোকে, অন্তর পূর্ণ ভাবরসে।

যাত্রা শুরু হল। চন্দনবাড়ী পড়ে রইলো পিছনে। কাছেই তুষার নদী। নিবেদিতাকে পার হতে হবে পায়ে হেঁটে, আদেশ স্বামিজীর। নিবেদিতা পালন করলেন সে আদেশ। কয়েক হাজার ফুটের বিরাট চড়াই, বৃক্ষ গুল্মহীন পার্ব্বত্য পথ, এঁকে বেঁকে চলেছে সামনে এগিয়ে। অতিক্রান্ত হল দীর্ঘ সে পথ, সুরু হল আবার খাড়া চড়াই। ছোট ছোট একপ্রকার ঘাসে ঢাকা পর্ব্বতের উপরের অংশ। মনে হয় যেন গালিচা পাতা রয়েছে।

শেষ-নাগা থেকে পাঁচশত ফুট উপর দিয়ে আর একটি পথ গেছে। শেষে তুষার ঢাকা শিখরগুলির মধ্যে বারোহাজার ফুট উঁচুতে তাঁবু পড়লো, অসম্ভব শীতে নিবেদিতার শরীর আড়ষ্ট। স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল সব পথটা নিবেদিতা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে, ঘোড়ার ব্যবস্থা করলেন। ফারগাছগুলো নীচে পড়ে রইলো, চারপাশ থেকে জুনিপার সংগ্রহ করে কুলিরা অগুনের ব্যবস্থা করলো।

পরদিন শেষ নাগ (১২০০ হাজার ফুট উঁচু) থেকে নীচে নামলেন। যেখানে তাঁবু ফেলা হল তার সামনে পাঁচটি স্রোতস্বিনী বয়ে গিয়েছে, নাম তার পঞ্চতরণী। বিধি অনুযায়ী সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে স্বামিজী ভিজে কাপড়ে প্রত্যেক নদীতে স্নান করলেন। এখানেও ঠাণ্ডা, তবে তুলনায় কম। প্রীতিপদও বটে। চারদিকে অজস্র সুন্দর ফুল, তাঁবুর শয্যার নীচেও ফুটে আছে বড় বড় নীল ও সাদা Anemone ফুল। নোতুন রকমের 'ফরগেট মি নট,'ঘন সবুজ পাতা যেন রাশীকৃত মখমল। তুষারাবৃত বিরাট পর্ব্বতমালা, যেন ভস্ম অনুলিপ্ত শঙ্কর ভগবান। সমস্ত জায়গাটা বিরাট এক ভাবোদ্দীপক। মনে হয় সার্থক এই শারীরিক যাতনা।

২রা আগস্ট, মঙ্গলবার অমরনাথের শেষ যাত্রা। শ্রাবণী বা রাখী পূর্ণীমার দিন অমরনাথে উৎসব অনুষ্ঠান। আগের দিন রাত্রে, জ্যোৎস্নালোকে যাত্রা শুরু হলো। ডাণ্ডী ও ঘোড়া ত্যাগ করে পদব্রজে যাত্রা। অতিক্রম করতে হল প্রায় দুহাজার ফুট। 'পাগদাণ্ডী' নাম রাস্তা। খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে গেছে। দু চার পা এগিয়ে নিবেদিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে দেখলেন বিচিত্র, সে ফুলের বাহার — কলাম্বাইন, মাইকেলমাস 'ডেজি' আর ছয়লাপ বুনো গোলাপ। নিবেদিতা শিল্পী, মুগ্ধ পথের সৌন্দর্য্যে। চড়াই এর পর উৎরাই যেখানে হয়েছে শেষ, সেখান থেকে অমরনাথের গুহা পর্য্যন্ত তুষারবর্ত্মের উপর দিয়ে পথ। গন্তব্যস্থলের মাইলখানেক আগে বরফের শেষ। যাত্রীরা সেই বরফগোলা জলে স্নান করতে লাগলো।

ক্লান্ত স্বামিজী পিছিয়ে পড়েছিলেন। নিবেদিতা কতকগুলো স্তুপের নীচে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দলে দলে যাত্রীগণ গুহার মধ্যে প্রবেশ করছেন। একটু দেরী হল তাঁর পৌছাতে। বললেন, তুমি এগোও, আমি স্নান করে আসছি!

নির্দ্দেশঅনুযায়ী নিবেদিতা গুহার মধ্যে ঢুকলেন। স্বামিজী চলে গেলেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল প্রবেশ পথে কখন তিনি আসবেন।

গুহাটি বিশাল। তুষারময় শিবলিঙ্গটি নিজ সিংহাসনে অরূঢ় মনে হয়। পাণ্ডা নেই, যাত্রীর কোলাহল আছে। কোন আড়ম্বর নেই, চারদিকে একটা নিরবচ্ছিন্ন পূজা পূজা ভাব।

নিবেদিতার বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি স্বামিজীকেই অনুসরণ করছিল। সর্বাঙ্গ তাঁর ভস্মাবৃত। প্রবেশ করলেন, গুহামধ্যে। সস্মিত বদনে দু'তিনবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর চোখের সামনে স্বর্গের দ্বার উদঘাটিত হয়ে গেল। তিনি শঙ্করের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করলেন। ভাবাবেশে আত্মহারা হওয়ার সম্ভাবনা দেখায় অল্পক্ষণ পরে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলেন।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত। নিবেদিতা গুহার বাইরে এলেন। বহুযাত্রী তাঁর হাতে লাল ও হলদে রংএর রাখি বেঁধে দিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একটি পাথরের উপর বসে জলযোগ শুরু করলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত নাগাসন্ন্যাসীও যোগ দিলেন।

কল্পনা করতে পারবে না।.... আজ সকালে আরও সুন্দর একটি সংবাদ পেয়েছি, স্বামিজীও তাঁর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়েছে । স্বামিজী সংবাদটি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, আমি কিন্তু এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে থাকতে পারছিনা! স্বামিজীর কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা, যদি সত্যই হয়, বুঝবো গভর্ণমেন্ট উন্মাদ— কারণ একাজে সারাদেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সেই আমি, সর্ব্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।.... আশা করা যাক, এই সকল সন্দেহের পরিবর্ত্তন করতে আমরা পারবো।'

বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কার সহজে দূর হওয়া সম্ভব নয়। নিবেদিতা আশা করেছিলেন আলাপ আলোচনা ও কাজের দ্বারা এ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির মনোভাব পরিবর্ত্তন করাতে পারবেন। তাঁর ভারতসেবার একটা প্রধান অংশই হবে, এই পার্থক্য অপনোদনের প্রচেষ্টা। বিজেতা জাতির অনমনীয় ও দম্ভপূর্ণ মনোভাব এতদিন ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। ৬ই জুন মিসেস হ্যামণ্ডকে লিখলেন :

"ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ পরস্পরকে ভালবাসবে— এটা আমার জীবনের স্বপ্ন। ইংলণ্ডের প্রতি সুবিচারের দৃষ্টি নিয়ে ভারতে গেলে আমার মনে হয়, ইংলণ্ডের সন্তানগণ নানাদিক দিয়ে সুচারুরূপে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতের সেবা করছে কিন্তু সে সেবার ধরণ এমন যে তার দ্বারা ভারতের কাছ থেকে প্রীতির সাড়া পাওয়া যেতে পারে। অপর দিকে প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতাব দাবী করেছে। ইটালী অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে, গ্রীস তুরস্কের কাছ থেকে, ভারতও ইংলণ্ডের কাছ থেকে মুক্তি চায়। ভারত মুক্তিলাভ করলে হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা ও শান্তি স্থাপন করতে পারবে। আপাততঃ ভারতের সামাজিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য রাজনীতিক শান্তি লাভের একমাত্র সম্ভাবনা, শক্তিশালী কোন তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব দ্বারা। এই তৃতীয় পক্ষের অবস্থান বহুদূরে এবং স্থানীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন।..... এ দেশের লোকের প্রতি ইংরেজের আচরণ সম্বন্ধে কথা এই যে, তা যদি নিজের চোখে দেখতে, তোমার মুখ আমার মতই লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো।...."

জাগতিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে, জগজ্জননীর অনুভূতি (স্বামিজীর) ক্রমে নিবিড়তর হতে লাগলো। শিষ্যদের বললেন, যে দিকে ফিরছি, কেবল মার রূপ দেখছি। তিনি আমার হাত ধরে ছোট শিশুর মত ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। শিব দর্শনে যে শিবময় অনুভূতির পরাকাষ্ঠা হয়েছিল, এখানেও সেই জগজ্জননীর সাক্ষাৎকারের দিব্যানুভূতির চরম পরিণতি দেখা দিল। তাঁর নৌকা, আরও নির্জ্জন স্থানে নিয়ে গেলেন। শিষ্যদের বললেন : কালী... কালী... কালী তিনি কাল, তিনি পরিবর্ত্তন, তিনিই অনন্ত শক্তি। যে হৃদয়ে ভয় নেই, সেখানেই তিনি। যেখানে ত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি মরণকে আলিঙ্গনের প্রচেষ্টা, সেখানেই মা, এই মায়ের কী রূপ!

অবশেষে সেই দিন এলো। শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে চিৎশক্তি, জগৎপ্রপঞ্চ, সে চিৎশক্তির বিকাশ, সেই দুর্জ্ঞেয় চিৎশক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন। অচিন্তনীয় সেই উচ্চ তত্ত্বের তীব্র উন্মাদনায় সমগ্র অন্তর তাঁর আলোড়িত হয়ে উঠলো। সেই তীব্র আবেগ লেখনী দ্বারা প্রকাশ করামাত্র মেঝের উপর পড়ে গেলেন। মৃত্যুরূপা কালী (Kali the Mothe) কবিতা সেই উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ।

সান্ধ্য ভ্রমণের পর নিবেদিতা সঙ্গীগণ সহ ফিরে এলেন। দেখলেন, নিজের হাতে লিখিত কবিতাটি বজরায় রেখে গেছেন স্বামিজী।

এই উপলব্ধির পর ক্ষীরভবানী যাত্রা করলেন একাকী। দেবীর সম্মুখে প্রতিদিন হোম, উপবাস করে, কুণ্ডে পায়েস ও বাদাম ভোগ নিবেদন করলেন। প্রতিদিন প্রাতে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিশু কন্যাকে উমারূপে পূজা করা, তাঁর সাধনার অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। কদিন

নিরবিচ্ছিন্ন কঠোর তপস্যা ও সাধনার দ্বারা যে অলৌকিক দর্শন লাভ করলেন, তা তাঁর কথা ও আচরণে প্রকাশ পেতে লাগলো।

৩০ শে সেপ্টেম্বর যাত্রা করেছিলেন স্বামিজী। নিবেদিতাও তাঁর সঙ্গিনীগণ তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। নিবেদিতা ও অন্যসকলে পূর্ব্বেই ক্ষীরভবানী দর্শন করে এসেছেন। তাঁদের মানসনেত্রে সেই কুন্ডের কাছে স্বামিজীর তপস্যারত চিত্র ভেসে উঠতে লাগলো।

৬ই অক্টোবর অপরাহ্নে তাঁর নৌকা দেখা গেল। স্বামিজীর হাতে একটি গাঁদাফুলের মালা— অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। নীরবে বজরায় প্রবেশ করে মালাটি সকলের মাথায় স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করলেন। শেষে মালাটি নিবেদিতার হাতে দিয়ে বললেন— এটি আমি মাকে নিবেদন করেছিলাম।

ভেতরে উপবেশন করে হাসতে হাসতে বললেন, আর হরি ওঁ নয়, এবার মা — মা! সকলে নিস্তব্ধ। অপার্থিব দিব্যভাবে ভরপুর সে স্থানটি, মুখে তাঁর প্রশান্ত পবিত্র জ্যোতি, আকৃতি যেন পাল্টে গেছে তাঁর। সকলেই বাস্তবজগতের পারে চলে গিয়েছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেও, কেউ কথা বলতে পারলেন না। স্বামিজী আবার বললেন, আমার সব প্রেম ভেসে গেছে, সব গেছে আমার : এখন কেবল মা— মা — মা!

ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন : আমার খুব অন্যায় হয়েছে। মা আমাকে বললেন, যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার প্রতিমা অপবিত্র করে— তোর তাতে কী। তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি। এরপর, স্বদেশ প্রেম বলে আমার কিছু নেই। আমি তো ক্ষুদ্র শিশু মাত্র!

বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে তিনি সস্নেহে বললেন, এখন এর বেশী আমি আর বলতে পারবো না, বলতে নিষেধ আছে।.....

জগজ্জননীর সত্ত্বায় অনুপ্রাণিত স্বমিজীর আত্মবিস্মৃতি। এই পরিবর্ত্তন তাঁর শিষ্যগণকে মুগ্ধ ও অভিভূত করলো। এক অপার্থিব ভাবারাজ্যের প্রকাশ, নিবেদিতার হৃদয়ে, এক দিব্য অনুভূতি সঞ্চারণে, নীরব উপাসনায় তাঁর অন্তরকে ব্যাকুল করে তুললো।

স্বামিজী ব্যস্ত ফেরার জন্য। ১১ই অক্টোবর সকলে বারমুল্লা যাত্রা করলেন। স্থির ছিল : সেখান থেকে লাহোর যাবেন। শিষ্যগণ স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দিল্লী, আগ্রা প্রমুখ বড় বড় শহর দেখে কলকাতায় ফিরবেন। অবশ্য লাহোরে, তাঁদের সঙ্গে তাঁর (স্বামিজীর) দেখা হল পুনরায়। সেখান থেকে ফিরে চলেছেন কলকাতায়।

১২ই অক্টোবর প্রভাতে স্বামিজীর সঙ্গে সকলে মিলিত হলেন। স্মরণীয় সে প্রভাত। তাঁর কথা শুনতে শুনতে সকলে এক অন্তরতম পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করলো। স্বামিজী গাইলেন জগন্মাতার গান। মাঝে মাঝে গাইতে লাগলেন, স্বামিজী, "শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে) ঘুড়ি লক্ষ্যের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।' (রামপ্রসাদী)

সে গানের মধ্যে শ্যামামায়ের মূর্ত্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আবৃত্তি করলেন নিজের কবিতা:
দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়;
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি, করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।"
থামলেন, একটু। বললেন, দেখেছি সব বর্ণে বর্ণে সত্য!"
পুনরায় গাইলেন : সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,

কালনৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারই কাছে আসে।

আবার থামলেন। বললেন : মা সত্যসত্যই তাঁর কাছে আসেন। আমি নিজ জীবনে এটা প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ, আমি মৃত্যুকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গণ করেছি।.... বললেন : বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কাহিনী। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পরম শত্রুতা সাধন করেছেন। কিন্তু তাঁর শতপুত্র নিধন, নিজের অপমান, ক্লেশ, সমস্তই বিস্মৃত হয়ে শত্রু বিশ্বামিত্রের প্রশংসায় মুখর।.... আমাদের প্রেম ও ঐরকম হওয়া চাই। যেমন ছিল বশিষ্ঠের বিশ্বামিত্রের প্রতি। তাতে ব্যক্তিগত ভালমন্দের স্মৃতির লেশ থাকবে না।

যে ক'ঘণ্টা নিবেদিতা, স্বামিজীর কাছে কাটালেন, তার দীপ্তি, সারা জীবন তাঁর, আলোকিত করে রাখল।

এলো বিদায়ের পালা। শিষ্যগণের কাছ থেকে যাত্রা করলেন লাহোরের পথে।....

১৩ই অক্টোবর তিনি (নিবেদিতা) তাঁর এক বান্ধবীকে লিখলেন : স্বামিজী গতকাল এখান থেকে যাত্রা করেছেন। লাহোরে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হতে পারে। আবার কলকাতা পৌছবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাও হতে পারে।

একপক্ষকাল পূর্ব্বে তিনি একাকী চলে গিয়েছিলেন। প্রায় আটদিন পরে যখন ফিরলেন, তখন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ—ঐশীভাবে অনুপ্রাণিত। সে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, বাক্যাতীত।.... জগন্মতার কোলে অবস্থিত শিশুর মত কথা, অথচ ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বর দেবোপসম প্রায়। তাঁর এই আনন্দময় ও ভাবগাম্ভীর্য্যপূর্ণ সান্নিধ্য, আমাকে নির্জ্জনতম কোণে বসে সর্ব্বক্ষণ নীরব পূজায় সমাহিত থাকার প্রেরণা যোগাচ্ছে। দেখেছি তারকার উদয়, জেনেছি তার অন্যতম তত্ত্ব। ... ভগবৎ সাক্ষাৎকারীর মত তাঁর আচরণ, চোখে এখনও দিব্যদর্শনের সেই ভাববিহ্বলতা।.... লোককল্যাণ এখন, তাঁর কাছে ভয়াবহ চিন্তা। স্বদেশপ্রেম ভ্রম মাত্র, সমস্তই ভ্রম। .... ফিরে আসার পর বললেন, যা কিছু দেখছি সবই মা। সকলই ভাল, কেবল আমাদের গ্রহণের অক্ষমতা। শিক্ষা—শিক্ষা না শিক্ষা দিতে আমি যাচ্ছি না, অন্যকে শিক্ষা দেবার আমি কে? .... মৌন তপস্যা ও জপারতি এই মুহূর্ত্তে জীবনের মূলমন্ত্র। জ্ঞাতসারে, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত জগন্মাতার সঙ্গে অতিবাহিত করতে না পারাটা চরম অপব্যয়।

এই মধুর গ্রীষ্মকালের দিকে যখন ফিরে তাকাই, আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, কী করে আমি সেই দুর্লভ শীর্ষরাজ্যে পৌঁছলাম। এই কয়েক মাস— এই বিরাট ধর্ম্মাদর্শের ভাস্বরলোকে বাস করছি, নিঃশ্বাস গ্রহণ করছি। এই সকল দিনে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরই ছিলেন অধিকতর প্রত্যক্ষ। গতকাল প্রভাতে, শেষ কয় ঘণ্টা যখন তিন জগন্মাতার উদ্দেশ্যে গান করছিলেন। আমি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রেখেছিলাম।.... এখন সবটাই তাঁর প্রেমপূর্ণ। তিনি বললেন, স্বামিজী আর নেই, চিরদিনের মত চলে গেছে!....

১৮ই অক্টোবর স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দিল্লী, আগ্রা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করতে গেলেন। পরিকল্পিত শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করায় আর কোন বাধা না থাকায়, একা কাশী হয়ে ১লা নভেম্বর কলকাতায় ফিরে এলেন নিবেদিতা। স্বামিজী তখন রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করছেন। হাওড়া ষ্টেশন থেকে উত্তর কলকাতার নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উঠলেন।

হিন্দু নারীদের মধ্যে কাজ, হিন্দু জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিতির একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমা তখন কলকাতায় আছেন। নিবেদিতা তাঁর কাছে বাসের অভিলাষ প্রকাশ করলেন। শ্রীমা তখন ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে বাস করছিলেন। সেই ব্যবস্থা করলেন স্বামিজী। বাড়ীতে ঢোকার পথে দুটি ঘর। একটিতে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যোগানন্দ বাস করছিলেন। অপরটিতে নিবেদিতার থাকার

ব্যবস্থা হল। শ্রীমা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরে যখন জানলেন, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য স্বগ্রামে তাঁকে শাস্তি পেতে হবে, অনুশোচনার অন্ত রইলো না। তাঁর ধারণা ছিল— জাতিভেদ-অজ্ঞতা প্রসূত কুসংস্কার, তাছাড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তখনও ঘটেনি। অথচ শ্রীমা রক্ষণশীলা হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা, পারিপার্শ্বিক গণ্ডীকে অতিক্রম করার মানসিক শক্তিও তাঁর বিপুল। তিনি সাদরেই নিজের আলয়ে স্থান দিলেন তাঁকে।

কয়েক দিনের মধ্যে নিবেদিতা সে পরিবেশে বাস করে উপলব্ধির করলেন, এটি শ্রীমার সমাজবিরোধী কাজ। পল্লীর মেয়ে তিনি, আত্মীয় স্বজনের উপরেও পীড়ন চলবে সেই সুদূর পল্লীগ্রামে।

তিনি (শ্রীমা) কলকাতায় এলে, বাগবাজার পল্লীতেই বাস করতেন। স্বামিজীরও ইচ্ছা তাঁর বাসস্থানের কাছাকাছি নিবেদিতার বিদ্যালয় স্থাপিত হোক। যদিও সেটি রক্ষণশীল পল্লী, তথাপি তাঁর (স্বামিজীর) প্রভাবে সবই সম্ভব হল। ১৬ নং বাড়ীটি ভাড়া পাওয়া গেল। হিন্দু নারীগণ অতিমাত্রায় রক্ষণশীলা, বিদেশীর, স্পর্শ, সযত্নে পরিহার করাই ছিল, সেদিনের চিরন্তনী পরিবেশ। অথচ তিনি ছিলেন পরিচিত সকলের। তাঁর কাজে, গুণে, কে মুগ্ধ নয়! তাঁরা তাঁকে সেদিন অভ্যর্থনা জানান নি, দূরেও সরিয়ে রাখেনি, তিনি (নিবেদিতা) নিজেই নিজেকে তুলে ধরেছিলেন তাঁদেরই পরমাত্মীয়া রূপে। আট দশদিন পরে, তিনি উঠে গেলেন নোতুন বাড়ীতে। যদিও সেটি স্বতন্ত্র, তথাপি প্রতিটি অপরাহ্নে তিনি শ্রীমার কাছে কাটাতে লাগলেন। গ্রীষ্ম তখন, তিনি (শ্রীমা) তাঁর নিজের কক্ষে নিবেদিতার বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। আসবাব শূন্য ঠাণ্ডা ঘর, পালিশ করা মেঝে, উপরে সারি সারি বিছানো মাদুর। তার উপর এক একটি বালিশ ও মশারী। উপরতলা থেকে গঙ্গা দর্শনের পরিপূর্ণ অবকাশ। শ্রীমার কাছে থাকতেন, গোপালের মা, যোগীন মা, ও লক্ষ্মী দিদি। সকলেই বিধবা। গোপালের মা, নিবেদিতা ও স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে প্রথম দর্শনেই স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টানের সঙ্গে এক গৃহে অবস্থান, আশী বছরের বৃদ্ধার সে সংস্কারে আঘাত লাগলেও ঐ দ্বিধা ভাবটি অতিক্রম করে, স্নেহ ও বৎসলে নিবেদিতাকে ভরিয়ে রাখলেন। শত শত বক্তৃতায় যা সম্ভব নয়, আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতায়, ঐক্যানুভূতির প্রাবল্যে সব সংস্কার তলিয়ে গেল। নরেনের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসা। নরেনের মেয়ে সেই নিবেদিতা, তিনি একান্ত স্নেহের পাত্রী! শেষ জীবনটা তিনি, তাঁর কাছেই কাটিয়ে গেলেন।

এঁদের কাছে অবস্থানকালে গভীর অভিনিবেশ সহাকারে, ভারতীয় জীবন যাত্রা অনুসরণ করতে সক্ষম হলেন নিবেদিতা। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মার্থ উপলব্ধির অবকাশ পেলেন। শ্রীমার ঘর, সত্যই শান্তি ও মাধুর্য্যের নিলয়।

সূর্য্য ওঠার আগে শয্যাত্যাগ। জপের মালা হাতে দেওয়ালের দিকে মুখ করে জপমগ্ন সকলে। প্রথম প্রথম এঁদের লক্ষ্য করে বিস্মিত হতেন, কেমন সচ্ছন্দে ধীর স্থির হয়ে দীর্ঘকাল বসে আছেন। সূর্য্য উঠলো, ঘরে কাজ সুরু হয়ে গেল। একটু বেলা বাড়লো, শ্রীমা নিজের ঘরে শ্রীঠাকুরের পূজায় বসলেন— সকলেই তখন তাঁকে নানাভাবে সাহায্যে এগিয়ে এলেন। দীপজ্বালা, ধুনা দেওয়া, পুষ্পনৈবেদ্য সাজানো, সকল কাজেই গভীর সে নিষ্ঠা। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিশ্রাম কিছুক্ষণ। গল্প গুজব। লক্ষীদিদি স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে বিভিন্ন দেবীর মূর্ত্তির নকল ও নানাপ্রকার পালার অভিনয় দেখিয়ে, সকলকে আনন্দদান করছেন। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হাস্য পরিহাস। ঘরে ঘরে দেখানো শুরু প্রদীপ শিখা। ভক্তিভরে সকলের ঠাকুরঘরে প্রণাম। শ্রীমা, গোপালের মার পাদবন্দনায় রত সকলে। এরপরই জপ। শ্রীমার পাশে বসার সৌভাগ্যলাভে সকলেই ধন্য!

নিবেদিতা হিন্দুজীবনযাত্রার প্রকৃতি, চিত্র, ও তার মর্ম্ম উপলব্ধির অবকাশ, শ্রীমার সাহচর্য্যেই গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন। তার চোখেও উপলব্ধি হল শ্রীমার সান্নিধ্যের মূল্য। প্রথম দিনেই ধরা

পড়েছিল, শ্রীমার সঙ্গে অন্য মহিলার পার্থক্য। তাঁকে ঘিরে আছে অনাড়ম্বর অপার্থিব ভাব, যার সান্নিধ্যে বিদূরিত হয় ক্লান্তি, উপশম হয় দুঃখ ও বেদনা। আলমোড়ায় তাঁর শ্রীমার কথা প্রতিদিনই মনে পড়তো। এসময়ে এক বন্ধুকে শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের বিবরণ দিলেন:

'শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিনীর নাম সারদা। একজন হিন্দু বিধবার মত তাঁর শুভ্র পরিচ্ছদ। শাড়ীটি সারা দেহ পরিবেষ্টন করে মাথা পর্য্যন্ত উঠে গেছে। যেন পাশ্চাত্য দেশের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন। তাঁকে ভাল করে জানলে, বোঝা যায়, তাঁর মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি, তৎপরতার চমৎকার প্রকাশ। মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি যেন। শান্ত, নম্র, স্নেহপ্রবন ছোট মেয়েদের মত, সদাই উৎফুল্ল। রক্ষণশীলা কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীগণকে দেখামাত্র, সে রক্ষণশীলতা তাঁর ধুয়ে মুছে যায়। আমাদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে আহার করলেন। আশ্চর্য্য তাঁর ব্যবহার। তিনি দান করলেন, আমাদের মর্য্যাদা, সহজ করে দিলেন ভবিষ্যৎ কাজের সম্ভাবনাকে।..... যখন কলকাতায় থাকেন চোদ্দ পনেরো জন উচ্চবর্ণের মহিলা তাঁর পরিচর্য্যা করেন। অপূর্ব্ব কৌশলে ও ভালবাসায় তাদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখেন। সত্যই, শক্তিরূপিনী ও মহানুভবা রমনীগণের অন্যতমা তিনি। বাইরে তিনি একান্ত সরল ও অকপট।

স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল নিবেদিতা শ্রীমার আশ্রয়ে তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়ে, আত্মোন্নতির পথে ও কর্ম্মজীবনে অগ্রসর হতে পারেন। সে উদ্দেশ্যেই বাগবাজারে কর্ম্মকেন্দ্র নির্ব্বাচন।

১৬নং নম্বরের বাড়ীটি ছিল, সেকেলে ধরনের। এবাড়ীটির বর্ণনায় নিবেদিতা রচনায় ভাবোচ্ছ্বাসের অধিক্য! খুবই স্বাভাবিক তা। এই বাড়ী তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। তাকে ভালবাসাই স্বাভাবিক। চোখে তাঁর নবানুরাগের অঞ্জন, অতিতুচ্ছ বস্তুও তাঁর কাছে মাধুর্য্যময়। ১৮৯৮ থেকে ৯৯ এর জুন পর্য্যন্ত এক বিচিত্র জগতে তাঁর বাস। স্বামিজীর সান্নিধ্যে অবস্থান, সকলকিছুতেই বড় করে তুলতো ও জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠতো ও সকল বস্তুকেই ভালবাসতে শিখাতেন। ফলে, দোষ ত্রুটির কালিমা দূর হয়ে জীবনের সম্যক বিকাশের জন্য উন্মুখ করে তুলতো। প্রতিপদে স্বামিজীর ভাবরাজি তাঁকে পরিবৃত ও স্বদেশ প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত দিব্যলোকের এক স্নিগ্ধজ্যোতি মধ্যে বিচরণ করাতো— এটা নিবেদিতার নিজস্ব উপলব্ধি এবং সে স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

কলকাতার উত্তর প্রান্তে একটি পুরাতন পল্লী বাগবাজার। বোসপাড়া লেন সেই অঞ্চলে অবস্থিত। রামকান্ত বসুস্ট্রীট থেকে বেরিয়ে উত্তরে গিয়ে তিনভাগে বিভক্ত। একটা অংশ চলে গেছে পশ্চিম দিকে, পূর্ব্ব দিকে, কাঁটাপুকুর লেন আর প্রধান রাস্তাটি সোজা বাগবাজারে পড়েছে। পশ্চিম দিকে ঘুরে, ঠিক তার মোড়ে একটুকরো খালি জমি। এই জমির এক অংশ ১৭ নম্বর। এই বাড়ীতে দ্বিতীয়বার এসে, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বাস করেছিলেন। অপর পাশের বাঁদিকে ১৬ নং বাড়ী। এখান থেকে কয়েকটি বাড়ীর পরেই গিরিশচন্দ্রের (ঘোষের) বাড়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ এ বাড়ীতে বহুবার এসেছিলেন। ১৬ নম্বর বাড়ীর অপর দিকে কাছেই শ্রীমা থাকতেন। এখনও এ বাড়িটি অক্ষত। এখানে জীবনযাত্রা ছিল ধীর, শান্ত। বিরাজ করতো একটা সুসম ছন্দ। ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাই ছিল এর মূল সুর। পল্লীর পশ্চিমদিক দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা। এঁর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী সকল ভারতবাসী। এঁর তীরে বসবাস, জীবনকে পবিত্র ও ধন্য বলে মেনে নেয় সবাই। গঙ্গাস্নানে দিনের আরম্ভ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পুরনারীদের স্নান শেষে, ফিরবার পথে প্রতিটি মন্দিরের সামনে কখনও ভূমিষ্ঠ হয়ে, কখনও বা করজোড়ে প্রণাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে কাজ শুরু। জেগে ওঠে পল্লী, জেগে ওঠে শহর, কর্ম্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। নেই বেশভূষার পরিপাট্য।·আলোচ্য হিন্দুশাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব থেকে শেকস্পীয়র, শেলী কোন কিছু বাদ নেই। সম্বলহীন ভিক্ষায় যাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়

সেই ছিন্নবস্ত্র ভিখারীর দলও উঠানে দাঁড়িয়ে খঞ্জনী বাজায়, হরি নাম করে। একমুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্ত্তে গৃহস্থকে ঈশ্বরের নাম শুনিয়ে, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে কথা। এলো মধ্যাহ্ন, প্রধান কাজ শেষ হল অন্তঃপুরবাসীগণের। বিশ্রাম নিয়ে, এলো অপরাহ্ন। বেলা গড়িয়ে এলো, ছাদে বা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চলে পরস্পরের কথাবার্ত্তা। বইখাতা হাতে, ঘরে ফিরে আসে ছোট ছেলেমেয়ের দল। মুখরিত প্রতিটি ওলি গলি পথ। ঢলে পড়ে সূর্য্য, পশ্চিম দিক, সেই লালের আভায় রক্তিম হয়ে ওঠে। গঙ্গার তরঙ্গে, তরঙ্গে তার প্রতিচ্ছায়া ভেসে বেড়ায় অপূর্ব্ব সে দৃশ্য। নামে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া, ঘরে ঘরে জ্বলে আলো, ভেসে আসে শঙ্খ নিনাদ। গৃহদেবতার সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানাচ্ছে গৃহবাসী তথা সারাটা শহর। আঁধার ঘন রূপ নিল, সঙ্গে সঙ্গে মঠ, মন্দির ও গৃহকোণ থেকে বেজে উঠলো কাঁসর ঘণ্টার মিলিত আধাধনা সঙ্গীত। ক্রমে থিতিয়ে এলো, সে মধুর সেই সুরধ্বনি.... বিরাজিত ধীর, স্থির, শান্ত ভাব। নিঃশব্দে ধ্যানে বসলো সকলে শ্রীমার বাড়ীতে। এটা যেন শান্তির লগ্ন। মনে সঞ্চার করে প্রশান্তির ভাব। ছাদের উপর একাকী বসে তন্ময় হয়ে পড়েন নিবেদিতা। চারদিক নিস্তবদ্ধ। শুক্লপক্ষে চন্দ্রালোকে শুভ্রারজনী, কৃষ্ণপক্ষে নিবিড় অন্ধকারের মাঝে নক্ষত্র, মেঘের ঝিলিকি, নিঃশব্দ মেটারলিঙ্কের ভাষায় মহৎ সৃষ্টিগর্ভ নীরবতা।

বাড়ী জুটেছে, কিন্তু মিলছেনা পরিচারিকা। বিদেশী মহিলার কাছে কাজ। তার উপর জাতে খ্রীষ্টান। অবশেষে মিললো এক ভদ্রমহিলা। সকৌতুকে জানালেন এক বন্ধুকে : অবশেষে পরিচারিকা পাওয়া গেছে। বেশবৃদ্ধা, বয়সে আমার দ্বিগুণ। আমায় ডাকে মা, আমি তাকে ডাকি 'ঝি' বলে। ঝি অর্থে মেয়ে (চলতি কথায় প্রকৃত অর্থ কন্যা)।

বয়সে বৃদ্ধা— কিন্তু কাজে খুব দড়। জলঢেলে ঘরগুলো ধুয়ে মুছে দিল। গরমজলে চেয়ার, টেবিলও সব ধুয়ে বিশুদ্ধিকরণ করলো (পবিত্র হয়ে গেল)। এবার এলো শর্তপালনের নির্দ্দেশ। নিবেদিতার রান্নাঘরে ঢুকবেন না, উনুন ও জল ছোঁবেন না। ছ পয়সা নিয়ে বাজারে চলে গেল। ফিরে এলো, সঙ্গে খান কয়েক টালি, একতাল মাটি, কয়েকটা লোহার শিক। তৈরী হয়ে গেল উনুন। গৃহস্থালীর সব ব্যবস্থা পূর্ণ।

বৈকালে চা তৈরী করলেন নিবেদিতা। ঝি (তাঁর কন্যা) বারান্দায় বসে সে অদ্ভুত ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। চা ঢেলে নিয়ে, এবার একটু গরম জল চাইলেন, গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করে নিমিষে উঠানে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে ভিজে কাপড়, ভিজে মাথায়, চায়ের পাত্রটি তুলে নিয়ে চলে গেল। পরে ধাতস্থ হয়ে, নিজেই নিবেদিতস্পৃষ্ট পাত্রগুলি ধুয়ে দিতে সুরু করলো। তবে অন্য মেমসাহেব এলে, সে কাজ করতে হয় আমাকেই, নিজের হাতে। ধীরে ধীরে সব সহ্য হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম আহারে, বিহারে, স্পর্শে, তাদের এই ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছি, মনোবেদনাও পেয়েছি কিন্তু মনের কোণে কোন দাগ কাটতে পারেনি।...

বোসপাড়ায় নিবেদিতার দিন আনন্দের মধ্যে দিয়েই কাটতে লাগলো। ছোটোবেলায় ইহুদি ধর্ম্মযাজক ও হিন্দুগণের দৈনন্দিন জীবন যাপন সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি শুনেছিলেন তার মধ্যে ছিল বীভৎস চিত্রের কল্পনা, তার সঙ্গে বাস্তব চিত্রের কি বিরাট পার্থক্য!

কয়েকটি আধুনিক চিত্র, পাশে সাজানো বই, সেটি তাঁর পাঠকক্ষ। এখানে বসে প্রতিবেশীদের দেখতে ভালবাসতেন। আর এই কক্ষটিও ছিল প্রতিবেশীদের কুতূহলের বস্তু। তিনি দেখতেন, লোকের আনাগোনা। পড়ার ফাঁকে, ফাঁকে কখনও দেখছেন শিশু চলেছে মা বা ঝিয়ের কোলে চেপে। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোমরে গোট, চোখে কাজল, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাদের। কখনও দেখছেন কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিনী চলেছেন স্নানে, তারাও তাঁর ঘরের দিকে চকিত

দৃষ্টিপাত করে চলেছেন সমুখপানে। কখনও বা চোখাচোখী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে দৃষ্টিতে থাকছে সম্ভ্রমের কৌতূহলের চিহ্ন, সেখানেও মাধুর্য্যভরা। কখনও দেখছেন, চলেছেন, ধীর, স্থির ও শান্ত দৃষ্টিতে কোন প্রৌঢ়ব্যক্তি। মুখখানা প্রশান্ত উজ্জ্বল প্রখর বুদ্ধির আভাষ। অদূরে পুকুর, পরিষ্কার জল, চারদিকে নারকেল গাছ ছায়া পড়েছে জলে। জানলার পাশে নানা জাতের পাখী, কলকণ্ঠে মুখর তারা। তাদের ছায়া কখনও কখনও লেখার কাগজের উপর এসে পড়েছে। মনে জাগে নোতুন অনুভূতি, আবেগ টলমল করে মন, সবই আনন্দে ভরপুর, সত্যই নবজন্ম তাঁর!

কলকাতায় ফেরার পূর্ব্বে নবজীবন সুরু। মানসিক সংঘাতের অবসান। লাভ করেছেন মানসিক স্থৈর্য্য। স্বামিজী বুঝলেন, এবার নিবেদিতার কাজের সময় এসেছে। নিবেদিতার সমগ্র সত্ত্বার রূপান্তর ঘটে গেছে। এখন তিনি মনে প্রাণে বিবেকানন্দের কন্যা ও শিষ্যা। তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেছেন অন্তরে।

কর্ম্ম সম্বন্ধে নোতুন ধারণা দিলেন স্বামিজী : কারও ভাল করতে যাওয়া বা অন্য যে কোন কাজের গূঢ় উদ্দেশ্য "আত্মকল্যাণ সাধন"। কর্ম্ম একটি উপায়, লক্ষ্য নয়।

সেই কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যই আত্মনিবেদন। স্বামিজী তাঁকে শিক্ষা কাজে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতাও চিন্তা করেছেন কিন্তু প্রকাশ্যে আলোচনার সুযোগ হয়নি। ২৪শে জুলাই বেরীনাগ বনের মধ্যে যেদিন তাঁবু পড়লো, সেই গভীর অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটি গাছের তলায় বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের পাশে শিষ্যগণসহ অবস্থান কালে, নিবেদিতাকে লক্ষ্য করে বললেন : কই তুমি তো তোমার স্কুল সম্বন্ধে কোন কথা বললে না? তুমি কি মাঝে মাঝে সে কথা ভুলে যাও? বিস্মিত হলেন নিবেদিতা। এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে কোন উৎসাহ পান নি, এ বিষয়ে তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট মতামতও প্রকাশ করেন নি তবে তিনি উদাসীন ছিলেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখেছিলেন : কলকাতায় যেমন করে হোক নিবেদিতাকে বালিকা বিদ্যালয় খাড়া করে দিতে হবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন : দেখ আমার চিন্তার বহু জিনিষ আছে। একদিন মাদ্রাজের দিকে মন দিই, সেখানের কাজের কথা ভাবি। একদিন আমেরিকা, ইংলণ্ড, সিংহল বা কলকাতায় থাকে। এখন তোমার বিদ্যালয়ের কথা ভাবছি!

শিক্ষাবিদ নিবেদিতার মনে কার্য্যপ্রনালীর একটা ধারণা ছিল। শিক্ষার্থীর বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর, শিক্ষার ভিত্ত স্থাপন করা হবে, যাতে তা ভারতীয় নারীসমাজের উপযোগী ও ব্যবস্থাকারী হয়। স্বামিজীর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হল। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে, তাঁর নিজের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জ্জন, বিশেষ করে ভারতীয় নারী সমাজ সম্বন্ধে।

জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামিজী এখন বিদ্যালয় সম্বন্ধে কি ভাবছ?

উত্তরে নিবেদিতা জানালেন, আমার কোন সহকারী থাকেন এটা আমি চাই না। সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ হবে, ছোট ছেলেমেয়ে যেমন করে প্রথম পাঠ শেখে, ঠিক তেমনি, ক্রমে নিজের প্রণালী ঠিক করে নেবো। আমার ইচ্ছা এই শিক্ষার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটা ধর্ম্মাভাব থাকা উচিত। কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষ উপযোগী।

সব কথা মন দিয়ে শুনলেন স্বামিজী। শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্ম্মভাব, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাকে প্রাধান্য দেবার কথা শুনে জানতে চাইলেন, উৎসাহ বজায় রাখার জন্যই কি এই সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রয়োজন? অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের বাইরে, যার জন্যই কি একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চাও? মনে হয় তোমার কথার মর্ম্মার্থ বোধ, অমি সঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছি।

একজন মহিলা একাজে নিবেদিতাকে সাহায্য করতে চাইলেও নিবেদিতার ইতস্ততঃ ভাব তাঁকে সংযত করে তুললেন। এ দেশে পা দেওয়ার পর বেশ কয়েকজন ব্রাহ্ম মহিলার সঙ্গে

নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল— তাঁরাও নিবেদিতাকে এ কাজে সাহায্য করতে উৎসুক ছিলেন কিন্তু স্বামিজী সম্মতি দিলেন না। তাঁর ইচ্ছা নিবেদিতা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্তা হয়ে, কল্যাণকর কাজে নিজেই আত্মনিয়োগ করুক, নইলে ব্রাহ্মসমাজের সহযোগিতায় সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। এখনও ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়নি, সুতরাং সাহায্য নেওয়া অর্থ, ভুলের সম্ভবনা বেশী, আলোচনা চলল উভয়ের মধ্যে। নিবেদিতা বললেন, আপনি আমার সমগ্র বিষয়টি চিন্তা করে সমালোচনা করুন। রাজী হলেন না স্বামিজী। বললেন, সমালোচনা অসম্ভব। কারণ আমার ধারণা, তুমি আমার মতই ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। অন্যান্য ধর্ম্মবলাম্বিগণের বিশ্বাস, ধর্ম্মের সংস্থাপকগণই সকলেই ঐশীশক্তি দ্বারা পরিচালিত, আমাদের বিশ্বাসও তাই। তুমি আমার মতই অনুপ্রাণিত। তোমার পরে, তোমার মেয়েরা ও তাদের মেয়েরাও সেইরকম হবে। এক্ষেত্রে তুমি যা সবচেয়ে ভাল বিবেচনা করেছ সেই কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

স্বামিজীর শরীরে ভাঙন সুরু হয়েছে। আজকাল প্রায়ই অসুস্থতা বোধ করছেন। বেদান্ত প্রচারের জন্য ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পুনরায় পাশ্চাত্য গমনের কথা চলছিল। নিবেদিতা ভারতে থেকে তাঁর কাজ করবেন। নারীগণের উন্নতি চাই। দেশের প্রাণবিন্দু তারা। তারা না জাগলে, তাদের মানসিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে, দেশ জাগে না। মনের সেই উন্নতিব কাজের ভার, দিতে চান নিবেদিতার উপরে। মনের বাসনা ধীরামাতা (মিসেস ওলি বুল) ও জয়া (মিস ম্যাকলাউড) কথাচ্ছলে জানাতে লাগলেন বারবার। নিবেদিতাকে বললেন : পুরুষদের উপর যে দায়িত্ব, তার চেয়ে তোমার দায়িত্ব বহুগুণ বেশী। তোমার বিশ্বাস আছে, মার্গট, তার সঙ্গে চাই, জ্বলন্ত উৎসাহ। সেটা তোমার চাই। তোমাকে 'দগ্ধে ধনমিবানলম্' হতে হবে। শিব, শিব মহাদেবের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন স্বামিজী।

অমরনাথ থেকে ফিরে এলেন। ১০ই আগষ্ট সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে ফেরার পথে ভাবী স্ত্রী শিক্ষা কাজের বিষয়ে তাঁর নিজের অভিপ্রায় কি, বিষদরূপে আলোচনা করলেন। অভিমত প্রকাশ করলেন: সেই শিক্ষার প্রয়োজন, যার মধ্যে স্বদেশ ও ধর্ম্মের সমন্বয় ঘটে। হিন্দুধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় না থেকে সক্রিয় এবং অপরের উপর প্রভাবশালী হোক, সেই সঙ্গে দূর করতে হবে সকলরকম ছুঁৎ-মার্গকে। কর্ম্মকুশলতার অভাব এদেশে সত্য — কিন্তু তার জন্য প্রাচীন চিন্তাশীল জীবন, সে কখনও ত্যাগ না করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : সমুদ্রের মত গভীর ও আকাশের মত উদার হওয়াই আদর্শ।

বিদ্যালয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ ছিল নিবেদিতার। সাগ্রহে প্রকাশ করলেন মনের কথা। সব শুনে স্বামিজী বললেন : আমার নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের দ্বারা পরিচালিত সত্য কিন্তু এটা অপরের পক্ষে তা কতদূর প্রযোজ্য হতে পারে তা তারা নিজেরাই বুঝবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি একজনের মধ্য দিয়ে জাগরিত হয় না!....

কলকাতায় ফেরার পরেই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ চলতে লাগলো। স্বামিজীর নির্দ্দেশে, নিবেদিতা ব্রহ্মানন্দের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করলেন। ১২ই নভেম্বর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হল। সেদিন সকালে শ্রীমা মঠের নোতুন জমিতে নিজে শ্রীঠাকুরের পূজা করলেন। স্বামিজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এই উপলক্ষ্যে বলরাম মন্দির থেকে মঠে এলেন। বিকালে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আহুত সভায় যোগ দিতে কলকাতায় ফিরে এলেন।

নিবেদিতা ওই অধিবেশনে সভানেত্রীত্বের অধিকারী হলেন। ৫৭নং রামাকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরামবাবুর বাড়ীতে, (বলরাম বসু) সাধারণতঃ মিশনের অধিবেশনে বসে থাকে। এ সভাও এই বাসভবনের সামনের দোতালার বড় হল ঘরে অনুষ্ঠিত হল। স্থির হল, বাগবাজার পল্লীতেই বালিকা বিদ্যালয় খুলবেন, ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। সেই সঙ্গে আবেদন করলেন, সকলে তাঁদের মেয়েদের যেন পাঠান এই স্কুলে। ঠিক সেই সময়ে সকলের পিছনে এসে বসলেন স্বামিজী। পাশে ছিলেন মাষ্টার মশায়, সুরেশ দত্ত, হরমোন বাসু প্রভৃতি। স্বামিজী হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে গুঁতো দিয়ে বললেন "ওঠ, ওঠ, ওঠ না! মেয়ের বাবা হলেই তো হবে না, জাতীয়ভাবে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগিতা তোদের সবাইকেতো করতে হবে। উঠে বল, আবেদনের প্রত্যুত্তর দে! বল, হ্যাঁ রাজী আছি, আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব।'

সে সাহস কারও হল না। সংস্কার ও জড়তায় সবাই নিস্পন্দ। শেষে, স্বামিজী হরমোহন বাবুকে চাপা গলায় বললেন, তোকে দিতেই হবে। তাঁর হয়ে স্বামিজী নিজেই বললেন— Yes, Miss Noble, this gentleman offers his girl to you.

নিবেদিতা— লক্ষ্য করেন নি, স্বামিজী সেই ভীড়ের মধ্যে বসে আছেন। তাঁকে দেখে, তাঁর উৎসাহবাণী শুনে খুশী হলেন। হাত তালি দিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচতে লাগলেন ঠিক একটি ছোট মেয়ের মত।

পরের দিন রবিবার। কালীপূজার দিন। শ্রীমা নিজে এসে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করলেন।

দ্বারে মঙ্গলঘট বসানো— নিবেদিতা শ্রীমার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় অধীর ভাবে দাঁড়িয়ে। শ্রীমা, গোপাল মা ও যোগীন মার সঙ্গে উপস্থিত হলেন। বলরাম বসুর বাড়ী থেকে স্বামিজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেন। শ্রীমা প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা আরম্ভ করলেন, সমাপন শেষে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীর কণ্ঠে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যেই আশীর্ব্বাদ করলেন : আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন, আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।

গোপালের মা স্পষ্ট করে তাঁর কথাগুলি সকলকে শুনিয়ে দিলেন। স্বামিজীর সঙ্কল্পিত একটি মহৎ কাজের উদ্বোধন হল। আর নিবেদিতা আনন্দে শিহরিত ও পুলকিত : ভবিষ্যতের শিক্ষিত হিন্দু নারী, জাতির পক্ষে শ্রীমায়ের এই আশীর্ব্বাদ, মহত্তর শুভ লক্ষণের শুভ বার্ত্তা চিরদিন বহন করে চলবে।

১৪ই নভেম্বর সোমবার বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হল। পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে পড়তে এলো। স্বামিজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দ সে শুভ কাজের সূচনায় উপস্থিত রইলেন। কাজের জন্য একটি মেয়ে (ঝি) রাখা হল। তার কাজ হল প্রতি বাড়ী থেকে এই মেয়েগুলিকে নিয়ে আসা ও পৌঁছে দিয়ে আসা। নভেম্বরের মাঝামাঝি মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড, কয়েকদিন বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার সঙ্গে অবস্থান করলেন। এই সময়েই মিসেস বুল শ্রীমার ফটো তোলার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীমা অত্যন্ত লজ্জাশীলা, তার উপর পীড়িত স্বামী যোগানন্দের অবস্থা খুবই শোচনীয় চলছিল। মন মোটেই ভাল ছিল না। তাঁর একান্ত শিষ্য, স্বামী যোগানন্দ। ফটো তুলতে রাজী হলেন না শ্রীমা। মিসেস বুল বিশেষ অনুনয় করে ধরলেন। বললেন : আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করবো।

তাঁর আন্তরিক কামনা ও অনুরোধে সম্মতি দিলেন তিনি। একজন ইংরেজ ফটোগ্রাফার এলেন। নাম তার হ্যারিংটন। মিসেস বুল পশুর চর্ম্মের আসনে শ্রীমাকে বসিয়ে মাথার কাপড় ও চুল ঠিক করেদিলেন। সামনে কয়েকটি টবও রাখলেন। কিন্তু ফটো গ্রাফারের সামনে বসতে লজ্জাবোধ করলেন তিনি। তাঁকে বলা হল ক্যামেরার দিকে তাকাতে। লজ্জায় কিছুতেই তাকাতে চান না। দৃষ্টি নত করে বসে থাকেন ও ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে ক্যামেরাম্যান প্রথম ছবিটি তুললেন। এটিই তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের প্রথম ফটো 'নতদৃষ্টি চিত্র ও পা ঢাকা'' মিসেস ওলি বুল আবার অনুনয় করলেন তাঁর পায়ে অঞ্জলি দেবেন, আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে এটি পূজা করবেন সুতরাং আরেকবার ছবি তুলতে হবে তাঁকে। ক্যামেরাম্যান প্রস্তুত। শ্রীমা প্রশ্ন করলেন শেষ হয়েছে কি? সেই মুহূর্ত্তেই ফটো উঠে গেলো, সকলের পরিচিত এই ফটোটি। এরপর ছবি তোলা হল আরও একটি। শ্রীমা ও নিবেদিতার ছবি উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রীমার স্নেহবিচ্ছুরিত সে দৃষ্টি আর নিবেদিতার চোখে তাঁর প্রতি অপার ভালবাসা ও শ্রদ্ধার আনন্দ-ছটা।

৯ই ডিসেম্বর যথারীতি পূজাপাঠের পর বেলুড়ে নোতুন মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। স্বামিজী ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। ১৯শে ডিসেম্বর বৈদ্যনাথ যাত্রা করলেন। ফিরে এলেন ২রা জানুয়ারী ১৮৯৯। মঠ নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ী থেকে বেলুড়ে স্থানান্তরিত হল।

নোতুন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে আদর্শবাদী ও নিষ্ঠাচারীর কাজ বাকী। 'যাদের তিনি ''আত্মনো মোক্ষার্থং'' নয় 'জগদ্ধিতায় চ' ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন, গুহায় বসে ধ্যান ধারণার পরিবর্ত্তে, তাদের 'শিবজ্ঞানে জীব সেবায়' নিযুক্ত থাকতে হবে,' এই মন্ত্রপূত করার শিক্ষা ও দীক্ষার কাজে ব্রতী হলেন। সাধন ভজন ও শাস্ত্রপাঠে আধ্যাত্মিক-উন্নত জীবনের সঙ্গে নানা বিদ্যায় যাতে পারদর্শী ও বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নে, শরীরচর্চ্চায় ও কায়িক পরিশ্রমে যথার্থ স্বদেশ হিতৈষীরূপে প্রতিভাত হন তারা, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন। যে, যে বিষয়ে পারদর্শী হতে চায়, সেই বিষয়ে তাদের নিযুক্ত করে উৎসাহ দিতে লাগলেন। পরামর্শ দিতে লাগলেন। তাঁর কাছে, এটাই ছিল চরিত্র গঠনের অন্যতম পথ।

নিবেদিতা শুধু শিক্ষয়ত্রী নন, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞা ও উৎসাহী। স্বামিজী, তাঁকে নবদীক্ষিতগণের ঐহিক শিক্ষকতায় নিযুক্ত করলেন। প্রতি বুধবার উদ্ভিদবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা ও প্রতি শুক্রবার শারীরবৃত্ত এবং সূচীশিল্প শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। পাঠ শেষ হলে স্বামিজীর ঘরে বসে চা খেয়ে নিজের বিদ্যালয়ে ফিরে আসতেন। এ ছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজে 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এখানে শিক্ষিত ব্রাহ্ম মহিলারাও উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কেশব সেনের দুই মেয়ে সুনীতা ও সুচারু দেবী, রবীন্দ্রনাথের ভাইজি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, ভারতী সম্পাদিকা সরলা ঘোষাল, জগদীশ চন্দ্র বসুর বোন লাবণ্যপ্রভা বসু ইত্যাদি। শনিবার সকালে চালু করলেন ব্রাহ্ম মহিলাদের জন্য 'শিক্ষক-শিক্ষণ' ক্লাস। এছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর আমেরিকান মিশনারী স্কুলে এক ঘণ্টা করে ইতিহাসের ক্লাশ নিতে শুরু করলেন।

একপাশে চললো অধ্যাপনার কাজ, সেই সঙ্গে চললো অধ্যয়নও। বাংলা ভাষা মোটামুটি পড়তেও বলতে শিখলেন। (শুদ্ধভাষায়)।

বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশন বসতো। মাঝে মাঝে জনসাধারণের জন্য অধিবেশনের আয়োজন হত সাধারণ কোন জায়গায়। এ সব সভাতে বক্তৃতা

করতে লাগলেন স্বামিজীর ব্যবস্থা মত। ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার, অ্যালবার্ট হলে "কালী ও কালীপূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ২৮শে "কালীঘাটে" কালীপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন। মিনর্ভা থিয়েটারে ২৬শে ফেব্রুয়ারী জনসাধারণের জন্য আহুত অধিবেশনে Young India Movement (নব্যভারত আন্দোলন) সম্বন্ধে উদৃপ্ত বক্তৃতা করলেন। সে সভায় স্বামিজী ও মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীগণও উপস্থিত। ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৯, বেলুড় মঠে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব সুরু হল, সেখানেও স্বামিজীর উপস্থিতিতে নিবেদিতা বক্তৃতা করলেন।

১৮৯৮, ১লা নভেম্বর থেকে ১৯শে জুন ১৮৯৯ কলকাতায় নিবেদিতার অবস্থিতি মাত্র কয়েক মাস। বক্তৃতা ও কাজের মধ্যে এই অল্প সময়ে কলকাতার সমাজ-জীবনে তাঁর বিস্ময়কর পরিচিতি ঘটে গেল। যেখানেই তাঁর বক্তৃতা, সেখানেই বিপুল উৎসাহ, বিপুল জনসাধারণের সমাবেশ হতে লাগলো। সারাবিশ্বে বিশেষ করে ভারতের 'নবজাগরণ' শ্রষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁরই শিষ্যা, নিবেদিতা সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন, এই দেশের সেবায়। ভারতের ধর্ম্ম ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতাগুলি গভীর চিন্তাপূর্ণ। প্রতিটি বাক্যের মধ্যে কি অপূর্ব্ব বিশ্বাস ও ভালবাসা। ভারতের অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি। জাতীয়-জীবনের মর্ম্মকথা উদ্ঘাটিত তাঁর চোখে। তাই তাঁর কথায় এত শক্তি, এত আন্তরিকতা। শ্রোতাদের অন্তরে সৃষ্টি করে আশা, সঞ্চার করে উৎসাহ। ভারতবাসী বলে গর্ব্ব অনুভব করতে শুরু করলো সকলে।

শিক্ষিত মহল জেনে গেছেন নিবেদিতা প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্না তেজস্বিনী বাগ্মী। ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তিনি পূর্ণ, ভারতের জাতীয় জীবনের উদ্বোধিকা।

বাগবাজার পল্লীতে তাঁর পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ। প্রতিদিন পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা তাঁর চারপাশে সমবেত হয় ১৬ নং বোসপাড়া লেনে। হাসিমুখে তাদের নিয়ে খেলা করেন। ভাঙা ভাঙা বংলায় গল্প বলতে চেষ্টা করেন। রং দেন, তুলি দেন, যা খুশী আঁকার জন্য কাগজ দেন। তাদের চাহিদামত যোগান দেন নানা উপকরণ। গড়া হচ্ছে, নানারকমের মাটির পুতুল, চলছে ছোট ছোট কাপড়ের টকুরোর উপর সেলাইয়ের শিক্ষা। সকলকেই উৎসাহ দিচ্ছেন। আদর করছেন। হাত ধরে শিখিয়ে দিচ্ছেন। আনন্দ, উৎসাহ ও ভালবাসার সজীবমূর্ত্তি তিনি।

মেয়েদের অভিভাবক, প্রতিবেশী, সকলের কাছেই পরিচিত তিনি। তাদের সকলের আপনার লোক। কারও সঙ্গে পথে দেখা হলে, তাদের সকলকেই হেসে অভ্যর্থনা জানান। যেটুকু বাংলা ভাষা শিখেছেন, তার সাহায্যেই, তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন। সুখ দুঃখের গল্প শোনেন। তারাও তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন। যে কেউ নবাগত তাঁর কাছে আসেন, তাদের সাহায্য করতে, এমন কি তাদের আহারের ব্যবস্থা করাটাও, কর্ত্তব্যে পরিণত হল। ইংরেজপল্লী চৌরঙ্গী ত্যাগ করে, তিনি এই সঙ্কীর্ণ অপরিচ্ছন্ন গলিতে আশ্রয় নিয়েছেন, দিনরাত কি সাধনায় তিনি মগ্ন, তা কারও জানা নেই। সে সাধনা কি আত্মোন্নতির জন্য কিংবা দেশ মাতৃকার উন্নতির জন্য, সে চিত্র তাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে এটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁদেরই মত, একজন পল্লীবাসী হয়ে গিয়েছেন তিনি। তিনি সে পল্লীর মঙ্গল কামনা করেন, সে চিত্র সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। উদ্ভাসিত তিনি— পল্লীর একান্ত আত্মীয়, একান্ত আপনজনরূপে।

স্বামিজী তাঁর স্কুলে এসেছেন। তাঁকে চা খাওয়ানোর একান্ত বাসনা কিন্তু বিব্রত তিনি, ঘরে দুধ নেই। খবরটা ছড়িয়ে গেছে বাতাসে, ছুটে এলেন প্রতিবেশিনী। সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। পল্লীবাসীরা ভালবেসে ফেলেছেন তাঁকে। কেউ অসুখে পড়লে বা বিপদে পড়েছে শুনলে, স্বেচ্ছায় তাদের পাশে ছুটে যান নিবেদিতা। খেতে বসেছেন, তাঁর বাড়ীর

অপরদিকে ছোট একটি মাটির বাড়ী থেকে ভেসে এলো কান্নার শব্দ। আহার পরিত্যক্ত রইলো, ছুটলেন নিবেদিতা। তাঁর সামনেই মারা গেল ছোট একটি মেয়ে। পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলেন তিনি। শোকাতুরা মার মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে নীরবে বসে রইলেন কক্ষে। কন্যাহারা বেদনাহত মার মন, একটু শান্ত হয়ে শুধালো : আমার মেয়ে কোথায় গেল মা? — স্থির ধীর নিবেদিতা। উত্তরে বললেন, বুক বাঁধো মা, মেয়ে তোমার এখন, মা কালীর কাছে। সান্ত্বনা মনে পেলেন মা। আর নিবেদিতা এদের এই বেদনাহত ব্যথার সমভাগী হয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন।

পল্লীবাসীদের চোখে এখন তিনি পরমাত্মীয়া বিদেশিনী প্রতিবেশী। যখন পুনরায় প্লেগ দেখা দিল পরের বছর, ভাল করে বুঝার অবসর পেল পল্লীবাসীগণ সত্যই তিনি তাঁদেরই জীবনের সহযাত্রী, পরমবন্ধু প্রিয় একজন।

১৮৯৯ সাল। স্বামিজী প্রথম থেকেই এ রোগের পুনঃ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। প্রতিরোধের সকল রকমের ব্যবস্থার ভার নিবেদিতার উপর অর্পন করলেন। এ রোগ মারাত্মক। তার প্রতিরোধ কল্পে রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামিজীর নির্দ্দেশমত একটি কমিটি গঠন করলেন। সিস্টার নিবেদিতা সম্পাদিকা, স্বামী সদানন্দ প্রধান কার্য্যাধক্ষ্য, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ সহযোগী। ৩১শে মার্চ্চ কাজ সুরু হল। সকলের আগে প্রয়োজন বস্তি পরিষ্কার। প্লেগের বিস্তৃতি, এই অপরিচ্ছন্ন বস্তি থেকেই। স্বামী সদানন্দ ধাঙড় নিয়ে বাগবাজার, শ্যামবাজার প্রভৃতি বস্তিগুলো পরিষ্কারে এগিয়ে এলেন। ৫ই এপ্রিল অর্থের জন্য ইংরাজী খবরের কাগজে আবেদন জানালেন। সাহায্য আসতে সুরু হল। ২১শে এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। ছাত্রদের ডাক দিলেন স্বামিজী। উৎসাহ ছড়িয়ে পড়লো। পনেরো জন ছাত্র এগিয়ে এলো, নিবেদিতাকে সাহায্য করতে। তারা প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ৫৫ নং রামাকান্ত বসু ষ্ট্রীটে সকলে সমবেত হয়ে, সম্পাদিত কাজের বিষয় পেশ করে, নতুন কাজ বুঝে নিয়ে যেতে লাগলো নিবেদিতার কাছ থেকে। প্লেগ নিবারণের কাজও সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চললো। জেলা মেডিকেল অফিসার ও চেয়ারম্যান সন্তোষ প্রকাশ করলেন এঁদের কাজে।

অসীম সাহস ও ঐকান্তিক সেবার কাজে ব্রাহ্মবন্ধুগণও এঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন নিবেদিতার কাছে। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর লিখলেন : এই সঙ্কটের দিনে বাগবাজারের প্রতিটি বস্তিতে, ভগ্নী নিবেদিতা স্বরূপা করুণাময়ীর মূর্ত্তি। আহার, বিহারে, ভ্রুক্ষেপহীন। নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। রোগীর ওষুধ ও পথ্যের জন্য নিজের বলতে যা কিছু সবই বিলিয়ে চলেছেন। এমন কি ত্যাগ করেছেন, নিজস্ব আহার, দুধ, ফলমূল সব কিছুই (তাঁর খাবার ছিল কলা আর দুধ)। স্বামী সদানন্দ ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগনী। ধাঙড় নিয়ে বস্তীগুলি পরিষ্কার রাখার ভার ছিল তাঁর। তবুও নিজের চোখে প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে দেখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় নিজকে নিয়োজিত রেখে চলেছেন তিনি। নিজেই ঝাড়ু নিয়ে রাস্তা পরিষ্কারে এগিয়ে এলেন। পাড়ার যুবকরা এগিয়ে এলেন, তাঁকে সাহায্য করতে। তারাই গ্রহণ করেছে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব। স্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে পল্লীতে পল্লীতে বিলবার ব্যবস্থা করলেন।

আগের বছর এই রোগ যখন দেখা দিয়েছিল, প্রাণের ভয়ে সহরবাসীরা পালিয়ে ছিল ব্যবস্থাবিধির ভয়ে। এবার ছোট লাট স্যার জন উডবার্ণ আশ্বাস দিলেন : কোন রোগীকে জোর করে ঘর থেকে সরানো হবে না। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর রোগী দেখে বাড়ী ফিরছেন, দেখলেন তাঁর বাড়ীর সামনে অপরিচ্ছন্ন কাঠের আসনে বসে আছেন একটি ইউরোপীয় মহিলা।

চৈত্রমাসের খর দুপুর রোদে বহুক্ষণ অপেক্ষা করছেন একটি সংবাদ জানবার জন্য। ইনি আর কেউ না, স্বয়ং নিবেদিতা।

এবার সংহারক রূপ নিয়ে ফিরেছে প্লেগ। রোগ ছড়াচ্ছে বস্তিতে বস্তিতে। চুন প্রতিষেধক। ছোট মই নিয়ে চুনকাম করছেন তিনি, স্যাতস্যাঁতে জীর্ণ একটি ঘর। আক্রান্ত হয়েছে একটি শিশু। তাকে কোলে তুলে নিলেন নিবেদিতা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেবায় নিযুক্ত তিনি। এ রোগে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও নিঃসঙ্কোচে সেবা করে চললেন। দুদিন পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো শিশুটি। কোলে নিয়ে তখনও বসে আছেন, মারা যাওয়ার আগে শিশুটি তাঁকে 'মা' 'মা' স্বরে আঁকড়েছিল— অক্লান্ত চেষ্টা তাঁর বিফল, চিরন্তণী মাতৃহৃদয় তাঁর, কান্নায় ভেঙে পড়লো সে মুহূর্ত্তে।

ভারতীয় ধর্ম্মজীবন তাঁকে প্রথমে বিস্মিত করেছিল। একদিকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা, অপর দিকে সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সমন্বয়। উপলব্ধি ছাড়া, যুক্তির দ্বারা এই দুটি ভাবের ধারণা সম্ভবপর নয়। আর স্বামিজী! তিনি ছিলেন বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট ধর্ম্মের সমন্বয়স্থল। এদের প্রত্যেকটিই সত্য, তার স্বাক্ষীস্বরূপ স্বয়ং তিনি। নিবেদিতাকে বোঝবার জন্য বলেছিলেন : "ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্য দিয়ে দেখলে, নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণরূপে প্রতিভাত হন"। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, অদ্বৈত দর্শন সর্ব্বোত্তম মতবাদ, বেদ ও উপনিষদ একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থ। অথচ জগন্মাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ছিল তাঁর প্রবল অনুভূতি। ১৮৯৮ সাল থেকে মঠে যথারীতি দুর্গাপূজা ও কালীপূজা বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করলেন। আবার কালী পূজার দিন নিবেদিতার বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করলেন। তিনি যখন বেদান্ত তত্ত্ব প্রচারে ব্যস্ত, নিবেদিতা এই তত্ত্বকে ধারণা করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে চলছেন। আবার ভারতে যখন এলেন, নানাবিধ উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি সে সব রহস্য উদঘাটন করায় সচেষ্ট হলেন। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীর আলৌকিক দর্শনের পর, স্বামিজীর চিন্তার তন্ময়তা, তাঁর চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করছে। এদেশে পা দিয়েই কালীঘাটে গেলেন। পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা ও দীক্ষা, মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল প্রথম দৃষ্টে, সে দৃশ্য তাঁর মনে নানা প্রশ্ন তুলেছিল। প্রশ্নটা ছিল, অভিযোগ স্বরূপ। তিনি স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মূর্ত্তিকে সকলের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের হেতু কি? মন্দিরে পশুবলি দেওয়ার অর্থ কি? পূজায় জীব হিংসার স্থান কেন?

স্বামিজী উত্তরে বললেন : চিত্রটি নিখুঁত করার জন্য, হলই বা একটু রক্তপাত! নিজের ধারণা কারও ওপর জোর করে চাপানো ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই অপরের মনের মত করে সাজালেন না। তিনি পাশ্চাত্য মনের পটে, বিজাতীয় রূপে প্রতীভাত ভারতীয় ভাবগুলিকে, শিক্ষার প্রারম্ভে ব্যাখ্যা করেছেন বার বার। আর নিবেদিতার সঙ্কল্প ছিল ভারতীয়-ভাবেই সে চিন্তা করার অভ্যাস করতে হবে তাঁকে। সে, ভাব আয়ত্ত করা, তাঁর পক্ষে খুব কঠিনও হয়নি।

১৩ই ফেব্রুয়ারী। এলবার্ট হলে বক্তৃতা দিলেন 'কালী ও কালীপূজা'। এর পূর্ব্বে এই পূজার রহস্যভেদের জন্য চেষ্টার ত্রুটিও তাঁর ছিল না। সেখানে উপস্থিত থাকবেন পরিচিত ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, কলকাতার শিক্ষিত সমাজও। সকলে যেন সহানুভূতির সঙ্গে কালীপূজার মর্ম্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হন, সেই উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু নিজে রচনা করে স্বামিজীর অনুমোনদন করিয়ে নিলেন।

শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উত্তেজনা। সভায় উপস্থিত হলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মিসেস সালজার, শ্রীমতী সরল ঘোষাল প্রমুখ মহিলাবর্গ। যথা সময়ে বক্তৃতা শুরু হল। পর,পর বললেন ডাঃ সরকার,

ডাঃ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শেষে নিবেদিতা তাঁর বক্তব্য রাখলেন। সরকার নিবেদিতার বক্তৃতার প্রতিবাদ করলেন। বললেন : আমরা এইসকল কুসংস্কার, দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তোমরা বিদেশীরাও, সেই সব প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগে গেছ! নিবেদিতার প্রতি এই আক্রমণে গোলমালের সৃষ্টি হল। দর্শকদের মধ্য থেকে একজন উত্তেজিত সমর্থক, ডাঃ সরকারকে তীব্রভাষায় কটূক্তি করে উঠলেন।

এই বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের কাছে আরও সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। এ ঘটনার দুএকদিন পরেই কালীঘাটে, কালীপূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ এলো।

২৮শে মে, কালীঘাটে বক্তৃতার দিন ধার্য্য হয়েছিল। যথেষ্ট সময় নিয়ে এসম্বন্ধে গভীর চিন্তা করে এলবার্ট হলে যে প্রতিবাদ উঠেছিল, তা খণ্ডন করে, কালীপূজার সকল অনুষ্ঠান এমন কি বলিদান সম্বন্ধেও তাঁর নিজস্ব ধারণা দৃঢ় ও শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি স্বামিজী ও তাঁর এক গুরুভ্রাতার কাছ থেকে শক্তিপূজার সকল তথ্য সংগ্রহ করলেন। তাঁর কাছে বলিদান প্রথার অর্থ দাঁড়ালো : যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্ত নিজেকে নিবেদন করার মত দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্ত মার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করে। পরে এমন সময় আসে, যখন সে নিজ হৃদয়ের রক্তে পুষ্পাঞ্জলি সিক্ত করে জগন্মাতার শ্রীচরণ ভূষিত করে। স্বামিজীর অভিমত : ভয়, দুঃখ ও বিনাশের মধ্যেও জগজ্জননীর প্রকাশ ধারণা করতে শেখা চাই। মঙ্গলের মধ্যে তাঁর যে রূপের প্রকাশ, অমঙ্গলের মধ্যেও সেই একই রূপ। তিনি বরাভয় করা, আবার খড়্গ মুণ্ডমালিনী। একটু চিন্তা করে বললেন তাঁর শাপই বর। ভাবাবেগে কখনও বলে উঠলেন : অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়-কন্দরে, মায়ের রুধির রঞ্জিত অসি ঝলমল করে। এরা আজন্ম অসি-মুণ্ড-বরাভয়-করা মূর্ত্তির উপাসক।

কালীপূজা পাশ্চাত্যের কাছে প্রহেলিকা। দূর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা অসুরনাশিনী, কল্যাণময়ী শক্তির প্রকাশ, কালীপূজা বা কালীমূর্ত্তি —দুর্জ্ঞেয় চিৎশক্তি, ভয়াঙ্করা সেই কালী মূর্ত্তি! নিজের চেষ্টায় ও স্বামিজীর সহায়তায় উপলব্ধি করলেন এর মর্ম্মগাথা। ফলে শক্তি উপাসনা তাঁর চিত্তকে প্রবলভাবে অধিকার করে নিল। গভীর চিন্তায়, পরিপূর্ণ ভাবটির মর্ম্মার্থগ্রহণে, ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সেই প্রতিমার মধ্যে একটি 'ভাব' চকিতে তাঁর চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। সহসা বলে উঠলেন : স্বামিজী, মা কালী হয়তো সদাশিবের, ধ্যানের উপলব্ধ বিশেষ একটি প্রতীক। তাই কি?

স্বামিজী তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। স্বাধীন চিন্তায় বাধা দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। জানতেন নিবেদিতা এই তথ্যের বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করে চলেছেন। সস্নেহে বললেন, বেশ তাই হোক, তোমার নিজের ভাবেই ওটি প্রকাশ কর।

এলবার্ট হলে বক্তৃতা দানের পর অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বক্তৃতাটি নিয়ে আলোচনা করলেন। স্বামিজীও সেখানে উপস্থিত থাকলেন। তিনি নিজে এই শক্তি পূজার রহস্য ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, দেখ প্রতীকোপসনার ঐতিহাসিক তথ্য সবিশেষ না জানলে, এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। ডাক্তার সরকার (মহেন্দ্রলাল) প্রভৃতির শক্তি পূজা-বিরোধিতার প্রধান কারণ, এটাই। শেষে একদিন নিজের মত জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন অনুভব করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলে উঠলেন, : শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি নিজে এই মহাশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, কালীঘাটে তোমার বক্তৃতার সময়ে বিদেশীয় বন্ধুগণ যদি যোগদান করতে চান, তাঁদেরও অন্য শ্রোতাদের মত জুতো খুলে যেতে হবে, মেঝের উপর বসতে হবে। এ ভার তোমার উপর রইলো। মনে রেখো : এটি পবিত্র মহাপীঠ, কারও যেন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে।

কালীঘাটের হালদার বাড়ী থেকেই এই আয়োজন। তাঁরাই উদ্যোগী। ২৮শে মে রবিবার, বিকাল পাঁচটায় নিবেদিতা খালি পায়ে সে সভায় উপস্থিত হলেন। স্বামিজীর শরীরটা অসুস্থ বোধ করায় সেখানে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দির। সেখানেই বক্তৃতা হবে। প্রচুর জনতার ভীড়। মহাপীঠের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলতে শুরু করলেন: হিন্দু-পারিবারিক জীবনে মায়ের প্রভাব সর্ব্বাধিক, বিশেষ করে মাতা পুত্রের সম্পর্ক যেমন নিবিড় তেমনি পবিত্র। জীবনের, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত জননীর সুগভীর স্নেহ। সেইজন্য বোধ হয় অনাদিকাল থেকে সৃষ্টির যিনি মূল কারণ, সেই পরমেশ্বরকে আপনা থেকে আপনার, উপলব্ধি করার জন্য, তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে 'মা'। হিন্দুর কাছে এর চেয়ে পবিত্র ও মধুরতম নাম আর কিছু নেই। দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ—একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ও বিভিন্ন নামে অভিহিত। নানাভাবে তাঁর প্রকাশ। দশপ্রহরধারিনী, অসুরনাশিনী, বিশ্বজননী দুর্গা সেই মহাশক্তির অপূর্ব্ব প্রতীক। চরাচর বিশ্বপ্রকৃতি তিনিই। জগদ্ধাত্রীরূপে সেই*মহাশক্তিই সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। আর মহাকালী যিনি, ভয়ঙ্করা ও লোলরসনা, মৃত্যু ও ধ্বংস যাঁর চারিপাশে বেষ্টন করে আছে, সেই অগ্নিরূপা মহাকালীর কাছে, সাধকের সমস্ত অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায়। তার আকুল হৃদয় মথিত করে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে আসে 'মা'!

শিশুর কাছে তিনি 'মা'। শিশু তার মাকেই সবসময়ে চায়। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। মাও তাকে আশ্রয় দেন। সেই মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এর বেশী কিছুর প্রয়োজনও তার নেই। কেবল তাঁকে ভালবাস। কাপুরুষ যে, সেই মায়ের ভয়ঙ্করা রূপে ভয় পায়। সাহসে, যে দুঃখ দৈন্য চায়—মাতৃরূপা তার কাছেই আসে।

নিবেদিতা খণ্ডন করলেন অ্যালবার্ট হলে যে প্রতিবাদ উঠেছিল। প্রথম আপত্তি মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে। অনন্ত ঈশ্বর যে, মূর্ত্তিরূপে পূজা করা অসম্ভব। এই মূর্ত্তিপূজাকেই পৌত্তলিকতা, আখ্যা দিয়ে বিরোধিতা করা হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু হিন্দুর কাছেও এই অযৌক্তিকতা বেশ দৃঢ় দেখা যায়। কিন্তু মাতৃপূজার অন্তর্নিহিত অর্থ, তাঁদের কাছে কি সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে? তিনি বললেন : হিন্দুগণ বস্তুত মূর্ত্তিকে পূজা করে না, মাত্র প্রতীক অবলম্বনে মনকে তন্ময় করার উপায় রূপে এই পথ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃত-পূজা প্রতিমার সামনে অবস্থিত জল পূর্ণ কুম্ভের উপর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর ঐ কুম্ভটিকেই সেই অনন্ত শক্তির প্রতীক রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে।

আরও অভিযোগ ছিল এই কালীমূর্ত্তির কল্পনায়, ভাস্কর্য্য ও শিল্পের অবনতি ঘটেছে। তিনি বললেন : অভিযোগকারী ইয়ুরোপীয় হলে, ইয়ুরোপীয় ভাস্কর্য্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার সঙ্গে একথাও স্বীকার করতেন যে, শিল্প সমালোচকদের দৃষ্টিতেও কালীমূর্ত্তির বিশিষ্ট নাটকীয় ভঙ্গী যা অপূর্ব্ব বলে গৃহীত হয়েছে। যাবতীয় প্রাচীন শিল্প, ভাব ও কল্পনা সহায়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে। এখনও তা সার্থকতা লাভ করেনি। কালীমূর্ত্তির মধ্যে শিল্পের গভীর তাৎপর্য্য সন্ধানী দৃষ্টির কাছেও সেটি সুস্পষ্ট এবং বিস্ময়কর।

বললেন : ভারতবাসীকে তার নিজের শিল্প ও পুরাণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যাভিমুখী দৃষ্টি ও তুলনামূলক মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। মাতৃভাবের চরম বিকাশের জন্য আরও উচ্চভাব ও শ্রদ্ধা আরোপ করতে হবে। তবেই ভারতবাসীর পক্ষে, যা যথার্থ জাতীয় ও মহান, এমন কিছু সৃষ্টি সম্ভব হবে। নতুবা বিদেশীয় শিল্পের গভীর ভাবব্যঞ্জনা না বুঝে, তারা শুধু তাঁর কৃত্রিম বহিঃসৌন্দর্য্যে বিভ্রান্ত হবে। ইয়ুরোপীয় ভাবে তা প্রকাশ করতে গিয়ে, নিজস্ব ভাবকে স্থূল ও বিকৃত করে তুলবে।

বলিদানের উল্লেখ করে বললেন : প্রকৃতপক্ষে কালী পূজায়, অন্যকে উৎসর্গ করার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গের বিধান রয়েছে। এই আত্মোৎসর্গই পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। এর মধ্যেই সাধকের শক্তিলাভের সকল রহস্য নিহিত। শক্তির উৎস— ত্যাগ। এই ত্যাগের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ছাড়া শক্তিপূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না।

এই বক্তৃতার মধ্য দিয়েই ভারতের জাতীয়তার 'উদ্বোধন' রাগিনী উদ্বোধিত হল। এই বক্তৃতা ছাপিয়ে বই হয়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে স্বকীয়তা বিসর্জ্জন, দিয়ে পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট অনুকরণ ও অনুসরণ, তাঁকে যে মর্ম্মপীড়া দিয়েছিল, এটি তার বহিঃপ্রকাশের প্রথম সূচনা বা তার ভারতীয় নারীর স্বরূপে, ভারতীর প্রথম 'প্রকাশ'।

এর আগেও ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে বড়দিন পর্ব্বে, বেলুড় মঠের কিছুদূরে 'বালী' গ্রামে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে যখন বাস করছিলেন তখন মিসেস লিগেটের মেয়েকে 'মা-কালী' সম্বন্ধে একটি গল্প উপহার দিয়েছিলেন "খুকুমনি, ছেলেবেলার সবচেয়ে আগেকার কোন কথাটি তোমার মনে পড়ে বলতো? মায়ের কোলে শুয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে, সেই কথাটি নয় কি?

মার সঙ্গে খুকুর লুকোচুরি খেলা। মা যেই চোখ বন্ধ করেন, খুকু তাঁর চোখের আড়ালে। আবার তিনি যখন চোখ খোলেন, অমনি দেখতে পান তাঁর খুকুকে।.... ঈশ্বর এই জননীর মত। তিনিই মা মহামায়া। তিনি এত বিরাট যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ক্ষুদ্র সন্তান। জগন্মাতা চোখ বন্ধ রেখে, তাঁর সন্তানদের সঙ্গে খেলা করেন। আর সারাজীবন ধরে আমরা এই বিশ্বজননীর চোখ খুলে দেবার চেষ্টা করি। যদি কেউ তাঁর চোখ খুলে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টিমেলাতে পারে, তবে সেই মুহূর্ত্তে সে সকল রহস্য অবগত হয়, শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে তার হৃদয়পূর্ণ হয়ে যায়।

এই বিশ্বজননীর চোখ বন্ধ থাাকে না। আমাদের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকাব, তাই মনে হয় তিনি চোখ ঢেকে আছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি কেঁদে উঠবে, মা তখনই তাঁর সুন্দর করুণাভরা দৃষ্টি তোমার দিকে মেলে ধরবেন। আর সেই মুহূর্ত্তে, তুমি যদি খেলা বন্ধ করে, 'কালী' 'কালী' বলে তাঁর বক্ষে তোমার ক্ষুদ্র মুখখানি ঢেকে রাখতে পার, তবে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাবে।

তুমি কি ক্ষণিকের জন্য খেলা বন্ধ করে, ক্ষুদ্র কর দুটি জুড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলবে 'মাকালী', একবার আমার দিকে তাকাও!

মা যখন লুকিয়ে থাকেন, তখনও খুকুর প্রতি তাঁর অপার স্নেহ। 'কালী মা' ঠিক সেই এইরকম। তাঁর চোখ যদি দীর্ঘকাল বন্ধ থাকে, তবু আমাদের ভয় নেই। তাঁর মুখে সব সময়ে হাসি লেগে আছে। একদিন তাঁর অবকাশ মত, যখন এই খেলা সাঙ্গ করবেন, তখন তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির মিলন ঘটবে, আর তখনই আমরা 'ইহজগত' থেকে দূরে চলে যাব.... অসীমের আর এক প্রান্তে।

কত বিভিন্ন রূপ 'মাকালীর। শিশুর কাছে তিনি স্নেহময়ী মা, কী কোমল, কী মধুর তাঁর ভঙ্গী। কিন্তু তিনিই আবার ভীষণ হতেও ভীষণতর। সেই করাল রূপিনী ভয়ঙ্করা কালীমূর্ত্তি, দীর্ঘ আলুলায়িত কুন্তলা মহাকালীর ঘন কৃষ্ণ কেশগুলো তাঁর পিঠে লুটিয়ে পড়েছে, প্রচণ্ড ধাবমান বাতাস, কালের বা ঘটনা স্রোতের মত। ত্রিণয়নার দৃষ্টিতে কালই মহাকাল। সেই মহাকাল রূপ এক বিপুল ছায়ার মত কৃষ্ণায়িত তাঁর অঙ্গের নীলিমা। জীবনমৃত্যু-রূপ রূঢ় সত্যের প্রতীক তিনি। মা তাই নগ্না, দিগ্বসনা। এই 'ভীষণাদপি ভীষণার' হৃদয়ের অতলে নিমজ্জিত শিব, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ধ্যানে মহাকালীর তত্ত্ব অবগত হয়ে, 'মা' বলে সম্বোধন করছেন। (The vision of Siva — শিবের ধ্যান) নিবেদিতা কালী তত্ত্বের ব্যাখ্যার পিছনের ইতিহাসঃ

ভারতে মুঘল রাজত্বের যখন রমরমা : ইয়োরোপ থেকে বাণিজ্য করতে এলো— পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি। যেখানেই ব্যবসা পত্তন করলো— আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে আমদানী করলো সৈন্য, গুলি, গোলা-বারুদ আর পাদ্রীর দল। মুঘল সাম্রাজ্যের যখন পতন শুরু হল, নানা স্বাধীন রাজ্য আত্মপ্রকাশ করলো কিন্তু স্থায়িত্ব তাদের স্বল্পকালীন, পরস্পর আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য। সেই সুযোগ পরিপূর্ণ গ্রহণ করলো ইংরাজ বণিকের দল। তারা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী তৈরী করেছিল— ছলে বলে তাদের পদানত করে গড়ে তুললো এক সাম্রাজ্য। সিপাই-বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডের রানী গ্রহণ করলেন সে রাজ্যভার। যুক্ত হল বণিকদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে : শাসনব্যবস্থার উন্নতি হল, শিক্ষা ব্যাপ্ত হল, গড়ে উঠলো শিক্ষিত সম্প্রদায়, তারাই তাদের সভ্যতা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হল। শক, হুন, পাঠান, মোগল শাসনাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারতের প্রচলিত ধর্ম্ম প্রতিটি শাসকদলের প্রচলিত ধর্ম্মের কাছে ঘা খেতে খেতে সংরক্ষণশীল হয়ে পড়লো। এর ফলেই গভীর বাঁধনে নানা অনুশাসনযুক্ত হয়ে তা সংস্কারে পরিণত হল। সমাজ পরিচালকগণ সে অবস্থার সাথে তাল দিতে দিতে সেই সংস্কার কুসংস্কারে পরিণত হল। খ্রীষ্টান পাদরীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে জগতে তাদের অসভ্য ও বর্ব্বর আখ্যা দিয়ে সাফাই গাওয়া শুরু করলো— বর্ব্বর জাতিকে সভ্য গড়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় সভ্যতা, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। তার ধর্ম্মও প্রাচীন, কিন্তু যৌলুশহীন, খ্রীষ্টধর্ম্মের চাকচিক্য বেশী, আকৃষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়। শুরু হল ধর্ম্ম ত্যাগের হিড়িক। তাকে ঠেকাতে এগিয়ে এলেন রামমোহন রায়, দ্বারকনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়। তাঁরা হিন্দু ধর্ম্মের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ থেকে সার সংগ্রহ করে একটি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করলেন : নাম দিলেন ব্রাহ্ম সংহিতা। প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্ম ধর্ম— চাকচিক্যে ভরা খ্রীষ্টধর্ম্মের মত। ধর্ম্ম ত্যাগের হিড়িক বন্ধ হ'ল, প্রাধান্য এলো ব্রাহ্ম ধর্ম্মের। দেবেন্দ্রনাথের উপর সমস্ত-দায়িত্ব অর্পন করে রামমোহন ইংলণ্ড গমন করলেন, তাঁর পিছু পিছু দ্বারকনাথও ইংলণ্ড গেলেন ব্যবসা প্রসারের উদ্দ্যেশ্যে, কিন্তু উভয়েই দেহ রাখলেন ইংলণ্ডে। দানের খ্যাতিতে দ্বারকনাথ হলেন প্রিন্স, কিন্তু রেখে গেলেন প্রচুর দেনা। সেই ঋণ পরিশোধ, পাদ্রীদের কাছে বেদ ও উপনিষদ প্রতিষ্ঠায় হলেন বিফল, পরাজিত ও গৃহদ্বন্দ্বে জর্জ্জরিত হয়ে পাড়ি দিলেন দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে। সাতবছর করলেন অজ্ঞাতবাস, সিপাই বিদ্রোহের পর কলকাতায় ফিরে এসে দেখলেন : তাঁর দক্ষিনহস্ত কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেওয়ায়—ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিখণ্ডিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের নববিধান। ব্রাহ্ম পরিষদভুক্ত যাঁরা— তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন নানা জায়গায়।

ঠিক সেই সময়েই রানী রাসমনীর প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে, তাঁর পুজারী ছোট ভট্চাজ কালী সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর, প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্ম সাধনা একে, একে শেষ করে প্রচার শুরু করেছেন সব ধর্ম্মই এক, যত মত তত পথ— কেন্দ্রপীঠ, সকলেরই এক। পরিচয় ঘটলো কেশবচন্দ্রের সঙ্গে। সর্ব্বপ্রথম তিনিই ঘোষণা করলেন তাঁর কথা। ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী; আকৃষ্ট হলেন সকলে। আনাগোনা শুরু হল ভক্তদলের। পাগল ঠাকুর বলে, যিনি ছিলেন উপেক্ষার বস্তু, তিনি পরিচিত হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রূপে। মার নির্দ্দেশমত, অপেক্ষারত তিনি তাঁরই নির্দ্দেশিত শিষ্যদলের। একে, একে আগমণ শুরুও হল, অবশেষে প্রধান লোকটি সন্ধান পেলেন কলকাতার শিমূলীয়া অঞ্চলের বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেনের। প্রথম সাক্ষাতের পরই কালীর হাতে সঁপে দিলেন তাঁকে। নিজে ছিলেন কালীর সন্তান। আর তিনিই বিশ্বের মুক্তি কামনায় তাঁকে প্রেরণ করলেন বিশ্ব দরবারে।

স্বামিজী আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারে হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌম্য ভাবেরই ব্যাখ্যা করলেন। দেবদেবী বা বিশিষ্ট ধর্ম্মপদ্ধতির কথাও তুললেন। মার্গরেটের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ব্যক্তিগত আলাপে তিনি মাতৃপূজা বা তাঁর গুরু সম্বন্ধে আলাপ করেছিলেন: শ্রীরামকৃষ্ণের সবটাই কালী। কালী দর্শন দিয়েই তাঁর সাধনার প্রথম সিদ্ধি, তাঁর মরজীবনের শেষ উচ্চারিত শব্দ 'কালী'। এর মাঝের জীবন, প্রতিটি দিন এই কালীর সঙ্গেই বোঝাপড়া, সংক্ষেপে বলা চলে : তাঁর ক্ষীণ তনু মানুষটিকে দিয়ে বিশ্বের আত্মা মন্থনের কাজটি করিয়ে নিয়েছিলেন কালী।

দাদার অনুরোধ ও রাণী রাসমনীর জামাই মথুরের একান্ত ইচ্ছায় মায়ের সাজবেশের ভার নিলেন। কালীর প্রথম পূজারী দাদা দেহত্যাগ করলে, মন দিলেন মায়ের পূজায়। পূজা শেষে দেবীকে প্রতিদিন রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদের গান শোনানো, পূজার অঙ্গ বলে স্থির করে নিলেন। তখন কলকাতা ভারতের রাজধানী, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পীঠভূমি। শিক্ষিত বিবেক, শিহরিত সংস্কার-পন্থীর দলে ভরপুর শহর। হিন্দুধর্ম্মের নানা ত্রুটি, সেই অন্ধ সংস্কার ও সামাজিক পরিবেশকে সামনে রেখে শিক্ষিত একটা অংশ কলরবে মুখর। বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবেশ সর্ব্বত্র। দক্ষিণেশ্বরে, তখন ভবানী মন্দিরে সাধক গদাধর কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বিভিন্ন ধর্ম্ম সাধনা-পথে অগ্রবর্ত্তী হয়ে ঘোষণা করলেন, সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য একই বস্তু, পথটা শুধু ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভক্ত। সহজ কথায় 'যত মত তত পথ'। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি, সঞ্চারিত করলেন প্রিয় শিষ্য নরেনের অন্তরে। তাঁরই নির্দ্দেশিত যাত্রা— বিশ্ব ধর্ম্ম মহাসভায়। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বেদ। তাঁর বৈদান্তিক আদর্শই প্রচার করলেন সারাবিশ্বে। (আমেরিকা ও ইংলণ্ডে)। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দেশের। তাদের কচকচানি, তাদের শিক্ষার অহঙ্কার, তাদের দৃষ্টির শক্তির অভাবেই সেই বিশ্বজয়ী শক্তিকে অবহেলার চোখে দেখে, স্বজাতি বিরোধী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠলো তাঁরই স্বদেশবাসী। হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি যে বেদ, সেই বেদান্ত দর্শনকে অস্বীকার করে গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁদের 'অহিন্দু' বলে প্রচার করতে শুরু করলো। দক্ষিণেশ্বরের "কালী মন্দিরে" তাঁর (স্বামিজীর) প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর প্রচারিত বেদান্ত দর্শন হিন্দুধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ, এটা প্রমাণ করতেই তিনি (স্বামিজী) শুরু করলেন দেবীমূর্ত্তি পূজা ও উদ্বোধিত করলেন নিবেদিতাকে।

অথচ এই স্বামিজীই বিশ্বধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যায় বেদান্তকেই তুলে ধরে ছিলেন সর্ব্বসমক্ষে এবং সেই বেদান্ত ধর্ম্মকেই প্রচার করতে উদ্যত হলেন সারা বিশ্ব তথা আমেরিকা ও ইংলণ্ডে, সারা ইউরোপে। যেখানে তাঁর ব্যাখ্যা ছিল না দেব, দেবী বা বিশিষ্ট ধর্ম্ম পদ্ধতির কথা। পরিচয়ে প্রথম পর্ব্বে মার্গটকে জানিয়ে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের (তাঁর গুরুর) সবটাই কালী! কালী দর্শন দিয়েই তাঁর প্রথম সিদ্ধি— তাঁর মরজীবনের শেষ উচ্চারিত শব্দ কালী। তাঁর মাঝের জীবন, প্রতিটি দিন ঐ কালীর সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া। সংক্ষেপে বলা চলে : তাঁর ক্ষীণ তনু মানুষটিকে দিয়ে বিশ্বের আত্মার মন্থনের কাজটি করিয়ে নিয়েছেন কালী। দাদার অনুরোধ রাণীর জামাই মথুর বাবুর একান্ত ইচ্ছাতেই মায়ের সাজবেশের ভার নিয়েছিলেন। কালীর প্রথম পূজারী তাঁর দাদা দেহত্যাগ করলে, পূজারীরূপে মায়ের পূজায় ব্রতী হলেন, পূজা শেষে দেবীকে প্রতিদিন রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদের লেখা গান শোনানোই পূজার বিশেষ অঙ্গ বলে স্থির করে নিলেন। প্রাণের সেই ব্যাকুল আকুতিতে নিবেদন করলেন প্রাণের পূজা, এমন কি করলেন আত্মনিবেদন। সেই কিশোর গদাধর দর্শন করলেন, স্পর্শ করলেন মৃন্ময়ীকে। প্রাণের ক্রন্দনে, ভরে রইলো মন্দির 'দেখা দে, দেখা দে মা। অসহ্য যন্ত্রণা হৃদয়ে। শুধু ক্রন্দন মা— মা— মা— দেখা দে'! সার্থক হল সে সাধনা। মা —সর্ব্বশক্তি মা— মা, অবশেষে দেখা দিলেন। তিনি হলেন কালীর সন্তান। সে কালী মধুর স্নেহময়ী মা। তিনি শায়িত রইলেন সেই মার কোলে। বললেন : ভাব মুখে থাক।

আর একজন তাঁরই পদতলে আত্মনিবেদনে দর্শন করলো সেই কালীকে। সে কালী, অনন্ত প্রেম প্রসবিনী, সৌন্দর্য্যময়ী, করুণাময়ী, সর্ব্বব্যাপ্তা তিনি। সেই প্রেমের মধ্যেই তিনি ভয়ঙ্করী। গুরু ছিলেন অনেক বেশী আত্মকেন্দ্রিক, তাঁর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তিনি ভয়ঙ্করীর অঙ্কে, সন্তান স্নেহে, আনন্দে মাতোয়ারা। আর একজনকে ত্রিনয়নের আগুনে ঝলসে তুললেন। দেখালেন সেরূপ— মৃত্যুরূপা কালী। রামকৃষ্ণের সেই জননী, দেখালেন কালীচরণের সাজ, নব সাজে সাজালেন তাঁর চেতনাকে।

নিবেদিতা— চোখে ভাসে গুরুর সেই কথা - ভাসে সেই সব সে দৃশ্য, অতলে তলিয়ে ভাবেন বারবার সেই কথা। উচ্ছ্বসিত সেই কণ্ঠস্বর : দাদার একান্ত অনুরোধ, মথুরবাবুর একান্ত ইচ্ছায়, মায়ের সাজবেশের ভার নিলেন। পরে পূজার ভার যখন এলো, পূজার শেষে দেবীকে প্রতিদিন রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্তদের লেখা গান শোনানোটাও হয়ে দাঁড়ালো পূজার অঙ্গ। রামপ্রসাদ তাঁর হৃদয়ের ভক্তি নিঙড়ে গান রচনা করতেন— আর সেই গান মাকে শোনাতেন। তাঁর সেই প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। তবে, তিনি কেন পাবেন না? ব্যাকুল হৃদয়ে বললেন: মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, আমাকে দেখা দিবি না কেন? ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাই না, আমায়— দেখা দে! অন্তরের ব্যাকুলতায়, চোখে জলে, বুকের ভারটা লঘু হয়ে আসতো। আশ্বস্ত বোধ করতেন। আবার সুরু করতেন নোতুন গান— বোধ হত এই গানেই তিনি প্রসন্না হবেন। ... পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন কেটে যায়। মনের অনুরাগ আর ব্যাকুলতা ক্রমেই বেড়ে যায়। পূজা ও সেবার সময় ক্রমে বেড়ে চলে। পূজায় বসে নিজের মাথা ফুল দিয়ে স্থানুর মত নিষ্পন্দ হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে যান। তিনি আমাদের বলতেন : যখন অন্নভোগ দিতাম মা খাচ্ছেন ভেবে কাটিয়ে দিতাম বহুক্ষণ। সকালে ফুল তুলতাম, মালা গাঁথতাম, মাকে সাজাতাম। সন্ধ্যায় আরতির সময়, অনুরাগে রঞ্জিত হৃদয় মার আরতিতে মগ্ন হয়ে পড়তো। দুপুরে মাকে গান শোনাতেও সেই তন্ময়তা, সেই ভাববিহ্বলতা। বার বার তাগাদা সত্ত্বেও আরাত্রিক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। ... দিনের পর দিন মনের অনুরাগ, ব্যাকুলতা, বেড়ে শরীরে নানা বাহ্যলক্ষণ দেখা দিত, আহার নিদ্রা কমে, বুক, মাথা, পিঠ, লাল হয়ে উঠলো। ছল ছল তাঁর চোখ, ভাগবদদর্শনের তীব্র ব্যাকুলতা : কি করি, কেমন করে পাই মাকে! সব সময় একই চিন্তা। যখনই ধ্যানপূজায় মগ্ন, শরীরে একটা আকর্ষণ ও চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিত। একদিন জগদম্বাকে গান শুনাতে শুনাতে সহসা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। "মা এত করে ডাকছি, কিছুই কি শুনছিস না! রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে দেখা দিবি না? হৃদয়ে অসহ যন্ত্রণা, যেন গামছা নিঙড়াচ্ছে! অস্থির হয়ে ভাবলাম, আর জীবনের প্রয়োজন নেই। মার ঘরে অসি ছিল, সহসা সে দিকে দৃষ্টি পড়লো তার উপর। উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে যেই অসি ধরেছি, সহসা মা দর্শন দিলেন। জ্ঞানশূন্য হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেলেন। সে দিন কেটে গেল, তার পরের দিনও। কিছুই জানতে পারলেন না। শুধু অন্তরে অনলভূত জমাট বাঁধা আনন্দ! উপলব্ধি করলেন 'মার সাক্ষাৎ প্রকাশ'।

"ঘর, দোর, মন্দির কোথায় সব তলিয়ে গেল। দেখছেন : এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! যে পাশে তাকান উর্ম্মিমালার তর্জ্জন, গর্জ্জন। মহাবেগে এগিয়ে চলেছে তা। দেখতে দেখতে সেটা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তলিয়ে দিলে আমাকে। হাঁপিয়ে হাবুডুবু খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লাম।"

যে চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্র দর্শনের কথা বলেছিলেন : সেটাই জ্যোতি ঘন জগদম্বার বরাভয় করা মূর্ত্তি। এই দর্শনের পর জ্ঞান যখন তাঁর ফিরলো : তিনি ডেকে উঠেছিলেন 'মা' 'মা' 'মা'।

এরপর তাঁর এই চিন্ময়ী রূপ বার বার দেখার আশায়, প্রাণে একটা অনাবিল ক্রন্দন জেগে উঠতো। সেভাবটা যখন আত্মপ্রকাশ করতো, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে 'মা কৃপাকর, দেখা দে—

আমায়' বলে কাঁদতে কাঁদতে থাকতেন, চারপাশে লোক জমে যেত, তাদের, ছবিতে আঁকা ছবি বলে মনে হতো। এদের দেখে মনে লজ্জা বা সঙ্কোচ দেখা দিত না। অনেক সময়, জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। তখনই দেখতেন, মার বরাভয়-করা চিন্ময় মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি হাসছেন, কথা বলছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন।.... ধ্যানে বসা মাত্র শুনতে পেতেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রন্থিগুলো খট খট শব্দে পায়ের তলা থেকে উপরে উঠে আসছে। ভিতর থেকে কে যেন তালা দিয়ে দিচ্ছে। প্রথম, প্রথম, দেখতে পেতেন জ্যোতিঃবিন্দু। কখনও বা কুয়াশার মত জ্যোতিঃপুঞ্জও চারপাশে ব্যাপ্ত। কখনও বা রূপের সে উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গ। চোখের পাতায় ভেসে বেড়াতো এইসব চিত্র। কিন্তু কি দেখছেন, বুঝতেন না, ভাল কি মন্দ, কিছুই জানতেন না। ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করতেন, মা আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝি না, যা করলে তোকে পাওয়া যায়, তাই আমায় শিখিয়ে দে! তুই না শেখালে, কে শেখাবে মা! তুই ছাড়া যে আমার গতি নেই, সহায় নেই। এর পর ধ্যানে বসলেই দেখতে শুরু করতেন, কখনও হাত, কখনও বা পা দুখানি, কখনও বা হৃসিভরা উজ্জ্বল মার মুখ। অন্য সময়েও দেখতেন, মা জ্যোতির্ম্ময়ী হাসছেন, কথা বলছেন, এটা কর, ওটা করিস না। তাঁর সঙ্গেই তিনি ঘুরছেন, ফিরছেন। মাকে অন্নাদি (ভোগ) নিবেদন করলে, মার চোখ থেকে একটা জ্যোতিঃরশ্মি লক্‌লক্ করে বেরিয়ে এসে, সেই সমস্ত নিবেদিত অন্ন, স্পর্শ করছেন। যেন মা ভোগ গ্রহণ করে সে জ্যোতিঃ, মার চোখে পুনরায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার কখন ও দেখতেন মার শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলোয় ভরা, খেতে বসেছেন তিনি। কখনও বা তাঁর উপস্থিতি দেখে, তাঁর পাদপদ্মে জবাবিল্ব অর্ঘ্য দেবেন, তন্ময় হয়ে চিন্তা করতে করতে সহসা বলে উঠছেন, রোস রোস আগে মন্ত্রটা বলি, তারপর খাস! কখনও বা পূজা না করেই নৈবদ্য নিবেদন করে দিচ্ছেন।

মূর্ত্তির সামনে, ধ্যানে বসলেই দেখতে পেতেন মূর্ত্তিতে তিনি জাগ্রত, অধিষ্ঠান করছেন স্বরূপে। কখনও বা দেখতেন সে পাষাণ মূর্ত্তি মিলিয়ে গেছে, বসে আছেন স্বয়ং চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি। তাঁর চৈতন্যে জগৎ সচেতন রয়েছে। নাকে হাত দিয়ে দেখতেন নিঃশ্বাস ফেলছেন তিনি। রাত্রে প্রদীপের আলোতে তাঁর ছায়া পড়ছে। কখনও নিজের ঘরে বসে শুনতেন, মা পাঁইজোর পরে, ছোট মেয়ের মত আনন্দে ঝম্‌ঝম্ শব্দ করতে করতে মন্দিরের দোতলায় উঠছেন। ছুটে এসে দেখতেন : সত্যই মা মন্দিরের দোতলার বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়িয়ে কলকাতা, কখনও বা গঙ্গা দর্শন করছেন।....

আর সেই সঙ্গে তাঁর নিজের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁর মাতৃদর্শনের কথা : পাঠ্যাবস্থায় বাবার মৃত্যু। মৃত অশৌচ শেষ হবার পর থেকে, জীবিকার সন্ধানে, কাজের চেষ্টায় মন দিলাম। অনাহারে খালি পায়ে, সেই খর দুপরের রোদে অফিস থেকে অফিস... ঘুরে বেড়াচ্ছি, অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কেউ কেউ সঙ্গে থাকতো, কখনও বা একাই ঘুরতাম। সর্ব্বত্রই বিফল যাত্রা। নির্ম্মমভাবে উপলব্ধি করলাম : স্বার্থশূন্য সহানুভূতি, বাস্তবের জগতে অত্যন্ত বিরল। দুর্ব্বলের স্থান এখানে নেই। কয়েকদিন আগে দেখেছি, আমাকে কিছুমাত্র, সহায়তার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য বলে ভাবতো যারা, এখন তারাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ক্ষমতা থাকলেও আমাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেছে। সংসারটা সেদিন আমার চোখে দৈত্যের রচনা বলে অনুভূত হতো। খালি পায়ে, ফোস্কা পড়ে গেছে, গ্রীষ্মের পিচ গলা সহর, দুপরে ঘুরে ঘুরে কখনও ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছি মনুমেন্টের তলায়, সঙ্গী দু একজন বন্ধু, তার মধ্যে একজন আমাকে আশ্বাস দেওয়ার আশায় গান ধরলো : 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্ম নিঃশ্বাস পবনে ....' কত প্রিয় ছিল এ গান— কিন্তু সেদিন এইক্ষণটি, আমায় মাথায় লাঠির আঘাত বলে মনে হল। ঘরে অসহায়, মা, ভাইবোন— অভিমানে ফুলে উঠলাম। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, নে, নে! চুক কর! যাদের ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব নেই, তাদের কাছে এটা কল্পনা— মধুর হতে পারে, আমারও

লাগতো, কঠোর সত্যের পরিচয়ে, আজ তা ব্যঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। .... ভোরে ঘুম ভাঙলে, গোপনে খোঁজ নিয়ে যখনই জানতে পারতাম, সকলের খাবার মত চাল নেই, হাতে পয়সা নেই, সেদিন মাকে আমার নিমন্ত্রণ আছে বলে বেরিয়ে পড়তাম। কোন দিন হয়ত কিছু জুটতো-কোনদিন বা তাও জুটতো না। অভিমানে, কারও কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারতাম না। আমার ধনী বন্ধুরা পূর্ব্বের মতই তাদের বাড়ী বা বাগানে, তাদের আনন্দের অংশীদার হতে অনুরোধ করতো, এড়াতে না পেরে, তাদের সঙ্গী হতে বাধ্য হতাম কিন্তু মন সাড়া দিত না। কেউ কেউ হয়ত জানতে চাইতো : এত বিষণ্ণ, এত দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে কেন? কেউ কেউ হয়ত অপরের কাছে আমাদের অবস্থার কথা শুনে বেনামীতে মাকে কিছু সাহায্য পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে চিরঋণী করে রাখতো!

যেসব বাল্যবন্ধু যৌবনের দুর্ব্বলতায় অসদুপায়ে, হীন জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল, তারা তাদের সঙ্গী করার চেষ্টা করলো। দেখলাম, তাদের আন্তরিকতা আছে। আমার দুঃখে, তাদের হৃদয় উথ্‌লে উঠেছে। অবিদ্যারূপিনী মহামায়াও ভোগের লালসার হাতছানি দিচ্ছে। তবুও ঈশ্বর মঙ্গলময়, এ 'চিন্তা', মনের মধ্য থেকে দূর করতে পারিনি। ঘুম ভাঙলেই তাঁকে স্মরণ করি! আশায় বুক বাঁধি, আবার পথে পাড়ি দিই। একদিন মা পাশের ঘর থেকে আমার কাতর প্রার্থনা শুনে, বলে উঠলেন : চুপ কর ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান —ভগবান তো সব করলেন!

মনে আঘাত পেলাম। স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলাম : সত্যই কি তিনি আছেন? থাকলে তিনি মানুষের সকরুণ প্রার্থনা শোনেন না কেন? এত যে প্রার্থনা করি, তার উত্তর নেই কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা থেকে এলো? মঙ্গলময়ের রাজত্বে, এত রকমের অমঙ্গল কেন? এই দুঃখে কাতর, বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা কানে ভেসে এলো : ভগবান যদি মঙ্গলময় ও দয়াময়, তবে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে, লাখ লাখ লোক দু মুঠো অন্ন না পেয়ে মারা পড়ে কেন? প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় আমার পূর্ণ হয়ে উঠলো।

চরিত্রে আমার গোপনতা ছিল না। অন্তরের চিন্তা, লুকানোর অভ্যাস ছিল না। ঈশ্বরের করুণা কোথায়? তাঁকে ডাকার প্রয়োজনই বা কি? হেঁকে ডেকে একথা জানাতে শুরু করলাম। রব উঠে গেল : আমি নাস্তিক হযে গেছি, চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে মিশে মদ খেতে বা বেশ্যালয়ে যেতে কোন কুণ্ঠা আমার নেই। যুক্তি দিয়ে, বোঝাতে চেষ্টা করলাম, নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভোলার জন্য, যদি কেউ মদ খায় বা বেশ্যাবাড়ী যায়, নিজেকে সুখী জ্ঞান করে, তাতে আমার আপত্তির কারণ খুঁজে পাবার কিছু নেই। যদি আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি, তাদের মত আমিও নিজেকে ভুলে ক্ষণিক এই সুখের ভাগী হতে পারবো, এপথ অবলম্বনে কুণ্ঠাবোধ করবো না।

কথা কানে হাটে। আমার কথা বিকৃত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কলকাতার ভক্তগণ পৌঁছে দিল। কেউ কেউ আমার স্বরূপ যাচাই করতে ছুটে এলো। কেউ কেউ ঠারে ঠুরে বুঝিয়ে দিল : যা রটেছে, সম্পূর্ণ সত্য না হলেও সত্যের সন্ধান তারা পেয়ে গেছে।

তাঁরা আমাকে এতদূর হীন ভেবেছেন জেনে, আমিও অভিমানে ফেটে পড়লাম। তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত উদ্ধৃত করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই তর্ক জুড়ে দিলাম। ফলে, আমার অধঃপতনের ইতিকথা হৃদয়ঙ্গম করে একে একে ফিরে গেলেন। আমি ও খুশী হলাম। ঠাকুরও হয়ত একথা শুনে, বিশ্বাস করবেন "আমি বয়ে গেছি"। কথাটা ভাবা মাত্র, অভিমানে মনটা ফেটে পড়লো। নিজেই স্থির করে ফেললাম : মানুষের ভালমন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন এতে কি যায় আসে?

স্তম্ভিত হলাম, যখন শুনলাম ঠাকুর একথা শুনে, হ্যাঁ না কিছুই বলেন নি। পরে ভবনাথ কাঁদতে কাঁদতে যখন জানালেন মশায়— নরেন এতো! স্বপ্নের অগচোর! ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বললেন, চুপ কর শালারা! মা বলেছেন, সে কখনও এরূপ হতে পারে না। যদি কখনও এ সব কথা বল, তোদের মুখ দেখতে পারবো না।

নাস্তিকতা পোষণ করে ছিলাম অহঙ্কারে, অভিমানে। ছেলেবেলা থেকে বিশেষ করে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই, যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হয়েছিল, সে সব কথা মনে উজ্জ্বল হয়ে ভাসতে লাগলো। ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন। তাঁকে লাভ করার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এ সংসারে প্রাণ ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। যতদুঃখ কষ্ট জীবনে আসুক, পথ খুঁজে বার করতেই হবে। দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, দোলায় মন, চিত্তের অস্থিরতায় মনের অশান্তি দূরতো হলই না, সংসারের অভাবও দূর করা সম্ভব হল না।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা এলো। কাজের সন্ধানে তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছি, সারাদিন উপবাস, বৃষ্টিতে ভিজে অবসন্ন পায়ে বাড়ী ফিরছি, শরীরে এত ক্লান্তিবোধ হতে লাগলো যে, একটা পাও এগুতে পারছিনা। পাশে একটা বাড়ীর রকে জড়পদার্থের মত বসে পড়লাম। চেতনা লোপ হল না, নানা চিন্তা, নানা ছবি, মনের কোণে উঁকি দিয়ে, পরক্ষণে মিলিয়ে গেল। সহসা উপলব্ধি করলাম : একটা দৈব শক্তির প্রভাবে ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরায়ণতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য নির্ণয় করতে না পেরে মনে, যে সন্দেহ দানা বেঁধে ছিল তা, একে একে মীমাংসা হয়ে গেল। অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশের, সন্ধান পেলাম। শরীরের সেই দুর্ব্বলতা নেই, মনে অমিতবল ও শান্তিতে পূর্ণ। রাত শেষ হতে আর দেরী নেই।...

মনের মধ্যে একটা উদাস ভাব— সংসারের প্রশংসা বা নিন্দার চিন্তাধারা, একই শ্রেণীভুক্ত। ভ্রূক্ষেপহীন দৃষ্টি, মনে দৃঢ় বিশ্বাস : অর্থোপার্জ্জন বা পরিবারবর্গের সেবায় সুখ ভোগ আমার কাজ নয়! গোপনে প্রস্তুত হলাম, পিতামহের মত গৃহত্যাগ করবো। দিন স্থির, খবর পেলুম ঠাকুর কলকাতায় এক ভক্তের বাড়ী আসছেন। ভাবলাম : ভালই হল! গুরুদর্শন করে চিরকালের মত গৃহত্যাগ করবো। দেখা হল তাঁর সঙ্গে। ধরলেন, 'তোকে আজ আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যেতে হবে। নানা ওজর তুললাম, কিছুতেই ছাড়লেন না। অগত্যা সঙ্গী হলাম তাঁর। গাড়ীতে কোন কথা হল না। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ বসার পর তাঁর ভাবাবেশ হল। দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার কাছে এসে সস্নেহে হাত ধরে সজল নয়নে গাইতে লাগলেন, "কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই, (আমার) মনে সন্দেহ হয়, বুঝি তোমায় হারাই হা-রা-ই।....

মনের ভাবাবেগ এতক্ষণ চেপে ছিলাম— আর পারলাম না। ঠাকুরের মত আমার বুকও চোখের জলে ভেসে গেল। বুঝলাম : ঠাকুর সব জেনে ফেলেছেন। ঘরে ভর্ত্তি লোক, তারা আমাদের এ আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঠাকুর প্রকৃতস্থ হবার পর কেউ কেউ প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, আমাদের ও একটা হয়ে গেল।

রাত্রে সকলকে সরিয়ে একান্তে নিজের কাছে ডেকে বললেন, আমি জানি, তুমি মার কাজের জন্য এসেছ, সংসারে থাকতে পারবে না কিন্তু আমি যতদিন আছি, ততদিন আমার জন্য থাক। বলেই বাকরুদ্ধ হয়ে পুনরায় চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

পরের দিন বাড়ী ফিরলাম। আবার সংসারের চিন্তায় জড়িয়ে পড়লাম। আগের মত কাজের চেষ্টায় ঘুরতে ফিরতে লাগলাম। এটর্নী অফিসে কাজ জোগাড় করে, কিছু কিছু অনুবাদ করে উপার্জ্জন সুরু করলাম। কিন্তু স্থায়ী কোন কাজ জুটলো না। মা ভাইদের স্বচ্ছলতার ব্যবস্থাও করে উঠতে পারলাম না। কয়েকদিনের মধ্যে মনে হল : ঈশ্বরতো ঠাকুরের কথা শুনেন, তাঁকে ধরে মা-ভাইয়েদের একটা ব্যবস্থা করলে কেমন হয়! নিশ্চয় আমার অনুরোধ তিনি দূরে ঠেলে দেবেন না।

ছুটলাম দক্ষিণেশ্বর। তাঁকে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলাম, মাকে বলে, মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট দূরের ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। আপনি মাকে জানেন। উত্তরে বললেন: ওরে, মাকে ও সব কথা যে বলতে পারি না। তুই চা'না! মাকে তুই মানিস না- সেইজন্যই তো তোর এত কষ্ট!

বললাম: আমি তো মাকে জানি না। আমার জন্যে মাকে বলুন! বলতেই হবে— আমি আজ কিছুতেই আপনাকে ছাড়বো না। সস্নেহে বললেন: ওরে, আমি যে মাকে কতবার বলেছি, মা নরেনের দুঃখ কষ্ট দূর কর। মাকে মানিস না তুই, সে জন্যেই তো মা শুনেন না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে 'কালী ঘরে' গিয়ে, মাকে প্রণাম করে, যা তুই চাইবি, মা তাই তোকে দেবেন। মা আমার চিন্ময়ী, ব্রহ্ম-শক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেন, তিনি ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন!

মনে বল এলো। ঠাকুর যখন বলছেন, নিশ্চয় প্রার্থনা মাত্র সকল দুঃখের অবসান হবে। মনে প্রবল উৎকণ্ঠা, রাত্রির জন্য গভীর প্রতীক্ষা। অবশেষে এলো সেইক্ষণ। এক প্রহর গত হল, ঠাকুর আমাকে মন্দির যেতে বললেন।

চলেছি, মনে নেশার ঘোর, পা টলছে, মাকে সত্য সত্য দেখতে পাবো, মার শ্রীমুখের বাণী শুনতে পাবো, গভীর একটা বিশ্বাস! তন্ময় হয়ে মন্দিরে ঢুকলাম, দেখলাম, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী। সত্য সত্যই জীবিতা অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ স্বরূপিণী। ভক্তি, প্রেমে, হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হয়ে গেল। বিহুল হয়ে বার বার প্রণাম করতে করতে, বললাম : মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও! তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি যেন। আমাকে এই মত করে গড়ে তোল তুমি! প্রাণ শান্তিতে আপ্লুত, জগৎ-সংসার মুছে গেছে, মা আমার হৃদয় জুড়ে বসে আছেন। ফিরলাম ঠাকুরের কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে মার কাছে সংসারের অভাব দূর করার প্রার্থনা করেছিস তো! চমকে উঠলাম সে প্রশ্নে। বললাম, না ভুলে গেছি। এখন কি করি? বললেন, যা- যা, ফের যা, মাকে জানিয়ে আয়! ছুটলাম মন্দিরে। মুখোমুখি হলাম মার, মোহিত হয়ে গেলাম। ভুলে গেলাম মনের বাসনা। ভক্তি ভরে প্রণাম করে, জ্ঞান, মুক্তি, লাভের প্রার্থনা জানালাম। ফিরলাম যখন, ঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন : কিরে, এবার বলেছিস তো? চমকে উঠলাম। বললাম : না! মাকে দেখামাত্র দৈবমায়ায় সব ভুলে, জ্ঞান, ভক্তি লাভের প্রার্থনা জানিয়েছি। কি হবে! ঠাকুর বললেন : দুর ছোড়া, নিজে একটু সামলে নিয়ে মনের আকাঙ্ক্ষাটা জানাতে পারলি না? পারিস তো আর একবার গিয়ে কথাগুলো মাকে জানিয়ে আয়। যা, শীগ্‌গীর যা! ছুটলাম পুনরায়। মন্দিরে ঢোকা মাত্র দারুণ লজ্জা, হৃদয়-দ্বার আমার রুদ্ধ করে দিল। মনে হল কি তুচ্ছ কথা বলতে এসেছি! ঠাকুরের কথায়, রাজার প্রসন্নতা লাভের পর লাউ কুমড়ার ভিক্ষা' —কি নির্ব্বুদ্ধিতা! এত হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায় অনুশোচনায় প্রণাম করতে করতে বললাম, অন্য কিছু চাই না মা, কেবল, জ্ঞান, ভক্তি দাও!

মন্দির থেকে বেরিয়ে মনে হল : এ নিশ্চয় ঠাকুরেরই খেলা। আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে ধরে বসলাম— এখন আপনাকেই বলতে হবে আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূরের কথা।

ঠাকুর বললেন : কারও জন্যে, ওরূপ প্রার্থনা যে করতে পারি না — আমার মুখ দিয়ে যে তা বার হয়না! তোকে বললুম - মার কাছে যা চাইবি, তাই পাবি। তুই চাইতে পারলি না! অদৃষ্টে তোর সংসার সুখ নেই। আমি আর কি করবো?

জোর দিয়ে বললাম: আমার জন্যে ঐ কথা আপনাকে বলতেই হবে! আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ছি না।

আমার নাছোড়বান্দা মুখের দিকে তাকিয়ে শেষে বললেন : আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব কখনও হবে না!.... হ্যাঁ.... এই আমার পুতুল পূজারী গুরু। মা কালী তাঁকে নিয়ে খেলা করেন, দেখা দেন, তাঁর স্নেহের পাত্রদেরও।

সেদিন একথাগুলো ছিল শ্রুতি। এবার প্রত্যক্ষ করছেন শ্রীগুরুর সেই মাতৃচেতনাকে। ভারতের কালীর কথা নিজেও শুনেছেন বহুবার, তখন ছিলেন শিশু। আজ তাঁর প্রত্যক্ষ অস্তিত্বে ঝলসে উঠেছেন। এই অভিজ্ঞতাকে জন্মান্তরের সৌভাগ্য বলে মেনে নিলেন নিবেদিতা।

ভারতে পা দেবার পরেই একদিন শ্রীমার বাড়ীতে স্বামিজীর দেখা পেলেন। ইতিমধ্যে প্লেগ সহরে পা দিয়েছে। আতঙ্কে লোক পালাচ্ছে। দাঙ্গা সুরু হয়েছে। রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই গরম। প্রায় ঝড় ওঠে ওঠে। অমঙ্গলের সঙ্কেত চারদিকে। স্বামিজী তাঁকে বললেন :' কিছুলোক কালীর অস্তিত্ব নিয়ে তামাশা করে। মহাকালী আজ বেরিয়ে পড়েছেন জনগণের মধ্যে। পাগলের মত ভয়ে লোক পালাচ্ছে। সৈন্য ডাকতে হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে। কে বলে, ঈশ্বর শুভের মতই অশুভেও নিজেকে মেলে ধরেন না? শুধু হিন্দুই তাঁকে অশুভ রূপেও পূজা করতে সাহসী।...(মে ১৮৯৮)

ইতিমধ্যে নিবেদিতা কালীঘাট মন্দির দর্শন করে এসেছেন। সেখানে মার মূর্ত্তি দেখে এসেছেন, বলিদানও দেখেছেন আর স্বামিজী তাঁর কথা ও আচরণে ফুটিয়ে তুলেছেন : ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ধর্ম্ম, শিব যার প্রতীক, আবার এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য, শ্মশানেরও প্রতীক। কালী, সেই মৃত্যু, মহা শ্মশান। ভাবপ্রবাহের মধ্যে তলিয়ে যেতে সুরু করেছেন। ডায়েরীতে লিখে রাখলেন : স্বামীজির কথায় মনে হচ্ছে ত্যাগের পতাকাই, মহাবিজয়ের পতাকা— চিরন্তনী বধূর মহামিলনের যাত্রায়, আত্মার ভূষণ হয়— দারিদ্র্য ও আত্মবিজয়! শুধু দাও, জীবনের সুদীর্ঘ সুযোগ, যা পাওয়া গেল সেটা অনুভব করো দুঃখ। তারই জন্য!...

কয়েক সপ্তাহ পরে যখন কাশ্মীরে! তখনও স্বামিজী বললেনঃ হিন্দুরা সুখের পূজা করে না, দুঃখেরও নয়, তারা উভয়েরই করে— সুখ দুঃখের পারে যেতে।

কথা প্রসঙ্গে কালীঘাটের আলোচনায় এসে গেলেন। নিবেদিতা শুধালেন : প্রতিমার সামনে সষ্টাঙ্গে নত হয় কেন? স্বামিজী তখন একটি তিল ফুল দেখিয়ে বললেন : এই হল আর্য্যদের আদিতম তৈলবীজ! প্রশ্ন শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। হাত থেকে ছোট সেই নীল ফুলটি পড়ে গেল। সসম্ভ্রম ঘন কণ্ঠে বললেন : প্রতিমার সামনে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর এই পর্ব্বত মালার সামনে সাষ্টাঙ্গ হওয়া, এক জিনিষ নয় কি? (২০শে জুন)

ধর্ম্ম বিশ্বাস, পথ ও পন্থা সমুদয়, গণ্ডীকে অতিক্রম করার যে মানসিক দ্বন্দ্ব সূচিত হয়েছিল তাঁর জাগ্রত বিবেকী মনে, 'লাইট অফ এশিয়া' পাঠে যে তৃপ্তির বোধ জেগেছিল মনের কন্দরে, সেই তৃপ্তির পরশ পেয়েছিলেন ভারতীয় যোগীর দর্শনে। আকৃতিতে মুগ্ধ, সাদৃশ্য স্থির ধীর ধ্যানের প্রতিমা, প্রতিটি বাণীর ঝঙ্কারে, জাগে চিত্তের প্রশস্তি। চুম্বকের মত আকর্ষণ করে অন্তরাত্মাকে! প্রচারে ব্রতী, বেদান্তের বাণী— সমদর্শিতা। সবধর্ম্মই মিলত হয়েছে, একই কেন্দ্র বিন্দুতে। ধর্ম্ম সেই যাত্রাপথ, উপলক্ষ্য একই বস্তু। সমস্যাবহুল জগতে যেন আলোর প্রদর্শক ইনি। শুনলেন : সে বাণী। দাগ কাটলো মনের কোণে। কোথায় যেন সমচিন্তার একটা সূত্র দেখা যায়। আকৃষ্ট হলেন। যেখানেই তাঁর সভা, সেখানে ছুটেন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে। প্রতিটি বক্তৃতার, প্রয়োজন মাফিক, নোট নেন। মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন। মিলিয়ে নেন, নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টির বেগধারার সঙ্গে। কয়েক মাস পরে, তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন আমেরিকায়। জড়িয়ে পড়লেন

তাঁরই প্রবর্ত্তিত বেদান্ত শিক্ষাকেন্দ্রে। এটা পরস্পরকে ছিল চেনা জানার প্রথম ধাপ। নিজেকে বিশ্লেষণের প্রথম সূত্র। প্রস্তুতি চলেছে আত্মনিবেদনের।....

ভারতে ফেরার পথে দ্বিতীয়বার আগমন। সেখানেই পেলেন ডাক। সাড়া দিল প্রাণ— কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে পারলেন না। পরদিন পেলেন তাঁর চিঠি। হারিয়ে গেল সব বাঁধন। প্রস্তুত হলেন : আত্মনিবেদনে। বেদান্ত প্রচারের কাজে, নিজের অজ্ঞাতেই জড়িয়ে পড়েছেন, তুলে নিয়েছেন সে ভার, তাঁর অনুপস্থিতির শূন্য আসনে।....

তিনি চলে এলেন। নিজেকে তৈরী করতে লাগলেন তাঁর সহযাত্রীরূপে। ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন তাঁর কাজে, তাঁর পথে। আত্মসর্ম্পন নয় নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া— আত্মবিলয়ে।

প্রথমে দর্শন, পরে আকর্ষণ, এর পরেই চলে একান্তে বিলিয়ে দেওয়ার পালা। দেখেছেন, বিশ্বশান্তির প্রতিমূর্ত্তি স্বয়ং বুদ্ধ, যত অগ্রসর হয়েছেন দেখেছেন স্বয়ং মহাদেব, অমরনাথ যাত্রাপথে। আর ক্ষীরভবানীর মন্দিরের পরে দেখলেন স্বয়ং কালীর সন্তান। মুখে, কথায়, ধ্যানে 'মা' ছাড়া কিছু নেই। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, সর্ব্বময়ী তিনি। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া জীবন গতিহীন। তিনি চিরশান্তির দূত, মহামৃত্যু! হ্যাঁ, মহা মৃত্যুর পূজারী তিনি। (২৬শে জানুয়ারী।)

২৯শে জুন তিনি (স্বামিজী) শোনালেন : প্রচুর কবিতা, শোনালেন গান:

এসো মা, ও হৃদয় রমা, পুরাণ পুতলী গো,
হৃদয় আসনে হওমা অসীনা, নিরখি তোরে গো।
আছি, জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জানগো জননী, কি যাতনা সয়ে
একবার হৃদয় কমল বিকাশ করিয়ে
প্রকাশ তাহে - আনন্দময়ী গো।

[Be seated, Mother, on the lotus of my heart,
And let me take a long long look at you
from my birth up. I am gazing
Mother, at your face—
Know you suffering what trouble and pain?
Be seated, therefore, blessed one
on the lotus of my heart,
and dwell there for ever more]

১৬ই জুলাই নদীপথে নৌকাযাত্রার সময়ে গেয়ে চললেন একের পর এক রামপ্রসাদের গান।

ভুতলে আনিয়ে মাগো, করালি আমায় লোহাপেটা,
(আমি) তবু কালী বলে ডাকি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা।

[I call upon thee Mother,
for though his Mother strike him
the child cries 'Mother' oh Mother!]

মন কেন রে ভাবিশ এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মত

[Though I can not see thee,
I am not a lost child
I still cry 'Mother' Mother!]

আমি তেমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।
[I am not the son to call
Any other woman 'Mother']

২০ শে জুলাই নদীর ধারের ক্ষেতের উপর দিয়ে চলেছেন তিনজন। স্বামিজী আরম্ভ করলেন 'পাপবোধ' নিয়ে। বললেনঃ মিশরীয়, সেমিটিক ও আর্য্যদের মধ্যে পাপ বোধ কি? বলতে বলতে বেদে এসে থামলেন। শয়তান যেখানে ক্রোধের অধীশ্বরী মার। বৌদ্ধদের মধ্যে তা কামের অধীশ্বর 'মার' বুদ্ধদেবের আখ্যায় মারজিৎ। কিন্তু বাইবেলে হামলেট শয়তান। বৈদিক ক্রোধের অধীশ্বর। বাইবেলের মত, সৃষ্টি কে দুভাগে ভাগ করেনি। যে সর্ব্বদাই অপবিত্রতার প্রতিভূ, ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী দ্বৈত্বের প্রতিনিধি নয়।

জরথুষ্ট্র প্রাচীনতর ধর্ম্মের সংস্কারক। আমার মতে অর্মাজদ্ ও আহ্রিমান পর্য্যন্ত পরম শক্তি নন, পরমের বিকাশ মাত্র। এই প্রাচীনতর ধর্ম্ম, বৈদান্তিক না হয়ে যায় না।.... মিশরীয় ও সেমাইটগণ পাপ-বাদকে আকড়ে ছিল বা আছেন, আর আর্য্যরা তথা ভারতীয় ও গ্রীকগণ, তা দ্রুত ছেড়ে দিয়েছেন। ভারতে ন্যায় হয়ে দাঁড়ালো 'বিদ্যা' এবং অন্যায় বা পাপ 'অবিদ্যা'। আর্যদের মধ্যে পারসিক ও ইয়োরোপীয়রা সেমিটিক ভাব গ্রহণ করে, ফলে তাঁদের মধ্যে পাপবোধের প্রাধান্য দেখা দেয়।...

আসন্ন সন্ধ্যায় আপেল গাছের তলায় ধীরা মাতা (মিসেস ওলিবুল) ও জয়ার (ম্যাকলাউড) সঙ্গে বসে নিজের বিষয়ে বলছেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন তাঁর আত্ম উন্মোচন রূপ। এরপূর্ব্বে এ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েনি। হাতে দুটুকরো পাথর তুলে নিয়ে বললেন, যখন সুস্থ থাকি, মনটা, এটা ওটা নিয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছা শক্তি কিছুটা দুর্ব্বল হতে পারে কিন্তু সামান্য অসুখ বা যন্ত্রণা বা মৃত্যুর আভাষ পাই ক্ষণিকের জন্য, হাতের পাথর দুটো ঠুকে বললেন : আমি কঠিন হয়ে উঠি, কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি!...

এই জুলাইয়ের শেষে যাত্রা অমরনাথ। চললেন সঙ্গে। গুরু শিবধ্যানে মগ্ন। চলেছেন তাঁকে শিবের কাছে, তাঁর কন্যাকে উৎসর্গ করতে। ... ২রা আগষ্ট, দর্শন করলেন অমরনাথের তুষার বিগ্রহ ও গুরুর সেই চিন্ময় অমরনাথের দর্শন প্রাপ্তির আলোকে উদ্ভাসিত দিব্য-রূপ। মনে পড়ে গেল কয়েক মাস আগে এই শিবসাজেই তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেদিনও মনে হয়েছিল ইনি স্বয়ং শিবের অবতার। আজ তা পরিপূর্ণ। এটা জীবনের সৌভাগ্যতম মুহূর্ত্ত।...

ক্ষীরভবানী যাত্রার দৃশ্য বর্ণনায় তিনি মনের অনুভূতির ছাপ এঁকে বললেন : অমরনাথ যাত্রার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমাদের জীবন শিবভাবনায় সমাহিত। প্রতিপদক্ষেপে, যাত্রাপথের কাছাকাছি তুষার পর্ব্বতমালার দৃশ্য, চোখের পাতায় যতই ভাসতে লাগলো, ততই প্রতিভাত হতে লাগলো সেই শিবের সাক্ষাৎ প্রতিমা, তাঁরই ভবনে অবস্থান করছেন তাঁরা। রাতের সুচনা, নবীন চাঁদের উদয়, বাতাসের মাতামাতি, শিহরিত দেবদারু পাতার সেই নৃত্যের ঝঙ্কার, অনিবার্য্যরূপে মনের কোনে প্রতিভাত হত মহাদেবের ললাটছবি। সে ধ্যানরাজ্যের বাইরে ছিলাম আমরা, আর আমার গুরুর হৃদয়কেন্দ্রে বিরাজিত স্বয়ং যোগীশ্বর, নীরব শান্ত, সমাহিত, গুণাতীত, বাক্যমনাতীত হৃদয়গম্য হিন্দু কল্পনার শিব, ঈশ্বর তিনি!

চরমজ্ঞানের অন্বেষণে ... অব্যক্তের উপর ব্যক্তিভাবের আরোপ :

যে দৃশ্য প্রতিয়মান হয়ে ওঠে... সেটিই ঈশ্বররূপ গ্রহণ করে। এই যে ব্যক্ত রূপ, তার পিছনে থাকে শক্তি ও ঈশ্বর। যে, এই ব্যক্ত রূপের গভীরে প্রবেশ করতে পারে, সেই ঈশ্বরের প্রতীক তাৎপর্য্য অনুধাবনে সমর্থ হয়। সে প্রতীক, শিব ও শক্তির যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হবেই।

পরব্রহ্মকে যদি চিন্তার অধীন করতেই হয়, আদি, অন্ত, রূপ পুরুষ বা শক্তিরূপের ধ্যানে মগ্ন হতেই হবে। কারণটা অজ্ঞাত। কিন্তু আগষ্ট মাসেই স্বামিজীর চিত্ত শিব থেকে শক্তির আকর্ষণে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল। তাঁর মুখে শোনা গেল সাধক রামপ্রসাদের গান। মন, শিশু ভাবনায় তলিয়ে গেছে। শিষ্যকে বললেন : যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি মা— মা আমার ঘরের মানুষ, ঘরেই আছেন। সহজ ও স্বাভাবিকভাবে 'মা' বলে ডাক। সেভাবটি তাঁর দলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। আমাদের মধ্যেও সেই ভাব ছড়িয়ে পড়লো : আমরা বড়রা বলতে শুরু করলাম এইভাবে 'মার ইচ্ছা মাই জানেন'। ক্রমে সেই ভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। এতদিন সুখ ও দুঃখ, ভাল ও মন্দ এদের উপরে উঠবার আদর্শকে বোঝবার চেষ্টা করে, হিন্দুরা এইভাবে পাপবোধ সমস্যার সমাধান করেছেন— এখন ঝাঁপিয়ে পড়লেন পৃথিবীর যন্ত্রনার দুর্ব্বোধ্য অন্ধকার দিকটার উপর। জগৎ প্রপঞ্চের অন্তরালের সত্যকে লাভ করবেন এই পথে। ক্ষীরভবানীর শক্তিতীর্থ একাই গেলেন স্বামিজী। যখন ফিরলেন পরিবর্ত্তিত উদ্দীপিত দিব্যরূপ নিয়ে। নিবেদিতার মন তলিয়ে গেল সে-রূপ দর্শনে। উপলব্ধি করলেন : তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। এই তীর্থ যাত্রার পূর্ব্বে লিখেছিলেন 'কালী দি মাদার' এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। আর ফিরলেন যখন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। নিবেদিতার দার্শনিক সংশয়কে নিবৃত্তি করে দিল চিরদিনের মত। ১৮৯৮ সালে আগষ্ট— অক্টোবরে যে বিশ্বাসের সূত্রপাত হয়েছিল, অবশিষ্ট জীবন, সেই স্রোতে ভেসে চলেছেন তিনি। প্রণাম জানালেন 'নববিশ্বাসের উদয় ক্ষেত্র দেখছি, দেখেছি বিশ্বাসের জন্মদাতা পুরুষকে।''

এরপর থেকেই তাঁর মধ্যে এই চেতনার প্রকাশ পেতে সুরু হল। তিনি তৈরী হতে লাগলেন। ৩রা জানুয়ারী ১৮৯৯, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আসার জন্য। এলবার্ট হল নেওয়া হয়েছে। বক্তৃতার বিষয় কালী ও কালীপূজা। যা বলতে চাই লিখে ফেলে রাজার কাছে নিয়ে যেতে চাই। মূল ব্যাপারটায় (শাস্ত্রীয় ব্যাপারে) সাহায্য করবেন। আমার সর্ব্বোচ্চ প্রার্থনা এই যে, কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে কালী পূজাকে সহানুভূতির আলোকে তুলে ধরতে যেন ব্যর্থ না হই। ৩০ তারিখে পুনরায় জানালেন, রবিবার বোধ হয় আমার কালী বক্তৃতা। সময় এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস। সব জিনিষেরই যেমন সময় আছে। মিসেস বুল Blessed Sacrament-এর সময়ে ধ্যানকে যেমন ভালবাসেন সেই জিনিষটি কালী বক্তৃতায় তুলে ধরবো।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী বক্তৃতা হল না। হল ১৩ই, অ্যালবার্ট হলে। বক্তৃতায় বললেন : এখানে দাঁড়িয়ে কালীপূজার বিষয়ে বক্তৃতা করার অধিকার আমার অল্পই আছে— এ বিষয়ে আমি সচেতন। সংস্কৃতবান বা ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে এমন জ্ঞান আমার নেই, যার দ্বারা এই উপাসনার বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নানা মতের বিচার করতে পারি। ভারতে মাত্র এক বছর আমি এসেছি এবং আমাকে প্রায়শঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ যা আমার কাছে অবিসংবাদিত সত্য মনে হয়, একবছর পরে তা ভিত্তিহীন রূপে প্রতীয়মান হতে পারে। সে যাই হোক, কিছু দাবী আমার আছে। প্রথমতঃ সারাজীবন ধরে আমি কালী পূজার কথা শুনে আসছি, কালী বা তাঁর পূজকদের সম্বন্ধে মোটেই স্তুতিবাচক সে বাক্য নয়। এখন আমি সেই বস্তুটির সংস্পর্শে এসেছি সুতরাং এখানে উঠে আমার একথা বলার অধিকার আছে যে, বাল্যকালে যে কথা আমি শুনেছি, তা অর্ধসত্য —পূর্ণসত্য নয়। এবং পূর্ণ সত্যের সন্ধানই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ একজন ইংরাজ রমণী রূপে ক্ষমা প্রার্থনা করার অধিকারও আমার আছে। আমার দেশের নরনারী, অন্য একটি দেশের মানুষের সমতুল্য, মানুষের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্মবিশ্বাসের কুৎসা করে যে অন্যায় করেছে, তার জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা আমি চাইতে পারি। এবং এই আশা পোষণ করতে পারি পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহানুভূতির বিস্তারের দ্বারা এই ধরণের কুৎসা প্রচার বন্ধ হবে। শেষে কথা : সদ্য লব্ধ কোন ধারণাকে প্রকাশের অধিকারও আমার আছে। অনেক সময় আমরা ভুলে যাই

যে, প্রথম ধারণা সৃষ্টি, যার দ্বারা হয়, সর্ব্বশেষ ধারণা, সৃষ্টিকারী জিনিসের মতই তা সত্য। উভয়েই সমগ্রের আবশ্যিক অংশ। সকল শ্রেয় এবং সকল সুন্দর সম্বন্ধে একথা খাটে। ধর্ম্মচেতনার মত জটিল ও বিস্তারিত ক্ষেত্র সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। ধর্ম্মবোধ, তার সকল অভিব্যক্তি স্তরের দ্বারাই বিচার্য্য। প্রতীক সর্ব্বনিম্ন বা সর্ব্বোচ্চ, যে অনুভূতিই সৃষ্টি করুক না কেন, তার কোন কিছুকেই অবজ্ঞা করা যায় না। অবশ্যই সর্ব্বোচ্চকে প্রধান স্থান দেব। অবশ্যই মনে রাখবো, প্রতীককে সহজে মেনে নিলে মানুষ বদ্ধ হয়ে পড়ে, যে প্রতীকের মধ্য দিয়ে যোগী উচ্চতর ঈশ্বরানুভূতি পেয়েছে, সেই জিনিষই নিতান্ত বাহ্যিক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই নিম্নতর পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার করার কালে বা এ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাবধান হতেই হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে এটি ক্রমোন্নয়নের নিম্নস্তর পর্য্যায় থেকে অতিক্রম করে সাধক সমুচ্চ দর্শনাদি লাভ করেছেন।

আবার অনেক সময়ে সতেজ নোতুন দৃষ্টির প্রয়োজন আমবা বিশেষভাবে অনুভব করি। এখানে তার প্রয়োজন কতখানি আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমরা নিজেদের বিষয়ে বলতে পারি, বাল্যকাল থেকে খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা, গল্প শোনার মত মারাত্মক জিনিষ খুব কমই হয়, তার ফলে গ্যালিলির সমুদ্রতীরে জুডার শৈলশিরে যাপিত সেই অপূর্ব্ব জীবনের সমস্ত তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায়, কোন তাৎপর্য্যই আর বহন করে না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের জীবনের সামনে প্রথম আবির্ভূত হলে হয়তো তা পৃথিবীর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রাণবস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং বহিরাগত মনের উপর আমাদের ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখলে অনেক সময়ে আমাদের উপকার হয়। আরও দুটি জিনিস একইভাবে সাহয্য করে (১) অন্য ধর্ম্মের অনুশীলন যা তুলনার ও নবসিদ্ধান্তের সুযোগ করে দেয়, (২) একদল মানুষ (কিংবা একটি মানুষ, তার জীবনের এক পর্ব্বে) কর্ত্তৃক সমস্ত ব্যাপারটার সত্যতা অগ্রাহ্য করার ফলে, মতের ভিত্তিভূমি, তার তাৎপর্য্য এবং জীবনের কাছে তার দাবীর বিষয়গুলি পরীক্ষিত ও পর্য্যালোচিত হতে পারে। কলকাতার এখনার জীবনে, একদল লোকের মধ্যে মাতৃরূপে ঈশ্বরাধনার ভাবটিকে অশ্রদ্ধা ও অগ্রাহ্য করার যে মনোভাব রয়েছে ধন্যবাদের সঙ্গে জানাতে পারি, মাতৃসাধনার ভাবকে শক্তিশালী পরিষ্কৃত করার ব্যাপারে, তার চেয়ে 'সুপরিকল্পিত' উপায় আর কিছুই হতে পারে না। আমরা যেন ভুলে না যাই, তাঁরাও আমাদের মত সত্যসন্ধানী। তাঁরা যা বলতে চান, সাবধানে তার বিচার বিবেচনা করা দরকার, এই কথা জেনে যে, স্বয়ং জগন্মাতা, তাঁদের কণ্ঠে আমাদের কাছে তাঁর কথা বলছেন, যাতে তাঁদের এবং আমাদের ভালবাসা ত্রুটিহীন হয়ে ওঠে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা অনুভব করেন যে, ঈশ্বর সন্ধানই জীবনের সব হওয়া, সব পাওয়ার লক্ষ্য এবং তিনিই প্রাজ্ঞ ও পূর্ণ জীবনবস্তু, যিনি সমগ্র আত্মাকে বিদীর্ণ করে চীৎকার করে উঠতে পারেন : তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণ যেমন নির্ঝরিনীর জন্য ব্যাকুল, তেমনি আমার আত্মা ব্যাকুল তোমারই জন্য হে প্রভু! তাঁদের কাছে জাতীয় রীতিনীতি, জাতীয় ইতিহাস, জাতির জীবনদৃষ্টি সবকিছুই ঈশ্বরোপলব্ধির প্রকাশ, ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে।

এইজন্য সেমাইটগণ ঈশ্বর ধ্যানের সর্ব্বোচ্চ ভাবাবেশের ক্ষণে ঈশ্বরকে 'আমাদের পিতা' বলে সম্বোধন করেন এবং ইয়োরপীয়েরা ঈশ্বরের প্রতি পুত্রভাব যোগ করার অভিপ্রায়ে দেখেছে— তাঁর উপরে আনত হয়ে আছেন মহিমান্বিত নারী (Glorified Maiden) যাঁকে তাঁরা জানে 'Our Lady' বলে।

ভারতে কিন্তু নারী সম্বন্ধে ধারণা সহজতর, অনেক ব্যক্তিগত এবং সুসম্পূর্ণ। কারণ ভারতের কাছে গৃহবন্ধনের হেতুস্বরূপ একটি সম্পর্কই আছে, যা দেহের প্রতি তন্ত্রীতে প্রবিষ্ট বা শুচিতা সৃষ্টি করে, যা কিন্তু পিতৃত্ব নয়— সুতরাং বিস্ময়ের কি আছে যদি ভারতবর্ষে সেই সম্পর্কের সূত্রেই মধুরতম নামে ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকে?

ঈশ্বর জননী। আশ্চর্য্য রহস্যের আকর্ষণ অনুভূত হয়, যে আকর্ষণ ও রহস্য বোধ— 'ভারত' শব্দটিকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে, ভারতীয় ইতিহাস বা দর্শনের অনুশীলনকারীদের কাছে।

বহু প্রাচীনকালে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্মের পূর্ব্বে ভারত রত্নভাণ্ডার। মূল্যবান পাথর, চন্দনকাঠ, হাতীর দাঁতের জন্য যার দারস্থ হতেই হতো। তারপরে এক সময় এলো, গ্রীসের উপর যখন পাশ্চাত্য পৃথিবীর দিনোদয় হচ্ছে, তখনও ভারতের বহুল তাৎপর্য্য ছিল সেই নোতুন জীবনের কাছে। সেই বৌদ্ধযুগ, যখন ভারতের নাগা সন্ন্যাসীরা গ্রীক দার্শনিকদের শিখিয়ে ছিল, তার প্রাচীন প্রাজ্ঞার কথা? হ্যাঁ তখনও কালের হিসাবে সে প্রাজ্ঞ প্রাচিন। তারপর এল ইউরোপে মধ্যযুগ, ভুমধ্যসাগরের চারপাশের দেশগুলি নিঃশ্বাস ফেলবার কিছুটা সময় পেয়েছে, ক্রুসেড বেঁধে গেছে। ক্রুসেড, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন ভূমি, প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্য স্বার্থ বাগদাদের দিকে প্রবল ধারায় প্রবাহিত, তারপরে সারাসেনদের দ্বারা সিরিয়ার মরুভূমে নিক্ষিপ্ত।

সেই ক্রুসেড কালে, পরে স্পেনে মূর অধিকার কালে এবং সেই চির আকর্ষণীয় ভেনিস ও জেনোয়ার প্রাচীন বন্দর সমূহের রাজপথে, ও সংকীর্ণ গলিতে, সর্ব্বকালে ভারত নামটি ঘিরে চিররহস্যের সূত্রপাত হয়েছিল।

ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের কথিত অপূর্ব্ব কাহিনীগুলি, ভারতীয় প্রাসাদসমূহ এবং প্রহরীগণের জাঁকজমক, যাদুকরদের অদ্ভুত খেলা এবং হঠযোগীদের শরীর সামর্থ্যের অসাধারণ প্রদর্শনী এইসব কিছু, 'ভারত' শব্দটি উচ্চারণমাত্র তাদের মনে জেগে উঠতো। যারা কখনও নিজ জন্মভূমে তালীবান পথে হাঁটেনি, কিংবা বনময়ুরের কলাপ বিস্তার দেখেনি।....

পরবর্ত্তীকালে ভারতে ইংরাজ অধিকারের সূচনাপর্ব্বে ভারতীয় দার্শনিক শব্দগুলিকে কেন্দ্র করে মোহসৃষ্টি হয়েছিল। 'মায়া' শব্দটির চলিত অর্থের চারপাশে মায়ালোকের বিস্তার এবং চেতনার শিহরণ 'মাতৃরূপী ঈশ্বর' সম্বন্ধেও। তাই বলে, আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন কোন ধর্ম্মের পক্ষে কি এই মাতৃভাবকে সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব? কদাপি নয়। গ্যালিলিয়ার আচার্য্য প্রবর.তা বিস্মৃত হন নি। একটি ক্ষুদ্র শিশুকে সকলের মধ্যে স্থাপন করে তিনি বলেছিলেন, 'যে নিজেকে এই ক্ষুদ্র শিশুর মত নম্র, কোমল করে তুলতে পারবে, সে স্বর্গরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হবে।' সেন্টপল তাঁর শিষ্যদের কাছে চিঠি লিখতেন আতুর জননীর মত, যাতে তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের জাগরণ হয়। সেমিটিক ভাবের মধ্যে সাহায্য ও সদুপদেশের যথার্থ ও মধুর প্রতিটি শব্দ প্রবেশ করেছে— 'যেমন পিতার সকরুণ ভালবাসা সন্তানের প্রতি' এবং আর্য্যদের মধুরতম ধারণার মতই 'যেমন মাতার সকরুণ ভালবাসা সন্তানের প্রতি।'

খ্রীষ্টধর্ম্মে কিন্তু ঐ ভাবটি স্পষ্ট প্রকাশিত হয়নি। আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং এখানেই নারী সম্বন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয় আদর্শের বিচিত্র পার্থক্যের কথা ওঠে— যা ইউরোপের ক্ষেত্রে অধিকভাবে ঈশ্বরাধনায় মাতৃভাবের প্রকাশকে ব্যাহত করেছে।

মধ্যযুগের ইউরোপ থেকে ভক্তি সাহিত্যের সুন্দরতম একটি নমুনা আমরা পেয়েছি। একটি পুরাতন ক্ষুদ্র ফরাসী পাণ্ডুলিপি, যার নাম "Our Lady's Tumbler"। এখানে, মনে হয় যেন, আমরা খাঁটি মাতৃ উপাসনায় উপনীত। আসলে কিন্তু তা নয়, কারণ বিশিষ্ট প্রয়োগটি হল অয়ি নারী মহীয়সী! তুমি আমার আনন্দময়ী, সারা বিশ্বের আলোকরূপিনী। (Lady, you are the monjoie that lightens all the world) অর্থাৎ এখানে মাতাকে পূজার্পণ করা হল না হল রানীকে। ভারতে তা কখনও হয়না। প্রাসাদ প্রাচীরের অন্তরালে কিংবা পর্ণকুটীরে সর্ব্বত্রই ভারতীয় নারীর সেই একই সরল সুন্দর জীবন, যা ছিল প্রাচীন আর্য্য গ্রামে। অপরিমেয় পরিচ্ছন্নতা এবং সরলতা, অনন্ত শুচি সাধনা এবং সর্ব্বসময়ে একই সুগভীর মাতৃত্ব।

ভারতের কাছে নারী সম্বন্ধে 'Lady' এই ধারণা বিজাতীয়। এমন যে হয়েছে তার জন্য দেশপ্রেমিক মানুষেরা কৃতজ্ঞ না হয়ে পারবেন না। এর অর্থ এই নয়, ভারতীয় নারী, যার দ্বারা মহৎ, মধুর এবং শক্তিমত হতে পারে তার থেকে বঞ্চিত হবে, আসল কথা, জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই তারা যা পেয়েছে, বিদেশাগত ধারণার চেয়ে তা অধিকতর সুন্দর কারণ অধিকতর মহৎ। ভারতীয় স্বার্থশূন্যতা, প্রজ্ঞা এবং সামাজিক শক্তিকে গভীর ও গতিশীল করতে পারলেই 'বন্ধন মুক্তি' আসবে।

বিলাস ও আত্মপ্রীতি থেকে এই মুক্তিই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ রূপ— এই জিনিষটি সুযোগ্য প্রতীক লাভ করেছে ভারতের ঈশ্বরভাবনার বিশিষ্ট রূপটির মধ্যে, যাকে বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বাধিক মূল্যবান প্রতীক বলা যায়— মাতৃরূপিনী ঈশ্বর, রাজ্ঞীরূপিনী ঈশ্বর নয়।

মাতৃরূপিনী ঈশ্বরের তিনটি রূপ দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী।

দুর্গার মধ্যে রাজ্ঞীভাবের অনেকটা রূপ পাওয়া যায়, তবে রাজ্ঞীর শক্তিটুক অধিকার বোধে নয়।

দিগ্‌বাদিনী দুর্গা তাঁর একপদ সিংহের উপরে, অন্য পদ অসুরের স্কন্ধে, সর্পের দ্বারা আক্রমণরতা, হস্তে পূজার দ্রব্য ও বিনাশের অস্ত্র। এই দুর্গার কল্পনায় অপূর্ব্ব কাব্যিক ব্যাখ্যার উপাদান রয়েছে। 'প্রকৃতি' রূপে বিকাশশীল মহাশক্তির তিনি প্রতীক, সৃষ্টি চক্রের কেন্দ্রীয় প্রাণ- চেতনা।

উপরে অস্পষ্ট আভাসিত চিত্রাবলী, দেবগণের দানচিত্র, তা এই মহাশক্তির সঙ্গে দেবগণের ও আমাদের আত্মার সম্পর্ক দৃশ্যমান করে তোলে।

নিম্নে সবকিছুই গতিময় আলোড়নে সংক্ষুব্ধ, উপরে অনন্ত ধ্যানের শান্তি। আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি চৈতন্যময়ী। এর বাইরে আছে যা, তা আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়রূপেই ব্যক্ত, তা হল ব্রহ্ম।

যে ভাবেই দেখাযাক না কেন, এর থেকে দ্বৈত বিকাশের পূর্ণতর সুন্দরতর চিত্র সম্ভবপর? কিন্তু দুর্গা আবার বিশ্বজননী। ঐশী অনিবার্য্য শক্তি, যিনি যেমন সৃষ্টি করেন, তেমনি ধ্বংস করেন, যিনি অযোগ্যকে বিনাশের ভয়ঙ্কর উপায়ের মধ্য দিয়ে পালন করে যান।

তা হলে কি ঈশ্বর আর প্রকৃতি সংঘাতে অবতীর্ণ,
যার জন্য প্রকৃতি এমন অশুভ স্বপ্নবিস্তার করেন!
যে প্রকৃতি সমষ্টি রক্ষায় এত যত্নশীল
অথচ ব্যষ্টির সম্বন্ধে এমন উদাসীন?
আমি বিবেচনা করেছি সবকিছু তাঁর কীর্ত্তির
রহস্যসন্ধান করেছি সর্ব্বত্র,
দেখেছি পঞ্চাশটি বীজ নিয়েও অনেক সময়ে
ফুটিয়েছেন একটিকে মাত্র।
যেখানে দৃঢ়পদে যেতে চাই, পা যায় কেঁপে,
জীবনের দায় জমে আর তার ভারে,
লুটিয়ে পড়ি বিশ্বপৃথিবীর বেদীমূলে,
গড়িয়ে পড়ি অন্ধকারে, ঈশ্বরের দিকে যা বিস্তারিত।
বিশ্বাসের ভাঙা হাত বাড়াই, আঁকড়াতে চাই,
মুষ্টিতে ধরা পড়ে ধূলি আবর্জ্জনা —
মনে হয় সর্ব্বময় প্রভু যেন আছেন তারই ভিতরে,
তখন অস্পষ্ট বিশ্বাস জাগে বৃহত্তর আশার উদ্দেশে।

[Are God and Nature then at strife
That Nature sends such evil dreams?

So careful of the type she seems
So careless of the single life?

That I considering everywhere
Her secret meaning in her deeds
And finding that of fifty seeds
She often brings but one to bear.
I falter where I firmly trod,
And falling with my weight of cares
Upon the great world's alter stairs
That slope through darkness up to God.
I stretch lame hands of faith and grope
And gather dust and chaff and call
To what I feel is Lord of all,
And faintly trust the longer hope.]

মানবের কম্পমান স্নায়ু, বেদনার রূপ জানে। দুর্গা কী চোখ দেখেন তাকে? যে সব দেবতাকে মানুষ নিজেরা নির্ম্মাণ করেছে, বিশ্বজীবনের একই বাণীকে তাঁরা উচ্চারণ করবেন না। কিন্তু মানুষের প্রাণবাসনার কোন কোন দিক উপবাসী ও ব্যাহত থাকবেই, যদি না সেই দেবী মূর্ত্তিকে ভক্তের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী রূপে কল্পনা করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এসব কিছুই, ঈশ্বরকে দেখার একজাতীয় পথ— প্রতিটি কাজ বা অনুভূতি, সেখানে অসচেতন পূজা। ঈশ্বরই মানুষের সত্য স্বরূপ, এবং যদি আমরা প্রেমের জন্য, সহানুভূতির জন্য, উৎসাহ বা সান্ত্বনার জন্য আতুর হই, মানুষের মধ্যে সে জিনিষ আমরা পাব না— যদিও মানুষের মধ্যেই হয়ত সেই মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে থাকে আমাদের আর্ত্তনাদ। সুতরাং ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কালে এই সব ক্ষুধার্ত্ত মানবমনের প্রতি আঘাত করা সম্ভব নয়। তার বাসনাকে চরিতার্থ করা যায়, করতেই হয়। দুর্গা কি তা করতে পারেন? যদি না পারেন, যদি সেই বিরাট বিশ্বশক্তি আমাদের আনন্দ বেদনায় নির্ব্বিকার থাকেন, তিনি মানবাত্মার মাতা হতে পারেন না।

জগদ্বাত্রীর মধ্যে রক্ষয়িত্রীভাবের কিছু বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কালীর কাছেই ভয়ঙ্করী, অগ্নিরসনা, অগ্নিবদনা, মৃত্যুশ্মশানের মধ্যে আসীনা যিনি— তাঁর কাছে আত্মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়— উচ্চারণ করে সেইপরম শব্দটি 'মাতা'।

শিশুদের কাছে তাদের শৈশবের প্রয়োজন পূরণ করেই তিনি 'মাতা'। যিনি রক্ষা করেন, যাঁর কাছে আমরা আশ্রয় নিই, যিনি মানবসন্তানের কাছে বলেন ঈশ্বরের কণ্ঠে, বাছা মোর, আমাকে খুশী করার জন্য, তোমার অনেক কিছু জানার দরকার নেই, শুধু গভীর ভাবে ভালবাসো আমায়'— সেই মাতা!

আর যদি তাঁর চারিপাশে এমন কিছু থাকে যা, বয়স্কের চোখে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হয়— শিশুদের চোখ কিন্তু সেদিকে রুদ্ধ থাকে, তারা সে রূপ দেখতে পায় না। তাদের জীবন এবং অভিজ্ঞতার পক্ষে বোধগম্য রূপটুকুই মাত্র তারা দেখে। প্রতীককে এইভাবেই নানা জন নানাভাবে দেখে।

আর বয়স্ক মানুষের কাছে, তাদের প্রয়োজন অনুরূপে তিনি মাতা, যে মাতা রক্ষা করেন না, কিন্তু বিজয়ী হবার মত শক্তিদান করেন, যে মাতা আমাদের সর্ব্বোচ্চ দানকে দাবি করেন, সন্তুষ্ট হন না তার অল্পে।

না, কালীর মধ্যে প্রতিটি ক্ষতের শুশ্রূষা নেই, প্রতিটি যাতনার উপর তিনি মধুবর্ষন করেন না, সত্যের নগ্ন চেহারার সামনে চোখ বন্ধ করার ব্যাপার সেখানে নেই, কোন একের রক্ষার ব্যবস্থা নেই, যাতে অন্যের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী হয়। যদি তাই আমরা চাই, যে পর্য্যন্ত আমরা তা চাইবো, সে পর্য্যন্ত আমরা শান্তির ছায়া কামনা করবো আর অপরকে ঠেলে দেবে বোঝা বইতে, রৌদ্র তাপের মধ্যে, যে পর্য্যন্ত আমরা পাওয়ার তৃপ্তিতে কৃতজ্ঞ থাকতে চাইবো, যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ভালবাসার মানুষের ক্ষেত্রেও কাপুরুষের আচরণ করবো, সে অবধি ঈশ্বরের মধ্যে কাপুরুষের পরিতৃপ্তিই চাইব, পাবও তাই।

কিন্তু যখন এ অবস্থাকে অতিক্রম করে যাব, তখন দেখব উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে আশীর্ব্বাদ, সেই সঙ্গে বাম হস্তে মৃত্যু। তখন বিশ্বের ধ্বংসক্ষণই হবে পরম উপলব্ধির ক্ষণ। জীবন হবে উন্মাদনা ও কৃতজ্ঞ মহাসঙ্গীত, কারণ চরম উৎসর্গ দাবি করা হয়েছে আমাদের কাছে।

উদ্ধৃত করলেন স্বামিজীর Kali the Mother এর বাংলা অনুবাদ :

নিঃশেষে নিবিছে তারা দল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী শালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভঃস্থল পরশিতে চায়! ঘোর রূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমাখা গায়,
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে মৃত্যুরূপা মা আমার আয়
করালি! করাল নাম তোর মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয় রূপিনী আয় মাগো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,-
কাল নৃত্য করে উপভোগ মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ]

ধর্ম্ম, দেখা যাচ্ছে, সভ্যভব্যের ব্যাপারে নয়, তা মানুষের প্রাণে জিনিষ। তাকে পরিশ্রুত করতে গেলেই তার প্রাণ বীর্য্য নষ্ট করতে দেওয়া হয়। প্রতি মানুষ যেন তার নিজস্ব আহার্য্য পায় ধর্ম্ম থেকে। খ্রীষ্টধর্ম্ম থেকে দৃষ্টান্ত আমাকে দিতেই হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে, কিছু পরিমাণে স্থূলতা এবং কুসংস্কারকে রক্ষা করেছে, যা না থাকলে তা এমন সব জায়গায় পৌঁচেছে, যেখানে যেতেই পারত না— এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

যে মানুষ, জীবন থেকে বর্ব্বর ভোগের আনন্দ নিষ্কাশন করে, বস্তুর উপরের চেহারাটুকুই মাত্র দেখতে পায়, তারও পরিতৃপ্তির অধিকার আছে এবং ঐসব প্রবৃত্তির প্রকাশ আছে, এমন উপাসনা পদ্ধতিও সে গ্রহণ করতে পারে। যে মানুষ চিন্তা রীতিতে উগ্র, জীবনবোধে— স্পষ্ট কামনায় অধীর প্রাকৃতিক সংঘর্ষকে সে উপভোগ করে, এবং তার মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শক্তিমান, সে মানুষ নিজ অধিকারে ঈশ্বরকে দৈনন্দিন জীবন কামনার অনুরূপ উপাদনে অর্চ্চনা করবে। অপর পক্ষে যে মানুষ জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে করুণাপূর্ণ, সে ঈশ্বরকে দেখবে সর্ব্বাশ্রয়রূপে স্নেহময়ী করুণাময়ী, বিশ্বজননী রূপে। মাতার করুণাঘন ক্রন্দনকে সে, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করবে পৃথিবীর পটে : "হে মানব, মানবগণ! তোমরা ঈশ্বর দূতদের মেরেছ, পাথর

ছুঁড়েছ, প্রেরিত পুরুষদের উপরে, কতবার আমি তোমাদের সন্তানদের একত্র করেছি আমার পক্ষপুষ্ট, যেমন মুরগী মাতা করে থাকে তার বাচ্চাদের, তবু তোমরা পরিবর্ত্তিত হওনি।"

কিন্তু মানব চৈতন্যের যাত্রা সমাপ্ত হচ্ছে না এইখানেই। শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর, দৃশ্য-বস্তুর ধ্বংসের, বীভৎসতা বা আতঙ্কের অর্থ কি? অগ্নিদাহ, হত্যা ও অন্ধ নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ঐশী শক্তির প্রেম ও মুক্তিবাণী আমাদের নিকট বহিত হয়ে আসেনা কি? যে মানুষের কাছে একদা ধর্ম্মের মহাবাণী ছিল 'বাছা আমাকে খুশী করার জন্য তোমার অনেক কিছু জানার প্রয়োজন নেই শুধু গভীর ভাবে ভালবাস আমাকে। মা যখন তোমাকে কোলে তুলে নেন, তখন যে ভাবে, তুমি তার সঙ্গে কথা বলো, সেইভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলো— সেই একই মানুষ এখন প্রতিটি কথা, কাজ ও চিন্তার দ্বারা বলতে পারবেন : 'যদিও মেরেছ আমাকে, তবু বিশ্বাস করি তোমাকে!

তারপর অতিদূর, অনন্ত দূর, কোনকালে যখন দ্বৈতত্ত্বের বোধ চলে গিয়েছে, যখন পৃথক ঈশ্বরবোধ পর্য্যন্ত অবলুপ্ত, তখন হয়ত অন্যবিধ অভিজ্ঞতার অবতরণ ঘটবে, যার বিষয়ে আচার্যদেব বলেছেন : শবরূপী ঈশ্বরের বুকের উপরেই, আনন্দময়ী মাতার দিব্য নৃত্য!

একটি শিশু যেখানে সবসময় ব্যস্ত তার মহাসম্পত্তিগুলির গণনায়, সেখানে বয়স্ক মানুষ ব্যাপৃত থাকে উচ্চতর গণিতের সত্য নির্ণয়ে, যেখান থেকে সে মানসিক বৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত হয় ঊর্দ্ধতর সত্যের জগতে, তেমনি এখানেও প্রারম্ভিক প্রতীক শেষতম প্রতীকের মতই গুরুত্বপূর্ণ, সর্ব্বশেষ স্তরে পৌঁছতে, যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়। শেষ স্তরে শিশুর গণনার মূল্য নেই। তবু গণিত থাকতেই পারতো না, তার গননা না থাকলে। সুতরাং উপাসনার মাটিতেই পা রেখে দাঁড়াতে হবে, যদি স্বর্গে ছোয়াতে হয় তার মাথা। প্রতিস্তরেই আমরা এমন কিছু উপলব্ধি করি, বা থেকে যায় আমাদের সঙ্গে চিরদিন। মায়ের সন্তানদের কাছে সকল মানুষই ভাই, ভাই। বিচ্ছেদন নয়, পার্থক্য নয় সকলেরই একই মা। মানুষের মুখে, তাঁরই বাণী, মানুষের হাতে, তাঁরই বাহু, তাঁর চোখে, তাঁরই প্রেম দৃষ্টি, মানুষের দায়িত্ব তাই মানুষের চির সেবা। ব্যক্তিমুক্তির কী প্রয়োজন যদি ঈশ্বর, অনন্ত ঈশ্বরে— প্রেম ও সেবা আহ্বান করেন?

বস্তু সত্য কী বিরাট! অনুভব করি আমরা। শুধু সুন্দর, সহজ, মধুর, কোমলকে বিশ্বাস করা, পূজা করার চেয়ে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে? আমরা যেন স্বেচ্ছায়, সানন্দে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পারি রূঢ় কঠিনের, বীভৎসের, ভয়ঙ্করের।

ঈশ্বর জীবন দিয়েছেন সত্য কিন্তু নিহন্তাও তিনি।

ঈশ্বর কালাতীত নিত্য এই ভাবের সঙ্গে জেগে ওঠে না কি মহাকালের কৃষ্ণচ্ছায়া, যার শুরু ও শেষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যে?

সুখের পরিবেশে জন্মেছি আমি। তিনিই তা দিয়েছেন। একই কথা বলার সাহস থাকে কি যখন অপরকে ক্লেশ, যাতনা আর দায়িত্বের ভার দেন? সেইজন্য তার ধ্বংশলীলার মধ্যে কি তাঁকে অর্চ্চনা করবো না, সেই শ্মশানই কি একমাত্র স্থান নয়— যেখানে নতজানু হয়ে আমরা বলতে পারি মা, মা গো!

এর সঙ্গে অন্যভাবেরও সংযোগ আছে— যা এর মধ্যে, বা এর পরে আমাদের চালিত করে। 'যদি তোমার হাত বা পা অসদাচরণ করে, কেটে ফেল তাদের। পঙ্গু, আপসহীন হয়েও পৃথিবীতে আসা ভাল, অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই হস্তপদের চেয়েও।" যিনিই সত্যের দেবতা, তিনিই বলির দেবতা। শেষ কথা মাতৃ-উপাসনার মহাগৌরব হ'ল : পৌরুষ দেয় তা। যুগে যুগে কালী ভারতকে মানুষ দিয়েছেন। প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, শিখেরা— এঁদের দিয়েছেন তিনি। যদি বাংলাদেশ, মাতৃপূজার এই আদি পীঠ, মাতৃসাধকদের এই জন্মভূমি, মাতৃপূজা ত্যাগ করে, তাহলে নিজ পৌরুষকেই ত্যাগ করবে। প্রাচীন পূজাকে দশগুণ বেশী ভক্তির সঙ্গে এখন করতে হবে, না করলে এ দেশের চির দূর্দ্দশা ও চির অপমান।

বিস্তারিতভাবে না হলেও মনে হয় আমি কথাপ্রসঙ্গে কালী পূজার বিরুদ্ধে উত্থাপিত তিনটি বিষয়ে বলেছি : (১) এটি প্রতিমা পূজা (২) প্রতিমাটি আকার বীভৎস (৩) এই পূজায় পশুবলি দেওয়ার দরকার হয়।

মনে হয়, এই সব প্রশ্ন এখানে ত্যাগ করাই উচিত। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রশ্নে এ আলেচনাগুলি আসতে পারে!

মনে রাখা ভাল, আমরা সত্যের সন্ধানী, কোন দলের জয়লোভী নই। আরও মনে রাখা ভাল, কালীপূজার দোষদর্শনে তিনিই অধিকারী, যিনি তা অর্জ্জন করেছেন, কালীপূজার সবকিছু জানার ও তার থেকে সবকিছু পাবার পরে।

সে অধিকার যে মানুষটির ছিল, তিনি কিন্তু কোন দোষ দেখেন নি। অপরপক্ষে জগন্মাতার নামে, যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তা আজ ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে, নানা জাতির মানুষকে আকর্ষণ করে আনছে মায়েরই পদতলে।

যে অনন্ত অখণ্ড পরাচৈতন্যের কাছে, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অলীক বলে প্রতীয়মান হয়, বেদান্তে তাই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত, এবং যে শক্তি, অর্ন্তজগৎ ও বহির্জগৎ রূপে ব্যক্ত হয়, তার নাম মায়া। তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করার উপযুক্ত স্থান এ নয়, কিন্তু মায়া তত্ত্বটি কি তা বলার প্রয়োজন আছে। অনন্ত ও পরমকে সংজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না, আপেক্ষিক সম্বন্ধে আনা যায় না, বা অংশে ভাগ করা যায় না। যদি কোন বস্তুকে অপর বস্তুর মত দেখায়, যা আসলে তা নয়, যেমন রজ্জুতে সর্প জ্ঞান, তখন এই ধরনের অসংখ্য বর্ণময় লীলাচাতুরী ঘটে। ব্রহ্ম যদি চিরসত্য হন, তাহলে বস্তুজগৎ বিশ্বজগৎ মায়ার লীলা ছাড়া কিছু নয়।

প্রাচীন ঋষিরা এই মায়াকে প্রতীকরূপ দিতে চেয়েছেন, তাকে স্পষ্ট আকারে প্রকাশ করেছেন কালীমূর্ত্তিতে।

হিন্দুদের তথাকথিত পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে। পৃথিবীর সকল সাধকই শব্দপ্রতিমা ব্যবহার করেন। হিন্দু ঋষিরা তা অতিরিক্ত স্পষ্ট মাতৃমূর্ত্তি রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বোঝার সুবিধার জন্য, তার ফলেই তাঁদের মধ্যে প্রতিমাপূজার চলন।

কালীমূর্ত্তি কি এখন দেখা যাক।

তিনি যে ভয়াল, ভয়ঙ্করী, প্রথমেই চোখে পড়ে। তিনি উলঙ্গিনী। স্বামীবক্ষে নৃত্যপরা, কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা। সদ্য নিহতদের তপ্তরক্তপানে ব্যাদিত বদনা। খড়্গধারিনী, নিক্ষিপ্ত অস্ত্রমধ্যে এবং ভূতপ্রেত পিশাচদলের মধ্য বিরাজমান। সর্ব্বনাশা মেঘপুঞ্জের মতই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। মুক্তকেশ ছড়িয়ে আছে পদতলে। হা হা হাসিতে লজ্জা পায় বজ্রধ্বনি। তিনি স্বয়ং ত্রাস।

এই কি তরুণী হিন্দুনারীর ছবি? হিন্দু নারীর স্বামী ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তিনি এতই মাধুর্যময়ী, লজ্জাশীলা, সঙ্কুচিতা, সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে আবৃতা কম্রকোমল প্রেমময়ী মাতা। কালী এই হিদু নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিচ্ছবি।

ঠিক সেইভাবেই ঋষিরা তাঁকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। আর আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা সফল হয়েছেন। তাঁদের নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তির চেয়ে অ-নারী জনোচিত, বিশেষতঃ অহিন্দুজনোচিত আর কিছু হতে পারে না।

ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যেমন সর্প ভিন্ন রজ্জুতে সর্পাকার সম্ভব নয়, কিংবা জল ভিন্ন বুদবুদ্। হিন্দু রমনী, সনাতনী নারীপ্রকৃতির নমুনা, যিনি স্বামী ভিন্ন তাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মায়া দেখালেন কী? সর্ব্বদা পিছন থেকে নিজের আদর্শভূমিকা পালন করে

যাওয়ার পরিবর্তে তিনি ব্রহ্মকে অধিকার করেছেন, আচ্ছন্ন করেছেন, নিজেকে প্রকাশ করেছেন অনণ্য ভয়ঙ্কর নারী বিরোধী উপায়ে। মাতৃত্ববিরোধী উপায়ে। অনন্ত, অম্লান, তরঙ্গোৎফুল্লঅমৃত সমুদ্রের পরিবর্তে আমরা পাচ্ছি, আপেক্ষিক জগতের বহুধা ব্যক্ত রূপকে, পাচ্ছি দুঃখ, মৃত্যুর অশান্ত ক্রন্দনকে, আত্মসংরক্ষণের উন্মুক্ত সংগ্রামকে, যে সংগ্রাম নীহারিকা থেকে মানবজীবন পর্য্যন্ত সৃষ্টির প্রতিটি পর্য্যায়কে আকরিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। যদি আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা না করি, স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে না থাকি, আমরা কখনই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সকল পর্য্যায়ের মধ্যে বিস্তারিত, জীবনের অগ্রগতির নিয়ামক ঐ নীতিটিকে অস্বীকার করতে পারব না, যার নাম আত্মসংরক্ষণের সংগ্রাম। এবং কালীদেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই অতিশয্যপূর্ণ কিংবা অতিরঞ্জিত মনে হবে না যদি তাকে আপেক্ষিক জীবনের এই মৌল নীতির স্পষ্ট প্রতিমারূপে দেখা হয়।

কালী মূর্ত্তির ব্যাখ্যা শোনার পরে মনে প্রথম যে জিজ্ঞাসা জাগবে তা হল যদি কালী এমনই হন, তাঁকে পূজা করা কেন? তিনি অনন্ত, কোনমতে পূজার্হ হতে পারেন না।

কিন্তু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই প্রশ্নের পিছনে রয়েছে উপাসনার মূল অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতারই প্রতিক্রিয়া। উপাসনার অর্থ, হিন্দুর কাছে নিত্য স্মরণ মনন।

তাই যদি হয় সেক্ষেত্রে মোক্ষলাভের পথে এই যে প্রতীয়মান জগৎ, যা তার অগণ্য ভয়ঙ্কররূপে আমাদের আতঙ্কিত করছে, তা আসলে মিথ্যা আকার ভিন্ন কিছু না, পিছনে আছেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম! এই বোধের মধ্যে নিত্য সঞ্জীবিত থাকা ছাড়া এ জগতে গুরুত্বপূর্ণ আর কি থাকতে পারে?

মায়া মিথ্যা, কালী তারই প্রতীক। কালীকে যদি আদর্শ হিন্দু নারী করে চিত্রিত করা হত, তাহ'লে তিনি সত্য হয়ে উঠতেন। তাঁর অবাস্তবতা দৃশ্যমান করার জন্য, কালী নিজেই তাই করেছেন— তাঁকে আদর্শ নারী 'না' রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

শিব পদতলে। তিনি আবৃত করে আছেন, নাচছেন শিবের বুকে, অন্যের মনোযোগ টেনে এনেছেন নিজের উপরে, যেমন মরীচিকা ঝলমল করে উঠে বিভ্রান্ত করে দৃষ্টিকে। তাই কালীকে ভেদ করে দৃষ্টি প্রেরণ করতে হবে, তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা, তাঁর উপাসনা ছাড়া গতন্তর কি? কোন বই যদি কেউ মুখস্থ করতে চায়, সেকি সাদা কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে?

তাই আসল সাধক, যিনি তাঁর ভিতর দেখে, তাঁকে জেনেছেন, তিনি শান্তভাবে তাঁর অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন, যেভাবে তিনি দেখান নিজেকে, সেভাবে তাঁকে না দেখে, দেখতে পেরেছেন আসল যা তিনি, তাঁকে। ব্রহ্মের মধ্যেই তাঁর সত্য অস্তিত্ব। যেমন জাগ্রত 'আমি' থেকেই স্বপ্নের 'আমি' উদ্ভুত। কোন নির্দ্দিষ্ট কালে স্বপ্ন যতই জীবন্ত সত্য বলে মনে হোক, জাগ্রত অবস্থায় তার অস্তিত্ব নেই। দ্রষ্টা বলেন, কালীকে যা মনে হয়, তিনি তা নন, যথাযত কালী ও ব্রহ্ম এক। তিনি মোক্ষদায়িনী তারা, তিনি ব্রহ্মময়ী।

দিব্যসাধক রামপ্রসাদের চেয়ে কালীকে পূর্ণতরভাবে প্রকাশ করতে আর কেউ পারেন নি। প্রাণশক্তিতে, সহজতায়, গভীরতায়, তাঁর মাতৃভাবের গানগুলির কোন তুলনা নেই। আমরা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গানেরই মত অনুবাদ এখানে শোনাতে পারবো :

কে জানে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে পায় না দরশন।।
আত্মারারমের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের বচন।
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।

কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন।
মুলাধার সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমন।
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ,
আমার মন বুঝেছি প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।
Who knows what Kali is?
The six darshanas (System of Philosophy)
have not obtained her Darshana (Sight)
Kali as a swan plays with the swan
in the lotus forest
The yogi always meditates on Her in the
Muladhara (the plexus underheath the
spinal chord) and in the Sahasrara
(that in the brain)
Kali is Atma (self) of the Atmarama
(enjoyer of the self)
Innumerable are the wonderful evidences
and administrations of Her
Tara resides in all forms just as She pleases
The universe is the Mother's womb – you know
What size it is.
The Mahakal understand her properly
who else knows Her like Him?
The world laughs at Prasads' words,
"crossing the ocean by swimming?"
My mind has grasped it but not the prana
This dwarf wants to touch the moon
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।।
আমি বেদাগম পুরাণে করলাম কত খোঁজ তল্লাসী।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী।।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।।
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী।।
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী।।
প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম নিরূপনের কথা দেঁতোর হাসি।

আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে 'পদে গঙ্গা গয়া কাশী।।
My mind, don't be intolerant
I have looked and searched through the
Veda Agama and Purana
Kali, Krishna, Shiva, Rama–
my Elokeshi (she with dishevelled
hair) is all these.
She holds the horn as Shiva and
plays on the flute as Krishna,
O mother, you have a bow as Rama,
and a sword as Kali.
Prosad says, the attempt to demonstrate
Brahman is like the smile of the person
who has got big rows of teeth
always projecting out.
May Brahmamayi is in all forms and
as her feet are Ganges, Gaya
and Kashi
এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা।।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা।।
ত্যাজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা।
Would, O Tara, such a day come, when
streams will flow down my eyes with
my repeating Tara Tara?
The lotus inside the breast will blossom and
raise up its head and the darkness of
the mind shall vanish.
And I shall fall down on the earth and be
inside myself with the name of Tara.
Then shall I be able to give up the questions
of distinction and non-distinction (or
duality and nonduality,
All wants of the mind will vavish
O the Vdea is true a hundred times–

my Tara is formless.
With the greatest happiness Ramprasad
proclaims to the world that the Mother
resides in all forms,
Look O blind eyes, at the Mother,
She is the dispeller of darkenss

আমি জানি, কালী পূজার সঙ্গে নানা অশুচি পাশবিক রীতিনীতি এসে জুটেছে। সে সব বিষয়ে আমাদের দুঃখ যেমন অসীম, তেমনি অপরপক্ষে, কালী পূজার সব কিছুর বিরুদ্ধে, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যে উগ্র বিদ্রূপ করে থাকেন অনেক সময়, তার মধ্যে উচ্চ প্রজ্ঞার লক্ষণ দেখি না। আগাছাকে দূর করুন, কিন্তু দোহাই বাগানকে নষ্ট করবেন না।

আলো পথ দেখায়। আবার চোখও ঝলসায়। সে যুগে যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁদের প্রাধান্যে ঘা পড়েছিল স্বামিজীর আবির্ভাবে। একপাশে জগৎজোড়া নাম, জগৎজোড়া খ্যাতি, চোখ-ঝলসে গেল ব্রাহ্ম-সমাজের, গণ্ডীবদ্ধ গোঁড়া হিন্দু নেতাদেরও। তাঁকে এক ঘরে করার চেষ্টা চলছে সর্ব্বত্র, কি ঘরে, কি বাইরে, কি বিদেশে। তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টায় ব্রতী, ব্রাহ্ম-সমাজ, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ, আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন গোঁড়া হিন্দুসমাজ রক্ষকগণ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী— কোথায় গুহায় বসে— তপস্যা করবেন, না দিলেন সাগর পাড়ী— যা হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করে। (১) জপতপ ছেড়ে— বক্তৃতা, প্রচার, ম্লেচ্ছ শিষ্য-শিষ্যার সঙ্গে ভ্রমণ ও ম্লেচ্ছ আহার গ্রহণ (২) ব্রাহ্মণ্য সমাজে— ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ, পূজাপাঠ বা ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা বা চর্চ্চার অধিকারী তাঁরা!— অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে জন্ম— সমাজে যাঁরা শূদ্র রূপে পরিচিত, সেই কায়স্থ সন্তান, বেদ প্রচার করে চলেছে বিশ্বে,— নাম দিয়েছে বেদান্তবাদী, স্পর্দ্ধা তো কম নয়! কর তাদের সমাজচ্যুত, করে দাও এক ঘরে, তাঁর সাধন জীবনের পীঠস্থান দর্শন অবরোধ কর। (৩) তাঁর শিষ্যা কালীতত্ত্বের মর্ম্মবাণী ব্যাখ্যা করছেন হিন্দু সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে।

এরপরই এলো কালীঘাটের মন্দির তরফ থেকে ডাক। খুশীর অন্ত রইলো না স্বামিজীর।

স্বামিজীর শরীর ভেঙেছে বার বার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, মা ভুবনেশ্বরীর মনে পড়ে গেল পূর্ব্বস্মৃতি। যখন তিনি ছোটবেলায় খুবই অসুস্থ,— কালীঘাটের কালীমায়ের কাছে, মানৎ করেছিলেন, ছেলে সুস্থ হলে— তাঁর পদতলে ছেলেকে নিবেদন করবেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন সেখানে। কর্তৃপক্ষ জানতেন বিলেত, আমেরিকা ফেরৎ বিবেকানন্দ, তাঁরা মায়ের চরণে নিবেদনের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি দেবীর নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকে বসে হোম করলেন, অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিলেন। কত পূণ্য সেই তীর্থভূমি! সেখান থেকে ডাক এসেছে নিবেদিতার কালীতত্ত্বের আলোচনার জন্য! খুশী স্বামিজী! হিন্দুস্থানে হিন্দু-মহিমা, আজও বর্ত্তমান! তা কুসংস্কারে মলিন হয়েছে সত্য কিন্তু সেজ্যোতি : এখনও অম্লান। এলবার্ট হলের বক্তৃতায় যে প্রতিবাদ উঠেছিল, সে মীমাংসার উত্তর দেবেন নিবেদিতা— সে প্রস্তুতিপথে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন স্বামিজী।

ফেব্রুয়ারী প্রথমেই মি. পাদশা ও মিসেস পাদশা এসে চায়ের আসরে উপস্থিত হলেন। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। স্বামিজীর পায়ের কাছে বসে নিবেদিতা। পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বলে চলেছেন।

দুর্গার ছবি তাঁর হাতে কালী সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছেন। ঠিক সেই সময়ে দুজন মহিলা মিশনারী উপস্থিত হলেন নিবেদিতার ঐতিহাসিক বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে। এরূপ আরও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। এঁদের উপস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা বন্ধ না করে নিবেদিতা ইঙ্গিতে স্বামিজীকে আলোচনা চালাতে বললেন। লড়াইয়ের মনোভাব তাঁর। স্বামিজীকে উঠতেও দিলেন না, বক্তব্য বিষয়ও বদলাতে দিলেন না। স্বামিজী অগত্যা তাড়াতাড়ি শেষ করলেন আলোচ্য বিষয়টি। তাদের সামনেই নিবেদিতা দেবীর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আগন্তুক শ্রোতৃদ্বয় সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করলেন, তবুও ইতিহাস ক্লাশ নেওয়ার জন্য উৎসুক্য প্রকাশ করে গেলেন।

এই আলোচনা ছিল স্বামিজীর আধ্যাত্মজীবনের বিরল বিষয়বস্তু। আর নিবেদিতা গিলছিলেন তা .... ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের কিছু অংশ যা যুক্তির তর্কজালে ধরা পড়ে না. ভাবের গভীরে ডুবিয়ে দেয়। মিষ্টিক ব্যাপারের দৃষ্টান্ত হয়ে পরবর্ত্তী কালের কাছে তা জ্বল জ্বল হয়ে ভেসে উঠে বর্তমানের মত।

স্থির হয়েছে ২৮ শে মে, রবিবার কালীঘাটে বক্তৃতার দিন। স্বামিজী ১৪ই মে কালীঘাট ঘুরে এলেন। নিবেদিতাকে কালীব্যাপারে বিচিত্র বক্তব্যের সম্মুখীন হতে হবে। ২৭শে তারিখে সকাল ৬টার সময়ে উপস্থিত হলেন নিবেদিতার বাসায়। একেবারে অথৈ জলে ভাসছেন নিবেদিতা। মনের গভীরে চলেছে বিরাট এক আলোড়ন। জগন্মাতা যেন তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বিরাট শক্তিতে তুলে ধরার জন্য। অপার্থিব পবিত্রতা, ঘনীভূত সে বিশ্বাস, চকিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠলো : যিনি অতি বাল্যকাল থেকেই সমাধির সহজ অধিকারপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি দাঁড়িয়ে সম্মুখে তাঁর। যৌবনে যিনি ব্রাহ্ম, এ..শ্বরবাদের প্রভাবাধীন, প্রচারক-জীবনে যাঁর 'ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই আদর্শ, অদ্বৈতদর্শন যাঁর মতবাদ, বেদ ও উপনিষদ যাঁর একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ, সেই তিনিই ইয়োরোপ আমেরিকায় মূর্ত্তি পূজার উল্লেখ করেছেন দু'একবার মাত্র (১৮৯৪ সালে শিকাগোয় জর্জ্জ হেলের বাড়ীতে অবস্থান কালে, বলেছিলেন : The Hindu faith recognized the motherhood of God as well as the fatherhood, because the former was a better fulfilment of the Idea of love. There were three different ways of looking God. One was to look upon Him as a mighty personage and fall down and worship His might. Another was to worship Him as a father. In India father always punished the children and an element of fear was mixed with the regard and love for a father still another way to think of God as a mother. In India a mother was always loved and revered. That was the Indian way of looking as their God.... ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনে, 'নারীর আদর্শ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বক্তৃতায় বলেছিলেন In India the mother is the centre of the family and our highest ideal. She is to us the representive of God, as God is the mother of the universe. It was a female sage, who first found the unity of God, and laid down this doctrine is one of the first hymns of Vedas. Our God is both personal and absolute. The absolute is male, the personal femal and thus, that we now say the first manifestation of God is the hand that rocks the cradle....

ভারতবর্ষে এসে দেখলেন নিবেদিতা, তাঁর মুখে সকল সময়ে লেগে আছে একটি শব্দ 'মা'। যখনই জগন্মাতা সম্বন্ধে কথা বলছেন সেভাবে, যেভাবে বাড়ীর একান্ত জনদের সম্বন্ধে কথা বলে থাকেন। সর্ব্বক্ষণ 'মা'র মধ্যেই ডুবে আছেন। শান্তছেলের মত কখনও নিরীহ, কখনও বা দুষ্ট বেয়াড়া, বিদ্রোহী। এটা শুধু মায়ের কাছেই। ভাল বা মন্দের জন্য কাউকেই দায়ী করেন না। শুভ কাজের সময়ে শিষ্যাকে একটি প্রার্থনা শিখিয়ে দিলেন, যা নিজের জীবনে মন্ত্রশক্তির মত কাজ করেছিল। "মনে রেখো" নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেটিকে" বাধ্য করবে, তোমার কথা শুনতে! মায়ের কাছে দীনাহীনা ভাব একদম না, একেবারে না, মনে রাখবে, হ্যাঁ। উত্তোলিত ডান হাতে আশীর্ব্বাদ, বাঁ হাতে কৃপান— তাঁর শাপই বর! উদ্দীপ্ত সেই কণ্ঠ, পরে দীর্ঘ নীরব তন্ময়তা। গভীর ভাবাবেগ, যেন কাব্যের ভাষা, 'যাঁরা তাঁর একান্তই আপনার, তাদের হৃদয়ের গভীরে ঝলসে ওঠে কালীর রক্তরাঙা অসি। মা নেমেছেন খড়্গ ধরে, এই মূর্ত্তির আজন্ম উপাসক তারা।' আমি ভয়ঙ্করের উপাসক মনে রেখো। মনে করা ভুল যে, সুখই সকলের কাম্য। কত লোক সুখ চায় ঠিক, সেই সংখ্যক লোকই আজন্ম দুঃখ চায়। এসো, আমরা ভয়ের জন্যই ভয়ঙ্করের অর্চ্চনা করি!"

নিবেদিতা তুললেন, পশুবলির কথা।

কয়েকটি কথায় ব্যাপারটা শেষ করে দিলেন। ছবিটা সম্পূর্ণ করতে দু'এক ফোঁটা রক্তপাত হলই বা! দীর্ঘ নীরবতা। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, : মন থেকে ভয় ও দুর্ব্বলতা দূর করার প্রচেষ্টা যা মাধুর্য্য ও মনের আনন্দও তা। পাপ, ভয়, দুঃখ বিনাশের মধ্যেই জগন্মাতার দর্শন। ভীষণের পূজা, একান্ত হওয়ার সাধনা। সহসা সরব হয়ে উঠলেন: 'মূর্খ ওরা! মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী। মূর্খ মূর্খ!'

মনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল নিবেদিতার। উপলব্ধি করলেন দয়ালু, পালনকর্ত্তা, সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বরের রূপে, ভূমিকম্পের, আগ্নেয়গিরির ঠাঁই নেই। সে পূজার অন্তর্নিহিত 'অহংবোধ' স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। দেখতে পেলেন, ঈশ্বর ভালোর মতই, মন্দের মধ্যে সমভাবে প্রকাশিত। এই শিক্ষাই নির্ভীক ও যথার্থ। যে মন, 'ব্যক্তি আমির' স্বার্থবোধে বিচলিত নয়, সে মন, স্বামিজীর বজ্র উক্তির অনুসরণে দৃঢ় হবে। মৃত্যু চাই, জীবন নয়, ঝাঁপ দিতে হবে তরবারির মুখে। এক হয়ে যেতে হবে চিরদিনের জন্য ভয়ঙ্করীর সঙ্গে।

কালীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে বললেন : সেই লোকটির কথা মনে আছে, যিনি বলছিলেন 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং দেবগণে বিশ্বাসী; আর কিছুতে নয়'?

নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন সেটা কি—

উত্তরে স্বামিজী বললেন : হ্যাঁ, a damned Light better business.... হ্যাঁ, এই হল আমার ভূমি, আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী, আবার দেবদেবীতেও— অন্য কিছু নয়। ... তার পূর্ব্ব চিন্তাসূত্র ধরে কিছুক্ষণ বসে থেকে, কর্নেল হের Goundian Angel এর কবিতা আবৃত্তি করলেন। তাঁর প্রথম বোধে, যে খটকা লেগেছিল, সেই খটকা বাধবে— বেদান্তের সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মবাদের সঙ্গে পূজা পদ্ধতির খাপ খাওয়ানোর সমস্যায়। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে গেলেন নিজের বক্তব্যকে।

নিবেদিতার চোখে তিনি নিজেই বৈপরীত্যের সমন্বয়, তিনিই তো প্রতিটি সত্যের সাক্ষী স্বরূপ। দেখলেন, তিনি একটা লক্ষ্যে যেন মগ্ন, ঠিক জের কাটাতে পারছেন না অথচ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন অর্দ্ধ স্বগতোক্তির মত : 'তোমার বক্তৃতা : সভাপতিত্ব করতে আমাকে বলেছ। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে আমি যাচ্ছি না। সোজা কথা বলি— সম্পূর্ণ সুস্থ হবার ভরসাও করি না। ওখানে দারুণ গরম হবে, আমি উত্তেজনা সামলাতে পারবো না, কারণ বহু শত বছর

ধরে আমরা কালী উপাসক, ঐ স্থানের প্রতিটি ধূলিকণাও আমার কাছে পবিত্র। মাটিতে গড়িয়ে যাওয়া রক্ত পর্যন্ত, তার প্রতিটি বিন্দুও!... পরম ভক্তিতে সে রক্ত চেটে, তুলতে পারি।...'

তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দৃঢ় নির্দেশ দিয়েছি। কোন চেয়ার থাকবে না, প্রত্যেককে মেঝের উপর বসতে হবে মঞ্চের তলায়, তোমার পায়ের নীচে। টুপি ও জুতো খুলে রাখতে হবে। যদি ইয়োরাপীয় বা ব্রাহ্ম কেউ উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রেও এ জিনিস যাতে করা হয় স্বয়ং তোমাকে দেখতে হবে। তুমি বসবে সিঁড়িতে কয়েকজন অতিথির সঙ্গে।

ওঃ! কালীকে ও কালী-ব্যাপারকে কী ঘৃণা না করতাম! ছ'বছর ধরে সেই লড়াই, কেন না কালীকে কিছুতেই মানবো না।

নিবেদিতা প্রশ্ন তুললেন : কিন্তু এখন আপনি তাঁকে বিশেষভাবে মেনে নিয়েছেন, তাই না স্বামিজী?

উত্তরে বলে চললেন : মানতে বাধ্য হয়েছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও তিনি (মা) আমাকে চালিত করেন— আমার এই বিশ্বাসের কথা তুমি জান। তিনি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করান।

...তবু কত দিনের লড়াই। লোকটিকে আমি ভালবাসতুম, বুঝতে পারছো, তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি—-। অনুভব করেছিলুম। আর জানতুম, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ মায়েরও নেই।

নিবেদিতা বলে উঠলেন : এত সুযোগ সত্ত্বেও যখন আপনিই এত দীর্ঘদিন সন্দেহ করেছেন, তখন ব্রাহ্মরা যে করবে, তাতে আশ্চর্য কি?

উত্তরে বললেন : হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু তারা তাঁর মধ্যে ঐ সীমাহীন পবিত্রতা কখনই দেখতে পায়নি, যা আমি দেখেছিলুম। আর সে ভালবাসার স্বাদও পায়নি।

আমার কি মনে হয় জানেন? নিবেদিতা বলে উঠলেন, তাঁর বিরাটত্বই তাঁর ভালবাসাকে এমন দুশ্ছেদ্য করে তুলেছিল আপনার কাছে!

উত্তর দিলেন : তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে বোধ কিন্তু তখন আমার মধ্যে জাগেনি। সেটা এল পরে, আত্মসমর্পণের, পরে। তার আগে তাঁকে খ্যাপা শিশুর মত ভাবতুম, সব সময়ে এই দেখছেন, সেই দেখছেন, দেবদেবী কত কি— সে সব জিনিসকে ঘৃণা করতুম। কিন্তু তারপরে এমন কি কালীকেও মেনে নিতে হল আমাকে।

কেন, মেনে নিতে হল, তাকি বলবেন না স্বামিজী! কিসে আপনার এ বিরোধিতা চূর্ণ হল? জানতে চাইলেন নিবেদিতা।

না সে রহস্য, আমার সঙ্গেই চলে যাবে। সে সময়ে আমার দুর্ভাগ্যের চরম। পিতার মৃত্যু ও নানা দুর্ব্বিপাক, মা দেখলেন এই সুযোগ, আমাকে গোলাম করে রাখবেন! আর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর হাতেই আমাকে তুলে দিলেন। বিচিত্র, এরপর তিনি মাত্র দুবছর বেঁচেছিলেন আর তার বেশী সময় ভুগেছিলেন। ছ'মাস যেতে না যেতেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হল, সে উজ্জ্বলতা কোথায় চলে গেল।

গুরু নানকের একই দশা হয়েছিল। তিনি সেই শিষ্যটির সন্ধান করেছিলেন, যাকে— নিজের শক্তি দিয়ে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে নিজ পরিবারের দাবিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। নিজ সন্তানাদির কোন মূল্যই ছিলনা তাঁর কাছে। সেই বালকটিকে না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলেন, যা— তাকে সব দিয়ে মরতে পারেন!

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সর্ব্বদা কালীর অবতার মনে করি। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকে কি, তাই বলবে না? জিজ্ঞাসা করলেন নিবেদিতা।

হ্যাঁ। এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ যে, কালী রামকৃষ্ণের উপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। মার্গট দেখ, আমি বিশ্বাস না করে পারি না, কোথাও একটা মহাশক্তি আছে, যা নিজেকে নারী প্রকৃতি বলে অনুভব করে, 'কালী' বা 'মা' নামে নিজেকে আখ্যাত করে। আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই, বুঝতে পারছ সর্ব্বদাই এমনই হয়। শরীরের অগন্য কোষ সমষ্টিতেই ব্যক্তির আকার, বহু মস্তিষ্ককেন্দ্র তৈরী করে অখণ্ড চৈতন্য।

হ্যাঁ বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য ঐক্য— সায় দিলেন নিবেদিতা।

তাই কি? কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে ভিন্নতার কারণ কি? ব্রহ্মই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আবার দেবদেবীও। সুতরাং দেখছো আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী আবার দেবাদেবীতে কিন্তু আর কিছুতে নয়! একটু থেমে বলে উঠলেন স্বামিজী, কিন্তু কিভাবে না তিনি (মা) আমাকে যন্ত্রণা দেন কখনো কখনো। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলি 'যদি তুই এই এই জিনিস আগামীকাল আমাকে না দিবি, তাহলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো— শ্রীচৈতন্যের পূজা করবো। এবং সেই জিনিসগুলি আমি অতি অবশ্যই পেয়ে যাই। এসব কথা কিন্তু কদাপি কাউকে জানাবার নয় মনে রেখো।

আপনি বলতে চান, এসব আলাপ পৃথিবীর শোনার জন্য নয়? জানতে চাইলেন নিবেদিতা।

"কদাপী নয়!" উঠে দাঁড়ালেন স্বামিজী।

স্বামিজী চলে গেলেন। নিবেদিতার মনোজগতে নোতুন দৃশ্যের উদয় হল। মিলিয়ে দেখতে লাগলেন : তাঁর ভাবে, গতিতে, কাজে, গচ্ছিত বিশ্বাস ও দায়বহণের ইঙ্গিত। কালী প্রতিমার ব্যাখ্যায় যা বললেন, তা অভিজ্ঞতার মহাগ্রন্থ। মানবাত্মা তার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্‌টে সবশেষে দেখবে কিছুই নেই, সব একাকার। ভাবী ভারতে, কালীমাতাই হবে উপাস্য দেবতা। তাঁর 'নামে' তাঁর সন্তানেরা নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌঁছতে সমর্থ হবে। একবারে শেষে, হৃদয়ে তাদের সনাতন জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ ঘটবে, আর সেই পরম-লগ্ন সমাগত হলে, প্রতিটি মানুষ জানবে তাদের সমগ্র জীবন ছিল— স্বপ্নময়। স্মরণে এলো, গীতার বেদগম্ভীর বাণী, 'কর্ম্মের আরম্ভমাত্র না করে, কোন ব্যক্তিই নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না, শুধু কর্ম্মত্যাগ করলাম, বললেই সিদ্ধিলাভ করতলগত হয় না। সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অগ্রসর না হলে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। মাতৃশক্তির মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম, নতুন জীবন, নতুন জ্ঞান, পরিবর্ত্তন, সংগ্রাম, জয়-ও পরাজয়ের সাময়িক সংঘটনের মধ্য দিয়ে, আত্মার নিশ্চিত স্বর্গে উত্তরায়ন, সেখানে, অভেদ— শুধু, শুধু, মহাশান্তি।

২৮শে রবিবার, কালীঘাট মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে বিকাল পাঁচটায় নিবেদিতা খালিপায়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হাজার দুই শ্রোতা। তাদের অভিবাদন জানিয়ে আরম্ভ করলেন : যে জায়গাটিতে আজ সন্ধ্যায় আমরা মিলেছি, এটি কালীর পবিত্রতম পীঠস্থান। যুগযুগ ধরে, কত ভক্তপ্রাণের প্রার্থনা, বেদনা ও কৃতজ্ঞতার পূজা নিবেদনের স্থান এটি। মৃত্যুক্ষণে শেষ চিন্তাব লক্ষ্যস্থল। মা এখানে কত সাধককে দর্শন দিয়েছেন তার নির্ণয় কে করবে? কেউ মায়ের সন্তান, কেউ তাঁর চিহ্নিত বীর। কেউ শুধু ভক্ত, তাঁর ভাব ও রূপ সুধাপানে পাগল। আবার কেউ তাঁকে নিজ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করেছেন। অখণ্ডআত্মা, তাদের অনন্ত শক্তি, বাসনাও অনন্ত— যার তৃপ্তি সাধন মা করে থাকেন।

এই স্থান থেকেই তরঙ্গিত হয় তাঁর স্বর, ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীতে, ঊষায়, সন্ধ্যায় মৃদু মধু কণ্ঠে ডেকে বলেন : শিশুরা, আমি, আমিও তোমাদের মা।

দিবস যখন প্রখর উজ্জ্বল, পৃথিবী কর্ম্ম— শব্দে মুখর তখন, মায়ের কণ্ঠ হয়তো ডুবে যায় কিন্তু আবার যখন শান্তিলগ্ন ঘনায়, নিজ অন্তরের মুখোমুখি হয়ে বসে, মানুষেরা— তখন তারা যত পরিবর্ত্তিত ভাবেই শুনুক না কেন, তবু বার্ত্তা আসে, শান্ত, ক্ষুদ্র সুরগুলি। এত ক্ষুদ্র, এত সুন্দর

যে আমাদের কানে প্রায় পশেই না, যদিও একদিন অনুভব করবই যে, বিশ্বের সবকিছু, জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা, কালীর অখণ্ড নিত্য সঙ্গীতের এক— একটি সুর।

পবিত্র, এই স্থানের আবহ, পবিত্র এই সন্ধ্যাকাল, মন্দিরের রক্ত, ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র। পবিত্র! আমরা যেন অনুভব করতে পারি এই স্থানে, যেখানে লক্ষ লক্ষ অতীত মানুষ প্রার্থনা করতে এসেছে, এখানে আমার বক্তৃতা শুনতে আসেনি, এসেছি সকলে পূজা করতে।

এলবার্ট হলে কালীতত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করে সেখানে উত্থাপিত আপত্তিগুলির উত্তরে বললেন : প্রথম প্রশ্নটি ছিল অনন্ত ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজা করা অসম্ভব কিন্তু আমরা বোধ শক্তি বলে হিন্দুরা মূর্ত্তিকে সম্বোধন করে পূজা করে না। ঠিকভাবে বলতে গেলে, মূর্ত্তি, মন সংযোগের অবলম্বন বিশেষ। আসল পূজা সম্মুখস্থ জলপূর্ণ পাত্রটিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। প্রকৃতি ও জীবনপাত্রে ঈশ্বররসধারা পূর্ণ হয়ে আছে, তারই প্রতীক এ পাত্রটি। আসলে তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখি, একটু থেমে বললেন, এখানে সমবেত হয়েছি কেন? যদি না একথা সত্য হয়? প্রতিমার মধ্যে আমরা ঈশ্বরকেই দেখি, অন্যত্র কি দেখি না? আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের প্রতিমা। আমাদের জীবনের প্রতিটি গতিছন্দ ঈশ্বরের পূজা, আমরা বর্ত্তমান জীবস্তরে রয়েছি, সেজন্য প্রতিমার মধ্য দিয়ে পূজার সত্য ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া কি ভাল নয়— যাতে আমরা স্বাভাবিক বিবর্ত্তনে উদ্ধতর পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারি?

কালী প্রতীকের আকার নিয়ে সেদিন আপত্তি উঠেছিল। অভিযোগকারীর মতে: কালীর এমনই আকার, যার কাছে মাতৃভাব শুকিয়ে যায়। এলবার্ট হলে বক্তৃতা কালে আরও একজন বক্তা তা সমর্থনও করেছিলেন। সেই সঙ্গে যীশুকোলে দেবীর সুন্দর মূর্ত্তির তুলনাও করেছিলেন। এই যে আপত্তি, তিন দিক থেকে এই আপত্তির সম্মুখীন হওয়া যায়। প্রথমত একথা সত্য ইউরোপে কোন এক যুগে ধর্ম্মধারণা ও আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তথাপি এর দ্বারা কেউ এমন মনে না করেন যে, মেরী ও শিশুর মূর্ত্তি সব সময়েই সুন্দর ছিল। বাইরের মানুষ যদি কেউ দেখে, যার মনের মধ্যে খ্রীশ্চান ভক্তের ভাবানুভূতির পরিমণ্ডল নেই, তাদের কাছে বাইজান্টিয়ান চিত্রাবলী এবং খোদাই কাজ অতীব প্রাণহীন ও কুৎসিত ঠেকবে ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন সমালোচকের কাছে কালীমূর্ত্তি গঠন যেমন ঠেকে।

দ্বিতীয়তঃ এই পরিস্থিতি, শিল্প বা ভাস্কর্য্য বিকাশের পরিপন্থী নয়। কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের সময় পর্য্যন্ত, গ্রীসে তীর্থ যাত্রা করে যেত ডেলফির মন্দিরে, যেখানে প্রায় নিরাকার মূর্ত্তি অবাহৃত ছিল। সে কালের মানুষেরা এহেন মূর্ত্তির পদমূলে প্রণতঃ হতো, তারাই জন্ম দিয়েছিল ফ্রিডিয়াস (Phridios)।

তৃতীয়তঃ এসব ব্যাখ্যাই আমাদের আলোচ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না। ভক্তের কাছে মায়ের মূর্তি [illegible] নয়। যে মূর্ত্তিটিকে তুমি বাল্যকাল থেকে ভালবেসেছ, ভক্তি করছো, সে মূর্ত্তি কি [illegible] আলাদা কিছু যে, তার সামনে গোমড়া মুখে দাঁড়াবে, নিন্দা বুকে পুরে নিয়ে। নিষ্ঠুর, [illegible] নির্দেশার। জীবন, অভিজ্ঞতা ও ভাবনা, যা দেখতে দেয়, মানুষ [illegible] মধ্যে তাই দেখে। কোন খৃষ্টান কি বর্ণনানুযায়ী ছবিটা চোখের পাতায় জাগিয়ে [illegible] রয়েছে উৎস পূর্ণ রক্তে? There is all fountain filled with blood.

এই [illegible] না মানুষের কাছে পূণ্যতম, পবিত্রতম ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে এবং এ কথা বললেও চলবে, এগুলির খুঁটিয়ে বিচার করা হয় না। যাইহোক ইয়োরোপীয় শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতেও কিন্তু কালী মূর্তির অসাধারণ নাটকীয় গতিশক্তি ধরা পড়ে। কোনমতে চোখ এড়াবার বস্তু— তা নয়। সকল আদিম শিল্পই 'ভাবনা ও অনুভূতির' প্রকাশ চেষ্টায় আঁকু পাঁকু করেছে। যেহেতু প্রকাশের উপযুক্ত উপাদান তাঁর আয়ত্তে ছিল না। কালীমূর্ত্তি দেখে অভ্যস্ত এমন

চোখেও ধরা পড়ে তার সুগভীর, মাধুর্য্য যা অর্থদ্যোক। যে অভিযোগকারী ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছেন, তিনি যদি ইয়োরোপীয় হতেন, তাহলে কালীমূর্ত্তি কল্পনার বিষয়ে ঐ কথা বলতেন। এখানে এইটুকুই বলা যায়, নিজেদের পুরান কথা বা সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয়রা পশ্চিম থেকে চোখ সরিয়ে, তুলনাদি ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকলেই ভাল করবেন। মৃত্যুরূপের চিত্রনে, নিজস্ব উপায় বজায় রেখে, তাতে অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদর্শবোধ সঞ্চারিত করাই তাঁদের' পক্ষে উচিত কাজ হবে। তা করলেই ,তাঁরা যথার্থ জাতীয় এবং মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন। তা না করলে, তাঁরা বিদেশী সৃষ্টির 'বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যটুকু' দেখে বিভ্রান্ত হবেন, কদাপি ঐ সৌন্দর্য্যের পশ্চাৎবর্ত্তী, গভীর 'প্রেরণা ও আদর্শের' চরিত্র বুঝবেন না এবং নিজেদের শিল্পকে ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন করতে গিয়ে আরও স্থূল ও নিম্নমুখী করে তুলবেন।

পরবর্ত্তী আপত্তি, বলির বিরুদ্ধে। এর উত্তরে আগেই বলেছি. তাঁর এই কথাটা, কপট ঠেকে যখন শুনি, নিজের জন্য বলি চলবে, কিন্তু দেবীর কাছে নয়। কালী পূজায় লুকোচুরি ভাব নেই। যা জুটিয়েছি, তাই দিতে হবে। তথাপি কালী পূজার রীতি অনুসারে অপরকে নয় নিজেকেই শেষপর্যন্ত উৎসর্গ করার কথা আছে। এতে তিনি আনন্দিত। এইজন্যই, শক্তিপূজায় এত শক্তি লাভ হয়। মাত্র ত্যাগের দ্বারাই শক্তি আসতে পারে, আর কালীকে, কখনই ত্যাগ ভিন্ন পূজা করা সম্ভব নয়। ত্যাগ, আরও ত্যাগ চাই— তাঁর পূজায়। আত্মোৎসর্গসহ জীবনবরণের যে অভিপ্রায়, একদা খ্রীষ্টানধর্ম্মে প্রবল হয়েছিল, কালীপূজার মধ্যে সেই ভাবের পুনজন্ম হয়েছে, ভারতীয়দের মধ্যে। কারণ এইভাবের তুল্য আর কোন ভাবই এত স্থায়ী ও শক্তিশালী নয়। কালীপূজার কুণ্ঠিত পক্ষ সমর্থনে আসেননি, সর্ব্বশক্তি দিয়ে তার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতেই উদ্যত হয়েছি।

সেদিনের আলোচনায় সকলের শেষে অংশ নিয়েছিলেন (ডাঃ মহেন্দ্র সরকার)। তিনি শ্রোতারদের অনুনয় করেছিলেন পৌত্তলিকতা পরিহার করতে। বলেছিলেন, মন্দিরে মন্দিরে নোংরামি ও লাম্পট্যের দৃশ্য—। তাঁর বিশ্বাস : এদেশের দুর্ব্বলতার মূল কারণ এই মূর্ত্তি পূজা। কালীর সামনে কখনও কখনও নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়!

উত্তরে নিবেদিতা বললেন : শ্রদ্ধেয় বন্ধু যে সব কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন, সেগুলিকে সত্য বলে মেনে নিতে পারেন না। এ অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। কালীর শত্রুরা নরবলির ইতিকথা প্রচার করেছেন। আর ব্যাপারটা যদি সত্যও হয়, এর দ্বারা মানুষ মাঝে মাঝে খুন করে, তার অতিরিক্ত কি প্রমাণ হয়? এভাবে, সেভাবে, যেভাবেই হোক খুন হল খুন।

আগের বক্তব্যে ফিরে এলেন। বললেন: যদি সমস্ত কিছুই ঐশী হয়, সমস্ত কাজই পূজা, হত্যাও পূজা, যার মধ্য দিয়ে এক ধরনের চরিত্র ঈশ্বরমুখী হয়।

ধর্ম্মভাবকে যেহেতু সত্যপূর্ণ, মহত্ত্বপূর্ণ ধরে নেওয়া হয়, তাই তার কিছু অনুগামী, কৃত বিকৃত কাজের জন্য, বিশিষ্ট ধর্ম্মপদ্ধতিকে দায়ী হতে হবে এ যুক্তি হাস্যকর। যদি তাই বলা হয়, তাহলে মূল প্রশ্ন করা যায় : কোন ধর্ম্ম তার প্রবর্ত্তনের নামে সর্ব্বাধিক মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে? অবশ্যই খ্রীষ্টানধর্ম্ম। কিন্তু কেউ কি খ্রীষ্টকেও স্বপ্নেও তার জন্য দায়ী করেন? যদি করেন, তাঁরা কি সঙ্গত কাজ করেন? কখনোই নয়। ব্যাভিচারাদির দারুণ অভিযোগের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। ধর্ম্মের ঘোষিত সত্য, দৃঢ় ও মহৎ হলেই হল। তার বিপরীত কিছুর জন্য তাকে দায়ী করা উচিত নয়। প্যারিস, লণ্ডন ও আমেরিকায় একই ধরনের Sutanites ও Diabalists সম্প্রদায় রয়েছে, যারা একই ধরনের কাজ চালিয়ে যায় অন্য এক ধর্ম্মের আচ্ছাদনের মধ্যে। এই পৃথিবীতে কোন নীতি বা আদর্শই প্রকাশিত হয়নি, যার বিরুদ্ধে কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেনি। এসব কথাই সত্য। তাই বলে কি আমরা নীতি বা আদর্শ ঘোষণায় বিরত থাকবো? এইভাবেই আমরা ভারতীয় পাপাদির কারণ ভারতীয় ধর্ম্ম— এমন কথা বলতে পারি না।

সকলের শেষে শ্রোতাদের কাছে নিবেদন করলেন : তাঁরা যেন কখনও মনে না করেন যে, ধর্ম্ম সংশয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চেয়েছেন। গভীরে দেখলে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয়, চূড়ান্ত সত্য বিশ্বাসেরই অপর দিক। আমাদের কর্ত্তব্য ঐ সংশয়ের সম্মুখীন হওয়া, তাকে প্রতিধান করা, তার পক্ষে তথ্য সন্ধান করা এবং যদি মৃত্যুও তাদের নিয়তি হয়, সযত্ন সমাধিতে তাদের শায়িত করা। যে মন সন্দেহ করেছে, আন্তরিক সন্দেহে আলোড়িত হয়েছে, সেই মনই বেঁচে রয়েছে। কিন্তু সন্দেহ যেন যথেষ্ট সন্দেহ হয়। যেন অতি সহজ, নিতান্ত সাধারণ সাধনাকে যথেষ্ট বলে, মেনে নেওয়া না হয়। ঈশ্বর প্রেমময় বলা খুব সহজ, কারণ আমাদের পারিবারিক সুখ শান্তি তার প্রমান। কিন্তু ঈশ্বর যে প্রেমময় ঠিক ঠিক সেকথা শিখি কখন, কি ভাবে? আমাদের জীবনের যন্ত্রণার মুহূর্ত্তেই কি মহাসত্য আমাদের কাছে আভির্ভূত হয়না—পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ সৌন্দর্য্য পূর্ণ আনন্দরূপে? কালী মূর্ত্তির মধ্যে এই বিপরীত সত্যটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃতি, পৃথিবী ও মানব আত্মার এই বিরোধী সত্যটুকু, মানবের কাছে ভয়ঙ্কর যা কিছু, সেই সকল কিছুর মাঝখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি-ই. তা সত্ত্বেও 'মা' এবং আমরা সকলে তাঁর শিশু সন্তান।"

এই বক্তৃতা দুটির মধ্যে এলবার্ট হলের জন্য তাঁর প্রস্তুতি শুরু জানুয়ারীর ১৮৯৯ প্রথম থেকে অথচ ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর পরিবর্ত্তে ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিলেন বক্তৃতা। সেই কণ্ঠ নিঃসৃত স্বর ছড়িয়ে পড়লো দেশের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। একজন ইংরাজ নারীর মুখে এমন প্রাঞ্জল ভাষায় হিন্দুদের পুতুল পূজার মূলতত্ত্বের সুন্দর ও গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশেষ করে এই কালী বক্তৃতায় তাকে ভারতীয় নারীর মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। এখন তিনি বিজাতীয় নন, পরিপূর্ণ ভারতীয়। লোক চোখে তিনি সিস্টার নিবেদিতা।

প্রথম বক্তৃতার পরই এলো কালীঘাট মন্দির কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমন্ত্রণ। সুরু হল প্রস্তুতি। চললো স্বামিজীর কাছে পাঠ নেওয়া। এরপরেই কালী তন্ময়তায় তলিয়ে গেলেন নিবেদিতা। আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমভিব্যক্তির আশায় আজীবন সংঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আভিলাষ জানালেন স্বামিজীর কাছে মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে। সম্মতি দিলেন তিনি। আগের দিন দুজন ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দীক্ষা দিয়েছেন তাঁকেও ওই ব্রতে দীক্ষিত করবেন স্থির করলেন।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। নৌকা এসে দাঁড়ালো মঠের ধারে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করা অনুচিত ভেবেই অপেক্ষা করতে লাগলেন নৌকার ছাদে। স্বামিজী তখন এক গাছতলায় ধূনীর পাশে বসেছিলেন। সংবাদ পেয়ে নৌকায় এসে ছাদে বসে আলোচনা সুরু করলেন। প্লেগ নিবারণের ব্যবস্থার কথাবার্ত্তা হল, তার পরে উঠলো প্রবুদ্ধ ভারতের বিষয়। নিবেদিতার কাজে খুব খুশী হয়েছেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে বললেন : প্রকৃত মনুষত্বের স্বরূপ আমরা এখনও জানি না। যখন প্রকৃত সেই মনুযত্বের উদয় হবে, দেখবার প্রয়োজন হবে না কোন পথে কম বাধা আসবে। প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকবে মহৎ কাজে এগিয়ে চলার। আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্ত নয় উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' আনা।

মনুষত্ব জাগরণের ব্যাকুলতায় নিবেদিতা হৃদয় স্পর্শ করলো। বলে উঠলেন স্বামিজী, আমি আপনাকে এই কাজে সাহয্য করবো।

উত্তরে বললেন : আমি জানি।

সেদিন থেকেই এই প্রতিশ্রুতি পালনে আত্মনিবেদন করলেন তিনি। প্রতিভাত হল স্বামিজীর স্বরূপ। মনুষত্ব ও জাতীয়তাবোধ আনয়নই হল তার সত্য সাধনা তথা মনের বাসনা। এটাই তাঁর প্রকৃতির নিজস্ব স্বরূপ। এই চেতনাই শিরধার্য্য করে নিলেন মার্গট জীবনের মূল মন্ত্ররূপে!

২৫শে মার্চ্চ তাঁর 'নিবেদিতা' নামের পূর্ণ হল একটি বছর। স্বামিজী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিনী রূপে দীক্ষিত করলেন। ২রা জানুয়ারী বেলুড়ে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছিল। সেখানেই সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। ৮টায় মঠে পৌঁছে ঘরে গেলেন। স্বামিজী বসেই ছিলেন। পূজার আয়োজন পূর্ণ হওয়ার আগে বুদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশমত পূজা আরম্ভ হল। শেষে বুদ্ধদেবের চরণে অর্ঘ-প্রদান করলেন। নীচে নেমে এসে হোম সম্পাদন করলেন।

হিন্দু বিধবার মত মার্গট নিষ্ঠাবতীর জীবন যাপন করেন, এই ইচ্ছা ছিল স্বামিজীর। আজ থেকে যে জীবন ও কাজের ভার তিনি গ্রহণ করলেন, তাতে এটাই ছিল অপরিহার্য্য অঙ্গ। স্থানীয় অধিবাসীর আস্থাভাজন হওয়ার প্রকৃষ্ট পথ ও পন্থাও ছিল এটি। মেমসাহেবের স্কুলে পড়লে, মেয়ে তাঁদের মেমেসাহেব হয়ে যাবে, এই ধারণা দূর করার একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ব্রহ্মচারিনী হিসাবে যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তা প্রযোজ্য উভয়ক্ষেত্রেই, সে মেয়ে বা ছেলেই হোক। — নিবেদিতা তাঁর মনের ইচ্ছা পরিপূরণে অক্লান্ত চেষ্টা করে চললেন। আহার্য্য হল ফল ও দুধ, শুধু ব্যতিক্রম উপরের ঘরে খাটের উপর শোয়া। ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে, এ দেশের গ্রীষ্ম, দারুণ কষ্টকর হলেও ঘরে তাঁর কোন বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা দূরে থাক, একটা টানা পাখাও রাখার ব্যবস্থা ছিল না। গুরু তাঁর স্বাধীনচেতা, নিজের পক্ষে যা প্রযোজ্য, এখানেও তাই, তবে আদর্শকে সামনে রাখতে উপদেশ দিতেন। যদিও পাশ্চাত্য জীবন ভোগ সর্ব্বস্ব, তার উপর তিনি ছিলেন আবেগপরায়না। স্বামিজী তাঁকে সর্ব্বসময়ে উপদেশ দিতে লাগলেন : ভাবোচ্ছ্বাস নয়, অনুভূতির চেষ্টা করে যাও। তিনি (স্বামিজী) রক্ষণশীল পন্থী, নিস্পৃহ হিন্দুজীবন ও সংরক্ষণ অর্থাৎ অবাধ মেলামেশার দ্বার রূদ্ধ, যেহেতু পাশ্চাত্যের ভাবাবেশে মানুষ, বহির্জগতের সঙ্গেই সম্বন্ধ, অবাধ মেলামেশাই সে দেশে, জীবনের ধ্যান ও ধারণা। এছাড়া তিনি প্রচণ্ড উৎসাহী ও অদম্য তাঁর কর্ম্মশক্তির মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ রাখাই তিনি (স্বামিজী) স্থির করলেন। বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে গভীর আলাপ ও পরিচয় হয়ে গিয়েছে ইত্যবসরে। এইসব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা বা তাঁদের বাড়ী যাতায়াত বন্ধ করলেন না। ইয়োরোপীয়দের, একটা সমাজ আছে এ দেশে, তাঁদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রকেও রুদ্ধ করার চেষ্টাও করলেন না। এই প্রথম বছরের দু মাস নানা শ্রেণীর এদেশীয় বা ইউরোপীয়দের ঘরে যাতায়াত, তাঁকে সংশয়ে দোলায় দুলিয়ে ছিল, শঙ্কাও বোধ করে ছিলেন, আজন্ম সঞ্চিত সংস্কারের ঘোরে হয়তো পুনরায় জড়িয়ে পড়বেন, তবুও বিন্দুমাত্র বাধা দিলেন না। আকারে, ইঙ্গিতে মনোভাব তাঁর প্রকাশ করে চললেন।

নিবেদিতা কিন্তু বন্ধুমহলের আলোচনা বা অভিজ্ঞতা, তাঁর কাছে অবাধে ব্যক্ত করতে লাগলেন আর তিনিও মন দিয়ে সেগুলি শুনলেন অথচ বিরুদ্ধ কোন মতামত প্রকাশে তাঁর এই স্বাধীন বিচরণের বা আচরণের ক্ষেত্রকে রুদ্ধ করে দিলেন না। আজীবন তিনি স্বাধীনচেতা, স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করার তিনি ঘোর বিরোধী। প্রকৃতির সব ক্ষেত্রের মতই, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিস্তৃত বিচরণ ভূমি, সেখানেই সে, সহজভাবে গড়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর শিক্ষাপ্রণালী। নিবেদিতা নিজের স্বাধীন সত্তার মধ্যেই নিজেকে গড়ে তুলুক, এটাই ছিল তাঁর চিন্তাজগতের বৈশিষ্ঠ। তাঁর সচেতন দৃষ্টিই হবে সে পথের দিশা, আশা ও আলোচনার পথপ্রদর্শক।

কালীঘাটে বক্তৃতার ২৩ দিন পর অর্থাৎ ২০ শে জুন স্বামিজী পাশ্চাত্য যাত্রা করলেন সঙ্গে নিবেদিতা, সংস্কৃত সাহিত্য,' দর্শনে সুপণ্ডিত স্বামী তুরিয়ানন্দ।

১৮৯৯, ২০শে জুন তাঁরা যাত্রা করে গুরুভাইদের সঙ্গে বাগবাজারে শ্রীমার বাড়ীতে এলেন। শ্রীমা নিজের হাতে রেঁধে সন্তানদের খাওয়ালেন। অপরাহ্নে শ্রীমার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ মাথায় তুলে নিয়ে প্রিনশেপ ঘাটে যাত্রা করলেন। হাসি মুখে শিষ্য ও জনমণ্ডলীর বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ

করে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে উঠলেন। ছ'বছর আগে অপরিচিত পাশ্চাত্য ভূমিতে যাত্রা, সেদিনের সঙ্গে আজ কত পার্থক্য। দু বছরের অতিরিক্ত শ্রমে ও রোগে শরীর ভেঙে পড়েছে— উপলব্ধি করছেন দেহ অবসানের বিলম্ব আর নেই। জীর্ণ দেহ কিন্তু মনে তাঁর অযুত বল, তিনি মনুষত্ব ও মাতৃভূমির সেবক। যাত্রার পূর্ব্বে বললেন : জীবনটা সংগ্রাম ক্ষেত্র। সে রণক্ষেত্রেই আমার মৃত্যু হোক! আমি জানি, দুবছরের রোগ যন্ত্রণা আমার পরমায়ু হরণ করে নিয়েছে — কিন্তু আত্মা, অপরিবর্ত্তিত। সেটা আজও অম্লান...."

জাহাজে কয়দিন বিশ্রাম পাবেন শিষ্যদের সেই আশা। কিন্তু বিশ্রাম তাঁর কই? মিশনের মুখপত্র উদ্বোধনের জন্য, লিখতে আরম্ভ করলেন 'পরিব্রাজক'। বাকী সময় বিশেষ করে, নিবেদিতার শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে লাগলেন। দেখালেন বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খ্রীষ্টানধর্ম্মের সঙ্গে কালীতত্ত্বের পার্থক্য। দাম্পত্য প্রেম, ও সৃষ্টি-কামনা সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি। ভারতে, সে ধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম, পশ্চিমে খ্রীষ্টধর্ম্ম। কিন্তু কয়জনই বা মৃত্যুকে কিংবা কালীকে উপাসনার সাহস রাখে? এসো মৃত্যুর উপাসনা করি, ভয়ঙ্করকে আলিঙ্গন করি, তাকে ভয়ঙ্কর জেনে, নরম করে না নিয়ে, দুঃখ জেনেই, দুঃখকে পূজা করি এসো!

আলোচনায় ব্যাপৃত তিনি। ব্যক্ত করলেন : নিজ মনোভাব। বললেন : তোমাকে লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ একবারে ছাড়তে হবে, রীতিমত নির্জ্জনবাস করতে হবে। তোমার চিন্তা, প্রয়োজন, ধারণা, অভ্যাস, হিন্দুর মত হওয়া চাই। তোমার জীবন হবে, ভেতরে বাইরে, যথার্থ নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর মত। সাধনার উপায় তুমি নিজে থেকেই জানতে পারবে— যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। সেই সঙ্গে ভুলতে হবে তোমার অতীত জীবনকে। এমন কি, সেসব স্মৃতিও ত্যাগ করতে হবে।

এই অর্দ্ধ পৃথিবী অতিক্রমের সময় ছিল মাত্র ছ'সপ্তাহ। জাহাজ, গঙ্গার মোহনা ত্যাগ করে সমুদ্রে যে মুহূর্ত্তে গা ভাসালো, সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল স্বামিজীর অন্যরূপ। একপাশে চলেছে পত্রিকার জন্য লেখা। তারপরই সুরু হচ্ছে ভারতীয় রীতিনীতি, ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা আবার তিনি আত্মস্থযোগী ভাবানন্দে মগ্ন। কখন কোন মুহূর্ত্তে, তাঁর উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হবে, কেউ জানে না। তখনই তিনি ব্যক্ত করে চলেছেন : সত্যের বার্ত্তা। নিবেদিতা তাঁর পাশে সদাই প্রস্তুত। ডায়েরীতে টুকে (Note) নিচ্ছেন সেইসব বাণী। আবার স্তব্ধতা। যেন যোগী যোগমগ্ন! চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেছেন। সহসা আবার মুখর হয়ে উঠলেন দেখ, যতদিন যাচ্ছে।...

কলম্বোতে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ২৪শে জুন, জাহাজ মাদ্রাজে পৌঁছলো। তীরে অপেক্ষমান বিরাট জনতা কিন্তু জাহাজ থেকে কোন যাত্রীর, তীরে অবতরণ নিষিদ্ধ, প্লেগ সংক্রামনের আশঙ্কায়। নৌকা করে নানা উপহার নিয়ে ভক্তের দল স্বামিজীকে দর্শন করে গেলেন। এমন কি স্বামী রামকৃষ্ণনন্দজীও। স্বামিজী প্রসন্ন হাস্যে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন মাদ্রাজ থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমল। ষ্টিমারে করে এসে পৌঁছলেন কলম্বোতে শ্রীগুরুর সঙ্গে মিলিত হলেন। স্যার কুমার স্বামী ও মি. অরুণাচলম্ জনতার সঙ্গে পুরাতন বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ করে তাঁরা এখানে মিসেস হিগিনের বৌদ্ধ বালিকা বিদ্যালয় এবং কাউন্টেস ক্যানোভারার কন্‌ভেন্ট ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে মিসেস হিগিনের সঙ্গে নিবেদিতার বহু আলোচনা হল। তাঁর সাহায্য পেলে মিসেস হিগিন একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন প্রস্তাবটি তুললেন। নিবেদিতা তা বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিলেন। মনে মনে স্থির করলেন পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কলকাতার মত মাদ্রাজ ও পুণায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। কলম্বোতেও আরেকটি খোলার সম্ভাবনা দেখা দিল।

যে উদ্দেশ্যে তাঁদের পাশ্চাত্য যাত্রা, সে সম্বন্ধে সচেতন রাখবার জন্য সুবিধা পেলেই অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে নিবেদিতার জীবনের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ শিল্পকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। যাত্রা সুরু হওয়ার পর সাগরসঙ্গমে জাহাজ উপস্থিত হলে, আবেগ ভরে বলে উঠলেন : নমঃ শিবায়! নমঃ শিবায়! ত্যাগ বৈরাগ্যভূমি পরিত্যাগ করে, ভোগৈশ্বর্য্য ভূমিতে পদার্পণ করতে চললাম। সেই সঙ্গে নিবেদিতাকে সতর্ক করে দিলেন, সাবধান, উত্তম আহার, পরিচ্ছদ - এ সকলের প্রতি মনোযোগ দিও না। সংসারে, বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হবে না। এ সব পরিত্যাগ কর, মূলসমেত উপড়ে ফেল। বিচিত্র বর্ণ, সুন্দর দৃশ্য ও শব্দ এবং অন্যান্য সংস্কার অনুযায়ী উচ্ছ্বাস, মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। এসব দূর কর, ঘৃণা করতে শেখ।

২৮শে জুন জাহাজ ত্যাগ করলো কলম্বো— মৌসুমী আরম্ভ হয়ে গেছে যেমন বৃষ্টি তেমনি বাতাস, দুলতে লাগলো জাহাজ কিন্তু এ আবহাওয়াতে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে লাগলো। ফলে তিনি তুরীয়ানন্দজীও নিবেদিতার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে সময় কাটাতে লাগলেন। একদিন তুরীয়ানন্দজীকে বললেন : স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন। আমি যদি ভুলে যাই বা অনিয়ম করি, আমায় মনে করে দিও।

হরিমহারাজ তাঁকে ব্যায়াম করাতে সুরু করলেন তা কয়েকদিন মাত্র। নানা প্রসঙ্গে নিবেদিতার সঙ্গে তন্ময় হয়ে ডুবে রইলেন।

সে তন্ময়তা ভাঙাতে সাহস পান না নিবেদিতা। হরি মহারাজ স্মরণ করালেন, ব্যায়ামের কথা। উত্তরে বলেন : আজ থাক, ভাই হরি। জাহাজে তো ভালই আছি। [illegible] এখন নিবেদিতার সঙ্গে কথা বলছি। ও বিদেশী মেয়ে, সব ছেড়ে ছুড়ে, আমার কাছে এসেছে এ সব কথা শোনার জন্য। বুঝলে ভাই, বড় ভাল মেয়ে, খুব সমঝদার। ওর সঙ্গে আলোচনায় বেশ আনন্দ পাই।

একদিন হরিমহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন : ওখানে কি রকম চলতে হবে?

ছুরির অগ্রভাগ নিজের হাতে ধরে, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হরি মহারাজকে বললেন : লোককে কিছু দিতে হলে, এইভাবে দেওয়া চাই। অর্থাৎ সববিষয়ে অসুবিধা ও বিপদের ভাগটা নিজে নিয়ে সুবিধার ভাগটা অপরকে দিতে হবে।

একদিকে তিনি যেমন নিবেদিতাকে মনের মত করে গড়তে চেষ্টা করছেন, অপর দিকে তাঁর চরিত্রের মহত্ব অবলোকন করছেন। জাহাজে তাঁদেরই সহযাত্রী আমেরিকান পাদ্রী মিঃ [illegible]। সঙ্গে স্ত্রী আর বেশ কয়েকটি ছেলে মেয়ে। তাঁরা ডেকের যাত্রী। তাঁদের ছোট মেয়ের নাম [illegible], অযত্নে মানুষ, ডেকের কোথায় তারা থাকে, তার সন্ধান রাখেন নিবেদিতা। তাদের আহার, তাদের যত্ন, তাদের তত্ত্বাবধানে অবশিষ্ট সময় তাঁর কাটে। স্বামিজী নীরবে লক্ষ্য করলেন . তাঁর ভেতরের মাতৃচরিত। তা চিত্রিত করে চলেন ভ্রমণ কাহিনী 'পরিব্রাজকের' মধ্যে।

এই যাত্রায় অভিজ্ঞতা লাভ হল তীব্র জাতি সমস্যার। স্বচক্ষে দেখলেন : নিবেদিতা নেটিভদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত ব্যবহার! তিনি ইউরোপীয়। তাঁর সঙ্গে অনেকেই আগ্রহভরে আলাপ করতে আসছেন, অথচ ভারতীয়কে দেখা মাত্র অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। এদের অবস্থা দেখে মনে তাঁর সহানুভূতি জাগলো। ভাবতে শুরু করলেন . হায়রে জাতিগত সংস্কার [illegible] সীমাবদ্ধ রেখেছে তাদের দৃষ্টি, নইলে জ্ঞানলাভের এতবড় সুযোগ তাঁর হাত ছাড়া হয়ে গেল।

সারাটা দিন কাটে গুরু শিষ্যের মধ্যে নিভৃত আলোচনায়। বিষয়: যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ এবং আর রামকৃষ্ণের জীবনী, ভারত ও ইউরোপীয় ইতিহাস, হিন্দুজাতির বর্তমানের দুর্গতি, ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবি উন্নতি, তার দর্শন ও তার ধর্ম্মনিষ্ঠা। এরই সঙ্গে ভেসে উঠছে তাঁর নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রেরণার ইঙ্গিত। নিরুদ্ধ হয়ে সব শুনে চলেছেন নিবেদিতা [illegible], সংগ্রহ করছেন তাঁর প্রতিটি কথা। ক্লান্তিহীন পাতার পর পাতা নোট নিচ্ছেন। [illegible]

ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে : অসংখ্য ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ভবিষ্যতে জন্ম নেবেন তাঁর গুরুর স্বপ্নগুলি, বাস্তবে পরিণত করার বাসনায়! তিনি, সে যাত্রাপথের সেতু স্বরূপ মাত্র।

এরই মধ্যে মনের কোণে যে সব চিন্তা ভীড় করতো তার সমাধানের আশায় মাঝে মাঝে প্রশ্ন তুললেন নিবেদিতা, কোন ব্রত নিয়ে যদি সিদ্ধিলাভ করতে না পারেন, তার গতি কি?

স্বামিজী শ্রীকৃষ্ণের অভয়বাণী আবৃত্তি করে বললেন : হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাদের কদাপি বিনাশ নাই। হে তাত, যে ব্যক্তি কোন লোককল্যাণকর কাজে প্রবৃত্ত, তার কোনকালে দুর্গতি হয় না।

স্বামিজী আশার সন্ধান পেলেন। নিজের মধ্যে, একটা প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করতে লাগলেন। চিন্তা শুরু হয়ে গেল: সে শক্তি কাজে লাগাবেন কেমন করে? ইংলণ্ডের উপর ভরসা কম, আমেরিকাতেই অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা অথচ সেখানে কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণাও তাঁর কম। ভরসা মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড— আঁরও আছেন স্বামিজীর শিষ্য বন্ধু ও অনুরাগী বৃন্দ, ততই উপলব্ধি করছেন, মনুষত্ব লাভই (manliness) জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই বার্ত্তাই আমি জগতে প্রচার করে চলেছি। যদি অন্যায় করো মানুষের মত কর, দুষ্ট যদি হও, বড় রকমের দুষ্ট হও। ... আর পরমুহূর্ত্তেই আবার সেই মৌনতা।.... কখনও বা কেবিন (জাহাজে থাকার ঘর) থেকে বেরিয়ে জাহাজের ডেকের উপর পদচারণা করছেন। উপভোগ করছেন প্রকৃতির রম্য পরিবেশ। ডুবছে সূর্য্য, হলদে লালে মেশানো রক্তিম আভায়, আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে সোনালী মেঘ, নীচে সুনীল সমুদ্র, মৃদু তরঙ্গে কাঁপছে তার প্রতিচ্ছবি, অদূরে এটনা আগ্নেয়গিরি থেকে বেরুচ্ছে হালকা হালকা ধোঁয়া। জাহাজ চলেছে এগিয়ে এবার পড়লো সেমিনা প্রণালীতে। আকাশে উঠলো চাঁদ, পায়চারী করছেন আর স্বামিজী বলছেন নিবেদিতাকে, সৌন্দর্য্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা : এই যে বাইরের জগতের সৌন্দর্য্যের বিকাশ, যা দেখে আমরা মুগ্ধ সকলে, মনের মধ্যে কিন্তু এর কোন অস্তিত্ব নেই। (সৌন্দর্য্য : বহিরঙ্গ, বস্তুগত না, মনোগত) আবার নীরবতা— আত্মমগ্ন হয়ে পড়লেন স্বামিজী!

ইতালির উপকূল। ধূসর পাহাড়ের মেলা। ভ্রূকুটি মাখা গর্ব্বোন্নত শির, অপর দিকে হাস্যময়ী সিসিলি দ্বীপ। অপূর্ব্ব সে প্রাকৃতিক দৃশ্য। সেদিকে তাকিয়ে স্বামিজী সহসা নিজের মনে বলে উঠলেন : 'মেসিনা আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, কারণ আমিই ত তাকে এই অতুল সৌন্দর্য্য দান করেছি।' পর মুহূর্ত্তেই সচকিত হয়ে নিবেদিতাকে শোনাতে লাগলেন : তাঁর বাল্যজীবনের সেই ব্যাকুলতা ও তার কঠোর সাধনার কথা। কিভাবে একাসনে স্থিরভাবে বসে সারাদিন একটি মন্ত্র জপ করতেন। প্রশ্ন করলেন নিবেদিতা, তপস্যা কি? ব্যাখ্যা করলেন স্বামিজী। পঞ্চতপাব্রতের কথা তুলে বললেন : চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে, মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য্য, তারা নিয়ে তন্ময় হয়ে সাধক বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পূজা করেন ভয়ঙ্করের। পূজা করেন মৃত্যুর। আর সব বৃথা, বৃথা সকল সংগ্রাম— এই বোধ শিক্ষা। তা কাপুরুষের মৃত্যু কামনা নয়, দুর্ব্বলের আত্মঘাত নয়, এ-হল বীরের অভ্যর্থনা। মৃত্যুকে, সবকিছুকে যে শেষ পর্য্যন্ত বাজিয়ে বাজিয়ে দেখেছে, জেনেছে এই শেষ উপায়! শেষ উপায়! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উচ্চতম অনুভূতি প্রকাশ করে ফেলে ছিলেন অজ্ঞাতসারে— সেটা ভোলাতেই যেন এটা তাঁর সচেষ্ট প্রকাশ। জাহাজ চলেছে এগিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়ে। স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আত্মমগ্ন। নিবেদিতা কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখামাত্র তীরে দিকে নির্দ্দেশে বলে উঠলেন "তুমি কি তাদের দেখনি? তুমি কি তাদের দেখনি, তীরে নেমে তারা "দিন দিন" (বিশ্বাস, বিশ্বাস) ধ্বনিতে চারদিক মুখর করে তুলেছে।" ভাববেগে আধঘণ্টা ইসলাম পতাকাবাহী আরব বীরদের স্পেনবিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করে চললেন।

নিবেদিতার চোখের পাতায় ভেসে উঠলো, ক্ষীরভবানী মন্দিরের দৈববানী, জগন্মাতার স্নেহকরুণ মৃত্যুভর্ৎসনা তাঁর চরিত্রে এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন এনে দিলেও, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর স্বদেশ (ভারত) কল্যাণ চিন্তা একমুহূর্ত্তের জন্যও ম্লান করে দিতে পারেনি। সে চিন্তার বিরাম নেই। তার পৌরানিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী, আলোচনার অবসর পেলেই মুখর তিনি! ভাবোজ্জ্বল তাঁর হৃদয়। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মহিমাসমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে বাস্তব, জীবন্ত করে তুলছেন সবসময়েই, বিস্মৃত শুধু বর্ত্তমান অধঃপতনের নৈরাশ্যজনক দৃশ্যগুলো। ভারতের উত্থান পতনের ইতিহাস ও জগদ্ধিতায় আবির্ভূত মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণীর মধ্যে জাতীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্যের ঘাত প্রতিঘাতময় বিকাশ সম্ভাবনা, তাঁকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে।

এই ভ্রমণ কালেই রচনা করেছেন "নাচুক তাহাতে শ্যামা"— নিবেদিতা শুনলেন তাঁর মুখেই সেই মহানাটকীয় আবৃত্তি "Yes! The older I grow, the more everything seems to me to lie on manliness. That is my new gospels. Do, even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale!"

"I have terror for its own sake, despair for its own sake, misery for its own sake. Fight always. Fight and fight on though always in deepest. That is the ideal. Thats' the ideal."

বললেন : সগুণ ঈশ্বর হলেন সকল আত্মার সমষ্টি, কেবল মানবাত্মার সমষ্টি নন। সেই সমষ্টি-ভূত বিরাটের অভিপ্রায়কে কেউ রোধ করতে সমর্থ নয়। তারই নাম নিয়তি। শিব, কালী প্রভৃতি বলতে তাকেই বুঝি আমরা!

আবার তলিয়ে গেলেন স্বামিজী। ডেকের উপর পদচারণা। তন্ময়, গভীর চিন্তা মগ্ন। সহসা মুখর হয়ে উঠলেন : একদিকে পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বল সঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রসুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল, অন্যপাশে ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী পূর্ব্বপুরুষদের ক্ষীণ আর্তনাদ, একদিকে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পোষাকে, লজ্জাহীনা বিদুষী নারী কুলের নতুন ভাব, নতুন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয়— অপরদিকে ব্রত, উপাসনা, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন', জটা, বল্কল, কষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান, একদিকে মিশনারী অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল, একদিক গতানুগতিক জড় পিণ্ডবৎ সমাজ, অপরদিকে অস্থির, ধৈর্য্যহীন, অগ্নিবর্ষনকারী সংস্কারক, এক পাশে ভাব-বিপ্লব সমুখ অভাব, অন্যদিকে চিরস্থায়ী দুঃখ, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ও অন্নহীনদের অন্তর্ভেদী হাহাকার— নাড়া দিচ্ছে, নাড়া দিচ্ছে তাদেব, তাদের ঘুম ভাঙছে,... হ্যাঁ... হ্যাঁ এমনি করেই তাদের ঘুমন্ত অনুভূতির জাগরণ হবে, জাগবে, দেখবে। জাগবে জাত্যাভিমান, পিষ্ট করবে তাদের। ফল : ভিক্ষা নয়, ভিক্ষার পাত্র নয়, সেই জীর্ণ কঙ্কালের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন সমাগত। কণ্ঠে ফুটে উঠলো, ক্ষীণ আশার আভা। প্রত্যক্ষ করলেন নিবেদিতা, তাঁর অন্তরে, বাইরে বইছে ঝড়, তিনি চাইছেন মুক্তি, মুক্তি — দেশের, দশের ... বিশ্বমানবের ..... পিষ্ট হৃদয়ের বন্ধন মুক্তি, স্বাধীনতা— ব্যক্তির, জাতির! চ'ইছেন সেই জাগরণ, জনসাধারণের, ব্যক্তিমানুষের! পূজা শুধু পূজা মানবত্বের!

বললেন : বুঝেছো, জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি বিদ্রোহ করে, পরের নকল করে একটা জাতির অভ্যুদয় হতে পারে না। জাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম, স্বাভাবিক বিকাশ— মুক্তির পথ। বিদেশীর শিক্ষা দীক্ষার অসংযত আস্ফালন, অভিব্যক্তি নয়, অনুকরণ, আত্ম বিস্মরণ জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে জঘন্য ব্যাভিচার।....

নিবেদিতার মানসপটে আঁকা হয়ে গেল... তাঁর গুরুর অন্তরের প্রতিচ্ছবি। মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি করলেন : গুরু তাঁর উৎসর্গিত জীবনে বার্ত্তাবাহী দূত, তিনিই প্রেরণা, তাঁকেই বহণ করতে

তাঁর বার্ত্তা দিকে দিকে— ছড়িয়ে দিতে হবে আকাশে, বাতাসে, ঠিক যেমনটি করে বলেছেন তাঁর প্রাণদেবতা, স্বকীয় গুরুর বার্ত্তাবহরূপে। পুঞ্জিভূত ঝড় ছিল দক্ষিণেশ্বরের পাদপীঠে, তা ছড়িয়ে গেছে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দিগান্তে, সমুদ্রে উঠেছে ঢেউ। সে গতির দ্বার রুদ্ধ করার শক্তি নেই কারও। সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান তিনি। মনে হল নিবেদিতার, এটা প্রতীক্ষা নয়— আহ্বান। সে সেতু রচনা করতে হবে তাকেই!

নিবেদিতা বলে উঠলেন : ভারতের কল্যাণকল্পে তিনি যে পথ নির্দ্ধারিণ করছেন, অপর ভারতহিতৈষীগণের প্রচারিত আদর্শের কাছে, এটা যে সংঘাত রূপ পরিগ্রহ করে!!

উত্তরে তিনি তাদেরও প্রশংসা করলেন।

সন্ধ্যায় পুনরায় সেই প্রসঙ্গ তুলে বললেন : যাঁরা তাদের ব্যক্তিগত কুসংস্কাগুলো আমার স্বদেশবাসিদের মধ্যে চালাতে চায়, আমি তাদেরই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিবাদ করি। সেটা খুবই তীক্ষ্ণ। একটু থেমে আবার বললেন : মিশরদেশের পুরাতত্ত্ব আলোচকগণের মিশরদেশের প্রতি যেমন অনুরাগ, কারও কারও ভারতবর্ষের প্রতি স্বার্থজড়ানো অনুরাগ থাকা বিচিত্র নয়। প্রত্যেকেই স্ব স্ব শিক্ষা, কল্পনা বা বই পড়ে ভারতকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। আমার ইচ্ছা, প্রাচীন ভারতের যত কিছু গৌরবময়— তারসঙ্গে বর্ত্তমান যুগের ভাল জিনিষও এক হয়ে নবীন ভারত গড়ে উঠুক। এই গঠনব্যাপারটি স্বকীয় হওয়া উচিত, যাতে বাইরের শক্তির প্রভাবকে একেবারে উপেক্ষা করতে সমর্থ হয়।

প্রাচীন আধুনিকের সম্মিলন হয়ত কল্পনার ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কথা স্মরণ কর। তিনিই সে পন্থার স্বরূপ উদ্ভুত অহং জ্ঞানরহিত পন্থা। একটু জোর দিয়ে বললেন : তিনিই সেই অসাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন, আমি তার ব্যাখ্যাকার মাত্র।

জাহাজ ৩১ শে জুলাই পৌঁছালো টিলবেরী ডকে।, সদলবলে নামলেন স্বামিজী। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত নিবেদিতার মা, বোন নিম, মিস প্যাসটনল, আমেরিকান দুই শিষ্যা মিসেস ফ্রাঙ্কি ও মিস্ গ্রিণষ্টায়ডেল— এঁরা এসেছেন ডিটেয়েট থেকে লণ্ডনে শ্রীগুরু দর্শনে। উপস্থিত নেই মি. ষ্টাডি, তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহে স্বামিজী প্রথম ইংলণ্ডে আগমন করেছিলেন বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গে উৎসাহী ছিলেন মিসেস জনসন। তাঁরাই প্রথম যাত্রায় তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করেছিলেন— বেদান্ত প্রচারের ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। নিবেদিতা যুক্ত হয়েছিলেন পরে, যদিও মি. ষ্টার্ডির সঙ্গে পরিচয় তাঁর বহুপূর্ব্ব থেকেই। মিস হেনরিয়েটা মুলারও যোগ দিয়েছিলেন বেদান্ত প্রচারের সহযোগিতায়। মিঃ ষ্টাডি ছিলেন উদ্যোগী আর মিস মুলার স্বামিজীর কাজে তাঁকে সাহায্য করতে ভারতেও গিয়েছিলেন। সেভিয়ার দম্পতি মঠ স্থাপনের জন্য যখন আলমোড়ায়, মিস মুলার তখন নিবেদিতাকে নিয়ে উপস্থিত কলকাতায়। স্বামিজী তাঁকে চিনেছিলেন, নিবেদিতাকে স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন ভারতে ডাক দেওয়ার পূর্ব্বে। পরে একে একে মিলিত হয়েছিলেন মিসেস বুল, ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে। অতি উৎসহী মিস মূলার স্বামিজীকে মঠের জমি কেনার টাকা দিলেন। জমি দেখা হল, কেনা হল তখন সেটা ছিল নৌকৌ বাঁধার ঘাট। অসমতল জমিকে সমতল কবা হল। তার উপর যে বাড়ী ছিল —তা সারানো ও বসবাসের উপযুক্ত করা হল মিসেস ওলি বুলে টাকায় আর দোতলা হল, লণ্ডনস্থ শিষ্যবৃন্দের সহায়তায় এছাড়াও এক লক্ষ টাকা মিসেস বুল তুলে দিলেন মঠ পরিচালনের জন্য ও তৈরী করে দিলেন ঠাকুরের জন্য ঘর। সেখানে বসবাসের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। সেই গঙ্গা, স্বামিজীর সাহায্যে উপদেশ আর ঝড়ের দৃশ্য সবই চোখের পাতায় একে একে ভেসে উঠলো নিবেদিতার।

ইতিপূর্ব্বে মিঃ স্টার্ডির চিঠি পেয়েছেন। স্বামিজীর আগমন সংবাদ পেয়ে, ওয়েলস চলে গেছেন। আর পূর্ব্বের সেই উদ্যোগতার মধ্যে মিসেস জনসন ও মিস্ হেনরিয়েটা, মুলার ইতি পূর্ব্বেই ত্যাগ করেছেন তাঁকে। একদিন তাঁকেই জগতে একজন বার্ত্তাবহ 'প্রফেট' বলে মনে হয়েছিল যখন তিনি পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হতে লাগলেন। সাধারণ মানুষের মত তিনিও সাধারণ। তার বেশী কিছু নন।

নিবেদিতার মনে পড়ে গেল মিস মুলারের বক্তব্য যখন স্বামিজী শুনলেন কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ সুন্দরভাবে চলছে। মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবা ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে, রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজে সাফল্যের সঙ্গে প্রচারের কাজ চালাচ্ছেন—অভেদানন্দজী ও সারদানন্দজী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার-কাজ চালাচ্ছেন উত্তমরূপে—নবীন কর্ম্মীদের উৎসাহ দেবার জন্য আলমোড়া ত্যাগ করতে ইচ্ছুক। বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর অনুরোধে স্থানীয় জিলা স্কুলে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর খ্যাতির কথা শুনে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ ইংলিশক্লাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন সভাপতি কর্ণেল পুলে সমবেত ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলাবৃন্দ এছাড়া উপস্থিত দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী "আত্মতত্ত্ব" সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে মিস মুলার রিপোর্ট লিখছেন : ক্রমশ অগ্রসর হয়ে স্বামিজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ ও উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করতে লাগলেন। মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হল বক্তা ও তাঁর বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ এক হয়ে গেছেন যেন! 'আমি' 'তুমি' 'উহা' কিছুই নেই। সে সকল ব্যক্তি সমাগত হয়েছিলেন তাঁরা যেন ক্ষণকালের জন্য আচার্য্যদেবের দেহ থেকে মহাশক্তিতে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশে —মন্ত্রমুগ্ধবৎ আত্মহারা হয়ে পড়লেন। যাঁরা সে বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের অনেকেরই জীবনে একই অনুভূতি। ক্ষণকালের জন্য, তিনি যেন তাঁর অবহিত, দোষগুণ সমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সামনে বক্তৃতাকারী বিবেকানন্দ থাকেন না, সে সময়ের জন্য, বিভিন্নতা, ব্যক্তিত্ব, অন্তর্হিত হয়। নামরূপ উড়ে যায়, এক কৈবল্য বিরাজ থাকে, যাতে শ্রোতা ও বাক্য এক হয়ে যায়। .... হ্যাঁ সেই মিস মূলার.... তাঁকে ত্যাগ করেছেন চোখে তাঁর এখন: তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র!

হ্যাঁ এটাও সত্য ও স্পষ্ট : দেশে প্রত্যাগমনের পর তাঁর কর্ম্মধারার রূপ পরিবর্ত্তন করেছিল। তিনি মন দিয়েছিলেন দেশ ও জাতির জাগরণে। যে বার্ত্তা বহন করে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করেছিলেন আমেরিকা ও ইউরোপে, সে অধ্যায়ের শেষ, এখন জনজাগরণই তাঁর ধ্যান.... জ্ঞান ...... সেই সঙ্গে গড়ে তোলা নোতুন কর্ম্মীসম্প্রদায়। যাঁরা, তাঁর বার্ত্তাবহ রূপে, জগত সমক্ষে শান্তি ও প্রীতির আদর্শ স্থাপনে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর এ বাণী বহনের জন্য প্রয়োজন একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা। সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি।

স্বামী সারদানন্দজী সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার চালাচ্ছিলেন। তিনি ফিরে এলেন সেই মঠ প্রতিষ্ঠার সাহায্যার্থে। শিবানন্দজী ফিরলেন সিংহল থেকে। স্বামী ত্রিগুণাতীতজী ঝাঁপিয়ে পড়লেন দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায়। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সবাই তাঁরই নির্দ্দেশে। সুরু হয়েছেন কর্ম্মযজ্ঞ। কাজ, কাজ শুধু কাজ আজ স্তব্ধ সে বাণী।

নিবেদিতার চোখে ভেসে উঠছে অতীতের দৃষ্টি : ইংলণ্ডের মাটীতে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন আর ভারতে কি দেখে এলেন : স্বামিজীর অনুপস্থিতিতে 'রামকৃষ্ণ মিশনের' কাজ চালাচ্ছিলেন ব্রহ্মানন্দজী। স্বামী তুরিয়ানন্দজী নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দদের শিক্ষায় নিযুক্ত। গুরুভ্রাতৃগণের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে খুশী হয়েছিলেন স্বামিজী। শিবরাত্রির দিন অপরাহ্নে সভা ডাক দিলেন। সভাপতি তিনি, গুরুভ্রাতাগণ বক্তৃতা দিলেন তাঁর আদেশে। উপস্থিত কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি সমাগত মহোৎসবের ভার নিলেন

নিজে। ঘোষণা করলেন : তাঁর ব্রাহ্মনেতর শিষ্যদের উপবীত প্রদান করবেন। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপর উপনয়ণ ও গায়ত্রী মন্ত্র প্রদানের ভার দিলেন। বেদ বললেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের উপনয়ণ সংস্কারে অধিকার আছে, সংস্কার অভাবে এঁরা বর্ত্তমানে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথিতে এঁদের স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব গ্রহণ করুক— কাল এঁদের ব্রাহ্মণ করে তুলবেন।

পঞ্চাশজন ভক্ত গঙ্গাস্নান করে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সামনে উপবীত ও গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করলেন। তাঁদের তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করলেন— প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্র জপের অধিকার দান করলেন।

গোঁড়া হিন্দু সমাজে ঘা পড়লো। উঠলো তুমুল ঝড়, তিনি নির্ব্বিকার। উদ্দেশ্য সমাজকে আঘাত নয়, প্রসুপ্ত হিন্দুজাতিকে আত্মসম্বিৎ দান করা — নানা উপাশনায় বিভক্ত হিন্দুগণকে একত্রীভূত করে শাস্ত্রানুশাস্ত্র অনুযায়ী চারটি মূলবর্ণে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তাহলেই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্বামিজী মঠ প্রতিষ্ঠা, সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলাবিধান, শিষ্য ও শিষ্যাদের শিক্ষাদানে নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন। ঘুরে এলেন উত্তর ও পশ্চিম ভারত। কিছুদিন পরে মিস মুলারের সঙ্গে মিস মার্গারিট নোবল পাশ্চাত্য সমাজের সকল বন্ধন কাটিয়ে কলকাতা চলে এলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে মিসেস ওলিবুল ও মিস ম্যাকলাউড আমেরিকা থেকে শ্রীগুরুর জন্মভূমি পরিদর্শন ও ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ ও নবীন সঙ্ঘের কাজে সহায়তা করার জন্য, এদেশে আগমন করলেন। এঁরা সকলে নবক্রীত পুরাতন বাড়ীতে বা কেউ কেউ কুটীরে বাস করতে লাগলেন। এঁদের কুটীরে অবসরমত সময়ে, নিজে এসে ভারতীর আচারের ব্যবহার, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করতে লাগলেন। মিস মার্গারেট নোবল পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। তাঁর আদেশে স্বরূপানন্দ তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন।

সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত হতে চাইলেন মিস নোবল। শিক্ষার অভিপ্রায় ও ঐকান্তিকতায় তাঁকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত করলেন নাম দিলেন 'ভগ্নী নিবেদিতা'। শিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন: যাও বৎস, তুমি তাঁর অনুসরণ কর যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করার পূর্ব্বে পাঁচশতবার লোককল্যাণ ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

মঠ নির্ম্মাণ ও শিক্ষাদানে নিযুক্ত কালেই শারীরিক অসুস্থতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। চিকিৎসকগণ তাঁকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্ত্তন করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অগত্যা কাজের ভার গুরুভাই ও শিষ্যদের দিয়ে ৩০ শে মার্চ্চ দার্জ্জিলিং যাত্রা করলেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগলো---- কলকাতায় তখন প্লেগ নগ্ন মূর্ত্তি ধারণ করেছে। শত শত লোক মৃত্যুর কবলে— স্থির থাকা সম্ভব হল না — ত্বরা মে নেমে এলেন কলকাতায়। সতর্কতা ও আবশ্যক প্রতিশেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বাংলা ও হিন্দী ভাষায় দু খানি প্রচার পত্র ছাপলেন। ভগ্নী নিবেদিতাও অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহচারীদের নিয়ে সেবাকার্য্য আরম্ভ করে দিলেন।

প্লেগ রোগ ও তার সরকারী রেগুলেশন দুই কঠোর। তার উপর ভীতিবিহ্বল নরনারীর প্রাণের ভয়, সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, রেগুলেশান মনোনয়নের জন্য ফৌজ মতায়েন, অসহায় ও নিরুপায় নরনারীকে আতঙ্কগ্রস্থ ও বিহ্বল করে তুললো।

সেবার কাজে নামলেন স্বামিজী। স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণতনয়গণ এগিয়ে এলেন, অভয় ও সেবার বাণী নিয়ে। কিন্তু টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? গুরুভাইয়েদের মধ্যে একজন প্রশ্ন তুললেন।

প্রয়োজন হয় নবক্রীত মঠের জমি বিক্রী করবো! অবিচল উত্তর স্বামিজীর। চোখের সামনে হাজার হাজার লোক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করবে, আর আমরা মঠে বাস করবো? আমরা সন্ন্যাসী, পূর্ব্বের মতই গাছতলায় বাস করবো, ভিক্ষান্নে উদর পূর্ণ করবো। ঝাঁপ দাও কাজে! কাজ আরম্ভ হল। প্রচুর অর্থ সাহায্য আসতে লাগলো নানা দিক থেকে। একটি প্রশস্ত জায়গা ভাড়া নেওয়া হল। নির্ম্মান করা হবে কুটীর। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অসহায় রোগাক্রান্ত নরনারীকে সেখানে রেখে উৎসাহী কর্ম্মীবৃন্দ সেবা করতে লাগলো। পল্লীর আবর্জ্জনা দূর করে প্রতিশেধক ওষুধ দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য লোক পাঠাতে লাগলেন। দারিদ্রনারায়ণের সেবায় তাঁর অসীম উৎসাহ ও আত্মত্যাগ দেখে বিরুদ্ধবাদী ও নিন্দুকের দল বুঝতে পারলেন : মুখে শুধু বেদান্ত প্রচার নয়, কাজেও বৈদান্তিক তিনি। "যত্র জীব তত্র শিব" মন্ত্রের ঋসি বিবেকানন্দ দেশবাসীকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, কেমন করে 'নারায়ণ' জ্ঞানে সেবা করতে হয়।

বেদান্তের মহান আদর্শ কর্ম্মজীবনে পরিণত করে, সেই আদর্শে জীবন গঠন করার আহ্বান করলেন : হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথর যাদের জাত্যাভিমানী সমাজ 'চলমান শ্মশান' বলে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, তাদের তিনি আলিঙ্গন করে বললেন : 'আমার ভাই' আমার রক্ত! কল্যাণকামী কর্ম্মবৃন্দকে, তমোহ্রদে প্রায় নিমজ্জমান কোটী কোটী অজ্ঞান নর-নারীকে, জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্ধার সাধনের ব্রত করার জন্য বার বার আকুলভাবে আবেদন করতে লাগলেন। বললেন, দুঃখ, দৈন্য, অজ্ঞতা, ঘোচাবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা। রুগ্ন, আতুর, আর্ত্ত, অনাথকে, ঔষধ, পথ্য ও আহার দানই, বর্ত্তমানে যুগোপযোগী মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ। সেবাই— ধর্ম্ম।

প্লেগের প্রকোপ কমে গেল, সরকারী রেগুলেশন শিথিল হল। মিঃ সেভিয়ারের আহ্বানে আলমোড়া যাত্রা করলেন পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সমভিব্যবহারে। সঙ্গে রইলেন স্বামী তুরিয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ ও চারজন পাশ্চাত্য শিষ্য। সদলবলে নৈনিতালে পৌঁছে কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেন। এখানে খেতরীর মহারাজা গুরুদেবের দর্শন কামনায় অবস্থান করছিলেন। স্বামিজীর শ্রীচরণ দর্শন ও পাশ্চাত্য শিষ্যদের সঙ্গে পরিচয়ে খুশী হলেন। বাল্যবন্ধু যোগেশ দত্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করেতে এলেন। কথা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষিত যুবকদের সিভিল সার্ভিস পড়াবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে বিলেত পাঠানোর কথা তুললেন, বললেন তাঁরা কৃতকার্য্য হয়ে দেশের কল্যাণে অনেক কাজ করতে সমর্থ হবে! উত্তরে স্বামিজী বললেন : দেশে ফিরে তারা ইয়ুরোপীয় সমাজে মিশবে, পদে পদে সাহেবদের খাওয়া দাওয়া, চাল চলন অনুকরণ করবে। স্বদেশ বা জাতীয় আদর্শের কথা, ভুলেও চিন্তা করবে না।

মিঃ সেভিয়ার আলমোড়া পৌঁছে সাহেবের বাংলোতে গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের নিয়ে উঠলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ অন্য একটি বাড়ীতে অবস্থান করতে লাগলেন। এখানেও চলতে লাগলো শিষ্য ও শিষ্যাদের কাছে ভারতীয় আদর্শ সমূহের ব্যাখ্যা। বোঝাতে লাগলেন : যাঁরা ভারতকে জীর্ণ স্থবির ও অধঃপতিত মনে করেন, সেটা নিছকই তাঁদের বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রণোদিত সমালোচনা। গৌরবময় বিকাশের জন্য প্রস্তুত হল : স্বনির্দ্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলার নিয়মাবলী। এই নবযুগের সূচনায় স্বদেশ সেবায় অগ্রসর হতে হলে, কত গভীর বিশ্বাস, ভালবাসা ও সদাজাগ্রত সহানুভূতি নিয়ে, সেই কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে দৌঁড়াতে হবে তাঁদের।

একদিন আলোচনার সময় সহসা আত্মপ্রকাশ করে বললেন : আমি নিজেকে বহুশতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলে অনুভব করছি। আমি দেখছি ভারত যুবাবস্থ।....

ভারতের কাজে বিগত জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে নিবেদিতা চলে এসেছিলেন কিন্তু তখনও তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি তাঁর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। ত্যাগ করতে পারেননি পরিণত

ইংরাজ মনের সহজাত ধারা। রাজভক্তিতে এখনও পরিপুষ্ট মন। ভারতীয় আদর্শ গ্রহণে অন্তরায় তাঁর চিরপোষিত রীতি, নীতি ও আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গী।

স্বামিজী তাঁকে ভেঙে চুরে সম্পূর্ণ ভারতীয় গড়ে তুলতে চাইলেন। সব কিছু বর্জ্জন। চাই পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শ! ভারত ছাড়া, অন্য কিছুর ঠাঁই থাকবে না মনে। শুরু করলেন আক্রমণ কড়া সমালোচনার চাবুক।

এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তখন। মানসিক দ্বন্দ্বে শেষে ভেঙে পড়লেন একেবারে। তাঁর এ অবস্থা উপলব্ধি করে মিস ম্যাকলাউড, এগিয়ে এলেন। স্বামিজীকে তাঁর মনের অবস্থা খুলে বললেন।

সব কথা মন দিয়ে শুনছেন তিনি। ফিরে গেলেন যথারীতি। সহসা ফিরে এলেন সে সন্ধ্যায়। আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ। যাবেন নির্জ্জন পরিবেশে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন তাঁকে, মুসলমানগণ নোতুন চাঁদের সমাদর করে। এসো আমরা এই নতুন চাঁদের সঙ্গে নোতুন জীবন আরম্ভ করি। পদতলে উপবিষ্ঠা তিনি স্বামিজী স্পর্শ করলেন তাঁর মাথা। সে দিব্যস্পর্শে তাঁর জন্মগত সংস্কার তলিয়ে গেল। তিনি পেলেন নোতুন জীবন।

এখানে পা দেবার পর থেকেই নির্জ্জনতা প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন স্বামিজী। প্রতিদিন দশঘণ্টা গভীর অরণ্যে একাকী ধ্যানে মগ্ন থাকছেন তিনি। দর্শনার্থীর ভীড় সারাক্ষণ। আধ্যাত্মিক আলোকে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দগণও অসহ্য বোধ হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। যে লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচার ছিল জীবনের সাধনা, সে অভিনেতার পরিচ্ছদ সরিয়ে উদাসী যোগীর জীবন যাপনেই অতিরিক্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে যে তীব্রতপোভাব পোষণ করে ছিলেন, সেই মন আবার জেগে উঠেছে।বহির্জ্জগতের প্রতি পরিপূর্ণ বিতৃষ্ণা। অরণ্যের সেই গভীর আকর্ষণ— টানছে তাঁকে একান্ত আপন করে। তাই প্রায়ই একা চলে যান গভীর অরণ্যে। সুদীর্ঘ সময় সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসেন কয়েক ঘণ্টার জন্য। ৫ই জুন সন্ধ্যাবেলায় তিনি ফিরে এলেন আলমোড়ায়। শিষ্যগণ ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছেন গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পাওহারীবাবা দেহ রক্ষা করেছেন। সাঙ্কেতিক লিপিবিদ মিঃ গুডউইন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ২রা জুন দেহত্যাগ করেছেন উড়কামন্ডে। পরদিন সকালে মিসেস বুল সংবাদ দিলেন স্বামিজীকে। সব শুনলেন ধীর ভাবে। পূর্ব্বের মতই ত্যাগ ও ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করে চললেন। কেটে গেল বেশ কয়েক ঘণ্টা। প্রকাশ করলেন মনের গভীর ব্যথা। সে ব্যথা প্রাণাধিক শিষ্য বিয়োগের নয়, ভারত হারালো একজন উদীয়মান কর্ম্মী। সেই আভাষটাই বিধে রয়েছে তাঁর বুকে।

"প্রবুদ্ধ ভারত" সম্পাদক ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আলমোড়ায় তা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। স্বামী স্বরূপানন্দকে করলেন সম্পাদক আর মিঃ সেভিয়ার হলেন পরিচালক। এরপর বেরিয়ে পড়লেন মিসেস বুলের অতিথি রূপে কাশ্মীরে। টাঙা করে রাওলপিণ্ডি থেকে মারী, নিলেন বিশ্রাম তিনদিন। তারপর পাড়ি দিলেন শ্রীনগরের দিকে। ঝিলাম উপত্যকার মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে উপস্থিত হলেন বারমূলায়। তিনিখানি হাউসবোট ভাড়া করে জলপথে এগিয়ে চললেন শ্রীনগর। এসময়ে তিনি ব্যাপৃত রইলেন কাশ্মীরের ইতিহাস, কনিষ্কের কাহিনী, অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও শিব উপাসনা বিষয়ে। ২৫শে জুন পৌঁছলেন শ্রীনগর। কাটালেন সাতদিন। ভাবান্তর দেখা গেল। সকলের অজ্ঞাতে একাকী নৌকাসহ অন্যত্র নির্জ্জন স্থানে চলে গেলেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই। গোপনে আমেরিকান শিষ্যদের বিশেষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন। অনুষ্ঠানটি যাতে সুন্দর হয় ... তিনি নিবেদিতার সহযোগিতা গ্রহণ করলেন। ফুল

ও পাতায় সাজালেন সেটি। স্থাপন করলেন তার মাথায় আমেরিকান জাতীয় পতাকা। সকালে সকলকে বিস্মিত করে যোগ দিলেন প্রাতঃভোজে। পড়ে শোনালেন : "To the fourth day of july"। ৬ই জুলাই বিশেষ কাজে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড গুলমার্গ চলে গেলেন। ফিরলেন ১০ই জুলাই। শুনলেন স্বামিজী চলে গেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল সোনামর্গের পথ ধরে যাত্রা করেছেন অমরনাথের দিকে।

বরফ গলতে সুরু হয়েছে। রাস্তা বন্ধ তিনি ফিরে এলেন ১৫ই জুলাই। ফিরে চললেন ইস্‌লমাবাদে (১৮ই জুলাই)। প্রাচীন দেবমন্দির ও অবন্তিপুরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করে আচ্ছাবল অভিমুখে এগিয়ে চললেন। হিন্দু, খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে শিষ্যগণকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমায় অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। আচ্ছাবলে পৌঁছেই অমরনাথ যাত্রার পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। নিবেদিতাকে সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। স্থির হল : অন্যেরা পহেলগামে অপেক্ষা করবেন তিনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত।

বস্ত্রাবাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনার জন্য পুনরায় ইসলামাবাদে ফিরে এলেন। সেখান থেকে নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এঁরা সকলেই অমরনাথ তীর্থযাত্রার সঙ্গী। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো রাত্রি যাপনের জন্য নিজ নিজ বস্ত্রাবাস স্থাপন করলেন। স্বামিজী ও নিবেদিতাকে তাঁদের মধ্যে বস্ত্রাবাস স্থাপন করতে দেখে আপত্তি জানালেন। স্বামিজী তীব্র ভৎর্সনার সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। ঠিক এই সময়ে একজন নাগা সন্ন্যাসী সামনে এগিয়ে এসে বিনীত ভাবে বললেন : স্বামিজী, আপনি শক্তিশালী কিন্তু তা প্রকাশ করা উচিত হবে না। নিজের ভুল বুঝতে পেরেই তিনি নিজেই নিরস্ত হলেন। সন্ন্যাসীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরেরদিন থেকে সকলের আগে তাঁদের বস্ত্রাবাস স্থাপন করে দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার পর প্রজ্জ্বলিত ধুনির পাশে শত শত সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিতে লাগলেন। তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ নিৰ্দ্ধারিণে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। এমন কি নিবেদিতাকেও নানপ্রকারে সাহায্য করতে লাগলেন।

বাওয়ানের পবিত্র ঝরনায় অবগাহণ করে একাদশী পালনের জন্য পহেলগাঁমে অন্য যাত্রীগণের সঙ্গে একদিন বিশ্রাম করলেন। চিরাচরিত কর্ত্তব্যগুলি অন্য সাধুদের মতই পালন করে চললেন। ধ্যান, জপ, শাস্ত্রালোচনা, একাহার—এগুলি দৈনিক কর্ত্তব্যের গণ্ডীবদ্ধ হয়ে গেল। ১৮০০ হাজার ফুট উঁচু তুষারবৃত গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে পাঁচটি গিরিনির্ঝরের মিলনস্থল পঞ্চতরণীতে বস্ত্রাবাস স্থাপন করলেন। ২রা আগস্ট মঙ্গলবার রাত দুটোর সময় জ্যোৎস্নাত হিমগিরির সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করতে করতে যাত্রা শুরু হল। সঙ্কীর্ণ উপত্যকা প্রথম, পরে কঠিন চড়াই। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। উঁকি দিল সূর্য্য, শেষ হল দুর্গমপথ। চোখের পাতায় ভেসে এলো অমরনাথের গুহা। সমবেত যাত্রীবৃন্দ মহাদেবের জয়ধ্বনি তুলে তুষার ধারায় অবগাহণ করলেন।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন স্বামিজী। পিছিয়ে পড়েছিলেন দলবদ্ধ যাত্রীদের থেকে। পৌঁছলেন একটু দেরীতে। উৎকণ্ঠিতা শিষ্যাকে পিছনে আসতে বলে স্নান করতে চলে গেলেন।

অবগাহণ শেষে নাগাসন্ন্যাসীর সঙ্গে বিভূতি লেপন করে কৌপীনধারী স্বামিজী বিশাল গুহায় প্রবেশ করলেন। তুষার গঠিত ভগবান মহাদেবের অনাদি শিবলিঙ্গই শ্রীশ্রী অমরনাথ। রজতশুভ্র কান্তি মহাদেব স্বীয় অটল মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। সেই মহান প্রতীক মূর্ত্তির সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে ভগবান শঙ্করের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করলেন। ধ্যানমগ্ন হয়ে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে বসে রইলেন। সিস্টার নিবেদিতাও মহাদেবের আরাধনা করলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। দর্শন করলেন শ্বেত পারাবত শ্রেণী। সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে সৌভাগ্যবান ও সিদ্ধ-সঙ্কল্প জ্ঞান করলেন।

ফিরে এলেন নদীতীরে। আধঘণ্টা পরে শিলাসনে সহৃদয় নাগাসন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিবেদিতাসহ জলযোগ করলেন। পাণ্ডা নেই, ধর্ম্মের ব্যবসা নেই, চিত্তবিক্ষেপের কারণ নেই। শুধু নিরবচ্ছিন্ন একটা পূজা.:.. আরাধনার ভাব সর্ব্বত্র মিশিয়ে রয়েছে। মৌনতা ভেঙে বললেন: এত আনন্দ আমি কোন তীর্থে পাইনি!....

স্বামিজীর চিত্ত দিব্য আনন্দে ভরপুর। নিবেদিতার অন্তর অতৃপ্তিতে ভরা। তাঁকে সঙ্গে এনেছিলেন মহাদেবের কাছে নিবেদন করতে। যিনি এনেছিলেন তিনি পরিপূর্ণ। আর তিনি! ভেবেছিলেন : তিনি ইচ্ছা করলেই সে দিব্য আনন্দে তাঁকে বিভোর করে দিতে পারেন— কিন্তু সে উপলব্ধিতো তাঁর হল না। নারীহৃদয়ের সহজাত অভিমান ফুসলে উঠলো! বুক ফাটলো তো মুখ খুলতে পারলেন না, যখন স্বামিজীর মুখে শুনলেন: তাঁর শিবদর্শন ঘটেছে! তাঁকে স্বেচ্ছামৃত্যু দান করেছেন তিনি!

একটা অস্ফুট স্বর ভেসে উঠলো নিবেদিতার ওষ্ঠে স্বামিজী! স্বামিজী মুখ তুলে তাকালেন কোন উত্তর দিলেন না।

এবার ফেরার পালা। মৌনতা ভাঙলেন স্বামিজী। বললেন : তোমার দর্শনও পরিপূর্ণ। তবে সে উপলব্ধি হতে সময় নেবে! বললেন নিবেদিতাকে : সে পরিপূর্ণ শক্তি ছিল আমার গুরুর। কিন্তু নিজে দেখলেন : তিনি শিবময়। মুখের ভাষা শুধু শিবের মহিমা কীর্ত্তনে গাঁথা!

পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী পহেলগামে এসে শিষ্যাদের সঙ্গে মিললেন। তখনও তিনি শিবময়! সেই শিবের মহিমাকীর্ত্তন। ফিরলেন শ্রীনগরে ৮ই আগষ্ট। কিন্তু নির্জ্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠলেন। চিত্ত সবসময়ে অন্তর্মুখী। মাঝে মাঝে ভারতের পুনরুত্থানের ব্রত বা আদর্শের কথা আলোচনা করেন। এসময়ে শিষ্যরা ছাড়াও কাশ্মীরসরকারের কর্ম্মচারীরাও নিয়মিত সে আসরে যোগ দিতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টিতে তখন একটি মাত্র সুর হিন্দুধর্ম্মকে ছুঁৎমার্গ বর্জ্জন করানো এবং করতে হবে তাঁকে প্রচারশীল আদর্শ। থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন।

এই সময়েই সহসা একজন প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা স্বামিজী দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার যখন চলে, আমাদের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর ভেসে উঠলো : বহুবল প্রয়োগ করে প্রবলকে নিরস্ত করা।

যদি— প্রশ্ন শেষ হতে দিলেন না। বলে উঠলেন, যেখানে দুর্ব্বলতা ও জড়ত্ব, সেখানে ক্ষমার কোন মূল্য নেই, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। যখন বুঝবে— একটু টেনে বললেন : সহজে জয় লাভ তোমার করায়ত্ত, ক্ষমা সেখানেই চলে। জগৎ যুদ্ধক্ষেত্র। সংগ্রাম করে, নিজের পথ করে নিতে হবে। সেটাও মানুষের ধর্ম্ম।

আবার প্রশ্ন : সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন না প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন?

দৃঢ়কণ্ঠ স্বর ভেসে এলো : অপ্রতিরোধ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, গৃহীর, ধর্ম্ম আত্মরক্ষা। একটু থেমে বললেন : বৌদ্ধ ও জৈনের অহিংসা এবং অপ্রতিরোধ. আদর্শের বিকৃতি। গার্হস্থ্য জীবনে মোক্ষমার্গী সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয়তাই হিন্দুজাতির জীবনে দেখা দিয়েছে তামসিক জড়ত্ব। শাস্ত্র বলেছেন : অহিংসা ঠিক নির্ব্বের জড় কথা, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে যদি কেউ চড় মারে, দশ চড় ফিরিয়ে দিও— নইলে পাপ করবে! আততায়িনং উদ্যন্তং' হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রাহ্মণবধেও পাপ নেই— মনু বলেছেন। একথা সত্য, ভোলাও উচিত নয় "বীরভোগ্যা" তবেই তুমি ধার্ম্মিক। ঝাঁটা, লাথি, খেয়ে চুপ করে ঘৃণিত, শাস্ত্রের মত সত্য, সত্য, পরমসত্য স্বধর্ম্ম করছি বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে এর তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা-উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করা, স্ত্রীপরিবার পালন করা, দশটা হিতকর অনুষ্ঠান করা, এ না পারলে— কিসের মানুষ তুমি!

কাশ্মীরের মহারাজ স্বামিজীকে একটি সংস্কৃত কলেজ ও মঠস্থাপনের জন্য আবশ্যকমত জমি দান করতে আহ্বান করলেন। ঝিলাম নদীর তীরে একটি স্থান মনঃপুত করলেন তিনি। কিন্তু রেসিডেন্ট মিঃ এডালবার্ট সাহেবের বিরোধিতায় তা সম্ভব হল না। আঘাত পেলেন স্বামিজী। বুঝলেন : দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ ভারতই তাঁর উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র। ২০শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার কনসাল জেনারেল তাঁকে ডাল হ্রদে আমন্ত্রণ জানালেন। দুদিন সেখানে বাস করে শ্রীনগরে ফিরে এলেন।

৩০ শে সেপ্টেম্বর ক্ষীরভবানী যাত্রা করলেন। এবার সঙ্গে কোন শিষ্যাকে নিলেন না। এখানে পৌঁছেই গভীর তপস্যায় ব্রতী হলেন। প্রতিদিন সকালে একমন দুধের ক্ষীর, আতপ অন্ন ও বাদাম জগজ্জননীর উদেশ্যে উৎসর্গ করতে লাগলেন। স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যাকে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পূজা করতে লাগলেন। প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির সামনে যোগাসনে বসে মহামায়ার ধ্যানে মগ্ন হবেন এমন সময় সামনে ভাঙা মন্দির দেখে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। এ মন্দির বিধ্বংসীরা ভেঙেছিল, বাহুবলে হিন্দুরা তাদের গতিরোধ করতে পারেনি? সেদিন যদি উপস্থিত থাকতে পারতাম জননীর মন্দির রক্ষায় প্রাণ দিতাম, কিছুতেই এ মন্দিরকে ধ্বংস হতে দিতাম না।

ধ্বনিত হল সস্নেহ ভর্ৎসনার সুর : বিধ্বংসীরা— তাতে কি? তুই আমায় রক্ষা করিস, না তোকে আমি রক্ষা করি?

অপ্রত্যাশিত দৈব ঘটনা। এ কার কণ্ঠ? একি তবে দৈবীমায়া? চিন্তার স্রোত ঘুরে গেল, যা হবার হয়ে গেছে, ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করবো, জীর্ণমন্দির সংস্কার করবো, নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবো, কোনো সন্দেহ নেই?

আবার ধ্বনিত সেই বামাকণ্ঠ : যদি ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্ত্তেই সপ্ততল মন্দির গড়ে তুলতে পারি এ আমার ইচ্ছা— তাই এই ভাঙা মন্দির!

চূর্ণ হল আজন্মের সংস্কার। রজোগুণের অভ্রভেদী সমুন্নত গরিমা, জগজ্জননীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো। স্মরণ হল শ্রীগুরুর কথা। হৃদয়ে একটি অজ্ঞানের পাতলা আবরণ মা-ই ঢেকে রেখেছেন, নিজের কাজ করিয়ে নেবেন বলে!

সে আবরণ ক্ষণিকের জন্য সরে গেল। দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন : মহামায়ার বিরাট ইচ্ছায় যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছেন তিনি। অনুভূতিতে মনের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলে। এনে দিল এক অপূর্ব্ব শান্তি। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নিয়ে ফিরে এলেন শ্রীনগরে।

সে এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর। বিস্মিতা শিষ্যগণ। অদ্ভুত কর্ম্মী, সদা উৎসাহোদীপ্ত যিনি— তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার সকল কর্ম্মস্পৃহা, সকল স্বদেশপ্রেম, অন্তর্হিত হয়েছে! হরি ওঁ। আমি মহাভুল করেছিলাম। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী! মা, মা তিনিই সব, তিনিই কর্ত্তা, আমি কে? তাঁর অজ্ঞান সন্তান মাত্র!

কয়েকদিন পরে নির্জ্জনে গভীর সাধনায় রত রইলেন। মাথা মুড়িয়ে সামান্য বেশে ফিরে এলেন শিষ্যাদের কাছে। আবৃত্তি করতে লাগলেন ক্ষীরভবানী যাওয়ার আগে যে কবিতা 'Kali the Mother' রচনা করেছিলেন তাঁর বাংলা অনুবাদ :

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীখানা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র, সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,

নভঃস্থল পরশিতে চায়। ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়,
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর, দুঃখরাশি জগতে ছাড়ায়—
নাচে তারা উন্মাদ অন্তরে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল নাম তোর, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীমচরণ নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে!
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ— মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

জননীর এই ধ্বংস মূর্ত্তির উপাসনা শিক্ষা করেছিলেন গুরু পরমহংসের কাছে। দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে অনুভব করেছিলেন : দুঃখ দৈন্য, ব্যাধি মড়ক, পরাজয় ব্যর্থতার সঙ্গে, বীরের মত সংগ্রাম করা, প্রয়োজন হলে নির্ভীক দৃঢ়তায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা বর্ত্তমান যুগের শক্তি সাধনা।

হ্যাঁ— রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী! সেইজন্যই আজ ত্রিশকোটী মনুষত্ব নির্বীর্য্য ও অলস। গুরুবলে বলীয়ান নবযুগের প্রারম্ভে ভারতবাসীকে ভীষণের পূজায়, মৃত্যুর উপাসনার আহ্বান করলেন:

'এসো নবযুগের শক্তি সাধক, আশা, আনন্দ, উল্লাস ও অতীত গৌরবের কঙ্কাল পরিপ্লুত এই ভারত মহাশ্মসানে, বৈরাগ্য, উদ্বেগ, আশঙ্কার এই ঘোর অমানিশার শুভলগ্নে : অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শক্তি সাধনায় অগ্রসর হও। ক্ষুধিতের কাতর ক্রন্দন, ব্যাধি পীড়িতের অসহায় হাহাকার, পদ দলিতের অক্ষম কাতরতা দেখে শিউরে উঠো না, এ ভীষনা তোমার উপাস্যা ইষ্ট দেবী। যাও, যেখানে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, মড়ক — মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে যাও সেখানে, ছুটে যাও! তাণ্ডব নৃত্যপরায়ণা মৃত্যুরূপা মাতার চরণে, হৃদয়ের উষ্ণশোনিত উৎসর্গ কর। প্রেতের অট্টহাসি, শিবার চীৎকার শুনে নারীর আঁচলের আড়ালে, ভীরুর মত আত্মগোপন করা— আর তোমার শোভা পায় না। শিয়রে মহাসর্ব্বনাশ নিষ্পলক নেত্রে, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, প্রেমের স্বপ্ন দেখার অবসর তোমার আছে কি? এসো দূর কর নারীমায়া— ভোগবিলাসের কামনা, হৃদয় থেকে নির্ম্মমের মত দূর করে দাও! রুদ্ধ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে এসো! এই অন্ধকারে বেরিয়ে পড়! ভয় কি? কিসের নৈরাশ্য? সিংহিনী যখন করি কুম্ভ বিদারণ করে রক্তপান করে, যখন ভীষণ গর্জ্জনে বনানী প্রকম্পিত করে তোলে, তখন পাশে দণ্ডায়মান সেই সিংহশিশু কি ভীত হয়? ওই রুধিরাক্ত রমনী, করাল দংষ্ট্রা সিংহী যতই ভীষণা হোক, সে তার জননী! এসো যুগ যুগান্তরের নিরাশা, ও জড়ত্ব পাশ, জীর্ণ বস্ত্রের মত দূরে নিক্ষেপ করে, কোটিকণ্ঠে একবার এই ভীষণাকে "মা মা বলে" ডাক। দেখ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনী চরণ তলে বসে পাগল পূজারী যেভাবে, যে নগ্ন সরলতা নিয়ে ডেকেছিলেন, ডাক দেখি একবার! মৃত্যুরূপা মা প্রসন্না হবেন, সাধনায় সিদ্ধি মিলবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের দুর্দ্দশাও ঘুচবে।...

১৩ই অক্টোবর লাহোরে এলেন সদলবলে। শিষ্যারা ভারতের বিখ্যাত শহরগুলি পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিষ্য সদানন্দজীকে নিয়ে ১৮ই অক্টোবর বেলুড়ে ফিরে এলেন। তাঁকে মঠে ফিরে পেয়ে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অবলোকনে তাঁদের চিন্তান্বিত করে তুললো। মুখের চেহারা পাংশুটে ভাব ধারণ

করেছে বাঁ চোখে রক্তজমাট বাঁধছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ডাঃ এল. দত্ত ও দু'জন কবিরাজ তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন। বিশেষ সাবধানে থাকার উপদেশ দিলেন। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসীবৃন্দ। কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার। মন তাঁর উদাসীন। বাহ্য বিষয়ে কোন অনুরাগ নেই। সকল বিষয়েই ঔদাসিন্যভাব। একই উত্তর : আমি কি জানি, মার যা ইচ্ছা তাই হবে। কৌতুককর গল্পে তাঁর মন ভাবরাজ্য থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করলেন অনেকে, কিন্তু তিনি লোকসঙ্গ এড়িয়ে নির্জ্জন স্থান বেছে নিতে লাগলেন।

শিষ্য শরৎচন্দ্র বেলুড়ে উপস্থিত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জানালেন : অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীতে কঠোর তপস্যায় শরীরটা একটু অসুস্থবোধ হচ্ছে, তেমন বিশেষ কিছু নয়।

শরৎচন্দ্র কিছুতেই থামলেন না। অনেক অনুরোধ উপরোধ করায় অমরনাথ ও ক্ষীর ভবানীর অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতির সম্বন্ধে দু'চার কথা বললেন। শেষে বললেন অমরনাথ থেকে ফেরার সময় শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন কিছুতেই নামছেন না।

বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে স্বামিজীকে নিয়ে আসা হল সুচিকিৎসার আশায়। মন ধীরে ধীরে উচ্চতম ভাবরাজ্য থেকে নেমে এলো। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কথোপকথন ও ধর্ম্মোপদেশ দিতে সুরু করলেন।

কিছুদিন পরে মঠে ফিরে গেলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী আলমোড়া থেকে মঠে ফিরে এলেন। শাস্ত্র আলোচনা, ধ্যান, তপস্যা বিরামহীন গতিতে চলতে লাগলো। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ে নবীন ব্রহ্মচারিদের উৎসাহ দিতে শুরু করলেন। নিবেদিতাও ফিরলেন। শ্রীগুরুর চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। হিন্দুনারীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ লাভের জন্য বাগবাজারে শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরানীর বাসভবনে বাস করতে লাগলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তগণের জন্য শ্রীনিবাস স্থাপনের ব্যবস্থাও স্থির হয়ে গেল।

শ্যামাপূজার দিন শ্রীশ্রীমা স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে নিয়ে বেলুড়ে আগমন করলেন। নিজে পূজা সমাপন করে সন্ন্যাসীবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর আশীর্ব্বাদে মঠের শুভ উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে এই আশায় ও আনন্দে সকলেই কৃতার্থ হলেন। আপরাহ্নে নিবেদিতার বিদ্যালয়ে ফিরে এলেন শ্রীশ্রীমা। সঙ্গে স্বামিজী, ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দজী। তাঁর প্রার্থনা মত তিনি (শ্রীশ্রীমা) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পূজা সমাপন করলেন। জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর আশীর্ব্বাদ এই বিদ্যালয় থেকে আদর্শ বালিকাগণ শিক্ষিতা হয়ে সমাজের কল্যাণদায়িনী হয়। সেই সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতাও আনন্দে নিজেকে সিদ্ধকল্প বলে অনুভব করতে লাগলেন।

৯ই ডিসেম্বর ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত। স্বামিজী গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দ ভাগিরথীতে অবগাহণ করলেন। নোতুন গৈরিকবাস পরিধান করে যথাবিধি ধ্যান, উপাসানা শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত পবিত্র তাম্রাধার দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করে নীলাম্বরঠাকুর বাগানবাটী থেকে বেলুড়ে নিয়ে এলেন। চলতে চলতে এক শিষ্যকে বললেন, ঠাকুর একবার আমায় বলেছিলেন, তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে খুশী নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকবো। তা সে কুঁড়ে ঘরই হোক, আর গাছতলায় হোক। পরম দয়ালের সেই আশীর্ব্বাদ ভরসা করে, আমি তাঁকে আমাদের ভবিষ্যৎ মঠে নিয়ে চলেছি। স্থির জেনো, বৎস, যতদিন তাঁর নামে, তাঁর অনুগামীরা পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, সর্ব্বমানবের সমপ্রীতির আদর্শ রক্ষা করবে, ততদিন ঠাকুর এই মঠকে তাঁর দিব্য উপস্থিতি দ্বারা ধন্য করে রাখবেন।

বেদীর উপর পবিত্র আঁধার স্থাপন করে, গুরুর উদ্দেশ্যে বার বার সষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর যথারীতি পূজা শেষ করে যজ্ঞাদি প্রজ্বলিত করলেন। বহুযুগ বিস্মৃত বেদমন্ত্র পুরাতন সুরে ঝঙ্কৃত করলেন। সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে বিরজাহোম সমাপ্ত করে, নিজের হাতে পায়মান্ন রেধেঁ ঠাকুরকে নিবেদন করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে রামকৃষ্ণ-সন্তানদের ডেকে বললেন, ভ্রাতৃবৃন্দ, এসো, আমরা কায়মনোবাক্যে লোক কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সূক্ষ্ম আবির্ভাবে, এই মঠ পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করেন! এই কর্ম্মকেন্দ্র থেকে বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, সর্ব্বসম্প্রদায়, সর্ব্বধর্ম্মের ভেদদন্দ্ব নিরসনের ভাবধারা প্রচারিত ও আচরিত হয়। ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী আলোচনা প্রসঙ্গে শিষ্য শরৎচন্দ্রকে বললেন, এখানে সাধুদের থাকার স্থান হবে, আর হবে সাধন, ভজন, জ্ঞান চর্চার প্রধান প্রাণ কেন্দ্র। এটাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগত ছেয়ে ফেলবে। মানুষের, জীবন-গতি সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করবে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের একত্র•সমন্বয়ে, এখান থেকে Ideals বেরুবে। এখানে যথার্থ ধর্ম্মনুরাগীগণের সমাবেশ হবে, তাঁরা দিগ-দিগান্তে প্রাণের সঞ্চারণ করবেন— মনে কত কল্পনার উদয় হচ্ছে!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য একটা বাংলা পত্রিকার অভাব বোধ বহুদিন থেকেই করে আসছিলেন। পাক্ষিক পত্র বার করার প্রস্তাব করলেন। সকলেই তাঁকে সমর্থন করলেন। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বার হল। স্বামী ত্রিগুণাতীতজীকে পরিচালনার ভার দেওয়া হল। "উদ্বোধন" নাম মনোনীত করলেন। ভক্ত ও সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিয়মিত শাস্ত্রালোচনা ও নানা উপদেশ দানে অত্যধিক পরিশ্রম হতে লাগলো। শরীরও ভাঙতে শুরু হল, শেষে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গ্রীষ্মে পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া স্থির, সুতরাং বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করলেন। কলকাতা বা বেলুড়, যেখানেই অবস্থান করুন না কেন দর্শক ও ভক্তবৃন্দদের এড়ানো সম্ভব নয়, অগত্যা ১৯শে ডিসেম্বর বৈদ্যনাথে গমন করলেন। অতিথি হলেন প্রিয়নাথ মুখুজ্যের। ওখানে হাঁপানী বেড়ে গেল। সকলেই তাঁর জীবন সম্বন্ধে সংশয়বোধ করতে লাগলেন। ঈশ্বরের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

১৮৯৯ সালের ২রা জানুয়ারী। নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ী বৈদ্যনাথের নির্জ্জনতায় আর বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হল না। অনেক কাজের পাহাড় জমেছে, চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চিকিৎসকগণের উপদেশ ব্যর্থ হল। ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরে এলেন মঠে। এখানে কাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলছে দেখে চিন্তামুক্ত হলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর নেতৃত্বে প্রশ্নোত্তর সভা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দান সুন্দর রূপে চলছে, অপরদিকে ধ্যান ও তপস্যার বিরাম নেই। মঠে পা দিয়েই একটি সভা ডাকলেন। সেখানে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করার জন্য গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের উপদেশ দিলেন। স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দজীকে ঢাকা অঞ্চলে যাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন।

বিরজানন্দজী সবিনয়ে আপত্তি তুললেন। বললেন, স্বামিজী আমি কিছুই জানি না লোককে বলবো কি?

গম্ভীর হয়ে উঠলেন স্বামিজী। বললেন : যাও বল, গিয়ে আমি কিছুই জানিনা— এটা আমার এক মহত্তম বার্ত্তা!

পুনরায় অনুযোগ এলো : সাধন বলে, আত্মসাক্ষাৎকার না করে কেমন করে লোক শিক্ষায় ব্রতী হবো? আর কিছুদিন সাধন করার আদেশ দিন।

ধিক্কারে গর্জ্জে উঠলেন : স্বার্থপরের মত নিজ মুক্তির চেষ্টা করলে, নরকে যাবে। যদি তুমি পূর্ণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে চাও, অন্যের মুক্তির সাহায্য করো। নিজ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনাশ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

শিষ্যকে মৌন দেখে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন : বৎস, ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে, জগদ্ধিতায় কর্ম্মে অগ্রসর হও। যদি পরম কলাণ কামনার কর্ম্মে অগ্রসর হয়ে, নরকেও যেতে হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে মঠের ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে ধ্যানস্থ হলেন। বহুক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করলেন। বললেন : আমার শক্তি তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করবো। শ্রীভগবান সর্ব্বদা তোমাদের পশ্চাতে থাকবেন কোন চিন্তা নেই।

প্রচার কাজের নানা উপদেশ দিলেন শিষ্যদ্বয়কে। দীক্ষা প্রার্থনা করলে কি মন্ত্র, কেমন ভাবে দীক্ষা দান করতে হয়, সব শিখিয়ে দিলেন।

নববলে বলীয়ান শিষ্যদ্বয় শ্রীগুরুর পদধূলি গ্রহণ করে পরদিন ঢাকা যাত্রা করলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও সদানন্দজীকে প্রচার কার্য্যে গুজরাট পাঠিয়ে দিলেন।

স্বামিজী মঠে ফিরে এসেছেন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে কলেজের ছাত্র, ও শিক্ষিত যুবকগণ দর্শনার্থী হয়ে আগমন করতে লাগলো। অসুস্থ শরীরের প্রতি দৃকপাত না করে উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত রইলেন। দেশ সেবায়, যুবকদের আত্মনিয়োগ করাই যে বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত একথা মনে প্রাণে অনুভব করে, সেই আদর্শে তারা জীবন গঠন করার চেষ্টা করুক— ওজস্বিনী ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তাদের কাছে ঘোষণা করলেন, সেবাই ধর্ম্ম, আর দেশসেবা সেই ধর্ম্মের অঙ্গ। আবার যখন তলিয়ে গেলেন দেশের দুর্দ্দশার আলোচনায়, ভাবের অতিশয্যে দুটো চোখে তাঁর জলে পূর্ণ হয়ে উঠলো। বলে উঠলেন : যদি দু হাজার বীর হৃদয়, বিশ্বাসী, চরিত্রবান ও মেধাবী যুবক আর ত্রিশকোটী টাকা আমি পাই, ভারতকে আমি নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।

জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাচ্ছে, নিরাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর আহ্বানে যে মুষ্টিমেয় নরনারী সাড়া দিয়েছে, তাদেরই অগ্রগামী রূপে গড়ে তুলতে হবে, মনেপ্রাণে উপলব্ধি করলেন। একদিন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের বললেন : শোন বৎসগণ। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, জগতের কল্যাণকামনায় দেহ বিসর্জ্জন করে গেছেন। আমি, তুমি, প্রত্যেককেই জগতের কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জ্জন দিতে হবে। বিশ্বাস কর আমাদের হৃদয় মোক্ষিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু থেকে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্ম্মবীরগণ, উদ্ভুত হয়ে জগৎ আলোড়িত করে দেবে। বুঝলে : আমি এখন এক ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই, যাতে মানুষ তৈরী হয়। (I want to preach a man making religion)

একজন প্রশ্ন করলেন : যে অসাধারণ বাগ্মীতায়, আপনি ইউরোপ, আমেরিকা মাতিয়ে এলেন, নিজ-দেশে এসে এমন চুপচাপ আছেন এর কারণ কি?

উত্তরে বললেন : এদেশে আগে জমি তৈরী করতে হবে! পাশ্চাত্যের মাটি খুব-উর্ব্বরা। বীজ ছড়ালেই ফসল ফলে, আর এখানে? দেখছো না এদেশের লোকেরা অন্নভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগশোকে জরারজীর্ণ, সেখানে লেকচার ফেকচার দিয়ে কি হবে? এখানে প্রয়োজন : ত্যাগী পুরুষের! যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। সেই জন্যই তো এ মঠের পত্তন। আমি সেই বাল সন্ন্যাসীদের তৈরী করতে চাই। যারা শিক্ষা শেষে ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে তাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলবে। কি উপায়ে এ

অবস্থার উন্নতি সম্ভব, ও ধর্ম্মের মহান সত্যতা কি? তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে, তাদের মন সচল ও সতেজ করে তুলবে! দেখছিস্‌না, পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য উঠবার আর বিলম্ব নেই। তোরা সব কোমর বেঁধে লেগে যা, সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন, কাজ হচ্ছে : দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে, গিয়ে বুজিয়ে দেওয়া : 'আর আলস্য করে বসে থাকলে চলবে না।' শিক্ষাহীন, ধর্ম্মহীন, বর্ত্তমান অবনতির কথা বুঝিয়ে তাদের বলগে : 'ভাই সব, উঠো, জাগো, কতদিন আর ঘুমোবে? সেই সঙ্গে বেদান্তের মহান সত্যগুলি সরল করে বুঝিয়ে দাও। এতদিন ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মটা একচেটে করে বসেছিল, কালের স্রোতে তা যখন টিকলো না, তখন সেই ধর্ম্মটা দেশের লোক যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে'। বোঝাগে : তাঁদের মত, তোমাদেরও সমান অধিকার, তোমাদের ধর্ম্মে। অচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। সোজা কথায় তাদের, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, গৃহস্থজীবনের আবশ্যকীয় বিষয়গুলির উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক আর বেদ বেদান্ত পড়াকেও ধিক। লেগে যা— কয়দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা! নতুবা গাছ পাথার হচ্ছে, মরছে, এরূপ জন্মাতে, মরতে— মানুষের কখনও ইচ্ছা হয় কি? কাজে দেখা, তোদের বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে শোনাগে, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগিয়ে তোল। নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তি কামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি-টুক্তি, আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা। এমনি করে জমি তৈরী করগে, আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে, তার ভাবনা নেই। এই দেখনা, যারা আগে ভাবতো আমাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষ ফাণ্ড কত কি বলছে। দেখছিস না নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে, আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবি না? যেখানে মহামারী, যেখানে জীব দুঃখে নিপীড়িত, যেখানে দুর্ভিক্ষ —চলে যা সেইদিকে। নয় মরেই যাবি! তোর আমার মত, কীট হচ্ছে— মরছে, তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এইভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাইতো দেশের আশা ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখলে, আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা, লেগে যা! দেরী করিসনে, মৃত্যু দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি বলে আর বসে থাকিস নে, তাহলে কিছুই হবে না।

নানাস্থান থেকে নানা লোক আসতে লাগলো। কারও ধর্ম্মীয় সমস্যা ভঞ্জন, কাউকে শিষ্যপদে বরণ করতে লাগলেন। পাত্রাপাত্র বিচার নেই, ধনী, দরিদ্র, ভেদ নেই। পণ্ডিত মূর্খ, তাঁর কাছে তুল্য আদর ও যত্ন পেতে লাগলেন। কখনওবা সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য শিষ্যবৃন্দদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। কখনও বা সংযম সাধনায় উৎসাহ দিতে লাগলেন ব্রহ্মচারীবৃন্দদের। আবার দেখা গেল, নিজেই লেগে গেছেন আবর্জ্জনা বা জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে। তাঁর দৃষ্টিতে সব কাজই সমান, সবই প্রভুর কাজ।

একদিন শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিযুক্ত আছেন। মঠে সাধুনাগ মহাশয় উপস্থিত হলেন। প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করলেন : ভাল আছেন তো?

আপনাকে দেখতে আইলাম। জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল। মুখে খুশীভরা হাসি।

স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রসাদ এনে দিতে বললেন স্বামিজী।

আনন্দে উজ্জ্বল নাগমশায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : প্রসাদ! স্বামিজী, আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন স্বামিজী— দেখেছিস! নাগামশায়কে দেখ, ইনি গেরস্থ, কিন্তু জগৎ আছে কি নেই— এঁর সে জ্ঞান নেই। সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে আছেন। বললেন, এরা সব ব্রহ্মচারী। আমাদের সকলকে ঠাকুরের কথা কিছু শোনান।

ওকি বলেন! ওকি বলেন! আমি কি বলবো। আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!! উত্তর দিলেন নাগমশায়।

সহাস্যে বললেন স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনিই চিনেছেন! আমরা শুধু ঘুরে ঘুরে মরলুম।

ওকি কথা বলছেন। আপনি ঠাকুরের ছায়া এপিঠ আর ওপিঠ । যার চোখ আছে সে দেখুক! ভাবে বিভোর নাগমশায়।

শুধালেন স্বামিজী : এ সব যে মঠ ফট্ হচ্ছে এটা কি ঠিক হচ্ছে?

ভক্তিতে গদ গদ নাগমশায়। সহাস্যে বলে উঠলেন, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে, — মঙ্গল হবে।

একবার আপনার দেশে যাবো।

আনন্দে দিশেহারা নাগমশায়। বললেন : এমন কি দিন হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট কি আমার হবে?

মৃদু হাসলেন স্বামিজী। বললেন, আমার তো ইচ্ছা আছে। মা নিয়ে গেলে নিশ্চয় যাবো।

কে বুঝবে আপনাকে, কে বুঝবে! দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার উপায় নেই। ঠাকুরই আপনাকে একমাত্র চিনেছিলেন। আজ, সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র। কেউ বুঝতে পারেনি।আবেগে উদ্বেলিত নাগমশায়ের কণ্ঠস্বর।

এখন আমার একমাত্র ইচ্ছা দেশটাকে জাগিয়ে তুলি। একটু হেসে বললেন : মহাবীর নিজের শক্তি মত্ততায় অনাস্থাপর, ঘুমোচ্ছে— সাড়া নেই ,শব্দ নেই। সনাতন ধর্ম্মভাবে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝবো, ঠাকুর ও আমাদের আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে মুক্তি ফুক্তি আজ তুচ্ছ বোধ হচ্ছে! আশীর্ব্বাদ করুণ যেন কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

উচ্ছ্বাসিত নাগমশায়। বলে উঠলেন : ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ, আপনার ইচ্ছা, গতি ফেরায় এমন কাউকে দেখিনা। যা ইচ্ছে করবেন, তাই হবে।

হাসলেন স্বামিজী। বললেন : কই কিছু হয় না— তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না! চকিতে গম্ভীর হয়ে উঠলেন স্বামিজী।

'তাঁর ইচ্ছা' আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে, আপনার যা ইচ্ছা! ঠাকুরের ইচ্ছাও তাই! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! মুখর নাগমশায়।

কিন্তু কি যে করছি, কি না করছি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে নাগমশায়। এক এক সময়ে এক একদিকে মহাঝোক আসে, সেই মত কাজ করে যাচ্ছি— এতে ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছিনে। অনুযোগ তুললেন স্বামিজী।

ঠাকুর যে বলেছিলেন চাবি দেওয়া রইলো। তাই বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝবামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে। কণ্ঠে নাগমশায়ের আবেগ ও উন্মাদনা।

কিন্তু .... চিন্তামগ্ন হয়ে উঠলেন স্বামিজী। ভাঙলেন না মনের কথা, ব্যাপৃত হলেন অন্য আলোচনায়।....

সন্দর্শনে এলে পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর, সঙ্গে দুজন বন্ধু। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। সুরু হল ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ, দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতার কথা— তার সঙ্গে এলো সামাজিক অব্যবস্থার কথা। স্বামিজী অভিযুক্ত করলেন, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে।

যারা অশিক্ষিত, দরিদ্র, যাঁরা সমাজে পিষ্ঠ তাদের সাহায্যের জন্য, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিব, তা দূরীকরণে অগ্রবর্ত্তী হওয়া উচিত। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সে ঘুম ভাঙানোর কাজে।

আলাপ চললো বহুক্ষণ। এবার পণ্ডিতজী উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গীটি আক্ষেপ করলেন ধর্মোপদেশ শোনার আশায়, আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা অতি সাধারণ বিষয়েই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। দিনটা বৃথাই রয়ে গেল।

করুণায় মুখখানা বেদনাহত হল। ধীর কণ্ঠে বললেন : যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমর জন্মভূমির একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আহার জোগানোই আমার ধর্ম্ম—এছাড়া আর যা কিছু সব অধর্ম্ম।

স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন। সন্ন্যাসী প্রচারকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কাজ ভালভাবেই চালাতে লাগলেন। মাদ্রাজ, কলকাতা ও আলমোড়ার মায়াবতী মঠ থেকে কর্ম্ম পরিণত বেদান্তের ও ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক আদর্শের নবধারার সেবার বাণী, প্রচারিত হতে লাগলো। মঠে নিজে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে গুরুভ্রাতাগণসহ নবীন সন্ন্যাসীদের সংগ্রামকুশলী সৈনিকরূপে গড়ে তুলতে লাগলেন। আলোচনায় জন্মগত অধিকারবাদের কথা উঠলো। স্বামিজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যায় বৈষম্য ও ভেদবাদের বিরুদ্ধে বলে উঠলেন : না আপোষ নয়, চূণকাম নয়, গলিত শবদেহকে ফুল দিয়ে ঢেকো না, কাপুরুষতা থেকে জন্ম নেয় আপোষ প্রবৃত্তি। সাহস অবলম্বন কর। হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, সর্ব্বপরি তোমরা, সাহসী হও। কোন কারণেই আপোষ করতে যেয়োনা। চরম সত্য প্রচার কর। লোকসমাজের শ্রদ্ধা লাভ করবে না অথবা অবাঞ্ছনীয় কলহের কারণ ঘটবে বলে ভীত হয়োনা। সত্য গোপন না করে, তুমি যদি সর্ব্বান্তকরণে সত্যের সেবা কর, তাহলে তুমি এমন ঐশী শক্তি লাভ করবে, সে শক্তির সামনে, তুমি যা সত্য বলে বিশ্বাস করনা, এমন কথা বলতে, লোকে কম্পিত হবে। চোদ্দ বছর কায়মন প্রাণে সত্যের সেবা করলে, লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করবে। কেবল এ উপায়েই তুমি জনসাধারণের কল্যাণ করতে পার, তাদের বন্ধন মোচন করতে পার জাতিকে উন্নত করতে পার।.....

গ্রীষ্মে সমুদ্র যাত্রায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে আশায় বন্ধুবর্গ ও চিকিৎসকগণ তাঁকে সমুদ্র যাত্রার অনুরোধ করতে লাগলেন। ১৬ই ডিসেম্বর দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই ইচ্ছাকে সকলেই সমর্থন করলো। শেষপর্য্যন্ত ২০ শে জুন ইংলণ্ড যাত্রার দিন নিদ্ধারিত হল।

স্বামিজীর ডাক পেয়ে মার্গট ভারতে যখন যাত্রা করলেন ছোট বোন মে-কে বহন করতে হল সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব, তার উপর পড়লো তাঁর দিদির স্কুল চালানোর ভার। অথচ তখন সে গার্হস্থ্যজীবনে নিজেকে জড়াতে প্রস্তুত হচ্ছে।....

নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্ব্বে, মনটাকে প্রস্তুত করতে সময় লেগেছিল মার্গটের। তিনি জানতেন, তাঁকে পরিপূর্ণ নোতুন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। সে দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই, পরিচয় শুধু স্বামিজীর সঙ্গে। এপাশে তাঁর নিজস্ব পরিবেশ, তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিশেষ করে বৃদ্ধা মা ও ছোট ভাইবোনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নিজের। অবশ্য সহযোগী ছোট বোন মে। তাঁর কাঁধেই সংসার ও স্কুল চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করে শেষপর্য্যন্ত ভারত যাত্রাই

স্থির করে নিলেন তিনি। সেদিন পরিচিত মহলের উপদেশ ও সকল ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে।

নোতুন দেশে, নোতুন পরিবেশে পা দিয়েই নিজেকে মানয়ে নেওয়ার যে আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা মনকে ঘিরে ছিল এতদিন, স্বামিজীর উপস্থিতি ও তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মুহূর্ত্তে সে পর্দ্দা সরে গিয়েছিল সত্য, বিশেষ করে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে পরিচয়ের শুভ সে-লগ্নে— তবুও মা, বোন ও ছোট ভাইটির কথা বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাঁর মনের অবস্থা গর্ভধারিনী মাকে জানাতে ছিল দ্বিধা। যদি প্রাণ খুলে, সে সংবাদ দেন, হয়ত ব্যথা পাবেন তিনি। তাই বন্ধুবান্ধবীর কাছে নিয়মিত দারুণ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে চিঠিপত্রে, তাঁদের সমস্ত খবর সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত খোঁজখবরও অবশ্য পেয়ে চলেছেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি স্বামিজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ ছিলনা কিন্তু মন! তার লাগাম সামনে রেখে চলা যায়, যখন নিজেকে নিয়োগ রাখা যায় কাজে— তারপর যখন আসে বিশ্রামের সুযোগ, যখন সে লাগামের টানা রাশ, শিথিল হয়ে পড়ে, তখন সে ছোটে অতীতের দিকে, যাঁরা পিছনে রয়ে গেছে, তাঁদের কথাই, ভেসে ওঠে আচম্বিত সেই ছিন্ন-পর্দ্দার বুকে। মানুষ তলিয়ে যায় তখন, এটাই তার বিচিত্র গতি। জোয়ার যখন আসে ছুটে চলে দুকুল ভাসিয়ে, পরিপূর্ণ হলে গতি, হয় স্থির হয়, ধীর তার পরিবেশ, তারপর যখন সে পেছন ফেরে, কুলে পড়ে থাকে সেইসব স্মৃতি যা সে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উদ্দাম গতির বেগে। কোনটা বা সেই গতিবেগে ফিরে যায় মাতৃভূমি তথা সমুদ্র গহ্বরে। কোনটা বা পড়ে থাকে গতির পিছনে তীরের চরভূমিতে। সেই চরভূমিই জীবনের অতীত স্মৃতি, কোনটা একেবারে ভেসে গেছে কোনটা বা পড়ে আছে স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ হয়ে।

এক পাশে নোতুন জীবনের আকর্ষণ, অথচ তা রুদ্ধ রেখেছে গভীর গুরু-দায়িত্বের বোঝায়। মে ভেঙে পড়েছে খবর পাচ্ছেন তিনি। আর তিনি ভারতে পরিপূর্ণ আত্মস্থ হয়ে মেতে উঠেছেন সাধনার গভীর রহস্য অনুসন্ধানে। যে কালী-সাধনা ভারতের আধাত্ম-সাধনা, সেই মূর্ত্তিই অন্য ধর্ম্মচারীদের কাছে আলোচ্য বস্তু। তার স্বরূপ উপলব্ধির বাসনায় হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে।

ওপাশে মের মনে চাপা ক্ষোভ। সংসারের গুরুদ্বায়িত্ব পালন করতে হলে স্বকীয় সুখ ও শান্তিকে বিসর্জ্জন দিতেই হবে। শরীর ও মন তার দিনের পরদিন ভেঙে পড়তে লাগলো। নেল হ্যামণ্ডের কাছ থেকে খবর পেলেন মার্গট। সাহায্য চাইলেন ম্যাকলাউডের। ইনি স্বামিজীর বিশেষ একজন ভক্ত। মিসেস বুলের মতই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। যখন তিনি মনস্থ করে ফেলেছেন ইংলণ্ডেই ফিরে যাবেন, যদিও তখনও মনের কথা স্বামিজীর কাছে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এপাশে স্বামিজীর শরীরও ভেঙে পড়েছে। বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বাগবাজার স্কুল স্থাপন হয়ে গেছে। পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ভারতের কাজে ভারতীয় সন্তানের অধিকারে। ২৪ শে ফেব্রুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন— ১৫ই মার্চ্চের পূর্ব্বেই জানতে পারলেন, মিসেস বুলের কাছ থেকে ইংলণ্ডে তাঁর স্কুলের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ভারমুক্ত মে (নিম)। ম্যাকলাউড তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। ১৫ই মার্চ্চ কৃতজ্ঞতা জানালেন মিসেস বুলকে। "এই অপূর্ব্ব মুক্তির বার্ত্তা আমার কাছে এল যা পাওয়ার অধিকার আমার নেই এর জন্য তোমাদের দুজনের (মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড) কার কতখানি ভূমিকা জানিনা, কিন্তু তোমার হাত নিশ্চয়ই আছে। এব্যাপারে আমার অনুভূতি কত গভীর তা তোমাকে এখনি জানাতে চাই, ধন্যবাদ এখানে নিতান্ত বাহিরঙ্গ ব্যাপার। 'যেন কবরের বুক-চাপা পাথর একটা সরে গেল' উপমাটি এ সপ্তাহে বারবার মনে হচ্ছে। আর ১৬ই মার্চ্চ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : প্রিয়তমা য়ুম, আমাদের বাড়ীর সংবাদের মধ্যে জোরালো সুখের

সংবাদটি বেছে পাঠানোর জন্য কি ভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি বলো! তুমি নিমকে ভালবাসো, মে আমার থেকে আলাদা বলেই ভালবাসো স্বর্গীয় কথা। ৬ই তারিখে লিখলেন : নিম সম্বন্ধে তোমার খোলাখুলি মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদও যথেষ্ট নয়। তোমার কাছে মে যেভাবে সাড়া দিয়েছে তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি। বাস্তবিক, তোমার শক্তির এ এক প্রমাণ। আমার কাছে এত খোলা মন সে কখনও হয়নি। বেচারা নিম। এই ভারকে সে এত দুর্ব্বহ ভাবছে তা ভাবতে ভয়ঙ্কর লাগে। সে বিয়ে করুক, বা না করুক- আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, মে যেখানেই থাকুক, স্বামিজীর কাজ করে যাবে। না করে পারবে না। যে অপূর্ব্ব ক্ষণে আমার কর্ম্মফল ভার, তুমি তার ঘাড় থেকে তুলে নিলে, সেইক্ষণ থেকে তার নিজের ভার বইবার এবং নিজের সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি, আমার বিভ্রান্ত ভাবনা ও চিন্তার পাপ থেকে তাকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমার দিব্য ক্ষমতায় তুমি বলতে পারো, বলেছও —এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার যোগ্যতা তার আছে। দুটো কি তিনটি চিঠিতে আমার ভাবনা যাতনার চেহারা তুমি দেখেছো, সেগুলির বিস্তারিত উত্তর দেবার কষ্ট স্বীকার তুমি করবে না ভরসা করি। ১৯শে এপ্রিল আবার লিখলেন: মিষ্টি কথাগুলির জন্য ধন্যবাদ, গত মেলে যা লিখে পাঠিয়েছ। সেই সঙ্গে নিমের চিঠিটিও। শেষোক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে আমার গভীর হৃদয়ানুভূতির কথা তুমি জানোনা, এ বিষয়ে কিছু বলা অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে, উপযুক্ত কিছু আশা রাখিনা। শুধু এই ভরসা করি, এবার কাজ করে যেতে পারলে, যা তোমার বিরাট বিশ্বাসের মর্য্যাদা হয়তো সম্পূর্ণ নষ্ট করবে না।

মের কী ভাগ্য যে, সেই রাত্রিটি এবং রবিবার তোমার সঙ্গে কাটাতে পেরেছে! যেভাবে তোমাকে জানি সেইভাবে তোমাকে জানার কিছু সুযোগ পেয়েছে।

স্কুলের বন্দোবস্ত হয়ে গেলে, সেই বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। ২রা মে নেলহ্যামগুকে বোনের প্রতি মধুর ও সহৃদয় মনোভাব দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মে'র মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজানিয়ে লিখলেন : অনেকদিক থেকে সে আমার থেকে অনেক অনেক এগিয়ে আছে। সে সম্বন্ধে ভাবার সময়ে নিজেকে ছোট মনে হয়। (এটা বোন মের উদারশীলতার পরিচয়)

স্বামিজীর দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও নিবেদিতার স্কুলের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ। সেই সঙ্গে এসে গেছে মের বিয়ে। বোনের বিয়ের পর আমেরিকা যাত্রা করবেন নিবেদিতা, স্বামিজীর পিছু পিছু, স্থির হয়েছিল।

মিস ম্যাকলাউডকে জানিয়ে দিলেন ৮ই মে : রাজা (স্বামিজীকে মাঝে মাঝে এ নামেই সম্বোধন করেন।) মধুর স্বভাবে প্রদীপ্ত। আগামীকাল টিকিট কাটা হবে। নিমের বিয়েতে হাজির ও আশীর্ব্বাদ জানাবেন স্বামিজী। যদি তোমার কথায় এ জিনিষ ঘটে থাকে, আমি জানি তুমি সে রকম কথা স্বতঃই বলবে, যাতে আমার বোনটির জীবনে এহেন ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ২১শে জুলাই পুনরায় জানালেন তোমার কাছ থেকে নিমের বিয়ের তারিখ জানতে পেরে খুবই আনন্দিত। মাকে ও নিমকে আমাদের যাত্রার কথা বলো না। আমি চাই না, আমাদের যাত্রার কথা তারা জানুক, কেননা তাহলে বিয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ মনোযোগ না দিয়ে আমাদের জন্য ব্যস্ত হবে। ২১শে জুলাই জানালেন স্বামিজীর সঙ্গে যদি মের প্রণয়ীর কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ ঘটে ওঠে, কৃতজ্ঞ হবো। স্বামিজী বলেছেন, সম্ভব হলে তিনি তা করবেন। অনেকদিন বাড়ী থেকে কোন খবর পাইনি। ২১শে জুলাই জানাচ্ছেন : নিমের বিয়ের দিন থেকে আমি সব কিছু পরিহারের ব্রত নেব। ভরসা করি, এ জীবনে আর কখনো আমার জন্য নোতুন গাউন তৈরী করার দরকার হবে না। অবশ্য যদি বিজ্‌লিতে যাই আর তুমি যদি চাও, তাহলে তোমার ফ্রক পরে আমি লৌকিক সাজ

করবো অন্যথায় আমি এক সাজে একটি সাজেই। য়ুম, আমি এমন বড় নই যে, আমার অবশিষ্ট জীবনের পাঁচমিনিট সময়ও ঐ একটি উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারি।

মিঃ ষ্টাডি লিখছেন : ওয়েলশ চলে গেছেন। স্বামিজীকে বাসস্থানের জন্য উইম্বলডনে যেতে হবে, যে পর্য্যন্ত না তিনি কর্ম্মসূচী স্থির করেন। তাঁর সঙ্গে তিনজন আছেন। লণ্ডনে আমি চাই তিনি উইম্বলডন চলুন, কয়েদিনের জন্য হলেও। কিন্তু নিমের বিয়ে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে থাকবেন, এমন আশা করার অধিকার আমার নেই। ৩রা আগষ্ট জানালেন : সোমবার, সকালে পৌঁছেছি। নিতান্ত অসময় হলেও, মা, নিম, মিস প্যাসটাল এবং দুই আমেরিকান মহিলা মিসেস কাঙ্কি ও মিস ষ্টাইডেলের সাক্ষাৎ পেলাম। রাজা সোমবার এই সব সঙ্গীদের সঙ্গে শহরে কাটিয়েছেন— এঁদের সান্নিধ্য দেবার জন্য। কিন্তু খুব সকালে ফিরে এসেছেন, শেষ পর্য্যন্ত উইম্বলডনকেই কেন্দ্র করে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে দুবার দীর্ঘ আলাপ হয়ে গেছে। নিম তাঁকে খুশী করেছে। রিচকে পছন্দ করেছেন তিনি। নিম তাঁকে মনোরম ঘর খুঁজে দিয়েছে। ষ্টেশনের কাছে, চারদিকে মনোরম পরিবেশ। ভবিষ্যতের কথা নিম একেবারে চুপচাপ। তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রথম সাক্ষাতের সময়টা যা—তা। দেখা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত চিন্তা বা অনুভূতি কিছু নেই— সহসা সবকিছু ঝাঁপিয়ে এল সেও স্থির থাকতে পারলো না কেঁদে উঠলো বললো— তুমি যেন সমাধির ঢাকা খুলে বেরিয়ে এলে। পরক্ষণেই স্বামিজীকে প্রণাম করলো : প্রথম দৃষ্টিপাতেই অভিভূত হল সমগ্র চিত্ত। স্বামিজীকে আপ্যায়িত করায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো। নিবেদিতা মার সঙ্গে যাত্রা করলেন। স্বামিজী রয়ে গেলেন ইংলণ্ডে, বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য। পরদিনই ফিরলেন।

১১ই আগষ্ট স্বামিজী জিজ্ঞাসা করলেন আমেরিকা যাবার জন্য কবে তৈরী হ'চ্ছ?

যখনি আপনি বলবেন।

বোনের বিয়ে পর্য্যন্ত থাকতে চাও না?

— সেটা উচিত, আপনি কি বলেন?

আরও একমাস— তা নয় কি?

২১ নং হাইষ্ট্রীট, উইম্বলডন। এখানেই নিবেদিতার মা সপরিবারে থাকেন। নোবল পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচয় হল স্বামিজীর। সকলেই তাঁকে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। মা মেরী, বোন মে, ভাই রিচার্ড এমন কি মে' ভাবী স্বামী মিস্টার উইলসন। খুশী নিবেদিতা, খুশী স্বামিজীও। খুশী নোবল পরিবারের সকলেই। তিনি সকলের কাছে "Behold the man" যিনি সত্য উপলব্ধি করেছেন, সত্য প্রচার যাঁর উদ্দেশ্য — তিনি সত্য দর্শনের অধিকারী মানুষ। গভীর নিশ্চয়তার প্রতীক। জিজ্ঞাসুকে আশ্বাস দিতে পারেন, সেই সঙ্গে বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারেন। সকলেই নিশ্চিত, এই আশ্বাসেই নিবেদিতা দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁকে অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আনন্দের স্রোত বইছে নোবল পরিবারে। স্বামিজীর যে দুজন শিষ্যা সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছিলেন তাঁরাও প্রায়ই সে আনোন্দৎসবে যোগ দিতে লাগলেন। ফলে ধীর, স্থির, মিষ্টভাসিনী কৃস্টীন গ্রীণস্টাইডেলের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে গেল। ভবিষ্যৎও যুক্ত হলেন একই কর্ম্মসূত্রে।

মে প্রথম দৃষ্টেই বুঝেছিলেন : স্বামিজী প্রকৃত শক্তিধর পুরুষ তাঁর সম্মুখীন হলে ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে নিজস্বসত্বা। তাঁর আহ্বানকে উপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে, উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয় সে জীবন। তাঁর দিদি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন- ঔচিত্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মনে মনে শঙ্কিত বিয়ে করতে বসেছেন যখন —তাঁর এই ক্ষমতাকে যদি পথ ছেড়ে দেওয়া হয়, বিয়ে তাঁর আর হবে না। তিনিও সে স্রোতে ভেসে যাবেন যেমনটি ঘটেছে তাঁর দিদির জীবনে। সত্যের

সন্ধানী মুক্ত পুরুষকে সেবাড়ীর সকলেই অবলোকন করলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সেইসঙ্গে অনুভব করলেন। ভারতগোষ্ঠীভূত হয়ে গেছেন সকলেই এ মুহূর্ত্তে।

শিষ্যরা সচরাচর গুরুর মধ্য থেকে নিজেদের অভিপ্রেত বস্তুকেই নির্ব্বাচন করে নেয় এবং তারা গুরুকে নিজেদের মতাদর্শের প্রয়োজনে ব্যবহার করে, আর স্বামিজীকে জানার অর্থ স্বয়ং খ্রীষ্ট কি চাইলেন তার কিছুটা জানা। যেন অফুরন্ত রসিকতার ভাণ্ডার। সেই হাসির আলোকেই নানা যুগের বিচার করছেন, সেই ভাবেই অনুভব করিয়ে দিচ্ছেন, ঈশ্বর মানুষের স্নেহশীল পিতামাতা— নির্দ্দয়, কঠোর, প্রভু নন তিনি। উন্নীত করে দেন নির্লিপ্ত বোধের এক জগতে।

সে বাড়ীর পরিবেশে তিনি খুশী। কিন্তু মনে হ'ল যেন নিবেদিতার চাপে সে বাড়ীতে গরু খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। নিবেদিতা অস্বীকার করলেন, তিনি মানলেন না। তার গোঁড়ামি নিয়ে তামাশা করলেন। বললেন : ইংরাজদের সাধারণ খাদ্য গরু, তার গোঁড়ামির জন্যই সকলে সে খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রিচকে সঙ্গে নিয়ে এক রেষ্টুরেন্টে গেলেন। তাকে বীফ ষ্টিক খেতে দিলেন। বললেন, পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে মানিয়ে চলে, কারণ মেয়েরাই তাদের সমর্থন করে। তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শনে সে বাড়ীর সকলে অনুভব করলেন তাঁর সংস্পর্শে এলে মানুষ মাত্রেই কোন না কোনভাবে উন্নীত না হয়ে পারে না। যদিও মন্দ মন্দই রয়ে গেল, তবুও সান্ত্বনা তার। সে আরও খারাপ হয়ে পড়তো জীবনে। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে এসে তার সেই মন্দত্বের সংশোধন না হয়ে যায়নি।....

১১ই আগষ্ট ১৭ই বৃহস্পতিবার। স্বামিজী আলান নাইনে নিউইয়র্ক যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্ব্বে নিবেদিতাকে বললেন: ৬ই সেপ্টেম্বরে নিমের বিয়ে। এরপর যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।

নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে টেলিগ্রাম সেইসঙ্গে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন স্বামিজী তোমাদের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। শেষ কথা তাঁর— যত শীঘ্র পার এসো। মের বিয়ে ৬ই সেপ্টেম্বর। যদি আগে না হয় তারপরেই যাত্রা করতে পারি নইলে আরও একসপ্তাহ পরে গ্লাসগো থেকে অ্যালান লাইনে।

নিমের প্রণয়ী আমাকে খুশী করেছে। সে আচার্য্যদেবের চরণে নতজানু হয়েছিল যেমনটি হয়েছিলেন মা, নিম ও রিচ। অপরূপ!... তোমার ফ্রকগুলি চমৎকার বিশেষতঃ সাদাটি। ওটি বিয়েতে পরবো। ৬ই চিঠি পেলেন স্বামিজী নিউইয়র্কে পৌছেছেন। উত্তর দিলেন ৭ই। গতরাত্রে তোমার বহুপ্রত্যাশিত চিঠি এলো। তাতে রাজার পৌঁছানোর সংবাদ পেলাম হৃদয় আমার শান্ত হল। এখন ন'টা কুড়ি বাড়ি ছাড়ছি। গতকাল অপরাহ্নে নিমের বিয়ে হল। মিষ্টি নিম। অনুষ্ঠানপর্ব্ব সমাধা করলেন আমার কাকা। খুবই সুখের, নিজেই ব্যাপারটা সাজিয়ে ছিলেন। নিমকেও খুব সুখী দেখাচ্ছিল— কাঁদাকাটা করেনি সুন্দর নয় কি? গির্জ্জার পাশ থেকে যখন নামালো সবাই পদ্ম আর গোলাপ ছুঁড়ে দিল সামনে। তারপর সকলে বাড়ী এলাম চায়ের জন্য। একসঙ্গে কেক কাটার জন্য খুব মজা হল তখন। সবাই বল্লো, নিতান্ত মধুর একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার। এরজন্য কৃতিত্বের দাবী করতে পারি না। এ পরিবারে এই প্রথম বিয়ে, জানতামই না এসবের নিখুঁত ফর্ম্যালিটি কি! আমি বিশেষভাবে সুখে ও বিস্ময়ে ছিলাম, কারণ বিয়ে ব্যাপারটা কমবেশী আমোদের জিনিষ হয়ে উঠতে পারে।... যদি অ্যালবার্টার জন্মদিনে উপস্থিত হতে পারি, তোমার ঐ একই পোষাক পরতে চেষ্টা করবো। তাহলে দেখবে কি দারুণ দেখতে হয়েছিল আমাকে। আর নিমের বিষয়ে সব কথা তোমায় বলবো। মা ডাকে 'কেক' পাঠাচ্ছেন।

বোনের বিয়ে শেষ। সামাজিক নিবেদিতা এখন পূর্ণ ব্রহ্মচারিনী। নিজেকে ফিরে পেলেন। এবার তাঁকে যাত্রা করতে হবে আমেরিকায় নিজ কর্ত্তব্যবোধে। ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন মিঃ ষ্টাডির বিরূপতার কারণ। অবশ্য ব্যক্তিগত চরিত্রে তিনি খুবই মুডি। যখন যে স্রোতে মাতেন ঝাপিয়ে পড়েন, আবার নোতুনের খোঁজে মেতে উঠেন। স্বামিজীর প্রতি নিষ্ঠা তাঁর চ্যুত হয়েছে ভারত থেকে যেসব সন্ন্যাসী এদেশে আসেন, এঁদের মধ্যে সেই সন্ন্যাসের প্রকৃত আদর্শের অভাব।

স্বামিজীর বিরুদ্ধে এই অসার অভিযোগ! তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা! ক্রুদ্ধ ফেনিনীর মত উদ্ধত হয়ে উঠলেন। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তাঁকে। আর একটি মুহূর্ত্তও না!

এবার স্বামিজী এখানে প্রকাশ্যে কোন বক্তৃতা করলেন না শুধু দর্শনার্থীদের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দান ছাড়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় কটা দিন কাটালেন। আমোরিকা থেকে বার বার ডাক আসতে থাকায় গুরুভ্রাতা তুরিয়ানন্দ ও আমেরিকান শিষ্যাদ্বয় নিউইয়ক পাড়ি দিলেন। তিনি কাটালেন দশদিন। সকালে গীতা পাঠ, তার ব্যাখ্যা। কখনও সংস্কৃত কবিতা ও কাহিনীর আবৃত্তি ও তার অনুবাদ, কখনও প্রাচীন বৈদিক প্রার্থনাসমূহ পাঠ এছাড়া নিস্তরঙ্গ সমুদ্র দর্শন। রাত্রে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ডেকের উপর পদচারণা, শিষ্যাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা : মায়ার রাজ্যের দৃশ্যাবলী যদি এত সুন্দর হয়, ভেবে দেখ, এর পিছনে সত্যস্বরূপ কতনা সুন্দর! আবার যখন একা রজনীর উজ্জ্বল সে রূপরাশি উপভোগ করছেন। মাথার উপর সোনালী চাঁদের হাসি, ভাব-রঙ্গে মেতে উঠে শিষ্যাদের বোঝালেন : চারদিকে ছড়ানো কবিতার সার— কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি? পৌঁছিলেন নিউইয়র্ক অতিথি হলেন লিগেট দম্পতির। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে এখান থেকে ১৫০ মাইল দূরে তাঁর পল্লীভবন রিজলিম্যানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। দৈহিক অবস্থা অবলোকন করে লিগেটদম্পতি তঁকে প্রচার চালাতে দিলেন না। তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন কারণ এই ভাঙা শরীরে প্রচারের কঠোর শ্রম তাঁর সহ্য হবে না। স্বামী অভেদানন্দজী প্রচার কাজে অন্যত্র ছিলেন, তাঁর আগমনের সময় নিউইয়র্কে উপস্থিত হতে পারেন নি। কয়েকদিন পরে তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছ থেকে বেদান্ত সমিতির স্থায়ীবাটীর বন্দোবস্ত হচ্ছে শুনে খুশী হলেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন। একদিন পরে তিনি বেদান্ত সমিতির কাজে পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরে গেলেন। ১৫ই অক্টোবর সমিতির নোতুন গৃহ প্রতিষ্ঠা করে ২২শে তারিখ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাশ চালাতে লাগলেন। ভারতেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও দক্ষতার সঙ্গে প্রচারের কাজ চালিয়ে ছিলেন।

নিবেদিতা ছিলেন রজগুণের অধিকারিনী কর্ম্মে অনলস। ইংলণ্ড অন্যান্য অনুগামীগণের হঠাৎ পশ্চাত অপসারণে ব্যথিত হয়ে সমগ্র ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করলেন। এতদিন মা, বোন ও ভাই সম্বন্ধে চিন্তায় মনটা বিক্ষিপ্ত থাকলেও এখন তিনি নিশ্চিন্ত। হিমালয়ের শান্তক্রোড়ে সেভিয়ার দম্পতি স্বামিজীর কল্পনা ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য পত্রিকা মাধ্যমে 'কাজ' সুরু করেছেন। তাঁর উপরে অন্যদায়িত্ব ভারতের নারীর শিক্ষাবিধান! মনের দিক দিয়ে তাঁরা ভারতীয় ঐশ্বর্য্যেমণ্ডিত, শিক্ষা শুধু বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে পরিচিতি ও ব্যক্তিজীবনে স্বাবলম্বী করে তোলায় ছিল সে উদেশ্য সমূহের দায়িত্ব, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁর প্রাণমনের স্বপ্ন সফল করে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। বোনের বিয়ে পরদিনই তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করলেন।

আমেরিকা আগমনের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ। স্বামিজীর মন্ত্র 'কর্ম্ম'। জ্বলন্ত ভাষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। বারবার হিন্দুদের কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে

জীবনের লক্ষ্য সুনিশ্চিত—
শান্তি এর একান্ত আশ্রয়।

স্বামিজী কবিতাটির মাধ্যমে তাঁর শান্তিলাভের আকুল প্রার্থনার উত্তর দিলেন।

নিবেদিতাকে মনের মত গড়ে তুলছেন, নিজের কর্ম্মধারা অব্যাহত রাখার আশায়। সে নিজেও নিজেকে নিযুক্ত রেখেছে, সে ধারা বহণের সামর্থ অর্জ্জনে। স্বামিজীর নির্দ্দেশেই তার নির্জ্জনবাস। এসময়ে তিনি কখনও নিজে স্বামিজীকে সন্দর্শনে উপস্থিত হন, কখনও বা স্বামিজী নিজে তাঁর কাছে এসে কিছু সময় ব্যয় করেন, আবার কখনও নিজের কাছে ডেকে পাঠান। কথা প্রসঙ্গে একদিন ঋষিকেশ ধামে একাদিক্রমে ষাট ঘণ্টা তাঁর মৌনী নির্জ্জনবাসের কাহিনী শোনালেন— আত্মশক্তি ও কর্ম্মশক্তি অর্জ্জনের প্রশস্ত পথ-নির্দ্দেশে।

ক্ষীরভবানী গমন ও মার-নির্দ্দেশাবলী মনে তাঁর জাগরূক সকল সময়। এখন কি করবেন— সেই চিন্তার আবর্ত্তে ভেসে চলেছেন। যদিও চিত্ত তাঁর ধ্যানযোগে আকৃষ্ট সকল সময়। কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত, তা রক্ষণেরও প্রয়োজন। কি করবেন না করবেন স্থির করতে পারছেন না। প্রচারের ও কর্ম্ম-প্রবাহ সৃষ্টির জন্য মঠ নির্ম্মাণ, সে কাজ শেষ, পরিচালনার দায়িত্বও ভাগ করে দিয়েছেন— অবশিষ্ট গুরুদত্ত শক্তিকে কর্ম্মধারায় প্রবর্ত্তিত করা। যে দায়িত্ব তাঁর উপর শ্রীগুরু অর্পণ করেছিলেন, তার কিছু কাজ তিনি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর এ পৃথিবীতে আগমন— সে কাজ এখনও অপূর্ণ, সে কাজের ভিদ, সবে পত্তন করেছেন, তা পূর্ণতর করার দায়িত্ব তিনি কার উপর দেবেন, সেই চিন্তায় মগ্ন এখন তিনি।

এ চিন্তার জন্ম— গুরু মার নির্দ্দেশে! তিনি ইচ্ছাময়ী— তাঁর ইচ্ছাই সব, তিনিই করিয়ে নেবেন। অথচ গুরু চাপিয়ে 'গেছেন সে ভার। তাঁর মধ্য দিয়ে যে শক্তির বিকাশ, তা ব্যাপ্তির দায়িত্ব তিনি তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। মা সে কাজ তাঁকে দিয়ে পূরণ করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সে বস্তু রূপদানের অধিকারী তিনি নন। এখন অন্য লোকের প্রয়োজন। অথচ সে দায়িত্ব পালনের ভার তিনি কার উপর দিয়ে যাবেন?

মনে যে ঝড় উঠেছিল, আমেরিকা যাত্রার অবকাশে— সে পথের সন্ধান তিনি পেলেন। চিত্ত এখন উদ্বেলিত— সহসা চোখের পাতায় উদ্ভাসিত হল দুটি মুখ : মিসেস বুল ও নিবেদিতা! মিসেস বুল, আমেরিকার কাজে পরিপূর্ণ সাহায্য করেছেন। মঠের কাজে অর্থ সাহায্য করেছেন তা সংরক্ষণের জন্যও অর্থ দান করেছেন। অবশ্য মিস ম্যাকলাউডও তাঁকে সাহায্য করতে বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছেন। স্থির করলেন তাঁকেই তিনি দান করবেন মঠের ও পরবর্ত্তী রক্ষণের দায়িত্বের ভার। অর্পণ করবেন সেই শক্তি— যা দেবভূমি জাগরণের পথ প্রশস্ত করবে, সে দায়িত্ব দেবেন নিবেদিতাকে। ঘনীভূত সেই নারীশক্তি যা উদ্ভূত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মজীবনে— যে দায়িত্ব বহন করেছেন উত্তরাধিকারী হিসাবে, সেই দায়িত্ব তিনি দ্বিভাবে ভাগ করে দেবেন এই দুটি মহিলার মধ্যে। হ্যাঁ, সেই শক্তি উদ্ভূত প্রকৃতি রূপিনী মাতৃশক্তির কাছ থেকে, তা অর্পিত হোক দুটি নারী প্রকৃতির কাছে। সেদিনই বৈকালেই দুটি গৈরিক উত্তরীয় প্রদান করে— সেই শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন উভয়ের মধ্যে। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। ডাক এসে গেছে— এবার তাঁর ফেরার পালা।

এসময়ে স্বামিজীর মানসিক চিত্র তাঁর চিঠির মাধ্যমে ফুটিয়ে রেখেছেন : ২৭ শে অক্টোবরের চিঠিতে। লিখলেন ম্যাকলাউডকে :

আমার একান্তবাসের মধ্যে গত রবিবার রাত্রে স্বামিজী এসে আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। ঘণ্টাখানেক ছিলেন। 'প্রতিটি মূখ্য অবতার, প্রকাশ্যে বা গোপনে, মাতৃ-উপাসক। এ বিষয়ে

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা জানালেন, নইলে, তাঁরা শক্তি পাবেন কিভাবে? শিব ও কালী তাঁদের আরাধ্য হতে বাধ্য।' উঠলো রামায়ণের কথা। স্বামিজী বললেন : রাবণই কেন্দ্রীয় চরিত্র অথচ সদানন্দ যখন রামায়ণের কথা বলেন, হনুমানই রামায়নের নায়ক। ... রামকে কমললোচন বলা হয়। সীতাকে উদ্ধারের জন্য মায়ের সাহায্য পাওয়ার প্রার্থনা করলেন, রাবণও মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন। রাম দেখলেন, রাবণ মাতৃক্রোড়ে বসে রয়েছেন। তাঁর পক্ষে, দারুণ কিছু করা দরকার। তিনি হাজার এক পদ্ম নিয়ে মায়ের অর্চ্চনা করার ব্রত নিলেন। লক্ষ্মণ, মানসসরোর থেকে পদ্ম নিয়ে এলে, রাম মাতৃযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তখন শরৎকাল, মাতৃপূজার সময় বসন্তকাল। রাম এই অকালবোধনের স্মারক হিসাবেই শরৎকালে মহাপূজা আরম্ভ। শ্রীরামচন্দ্র মায়ের শ্রীচরণে সেই পদ্ম অর্পণ করতে লাগলেন। হাজার পদ্ম পর্য্যন্ত দিলেন। এদিকে মা একটি পদ্ম হরণ করে নিয়েছেন। শেষপদ্মটি যে পাওয়া যাচ্ছে না! দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাম হার মানবেন না, ছুরি চেয়ে নিয়ে, নিজের নয়ন উৎপাটন করতে উদ্যত হলেন। নয়নটি তাঁর নীলকমল রূপে অভিহিত। মা, তাঁর ভক্তির কাছে, হার মানলেন। আশীর্ব্বাদ করলেন মহাবীরকে : তার বাহুবলের জয় হবে। .... অবশ্য তাঁর বাহুবলের জয় হয়নি, রাবণের ভাই বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই।

রাজা (স্বামিজী) বললেন : ঐ বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরও মহত্বের একটি ক্ষেত্র ছিল। রাম রাজসভায় যখন বসে আছেন, রাবনের বিধবা পত্নী এলেন, দেখতে কে সেই যোদ্ধা? তাঁর স্বামী ও পুত্রহনণ করেছেন? রাজসভাশুদ্ধ রামচন্দ্র, সঙ্গিনী পরিবেষ্টিত রাণীকে অভ্যর্থনায় উত্থিত। কিন্তু কোথায় রাজকীয় ঐশ্বর্য্যভূষিত মহারানী? হিন্দুবিধবার অনাড়ম্বর পোষাকে, এক নিতান্ত সাধারণ নারী। মহিলাটি কে? বিমূঢ়ভাবে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, রাজভ্রাতাকে। উত্তরে বললেন তিনি : এই সেই সিংহিনী, যাঁকে তাঁর সিংহ ও শাবকদের থেকে, বঞ্চিত করেছেন! সেই তিনি এসেছেন আপনাকে দেখতে!

ওগো য়ুম, নারীত্বের কি সুমুচ্চ আদর্শই না ব্যক্ত করলেন স্বামিজী! নিশ্চয়ই আর কোথাও এই প্রচণ্ড আদর্শ নেই, শেক্সপীয়ারে নেই, অ্যাক্সকাইলালেও নেই, যখন তিনি অ্যান্টিগণকে এঁকেছেন কিংবা সফোক্লিস, যখন তিনি এঁকেছেন অ্যালসেসটিমকে। নারীত্বের আদর্শের বিষয়ে, কথাগুলি পুনরায় পড়ার পরে (নিবেদিতা আলেচনার সারাংশ লিখে রাখলেন) বুঝলাম, তাঁর সব কিছু, প্রতিটি শব্দ পর্য্যন্ত ভাবী পৃথিবীর নারী আদর্শের রক্ষা কবচ, এবং প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নিজ দেশের জন্য, সে আদর্শের যথার্থ যোগ্য কেউ হতে পারলো কিনা সেটা বড় কথা নয়!

মঙ্গলবার রাত্রে ধাপে ধাপে ভক্তির আবেশে উন্মত্ত হতে লাগলেন হৃষীকেশের কথা বললেন: সেখানকার প্রতি সন্ন্যাসীর স্ব-নির্ম্মিত কুঠিয়া, সন্ধ্যায় ধূনির আগুন, সেই আগুনকে ঘিরে ছোট ছোট আসনে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীরা, আর মৃদুস্বরে উপনিষদের আলোচনা: "কারণ ধরে নেওয়া হয় সন্ন্যাসী হবার আগেই মানুষ সত্যকে পেয়েছে, তার বিচার বুদ্ধি শান্ত হয়েছে এখন শুধু বাকি সত্যকে উপলব্ধি করা।" সুতরাং আলোচনা বা তর্কের প্রয়োজন নেই। হৃষীকেশে তাই, পর্ব্বতের অন্ধকার সানুদেশে, জ্বলন্ত ধূনির চারপাশ ঘিরে শুধু উপনিষদের আলাপ। তারপর ক্রমে নীরবতার মধ্যে হারিয়ে যায় কণ্ঠস্বরগুলি। প্রতিটি সন্ন্যাসী নিজের আসনে খাড়া হয়ে বসে থাকেন, তরও পরে একে একে নিঃশব্দে চলে যান নিজের কুঠিয়ায়।

বুধবার একই ধরণের কথা বললেন নানা সময়ে। একবার উচ্ছ্বসিত হলেন একটি বক্তব্যে: হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ত্রুটি, তা একমাত্র ত্যাগের ভিত্তিতে মুক্তিপথ দেখিয়েছে। গৃহী এখানে নিজেদের নিম্নাবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। তারজন্য কর্ম্মমার্গ, ত্যাগের কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু আমি প্রশ্নটির সমাধান অন্যভাবে করতে পেরেছি। ত্যাগ সকলের মূল জীবননীতি। যদি কেউ মনে কর যে এর

বাইরে আছে, সেটা মায়া ছাড়া কিছু নয়। আমরা সবাই বিরাট শক্তিপূজাকে অনুভব করার জন্য সংগ্রাম করছি। তার অর্থ কি এই না যে, আমরা সবাই যত দ্রুত সম্ভব মৃত্যুর দিকে ধাবিত — আমরা সকলেই। যে স্থূল-দেহ ইংরাজটি মনে করে, পৃথিবীকে অধিকার করাই তার কাম্য, আসলে সে আমাদের অধিকাংশের চেয়ে তীব্রভাবে মরবার জন্য লড়াইয়ে মত্ত। আত্মসংরক্ষণেচ্ছা, ত্যাগেরই বিশেষ চেহারা। মন্দ ভালোরই বিশেষ একটি রূপ। বাঁচার উৎকণ্ঠা, মৃত্যুপ্রীতির অন্যতম প্রাকার"

বুধবার রাত্রে রাজা পবিত্রতা সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলেন- কিভাবে পবিত্রতার অনুশীলন ও সঞ্চার করতে হবে। প্রসঙ্গটি যখন গভীর থেকে গভীরতর স্তরে অবতরণ করছিল, তখন নির্ব্বোধের মত কি একটা করে, তাঁর ভাব ভঙ্গ করলাম। পরে আমি তাঁর সঙ্গে একলা রইলাম অন্য সকলে চলে গেল। এ ব্যাপারে মুহ্যমান হতে চাইছি না, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস: প্রসঙ্গটি আবার ফিরে আসবে, যদি আমি নাও থাকি, সেটা লাভ করবে অন্য কেউ, আর বিলম্বিত হওয়ার ফলে, তা মহত্তর রূপে বিদীর্ণ হবে। 'ব্রহ্মচর্য্য যখন ধমনীতে ধমনীতে ঈশ্বরাগ্নির মত জ্বলতে থাকে' তাঁর শেষ কথা বিষয়টি সম্বন্ধে।

বৃহস্পতিবার রাত্রে কিছু সময়ের জন্য শিখদের ও তাদের দশ গুরুর বিষয়ে বললেন। গ্রন্থসাহেব থেকে গুরু নানকের একটি কাহিনী- শোনালেন: তিনি মক্কা গিয়েছিলেন, সেখানে কাবা মসজিদের দিকে পা করে শুয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ মুসলমানেররা এসে তাঁকে জাগিয়ে প্রায় মেরেই ফেলে আর কি—ঈশ্বরের আবাসের দিকে পা করে শোয়ার স্পর্ধা! তিনি ধীরে চোখ মেলে শুধু বললেন, "কোন দিকে ভগবান নেই, সেই দিকে আমার পা ঘুরিয়ে দাও।' সেই মধুর উত্তরই যথেষ্ট হল, অনেকে তাঁর মত গ্রহণ করলো।.....

এমন, বিচিত্র জিনিষ তোমাকে বলার জন্য সংগোপনে রেখেছি। কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে ওলিয়ার কাছে সমালোচনা করে বলেছে— স্বামিজী কথা বলার সময়ে তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। যথাসময়ে সেটি আমার কানে এসেছে। সুতরাং তারপর তাঁর কথা বলার কালে ঐকথাগুলি আমার মনে পড়েছিল এবং আমি অন্যত্র তাকাতে চেষ্টা করেছিলাম। তখনই আমি বুঝেছিলাম কেন আমি মিসেস জনসনের দৃষ্টি এড়াতে চাই। যেহেতু স্বামিজী মুখ ছাড়া প্রতিটি মুখের দিকে চাইলে একটা বাধা অনুভব করি, চোখ সরিয়ে নিতে হয়, বাড়ীর বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়, আর যদি তাঁর দিকে তাকানো যায়, মনে হয় মুক্ত দ্বারপথে সোজা তাকিয়ে আছি অনন্তের দিকে। তাঁর মধ্যে আত্মসচেতনা একদম নেই, এজন্যই কি এরকম হয়!

৪ঠা নভেম্বর ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

তোমাকে বলা উচিত, যদিও বলতে ভুলে গিয়েছিলাম জগৎ থেকে অব্যাহতির জন্য আবার সেই ব্যাকুল কথা, পুরানো রীতিতে। সারাজীবন ধরে ধন-মানের বিরুদ্ধে ঘৃণার স্তোত্র উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু এখনই তার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝতে শুরু করেছেন। এ পৃথিবী অসহ্য। 'এ আমি কোথায়'? হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মুখে সব হারানোর সে-কী অপরিসীম শূন্য দৃষ্টি। তারপর বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন—'রামকৃষ্ণ তোমারই জন্য (একটু থেমে) ঠাঁই দাও, ঠাঁই দাও, শুধু তোমার চরণেই যে মানুষের আশ্রয়'। কী মহূর্ত্ত! কাতর ক্রন্দন! তোমার উপস্থিতি আমি তত‌ই চেয়েছি এইকালে।

'এ শরীর চলে যাচ্ছে। কঠোর তপস্যায় এর ক্ষয় হোক। প্রতিদিন উপবাস করে, দশহাজার ওঁ মন্ত্রজপ করবো —শুধু একলা, গঙ্গাতীরে, হিমালয়ে— "হর হর ডাকবো – মুক্তি! মুক্তি! আবার নাম বদলাবো, এবার আর কেউ সন্ধান পাবে না। আবার নোতুন করে সন্ন্যাস দীক্ষা নেব— আর ফিরব না- - না – না"।

তারপর আবার সেই হারানো দৃষ্টি আর দারুণ ভাবনা— ধ্যানের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। 'আমি সব হারিয়েছি, সব হারিয়েছি, ম্লেচ্ছ' তোমাদেরই জন্য ! তারপর মধুর হাসি- দীর্ঘশ্বাস এবং প্রস্থান।

১১ই নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে লিখলেন, গত রবিবার ভাবো একবার! স্বামিজী সঙ্গে একই বাড়ীতে আছি আমরা। গত শনিবার স্বামিজীর 'এ আমি কোথায়' জাতীয় দারুণ শূন্য ভাবের বিষয়ে তোমাকে লিখেছি বলেই মনে হয়। সে ভাব কিছুটা গেলেও হতাশা সম্পূর্ণ যায় নি। মুখে তার ছাপও রয়েছে।

রবিবার প্রাতরাশের পরে আগ্নেয়গিরির বিদারণ! সকলের মাঝে তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন : আর কতদিন এভাবে ঝুলে থাকবো আমি? রীতিমত গালাগালির মেজাজে। তারপরেই আর্দ্র কোমল কণ্ঠে 'মৃদু কয়েকটি শব্দ.... তার রূপ তুমি জানোই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতখানি মনের কথা এগুলি? তাঁর রূঢ়তায় সদাশয়তা ছিল না। তাছাড়া এর প্রয়োজনই বা কি ছিল, আমি তো অনেকদিন ধরে কাজে লাগাবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। এখানে যদি থাকি, সে তাঁরই সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী। স্বামিজী তা সমূলে বুঝলেন। ওলিয়া ঘর থেকে উঠে যাবার সময়ে, তার ও আলবার্টার সঙ্গে চিকাগো যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। এই আমন্ত্রণ আমাকে গ্রহণ করতে হবে -- স্বামিজী বিধান দিলেন। তারপরেই মহাগৌরবেরো বিস্ফারিত আকার। জানালেন, যদি আমার স্বাস্থ্য তাঁর থাকতো, তাহলে পৃথিবী জয় করে ফেলতেন। আমি ক্ষত্রিয় —তাঁরই পরিবারের লোক, তা কি জানতাম? আমি ব্রাহ্মণ নই। কৃচ্ছ্রসাধনই পথ.... ইত্যাদি.... ইত্যাদি। প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। পরিশেষে আশীর্ব্বাদ করলেন, যার মধ্যে গুরু হারিয়ে, পিতা জেগে উঠলো যখন বললেন: পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমার জন্য লড়াই কর। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে আমি যেন এই পাই। ও! ঘুম!

সুতরাং আমার যাত্রা ঠিক হয়ে গেল। ওলিয়া আমার আশ্রয়দাত্রী, অ্যালবার্টার সঙ্গে। ... রবিবার বিকালে জিনিষপত্তর বাঁধাছাদা করছি— তিনি কয়েকটি সিল্কের পাগড়ী নিলেন বালিকাদের দেবার জন্য। তারপর দু'টুকরো কাপড়, গেরুয়া রঙের, মিসেস বুলের জন্য। তিনি... আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন জিনিগুলি দেবার জন্য। সেখানে মিসেস বুল বসে লিখছিলেন। পাগড়ীগুলি স্বামিজী একপাশে রাখলেন।

প্রথমে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর গেরুয়া কাপড়টি মিসেস বুলের কোমরে জড়িয়ে দিতে দিতে তাঁকে সন্ন্যাসীনী বলে সম্বোধন করলেন এবং এক হাত তাঁর মাথায় রেখে অন্যহাত আমার মাথায় রেখে বললেন : রামকৃষ্ণ পরমহংস আমায় যা দিয়েছিলেন, আমি সেসব তোমাদের দিলাম। এক নারীর কাছ থেকে আমাদের কাছে যা এসেছিল, আমি তা দিলাম দুই নারীকে। এর দ্বারা যা সম্ভব তাই করো। আমি আর নিজেকে বিশ্বাস করি না। আগামীকাল কি করব জানি না, যাতে আমার কাজ হয়তো ধংস হয়ে যাবে। এক নারী-জগন্মাতার কাছ থেকে যা এসেছিল, নারীরাই তাকে শ্রেষ্ঠভাবে রক্ষা করতে পারবে। তিনি কে, কি। জানি না, তাঁকে দেখিনি, কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন- (আমার জামার হাতা স্পর্শ করে) —ঠিক এইভাবে। আমি এইটুকু জানি, তিনি হয়তো এক বিরাট বিমূর্ত শক্তি। যাই হোক, তোমাদের উপর ভার চাপিয়ে দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি— শান্তি পেতে। আজ সকালে আমি প্রায় পাগলের মত কী করবো, কী করবো - সেই চিন্তায় আর চিন্তায় যখন মগ্ন লাঞ্চের আগে ঘুমোতে যাচ্ছি, তখন এই কাজটি করার কথা মাথায় এলো। ভারী আনন্দ পেলাম তাতে। এটি একটি পরিত্রাণের মত! এতদিন ধরে একে বহন করেছি, এখন ত্যাগ করলাম।....

তিনি কি এই কথাগুলিই বলেছিলেন! মনে হয় তাই। ঘটনা ঘটেছিল, আমার ধারণা, নিশ্চয় তিনটে নাগাদ বা সামান্য কিছুপরে কারণ, তখনও দিবালোক ছিল, এবং তার অনেকপরে তাঁর

সঙ্গে বাঁধা ছাদার কাজে আবার ফিরে গিয়েছিলাম, তাই মনে হচ্ছে! তিনি বিস্মিত হলেন যখন তাঁকে নীচের অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে যেতে বললাম। বাকী কাজ একলাই সেরে নিতে পারবো! তিনি নিশ্চিন্ত বালকের মত চলে গেলেন।..... তিনি বললেন: কী যে আনন্দবোধ হচ্ছে।....

সুতরাং যুম এইভাবেই আমাদের জীবনের "চরম ঘটনা" ঘটলো— জীবনের বিরাট সন্ধিলগ্ন আমার এবং সবার!

পরদিন তিনি বিজলিতে এলেন। মিসেস লেগেট, মিসেস আর স্মিথকে তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলাম, কেননা তিনি তাঁর বাণীর জন্য তৃষ্ণার্ত্ত। সে বাণী মিসেস স্মিথ প্রার্থনা করলে, স্বামিজী বললেন : আমার কোন বাণী নেই। আগে মনে হত : তা বুঝি আছে, কিন্তু জেনেছি এ পৃথিবীর জন্য আমার আর কিছু নেই। যা আছে, সব নিজের জন্য। এ স্বপ্নমায়া আমাকে ভাঙতে হবে।"

তারপরে মিসেস বুল, মিসেস ব্রিগস্ ও আমি তাঁকে পেলাম কয়েক ঘণ্টার জন্য। তিনি শিবের বিষয়ে বললেন, এই কয়েকমাস যার বিষয়ে নিরন্তর বলে এসেছেন এবং শুকদেবের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামিজীর কালীদর্শন পূর্ব্ব দিনগুলিতে তাঁকে 'শুক' বলে ডাকতেন। শুকের কাছে জগতের সবটাই খেলা, জীবন খেলা, ব্রহ্মখেলা। আমি জানি, 'শুক' জানে এবং হয়তো ব্যাস কিছুটা জানলেও জানতে পারে— শিবের উক্তি।

সুপবিত্র, সুমহান বাক্যমনাতীন ক্ষণ! গোড়ায় মায়ের কথা বলতে লাগলেন, তাঁর নিজস্ব দুষ্টু ছেলের ভঙ্গীতে; মা তো নয় শয়তানী; তার কিছুপরে সেভাব ভুলে গেলেন, কোমল হয়ে এল কণ্ঠ, আর পূজায় পূর্ণ:

সর্ব্ববস্তুতে বিরাজমানা মাতা যিনি
তাঁকে নমস্কার!
যাঁকে মহামায়া বলে জগৎ ঘোষণা করে
তাঁকে নমস্কার
তুমি দাও সকল আশীর্ব্বাদ,
তুমি দাও সকল শক্তি
তুমি দাও সকল বাসনা
তুমি পরম করুণাময়ী, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার!
তুমি মহারাত্রি, তুমি মোহরাত্রি,
তুমি মৃত্যু, রাত্রি ভয়ঙ্করী!
তোমাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার!
তারপর শোনালেন :
বাতাস বইছে বিবেকের
সমুদ্র বইছে আশীর্ব্বাদ,
স্বর্গের পিতা মধুময়,
মধুময় অরণ্যের বৃক্ষ, মধুময় গবাদি পশু,
মধুময় জ্যোতির্ম্ময় পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা পর্য্যন্ত,
ও মধু! মধু! মধু!

.... কিন্তু তাঁর গোপন ভাবনার বিষয়ে চোখ বুজে থাকতে পারিছি না। তাঁর আচার্য্য তাঁর উপরে শক্তি অর্পণ করার পরে, মাত্র এক দেড় বছর বেঁচেছিলেন : ঠিক তেমনি তিনিও অল্পদিনই

বাঁচবেন। জীবন তাঁর কাছে যন্ত্রণা। আমাদের সুখের জন্য এ জীবন সহ্য করতে তাঁকে বলতে পারবো না কিন্তু ওঃ যুম যুম- - যদি তোমার প্রার্থনার কোন মূল্য থাকে, চিরন্তনের কাছে, তাহলে দেখো, তাঁর অবশিষ্ট সময় যেন জয়শ্রী ও লীলায় পূর্ণ থাকে। আমার সহস্র মরণ হোক, আমি প্রার্থনা করি না, আমি দাবি করি পরমপুরুষের কাছে ---পরিবর্ত্তে যেন তাঁর জীবিতকালে আমি তাঁর শ্রীচরণে দুএকটি জয়মাল্য অর্পণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর যদি মায়ের প্রাণ হয়-- নিশ্চয় এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হব না।

স্বামিজী স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি দেখা দেওয়ায় নিউইয়র্কে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অবশেষে, ৫ই নভেম্বর অতিথিবৎসল লিগেট দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিবেদিতা ও তুরিয়ানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে স্বামিজী উপস্থিত হলেন নিউইয়র্কে। ৮ই নভেম্বর বেদান্তসমিতি— গৃহে আহূত প্রশ্নোত্তর সভায় উপস্থিত হয়ে সভ্যগণের সঙ্গে পরিচিত হলেন ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সকলকে কৃতার্থ করলেন।

১০ই নভেম্বর স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে থেকে তাঁকে অভিনন্দন প্রদান করা হল। এখানে পুরাতন বন্ধু-বান্ধব ও শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ অনুভব করলেন ও অভিনন্দনের সময়োচিত উত্তর দানও করলেন। তুরিয়ানন্দজী, অভেদানন্দজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বেদান্ত সমিতির কাজে যোগদান করলেন। তাঁর উদার ও সমুন্নত চরিত্রের প্রভাব, সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল।

রজোগুণের আধিক্য ছিল নিবেদিতার চরিত্রে। কর্ম্মে ছিলেন অনলস। ইংলণ্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট স্বামিজীর অনুগামী পাশ্চাত্যগমন করায় নিবেদিতা একাই সমগ্র ইংলণ্ডের পক্ষ হয়ে স্বামিজীর কাজে, জীবন উৎসর্গের বাসনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সেভিয়ার দম্পতির সংকল্প ছিল মহৎ। হিমালয়ের শান্ত ক্রোড়ে তপস্বীর জীবনযাপন ও স্বামিজীর পরিকল্পনা ও আদর্শকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত হলেন সঙ্ঘ মুখপত্র প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর নিবেদিতা দায়িত্ব তুলে নিলেন ভারতে নারী শিক্ষার বিধান। এই দায়িত্ব পালনের আকুলতায় অধীর ছিল তাঁর মন ও প্রাণ।

স্বামিজীর মন্ত্র ছিল কর্ম্ম। জলন্তভাষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণাগুলো বার বার উল্লেখ করে, তাঁকে উদ্দীপ্ত করে চললেন। বার বার উপদেশ দিতে লাগলেন : তিতিক্ষা অভ্যাসের প্রয়োজন। বহির্জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা, কাজে নামার আগে ধ্যানের দ্বারা অন্তর্মুখ ভাবটিকে আয়ত্ত রাখা, সবার উপর সন্ন্যাসের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া।

নিউইয়র্ক থেকে ১৫০ মাইল দূরে লিগেট দম্পতির পল্লী ভবন 'রিজলিম্যানর' এ অবস্থান কালে নিবেদিতা একটি নির্জ্জন কুটীরে ব্রহ্মচারিনীর ব্রত উদ্‌যাপনে নিজেকে ১৭ই অক্টোবর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত নিয়োজিত করলেন। এখানেই তাঁর রচনা সুরু ও শেষ 'Kali the Mother' গ্রন্থের। অবশ্য যদিও সংযোজিত নীচের তিনটির মধ্যে The Story of Kali Ý The Vision of Siva" পূর্ব্বের লিখিত দুটি প্রবন্ধ আর Voice of Mother, জগন্মাতা কালী সম্বন্ধে স্বামিজীর কাছে শোনা নিজের মনোমত অনুভূতি গ্রাহ্য করে পূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধ।

এখানে কুটীরে বাস করলেও প্রত্যহ স্বামিজীর দর্শন লাভ করতেন। কখনও বা স্বামিজী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হতেন কখনও বা নিজের কাছে ডেকে পাঠাতেন। তাঁর এই নির্জ্জন বাসে খুশী হয়েছিলেন স্বামিজী। কথাপ্রসঙ্গে এখানে তাঁর হৃষীকেশে একাদিক্রমে ষাট ঘণ্টা মৌন অবলম্বনের কাহিনীর উল্লেখ করলেন।

নব প্রতিষ্ঠিত মঠের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অথচ তাঁর শারিরীক বিপর্যায়, তাঁর অন্যান্য সংকল্পগুলি কাজে পরিণত করার অন্তরায় হয়ে ওঠায়, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করে

উঠতেন। উপলব্ধি করছিলেন দিন তাঁর শেষ হয়ে আসছে, অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পাদনের উপযুক্ত, যাঁকে স্থির করেছেন তাঁকে গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন। তিনি উপদেশ দিতে লাগলেন : শিষ্যের কর্ত্তব্য : নিজেকে ক্ষত্রিয়বীর গড়ে তোলা, সংযতভাবে গুরুর আদেশ পালন করা, সময়ের অযথা অপব্যয় নয়, কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া। সেই সঙ্গে নিজেও শেষবারের মত বেদান্তপ্রচারের কাজে নিয়োজিত করতে উদ্যত হলেন। স্থির হয়ে গেল : তিনি নিউইয়র্ক যাবার পর নিবেদিতাকে যাত্রা করতে হবে শিকাগোতে। জ্বলন্ত ভাষায় শিব ও শুকের উপাখ্যানের বর্ণনা করতে লাগলেন। জগতটা খেলা ঘর, আর এই চিন্তাই, জগতের প্রতি যাবতীয় বৈরাগ্য শুরু করে।

কাজে নামবার পূর্ব্বে শক্তিভাবে পূর্ণ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। যাত্রার দিন সকালে বললেন: দেখ রামকৃষ্ণ প্রতিদিন সকালে বহুক্ষণ ধরে শিব গুরু, মহাকালী অথবা সচ্চিদানন্দ এই সকল নাম করতেন। সব সময়ে দুর্গা নাম স্মরণ করবে, তোমাকে— সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। সহসা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, আর দেখ, শুধু প্রার্থনা নয়, তাঁকে জোর করে ওটা পূরণ করাতে হবে। মার কাছে ওসব দীনহীন ভাব চলবে না।'

এই মাতৃপ্রার্থনা সেদিন থেকে নিবেদিতার জীবনে মন্ত্রশক্তির কাজ করলো। যখনই সমস্যা পথরোধ করতে চায়, তখন জপ করলেন 'দুর্গা' নাম। শিকাগো যাত্রার সময়েও জপ করলেন, দুর্গা নাম। তিনি সন্ন্যাসিনী। সকল বাধা অতিক্রমে, যেন তিনি বল সঞ্চারণ করলেন। জয়ী হয় যেন তাঁর ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। পথের সঙ্গী হলেন মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়া।

পরিচয় হল হেল পরিবারের সঙ্গে। এটাই তাঁর প্রথম পরিচয়। মেরী হেল, স্বামিজীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন— ফলে, উভয়ের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। স্বামিজী তাঁকে ভগিনী সম্বোধন করতেন—নিবেদিতা তাঁর কন্যা। মেরী হলেন Aunt ওরফে পিসী।

রিজলিম্যানর শহর থেকে দূরে এক পল্লীগ্রামে। সেখানে ভোগ করেছেন নির্জ্জনতা তার উপর ছিলেন স্বামিজী। আবহাওয়া ছিল বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। আর শিকাগো! সর্ব্বত্র অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা, ঝলমলে বিদ্যুতের আলো—উন্মাদনা ভরপূর গতানুগতিক জীবনযাত্রা। আমেরিকার বড় শহরগুলির ধারাই এই। এখানে জীবনের একমাত্র সত্য— ইহলোক। তাকে একান্তে ভোগের বিচিত্র আয়োজন, তার উপকরণও অসংখ্য। সর্ব্বত্রই উৎকট স্থূলতা— নিবেদিতাকে ক্লিষ্ট করে তুললো। মিস জেন অ্যাডামস্ শিকাগো শহরের একজন বড় কর্ম্মী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হাল্ হাউসে' নিবেদিতা অবস্থান করতে লাগলেন। বাড়ীটিতে ধনী বা সাধারণ নরনারীও বাস করতে পারেন। সেখানে ধনীর বিলাসবহুল যেমন ব্যবস্থা, দরিদ্রের বাসোপযোগী ব্যবস্থাও ছিল পাশাপাশি।ফলে, বিভিন্ন নরনারীর সংস্রবে যেমন আসাা যায়, তেমনি স্বচ্ছন্দে মতামত প্রকাশের অবকাশ ছিল এখানে। নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতা দ্বারা অর্থসংগ্রহ। তার উপর তিনি ভারত থেকে এসেছেন, যাঁরা ওদেশ সম্বন্ধে কৌতুহলী তাদের ভীড় জমে উঠলো। ১৬ই নভেম্বর, তিনি মিস ম্যাথিউর প্রাথমিক স্কুলের বালক বালিকাদের কাছে, ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। স্বামিজীর কাছে শুনেছিলেন যে সকল উপাখ্যান, তা কাজে লাগলেন। বক্তৃতা দেবার কৌশল আয়ত্তে ছিল। 'শিশুখ্রীষ্ট' থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় শিশুখ্রীষ্টের উপাখ্যান বর্ণনা করার সময় শ্রীকৃষ্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং গোপাল সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক কাহিনী ব্যাখ্যা করলেন। অপেক্ষাকৃত যাঁরা বড়, সেই সব ছাত্রীগণের কাছে ভারতের গঙ্গানদী, আগ্রার তাজমহল ও ফোর্টের চমৎকার বর্ণনা দিলেন। পরদিন শুক্রবার, এক মিশনারী বোর্ড কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে 'ফ্রাইডে ক্লাবে' "ভারতীয় নারীগণের অবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ২০শে নভেম্বর মিস অ্যাডামসের উদ্যোগে 'হাল্ হাউসে' ব্যবস্থামত বললেন "ভারতে ধর্ম্ম জীবন"। পহলগামে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী থেকে সুরু করে দক্ষিণেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বর্ণনা করলেন।

এপাশে নিউইয়র্কে, বেদান্ত সমিতিতে যোগদানের পর তুরিয়ানন্দজীর উদার ও সমুন্নত চরিত্র প্রভাবে জনসাধারণের কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে আহূত হয়ে, মন্ট ক্লেয়ারে গমন করলেন। ডিসেম্বর মাসে কেমব্রিজে 'বেদান্ত' প্রচার কাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করলেন। ১০ই ডিসেম্বর 'কেমব্রিজ কনফারেন্সে'র ব্যবস্থানুযায়ী "শঙ্করাচার্য্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও বহু দার্শনিক ও ধর্ম্মযাজক নবাগত স্বামিজীর প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে শুনে, প্রশংসা করতে লাগলেন। এমনিভাবে তিনি (তুরীয়ানন্দজী) হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাস্পন্ন আমেরিকান নরনারীগণের অন্যতম আচার্য্যরূপে পরিগৃহীত হলেন।

ক্যালিফোর্নিয়া যাবার পথে ২৩শে নভেম্বর স্বামিজী শিকাগো ফিরে এলেন পুনরায়। অল্প কয়েকদিন অবস্থান করলেন হেল পরিবারে। নিবেদিতা পুনরায় দর্শন লাভের সুযোগ পেলেন স্বামিজীর।

১লা ডিসেম্বর 'হাল্ হাউসে' আর্ট য়্যাণ্ড ক্র্যাফট আসোসিয়েশনে ভারতের "প্রাচীন শিল্পকলা" সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। নিবেদিতার তখনও ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটেনি। স্বামিজী এসে পড়ায় : স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ লাভ হল। তাঁর কাছ থেকে বক্তৃতার সারাংশ লিখে নিলেন। সে বক্তৃতায় প্রথম কয়েক ডলার লাভে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হলেন তিনি।

বহুদিন পরে স্বামিজী শিকাগোতে আগমন করায়, শিকাগোর বন্ধুগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। নিবেদিতার সঙ্গে একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। মেরী হেল ও মিস জেন এ্যাডামসের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ এসে গেল। যারা স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন বা তাঁর দর্শনে উৎসুক, তাদের সঙ্গে নিয়ে স্বামিজীর অবকাশ মত দেখা সাক্ষাৎ করতে হেল পরিবারে উপস্থিত হতে লাগলেন।

স্বামিজী সত্যাশ্রয়ী। তাঁর মন্তব্য সব সময়েই কঠোর ও রূঢ়। যাঁরা তাঁর সঙ্গে মত বিনিময়ে ক্ষুণ্ণ হতেন, তাঁদের প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করলেন নিবেদিতা : জগতের মতামত সম্বন্ধে উদাসীন স্বামিজী! তাঁর লক্ষ্য সত্যপ্রচার। যাঁরা তাঁর কাছে যান বা মত বিনিময়ের সুযোগ পান তাঁরা সকলেই সত্যান্বেষী আত্মা। যেসব মহিলাদের স্বামিজীর কাছে নিয়ে যেতেন, পাশ্চাত্য আদবকায়দা বজায় রেখে মেরী পিসিকে খুশী করে, সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে স্বামিজীর সম্মুখীন হতেন। যাঁরা দর্শন প্রার্থী সকলেই যেন তাঁর (স্বামিজীর) কাছে সহজেই যেতে পারেন সে ব্যবস্থা করে ফেললেন নিবেদিতা। ফলে, সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জীবন ধন্য হতে লাগলো।

শিকাগো ত্যাগের পূর্ব্বে স্বামিজী নিবেদিতাকে বললেন : মনে রেখো, ভারত চিরকালই ঘোষণা করেছে, আত্মা প্রকৃতির জন্য নয় প্রকৃতিই আত্মার জন্য।

সর্ব্বপ্রকার লোক ও সর্ব্ববিধ মতবাদের মিলন ক্ষেত্র আমেরিকা। হাল্ হাউসেও বিভিন্ন দেশের লোক সমবেত। নিবেদিতার চারপাশে কৌতূহলী শ্রোতৃবর্গের জমা ভিড়। অসংখ্য প্রশ্ন। ড্রইং রুমে বসে ছোট ছোট দলের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চলতো। এক সন্ধ্যায় অনেকের অনুরোধে 'কালীপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। প্রশংসা লাভ করলেন। উইমেন্স ক্লাবের সদস্যগণের কাছেও নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তাদের সহায়তা লাভ করলেন।

কিন্তু সমস্যা তৈরী করলো তাঁর পোষাক। জীবন তাঁর ত্যাগের, উদ্দেশ্যও মহৎ, ভারতীয় নারীদের শিক্ষার্থে যৎকিঞ্চিত সাহায্য, ওরফে অর্থ ভিক্ষা! সেই জন্যই তাঁর বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদ গ্রহণ, যা তাঁর আদর্শ ও কর্ম্মধারার বাহক-রূপে প্রতীয়মান হয় বাস্তব জগতে। অথচ তাঁর বহুবান্ধবী তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন ও পোষাক ত্যাগ করে সাধারণ পোষাক গ্রহণ করেন যেন। কারণ, এই পোষাকই তাঁর কাজের অন্তরায়। যুক্তিগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না, অথচ তাঁর

পক্ষেও পোষাক ত্যাগও অসম্ভব— একথা কোনমতেই বোঝানো সম্ভব হল না। আবার কেউ কেউ তাঁকে সাদা পোষাক পরতে উপদেশ দিতে লাগলেন। সর্ব্বত্রই সমস্যা কিন্তু উপায় কি? ব্যর্থতার জন্যও প্রস্তুত থাকা চাই। আবার কারও কারও ভারতীয় নামের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যেতো। বিভিন্ন লোকের বিচিত্র মত, কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলে না— নিজেকে অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

মাদাম কালভে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না। পরিচয় ঘটলো নিবেদিতার সঙ্গে। বহু হিন্দু ও সিংহলী বৌদ্ধও, তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে স্বামিজীর প্রসঙ্গ উঠলেই অনুপ্রাণিত হয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে মুখর নিবেদিতা বিশেষ করে তাঁর ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন যখন উঠতো— তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আত্মহারা হয়ে ঐ সম্বন্ধে স্বামিজীর কথাগুলি বর্ণনা করে যেতেন।

প্রাণপাতী পরিশ্রম। শেষে একদল হিতৈষী বন্ধুলাভ হল। জনৈকা মিস লিক নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে, শেষে তাঁকে সহানুভূতি সহকারে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। আর্থিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁদের মধ্যে মিসেস কোহান, মিসেস কাইফ, মিসেস কংগার, মিসেস কিং এবং মিসেস ইয়ারো বিশেষ উদ্দ্যোগী। শিকাগোয় কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হলে, অন্যশহরের অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১০ই জানুয়ারী শিকাগো ত্যাগ করলেন।

আর স্বামিজী! তিনি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কালিফোর্নিয়ার প্রধান নগরী লস এঞ্জেলসে মিসেস রোল্ডগোটর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড সেখানে অবস্থান করছিলেন। স্বামিজীর আগমনের অল্প কয়েকদিন পরেই প্রতিদিন দলে দলে নর নারী তাঁর দর্শনার্থী হয়ে আগমন করতে লাগলেন। তাঁর বই পড়ে তাঁরা এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি লস্ এঞ্জেলসে বাস করছেন জানতে পেরে দূর দূরান্ত থেকে বহুলোক তাঁর কাছে সমাগত হতে লাগলেন। কালিফোর্নিয়ার অন্যান্য নগর থেকেও সাগ্রহ আহ্বান আসতে লাগলো। সকালে ও দুপুরে প্রশ্নোত্তর সভার অনুষ্ঠান চলতে লাগলো। শেষপর্যন্ত সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হলেন।

৮ই ডিসেম্বর 'ব্ল্যাঙ্কার্ড বুক' নামক সুপ্রশস্ত ভবনে সহস্রাধিক শ্রোতার সামনে 'বেদান্ত দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এখানে নানাস্থানে ক্রমাগত অনেক বক্তৃতা প্রদান করলেন। স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্য অনুকূল ছিল— তাই গড়ে প্রতিদিন একটি করে বক্তৃতা দিয়েও পূর্ব্বের মত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন না। বক্তৃতা ও কথোপকথন ছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় অনুরাগী শিষ্য ও ছাত্রদের 'রাজযোগ' শিক্ষা দিতে লাগলেন। 'হোম অফ ট্রুথের' সভ্যগণ তাঁর প্রতি এত আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তাঁরা তাঁকে তাঁদের ভবনে নিয়ে গেলেন ও তাঁর দৈহিক অভাব পূরণের ভার গ্রহণ করলেন। তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। দু মাস সময়ের মধ্যে কালিফোর্নিয়ার প্রচার কাজে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে তাঁর পবিত্র চরিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রচারবার্ত্তা প্রকাশ হতে লাগলো।

ফেব্রুয়ারী মাসে ওক্‌ল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চের ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড ডাঃ বেঞ্জামিন কে. মিলস কর্ত্তৃক আহুত হয়ে সেখানে গমন করলেন। ওখানে পর পর আটটি বক্তৃতা প্রদান করলেন। প্রতিদিন গড়ে দুহাজার শ্রোতা, আগ্রহের সঙ্গে তাঁর উদার ধর্ম্মমত শোনার আশায় সমবেত হতে লাগলেন। স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহে তাঁর বক্তৃতার সারাংশ ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিদিন আলোচনা চালাতে লাগলো।

এই সময় ডাঃ মিলস্ কর্ত্তৃক 'Congress of Religions' (একটি ধর্ম্মসভা) ডাকা হল। কালিফোর্নিয়ার শত শত মিশনারী ও ধর্ম্মযাজক সে সভায় যোগ দান করলেন। সকলেই স্বামিজীর উদার ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম সমন্বয়ের অপূর্ব্ব বার্ত্তা, আগ্রহের সঙ্গে শুনে প্রশংসা মুখর হলেন। ডাঃ বেঞ্জামিন তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্যতাও অসীম আধ্যাত্মিক অন্তর-দৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচিত হয়ে এতই

মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে শ্রোতৃবৃন্দের কাছে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন "A man of gigantic intellect indeed, one to whom our greatest University Professors were as mere children....."।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে ওক্‌ল্যাণ্ড থেকে কালিফোর্ণিয়ার রাজধানী সানফ্রানসিস্কোয় উপস্থিত হলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সমাগত দর্শনার্থিগণের কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে টাকার ষ্ট্রীটে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। কয়েকদিন পরে 'গোল্ডেন গ্রেট হলে' সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের সামনে, প্রথম ও সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ, নামে বক্তৃতা প্রদান করলেন। স্বামিজী আসন পরিগ্রহ করলে জনতা সম্মিলিত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করতে লাগলেন। প্রতিটি শ্রোতা অনুভব করতে লাগলেন : জগৎ কল্যাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ সত্য সত্যই ঈশ্বরের দূতরূপে, মুক্তির অভিনব বার্ত্তা বহন করার জন্যই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। মার্চ্চ মাসে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিলেন। এছাড়া সাধারণের আগ্রহে তাঁকে প্রায়ই 'রাজযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করতে হল। সকালে, যোগশিক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাদান, ধর্ম্মালোচনা ও বৈকালে বক্তৃতা দান— এই উচ্ছল কোলাহলের মধ্যেও তাঁর সমাধিত মন মাঝে মাঝে এক অজ্ঞাত, অব্যক্ত ভাবরাজ্যে ডুবে যেতে লাগলো।

স্বভাবে নিবেদিতা ছিলেন অনুভূতি প্রবণ। সাফল্যে যত খুশী, ব্যর্থতায় ততখানি বেদনাগ্রস্থ। অর্থ সাহায্য পেলে যত উৎফুল্ল, বিমুখ হলে ততখানি ক্ষুব্ধ। শ্রোতাদের কাছ থেকে যখন অজস্র প্রশ্ন, যখন চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার শেষে প্রাপ্তি ঘটে শুধু ধন্যবাদ, তখন তিনি ভেঙে পড়েন। তখনই ভেসে আসে স্বামিজীর উপদেশবাণী : 'দুর্ব্বলতার বহিঃপ্রকাশ মানুষকে অধিকতর দুর্ব্বল করে ফেলে' নিবেদিতা নিজেকে সবল করায় সচেষ্ট হলেন।

আত্মসমর্পণ নয়, বেদনা বোধ নয়, সামনে দুর্গম গিরি, তাকে লঙ্ঘিতে হবে। উদ্যম চাই, অফুরন্ত উদ্যম। স্মরণে ভেসে উঠছে স্বামিজীর ছবি— কর্ম্ম যত মহৎ, হতাশাও তত বেশী। অথচ এজীবনে কর্ম্মই একমাত্র সত্য! অপেক্ষা তাঁকে করতেই হবে, যতদিন না— উপযুক্ত লোকের সন্ধান পান। চোখের পাতায় ভেসে উঠে কতকগুলি বালিকার মুখ, যাদের শিক্ষার ভার তুলে দিয়েছেন স্বয়ং স্বামিজী। যদি প্রয়োজনীয় অর্থ না জোটে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন: শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা হবে না-এর বেশী তো কিছু নয়। পরাজয়— সেতো জয়েরই প্রতিচ্ছবি, স্বামিজীরই পরিভাষা।

স্বামিজী লসএঞ্জেলিস গেলেন। সর্ব্বত্রই বক্তৃতার দ্বারা ভারতের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি ব্রতী। বীর যোদ্ধা, আবার অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও ভাবপ্রবণ। অত্যধিক পরিশ্রম, স্বাস্থ্য ক্রমশঃ মন্দের দিকে। তার উপর মানসিক ক্লেশ। মিঃ ষ্টাডি ও মিস মূলারের আচরণে তিনি মানসিক বেদনায় অভিভূত। ২০শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে মেরীকে লিখলেন : দারিদ্র্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ও আমার নির্ব্বুদ্ধিতা জীবনকে দুর্ব্বিসহ করে তুলেছে। রিজলি ত্যাগের পূর্ব্বদিন, একই কথা বলেছিলেন নিবেদিতাকে। এখানে আগমনের উদ্দেশ্যে, ভারতের কাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থসংগ্রহ করা। সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না। নিউইয়র্কে, স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে স্বামিজীর পুরাতন বন্ধুবর্গের বনিবনা হলনা, মিঃ লিগেট বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেছেন। মিসেস বুলকে লিখলেন : দৈবের সহায়তা আমি সত্যই হয়তো পেয়েছি, কিন্তু উঃ তার প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য আমাকে কী পরিমাণেই না রক্ত মোক্ষণ করতে হয়েছে।

তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নিবেদিতা ও ম্যাকলাউড। নানাভাবে তাঁর কাজের ভবিষ্যৎ সাফল্যের বর্ণনা করে, তাঁকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করলেন। সব কিছুই তিনি সস্নেহে গ্রহণ

করলেও জানতেন, তার সব কল্পনা সফল হওয়ার আশা খুবই কম। ৬ই ডিসেম্বর (১৮৯৯) তিনি নিবেদিতাকে জানিয়ে ছিলেন: কাহারও কাহারও প্রকৃতিই এরূপ যে, তারা যন্ত্রণা পেতেই ভালবাসে। মা, আমরা সকলেই সুখের পিছনে ছুটছি সত্য, কিন্তু কেউ কেউ যে দুঃখের মধ্যেই আনন্দ পায়, ইহা কি বিশেষ অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না? খ্যাতি নয়, শুধু ভাববার বিষয় এই যে, সুখ এবং দুঃখ উভয়েই সংক্রামক।.... আমার ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখে জগতের কিছুই আসে যায় না। কেবল দেখতে হবে যেন, অপরে উহাতে সংক্রামিত না হয়। এটাই কর্ম্ম কৌশল।

মা, যদি সত্যই জগতের বোঝা নিতে প্রস্তুত হয়ে থাক, তবে সর্ব্বতোভাবে তা গ্রহণ কর, কিন্তু তোমার বিলাপ, ও অভিশাপ যেন, আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা যন্ত্রণার দ্বারা, আমাদের এরূপ ভীত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে বরং আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই ছিল ভাল! যে ব্যক্তি, সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, সে জগৎকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা বা সমালোচনা থাকে না। অবশ্য তার কারণ এটা নয় যে, জগতে পাপ নেই, প্রত্যুত তার কারণ এই যে, সে এটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে, স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছে। যিনি উদ্ধার করবেন, তাঁকে সানন্দে আপন পথে চলতে হবে, যারা উদ্ধার হতে আসবে, তাদের এটা করবার বাধ্যবাধকতা নেই।

আজ প্রাতে এই তত্ত্বটিই আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যদি উহা আমার মনে স্থায়ীভাবে এসে থাকে এবং আমার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে, সেটাই যথেষ্ট।

দুঃখভার জর্জ্জরিত যে যেখানে আছ, সকলেই এস, তোমাদের সকল বোঝা, আমার উপর ফেলে দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে চলতে থাক, আর তোমরা সুখী হও ও ভুলে যেও আমি একজন কোনকালে ছিলাম। অনন্ত ভালবাসা জেনো। ইতি তোমার বাবা বিবেকানন্দ

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, নিবেদিতা যে কাজে ঝাঁপ দিয়েছেন, তাতে বহু ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। পরের কল্যাণ করতে গিয়ে তাঁকে, অনেক সহ্য করতে হয়েছে। নিবেদিতাকেও তা করতে হবে। প্রাণপাত করে, যাদের জন্য কিছু করবেন, বিনিময়ে তাদেরই অভিশাপ কুড়াবেন— তাঁর আন্তরিকতার প্রতি, সন্দেহ ও বিদ্রূপ অনিবার্য। সুতরাং মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বামিজীর চিঠি পড়ে নিবেদিতার মনে নূতন বল এলো। কেন হতাশ হবেন? দুঃখে ভেঙে পড়বেন? তিনি কি স্বেচ্ছায়, সানন্দে স্বামিজী প্রদত্ত কাজের ভার, গ্রহণ করেন নি? তবে অনুযোগ কিসের? যুক্তির ফাঁদে মনকে ধরে রাখা যায় না। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক চাপের প্রভাবে সে ভারাক্রান্ত হবেই! কিন্তু যে, নিজেকে উৎসর্গ করেছে, যে আদর্শকে মাথায় বরণ করে নিয়েছে, তার পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ কোথায়? সমুদ্রে অথৈ জল, পাড়ি দিতে হবেই তাঁকে! সাঁতারু যে, লক্ষ্য হবে তার স্থির। লক্ষ্যে তাকে পৌঁছাতে হবেই।

শিকাগো থেকে রওনা হয়ে নিবেদিতা প্রথমে জ্যাকসন এবং পরে অ্যান আয়বর গমন করলেন। এই সময়ে স্বামিজীকে পত্রে লিখলেন :

স্বামী বিবেকানন্দ সমীপেষু

অ্যান আয়বর
৩রা জানুয়ারী, ১৯০০

গতরাত্রে, আপনার প্রেরিত আমার জন্মদিনের কবিতাটি পেয়েছি। এ বিষয়ে আমি যাই বলি না কেন, সবই কেমন গতানুগতিক শোনাবে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যদি আপনার সুন্দর ইচ্ছাটি ফলবতী না হয়, তবে আমার হৃদয় ভেঙে যাবে।

এখানে আমি রামপ্রসাদের সঙ্গে একমত--- চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি। এমন কি ভগবানকেও কোনভাবে জানতে চাইনা, যে চিন্তা, আমার পিতাকে পাওয়ার বহু ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করবে না, তেমন কোন বিষয় চিন্তা করাও আমার পক্ষে হাস্যকর।

আমি যেন অসম্ভব কথা বলাবার ও যা চিন্তার বিষয় হতে পারে না— এমন কোন চিন্তা করার চেষ্টা করছি— তবে আপনি ভাল করেই জানেন, আমি কী বলতে বা কোনভাব প্রকাশ করতে চাইছি!

আগে ভাবতাম, আমি ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য কাজ করতে চাই, আরও সব সুন্দর সুন্দর নৈব্যক্তির ধারণা পোষণ করতাম, এখন ঐসব আদর্শের উচ্চশিখর থেকে নিশ্চিতভাবে অবতরণ করেছি এবং বর্ত্তমানে আমি যেসব কাজ করতে চাই সে কেবল পিতার অভিপ্রায় স্মরণে রেখে।

এমন কি ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও, যেন একটা প্রতিদান চাওয়া। আচার্য্যদের, আমি চিরকাল শুধু সেবার জন্যই সেবা করতে ব্যাকুল— একটা তুচ্ছ দীনহীন জীবনের জন্য নয়।

আর একটি বিষয় আমি নিশ্চিতভাবে জানি এবং ঠিক সময়ে জানা প্রয়োজনও, তা হল অচিরে আপনি সহস্র সহস্র সন্তান লাভ করবেন, যাঁরা আরও মহৎ, আরো যোগ্য, তারা আপনাকে আমার চেয়ে অনন্তগুণ বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে।

আপনার কন্যা
মার্গট।

অ্যান আয়বর থেকে ডেট্রয়েটে পৌঁছালেন নিবেদিতা। কোথাও সাহায্য মিললো- কোথাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জ্যাকসনে তাঁর বক্তৃতার পর মহিলারা তাঁকে ঘিরে বসলেন— কী সাহায্য তাঁরা করতে পারেন? উত্তরে নিবেদিতা বললেন, 'বিশেষ কিছুই নয় বছরে একটি করে ডলার।'

এই সামান্য প্রতিশ্রুতি পাওয়া যে কত কঠিন! সর্ব্বত্রই তাঁকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। ভারত সম্বর্দ্ধে; বিশেষ করে বাল্যবিবাহ , বহুবিবাহ ও নারীগণের হীন অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমাগত প্রশ্ন ও সমালোচনার উত্তর দিতে হয়েছে ও নানারকমের অদ্ভুত সেসব ধারণা, তার উপর কঠোর সমালোচনা তাঁকে শুধু ব্যথিত নয় ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এদেশে প্রচারে এসে স্বামিজীকে কত সহ্য করতে হয়েছিল— নিদারুণ সে অভিজ্ঞতা।

ডেট্রয়েটে মহিলা ক্লাবে ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এলো। ভাবলেন, দীর্ঘদিন পরে ক্লাবটি সহসা ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে- একটা শুভ লক্ষণ সুনিশ্চয়। কিন্তু সেখানে বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ সম্বন্ধে উৎকট মনোভাব, বিভিন্ন প্রশ্নে তা ভেসে উঠতে লাগলো। সেসব প্রশ্নে তিনি প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন।

বক্তৃতায় যা বললেন, ক্লাব সদস্যদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। শেষে শুরু হল আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। এঁদের মধ্যে একজন তাঁকে মিশনারীদের দলে ফেলতে চেষ্টা করলেন। উত্তরে তিনি অস্বীকার করলেন। অন্য একজন বললেন, বক্তৃতায় নোতুন কিছু নেই। যা পূর্ব্বে মিশনারীগণের কাছ থেকে শোনা যায়নি, অমুকে অমুক ব্যক্তি এ ধরণের কথা বলেছেন। অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। বললেন : এ পর্য্যন্ত একজন লোকই এ সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রতিভা রাখেন। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে, সভানেত্রী তাড়াতাড়ি অন্য প্রশ্নে অবতারণা করলেন। উঠলো : ভারতের বহু বিবাহের প্রথার বিষয়। ব্যাখ্যায় বললেন তিনি— পাশ্চাত্যদেশে 'বিবাহ বিচ্ছেদের' মত 'অন্যতম প্রথা' মাত্র! তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ধ্বনি শোনা গেল : ঠিক আমাদের দেশের মর্মন আর কি! তারাও তো ঐ সব কথা বলে!

বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন : মনে হয়, মর্মনদের মত নয়; অথবা অন্ততঃ খ্রীষ্টানদের মত, খারাপও নয়!

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো : স্থির করে নিলেন : নীরব থাকাই ভাল।

আর একজন মন্তব্য করলেন : ভারতবর্ষে স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে বাস করে না, অন্ততঃ এজন্য আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত!

উত্তরে বললেন নিবেদিতা : এ-ব্যাপারটা অন্ততঃ দম্পতির উপর ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তারাই স্থির করুন, কোনটি ভাল। কারণ এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। অপরের সঙ্গে এর কোন সংস্রব নেই।

অসহিষ্ণু প্রশ্নকারী বলে উঠলেন : আপনার খুবই ভুল হচ্ছে। সবাই ঐ কথা বলে বটে, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার ব্যক্তিগত নয় সকলের!

বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন নিবেদিতা : তা হতে পারে, তবে আমার সঙ্গে এর কোন সংস্রব নেই। আমি এই ধরনের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাইনা! যদি কোন ইংরাজ দম্পতির উদাহরণ দিই, আমেরিকান দম্পতি কি সেটা মেনে নেবেন?

কথার মোড় ফেরানোর জন্য একজন, জাতিভেদের প্রসঙ্গ তুললেন। কিন্তু তাতে কারও আগ্রহ দেখা গেল না। এবার উঠলো : পত্নীদের হীন অবস্থা, কন্যা অপেক্ষা পুত্রের প্রাধান্য, নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা, আরও নানা অভিযোগ। নিবেদিতা বুঝলেন, সর্ব্বত্রই অসন্তোষের গুঞ্জন, যে কোন মুহূর্ত্তে গোলযোগের সম্ভাবনা। নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া খোলা পথ আর নেই।

যতদিন যায়, ততই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়, কিন্তু মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন, যখন বক্তৃতার মাঝে, স্বামিজী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য কিংবা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ আলোচনা শুরু হল। তিনি নিজেকে, তাঁর (স্বামিজীর) যন্ত্রস্বরূপ করে তুলেছেন। কেউ তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে এলে, আনন্দে তদগত চিত্তে তাঁর কথাই বলে চললেন, অজ্ঞাতসারে বক্তৃতার সেই সুরে, যা তাঁর কথার প্রতিধ্বনি। যখন এ ত্রুটি আবিষ্কার করলেন, নিজের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখলেন, যাতে নিজের কথাই বলতে পারেন। পর মুহূর্ত্তে অনুভব করলেন— এতে গুরুত্বের কি আছে? সন্তান কি পিতার বাণী প্রচার করে আনন্দ অনুভব করে না?

আন্তরিক সোহার্দ্দ্য জন্মেছিল মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে। য়ুম (Yum) বলে সম্বোধন করতেন। মনের কথা অকপটে সবিস্তারে তাঁর কাছে জানাতেন— তা ভাল বা মন্দ হোক। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী। বুঝতেন নিবেদিতা স্বামিজীর বাণীই প্রচার করছেন। প্রতিবাদ অর্থে স্বামিজীর কথার প্রতিবাদ, তাই অসহিষ্ণু তিনি। পরামর্শ দিলেন : তুমি নিজের ভাবে চল— এবং তোমার নিজের বক্তব্য বল। তিনি (মিস ম্যাকলাউড) অনুভব করে নিলেন : অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী নিবেদিতার পক্ষে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে, স্বামিজীর পথ অনুসরণ সম্ভব নয়। এ কথা স্বামিজী নিজেও উপলব্ধি করে তাঁকে স্বাধীনভাবে চলতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

অথচ স্বামিজীর প্রভাবমুক্ত করার চিন্তাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। আবার নিজে, যা ভাল বুঝতেন, তা থেকে নিবৃত্ত হওয়াও ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। ম্যাকলাউডকে ভালবাসেন, তাঁকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাঁর কাছে পরামর্শ চান--- অথচ সে উপদেশ মনে তাঁর কোনদিন রেখাপাত করতো না। নিজের বাণী, নিজের চিন্তা, নিজের মিশন, যা মিস ম্যাকলাউডের কাছে মনে হতো নিবেদিতার কথা— নিবেদিতা তাকেই স্বামিজীর কথা বলে অনুভব করতেন।

প্রবল আনুগত্য ও শ্রদ্ধার জন্য তাঁকে বহু আঘাত সহ্য করতে হতো। ভারত প্রসঙ্গ উঠলেই স্বভাবতঃ স্বামিজীর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ভারত সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা ও অভিজ্ঞতা সবটাই, তার ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রভাবিত ও অতিরঞ্জিত। ফলে সংঘাত অনিবার্য্য রূপে দেখা দিতে লাগলো। স্বামিজীর সমর্থনের যুক্তিগুলি সবসময়ে অপরের মনোমত হত না বা তাঁর (স্বামিজীর) উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আগ্রহপূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমত অনেককে অধৈর্য্য করে তুললো।

যাঁরা স্বামিজীর নিকট বন্ধু, তাঁদের কাছে নিবেদিতার প্রত্যাশা ছিল অনেক। যখন সে প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। অভিমানে হৃদয় তাঁর দগ্ধ হতে লাগলো। অনুভব করলেন প্রত্যাশা বৃথা। নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইলেন। স্বামিজীর প্রতিটি কথা প্রতিফলিত হচ্ছে অন্তরে। অথচ এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করে চললেন। ফলে, তাঁর সেই উচ্চআকাঙ্ক্ষা জনমতকে পরিপূর্ণ আকৃষ্ট করতে সমর্থ হল না।

ধারণা ছিল, তাঁর সকল বন্ধু বা পরিচিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, মিস ম্যাকলাউড অথবা মিসেস বুলের মত উন্নত চরিত্রের হবেন। উপলব্ধিতে ঘটলো তার ব্যতিক্রম। স্বামিজীর কাজে আত্মসমর্পণ করেছেন অনেকেই কিন্তু তাদের অনেকের সহানুভূতির অভাব। সবকিছু স্বীকার করেও চরম আঘাত এলো মেরী হেলের কাছ থেকে। কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে একটি সাহায্য সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা করলেন। ঐ সমিতির শিকাগো কেন্দ্রের সম্পাদিকা রূপে কাজ করার জন্য মেরী হেলকে অনুরোধ করলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এছাড়াও জানিয়ে দিলেন, তাঁকে সাহায্য করা বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে কোন সংস্রব আর থাকবে না। এটা ছিল কল্পনার অতীত। তাঁর (স্বামিজীর) নিকটতম বন্ধুর, যদি এই ব্যবহার হয়, তবে, কার কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারেন?

তাঁর মনের অবস্থা উপলব্ধি করে, মিস ম্যাকললাউড তাঁকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিলেন : তোমার দীর্ঘ পত্রে জানতে পারলাম যে মেরী হেল তোমার সেক্রেটারী রূপে কাজ করতে অনিচ্ছুক, এছাড়া তোমার কাজেও তাঁর সমর্থন নেই।.... তুমি যে আঘাত পেয়েছ তা ভয়ঙ্কর। তবে যখন উহা ঘটে গেছে, তোমার সমগ্র জীবনকে তা প্রভাবিত করবে। স্বামিজীর সাহায্য ছাড়াই, তোমাকে সফলতা প্রদান করবে।.....

তুমি জান এবং স্বামিজীও জানেন যে, আমার সর্ব্বদা মনে হয়েছে, এ কাজের জন্য তোমার নিজস্ব বাণী, নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, আর স্বামিজী যেখানে অপরিচিত, সেখানেই তোমার পক্ষে কাজ করার অধিক সম্ভাবনা। স্বামিজীকে যে চেনে এবং ভালবাসে, তার পক্ষে তাঁর সম্বন্ধে, অপর কারও অভিমত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এমন কি তোমার অভিমতও নয়। সারদানন্দের কাছে শুনেছি, রামকৃষ্ণের জীবৎকালে, তাঁরা স্বামিজীর কথা শুনতেন না। সুতরাং তোমাকে নূতন লোকের মধ্যে কাজ করতে হবে। নিজের শ্রোতা ও অনুগামী, তোমাকেই তৈরী করতে হবে। আমেরিকায় দু'বছরের অভিজ্ঞতা, খুব বেশী নয়। নারীজাতির সমস্যার ভার তোমার উপর এবং ঐ বিষয়ে কাজ করার সময়, স্বামিজীর অস্তিত্ব তোমাকে বিস্মৃত হতে হবে। আমরা তাঁহাকে যে ভাবে জেনেছি, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ এবং উহাই তোমার, সারার ও আমার মধ্যে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করেছে--- কিন্তু ঐখানেই উহার শেষ।

হেল পরিবার স্বামিজীকে শ্রদ্ধা করে, তাদের নিজস্বভাবে, আমাদের ভাবে না। তাঁদের যতদূর সাধ্য, তাঁকে সাহায্য করেন কিন্তু আমাদের ভারতীয় জীবন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যে অনুভূতি দান করেছে, তা ধারণ করার শক্তি তাদের, বা স্বামিজীর অন্য কোন বন্ধুর নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে তোমাকে যেতে হবে— যেখানে তাঁহাকে জানবার সম্ভাবনা নেই।

লণ্ডনে যেমন, এখানেও তেমন, সাধারণ লোক কৌতূহলী। যখন, জগতে তোমার নিজস্ববার্ত্তা ছিল, তখনই তুমি যথার্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ করেছ। কালী সম্বন্ধে তোমার যা বক্তব্য তা তোমার নিজস্ব। উহার সঙ্গে স্বামিজীর কোন সংস্রব নেই।

তুমি যে আমাকে লিখেছ সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দিত। মিসেস হ'র মত, যাঁরা স্বামিজীর প্রতি উদাসীন, তাদের তুমি প্রভাবিত করতে পার, ইহা অদ্ভুত নয় কি? (১৪.১.১৯০০)

এই চিঠিখানি তাঁকে সান্ত্বনা দিল অনেকখানি। ম্যাকলাউডের বিচক্ষণতা ও ব্যবহারিক বুদ্ধি তাঁকে অনেক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষের দিকে শিকাগো ফিরে এলেন নিবেদিতা। যখন তিনি নানাস্থানে কাজে ব্যাপৃত, তখন কয়েকটি শিক্ষালয় পরিদর্শনের সুযোগ পেলেন। সেখানের শিক্ষা পদ্ধতি তাঁকে আকৃষ্ট করলো। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ-শিক্ষাবিদ মিঃ পার্কারের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো। তাঁর (মিঃ পাকারের) উদ্দেশ্য ছিল তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে বিভিন্ন জাতির মেয়েদের উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে যোগ্য শিক্ষয়িত্রী গড়ে তুলবেন। নিবেদিতা একজন হিন্দুবালিকাকে ঐ কেন্দ্রে শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করলে তিনি সহজেই সম্মত হলেন।

তিনি (নিবেদিতা) তাঁর বিদ্যালয়ে সন্তোষিনী নামে একটি মেয়ের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, তাকে তিনি ভবিষ্যতে একজন কর্ম্মী তৈরী করে তুলবেন। মিঃ পার্কারের কাছে সেই উদ্দেশ্যেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হল না। স্বামী সারদানন্দের চিঠিতে জানলেন, তার বিয়ে হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা আর পূর্ণ হল না।

শিকাগোকে কেন্দ্র করে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ছোট ছোট হিতৈষী দল গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি যে রয়েছেন, স্বামিজী তা জানতেন। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য ২৪শে জানুয়ারী পত্র লিখলেন : আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলিয়াছে, একটা বিরাট বলি ব্যতীত, অন্যকোন প্রকারে ইহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া দেয়, তাহারা অনেক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়। আর যাহারা বাধা দেয়, তাহাদের দুর্ভোগ অধিক।

তোমাব বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ আসিবেই, আসিতেই হইবে, আর যদি না আসে তাহাতেই বা কী আসে যায়? মা জানেন, কোন পথ দিয়া কাহাকে লইয়া যাইবেন। তিনি যে পথ দিয়া লইয়া যান, সব পথই সমান।

ধৈর্য্য অবলম্বন কর। যাহারা কঠিন এবং যাহারা কোমল, সকলেই ঠিক পথে আসিবে। এই যে তোমার নানারূপ অভিজ্ঞতা হইতেছে, ইহাই আমি চাই। আমারও শিক্ষা হইতেছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা উপযুক্ত হইব, অর্থ এবং লোক আমাদের কাছে উড়িয়া আসিবে। এখন আমার স্নায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলিয়া সব গোলমাল হইয়া যাইতে পারে। সেই কারণেই, মা আমার স্নায়ুগুলিকে, একটু একটু করিয়া আরোগ্য করিয়া দিতেছেন, আর তোমার ভাবুকতাকেও শান্ত করিয়া আনিতেছেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যানসাস সিটি ও মিনিয়াপলিস হয়ে নিবেদিতা বস্টনের অন্তর্গত কেমব্রিজে মিসেস বুলের কাছে কয়েকদিন কাটালেন। এই সময় বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে পরিচয় হল।

অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নিবেদিতা কয়েকজন বন্ধু লাভ করলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই হিতৈষীদলকে নিয়ে একটি রামকৃষ্ণ সাহায্য মণ্ডলী গঠন করলেন। 'রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় পরিকল্পনা' নাম দিয়ে ভারতবর্ষে তাঁর কাজ সম্বন্ধে সুচিন্তিত একটি পরিকল্পনা বইয়ের আকারে ছাপা হল। এই মণ্ডলীর অধ্যক্ষা হলেন মিসেস এইচ. লেগেট; মিসেস ওলি বুল হলেন সম্পাদিকা। শিকাগো, বস্টন, কেমব্রিজ ও ডেট্রয়েট কেন্দ্রের উপাধ্যক্ষা পদে যথাক্রমে হেনরী ডিলয়েড, মিস জোসেফীন ম্যাকলাউড, মিস এমা থর্সবি, এডুইন নি. মীড়, মিস অক্টোভিয়া উইলিয়াম বেটস প্রভৃতি। প্রতি কেন্দ্রের একজন করে সম্পাদিকা নিযুক্ত হলেন। কৃষ্টীন গ্রীণ ষ্টাইডেল হলেন ডেট্রয়েট কেন্দ্রের সম্পাদিকা।

স্থির হল : সংগৃহীত অর্থ নিউইয়র্কের এক প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে। যাঁরা অর্থ সাহায্য করবেন তাঁদের নাম মিস নোবলের কাছে পাঠালে, তিনি রসিদ ও কার্য্যবিবরণী পাঠিয়ে দেবেন।

স্থানীয় সম্পাদিকার কাজ হবে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া ও সাহায্যকারীর নাম ঠিকানা রামকৃষ্ণ স্কুল কলিকাতা এই ঠিকানায় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালয় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, মিস নোবলের কাছে, নিউইয়র্কে মিঃ ফ্রান্সিস এইচ লেগেটের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

পরিকল্পনাটি বইয়ের আকারে ছাপাতে মিঃ লেগেট সাহায্য করলেন। মিসেস লেগেট প্রথমেই এক হাজার ডলার দান করে নিবেদিতাকে আশ্বস্ত করলেন।

উল্লেখ্য : রামকৃষ্ণ বালিকা-বিদ্যালয় পরিকল্পনার মধ্যে স্থির হইয়াছে, যদি উক্তমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহে সাফল্য লাভ করিতে পারে কলিকাতার নিকটস্থ একটি বাড়ী ও জমি সংগ্রহ করিয়া কুড়িজন করিয়া বিধবা ও অনাথা বালিকাদের স্বাবলম্বী করিবার ব্যবস্থা থাকিবে ও তাহার সহিত যুক্ত হইবে উৎকৃষ্ট শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার রামকৃষ্ণ জীবনী ও উপদেশাবলী বই লিখিয়া প্রচারের ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটি সারদাদেবীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি হইবে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তি; ইংরাজী এবং বাংলা ভাষাও সাহিত্য পাঠের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহার সহিত প্রাথমিক গণিত ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বিশেষ রূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হস্ত শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। শেষোক্ত বিষয়ের বর্ত্তমান সার্থকতা ইহাই হইবে যে, প্রত্যেক ছাত্রীগৃহে অবস্থান করিয়াই এমন একটি পন্থায় জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে, যাহা সর্ব্বতোভাবে মর্য্যাদাকর। কিন্তু বিদ্যালয়ের আরও একটি কার্য্য থাকিবে। ১৮ হইতে ২০ বৎসরের বিধবাগণ কেবল যে প্রকৃত হিন্দু পরিবেশ ও আদর্শ পারিবারিক জীবন দেখাইতে পারেন তাহা নয়, তাহাদের সাহায্যে দুই তিনটি শিল্পব্যবসা সংগঠন করারও আশা রাখেন। উহার দ্বারা ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার বাজারে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

ধরা যাক, আমাদের প্রচেষ্টা, সকল দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে, সর্ব্বোপরি, কোন প্রকারেই জাতীয়তার পরিপন্থী নহে, বলিয়া হিন্দুসমাজ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হইলে সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতেই আমরা প্রত্যেক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করতে পারব সে বিবাহিত জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক অথবা জাতীয় কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়। যাহারা প্রথমটি মনোনয়ন করিবে, তাহাদের জন্য সম্পূর্ণ সম্মানজনিত ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। আর যাহারা স্বদেশ এবং নারীজাতির উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে চায়, তাহাদের দ্বারা বিস্তারিত শিক্ষালাভের পর, বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাগণের কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে অন্যান্য স্থানে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারিবে।

পরিশেষে নিবেদন, আমার বিশ্বাস, আমি কাহারও উদ্যম অথবা প্রতিভাকে নিকটবর্ত্তী কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দূরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের দিকে পরিচালিত করিতে চাহিতেছি না। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও আর্থিক পরিস্থিতির দিনে, আমরা নিশ্চিত রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে, বিশ্ব-সেবাই প্রকৃত স্বদেশ সেবা। মনে হইতেছে যে, আমরা ইতিপূর্ব্বেই ওয়াল্ট হুইটম্যানের "সকল জাতি কি সম্মিলিত হইতেছে?" এই মহৎ প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর দিতে অগ্রসর হয়েছি।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে, নারীজাতির শিক্ষার জন্য স্বামিজী গভীর চিন্তা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, নিবেদিতার সহায়তায় তিনি, তা কাজে পরিণত করায় সচেষ্ট হয়েছেন।

অবশ্য জগতে সকল বিষয়ই, সময়ের অপেক্ষায় থাকে। ভাবীকালের উপযোগী চিন্তার বীজ মহাপুরুষগণই বপন করে যান। যথাসময়ে তা অঙ্কুরিত হয়, পাতা, ফল, ফুলে, পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। পরিকল্পনাটি স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনার পরই, তাঁর আদর্শের পথে তা পরিচালিত হতে চলেছে।

নিবেদিতা এখানে সর্ব্বত্রই বক্তৃতার সময়ে ভারতবর্ষে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? কোন শ্রেণীর নারীগণকে শিক্ষা দেওয়া হবে? তাদের শিক্ষনীয় বিষয় কী কী? তিনি কি তাঁর দেশ, জাতি, ধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন? —প্রভৃতি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এসব প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হল বইটির মধ্যে। বইটি ছাপা হয়ে এলো ২রা এপ্রিল। এর পরই 'Kali the Mother' ছাপাবার আয়োজন সুরু হল। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তিনি যে কৃষ্ণ, গোপাল, ধ্রুব প্রভৃতি চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন ও স্বামিজী পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা, কৃষ্ণ প্রভৃতি স্বলিখিত কাহিনীগুলি নিবেদিতাকে ইচ্ছা মত পরিবর্ত্তন করে ছাপাতে নির্দ্দেশ দিলেন। পুস্তক প্রকাশক মিঃ ওয়াটারম্যান 'পাবলিক বিদ্যালয়ে' পাঠ্যপুস্তকের আশ্বাস দিলেও তা তাঁর মনঃপুত না হওয়ায় প্রকাশ সম্ভব হল না।'

১৮ই এপ্রিল (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) স্বামিজী শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : (কালিফোর্নিয়ার)

.... কর্ম্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। আর আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্ত্বায় মিশে একেবারে তন্ময় হয়ে থাকে। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।...... আমি ভাল আছি, মানসিক খুব ভাল আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী অনুভব করছি। লড়াইয়ে হার জিত দুই-ই হল —পুঁটলী পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তি দেবতার অপেক্ষায় বসে আছি। "অব শিব পার কর মোর নাইয়া"— হে শিব, হে শিব! আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।

যতই যা হোক, জো, আমি এখন পূর্ব্বের সেই বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ববাণী অবাক হয়ে শুনতো আর বিভোর হয়ে যেতো। ঐ বালকভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি। আর কাজকর্ম্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতির উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটি উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি— সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর। যাতে আমার প্রাণের ভেতরটাকে পর্য্যন্ত কন্টকিত করে তুলছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজ, কর্ম্ম, বিষাদ বোধ হচ্ছে। জীবনের প্রতি আকর্ষণ বোধও প্রাণ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তার স্থলে রয়েছে কেবল প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান। যাই প্রভু-যাই। ঐ তিনি বলছেন, মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে, তুই ওসব ছেড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয়। অন্তর ব্যাকুল যাই প্রভু যাই!

হ্যাঁ, এবারে আমি ঠিক যাচ্ছি? আমার সামনে অপার নির্ব্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। সময় সময় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তি সমুদ্র! মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ; পর্য্যন্ত যে শান্তিভঙ্গ করছে না!

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী আছি, এত যে দুঃখে ভুগেছি, তাতেও খুশী, জীবনে কখনও কখনও বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী। আবার এখন যে নির্ব্বাণের শান্তি সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, অথবা এমন বন্ধন আমিও, কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমাকে মুক্তি দিক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরানো বিবেকানন্দ আজ চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য— চলে গেছে, পড়ে আছে কেবল পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর চিরশিষ্য— চির পদাশ্রিত দাস।

অনেকদিন হল নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই, 'এইটে আমার ইচ্ছা, বলবার আর অধিকার নেই।' তাঁর ইচ্ছা স্রোতে, যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই, জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপ গা ভাসান দিয়েছি। উপরে, দিবাকর নির্ম্মল কিরণ বিস্তার করেছেন— পৃথিবীর চারদিক

শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই এখন নিস্তব্ধ, স্থির ইচ্ছা বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না, পাছে এই শান্ত নিস্তব্ধতাটা ভেঙ্গে যায় আবার। প্রাণের এই শান্ত নিস্তব্ধতাটাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। পূর্ব্বে, আমার কর্ম্মের ভিতর, মান যশের ভাবও উঠতো, আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যক্তিবিচার আসতো, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে, ফল-ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকতো, আমার নেতৃত্বে, প্রভুত্বের স্পৃহা আসতো। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে, আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই মা, যাই মা— যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে, যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাইছো, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে, অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে, কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।

ঠিক এমনি একটি চিঠি স্বামিজী মিসেস ওলি বুলকে লিখলেন : আমি এখন আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনার উপরে বেশী বিশ্বাস করি। জো এবং মার্গট মহাপ্রাণ, কিন্তু আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলার আলোক, এখন 'মা' আপনার হাতেই অর্পণ করেছেন। আপনি কি আলোক পাচ্ছেন? আমি শিশু বই আর কিছু নই। আমার আবার কাজ কি? আমার শক্তি, সে তো আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছি। পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছি। বক্তৃতা মঞ্চে, বাণী প্রচার করতে আর পারবো না। এসব কথা কাউকে বলবেন না, জো কেও না। আমি খুশী। বিশ্রাম চাই আমার। আমি যে ক্লান্ত! তা নয়, কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায় হবে— বাণী নয়, অলৌকিক স্পর্শ, রামকৃষ্ণের মতো। শব্দ গেছে আপনার কাছে, আর স্বর গেছে মার্গটের কাছে। ওসব আর আমার কাছে নেই। আমি খুশী। সব ছেড়ে দিয়েছি। শুধু আমাকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।..... (১৭ই জানুয়ারী ১৯০০)

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি উৎসাহী শিষ্যাগণ কালিফোর্নিয়ার স্থানে স্থানে বেদান্ত সমিতি ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে, বেদান্ত প্রচার করতে লাগলেন। লসএঞ্জেলস থেকে ডাক এলো। কিন্তু সানফ্রানসিস্কো ও তৎসন্নিধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহের আরব্ধ কাজ পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া তাঁর মনঃপূত হলনা। অন্যতমা শিষ্যা মিসেস হেইনস্‌বোরা লসএঞ্জেলসে নিয়মিত বেদান্ত ক্লাশগুলি চালিয়ে যেতে লাগলেন। সানফ্রানসিস্কোর বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট ডাঃ এইচ. লোগান ও অন্যান্য কয়েকজন শিষ্য শিষ্যাগণ বুঝতে পারলেন যে স্বামিজী শীঘ্রই অন্য জায়গায় চলে যাবেন। এই সমিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে একজন ভারতীয় আচার্য্যের প্রয়োজন। তাঁদের অনুরোধে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে কালিফোর্নিয়ায় আসার জন্য পত্র লিখলেন। নিউইয়র্কের বেদান্ত-সমিতির ভার ছিল তাঁর উপরে। স্বামী অভেদানন্দজী যুক্তরাজ্যের নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সানফ্রাসিস্কো অভিমুখে তাঁর যাত্রা করা সম্ভবপর হল না।

কালিফোর্নিয়া ত্যাগের কয়েকদিন আগে মিস মিন্নি সি. বুক (Miss Minnie C. Book) নামে ভক্তিমতী শিষ্যা স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য ১৬০ একর জমি প্রদান করলেন। আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করলেন স্বামিজী। স্বামী তুরীয়ানন্দজী সেখানে 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু স্বামিজী সে আশ্রম দেখে আসার অবকাশ পেলেন না।

একটানা প্রচার কার্য্য চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। বসন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে 'ক্যাম্প টেইলর' নামক পল্লীতে যাত্রা করলেন। তিন সপ্তাহ পরে পুনরায় সানফ্রানসিস্কোতে ফিরে এলেন। তখনও তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি। এমতবস্থায় শিষ্যগণ তাঁকে বক্তৃতা প্রদান করতে অনুরোধ করলেন না। তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তি করতেন ডাক্তার উইলিয়াম কাষ্টার। তিনি তাঁকে সকল সময়ে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। মে মাসের শেষের দিকে

অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন। শরীরটাই সকল কাজের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা সম্বন্ধে ক্রমাগত চারটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। নিয়মিত বক্তৃতা দান পরিত্যাগ করলেও লোকসমাগমের বিরাম ছিল না। বালকের মত পরিহাসপ্রিয় ও চাটুল বাক্য বিন্যাসে পটু তিনি। তাঁর সেই মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রে তাঁর নানাবিধ সমালোচনা বেরুতে সুরু হল। 'প্যাসিফিক বেদান্তিনে' মন্তব্য প্রকাশিত হল : 'স্বামিজী সুগভীর ভাবদ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্পন্দিত করেছেন। তাঁর এই ভাবরাশি প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত' সবসময়ে প্রতিধ্বনিত হবে। তাঁর সঙ্গে কি শিশু, কি ভিক্ষুক, রাজা কিংবা ক্রীতদাস অথবা বেশ্যা, সকলেই সমান অধিকারে তাঁর আলাপ করতে পারে। তিনি বলেন, সকলেই একই পরিবারের অন্তর্গত। তাদের সকলের মধ্যেই আমার অস্তিত্ব দেখতে পাই এবং আমার মধ্যেও তাদের স্বরূপ অনুভব করি। এই পৃথিবী, এক পরিবার সদৃশ, যুগযুগান্তপূর্ব্ব ব্যাপিয়া, সত্যস্বরূপ অনন্ত-ব্রহ্ম-সমুদ্র বিদ্যমান এখানে।

মে মাসের শেষের দিকে তিনি লণ্ডন থেকে লিগেট দম্পতির পত্র পেলেন। তাঁরা জুলাই মাসে প্যারিসে যাবেন। স্বামিজীও যেন সেখানে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। প্যারী-প্রদর্শনীর ধর্ম্মেতিহাস সভায় বৈদেশিক প্রতিনিধিগণের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে বক্তৃতা প্রদান করার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছিল। এই দু' কারণে তিনি কালিফোর্নিয়ার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় নিয়ে নিউইয়র্কে উপস্থিত হলেন। পথে পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণের সঙ্গে দেখা করার জন্য শিকাগো ও ডিট্রয়েটে, যাত্রা বিরতি করলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নিবেদিত শিকাগো পরিত্যাগ করে জামাইকা শহরে গমন করলেন। সেখানে মহিলাগণের অনুরোধে 'ফ্রি রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশনে' আমাদের নিকট প্রাচ্যের 'ঋষি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় তিনি অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে একমাত্র ভারতই বিশ্ববাসীকে যথার্থ সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে কিছু সাফল্য লাভ করলেও তাঁর লেখা পত্র থেকে বোঝা যায় দুর্ভোগের শেষ তখনও হয়নি।

— "জনৈক নেতা বলেছিলেন : যে কোন নূতন সত্য সাধনের ভাবধারা গৃহীত হবার পূর্ব্বে, তাকে উপহাস, যুক্তিতর্ক, আর বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। যখন এই তিনটি বিষয় সমুপস্থিত তখন জানবে জয় অতি নিকটে।" হায়! তোমরা তিনজনেই এক সঙ্গে এস এবং সঙ্গে আন, যতদূর সম্ভব কঠোরতা। কঠোরতার পরিমাণ যতই হোক না কেন, আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, যদি তোমাদের উপস্থিতি, কেবল চিরস্থায়ীত্বে পরিণত না হয়!"

নিবেদিতা যখনই বিশেষ কাতর হয়েছেন, স্বামিজীর কাছ থেকে আশ্বাস এসে যেতো। ২৬ মের পত্রে স্বামিজী লিখলেন : আমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ জানিও এবং কিছুমাত্র নিরাশ হইও না.... ক্ষত্রিয়শোনিতে তোমার জন্ম। আমাদের গৈরিক বাস তো, যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু সজ্জা। ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য, ব্যস্ত হওয়া নয়! দৃঢ় হও মা! কাঞ্চন কিংবা অন্যকিছুর দাস হইওনা। তাহা হইলেই সিদ্ধি আমাদের সুনিশ্চিত"।

স্বামিজীর সকল পত্রই নিবেতিাকে সর্ব্বপ্রকার বাধা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আদর্শের জন্য বীরঙ্গনার মত যুদ্ধ করবার মত প্রেরণা দান করলো।

নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সমিতির' স্থায়ী বাসভবনে বাস করতে লাগলেন স্বামিজী। আগে বক্তৃতা ও লোকশিক্ষা দানে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করতেন, এবারে প্রাচীন বন্ধু, শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বেদান্ত সমিতির কাজ ভালভাবেই চলছিল। সর্ব্ব প্রথম সভাপতি মিঃ লিগেট পদত্যাগ করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল নির্ব্বাচিত হলেন। স্বামী তুরিয়ানন্দজী এপ্রিল মাস থেকে নিয়মিত বক্তৃতা ও যোগশিক্ষা দান

করছিলেন। স্বামিজীও প্রতি রবিবার গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। স্বামী তুরিয়ানন্দজীকে কালিফোর্নিয়ায় যাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

আমেরিকার কাজ শেষ হওয়ায় জুন মাসের প্রথমেই নিউইয়র্ক চলে এলেন নিবেদিতা। স্বামিজীও কালিফোর্নিয়ার থেকে শিকাগো হয়ে নিউইয়র্কে ফিরে এসেছেন। পূর্ব্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বামিজী বক্তৃতা ও ক্লাশ আরম্ভ করেছেন। বহুদিন পরে নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতা শুনবেন। লণ্ডনে যেমন দ্বিতীয় সারির বাঁদিকে শেষের আসনটিতে বসতেন, ঠিক সেই ভাবেই বসে সাগ্রহে স্বামিজীর বক্তৃতার অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময়ে বক্তৃতা আরম্ভ হল। বিষয় : বেদান্ত দর্শন; মানব জীবনের লক্ষ্য কি?

দীর্ঘদিন সংগ্রাম ও ব্যর্থতায় হৃদয় মন অবসন্ন হয়ে পড়ে ছিল নিবেদিতার। ব্রত সাধনের জন্য জীবন যাত্রার পথে যে আবেগের প্রয়োজন, তার অভাবে প্রাণে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। স্বামিজীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে অন্তর তাঁর আবার নূতন উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।

এখানে কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে অবস্থানের সুযোগ এলো। তাঁর সকল বক্তৃতায় উপস্থিত থাকা ও নোট সংগ্রহের অবকাশ পেলেন। মিস ম্যাকলাউডকে প্রতিটি বক্তৃতার বিবরণী পাঠিয়ে দিলেন। নিজেরও কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের আগ্রহে, শনিবার ও রবিবার অপরাহ্ণে নিয়মিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করলেন। ১৭ই জুন, তিনি 'হিন্দুরমনীব জীবনাদর্শ' সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করলেন। এই সভাটি নিউইয়র্কের শিক্ষিত নারীদের সমাবেশ বলা চলে। সকলেই আগ্রহভরে বক্তৃতাটি শুনলেন। কৌতুহলী হয়ে বহুক্ষণ যাবৎ সিস্টারকে নানাবিধ প্রশ্ন করলেন। ভারতীয় রমনীগণের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী শ্রবণ করে, তাঁরা সকলে আনন্দিত হলেন।

২৩শে জুন স্বামিজী 'গীতা'' সম্বন্ধে ক্লাশ করলেন। পরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হল ''শক্তিপূজা'' আর সন্ধ্যায় নিবেদিতা বক্তৃতা দিলেন (২৪শে জুন) ''ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা।''

নিউইয়র্কে স্থায়ী বেদান্ত সমিতি গঠিত হওয়ায় ও স্বামিজীর বহু অনুরাগী বন্ধুবান্ধব থাকায় কাজের প্রচার, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক সফল হল। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বক্তৃতায় (নিবেদিতার) ভারতের কাজ সম্বন্ধে বিশেষতঃ, উল্লেখ থাকায় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না ও ব্যক্তিত্বশালিনী এই নারী, ভারতের প্রতি অনুরাগবশতঃ জীবনের উৎসর্গের কথা প্রচারিত হওয়ায়, তাঁরা তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হলেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও কথাবার্ত্তা বলতে এলেন ও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, প্রকৃতই উহা শিক্ষাপ্রদ। যখন ২৮শে জুন তিনি প্যারিস উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন নিউইয়র্কবাসীগণ সত্যই দঃখবোধ করলেন। তারা চাইছিলেন আরও কিছুদিন, তিনি সেখানে অবস্থান করুন।

এখানে অবস্থান কালে নিবেদিতা একদিন, স্বামিজী পত্র লেখার বিষয়ে অযাচিত উপদেশ দিতে যাওয়া তিনি বিরক্তি প্রকাশে বলে উঠলেন : মনে রেখ, আমি মুক্ত, সর্ব্বদা মুক্ত। পরক্ষণেই দিব্যভাবে পূর্ণ হয়ে বললেন : আমার ইচ্ছা করে কর্ম্ম ও পৃথিবী, যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আর আমি হিমালয়ের নিভৃত ও শান্ত কোলে বসে, ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতে পারি।.... পাশ্চাত্যের লোক তোমরা, কোনকালে ধর্ম্ম প্রচার করতে পারনি। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ ধর্ম্মপ্রচার করে থাকে, সে কয়েকজন সাধু, যাঁরা মতলব করে কাজ করতে জানতেন না। যাঁরা মতলব এঁটে কাজ করে, তাঁদের দ্বারা কোন কালে ধর্ম্মপ্রচার হয়নি, হতে পারে না।''

নিবেদিতা নত মস্তকে সে তিরস্কার গ্রহণ করলেন। উপলব্ধি করলেন : ওঁকে পরামর্শ দেওয়া সত্যই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে সমস্ত দৃঢ়তা বিস্মৃত হয়ে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করে বললেন : মনে রেখো, তুমি মায়ের সন্তান।

৩রা জুলাই স্বামিজী নিউইয়র্ক থেকে ডিট্রয়েটে গমন করলেন। তুরিয়ানন্দজী তাঁর ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে কালিফোর্নিয়ায় যাত্রা করলেন। গুরুভ্রাতাকে আশ্রম প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়ে বিদায় নেবার সময় গম্ভীর স্বরে বললেন : যাও বীর। কালিফোর্নিয়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর, বেদান্তের পতাকা উড্ডীন কর। ভারতের চিন্তা-স্মৃতি থেকে নিজেকে মুছে ফেল। আদর্শ জীবন যাপন কর, জগজ্জননীর কৃপায় কৃতকার্য্য হবে।

প্রায় সপ্তাহ কাল অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করে ১০ই জুলাই ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে ২০শে জুলাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হল প্যারিসে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপলক্ষ্যে একটি ধর্ম্ম ইতিহাস সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। বৈদেশিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণের জন্য একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা স্বামিজীকেও আহ্বান জানালেন। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর প্যারিস যাত্রার ব্যবস্থা।

মিঃ ও মিসেস লেগেট এই উদ্দেশ্যে প্যারিসে যাবেন। যাত্রার পূর্ব্বে তাঁকে তাঁর অতিথি হবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এ প্রদর্শনী মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডকেও আকৃষ্ট করলো। তাঁরাও প্যারিসে যাত্রা করলেন। প্যারিসে জগদীশচন্দ্র বসুও সস্ত্রীক আসছেন, বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যোগ দিতে, খবর এলো। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে পা দিয়েছিলেন, তখন বসু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াতও করতেন নিয়মিত। তাঁরা আসছেন, তার উপর অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ প্রদর্শনীর বহুবিভাগের কার্য্য পরিচলনার ভার নিয়েছেন। নিউইয়র্কেই মার্চ্চ মাসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নিবেদিতার। তাঁর কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় জানা ছিল। আহ্বান করলেন প্যারিসে আসার জন্য। নানাদিক থেকে আকৃষ্ট করছিল প্যারিস। নিউইয়র্কে স্বামিজী আছেন, তাঁকে পরিত্যাগ করে আসার ইচ্ছা ছিল না। তবুও তাঁকে পূর্ব্বেই চলে আসতে হল অধ্যাপক গেডিজের অনুরোধে। ২৮শে জুন নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করে প্যারিস যাত্রা করলেন।

অধ্যাপক গেডিজকে সাহায্য করাই হবে তাঁর কাজ। পারিশ্রমিকের কিছু আশা ছিল কিন্তু তাঁর কাছে বড় হয়ে দাঁড়ালো অধ্যাপকের কর্ম্মকুশলতা। তিনি সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। তাঁর "রূপান্তর বাদ" থিওরীতেও আকৃষ্ট ছিলেন তিনি (নিবেদিতা)।

অধ্যাপক ছিলেন অসাধারণ কর্ম্মী। সেই কর্ম্ম কৌশল আয়ত্ত করার আগ্রহ, তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কাজে নেমে দেখলেন বাধা অনেক। প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর, অপরের নির্দ্দেশে কাজ করার পক্ষে তা একান্ত অন্তরায়। তাঁর কাজ : তালিকা নির্ম্মাণ, সূচীপত্র প্রণয়ন, বক্তৃতার রিপোর্ট নেওয়া ও রিপোর্ট তৈরী করা। তিনি মাসের মধ্যে একটি গ্রন্থাগার গোড়ে তোলাও ছিল একাজের একটি বিশেষ অঙ্গ।

অধ্যাপক চান, তাঁর চিন্তাকে নিবেদিতা নিজের ঢঙে প্রকাশ করেন। তিনিই নিজে তাঁকে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর সার্ব্বিক অধিকারের পরিবর্ত্তে, অনুনয় করে বললেন, নিশ্চয় আপনি পারবেন। অথচ তাঁর সে অনুনয় রক্ষার সম্ভাবনা, একেবারে নিরর্থক। তাঁর মন সৃষ্টিধর্ম্মী। সুতরাং রিপোর্টি তৈরীর কাজ হয়ে দাঁড়ালো প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অপরের মনের মত, প্রকাশ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সদুঃখে জানালেন, আমি রিপোর্টার হতে পারি না— আর রিপোর্টারের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেক চেষ্টায় অধ্যাপকের উজ্জ্বল ভাষণের টুকরোগুলি, ব্যাকরণের সিমেন্ট দিয়ে যা গড়া হল তা মোজায়েক, শুধু ঝক ঝকে কিন্তু পঙ্গু। একটা ধারণা দিয়ে, পুরোপুরি স্বাধীনতা দিলে, অধ্যাপক অনেক বেশী কাজ পেতেন কিন্তু নিবেদিতা জানতেন তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের কথা, নিজের চিন্তা অধ্যাপকের চিন্তার প্রতিধ্বনি হয় না। চরিত্রগত পার্থক্য, ক্রমেই ব্যবধান তৈরী করতে লাগলো।

আমেরিকায় মিঃ ওয়াটারম্যানের নির্দ্দেশমত ভারতীয় গল্পগুলি লিখতে গিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা স্বত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন— অপরের মনের মত করে লিখতে গিয়ে নিজের আনন্দ নষ্ট হয়েছিল, আবার যাঁর নির্দ্দেশে কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁরও মনপুতঃ হ্‌ল না। এখানেও সেই পুনরাভিনয়।

নিবেদিতাকে স্বামিজী বলতেন : নিজের মত করে, নিজের ভাব প্রকাশ কর।". তিনি নিজেও স্বাধীনতা থেকে কাউকে ক্ষুণ্ণ করতেন না। অধ্যাপক গেডিজের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝলেন, স্বামিজী মানুষকে স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী, যা তাঁর মনের ঔদার্য্য কত গভীর, তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলেন। তবুও তাঁরা উভয়েই পরস্পরের কাছে উপকৃত এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিলেন। গেডিজের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি ইয়ুরোপকে বহু পরিমাণে জেনেছিলেন। এই জন্যই ভারতকে জানবার কাজ, তাঁর কাছে বিশেষ উপযোগী হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় চিন্তাধারা তাঁর স্বচ্ছতা লাভ করলো।

The Web of Indian Life পুস্তকে অধ্যাপকের কাছে লব্ধ রচনাশৈলী প্রয়োগ করলেন। বহুদিন পরে অধ্যাপকের Sociological Method in History বই সমালোচনার সময়ে অকপটে তা স্বীকার করলেন : গেডিজ এক নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক।

নিবেদিতার ক্ষিপ্রতা ও কর্ম্মকুশলতায়, গেডিজের কাজ পরিচালনার যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলেন। তিনিও তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন "এই ক্রম বিকাশের প্রণালীগুলি আয়ত্ব করে, সেবিষয়ে অনুশীলন করে, ভারতীয় সমস্যায় তা প্রয়োগ করতে আগ্রহী হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের ঘরের ছাদের চিলেকোঠায় আশ্রয় নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর উদার ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি অনুরাগ ও কৃচ্ছতাপূর্ণ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সঙ্গে ওই পরিবেশ সেদিন সহজেই খাপ খেয়েছিল।"

অবশ্য মতান্তর ঘটলেও কাজ তিনি ছাড়েননি। উদ্দেশ্য ছিল গেডিজের 'রূপান্তর বাদ' আয়ত্ত করা।

আগষ্ট মাসে সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু প্যারিসে এসে পৌঁছলেন। গেডিজের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় উভয়েই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে, তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয় প্রদানে সকলকে চমৎকৃত করলেন। প্রতি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত এ আবিষ্কার অভিনব, বিস্ময়কর। স্বামিজীও, জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নীর প্রশংসায় মুখর। তাঁরা মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি।

প্যারিসে প্রথমে লেগেটদের বন্ধু জেরাল্ড নোবেলের বাড়ীতে কাটালেন স্বামিজী। পরে লেগেট দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরে বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও দার্শনিক মসিয়ে জুল বোয়ার সঙ্গে অবস্থান করলেন। লেগেট দম্পতির প্রাসাদোপম বাসভবন। নিত্য গুণীগণের সমাবেশে মুখর। বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনায় স্বামিজী আনন্দ উপভোগ করলেন।

এখানে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হত। বিদ্বৎসমাজের সংস্রব, তাঁরও আনন্দের বিষয় ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলেন স্বামিজীর মানসিক পরিবর্ত্তন। তিনি যেন সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। নিবেদিতার মনে নতুন অশান্তির সৃষ্টি হল।

১৮/৪/১৯০০ স্বামিজী চিঠি লিখলেন ম্যাকলাউডকে, কর্ম্মকরা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর জো, চিরদিনের জন্য যেন আমার কাজের প্রবৃত্তি ঘুচে যায়! আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিশে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন। লড়াইয়ে হারজিত দুইই হয়েছে, এখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেই মহান মুক্তি দাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। "অব শির্ব পার করো মেরী নেইয়া"— সেই উদাসীনতা, তাঁর শ্রান্ত দেহমন, বিশ্রামের প্রয়োজন। অন্তরে মুক্তির আনন্দ। কর্ম্ম আপনিই খসে পড়ছে।

প্যারিসের ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে স্বামিজী বক্তৃতা দিলেন। ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভ্রান্ত ধারণা সমূহ প্রবল যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করলেন।

বিদ্বৎসমাজে যেমন চলাফেরা, মেলামেশা করছেন, সকল বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, নোতুন করে ফরাসী ভাষা শিক্ষায় মন দিলেন, কিন্তু তার পত্রের সুর বুঝিয়ে দেয়, সকল কিছু থেকে মন গুটিয়ে নিচ্ছেন, সর্ব্বত্রই যেন বিদায় কামনা!

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য স্বামিজী উৎগ্রীব হয়ে পড়লেন। স্থির করলেন : প্রদর্শনী শেষ হলেই ভারতে ফিরে যাবেন। নিবেদিতার কাছে এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁর কার্য্যক্রম সম্বন্ধে এই উদাসীনতা, বেদনাদায়কবোধ হল। তাঁকেই পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করে জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন, সেখানে প্রতিপদে তার সাহায্য বা সহযোগিতার আশা এখনও তিনি ত্যাগ করেন নি। নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজ নয়! একথা তিনি ম্যাকলাউড কে লিখেছিলেন : তোমরা কাকে নৈর্ব্যক্তিক বল, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমার মনে হয় 'নৈর্ব্যক্তিক'ও 'ব্যক্তিমূলক' দুটি কথাই আপেক্ষিক। যখন কেউ নৈর্ব্যক্তিকের কথা বলে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে যা, তার কাছে নিতান্ত ব্যক্তিগত, তাই বলে যায়। সুতরাং স্বামিজীর ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা —অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া নিবেদিতার পক্ষে কঠিন। মনে বার বার পাক খেতে লাগলো : যাঁর অভিপ্রায়কে সফল করার জন্য প্রাণপাত করছেন, তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতির আশা করাটা কি সঙ্গত নয়?

দ্বিতীয়ত, বসু দম্পতির সঙ্গে নিবেদিতার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর। বীরত্ব ও প্রতিভার সহজাত আকর্ষণ, তাঁকে অধ্যাপক বসুর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় হিন্দুভাব ধারা গ্রহণের ও যথার্থরূপে ভারতকে দেখার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে, এই চিন্তায় স্বামিজী তাঁকে ব্রাহ্মসমাজ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। অথচ নিবেদিতার প্রবল আগ্রহকে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করাকে যুক্তিযুক্ত হবে না, বলে স্থির করে নিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল : সত্যকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া। কে, কিভাবে, এটা কতখানি গ্রহণ করবে, তা শিক্ষার্থীর উপর ছেড়ে দেওয়াকে তিনি সমীচীন স্থির করেছিলেন।

শাসককুল বিদেশী। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য শাসিতদেশবাসীকে হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করার জন্য, যেকোন হীন উপায় গ্রহণই ছিল সে সময়ের নীতি। ডক্টর বসু, ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার ব্রতী। তাঁর সাধনাকে পিষ্ঠ করার সরকারী নানা ষড়যন্ত্র, নিবেদিতাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ও তাঁর পরিবারভুক্ত সকলেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বিজ্ঞান-সাধকের প্রতি। বৈজ্ঞানিক সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠিত করাটা তাঁর অন্যতম কর্ত্তব্য বলে স্থির করে ফেলেছিলেন। এবং আজীবন তা পালনও করে গেলেন। ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সঙ্গে অধিক মেলামেশা ছিল তাঁর (স্বামিজী) অনভিপ্রেত, ভাল করেই তা তিনি জানতেন। স্বামিজীর বর্ত্তমান এই ঔদাসীন্য তার পরিণতি বলেই স্থির করে নিলেন। অধ্যাপক গেডিজের সঙ্গেও মতান্তর ক্রমশঃই বেড়ে চলেছিল। এখন তিনি কি করবেন? স্থির করলেন, স্বামিজীকে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয় জানানো উচিত। তাঁর সঙ্গে প্রত্যহ দেখা হয়, কিন্তু মনের কথা খুলে বলতে পারেন না। চিঠি লিখে জানালেন সব। তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস, অনুযোগ ও সেইসঙ্গে তাঁর আদেশের প্রার্থনা করলেন। আরও চাইলেন, সর্ব্বোতভাবে তাঁকে তিনিই পরিচালনা করুন। আদেশ দিন, সহানুভূতি দেখান। এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ না হওয়ায় ক্ষোভে, দুঃখে হৃদয় তার পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পত্রের উত্তর পেলেন তিনি। স্বামিজী লিখেছেন :

প্রিয় নিবেদিতা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। আমার প্রতি সহৃদয় বাক্যের জন্য বহু ধন্যবাদ।.... এখন আমি স্বাধীন, যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্ত্তৃত্ব বা পদ আমি রাখিনি। সভাপতি পদও আমি পরিত্যাগ করেছি।

এখন মঠ প্রভৃতি আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেছে। ব্রহ্মানন্দ অধ্যক্ষ হয়েছেন, পরে প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর পড়বে। সমস্ত বোঝা মাথা থেকে নেমে যাওয়ার আনন্দ বোধ এখন করছি। এখন আমি সত্যই সুখী। .... আর আমি কারও প্রতিনিধি নয়, কারও কাছে দায়ী নয়। এতদিন বন্ধুবর্গের কাছে আমার যে বাধ্যবাধকতা বোধ ছিল, তা যেন এক দীর্ঘস্থায়ী অস্বাস্থ্যতা। বিশেষ চিন্তা করে দেখলাম কারও কাছে আমার কোন ঋণ নেই। প্রত্যুতঃ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে আমার সমস্ত শক্তি সকলকে দান করেছি। প্রতিদান স্বরূপ পেয়েছি আস্ফালন, অনিষ্ট চেষ্টা, বিরক্তি ও জ্বালাতন। এখানের অথবা ভারতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।

তোমার পত্র পড়ে মনে হল, তোমার ধারণা,— তোমার নূতন বন্ধুদের প্রতি আমি ঈর্ষান্বিত। কিন্তু চিরদিনের মত জেনে রাখ, অন্য যে কোন দোষ আমার থাকুক, জন্ম থেকেই আমার ভেতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্ত্তৃত্বের ভাব নেই।.... পূর্ব্বেও আমি কখনও তোমাকে আদেশ করিনি, এখন কোন কাজের সঙ্গে যখন আমার সম্পর্ক নেই, তখন তোমাকে নির্দ্দেশ দেবারও কিছু নেই। কেবল জানি যতদিন সর্ব্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা করবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালনা করবেন।

তুমি যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ, তাদের কারও সম্বন্ধে আমার কখনও ঈর্ষা হয়নি। কোন বিষয়ে নিজেদের জড়িত করার জন্য আমার গুরুভ্রাতাগণকে আমি কোন সমালোচনা করিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জাতিদের এই এক অদ্ভুত স্বভাব যে, তারা নিজেরা যা ভাল মনে করে, অপরের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে। তারা ভুলে যায় যে, তাদের নিজের পক্ষে যা ভাল, অপরের পক্ষে তা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয় ছিল নূতন বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসায় ফলে তোমার মন যেদিকে ঝুঁকবে, তুমি অপরের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখনও কখনও তোমাকে বিশেষ বিশেষ প্রভাব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। অন্য কোন কারণ নাই। তুমি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামত চল, নিজের কর্ম্ম বেছে নাও, ... মিত্র হোক, শত্রু হোক, সকলেই মায়ের হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ, দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষয় করবার সাহায্য করে। সুতরাং মা সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। (২৫/৮/১৯০০)

এই চিঠি পেয়ে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের লাঘব তো হলই না,- বরং বেড়ে গেল। স্বামিজীকে কোন অপ্রিয় বাক্য তিনি বলতে চান নি। তাঁর জীবন তো স্বামিজীর কাছে সমর্পিত। কেন তিনি আদেশ করলেন না? যে সকল কথা, কল্পনা করে তিনি দুঃখ পাচ্ছিলেন, লিখতে বসে নিজের অগোচরেই কোন ফাঁক দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। মনে হল এ তার নিজের অহংকারের অভিব্যক্তি। সাধনার এখনো অনেক বাকী। অহঙ্কারই, তাঁর সকল কাজে সফলতার প্রতিবন্ধক। অতীতে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল, এবারও তাঁকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে, তা যেন বুঝেও বুঝতে চাইলো না। স্বামিজী কি বারবার বলেন নি কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন? যে কর্ম্ম মায়ের কর্ম্ম, স্বামিজীর কর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছেন, তা সাধনের দায় তাঁর নিজের। অন্তর্দাহ, ঘটবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। স্বামিজীর পত্রের সুরও প্রায় অনুরূপ।

নিবেদিতার অন্তরের দ্বন্দ্ব, কাতরতা, ও দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর অবসন্নতা মিসেস বুলের অগোচরে ছিল না। তিনি ভালবাসতেন নিবেদিতাকে। এক সময়ে তাঁকে স্বামিজী লিখেছিলেন : মার্গরেটের সাফল্য সংবাদে আনন্দিত। তাহার ভার আপনার উপরে অর্পণ করিয়াছি। এবং

নিশ্চিত জানি, আপনি তাঁকে দেখিবেন।" নিবেদিতার অশেষ গুণের জন্য মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড উভয়েই তাঁর প্রতি যথার্থ অনুরাগী ও দরদী ছিলেন। নিবেদিতাকে তিনি ব্রিটানীতে তাঁর গৃহে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করলেন।

৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে মিঃ ও মিসেস লেগেটের আবাসে একটি বৈঠক বসলো। বৈঠকটির নাম 'কংগ্রেস'। উপস্থিত স্বয়ং স্বামিজী, সারা বুল, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও প্যাট্রিক গেডিজ। অধিবেশন চললো ৩রা থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত! এরপরই তিনি প্যারিস ত্যাগ করে ব্রিটানী যাত্রা করলেন।

মিসেস বুলের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর ব্রিটানী যাত্রা করলেন স্বামিজী।

ব্রিটানীর অন্তর্গত লামিয়াঁ থেকে ছমাইল দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত পোরা গাইরেক একটি মনোরম ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রকৃতি উদার উন্মুক্ত পরিবেশ নিবেদিতার শ্রান্তদেহ ও মনের অবসাদ দূর করলো। কেবল, আহার, ভ্রমণ ও নিদ্রা। চারদিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবেষ্টনী, শহরের কোন আড়ম্বর নেই। লোকজনের মধ্যে কৃষককুল। দীর্ঘদিনের নিয়মানুবর্ত্তিতার ছাপ এদের মুখে। বৃদ্ধাদের মুখে কি কোমলতা ও মাধুর্য্য। কাঁধে ঝুলি, হাতে লাঠি, দল বেঁধে চলেছে ভিক্ষা করতে। করুণ দৃশ্য। কিন্তু মুখে প্রতিফলিত তাদের অন্তরের শান্তি। কঠোর জীবনেই তারা অভ্যস্ত। সাগর ও উন্মুক্ত আকাশ তাদের সঙ্গী। ভিক্ষায় তাদের লজ্জা নেই। মনে হল নিবেদিতার— এদের জীবনযাত্রা কত সহজ, সরল ও স্বচ্ছ! সমগ্র চিত্ত তাঁর শান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

কয়েকদিনের জন্য স্বামিজী মিসেস বুলের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। গুরুর সান্নিধ্যলাভে মনের ক্ষোভ দূরীভূত হল। উপলব্ধি করলেন : তাঁর অবিল স্নেহের বিন্দুমাত্র হ্রাস কোথাও নেই। সান্ত্বনা পেলেন নোতুন করে। স্বামিজীও তাঁর উদ্দেশ্য আশীর্বানী কবিতাটি লিখলেন (২২শে সেপ্টেম্বর) স্থির ছিল এবার ভারতে ফিরে যাবেন। নিবেদিতাকেও কর্ম্মপন্থা স্থির করতে হল।

আমেরিকার কাজ শেষ, নিবেদিতা এর পর যাবেন ইংলণ্ডে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কার্য্যপ্রণালীও অনিশ্চিত, যাত্রা করতে হবে তাঁকে একাই! স্বামিজীর সঙ্গে শীঘ্র দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

স্বামিজীও লক্ষ্য করেছেন তাঁর কিছু পরিবর্ত্তন। তার জন্য তাঁরও উদ্বেগবোধ হল। প্রথমতঃ দীর্ঘদিন স্বদেশে অবস্থানের প্রতিক্রিয়া, পুরানো সম্পর্কগুলি, বহু সময় নূতন সম্পর্ক স্থাপনের অন্তরায়, দ্বিতীয়তঃ বহু লোক তাঁকে কথা দিয়ে শেষ মুহূর্ত্তে তা রাখেনি।

ইংলণ্ড যাত্রার দিন স্থির। নিবেদিতা আগে যাবেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর তাঁর লতাপাদমণ্ডিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের দ্বারপ্রান্তে নিবেদিতা সহসা স্বামিজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। রাত্রের আহার শেষে নিজ কুটীরে যাবার পথে স্বামিজী তাঁকে আশীর্ব্বাদ জানাতে এসেছেন। নিবেদিতাকে দেখে স্বামিজী বললেন : এক অদ্ভুত রকমের মুসলমান সম্প্রদায় আছে। শোনা যায় তারা এত গোঁড়া যে, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে ঘরের বাইরে ফেলে রেখে বলে "যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তোমার মৃত্যু হোক, আর যদি আলি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, দীর্ঘজীবী হও। শিশুকে তারা যা বলে থাকে, আজ রাত্রে আমিও তোমাকে তাই বলছি, কিন্তু কথাটাকে উল্টে দিয়ে যাও, কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি, বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন সার্থক হও।

অবনত মস্তকে নিবেদিতা সে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করলেন। সর্ব্বপ্রকারে স্বামিজী তাঁকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু তাঁর করুণা তিলমাত্র কমেনি।

পরদিন সকালে তিনি (নিবেদিতা) যাত্রা করলেন। সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হয়েছে। স্বামিজী পুনরায় এলেন তাঁকে বিদায় দিতে। ইয়ুরোপে স্বামিজীর সঙ্গে তাঁর এই শেষ সাক্ষাৎ। ব্রিটানীতে

যানবাহনের অভাব। কৃষকদের পণ্যবাহী গাড়ীতে আরোহণ করলেন। কুটীরের বাইরের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন ঊর্দ্ধে হাত তুলে অভিনন্দন জানালেন।

আলো ফুটে উঠেছে চারদিকে। নিবেদিতা গাড়ীতে বসে পিছন ফিরে বার বার দেখতে লাগলেন তখনও দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। প্রাচ্যের অধিবাসীগণের কাছে এটা অভিবাদন নয় .আশীর্ব্বাদও।

এই আশীর্ব্বাদ চিরদিনের মত নিবেদিতার বুকে গাঁথা হয়ে রইলো।.....

নিবেদিতা তাঁর গুরুকে কি ভাবে চিনেছিলেন তার পরিচয় নীচের চিঠিগুলিতে পাওয়া যাবে:

২২শে নভেম্বর মিসেস ওলি বুলকে জানালেন : পাশ্চাত্যে তাঁর আগমন সূর্যোদয়ের মত কিংবা ঈশ্বরার্বিভাবের মত। তিনি যেন গতি ও শক্তির দুই পাখা ভর করে উড়ে এসেছেন।

২৫ শে নভেম্বর মিসেস বুলকে :

স্বামিজী যা ঠিক, ভারত সেই ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করেছে... মুক্ত পুরুষ রূপে। 'জনৈক আমেরিকান কথিত স্বামিজীর গোমাংস আহারের' গল্প এবং মাদ্রাজে সেই পরীক্ষায় কিভাবে উত্তীর্ন হয়েছেন সে কথা বললাম। সকলে তাতে অভিভূত হয়ে গেল। ভারত তার গোমাংসভোজী সন্তানকে তুলে নিয়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

৪ঠা ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে :

মধুর বা নিষ্ঠুর, স্বামিজী যাই বলুন, সব কিছুকে তোমার ভালবাসার মনোভাব, অধিকাংশের কাছে অচিন্তনীয় ব্যাপার। ভাল ও মন্দের মধ্যে ঈশ্বরের সমবিকাশের, সমদৃষ্টির, বেদনা বহনের এবং ঐ জাতীয় অজস্র জিনিসের একমাত্র ব্যাখ্যা ওঁর মধ্যে থেকে আমি করতে পেরেছি। কিন্তু অনেকেই ব্যাপারটাকে অবাঞ্ছিত মনে করে সরে গেছে।

কিন্তু মেরী হেল ও আমি আজ বিকালে একটি গুরুতর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। যে-লোকের স্বভাব বিষণ্ণ ও নৈরাশ্যময়, সে যন্ত্রণার উপর আধিপত্য, স্ফূর্তি বজায় রাখা ইত্যাদি। 'ক্রীশ্চান সায়েন্সের' সাধারণীকরণ নীতিতে সহজে বেড়ে উঠতে পারে, আর তোমার আমার মত উৎসাহী স্বভাবের মানুষের পক্ষে যে ভূমিকা নেওয়া যায় তাই নিয়েছি, তুমি নিয়েছ জীবনের ব্যর্থতাকে' ভালবাসার ভূমিকা, আর আমি যন্ত্রণাকে অর্চ্চনার। আমরা আমাদের বিপরীত অবস্থাকে কামনা করি। বুঝতে পারছ! মেরী হেল সম্বন্ধে যে কথা বলছি, অধিক তার সহনের শক্তিতেই সে মহান। কিন্তু ব্যাপারটা সে নিজে জানে না। সে 'ক্রীশ্চান সায়েন্সের' মামুলী নীতিতে আসক্ত, এবং আমাদের বিষয়ে বলে, আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। সে কিন্তু সদাই গৌরবময়।

খুব অদ্ভুত নয় কি দু'জন মানুষ (নিবেদিতা ও মেরী হেল) পাশাপাশি বসে স্বপ্ন দেখছে যে, একজনের প্রতি (স্বামিজীর প্রতি) ভালবাসার সূত্রে তারা পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, অথচ সেই একই ভালবাসা দুই রূপে দুই ধর্ম্মের মধ্যে দিয়ে দুজনের কাছে ভাব বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন স্বামিজীর ক্ষেত্রে সেই ভয়ঙ্করের অর্চনা কি তাঁর কাছে নূতন কিছু? আমার তা মনে হয়না। এখন মনে হচ্ছে, আমি তাঁর মধ্যে, একেবারে কোন একটা জিনিসের সম্ভাবনার অর্থ তিনি কিছু এটাকে পেয়েছিলেন তারই সঙ্কেত এবং আমি মনে করেছিলাম তার চাবি তিনি আমাকে দেবেন। পরে সে কথাই সত্য হল। ভয়ঙ্করের অর্চ্চনা ইদানীং আরও প্রবল হয়েছে অতীব অতীব। সম্প্রতি সেই 'চাবি' এবং পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন —কিন্তু সে জিনিষ তাঁর মধ্যে প্রথম থেকে ছিল। আমার প্রতিটি কথা সত্য তুমি বুঝবে, কিন্তু মেরী হেলের কাছে যখন বলি তখন তার পক্ষে স্বামিজীর অতি সহজ ও সাধারণ ভাবগুলির অর্থ বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এইসব বিরাট ভাবরাজির পাশে, সাধারণ জীবন কী যে সাধারণ মনে হয়, কি বলবো!

হিন্দুর সে বক্তব্য : শুদ্ধ আত্মা আর মুক্ত আত্মা, নদীতটে বাঁধা নৌকা আর সূর্য্যোলোকে দ্রুত ধাবমান নৌকা, ঘটনাচক্রে ও স্বার্থে বাঁধা জীবন, সর্ব্বোত্তমেরই সাধ্য পরম স্বাধীন জীবন।

কী সত্য কী গভীর ও সহজাত এই তত্ত্ব. স্তব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করি নিজেকে : আমি মুক্ত তা কি সত্য? একি সত্য যে আমি মুক্তই আছি চিরদিন, শুধু তা জানি না।....

অবশ্য মুক্তি পূর্ব্ব থেকে ছিল। কিন্তু আর একদিক থেকে সে মুক্তি পেয়েছি যেদিন আমাকে ও সারাকে ব্রহ্মচারিনী করা হয়েছে। তুমি যেহেতু আগে থেকেই মুক্ত আছ, তোমাকে তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়নি।

১৫ই ডিসেম্বর, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

বালক ত্যাগানন্দ আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল। সে বলল স্বামিজীর বহির্জীবনের বিষয়কে কিছুই মনে করতে পারছে না কেননা তাঁর কাছে থাকার সময়ে সে সর্ব্বসময় সচেতন থাকতো যে, সে ঐশী শক্তির সান্নিধ্যে রয়েছে।

১৫ই ডিসেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

'মিসেস বেল' এর বাড়ী থেকে চিকাগো, শুক্রবার।

আমাদের প্রিয় পিতা,

সারাদিন আপনার কাছে চিঠি লেখার ইচ্ছার আনন্দে আছি। গতরাত্রে এত ক্লান্ত ছিলাম যে একটি শব্দও লিখতে পারিনি।

মেরী খুড়ী আমাকে শিকড় সুদ্ধু তুলে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন। একেবারে বিলাসের মধ্যে, কয়েদিনের জন্য এবং এখানে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝলাম গতকয়েক সপ্তাহ আমি কি রকম গুরু গম্ভীর হয়ে কাটিয়েছি। বুঝলাম হাসি কি উপাদেয় জিনিস! বুঝতেই পারছেন মিস হ্যারিয়েট ম্যাকিগুগুলি এখানে আছেন।

তারপর মেরী খুড়ী ডিনারে রইলেন, সন্ধ্যাটা কাটালেন। সুন্দর লাগলো আজ তাঁর জন্মদিন।

সোমবার সকাল।... আমি কি আপনার খুব বদ মেয়ে নই— আমার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতার কাছে? তবে শুনেছি পিতা আমার খুব দরিদ্র নন, আর ইদানিং বৃদ্ধও নন; তিনি নাকি রীতিমত তরুণ আর উৎফুল্ল ক্রীড়াশীল হয়ে উঠেছেন সত্যি! সুতরাং পিতা, প্রতি হাত আমরা কোন না কোন পুরাতন প্রবাদ উল্টে ব্যবহার করি, সেটা এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে : যখন ইঁদুর থাকে দূরে, তখন বেড়াল নাচে জোরে! স্বামিজী- স্বামিজী- স্বামিজী- যদি— কথাটা সত্য হয়- হয়- হয়। যদি মা আপনার স্বাস্থ্য ফিরে দেন, নিজেকে আবার শরীরে শক্তিমান বলে অনুভব করতে পারেন, যে ভার বইতে চাইছেন, তার সামর্থ্য পেয়ে যান, তাহলে এ জীবনে আর কিছু চাইনা। শুধু, মা যেন আপনাকে পুরাতন গহ্বরে পুনরায় নিক্ষেপ না করেন। আমার মস্ত আশা, তিনি তা করবেন না। পরের শনিবার পর্য্যন্ত এখানে আছি। ঐদিন, যারা জমেছে এখানে তাদের যে যার জাগায় চলে যাওয়ার কথা। আমিও নিজের আস্তানায় ফিরে যেতে পারবো। অতীব চমৎকার সময় কেটেছে, এর দ্বারা মেরীর মত অন্যদেরও বিশেষ করে জানবার সুযোগ হয়েছে বলে। ইসা বেলকে, অপর তিনজনের মধ্যে, আমার উপর সবচেয়ে সহানুভূতি সম্পন্ন মনে হল, যেটা আমার আশার অতীত ছিল।

কিছু মহিলা একদিন এসেছিলেন কনভেন্ট সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তাঁদের একজন বললেন, আমি কখনও ক্যাথলিক হতে চাইনি। তবু কোন একটা কনভেন্টে প্রবেশ করার কামনা করেছি সারাজীবন, সে কথা প্রকাশের কখনো চিন্তা করিনি। কার্যগতিকে বিয়ে করলাম, এখন দুটি শিশু নিয়ে আমি বিধবা। ভারতে বাল্য বিধবাদের বিষয়ে সেদিন রাত্রে আপনি কিছু বলেছিলেন তার দ্বারা গোটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হয়েছে, আমার প্রতি নিজের প্রতি অসন্তোষের রূপও। অপর মহিলাটি এখনও বিবাহিত নন, তিনি বললেন, আমি বৈরাগ্যের বিষয় জানতে চাই আমাকে কিছু বলুন। আমি তাদের দুজনকেই বললাম, কিভাবে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের

পূর্ব্বে কিছুই বিশ্বাস করতাম না, কিভাবে সেদিন আমি কেবল একটি শব্দই শুনেছিলাম— 'বৈরাগ্য'। কিভাবে আজ পর্য্যন্ত ঐ শব্দটি ছাড়া, আর কিছু না শুনে চলেছি। আমরা উভয়ে সে মুহূর্ত্তটিকে কল্পনায় দেখেছি, তা যেন মনে হল আমার কাছে এসে গেছে : ঐ শব্দটির জন্য প্রতীক্ষমান সত্তাগুলির কয়েকটি, যেন সে সংকেতে সাড়া দিয়েছে। ছোটো খাটো মানুষটি প্রিয় মিসেস অ্যারো, এ নিয়ে এমন হৈচৈ তুলেছেন যে, ব্যাপারটার যৌক্তিকতা বোঝাতে আমাকে গভীরে প্রকাশ করতে হচ্ছে। আমি তাঁকে ভালবাসি আর আপনার সুন্দর চিঠিটি (বৈরাগ্য) শব্দটির উপর স্থায়ীত্বের সেই মুকুটখানি।

আপনার কন্যা

মার্গট

.... অভয়ানন্দের চিঠি স্বর্গীয় না কি? ইশাবেল আপনাকে হৃদয় ভরা ভালবাসা পাঠিয়েছে।

৬ই মে ১৯০০ মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন :

এখন এখানে। হ্রদের দিকে চোখ মেলে আছি। নত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে নিম্নের বৃক্ষশীর্ষের উপর দিয়ে। কয়েকদিন এখানে আছি। মিসেস কুনালী ওয়ার্ডের সঙ্গে বাস করছি। বিরাট জানালার পাশে একাকী বসে। Pavlo এবং Francesca পড়ছি ঘণ্টাখানেক। কী সুন্দর। স্বামিজীর মুডকে যে আমি নিজের মধ্যে অনুভব করছি! যে মুড থেকে তিনি বলেন : আমরা সকলে, এই বিশ্বসৃষ্টি, এমনকি ঈশ্বর পর্য্যন্ত, শব্দের অর্থ বিকাশ ছাড়া কিছু নয়। একদিন আমি মুক্তিতে উত্তীর্ণ হব, তখন নিশ্চয় জানি, এক বিশাল ধ্বনি আমার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। সেদিন আমার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বাক্যে, স্ফুরিত হবে মানবপ্রাণ। তখন আর কাহিনীর চারিদিকে, ছবির মাথা গেঁথে যাওয়া নয়, তখন প্রতিটি দৃষ্টি ঝলকে চকিত অভ্রান্ত বেগে আবর্ত্তিত হবে জীবননাট্য পরিনতির দিকে যা দ্রুত ধাবিত। তার ওপরে আরও পরে একটি দিব্য শব্দ প্রতিমা, সুপ্রাচীন .... অথচ ভাব-গর্ভ বাণীমূর্ত্তি। যার মধ্যে সকল নাট্যের নিশ্চিত মহামিলন।

দেখছ, এখনো প্রতীক পূজক রয়ে গেছি অনন্ত অনির্ব্বচনীয়তাকে শব্দে প্রকাশের এই আকুতি!

চেয়ে দেখছি, নীল বিশাল জলরাশির অশান্ত ঊর্মি তরঙ্গ আমার জানালার কয়েক পা নীচেই যেন জলরাশি ছড়িয়ে আছে। নিষ্পত্র বৃক্ষশাখায় মাঝে মাঝে তাতে ছেদ পড়েছে, শাখাগ্রের কোরকের আঘাতে এখানে ওখানে কম্পমান বারি, সাদা পাখী, নীল জলের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে উত্তরে দক্ষিণে, দেখে মনে হচ্ছে মর্ম্মরিত বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়ে গলাগলি করে তারা ছুটছে।

তোমাকে শুনাব ভাবছি মুক্তির মহাদিনে তুমি কি চাইবে ! না, তুমি শব্দ চাইবে না, বিদারণ ধ্বনি নয় আমি জানি। তুমি কি চাইবে, সকলকে ভালবাসতে, হয়তো, কিংবা সকলের বেদনাভার... নিতে সকলের জন্য দগ্ধ হতে কিংবা চাইবে..... কোন ভিশন না দেখার অধিকার— এই হবে তোমার প্রার্থনা, যদি সত্যই নিজের জন্য কিছু চাইছ, এইভাবে আমি তোমাকে কল্পনা করতে পারি।

আমার এ স্বপ্ন খুবই স্বার্থপর, কি বল! কিন্তু শব্দের শক্তির মধ্যে এমন কিছু একটা রহস্যময় শক্তি আছে, যা আত্মাকে নাড়া দেয়– যেমন দুলছে এ সম্মুখের জলরাশি, বৃক্ষরাজি, যেমন পালভো ও ফ্রানসেসকো।

(স্বামিজীও ১৮৯৫ ১৯ জুন ছাত্রদের বলেছিলেন ঃ

নিউটেস্টামেন্টের 'জনের গ্রন্থখানি' নিয়ে ছাত্রদের বললেন— তোমরা সকলেই খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান শাস্ত্র নিয়ে আরম্ভ করাই ভাল -- জনের গ্রন্থারম্ভে এই কথাগুলো আছে :''আদিতে• শব্দ মাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিত বিদ্যমান ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম।'' হিন্দুরা এই ''শব্দকে

মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, কারণ এটা ব্রহ্মেরই শক্তি। যখন এই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা মায়াবরণের মধ্য দিয়ে দেখি, তখন তাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলে থাকি। শব্দের দুটো বিকাশ, একটা এই প্রকৃতি। এইটেই সাধারণ বিকাশ। আর একটা বিশেষ বিকাশ হচ্ছে— কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ।

১৮ই মে ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

গতরাত্রে একটা চমৎকার ভাব মাথায় উঠেছে। স্বামিজী কি অর্থে কালীপূজাকে মাতৃপূজা বলেন, তা তুমি জানো! আমি কালীকে সেই দৃষ্টিতেই ভাবছিলাম— এমন সময়ে মনে হল, একটি ক্ষুদ্র রক্তপথ তাঁতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তাঁর নিকটবর্ত্তী হবার চেষ্টা করলেই তিনি আরও পিছিয়ে যান, আরও আরও শেষে এক বিশাল ঘনকৃষ্ণ দ্বারে রূপায়িত হন। সেখানেই পথের শেষ। তারপরেই অনন্তের সমুদ্র। কালীই মৃত্যু।

তাঁর নাম স্মরণমাত্রে এখন ঐ বিশাল ঘনকৃষ্ণ দ্বারের ছবি আমার মনে জাগে।

৪ঠা জুন ১৯০০ নিউইয়র্কে স্বামিজী যে বক্তৃতা দিলেন :

আগে গিয়ে দ্বিতীয় সারির বাম প্রান্তে আসন নিলেন নিবেদিতা যে নিয়মে তিনি লণ্ডনে আসন নিতেন, যদিও তা তাঁর স্মরণে তখন ছিল না। স্বামিজীর আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। একটা বিরাট স্পন্দন, শিহরণ দেহমনকে দোল দিয়ে গেল। অনুভব করলেন : জীবনের এক পরীক্ষা মুহূর্ত্ত উপস্থিত। শেষবার যখন এইভাবে বসেছিলেন, তারপর কত কি এলো, গেল, কত কি ঘটলো! ব্যক্তিগত জীবন দাঁড়িয়ে কোথায়? হারিয়ে গেছে। পরিত্যক্ত পরিচ্ছদের মত ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া হয়েছে তাকে। ফলে এই মানুষটির চরনতলে নতজানু হতে পেরেছেন। ভুল হয়ে দাঁড়াবে কি তা মরীচিকায়? না তা হবে কি পরম নির্ব্বাচন? কয়েক মুহূর্ত্ত বাকী — তার পরে? ঘোষিত হল : তিনি এসেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন। শুরু করার আগে নীরবতা! সমস্তই অতি মহান এক স্তোত্রসঙ্গীত, এক সুবিশাল আরাধনা। অবশেষে কথা বললেন তিনি, খুশীতে, হাসিতে, ভঙ্গ সে নীরবতা।

আরম্ভ করলেন, অভেদ সর্ব্ববস্তুর একত্ব।.... সুতরাং সকল জিনিসের পরিণতি একত্বে। যাকে বহুরূপে দেখি— কাঞ্চন, প্রেম, দুঃখ, পৃথিবী সবই আসলে ঈশ্বর।..... বহুকে দেখি আমরা, যদিও যথার্থত বর্ত্তমান আছেন সেই এক বস্তুই।.... অভিব্যক্তির মাপের পার্থক্য অনুযায়ী, নামগুলির পার্থক্য হয়। আজকের জড়, আগামীকালের চেতনা। আজকের কীট, কালকের ঈশ্বর। এই যেসব পার্থক্যকে, এত সমাদরে আমরা বরণ করি, এসব কিছুই পরম ও চরম এক অস্তিত্বের অংশ মাত্র— সেই চরম ও পরম অস্তিত্বের নাম .... মুক্তি।

আমাদের সকল সংগ্রাম, মুক্তির জন্য। আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না - মুক্তি চাই। মানুষের জ্বলন্ত, অশান্ত, অতৃপ্ত-তৃষ্ণা আরো আরো আরো চাই। তোমরা আমেরিকান, তোমরা চাইছো আরও। গভীরে দেখলে এই বাসনা মানুষের অসীমত্বের দ্যোতক। অসীম মানুষ, একমাত্র তৃপ্তি পেতে পারে, অসীম কামনায় এবং অসীম প্রাপ্তিতে।

অপরূপ বাক্যগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আছড়ে পড়তে লাগলো। সকলে উত্থিত হল অনন্তে, সাধারণ মানুষ হয়ে গেল আশ্চর্য্য শিশুর মত। যে শিশু আকাশের সূর্য্য, চন্দ্র তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় —শিশুদের খেলনা ভেবে।'

অসাধারণ কণ্ঠে বেজেই চললো :

অসীমকে সাহায্য করতে পারে কে?.... অন্ধকারের মধ্যেও যে হাত তোমার কাছে পৌঁচেছে, সে হাত তোমারই হাত, আর কারো নয়।

তারপর সেই বুকে বাণ বেঁধা সকরুণ বিলম্বিত যাতনা, পৃথিবীর অতি বড় লেখনীও যাকে আভাসে প্রকাশ করতে অসমর্থ, আমরা অনন্তের স্বাপ্নিকেরা, আমরা দেখবো সীমার স্বপ্ন হায়!'

আহা, কী ভুল তারা করে, যারা বলে কণ্ঠস্বর কিছু নয়, ভাবই সব। স্বরের উত্থান পতনেই শব্দের কবিতায় সঙ্গীতে সঞ্চার হয়, জীবনের হাটের কোলাহলে আনে মাত্রা ও যতি, সেই সঙ্গে যেন ধ্বনিত হয় গীর্জ্জার অর্ধালোকিত পার্শ্বদেশে কোনো এক স্তবমন্ত্র গান- সে সুর এসেছে, সে গান বেজেছে আজ এই প্রহরে।

অবশেষে— সব কিছু নেমে এল — থেমে গেল আর মিলিয়ে গেল একটি ভাবনায়; যদি এই অখণ্ড একত্ব মুহূর্ত্তের জনাও বিঘ্নিত হয়, যদি একটি পরমাণুকেও চূর্ণ করে স্থানচ্যুত করা হয় তাহলে আমি দেখতে পাব না, কথা বলতে পারবো না তোমাদের সঙ্গে, যে-আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কথা বলছি...... হরি ওঁ তৎ সৎ।

আর আমি! জীবন যে অনন্ত গভীর জিনিষ, আমাদের জন্য ধরে আছে, তার সাক্ষাৎ পেলাম। আগের মতই ঐ জায়গায় বসে শোনা। কিন্তু বুদ্ধির যে অস্থির জ্বালা, অভিনবের জন্য কম্পন-শিহরণ আর নয়!

ঐ যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন ওঁর মুঠিতে ধরা আমার জীবন। তিনি একবার যখন আমার দিকে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টিতে দেখলাম লেখা আছে— যে লেখা আমার হৃদয়েও, পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আদর্শের স্থায়ী বোধ, ভাবাবেগ নয়।

৯ই জুন ম্যাকলাউডকে জানালেন :

তোমাকে চিঠি পাঠিয়ে অন্য কাজ করার জন্য বেরিয়ে তুরীয়ানন্দের কাছে হাজির হয়ে শুনি — স্বামিজীর দেড়টায় আসার কথা। তিনি এলেন। বিকালটা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে অনেকখানি হেঁটেছেন, বাইরে ক্লান্তির সামান্যতম লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু তাঁর অসুখ ছিলই। ছোট একটা অপারেশন হয়েছিল, যেটা সম্পূর্ণ সারেনি এখনো। টাকাকড়ির ব্যাপারে খুবই সতর্ক, প্রতিটি পেনী পর্য্যন্ত বুড়ো কৃপণের গুণে গুণে খরচ করছেন দেখে হেসে বাঁচি না!

২৪ শে জুন ম্যাকলাউডকে জানালেন :

ধীরা মাতাকে (মিসেস ওলি বুল) অতি মিষ্টি এক চিঠি পাঠিয়ে আমার আমেরিকাবাসের ইতি করেছি বর্ত্তমানের মত। স্বামিজীর ভাগ্য কিভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে,— তাঁকে তা লিখেছি। স্বামিজীকে দেখাচ্ছে দেবতার মত কিংবা শ্রেষ্ঠ দেবদূত গেব্রিয়েলের মত। এর দ্বারা ধীরামাতা অনুমান করে নেবেন, সারা পৃথিবীর মাথা স্বামিজীর পদতলে আনিত।....

য়ুম, য়ুম— এসব কথাই সত্য, অতিসত্য। তিনি যেরূপে এখন দৃশ্যমান- তাতে সারা পৃথিবীর কিছুই তার প্রতিরোধ করত পারবে না। সত্যই ঐশ্বরিক। আজ সকাল এগারোটায় মাতৃপূজার বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ তোমরা পাবে সেটার নোট নেবার জন্য যদি ১০ ডলার করচ করতে হয়.... তবুও। বিরাট ঘটনা হবে। তার সামনে কেউ একজন বক্তৃতার বিষয়টি প্রস্তাব করলেন। তিনি ফিরে হাসলেন : মাতৃপূজা? ঠিক। ঐ বিষয়েই বক্তৃতা করতে গভীর আনন্দ পাব। সেই পুরানো জ্যোতির্ম্ময়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, মুক্ত স্বরূপ।

সেদিন সকালে তিনি ৩৪তম রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিছু সংবাদ নিয়ে। আমি যে পরামর্শ দিলাম তা তাঁর অনুচিত মনে হল। আহা য়ুম। যদি তাঁর চেহারা তখন দেখতে। এমন একটা ঝলক দেখতে দুষ্টুমি করাও চলে। তিনি বললেন- মনে রেখো! আমি মুক্ত! মুক্ত! মুক্ত - হয়ে জন্মেছি!" তারপর মার কথা বলতে লাগলেন--- কিভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন, তার কথা। পৃথিবী চূর্ণ হয়ে যাক, কিন্তু তিনি হিমালয়ে ধ্যানমগ্ন থাকবেন। ইয়ুরোপীয়রা কখনই ধর্ম্মের প্রচার করতে পারেনি কারণ তারা সব সময় পরিকল্পনা করছে। তারই মধ্যে দু'একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী শুধু ধর্ম্মের কাছে পৌঁছেছে। তিনি নন, মাই সব করেন। মা যাই করুন, সবই সমান বাঞ্ছনীয়। একদা শিব উমার সঙ্গে কৈলাসে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ উঠে

পড়লেন. উমা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন. আমার এক ভক্ত প্রহৃত হচ্ছে, তার সাহায্যে আমি যাচ্ছি। পরমুহূর্ত্তে ফিরে এলেন। উমা তখন ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, আমার সাহায্যের দরকার হবে না--সে নিজের সাহায্য নিজেই করেছে'

তারপর তিনি যাবার আগে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন. ঠিক, ঠিক মায়ের সন্তান। 'আমি সরে গিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললাম- কেন জানি না মনে হল. সেটি একটি মহাক্ষণ!

৩০ জুন বললেন : প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে-- একটি হচ্ছে ভাব, দ্বিতীয়টি ঐ ভাবদ্যোতক শব্দ--- আমাদের এই দুটিকেই নিতে হবে। কি আইডিয়ালিষ্ট কি মেটিরিয়ালিস্ট কারও মত খাঁটি সত্য নয়। ভাব ও তার প্রকাশ, দুই-ই আমাদের নিতে হবে।

১২ই জুলাই বললেন : এই জগৎ-প্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এইভাব প্রকাশক শব্দরাশি মাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করতে পারি, আবার নাশ করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের কর্ম্মীদের মত এই যে, শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন : আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টিকর্ত্তা। শব্দ বিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে আর তার ফল দেখা যাবে। মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন, ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি।')

১৫ই জুলাই :

আজ সকালে গীতার উপর পাঠ অপূর্ব্ব। শুরু হয়েছিল সর্ব্বোচ্চ আদর্শ সকলের জন্য নয়---এই বিষয়ে সুদীর্ঘ ভাষণসহ। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত সাধু ক্ষত থেকে স্খলিত কীটটিকে পুনরায় ক্ষতে স্থাপন করে বলেছিলেন, ভ্রাতঃ তোমার আহার্য্য তুমি গ্রহণ কর। এই জিনিষ যার কাছে বীভৎস ও অশ্রদ্ধাকর, তারজন্য অপ্রতিরোধের আদর্শ নয়। অপ্রতিরোধ বা অহিংসা পালন করতে হয় ক্রুদ্ধ শিশুর প্রতি মায়ের ভালবাসার মনোভাব নিয়ে। কাপুরুষ যখন অহিংসার অভিনয় করে কিংবা সিংহ তা করে মুখব্যাদান করে, তখন ব্যাপারটা নিতান্ত হাস্যদ্দীপক হয়ে ওঠে।

এস, আমরা খাঁটি হই। আমাদের প্রাণশক্তির শতকরা ৯০ ভাগ খরচ হয় আমরা যা নই, অন্যের কাছে নিজেদের সেইভাবে তুলে ধরার চেষ্টায়। আমরা যা হতে চাই, তাই হওয়াব চেষ্টায় ঐ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত। এইভাবে কথা বয়ে চললো এক অবতারের কাছে নমস্কার দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল।

তোমাকে নমস্কার. ব্রহ্মাণ্ডের তুমি গুরু,
যাঁর পাদপীঠ পূজিত হয় দেবগণের দ্বারা।
অখণ্ডাত্মা তুমি.
তুমি ভবরোগবৈদ্য,
তুমি দেবগণেরও গুরু,
তোমাকে নমস্কার করি,
তোমাকে নমস্কার ... নমস্কার... নমস্কার।

ভারতীয় সুরে এই স্তোত্র স্বয়ং স্বামিজীর কণ্ঠে!

সমস্ত ভাষণটির মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছিল : খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের পশ্চাদগামী। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সর্ব্বোচ্চ কৃষ্ণ সব কিছুর ধ্রুব রূপকে দেখেছেন সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বাংশে, বিরোধী আদর্শ-সমূহকে নিয়েই। যাঁরা স্বামিজীর এই চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। স্বামিজী সরবে বলে উঠেছিলেন : 'দি সারমন অন দি মাউন্ট' মানুষের আত্মার উপরে নূতনতর আর একটি বন্ধন।''

এখানকার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে স্বামিজী, জীবনকে তার বাস্তবরূপে বুঝে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের মনোভাব দেখাচ্ছেন। এটা নয়, এটা নয় মনোভাব কম দেখাচ্ছেন তিনি; বেশ ফুটেছে 'এই দেখছি, যার পরিণতি এই' মনোভাব।.....

মধ্যাহ্ন ভোজের পরে বাংলা কবিতা বিষয়ে বললেন। তারপর জ্যোতিষ বিষয়ে। আকাশের তারা কারা? কি চোখের ভ্রম? খেয়ালী সন্দেহ হাজির করলেন সে বিষয়ে! কেননা, মনুষ্য অধ্যুষিত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী থেকে, যেমন পৃথিবীসমূহের অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব, আমাদের কাছে কোন সংকেত তার ক্রমে পৌঁছায় না কেন?

হিন্দুশিল্পের উদ্ভট চেহারা প্রসঙ্গে কারণ দেখিয়ে বললেন : এর মূলে আছে আত্মিক চেতনাকে, দেহবস্তুতে পরিবেশনের জাতীয় প্রবণতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, অধিকাংশ দেহগত বা বস্তুগত জিনিষের আত্মীক প্রতীক রয়েছে, বস্তুর বাইরের চেহারার তুলনায় প্রতীকের চেহারা নিতান্ত পৃথক ও উদ্ভট। গতকাল বললেন · শিশুকালে সচেতনভাবে ঘুমোতে যাচ্ছেন, এ ব্যাপার প্রায় তাঁর ঘটেনি। রঙিন আলোর একটি গোলোক তাঁর কাছে আসত, সেটিকে নিয়ে, তিনি যেন সারারাত খেলতেন। কখনও কখনও সেটি তাঁর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফেটে যেত বিপুল আলোক ছড়িয়ে, আর তিনি হারিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রথমেই যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তার মধ্যে এবিষয়ে প্রথম প্রশ্নও ছিল : 'ঘুমোবার সময়ে তুমি কি কোন আলো দেখ? হ্যাঁ! তাঁর সবিস্ময় উত্তর : কেন, সবাই কি ঘুমোবার সময়ে তাই দেখে না?

সন্ন্যাসিদের মধ্যে একজন বললেন, এই অতি মানসিক বিষয়টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তাঁর মনঃসংযোগের ক্ষমতা, জন্মলব্ধ পরে অর্জ্জিত জিনিষ নয়। একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত, অভিজ্ঞতার প্রতিটি স্তরকে স্মরণ রাখায় স্বামিজীর সহজাত ক্ষমতা, অতিমানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধের সেই শেষ দর্শনেরই এক অংশ এটি, সন্দেহ নেই।

আমরা যখন শেষ প্রান্তে, তখন আর আমাদের অতীত অবতরণগুলির বিষয়ে জানতে চাইব না। ম্যারিয়া, টেরেসা, পেট্রাক এবং লরার কোন তাৎপর্য্যই আমাদের কাছে থাকবে না। কিন্তু আমাদের উপলব্ধির পর্য্যায়গুলির মূল্য বজায় থাকবে। এই জিনিষটি তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। আমি এখন তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনছি; সবকিছুই বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এত স্বতঃসিদ্ধ লাগছে, যা ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্রে অ· 'পনীয় মনে হয়। আমি নিজেকে বলি : অতীতে কী না কালো মেঘ আমাকে ঢেকে রেখেছিল? এত অন্ধ আর অজ্ঞান কেউ হতে পারে? তুমি যখন আমাকে কঠিন ও শীতল ভেবেছিলে ঠিকই ভেবেছিলে। আমি নিশ্চয় তাই ছিলাম এবং তা হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে অনুভূতিকে বর্জ্জন করে শুধু মনের দ্বারা কোন জিনিষকে দেখার ধারাবাহিক চেষ্টার জন্য।

স্বামিজী এখন ভক্তি ও আবেগের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর, তাঁকে তাড়াতে হবেই বলেছেন তিনি। কিন্তু যে-ভূমি থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, সেখানে মন ও হৃদয়ের কি অসাধারণ একত্ব! যেহেতু তাঁর মন ও হৃদয় উভয়ই পূর্ণ বিকশিত, তাই কোন একটিকে বাদ দিয়ে চলতে অসুবিধা হয়না..

১৩ই অগষ্ট মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন :

বুদ্ধ বলেছিলেন, জীবন তার মূল স্বভাবে নরক। জীবনের অনেকখানি পথ না মাড়িয়ে মানুষ কেন এ কথা উপলব্ধি করে না, তা বুঝতে পারিনা। যৌবনে কেন আশার সোনার স্বপ্ন, সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে! বহু বহুদিন আগে কি বুঝতে পারা যায়নি যে, সহসা বিস্মিত করে দিয়ে ঐ জ্ঞান বর্ষিত হবে! ব্যক্তিগত কষ্টের জন্য জীবনের রূপকে ভয়ঙ্কর বলছি না, সে কষ্ট আমার কিছুই নেই। ভয়ঙ্কর হল, প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে মানুষের জীবন চূর্ণ করতে হয়। মিষ্টির দোকানে ভূতের মত খাটে কিছু লোকে, যাতে অন্যে সুখ পায়। এই হল সত্য চিত্র। ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত কামনা করতে পারি না, কোন কোন মানবিক কামনাকে নিপীড়িত না করে। এমন কোন আনন্দ,

আমাদের কাছে আসেনা যা যন্ত্রণায় পরিবর্ত্তিত না হয়। মানব জীবন নিত্য স্বর্ণক্রুশে গাঁথা আছে।

কোটিপতি সম্মোহিত হয়ে শুধু চেয়েই থাকে তার স্বর্ণভাণ্ডারের দিকে। তারপর দারুণ আতঙ্কে একদিন দেখে, সে সব কিছুই পাপের পুঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। এ ভীষণ দুঃস্বপ্নের কি ইতি নেই? 'স্থান' ধ্বংস হয় প্রলয়ে, তখন সব একাকার, কিন্তু কালের সমাপ্তি কোথায়?

কিন্তু এসবই তো শূন্য কথা মাত্র। আমাদের গভীরতম প্রকৃতিতে, স্বভাবের গহনে, গহনে, বাসনার শিকড় প্রবিষ্ট হয়ে আছে। মৃত্যু কি জীবনের মত? আমি ভাবতাম : আমি তাই জেনে গেছি। ভেবেছিলাম, ওকথা ভাবা খুবই সহজ। কিন্তু তা নয়। এমন কি সুখ ও দুঃখকে সমভাবে দেখতে পারি না। যেটুকু অংশে তা পারি, তার পরিনাম অতিক্ষুদ্র। শুধু কি একটি স্বপ্ন ভাঙতে হবে? হাজার হাজার স্বপ্ন না! পর্দার পর পর্দা সরাই - তার পিছনে উদঘাটিত হয় দৃশ্যের পর দৃশ্য। শক্তির লোভ জেগে থাকে, দূরতম দিগন্তে। সত্যে মানুষ পৌঁছাবে কি করে?

দম্ভ, পরচর্চ্চা, আত্মবিজ্ঞাপন, গর্ব্ব, অপরের সম্বন্ধে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা, কখনো মরে না। এগুলি হয়ত বিলাসবাসনার চেয়ে কম নোংরা কিন্তু এগুলিকে মারা বিশ হাজার গুণে শক্ত।

এসব কথা মনে আসছে কেন? জানি না। কিন্তু মন উন্মুক্ত করতেই হবে আমাকে।

আমরা যেন আলো আঁধারির কন্টক বনে আটকে পড়ে আছি— আমরা সকলেই! বের হওয়ার পথ নেই কোথাও। এই শূন্য প্রান্তরের আলেয়া হল, অপরকে সাহায্য করার স্বপ্ন, যা আমাদের নূতনতর প্রহেলিকার দিকে নিয়ে যায়। নরকের মধ্যে আনন্দ কিভাবে সম্ভব? আর যদি আনন্দ না থাকে, সাহায্যই বা থাকে কি করে? না পেতে চাইতে পারে মানুষ! (অন্ততঃ আত্মপ্রবঞ্চনা করে ভাবে সে পেতে চায় না!) কিন্তু দেওয়া স্বপ্ন যে মরে না! দেওয়ার কথা এখানে ছেড়ে দেওয়া যাক; কিন্তু অন্যের জন্য যন্ত্রণা সহন তো করা যায়! কী তুচ্ছ এই পরিকল্পনা। কিন্তু অন্যের জন্য সহনের আকাঙ্ক্ষা যে রয়েছে, তাই অনুভব করতে হবে! বিরাট একটা কিছু আছে। আমরা আমাদের অশক্তি ও নৈরাশ্যের মধ্যেও নিজের প্রেমের বিষয়ে সচেতন। আমাদের সচেতন হতে হবে, এই সমস্ত সীমাবদ্ধতার পারে কি আছে তার বিষয়ে! হয়তো তাই! কিন্তু তার রূপ জানি না। আমি নিজস্বভাবে সেখানে পৌঁছতে পারব না, যদি না স্বামিজী অলৌকিক শক্তিতে তা আমাকে দেন। সেটা এখন বেশ বুঝেছি।..... তিনি কি আমাকে তা দেবেন? হায়, ওগো মহীয়সী সারা! তোমাকে চুপি চুপি বলি তিনি দিতে পারেন না। আমি যে তাঁকে দিতে চেষ্টা করতে দেখেছি আগে। যদি পারতেন, আগেই দিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর আছে — এই দেবার শক্তি আছে। কিন্তু পাওয়ার ব্যাপারে, অনেকখানি যে নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করে। তা যে আমার নেই— সত্যই নেই। এমন দারুণভাবে কি আমি পেতে চেয়েছি, যার জন্য সবকিছু হারাতে প্রস্তুত? আমি কি মনপ্রাণ, সর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্য (আসল স্বাচ্ছন্দ্য: বহিরঙ্গ স্বাচ্ছন্দ্য ভিন্ন জিনিষ; বিছানা নরম হোক বা শক্ত হোক, নিদ্রাই আসল জিনিষ-সেটাই স্বাচ্ছন্দ্য), স্নেহ, মমতা এর জন্য বিসর্জ্জন দিয়েছি? ওঁরা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজী কি ত্যাগ করেছেন? কী না ত্যাগ করেছন?

স্বামিজী নিজে আমাকে বলেছেন, উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জ্বরের মত তাঁকে অধিকার করেছিল, তিনি যেখানে সে অবস্থাতেই থাকুন ঐ সংগ্রাম চলছিল চব্বিশ ঘণ্টা একটানা বসে, একই আসনে, তারই জন্য। এ আকাঙ্ক্ষা কার আছে?

মুখে এসব কথা বলা কত সহজ যে, আমি মুক্তি চাইনা, আমি সেবা করতে চাই, বলি দিতে চাই নিজেকে, সেবার প্রয়োজন যখন থাকবে না তখন আত্মাবলির কথাও উঠবে না তখনই মুক্তির সাধন করা যাবে।

এ চিঠির কথা কাউকে বলো না। এসব কথা কেন লিখে পাঠালাম নিজেই জানি না।.... এসব কথা গভীর বাস্তব ও অবাস্তব একই সঙ্গে— কি বল?

চিকাগো মহামেলার অনুকরণে প্যারী প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ধর্ম্মমহাসভাব অধিবেশন হবার কথা ছিল কিন্তু রোমান ক্যাথলিকদের আপত্তিতে তা সম্ভব হল না। ক্যাথলিক গোষ্ঠী-শিকাগো মহামণ্ডলীকে যোগ দিয়ে ছিলেন আপনাদেব ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টাও করেছিলেন, ফল অন্যরূপ হওয়ায়, তাঁরা বর্ত্তমানে সর্ব্বজনীন ধর্ম্মসভা আহ্বানের প্রতিবাদীরূপে দণ্ডায়মান হলেন। ফ্রান্সের অধিকাংশ অধিবাসীই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রদর্শনীব কর্ত্তপক্ষ তাঁদের উপেক্ষা করতে সাহসী হলেন না। স্থির হল : ধর্ম্মেতিহাস সভা আহ্বান করবেন। আধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনা নয় বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস বা তথ্যানুসন্ধানই হবে উদ্দেশ্য। স্বামিজীও যথোচিত সম্মান সহকারে পবিগৃহীত হলেন।" বৈদিক ধর্ম্ম অগ্নি, সূর্য্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনাসম্ভূত অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত খণ্ডন করার জন্য আহুত হলেন। তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন প্রতিশ্রুতিও দিলেন কিন্তু এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হল না। কোনরূপে সে সভাতে উপস্থিত হতে পারলেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

একজন জার্ম্মান পণ্ডিত (মিঃ ওপর্ট) শালগ্রাম শিলাব উৎপত্তি সম্বন্ধে পাঠ করলেন। তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি "যোনি চিহ্ন" বলে নির্দ্ধারণ করলেন। তাঁব মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম উভয়েই লিঙ্গ-যোনিপূজার অঙ্গ।

স্বামিজী মতদ্বয়ের খণ্ডন করে উত্তবে বললেন : শিবলিঙ্গ এব নরলিঙ্গতা সম্বন্ধে অবিবেক মত প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু শালগ্রাম সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক। শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ববেদ সংহিতার য়ুপ-স্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র থেকে। সেই স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং সেই স্কম্ভই যে ব্রহ্ম তা প্রতিপাদিত হয়েছে। যে প্রকার যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গল জটা, নীলকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি ও বাহনাদিতে পরিণত হয়েছে, সেইপ্রকাব য়ুপ-স্কম্ভ ও শ্রীশঙ্করে লীন হয়ে মহামান্বিত হয়েছে। অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টের ও ব্রহ্মত্ব মহিমা প্রতিপাদিত হয়েছে।

লিঙ্গাদি পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করে মহাস্তম্ভের মহিমা ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।....

বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপ মধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষুগণের ভস্মাদি রক্ষিত হত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতু প্রোথিত হত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থি ভস্মাদি রক্ষণশিলার প্রাকৃতিক প্রতিস্বরূপ। প্রথমে বৌদ্ধ পূজিত হয়ে বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের মতই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ কবেছে। অপিচ্য নর্ম্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপাল প্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।

শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতি অশ্রুতপূর্ব্ব এবং প্রথম থেকেই অপ্রাসঙ্গিক। শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌনব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্ব্বাচীন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময়ে সঙ্ঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোব বৌদ্ধতন্ত্রসকল নেপাল ও তিব্বতে এখনও প্রচলিত।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় ধর্ম্মমতের বিস্তাব বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা করলেন। বিশেষভাবে ভারতীয় সভ্যতা, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ ইত্যাদিতে গ্রীক প্রভাবের প্রতিবাদ করলেন। কয়েকজন পণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তিনি তাঁদের লক্ষ্য করে উপসংহারে বললেন, তাঁরা যেন ধীরভাবে সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্য অধ্যযন করেন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে, তাতে আদৌ গ্রীক প্রভাবের ছায়া নেই বরং অনেকাংশে এটাই সত্য যে, গ্রীকগণ হিন্দুগণের কাছ থেকে অনেক বিষয় শিক্ষা করেছিলেন।....

প্যারী সভ্যজগতের সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান কেন্দ্র। মহাপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সে সভায়। স্বামিজী পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর মধ্যে বাঙালী যুবককে দেখে, অত্যন্ত খুশী হলেন। তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় মুগ্ধ করলেন পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে। গর্ব্বে বুকখানা ভরে উঠলো তাঁর। মনেপ্রাণে তিনি ধন্য, ধন্য করে উঠলেন।....

প্রায় তিনমাস প্যারীতে যাপন করে ২৪শে অক্টোবর রাত্রে সদলবলে যাত্রা করলেন ভিয়েনায়। পৌঁছলেন ২৫ শে সন্ধ্যায়। সেখানে নগরীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করে ২৮শে হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া হয়ে ৩০শে অক্টোবর তুর্কির রাজধানী ইস্তাম্বুল বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কনষ্টান্টিনোপলে প্রবেশ করলেন। এই দেশ অনেকটা প্রাচ্যভাবাপন্ন। শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে খুশী মনে নগর পরিদর্শন করলেন।

কামান নির্ম্মাতা ম্যাকসিম সাহেবের পরিচয় পত্র সহায়ে তিনি অনেক স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতার অধিকার পেলেন না। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের বৈঠকখানায় তিনি প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন করলেন। বেদান্ত আলোচনায় যোগ দিলেন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা। আনন্দের মধ্যে কাটালেন কয়েকটা দিন।

তুর্কি সাম্রাজ্যের কবলমুক্ত ছোট ছোট নবীন রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভে খুশী হয়ে তিনি লিখলেন.... তবু স্বাধীনতা এক জিনিষ, গোলামী আর এক। পরে যদি জোর করে কাজ করায় ভাল কাজ করতে, ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ বড় কাজ করতে পারেনা। স্বর্ণশৃঙ্খল যুক্ত গোলামীব চেয়ে, এক ফাটা ছেঁড়া ন্যকড়া পরা স্বাধীনতা, লক্ষ গুণে শ্রেয়। গোলামের ইহলোকও নরক, পরলোকও তাই। ইউরোপের লোকেরা তাদের ভুল অপরাগতা নিয়ে ঠাট্টা করে এতকাল দাসত্ব করার পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বৈকি। দুশোবার করবে, করে শিখবে— শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে, অতি দুর্ব্বল ও সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।.....

এবার এলেন প্রাচীন সভ্যতার সমাধি-ভূমি এথেন্সে। এথেন্স নগরী পরিদর্শন করে তিনি সঙ্গীগণসহ যাত্রা করলেন মিশর। কায়রোতে উপস্থিত হয়ে তিনি মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রাচীন দ্রব্য সামগ্রী দর্শনের বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সহযাত্রীদের মিশরের অতীত ইতিহাস থেকে অদ্ভুত-কর্ম্মা করায়ত্ত রাজবংশের বিবরণ সোনাতে লাগলেন। 'পিরামিড' স্পিনিফ প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পড়ামাত্র জ্ঞাতব্য যা কিছু, সঙ্গীদের কাছে তার বর্ণনা দিতে লাগলেন। মনে হতে লাগলো সারাজীবন ধরে মিশরের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করেছেন তিনি।

প্যারি, ভিয়েনা, কনষ্টান্টিনোপাল, এথেন্স, কায়রো প্রভৃতি নগরের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বিলাস প্রত্যক্ষ করে অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। পার্থিব সুখ সম্পদশালী পাশ্চাত্যের উদ্ধত অহংকার, তাঁকে অহরহ পীড়াদিতে লাগলো। ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রতিনিয়ত নব নব ভোগ্যবস্তু আবিষ্কারের উন্মত্ত চেষ্টা এবং সেই কামনা পরিপূরণের আশায়, প্রতি পদক্ষেপে ন্যায়, নীতি, ধর্ম্মের মস্তকে ভ্রূক্ষেপহীন পদাঘাত, ইয়ুরোপেব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি শুধু দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত বিচরণ করলেন দেশের পর দেশ। মিশরে পা দিয়েই ভারতে ফেরার জন্য মনটা তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

খবর এলো মায়াবতী মঠের সংস্থাপক মিঃ সেভিয়ার ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এ দুঃসংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি ভারতে ফেরার জন্য ব্যাস্ত হয়ে উঠলেন।

মঁসিয়ে বোওয়া, ম্যাডাম ক্যালভে, মিস ম্যাকলাউড দুঃখিত মনে তাঁকে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। বোম্বাই বন্দরে নেমেই অজ্ঞাত ভাবে কলকাতায় পাড়ি দিলেন তিনি।

৯ই ডিসেম্বর (১৯০০ খৃঃ) রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে বেলুড় মঠে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসীদের খাবার ঘণ্টা পড়ছে। গেটে তালা বন্ধ। বাগানেতে মালী সন্ন্যাসীদের সংবাদ দিতে ছুটলো একজন সাহেব এসেছেন গেটের চাবি চায়।

গেট খোলা হল। গাড়ী খালি। সাহেব নেই। প্রেমানন্দজী দেখলেন, সাহেব মাথার টুপিটা একটু টেনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভোজনঘরের সামনে। ভাল করে দীপ তুলে দেখলেন সাহেব অন্য আর কেউ নয়, তাঁদের প্রিয়তম নেতা স্বামিজী স্বয়ং। হেসে উঠে বললেন : বাইরে থেকে খাবারের ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যদি তাড়াতাড়ি না যাই তাহলে রাত্রে আর খেতে পাব না। তাই পাঁচিল টপকে এসে পড়লুম। বড় খিদে পেয়েছে খেতে দাও আমায়।

আনন্দের স্রোত বয়ে গেল মঠে। বহুদিন পরে মিলন। গল্প করতে করতে পরমানন্দে খিঁচুড়ি খেতে আরম্ভ করলেন।

মায়াবতী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা ও মঠের পর্য্যবেক্ষণ করা একমাত্র উদ্দেশ্য। ২৭শে ডিসেম্বর যাত্রা করলেন। কাঠগুদাম থেকে মায়াবতীর পথে পেলেন শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত। খুব কষ্ট হল। একে অসুস্থদেহ, তার উপর শ্রমক্লান্তি! শিষ্যগণ সেবা যত্ন করতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে মিসেস সেভিয়ারকে বললেন, দেহটা ভেঙে পড়েছে সত্য, মাথা পূর্ব্বের মতই সবল ও কার্য্যক্ষম।

শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে ডেকে, আশ্রম, প্রচার ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা পরিচালন বিষয়ে আলোচনা করলেন। ঐ ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে প্রচারের কাজে ইতস্ততঃ ভ্রমণ আর সম্ভব নয়, অনুভব করেই শিষ্যকে মহা উৎসাহে 'সেবাব্রত ও কর্ম্মযোগ' প্রচারের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতে লাগলেন। আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসী একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিত্যপূজা ও ভোগ হত নিয়মিত। চোখে পড়লো তাঁর। বাহ্যপূজার ব্যাপার দেখে ভালমন্দ কিছুই বললেন না। সন্ধ্যায় যখন অগ্নি-কুণ্ডের সামনে সকলেই উপস্থিত, তিনি বাহ্যপূজার অসারতা প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। অদ্বৈত আশ্রমে কোন বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান না থাকে, এ অভিপ্রায় পূর্ব্বে বহুবার ব্যক্ত করেছেন। আজও শুধু মনের অভিপ্রায় ব্যাক্ত করলেন, ঠাকুর ঘর বন্ধের নির্দ্দেশ দিলেন না। ক্ষমতার ব্যবহারে বিরত রইলেন। কারও প্রাণে আঘাত দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। নিজেদের ভুল সংশোধন করানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

সকলেই বুঝলেন, দ্বৈতভাবে, সাকারকে উপাসনা করতে হয়। অদ্বৈত আশ্রম তার উপযুক্ত ঠাঁই নয়। তবুও একজনের সন্দেহ রয়ে গেল। তিনি সুযোগমত পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমার কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীমা জানালেন, শ্রীগুরুদেব অদ্বৈতবাদী ছিলেন— অদ্বৈত সাধনা প্রচার করেছেন। তাঁর শিষ্যগণ প্রত্যেকেই অদ্বৈতবাদী।

মায়ামতী মঠে স্বামিজী নানা পত্রের উত্তর দেওয়া ছাড়া, শাস্ত্রালোচনা করতে ব্যস্ত রইলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য 'আর্য্য ও তামিল' সামজিক সভায় মিঃ রানাডের অভিভাষণের 'সমালোচনা' ও 'থিয়সফি' সম্বন্ধে মন্তব্য তিনটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখলেন।

লাহোর কনফারেন্সের (১৯০০ খৃঃ) সভাপতিরূপে মিঃ রানাডে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আপত্তিজনক মনে হওয়ায় নির্ভীক প্রতিবাদ ও সমালোচনা করলেন। ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের মত মিঃ রানাডে সন্ন্যাসাশ্রমের বিরোধী। সুযোগ পেলেই কটাক্ষপাত করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বিবাহিত ঋষিগণ সমাজের নেতা ও আচার্য্য ছিলেন, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল না, নরনারী সকলেই সমভাবে সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করতেন এবং কঠোর সংযমের ভাব ছিল না। ফলে, মানবজীবনের মাধুর্য্য সকলেই পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতে পারতো। বক্তব্যের সারমর্ম্ম ছিল (১) ঋষিগণ বিবাহিত। ক্ষত্রিয় রাজ

নন্দিনীগণের সঙ্গে ঋষিদের অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন (২) শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরুগণও বিবাহিত অতএব বিবাহিত একদল আচার্য্য গঠন কবা উচিত। সন্ন্যাসীর জীবন, অসম্পূর্ণ জীবন, বৈদিক যুগে ছিল না— এখনও থাকা উচিত নয়।

প্রতিবাদে লিখলেন স্বামিজী : (১) সন্ন্যাসীগুরু ও গৃহস্থগুরু, কুমার ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত আচার্য্য উভয় প্রকার আচার্য্য বেদ যত প্রাচীন তত প্রাচীন। অতএব তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম কল্পনার সাহায্য না নিয়ে, স্বাধীনভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করার প্রয়োজন। সন্ন্যাসী আচার্য্যগণ, গৃহস্থগণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পূর্ণব্রহ্মচর্য্যরূপ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়েছিলেন বলেই তারা উপনিষদ্বক্তা, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

(ক) একদিকে বিবাহিত গৃহস্থ ঋষি কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার —শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন। খুব কম করে বললেও বলতে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরণের আর অন্যদিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণ সন্ন্যাসী ঋষিগণ, মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব স্বত্বেও এমন উচ্চ ধর্ম্মনীতিও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন যার অমৃতবারি, সন্ন্যাসের বিশেষ বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধরা, পবে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রাণভরে পান করে তাঁদেব অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তি লাভ কবেছিলেন এবং যা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিনচার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজসংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করবার শক্তি দান করেছে।

(খ) হিন্দুজাতি অনাদি কাল থেকে জড়ের পরিবর্ত্তে চৈতন্য, ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগকেই শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব যতদিন সমগ্র হিন্দুজাতির মনের ভাব এরূপ চলবে, আর আমরা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এইভাব চলুক, ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিবৃন্দ ভারতীয় নর-নারীর 'অত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্ব্বত্যাগ করবার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার আশা কি করতে পারেন?

(গ) সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতাব আমলের' পচা মড়ার মত আপত্তিটা ইউরোপ প্রোটেষ্টন্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙালী সংস্কারকগণ তাঁদের থেকে ঐটি ধার করে নিয়েছেন আর এখন আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃগণ ওটা আঁকড়ে ধরেছেন, সন্ন্যাসীরা অবিবাহিত থাকার দরুণ জীবনটাকে পূর্ণভাবে এবং নানারকমের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত।.... অবশ্য সন্ন্যাস আশ্রমের বিরুদ্ধবাসীদের মুখে, একথা তো লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক বৃত্তি দিয়েছেন, কোন না কোন ব্যবহারের জন্য, সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি করছেন না, তিনি অন্যায় করছেন— তিনি পাপী। বেশ তাই, বলেতো কাম, ক্রোধ, চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল বৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, আর এদের মধ্যে প্রত্যেকটিই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবনরক্ষাব জন্য আবশ্যক। এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্য? জীবনে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন করে কি, ঐগুলোও পুরোদমে চালাতে হবে না কি? অবশ্য সমাজসংস্কারকদলের সঙ্গে যখন সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, এবং তাঁরা যখন, তাঁর কি কি ইচ্ছা তাও ভালবকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের, এ প্রশ্নের 'হ্যাঁ' জবাব দিতে হবে।

(২) স্মরণাতীতকাল থেকে জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ সমাজ শীর্ষে অবস্থান কবে, জাতিকে উন্নতির পথে চালিত করেছেন। সন্ন্যাসীর সু-কঠোর সংযতজীবন, ভোগবিতৃষ্ণা, যুগে যুগে কত মানবকে উচ্ছৃঙ্খল লালসা সংযত করতে শিখিয়েছে। উচ্চ চিন্তা, তার অধিকাংশই সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য পুষ্ট মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। সমাজ-তরণীর কর্ণধারের আসনে, ভারত প্রাচীনকাল থেকেই সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে স্থাপন করেছে, আর সন্ন্যাসীগণ আজই জীবনতরণীর হাল

ধরে বসে আছেন বলেই, সহস্র ঝঞ্ঝাবর্তও তা ধ্বংস করতে পারেনি, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। সমাজের ওপর, জাতির ওপর, তার অমোঘ প্রভাব, মিঃ রানাডে অস্বীকার করতে পারেন নি, তবুও তিনি বলেছেন, আমাদের আচার্য্যগণ যেন নোতুন কোন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা না করেন! কারণ তাঁরা জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার রসস্বাদ করতে অক্ষম। ভবিষ্যৎ ভারত গঠনকল্পে, তিনি সন্ন্যাসীর প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করেছেন এবং আশা করেছেন যে ভারত যখন আচার্য্যরূপে প্রাচীনকালের অগস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের ন্যায় বর্ত্তমানকালেও 'ডাঃ ভাণ্ডারকর, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, লালা মুন্সীর নাম প্রভৃতি ঋষিগণকে লাভ করেছি তখন এঁদের উপদেশ ও আদর্শ জীবন অনুকরণ করে চললে ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী!

(৩) সন্ন্যাসের উচ্চতম আদর্শকে ধারণা করতে অক্ষম হয়ে, কেউ কেউ ত্যাগপূত গৈরিক কলুষিত করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্ব্বল ও অসৎপ্রকৃতি সন্ন্যাসীগণের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, সংস্কারকগণ সমস্ত সন্ন্যাসী ও এমনকি সন্ন্যাসআশ্রমকেও অযথা আক্রমণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সন্ন্যাসের ক্ষুরধার দুর্গমপথে চলতে গিয়ে, যদি কারও পদস্খলন হয় তবুও সে একজন সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। কারণ চলতি কথায় আছে যে, ভালবেসে না পাওয়া, ভাল না বাসা, অপেক্ষা ভাল। যে কখনও উন্নত জীবনলাভের চেষ্টাই করেনি, সে কাপুরুষের সঙ্গে, তুলনায় তো বীর!

আমাদের সংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের যদি ভাল করে খবর নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা দেবতাদেরও ভাল করে গুণতে হয়, আর আমাদের সমুদয় কাজকর্ম্মের এরকম· সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব যে দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের হৃদয় মধ্যেই! কিন্তু এদিকে দেখ, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারো কিচ্ছু সাহায্য চাইছে না, জীবনে শত ঝড় ঝাপটা আসছে, বুক পেতে সব নিচ্ছে, কাজ করছে কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমন কি কর্ত্তব্য বলে লম্বা নামে সাধারণ পরিচিত, সেই পচা বিট্‌কেল ভাবটাও নেই। সারা জীবন কাজ চলছে, আনন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ চলছে। কারণ, ক্রীতদাসের মত জুতোর ঠোক্কর মেরে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেমে বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও সে কাজের মূলে নেই"।

এ কেবল সন্ন্যাসীতেই হতে পারে। ধর্ম্মের কথা কি বলবো? ধর্ম্ম যদি থাকে তবে ধর্ম্মসাধনে বিশেষাভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক, ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্ম্মের বিশেষাভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ তাঁরাই ধর্ম্মকে জীবনের মূললক্ষ্য করেছেন। তাঁরাই ঈশ্বরের সৈনিকস্বরূপ। যতদিন একদল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন ধর্ম্মের বিনাশ আশঙ্কা?

প্রোটেস্টান্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকা, ক্যাথলিক সন্ন্যাসীগণের প্রবল প্লাবনে কম্পিত হচ্ছে কেন?

বেঁচে থাকুন রানাডে ও সমাজসংস্কারকের দল। কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত! ভুলো না বৎস, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছো না, মীমাংসাকরা তো দূরের কথা।

তুষারপাতের জন্য কক্ষের মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করতে হল তাকে। বিশেষ করে হিমালয়ের শীত, তাঁর অসহ্যবোধ হতে লাগলো। ২৪শে জানুয়ারী (১৯০১ খৃঃ) ফিরে এলেন বেলুড় মঠে। মঠের কাজ ভাল রূপেই চলছিল। স্বামিজীর আগমনে নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উৎসাহ শতগুণ বেড়ে গেল। তাঁদের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি লক্ষ্য করে তুষ্ট হলেন। অবসর মত, তিনি নিজে আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে শিক্ষাদানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করতে লাগলেন।....

গুরুর আশীর্ব্বাদ অন্তরে জপ করতে করতে নিবেদিতা ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন। নিজেকে শিশুর মত সুখী বলে মনে হল। জীবন যত কঠোর ও ভয়াবহ হোক, তাতে কি আসে যায়! তিনি স্বামিজীর সন্তান, মায়ের সন্তান। জীবন একটি মাত্র বাসনা, সর্ব্বোতভাবে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন। কিন্তু বাস্তবে প্রতিদিনই ব্যর্থতা। সফলতা লাভের মুখে এসেও বাঞ্ছিত সোনার আপেল হাতছাড়া হয়ে যায়। ইচ্ছা হয়, স্বামিজী তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনের অনুজ্ঞা দেন।

স্বামিজী জানতেন তাঁর জীবন সম্পূর্ণ ধ্যানধারণা ও তপস্যার জীবন নয়। তিনি কর্ম্মী তাঁর পক্ষে প্রয়োজন জগন্মাতার উপাসনা। এজগৎ কি জগজ্জননীর শক্তির প্রকাশ নয়? যদি কেউ কর্ম্ম করতে চায়, সে শক্তিউপাসনা করুক। নিবেদিতার স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শক্তি পূজার দিন। তাঁকে তিনি মাতৃভাবের উপাসনা শিখিয়ে দিলেন। তাঁর প্রতিপদক্ষেপে, প্রতি কাজের পশ্চাতে সেই শক্তিরূপিনী মহামায়া বিরাজ করছেন। নিবেদিতাকে তিনিই পরিচালনা করবেন।

স্বামিজীর অভিপ্রায়, সংসিদ্ধির জন্য জননীর উপাসনা চাই। কিন্তু নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল এমন দিন আসুক যখন স্বামিজীর কাজ সম্পূর্ণ হবে, তখন তিনি অবসর নিয়ে শিবের আরাধনা করবেন। মহাদেবই একমাত্র মুক্ত, চির উদাসীন, সদামুক্ত। মুক্তির স্বরূপ যদি আস্বাদন করতে হয় চিরকালের জন্য সদাশিবের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতে হবে।

আপাততঃ বিরামহীন সংগ্রাম। তা নিজে স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। কর্ম্মই, বন্ধন সৃষ্টি করে অথচ জীবনে কর্ম্মই প্রকৃত সত্য কারণ, অপরের বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম। কর্ম্মবিমুক্ত জীবন তাঁর নয়।

ইংলণ্ডে পা দিয়েই কর্ম্ম প্রবাহে পড়ে গেলেন। প্রথম কাজ শ্রীযুক্ত বসুর (জগদীশচন্দ্রের) তত্ত্বাবধান করা। তিনি সস্ত্রীক ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলেন। ডিসেম্বর মাসে তাঁর একটা অস্ত্রোপচার হল। তাঁকে উইম্বলডনের বাড়ীতে রাখার প্রস্তাব করলেন। মিসেস বুলও সর্ব্বোতভোবে সাহায্য করলেন বিদেশে। এই দুটি নারীর কাছে অযাচিত সাহায্য শ্রীমতী অবলাবসুকে যথেষ্ট শক্তি দান করলো।

বসু আরোগ্য লাভের পর নিবেদিতা তাঁর কাজও করলেন। বিদ্বৎসমাজে তিনি পূর্ব্বেই সুপরিচিত ছিলেন। বক্তৃতাও বহুবার দিয়েছেন এবার পৃথক বস্তু। বক্তৃতার বিষয়বস্তুও পৃথক। উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরিকল্পিত কাজটিকে সফল করার বাসনায় অর্থ সংগ্রহের আশায় এবার তাঁর ভারত ত্যাগ। এখানের বন্ধুবর্গের কাছ থেকে কতটা সাহায্য পাবেন— সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল তাঁর। এখানের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তাঁর ভারতীয় কর্ম্মধারার বিবরণী প্রকাশিত হল। লণ্ডন 'ডেলী নিউজে' তাঁর বক্তৃতার ঘোষণা থাকতে লাগলো।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে শ্রোতৃবর্গের সামনে ভারতীয় জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। পরনে নিতান্ত সাদাসিধা সাদা ফ্লানেলের গাউন। গলায় একটি মালা দূর থেকে জপের মালা বলে মনে হয়। টার্নব্রিজ ওয়েলস, হাইয়ার থট সেন্টার ও সেসেমি ক্লাবে 'নারীজাতির আদর্শ' 'ভারতীয় সমস্যা' 'ভারতীয় নারী' 'একাগ্রতা' ধর্ম্মশিক্ষায় 'কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি' ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ব্যর্থতা, রামকৃষ্ণ সংঘ এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে চিন্তার প্রয়োজন, সামাজিক জীবন প্রভৃতি সুচিন্তিত বক্তৃতাগুলি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করলো। তাঁর বক্তৃতায় ভারতের জনসাধারণ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ সকলকে আকৃষ্ট করতে লাগলো। বাংলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল একটি সভায় সভাপতিত্ব করলেন। ভারতে নিবেদিতার শিক্ষাপ্রদানের প্রচেষ্টাকে তিনি (স্যার রিচার্ড) সমর্থন ও প্রশংসা করলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বললেন : একবস্তুকে বোতলে ভোরে ওষুধ গেলানোর মত নিয়মিত মাত্রায় দেওয়া যায় না। হিন্দুরমনীদের শিক্ষার প্রধান উপকরণ প্রাচীন শাস্ত্র। শিক্ষার প্রণালী নির্দ্দেশ করতে গেলে, শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তার অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ জীবনের পর্য্যালোচনা আবশ্যক। আমি যে কেবল হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাবগুলির প্রতি অনুরক্ত তা নয়, ভালমন্দ সকল অংশের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন। সেই হেতু হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনা আমার অভিপ্রায় নয়। সমুদয় হিন্দু সর্ব্বোচ্চ্য সভ্যজাতি। জগতের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজেই সুন্দর শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান। হিন্দু গার্হস্থ্যজীবনের ন্যায় সুন্দর বস্তুবোধ আর কিছুই নেই এ পৃথিবীতে। ভারতীয় রমনীর আদর্শ, প্রেম নয় ত্যাগ। এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে আমি হিন্দুরমনীকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্য্যকরী শিক্ষা দিতে চাই।

স্কটল্যাণ্ড থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করলেন। পরদিন এডিনবরায় ভিক্টোরিয়া ক্লাবে "ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক বক্তৃতায় হিন্দুনারীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বিষয় শ্রোতৃবর্গের কাছে সম্পূর্ণ নোতুন। পূর্ব্বে এ বিষয়ে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত, তিনি বক্তৃতা শেষ করতে বাধ্য হলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী 'ভারতবর্ষে তাঁর কার্য্যপ্রণালী' ও ২৫শে 'ভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের পর ইংলণ্ড এলেন।

ভারতে ফেরার জন্য তিনি অধীর। স্বামিজীও ভারতে চলে গেছেন। মিস ম্যাকলাউড রওনা হয়ে গেলেন, জাপান হয়ে ভারতে যাবেন। তাঁর মনে হল ইংলণ্ডে সময় নষ্ট করছেন। এখানে কি কোন প্রয়োজন আছে না মনের খেয়ালকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? প্রতিদিন তাঁর ধারণা দৃঢ়তর হচ্ছিল যে ইংলণ্ডে বসে কিছু করা সম্ভব নয়। ভারতের আশা ভারতবর্ষেই, ইংলণ্ডে নয়। অনুনয় করে ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তিনি যেন তাঁর ভারত প্রত্যাবর্ত্তন সমর্থন করেন। ইংলণ্ডে কিছু করার আশা পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও স্বার্থপরতার কাজ মনে হল। শ্রীমার অসুস্থতার সংবাদে উৎকণ্ঠা বেড়েই চললো। শ্রীমা যদি তাঁকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন তা হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ম্যাকলাউড জানালেন শ্রীমারও ইচ্ছা তিনি ভারতে ফিরে যান। এই অনুমতি তাঁর অভিলাষ পূরণে সাহায্য করলো। বালিকার মত আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু ইচ্ছা পূর্ণ হল না। হঠাৎ কতকগুলো কাজ এসে পড়লো। মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেবার কথা। স্থির করলেন আর বক্তৃতা দেবেন না— বা অর্থের কোন কাজের ভার তিনি নেবেন না। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে সে সংকল্প ত্যাগ করতে হল।

মিঃ হাউই এর সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বহু আলোচনা হল। তিনি তাঁকে ঐ বিষয়ে একটি জোরালো প্রবন্ধ লিখে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রীযুত বসুও উৎসাহ দিলেন। 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ উইলিয়ম ষ্টেড তাঁর পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বেই লেখা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আবার বিশেষ অনুরোধ করলেন শ্রীবসুর চরিত্র অঙ্কন করে একটি প্রবন্ধ যদি লিখেন ভাল হয়! সত্যই এটি ভারতের দিক থেকে একটি মূল্যবান উপহার হবে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব দিলেন : ভারত সম্বন্ধে তাঁর যে বই লেখার ইচ্ছা আছে, তিনি তা ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। 'Web of Indian Life' বইটি রচনার প্রাথমিক উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল। 'Kali the Mother' বইখানি ছাপা হয়ে গিয়েছিল। সমালোচনাও বেরিয়েছে। বইখানি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। শ্রীদত্ত তাঁকে বার বার আশ্বাস দিতে লাগলেন তাঁর লেখনীই বিদ্যালয়ের অর্থাগমে সাহয্য করবে।

স্কটল্যাণ্ডে, অধ্যাপক গেডিজের সঙ্গে দেখা হল, তিনি তাঁকে জুনমাসে ডাণ্ডী নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করলেন। গ্লাসগো প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে বক্তৃতা দেবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। শ্রীমার অনুমতি পেয়ে এসব উপেক্ষা করতে প্রস্তুত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হল না। স্কটল্যাণ্ডে মিশনারীগণ এডিনবরায় বক্তৃতা দেবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলেন। ভারত ও ভারতীয় জীবনযাত্রার ভয়ানক বিবরণ দেন, তার প্রতিবাদে একবার মাত্র বলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁর বক্তৃতায় ক্রুদ্ধ মিশনারীগণ ভারতীয় এক খ্রীষ্টান যুবককে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করলেন। যুবকটি তাঁকেই সমর্থন করলেন। ইউরোপে আসার পর নিজেকে তিনি আর খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। যুবকটির দাস মনোভাব অপনোদনের চেষ্টায় মুগ্ধ হলেন। কিন্তু যে ক্লাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল তার সদস্যগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় যাতে তিনি বক্তৃতার সুযোগ না পান তার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। অগত্যা তাঁকে এডিনবরা ত্যাগ করতে হল। মিশনারীগণ নিজের মনোমত অপপ্রচারের যাওয়ার পূর্ব্বে যে করেই হোক এই হীন প্রচারের উত্তর তিনি দেবেন।

অধ্যাপক গেডিজ বার বার তাঁকে ডাণ্ডীতে যাবার আহ্বান করতে লাগলেন। মিশনারীদের সম্বন্ধে তিনি যা লিখবেন তার ভূমিকা লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এসুযোগ তাঁর পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। য়ুম কে লিখলেন : আহা, যদি ভারতে ফিরে যেতে পারতাম! ফিরে যাবার জন্য আমি ব্যগ্র, যদিও জানি যে, যে পুস্তক লিখতে চাই তার সূচনা করে উঠতে পারবো না। কলকাতায় এতদিনে নিশ্চয় প্লেগের আক্রমণ সুরু হয়ে গেছে। এসময় দূরে বসে থাকা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর।... আমি সত্যই আনন্দিত যে তোমার কাছে প্রতিটি দিনই মধুরতর হয়ে উঠেছে।

নিবেদিতা জন্মগত শিল্পী, লেখিকা। নব নব রূপে ভাষা সৃষ্টির মধ্যে তিনি আনন্দ পেতেন। ভারত এবং ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সার্থক রচনার তা রূপদানের আকাঙ্ক্ষা তাঁর তীব্রতর হয়ে উঠলো অথচ অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন, সর্ব্বোপরি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নবলব্ধ অভিজ্ঞতা সমূহ তাঁর মনের উপর ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছিল। তা প্রকাশে এক নির্জ্জন স্থানের প্রয়োজন ছিল, যেখানে নির্বিঘ্নে লেখার কাজগুলি শেষ করতে পারেন।

মিসেস বুলের বাড়ী নরওয়ে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে নরওয়ের বার্গেন সহরে তাঁর পরলোকগত স্বামী ওলিবুলের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে মিসেস বুল নরওয়ে যাত্রা করছেন। নিবেদিতাকেও তাঁর সহযাত্রী হওয়ার আহ্বান জানালেন।

২১শে মে নিবেদিতা নরওয়ের অন্তর্গত লাইসো পৌঁছলেন। পুরো তিনমাস তিনি ঐ দেশে অবস্থান করলেন, বার্গেন থেকে কিছুদূরে সমুদ্রের এক খাড়ির ধারে গুহার মত একটি জায়গায়। তাঁবু খাঁটিয়ে কুটীর তৈরী করা হল। মিসেস বুল যে কদিন ছিলেন, মাঝে মাঝে বার্গেনে তাঁর কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। কাশ্মীরের আচ্ছাবলের সদৃশ স্থান এটি। নীল সমুদ্রের তীরে সবুজ বনভূমি, পাথরের ছোট ছোট স্তূপ, সরল বৃক্ষের সারি আর মাঝে মাঝে পায়ে চলার পথরেখা। বন থেকে ভেসে আসা সুমিষ্ট গন্ধ। তিনি স্থির করলেন : শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে ভারতে ফিরবেন না।

নিবেদিতার এই অরণ্যভূমিতে অনেকেই আসতেন। মিসেস বুলের সাদর আমন্ত্রণে যাঁরাই নরওয়ে আসতেন, তাঁরাই তাঁর সঙ্গলাভের আশায় কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুও কিছুদিন কাটিয়ে গেলেন। মিসেস সেভিয়ার বিষয় সংক্রান্ত কাজে ইংলণ্ড এসেছিলেন। তিনিও নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ইংলণ্ডের উদারনীতিক দলের মিঃ জন ল্যাণ্ডের

সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। তিনি এবং রমেশচন্দ্র দত্ত বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলেন। The web of Life বইটির কয়েকটি পরিচ্ছদ এখানেই রচনা করলেন। শ্রী দত্তকে পড়ে শোনালেন ও তাঁর সাহায্য গ্রহণ করলেন। সে সময়ে রমেশচন্দ্র দত্তও রচনা করেছিলেন অর্থনৈতিক ইতিহাস (ইংরাজী ভাষায়)।

মিঃ ষ্টেডের অনুরোধে, বিশেষ পরিশ্রমে জগদীশচন্দ্রের (বসুর) চরিত্র অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করলেন। কিন্তু তাঁর (মিঃ ষ্টেডের) অনুমোদিত হল না। তাঁর মতে লেখাটি ত্রুটি হয়েছে সম্পূর্ণ ভারতের মর্ম্মকথা। বসুর চেয়ে ভারতবর্ষের কাহিনীই বেশী। শুরু করলেন নোতুন করে লেখা। ইতিমধ্যে তার শেষ হয়ে গেছে 'Lambs among wolves'। ওয়েষ্ট মিনিষটার গেজেটে প্রকাশ পেল সেটি—মিশনারী আক্রমণের প্রত্যুত্তর রূপে।

দীর্ঘ অবকাশ। নির্জ্জন স্থানে বাস। পেলেন আত্মবিশ্লেষণের অবসর। অনুভব করলেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। শুরু তার ইংলণ্ডে, স্বচ্ছরূপ নিয়েছে নরওয়েতে। মনে পড়লো; ১৮৯৮ সালে স্বামিজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা। একটি উপবেশন কক্ষ। প্রত্যক্ষ করলেন উপবিষ্ট একজন ভারতীয় যোগী, যার, মধ্যে ধ্যানীর মগ্নতা, মুখে শিশুযীশুর কোমল বিহ্বলতা। কণ্ঠে বিচিত্র "ধ্বনি" "শিব" "শিব"। অবাক সেই নীরবতা- মাঝে আর একটি ধ্বনি 'INDIA' প্রত্যেকটিই পাঁচ অক্ষরে সীমাবদ্ধ। তাতে ছড়ানো ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য্যে ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা। প্রচণ্ড সে ভালবাসার, অনুভূতির সঞ্চার।

পূর্ব্বেই আত্মিক অনুসন্ধিৎসার জাগরণ শুরু হয়েছিল মনে। ব্যাপৃত ছিলেন তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে। সে বিশ্লেষণ পথে বিঘ্নস্বরূপ ধর্ম্মীয় আচরণের দৃঢ় আবেষ্টনী অথচ কঠোর অনুশাসন। বিদ্রোহী আত্মার একটা চাপা আর্ত্তনাদ — কোথায় সে পথ, কোথায় সেই তৃপ্তির পাথেয়?

বিদগ্ধ সে আত্মা মুগ্ধ প্রথম দৃষ্টিতে। আত্মসমর্পণের তৃষ্ণা শুরু অজ্ঞাতেই অথচ বাধার প্রাচীর তুলেছে শিক্ষা, দীক্ষা ও বিশ্লেষণের খুর ধারায়।

ফিরলেন ঘরে। মনটা যেই হারিয়ে ফেললো নিজেকে। একটা আকর্ষণ তাঁকে নিরন্তর টানছে। যেখানেই তিনি, যেখানেই বক্তৃতা— সেখানেই ছুটছেন। তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে তৃপ্তির শেষ আর নেই! বুঝলেন, ইনিই সেই মানুষ, যিনি পরিতৃপ্তি দিতে পারেন অন্তরকে, দেখাতে পারেন চলার পথ।

শুরু হল পাঠ গ্রহণ। অনুসরণ করলেন বৈদান্তিককে। হারিয়ে ফেললেন নিজেকে কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর চিন্তার আবর্ত্তে।

জন্ম নিল ভারতপ্রীতি। প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁর মধ্যে প্রদীপ্ত, জীবন্ত সে-রূপ। মিলনের সে -সূত্র ছিল গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তি। সেই উদ্দেশ্যেই যাত্রা আত্মবলিদানের।

স্বেচ্ছায় তুলে নিলেন সে গুরুদায়িত্ব। কিন্তু সে গুরুভার বইবার জন্য ও তার ভিত্তি রচনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সে-উদ্দেশ্যেই যাত্রা আমেরিকায়।

আমেরিকা। হ্যাঁ সেই আমেরিকা, যেখানে তাঁর গুরু প্রথম পদক্ষেপেই জয় করেছিলেন সে দেশবাসীর চিত্ত—ঘোষণা করেছিলেন বিশ্ববিজয়ের বার্ত্তা।

কার্য্যক্ষেত্রে নেমেই সেখানে পেলেন প্রচণ্ড বাধা। তাঁরা দেখেছেন স্বামিজীকে, শুনেছেন তাঁর বার্ত্তা, নিজের চোখে দেখেনি ভারতবর্ষকে। সে দেশ সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত, কত অদ্ভুত জনশ্রুতি, সেরকমই তাদের ধারণা। সে দেশ পরাধীন, পরাভূত, তাদের মনোভাব, তাদের রুচি, তাদের আচরণ সবকিছুই কদর্য্যে ভরা।

বিপিন পাল এলেন। তাঁকেও শুনতে হল : আগে স্বাধীন হও, তারপরে এসো এদেশে। এসেছো তোমাদের ধর্ম্ম, দর্শন সম্বন্ধে বলতে! আগে স্বাধীন হও, তারপর শুনবো, মূল্য দেবো, ভাববো— তার পূর্ব্বে নয়।

স্বামিজীর ছিল সাধনা, ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ছিল আত্মিক শক্তির প্রভাব, তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিল সসম্মানে— যদিও মিশনারীরা প্রতিপদে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ত্যাগ করেনি সেদিন। আর তিনি নারী! তাঁকে উপেক্ষা, তাঁর প্রচেষ্টাকে হেয় করার চেষ্টাও তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর অবচেতন মনের রূপান্তর শুরু হল। বুঝলেন : স্বাধীন জাতির চোখে-স্বাধীনতার মূল্যই বেশী। স্বাধীনতার মূল্য এঁরা বোঝেন অথচ পরাধীন ভারত তো 'বন্ধন মুক্তি' চাই, যোগ্যমর্য্যাদা পেতে হলে, আজ ভারতের মুক্তির প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। স্বামিজী যেখানে আলো সেখানে তাঁর অনুপস্থিতি ঘোর অন্ধকার!

বহু চেষ্টায় সফলতার পথ উন্মুক্ত করে ফিরলেন স্বদেশ ইংলণ্ডে; স্বকীয় কাজ সিদ্ধির আশায়। আমেরিকায় পাশে ছিলেন স্বামিজী, যদিও দূরে, তবুও ছিল তাঁর উপস্থিতি, আর এখানে সম্পূর্ণ একা। ব্যক্তিসত্ত্বার প্রতীক ক্রমে অনুভূত হতে লাগলো। ঘটতে লাগলো নানা ঘটনা। ভারত সম্বন্ধে গভীরতর সচেতন হয়ে উঠলেন। যে দেশ পরপদাণত, সেদেশের মানুষের কোন মর্যাদা নেই— এ বোধ জাগ্রত হয়েছিল আমেরিকায়। স্বদেশে, পরাধীন দেশে-জাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিকাশের পথে প্রতি পদে বাধা দান, তাঁকে ক্রমাগত অসহিষ্ণু করে তুলতে লাগলো। বৈদেশিক শাসনের ভয়াবহ রূপ ক্রমশঃই পরিস্ফুট হতে লাগলো। গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখলেন : দেশীয় সরকার যদি বিজ্ঞানের কাজের ভার গ্রহণ করে খুবই ভাল হয়। কিন্তু কাজে পরিণত করার মত উদার হৃদয় ইংরেজ জাতির নেই।

আধ্যাত্মিক আকর্ষণে ভারতে ছুটে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক আলোচনা বা তা জানার সুযোগ ঘটেনি সেদিন। এখন বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার ফলে, বুঝলেন : মুষ্টিমেয় লোকই ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। বিশেষতঃ পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যগণের মনোভাব ভারত-বিরুদ্ধ। উদার-নৈতিক দলের অন্যতম নেতা- মিঃ জন ল্যাণ্ড প্রমুখ দু-চারজন মাত্র তাঁর মর্ম্ম-বেদনা বুঝতে সমর্থ। ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারতীয়গণের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা স্বদেশচেতনায় জাগ্রত, তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে ভারতের জনসাধারণ কি ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে, জানতে সমর্থ হলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন মতবাদে নরমপন্থী। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোভাব জানার সুযোগ এসে গেল। কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ, তিনি আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করতে সুরু করলেন। এমনকি নিজেকে কংগ্রেসে জড়িত করার চিন্তাও তাঁর মনে উদয় হল।

মিশনারীগণের অপপ্রচার, তাঁকে ক্রুদ্ধ সিংহিনীর মত ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। ঠিক সেইসময়েই রমেশচন্দ্র দত্ত জনা পঁচিশ ভারতীয় ছাত্র সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। এঁদের কাছে জ্বলন্ত ভাষায় 'ভারতের নবজাগরণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর অনেক আশা : এঁরাই তাঁর একান্ত আপন জন। এরাই ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যধর। কিন্তু এদের দাসসুলভ মনোভাবে অন্তরে আঘাত পেলেন। নিজের দেশ সম্বন্ধে এঁদের এতটুকু মর্য্যাদাবোধ নেই! নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিলেন তিনি। ভারত থেকে যে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করছিলেন সবই ছিল পরাধীন দেশের অসহায়তা ও গ্লানির সংবাদ। জামসেদজী টাটার বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনায় — ব্রিটিশ সরকারের অনুদার মনোভাব, মিসেস বেশান্তের কাশীতে কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রত্যাখ্যান, শেষে তাঁর ভারতীয় ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টনের কাছে আবেদনটুকুও। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ, আইরিশ চিত্ত তাঁর, প্রবল আলোড়নে উদ্বেল হয়ে প্রত্যাঘাত চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।

স্বদেশে ফিরে এলেন, পূর্ব্বজীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে। পুরাতন সম্পর্ক, নব পরিচিত ভারতীয় রূপকে ভুলিয়ে দিতে পারলো না। ফিরেছেন এখানে, উদ্দেশ্য সফলের আশায়। প্রতিটি কর্ম্ম, এমন কি চলাফেরা পর্য্যন্তও একই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ ছাড়া পূর্ব্ব পরিচিত সকলের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ ছিন্ন। প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করছেন : এঁদের যাত্রাপথের সঙ্গে বর্তমানে নিজস্ব গতিপথের মিল নেই। মার্জ্জিত সুসভ্য প্রভুত্বপরায়ণ ব্রিটীশ নরনারীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সংযোগ আজ ছিন্ন। লক্ষ্য বর্ত্তমানে শুধু সেবা... হ্যাঁ সেবা—নিপীড়িত ভারতীয় জনগণের, যারা অন্নক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত, অশিক্ষিত, যারা স্বাধীন জাতির চোখে বর্ব্বর, হেয় রূপে প্রতিভাত, তাদের সেবাই বর্ত্তমানে একমাত্র পাথেয়। বুক ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে নিবেদিতার— হা ভগবান! যারা সত্যই মনুষত্বের অধিকারী, যাদের সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত— তারাই ভাগ্যবশে এমন দেশে জন্ম নিয়েছে, বর্ত্তমানের সভ্য জগতে, শুধু উপেক্ষিত নয়, অসভ্য ও বর্ব্বর জাতি রূপে প্রতিভাত বিশ্বের কাছে।

গুরুর প্রতি আনুগত্যে, অটুট এখনও তিনি। কর্ম্মপন্থায় ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। অন্তরের সব কথা জানালেন মিস্ ম্যাকলাউডকে। এমন কি ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থাও! এও ব্যক্ত করলেন—স্বামিজীকে যতদূর চিনেছেন, তাঁর মনোগত ইচ্ছাও তাই।

রাশিয়ার অন্যতম বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিন এসময়ে লণ্ডনে বাস করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তাঁর ইংরাজ বিদ্বেষী মনোভাব পুষ্ট হয়ে উঠলো। স্বামিজীকে ব্রিটিশ সরকারের অবিশ্বাস, তাঁর কাজে বাধা দান, তাঁর পিছনে (স্বামিজীর) গোয়েন্দা লাগানো, তাঁর পূর্ব্বজীবনের ব্রিটীশ আনুগত্যে চিড় ধরিয়েছিল। ক্রমেই তাদের (ইংরাজ জাতির) অকপট আচরণে, ক্ষোভ তাঁর ক্রমেই বেড়েই চলেছিল। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের প্রতি বিমাতৃক সুলভ আচরণ, প্রতি পদক্ষেপে বাধা ও শাসকদলের নীচ মনোভাব ও তাদের প্রভুত্বের ঔদ্ধত্য, তাঁকে পরিপূর্ণ বিক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত করে তুললো।

যে দেশকে তিনি ভালবাসেন, সে দেশ ও দেশবাসীকে প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই হেয় প্রতিপন্ন করার অবিরাম প্রচেষ্টায়— বিদ্ধ হয়েছিল তাঁর হৃদয়। ইংলণ্ডে বসেও দেখলেন সেই একই চিত্র। বিজিত দেশের প্রতি শাসক জাতির নির্ম্মম ঔদ্ধত্য, আচার আচরণে, বিরাট পার্থক্য, শোষণ ও শাসনের নির্ম্মম পেষণে রক্ত শোষণের চরম ব্যবস্থা —-বিপ্লবী মনের দ্বারে বার বার আঘাত হানতে লাগলো। স্থির করে নিলেন তাঁর যাত্রাপথ।

মনে পড়ে গেল দীক্ষাদানের পর কয়েকমাস, বিশেষতঃ আলমোড়া ভ্রমণকালে তাঁর মনের কোণ থেকে "দেশ ও জাতির সম্বন্ধে সংস্কার ছেদনের জন্য" স্বামিজীর চেষ্টা আর তাঁর প্রতিরোধ এমনই তিক্ত পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সে এক অন্ধযুগ বা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অথচ তাঁর কাছ থেকে নতুন বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি বা নূতন মতের ঘোষণার দাবী ছিল না এতটুকু। ১৮৮৯ সালের মে— মানসিক সংঘর্ষ আর তার কিছুদিনের মধ্যে ভারতে, ইংরাজের জাতিবিদ্বেষের রূপ দেখার তিক্ত অভিজ্ঞতা, দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল তাকে। ভারত ও ইংলণ্ডকে ভালবাসায় বেঁধে ফেলার স্বপ্ন তখনও না দেখে পারেন নি। প্রভাবশালী ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে রাজনৈতিক মনোভাবকে পরিবর্ত্তিত করে ভারতের প্রতি সুবিচার আদায়ের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কল্পনা-বিলাসে সেদিন পূর্ণ ছিল তাঁর মন। ৫ই জুন '৯৮, তারিখে চিঠি লিখলেন : ইংলণ্ড ও ভারতকে পরস্পর ভালবাসতে পারবো এটাই জীবনের স্বপ্ন। ইংলণ্ডের সন্তানগণ অনেক ক্ষেত্রেই ভারতকে ভালভাবে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করেছে, কিন্তু যে ভাবে তারা সে কাজ করেছে তা ভারতবাসীর মধ্যে যথার্থ ভাবাবেগ মূলক সাড়া জাগাতে পারেনি। প্রতি জাতিই স্বাধীনতার দাবী করে। অস্ট্রিয়া থেকে ইতালী, তুরস্ক

থেকে গ্রীস, ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষও। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ সরকার গঠনের উপযোগী হবে, তা বলশালী তৃতীয় শক্তির উপর নির্ভর করে। ঐ তৃতীয় শক্তি এমন এক দূর স্থান থেকে আসবে যা তাকে স্থানীয় সংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে মুক্ত রাখতে পারবে।

তৃতীয় শক্তিকে হলে ভাল হয়, রাশিয়া না ইংলন্ড? আমার বিবেচনায় রাশিয়া দৈনন্দিন শাসনকার্য্য আরও দয়ালুভাবে করতে সমর্থ। শাসিত প্রদেশের ভাষা, প্রদেশের গভর্নর ও বিচারকদের যাতে জনগণের ভাষা জানতে বাধ্য হয়, তাঁর ব্যবস্থা তারাই করে। আমাদের পক্ষে এটা চির ধিক্। ও ব্যবস্থা আমরা করিনি। আসামীরা এক অজানা ভাষায় মৃতুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়— কী সুসংস্কৃত নিষ্ঠুরতা।.... রাশিয়ার নিজস্ব রাজনৈতিক ... ধারণা সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্যদেশীয়। অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কোন তৃতীয় বিকল্পের কথা জানে না। ভারতীয়ের মূলে ইয়ুরোপীয় জাতি... তাদের ইতিহাস ও জাতিগত পার্থক্য, রাজনৈতিক বিকাশের যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করে, রাশিয়া তা কোনভাবেই দিতে সমর্থ নয়।"...

এর পরই এলো কয়েকমাসের মধ্যে কাশ্মীরের ঘটনা। তাঁর সমস্ত চিন্তা তচ্‌নচ হয়ে গেল। কাশ্মীরের মহারাজা স্বামিজীকে সংস্কৃত কলেজ করার জন্য কাশ্মীরে জমি দেবেন স্থির করলেন কিন্তু মিশনারীদের উস্কানীতে আর বৃটিশ সরকারের গোপন নির্দ্দেশে বৃটিশ রেসিডেন্ট স্যার অ্যাডালবার্ট ট্যালবার্ট বার বার ভেটো প্রয়োগ করে, আলোচনা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। মিসেস ওলিবুলের, মিসেস প্যাটারসনকে (আমেরিকান কনসাল পত্নী) সঙ্গে নিয়ে বৃটিশ রেসিডেন্টের দুষ্ট চেষ্টা বরবাদ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হল। ইংরাজ রমনী হিসাবে, তিনি স্থির করে নিলেন এটা ইংলণ্ডের নীচ কাজ, এটা সহ্য করা যায় না।

ইংলণ্ড 'নীচ কাজ' চালিয়ে যেতে লাগলো, তাঁর মুমূর্ষু আশার মরিয়া লড়াই, তিনি চালিয়ে গেলেন। কলকাতায় প্লেগের সূচনা, কার্জ্জন দৃঢ় অথচ সুবিবেচনার নীতি অবলম্বন করলেন। ভাবলেন : (২২-২-১৮৯৯) হয়তো ভারতে, শুভদিন আসবে। তখনও ভাবাবেগে ভেসেছিলেন, যখন তাঁরা কেউ থাকবেন না, তখন ভারত ও ইংলণ্ড এক হয়ে যাবেই!

একপাশে স্বপ্ন, অন্যদিকে বেদনাময় বিরাট বাস্তব। সম্মুখে স্বামিজী সেই বর্ত্তমানের প্রতীক। লক্ষ্য করলেন নিবেদিতা : ভারতের প্রতীক পুরুষ স্বামিজী, নিরূপায়ে ইংরাজ শাসকদের কাছ থেকে অপমান সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। ঘোষণা করলেন তাঁর বাণী : 'সবল দুর্ব্বলের উপরে অত্যাচার করলে, দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য ঐ সবলকে ছিঁচে দেবার চেষ্টা করা' "একথা ভুলো না"... "বিদ্রোহে তোমার চির অধিকার।"

বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই। গভীর মর্ম্মপীড়ার দর্শক মাত্র তিনি। ভারতে ইংরাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ইংলণ্ডে আবেদন করে কোন সাড়া পাচ্ছেন না। 'মৎসিনী'ভক্ত তাঁর বন্ধু অক্টোভিয়াস বীটি পর্য্যন্তও কাশ্মীরের ঘটনা, তাঁর ইংলণ্ডের কাগজে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। (৪/১/৯৯)

ভারত ভ্রমণকালে, স্বামিজীর নিরন্তর যন্ত্রণাময় দেশপ্রেম লক্ষ্য করেছেন। আকবর, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী ও শিখ গুরুগণের জীবনধারা নিয়ে তাঁকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছেন। যে দেশে কখনও বিশ্বাসঘাতক দেখা যায় নি, সেই জাপান, ও তার ধর্ম্ম, শিল্প, সাম্রাজ্য সংগঠন, তৎসহ স্বাধীনতার জন্মভূমি মৎসিনীর দেশ ইতালীর কথা বলতে শুনেছেন, কি ভাবে এলিজাবেথের আমলের দীন ইংলণ্ড, ভারতকে শোষণ করে ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছে তার বর্ণনাও শুনিয়েছেন। লক্ষ্য করেছেন : স্বামিজীর বন্দনার রানী "তাঁর মাতৃভূমি"— আর সে ভাবনা "তাঁর শ্বাসবায়ুস্বরূপ"। কোন আতঙ্কের চীৎকার, দুর্ব্বলতার শিহরণ, অপমানের সঙ্কোচ ছিল না— যাকে তিনি জানতেন

না বা বুঝতেন না। পাপের প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছেন, পার্থিব জ্ঞানের অভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন— নিজেদের ত্রুটি ধরে নিয়েই। আবার জন্মভূমির ভাবী মহিমার দর্শনে ভাবাচ্ছন্ন থাকতেও তাঁকে দেখা যায়নি। গৃহীর জীবনে, সাধুর অহিংসাকে উচিত বিবেচনা করেন নি, বৌদ্ধদের বাড়াবাড়ি "অহিংসার" জন্যই ভারতের পরবর্ত্তী জীবনে কাপুরুষতা— ঘোষণা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। যেখানে জয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে— কাপুরুষেরাই এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেয়। শোনালেন : যতই বয়স বাড়ছে, ততই দেখছেন, সবকিছু আছে, পৌরুষের মধ্যে। এটা আমার নতুন বার্ত্তা, পাপ যদি করতে চাও, পুরুষের মত করো, বদমাশ যদি হতে চাও, বিরাট আকারে হও। একদিন সখেদে বললেন যখন তাঁকে শোনালো হল : এ দেশে অপরাধীর সংখ্যা স্বল্প! হায়! এ যে মৃতের ... সাত্ত্বিকতা। একদিকে বিদ্যমান পৃথিবীতে অধিকার ভোগীর ক্রমবর্দ্ধমান পরিতৃপ্তি ও নোংরা স্থূলতা, অন্যদিকে বঞ্চিতের ক্রমবর্দ্ধমান যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য! পরাজিতগণের পক্ষে দণ্ডায়মান স্বামিজী। তাঁর কাছে প্রতিভাত, ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্য সভ্যতার রূপ। সেখানে, চীৎকার শুধু : যার আছে, তাকে আরও ঢেলে দাও, হৃত সর্ব্বস্বদের শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নাও। সাবধান, সাবধান! হেরে গেলেই সর্ব্বনাশ! তখন সন্ন্যাসীর গৈরিকতার বাস খসে বেরিয়ে আসছে যোদ্ধার বর্ম। একমুহূর্তে ঘটে যেতো তাঁর চরম আত্ম উন্মোচন : মর্ম্মান্তিক আঘাত পেলেই সিংহ গর্জ্জন করে, মাথায় ঘা খেলেই সাপ সোজা ফনা ধরে খাড়া হয়ে ওঠে, আর মানুষের আত্মার বিপুল মহিমা প্রকাশ পায় তখনই, যখন সে মর্ম্মে গভীর আঘাত পায়।

দর্শন পেলেন গুরুর মধ্যে বিপ্লবের মহাদেবী সেই কালীকে। চেতনায় ঝড় বয়ে গেল। খ্রীষ্টীয় সংস্কারের উপর, কালীর এই কৃষ্ণ ছায়াপাত— বৈপ্লবিক চেতনায় রূপান্তরিত হ'ল।

ভারতে আসার কিছুদিন পরেই প্লেগ ও তার টীকাদান সূত্রেই ঘটে গেল দারুণ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ। হিন্দু মুসলমানের মিলিত রোষ, শাসন কর্ত্তাদের রাজপথ নিরাপদ রইল না। সে সময়ে 'অ্যান ইংলিশ লেডি' ছদ্মনামে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখে পাঠিয়েছিলেন এক বিলাতী কাগজে (৪/৫/৯৮) : গত কয়েকমাস ধরে ইউরোপীয়রা এখানে অস্বাচ্ছন্দে আছে, মুসলমানগণ সর্ব্বদা ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। পাঁচ সপ্তাহ আগে সহরের সমস্ত রিভলবার কিনে নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে : পুলিশ অঙ্কুরেই একটি ষড়যন্ত্র বিনাশ করছে।...

অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি একত্র হয়েছে। শান্তি বিঘ্নিত। অনুগতরাও ফিস্ ফিসিয়ে বলছে বৃটিশ সরকার টলমল বুঝি ভেঙে পড়ে যে কোন মুহূর্ত্তে!

"চাঁদের চারপাশে লোহিতাভ কুয়াশা, সামাজিক জীবনে আলোড়নের সূচক।"...

আর স্বামিজী এই ঘটনার মধ্যে দেখছেন : ভয়ঙ্করী কালীর ছায়া। বললেন : ঈশ্বর শুভের মত অশুভের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন আর হিন্দুরা তাঁকে অশুভ রূপেও পূজা করতে সাহস করে। .... ভয়ঙ্করের পূজা করো, মৃত্যুর পূজা করো। ও বস্তু দুর্ব্বলের, কাপুরুষের মৃত্যু ইচ্ছা নয়, আত্মহত্যা নয়, এ হল শক্তিমানের 'মৃত্যু' সম্ভাষণ! সবকিছু জানার পরে, সকল বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে, বুঝেছেন এ ছাড়া অন্যপথ নেই।

আমি ভয়ঙ্করকে, ভয়ঙ্কর বলে ভালবাসি, নৈরাশ্যকে, নৈরাশ্য বলে ভালবাসি, দুঃখকে, দুঃখ বলে ভালবাসি। সংগ্রাম করো, অবিরাম সংগ্রাম করো— প্রতিপদে পরাজয়! তবু সংগ্রাম করো এই হল আদর্শ— এই আদর্শ শ্রেষ্ঠ জীবনের।

বিপ্লবের অমোঘ ধ্বনি শুনেছেন গুরু মুখে : উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতরা যখন একই আশা ও আতঙ্কে সম্মিলিত, সৈন্যবাহিনীর সগর্ব পদসঞ্চার, জাতি সমূহের লণ্ডভণ্ড আলোড়নের

শব্দ—মানস কর্ণে ক্রমেই উচ্চতর ও স্পষ্টতর আকারে ধ্বনিত, গুরুজীর কণ্ঠে তখন মহাস্তোত্রের বজ্রনির্ঘোষ :—

'হে ভয়ঙ্করী অমারাত্রি
হে ভয়ঙ্করী মোহরাত্রি
হে ভয়ঙ্করী কালরাত্রি

তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, সেই সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড আশীর্ব্বাদ : চিরপূজারী হও, যদি স্বয়ং মাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করে থাকেন। অনুভব কর : তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার অর্থ যুদ্ধপতাকা নিয়ে বেড়িয়ে পড়া।... জন্মসূত্রে ছিলেন চরমপন্থী। রক্তের সঙ্গে মেশানো রাজনৈতিক বিপ্লবী ঐতিহ্য। যদিও তিনি স্কট আইরিশ, ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রোটেস্টান্ট, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পিতামহ জন নোবল-এর সক্রিয় সংযুক্তি। বাবা স্যামুয়েল নোবলও ছিলেন আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। রক্ত প্রবাহে নিজেও আইরিশ, লণ্ডনে হোম রুলের জন্য 'ফ্রি আয়ারল্যাণ্ড' দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে আইরিশ দলসমূহের মুখপত্র উইম্বলডন নিউজের সম্পাদক অক্টোভিয়াস বীটীর, সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছিলেন। বন্ধুত্ব ছিল উভয়ের মধ্যে। রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তায় প্রভাবিত, জোয়ান অব আর্ক, জোসেফ মাৎসিনী ও বিপ্লবী ক্রপটকিন। ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ক্রপটকিনের সঙ্গে ১৮৯৪ সালে 'ফ্রি আয়ারল্যাণ্ড' গোষ্ঠীর এক সমাবেশে বক্তৃতার আসরে। বিখ্যাত বিপ্লবীকে দেখার আগ্রহ বহু পূর্ব্বেই জন্মেছিল, সহসা সে সুযোগ এসে গেল। পরিচয় হল উভয়ের মধ্যে। কণ্ঠে তাঁর পিতার কণ্ঠ খুঁজে পেলেন। বুঝলেন, যথার্থই তিনি একজন নেতা। থাকতেন লণ্ডনের উপপ্রান্তে। প্রায়ই যেতেন সেখানে এবং সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনা করতেন। শুনলেন তাঁর মুখেই 'বিপ্লব' দ্রুততর পরিবর্ত্তন। ১৮৪২ থেকে তিনি নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করেছেন। তাঁকে ঘিরে ছিল আদর্শ ও ত্যাগের জ্যোতিঃমণ্ডল। অভিজাত বংশের সন্তান সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পার্ষদ কর্ম্মচারী দলভুক্ত। রাজসভা জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, ১৮৬২ খ্রৃষ্টাব্দে তিনি আর্মীর কসাক অশ্বারোহী বাহিনীতে চাকরী নিয়ে সাইবেরিয়া চলে গেলেন। পাঁচবছর চাকরী করে, সরকার নিয়ন্ত্রিত শাসন শৃঙ্খলায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। বনভূমির জীবজন্তুর আচার আচরণের মধ্যে খুঁজে পেলেন অনেক শিক্ষনীয় জিনিষ। চার্লস ডারুইনের 'অরজিন অব স্পিসিস' ছিল বহু বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ। তার সিদ্ধান্তসমূহ অকাট্য বলে গৃহীত সর্ব্বত্র। তাকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন : ডারউইন কথিত সামাজিক জীবনের বর্ব্বর নিয়মকে পারস্পরিক সহযোগিতা তত্ত্ব দিয়ে খণ্ডন করা চলে। পারস্পরিক সহযোগিতা-নীতি উচ্চতর জীবজন্তুর মধ্যেও বর্ত্তমান।" "একই প্রজাতি পশুদের জীবন, নিষ্ঠুর ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষে পূর্ণ এবং ব্যাপারটি তাদের জৈব জীবনের উপর পূর্ণাধিকার বিস্তার করে আছে, ডারউইন পন্থীগণ এই সিদ্ধান্ত, যদি এই মনুষ্যজাতি উচ্চতর জীবগণের কাছ থেকে প্রাজ্ঞ আচরণের শিক্ষাগ্রহণ করে, তাহলে লাভবান হবে সমস্ত মনুষ্য সমাজ।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত অ্যানার্কিষ্ট এম. এ. বুকনিনের সঙ্গে পরিচিত ১৮৭২ সালে। তিনি এখানে জুরা ফেডারেশনের ঘড়ি নির্ম্মাতাদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। পরিশ্রমী, কুশলী সৌহার্দ্যযুক্ত ঘড়ি নির্ম্মাতা শিল্পগোষ্ঠীর ব্যবহারনীতি তাঁর কাছে সামাজিক সহযোগিতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ— পৃথিবীর সুশৃঙ্খল 'সুখী নৈরাজ্যের' উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

রাশিয়ায় ফিরে গেলেন কিছুদিন পরে। কারারুদ্ধ হলেন রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে। দু'বছর পর আশ্রয় নিলেন সুইজারল্যাণ্ডে। থাকলেন ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত। ঐ সময়ে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার খুন হলেন, ষড়যন্ত্রকারী বলে সন্দেহ করা হল তাঁকে। চলে এলেন ফ্রান্সে। এখানেই গ্রেপ্তার হলেন। পাঁচ বছর জেলে গেলেন। কিন্তু মেয়াদের আগেই ১৮৮৬ সালে মুক্তি পেয়ে

গেলেন। বসবাস শুরু করলেন ইংলণ্ডে। নির্বাসিতের জীবনে গ্রাসাচ্ছদন করছেন প্রবন্ধ লিখে। অ্যানার্কিষ্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক রূপই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু, তবে ভূগোল ও সংহত কৃষিকাজ সম্বন্ধেও লিখে চলেছেন আজও।

১৮৭২ সালে প্রথম সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে যোগ দিয়েছিলেন। বুকনিনের অনুরাগীরা ইন্টারন্যাশন্যালের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে, তিনিও তাঁর অনুগমন করেন। একসঙ্গে জুরা ফেডারেশনে যুক্ত হয়ে পড়লেন। পুরোপুরি সোস্যালিজম বা কমিউনিজম গ্রহণ করলেন না। চাইলেন : ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলয়, সেইসঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ। অ্যানার্কিষ্ট সমাজ : গোড়া থেকেই উৎপাদকদের স্বাধীন সমবায় দ্বারা গঠিত হবে, তা আঞ্চলিক জাতীয় ও অন্তর্জাতিক স্তরে, বিনা শক্তি প্রয়োগে, শিথিল ফেডারেশনে স্থাপিত হবে, কমিউনিষ্টরা এই ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখার পক্ষপাতী।

উনিশ শতকের শেষ দশকেই প্রতিষ্ঠিত লেখক তিনি। নিবেদিতা তাঁকে সৃষ্টিশীল, চিন্তাবিদ লেখক রূপে দেখেছেন। শ্রদ্ধা করেন তাঁকে মানবতাবাদী প্রতীকরূপে। চরিত্রে তিনি ঋষিযোনিত। বিহেসাবী অথচ কৃচ্ছ কঠোর জীবন বহনের সানন্দ সহনশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি রূপে অ্যানাকিস্ট আন্দোলনের পক্ষে সহানুভূতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি ইংলণ্ডে।

স্বামীজির সঙ্গে ১৯০০ সালে ফ্রান্সে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হল। যোগাযোগ তাঁর এখানেই। সঙ্গে তখন নিবেদিতা ও কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্যা ও শিষ্য।

প্রচণ্ড গতিশীল নারী চরিত্র নিবেদিতার দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্ত্তিত রূপ এখন। বর্তমানে বৃটিশ শাসনের অনৌচিত্য সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। ভারতের এই অপশাসনকে উৎখাত চিন্তায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। ক্রিপ্টকিনের মতাদর্শ ঘৃতাহুতি দিল তাঁর অন্তরে।

সিদ্ধান্ত নিলেন : ভারতীয় পটভূমিকায় প্রয়োগ করবেন এই নীতি কারণ ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনক্ষেত্রে তার বিশেষ মূল্য আছে। কিভাবে তারা (ভারতীয়রা) আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে, সংগ্রামের প্রথম পর্য্যায়ে সামাজিক সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে তুলে ইংরাজের চাপানো সাম্রাজ্যিক শাসন কাঠামোকে অকেজো করে দিতে সমর্থ হবে— তার পরিকল্পনা ক্রপটকিনের চিন্তাসূত্রে প্রস্তুত করলেন।

১৮ আগষ্ট ১৯০০ সালে তিনি একটি চিঠি লিখলেন, যদি তিনি মারা যান, তা হলে সেটিই হবে তাঁর "লাষ্ট উইল এণ্ড টেস্টামেন্ট' ক্রুপ্টকিন, অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে অধিকমাত্রায় ভারতের প্রয়োজন কি,— তা জানেন। গর্ভনমেন্টগুলির সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়তার কথাই আমি বিশেষভাবে বলতে চাইছি। ঐ জিনিষটিই আমরা শিখতে চাই। ঐ জিনিষটিই শেখার পরে জনগণের রক্ত ও স্নায়ুর মধ্যে তাকে এমনভাবে ঢুকিয়ে সক্রিয় করে তুলতে চাই, যাতে কখনও কোন রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রই যেন একটি কৃষকের উপর চেপে বসার সুযোগ না পায়। এক্ষেত্রে ভারতের সিংহাসনে কে বসলেন, ইংলণ্ডের সপ্তম এডওয়ার্ড কিংবা রাশিয়ার জার— তাতে কিছু এসে যায় না। ভারতের যথার্থ আশা তার জনগণের শিক্ষার উপর। কিভাবে এই ধরনের শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর সে সম্বন্ধে ক্রুপ্টকিন স্বয়ং বহুবর্ষের দীর্ঘ প্রচার কার্য্য রচনা, মুদ্রণ, বক্তৃতার কথা বলেছেন, যার ফল কেবল এখানে ওখানে অপ্রত্যাশিত ক্ষণে দেখা গেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের নৈরাশ্যজনক ব্যর্থতার বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাবে বলছি এইজন্য যে, কোন ধারাবাহিক নীতি তার পিছনে বর্তমান ছিল না। কিন্তু গ্রাম, সমাজ-ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো সরবরাহ করেছে। ওর তুলনায় অন্যসকল কিছুই জনগণের কাছে অপ্রয়োজনীয়, এই বিষয়ে জনগণের দৃঢ় কঠিন বিশ্বাসই ভবিষ্যতে, একমাত্র নীতি-রূপে হয়ত স্থায়ী ও ধরাবাহিক ব্যাপার বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের কি করতে হবে।

ইংলণ্ড, রাশিয়া বা অন্যকোন সরকারের ভাবনা নয়— চায় অ্যানার্কির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর ভারত ইতিমধ্যেই যেহেতু পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্যদেশ, তাই আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ঠিক বর্ত্তমানে একমাত্র ভারতেই একটি বিরাট জাতি সমগ্রভাবে ঐ গ্রাম স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের কাজে নিয়োজিত আছে। এখানেই, তাই পৃথিবীর সমস্যা সমুহের সমাধান হবে। যুদ্ধ নয়, রক্তপাত নয়, এক দিন আমরা প্রশান্তভাবে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে, তাঁকে সহাস্যে জানিয়ে দেব : তাঁকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। যতদিন না তা হচ্ছে, ততদিন ঐ উদ্দেশ্যে অন্য কিছু যদি করে উঠতে না পারি, তবু অন্ততঃ প্রত্যেক রাজতন্ত্রকে ধ্বংস হতে দেখলে আনন্দিত হব। এই চিঠিঠি নকল করে তাদের দিও, যারা আমার শেষ উইল ও বিশ্বাসের ঘোষণা জানতে চায়।"

ক্রপ্টাকিনের লণ্ডনের হাইগেটের বাস ভবনে, তাঁর যাতায়াত ছিল, ফলে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে ছিল। আলোচনায় জেনেছিলেন কেমন করে তাঁরা জনগণের মনে বিপ্লবের ইন্ধন জুগিয়ে ছিলেন : শাসক ব্যবস্থা তুলনায় অনেক ভাল কিন্তু প্রশাসকদের পাঠানো নির্দ্দেশ মেনে চলতে হয়। কেন্দ্রবদ্ধ প্রশাসন —কর্ম্মচারীরা দেশের স্বার্থ ভাবে না। তাদের চেষ্টা : উপরওলার ইচ্ছাকে শাসনযন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া। দেশের ক্ষতি হয় হোক গে! শিক্ষার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ কুড়িলক্ষ রুবল। তাও খরচ করা হত না। কারণ রাশিয়ানরা চাইতো কারিগরি বিদ্যাশিক্ষা, সরকার চাইতো গির্জ্জার কাঠামো মাফিক শিক্ষা, যাতে জনসাধারণ, বাস্তব প্রয়োজন ভুলে থাকতে পারে। আবার সে, শিক্ষা এতই কঠোর যে, অধিকাংশ ছাত্রই অকৃতকার্য্য হয়ে যেত। ফলে, শিক্ষাটা দাঁড়ালো বিলাসের সামগ্রী। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কাউন্টি কাউন্সিল বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতি খুলে যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হতো, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বেঁধে যেত সংঘর্ষ। যে দেশে ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কৃষক, ভুতাত্ত্বিকের বিশেষ প্রয়োজন, সে দেশে টেকনিক্যাল শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টাকে, বিপ্লব-পন্থার সমতুল্য বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে, শিক্ষা প্রায় নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হতে লাগলো।

এখানে ষাটদশকে, বিশেষ করে সেন্ট পিটারবার্গে, পূর্ণ ছিল প্রগতি চিন্তাশীল মানুষ, তাঁরা সব নিশ্চুপ হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এমনভাবে ঝিমিয়ে যাওয়ার কারণ কি? দুএকটি প্রবাদের ব্যবহার চালু হল : "খড়ের চেয়ে লোহা কঠিন", 'মাথা ঠুকে, পাথর ভাঙা যায় না' প্রগতিশীলেরা বললেন : আমরা কিছু তো করেছি, এর বেশী কিছু আশা করো না। ধৈর্য্য ধরো : এমন জমানা, নিশ্চয় চিরদিন চলতে পার না। তরুণরা যখন, জীবন উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইতে গেল, বারবার এই একই উপদেশ পেল শুধু।..... পুলিশ বিভাগ সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে। 'র‍্যাডিকেলিজম'এর সন্দেহ জেগেছে, অতীতে কে কি করেছেন বা করেননি, বিবেচনা নেই— যে কোন রাত্রে গ্রেপ্তার হতে পারেন! তাঁদের অপরাধ? এটা রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের জড়িত কোন অপরাধ! এটা; ওটা রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত কোন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন কিংবা খানাতাল্লাশকালে একটি নির্দোষ চিঠি তাঁর জিম্মায় পাওয়া গেছে কিংবা নিছক তাঁর মারাত্মক একটা মত আছে। রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার-যে কোন পরিণতিই সম্ভব।.... মুরাভিক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন : পিটারসবার্গ থেকে সকল চরমপন্থীর শিকড় উপড়ে ফেলবেন। এই পরিস্থিতি। বয়স্ক মানুষরা গুটিয়ে গেলেন। প্রগতিশীল যুবকদের সঙ্গে বিরাট ফারাক হয়ে গেল তাঁদের। কি ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ বা সমাতন্ত্রের পক্ষে লড়াই বা সাধারণ রাজনৈতিক অধিকারের দাবী, কোনটাতেই সাহায্য পেল না নবাগতরা। সেদিন নিজেকে প্রশ্ন করে ছিলাম— ইতিহাসে, পূর্ব্বে কি এমন কোন নজির আছে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-এ অগ্রসর তরুণদল, তাদের পিতা বা অগ্রজদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যজ্য হয়েছে? তারা তো তাঁদেরই চিন্তার উত্তরাধিকারী। মনেপ্রাণে সে রূপদান ব্রত গ্রহণে তারা ব্রতী! এই ট্র্যাজিকের মধ্যেই, তারা

সংগ্রাম সুরু করলো। গ্রামে, গঞ্জে তরুণরা ছড়িয়ে পড়লো, কেউ ডাক্তারের সহকারী হয়ে, কেউ শিক্ষক হয়ে বা খাতা লেখার কর্ম্মচারী বা কৃষি, শ্রমিক, বা কামার, ছুতোর হয়ে। ধাত্রীবিদ্যা শিখে শত শত সংখ্যায় গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো অথচ গ্রাম-সংগঠন-শিক্ষা পর্য্যন্ত ছিল না তাদের। শুধু আন্তরিকতা, সাধারণ মানুষকে সাহায্য ও অন্ধকার দুঃখজীবন থেকে, তাদের তোলার উদ্দেশ্যে।

বিকেন্দ্রীকরণের নামে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তন করা হল। যেই কাউন্টি-কাউন্সিল, সেই ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাইলো : তারা ঘৃণা ও সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়ালো। বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা, বলে ধিকৃত হল। অপবাদ দেওয়া হল, রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা— এটা। মন্ত্রীদের নির্দ্দেশ পালন ছাড়া অন্যকিছুর অধিকার তাদের নেই।

সর্ব্বত্রই একই চিত্র। রাজনৈতিকদল নিজেদের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করার পর ঘোষণা করলো: পূর্ণ লক্ষ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হবে না— সেই দলই, দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল আদর্শকে ধরে রাখলো, অন্যদল, 'ঘোষিত আদর্শের একচুল ব্যতিক্রম হয়নি' সজোরো ঘোষণার পর, কোন না কোন আপোষ রফার পথে এগিয়ে এলো। এই আপোষ বেড়ে চললো ক্রমান্বয়ে— শেষে, প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে বহুদূর পিছিয়ে গিয়ে, এখানকার মত, এতেই চালিয়ে নেওয়া যাক ধরনের, নম্র-নত-শাসন সংস্কারের সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো।

বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আঘাতের পথ ধরলো। (১) পার্টির মধ্যে যে সব স্পাই ঢুকে গিয়েছিল, (২) যারা বন্দীর উপর অত্যাচার চালাতো, (৩) যে সব পুলিশ প্রধান, সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অধিকারী, এঁদের সকলের বিরুদ্ধে।

এঁদেরকে রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল গুপ্ত পুলিশ বাহিনী। তারা অফিসারের ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করে অপর মানুষদের মধ্যে বিপ্লব-কথা বলার জন্য প্রনোদিত করতো, তারপরই তাদের পাকড়াতো। প্রত্যেক বিপ্লবীই এই ধরণের উস্কানিদাতা এজেন্টের খপ্পরে পড়ে গেলেন। এই চরদের পুষতে সরকার অনেক খরচা করতে লাগলো।

সমাজের উচ্চবর্গের মধ্য থেকে সংগৃহীত চরদের নৈতিক চরিত্র, আস্তাকুড়ের অধম। বিপুল সংখ্যক ট্র্যাজিডি ঘটে গেল। আর ঐ জোচ্চরগুলো, আরামের জীবন শুরু করলো। চারদিকে পাতা ফাঁদ, মর্ম্মন্তুদ ঘটনায় বিধ্বস্ত অগনিত জীবন, সর্ব্বত্রই ছড়ানো জীবনের দুঃখবেদনা। মানুষ আতঙ্কিত না হয়ে কি পারে?....

ভারত ও রাশিয়ার সমাজ-সংগঠনের চিত্র এক। উভয় দেশেই গ্রাম একক মাত্রা। ভাষা ও আচার ব্যবহারের কিছু পার্থক্য বাদ দিলে, উভয় দেশের গ্রামগুলি সাধারণ-রূপে কত না ঐক্য।

নিবেদিতা নিজের চোখে এদেশের মানুষকে দেখেছেন। তাদের মধ্যে সহজ প্রজ্ঞার অদ্ভুত প্রকাশ। কৃষক নিজের হাতে কাজ করে, তার অভিজ্ঞতা বস্তুনিষ্ঠ। সেই কারণেই তারা সহজবুদ্ধির অধিকারী।

কিন্তু তিনি (ক্রপ্টকিন) বললেন : ওটা সহজবুদ্ধির কারণ নয়— গভীরতর কারণ হল— কৃষক সামাজিক মনের সংস্পর্শ থাকে। আমরা লাগোয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রূপ দেখো:— আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। পরস্পরের নাম জানি কিনা সন্দেহ— পরস্পরের কাজকর্ম্মের সংবাদ তো রাখিই না। আমাদের সম-স্বার্থ আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা অসচেতন। এই হল আধুনিক নগর-সভ্যতার চেহারা। কৃষকের যুক্তি, শক্তি আসে সমগ্র সমাজের বুদ্ধি উৎস থেকে, আর সম্বল আমাদের ব্যক্তি-বুদ্ধি।

আলোকজ্জ্বল মন্তব্য। নিবেদিতার চোখের সামনে খুলে গেল ইতিহাসের বিস্তীর্ণ অধ্যায়গুলি। কিভাবে গ্রাম চৈতন্য, অতীতে জাতীয় সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল— সেই ইতিহাস। সদুঃখে অতীত ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক যুগের তুলনা করলেন : আধুনিক যুগ, অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নয়, ব্যাপৃত ক্ষয়কার্য্যে।

বলে চললেন ক্রপ্টকিন : পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করেছি। শিখেছি মানবতার জন্য উৎসর্গীত কোন চিন্তা বা শব্দ, কখনও নষ্ট হয় না। মন্দ বস্তু বা সমাজবিরোধী কাজ— ধ্বংস হয়, শুভ কাজের মৃত্যু নেই। তরঙ্গের উত্থান, বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু সব স্থায়ী। কারাবাস, নির্ব্বাসন, উৎপীড়ন, প্রাণদণ্ড— কৃষকদের রাজনৈতিক বুদ্ধি ও চেতনা বাড়িয়েছে।

প্রশ্ন করলেন : কোণ মৌলিক ভাবের দ্বারা, এই সাধারণ শিক্ষার অবস্থান স্থির করলেন?

জবাব দিলেন ক্রপ্টকিন : তাদের শিক্ষা দিয়েছিলাম, জানো এ জমি কার? এ জমি তোমার। তোমার পিতৃপিতামহগণ পরিষ্কার করেছেন, বীজ বপন করেছেন, শষ্য উৎপাদন করেছেন। মালিককে এক্ষেত্রে খাজনা দেবে কেন? মালিকই তো তোমাদের দেবে, ঐ জমিতে বসবাসের অধিকার পেয়েছে বলে । এভাবটি তাদের প্রাণের গভীরে ঢুকে গেছে। জমিকে তারা এখন নিজস্ব মনে করে, কর্ত্তারা তাদের সেবক।

প্রশ্ন করলেন : প্রতিটি প্রদেশে, তারা একযোগে উত্থিত হচ্ছে না কেন? তা হলে তো, বিপ্লব সফল হয়ে যায়?

সহাস্যে বললেন ক্রপ্টকিন : আমরা সতেরো কোটি মানুষ, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠন সহজ ব্যাপার নয়। কারণ, ভূমির মালিকরা 'কনষ্টিটিউশন' চায়, গ্রামগোষ্ঠীর জন্য, অধিকার চায় গোষ্ঠীর। কৃষকগোষ্ঠী চায় সামাজিক বিপ্লব— জমি, গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধীন হোক। যত দিন না জমির মালিকরা কৃষকদের সমর্থন করছে, কোন ফল লাভ হচ্ছেনা ততদিন।

প্রশ্ন করলেন নিবেদিতা : তা ঘটার কোন আশা আছে কি?

উদ্দীপ্ত ক্রপ্টকিন শুধালেন : আশা রাখতেই হবে। একই জিনিষ, ফরাসি বিপ্লবের সময়ে হয়েছিল। ফ্রান্সের গৌরব ১৭৯৩ সালে সেখানের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ক্ষতিস্বীকার করেও জমির অধিকার দিয়েছিল কৃষকদের। ফলে, 'বিপ্লব' জাতীয় স্তরে পৌঁছে যায়, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত করে তোলে। সকল বিপ্লব, এই মূল প্রশ্নের সম্মুখীন। জনগণের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি সে দেবে? রাশিয়ার কৃষকেরা যে জমিতে বসবাস করে, তারা তা কিনতে চায়, কুড়ি, ত্রিরিশ, পঞ্চাশ বছরে শোধ করবে। তারা, দান চায় না, তারা চায় বিভিন্ন দফায় দাম দেবার যুক্তিসঙ্গত সুবিধা। অবনত, অবদমিতদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা ছাড়া 'বিপ্লব' কোনদিন সফল হতে পারে না। ওখানে (রাশিয়ায়) মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিভিন্নস্তরে সুসংগঠিত। নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী ইউনিয়ন আছে। ধাত্রী, ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার সকলেই নিজ নিজ ইউনিয়নভুক্ত। এখন ছাত্ররা, যারা প্রচারের ভূমিকা নিয়েছে, গ্রামবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করছে। অপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটে গেছে। ট্রেন অচল বিভিন্ন প্রদেশে। খাদ্যবস্তু জমে গেছে, সেন্ট পিটার্সবার্গে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। রাতে, পথঘাট অন্ধকার। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। নিকোলাস কনষ্টিটিউশনে স্বাক্ষর দিলেন কিন্তু গোপনে পুলিশকে খবর পাঠালেন, তা যেন বরবাদ করা হয়। যারা এতদিন গ্রামে গ্রামে শিক্ষাদানের কাজেব্রতী ছিলেন, বন্দী হলেন একে একে, পাঠানো হল নির্ব্বাসনে।

খোঁচা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নিবেদিতা বললেন : সংবাদপত্রকে তো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন জার নিকোলাস!

ধমক দিয়ে উঠলেন ক্রপ্টকিন : স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে? স্বাধীনতা কখনো দেওয়া হয় না— স্বাধীনতা সকল সময়ে কেড়ে নিতে হয়। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন : সাহস, বন্ধু সাহস! জেনো কোনোভাবেই স্বাধীনতাকে দীর্ঘকাল আটকে রাখা যায় না।

তিনি (নিবেদিতা) মনে প্রাণে ছিলেন 'ম্যাৎসিনী' পন্থী। তাঁর জীবন ও কার্যাবলী তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ ও সর্ব্বাত্মক সংগ্রামে। বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন : 'ফরাসী বিপ্লব' একটি বাস্তিল, একটি শাসনতন্ত্র ও একটি গিলোটিনের তাৎপর্য্য নয়, বহন করে এনেছিল

সমগ্র মানুষের অধিকারবোধ, স্বাধীনতাবোধ, সাম্যবোধ— যা সার্থকমণ্ডিত করেছিল বিপ্লবের মহান সেই বার্ত্তা। প্রতি মানুষের মধ্যে সমষ্টি সংকল্পের-শক্তি সম্বন্ধে এনে দিয়েছিল সচেনতা, জাগিয়েছিল প্রত্যয়।.... আর মাৎসিনীর শিক্ষায় বিদ্রোহের ফল কি? পৃথিবীর সব কিছু খোয়ানো— মায় জীবনশুদ্ধ। পিছনে পড়ে থাকবে বন্ধনের মুক্তি, আত্মার স্বাধীনতা।.... চরিত্র ভিন্ন, আত্মত্যাগ হয় না, মূলে থাকে ঈশ্বর বিশ্বাস। যতদিন স্বার্থের ভিত্তিতে আত্মত্যাগের চেষ্টা, ততদিনই মিলে অনুগামী, কথায়— কাজে নয়।... চাই ঈশ্বর বিশ্বাস, তবেই লাভ হবে কর্ম্মপ্রেরণা। ঈশ্বর বিশ্বাস সঞ্চারিত না হলে, শিক্ষাদাতা আচার্য্যের ভূমিকা নিতে সমর্থ হয়না। জীবন মানে, আদর্শের জীবন— কর্ত্তব্যই, তাঁর প্রথম নীতি আর স্থির-প্রত্যয়ই তার চলার পাথেয়। তিনি স্থির করে নিলেন তাঁর ভবিষ্যৎকর্ম্মপন্থা।

ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নভেম্বরের শেষের দিকে মিশরে স্বামিজী যখন ভ্রমণরত, সহসা খবর এলো, মিঃ সেভিয়ার ইহলোক ত্যাগ করেছেন। জাহাজ ধরলেন ভারতের পথে। কলকাতায় পৌঁছলেন ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে, যখন মঠে খাবার ঘণ্টা বাজা সুরু হয়েছে।

মিস ম্যাকলাউড যাত্রা করলেন জাপানে। উদ্দেশ্য কর্ম্মকেন্দ্রের সন্ধান।.....

স্বামিজী, আমেরিকায় অনেক শিষ্যা পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলই ছিলেন তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ। এঁরাই পরিপূর্ণরূপে চিনেছিলেন স্বামিজীকে। আমেরিকাকে কেন্দ্র করে, জগত সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ, তথা অতীত ভারতের আধ্যাত্মিক-দর্শন-বার্ত্তা— প্রচার করলেন : বৈদিক-ধর্ম্মের বার্তা। এই দুই বিদূষী মহিলাই তাঁর ধূমায়িত অন্তরের রূপকে দর্শন করেছিলেন। উভয়েই ছিলেন প্রতিপত্তিশালিনী, বিত্তশালী ও ধনকুবের। সমাজে ছিল প্রভাব, পরিচিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে।

মিসেস বুল, তাঁর অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে, তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে ফলবতী করার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন, আর মিস ম্যাকলাউড ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনিই জেনেছিলেন তাঁকে পরিপূর্ণরূপে। প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর স্বাধীন-সত্তার বিকাশ আর সচেষ্ট ছিলেন তাঁর মনোগত-ইচ্ছার বাস্তব রূপদানের প্রচেষ্টায়। মিসেস বুলের সহায়তায় রূপ নিল বেলুড় মঠ। পরিচালনের জন্য দান করলেন এককালীন অর্থ। এছাড়াও কাঁধে নিলেন নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সাহায্য করতে লাগলেন নিবেদিতাকে স্বামিজীর-ইচ্ছা পরিপূরণের আশায়। স্বামিজী নিবেদিতাকে যেরূপে চিনেছিলেন, দিয়েছিলেন কন্যার মর্য্যাদা, মিসেস বুল তাঁকে গ্রহণ করলেন ধর্ম্মকন্যা রূপে। বুঝেছিলেন : স্বামিজীর অন্তরের বাসনার রূপদান তাঁর দ্বারাই সম্ভব। এছাড়া, নিভৃতে যেরূপ সাহায্য করে এসেছেন বিশ্বের জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তিদের, তেমনি ভারতের কাজে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র (বসু) কে। উৎসাহ দিয়ে, তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করে গেলেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

ভক্তের কাছে স্বামিজী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নানা চিঠিপত্রে। মিস ম্যাকলাউড ব্রতী হলেন সেই ইচ্ছাপূরণে। স্বামিজীর স্বপ্ন ছিল শুধু আধ্যাত্মিক জগত জয় নয়, পোষণ করতেন পরাধীন দেশমাতার শৃঙ্খল-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মিস ম্যাকলাউড এগিয়ে এলেন সেকাজে। চন্দননগরের মধ্য দিয়ে অস্ত্রপাচারের চেষ্টা করলেন, নিজস্ব ব্যয়ে। ধরা পড়ে গেল নৌকাসহ সেসব অস্ত্র। শাসককুল সে সূত্রের সন্ধান খুঁজে পেলেন না। সারা এশিয়া পদানত, স্বাধীন শুধু জাপান। স্বপ্ন দেখছে : এশিয়ার মুক্তি। জাপান যাত্রা তাঁর সেই উদ্দেশ্যে। পরিচয় হল শিল্পী ওকাকুরার সঙ্গে। তিনি কবিতাও রচনা করেন রাত্রে। ঘরটি তাঁর কবিতায় ঠাসা। জন্ম তাঁর ১৮৬২ সালে। বাল্যকাল

থেকে পুরাতনী সংস্কৃতির অনুরাগী। ১৮৮০ সালে কলেজ ছাড়ার পর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্লাব, সোসাইটি সংগঠনে তৎপর। ঘুরেছেন ইউরোপ ও আমেরিকা ১৮৮৬ সালে জাপানের আর্ট কমিশনের সদস্যরূপে। পাশ্চাত্যে শিল্পের সাক্ষাৎ পরিচয়ের পরও প্রাচ্য শিল্পের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর অনুরাগী। জাপান সরকার তাঁকে টোকিও নিউ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ করে, ইউরোপীয় শিল্পরীতি অনুসরণের জন্য চাপ দেওয়ায় ১৮৯৭ সালে সে পদ ত্যাগ করলেন। তরুণ শিল্পীদের নিয়ে টোকিওর শহরতলীতে 'নিপ্পন বিজিৎসু' বা 'হল অব ফাইন আর্টস' স্থাপন করেন। পরে পুনরায় সরকারী প্রতিষ্ঠান ইম্পিরিয়াল আরকিওলজিক্যাল কমিশনের প্রধান সংগঠক হন। ১৯০১ মে মাস থেকে তাঁর কাছে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শিল্প পাঠ নিলেন মিস ম্যাকলাউড। উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হল বন্ধুত্ব। যে নোট, তিনি নিতে লাগলেন, সেগুলিই ধাপে ধাপে পাঠাতে লাগলেন ইংলণ্ডে, সেইসঙ্গে জানালেন ওকাকুরার মনভাব, ভারতমুক্তি তথা এশিয়ার মুক্তির স্বপ্ন। তখন নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের আশায় অবস্থান করছেন ইংলণ্ডে। সেগুলিই পরে গ্রন্থীভূত করে, তিনি (নিবেদিতা) নোতুন রূপ দিলেন 'আইডিয়াল অব ইষ্ট' বইটির।

নিবেদিতা সে সময়ে মনে প্রাণে বৃটীশ শাসন বিরোধী। ঝলসে উঠলেন : সে সব নোটগুলি পাঠ করে। নরওয়ে থেকে ১৯০১ এর ১৯শে জুলাই, চিঠি লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : তোমার পাঠানো কাগজপত্র আমাকে অসীম আনন্দ দিয়েছে।.... আমেরিকা ও নরওয়ে— এখন জাপান থেকে এই কথা শুনে আমি অফুরন্ত সাহস পেয়েছি। স্বামিজীর কাছ থেকে খাঁটি বস্তু কিছু পেয়েছি বলেই, এ জিনিষ সম্ভব হয়েছে, নচেৎ হতনা।

মিস ম্যাকলাউডের চিঠি ও জাপানী কাগজপত্তর থেকে ওকাকুরাকে সম্পূর্ণ জানার অবকাশ ছিলনা— পরিচিত হলেন তাঁর শিল্পবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক মত ও পথের গোপন ইঙ্গিত— যা, সশস্ত্র বিপ্লবের অঙ্গ।

বর্ত্তমানে তাঁর (নিবেদিতার) লক্ষ্য, পরাধীনতার-শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। স্বামিজীর বিরাট ও সর্ব্বাত্মক ভাবকে, বিশেষ খাতে চালিত করা। ৭ই মার্চ্চ, মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : স্বামিজী আছেন মূলবস্তুতে, বাদবাকি অন্য আন্দোলনগুলি, বাইরে প্রকাশিত কিছু কিছু লক্ষণকে আক্রমণ করতে তিনি ব্যাপৃত। ১৫ই মার্চ্চ জানালেন : বিশেষ পথ তিনি অবলম্বন করতে চান— তা হল রাজনৈতিক পথ। নিজের বিষয়ে এই বলতে পারি : তোমার আশীর্ব্বাদে আমি অভীষ্ট কর্ম্মের যোগ্য হব।..... অনুভব করছি, সমস্ত মানুষের মধ্যে আমিই যেন সে বস্তুকে, তার ঠিক চেহারায় দেখতে শুরু করেছি। একথা নিশ্চয় ঠিক যে, স্বামিজী ছাড়া আর কেউ তাকে দেখেনি। আরও জানি যে, তাঁর দর্শন আমার দর্শন ব্যাহত করছে না, বরং তাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

১০ই জুন তারিখে জানালেন : কংগ্রেসে বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা— আশা করছেন স্বামিজীও তাই করবেন।.... "মহা আতঙ্কে" দেখছি, আমার কাছে স্বাধীনতা মূল্যবান হয়ে উঠছে, কারণ আমার জীবন এখন অনেক কিছু বস্তু গ্রহণ করেছে। স্বামিজী সম্ভবতঃ যা দান করতেন না, সে সকলই, অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁর জন্য নিৰ্দ্ধারিত— আমার তো তাই বিশ্বাস— আর এখন, এই ব্যাপারের জন্য তিনি নিশ্চয় আমাকে কন্যাস্নেহ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

১৯শে জুলাই ১৯০১ স্বামিজীর বাণী ও পরিকল্পনার বিশালতার কথা ব্যক্ত করে নিজের জন্য তীক্ষ্ণ পথ গ্রহণের কথা জানালেন :

"হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে যখন, স্বামিজীর রচনার পৃষ্ঠা ওল্টাই, তখন তার বিশালতা আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়। তারপরে আত্মসংবরণ করে চিন্তা করি, তাঁর জ্ঞান ও কীর্ত্তির বিপুল ভারই বোধহয় এই মুহূর্ত্তে ভারতের জন্য। যে-সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, তৎসহ স্পষ্ট নিনাদিত কণ্ঠস্বরের

সর্ব্বাধিক প্রয়োজন, তা ঘোষণার অন্তরায়। আমার অজ্ঞতা ও অগভীরতাই বোধ হয় আমার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। তাই বলে, চিরকালের জন্য স্বামিজীর বাণীই যে 'চরম ও পরম বাণী'— এই বোধ আমার নেই তা নয়। সে বোধ আমার আছেই। কিন্তু দারুণ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, কোন এক পুরুষে কার্য্যকর করার পক্ষে ওটি অতিরিক্ত বৃহৎ। ওর থেকে একটা সূচী মুখ বার করতে হবে।"

ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের বুদ্ধিমান ছোকরাদের স্বর্ণলোভী ধরালো বুদ্ধির উল্লেখ করে বললেন "ঐ ধরনের বুদ্ধির বাহ্য ঝলক, কোন মহান জাতির সর্ব্বোচ্চ বস্তু নয়। এব্রাহামলিঙ্কনের ঘরোয়া ঐকান্তিকতা ও সহজতার মধ্যে তা লক্ষগুণে আধিক পাওয়া যায়। লিঙ্কনের সম্বন্ধে এখানে একটা বই আছে, তার মধ্যে জনৈক জনসনের কথা পাই। ঐ ব্যক্তি যখন 'ন্যাশভিলা' রক্ষা করছিলেন, তখন তাঁর এক সহঅফিসার স্থির করলেন সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করবেন। তাতে ইনি বলেছিলেন : 'আমি কিন্তু ধার্ম্মিক লোক নই, তবে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বাইবেলকেও বিশ্বাস করি, সুতরাং বলতে পারি, আমি নরকে যাব, যদি 'ন্যাশভিল' আত্মসমর্পন করে। কী লোক! আহা! যদি ভারতে ঐরকম দু'একটি লোক থাকতো!"

জনগণের পথের সন্ধান ভারতবর্ষকে দিতে উৎকণ্ঠিত তিনি। মিস ম্যাকলাউড তাঁর জাপানী কাগজপত্র পাঠাতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে ৩রা অক্টোবর তাঁকে লিখলেন : তিনি তখন Home of Retreat of the Sisters of Bethony (খ্রীষ্টীয় ভগিনী নিবাসে) অবস্থান করছেন। সেখানের অব্যাহত ঐকান্তিক ঈশ্বর বিশ্বাস ও আনুগত্যের রূপ দেখলেন। তারই উল্লেখ করে বললেন:

"এই প্রকার চরম তীব্র শক্তির একটি যন্ত্র স্থাপন করে, সেটিকে মানুষের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করার জন্য, আমি কি না দিতে পারি। কাজের খুঁটিনাটি চেহারা এখনো স্পষ্ট হয়নি আমার কাছে, তবে আশা করি 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের অনুরূপ একটি ছোট বই লেখার কোন না কোন ভাব আমার মধ্যে এসে যাবে— যার নাম দেব 'স্বাধীনতা'। সে বইটি যদিও রাজনৈতিক না হয়ে ধর্ম্মীয় বই হবে, কিন্তু পুরো রাজনীতি তার অন্তর্গত থাকবে।... পরিকল্পনার কথা কিছু বলছিনা, কারণ তা এখনো সন্দেহজনক স্তরে। ভারতে ফেরার পথে জাপান ঘুরে যেতে পারি, যেহেতু সেন্ট সারা (মিসেস বুল) তার প্রয়োজন অনুভব করেন।...তদুপবি, তিনি অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছেন, ও কাজ করলে আমি স্বামিজীর কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়বো। আর আমি অনুভব করছি, ওর ফলে, ব্যাপারটার মধ্যে সরাসরি এগিয়ে যাওয়া যাবে।"

.....বুয়োর যুদ্ধে ইংরাজদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত অধঃপতন সূচিত হয়েছে।.... ইংলণ্ডের মধ্যে যা কিছু মহৎ ছিল, সবই যেন মরে গেছে। সোনার গুড়োর লোভে পাগল একদল পাবলিক স্কুলের ছাত্রকে প্রতিনিধিত্ব করতে দিয়ে ইংলণ্ড পরিতুষ্ট।

আমি তোমাকে একান্তভাবে বলছি : ভারতের জন্য, সরকারের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমার মতে, জনগণ নিজের জন্য নিজেরা করেনি, এমন সমস্ত কাজই মন্দ কাজ— যত চমৎকারই তাদের চেহারা হোক। যতদিন যাচ্ছে, ক্রমেই আমি দেখছি, একদা যাকে (যে মতকে) ব্যক্তির পক্ষে সত্য বলে মনে করেছিলাম, সম্প্রদায় সমূহের পক্ষেও তা সত্য। শিশুকে ছবি আঁকা শেখাবার শিল্পী, শিশুর ছবিতে তুলি বুলিয়ে - তাকে চমৎকার করে তুলতে পারেন কিন্তু শিশুর একটা নিজস্ব হিজিবিজি ছবি, ঐসব সংশোধিত হাজার হাজার ছবির চেয়ে অনেক মূল্যবান। দেশ সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। দেশবাসী নিজেরা যা উৎপন্ন করে তা উত্তম, আর তাদের হয়ে যা তৈরী করে দেওয়া হয়, তা হল সাজানো রঙিন প্রদর্শনী।

ভারতের জন্য আমি কিছুই করছিনা, আমি শিখছি আর তড়িৎস্পর্শে শিউরে জাগছি। কিভাবে চারা-গাছ বেড়ে ওঠে, তাই দেখতে চাইছি। সেটা বুঝে উঠতে পারলেই, মনে হয় আমি জানব যে, ওটিকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার দরকার নেই। ভারত জ্ঞান, সাধনায় নিমগ্ন

ছিল, সেইসময় একদল ডাকাত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাঁর ভূসম্পত্তি ধ্বংস করেছে। ফলে, ভারতের তন্ময়ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। ডাকাতদল তাকে শেখাবে? না। ডাকাতদের খেদিয়ে দিয়ে, ভারতকে ফিরে যেতে হবে স্বভূমিতে। এখন এইধরণের প্রচেষ্টাই, ভারতের পক্ষে যথার্থ কার্য্যক্রম। সুতরাং যতক্ষণ সরকার বিদেশী, ততক্ষণ খ্রীষ্টান-মিশনারী বা সরকারের তাঁবেদারদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া নয়। যা-কিছু ভারতীয়, তা যত তুচ্ছ ও অর্থহীন হোক, তার পদস্পর্শ করি। বাদবাকী যা কিছু, তারা যত না ভাল করবে, মন্দ করবে বেশী। তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ আমার পথও কিছু মন্দ করবে, কিন্তু আমার পথ জনগণের পক্ষে মূলগত অপরিহার্য্য— ভাল বা মন্দ যাই ঘটুক, সে সবই তাদের নিজস্ব, অন্য কারো নয়। তাই ক্ষতির পরোয়া করি না। ভারতের প্রয়োজন আছে তা।

হে ভারত ! ভারত! আমার জাতি, তোমার যে ভয়ানক ক্ষতি করেছে, কে তার অপনোদন করবে? হে ভারত! তোমার সন্তানগণের মধ্যে, যারা সর্ব্বপেক্ষা সাহসী, তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন এবং শ্রেষ্ঠ— তাদের উপর এই যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অপমান বর্ষিত হচ্ছে, কে তার একটিরও প্রায়শ্চিত্ত করবে, বলো?

ইংলণ্ডে অবস্থান করে ভারতের মঙ্গলের জন্য কিছু করার চিন্তা কি, না হাস্যকর মনে হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না। ওটা সময়ের নিতান্ত অপব্যয়। তুমি কি ভাবো, ক্ষুধার্ত্ত নেকড়েকে শান্তশিষ্ট শিশু করে তোলা যায়? তাদের, বাচ্চা মেয়ের মতো নম্রমধুর করা যায়? ইংলণ্ডে অবস্থান করে, ভারতের জন্য কাজ করার মানে তাই। ইংলণ্ডে কাজ করার দরকার অবশ্যই আছে, কাজ করতেও হবে, সে কাজের রূপ জানো? স্বামিজী, ডঃ বসু, মিঃ রমেশ দত্ত'র মত মানুষেরাই ইংলণ্ডে এসে, নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন ভারত যথার্থতঃ কী এবং কী হতে পারে। অবশ্যই এখানে তাঁদের লক্ষ লক্ষ বন্ধু, অনুরাগী ও শিষ্য করতে হবে। ফলে, এখন থেকে কুড়ি বছর পরে যখন আঘাত হানা হবে — তা হবেই আমি জানি, তখন সহসা ইংলণ্ডের একদল নরনারী উত্থিত হয়ে বলবে, যে ভূমিকায় তারা নিজেদের কখনো দেখবে বলে ভাবেনি, 'তফাৎ যাও'! এ মানুষগুলি অবশ্যই স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে — ওকাজ তো প্রায়োশ্চিত্তের, ওটা ভারতের জন্য ইংলণ্ডের কাজ নয়, বুঝলে? আর আমি ঐ প্রায়োশ্চিত্তের কাজ করার জন্য জন্মাইনি।

ভারতে এখন আমরা চাই— কি চাই? আমরা চাই, পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা যেন আমাদের কাছে, আমাদেরই বার্ত্তা বহন করে আনে। ধীর বিকাশিত সংগঠনী শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে আমরা চাই। মনে করোনা যে, শিশু-শিক্ষা, বৃক্ষরোপণ বা কৃষিকার্য্য প্রভৃতির কথা আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু একসঙ্গে চাই-আহ্বানের ঝঞ্ঝনা, লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্মাদনা, মৃত্যুপিপাসা। এগুলিকে কোনমতে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের প্রয়োজনের বিরাট আকারের কথা ভাবলে, নৈরাশ্যবোধ করি, কিন্তু মনে পড়ে যে, কালপূর্ণ এবং আমরা নয়, মাই কাজ করেন, তখন সাহস ফিরে পাই।

স্রোতে গা ভাসান দেওয়াই এখন আমাদের কাজ— যেখানেই তা নিয়ে যাক। যে পুরো বাণীটি পেয়েছি, তার উচ্চারণ যেন করতে পারি উত্তাপের ক্ষণটিতে, যেন আঘাত হানতে পারি। ব্যর্থ হব না— এই আশা কি সাহসের সঙ্গে পোষণ করবো না? আমার কাজ : দেখা এবং দেখানো। বাকী আপনিই হবে। দর্শনের কালই তো সন্ধিক্ষণ।

আমি কী বোধ করছি, এবং কেন করছি বুঝতে পারছো? আমার কাছে এখন, যে কোন মিশনারী, একটা সাপের মত। যাকে পায়ে পিষে মারা দরকার। সে যত ভাল করবে তত মন্দ, অন্ততঃ আমার কাছে। ওদের বিষয়ে রায় দেবার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্র সময় দিতে পারবো না। শাস্তি যদি দিতেই হয়, দ্রুত অভিযোগ জানিয়ে তা সমাধা করে ফেলাই ভাল।

ইংরাজ কর্ম্মচারীরা নির্ব্বোধ। ধূমায়িত ধ্বংশস্তূপের মধ্যে, খেলে, বেড়িয়ে, তারপর বড় রাস্তায় উঠে, তারা চেঁচাচ্ছে আমরা ভাল গড়তে পারি! আর দেশী খ্রীষ্টানরা, স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক। এইসকল এবং অন্য কোন তাঁবেদার ও গুপ্তচরদের জন্য ভারতের প্রয়োজন নেই, ধৈর্য্য নেই। একেবারে ভিন্ন ধরণের কাজের মানুষ তার চাই, যারা তাকে রক্ষা করবে কিংবা কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, দেখিয়ে দেবে। কংগ্রেস নির্ব্বোধ সন্দেহ নেই, ক্ষেত্রবিশেষে বজ্জাতও কিন্তু .তারা মিঃ টাটার পরিকল্পনা বা সোরারজি-মতলব থেকে দশহাজার গুণ ভাল। জানা মানুষদের মধ্যে স্বামিজীই সবকিছুর মূলদেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন, জাতীয় মানুষ গঠনের কথা বলেছেন কিন্তু জানি না-ঐসব অন্যতম বিষয়গুলির পরিকল্পনা তিনি করেছেন কি না; মনে হয়না করেছেন।

আমাকে ভুল বুঝো না। ভারত যদি একবার আত্মরক্ষার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে সে ইচ্ছামতো যে কোন বিদেশীকে, খ্রীষ্টানকে এখানে ওখানে কাজে লাগাতে পারে। সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু বর্ত্তমানে তারা মিশনারী ইত্যাদির ঘাড় ধরে, ভারতকে আফিম মেশানো মিষ্টি সরবৎ খাইয়ে, তার নাম দিচ্ছে শিক্ষা।

যদি তোমার মনে হয় আমার সমস্ত কথাই ভুল এবং বিপজ্জনক, তাহলে তোমার পাদস্পর্শ করে, তোমার কাছে অনন্ত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমি নিজের পথে চলে যাবো। যে ভিশন দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তাকে কাজে পরিণত করতে হবেই আমাকে।

৩রা অক্টোবর লিখলেন : বৃহত্তর, অনাস্বাদিত এক প্রশান্তির অনুভূতি আমায় তলিয়ে দিচ্ছে। এটা কি প্রস্তুতির অংশ? অথবা এও হতে পারে, আমার সামর্থ্য চরমে উঠে এবার অস্ত যেতে বসেছে। কিন্তু যদি তাই হয়, তা হলে সে মায়ের দোষ। আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। মায়ের যা ইচ্ছা, তাই তিনি গ্রহণ করবেন। তোমার মূল্যবান বন্ধুর উক্তি একেবারেই ভ্রান্ত। কোন দেশে বিদেশী শাসনের অর্থ কি, সে বিষয়ে তাঁর বা তাঁর মত ব্যক্তিদের যদি সামান্যতম ধারণা থাকতো, সর্ব্বোপরি, ভারতের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী শাসন, কোন নৈতিক অধঃপতন, ঘৃণ্য দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে চলেছে, তা যদি তিনি জানতেন, তাহলে মানবতার বিরুদ্ধে ওরকম কুৎসা করার চেয়ে তিনি নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে দিতেন। ঐ একটিমাত্র রাজনৈতিক ধারণা সম্বন্ধে আমি একেবারে অসহিষ্ণু। আমি যদি জাতীয় সরকারের কর্ত্তা হতাম, তাহলে ঐ প্রকার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের আদালতে দাঁড় করিয়ে, এমন এক জায়গায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাতাম, যেখানে কেবল বিদেশী শাসন আছে। (ম্যাকলাউডের একবন্ধু ভারতে, বিদেশী প্রয়োজনীয়তার কথাকে "মানবতার বিরুদ্ধে কুৎসা" বলে চিহ্নিত করেছিলেন)।

ভারতের ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য আছে কি? নিশ্চয় না। এমন কি তার শত্রুর দ্বারা লিখিত ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, পশ্চিম ইউরোপের মতই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ, কখনও এ রকম বিশৃঙ্খলতার দুর্ভোগ, ভোগ করেনি। কেবল ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যেই যে যুদ্ধগুলি ঘটেছে, তাদের কথা ভেবে দেখ; ইংলণ্ড এবং স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের কথা চিন্তা কর; প্রত্যেক দেশের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছে, তাদের স্মরণ কর।.... গভীর ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে, অপূর্ব্ব রাজনৈতিক শান্তিপ্রিয়তার সমন্বয়, এর চেয়ে অসাধারণ ব্যাপার ভারতবর্ষে আর কিছু নেই। একমাত্র জিনিষ যা কখনো লেখা হয়নি, সেটা হচ্ছে ভাল ইতিহাস, অন্ততঃ ভারতবর্ষের— তা আমার ভাল করেই জানা আছে।

স্বামিজী ৩০শে অক্টোবর ১৮৯৯ সালে, মেরী হেলকে লিখেছিলেন : আধুনিক ভারতে বৃটীশ শাসনের একটি মাত্র সুফল দেখা যায়। অজ্ঞাতসারে হলেও, এই শাসন ভারতবর্ষকে আবার জগতের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেছে, বহির্জগতের সঙ্গে জোর করে তারা যোগাযোগ ঘটিয়েছে।.... রক্তশোষণই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হতে পারে না। মোটের উপর সাধারণের পক্ষে আগেকার শাসনব্যবস্থা ছিল কতকটা ভাল, কারণ তখন তাদের সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়নি, কিছু বিচার, কিছু স্বাতন্ত্র্যও ছিল। আধুনিক ভাবাপন্ন অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও জাতীয়ভাব বর্জ্জিত কয়েক শ' লোক এই হল ইংরাজি শাসিত বর্ত্তমান ভারতের সেরা রূপ। আর কিছু নেই। ..... ইংরাজের বিজয় প্রচেষ্টার ফলে শতাধিক বর্ষব্যাপী অরাজকতা, ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে ইংরাজের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও ততোধিক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, যা হল ইংরাজ রাজত্বের অনিবার্য্য ফল (করদ রাজ্যগুলিতে কোনদিন দুর্ভিক্ষের বালাই নেই) এবং যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। এসব অন্তরায় সত্ত্বেও লোকসংখ্যার বেশ বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, তখন অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে লোকসংখ্যা যা ছিল, তা এখনও হয়নি।

....এইতো অবস্থা! এমন কি, শিক্ষার প্রসারও আর হতে দেওয়া হবে না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আগেই বন্ধ করা হয়েছে (বলা বাহুল্য, নিরস্ত্রীকরণ বহু পূর্ব্বেই হয়ে গেছে) যে সামান্য স্বায়ত্বশাসন কয়েক বৎসরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেটুকুও দ্রুত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাকিয়ে আছি, আর ও কী হয় দেখবার জন্য। গুটি কতক নির্দ্দোষ সমালোচনাত্মক কথার ফল: সঙ্গে সঙ্গে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন, কারও বা বিনা বিচারে কারাদণ্ড, তা ছাড়া কেউ জানে না, কখন তার মাথা কাটা যাবে।

ভারতবর্ষে কয়েকবছর ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। ইংরেজ সৈনিকদের হাতে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাণ হারাচ্ছে, মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে। তাদেরই আবার আমাদের ঘাড় ভেঙে, বৃত্তি ও পাথেয় দিয়ে ঘরে পাঠানো হয়। এক ভয়ঙ্কর হতাশার মধ্যে আমরা বাস করছি।

শিক্ষার ব্যবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সরকারেরা যে সব জমি জরাত দিয়েছিল, সেসব গ্রাম শেষ হয়ে গেছে এবং বর্ত্তমান সরকার শিক্ষা বাবদে রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে আর সে শিক্ষাও কেমন!

মৌলিকত্ত্বের এতটুকু প্রকাশ দেখলেই তাকে গলাটিপে মারা হয়। মেরি, সত্যই যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি ছাড়া আমাদের কোনও আশা দেখি না।... আমরা এক নূতন ভারতবর্ষের সূচনা করেছি, এক অভ্যুদয়ের এবং কী ফলাফল হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। সমাজও আমাদের মধ্যে নয়— ওরা তো গেছেই! এ সংগ্রাম আরও কঠোর, গভীরতর ও আরও ভীষণ।

স্বামিজী সেদিন বিদেশী শাসনের ভয়াবহ পরিণাম পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন, ঐ শাসন থেকে মুক্তিলাভ না করলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সম্ভব নয়। আর সেই উদ্দেশ্যেই ডাক দিলেন স্বদেশবাসীকে: হে, ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এই সহায়ে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে? এ লজ্জাকর কাপুরষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করবে?

প্রয়োজন ছিল ভূমিকর্ষণের। তাই রাজনৈতিক সংগ্রামকে জাতির মুক্তির পন্থা-রূপে গ্রহণ না করে, জনগণ চিত্তে জাতীয়-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেম।

নিবেদিতা আরও একধাপ উঠতে চাইলেন। তিনি জাতি-চিত্তে জাগরণের সুর বহাতে সচেষ্ট হলেন। ভয় ছিল, মর্ম্মান্তিক বেদনা পোষণ করেছিলেন, "হয়ত তাঁর (স্বামিজীর) সমর্থন পাওয়া যাবে না।" লিখলেন, আমার ভয় হয়.... শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে পিতার

ক্রোধ থেকে রক্ষা করেন। হয়তো বক্তৃতা দেবার জন্য আমি কংগ্রেস থেকে অনুরুদ্ধ হতে পারি, আশা করি স্বামিজীও হয়তো বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ আমারই মত গ্রহণ করবেন।

আমার কাছে স্বাধীনতার একটা কদর আছে, যার জন্য আমি অত্যন্ত ভয় পাই। কারণ আমার জীবনে এমন কতকগুলো ঘটনা জড়িয়ে গেছে, যা স্বামিজীর অনুমোদন লাভ করবে না। যাই হোক আমার বিশ্বাস, শেষপর্য্যন্ত কিন্তু সবই তাঁর জন্য, আর পূর্ব্বের মতই তিনি আমাকে তাঁর সন্তান বলে গ্রহণ করবেন!.... আমার আত্যন্তিক সম্পর্ক কাজের সঙ্গে, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ও ছোট মেয়েদের সঙ্গে। আর হিন্দু ধর্ম্মই এখন সবচেয়ে বেশী করে আমার ধর্ম্ম, কিন্তু সেইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজন, এত স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি। আমার বক্তব্য এই. এর কাছে খাঁটি আমায় থাকতে হবে। এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, ভারত এবং ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু করণীয় আছে। কেমন করে সেটা সম্পন্ন হবে, তার ভার মায়ের উপর— আমার উপর নয়।" লিখলেন ১০ই জুন ১৯০১।

৩রা অক্টোবর লিখলেন : তুমি কি ভাব, আমি জানি না যে; স্বামিজীর মহৎবাণী অতুলনীয়? আমার পক্ষে তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার বাইরে আর কিছু নয়। গত কয়েকবছর ধরে আমি এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি; যা তিনি আমার জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার বাইরে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি এত দৃঢ়ভাবে ধরেছি যে, যদি কোন জায়গায় আমার ভুল হয়ে থাকে, তবে সে ভুল তাঁর, আমার নয়। অথচ এসমস্তই হয়তো আমার ভবিষ্যৎ জীবনে আনবে বিপদের সূচনা অথবা দুঃখ পর্য্যন্তও। জানি না, প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন, কেবল বিশ্বস্ত হওয়া, আর আমার যথাসাধ্য, আমি করেছি।

আমার মনে হয়, ভারত সম্বন্ধে এইসব নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আমি, এই সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই লাভ করেছি, অন্যকোন উপায়ে তা সম্ভব হত না। যদিও অনুমান পর্য্যন্ত করতে পারি না, কেমন করে আমার এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারবো, অথবা সে দর্শনের আদৌ কোন মূল্য থাকবে কিনা।

দীর্ঘ তিনমাস বিশ্রাম গ্রহণের পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর নরওয়ে থেকে ইংলণ্ডে ফিরলেন। গ্লাসগো প্রদর্শনীতে বক্তৃতা করলেন ১৪ই সেপ্টেম্বর। অক্টোবরের এক সপ্তাহ কাটালেন বেথানীর একটি ছোট মঠে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চলেছে নিরবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা আর সন্ন্যাসিনীগণের অখণ্ড কর্ম্মপ্রবাহ। এখানে বসবাস কালে লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : আমার পরিকল্পনার কথা কিছু বলতে পারছি না। কারণ, এখনও পর্য্যন্ত সবই অনিশ্চিত। আমি কেবল স্বামিজী ও শ্রীমার কাছে ফিরে যেতে চাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তা স্থির হচ্ছে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? ইতিমধ্যে লেখার কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছি— বর্ত্তমান উপস্থিত কর্ত্তব্য হিসাবে। নভেম্বর মাস কাটালেন অধ্যাপক গেডিজের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়। ডক্টর বসুর Living and Non-living বই রচনার কাজে ব্যাপৃত রইলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত। জাহাজ মম্বাসায় জিনিষপত্তর পাঠালেন ৩১শে ডিসেম্বর। প্যারিস হয়ে ৯ই জানুয়ারী ১৯০২ চাপলেন জাহাজে। সঙ্গে মিসেস সারা বুল ও রমেশচন্দ্র দত্ত। জাহাজ কলম্বো হয়ে ৩রা ফেব্রুয়ারী ভিড়লো মাদ্রাজ বন্দরে।

ঢাকা থেকে ডাক আসতে লাগলো। স্বামিজীর গর্ভধারিনী পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তীর্থগুলি দর্শন করতে চেয়েছিলেন। সে কথা স্মরণ করে তিনি জননী ও তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়ে ১৮ই মার্চ্চ ঢাকা যাত্রা করলেন। ষ্টীমারে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছানো মাত্র ঢাকা অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সভ্য তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছালো। তখন অপরাহ্ন। প্রসিদ্ধ উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। হাজার হাজার ব্যক্তি জমায়েত হয়েছিল তাঁর দর্শন কামনায়। দৃষ্টিপথে তিনি পতিত হওয়া মাত্র 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে ষ্টেশন মুখোরিত হয়ে উঠলো। ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা তাঁকে জমিদার মোহিনী মোহন দাসের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললো।

বুধাষ্টমী উপলক্ষ্যে, ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য নৌকাযোগে তিনি লাঙ্গলবন্ধ অভিমুখে যাত্রা করলেন। ২৫শে মার্চ্চ, জননী ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দ নারায়ণগঞ্জে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। সদলবলে লাঙ্গলবন্দে উপনীত হয়ে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র সলিলে অবগাহন করে তিনি আনন্দলাভ করলেন। কিন্তু সেইদিনই রাত্রে একটু জ্বর দেখা দিল। ঢাকায় ফিরে এলেন নির্ব্বিঘ্নে।

বহুলোক তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ ও উপদেশপ্রার্থী হয়ে আগমন করতে লাগলেন। স্বামিজী তাঁদের সকলকে সাদরে গ্রহণ করে, শিষ্ঠালাপে পরিতুষ্ট করতে লাগলেন। বৈকালে দুতিন ঘণ্টা ত্যাগ, বৈরাগ্য, কর্ম্মযোগ, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁর মধুর ব্যবহারে ও বিনম্র বচনে মুগ্ধ হলেন সকলে।

৩০ শে মার্চ্চ জগন্নাথ কলেজে একটি সভা আহুত হল। উকিল রামাকান্ত নন্দী হলেন সভাপতি। প্রায় দুই হাজার শ্রোতার কাছে তিনি ইংরাজীতে 'আমি কি শিখেছি' সম্বন্ধে একঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। পরের দিন পোগজ স্কুলের প্রাঙ্গণে তিনহাজার শ্রোতার সামনে, 'আমার জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্ম' বিষয়ে দু ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, মূর্ত্তি পূজার ভেতর নানাবিধ কুৎসিতভাব প্রবেশ করে থাকলেও আমি এর নিন্দা করিনা। যদি সেই পূজ্য ব্রাহ্মণের পদধুলি আমি না পেতাম, তবে আমি কোথায় থাকতাম। যে সকল সংস্কারক, মূর্ত্তি পূজার নিন্দা করে থাকেন, তাঁদের আমি বলি, ভাই, তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হয়ে থাক, তা কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাড়ীর জীর্ণসংস্কার মাত্র। জীর্ণসংস্কার হয়ে গেলে, আর ওর প্রয়োজন কী? সংস্কারকদল এক স্বতন্ত্রদল গঠন করতে চান। তাঁরা মহৎকাজ করছেন। তাঁদের মাথায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক! তোমরা আপনাদের পৃথক করতে চাও কেন? হিন্দু নাম নিতে লজ্জিত হও কেন?.....

সংস্কারকগণের স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম বিদ্বেষ দেখে বার বার খুব্ধ হৃদয়ে বললেন : আমরা তো ওদের কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে বসে আছি, ওরা যদি না আসে আমরা করবো কি?

কুসংস্কার ও গ্রাম্য আচার ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বর্দাস্ত করতে পারলেন না। বললেন: এঁদের অভিহিত দল প্রাচীন সম্প্রদায়, যাঁরা বলেন আমরা অতশত বুঝিনা- বুঝতেও চাইনা, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে, চাই জগৎকে ছাড়িয়ে, সুখ দুঃখকে ছাড়িয়ে, অতীত প্রদেশে যেতে। যাঁরা বলেন, বিশ্বাস থাকলে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়, যাঁরা বলেন শিব, রাম প্রভৃতি যাঁর প্রতিই হোক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি, করে উপাসনা করলে মুক্তি হয়ে থাকে –– আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। ..... এই সময়ে একদিন সালঙ্কার ভূষিতা এক পতিতা তাঁর মার সঙ্গে স্বামিজীর দর্শনপ্রার্থী হলেন। ভক্তবৃন্দ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। সংবাদ পৌঁছলো তাঁর কাছে। তিনি তাঁদের নিজের ঘরে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। প্রণাম করে তাঁরা উঠে দাঁড়াতেই, তিনি তাঁদের বসতে বললেন।

নর্ত্তকীর মা হাঁপানি রোগগ্রস্তা মেয়ের জন্য ওষুধ ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন। সহানুভূতি জানিয়ে বললেন : মা, আমি নিজেই হাঁপানী রোগী, নিজের ব্যাধিই আরোগ্য করতে পরিনা। ইচ্ছা হয় তোমার কন্যার ব্যাধি আরোগ্য হোক- ক্ষমতা যদি থাকতো তাহলে আমি তাই করতাম।

মুগ্ধ হলেন রমনীদ্বয়, মুগ্ধ হলেন উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়ে ধন্যবোধ করে তারা বিদায় গ্রহণ করলো।

এখানে গোঁড়া হিন্দুরা স্বামিজী সকলের হাতে খাবার গ্রহণ করে বলে আপত্তি প্রকাশ করায় তিনি বলেন, বাবু! আমি ফকির সন্ন্যাসী, মাধুকরী ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেছি একদিন, তার আবার জাতের বিচার কি? আচার কি? শাস্ত্র বলেছেন : সন্ন্যাসী মাধুকরী, ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবে এমন কি বিভিন্ন ধর্ম্মালম্বীর ঘর থেকেও খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষাগ্রহণ করতে সন্ন্যাসীর কোন বাধা বা নিষেধ বলে কিছু থাকবেনা!

.....নাগমশায়ের জন্মভূমি দেওভোগে। এলেন স্বামিজী। সাধূ নাগমশায় দেহরক্ষা করেছিলেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে যাবেন। এবার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। জনকতুল্য এই সাধু তপস্বীর কত পুণ্য স্মৃতিই না উদয় হল মনে। সম্ভ্রমে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠলো। নাগমশাইয়ের সহধর্ম্মিনী, তাঁদের ইষ্টদেবের দ্বিতীয় বিগ্রহ তিনি, তাঁর অভ্যর্থনার ত্রুটি রাখলেন না। কি দিয়ে যে তাঁকে পরিতৃপ্ত করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। ভক্তি ও উল্লাসে আত্মবিস্মৃত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয়তম পার্ষদদের সেবার জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে ছুটলেন।

স্বামিজী সদলবলে তাঁর পুকুরে স্নান করতে গেলেন। ঝাপ দিয়ে, সাঁতার কেটে মনের আনন্দে স্নান সেরে এলেন। বহুদিন তাঁর সুনিদ্রা হয়নি। দিনে, কর্ম্ম কোলাহল, অবসররে জন্মভূমির দুঃখ, দৈন্য, অধঃপতনের শোচনীয় চিত্র, মানসপটে সৃষ্টি করে আলোড়ন। চিত্তে তোলে ঘূর্ণীঝড়। নামে দীর্ঘশ্বাস—তোমার দুঃখ মোচনের জন্য কি করবো মা! আত্মবিস্মৃত ভারত সন্তানদের যে, এত ডেকেও সাড়া পাচ্ছি না মা! পাঞ্জাব, বাঙলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ যেদিকে তাকাই সেদিকেই জরাজীর্ণ স্থবির অবস্থা। জাতির এই জড়ত্ব না ভাঙলে সে চেষ্টায় প্রাণ দেবো, সকলকে উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত অভয়বাণী শোনাবো, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্যে আশার আলোক আনতে চেষ্টা করবো, সে চেষ্টা, উদ্যম, ব্যর্থ হোক, শতবার বিফল হোক- উদ্দেশ্য ছাড়বো না।..... কেটে যায় রাতের অন্ধকার, ভেসে ওঠে দিনের আলো— শুরু হয় কর্ম্ম কোলাহল! —বিশ্রাম না- না- না- সে অবকাশ হয়ত মেলে, কিন্তু উপভোগের অবসর আর আসে না!

এই চিন্তার রাজত্বে এলো ক্ষণিক বিশ্রাম। গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন। পল্লীর নিভৃত বক্ষে, তার স্নেহের নিবিড় আকর্ষণে তিনি সুষুপ্তি লাভ করলেন। বেলা আড়াইটার সময় জেগে উঠলেন। আহারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। সবই প্রস্তুত। পাছে তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত হয়, সেইজন্য অপেক্ষা। পরমতৃপ্তি সহকারে আহার করলেন।

নাগ মশাইয়ের সহধর্ম্মিনীর দেওয়া বস্ত্রখানি মাথায় জড়িয়ে আনন্দ করতে করতে ফিরে এলেন ঢাকায়।

কামাখ্যা পীঠ ও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করলেন। পথে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটীতে বিশ্রাম নিলেন। এখানে (গৌহাটীতে) পর পর তিনটি বক্তৃতা দিলেন।

ঢাকায় যখন ছিলেন শরীর তখন ও ভাল ছিলনা। কামাখ্যা থেকে যখন গৌহাটী ফিরলেন অবস্থা তখন সঙ্কটজনক। ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী চিন্তায় পড়লেন। শিলং এর আবহাওয়াতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে ভেবে সকলে তাঁকে শিলং যাওয়ার অনুরোধ করলেন। রাজী হয়ে গেলেন স্বামিজী।

স্যার হেনরী কটন তখন আসামের চীফ কমিশনার। তিনি ছিলেন ভারতহিতৈষী। তিনি আসছেন সংবাদ পেয়ে তাঁর দর্শন কামনায় ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। সাহেবের অনুরোধে একটি বক্তৃতাও দিলেন। সভাতে ইউরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেকেই সাগ্রহে যোগদিলেন। কটন সাহেব বক্তৃতা শেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। ইনি স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর প্রকাশিত বক্তৃতা পড়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন : ভারতীয় শিক্ষা

ও সভ্যতার এমন সুন্দর যুক্তি ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা কখনও শোনেননি। একদিন স্বামিজী আবাসস্থলে উপস্থিত হলেন তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে। কথা প্রসঙ্গে বললেন : ইউরোপ, আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করে শেষে জঙ্গলে কি দেখতে এসেছেন?

বাহুপাশে জড়িয়ে ধরে স্বামিজী সহাস্যে উত্তর দিলেন : আপনার মত ঋষি যেখানে বাস করে, তা তীর্থস্থান। আমি সেই তীর্থদর্শনে এসেছি।....

তাঁর শোচনীয় দৈহিক অবস্থা দর্শন করে কটন সাহেব সিভিল সার্জ্জন সাহেবকে তাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত করলেন। তিনি দু'বেলা এসে স্বামিজীর তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন।

শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু স্বামিজীর স্বাস্থ্যের উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং খারাপের দিকেই এগিয়ে চললো। একদিন রাত্রে শ্বাসকষ্ট এমন চরম অবস্থায় পৌঁছালো যে শিষ্যবৃন্দগণ আশঙ্কা করলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি দেহত্যাগ করবেন। বালিসের উপর ভর দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পতনের জন্য তিনিও অপেক্ষা করতে লাগলেন। আপন মনে বলে উঠলেন, যদি দেহত্যাগ হয়, তাতেই বা কি! আমি জগতকে বহুবর্ষ চিন্তা করার উপকরণ দিয়েছি।

রাত্রি ক্রমেই বাড়তে লাগলো। যন্ত্রণার কিছু মাত্র উপশম হল না। একজন বালব্রহ্মচারী তাঁর মাথা দুহাতে সরলভাবে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ রোগ-যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগলো। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন— হে ভগবান দয়া করে এই রোগের ভার আমাকে অর্পণ কর— স্বামিজী সুস্থ হয়ে উঠুন! সহসা চোখ মেলে তাকালেন স্বামিজী। করুণার্দ্র দৃষ্টিতে বালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, বৎস! দুঃখ, কষ্ট, ভোগ করার জন্যই দেহধারণ করেছি, অধীর হয়ো না।

ভগবান যে করুণ আবেদনে সাড়া দিলেন। স্বামিজী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে উঠলেন। উৎকণ্ঠিত শিষ্যগণ সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ শেষ করে, বেলুড়ে ফিরে এলেন স্বামিজী। ভুগছিলেন বহুমূত্র রোগে, এখন দেখা দিল শোথ। শঙ্কিত হলেন গুরুভ্রাতাগণ। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। অনুরোধ করলেন, অবসর গ্রহণের। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের একান্ত ইচ্ছায় তিনি প্রচার কার্য্য পরিত্যাগ করে, মঠে অবস্থান করতে লাগলেন। কবিরাজী চিকিৎসা চলতে লাগলো। ওষুধে কিছু কাজ হল কিন্তু জড় দেহের জন্য নিয়ম মেনে চলা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তরে বললেন : উপকার, অপকার বুঝিনা। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি!

তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য সকলেই বিচলিত। তাদের উদ্দেশ্যে হাস্য কৌতুকে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করলেন, ব্যাধিটা সেরূপ সাংঘাতিক কিছু নয়!

দর্শনার্থী ও আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষীর আগমন লেগেই ছিল। তিনি প্রত্যকের সঙ্গে আলাপ করে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগলেন। দেশের কল্যাণ কামনায় সেবাব্রত গ্রহণ করবার জন্য যুবকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এলে, প্রবল আগ্রহের সঙ্গে ওজস্বিনী ভাষার শক্তিসাধনার মহিমা কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সবল, শক্তিমান, জিতেন্দ্রিয় হবার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ দিতে লাগলেন। কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দেশের দুর্দ্দশা ও তার প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে যুবকদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

গুরুভ্রাতাগণ তাঁকে নিরস্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কখনও সে অনুরোধে কান দিলেন, কখনও বা বিরক্তি বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন: রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম! এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক, ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করার জন্য প্রস্তুত হয়, তা হলেই সার্থক আমার শ্রম! পরকল্যাণে হলইবা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়! চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে,

বেঁচে থাকার ফল কি? কতদূর থেকে এরা, এত কষ্ট করে আমার দুটে কথা শুনবার জন্য এসেছে, আর অমনি অমনি ফিরে যাবে? তোরা যা পারিস কর, অমি জড়ের মত চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না!

কেউ হয়তো অতীতের অনাচার ব্যক্ত করে অনুতাপ করলেন। স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনা করে উঠলেন : ছিঃ নিজেকে তুমি দুর্ব্বল বা দোষযুক্ত মনে করছো কেন? যা করছে, ভালই করছে, এখন আরও ভাল হও।

কেনা হল "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা" "Encyclopedia Britanica" ঝক ঝক করছে সব বই। শিষ্য শরৎবাবু বললেন, এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘটনা!

বিস্মিত স্বামিজী বললেন : বলিস কি! এই দশখানা বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, সব বলে দেবো! শিষ্য আবার জিজ্ঞাসা করলেন : সব বই পড়ে ফেলেছেন?

না পড়লে কি আর বলছি! নে, জিজ্ঞাসা কর! আদেশ দিলেন স্বামিজী। গুরুর আদেশে শিষ্য বেছে বেছে কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি পুস্তক-নিবন্ধ মর্ম্মার্থ তো বললেনই, উপরন্তু স্থানে স্থানে ভাষাটি পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করে গেলেন।

পরীক্ষা শেষে বইগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন শিষ্য : এটা মানুষের শক্তি নয়!

বললেন স্বামিজী : দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে, সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত করা যায়। শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশ, ধ্বংস হয়ে গেল।.....

জুলাই ও আগষ্ট কেটে গেল। স্বামিজী অনেকটা ভাল হলেন। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মঠ থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় যেতে লাগলেন। সে সময়েও গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণ থাকতেন সঙ্গে। করতেন, নানা বিষয়ের আলোচনা। কখনও বা মগ্ন থাকতেন গভীর চিন্তায়। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার প্রকৃতি তাঁর নয়। হয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা দিতে ব্যস্ত নতুবা মঠের গৃহস্থালীর কোন না কোন কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখেন। কখনও ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, কখনও বা জমি কুপিয়ে ফলফুলের বীজ রোপণ করছেন, আবার কখনও বা রান্না করে সন্ন্যাসীবৃন্দকে ভোজন করাচ্ছেন। অনাড়ম্বরহীন জীবন-যাপন প্রণালী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যানুসন্ধানের মধ্যে তরুণ সন্ন্যাসীগণকে পরম শিক্ষায় উৎসাহিত করাই হল তাঁর ব্রত।

বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দু সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রতিষ্ঠানটির উপর। সন্ন্যাসীদের উদারভাব, দেশাচার ও লোকাচার সাস্বত আচার নিয়মের প্রতি তাঁদের ঔদাসিন্য, জন্মগত ও জাতিগত ভেদবুদ্ধি পরিবর্জ্জন, নানা আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। স্বামিজী ও তাঁর সঙ্গীগণ সম্বন্ধে অলীক কাহিনী প্রচার করে জনসমাজে বিভ্রান্তির চেষ্টা চলছিল। শাস্ত্রানাভিজ্ঞ ও আচার সর্ব্বস্ব সমাজে নানা অলীক কাহিনী, জনসমাজে চালু হয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু লোক, এই শোনা কথাগুলো বিশ্বাস করে, স্বামিজীর উদ্দেশ্যে হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, নিন্দাবাদ শুরু করে দিল। এমন কি চলতি নৌকার যাত্রীগণও মঠবাটী দেখিয়ে ঠাট্টা, তামাশা বা স্বামিজীর চরিত্রের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করতেও দ্বিধা বোধ করতো না। ওরা হিন্দু সমাজের লোক নয়— এ অভিভাষণ চালু হয়ে গিয়েছিল।

ভক্তগণের অনেকেই স্বামিজীর কাছে এ সংবাদ ব্যক্ত করে চললেন। কণ্ঠে তাঁর উপেক্ষার সুর। উত্তরে বললেন : 'হাতী চলে বাজার মে, কুত্তা ভূঁকে হাজার। সাধু ওঁকো ভাব নহী, যব নিন্দে সংসার।' কখনও বা ক্ষুব্ধ ভক্তগণকে উৎসাহ দেবার আশায় বললেন : যখনই দেশে কোন নতুন

'ভাব' প্রচার হয়েছে, প্রাচীনপন্থীগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। ধর্ম্ম সংস্থাপক মাত্রকেই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। অন্যায় অত্যাচার (Persecution) না হলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তঃস্থলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।

তিনি জানতেন, তীব্র সমালোচনা বা কুৎসায় বিচলিত হলে চলবে না। ওগুলোই তাঁর 'নব ভাব' প্রচারের সহায়ক হবে। তিনি তো কোন প্রতিবাদ করলেনই না, এমনকি তাঁর সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তগণকেও প্রতিবাদ করতে নিষেধ করলেন। বললেন : ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন ফল নিশ্চয় ফলবে!

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মঠে দুর্গোৎসবের আয়োজন করতে বললেন স্বামিজী। শিষ্য শরৎচন্দ্রকে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব সংগ্রহ করে আনতে বললেন। কারণ আচার ব্যবহারে তিনি উদারমতালম্বী হলেও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানগুলি শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুযায়ী যাতে অনুষ্ঠিত হয়, পূজা 'শাস্ত্র' উক্ত বিধান অনুযায়ী নিষ্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সকল সময়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দ পূজার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। সন্ন্যাসীর পূজা বা ক্রিয়ার সঙ্কল্প করার অধিকার নেই। শ্রীশ্রীমার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি। তিনি (শ্রীশ্রীমা) অনুমতি দিলেন, তাঁর নামেই সঙ্কল্প হবে। স্বামিজী আনন্দে আত্মহারা। প্রতিমা এলো। শ্রীশ্রীমা বাগবাজার থেকে মঠে এলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর পূজকের আসনে উপবেশন করলেন। তন্ত্রমন্ত্র-কোবিদ ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টচার্য্য, শ্রীমার আদেশে তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করলেন। যথা-শাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হল, কেবল পশুবলি হলনা। বলির অনুকল্পে চিনির নৈবেদ্য ও স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি, প্রতিমার দুপাশে শোভা পেতে লাগলো। (এই অনুষ্ঠানই, পরে এই 'নীতির' অনুসরণ চালু হয়ে গেছে)।

গরীব, দুঃখী, কাঙাল্গণকে দেহধারী-ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হল। বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও নিমন্ত্রিত হয়ে সে উৎসবে যোগদন করলেন। মঠের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হলণ যে বিদ্বেষ ভাব এতদিন মনে ও মুখে চালু ছিল, তা দূরীভূত হয়ে বুঝতে সমর্থ হলেন মঠের সন্ন্যাসীরাও যথার্থ হিন্দু-সন্ন্যাসী।

দুর্গোৎসবের পর লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান হল। মা তাঁর ছোটবেলার একবার অসুখের সময় মানত করেছিলেন পুত্রের রোগমুক্তি হলে কালীঘাটে বিশেষ পূজা দেবেন। শ্রীমন্দিরে তাঁকে গড়াগড়ি দেওয়াবেন। বর্ত্তমানে বার বার তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, তাঁর মনে সে-স্মৃতি জাগরূক হলো। বিস্মৃত স্মৃতির সহসা জাগরণ তিনি স্বামিজীকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট রওনা হলেন। মার আদেশ অনুযায়ী আদি গঙ্গায় অবগাহন করলেন। আর্দ্রবস্ত্রে মন্দিরে প্রবেশ করে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সামনে, তিনবার গড়াগড়ি দিলেন। সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকে অনাবৃত চত্বরে বসে হোম আরম্ভ করলেন। মঠে ফিরে এলেন স্বামিজী। আনন্দে হৃদয়খানা তাঁর দুলছে। বললেন, কালীঘাটে এখনও কেমন উদারভাব দেখে এলাম। বিলাত প্রত্যাগত জেনেও মন্দিরে ঢুকতে কেউ বাধা দিল না বরং সমাদরে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা পূজা করায় সাহায্য করলেন!

অক্টোবর মাসে পুনরায় ব্যাধির প্রকাশ বৃদ্ধি পেলে, শয্যাগ্রহণ করলেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিঃ স্যাণ্ডার্সন চিকিৎসা করতে এলেন। সকল রকমের মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ হল। যাতে কোন রকম গভীর ও জটিল তত্ত্বের আলোচনা করতে না পারেন সেইমত ব্যবস্থা করলেন সন্ন্যাসীগণ।

কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হলেন একটু। গুরুভ্রাতাগণ কিন্তু তাঁকে আর ইচ্ছামত কাজ করতে দিলেন না। সম্পূর্ণ সবল ও সুস্থ হয়ে উঠলে জগতের প্রভূত কল্যাণ হবে, এ চিন্তা করেই তাঁরা আগন্তুক ভদ্রমহোদয়দের বেশীক্ষণ তাঁর সাথে আলাপের সুযোগ দিলেন না।

নিশ্চেষ্ট থাকার লোক তিনি নন— কিছু না কিছু কাজ, তাঁর চাই। অবসর পেলেই মঠের ছোট খাটো কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এছাড়া অধ্যাত্মিক গান গেয়ে শ্রোতাদের ভগবৎপ্রেমে উদ্দীপ্ত করতে লাগলেন। সকাল সন্ধ্যায় গভীর স্বরে পবিত্র বেদমন্ত্র সকল আবৃত্তি সুরু করলেন। আবার কখনও পদ্মাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন।

নবযুগের, বার্ত্তা প্রচার বন্ধ। ম্রিয়মান স্বামিজী। তাঁর বিশ্বাস ছিল কয়েকটি চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী ও আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবক পেলে তাদের দেশের চিন্তাভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে নোতুন চলার পথের সন্ধান দিয়ে যাবেন। যারা বীরত্বে কঠোর মহাপ্রাণ, তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সমগ্র দেশকে জাগ্রত করে তুলতে সমর্থ হবে। যারা অত্যধিক বিলাস, লোলুপ, বিকৃতবুদ্ধি সম্পন্ন মস্তকগুলিকে মহান আদর্শের অনুপ্রাণিত করে পরার্থে জীবন বলিদানে নিয়োজিত করবে, তাদের দুর্ব্বল ও ভগ্ন দেহগুলিকে সবল, সুস্থ, লৌহ-দৃঢ় পেশী বিশিষ্ট করে শ্রমের মধ্য দিয়ে দীক্ষা দানে নিযুক্ত থাকবে।

তাঁর কাছে আদর্শ ছিল মহাবীরের চরিত্র। বার বার বললেন : দেখলে না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল, জীবন-মরণে দৃকপাত নেই, মহা-জিতেন্দ্রীয়, মহাবুদ্ধিমান, সাম্যভাবের মহা-আদর্শে অনুপ্রাণিত। ঐ আদর্শে তোমরাও জীবন গড়ে তোল! এরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ আপনা আপনি হবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাই হচ্ছে, Secret of Success (কৃতী হবার একমাত্র উপায়।) নান্যঃ পন্থা বিদ্যুতে হয় নায় (অবলম্বনের দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহ-বিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। রাম সেবা ভিন্ন, অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা। শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। ঐরূপ একনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল, করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে দেশটা, উচ্ছন্ন হয়ে গেল! একে তো পেট-রোগা (Dyspeptic) রোগীর দল, তাতে এত লাফালে চলবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে, যেখানে যাবি, দেখবি, খোল করতালই বাজছে। ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরি ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐসব গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছোটবেলা থেকে মেয়েমানুষের মত বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে কি অধঃপাতে যাবে? কবি-কল্পনাও ছবি আঁকাতে হার মেনে যায়! ডমরু, শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্ম রুদ্র তালে দুন্দভি-নাদ তুলতে হবে। 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে আর হর হর ব্যোম, ব্যোম শব্দে দিগবিদিক কম্পিত করতে হবে। যে সব গীতবাদ্য (music) মানুষের হৃদয়ে কোমলভাব সমূহ (Soft fealing) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। খেয়াল, টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা, আনতে হবে!

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে জাতীয় মহাসভার কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো কলকাতায়। বিভিন্ন স্থানের নেতারা দলে দলে সমবেত হলেন। এঁদের অনেকেই স্বামিজীকে অন্যতম জাতীয়নেতা বলে শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন। তিনি মঠে অবস্থান করছেন শুনে বেলুড়ে গেলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। এঁদের সঙ্গে ইংরাজী ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দীতে আলাপ করলেন। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে সহসা একজন প্রশ্ন করে বসলেন : অচ্ছা, স্বামিজী কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বললেন : যাতে সমগ্র ভারতে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেরূপ সংগঠনের

একান্ত প্রয়োজন নিঃসন্দেহ। তবে দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল হওয়া উচিত। যার মূল ভিত্তিভূমি হবে 'জাতীয়তা' 'স্বাধীনতা'— মুক্ত মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে। সেদিন ভেদাভেদ থাকবে না, ছুৎমার্গ পরিত্যাগ করে, সাম্প্রদায়িকতা ভুলে, একজাতি, এক প্রাণের সুর প্রতিধ্বনিত হবে 'ভারতবর্ষ'! আমরা ভারতবাসী। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান নয়, পার্শী নয়, জৈন নয়, বৌদ্ধ নয়, সকলেই ভারতবাসী। জগতে তারা ভারতীয়। এটাই হবে একমাত্র পরিচয়।.... এসে গেল বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা। এখানেও প্রশ্ন উঠলো : আধুনিক যুগে এর প্রয়োজন কি? উত্তরে স্বামিজী বললেন : প্রাচীন আর্য্যগণের আদর্শ অনুযায়ী আচার্য্য ও প্রচারক-সন্ন্যাসী গঠনের একান্ত প্রয়োজন। আর এই বেদবিদ্যালয়ের কাজ হবে সংস্কৃত, সাহিত্য, দর্শন, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির শিক্ষাদান। এর ফলশ্রুতি: মানুষ গড়ে তোলার ভিত প্রতিষ্ঠা। ভারতের আদি শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, বর্ত্তমানে যুগসৃষ্টি সম্ভব নয়। আমার স্থির বিশ্বাস : ছেলেরা অতীত ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচত হলেই, সত্য আদর্শের সন্ধান পাবে, নকলনবিশ হওয়ার প্রয়োজন আর থাকবে না।

নেতারা তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁদের সাধ্যমত সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেলেন। আফ্রিকা থেকে প্রত্যাগমন করে, গান্ধীজীও এ অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন। তিনি কয়েকদিন পরে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে বেলুড় মঠে এলেন। আফ্রিকা অবস্থানকালে স্বামিজীর নাম শুনেছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুলাকাৎ করাই তাঁর বাসনা। কিন্তু সেদিন স্বামিজী কলকাতা চলে যাওয়ায় উভয়ের সাক্ষাৎ সম্ভব হল না।

বেদবিদ্যালয়ের স্থাপনের সঙ্কল্প স্বামিজীর বহুদিনের। এ কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এছাড়াও প্রয়োজন কয়েকজন চরিত্রবাণ, ধার্ম্মিক ও বেদজ্ঞ অধ্যাপকের। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে যুক্তি করে মঠেই উপযুক্ত এক পণ্ডিতের তত্ত্বধানে এ কাজে ব্রতী হবেন স্থির করলেন। স্বামী ত্রিগুনাতিতকে উদ্বোধন প্রেসটি বিক্রী করার উপদেশ দিলেন। ১৯০১ সালের প্রথম ভাগে মিস ম্যাকলাউড জাপানে গিয়েছিলেন শিল্পপাঠ নেওয়ার উদ্দেশ্যে। ওখানে পরিচয় হল শিল্প বিশেষজ্ঞ ও কবি মিঃ কাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে। তাঁর কাছে মে মাস থেকে পাঠ নিতে শুরু করলেন। এইসময়ে তিনি যেসব বক্তৃতা দিতেন, সেগুলির নোট নিয়ে সংকলনের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে নিবেদিতার কাছে পাঠাতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললেন ভারতে স্বামিজীর সঙ্গে।

উত্তরে ১৪ই জুন স্বামিজী তাঁকে লিখলেন : জাপানকে বিশেষতঃ জাপানী-শিল্পকে উপভোগ করছো, এতে আমি খুব আনন্দিত। তোমার কথাই ঠিক, জাপানের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। জাপান যে সাহায্য করবে, তাতে থাকবে গভীর সহানুভূতি ও সম্মান, অপরপক্ষে পাশ্চাত্য সহানুভূতি শূন্য, সেই সঙ্গে ধ্বংসকারীও। ভারত ও জাপানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

মিঃ ওকাকুরাকে জানালেন : জাপান আমার কাছে স্বপ্নের দেশ। সারাজীবন মনে, শিহরণ জাগানোর মতই সুন্দর।

৮ই নভেম্বর ম্যাকলাউডকে লিখলেন স্বামিজী : তুমি তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে ভারতে আসছো জেনে খুব খুশী। সাধ্যে যতটা কুলায়, তাদের খাতির যত্ন করবো। তবে, জানিনা তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখা সম্ভব হবে কিনা! আমাকেই ঢুকতে দেবে কিনা জানিনা, আমি যে ম্লেচ্ছ আহার করেছি! লর্ড কার্জ্জনকেই মন্দিবের ভেতর ঢুকতে দেয়নি।

ম্যাকলাউডের শিল্পকলার পাঠ শেষ হল ডিসেম্বরে। ওখানে তখন মুক্ত এশিয়া ফেডারেশনের প্রস্তুতির তোড়জোড় চলছিল। ধর্ম্মসম্মেলনের উদ্দ্যোগ চলতে লাগলো বৌদ্ধ পুরোহিত

ওডাটোকুনোকের সহায়তায়। স্বামিজীকেএ সে সম্মিলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাতে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে (১৯০২ সাল) মিঃ ওকাকুরা, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতালম্বী মিঃ হোরি সহ মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গী হয়ে ভারতে উপস্থিত হলেন। ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় ম্যাকলাউড তাঁর বন্ধু মিঃ ওকাকুরাকে নিয়ে মঠে উপস্থিত হলেন, স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে। সেইসঙ্গে অবহিত করলেন এঁদের আগমনের উদ্দেশ্য।

স্বামিজী তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে আলাপে স্বামিজী মুগ্ধ হলেন। মিঃ ওকাকুরাও দাবী করে বসলেন : স্বামিজী আমাদের সমগ্র এশিয়ার, এমন কি সারা বিশ্বের অদ্বিতীয় পুরুষ! মঠে রয়ে গেলেন মিঃ ওকাকুরা। একদিন আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশে মিঃ ওকাকুরা অনুরোধ করলেন, স্বামিজীর সঙ্গে বুদ্ধগয়া ও বারানসী যাওয়া তাঁর একান্ত বাসনা। উত্তরে বললেন স্বামিজী : তথাগত যেখানে 'বোধি' লাভ করে ছিলেন ও প্রথম বাণী যেখানে প্রচার করেছিলেন, সেখানে আমার বিশেষ আকর্ষণ আছে।

স্থির করলেন তিনি তার সঙ্গী হবেন। ম্যাকলাউডকে জানালেন : মনে হচ্ছে, যেন বহুদিন পরে, হারানো ভাইকে ফিরে পেয়েছি! ম্যাকলাউডও অনুমান করে নিলেন, নিশ্চয় ওঁদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়েছে। খুশীও হলেন তিনি।

২৩ শে জানুয়ারী স্বামিজী ক্রিস্টিনকে জানালেন : মিস ম্যাকলাউড তাঁর বন্ধুদের নিয়ে এসে গেছেন। এঁদের মধ্যে একজন ব্রতালম্বী মিঃ হোরি। এরা এসেছেন ভারত দর্শনে। ভারত হল জাপান সংস্কৃতি ও শিল্পের মাতৃভুমি।

২৭শে জানুয়ারী স্বামিজী মিঃ ওকাকুরা, মিস ম্যাকলাউড ও নরেশচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধগয়া যাত্রা করলেন। শতআটা অবস্থান করে, ওকাকুরাকে প্রতিদিন মন্দিরে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেককে মূর্ত্তির ভাব, শিল্প নৈপুণ্য ও ঐতিহাসিকতা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন স্বামিজী। উত্তর পশ্চিম কোণে একটি ঘরে যে জাপানী বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, সেটি যেন অবিকল তাঁর প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যেকের মনে হল এক সজীব বুদ্ধ, অন্য এক পাথরের সুন্দর নিস্পন্দ বুদ্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। (যখন প্রথম আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন জাপানে জামসেদজী টাটা উপস্থিত ছিলেন। তিনিও নিবেদিতাকে বলেছিলেন, বুদ্ধদেবের চেহারার সঙ্গে স্বামিজীর চেহারার সদৃশ্য বর্ত্তমান। আমেরিকাতেও তাঁর মুখের সঙ্গে বুদ্ধমুখের সাদৃশ্যের কথা শোনা গিয়েছিল)। কয়েক মাইল দূরে একদিন বুদ্ধগুহাগুলি দেখতে যাওয়া হল। ডাণ্ডিতে চললেন তিনি, আর হাতী করে চললেন মিস ম্যাকলাউড, মিঃ ওকাকুরা ও নরেশচন্দ্র। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পাহাড়ে উঠলেন গুহা দর্শনের জন্য। তিন চারটি গুহা খুব সুন্দর। দেওয়ালে চমৎকার খোদাই করা সেই সব মূর্ত্তি।

তীর্থের সার শ্রীকাশী। যাত্রা করলেন ট্রেনে সেকেণ্ড ক্লাসে স্বামিজী ও মিঃ ওকাকুরা। কলকাতায় ফিরে এলেন মিস ম্যাকলাউড।

কাশীতে পাঁচ সাতদিন অবস্থানের পর স্বামিজী মিঃ ওকাকুরাকে কালোপেড়ে ধুতি ও সিল্কের পাগড়ীতে নেপালের রাজবংশীয় সাজিয়ে পাঠালেন বিশ্বনাথ দর্শনে-- সঙ্গে আরও পনেরো কুড়িজন। ঘোড়ার গাড়ী করে চললেন সবাই কিন্তু তিনি নিজে গেলেন না।

এখানে অবস্থানকালে স্বামিজীর আালোচনার বস্তু ছিল চিত্র ও কলাবিদ্যা' প্রমদাদাসের ছেলে কালিদাস মিত্রের সঙ্গে বসতো সে আলোচনার আসর। এখানে তিনি স্বয়ং যেন একজন চিত্রকর। চিত্র, আলেখ্য, প্রাকৃতিক চিত্রের বর্ণসংযোগ, তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, দৃষ্টির প্রকারভেদ, কটিদেশ ও বক্ষস্থল, নানাপ্রকারের ভাব ব্যঞ্জনার বর্ণনা দিয়ে চললেন। তিনি ইতালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও ভারতের বৌদ্ধযুগ ও মুঘল পারস্যের বিভিন্ন সময়ের চিত্র সমালোচনায়

ডুবে রইলেন সেই সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের দৃশ্যপট যা ফ্রান্সে বিশিষ্ট শিল্পীর আঁকা দৃশ্যগুলি দেখে এসেছিলেন তার ত্রুটির কথাও উল্লেখ করলেন।

উঠলো জাপান যাওয়ার কথা। স্বামিজী বললেন, ওকাকুরা সেইজন্য এসেছেন। বেশ দেশ, আমেরিকা যাওয়ার সময় দেখে এসেছিলাম দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও শিল্পবিদ্যার সমাবেশ, বাঁশের ঘর, সামনে ছোট ছোট বাগান, লাগানো ফুলের গাছ, সব ঘরগুলিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জাত হিসাবে খুবই উন্নত।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯০২ মিসেস ওলিবুল ও মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সহ নিবেদিতা মাদ্রাজে অবতরণ করলেন ইয়ুরোপে অবস্থানের পর। তাঁদের সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হল- 'মহাজন হলে'। সভাপতিত্ব করলেন বিখ্যাত সংস্কারক, সাংবাদিক ও কংগ্রেস নেতা মিঃ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার। প্রথমে বক্তৃতা করলেন মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত। নিজে মডারেট, তবুও সে সভায় স্বামিজীর অনুকরণে বললেন : ভারতের ইতিহাসে মানুষকে আর কখনও এখনকার অপেক্ষা অধিক নিঃস্ব, শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক ভগ্নশক্তি এবং কৃষক রূপে অধিক ঋণগ্রস্ত দেখা যায়নি। স্বল্পকালের পরিধিতে আর কখনও দুভার্গ্য ও মৃত্যুর সমাবেশ ঘটেনি। আর কখনও একটি সভ্য, উর্ব্বর এবং শ্রমসমর্থ দেশে এমন ব্যাপক দারিদ্র্য ও শ্মশান-শূন্যতার দৃশ্য বিস্তার করেনি। বিশ্বাস করুন, কোন সভ্য সরকার আর একটি সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কখনও চিরদিনের জন্য স্বায়ত্ব শাসনের অমূল্য আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না। আমরা যেন আত্মবিশ্বাসী হই। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই উপর নির্ভর করছে। আমাদের ভাগ্য আমাদের শ্রমের উপর স্থাপিত। মহান ও সুযোগ্য উদ্দেশ্যের অনুসরণ করার মধ্যেই আছে জাতীয় জীবনের সম্পদ। অপরপক্ষে স্তব্ধ হয়ে, আবদ্ধ হয়ে, থাকার মধ্যে আছে জীবনের মৃত্যু!... আমি অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করছি : আপনারা সেইনারীকে হৃদয়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, যিনি এখন আমাদেরই একজন, আমাদের অনুরূপ জীবন যাপন করছেন এবং আমাদের মাতৃভূমির সেবায়, আমাদের সঙ্গে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে অনুভব করছি, এখানে আমি যেন সংস্কৃত নাটকের সূত্রধর, মঞ্চে এসে রাজপ্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে রাজকুমারীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রস্থান করে নিজে।

নিবেদিতা সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বললেন, ভারতের সেবায় যাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁদের সেই সহযাত্রীকে, বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ করায় তিনি বিশেষ আনন্দিত। স্বামিজীর সঙ্গে ইয়ুরোপ যাত্রার পূর্ব্বে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। লক্ষ্য করেছিলাম, পবিত্রতা, গভীর চিন্তা ও অনুভূতিই তাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈশিষ্ঠ্য। ভোগবিলাসপূর্ণ পাশ্চাত্যে ভ্রমণকালে, হিন্দুপরিবারের সুখময় গৃহই ছিল সে সুখস্মৃতি।

হিন্দুজীবন ও চিন্তাধারার আলোচনা প্রসঙ্গে, ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় উল্লেখ করে বললেন : স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ধর্ম্মব্যাপারে আপনারা দাতা— পাশ্চাত্যের কাছে আপনাদের শেখবার কিছু নেই। সামাজিক ব্যাপারেও সেইরকম। প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধনেব যোগ্যতাও আপনাদের যথেষ্ট। বাইরের কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে, উপদেশ দেবার বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। অগ্রগতির জন্য পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন মৌলিক, স্বনিয়ন্ত্রিতও হওয়া চাই। তিন হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার কি কোন মূল্য নেই যে পাশ্চাত্য দেশের তরুণ জাতিগুলি তাঁদের পরিচালিত করবে? "ভারতীয় জীবন অনুন্নত, সুতরাং ভারত চায় অন্যদেশের মত তারাও উন্নত হবে" এই উক্তির উত্তরে বলতে চাই যে, আড়ম্বরহীনতাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ঠ্য, আর সে সভ্যতার এটাও শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

ভারতীয় নারীগণ অশিক্ষিত ও অত্যাচারিত এই অভিযোগ কোনক্রমেই সত্য নয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে নারীজাতির প্রতি অত্যাচার কম। ভারতীয় নারীর মহৎ চরিত্র, তার জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আধুনিক অর্থে তারা অজ্ঞ বটে: অর্থাৎ লিখতে কেউ পারে না, অক্ষর পরিচয়ও অতি অল্প স্ত্রীলোকের আছে, কিন্তু তাই বলে কি তারা অশিক্ষিত? যদি তাই হয়, তবে যে সব মা, ঠাকুরমা, দিদিমা ছেলেমেয়েদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও নানা উপাখ্যান বর্ণনা করেন, তাঁদের সকলকেই কি অশিক্ষিত বলা যেতে পারে? আবার এঁরাই যদি ইউরোপীয় উপন্যাস ও কতকগুলি বাজে ইংরাজী বই পড়তে পারেন, তবে আর অশিক্ষিত বলে অভিহিত হতেন না! এটা কি পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলে মনে হয় না?

প্রকৃত পক্ষে, আক্ষরিক জ্ঞান, সংস্কৃতির পরিচয় নয়। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, ভারতীয় পারিবারিক জীবনের মূল কথা হল : মহত্ত্ব, ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ধর্ম্মশিক্ষা, হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ, আর প্রত্যেক ভারতীয় নারীর মধ্যেই এই গুণগুলি বর্ত্তমান। সুতরাং যে নিজের মাতৃভাষা পড়তে পারে এবং নাম সই করতে না পারলেও সমালোচকরা তাকে যে দৃষ্টিতে দেখেন এবং যথার্থ দৃষ্টিতে সে তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিতা।....

৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজী মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : নিরাপদে বেনারসে পৌঁচেছি। মিঃ ওকাকুরার বেনারস দেখা শেষ— আজ প্রাচীন বৌদ্ধভূমি সারনাথ দেখতে যাবেন। কাল থেকে সে ভ্রমণ শুরু, সঙ্গে তাঁর চলেছে নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) তাঁকে রাজি করিয়েছি।

আরও সানন্দে জানালেন : বিশ্বনাথ মন্দিরেও প্রবেশের ব্যাপারে আপত্তি হয়নি, শিবলিঙ্গের স্পর্শ পূজার ব্যাপারে, বোঝা গেল বৌদ্ধদের জন্য এই মন্দির সর্ব্বদা মুক্ত।

৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার অমৃতবাজারে নির্বেদিতাব বক্তৃতাটি প্রকাশিত হল। স্বামিজী খুশীমনে মন্তব্য করলেন : সত্যই সুন্দর বক্তৃতাটি। ভারতের প্রতি অকপট ভালবাসা, তার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, আর যারা ভারতকে বর্ব্বর দেশ বলে অভিহিত করে, সেই শাসকবর্গের প্রতি রুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে।

শাসকবর্গ সত্যই সজাগ ও সচেতন হলেন। তাঁরা নিবেদিতাকে মিত্রভাবাপন্ন বলে চিহ্নিত করার অবকাশ পেলেন না। তাঁর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার ও চিঠিপত্র খুলে পড়ার নির্দ্দেশ দিলেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে ফিরে এলেন নিবেদিতা। তখন বাড়ীটি সারানোর কাজ চলছিল। অগত্যা মিসেস বুল ও মিসেস ম্যাকলাউডের অতিথিরূপে চৌরঙ্গীতে আমেরিকান কনসুলেটে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন গান্ধীজী। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন অবস্থান করছিলেন। নিবেদিতার আগমন সংবাদ পেয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর চৌরঙ্গীর প্রাসাদোপম বাড়ীতে। জাঁকজমকপূর্ণ সে বাড়ীর চেহারা দেখে তিনি বিস্মিত ও আশাহত হলেন। শুরু হল উভয়ের মধ্যে আলোচনা। লক্ষ্য করলেন: নিবেদিতার দৃঢ় বৃটীশ সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাব আর শুরুতেই সংঘাত। তাঁর বৃটীশ শাসনতন্ত্রের উপর গভীর আস্থা, নাটালে প্রতিটি সভায় বৃটীশ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হত, গান্ধীজী সে সঙ্গীতে শুধু অংশ নেওয়া নয় তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে, সে সঙ্গীতে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ দেখে ভেবেছিলেন ওটা বৃটীশ ঐতিহ্যবিরোধী, বিশ্বাস করতেন, ওটা সাময়িক ও স্থানীয়। মনে পোষণ করতেন রাজসিংহাসনের প্রতি গভীর আনুগত্য। এমনকি বুয়োরদের যুদ্ধে বৃটীশসাম্রাজ্য রক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মনে-প্রাণে তিনি বিশ্বাস করেন, বৃটীশ নাগরিক

অধিকারের দাবীতে বৃটীশসাম্রাজ্য রক্ষায় অংশগ্রহণ তাঁর একান্ত কর্তব্য। তাঁর চিন্তা কেন্দ্রীভূত ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই ভারতের মুক্তি লাভ সম্ভব। বন্ধুত্ব লাভ করতে হলে চাই কঠিনতম প্রতিরোধকে জয় করার প্রবৃত্তি, তুলে ধরতে হবে ভারতীয় চরিত্রের সহনশীলতা আর তার প্রেমের গভীর পরাকাষ্ঠা!

অন্যপ্রান্তে অবস্থিত নিবেদিতা। একদিন তিনিও ছিলেন বৃটীশ পতাকা-পূজারী— কিন্তু সে স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্ন! ভেঙে গেছে সে মোহ। দেখেছেন রক্তশোষণের সে হিংস্রমূর্ত্তি! আজ তাঁর কাছে প্রেম দুর্ব্বলতা। স্বার্থান্বেষীর অত্যাচার ও শোষণের প্রতিরোধই, মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা।

গান্ধীর অস্ত্র : সহনশীলতা আর প্রেমে, হৃদয় জয়ের ব্যবস্থা আর নিবেদিতার অস্ত্র : চারিত্রিক শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিরোধ, প্রয়োজনে প্রতিঘাত। সুতরাং এ সাক্ষাৎ মনঃপুত হল না। দৃষ্টিভঙ্গী উভয়ের বিপরীতমূখী, তাছাড়া নিবেদিতা তাঁর বক্তব্য প্রকাশ কালে তাঁর চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তারে অপরকে বশীভূত করার প্রয়াস চালাতেন সকল সময়। একজনের তোষণ নীতি অপরের 'প্রতিঘাত নীতির' দ্বন্দ্ব— প্রথম স্যাক্ষাতেই হল শেষ পরিচয়।

গান্ধীজী প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরে এলেন। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই ১৯ শে জানুয়ারী কলকাতায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন মিঃ গোখলের সঙ্গে। রাজনৈতিক মতের সহযাত্রী ছিলেন উভয়েই। উভয়েই ছিলেন মডারেট অর্থাৎ নরমপন্থী। মিঃ গোখলেকে তিনি গুরুপদে বরণ করেছেন। আর মিঃ গোখলে— মায়ের স্নেহে, যত্নে গ্রহণ করেছেন তাঁকে। উচ্ছ্বসিত উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্যে। কয়েক বছর আগে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয়নদের হাতে শারীরিক নিগৃহীত হয়েছিলেন। বুয়রযুদ্ধে তিনিই এ্যম্বুলেন্স কোর গঠনে ইংরাজদের সহায়তা করে ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় মনোভাবের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তার উল্লেখ করে, উল্লিখিত সভায় মিঃ গোখলে ঘোষণা করলেন : উনি প্রমাণ করেছেন কঠিনতম প্রতিরোধকে জয় করা যায়, তিক্ততম ভুল বোঝাবুঝিকে দূর করা যায় যদি আমরা নিজেরা খাঁটি থাকি, নিঃস্বার্থভাবে, সরল পথে কাজ করি এবং অপমানের বিরুদ্ধে অপমান, নিন্দার বিরুদ্ধে নিন্দা ফিরিয়ে না দিই! যথার্থই প্রমাণ করেছেন: প্রেম, ঘৃণার উপর জয়ী। ভারতীয় চরিত্রকে ইংরাজদের চোখে উচুঁ করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। আফ্রিকায় ভারতীয় মর্য্যাদাকে উন্নীত করেছেন। তিনি ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত বন্ধু!

অথচ মিঃ গোখলে ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে নিবেদিতার কথা ও আচরণে দিশেহারা। সেই সময়েই গান্ধীজীর কলকাতায় আগমন। যখন গান্ধীজী তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে জানালেন এবং তাঁর মুখ থেকে নিবেদিতা সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনলেন স্বভাবতই গান্ধীজী মিঃ গোখলেকে নিজ মনোভাবের সমর্থক ভেবেনিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজী মিসেস বুলকে লিখলেন : জাপানী বলে মিঃ ওকাকুরার মন্দিরে প্রবেশে আপত্তি ওঠেনি। মনে হয় তিব্বতী বা অন্য উত্তর দেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবলিঙ্গের পূজার জন্য এসে থাকেন ও তাঁদের স্পর্শ বা পূজা করতে দেওয়ার প্রচলন আছে। মিসেস এ্যানি বেশান্ত একবার চেষ্টা করেছিলেন খালিপায়ে, শাড়ী পরে, পুরোহিতদের সামনে মাথা লুটোপুটিয়ে ছিলেন। তিনি মহিলা তবুও মন্দিরের চত্তরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এদেশে বৌদ্ধদের অহিন্দু বিবেচনা করা হয়না। মিঃ ওকাকুরা ছোটখাটো ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছার আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজান্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর ও দিল্লী দেখবেন।

এই একই তারিখে অন্য পত্রে লিখলেন : প্রিয়মাতা ও কন্যাকে আর একবার ভারতভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি। জো (ম্যাকলাউড) কর্ত্তৃক প্রেরিত মাদ্রাজের পত্রিকা আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। মাদ্রাজে নিবেদিতার অভ্যর্থনা ও তার উত্তরটি সত্যই সুন্দর। তাঁর ইচ্ছা বিশ্রামের পর তাঁরা যেন উভয়ে কলকাতার পশ্চিমে কয়েকটি গ্রাম ঘুরে, বাঁশ বেত ও খড় প্রভৃতি দিয়ে নির্ম্মাণ

করা বাসগৃহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। প্রাচীনকালে যে ব্যক্তি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতো, সেই আবার অতিথির জন্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করতো। আহাঃ, নিবেদিতার বিদ্যালয়টি যদি আমি ঐ ধরণে নির্ম্মাণ করতে পারতাম!

১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। নিবেদিতা প্রথমে কামারহাটি গিয়ে গোপালের মাকে দেখে এলেন। ফেরার পথে দক্ষিণেশ্বর গেলেন। স্থির করলেন : সরস্বতী পূজার পর বিদ্যালয়ে কাজ আরম্ভ করবেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ছোট মেয়েদের ও প্রতিবেশিনীগণকে নিমন্ত্রণ করলেন। বেলুড় গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে স্কুল খোলা সম্বন্ধে মত বিনিময় করলেন। তাঁরাও তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দান করলেন। বেনারসে স্বামিজীকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে পত্র দিলেন।

স্বামিজী, ১২ই ফেব্রুয়ারী ব্রহ্মানন্দজীকে জানালেন:—১২ই তারিখে মিঃ ওকাকুরা ও নিরঞ্জনানন্দ আগ্রায় পৌঁচেছেন।

নিবেদিতার পত্র পেয়ে স্বামিজী উত্তরে বললেন, সর্ব্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক। মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে ও বাহুতে অধিষ্ঠিতা হউন। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক ও সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই অথবা তদপেক্ষা সহস্রগুণ স্পষ্টরূপে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে যান।

ব্রহ্মানন্দজীকে লিখলেন : পত্রে সবিশেষ জেনে আনন্দ লাভ করলাম। নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে যা বলার ছিল, তাকে লিখেছি, বলবার এই যে, তাঁর যা ভাল বিচার হয় করবেন।

মিসেস ওলিবুলের ইচ্ছা ছিল তিনি মিঃ ওকাকুরার সহযাত্রী হয়ে অজন্তা, ইলোরা ঘুরে আসবেন। স্বামিজী এ সংবাদ অবগত হয়ে ২১শে তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিষেধ করে পত্র দিলেন : আমার হয়ে মিসেস বুলকে বলো : এখন ইলোরা বা অজন্তা বা অন্যস্থান ভ্রমণ খুব কষ্টকর। প্রচণ্ড গরম। শরীর তাঁর ক্লান্ত। ভ্রমণ উচিত হবে না।

স্বামিজীর পরামর্শ গ্রহণ করলেন মিসেস বুল কিন্তু অদম্য মিস ম্যাকলাউড। তিনি মিঃ ওকাকুরার সহযাত্রী হওয়ার আগ্রহে শীঘ্রই কলকাতা ত্যাগ করলেন।

শিল্পরসিক মিস হে, গ্রীসের অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন বলরাম বসুর বাড়ীতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী। তিনিই নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। উভয়ে উভয়ের সঙ্গে পরিচয়ে উপলব্ধি করলেন : 'তিনি ভারতীয় শিল্প-সম্বন্ধে গভীর অগ্রহী।' বাসায় ফিরে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আজ শুক্রবার। তুমি অজান্তায় আছ। সাঁচী না জানি কি সুন্দর। অজান্তা যে অপূর্ব্ব ব্যাপার তা প্রায়ই শুনি। আমি খুবই সুখী যে মিঃ ওকাকুরা সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গ করছেন এবং তুমি বৌদ্ধ ভারতের সবকিছু দেখছো— তাঁর সাহচর্য্যে। আমাকে মিস হে এখানকার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাভেলের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা সফল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ সঠিক ধারণা-সম্পন্ন। স্কুলগুলি মন্দ ছাড়া ভাল করছে না। সরকার পুরো অন্ধ। উনি বললেন, কাউকে রেখা টানতে বা রঙ চড়াতে শেখাতে পারি, কিন্তু তাকে শিল্পী করতে পারি না কিংবা জিনিয়াস বানাতে।

শুনেই মনে মনে হেসে উঠলাম 'অবোধ'! ওকাজ আমি পারি!.... আচ্ছা ওরা এই ব্যাপারটি দেখছেন না কেন? দেশের প্রতি ভালবাসা, দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা, কুল গৌরব, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা বিশ্বাস, ভারতের জন্য অদম্য ভাবাবেগ এই সকলের দ্বারা শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম এবং

প্রাণশক্তির এমন বন্যা তরঙ্গ জেগে উঠবে, যা কোন মানুষের পক্ষে, তাকে পিছু ফেরানো সম্ভব হবে না। বৃদ্ধ মানুষের বদলে বীর, নকলনবিশের বদলে মৌলিক প্রতিভা,—এসকলই সৃষ্টি করা যায় করতেই হবে!....

ভূমি! ভূমি! এবং ভূমিজাত সকলকিছুই। সুবিশাল আরাধনা ও মধুরিমা নিয়ে অবস্থিত তপোমগ্ন অরণ্যবলীকে আমি দেখেছি। দেখেছি মহাবিশ্বস্পর্শী মানুষকে। একটি পরিধেয় শালের নির্ম্মাণে, একটি পটের অঙ্গ বিন্যাসে, রয়েছে যে মধুরতা ও আস্বাদনের সুসংহত মর্য্যাদা, সে সকলই কি সম্পূর্ণরূপে রক্ষণীয় নয়— যা মানুষকে মহাশক্তিমান করে তুলবে?

ভারতের কলামন্দির অভিমুখে তাঁর এখন থেকেই যাত্রা সুরু। সহযাত্রী কয়েকটি মাত্র বালিকা নয়, দেশের সৃষ্টি-সমর্থ প্রতিভাবান শিল্পীরা ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনীষী লেখকরাও।

পরিব্রাজক জীবনে স্বামিজী, ভারতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরেছিলেন, দেখেছিলেন সারা ভারতবর্ষের স্বরূপ। প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল প্রতিটি দেশবাসীর সঙ্গে, হিন্দু স্থাপত্য ও মুসলমান যুগের স্থাপত্যের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল সেসময়। আলোয়ার ভ্রমণের সময় দেখেছিলেন মিনার, লক্ষ্য করেছিলেন তার অনবদ্য ভাবপ্রকাশের সৌন্দর্য্য। দেখেছিলেন আগ্রার তাজ। সে মর্ম্মরের যে-কোন-অংশ পেষণ করলেই, রাজহৃদয়ের প্রেম ও যাতনা, বিন্দু বিন্দু করে ঝড়ে পড়ে! জন্ম প্রাসাদনগরী কলকাতা। বাক্সের মত সাজানো, একের পর এক, কিন্তু 'ভাব' বলে কোন বস্তুর সন্ধান এখানে নেই। আর রাজপুতনা? যেখানে খাঁটি হিন্দুস্থাপত্যের স্বাক্ষর, ধর্ম্মশালার দিকে তাকালে, যেন আতিথ্য-গ্রহণের জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে! মন্দির যেন দেবভাবাপূর্ণ! গ্রামের কুটীর, তার সর্ব্বাঙ্গ যেন গৃহস্বামীর মন, খুলে ধরে রয়েছে। এই ধরণের ভাবব্যঞ্জক-স্থাপত্য দেখেছেন ইতালিতে। জাপানে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার শিল্পসুন্দর-রূপ দেখে। তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা: সভ্যতার বিশেষ মহিমা, তার শিল্প। আর এশিয়াবাসীর শিল্পই সে অঙ্গাদি বস্তু! এই আর্টের জন্য, জাপান এত বড়। তারা এশিয়াটিক, জীবন তাদের আর্টে মাখা। আর্ট না থাকলে, তারা তা ব্যবহার করে না। ধর্ম্মের অঙ্গ এই আর্ট। যে মেয়ে ভাল আল্পনা দিতে পারে, তার কদর কত! শ্রীশ্রীঠাকুরও নিজে একজন বড় আর্টিস্ট ছিলেন। এশিয়ার সংস্পর্শে এসেই ইউরোপ, নিজেদের জীবনে শিল্প ঢোকাতে চেষ্টা করেছে। তাদের বাড়ী সাদামাটা, স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে তাৎপর্য্যহীন, আর এদেশের পাড়াগাঁয়ে চাষীদের বাড়ী, তাদের ধানের মরাই, কত আর্ট! মেটে বাড়ী, কত চিত্তির বিচিত্তির, ব্যবহারের 'ঘটি' সেখানেও আর্ট। ওদের গেলাস— সাহেবী শিক্ষায় এদেশের দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। ওদের ইউটিলিটি, আমাদের আর্ট, জাপান সমন্বয় ঘটিয়েছে বলেই জাপানের উন্নতি! ওকাকুরার সঙ্গে তাই তাঁর আত্মিক সম্পর্কের অন্যতম কারণ। তিনি চাইলেন, ওকাকুরা ভারতের গণজীবনে ওতঃপ্রোত শিল্পকে, বুঝে নিক! তাই ভারতের শিল্প নিদর্শনের জন্য ওকাকুরা বেড়িয়ে পড়লেন।

১৮৯৬ সালের ৯ই জুলাই আর্নেষ্ট বীনাফিল্ড হ্যাভেল সাহেব কলকাতায় সরকারী আর্টস্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে এসেছিলেন, অবশ্য একদশক আগে মাদ্রাজ আর্টস্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ড্রইং ও পেন্টিং ক্লাসে তখন ইংরাজদের প্রচলিত শিল্প অনুসরণে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু তিনি কলকাতায় পা দিয়েই স্থির করলেন : প্রদেয় শিক্ষার ভিত্তি হবে 'প্রাচ্যশিল্প'। প্রতিবাদে একদিনের ছাত্র-ধর্ম্মঘট হল। কিছু ছাত্র আর্টস্কুল ছেড়ে গেল। অন্য প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হল। এঁদের নেতা রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত। এই বিদ্রোহের কারণ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। জাতীয় ভিত্তির উপরে না দাঁড়ালে শিল্পীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রকাশ সম্ভব নয়, এই সহজ ও স্বীকৃতি— অস্বীকার্য্য ছিল সেকালের মানুষের কাছে। ছাত্ররা মনে করেছিল, বিদেশী

পদ্ধতিকে অনুসরণ না করলে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহেবী সমাদর লাভ সম্ভবপর নয়— ফলে শিল্পীর অন্নসমস্যা। এর এগারো বছর আগে আর্টস্কুলের অস্থায়ী অধ্যক্ষ, ও গিলার্ডি, তারও আগে স্কামবার্গ কিছুটা এধরনের চেষ্টা করেছিলেন। তখনও ভারতীয় ছাত্ররা বিরূপতা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। গিলার্ডিকে, স্কামবার্গ বলেছিলেন শিক্ষাসূচীতে ভারতীয় অলঙ্কার-রীতি-ভিত্তি চিত্রকে যোগ করে দেওয়া উচিত। সে কাজ সাধ্যাতিত মনে হয়েছিল স্কামবার্গ ও গিলার্ডি সাহেবের, তাকে ব্যাপকতর আকারে সম্ভব করলেন হ্যাভেল সাহেব।

যখন বড় বড় নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিকরা, এদেশের প্রাচীন মন্দির ও মঠের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন, আর্টস্কুলে চলেছে প্রাচীন গ্রীক রোমান মূর্ত্তির ছাঁচ ও প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার মাঝারিগোছের সস্তা নমুনা থেকে নকল নিয়ে, শিক্ষার্থীদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ওয়েলপেন্টার, ওয়াটার কালার পেন্টার, নকল র‍্যাফেল টিশিয়ান হয়ে ওঠার অভিনয়। বাঙালী ছেলে ব্রুটাস সেজে মুখস্থ করা স্পীচ আওড়াচ্ছে, আর ভাবছে সত্যই রোমান সেনেটের একজন। হ্যাভেল সাহেব তাঁর লেখায় প্রত্নতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের নিগূঢ় রস পরিবেশন করলেন ভারতীয় শিল্পের। তিনি অধ্যক্ষ হয়ে আসার কিছুদিনের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। এর অল্প আগে দেশী রীতিনীতিতে শিল্প চর্চা আরম্ভ করলেও এদেশীয় শিল্পের প্রাণধর্ম্ম তাঁর কাছে তখনও ধরা পড়েনি।

গভর্ণমেন্টের টাকায় আর্ট গ্যালারির জন্য জিনিষ সংগ্রহ চলেছে। এদেশের আর্ট বোঝার মত হ্যাভেল সাহেবের সমকক্ষ ছিলনা তখন কেউ। রোজ অবনীন্দ্রনাথকে দুঘণ্টা পাশে বসিয়ে নিরিবিলিতে দেশের ছবি, মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের ইতিবৃত্ত বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ফলে, দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল অবনীন্দ্রনাথের। কী করে মুঘল শিল্প দেখতে হয়, তার দিশাও পেলেন তাঁর কাছ থেকে। তিনি দিয়েছিলেন তাঁকে আতসী কাঁচ, তার সাহায্যে ছোট ছোট মুঘল ছবির খুঁটিনাটি দেখছেন, আর অবাক হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ। ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি— ঢেলে দেওয়া সোনা রূপো সব।

অবনীন্দ্রনাথ বড় ভালবাসতেন তাঁর একটি মেয়েকে। ঘটলো তার অকাল মৃত্যু। পিতৃহৃদয় উজাড় করে আঁকলেন 'সাজাহানের মৃত্যু'। মুগ্ধ হলেন হ্যাভেল সাহেব। তিনিই ১৯০২ সালের দিল্লী দরবারে পাঠালেন সে ছবিটি। পেলেন সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা। এখানেই শেষ নয়, তিনিই গ্রহণ করলেন তাঁর বৈদেশিক প্রচারের। ইংলণ্ডের ষ্টুডিও পত্রিকায় ১৫ই অক্টোবর সংখ্যায় ভারতীয় শিল্পের ধারাপথে ঘোষিত হল অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের জয়বার্ত্তা।

একদিন হ্যাভেল সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর রচনার মাধ্যমে : ভারতীয় চিত্রশিল্পের সমাদর ভারতীয়দের মধ্যে নেই। এমন কি ভারতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষক বলে কথিত, পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহী পর্য্যালোচক ও প্রশাসকরাও ভারতীয় চিত্র শিল্প সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। এদেশে অজন্তা আছে, যা দেখিয়ে দেয় হিন্দু-শিল্প-নীতির কঠোর রীতি-বন্ধন ও মুসলমানী গোঁড়ামির বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত থাকলে ভারতীয় শিল্পীরা এদেশের জীবন ও নিঃসর্গ প্রকৃতির অসীম কাব্যিক সম্ভবনাকে পুরোপুরি উপভোগ করে, তা রূপায়িত করতে সমর্থ হবে। যেমন দেখা যায় এই পর্ব্বের গৌতমবুদ্ধের মানবাত্মিক ভাবধারায় প্রভাবিত উত্তর ভারতে বসবাসকারী আলেকজাণ্ডারের অনুগামীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত গ্রীসের শিল্পনীতির নিদর্শন।

এদেশে চিত্রশিল্পের অধোগতির কারণ বিশ্লেষণে তিনি বললেন : বৌদ্ধধর্ম্ম বিলয়ের সঙ্গে এই শিল্পের বিলোপ হতে আরম্ভ হয়। কারণ হিন্দুদের জাতীয়-প্রথায়, এই জাতীয় শিল্পীদের স্থান ছিল সর্ব্বনিম্নে। ব্রাহ্মণ্যবাদ, মন্দির অলঙ্করণের জন্য ভাস্কর্য্যকেই পছন্দ করতো। এর ৯০০ বছর পরে মুঘল-যুগে, তার পুনরুত্থান ঘটলো। মুঘলরা পারস্য থেকে শিল্পী আনিয়ে পুথিপত্র, পাণ্ডুলিপি, শাস্ত্রগ্রন্থ অলঙ্করণের কাজ করাতে শুরু করলেন। আকবরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মুঘল-শিল্পে

ভারতীয় পরিবেশের চিহ্ন নেই। সারাসেনিক আর্টে, জীবজন্তু বা মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আকবর আনলেন নোতুন জীবনদর্শন। সরিয়ে দিলেন বাধা। শিল্পীরা পেলেন সৃষ্টির স্বাধীনতা। উজ্জীবক পরিবেশে, নতুন ও বিশিষ্টভাবে উদ্ভব হল ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার। তাঁর শাসনের গোড়ার দিকে না হলেও শেষের দিকে, শিল্পে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটলো। এই সময়টাকে হ্যাভেল সাহেব 'রিয়ালিষ্টিক' বলে চিহ্নিত করলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীরা যে ভাবে, রিয়ালিজমের নামে সমস্ত রীতিনীতি ঠেলে সরিয়ে দেন, তখন যে বস্তু ছিল না— প্রকৃতি থেকে সরাসরি প্রেরণা লাভ করতেন তাঁরা।

এই শিল্পীরা পারসিক শিল্পের অপূর্ব্ব আঙ্গিক কৌশল ও মণ্ডন-ধর্ম্ম স্বীকার করে, মানব চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে নোতুন মাত্রা এনেছিলেন। আকবরের পথ, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান পর্য্যন্ত এই নবভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। বিশেষ করে শাজাহানের ঝোঁক ছিল স্থাপত্য-শিল্পের দিকে। আরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতা, সেই শিল্প বিকাশকে বিপর্য্যস্ত করে, তাঁর 'শরিয়তী আইন' কঠোরভাবে বলবৎ করায়, যাঁরা তাঁর বিধান অগ্রাহ্য করলেন, তাঁদের দূর করে দিলেন রাজসভা থেকে। যে স্থাপত্য ও চিত্রকলা তাঁর বিবেচনায় বিধর্ম্মী বলে বিবেচিত হল, হয় ধ্বংস না হয় বিকৃত করলেন। কিছু শিল্পী জয়পুর, লাহোর, দিল্লী, মহীশূর ইত্যাদি জায়গায় সরে গিয়ে এই ধারাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। পূর্ব্বেকার গৌরবযুগ আর ফিরে আসেনি। সেই মুঘল-শিল্প সমুন্নতির অল্পস্থায়ী পর্ব্বে, এমন কি পরবর্ত্তী মুসলমানী ধর্ম্মান্ধতা, রাজনৈতিক নৈরাজ্য এবং বৃটীশের অসংস্কৃত মূঢ়তার ক্রমাগত অনিষ্টকর আঘাতে, ভারতীয় জীবন রীতিনীতি ও ইতিহাসের যে চিত্ররূপ রেখে গেছে, যাঁরা বিরাট ভারতসাম্রাজ্যের শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আগ্রহ দেখান, তাঁদের কাছেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সৃষ্টিকে অনুধাবন করতে হলে, গোটা ধারাপথে স্থাপন না করলে তাঁর চিত্রধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প প্রতিভা সম্পন্ন এক পুরাতন ভারতীয় পরিবারের সন্তান ইনি। এঁর কাকা রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত বাঙালী কবি ও নাট্যকার, সৌরীন্দ্র মোহন টেগোর, সঙ্গীত-শিল্পী। ভারতীয়-সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাশ্চাত্যেও স্বীকৃত। আর এই শিল্পীর চিত্ররীতি, পুনরুজ্জীবনবাদী গোঁড়ামীর উৎপাদন নয়, তা লুপ্ত ধারাকে সঞ্জীবিত করে সাগরবাহিনী করার প্রযত্ন। ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালাই করার পরিবর্ত্তে মুঘলরীতির মধ্যে নিজের শিল্প বিকাশের পদ্ধতি খুঁজে পেলেন। আধা ইউরোপীয় সহরগুলিকে বাদ দিলে, ভারতবর্ষ মূলে এখনও পাঁচশো বছর আগেকার ভারতবর্ষই। মুঘল রীতির শিল্প-ঐতিহ্য এখনও সজীব। তা অনুসরণ করে তিনি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিলেন না, শিল্পীজনোচিত আনন্দানুভূতির সঙ্গে পুরাতন যুগের চিত্রকাহিনী আঁকলেন, যার মধ্যে মনোহারী কাব্যিক আবেগের প্রকাশ লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্যে শিক্ষানীতির জড় প্রভাবে, যে শিক্ষা ভারতে চালু করা হয়েছে, তা মৌলিকতার সকল সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে, ভারতীয় ছাত্রদের এই কথাটা বিশেষভাবে শেখানো হল : ভারতের শিল্প-সাহিত্যের কোন কিছুই চর্চ্চার যোগ্য নয়, ভারতীয় জীবন ও শিল্পের মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য নেই বা থাকতে পারে না। টপহ্যাট ও ফ্রক কোটই সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়ধ্বজা। ৫০ বছর ধরে ভারতীয় শিল্প যেমন গৌরবহারা, অন্যদিকে ইউরোপীয় শিল্প-সংগ্রাহকরা এই দেশকে তছনছ করে, যা কিছু হস্তান্তর যোগ্য উচ্চাঙ্গের শিল্প নিদর্শন পেলেন, তাদের নিয়ে চলে গেলেন স্বদেশে। ফল দাঁড়িয়েছে, ভারতীয় শিল্প-চর্চ্চা করতে হলে ভারতের মিউজিয়ামে গেলে চলবে না— যেতে হবে ইউরোপের ব্যক্তিগত ও সাধারণ সংগ্রহশালায়। স্বাধীন ও বুদ্ধিমান জাপানীরা এ জিনিষ নিজেদের দেশের ক্ষেত্রে করতে দেয়নি।

পরিচয়ের প্রথম দিনেই নিবেদিতা বুঝলেন : হ্যাভেল সাহেবের মধ্যে রয়েছে, অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা। তিনি তাঁরই মত ভালবাসেন এই দেশকে।

তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পরিপূর্ণ করার উদ্দীপ্ত আবেগবোধ করলেন। ফলে, পরিচয়টা দাঁড়ালো বন্ধুত্বে। তিনি হলেন বন্ধু ও সহযাত্রী শিল্প-জগতে। চারিত্রিক গুণে তিনি বিদ্রোহিনী, বিপ্লবী, আবার কর্ম্মজগতে নিষ্ঠাবতী, আদর্শবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিক— ফল্গু-নদীর মত অন্তঃশীলা। যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই তিনি অথচ ছিল তাঁর আত্মবিলোপের সাধনা। তাঁর নামের উল্লেখ থাক, এটা তিনি চাইতেন না অথচ সর্ব্বক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ, প্রভাবিত করাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় শিল্পের গূঢ় রহস্য ও অন্তরের কথা জানার ব্যগ্রতা ছিল হ্যাভেল সাহেবের। ইণ্ডিয়ান আর্টের উপর যখনই লিখেছেন বই, ভারতীয় মনীষীর সঙ্গে বসতেন আলোচনায়। Aesthetics ও Philosophy of Art বিষয়ে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর পাঠ নিলেন নিবেদিতার কাছে, আলোচনা করলেন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও ওকাকুরার সঙ্গে শিল্প বিষয়ে। সকলেই অনুপ্রাণিত সিস্টারের (আইরিশ) আদর্শধারায়।

'সাধনপথে' প্রত্যেকে পৃথক। শিল্পজগতে হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা, বিপ্লবী জগতে ওকাকুরা পরে অরবিন্দ প্রমুখ, বিজ্ঞানজগতে জগদীশচন্দ্র, কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথ, দীনেশ সেন প্রমুখ সর্ব্বত্রই তিনি সিস্টার। নিজগমন পথে যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, কোন কোন সময়ে সহযাত্রীও হয়েছেন তবুও তিনি একা। গুরু আদর্শে ব্রতচারিনী শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা। সেবা ছিল নীতি, ধর্ম্ম ছিল পাথেয়, দৃষ্টি ছিল জাগ্রত, গতিতে ছিল নিষ্ঠা— এক কথায় ছিলেন সেবিকা। ছিলেন দীপ্তশিখা। পথ দেখানোই ছিল কাজ। তিনি আজন্ম বিদ্রোহী, বিপ্লব ছিল সেই পথের দিশা।

১৮৯৩ সালের শেষভাগে ধর্ম্মমহাসভায় আবির্ভাব বিবেকানন্দের। তাঁর বাগ্মীতা ও জাতীয় চেতনা ত্রিশ বছর বয়সেই তাঁকে বিশ্বচরিত্র গড়ে তুলেছিল। প্রায় দেড় বছর আমেবিকায় ধর্ম্মপ্রচারের পরে ১৮৯৫ সালে কয়েক মাসের জন্য এলেন ইংলণ্ডে। তারপরেই পুনরায় ফিরে গেলেন আমেরিকায়। এই কয়েক মাসের সফরে যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করলেন। সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মুখর হল সংবাদপত্র: এমন কি রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকাও— দুই গোলার্দ্ধে তাঁকে পরিচিত করলো বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক-রূপে। ঠিক এই সময়েই আরও একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞমহল ও সংবাদপত্রে উল্লেখিত হলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ১৬ই মার্চ্চ উদ্ধৃত হল 'বেঙ্গলী'তে

...for the honour of India, let us all hope that the remour is true that Professor J.C. Bose of the Bengal Presedency College, has made an original discovery, which if demonstrated to be all that is claimed for it, will place him in the front rank among modern scientists. It is said that Prof. Bose has been experimenting on the Theory that the etheric waves may be used for telegraphing and will conductive wires dispersed with. It is alleged that he has achived the result of sending signals of sound and light between two points with the help of ether only.

যখন স্বামিজী ১৮৯৬ সালে ইংলণ্ডে, জগদীশচন্দ্রও উপস্থিত সেখানে। লর্ড কেলভিন প্রমুখ ব্রিটীশ বৈজ্ঞানিকরা প্রশংসা মুখর : ভারতবর্ষ আত্মশ্লাঘার কারণ ঘটাচ্ছে। তিলকের রাজনৈতিক পত্রিকা 'মারহট্টা' মন্তব্য করলো ইংরাজদের রাজনৈতিক স্বর্থ যেথায় ঘা না খায়, গুণের সমাদর করে তখনই.... ২৫শে এপ্রিল ১৮৯৭

Professor Bose's triumphal progress through Europe:–

"Everyone will be sincerely glade to hear that Professor Bose is winning golden opinions receptions and honours wherever he is going in Europe. From the United Kingdoms. Professor Bose proceeded to Germany and from Germany, he went by invitation to France. In course of his triumphal progress, he is delivering lectures to appreciative and learned Audience and is beeing highly enlogised by the leading scientists of every country. Our readers are aware that he was even requested to reside in Scotland and request was made most acceptable by the simultaneous offer of a well-equiped Laboratory. The scincerity and warmth of the feelings of the English Scientist world towards Professor Bose shows that the fact of his being a foreigner and what is more, one of the race of the ruled, does not come in the way of their appreciation and sympathy. The man of science in this respect offers a notable contrust to the man of politics at home.... The man of politics takes stand on the narrow basis of the good of the Country. ...The English politicians cannot but feel that the native of India with his aspirations for the political eminence is a rival of himself... These considerations of jealousy never or very rarely enter into the heart of man devoted to science. ...The honour which Professor Bose or Dr. Bhandarkar before him got in the Europiean Countries can be explained. A native politician, of equal merit, can not hope to command such treatment at the hands of the English people at home."

এই ১৮৯৬ সাল, ভারতের গৌরবের উপনিবেশ স্থাপনের বছর। কুমার রণজিৎ সিং, ক্রিকেট খেলায় প্রমাণ করলেন ইংরাজের জাতীয় খেলায় অতিক্রম সম্ভব। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করলেন : বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই. সি. এস পরীক্ষায় প্রথম হলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন লণ্ডনের ড্রইংরুমে ও নানা সভাকক্ষে উদ্ঘাটন করছেন অধ্যাত্মবিজ্ঞান। বিলেতী সংবর্দ্ধনায় পরাধীন দেশ সম্বর্দ্ধিত হল। সমসাময়িক উন্মাদনার কারণ স্যার উইলিয়াম হান্টারের রচনা। উদ্ধৃত হল সেটি, ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর পত্রিকায়, ১লা নভেম্বর। যেহেতু প্রাচ্যদেশ, পাশ্চাত্য পন্থায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে, সুচিত হয়েছে ভারতে 'নবোদয় যুগ'। একই সময়ে বাঙালী যুবক লেফটেন্যান্ট সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিলের গৃহযুদ্ধ বিরাট সাহস ও সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরও উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ উপস্থিত ছিল সেই সঙ্গে।

জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্যার উইলিয়াম বললেন :

Among the most interesting features at the British Association, this year was the paper on Electrical Waves by Professor J.C. Bose. This gentleman, an M.A. of Cambridge, Doctor of Sceience of London and Graduate of the Calcutta University, had already won the attention of the scientific world by his strikingly originaly researches on the Polaraisation of the electric ray. His later papers on the Indices of Electric Refrection and the Wave-length of the Elecric Radiation were published with high tributes,

by the Royal Society. Lord Kelvin declared himself literally filled with wonder and admiration for so much success in these dificult and novel experimental problems. The originality of the achievement is enhanced by the fact that Dr. Bose to do the work in addition to his incessant duties as Professor of Physical Science in Calcutta and with apparatus and appliances which in this country would deemed altogether inadequate. He had to construct for himself his Instruments as he went along. The paper which was read before the British Association the other day "On a complete Apparatus for the study of the Properties of Electric Waves' forms the outcome of twofold line of labour– construction and research. Professor Bose is not only an example of the change from the old Philosophical and a prior persuits of learned Indians to the experimental science of the West, but he has also persuaded the Government to recognise the change. He has been deputed to visit the chief Laboratories in Europe, with a view to forming a well-equiped laboratory in Calcutta for physical and Electrical work. The position which Professor Bose had attained among British man of science, while himself still in the first energies of manhood is an significant as the success of Prince Ranjit Singh and Mr. Chatterjee in their widely diverse fields of effort"

উভয়েই একই সময়ে ইংলণ্ডে। জগদীশচন্দ্রের আগ্রহের কথা তিনি নিজেই বলেছেন নিবেদিতার কাছে আর স্বামিজী! তিনিও সচেতন ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাচার্য্য হলেও ছিলেন স্বজাতির ঐহিক উন্নতির জন্য, সব সময়েই উদ্‌গ্রীব। স্যার উইলিয়াম ভারতীয় অতীন্দ্রিয় অভিপ্সাকে এড়িয়ে গেছেন, যেহেতু জাতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষ বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি।

১৮৯৭ জানুয়ারী মাসে কেমব্রিজের 'ইণ্ডিয়ান ‑জলিস' রণজিৎ সিং ও অতুল চ্যাটার্জ্জীকে সংবর্দ্ধনার জন্য একটি সভার আয়োজন করলেন। সে সভায় স্বামিজী উপস্থিত ও বক্তৃতা দিলেন। কেবল সংবর্দ্ধনা জানানো হল না ডঃ বসুকে! সবাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গল-গানে মুখর— হর্ষধ্বনি ও জয়ধ্বনিতে। উপস্থিত ইংরাজগণও তৃপ্তির সঙ্গে রাজানুগত্যের খাবার ও পানীয় আস্বাদন করলেন। যদিও তখন, সুদূর ভারতে চলেছে দুর্ভিক্ষ, শত শত লোক মরছে অনাহারে।...

ব্যতিক্রম স্বামিজী! রণজিৎ সিং বললেন : "সাম্রাজ্যের স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে। অতুল চ্যাটার্জ্জীর ছিল ইতিহাসে পারদর্শিতা। তাঁকে স্বামিজী অনুরোধ জানালেন, আপনি ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস রচনা করুন, যে ইতিহাস— অসুস্থ দাসত্ববোধের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা জাগাবে। আর উপস্থিত ভক্তদের বললেন, ভারতের এই পতনই শেষ কথা নয়, ভারত আবার উঠবে। উপলক্ষ্য: আর একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সে সভায় অনাহুত যিনি বিজ্ঞানজগতে আত্মপ্রকাশে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে চলেছেন— দিনের পর দিন। —"অমৃতবাজার" ৮ই জানুয়ারী ১৮৯৭।

স্বামিজীর ডাকে আত্মবিলয়ে তাঁর সহযাত্রী রূপে যখন ভারতে পা দিলেন ভারতে ও ভারতবাসীর সেবার্থে, তখনও নিবেদিতা পোষণ করছেন ইংরাজপ্রীতি ও প্রবল রাজভক্তি। ভারতে চলেছে তখন হিন্দপণ্ডিত-মণ্ডলী পরিচালিত হিন্দু সমাজের ঘোরতর অন্ধসংস্কারের

গোঁড়ামী ও স্পর্শকাতরতা। গণ্ডীর দৃঢ় বাঁধনে নিজেদের রেখেছে বদ্ধ, আর পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে যাঁরা মোহমুক্ত, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী কুসংস্কারের সেই বেড়াজাল ভাঙার প্রচেষ্টায় উন্মুখ, সেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে গেল অল্প সময়ের ব্যবধানে। স্বামিজী তাঁকে দিলেন অবাধ স্বাধীনতা। যে দেশকে সেবা করতে এসেছেন সুদূর ইংলণ্ড থেকে, পাশ্চাত্য পরিবেশের মধ্যে যাঁর শিক্ষা ও দীক্ষা, তাঁকে এদেশের সবকিছুই দেখে, শুনে, বুঝে নিতে হবে, মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। অথচ তাঁর বাসস্থান নির্ব্বাচন করলেন গোঁড়া হিন্দুপল্লী, বাগবাজারের সরু একটি গলির মধ্যে। তিনি নিজেকে মানিয়ে নিলেন, ঘনিষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুলে, হয়ে উঠলেন সে-পল্লীর একান্ত আপনজন।

১৮৯৮ সালের শেষের দিকে ঘটলো জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়। পৃথিবী বিখ্যাত এক প্রতিভাকে শোচনীয় পরিবেশের মধ্যে কাজ করে যেতে হচ্ছে দেখে, শিউরে উঠলেন তিনি। ভারতীয় প্রতিভা, সত্যকার প্রতিভা। তার এতখানি দুর্দ্দশা! সহানুভূতিতে হৃদয় তাঁর উদ্বেলিত হয়ে উঠলো।

এদেশে নারী শিক্ষার প্রয়োজন। নারী ধাত্রী, নারী জননী, নারীর মানস মূর্ত্তি— তাঁর সন্তান। তাদের গড়ে তুলতে হলে, তাদের মধ্যে চাই শিক্ষার প্রয়োজন.... যা তার চেতনাকে করবে উদ্বুদ্ধ, দৃষ্টিকে করবে মোহমুক্ত ও প্রসারিত, গড়ে তুলবে নোতুন মানুষ, নোতুন সমাজ। এই আদর্শের ভিত্তিভূমি গঠনের জন্যই নিবেদিতাকে ভারতে এনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন স্বামিজী। বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত হল সেই বিদ্যামন্দির। কিন্তু তার জন্য অর্থের প্রয়োজন অথচ তাঁর শরীর এখন ভগ্ন অথচ সম্মুখে সুউচ্চ আদর্শ, যথেষ্ট চিকিৎসা সত্বেও রোগমুক্ত হতে পারছেন না। সমুদ্র যাত্রায় যদি তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, সেই আশায় নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ইংলণ্ডে হয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন।

জগদীশচন্দ্রও এই বিদেশিনী মহিলাকে নানারূপে দেখেছেন, তাঁর কলকাতা পদার্পনের পর। রক্ষণশীল বাগবাজার পল্লী এঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। এলো প্লেগের মড়ক, নিজের জীবন বিপন্ন করে রোগীর সেবায়, করলেন আত্মনিয়োগ। শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করলেন, নিজের হাতে ঝাড়ু ধরে, জঞ্জালমুক্ত করে। স্তম্ভিত করলেন : শহরবাসীদের 'কালী' বক্তৃতা দিয়ে।

স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব, বিশ্বব্যাপী পাণ্ডিত্য ও নোতুন যুগসৃষ্টিকারী আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শক রূপ আকৃষ্ট করেছিল জগদীশচন্দ্রকে। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। স্মরণ-মননও করেন কিন্তু নিবেদিতার গুরুপূজাকে সমর্থন করেন না। অথচ পরিচয় ও হৃদ্যতা গভীরতর হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। নিবেদিতা চাইলেন : এই দুই প্রতিভার সমন্বয়। এর উপরেই নির্ভর করছে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তিনি সন্ন্যাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার পথ বেছে নিলেন।

জগদীশচন্দ্রের তখন সঙ্কটতম জীবন। শিক্ষিত ভারতীয়সমাজে ইংরাজজাতি ও তার শাসনব্যবস্থার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অটুট সমর্থন! জগদীশচন্দ্র তাঁদেরই একজন। সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছেন স্বয়ং ভাইসরয় বা লেফটনান্ট গভর্নরের কাছ থেকে। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের বিরোধিতা সত্বেও চাকরী পেয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। বৈজ্ঞানিক পেপারগুলি ইংলণ্ডে বিপুল প্রসংশা ও বৈজ্ঞনিক সফরে সম্বর্দ্ধনা পেলেন সেই দেশবাসীর কাছ থেকে। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদের ঈর্ষা, ঘৃণা ও পদে পদে বাধাও পেয়েছেন। সে অবস্থা তাঁকে ততখানি আঘাত করেনি, যতখানি করলো তাঁর ইংরাজ সহকর্ম্মীদের আচরণ। তাঁদের কাছ থেকে এলো বাধা ও অসহযোগিতা।

দেশে ফিরে দেশবাসীর কাছ থেকে জয়ধ্বনি ও অভিনন্দন পেয়ে যে তৃপ্তি এসেছিল মনে, সেই মনই মুষড়ে পড়লো সহকর্ম্মী ও সহযাত্রীদের আচরণে। মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন পরাধীন

দেশে জন্মানোর অভিশাপ কত গভীর। সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ানো আত্মঘাতী ঔদ্ধত্য। মর্ম্মযাতনার পীড়নে সেদিন তিনি একান্ত ক্লান্ত। একান্ত অবসন্ন। সে সময়েই পাশে এসে দাঁড়ালেন নিবেদিতা জননীর মত স্নেহ ও মমতা নিয়ে। তিনি মিসেস বুলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন, যিনি ছিলেন প্রতিভার ধাত্রী ও জননী। তিনি ধনী ও সমঝদার। তাঁর হাত সকল সময়েই মহৎ ব্যক্তিত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে প্রসারিত। তিনি স্থির করলেন এঁর সাহায্য পেলে জগদীশচন্দ্র উপকৃত হবেন। তাঁর অর্থে গবেষণার সুবিধা হবে, তাঁর প্রতিপত্তিতে বিরোধী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজসাধ্য হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুকৌশলে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর পুত্র করে তুলতে চাইলেন। মিসেস বুলের জীবনে ছিল নিঃসঙ্গতার কারুণ্য। একথা জানতেন নিবেদিতা। তার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে কন্যা ওলিয়া শান্তি আনতে পারেনি। স্বামিজী তাঁকে মা বলে সম্বোধন করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এত বিরাট যে তাঁকে সন্তান ভাবা যায় না। তাই তিনি তার চাইল্ড! তবে 'হোলি চাইল্ড'। বিজ্ঞানতন্ময় জগদীশচন্দকে জাগতিক স্নেহবোধ করা সম্ভব, যদি একবার এঁকে তাঁর সন্তান রূপে গৃহীত করানো যায়! মিসেস বুলের দাক্ষিণ্য অজস্রধারে বর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে।

মিসেস বুলকে জানালেন, ভারতে তোমার একটি পুত্র আছে, যার স্নেহ চাই, সাহায্য চাই, তাকে তুমি পুত্র বলে গ্রহণ করো।

জগদীশচন্দ্রকে বললেন : মিসেস বুলের মাতৃহৃদয়ে সন্তান চায়, তাঁকে তুমি 'মা' বলে ডাকো।

৩রা জানুয়ারী ১৮৯৯ ম্যাকলাউডকে জানালেন : আমার মঠ যাত্রার কথা তোমাকে জানাতে চাই। স্বামিজীর ঘরের মিষ্টি ছোট্ট চায়ের টেবিলের কথা, পড়ানোর পরে যাতে বসে চা খেয়ে ছিলাম। আমার পড়ানোর হিসাব : বুধবার উদ্ভিদবিদ্যা, চারটোয় অঙ্ক, পাঁচটায় চা ও হোম। শুক্রবার তিনটায় শরীরবিজ্ঞান, চারটায় সেলাই, পাঁচটায় চা ও হোম। 'হোম' স্বামিজীর সন্নিধ্য। শুক্রবার সেই প্রিয় বসুদেব সঙ্গে যাঁদের আমি একান্ত ভালবাসি।

২১ ফেব্রুয়ারী জানালেন : ডার্লিং য়ুম, তুমি বলো যে, হিন্দুজাতির প্রতিনিধিরূপে দু'একজন হিন্দুকে ভাল বাসবো তাই যথেষ্ট; কিন্তু কী অপূর্ব্ব সব মানুষই না তারা সৃষ্টি করেছে! এখনি তিনজন মানুষ-দেবতার একটি দল পেয়ে গেছি— স্বরূপানন্দ, মিঃ পাদশা আর ডঃ বসু।

এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে, ঠিক করতে পারিনি। প্রত্যেকেই বন্দনা করি। মিসেস বসু স্বামীকে পূর্ণাঙ্গ করে রয়েছেন, যেমন মিসেস অ্যাপেনন। ডঃ বসুর আত্মাও অতিসুন্দর, সুকুমার— যেমনটি দেখেছি মিঃ অ্যাপননের মধ্যে, খানিক মিঃ অলিভের মধ্যে— যার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে মনে হয় না।

একসন্ধ্যায় অর্দ্ধচেতনভাবে বক বক করছি, শিকারে যাবো বলে, হঠাৎ রাগে সদ্য আবেগে শিহরিত অপরজন চেঁচিয়ে উঠলো— এত নিষ্ঠুর কেন তুমি? অত সব সুন্দর সুন্দর পড়ার কী ফল, যদি না অন্তর দিয়ে পড়ো? বলেই বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন ধূমপান করতে।

চোখের আবরণ সরে গেল। দেখলাম, কথাটা সত্য! আমি যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছি তাতে খুবই আনন্দিত, মানুষটির পূর্ণ মহত্বের ঝলক দেখা গেল! সে অনুভূতি আমায় ত্যাগ করেনি।

শব্দ কত দীন। মুহূর্ত্তটির কোন আভাস দিতে পারলাম বিশ্বাস হয় না কিন্তু তুমি নেবে, মনেও হয়েছিল— এটা য়ুমের জন্য! এ প্রসঙ্গে 'গ্রাহাম ট্রাভেসের ফেলো ট্রাভেলার্স' যোগাড় করে দিতে বলতে হচ্ছে! ছোট গল্পের সংকলন বইটি, ডঃ বসু জেদ করছেন বইটি এঁকে খুবই সাহায্য করেছে। তুমিও নিশ্চয় ভালবাসবে বইটিকে।

১২ই মার্চ্চ : জানালেন : ডঃ বসু এমনিতেই হঠাৎ সেন্ট সারার কথা বললেন। ১৫ই মার্চ্চ তোমাকে ডঃ বসুর কথা ও তাঁর তোমাকে পত্র লেখার ইচ্ছার কথা জানাতে চাই।

১৫ই মার্চ্চ, ওলিবুলকে লিখলেন : আমি তোমাকে ডঃ বসুর কথা ও তার তোমাকে পত্র লেখার ইচ্ছার কথা জানাতে চাই। আশা করি, তুমি শিগ্‌গিরী এক ছোট চিঠি তাঁকে লিখে ফেলেছ, সেই সঙ্গে মিস উইলকিনসনের ছোট দুখানি বই পাঠাচ্ছো। ইনি তোমার সম্বন্ধে প্রায়ই বলেন। তুমি এমন একজন, যাঁর কাছে গভীর শোকের সময়ে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে। আমি তাঁকে শোনালুম তোমার নরওয়ের বাড়ীর কথা। তার পরিবেশ, সে সঙ্গে জড়িত স্মৃতির কিছু কথা। উনি এখন দারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন...... মিঃ অ্যাপাননের সঙ্গে যেমন আমার ভালবাসা, ডঃ বসুর সঙ্গেও তেমনি। 'আমার কালী বক্তৃতার' পর থেকে স্বামিজী সম্বন্ধে, এর তুল্য ব্যক্তির মনোভাব, আমাকে বিশেষ দুঃখ দিয়েছে। তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি যা বলো, তার যর্থার্থ মূল্য উদঘাটিত হতে আরম্ভ হয়েছে। আমরা যে চোখে দেখি এ জিনিষ, তার থেকে ভিন্ন কোন ধারায় দেখা, তাঁর পক্ষে বস্তুতঃ অনেকখানি অসম্ভব, বললাম তাঁকে। তখন তাঁর বিভ্রান্তভাব প্রকাশ হয়ে পড়লো। অন্যক্ষেত্রে ইনি বিরাট পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ। এক্ষেত্রে ইনি স্বামিজীর তুলনায় অজ্ঞান ও কুসংস্কারের সমতুল্য। এসব ক্ষেত্রে কিভাবে কথা বলবো? খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশী করে, না তার সর্ব্বজনীন দিকটার প্রীতি ও সহানুভূতির বর্ণনা করবো? তুলনামূলক ধর্ম্মের ব্যাপার সরাসরি উপস্থিত করা কার্য্যতঃ অর্থহীন।

১৬ই মার্চ্চ ম্যাকলাউডকে জানলেনঃ আগামী সন্ধ্যায় না গিয়ে আজ বসুদের কাছে যাব মনে করছি। একটা জিনিষ চাই, মিস উইলকিনসনের দুখানা ছোট বই, বসুদের জন্য। তুমি বা লেডী সারা ভালবাসা সহ ৮৫, আপার সারকুলার রোড, কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে? সেই সঙ্গে লেডী সারা যদি কিছু লেখেন বরফ গলবে।

২৬শে মার্চ্চ, ওলি বুলকে লিখলেন : আমি চাই তুমি জানো, বসুদের কিরকম ভালবাসি আমি। আশা করি তুমি বসুকে, অন্তরে গ্রহণ করবে সন্তানের মত। কারণ প্রায়ই তোমার কথা তিনি বলেন।

৫ই এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে জানালেনঃ এসপ্তাহের বড় ঘটনা ডঃ বসুর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা। মানুষটিকে আমি ভালবাসি। তিক্ত সে আলাপ। মিস নোবলের পরিবর্ত্তে সিস্টার বলতে আত্মশাসন করতে হয়। এরপরও আমাকে মানবিক কিছু ভাবতে তিনি অসমর্থ। আমার সঙ্কীর্ণতা তাঁকে অসহ্য আঘাত করে। একটা দুঃস্বপ্নের মত যাঁকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, এমন কেউ পূর্ব্বে আমাকে সঙ্কীর্ণ মনে করেছে, তুমি বা সারা? আমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় বলার জন্য মিষ্টি কথায় উসকে দিলাম। তখনই বেরিয়ে এলো উৎসমুখ। স্বামিজীর গুরুদেবের উপর দেবত্বারোপ! সঙ্কীর্ণ ছাঁচে গড়া একটি মানুষ, যিনি নারীকে প্রায় শয়তানী মনে করতেন, যে কোন নারীকে দেখলে, মূর্চ্ছা যেতেন!!! শুনেছ কথা!

আতঙ্ক ও হেসে ওঠার মাঝামাঝি অবস্থায় বললাম : ও বর্ণনা, মেনে নিতে পারি না। আমি নিজেও পূজা করি অন্ধভাবে, তবে আমাদের কেউ অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায় না— স্বামিজী তো ননই। ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার! বর্ত্তমান ভারতে, এমন ধর্ম্মের প্রয়োজন যা সকলকে আলিঙ্গন করবে। সকল সম্প্রদায়কে একত্র করবে, অবতারবাদ তা পূরণে অসমর্থ? বিচিত্র! আমার কাছে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এপথটাই একমাত্র উপায়! সম্প্রদায়ের শেষ জানবার জন্য প্রয়োজন অবতারবাদের। যিনি অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না, স্বরূপানন্দের মত— তাঁকে অবতার বলবেন না। এঁর দ্বারা নূতন ধর্ম্মের উদয়ও প্রমাণিত হয়না। বললাম : কেউ তা চাইছে না। সংঘের কাছে যে কিছু শিক্ষামূলক কাজ রয়েছে, তারবেশী কেউ পরিকল্পনা করছে না— করতেও

ব্যস্ত নয়। পূজার প্রশ্ন বা ধর্ম্মের কথা ভবিষ্যৎই ইচ্ছামত' ঠিক করবে (প্রায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে যা করেছি তাই যথেষ্ট)। এরপর জানালেন : কী বিরাট শিহরণের সঙ্গে স্বামিজীর উক্তি : শুনেছিলাম— "আমার জীবনের উদ্দেশ্য, জনগণের মধ্যে পৌরুষ আনা"— ইংলণ্ডে থাকাকালীন সময়ে এই শিহরণের সঙ্গে পড়েছিলেন তাঁর কলকাতায় দেওয়া ভাষণগুলি। দেখেছিলাম মানুষের যথার্থ কল্যাণ ও সত্যের জন্য, কি গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে নিজের জনপ্রিয়তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছেন। তারপর যখন দেখলাম: গুরুপূজা ও তোমার কালীপূজায় উনি অগ্রসর তখন যাতনায় পিছিয়ে এলাম। যে মানুষ আমার চোখে ছিলেন বীর, হয়ে দাঁড়ালেন নূতন সম্প্রদায়ের ব্যাপারী!.....

তর্ক করতে পারতাম— কিন্তু ভাবলাম, সে সময় এখনও আসেনি। পরিবর্তে প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্র লিখলাম। জোর দিলাম : "তাঁরা যদি আমাদের ক্ষেত্রে না পারেন, তাঁর দেশপ্রেমের ক্ষেত্রকে সমাদর করেন। দলের প্রয়োজন উভয়ক্ষেত্রেই'। উত্তর এলো; মিষ্টি। এই পর্য্যন্ত...।

প্রিয় বৃদ্ধ মিঃ ঘোষ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) বললেন : ডঃ বসু শীঘ্রই আমাদের একজন হয়ে যাবেন কারণ উদাসীন তিনি নন!"

৮ই এপ্রিল ম্যাকলাউডকে লিখলেন: এখন তোমাকে অনেক কিছু বলতে ও তোমার দৈবী সাহায্য পেতে চাইছি। গতকাল বসুদের সঙ্গে কাটিয়েছি— সমস্ত দিনটাই। এ যেন তোমার কাছে বালীতে, প্রায় বেলুড় যাওয়ার ব্যাপার! কাবণ যে বসুকে আমি ভালবাসি, পেতে চাই, তিনি আমারই। কী বিরাট, কি সরল! আর কী যন্ত্রণাসহন! এক্ষেত্রে আমার অধৈর্য্যকে কিভাবে না ঘৃণা করেছি, যখন দেখলাম, যথার্থ বিরাট এই মানুষের কাছে তিক্ততাভরা জীবন! শুধু সুখী হওয়া কি সামান্য কথা! যদিও 'নিম' এর কথায় অপূর্ব্ব সত্যতা রয়েছে— 'উজ্জ্বল হওয়া-অতীব ঐশ্বরিক ব্যাপার।' গতকাল বারান্দায় বসে যে-কাহিনী বলছিলেন, উৎকীর্ণ বাতাসের কাছেও তা, পুনরুচ্চারণ করলে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে। গৌরবের উচ্ছ্বাস নিয়ে ইউরোপ থেকে ফেরার পরে, ইউরোপীয় সহকর্ম্মীদের আচরণে জাতি-পার্থক্যের বোধ, যে বৈষম্য ঘটিয়েছিল তার উল্লেখে বললেন : সে জিনিষটা তাঁর কাজের সমস্ত প্রাণ যেন শুষে নিয়েছে। কারণ হয়তো বলে বুঝাতে পারবো না— ভালবাসা পাওয়া আমার কাছে কত প্রয়োজন।"

এসব কথা তোমাকে জা- েতে চাই— কারণ দিব্যভাবেপূর্ণ তুমি— তুমিই বুঝবে ও স্বীকার করবে। দুটি মানুষের কাছে লিখতে হয় তুমি জানো। মিস উইলকিনসের যার একটি রোমান্স ও দূরাগত সঙ্গীতের মাধুর্য্যসিক্ত, বা অন্য ছোটখাটো জিনিষ পাঠিয়ে তাদের বন্ধুত্ব প্রাপ্তিতে তোমার প্রীতি ও গৌরববোধের কথা লিখে, কি করতে হবে তুমি জানোই। শুনলে সত্যই গৌরববোধ করবে (একেবারে গোপনীয় কথা)। জনৈক ইংরাজ অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে বললেন : একদিন ভাইসরয় এঁর জুতো খুলে দেবেন যদি, ইনি যে ভাবে আরম্ভ করেছেন— সেভাবে চালিয়ে যেতে পারেন!"

নোট বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে যতখানি ভালবাসা ও সাহস ঢেলে দেওয়া সম্ভবপর— তা দিয়ে ভরালাম— তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম, যাতে সকালে ল্যাবরেটারীতে প্রবেশের পথে পেয়ে যান। লিখলাম "আমার বন্ধুত্ব তোমার ও সারার বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি এবং রাজার (স্বামিজীর) ভালবাসারও গর্ব্বপ্রকাশ-এর যোগ্য আপনি। "তুমি ও তোমাদের বলেছি, এই ভাব না দেখিয়ে, আশা ও উৎসাহ ঝঙ্কৃত কিছু শব্দ লিখে পাঠাতে পারো। ওগো আমার প্রিয় শক্তিমতী য়ুম! সারার ক্ষেত্রে কোন অজুহাতের প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁকে লিখতে ও তাঁর কাছ থেকে লেখা পেতে প্রাণান্ত ব্যাকুল। কাল বললেন, আমি যেন তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না জানিয়ে, সারাকে পত্র না লিখি। কেননা তার স্রোত সদাই প্রবাহিত।

৯ই এপ্রিল ম্যাকলাউডকে লিখলেন : স্বামিজী প্লেগ সেবার ব্যাপারে প্রাণের ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিলেন। সে নিষেধ মানিনি বলে প্রিয় ডঃ বসু মর্ম্মপীড়িত। সে কথা খোলাখুলি বলার সুযোগ দিয়েছি, আত্মসমর্থনের চেষ্টা প্রায় করিনি, নিজের বিবেকের খোঁচা এড়াতে পেরেছি এমন গর্ব্ববোধ এখনও করছি না।

গত সপ্তাহে যা তোমাকে লিখেছি, স্বামিজীকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন : তথাপি তিনদিন ধরে প্রায় পূজা করেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে সে আমাদের লোক হয়ে উঠবে"। বললাম, : হ্যাঁ সত্যই পূজা করেন। প্রিয় য়ুম কী গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আত্মসংযমের সঙ্গে অপরূপ পূজা নিবেদিত—তা যদি জানতে! রাজা বললেন, ঠিক। আর এরাই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে হৈ চৈ করে। এরা নিজেদের চেনে না। যা নিয়ে তাদের অন্তঃসংঘাত, অপরকে তাই করতে দেখলে, তাদের ঘৃণা করে।" হঠাৎ আলোর ঝলক। ইউরোপ যাত্রার আগে যদি বসুকে একবার মঠে নিয়ে যেতে পারি— যদি শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ তুলে চান— যদি না চানও তবু এক সুন্দর দিনে তাঁর বিষয়ে এই 'ডায়াগোনেসিস' তাঁকে আমি জানিয়ে দেবোই।

স্বামিজী বিশেষ ধরণের মাছ রাঁধবেন। মধ্যাহ্নভোজনে এলাম— সেখান থেকে সোজা বসুদের ওখানে। দেখছো -শ্রীরামকৃষ্ণ সাহায্য করছেন। ওঁরা শ্মশানঘাটের কাছে প্রায় দেড়টা নাগাদ মিলিত হলেন।

বুধবার সন্ধ্যা— একত্র হলাম আমরা। বসুদের ভালবাসি। মঠে তাদের নিয়ে যেতে খুবই আনন্দ পেয়েছি। নিজস্ব স্বভাবে রাজা বুকে হাত বুলাচ্ছেন তখন। মুখে কষ্টের চিহ্ন, শরীরটা ভাল নেই, লক্ষ্য করলাম।

মিসেস বসু ও আমি সারা মঠে হেঁটে জলের ধারে আমাদের সেই ঘাসে ঢাকা ঢালু জমিতে বসলাম। মিসেসকে বললাম : আমাদের মধ্যে অদৃশ্যে রয়েছে ম্যাকলাউড। যখনই ওখানে যাই, আমার সঙ্গে তিনিও আসা যাওয়া করেন। সুতরাং তুমি ও মিসেস বুল, (যিনি প্রিয় ডঃ বসুর বিশেষ পূজামন্দির) বিস্মৃত হওনি— হওনা কখনও।"

১৯শে এপ্রিল মিসেস বুলকে জানালেন : য়ুমকে এই লিখছিলাম- কিভাবে গত রবিবার বসুদের সঙ্গে কাটিয়েছি। একেবারে স্বর্গীয়। এই প্রথম আমার প্রিয় ডঃ বসুর হৃদয়পূর্ণ প্রবেশের অধিকার পেয়েছি। অন্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছে। ভারতস্থ ইংরাজদের লজ্জার বোঝা বহন করতে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে সবকথা খুলে বলতে পারবো। এখন নয়, এমন কি শেষ কথাটিও উদ্ধৃত করা সঙ্গত নয়— তুমি ছাড়া কাউকে বলাও সম্ভব নয়। "ভালবাসা পাওয়া আমার পক্ষে কতখানি দরকার তা বোঝাতে পারবো না!"

অনবদ্য তিনি কিভাবে এবং কেন, না বললেও তুমি জানো। ইউরোপে তাঁর অসাধারণ সাফল্যে সহকর্ম্মীদের ভালবাসা ও সহানুভূতি হারাতে হয়েছে— যা পেয়ে এসেছিলেন যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। "কি করে তাদের কাছে গিয়ে জানাবো এর ফলে আমাদের সম্পর্কের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি! তুমি জানো আমার ওধরনের কোন অভিমান নেই।"

মনোনিবেশের যে বিশেষ শক্তি, তাঁর কাজকে এত বিরাট করে তুলেছে, তার জন্যই তাঁর পক্ষে ঐব্যবধান বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, — ফলে উৎসাহ হারিয়ে যাচ্ছে, বাকী যা কিছু প্রিয় গ্যানী, তুমি জানোই। তোমার প্রতি ওঁর পুত্রের ভালবাসা (ওঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা না জানিয়ে আমি যেন কখনও তোমাকে চিঠি না লিখি, —একথা, আমাকে বলেছেন, কারণ তা সদাই প্রবাহমান)-ওকে নিশ্চয় তুমি চিঠি লিখবে এবং পুত্র বলে গ্রহণ করবে। কি করে বিরাট মানুষকে বিরাট কাজ করাতে হয়, তাতো তুমিই জানো। এই মানুষটির মধ্যে তার নিজস্ব মধুর ও নিখুঁত রূপে যে মহিমা রয়েছে, তার থেকে বৃহত্তর মহিমা তুমি কখনও দেখনি, আমি জানি, তুমি তা

পরে বলবেই। জীবন এঁর কাছে বোঝা। তবু সাধুতার সঙ্গে তাকে ধরে আছেনই, শুধু তার দেশবাসীর কাছে এইটুকু প্রমাণ করার জন্য, প্রয়োগবিজ্ঞানে তাদের সাফল্য ইয়ুরোপীয়দের তুল্যই বিরাট।

সারা সপ্তাহ ধরে ঐ অনুভূতি আমার হৃদয়ের মধ্যে কিভাবে বর্ত্তমান ছিল কল্পনা করো। অকারণে মানুষ হয়েও মানুষের উপর অসম্মান আমরা চাপিয়ে দিতে পারি— তারই নিষ্ঠুরতায় শুধু কেঁদেছি। এখানেও আমাদের ইংরেজ সমাজে, যখন এঁর কথা উঠেছে, প্রত্যক্ষ করেছি সেই বিকৃত একটা সুর, আমাকে কঠিন গলায় বলতে হয়েছে,— উনি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন। অল্প বিরুদ্ধ সমালোচনা নয়- কথার ভঙ্গিটা আপত্তিজনক। ওঁর দোষ কোথায়? উনি উল্লিখিত হ'বার যোগ্য!

অমন ভালবাসার, সহ্য করার, বহণ করার শক্তি, আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না। সব কিছুকেই নিজের মধ্যে পুষে রাখতে হচ্ছে, প্রকাশ করা যাচ্ছে না! মূকযন্ত্রণানুভূতি ভয়ঙ্কর! উন্মোচন ভবিতব্য নয়, সহনই ভবিতব্য। এখন সম্পূর্ণ অন্য জিনিসের কথা ভাবছি যার বিষয়ে তিনি বলেছেন।

য়ুমকে পূর্ব্বেই বলেছি, আমি একটি অগ্নিময় চিঠি পাঠিয়েছি। সে বিষয়ে শুনে তুমি হয়ত হাসবে, - তাতে বলেছি : 'যে বন্ধুত্ব তাঁর উপরে এত অনুপযুক্তভাবে অর্পন করেছি, তার মধ্যে আছে, তোমার, য়ুমের ও স্বামিজীর গর্ব্ব ও বিশ্বাস— তাঁর প্রতি'।

২৫শে এপ্রিল ম্যাকলাউডকে জানালেন : রাজা গতকাল আসেননি। পূর্ণিমা ছিল কাল। সারারাত দুটি সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের জন্য ধ্যানে কাটিয়েছেন। আমি বসুদের সঙ্গে একটি মধুর সন্ধ্যা উপভোগ করলাম গভীর আনন্দে। ও য়ুম, সেখানে আমার পূজা ও ভালবাসা কতখানি। মানুষটিকে কখনো কখনো এত পুন্যাত্মা মনে হয়, যার প্রকাশ অসম্ভব।

শনিবার ওঁরা দুমাসের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, সুতরাং শুক্রবার রাত্রে বিদায় জানালাম। শুধু নিষ্ঠুরতা আর নীচতা, বিজেতাদের। ডার্লিং, তোমার বিরাট স্বর্গীয় হৃদয়কে আমি জানি- নইলে যে জিনিষের সঙ্গে জড়িত নও, সে সম্বন্ধে এত কথা বলে তোমাকে ক্লান্ত করে তুলতে সাহসী হতাম না। কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষকে যদি যোগ করে দেওয়া যায় বিরাট কাজের শ্রান্তির সঙ্গে, আবহাওয়া জনিত অবসাদ, তখন একজন ঋষিমনিষীকেও নিজ জীবন সম্বন্ধে ঘৃণা পোষণ করতে প্রণোদিত করে— তা কি বুঝতে পারো? জানো কি 'কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ' কথাটার মধ্যে অবজ্ঞা ও অপমান জড়িত আছে!

দেখতে পাচ্ছি ইংলণ্ডের যে মস্ত চাকরি প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন তার জন্য অনুতপ্ত এখন। ক্ষমতা আর নীচতা, জঘন্যতম কাজে সফলতা লাভ করে বুঝতে পারছি! গতরাত্রে মিসেসকে তাগিদ দিয়েছি, তিনি যেন চাকরীর অন্য 'অফার' সংগ্রহের চেষ্টা করেন- কারণ সে অফার যদি পান, নিন বা ছেড়ে দিন, তা তাঁকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে, পরিত্রাণের মত হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কি মনে কর, পৃথিবীর এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে তাঁর ধরনের কাজ মহা গৌরবের সামগ্রী বিবেচিত হবে না?

২৬ শে এপ্রিল ওলিবুলকে জানালেন, তোমার বিষয়ে, তোমার নূতন সন্তানের গতরাত্রের উক্তি 'তুমি সেই আত্মা— যা শান্তি বিকীর্ণ করে'.......

গতরাত্রে বসুদের কাছে আবার গিয়েছিলাম। একটা পার্টি হওয়ার কথা ছিল। পরেছিলাম ফ্রক, আনুসঙ্গিক আর কিছু মধুর সাজ, যার কিছু অংশ এই সপ্তাহে লণ্ডন থেকে এসেছে তুমি জানো। কিন্তু পার্টি হয়নি— তাতে খুব খুশী। পূর্ণিমা। গাছের তলায় বসেছিলাম— এত পূত পরিবেশ যে এক-এক সময়ে কথা কওয়াও সম্ভব ছিল না।

কিন্তু কী বেদনা! বলো, কেন এই বিরাট আত্মাকে পীড়ন করে মেরে ফেলা হবে? কাপুরুষতা, স্বেচ্ছাকৃত অবজ্ঞা ও অপ্রয়োজনে অসুবিধা সৃষ্টি। ইংলণ্ডে যে চাকরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন,, তার জন্য স্ত্রী তিক্ত ক্ষোভ প্রকাশ করতে সুরু করেছেন। আমি অনুনয় করে বললাম, তাঁর ক্ষোভ করা উচিত হবে না— ফলে এজীবনটা দুষ্ট লোকের শিকার হয়ে দাঁড়াবে— হবে নিষ্ফল সংগ্রামের ক্ষেত্র। আমি মিসেস বসুকে তাগিদ দিয়েছি, যদি পারেন ওঁর জন্য নূতন চাকরির অফার সংগ্রহ করুণ, এই মুহূর্ত্তে যদি বিকল্প কিছু পেয়ে যান, তাহলে জীবনের নৈতিক স্বাধীনতা পুনশ্চ ফিরে পাবেন।

ইংলণ্ডে, শেষ যে ৯ মাস কাটিয়েছেন, রবিবারও বাদ নয়, এমন বেগে যে, বহিঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারে অসচেতন, ফলে সবকিছু মিশিয়ে ফেলতেন, সংবাদ, খাদ্য, ছোট জিনিষ, বড় জিনিষ। বৈজ্ঞানিক সত্যদর্শনের দিব্যভাবাবেশ। এরপরই ফিরে এলেন এই বীর ধারাবাহিক ক্রুশবিদ্ধ জীবনের মধ্যে। গ্র্যাণী, আমি আমার স্বদেশবাসীকে ঘৃণা করি। তারা এত নীচ!

এখন আর কাজ করতে পারেন না। আকাশ গুঁড়িয়ে গেছে, ঢুকতে হয়েছে বদ্ধ কূপে! তবু একটিও তিক্ত কথা নয়— সর্ব্বদাই বেদনাহত বিস্ময়। এই কথাটাই মনে জাগছে— নিশ্চয় এটা তাঁর প্রাপ্য— সর্ব্বদা মনে করার চেষ্টা : এতো ইংলণ্ডের যোগ্য নয়, ইংরাজ চরিত্রের অনুরূপ নয়!

তোমার মনে পড়ে আমি কি ভাবে স্বামিজীকে বলেছিলাম— আমি কখনও ইংরেজের পতাকাকে নমিত করতে পারবো না? কিন্তু আর আমি ইংরাজের পাতাকার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবো না। আমার পক্ষে আকাশে ওড়া যেমন অসম্ভব, এও তেমনি। দেখতে পাচ্ছি এদেশে ইংরেজের প্রতিপত্তির দিন এখনো শেষ হয়নি— কবে সেদিন আসবে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাই চাইছি। প্রার্থনা করি পুনর্জ্জন্ম নিয়ে একদিন যেন ধ্বনি তুলতে পারি— 'জয় তরুণ ভারত'— যেদিন আমাদের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় আসবে— যেমন করে ইতালীর স্বাধীনতার দিনগুলিতে মৎসিনীর পাশে ওঠাতে পারতো তরুণতম ব্যগ্রতম নবদলভুক্তেরা!

তোমাকে এই চিঠি লিখতে লিখতে যেন তোমারই কাছ থেকে পাওয়া একটি চিন্তা আমার মাথায় উঠেছে- আমি মিঃ মোহিনীর কাছে গিয়ে তাঁকে কোন কিছু না জানিয়ে তাঁকে দিয়ে মিঃ পাদশাকে চিঠি লেখাবো এবং মিঃ পাদশার কাছ থেকে আমার বন্ধুর জন্য একটি উৎসাহসূচক উষ্ণ পত্র আদায় করে নেব যাতে ভবিষ্যতের কথা, পরিকল্পনাদির কথা থাকবে এবং ভারতের জন্য তাঁর (বসুর) দায়িত্বের কথা। এটা উপর পড়া কাজ হবে না, হবে কি যদি মিঃ মোহিনী সাহায্য করতে স্বীকৃত হন! আমি জানি, তুমি অনুভব করবে যে, এতে কোন ক্ষতি হবে না, যদি এই ধরনের মানুষের মারফত তা করানো যায়। ইতিমধ্যে বলে নিই, আর কোন বন্ধুত্ব থেকে আমি দুটি জিনিষের এহেন উপলব্ধি পাইনি—

এক, আমার মাতৃত্বের অনুভব ইত্যাদি, যা তুমি বুঝবে এবং দুই স্বেচ্ছায় নিম্নতর হওয়ার আনন্দ, যাতে অন্যের বিরাটত্ব ও ভালোত্ব উপভোগ করতে পারি, 'আমি চিনি হতে চাইনে মন, চিনি খেতে ভালবাসি।'

গতরাত্রে তিনি আমাকে একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন যা তাঁর বন্ধুত্বের সমগ্ররূপকে প্রকাশ করে। তিনি বলেছিলেন : 'আমি তোমাকে এমনভাবে কল্পনা করেছি, যে সীমায় হয়তো এখনও পৌঁছতে পারোনি। কিন্তু আমাকে আশা করতেই হবে, তুমি একদিন সেখানে পৌঁছাবে।'

সুমহান ব্যাপার নয়কি? প্রশস্তির নামে প্রার্থনা!

এখন এবিষয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই, কারণ তোমার হৃদয়ে উঠে গেছে বিষয়টি : যেমন আমার হৃদয়ে এবং তুমি, যুম ও আমি মিলে এই দুজনের চারপাশে শক্তি ও প্রেমের

উত্তপ্ত পরিমণ্ডলী রচনা করবো, যাতে পৃথিবীতে এই কথাটাই বজায় থাক, এখানে এখনো আশ্রয় আছে।

১লা মে, ম্যাকলাউডকে লিখলেন : লাঞ্চের সময় তাঁকে (স্বামিজী) ডঃ বসু সম্বন্ধে অনেক কিছু বললাম। ঐ সন্ধ্যায় তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর কথা ছিল। স্বামিজী এত মধুর ও সহানুভূতিপর। গোপন রেখে তাঁকে বললাম —একথাটা আপনার কাছে বলছি, যেমন পাদরীর কাছে লোকে বলে (কনফেশনের মত)। ''উত্তরে তিনি' বললেন : না, না এখানে ওসব ভাব রাখার. দরকার নেই, আমরা এখন দেশপ্রেমিক হিসাবেই কথা বলছি।''.... তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : সন্ন্যাসিনী হবার যোগ্যতার জন্য আমাকে কী ধরণের নিখুঁত আচরণ করতে হবে বলুন? দ্রুত উত্তর দিলেন 'তুমি যেভাবে আছ সেইভাবেই থাক'। খুব সতর্কতার সঙ্গে ভেতরের কথা বার করার চেষ্টায় বললাম : আমার ঘুরে বেড়ানো, নানাজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা.... আপনার কাছে সেটা অপরাধ কিনা? যেটা আমার নিজের কাছেই অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে! খোলাখুলি উত্তর: না, তা নয়। বসুদেরও জানালাম : যতদিন তাঁরা চাইবেন শুক্রবার, শুক্রবার আসবো ততদিনই!

শনিবার তাঁর মনোভাব অন্যরূপ দেখা গেল। চায়ের পর আমাকে নিয়ে বাগানের চারপাশে বেড়ালেন। বসুদের প্রশ্ন উঠলো। কঠিন সে মনোভাব। গৃহীর মুক্তি নেই। যদি সাহস থাকে, তাঁকে যেন জানিয়ে দিই। বলো, যদি বিরাট কোন ত্যাগ না করেন কখনই শক্তিশালী হবেন না। জঘন্য! ... সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দন তাঁর মধ্যে জাগছে, তাঁর খাদ্য স্পর্শ করলে সে লোকটির মনের চেহারা বুঝতে পারছেন।... অমুক অমুক কেন বিয়ে করলো? মুহূর্তেই সেই সেই ব্যক্তির স্পর্শে শারীরিক কষ্ট অনুভব করছেন। দিন তাঁর ঘনিয়ে আসছে হয়তো বা যদি সেরূপ না হয় আপোষ একেবারে ছেড়ে দিচ্ছেন। বললেন, আলমোড়া চলে যাবেন, ধ্যানে ডুবে থাকবেন, পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়বেন, চুরমার করে দেবে এমন সত্য প্রচার করবেন! তাদের বুঝাবেন : তারা ঠিক পথে আছে! এ মিথ্যার চমৎকার মজা। চলে কিছু সময়ের জন্য! কিন্তু মিথ্যা, মিথ্যাই। ত্যাগ করুক তারা। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ...

শান্ত হলেন কিছু পরে। বললেন : মার্গট এসব এখন তুমি বুঝবে না- আরও অগ্রসর হও বুঝবে। এ জিনিষকে, বিশ্বাস করার মত করে, আমাকে মানুষ করা হয়েছে।

ভয় পেলাম— পাছে উত্তেজিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর সেই গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি মিঃ মোহিনীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বিদায় জানিয়ে ... চলে এলাম।

কথার অধিকাংশই উগ্রতা ও অযৌক্তিক, তা স্বত্তেও কি পবিত্র ও সঘন সেই মুড। আমার যে বন্ধুর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হল, জানাবার সময় এলে তখন আমার সাহসের অভাব হবে না। কিন্তু আমার যেন মনে হয়., ও বার্ত্তা কিয়দংশ পৌঁছে গেছে। আমি বিশ্বাস করি না যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ মানুষটির মত একজনকে প্রত্যক্ষে বলেন না। .....ব্রাহ্মরা কি সত্যই তাঁকে ভালবাসে না।....

ডঃ বসু চলে যাবার পর নিজেকে বলেছিলাম ব্যক্তিগত কিছু করবো না— এখন শুধু নৈর্ব্যক্তিক বিষয়— লেখা তুলে নিয়েছি। ডঃ বসু চান ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করি— ও বিষয়ে এখন চেষ্টা করতেই হবে। ডার্লিং য়ুম, ডঃ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে যে সব অপ্রকাশিত ও অপ্রকাশ্য চিন্তা মনে আমার জেগেছে, তার সবগুলি যদি তোমাকে বলতে পারতাম! মনে হয় সেগুলি একটি বই বা জাতীয় কিছুতে পরিণত হবে।

২রা মে নেলহ্যামণ্ডকে লিখলেন : কী সব বন্ধুই না মানুষ পায় এখানে। একজন বিরাট মানুষ— যাঁর থেকে বিরাটতর কাউকে জেনেছি কিনা সন্দেহ— আমাকে কোন প্রশস্তি করেছেন বল দিকি? শোন : খুবই কোমল কণ্ঠে বলতে হবে তা এমনই পবিত্র—

"আমি তোমাকে এমনভাবে কল্পনা করেছি, যে সীমায় তুমি হয়ত এখনও পৌঁছতে পারনি, কিন্তু আমাকে এ আশা অন্ততঃ করতে হবে—একদিন তুমি সেখানে পৌঁছবেই।"

৮ই মে ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বসুরা পথ মধ্যে। যাবার আগে বলেছিলেন : আমি যেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা পাঠিয়ে দিই য়ুমকে, আমি সানন্দে রাজি এই অনুমান করে যে, য়ুমও তার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা পাঠিয়ে দেবে ওঁদের।....

এক সন্ধ্যায় তাঁদের কাছে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম তোমার ভালোত্বে আমি ঈর্ষাতুর। বসু আঘাত পেলেন— এমনই তোমার ভালোত্ব!....

মিঃ স্টেড যে লাইনগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি কি সুন্দর "যে আসন পেতে চাও জীবনে, সে আসন তোমারই সন্ধানে ফিরছে, তাই তার সন্ধানে বিরত হয়ে শান্ত হও!"— শেষ পর্য্যন্ত এটাই সমগ্র সত্য নয় কি? একদিন কোন একটা ছুতো নিয়ে ডঃ বসুর কাছে পাঠাব, কারণ বুঝতে পারছি- এই কথাগুলোই দেবার জন্যই মনে মনে বৃথা সন্ধান করছি।

৩১শে মে ওলিবুলকে লিখলেন : বসুদের কাছে লিখেছ! কি মিষ্টি তুমি। তোমার হৃদয়বত্তা ও মাতৃত্বকে নমস্কার করি।..... সবকিছু পাঠিয়ে দিয়েছি,— মনে হচ্ছে ম্যাকলাউড মিস উইলকিনসের বই একই মেলে পাঠিয়েছে। সন্দেহ নেই সব কিছু গতকাল পৌঁছে যাচ্ছে, বড় মধুর হবে তা।

১৮ই জুন ম্যাকলাউডকে জানালেন : সে কি, নিশ্চয় ডঃ বসুও তাঁর স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন। ইতিমধ্যে ডঃ বসু সস্ত্রীক মঠে এলেন। খুশী হলেন স্বামিজী। তাঁর বিদেশ অবস্থানের অভিজ্ঞতা তাঁদের বর্ণনা করলেন। এঁদের আমন্ত্রণে স্বামিজীও এক শীতের সন্ধ্যায় জগদীশচন্দ্রের বাড়ী ঘুরে এলেন। মিসেস বসু তাঁকে নিজে রেঁধে পূর্ব্ববঙ্গীয় খাদ্য পরিবেশনে তৃপ্ত করলেন। নিবেদিতা খুশী হলেন, বাসনা তাঁর পূর্ণ এতদিনে।

স্বামিজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। এপাশে নিবেদিতার স্কুলের জন্য আর্থিক প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিতে সুরু হয়েছে। সেই অর্থ সংগ্রহের আশায় স্বামিজী স্থির করলেন পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করবেন। সমুদ্র যাত্রায় তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভবনা। এদিকে নিবেদিতার বোনের বিয়ের দিন ধার্য্য হয়ে গেছে। স্বামিজী ঠিক করলেন : ইংলণ্ড হয়ে আমেরিকা যাবেন। সঙ্গে যাবে নিবেদিতা ও তুরিয়ানন্দজী। তিনি বিয়ের সময় ইংলণ্ডে কিছুদিন কাটিয়ে স্বামিজীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবেন আমেরিকায়।

নিউইয়র্কে যখন স্বামিজী অবস্থান করছেন; নিবেদিতা অর্থ সংগ্রহের আশায় দিনের পর দিন বক্তৃতা করে চলেছেন, মিসেস বুল নিবেদিতাকে পত্র লিখলেন ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯০০ সালে : অধ্যাপক গেড্সে সম্বন্ধে চিঠি পেলাম। ঐ লোকটির বিষয়ে আমি সর্ব্বদাই মন্দভাগ্য। নরম্যান উইন্ড ওঁর বিষয়ে যা বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন তুমি সেইরূপেই দেখতে পেয়েছ বলে আমি খুশী।

ইতিমধ্যে গেডেসের সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় হয়ে গেছে। মিসেস বুল স্বামিজীকে ১৩ই মার্চ্চ ১৯০০ সালে অধ্যাপক গেডেসের প্রশস্তি লিখে পাঠালেন : নরম্যান উইলড্ আমাকে বলেছিলেন, যদি অধ্যাপক গেডেসের দেখা পাও দেখবে, তোমার আত্মার পরিত্রাণ হয়ে গেছে। আর জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী চিরতরে নিদ্ধারিত হয়ে যাবে। স্পেনসারের পর উনি প্রথম সমাজ বিজ্ঞানী, যিনি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত সমাজ সম্বন্ধীয় নোতুন জীবনতত্ত্বের উদ্ভাবন করতে পেরেছেন। ইনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, সেইসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীও...

মিঃ গেডেস প্যারিস ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিজিলিস্ট আয়োজিত বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশ সংগঠনের ভার পেয়েছেন। নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে যোগদানের পরামর্শ দিলেন। তাতে তাঁর আর্থিক সুবিধা লাভের সম্ভাবনা। নিবেদিতা রাজী হলেন সে কাজে যোগ দিতে।

১৯০০ সালের মাঝামাঝি তিনি চলে এলেন প্যারিসের সংগঠনের কাজে যোগ দিতে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে জগদীশচন্দ্রও সস্ত্রীক যোগ দিলেন সে সম্মেলনে। স্বামিজীও আমন্ত্রিত হয়ে প্যারিসে এলেন। তখনও নূতনভাবে সাড়া দেবার মত শারিরীক অবস্থা তাঁর নয়। তবুও তিনি এলেন, তাঁর চির জিজ্ঞাসু মনের প্রেরণায়— যা ছিল ইয়ুরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা, ফরাসী সংস্কৃতির চাবিকাঠি আয়ত্ত করার উদ্দেশ্য। মিঃ লেগেটের অভিজাত বাসভবনে বিদগ্ধ শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক মহারথীদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এই সম্মেলনে। সমাজ-তাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডেস, বিপ্লবী ও দার্শনিক, প্রিন্স ক্রপ্টকিন, দার্শনিক উইলিয়াম ডেমেস, শিল্পী রঁদ্যা, প্রিন্সেস ডেমিডক, ধর্ম্মনেতা পিয়ের হিয়ামাছু, আধিকারক হিরাম ম্যাকসিস প্রমুখ।

এখানেই তিনি সকল সত্যের শেষ সত্য মৃত্যু বা অমৃতকে অনুভব করলেন। লেগেটের বিলাসভবন ত্যাগ করে সাহিত্যিক জুলবোয়ারের দীন আবাসে চলে গেলেন। এই বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে (প্যারিস কংগ্রেস) প্রদীপ্ত প্রতিভার দর্শন করে ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় প্যারিস থেকে বিদায় গ্রহণ করে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ দর্শন করে মিশরে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে।

১৮৯৯ সালে জগদীশচন্দ্র যখন বৈদ্যুতিক গবেষণায় রত, তখন পদার্থ বিদ্যা ও শরীরতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী এক অংশে এসে গেলেন। লক্ষ্য করলেন : এই দুই বিজ্ঞানতত্ত্বের রেখা ক্রমশঃই অবলুপ্ত হয়ে এক স্রোতে মিশে গেছে। এখান থেকে শুরু হল তাঁর অসাধারণ গবেষণা 'জড়ের সাড়া'

প্যারিসে সমবেত বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের ভাষণে উপস্থিত ছিলেন স্বামিজী। জগদীশচন্দ্র ৩১শে আগষ্ট ১৯০০ সালে সে বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিলেন : প্যারিসে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আমাকে হঠাৎ বলার জন্য অনুরোধ করলেন। কিছু কিছু বললাম। অনেকেই আশ্চর্য্য হলেন.... আমার সঙ্গে সেক্রেটারী মশায় দেখা করতে এলেন। আমার কাজ নিয়ে আলোচনা করলেন। এক ঘণ্টা পরে হঠাৎ বলে উঠলেন : But monsieur this is very beautiful. তারপর আরও তিনদিন আলোচনা হল। প্রতিদিন more and more excited শেষদিন তাঁরা আর নিজেদের সংবরণ করতে পারলেন না। সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট ফরাসীভাষায় আমার কাজের সম্বন্ধে বলে চললেন।

স্বামিজী তাঁর 'পরিব্রাজক' বইয়ে এর বর্ণনা দিলেন : এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতের এক মহাকেন্দ্র। মহাপ্রদর্শনীর নানা দিগ্‌দেশ সমাগত সজ্জন সঙ্গম, দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছে আজ এই প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরী ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি, জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী-বীর, আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গভূমির নাম ঘোষণা করলেন : সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডঃ জে. সি. বোস! এক যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজ প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন। সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মত প্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ দান করলো। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশচন্দ্র

বসু, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁর সতীসাধ্বী, সর্ব্বগুণাসম্পন্না গৃহিনী। যে দেশে যান, সেখানেই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন, বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতি! (২৩শে অক্টোবর ১৯০০)।

প্যারিস কংগ্রেসে স্বামিজী ডঃ বসুর সঙ্গে 'অন্তরঙ্গ' হিসাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। তার আগেও ১৭ই জুন ১৯০০ সালে মেরী হেলকে লিখেছিলেন : তুমি যদি মনে করে থাক যে, হিন্দুরা বসুদের পরিত্যগ করেছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। ইংরাজ শাসকগণ তাঁকে কোনঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোনমতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য করে তুলেছে। সেজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চেয়েছেন।"

ইংলণ্ডে যখন জগদীশচন্দ্রের অপারেশন হল, তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিসেস ওলিবুলকে ৬ই জানুয়ারী পরে ২৬শে জানুয়ারী১৯০১ সালে পর পর চিঠি লিখে সংবাদ নিলেন স্বামিজী। তাঁর জীবনের সমসাময়িক ভারতবর্ষে, যেসব সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় চরিত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অজ্ঞেয়বাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক তিলক, লালা লাজপথ প্রমুখ, দায়িত্বশীল শিল্পপতি জামসেদজী টাটা এছাড়া ছিলেন অসংখ্য উকিল বা ব্যারিস্টার, ছিল যথেষ্ট স্বেচ্ছাদাস, ও স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম বিরোধী আত্মনিন্দুকের দল। যাত্রা পথে আরও একজনকে পেলেন যিনি ভারতের মুখ উজ্জ্বলকারী বৈজ্ঞানিক। যদিও ধর্ম্মও বিজ্ঞানমুখী, তবুও তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল ধর্ম্মের মূল সত্য, বিজ্ঞানী দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে সত্যরূপে গৃহীত হবেই। তাঁর বিশেষ অনুরক্ত বিখ্যাত আমেরিকান বৈদ্যুতিক নিকোলা টেসলা, তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত পেয়ে পুলকিত হয়েছিলেন। আর বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের গবেষণা যখন পদার্থ বিজ্ঞানের বেষ্টনী অতিক্রম করে শরীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে জড় ও জীবের মধ্যে অখণ্ড সত্যের আভাস পেতে লাগলেন তখন তিনি তাঁর প্রতি মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারেন নি। কারণ জগতের হিন্দু ধর্ম্মের মূল সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, এই বৈজ্ঞানিকের একনিষ্ঠ সাধনায়। তাঁর সাফল্যে তিনি উচ্ছ্বসিত।

প্যারিসে সমবেত বৈজ্ঞনিকগণ জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের অভিনবত্বে চমকিত। তাঁরা তখন তাঁকে অভনন্দন জানিয়ে এই পেপারটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করলেন ও কংগ্রেস বিবরণীতে প্রকাশ করলেন। তখন ব্যক্তিস্বার্থ বা জাতিস্বার্থ ছিল উর্দ্ধে।

১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাডফোর্ড বৃটিশ এসোশিয়েশন পড়লেন প্যারিসে পড়া একই পেপার। উল্লাস বোধ করলেন পদার্থবিদ বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু বিমূঢ় হলেন শরীরতাত্ত্বিকরা। তাঁকে ইংলণ্ডে চাকরী গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হল। স্যার উইলিয়াম ক্রুকস তাঁকে রয়েল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করলেন। এখানেও প্রশংসা পেলেন পদার্থবিদদের কাছে। আপত্তি তুললেন শারীরতাত্ত্বিকগণ। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর সে আপত্তি খণ্ডন করা সম্ভব হল না। অপরেশন হল দু'মাস রোগশয্যায় কাটালেন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হল না, শরীরে একটু বল পাওয়া মাত্র ডেভি ফ্যারাডে ল্যাবটারীতে কাজ আরম্ভ করলেন, যাতে শারীরবিজ্ঞানেও প্রমাণ করতে পারেন তাঁর সিদ্ধান্তকে। এপ্রিল ১৯০১ মাসে উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য তৈরী হলেন। রয়াল ইনষ্টিটিউশনে ১০ই মে, সভা বসলো। ৭ই মে তাঁর বক্তৃতার চুম্বক পাঠিয়ে দিলেন সোসাইটিতে। এখানে শারীরতাত্ত্বিকগণ আপত্তি তুললেন না। কিন্তু মেঘ জমতে সুরু হল। ৬ই জুন বার্ডন স্যাণ্ডারসন ও ডাঃ ওয়েলার আপত্তি তুললেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন, বিজ্ঞানের জাতিভেদ তোলা হল, পদার্থ-বিজ্ঞানকে শারীরিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। রয়াল সোসাইটিতে তাঁর পেপার ছাপা হল, প্রকাশ হল না স্যাণ্ডারসন ও ওয়েলারের প্রতিবাদে। বৈজ্ঞানিকরা বিভক্ত হলেন। সভাপতি স্যার উইলিয়াম ক্রুকসের কাস্টিং ভোটে তা বন্ধ হয়ে গেল।

পেপার প্রকাশ না হওয়া তাঁর লাঞ্ছনা বাড়লো। ভারত সরকার তাঁর ডেপুটেশন কাল বাড়াতে রাজী হলেন না। অথচ গবেষণার শেষ করার জন্য তাঁর ইংলণ্ডে থাকার প্রয়োজন। রয়াল ইন্সটিটিউশন ল্যাবরেটরীতে কাজ আরম্ভ করলেন। কাজের অগ্রগতিতে অধ্যাপক ভাইনস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ খুশী হলেন। তাঁরা জানালেন রয়াল সোসাইটি দরজা বন্ধ করে দিলেও লীনিয়ান সোসাইটির দরজা খোলা আছে। সেখানের বক্তৃতা (২১শে মার্চ্চ ১৯০১) সোসাইটির কাগজে প্রকাশ করা হল। এর পরই ডঃ ওয়েলার দাবী করলেন ডঃ বসুর আবিষ্কারের কেনা অংশ বিশেষ তাঁর আগেই নিজস্বভাবে প্রকাশ করেছেন। ঘটনাটা ছিল মূলে অন্যরূপ, যখন রয়াল সোসাইটিতে ডঃ বসু বক্তৃতা দেন তখন তিনি তার প্রচুর নোট নিয়ে নেন, ডঃ বসুর পেপার রয়াল সোসাইটিতে প্রকাশ বন্ধ থাকায় তা তিনি নিজের নামে চালিয়ে দেন তদন্তে তা প্রমাণ হয়ে গেল। এপাশে রয়াল সোসাইটিতে তা প্রকাশ বন্ধ থাকায় ডঃ বসু স্থির করলেন বইয়ের মাধ্যমে তাঁর গবেষণার ফল সকলের গোচরে আনবেন।

নিবেদিতা স্বামিজীর সঙ্গে যখন পাশ্চাত্য যাত্রা করেছেন। তাঁর সঙ্গে কিন্তু ডঃ বসুর যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৯৯ তারিখে মিসেস বুলকে জানালেন : গতকাল বসুদের কাছ থেকে খবর এসেছে। ডঃ বসু প্যারিসে আমন্ত্রিত হয়েছেন। আমি কিভাবে না চেয়েছি তিনি অধ্যাপনা পদটি পান! পেলে অবস্থাকে অতি অবশ্যই সফল করে তুলবেন। আশা করি তিনি আসবেন, কখনই ফিরে যাবেন না। তাঁর স্পর্শকাতর মন 'জাতি মর্য্যাদা' দেয়, তা অতি মারাত্মক। তাছাড়া কলকাতার আবহাওয়া গবেষণার সহায়ক নয়। আমি খুবই খুশী এই ভেবে, সবকিছুই বিশ্বমাতার হাতে, ভারতের জন্য সত্যই উত্তম কোনটি— তা তিনিই পেয়ে থাকেন।

একই তারিখে মিস ম্যকলাউডকে জানালেন গতকাল বসুর চিঠি এল। আবিষ্কারাদি মহাগতিশীল। পাঁচমাস একাদিক্রমে এমনকি রবিবার পর্য্যন্ত ছুটি না নিয়ে কাজ করে চলেছেন। সায়েন্টিফিক কংগ্রেস তাঁকে প্যারিসে যেতে বলেছে, এ প্রস্তাব গ্রহণে এখনও নিশ্চিন্ত নন। বাস্তব অসুবিধা অনেক। আমার কথা— তিনি আসুন এটা আমি চাই। আর তিনি ফিরে যাবেন না। চিঠি খানা পাঠিয়ে দেবো, স্বামিজী এ চিঠি পড়তে ইচ্ছা করবেন। বলবেন— সেগুলি মিসেস বুলের কাছে পাঠিয়ে দিতে। আহা, আমার কী যে ইচ্ছা হয়, আমেরিকায় অধ্যাপনা তাঁর যদি যোগাড় করা যায়!

১৩ই জানুয়ারী ১৯০০ লিখলেন : গতরাত্রে ডঃ বসুর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, স্বামিজীর পড়া হয়ে যাবার পরে তুমি কি সেন্ট সারার কাছে পাঠিয়ে দেবে?

১৫ই এপ্রিল লিখলেন : সেন্ট সারা বসুদের সম্বন্ধে আমার মতই নিশ্চয়তা বোধ করবেন হুর্‌রে!

২৪শে এপ্রিল জানালেন : সেন্ট সারাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি, তিনি লেডী ইসাবেলের কাছ থেকে শুনেছেন, লর্ড রিপন, লর্ড র‍্যালেকে কিছু অনুরোধ করতে পারবেন না, যেহেতু তিনি তাঁকে চেনেন না! সেই সঙ্গে মিঃ লাওয়েলকেও না। কিভাবে ব্যাপারটা সমাধা করা যায় জানতে চেয়ে মিঃ গেডিসকে লেখার ইচ্ছা আছে। সেন্ট সারাকেও কাজটা করতে বলো। যদি সরকার ডঃ বসুকে পাঠায়— পাঠাবে বলেই বিশেষ বিশ্বাস, এক্ষেত্রে মনে হয় সেন্ট সারা চাইবেন লাওয়েল পদটিই তিনি নেবেন।

১৩ই মে মিসেস ওলিবুলকে জানালেন : বসুদের সম্বন্ধে কত না সুখী আমি। এখন আমি নিশ্চিন্ত তাঁরা প্যারিসে আসবেন।

৬ই জুন মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : সেন্ট সারাকে তুমি বলবে কি যে, মিসেস চেনীর এক পালিত পুত্র আছেন জনৈক উদ্ভিদবিজ্ঞানী, তিনি ওঁর সঙ্গেই থাকেন। অধ্যাপক সেজউইকের অধীনে ভদ্রলোক কাজ করেন। অধ্যাপক সেজউইক Lowell Inc. Trust-এর কার্য্যতঃ

ব্যবস্থাপক। মিঃ জ্যাক বলেন, তাঁর কোন প্রভাব নেই, এবং কাজটার ভার নিতে তিনি সঙ্কুচিত, কিন্তু মিঃ চেনীর দৃঢ়মত : কাজটা সম্পন্ন করবার এটাই পথ। ব্যাপারটা অবশ্য বেশী হৈ চৈ করে বা মুখমিষ্টির ভাব না দেখিয়ে সহজভাবে করিয়ে নেওয়া দরকার। তাই আমি মিঃ জ্যাককে ব্যাপারটার বিবরণ দিয়ে সরাসরি ছোট একটা চিঠি লিখলাম, তার সঙ্গে লর্ড রিপনের চিঠিও দিলাম, আজ প্রাতরাশের সময়ে মিঃ জ্যাককে সব দিয়েছি। উড়ন্ত মোরগের মত আমি কিছু বীজ ইতস্ততঃ ছড়াতে পারি হয়ত কিন্তু অধ্যাপক সেজউইক যদি ব্যাপারটা নিজে নির্দ্ধারণ করতে মনস্থ করেন, তাঁর উপরে সমস্তটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তিনি ইতিমধ্যে ইউরোপ যাত্রা করেছেন এখন অনুমান করা সঙ্গত যে, তিনি আগামী কয়েকমাসের মধ্যে পদের উপযুক্ত লোকের সন্ধান করবেন। তিনি বায়লজিষ্ট (টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের) সুতরাং তাঁকে জালে বদ্ধ করা সহজ বলে তোমার মনে হওয়া উচিত এবং তারপরে সেন্ট সারা ডঃ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন বিষয়টা তাঁর কাছে উল্লেখ করা উচিত হবে কি না।"

২৪শে জুন, ম্যাকলাউডকে জানালেন, নিউইয়র্ক থেকে : বসুরা তাঁদের নিজস্ব প্রিয় স্বরূপে। লেডী চেটী (মিসেস লেগেট) বলেন, তাঁরা চমৎকার। অনুমান করতেই পারো এতে আমার আনন্দ ও তৃপ্তি কতখানি!"

মার্চ মাসে প্যাট্রিক গেডিসের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটে গেল। তিনি প্যারিস প্রদর্শনীতে ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন বৈঠক গঠনের ভার পেয়েছেন নিবেদিতাকে সহকারিনী রূপে পেতে চাইলেন। তাঁরই অনুরোধে প্যারিসে স্বামিজীর অনুমতি নিয়ে আগে রওনা হলেন। স্বামিজী এলেন জুলাইয়ের শেষে। মিসেস বুল ও ম্যাকলাউড তখন প্যারিসে। ডঃ বসু সস্ত্রীক এলেন আগষ্টে লেগেট ভবনে মিলিত হলেন, সকলে (স্বামিজী, নিবেদিতা, ডাঃ বসু, মিসেস বুল আরও অনেকে) বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডঃ বসুর সাফল্যের প্রত্যক্ষদর্শী হলেন।

১লা আগষ্ট মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : বসুরা এসেছেন তোমায় জানাতে চাই। তাঁরা চমৎকার। মি. ম্যাভর মিসেস বসু সম্বন্ধে অতীব উৎসাহী। চমৎকার নয় কি? গেডিসের আবাসে বসুরা যখন কফি খেতে এসেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। প্রিয় গেডিস! পণ্ডিতদের পরস্পর সম্বন্ধে তাঁর এই উদার মহত্ত্ব ও হৃদয় মাধুর্য্য আমি ভালবাসি। আজ সকালে মিঃ ম্যাভরকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম : ওঁদের কেমন লাগলো?— উত্তরে বললেন : অত্যন্ত ভাল। শ্রীমতি বসুর মত পছন্দসই মর্য্যাদাময়ী মহিলা অল্পই দেখা যায়। মধুর ও বিচিত্র সুন্দর নয় কি? কী যে ভালবেসেছি ব্যাপারটা। আজ রাত্রে ওঁদের কাছে যাচ্ছি।

পাশ্চাত্যে শিশুদের জন্য ইংরাজীতে ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্ (পৌরাণিক গল্পগুলি) লেখা হয়ে গিয়েছিল। বর্ত্তমানে তা ঘসামাজা চলছিল, সেই প্রসঙ্গে জানালেন : যদি সত্যই আসো, ওগুলি নিয়ে আসবে কি? তা হলে বসুদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যায়। ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আধঘণ্টা পরে ডঃ বসু ও বিষয়ে বললেন। তিনিও চান ভারতীয় গল্প পাশ্চাত্যজগতে যাচাই করে নেওয়া হোক। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা চিন্তিত, এতে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

২০ শে আগষ্ট ম্যাকলাউড জানালেন : ঘন্টাখানেক কি ঘণ্টা দুই আগে ডঃ বসুর কাছ থেকে চমৎকার একটি চিঠি পেয়েছি। মিস উইলির সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি নিশ্চিত ডঃ বসু মিস উইলিকে পছন্দ ও প্রশংসা করবেন। তাঁকে আমি অপরূপ মনে করি। ... ওয়েলাদের এবং বসুদের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি অপূর্ব্ব তোমার মহিমা। ইউরোপে ডঃ বসুর পূর্ণতার ছবিতে আমি আনন্দিত— পুণ্যাত্মা মানুষটি। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ইংলণ্ডে গেলেন জগদীশচন্দ্র। ব্রাডফোর্ড বৃটিশ এ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা দিলেন। ফলে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির প্রস্তাব এলো।

১০ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন জগদীশচন্দ্র : বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদের নিয়ে আমার Steroscope এ M E R O ইত্যাদি দেখে আশ্চর্য্য হলেন। বললেন : You have a fine research in hand, go on with it! পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others.... all very important"... মিঃ লজ যে ইঙ্গিত করেছিলেন অধ্যাপক ব্যারেট স্পষ্টই সেই চাকরির প্রস্তাব করেন। অত্যন্ত ভাল চাকরী, অধ্যাপনার।

এ প্রস্তাবে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে : এখন কি করি বলুন? একদিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করেছি, যার outskirts নিয়ে ব্যাপৃত আছি এবং যার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলবে না। তার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করতে পারে না। আমি কি করবো কিছুই স্থির করতে পারছি না। আমার সমস্ত Inspiration-এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হলে আমার আর কি রইলো!...

৫ই অক্টোবর লিখলেন : জীবনের কথা কেউ বলতে পারে না। নতুবা ইচ্ছা ছিল, এক নূতন School of works ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশ হবে। আপনারা কেন একাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন না। তাহলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছে যেত। জীবন অনিত্য বলেই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে হচ্ছে। দেশ থেকে আসবার সময়ও জানতাম না যে কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়েছে। সম্পূর্ণ না ভেবে যে থিয়োরী প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছি তা অর্দ্ধপরিস্ফুট, প্রতি কথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে প্রথমে বুঝিনি। এসব কথার অর্থ করতে গিয়ে দেখছি ঘোর অন্ধকারে হঠাৎ জ্যোতিঃর আবির্ভাব। যে দিকে তাকাই সেদিকেই অনন্ত আলোক রেখা। জন্মজন্মান্তরেও শেষ করতে পারবো না। কোন দিকটা ছেড়ে কোনদিকটা ধরবো স্থির করতে পারছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার ছুটির সময়ও ফুরিয়ে আসছে।

২রা নভেম্বর লিখলেন : আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থেকে কিছু করতে পারি, তাহলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। দেশে ফিরলে যে সব বাধা পড়বে তা বুঝতে পারছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থেকে যায় তাও সহ্য করবো।....

১০ই নভেম্বর লিখলেন : আজ প্রায় দু মাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলছে। এখানে থাকবো কি দেশে ফিরে যাবো! তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করবে?

ভেবে দেখ, যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলে চলে আসি, তবে কে ভার বইবে? সকল সময়ে তোমাদের পিছনে এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্ত্তি দেখতে পাই। তোমাদের সঙ্গে আমি তাঁর আঁচলে আশ্রয় নিই। ভাষায় সেসব কথা কি করে প্রকাশ করবো? তুমি বুঝবে।

সাধারণতঃ লোকের যে সব বন্ধন থাকে, তা থেকে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সে অঞ্চলডোর ছেদ করতে পারি না।....

২৯শে নভেম্বর লিখলেন : গাছ মাটি থেকে রস শোষণ করে বাড়তে থাকে, উত্তাপ ও আলো পেয়ে পুষ্পিত হয়। কার গুণে প্রস্ফুটিত হল? কেবল গাছের গুণে নয়! আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরে হোমানলের অগ্নি অনির্ব্বাপিত রয়েছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়ে সেই আগুন রক্ষা করেছেন, তারই. এক কণা দূরদেশে এসে পড়েছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই শুধু দুঃখের

অংশী সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করতে দাও। তাহলে শতবাধা পেয়েও হতোদ্যম হব না। তোমাদের জন্যই জয়লাভ করবো।...

একপাশে জগদীশচন্দ্রের অন্তরদ্বন্দ্ব, অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রশংসা ও শারীর তত্ত্বিকগণের আপত্তির তুফান। সমস্যা সমাধানের পূর্ব্বেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ডঃ বসু ইংলণ্ডে ফিরে যাবার কিছু পরেই নিবেদিতা প্যারিস থেকে ইংলণ্ডে এলেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমার ছোট্ট মা (গর্ভধারিনী মা) এইমাত্র ডঃ বসু ও মিসেস বসুকে ঠাঁই দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তাঁর পক্ষে এটা খুব প্রিয় ব্যবহার নয় কি? আমি কিন্তু অপেক্ষা করতে বলেছি যতক্ষণ না মিসেস বুল আসেন। ইতিমধ্যে আমি দারুণ বেহিসেবী খরচের মধ্যে যাচ্ছি। এক সন্ধ্যায় ওঁদের ঠাণ্ডা মটন সাপার দেবো, যাতে তাঁরা ঘরোয়া পরিবেশ অনুভব করেন।

১লা নভেম্বর লিখলেন : কয়েকদিন আমরা সারের পাইন বনে কাটিয়েছি একেবারে স্বর্গ। আমার জন্মদিন সেখানেই কেটেছে, মা এবং বসুরা আমার সঙ্গে ছিলেন।

প্রিয়তমা, তোমাকে বলে উঠতে পারবো না, এই বন্ধুরা আমাদের অভীপ্সার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের কাছে কতখানি আপন হয়ে উঠেছেন। অদ্ভুত শোনাবে, তবু সত্য মনে হচ্ছে আমরা তাদের কাছে গীতাকে এনে দিচ্ছি। ডঃ বসু অসতর্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন একটানা বলে যান তখন শুনতে কত ভাল লাগে। বলে যান ভারতের অতীর ত্যাগের প্রচণ্ড কাহিনীগুলি, একের পর এক। তখন কেবল এই ভাবেই তত্ত্বের শুকনো পাঁজরে আঙুল বুলিয়ে নয়— কতকটা ধারণা করতে পারি, এই ধরণের আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কোন উত্তরাধিকার পেয়েছে।

আমার কাছে খুবই মর্ম্মস্পর্শী মনে হল, যখন গতকাল সকালে প্রাতঃরাশের আগে দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়ে পরিকল্পনা করতে লাগলেন : যদি সবর্বাত্মক ক্ষমতা হাতে এসে যায়, তাহলে ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে দশ বছরের জন্য আমরা ক'জন কি করবো? শুধু আমরাই ছিলাম, তিনি শিশুর মত বলে চলেছিলেন। চার বছরের পাঠ্যসূচী নিয়ে এহেন প্রাথমিক বিদ্যালয় করবো, তারপর চার বছরের জন্য এহেন মাধ্যমিক ব্যবস্থা— তারপর স্কলারশিপ প্রভৃতির চমৎকার ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি...।

শুধালাম—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি করাবেন?

আমি তাদের মিঃ কুকের আকাঙ্ক্ষামত আত্মবিকাশের শিক্ষা দেবো। মিঃ কুক দুদিনের জন্য এসেছিলেন— বটানি পাঠ দিয়েছেন আমাদের, যার জন্য ডঃ বসু তাঁর প্রতি প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধায় বাঁধা পড়ে গেছেন। কেমন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে হয়, সে শিক্ষা দেবো, আর দেবো ঐ জিনিসটা, ঐ যে তুমি বলে থাকো কি যেন সেটা কাজ আর কাজ!.... কারণ সত্যকার মহান শিক্ষার হল এটা তৃতীয় দিক। আমাদের লক্ষ্যই হবে একটি মাত্র বিজ্ঞানের লোক তৈরী করা নয়, বিজ্ঞানের নিখুঁত লোকগুলি তৈরী করা। বুঝতে পারছো!

অনুভব করতে পারো কি, এই কথোপকথন আমার জীবনে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

১৫ই নভেম্বর লিখলেন : এই সপ্তাহের প্রতিদিনই তোমার কাছে লিখবার চেষ্টা করছি, কিন্তু টাটা স্কীম ও ডঃ বসুর পেপারগুলির উপর এত বেশী সময় গেছে যে, আমি লিখে উঠতে পারিনি। বসুদের সঙ্গে আছি, প্রতিদিন কাজে ভর্ত্তি। পয়লা ডিসেম্বর বা কাছাকাছি সময়ে তাঁর অস্ত্রোপচার হবার কথা।....

ক্লাবে এখন বক্তৃতার রাত্রিগুলি যা তা। আগে যা ছিল সে রকম নয় একেবারে। লণ্ডন লণ্ডনই নয় লেডী ইসাবেল ছাড়া। এখন লণ্ডনের চেয়ে বসুদের সঙ্গই অধিক উত্তম।

মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তকে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছি। তিনি বললেন: স্বামিজীর সঙ্গে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। সকলের প্রিয় হবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় ডঃ বসু খুব আমোদ বোধ করেন।

তর্ক জুড়ে দিলাম যদি তরু দণ্ডের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা বা সম্পর্ক থাকে, তাহলে স্বামিজীর সঙ্গেও নিশ্চয় আছে। এ অভিযোগটি অস্বীকার করলেন না...

চিঠি লেখা হয়ে উঠছেনা- গোটা দিনগুলি কেটে যায় বিজ্ঞানের অনুবাদ ও ভারতের কথায়।

ডঃ বসু উত্যক্ত করছেন স্বামিজী ও মিঃ মোহিনীর বিষয়ে। বলেছি : ওদুটি মানুষের মধ্যে এমন কোন সমতা নেই- যা তুলনা করা যেতে পারে!

মিসেস বসু থামিয়ে দিলেন : নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন। তুলনার প্রশ্নটা উদ্ভট।

গভীরতম বিষয়! কেউ বলতে চায় না, অথচ ঐরকম খড়কুটো স্রোতের গতি বুঝিয়ে দেয় তাঁদের মধ্যে স্বামিজী সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ আছে আর তা বিশ্বাস করার কারণ প্রায় ঘটে। এক এক সময়ে ভাবি প্রতীক পূজার ব্যাপারেও বোধ হয়, মতভেদ আছে কিনা সন্দেহ।...

২২শে নভেম্বর ওলিবুলকে লিখলেন : দুটো জিনিষ তোমাকে দিতে চাই, গতরাত্রের ডিনার সূত্রে :

(১) ইথার ও ইথার বোনা- বিশ্বজগৎ (২) কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, ফুল বা পতঙ্গ, তুমি বা আমি আমাদের সকলের জীবন দুই অনন্তের মধ্যে সেতুস্বরূপ, পিছনে আকরিত বিরাট অনন্ত, সামনে সম্ভাবনা গর্ভ অসীম অনন্ত।

তোমার ভালবাসা সকলকে দিয়েছি খোকাকেও (ডঃ বসুকে)! তিনি বললেন : আঃ তা হলে আমরা সত্যই এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।... ডঃ বসুর জন্মদিন শুক্রবার ৩০শে।

২৯ শে নভেম্বর মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন :

তুমি এখানে নাও আসতে পারো? এই সংবাদ আমাদের সকলেরই মনোভঙ্গ। ডঃ বসুর সর্ব্বোধিক। যদি তুমি আজ রাত্রে যাত্রা করতে না পার, তবু যে কোন ক্ষেত্রেই তোমার জন্য একটি চেয়ার প্রস্তুত রাখা হবে- একথা লিখে দিচ্ছি।..... তোমাকে বোঝাতে পারবো না— তোমার অভাব কিভাবে বোধ করছি!.... ডঃ বসু হঠাৎ কয়েক মিনিট আগে মনে করলেন, একটি বইয়ে তিনি আমাদের সকলের সাক্ষর এবং প্রত্যেকের লেখা কয়েকটি কথা নিয়ে নেবেন, ভবিষ্যতের স্মারক হিসাবে। আশঙ্কা হয়, তোমার নাম সেখানে থাকবে না এবং সে তো বিরাট ফাঁক।...

দ্বিতীয় পেপারটি বেশ দূর এগিয়েছি। এটি দারুণ।... তুমি নিশ্চয় শুনে অবাক হবে না, বৈজ্ঞানিক নকশা করতে, গণনা করতে, ভেবে জিনিষ বার করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়; ইনি বলবেন : আরও একটা দিন বৃথা গেল! আমি এত অলস কেন? কিন্তু একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট করা হয়নি, বাস্তবিকই। গতকাল সকালে তার ফলে সোফায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে। সোমবার আমি তাঁর প্রচণ্ড মনের তড়িৎপ্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রইং করেছি, ফল ভেঙে পড়া। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ওঁকে একটি পেপারকে সর্ব্বাধুনিক করতে দিনের পর দিন কাটাতে হয়।

তুমি তো জানো, আগামীকাল তোমার এবং মিসেস বসুর জন্য পোর্টফোলিও তৈরী রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। যা করেছি তা হল ডঃ বসুর জন্য ছোট মলিন বুক কভার।...

আজ সকালে শুধু আমরা ছিলাম। হঠাৎ তিনি রেখাগুলি, যা এইভাবে যায়— তার বিষয়ে ভাবতে ভাবতে বললেন : ম্যাগনেশিয়াম এবং অন্যান্য জিনিষে যে প্রকার ঘোরানো বাঁকানো রেখা, মানুষ সেইভাবেই যেন গভীর থেকে গভীরে ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে, একই সঙ্গে উচ্চের উচ্চে অপ্রতিহতভাবে উত্থিত হতে পারে তার জীবনের সর্ব্বত্র। জীবনপথে মানুষ অগ্র, পশ্চাত অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় ধাক্কা খেতে খেতে অগ্রসর হবে— শৃঙ্খলমুক্ত অবিরত সর্ব্বত্র। এরই নাম সত্যকার স্বাধীনতা। শুনতে শুনতে আমি কি বলবো, রুদ্ধশ্বাস— একেবারে স্বামিজীর দর্শন।

আমার মহা সুখের বিষয়টি তোমার কাছে বলতে চাইছি: এখন জগদ্ধাত্রী, পৃথিবীর ধাত্রীমাতার শুক্লপক্ষ। ভাবতে ভাল লাগে যে, এই আত্মা (ডঃ বসু) জন্ম নিয়েছিল— জীবনের যা কিছু মধুর, রক্ষাকারী.... তারমধ্যে.....

দুর্গা অক্টোবরের গোড়ায়, কালী সেই সময়ে থেকে নভেম্বরের মধ্যে, জগদ্ধাত্রী এখন! দেখতে পাচ্ছ, রুদ্র, নিষ্ঠুর, বিশ্বশক্তির (দুর্গার) আধিপত্য তার উপর নয়, কিংবা ভয় ও মৃত্যুর প্রিয় মাতার (কালীর)ও অধিপত্য নয়— পরন্তু যাঁর থেকে সকল মানবীয় মাতৃত্ব উদ্ভুত হয়, জন্মকালে তাই তাঁর নিয়ন্তা— শেষেও তাই থাকবে।

ঠিক এই মুহূর্তে হয়ত তুমি দারুণ এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছ। ডঃ বসু মনে করেন না যে, তুমি যাত্রা করতে পারবে, আর মিসেস বসু নিশ্চিত যে তুমি এখানে আগামীকাল আসছোই। ইতিমধ্যে, তোমার জন্য আমার ভালবাসা এবং শুভ আশা। এই চিঠি পাঠাবার কারণ তুমি আসতে না পারলে যাতে জানতে পারো যে, আমরা তোমার জন্য স্থান করে রেখেছি এবং উৎসব করছি তোমার নামেই।

ডঃ বসু জানালেন— আমি তোমার উপর উৎপীড়ন করি। তাই কি? ইচ্ছা করে তো করি না। আমি অবশ্যই বলবো না, আমি অতিশয় দুঃখিত, কারণ এই উৎপীড়ন সুমধুর, যদি সত্যই তা করে থাকি! উনি বললেন, আমি তোমার উপর করি, তুমি কর তাঁর উপরে, কারণ তিনি তোমার কোন অভিপ্রায় রোধ করতে সমর্থ নন, এবং অপরদিকে তিনি করেন আমার উপর। .... দেখতে পাচ্ছ আর একটি ত্রিভুজ।

ডঃ বসু বলেন : না, যদিচ তুমি এখানে আসতে না পার, তার জন্য দুঃখবোধ করা, কারণ তিনি অন্ততঃ মনে করেন তুমি এখানে আছই— আসো আর নাই আসো।

১৯০০ সালে ডিসেম্বরে জগদীশচন্দ্রের শরীর জীবন বিপন্ন, মিসেস বুল সেকথা শুনে ইংলণ্ডে এসে পৌঁছালেন। ডাক্তার দেখিয়ে ১২ই ডিসেম্বর অপারেশনের ব্যবস্থা করলেন। মিসেস বুল ও নিবেদিতার প্রচেষ্টা ও সেবা যত্নে ডঃ বসু রোগমুক্ত হলেন। এর ফলে মিসেস সারা বুলের তিনি সন্তান রূপে গৃহীত হলেন।

২৫শে ডিসেম্বর ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

ডঃ বসুর শয্যাপার্শ্ব, খ্রীসমাস অপরাহ্ন, আজ বড়দিন, কাল তোমার জন্মদিন। কতদিন হয়ে গেল তোমাকে একটা কথাও লিখে উঠতে পারিনি। চিন্তাশূন্যতার জন্য নয়, ডঃ বসুর কাজে শেষ শক্তিবিন্দু ব্যয় করেছি, একেবারে তন্ময় হয়ে পক্ষকাল পূর্ব্ব অবধি। ডঃ বসুর ১২ তারিখে অপরাশেন হল। আমরা সর্ব্বসময় তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে আছি। এখন বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে। এই বাড়ীতে একটি ঘরে তাঁর স্ত্রী থাকেন। আমরা পালা করে তাঁর সঙ্গে কাটাই চমৎকারভাবে সেরে উঠেছেন। আমার মনে হয় আমরা সবাই আশা করি অসুখের আগে তিনি যা ছিলেন, তার থেকে অনেক ভাল ও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝে খোঁচা খাওয়া বাঘের মত কাজের জন্য ছটফট করছেন।....

তুমি জানো, আমার সমস্ত হৃদয় উন্মোচন না করে তোমাকে কখনও কিছু লিখতে পারি না, তাই নীরব ছিলাম। প্রকাশের উপযোগী সুযোগ বা সামর্থ্য পাইনি। যা শিখেছি, শিখছি- তার অর্দ্ধেক যদি তোমাকে বলতে পারতাম! অনেক কিছুই বলতে পারিনা, কিন্তু একথা ঠিক, অন্ততঃ তাই আমার বিশ্বাস। আমি সত্যই শিখছি, এমন কিছু যা অপরের সম্বন্ধে সর্ব্বদা কোমলতর, মধুরতর এবং সশ্রদ্ধ করে তোলে। এখানে, প্রতি পদক্ষেপে, আমি তোমার জ্ঞানের কিছুটা আয়ত্ত করছি। কিন্তু হায়, এখনও জানি না, কি ভাবে আমার আত্মাকে অন্যের আত্মার সুরে বাঁধা যায়

এবং প্রতিমুহূর্ত্তে সুসমঞ্জস্য সম্পর্কে আসা যায়। আরও শ্রদ্ধা চাই, আরও আরও - মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে কতখানি যে প্রয়োজন তার! এই ক্রীসমাসে আমি প্রথম 'লাবণ্য-প্রতিমা' মেরীর পূজারী হয়েছি। প্রিয় য়ুম, এযে কতখানি, কি বলবো! যে আত্মাগুলি তোমার সান্নিধ্যে আসে, তাদের প্রত্যেকের উপরে মাধুর্য্য ও সহানুভূতি, বর্ষণেও তুমি লাবণ্য! কারুণ্য প্রতিমা। কিন্তু আহা, মেরী! যে মাতৃত্বের পূর্ণতা পেয়েছে, তার কণামাত্র যেন অন্যে পায়!

আজ অপরাহ্ন কাটাচ্ছি ডঃ বসুর সঙ্গে। জাহাজের ডায়েরী স্বামিজীর সঙ্গে ভ্রমণের —কিছু কিছু পড়তে চেয়েছি। ও য়ুম, 'যোগসূত্র' হবার কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু এই মানুষটি যদিনা তাঁর (স্বামিজীর গোষ্ঠী) এবং কাজে সবেগে প্রবেশ করেন, তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ আমার কল্পনার অনুরূপ আকার নেবে না। ইনি স্বীকার করেন যে, কোনকিছু আধাআধি করতে পারেন না। এ পর্য্যন্ত কর্ম্মই তাঁর ধর্ম্ম আর সে কী ধর্ম্ম! কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ কখনো ঘনায়নি এঁর উপরে এবং প্রতীক বিষয়ে ধারণা নানা 'না' এর বেড়ায় বাঁধা। কিন্তু কি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে স্বামিজীর মহা নির্দ্দেশের কথা শোনেন! সেগুলি সত্যই বিরাট। সেই ৬ সপ্তাহের জন্য (স্বামিজীর সঙ্গে জাহাজে ৬ সপ্তাহ কাটানো) আমার কৃতজ্ঞতার শেষ হবে না কখনও। এঁর (বসুর) হিন্দু কৃতজ্ঞতা অপরূপ। আমাদের বন্ধুত্ব ও একত্র কাজের বিষয়ে আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন তিনি খুবই সহজভাবে বললেন : এমন কাজ কার জন্য তা জানি এবং সেই 'কে' হলেন আমার পিতা 'স্বামিজী।'

৪ঠা জানুয়ারী-১৯০১, ম্যামলাউডকে লিখলেন : ডাঃ বসু এখন প্রায় সুস্থ। মা তাঁর ছোট বাড়িটি তাঁদের ও আমার জন্য ছেড়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমরা উইম্বলডনে আছি।

আমি খুব ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্ম ঐতিহ্য ও অনুভূতি আয়ত্ব করবার চেষ্টা করছি। পাওয়ার পক্ষে এটি উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বস্তু মনে হচ্ছে। ইনি (ডঃ বসু) অনুভব করেন যে, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর মত আমার শোনা উচিত। মর্য্যাদার বিষয় হবে না সুতরাং বলার সময়ে মনের প্রচণ্ড বাধা তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। অবশেষে মনে হয়, আমি পাচ্ছি। সম্পূর্ণভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি। আমার বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ চান আমি এই করি এবং যদি সম্ভব হয় এইপথে ঈশ্বরের সমীপে যাই। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, আমরা (অন্তত আমি) প্রথমে শিব ও কালীকেও ভালবাসিনি। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণও সকল ধর্ম্মকে সমভাবে ভালবাসেন নি। বর্ত্তমানে এই যে প্রয়াসে আমি নিরত আছি, এর প্রতি কোন আনুগত্যের অভাব না দেখিয়েও বলতে পারি এটি আমার বাল্যের পিউরিটানিজমের সঙ্গে ভয়াবহরকমে এক। কিন্তু দারুণভাবে এও অনুভব করছি, যতই যা হোক, আমাকে আরও চেষ্টা করতে হবে। এবং কখনো কখনো আমি খুব স্বচ্ছভাবে, ও নিশ্চিতভাবে বোধ করি: এই ডাক, এই চেষ্টার তাগিদ এসেছে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। অন্য সময়ে স্বামিজীর কথা মনে পড়ে আর কেঁপে উঠি, কারণ মনে হয় না ব্যাপারটা তিনি বুঝবেন ও অনুমোদন করবেন। এবং তাঁর অনুমোদন এখনো আমার কাছে গভীরতম ব্যাপক। অধিকন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আমি জীবনযাপন করেছি, এ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে যা কিছু বরণ করতে পেরেছি, সব কিছুই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু এইভাবে ভাবা আমার পক্ষে কী হীনতা। যেন নিজের হতভাগ্য ক্ষুদ্র সত্তাকে, অন্যায়ে পতিত দেখা। এতো ভয়ঙ্কর! বিস্ময়ের কিছু নেই, যখন নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত, শীতল ও বিদ্রুপের লক্ষ্যবস্তু দেখতে মানুষ এত সংকোচ বোধ করে!

কী কাণ্ড! তুমি মাতাঠাকুরানীকে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে দেখতে পাবে। কী অপূর্ব্ব তা আহা!...

ডাঃ বসু ও মিসেস বসু প্রায়ই বলেন, কলকাতায় শেষে স্থির হয়ে বসার আগে, ভারতের নানাস্থানে ওঁদের পরিচিত নানাজনের কাছে আমি চক্র দিয়ে ফিরেছি, মিসেস বসুর ভাষায়

'অশ্বমেধের অশ্বের মত', আমার মনে হয়, যদি সত্যই তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহলে তা করবার মত কাজ।

১১ই জানুয়ারী লিখলেন ম্যাকলাউডকে, আগামীকাল এলে অপারেশনের পরে একমাস হবে। সেদিন ডঃ বসু টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে, বলেছিলেন: ভদ্রমহোদয়গণ! এবার আপনারা ছুরিকাঘাত করতে পারেন!' এই সপ্তাহে তিনদিন তিনি ল্যাবরেটরীতে কাজ করছেন, ঐ সময়ের মধ্যে প্রচুর কাজ হয়েছে। অপূর্ব্ব নয় কি? ভারতীয় রক্ত এবার নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। এত দ্রুত আরোগ্যের একমাত্র কারণ হতে পারে তাঁর মিতাচারী স্বভাব। যে ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন,তা তখন যা, বুঝেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। ধন্যবাদ এবং আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীকে অধিক ধন্যবাদ, আমরা ভালয় ভালয় অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছি। কলকাতায় মার্চ্চ মাসে ফিরতে চাইছি। আশা করি তোমার চিঠিগুলি এর পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অনেকদিন ধরে মাতাঠাকুরাণী সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত। গত মেলে যে-সব চিঠি পেয়েছি, তাতে আমার আশঙ্কাই সত্য বোধ হচ্ছে। সুতরাং দ্রুত যেতে ব্যগ্র।....

গত রবিবার আমি দুবার ওয়েলসে বক্তৃতা করেছি।... সেখানে একটি অসাধারণ জিনিষের উদয় হয়েছে। বলেছিলাম : আমি ব্রাহ্মমতকে ধরবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সারা বললেন, আমি তা মোটেই করছি না। যাই হোক, এক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতে হল। আমি দেখলাম, স্বামিজী এ পর্য্যন্ত আমাদের যা দিয়েছেন, তারই সর্ব্বোচ্চ অংশ অবলম্বন করেছি। এক ঝলকে তখন বুঝলাম, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা এ কাজ করতে প্রণোদিত করেছে, যা আমি কখনোই হয়ত করতাম না— অন্যের প্রয়োজনের আমন্ত্রণ ভিন্ন। সুতরাং বুঝতে পারলাম, আমি হয়ত, প্রতীককে ব্যবহার করেছি, অভেদ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিকে ব্যাহত বা রুদ্ধ করতে। এবং যে-পর্য্যন্ত না সেই অভেদ দৃষ্টি পুনরায় ফিরে পাই। হয়ত প্রতীকে আর ফিরে যাবো না। এই আবিষ্কারে কতখানি শান্তি পেয়েছি কি বলবো! এটা কি অদ্বৈত সত্যের অপূর্ব্ব প্রমাণ নয়— যে সত্যকে প্রচণ্ডভাবে ঘোষণা করেন স্বামিজী, যেখানে, প্রতিটি পথেই তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষিত?

ডঃ বসুর সঙ্গে কখনো কখনো কথা বলে, এই বিষয় কিভাবে না বুঝেছি! স্বামিজী এবং তাঁর মতপার্থক্যের বিষয়গুলি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেন না, কারণ সেটা অশালীন হবে এবং আমাকে সর্ব্বদা জোর দিয়ে বলতে হয়- "দেখতে পাচ্ছেন না, সেই মানুষটি এত বিরাট যে, যে পর্য্যন্ত আপনি সত্যের উপর বিশ্বাসী, আপনি কখনই তাঁর বিরোধী হতে পারেন না।"

একই সঙ্গে ডঃ বসুর মধ্যে এই অসাধারণ ব্যাপারটি দেখা যায় অদ্বৈতের, সেই পুরাতন ধারণা, পিছন থেকে তাঁকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে, যার মধ্যে অন্য বিজ্ঞানীরা অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই প্রমাণগুলিই আমি ভালবাসি— কথা বা যুক্তি নয় বা ঐজাতীয় অন্য মারপ্যাঁচ নয়, যা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। ভালবাসি, এই এক বা অন্য স্তরের অভিজ্ঞতাকে, যেখানে তা সর্ব্বোচ্চ স্তরের নয়, সেখানেও। 'আমাদের উভয়কে সেই একই ব্রহ্মবস্তু করে তোলে।'

মিঃ হাউই চান, আমি ভারতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গ নিয়ে কোন সেরা পত্রিকায় ঝক ঝকে জোরালো একটি প্রবন্ধ লিখি। এমন কি ডঃ বসুও বলছেন, এব্যাপারে এক দৃঢ় ভূমিকা নেবার জন্য, আমার প্রস্তুত থাকা দরকার। কেবল তাঁর দাবি, তা করার আগে, এ সংক্রান্ত সকল তথ্য, সম্পূর্ণ অধিগত করে নিতে হবে, ওবিষয়ে এমন অথরিটি হয়ে উঠতে হবে যে, ওরা যেন আমাকে সভয়ে সম্মান করে। তা না হতে পারলে, চুপ করে থাকাই ভাল।

উত্তম উপদেশ। সুতরাং আমি এ. এম. বসুর (আনন্দমোহন) কাছে সাহায্যের জন্য লিখেছি।

১৮ই জানুয়ারী ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

অল্প কয়েক ছত্র, দারুণ তাড়াহুড়োর মধ্যে মজার কথাটা জানার জন্য. যে বিষয়ে সেন্ট সারা দেখছি তোমাকে গোটাগুটি লিখে পাঠিয়েছে।... ডঃ বসু, যে শক্তির সঙ্গে গতরাত্রের আঘাত গ্রহণ করেছেন, তা আমাকে সবচেয়ে উল্লাসিত করেছে। একসময়ে তিনি স্বামিজীর চেয়েও স্পর্শকাতর ছিলেন। দেশাত্মবোধের সেহেন অনুভূতিপ্রবণ তরু থেকে কার্য্যকরী কিছু পাওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে খুবই নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। যদিও তিনি এস-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হয়েছিলেন ও তাঁর কাছ থেকে অনেক বড় কিছু আশা করেছিলেন, গত রাত্রে বাড়ী ফিরে যখন আমরা কাহিনীটি বললাম, তখন তিনি শুধু খাড়া হয়ে বললেন, 'আমি অন্য ধরণের বিবরণ' আশা করেছিলাম। যাই হোক যা হয়েছে তাও উত্তম।' মিসেস বসু, উপরতলায় উঠে দেখেন, তিনি শান্তভাবে ঘুমোচ্ছেন!"

অপারেশনের দুমাস পরে ডঃ বসু পুরোপুরি কাজ সুরু করলেন। রয়াল ইনস্টিটিউটে যুগান্তকারী বক্তৃতা দিলেন। নিবেদিতা অসুস্থ বসুকে সেবা করে, হৃত স্বাস্থ্য তাঁর ফিরিয়ে দেওয়া বা প্রেরণা দিয়ে আত্মিক বলধানের চেষ্টা করলেন না বস্তুগত সাহায্য করে চললেন। সে প্রয়াস ছিল নানামুখী। চাকুরী সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, বন্ধু সংগ্রহ, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে অংশ গ্রহণ, সংবাদপত্র বা সাময়িকে প্রচার, কর্ম্মতালিকার অংশীভূত হল। এর উপরে ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুলিকে উপযুক্ত ভাষায় রূপ দেওয়া।

১৮৯৮ সালে জামসেজী টাটা ভারত সরকারের কাছে বিরাট দানের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ঐ টাকায় পোষ্টগ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট তৈরী হবে ও সেটি পরিচালনায় ভারতীয়দের বড় অংশ থাকবে। এ প্রস্তাবে স্বামিজী ও নিবেদিতা আগ্রহী ছিলেন। ১৯০০ সালের নভেম্বরে মিসেস ওলিবুলকে দিয়ে বিভাগীয় বড় কর্ত্তা স্যার জর্জ্জ বার্ডউডকে নিমন্ত্রণ করলেন সেখানে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সরকারের মনোগত অভিপ্রায় জানতে চেষ্টা করলেন কিন্তু জর্জ্জ বার্ডউড ঘাড় পাততে রাজী হলেন না- সে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল। সবিস্তারে ডঃ বসুকে লিখে জানালেন। উদ্দেশ্য ছিল, বৈজ্ঞানিক সাধনার স্বাধীনতা তিনি হয়ত পেতে পারেন এই রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তিনি ভাল করেই জানতেন ইংলণ্ডে তাঁর চাকরী গ্রহণ সম্বন্ধে মানসিক দ্বিধার কারণ স্বদেশকে কত গভীর ভালবাসেন তিনি।

পুনরায় সেপ্টেম্বরে উত্তর দিলেন রবীন্দ্রনাথ : আজ মিস নোবলের চিঠিতে তোমার কথা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। তোমার কাজে ত্রিপুরা এসেছি।.... মহারাজা শ্রীঘ্রই দু'এক মেলের মধ্যে তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।....

২৪ শে শ্রাবণ ১৩০৯ সালে (জুলাই মাসে) পুনরায় জানালেন রবীন্দ্রনাথ, মহারাজা যে পাঁচহাজার টাকা তোমায় সাহায্য পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত! এছাড়া এদেশে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধানাকে সুপরিচিত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গ দর্শনে দুটি প্রবন্ধ লিখলেন "আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জয়বার্ত্তা— আষাঢ় ১৩০৮, "জড় কি সজীব" শ্রাবণ ১৩০৮, বন্ধু ও আত্মীয় মণ্ডলীকে এ কাজে প্রাণোদিত করলেন। সহকর্ম্মী জগদানন্দ রায়কে ভারতী পত্রিকার ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনায় নিয়োজিত করলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুহৃৎ রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকেও একাধিক প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ প্রদর্শন করলেন। নিবেদিতাও রমেন্দ্রসুন্দরকে বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় উৎসাহ দিলেন।

১লা মার্চ্চ ১৯০১, লিখলেন ম্যাকলাউডকে : মিঃ ষ্টেড প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডঃ বসুর 'চরিততিত্র' ছাপাবেন, যা জীবন্ত ভারতের ছবি ফোটাবে।

১৫ই মার্চ্চ লিখলেন ম্যাকলাউডকে :

ডঃ বসু যেন বাতাসে ভাসছেন। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, এক যন্ত্রের পর অন্য যন্ত্র, অপূর্ব্ব অভিপ্রায় এখন বাস্তবায়িত সত্য। শ্বাসরোধ করে সসম্ভ্রমে, তা চেয়ে দেখতে হয়। জগন্মাতা কিভাবে না তাঁর প্রেরণা, এত অজস্রভাবে ঢেলে দিচ্ছেন।"

২২ শে মার্চ্চ জানালেন : জীবনচরিত নিয়ে এগুচ্ছি। এ ব্যাপারে তুমি উৎসাহ দিয়েছো তোমার কল্যাণ হোক।

২২ শে মার্চ্চ লিখলেন : ডঃ বসুর কাজের তুল্য কিছু তুমি দেখনি— এ যেন আবিষ্কারের ধারাবর্ষন!

৪ঠা এপ্রিল জানালেন : ডাঃ বসু চান, তাঁর ছোট ভাগনা মিঃ এ. এম. বসুর ছোট ছেলেটিকে বছরখানেক কি তারও বেশীসময় আমি কাছে রাখি। তাঁর ধারণা সারদা দেবী হয়ত আপত্তি করবেন। আমার কিন্তু তা, সত্য বলে মনে হয় না। তবু জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছি। বাংলা পড়ার সময় বাদে সারাক্ষণ নিজের কাছে রাখতে চাই। তাকে এমন দেশপ্রেমিক ও এমন বৈজ্ঞানিক করে তুলতে চাই, যার তুলনা পৃথিবী দেখেনি।

সকাল ও সন্ধ্যায় সকলে মিলে আমরা ছুটির ব্যায়াম হিসাবে বাইসাকেল চড়ছি। খুবই উপভোগ্য। এমন কি সেন্ট সারা পর্য্যন্ত রিচকে (ভাই রিচমণ্ড) আচার্য্য করে চড়তে শিখেছেন।

আমরা সকলে রান্না ঘরেই খাওয়া দাওয়া সারছি, কারণ ডঃ বসু খাওয়ার ঘরকে ছুটির সময়ের ল্যাবটরীতে রূপান্তরিত করছেন। আহা, যদি দেখতে যন্ত্রপাতি সাজানো অবস্থায় কি দারুণ দেখতে হয়েছে।

৩রা মে লিখলেন ম্যাকলাউডকে, : রয়াল ইনষ্টিটিউশনে বক্তৃতার পূর্ব্বে আগামী শুক্রবার, রয়াল ইনষ্টিটিউশনে ডঃ বসুর বিরাট বক্তৃতার দিন। ঐ বিরাট ঘটনার জন্য আমরা আশা করি, মিসেস লেগেট এবং অ্যালবার্ট এখানে উপস্থিত থাকবেন। কত কি এর উপরে নির্ভর করছে। আশা ও বিশ্বাস করি যে সভাকক্ষ তারকাখচিত হবে।

১০ই মে তারিখের বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ম্যাকলাউড, মিসেস বুল, স্বয়ং নিবেদিতা ও অনেকে। সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখেলেন সবিস্তারে। সে চিঠির কিছু কিছু অনুবাদ করে 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের 'বিজয় বার্ত্তা' নামে প্রবন্ধ লিখলেন বৈজ্ঞানিক মূল আবিষ্কারের বিষয়ে। এবং এই প্রবন্ধের শেষের দিকে দেখালেন : বৈজ্ঞানিক সমাজের একাংশ কেন জগদীশচন্দ্রের বিরোধিতায় অগ্রসর আর সেই সঙ্গে ব্যক্ত করলেন, সহানুভূতি ও সহায়তাহীন কি শোচনীয় পরিবেশে কাজ করতে হচ্ছে জগদীশচন্দ্রকে। সে বীরকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন : "তিনি জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্ব্বোচ্চ্য রেখে, জ্ঞানে, সাধনায়, কর্ম্মে, এই হত চরিত্র দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ সে প্রবন্ধে লিখলেন : আমাদের আচার্য্যের জয়বার্ত্তা এখনও ভারতবর্ষে পৌঁছেনি। ইয়ুরোপেও সে জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হতে কিছু বিলম্ব আছে।....

আমাদের দেশে, দর্শন যে পথে গিয়েছে- ইয়ুরোপে বিজ্ঞান সে পথে চলেছে। এটা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত সেই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পেয়েছে তার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় "হক্সলি" প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করতে পারেন নি। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়ে পদার্থতত্ত্ব থেকে বহুদুরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের ঐক্য সেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করেছেন। কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ বলছেন : আপনি তো ধাতব পদার্থের কণা নিয়ে এতদিন পরীক্ষা করে এসেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতু পদার্থকে চিমটি কেটে তার মধ্য থেকে এমন লক্ষণ বার করতে পারেন, জীব শরীরে চিমটির সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে, তবেই বিশ্বাস সম্ভব হতে পারে!

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জগদীশচন্দ্র নূতন এক কল বার করেছেন। জড়বস্তুকে চিমটি কাটলে যে স্পন্দন হয়,— এই কলের সাহায্যে তার পরিমাণ স্বতঃ লিখিত হয়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিমটির ফলে, যে স্পন্দন রেখা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এই লেখার পার্থক্য ধরা পড়ে না। জীবনের স্পন্দন যেমন নাড়ী দ্বারা বোধ করা যায়, জড়েরও জীবনী শক্তির নাড়ী স্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ করলে তার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হয়ে আসে —এই কলে তা চিত্রিত হয়েছে।

এরপর তিনি নিবেদিতার পত্রের বিবরণ অনুবাদ করে দিলেন : সন্ধ্যা ন'টা- সভার দ্বার উন্মুক্ত হল। বসুজায়াকে নিয়ে সভাপতি সভায় প্রবেশ করলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপক পত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি অবগুণ্ঠিতা ভারতীয় শাড়ী ও অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁর পিছনে যশস্বী ব্যক্তিসমূহ ও সব শেষে জগদীশচন্দ্র। শান্ত চোখে সভাপতির দিকে তাকিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দে সমাহিত ভাবে বক্তব্য সুরু করলেন। তাঁর পিছনে রেখাঅঙ্কন চিত্রিত বড় বড় পট টাঙানো, তাতে বিষ প্রয়োগ, শান্তির অবস্থা, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতির আক্ষেপ, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশী তার সঙ্গে তার তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা আঁকা রয়েছে। সামনের টেবিলে সাজানো যন্ত্রগুলি।

আচার্য্য বসু, বাঙ্মী নন। বাক্য রচনা তাঁর পক্ষে সহজ সাধ্য নয়, বলবার ধরণ ও আবেগও সাধ্বাসপূর্ণ। কিন্তু সে সময়ে তাঁর বাক শক্তির স্ফুরণ দেখা গেল। পদবিন্যাস, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাষায় ও ভাবপূর্ণ আবেগে বৈজ্ঞানিক ব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপে, রসায়নে, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় ভেদ' অত্যন্ত সহজ উপহাস্যেই মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ নিরূপক সংজ্ঞা ছিল তা মাকড়সার জালের মত ঝেড়ে ফেললেন। যার মৃত্যু সম্ভব, তাকে জীবিত বলে, এক খণ্ড টিনের মৃত্যু শয্যা পাশে দাঁড় করিয়ে তিনি যেন তার মরণাক্ষেপ দেখাতে প্রস্তুত, পুনরায় তাঁকে সুস্থ করে তুললেন।

সবশেষে তিনি তার নিজের নির্ম্মাণ করা কৃত্রিম চোখ সভার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। দেখালেন : তার শক্তি, আমাদের চোখের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

যে মহৎ ঐক্য, যুগে যুগে অকুণ্ঠ চিত্তে ভারত ঘোষণা করে এসেছে, সেই ঐক্যবাদ আধুনিক কালের ভাষায় যখন উচ্চারিত হল, আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হল তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মনে হল বক্তা যেন, নিজের নিজস্ব আবরণ ত্যাগ করে, অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছেন, কেবল আমাদের সামনে উপস্থিত তাঁর দেশ ও তাঁর জাতি। বক্তার উপসংহার:

"I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similiar are the two sets of writings, so similiar indeed that you can not tell them one from the other. They show you the waxing and waning pulsations of life– the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death rigar from the toxic effect of poison.

It was when I come on this mute witness of life and saw an all pervading unity that binds together all things– the mote that thrills on ripples of light, the teeming light on earth and rediant suns that shine on

it— it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago.

They who behold the one, in all the changing manifoldness of the universe unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else...

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। সভার মধ্যে দু'একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁদের ভক্তি ও বিস্ময় নিবেদন করলেন।

অনুভব করলাম : এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবে নয়, সমকক্ষভাবেও নয়, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করলো। পরিস্ফুট হয়ে উঠলো পদার্থতত্ত্ব সন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে প্রভেদতত্ত্বের সীমারেখা।

রবীন্দ্রনাথ এ বিবরণে ভাবাবিষ্ট হয়ে সেই সত্য গৌরবের সত্য অনুসন্ধান করলেন।

যা পাঠ করেছি তাতে অহঙ্কার জাগেনি। উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করার অবকাশ পেয়েছি। ভারতের পুরাতন ঋষিগণ বলেছেন : "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এতি" এই যাহা কিছু, সমস্ত জগৎ, প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। অন্তরে উপলব্ধি করছি : হে জগদগুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয়নি, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনও অনির্ব্বাণ রয়েছে, এখনও তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে, প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করছো। তোমরা আমাদের ধ্বংস হতে দেবে না, আমাদের কৃতার্থতার পথে নিয়ে যাবে। তোমাদের মহত্ত্ব, আমরা যেন যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। সে মহত্ত্ব, তুচ্ছ আচার বিচারের সীমায় বদ্ধ নয়, বর্ত্তমানের হিঁদুয়ানি, সে তো সমস্তই পতিত ভারতের আবর্জ্জনা মাত্র। যে অনন্তবিস্তৃত লোকে, তোমরা যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলে, সেই অনন্ত বিস্তারিত লোকে, যদি আমরা আমাদের চিত্তকে জাগ্রত করে তুলতে পারি, আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবাহিত না হয়ে বিশ্বরহস্যের অন্তর নিকেতনে প্রবেশে সহায়তা করবে!.....

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সে দৃষ্টান্ত আমাদের দেখালেন। বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পেয়েছেন - সে পথ প্রাচীন ঋষিদের পথ— তা একের পথ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে কি ধর্ম্মে কর্ম্মে, সেই পথ ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'....

পাশ্চাত্যে তাঁর প্রথম সাফল্যের পর ১৮৯৭ সালে ভারতে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর বাসায় গিয়ে ফিরে এসেছিলেন। সাক্ষাৎ না পেয়ে রেখে এসেছিলেন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শন একটি ম্যাগনোলিয়া ফুল। সে বর্ণ, গন্ধ, জীবনে তাঁদের ম্লান হয়নি। কবি প্রতিভায় মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র, চেয়েছিলেন সে প্রতিভা গোচর হোক বিশ্বজনের কাছে। আর রবীন্দ্রনাথ চাইলেন বিশ্বসমক্ষে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা-বিকাশ-জ্যোতির যবনিকাপাত না ঘটে।

যেমন গভীর যোগাযোগ ছিল জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ছিল নিবেদিতার গভীর মেলামেশা, তেমন ছিল ঐকান্তিক যোগাযোগ। বিজ্ঞান সাধনার পথে যে সব বাধা বিঘ্ন এসেছিল, সবই তিনি জানিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। ঠিক যে পথ অবলম্বনে তিনি মিসেস ওলিবুলকে বসিয়ে ছিলেন মাতৃত্বের আসনে, আর নিজে, জগদীশচন্দ্রকে সন্তানরূপে করেছিলেন গ্রহণ। আবার ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে বিশ্ব-আসরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায়, তেমনই ব্রতী স্বয়ং আর মিসেস বুল ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যে প্রতিভা বিকাশের সহযোগী ও সমর্থক।

১৯০০ সালের নভেম্বর থেকে নিবেদিতা পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন ও অবহিত করছেন বৈজ্ঞানিকের সাধন পথে, বাধা, বিঘ্ন ও অসহায় অবস্থার কথা। এমন কি ইংলণ্ডে অধ্যাপক পদ প্রত্যাখ্যান ও আবিষ্কারের পেটেন্টে করার বিরোধিতার কথাও।

রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন সে পথে মুক্তির অন্বেষণে এবং কোন পথে তাঁকে সাহায্য করা যায়। ত্রিপুরা মহারাজের সাহায্য প্রার্থী হলেন। তিনি তাঁকে দেখালেন নিবেদিতা ও জগদীশ চন্দ্রের চিঠিপত্তর। মহারাজা হাত মেলালেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

১০ই জুন জানালেন : ডাঃ বসুর 'চরিত্র-চিত্র' ঠিকই লিখেছি, এখন তা মিঃ ষ্টেডের হাতে। মনোনীত হতে পারে।

১৯শে জুলাই লিখলেন : 'চরিত-চিত্র' লিখেছিলাম কাজটা বিরাট দায়িত্ব হয়েছিল। মিঃ ষ্টেড তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ ওতে ভারতবর্ষই বেশী, ডঃ বসু কম। যাই হোক আমি আবার লিখছি এই প্রত্যাশায়, শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হবে।

১৯শে জুলাই ১৯০১ ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ডাঃ বসুর কাজকে যেরকম ব্যাপক আক্রমণ করা হচ্ছে, তাতে আমরা অবশ্যই ভাবতে পারছি এই লাইনে এতাবৎ করা, এইটেই সেরা কাজ। শরীরতাত্ত্বিকরা এমনই বিচলিত যে চড়াই পাখীর মত কিচির মিচির করছে। কখনও তাঁর গবেষণার ফলে বিহ্বল, আবার কখনও বুক ঠুকছে, যেহেতু অক্সফোর্ডের বার্চ্চ বলেছেন : ঐ একই পরীক্ষা তিনি পুনর্ব্বার করে দেখেছেন যে, ঐ ফল হয়েছে অনিশ্চিত সংযোগের জন্যই। বার্চ্চের মন্তব্য তাঁকে জানাতে সাহস করিনি, কিন্তু অপর পক্ষে তাঁদের সকলের চিঠি থেকে সমূহ স্বস্তি পেয়েছি। ইতিমধ্যে অবশ্য তাঁরা, তাঁদের সকল প্রভাব প্রয়োগ করে আমাদের হতভাগ্য হিন্দুটিকে সরাসরি কলকাতায় ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। কুছ পরোয়া নেই, প্রভাবে ভারতের সর্ব্বনাশ করা যাবে না। ওঁকে কোন কিছু না বলে আমি মিঃ টেগোরের কাছে লিখেছি কোন হিন্দুরাজ্য কি এঁর কাজের ভার নিতে পারে না?

২০শে জুলাই লিখলেন মিসেস ওলিবুলকে : বসুর 'চরিত্র-চিত্র' এর পুনর্নির্লখন সম্পন্ন হয়েছে। মিঃ স্টেডের চিঠি পুনরায় যখন পড়লাম, কিরকম বোকা স্বার্থপর মনে হল নিজেকে। তিনি চেয়েছেন 'ভারত' অংশ বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অংশ প্রকাশ করতে। তাতে আমি একটুও কিছু মনে করবো না— এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় সাক্ষাৎ কর। বলো : তিনি খোকাকে (বসুকে) কোনভাবে ভেঙে চুরে দেখাতে পারবেন না, কিংবা আমাদের দুজনের কোন একজনকে না দেখিয়ে কাজ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলো।

'জীবন-চিত্র' হয়ে যাবার পর 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' বইটির কোন অধ্যায় আসবে বুঝতে পারছি না, সম্ভবতঃ কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের অধ্যায়। এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমি সকল সময় মোহ বোধ করি। কিন্তু ডঃ বসুকে এ বিষয়ে কিছু না বলাই ভাল, উনি অত্যন্ত চটে যাবেন।

২০শে জুলাই জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : সেদিন রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেশে ফিরে যাবার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলেন। একবার বাধা পেলে, দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পারছি। কি করবো— কিছুই স্থির করতে পারছি না। তোমার পত্র পেলে স্থির করবো।

২৩শে জুলাই জানালেন : 'চরিত্র-চিত্র' নূতন ভাবে লিখতে সবিশেষ চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখলাম এখানে পাণ্ডুলিপিটি নেই, কেবল কতকগুলি খসড়া কাগজপত্র রয়েছে। আসল লেখাটা নিশ্চয় 'উইম্বলডনে' গ্লাস কাবার্ডে রয়ে গেছে। সত্যই কাজটি আর করতে পারলাম না। মনে হয় সবচেয়ে সহজ কাজ হবে বর্ত্তমান আকারটিকে, ভাগ করে তার মধ্যে সাক্ষাৎ চরিত্র সম্বন্ধে ফুটিয়ে তোলা।

২৩শে জুলাই নিবেদিতা ওলিবুলকে লিখলেন : মিঃ দত্ত (রমেশবাবু) আমাকে বলেছেন, কাজ চালিয়ে যেতে এবং সে কাজ শেষ করতে হলে, ডঃ বসুর প্রয়োজন (১) সহকারীর মাহিনা

ও অন্যান্য খরচ বছরে দুশো পাউণ্ড; (২) যন্ত্রপাতি, তাও বছরে আরও দুশো পাউণ্ড; (৩) ব্যক্তিগত খরচ ও ভ্রমণ ইত্যাদি ছ'শো পাউণ্ড। মোট খরচ দাঁড়ায় হাজার পাউণ্ড বছরে। এই টাকা যদি অ্যানুয়িটি হিসাবে ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়— প্রয়োজন ১৩শো পাউণ্ড ব দু'লক্ষ টাকা সারা জীবনের জন্য। পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়, অবশ্য আমার ভুল হতে পারে।.....

সে যাই হোক গোপনে ভারত থেকে টাকা যাঞ্ছা করতে হবে, আর এ কাজে সাহায্য করতে হবে। তুমি জানো স্বামিজীর বিষয়ে টাকা কড়ির ক্ষেত্রে, ভাগ্য আমার ভাল, এক্ষেত্রে হয়ত কিছু পেতে পারি। তোমার কি মনে হয়? আমি বলেছি, এভিক্ষার কাজ আমার কাছে, সর্ব্বোচ্চ কল্যাণের কাজ হবে। মিঃ দত্তের সঙ্গে এখন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ও ভারতের কল্যাণে ব্রতী তিনি। আমাকে এমন সব লোকের দারস্থ হতে হবে, যাদের কাছে তিনি নিজে বলতে অসমর্থ। ইতিমধ্যে, তিনি মিসেস বসুর সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে মিঃ টেগোরের কাছে লিখেছেন, কিন্তু তাঁর ধারণা মিঃ টেগোর অসহায় বোধ করবেন।

এ কাজের আদর্শের দিকটিও উপলব্ধি করেছেন মি. দত্ত। একাজে জাতি কতখানি লাভবান হবে, নবীন বিজ্ঞানকে পুরাতন বিজ্ঞানের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি.... বললেন কোন নেটিভ গভর্মেন্ট (দেশীয় রাজ্য) এঁর কি ভার নিতে সাহস করবে না? হায় টাটা.... হায় টাটা!!....

সুতরাং প্রিয়তমাসু, যে ব্রত তোমাকে প্যারিস থেকে টেনে এনেছে, এঁদের সঙ্কটের অবস্থা আমরা পার করিয়ে দেব, তাকে আর টেনে রাখার প্রয়োজন নেই।

এছাড়া আরও একটা চিঠি লিখলেন একই তারিখে ডঃ বসুর আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়া সম্বন্ধে

Re : The patent-Molybdenum being absolutely neutral to electric conductivity, the curve beeing straight line without deflection, this is a material of which standard high resistances can be made-

The Bairn has given you this information and more by now– but just in case I am so pleased that you feel it was the nick of time. And I am so so so pleased Dearie that you are there! এদিকে সংযোগ রেখে চললেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্রের কার্য্যবিবরণী নিয়মিত পাঠাতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে।

আগষ্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ জানালেন জগদীশচন্দ্রকে : আজ রমেশবাবুর চিঠি পেয়ে উৎসাহিত হয়েছি। তোমার প্রতি সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁর সহৃদয় অনুরাগ আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।

নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি জানালেন জগদীশচন্দ্রকে : আজ মিস নোবলের চিঠিতে, তোমার কথা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরা-এসেছি।..... তিনি শীঘ্রই দু'এক মেলের মধ্যে : দশহাজার টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৩১শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ জানালেন :

১৩০৯ (১৯০১) জানালেন : জগদীশচন্দ্রকে মহারাজা পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন — সেজন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত।

রয়াল সোসাইটি, জগদীশচন্দ্রের পেপার ছেপেও যখন প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন, জগদীশচন্দ্র তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা সে গ্রন্থ রচনায় তাঁর সহযোগী হলেন আর মিসেস ওলিবুল অর্থ সাহায্য দিয়ে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হল না নিবেদিতার। মিসেস ওলিবুল ও জগদীশচন্দ্র তাঁকে ছাড়তে রাজী হলেন না। ঠিক

সেই সময়েই মিঃ ষ্টেড্‌ প্রতিশ্রুতি দিলেন নিবেদিতা যদি ডঃ বসুর চরিত-চিত্র লিখে দেন, তাঁর রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় ছাপাতে রাজী আছেন। এই পত্রিকায় প্রতি মাসে বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সচিত্র জীবনচিত্র প্রকাশ করা হতো। প্রয়োজন ছিল এ রকমের একটি কাজেরও। নিবেদিতা মন দিলেন সে চিত্ররচনায়।

পুনরায় অক্টোবর ও নভেম্বরে জানালেন : তোমার কাজেই ত্রিপুরায় এসেছি।.... মহারাজ শীঘ্রই দু কি এক মেলে তোমাকে দশহাজার টাকা আমার নামেই পাঠাবেন। এ বছরের মধ্যেই আরও দশ হাজার পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। .... আরও জানালেন : আচ্ছা, তুমি যদি এদেশ থেকে কাজ করতে চাও, তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারিনে? কাজ করে তুমি যে সামান্য টাকা পাও— সেটা যদি আমরা পুষিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমাদের ধিক! কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে, পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কি কাজ করতে পারবে?....

সরস্বতী পূজার সংবাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ জানালেন স্বামিজীকে। উত্তরে স্বামিজী লিখলেন : নিবেদিতার সরস্বতী পূজার ধুমধাম শুনে বড় খুশী হয়েছি। নিবেদিতা শীঘ্রই স্কুল খুলুক।

নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের বাড়ীর পুরানো পরিচারিকা 'বেট' এসেছিল, বিদ্যালয় ও অন্যান্য কাজের সুবিধা হয়ে গেল।

বাড়ীটির সারানোর পর অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা হল নিবেদিতার বাসার ঠিকানা। রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আনাগোনা সুরু হয়ে গেল। রমেশ দত্তমশায় তাঁর কাছে যাতায়াত করছিলেন, সেইসঙ্গে তাঁকে বাংলা পড়াতে আরম্ভ করলেন।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল মিঃ গোখলে, আব্দুর রহমান, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির সঙ্গে। এই সময়ে তিনি মিঃ পেষ্টনজি পাদশার বাড়ীতে গেলেন। তাঁর বৃদ্ধা মার সঙ্গে যখন কথা বলছেন গান্ধীজীর সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়ে গেল। গান্ধীজী দোভাষীর কাজ করলেন। তখন তিনি (গান্ধীজী) হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর গভীর ভালবাসার পরিচয় পেলেন। তাঁর এই নবরূপ দর্শনে শুধু মুগ্ধ হলেন না, হৃদয় তাঁর সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

১১ই মার্চ্চ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি আগতপ্রায়। স্বামিজী ইতিমধ্যে বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন। ঠিক ছিল ওখান থেকে কাশী গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করবেন।

বোধিদ্রুম মূলে উপস্থিত হতেই স্মরণে প্রতিভাত হল সত্যলাভের কামনায় একদিন তিনি উন্মাদের মত ছুটে এসেছিলেন মুক্তি কামনায়। ধ্যানে তন্ময় হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন মিছেই ছোটা ছুটি সার, অমৃতের কুম্ভ রয়েছে সেখানেই— যেখান থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছেন এখানে। সেদিনের সে ধ্যান ছিল নিজমুক্তির কামনায়— আর আজ? পুনরায় বসলেন গভীর ধ্যানে। মুক্তি বাসনার কামনা তাতে নেই। ধ্যানাসীন তিনি, একটা উৎপীড়িত, উপেক্ষিত, দরিদ্র, পতিত জাতির প্রতিনিধি রূপে কোটী কোটী মানুষের মুক্তির সন্ধান কামনায়!

মঠের মোহান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে অতিথিরূপে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করেদিলেন। কয়েকটা দিন ধ্যানানন্দে কাটিয়ে বারানসী যাত্রা করলেন।

এখানে কয়েকটি বাঙালী যুবককে ভাড়া নেওয়া একটি ছোট বাড়ীতে, রাজপথ ও গঙ্গার ঘাট থেকে স্থবির রুগ্ন নরনারীকে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা ও সেবা শুশ্রুষার ভার নেওয়ার ব্যবস্থা দেখে, খুশী হলেন। বিশেষ করে, তাদের একাজে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দর্শন করে। বেলুড়ে বাস তাঁর

আদর্শ কাজে পরিণত হচ্ছে না দেখে, মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন, এখানে কয়েকটি যুবককে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখে তাঁর মনোবেদনা দূরীভূত হল। উৎসাহ দিয়ে বললেন : তোমরা সত্যের পথ বেছে নিয়েছো। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ, সর্ব্বদা তোমাদের কল্যাণ করুক! সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাও, নিজেদের অসহায় ভেবে হতাশ হয়ো না, অর্থ আসবে। ক্ষুদ্র এই অনুষ্ঠান আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ভবিষ্যতে তা, তোমাদের বর্ত্তমানের পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথম রিপোর্ট সহ জনসাধারণের সাহায্যের আবেদন পত্র লিখে দিলেন। তাঁর উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ-লাভে যুবকদের কর্ম্মোৎসাহ শতগুণ বেড়ে গেল।

এখানে জলবায়ুর গুণে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। কাছাকাছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব, মঠে ফিরে এলেন স্বামিজী। দেখা হল নিবেদিতার সঙ্গে। বললেন : চলে যাচ্ছি!

জাপান যাওয়ার কথা চলছিল। ভাবলেন নিবেদিতা : সেইকথাই বলছেন বোধ হয়!

মঠে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ বাড়ার মুখে। জন্মতিথির দিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী পাহারা দিতে লাগলেন। সকলেই স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে ও কথা বলতে উৎসুক। নিবেদিতা মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর কষ্ট হতে পারে ভেবে অল্প কালের মধ্যে বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

বেলা দেড়টায় শরৎবাবু এলেন। বললেন : উৎসবে : পঞ্চাশ হাজারের মত লোক হয়েছে। কথাটা শুনে অতিকষ্টে জানালার শিক ধরে উঠে দাঁড়িয়ে জনসঙ্ঘের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন : বড়জোড় ত্রিশ হাজার! দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়েছেন। শয্যার আশ্রয় নিলেন। তবুও উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বললেন : যেভাবে উৎসবে মানুষ যোগ দিচ্ছে, এই অনুষ্ঠান চার পাঁচ দিন ধরে চললে বেশ হয়। প্রথম দিন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় দিন বেদ বেদান্তের বিচার ও মীমাংসা, তৃতীয় দিন প্রশ্নোত্তর সভা, চতুর্থ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও তৎপ্রদর্শিত আদর্শ ও পন্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা, সর্ব্বশেষে দিনে প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা। উৎসবে ঠাকুরের জীবন, গঠনোপযোগী ভাব সকল, সাধারণ লোকের হৃদয়ে, যাতে প্রবিষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করা। মহোৎসবের অনুষ্ঠান, যদি তাঁর ভাব প্রচারের কেন্দ্ররূপে পরিগনিত না হয়, তা হলে কিছু লোক মিলে হৈ চৈ করাকে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচার বলে মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। সাময়িক উদ্দীপনা, ধর্ম্মের নামে উত্তেজনা, কীর্ত্তন নৃত্যাদির দ্বারা জনচিত্ত আকর্ষণ করা মাত্র, কাজেব. কাজ বিশেষ কিছুই হয়না।

ক্রমাগত ওষুধ খাওয়া ও নিয়ম কানুনের মধ্যে থাকায় বিরক্ত হয়ে পড়লেন স্বামিজী। শুনলেন: গভীর দার্শনিক তত্ত্বাদির আলোচনা পাছে সুরু হয়, এই ভয়ে গুরুভ্রাতাগণ অনেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে, তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছেন না। তাঁদের ডাকলেন। বললেন : এ দেহ রেখে আর কি হবে? পরকল্যাণ-সাধনে নিপাত হোক! ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পরহিতায়, উপদেশ প্রদান করে গেছেন। আমারও কি তাই করা উচিত নয়? তৃণসম অকিঞ্চিতকর এদেহ থাক্ বা না থাক, আমি গ্রাহ্য করিনা। সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে, আমার কত আনন্দ হয়, তা তোমরা কল্পনায় আনতে পারবে না। আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের আত্মশক্তি জাগ্রত করতে, সাহায্য করার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত আমি নই!

মার্চ্চ মাসের প্রথম থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দৈহিক অসুস্থার দিকে লক্ষ্য না রেখে অসাধারণ পরিশ্রম করতে উদ্যত হলেন। কয়েকখানি বই লিখবেন স্থির করলেন।

মঠের নিত্য নৈমিত্তিক ঠাকুরপূজা যথাসম্ভব সাদাসিদা ভাবে অনুষ্ঠান করে, তিনি ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণকে সাধনা, শাস্ত্রালাপ, বেদাদি-পাঠ ইত্যাদিতে নিযুক্ত রাখলেন। মঠের শৃঙ্খলা রক্ষার

জন্য প্রতিটি কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন। কেউ স্বেচ্ছায় নিয়ম ভাঙলে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

রাত্রি তিনটায় শয্যা ত্যাগ করে নির্দ্দিষ্ট, স্বতন্ত্র একটি ঘরে বসতে আরম্ভ করলেন। তাকে ঘিরে বসলো অন্যান্য সন্ন্যাসী ও বাল ব্রহ্মচারীগণ। তিনি গাত্রোত্থান না করা পর্য্যন্ত, ওঠার কারও অধিকার রইলো না।

'শিব' 'শিব' বলতে বলতে আসন থেকে উঠে প্রণাম করে শ্যামা বা শিব সঙ্গীত গাইতে গাইতে নীচের নেমে উঠানে পায়চারি আরম্ভ করলেন।

এরপর ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণ কক্ষ ত্যাগ করার অবকাশ পেতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম—তারপর শুরু শাস্ত্রপাঠ সেখানে উপস্থিত হয়ে শিষ্যগণের বিচার শুনে, যেখানে জটিল তত্ত্ব, নিজেই মীমাংসা করে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সকালে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, প্রভৃতি বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যায়ন, তারপর দুপুরের আহার। এরপরও, পুণরায় শুরু করতেন পাঠ পানিনি ও লঘু কৌমুদীর। বৈকাল হলে, বিশ্রামের অবকাশ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। চললেন ভ্রমণে, তাঁদের কেউ কেউ চললেন তাঁর সঙ্গে, কেউ কেউ নিযুক্ত রইলো মঠের গৃহস্থালির কাজে।

আরতির ঘণ্টা শেষ হলেই, প্রত্যেককে ধ্যান ঘরে উপস্থিত থাকতে হত। কঠোর নির্দ্দেশ, ভঙ্গ হলেই ভর্ৎসনা। মঠের-নিয়মের ব্যতিক্রম চলবে না একমাত্র, অসুস্থতা ছাড়া। নিয়মের লঙ্ঘন, বন্ধ তাঁর আহার, ব্যক্তিবিশেষের সামান্যতম ত্রুটি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। ভবিষ্যৎ আদর্শ রক্ষা করতে হলে, উদারতা বা ক্ষমার অবকাশ নেই। তিন গঠন করতে চান 'মানুষ'। সেই 'মানুষ' গঠনকল্পে নিয়োজিত করেছেন তাঁর সমস্ত শক্তি। নতুন উৎসাহ ফিরে এসেছে, যেমনটি ছিল তার নবীন যৌবনে।

২৩শে মার্চ্চ ক্লাসিক থিয়েটারে বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। বিষয় 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দুমন'।

মঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। পুরস্কার বিতরণ করালেন নিবেদিতাকে দিয়ে। শরীরটা অসুস্থ। নীচে নামতে পারলেন না, ঘরে জানালায় বসে দেখতে লাগলেন সেদৃশ্য। পাশে দাঁড়িয়ে মিস ম্যাকলাউড, হঠাৎ তাঁকে ডেকে বললেন : আমি চল্লিশে পৌঁছাবো না।

সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ম্যাকলাউড : এ কথা বলছেন কেন?

হাসলেন স্বামিজী। বললেন : কথাটা তোমাকে বলে ফেললাম।

এপ্রিলের প্রথম দিকে কৃস্টীন গ্রীষ্টাইলেড কলকাতায় এলেন। নিবেদিতার সঙ্গেই বোসপাড়া লেনে বাস সুরু করলেন। এসেছেন স্বামিজীর কাজে আত্মনিয়োগ করতে।

জন্ম তাঁর জার্ম্মানীর নুনবার্গ সহরে এক জার্ম্মানি পরিবারে ১৮৬৬ সালের আগষ্ট মাসে। বয়স যখন তিন, বাবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এসে ডেট্রয়েটে বসবাস আরম্ভ করলেন। যখন বয়স তাঁর সতেরো, বাবা মারা গেলেন। মা আর বোনেদের ভরণপোষণের ভার পড়লো তাঁর উপরে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী দর্শন করলেন স্বামিজীকে। বেদান্ত দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

যাঁরা সহস্রদ্বীপোদ্যানে গভীর ভাবভূমিতে স্বামিজীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন কৃস্টীন।

অন্ধকার রাতে ঝড় জলের মধ্যে এক মহিলা বন্ধুর সঙ্গে স্বামিজীকে দর্শন করার বাসনায় সেই স্থানে উপনীত হলেন। তাঁকে দেখা মাত্র বলে উঠলেন কৃস্টীন : ভগবান ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকলে তাঁর কাছে যে উপদেশ ভিক্ষা করতাম, তেমনি আমরা আপনার কাছে এসেছি।

সস্নেহে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বামিজী বললেন, শুধু আমার ভগবান খ্রীষ্টের মত এই মুহূর্ত্তে তোমাদের মুক্ত করে দেবার ক্ষমতা যদি থাকতো!

কৃস্টীনের ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয়ে সেদিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন : তোমাকে আমার কলকাতার কাজের জন্য চাই।

দ্বিতীয়বার যখন স্বামিজী ডেট্রয়েটে সাতদিন অবস্থান করেন, কৃস্টীন স্বামী তুরীয়ানন্দের সংস্পর্শে আসেন। পরে ইংলণ্ডে নিবেদিতার সঙ্গে ঘটে তাঁর পরিচয়। অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন নিবেদিতা ডেট্রয়েট যান যথাসম্ভব তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। শাখা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদিকার কাজ করেছেন। একান্তভাবে চেয়েছিলেন সংসারের দায়িত্ব অবসানে, ভারতে গিয়ে তিনিও স্বামিজীর অভিপ্রেত কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সহকর্ম্মীর প্রয়োজন ছিল নিবেদিতার। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই কলকাতায় আগমন কৃস্টীনের।

ধীর, স্থীর, শান্ত, সদাহাস্যময়ী, মধুরভাষিনী। স্বামিজী তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে লিখেছিলেন: আমি জানি, তুমি মহৎ এবং তোমার মহত্ত্বে আমার সর্ব্বদা আস্থা আছে। আর সকলের বিষয়ে ভাবনা থাকলেও, তোমার সম্পর্কে আমার অনুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। .... জগজ্জননীর কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই তোমাকে সতত রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। আমি নিশ্চিত জানি— কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করবে না। কোন বাধা বিঘ্ন মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে অবসন্ন করতে পারবে না।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সংসারের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে কৃস্টীন কলকাতায় উপস্থিত হলেন। স্বামিজী, আনন্দ প্রকাশ করলেন।

স্বভাবে নিবেদিতার বিপরীত। ধীর, স্থির, অবিচলিত ভাব ও স্বামিজীর উপর নির্ভরতা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। যুমকেও পত্র যখনই লিখেছেন তাতে কৃস্টীনের প্রশংসাপূর্ণ থাকতো। একবার লিখেছিলেন : শান্ত, নির্ভরশীল ঔদ্ধত্য নেই তার স্বভাবে। অনুগত ও সহৃদয়।.. স্বামিজীর যথার্থ লোক নির্ব্বাচনের কতদূর ক্ষমতা কৃস্টীনকে দেখলেই অনুমান করা যায়।

চরিত্রগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, অটুট প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হল উভয়ের মধ্যে।

মিঃ ওকাকুরা যখন ভারত ভ্রমণে সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নিবেদিতা কলকাতা ফিরেই বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে যোগাযোগ সুরু করে দিলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ম্যাকলাউডকে লিখলেন : জীবন, জীবন— আমি জীবন চাই। আর জীবনের একমাত্র প্রতিধ্বনি স্বাধীনতা। না থাকলে মৃত্যুই শ্রেয়।

৩রা মার্চ্চ লিখলেন : আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে— পুলিশ আমার চিঠিপত্র খোলার অনুমতি পেয়েছে। তাদের নজরে পড়ুক এখন কিছু তোমাকে লিখতে উৎসাহী নই। সে সম্ভাবনায় কলম টেনে ধরি। পরিস্থিতি হঠাৎ উত্তপ্ত। ভয় হয়, আমাদের দল (কংগ্রেসের লেফটিস্ট পার্টি) হয় তো ভেঙে যাবে।"

জাপানী পুরোহিত রেভাঃ ওডা স্বামিজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য কলকাতায় এলেন ২রা এপ্রিল ১৯০২। মিঃ ওকাকুরা মার্চ্চমাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে ভ্রমণ সেরে ফিরে এলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য : পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুধাবন। স্বামিজীর সূত্রে কলকাতায় তিনি দু'এক জায়গায় পরিচিত হলেও নিবেদিতাই তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সর্বত্র : প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, আশুতোষ চৌধুরী, রজত রায়, সুরেন হালদার, হরিদাস হালদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশচন্দ্র বসু

প্রভৃতির সঙ্গে। মিঃ ওকাকুরার সেই সব বক্তৃতাবলি যা মিস ম্যাকলাউড নোট করে তাঁর (নিবেদিতার) কাছে পাঠিয়েছিলেন তার রূপ দিলেন "আইডিয়ালস অব দি ইস্ট" নবরূপে ও নব আদর্শ সংযোজিত করে।

শৃঙ্খল মুক্তির বাসনায় প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা। কিন্তু সংগঠনের দুর্ব্বলতায় তা ভেস্তে যায়। বণিক রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে যে-শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়। সেই সুবাদে শিক্ষিত ও চিন্তাবিদদের মনে পাশ্চাত্য জগতের প্রতি আকর্ষণ জাগে ও সে দেশের সাহিত্য পাঠে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা-পোষণ করতে শুরু করেন। ফলে ধর্ম্মত্যাগের হিড়িক ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ প্রবৃত্তির জন্ম হয়। গঠিত হল এসোসিয়েশন, পরে তা পরিণত হল কংগ্রেসে। এই গোষ্ঠীর কাজ ছিল সরকারের কাছে অভাব অভিযোগের দাবী পেশ করা আবেদন নিবেদনে। স্বাধীন জাতি বা স্বাধীনতা লাভের কোন প্রচেষ্টা ছিল না—ছিল না পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী সুখ সুবিধার দাবী পেশ করা। ফরাসী বিপ্লব বা ঐ জাতীয় কাহিনী পাঠে চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হয়েছিল কিন্তু নিবেদিতাই এদেশে পা দিয়ে (১৯০২ সালে) স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য একটি দল গঠনে ব্রতী হলেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে রামমোহন রায় ও ডিরোজিওর শিষ্যগণ বিপ্লব সাহিত্যপাঠে বিচলিত হয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এমন কি, দিল্লীর নামমাত্র বাদশাকে শীর্ষস্থানীয় ইংরাজ বিপক্ষরূপে নিখিল ভারতীয় ও বৈপ্লবিক পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছিলেন তাঁর ছ'খানা ফার্সি পত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মারফৎ)।

বন্ধন ছিন্নের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন রামমোহন। বিদ্যাসাগর আরও একটু এগিয়েছিলেন এরপর একই পথের যাত্রী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, স্বাধীনজাতি সৃষ্টির পরিকল্পনায় লিখলেন 'আনন্দমঠ'। হেমচন্দ্র লিখলেন : ভারত সঙ্গীত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখলেন : স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস, যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণকে দেশপ্রেমোদ্দীপক নানা পুস্তক লেখার অনুরোধ জানানো হল, তাঁর 'আর্য দর্শন' পত্রিকায়। তিনকড়িবাবুকে হুগলী ও চন্দননগরের আশেপাশে ব্যায়ামগার স্থাপনের আদেশ দেওয়া হল। চেষ্টা চলতে লাগলো রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্দীপনা প্রচার। (৮৭-৮৮)

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল, জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতা, জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে চাইলেন বক্তৃতার মালা রচনা করে। দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার বাসনায় প্রতিষ্ঠিত হল 'বেঙ্গলী' পত্রিকা। একটি সম্পাদকীয় লেখার জন্য সুরেন্দ্রনাথ দোষী সাব্যস্ত হয়ে ছ'মাস জেলে গেলেন। চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল শিক্ষিত ও ছাত্র সমাজে। তাঁরা প্রতিবাদে সমবেত হলেন হাইকোর্টের চারপাশে। পুলিশের উপর ইঁট ছুড়লেন, জানালা ভাঙলেন। এঁদের মধ্যে ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। এমনকি সুরেন্দ্রনাথকে অন্য পথ দিয়ে গোপনে জেলে নিয়ে যাওয়া হল। স্বতঃস্ফূর্ত্ত হরতাল হল পল্লীতে, পল্লীতে। বিক্ষোভকারীদের হল ঘরে স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় খেলার মাঠে সর্ব্বপ্রথম জনসভা হল কলকাতায়। বাংলার বাইরেও সভাসমিতি হল, সরকারী কিছু কর্ম্মচারীও সে সভায় যোগদান করলেন। ফলে অনেককে শাস্তি ভোগ করতে হল।

মি. পি. মিত্র মহাশয় প্রকাশ্যে বিদ্রোহের পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়ে তাঁদের বৈপ্লবিক বন্ধুদের উপদেশে, বরিশাল গেলেন। স্থির হল : বৈপ্লবিক পতাকা উড়িয়ে, বহুলোক সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে জেল ভেঙে সুরেনবাবুকে মুক্ত করে নিয়ে আসবেন। কলকাতার নেতারা কিন্তু তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। তাঁর বিপ্লবের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। অবশ্য এর পিছনে ছিল সুরেন্দ্রনাথের নীতিপরায়ণতা। তিনি এ পথ গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি চাইলেন আইনের পথে চলতে (১৮৮৩ সাল)।

এর আগেও একবার চেষ্টা চলেছিল ঠনঠনে পাড়ায় ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত। এক পড়োবাড়ীতে 'সঞ্জীবনী সভা' বা 'হাঞ্চু পামু হাফ' নামে এক সমিতি গঠন করা হয়েছিল। যার অধ্যক্ষ ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। সভ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। সে সভার অসবাব পত্তর ছিল ভাঙা ছোট একটা টেবিল, কয়েকখানা ভাড়া চেয়ার, আধখানা ছোট টানা পাখা। অধ্যক্ষ লাল পাটের কাপড় পরে সভায় আসতেন, আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার থেকে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের পুঁথি আনা হত যেদিন দীক্ষা দেওয়া হত। নিয়ম ছিল অনেক কিন্তু সে সভায় 'মন্ত্রগুপ্তি' ছিল প্রধান অর্থাৎ এসভাতে যা কথা হবে, যা করা হবে বা শোনা যাবে তা একমাত্র সভ্যছাড়া অন্যের কাছে প্রকাশ করা চলবে না। টেবিলের উপর দুপাশে রাখা হত দুটি মড়ার মাথা, চক্ষুকোঠরে বসানো থাকতো দুটি মোমের বাতি। মড়ার মাথার সাঙ্কেতিক চিহ্ন মৃত ভারত। বাতি দুটির অর্থ মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করা ও জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলা। সভা আরম্ভ হবার আগে গান হত নিজস্ব সাংকেতিক ভাষায় 'সংগচ্ছধ্বং সংবদ্ধম'। কাজের বিবরণী লিখতেন স্বয়ং জ্যোতিবাবু। সবটাই রোমহর্ষ ব্যাপার, এর বেশী ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না, উত্তেজনার আগুণ পোহানোর মত।.... দীক্ষা ঋকমন্ত্রে, কথা চুপি চুপি, দ্বার রুদ্ধ, ঘর অন্ধকার।

এরপর কয়েকবছর পরে ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের চেষ্টায় বৈপ্লবিক কর্ম্মকাণ্ডের সুরু। ইনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। ভাল ইংরাজী লিখতেন ও বলতেও পারতেন। কংগ্রেসে গিয়ে গলাবাজী করে নাম কিনতে চাইতেন না। আবেদন নিবেদনের রাজনীতি তাঁর ছিল না। ছিলেন অন্যান্যের সঙ্গে বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের প্রয়াসী। 'বৈপ্লবিক সমিতি' স্থাপনের প্রধান সভাপতি, তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এর বহু পূর্ব্বে বিলেতে যখন পড়তে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁর মাথায় 'সিক্রেট সোসাইটি' গঠনের স্বপ্ন জেগেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' অবলম্বনে অনুশীলন সমিতি বা এরকম কিছু নাম দিয়ে একটি গুপ্তসমিতি চালাবার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। সরলা দেবীর সঙ্গেও একটি সমিতি গঠন করেছিলেন : ছেলেদের লাঠিখেলা ইত্যাদিতে উৎসাহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে।

নিবেদিতা ফিরেই সকল স্বাধীনতাকামী চিন্তাবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সুরু করে দিলেন। ওকাকুরা সফর শেষ করে ফিরে এলে, তাঁকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে। বৃটিশ কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতের চিন্তা মাথায় নিয়ে দিশেহারা তখন তিনি। ওকাকুরা এসে সে চিন্তায় ঘৃতাহুতি দিলেন। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দল সংগঠনের কাজে। জন্ম থেকেই বিদ্রোহিনী নিবেদিতা। ভারতে পা দিয়ে তাঁর মানসরূপ ধারণ করলো 'ভারতের' স্বাধীনতা। ঘোরতর রাজভক্তি আজ সাম্রাজ্য বিরোধী। সর্ব্বান্তিঃকরণে চাইছেন ভারতের বন্ধনমুক্তি। সে পথ যত রূঢ় হোক, অসহযোগ বা সশস্ত্রসংগ্রাম "পরিতজ্য নৈব সম্ভবম"-আবেদন, নিবেদন বা আপোষ— 'নৈবচ, নৈবচ'-। তিনি হাড়ে মাসে চিনেছেন সাম্রাজ্যবাদীর শোষণের রূপ। তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে স্বাধীনতা। প্রয়োজনে আঘাতের পর আঘাত, শৃঙ্খল মুক্তি— এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

চিন্তিত হলেন স্বামিজী। পূর্ব্বেই বুঝেছিলেন : সাম্রাজিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম তখনই সম্ভব যখন তার পিছনে জনসমর্থন থাকে। সেই জনমত বা গণশক্তির জাগরণ যতদিন সম্ভব না হয়, ততদিন চালাতে হবে ক্ষেত্রসৃষ্টির কাজ। তার জন্য প্রয়োজন জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন। প্রথমে সেই উদ্বোধনের হোতা সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামে গঞ্জে গিয়ে তারা, মানুষকে সচেতন করে তুলবে জাতীয়তাবোধের মহান আদর্শে। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি আত্মত্যাগী মানুষ তৈরী করতে চাইছিলেন।

ওকাকুরা এসেছেন এদেশে তাঁকে জাপানের ধর্ম্মসভায় আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে। অথচ তিনি নিজে জড়িয়ে পড়েলেন প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে। সাক্ষাতের প্রথম পরিচয়ে তাঁকে মনে হয়েছিল 'বহুদিনের হারানো ভাই' কিন্তু তাঁর কর্ম্মধারা, তাঁকে চিন্তিত করে তুললো: এটা সাধু উদ্দেশ্য নয় তার।...

নিবেদিতাকে তিনি চেনেন। প্রচণ্ডজেদী ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী। নিজ ভাবধারা অপরের উপর প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আজ প্রয়োজন : সে গতিপথের নিয়ন্ত্রণ!...

তিনি নিজে চেয়েছিলেন দেশের যুবসম্প্রদায়কে প্রনোদিত করে জাগ্রত করা। জনচেতনা জাগ্রত হলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে তারা। তাঁর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সতীশ বসু প্রতিষ্ঠা করলেন অনুশীলন সমিতি। হেমচন্দ্র ঘোষও সে পথ অনুসরণ করলেন। তিনি স্বয়ং যেখানে গেলেন সেখানেই দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। পাটনায় জাতীয়বাদী অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রকে বললেন, ভারতে আজ বোমার প্রয়োজন। যারা তাঁর কাছে আসছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই দেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করছেন। এঁদের মধ্যে ক্ষীরোদ গোপাল মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক জোয়ারদার, পুলিন মুখার্জ্জী, ডাঃ যতীন ঘোষাল প্রমুখ। ঢাকা সফরে গিয়ে শ্রীশপাল, যোগেন্দ্র দত্ত, মাষ্টার সাহেব মৌলবী আলিমুদ্দীন প্রমুখকে, দেশপ্রেম, বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার জ্বলন্ত বাণী শোনালেন। উপদেশ দিলেন; রাণী ঝাঁসির আদর্শ গ্রহণ করতে। বললেন : ফুটবল উত্তম খেলা, পদাঘাতের উত্তরে পদাঘাত করা যায়! যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এলেন তাঁর সংস্রবে। ১৯০২ সালের গোড়ায় যখন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপথ রায় প্রমুখ এলেন, তাঁদের বললেন : আমরা বিদেশী শক্তির শাসনাধীন, আমাদের রাজনীতি নির্ভর করবে আত্মশক্তির উপরে, পদ্ধতি অবশ্যই সংঘাতশীল ও প্রতিরোধাত্মক। যার প্রভাবে শাসনশক্তি নতি স্বীকারে বাধ্য হবে।...

ওকাকুরার অনুরোধে তিনি বুদ্ধগয়া যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন। যেখানে বুদ্ধদেব প্রথম বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই বারানসী যাত্রারও সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁকে বিশ্বনাথ দর্শনে ও পূজায় পরিতৃপ্ত করালেন। ভেবেছিলেন সারা এশিয়ার বন্ধু ও মুক্তিকামী পুরুষ ইনি অথচ এঁর চলচলনে সন্দিগ্ধ হলেন। বুঝলেন : লোকটির মন ও মুখ এক নয়। নিবেদিতাকে বললেন : ওকাকুরা-নিজের কাজ করুক, তুমি স্বতন্ত্র পথে চল।

বিপ্লবীচেতনায় তখন এতই উন্মনা নিবেদিতা যে নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। যে গুরুকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁর সতর্ক বাণী এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন : এটা তাঁর ঠিক মনের কথা নয়, এটা ভগ্নস্বাস্থ্য রোগীর স্নায়ুর দুর্ব্বলতা। সুস্থ হয়ে উঠুন। বুঝবেন, কন্যা পিতার নির্দ্দেশ অমান্য করেনি। নিবেদিতা স্থির করে নিলেন : তিনি তাঁর পথে এগিয়ে চলবেন। তাঁর পিতাকে যতদূর চেনেন, তিনি পরিপূর্ণ স্বাধীনতাকামী, ভারতের শৃঙ্খলমুক্তিই তাঁর স্বপ্ন। এই বাধা প্রদান সাময়িক। এটা তাঁর অসুস্থ দেহের ও মনের খেয়াল ছাড়া অন্য কিছু নয়। একদিন না একদিন একাজ তিনি সমর্থন করবেনই।

ওকাকুরার প্রস্তাব 'এশিয়াটিক ফেডারেশন'। নিবেদিতার স্বপ্ন : জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের মুক্তি পেতে হলে : তা ভারতীয়েরাই করবে। সে পথে ওকাকুরা সাহায্য করুক।

তিনি আরও একধাপ এগিয়ে চললেন। যোগাযোগ করলেন প্রমথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে। ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বিপিনপাল, যোগেশ চৌধুরী, রজত রায়, হরিদাস হালদার প্রমুখের সঙ্গে।

চিত্তরঞ্জন দাস এশিয়াটিক ফেডারেশনের যুক্তি অনুমোদন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে গঠিত হল একটি রাজনৈতিক দল। সভ্য হলেন প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, আশুতোষ চৌধুরী,

সত্যরঞ্জন দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, রজত রায়, সুরেন হালদার, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার দত্ত প্রভৃতি। সে রাজনীতির মুখপত্র হল 'নিউইণ্ডিয়া' যার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলেন সত্যরঞ্জন দাস, সম্পাদক হলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

ওকাকুরাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গে। এই যোগাযোগের হোতা হলেন মিসেস বুল। তিনি পার্টি দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন : ইনিই নব্য জাপানী শিল্প বিদ্যালয় নিপ্পন বিজিৎস্যুর প্রতিষ্ঠাতা। লিখেছেন : 'আইডিয়ালস্ অফ দি ইষ্ট'। এসেছেন ভারতে ভ্রমনে।

গৃহস্বামীর পাশে উপবিষ্ট মাঝারি উচ্চতার একটি মানুষ, কালো সিল্কের কিমোনোয় আবৃত দেহ, উপরে পারিবারিক প্রতীক পাঁচ পাগড়ীর সাদাসিধে একটি কাজ করা ফুল, হাতে বাঁশ ও কাগজের তৈরী পাখা, তাতে রক্তপিঙ্গল রঙের পাতাগুচ্ছের অলঙ্করণ। জাপানী কাপড়ের মোজায় ঢাকা পা, পরা ঘাসের চটি। প্রথম দৃষ্টে মনে হয় চীনা. চোখের পাতা ভারী, অল্প গোঁফ, গায়ের রং লাল। সহজভঙ্গিতে উপবিষ্ট, সমাহিত, গাম্ভীর্য্য, মিশরীয় সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন পরের পর।

ওকাকুরা নীরব। নিবেদিতা নিমন্ত্রিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন : আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় ওঁকে আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে টেনে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে জাপান ও তাঁর বইয়ের উল্লেখ করে প্রশংসা মুখর হয়ে উঠলেন। ওকাকুরা আভূমি নতনমস্কারে অভিবাদন জানালেন, স্বীকৃতি হিসাবে কিন্তু মুখে কোন ভাষা তাঁর ছিল না।

কিছু পরে ওকাকুরা উঠে গেলেন। অনুষ্ঠান শেষ, ভেবে উপস্থিত সকলে বিদায় নেবার জন্য অগ্রসর হলেন। নিবেদিতা এসে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। যেখানে কাচ বসানো বারান্দায় বসে আছেন ওকাকুরা। ধূমপান করে চলেছেন সমানে। একটি টেবিল — দুটি চেয়ার, অটল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। নত হয়ে সম মর্য্যাদায় অভিবাদন করে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। একটি সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

থেমে থেমে ইংরাজীতে বললেন, আপনাদের দেশের জন্য আপনি কি করতে চান বলুন? হতভম্ব হলেন সুরেন্দ্রনাথ। প্রশ্নটা আচমকা। তবুও তাঁর মনে হল নিবেদিতার হয়ে কথাটা পেড়েছেন তাঁদের জাগিয়ে তুলতে। আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন সুরেন্দ্রনাথ : বর্ত্তমানে অবস্থা যে রকম, তাতে নিজের কাজটুকু সমাধা করে সমষ্টিগত ফলাফল কালের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই! নিজের কাছেই নিজেকে খুব দুর্ব্বল বলে মনে হল সুরেন্দ্রনাথের।

উত্তরে ওকাকুরা বললেন, — এদেশের তরুণদের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব, তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাঁর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল, যাঁদের সঙ্গে তিনি ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও এই একই দুর্ব্বলতা ঝিমিয়ে রয়েছে, মনের দুর্ব্বলতা, চিন্তাধারাও।

তাতিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, নিজে কোন পরিবেশে তিনি গড়ে উঠেছেন, তার বর্ণনা দিয়ে বললেন : অতি শৈশবে, পাশের ঘরে বাগ্‌বিতণ্ডার শব্দ শুনে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম - কাকার মুণ্ডহীন দেহটা বসে আছে, গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা। মুখে ফুটে উঠলো হাসির ঝলক।

তিনি ছিলেন সামুরাই বংশের। শিখেদের স্বর্ণমন্দিরের দিকে ধাবিত থাকা স্বাভাবিক। কৃপাণ নীতির প্রতি আকর্ষণ স্পষ্ট ব্যক্ত হয়ে উঠলো : মুণ্ডহীন ধড় ও রক্ত ফোয়ারার মধ্যে। শ্রোতা শিহরিত হলেন. পাশে উপবিষ্ট মহিলাটি কিন্তু মৃত্যু পূজারী বিবেকানন্দের-আইরিশ বিপ্লবাদিনী শিষ্যা। 'আইডিয়ালস' বই-র ভূমিকায় যিনি জাপানী আর্ট সম্বন্ধে প্রচলিত ধরণা দূর করার ব্যাপারে লিখেছে— ঐ আর্ট কল্পনা ফোটা ফুলের বর্ণ সমারোহ বা হাল্কা পাখীর আকার নয়, মূলে আছে তার ড্রাগনের প্রচণ্ড স্বতঃস্ফূর্ত্তি— যার নাম মৃত্যু পূজা।

যিনি আজন্ম স্বাধীনতার পূজারী, পরাধীনতা, সমাজবাদ, বিপ্লববাদ বিষয়ে যাঁর দৃঢ় মনোভাব, সেই বিপ্লববাদে ইতিপূর্ব্বেই জড়িয়ে পড়েছেন তাঁর দুই প্রিয় শিষ্যা একজন মাতা, অন্যজন কন্যা! এঁরা দুজন ছাড়াও জড়িয়ে পড়েছেন আরেকজন বিদেশিনী তাঁর নাম মিস ম্যাকলাউড। ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। তিনি স্বামিজীর একনিষ্ঠা ভক্ত। স্বামিজীর ভারতের ভাল হতে পারে এমন সবকিছুতে সাহায্য করতে প্রস্তুত তিনি। তাঁর অর্থ ব্যবহৃত হল নিবেদিতা অবলম্বিত বিপ্লবী সংগঠনের নানা কাজে। ভারতমুক্তি ও এশিয়া ফেডারেশন গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে আগমন করেছেন তিনি। সে কাজ জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই, ওকাকুরার আর্ট লেকচারের সম্পূর্ণ নোট পাঠিয়ে ছিলেন নিবেদিতার কাছে একটি পুস্তক রচনায় যা— সারা এশিয়ার জাগরণের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে, মিসেস বুলেরও সহযোগিতা ছিল। তাঁর কাজ শুধু অর্থ সাহায্য নয় রাজনৈতিক প্রয়োজনে উচ্চ মহলে যোগাযোগ স্থাপন, গোপন চিঠিপত্র তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ চালাচালির গোপন ব্যবস্থা। মিস ম্যাকলাউড ছিলেন বিত্তশালিনী আর ছিল তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব, মিসেস বুলের মতই আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উচ্চ মহলে।

স্বামিজীর গভীর আশা ও প্রত্যয় ছিল নিবেদিতার উপর। তিনি সন্ন্যাস জীবনে ভারতের এপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশে, জনগণের দুঃখ ও দুর্দ্দশা অবলোকন করেছেন স্বয়ং। যে আত্মমুক্তি কামনায় তাঁর সর্ব্বত্র বিচরণ, সেই মুক্তির দিশা পরিবর্ত্তিত হল জনমুক্তির কামনায়। তাই সেদিন রাজগুরু হয়েও শিষ্যদের কাছে যাঞ্চা করেছিলেন জনমুক্তির কামনা। ব্যর্থ হয়েছিলেন সে কার্য্যোদ্ধারে। তার পরিবর্তে তাঁরা মিলিতচেষ্টায় রাজগুরুকে সম্মতি করালেন বিশ্বধর্ম্ম সম্মিলনে যোগদান করতে। উপস্থিত হলেন কন্যাকুমারীতে। বসলেন ধ্যানে। শুনলেন শ্রীগুরুর আহ্বান। সংশয় কাটলো না, অনুমতি প্রার্থনা করলেন শ্রীমার কাছে। তাঁর কাছ থেকে এল একই বার্ত্তা। সারা আমেরিকা ভ্রমণ করলেন গুরুরবার্ত্তা বহন করে, পেলেন বহু শিষ্য ও শিষ্যা কিন্তু যে অগ্নির সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত, সেই অগ্নির সন্ধান পেলেন ইংলণ্ডের এক ঘরোয়া বৈঠকে। তিনি তাঁকে আহ্বান জানালেন। তিনি তাঁর চরণপ্রান্তে আত্মনিবেদন করলেন।

মুক্ত পরিবেশে, স্বাধীন দেশের সঙ্গে তাঁর ঘটলো গভীর পরিচয়। যে জ্বালায় তাঁর মুক্তি কামনা, জনমুক্তির আশায় উদ্বোধিত হয়েছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবন, সেই মুক্ত চেতনা আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণের শেষে -ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তীব্রতর হয়ে উঠলো পরাধীনতার তীব্র সেই গ্লানি। একদিকে পেয়েছিলেন সে দেশবাসীর সহানুভূতি ও বদান্যতা। অন্যদিকে দেখেছিলেন পরাধীন জাতির প্রতি তাদের অদম্য ঘৃণা। একটা দেশের ঐতিহ্য যতই গৌরবময় হোক, সে দেশ যদি পরাধীন হয়, তাদের দৃষ্টিতে সে অসভ্য ও বর্ব্বর। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন মূল্য নেই। ঠিক যেমনটি মধ্যাহ্নের সূর্য্য আর গোধুলির মলিন পরিবেশ।

নিবেদিতা যেদিন এদেশে প্রথম পা দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যেও ছিল সেই মধ্যাহ্নের প্রখরতা। স্বাধীন দেশের মানুষ, স্বাধীন চিন্তাধারা, তেমনি প্রগাঢ় তাঁর রাজভক্তি। স্বামিজী চুরমার করে দিলেন সে চিন্তার আবর্ত্ত। বুঝিয়ে দিলেন, যে দেশে এসেছো আত্মনিবেদনের মহান ঔদার্য্য নিয়ে, সেদেশকে জানতে হবে, চিনতে হবে, তার সঙ্গে ঘটাতে হবে আত্মিক সংযোগ। তবেই সম্ভব হবে আত্মজয়, আত্মত্যাগ, সেবাই হবে মহান আদর্শ। সেখানে 'আমির' ঘটবে বিলুপ্তি, আমাকে ঘিরে যারা আছে তারাই, সেদিন হবে একান্ত আপনজন।

এপ্রিলের প্রথম দিকে ম্যাকলাউড মায়াবতী যাত্রা করলেন। ফিরে এলেন শেষের দিকে। যাত্রা করলেন : আমেরিকা। উভয়ের এই শেষ সাক্ষাৎ।

ওকাকুরার সঙ্গে মিলিত হবার পর থেকেই নিবেদিতার গোপন রাজনৈতিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে নানা নামে অবিহিত করতে লাগলেন। কখনও জাপানী বন্ধু, কখনও জাপানী পোয়েট, কখনও 'নিগু', কখনও নি-আদার, তোমার ছেলে, ব্যানার চীফ বা জেন্থিশ। ম্যাকলাউডের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদানে এইসব গোপন নাম ব্যবহার করে চললেন।

১৯ শে এপ্রিল ম্যাকলাউডকে জানালেন : নিগুর ভারত ভ্রমণের খরচা পড়ছে তিন হাজার টাকা। নেপাল ভ্রমণের পাশপোর্টে নাম থাকবে 'রাইনো সারাস' আরও লিখলেন: আমি একলা, তবু একলা নই, আর একজনের হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং চক্ষু ছ'সপ্তাহ ধরে আমারই প্রয়োজনে নিয়োজিত। আমার ভিশন, এখন কেবল আমার নয় তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ওঁর ভিশনও।

২০ শে এপ্রিল জানালেন ম্যাকলাউডকে : ওকাকুরা ভারত সফরে যাত্রা করছেন। তাঁকে বিদায় দেওয়া হল। সেখানে আমি ও ক্রিস্টিন উপস্থিত ছিলাম। আমাদের পান পাত্রে এক ফোঁটা ব্রান্ডি পেয়েছিলাম, কারণ বিদায়ের 'পান পাত্র' অবশ্যই মদের হওয়া চাই। যখন নৈশ ভোজ সমাপ্ত হল, তখন সকলেই গান গাইলেন। প্রিয় মি. ওডা সুন্দর স্তোত্র গান শোনালেন। হোমি গাইলেন সুমধুর ফুজিয়াগান, যা গ্রিসোরিয়ান ধর্ম্ম সঙ্গীতের মত শোনালো। ক্রিস্টিন গাইলো মনোরম জার্ম্মান বিদায় গীতি, চীফটেন তাঁর দৈত্যদানা, আগ্নিঃ, নিশ্বাস, হুলস্থুল গান আর আমি কি করি, শিবগুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র এবং 'হরি ওম্'— শেষ হল এইভাবে। আরও জানালেন : তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা সেই সঙ্গে ওকাকুরার দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে স্বীকৃতি : 'বেটা যা বলেছে তা ঠিক'! উনি আমার থেকেও নির্ভীক। যে কাজ, উন্মাদ ছাড়া কেউ করে না— সেই কাজ করতে এগিয়ে যান ইনি।'

২১ শে এপ্রিল ম্যাকলাউডকে কৃতজ্ঞতা জানালেন সেই সঙ্গে লিখলেন : "গুরুর কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন"— এই সম্ভাব্য সমালোচনার বিরুদ্ধে, আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি, নোতুন কোন ব্যক্তি দিতে পারেন এমন সকল প্রেরণা, যা আমি গ্রহণ করতে সদাই প্রস্তুত! সে ব্যক্তির জাতি বা আচার আচরণ, যাই হোক না কেন! তা বলে এটাকে আমি ব্যক্তিগত ব্যপারের বেশী মনে করছি না, অন্য গুরু এসবক্ষেত্রে যেমন করেন, তার বেশী করছি না। আমি যাই করি না কেন, স্বামিজীর মধ্যে এই বোঝাপড়ার মনোভাব সর্ব্বদাই দেখতে চাইবো।

১লা মে সংবাদ দিলেন ম্যাকলাউডকে : ওকাকুরা বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে এসেছেন। ক্রিস্টিন, সদানন্দ ও তিনি নিজে মায়াবতী যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত।..... সেই সঙ্গে তাঁর দেওয়া টাকার ব্যয় ও বাক্সের কথা উল্লেখ করলেন।

৫ই মে তাঁকে জানালেন : তাঁর রাজনৈতিক কাজে স্বামিজীর মতামত উপেক্ষণীয় নয়। নিশ্চয় অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে।..... অবশ্য নিগুর মত : স্বামিজীকে সরিয়ে রাখো, তাহলে সব ঠিক হবে, তাঁকে কিছুই জানিওনা। আমার মনে হয় ওঁর কথাই ঠিক।.... স্বামিজী যদি কিছু লেখেন, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না। তাঁর মেজাজের ওঠা পড়া হয়, স্নায়ুর তটে অসুস্থ ভাটার টান থেকেই।

২৫ শে মে ম্যাকলাউডকে অভিযোগ করলেন : তাঁর আশঙ্কা, "স্বামিজী আমার ও অন্যের কাছে যা পবিত্র বস্তু, তাকে ধ্বংশ করে দিতে পারেন" সুতরাং সে ব্যাপারে সতর্ক থাকাই তাঁর অভিপ্রায়। .... তোমার কাছে একথা বলে বোঝাতে হবে না যে, যেহেতু স্বামিজীকে ভালবাসি, তাঁকে যথার্থ সেবা করতে চাই— তাঁর নিজের প্রয়োজনেই! এই ধরনের একটি পরিকল্পনার সম্মুখীন হয়েছি শান্তভাবে। আহা! তিনি যদি এখন, ভারতের বাইরে থাকতেন, তাহলে কি ভালই না হত! তাঁর দেশসেবার শক্তি শেষ হয়ে গেছে, তা অবশ্য কোনমতেই মনে করি না, কিন্তু এদেশে তাঁর উপস্থিতি যে, দেশসেবার পরিপন্থী, অন্ততঃ যতক্ষণ না কোন বিরাট সংশয়কাল উত্তীর্ণ হচ্ছে,

ততক্ষণ যে, তা সত্য, একথা খুবই বিশ্বাস করি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি আমার কাছে এই দাবি করতে পারেন- 'আর কিছু নয়' যুদ্ধের আলোড়নের মধ্যে আমার পতাকা তুলে ধরো। আর ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে সরিয়ে রাখো, পাছে তা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে কিংবা দুর্ব্বল করে বাহুকে... যে পথ বেছে নিয়েছি, সে পথে ওকাকুরার সাহায্য পর্য্যন্ত দরকার নেই, ওকাকুরা স্বদেশে ফিরে পূর্ব্ব কার্য্যে ব্রতী থাকলেই ভাল করবেন।

কলকাতার মে মাস। যেমন গরম, তেমনি চড়া রোদ। স্থির হল : এ সময়টা নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন মায়াবতী আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবেন। স্বামিজীও উৎসাহ দিলেন। এই কেন্দ্রটি স্বামিজী, পাশ্চাত্য শিষ্যগণের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় স্থান। মিসেস সেভিয়ার সঙ্গে নিবেদিতার পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতা ছিল পূর্ব্ব থেকেই। যাত্রা করলেন। তাঁদের সঙ্গী হলেন ওকাকুরা। ওখানে যেতে হলে কাঠগোদাম হয়ে ভীমতাল, ধারী, দেবীধুরা প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে যেতে হয়। কিছুটা হাঁটা পথ ছাড়াও ডাণ্ডীতে অতিক্রম করতে হয় অনেকখানি। সে পথের পাশে সরল বৃক্ষের সারি, রডোডেনড্রন পুষ্পের গুচ্ছ, সাদা গোলাপ, নানাজাতের ফার। সদলবলে সেখানে পৌঁছলেন ১১ই মে।

বহুদিন পরে আবার দেওদার বৃক্ষতলে বসে হিমালয়ের শান্ত নির্জ্জনতা উপভোগ করলেন। একদিন খুব বৃষ্টি হয়ে বেশ শীত পড়ে গেলো। মিঃ সেভিয়ারের জীবিত অবস্থায় স্বরূপানন্দ মায়াবতীর অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। মিসেস সেভিয়ার ও তাঁর আতিথ্যে দিনগুলি আনন্দে কাটতে লাগলো। কয়েকদিন পরে মিঃ ওকাকুরা চলে গেলেন। মায়াবতী অবস্থান কালে ২রা জুন মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : জানাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু মনে হচ্ছে এই বৎসর ডঃ বসুর প্রত্যাবর্ত্তন চূড়ান্তভাবে স্থির হয়েছে। ভাবছি, তুমি হয়তো নরওয়েতে হাজির হবে। কে জানে! অবশ্যই আশা করি যে, ডঃ বসুও যাবেন।

৭ই জুন ১৯০২ লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : এর মধ্যে তুমি আমার শিশুর (বসুব) সাক্ষাৎ পেয়েছ। যদি তুমি ধেয়ে গিয়ে, তাকে, তার হৃদয়, মন এবং কল্পনাকে বন্দী করে ফেলতে পারো— তা করো। জীবনের স্পর্শ চায়, মজা চায়, নূতন আকর্ষণ চায়। ভ্রূক্ষেপ করি না, কোথা থেকে সে তা পায়! যদি সে সত্যই পেতে চায়। পূর্ণ কর তাকে, 'আনন্দে'। সে অনুভব করুক আবার সে বাঁচতে শুরু করেছে। তার কাছে ধর্ম্মের কথা বলে, কিংবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কথা কিংবা আবোল তাবোল, যা ইচ্ছা। কি বলছ, তাতে কিছুই এসে যায় না।

কেবল, যদি তাকে না ভালবাসো, ভালবাসার ভঙ্গি করো না। আমি কিছুই মনে করবো না, যদি তুমি স্বতঃই মনে কর যে, সে তোমার মনে সাড়া জাগায় না, সেক্ষেত্রে কোন পথ নেই। যাতে চূড়ান্ত ভাবে সে তোমাকে ভালবাসে তা করো, যদি না মনে করো, পরে— তাকে পরিহার করার প্রয়োজন হবে।

শুধু এইটুকু চাই এর বেশী নয়, এটা বেশী কি?

ক্রিস্টিনের অভিলাষ আরও কিছুদিন হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করেন।

৭ই জুন চিঠি লিখলেন মিসেস বুলকে। তাঁর আইডিয়েলস বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন প্রকাশক— মারে কোম্পানী। নিবেদিতা একাই কলকাতা ফেরার জন্য ২৪শে জুন রওনা হলেন। বেরিলি, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি হয়ে ২৬ শে জুন রাত্রে কলকাতায় পৌছলেন।

২৮ শে জুন স্বামিজী তাঁর বোসপাড়ার বাড়ীতে দেখা করতে এলেন। নিবেদিতা তখনও উপলব্ধি করতে পারেন নি— এই তাঁর শেষ আগমন। দিন যতই যেতে লাগলো ততই তাঁর ধ্যানের নেশা বাড়তে লাগলো।

চিন্তিত হলেন গুরুভাইরা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : ও যেদিন নিজেকে চিনতে পারবে, সেদিন আর, তার দেহ থাকবে না। কথায় কথায় এক গুরুভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা স্বামিজী! আপনি কে, তা কি বুঝতে পেরেছেন?

স্বামিজী গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন : হ্যাঁ, এখন আমি বুঝেছি!

গুরুভ্রাতাগণ চিন্তিত ও বিষণ্ণ হলেন। কিন্তু হাস্য-পরিহাস ও ক্রীড়া কৌতুকে তাঁদের ছলনা করতে লাগলেন। তিনি যে সত্যই দেহ ত্যাগ করতে চলেছেন, তা কেউ বুঝতে পারলেন না।

জীবন অবসানের মাত্র সাতদিন বাকী দেখা করতে এলেন নিবেদিতার সঙ্গে। মঠে ফিরে শুদ্ধানন্দজীকে পাঁজি আনবার জন্য আদেশ দিলেন। নিজের কক্ষে সেটি নিয়ে গিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগলেন। মুখ দেখে মনে হল, বিশেষ কোন কাজের জন্য দিন নির্ব্বাচন করতে চাইছেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছেন না

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ ত্যাগের কয়েক দিন পূর্ব্বে এক শিষ্যকে পাঁজি আনতে বলেছিলেন। কতকগুলি দিন পাঠের পর বলেছিলেন : থাক্ আর দরকার নেই। স্বামিজী শ্রীগুরুর পথে অনুসরণ করলেন।

তখনও তিন দিন বাকী, বেড়াতে বেড়াতে একটি স্থান নির্দ্দেশে, সহসা বলে উঠলেন: আমার দেহান্ত হলে, ঐখানে অগ্নিসংকার করো। সঙ্গীরা শুনলেন কিন্তু প্রশ্ন করার কথা, কারও মনে এলো না।

২৯ শে জুন নিবেদিতা মঠে এলেন। প্রথম দিন। স্বামিজীর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে বহুক্ষণ কথা হল। কথা প্রসঙ্গে এলো অনাথ ও বিধবা আশ্রমের কথা। তিনি বললেন : বিধবা আশ্রম বা অনাথ আশ্রম স্থাপন ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। কারণ এতে ভাল অপেক্ষা মন্দের সম্ভাবনা বেশী। মিশনারীরা এ কাজ করে থাকে। তারা বিধবা বা অনাথদের কিনে এনে তাদের উপর নির্য্যাতন করে, অবশ্য তার পিছনে থাকে তাদের অর্থ ও তরবারি।

নিবেদিতা স্বামিজীর বক্তব্য অনুধাবন করতে না পেরে সাগ্রহে বলে উঠলেন : হ্যাঁ, আপনি কি বুঝে উঠতে পারছেন না, এইজন্যই আমি বলি অন্য প্রশ্নটির উত্তর সর্ব্বাগ্রে দিতে হবে, তারপর শিক্ষা ও অন্য সংক্রান্ত ব্যাপার।

উত্তরে স্বামিজী বললেন : তাই হবে মার্গট, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। আমার কেবল মনে হয়, আমি মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হচ্ছি। এইসব জাগতিক ব্যাপারে মন দেওয়া, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেখ, মার্গট আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মধ্যে উপস্থিত এই বিষয়ে একটা দৃঢ়তা এসেছে, যেমন ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে এসেছিল, আবার চলেও গিয়েছিল। একটু জোর দিয়ে তাঁর ওকাকুরা প্রীতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করলেন : ঠিক মার্গট, ঠিক। আমি দেখতে পাচ্ছি এখন তোমার এই সকল বিশ্বাসের কাল। আগে তোমার ব্রাহ্ম বিশ্বাস ছিল, টেগোর বিশ্বাস ছিল, বর্ত্তমান তোমার এইসকল বিশ্বাস— এগুলিও যাবে, যেমন গেছে অন্যগুলি!

মিসেস বুলের চিঠি পড়ে মনে হল : প্রকাশক মারের "আইডিয়েলস" বইটির কিছু অংশের কঠোর সমালোচনা করেছেন। রচনানীতির, বিরুদ্ধে সমালোচনা? অধীরভাবে জানালেন : হৃদয় আমার চমকে স্থির। ভাবলাম : কী, রচনানীতি ওহেন ত্রুটি যুক্ত? পরে ওকাকুরাকে লেখা মিসেস বুলের চিঠি থেকে বুঝতে পারলেন, রচনানীতি নয়, বইটির অন্তর্গত কিছু 'আসল ছোঁয়া' অর্থাৎ রাজনৈতিক মাত্রা সম্বন্ধে মারের আপত্তি। অবশ্য স্বস্তি পেলেন ২রা জুলাই।

তাঁর স্কুলে পাঠ্যের সঙ্গে মেয়েদের বিজ্ঞানের কিছু প্রসঙ্গ যুক্ত করতে চান, স্বামিজীর অনুমতি ছাড়া তা সম্ভব নয়। সেই উদ্দেশ্যে ২রা জুলাই মঠে ছুটে এলেন। স্বামিজীর সঙ্গে

আলোচনা হল বহুক্ষণ। সেদিন বুধবার। একাদশী। স্বামিজীর উপবাস, কিন্তু তিনি নিজের হাতেই তাঁকে রেঁধে খাওয়ানোর উদ্যোগ করলেন। বললেন, তুমি এখানে খেয়ে যাবে।

আলোচনা চলতে লাগলো। মন দিয়ে সব শুনলেন তিনি। বুঝলেন : জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সংযুক্ত। তাই, ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল জাগানোর উদ্দেশ্যে পাঠ্যে কিছু অংশ সংযুক্ত করতে চান। বললেন : আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করছে। জাগতিক, সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে, তাঁর মতামত প্রকাশ আজ নিরর্থক। মন তুলে নিয়েছি। এসব ব্যাপারে আর আলোচনায় সমর্থ নই, চলেছি মৃত্যুর দিকে।

প্রকৃত তাৎপর্য্য সে মুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম হল না। মনে পড়ে গেল কাশ্মীরের কথা। তখন একবার অসুস্থ হওয়ার পরে সুস্থ হয়ে উঠলে বলেছিলেন, যখনই মৃত্যু কাছে আসে, আমার সব দুর্ব্বলতা মুছে যায়। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকি। হাতের দুটো পাথর সজোরে আঘাত করে বলেছিলেন : কারণ আমি সে মুহূর্ত্তে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছি।... অমরনাথ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বলেছিলেন : আমি ইচ্ছা মৃত্যু বর লাভ করেছি। ... নানা ভাবে ইঙ্গিত দিয়ে চলেছেন এবার মহাপ্রস্থানের পথে! দুর্ব্বল মানুষের মন, কানে শুনেও শুনে না, বুঝেও বুঝতে চায় না। তাঁর নিজস্ব ধারণা : আরও অধিক দিন হয়ত এ পৃথিবীতে থাকবেন না, তবে আরও তিন চার বছরতো বটেই!

স্বামিজী তাঁকে আহার করানোর জন্য ব্যস্ত হলেন। কাঁঠালের বিচি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, ভাত ও বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা দুধ। নিজের হাতেই পরিবেশন করলেন। হাস্য-পরিহাসে মাতিয়ে রাখলেন তাঁকে।

খাওয়া শেষ হল। নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দিলেন। তোয়ালে নিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন।

স্বামিজী! এসব কাজতো আমার, আপনার জন্য নয়! সলজ্জ কণ্ঠে বলে উঠলেন নিবেদিতা।

অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন স্বামিজী : ঈশা তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

চমকে উঠলেন নিবেদিতা। মুখ দিয়ে বার হতে যাচ্ছিল সে তো শেষ সময়ে— কিন্তু শঙ্কায় তাঁর কণ্ঠস্বর অনুচ্চারিত রয়ে গেল। ঠোঁটের পাতা দুটো কেঁপে উঠলো শুধু।

এদিন স্বামিজীর কথাবার্ত্তা, চালচলনে, কোন বিষাদভাব ছিল না। সকলেই তাঁর মধ্যে একজ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বার আবির্ভাব অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর স্থূলদেহ যেন একটি ছায়া বা প্রতীকমাত্র, প্রতীয়মান হতে লাগলো।

নিবেদিতা তিনঘণ্টা অতিবাহিত করলেন মঠে। অনুভব করতেই পারলেন না, এটাই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। আর স্বামিজী! আশীর্ব্বাদে আশীর্ব্বাদে তাঁকে ভুলিয়ে রাখলেন বুঝতেই দিলেন না বিদায়ক্ষণটির কথা!

তাঁকে বেশ সুস্থই দেখাচ্ছিল। নিবেদিতা ভাবলেন, তাঁর সাবধান থাকার প্রয়োজন। কোন প্রসঙ্গ তুললে পাছে সহসা উত্তেজিত হয়ে পড়েন— এই আশঙ্কায় আর বেশীক্ষণ রইলেন না মঠে। তাঁর অনন্ত করুণা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করে, অন্তর পূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর— ফিরে এলেন বোস পাড়ার বাসায়।

২রা জুলাই ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমার শিশুটির বিষয়ে, তোমার মিষ্টি চিঠি সম্বন্ধে কি আর বলতে পারি বলো! ঐভাবে তোমার লেখাটি, এ যেন তারই খানিক স্পর্শ। এত খুশী আমি, তুমি অমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এসেছিলে। তোমার মুখে, তার মাধুর্য্য এবং শিষ্ট নম্রতার কথা শুনে, খুবই ভাল লাগলো। বেচারা খোকাটি আমার! ভয় হয়, সে শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এইটুকুই আশা করতে পারি, সেন্ট সারা তাকে তার শক্তির বাইরে যাবার তাগিদ দেবে

না। ভরসা করি পরের শীত সে বস্টনে কাটাতে পারবে। সারার পরিবেশ অপূর্ব্ব। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসতে চায় সে। বাইরে থাকার ব্যাপারে কতই ধৈর্য্য দেখিয়েছে। তার ১০ই জুনের বক্তৃতা কী প্রচণ্ড জয়সূচক। আমাদের সৌভাগ্যের শেষ নেই।

প্রিয় য়ুম, আমার অভিপ্রায়, তুমি ভাল থাক। কিন্তু অসুস্থতা হয়ত সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর হবে না। যদি তা, কাউকে তোমার নৈকট্যে এনে দেয়। মেয়েদের অহঙ্কার এমনই হয় দেখতে পাচ্ছি। তোমার জীবনে, বসু সম্ভবতঃ সুদূর ক্ষুদ্র একটি ঘটনা। আমি চাই সে তোমার মধ্যে সুখের বিরাট উৎস দেখুক। সে বলে : তুমি প্রেমের মতই প্রেমময়। তাই হোক। পৃথিবীতে অবতীর্ণ এক বিরাট স্বর্গ, স্বপ্ন তুমি —যাকে আমাদের সবারই প্রয়োজন।

৪ঠা জুলাই শুক্রবার। যথারীতি ভোরে উঠলেন। কিন্তু ধ্যান করতে গেলেন না। অতীতের কথা তুলে নানাবিধ গল্প করে চললেন। পরের দিন অমাবস্যা-শনিবার। মঠে শ্রীশ্রীকালীপূজার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন স্বামিজী। পূজার আয়োজনের কথাবার্ত্তা চলছে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বাবা, শক্তি-সাধক ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মশায় উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে খুব খুশী হলেন স্বামিজী। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানান্দজীকে পূজার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। তারপর চা খেয়ে মঠের ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন। লোক মারফৎ নিবেদিতাকে খবর পাঠালেন. নিজেকে, আজ বেশ সুস্থবোধ করছেন! তখন নিবেদিতা তাঁর অসুস্থ পরিচারিকা বেটের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত।

ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করে তিনঘণ্টা কাটালেন। তারপর একটি শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে ভবানন্দে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। মঠের প্রাঙ্গণে পদচারণা করতে করতে নিজের মনে গাইতে লাগলেন : 'মন চল নিজ নিকেতনে......'

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দজী। তিনি সহসা শুনলেন : আত্মস্থ স্বামিজী, পদচারণা করতে করতে অনুচ্চস্বরে বলে চলেছেন : যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকতো, তা হলে বুঝতে পারতো, বিবেকানন্দ কি করেছে। কিন্তু কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে।

চমকে উঠলেন প্রেমানন্দজী। স্বামিজীর মন উচ্চতম ভাবভূমিতে আরূঢ় না হলে —এসব কথা কখনও বলেন না! সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ স্বামী প্রেমানন্দজী দেখেও দেখলেন না, বুঝেও বুঝলেন না, তাঁদের বড় আদরের গুরুভ্রাতা দেহত্যাগের সঙ্কল্প নিয়ে যোগরূঢ় হয়েছেন!

নিয়মিত আহারের ঘণ্টা বাজলো। ঠাকুর ঘরের নীচের তলার বারান্দায় সকলের সঙ্গে আহারে বসলেন স্বামিজী। অসুখের পর থেকে সাধারণতঃ সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করতেন না। নিয়মের ব্যতিক্রম! কারও মনে কোন সন্দেহ দেখা দিল না বরং একসঙ্গে আহারের সৌভাগ্যলাভে সকলেই আনন্দবোধ করতে লাগলেন। সকৌতূক আলাপে গুরুভ্রাতাদের মাতিয়ে রাখলেন। বললেন : অন্যদিনের চেয়ে শরীরটা আজ বেশ ভালই লাগছে!...

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত ক্লাশে আহ্বান করলেন। অন্যদিন আড়াইটা-তিনটায় পাঠ আরম্ভ হয়, আজ একটা পনেরো মিনিট সময়েই পাঠ আরম্ভ হয়ে গেল। লঘু কৌমূদী ব্যাকরণের ক্লাশ চলতে লাগলো। নিরস বিষয়ে তিনঘণ্টা পাঠ কেউ বিরক্তিবোধ করলো না! ছোট ছোট হাসির গল্প বা কৌতূকাবহ ব্যাখ্যা করে কঠিন বিষয়বস্তুগুলিকে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুললেন।

বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে মঠের বাইরে বেড়াতে বেরুলেন। গল্প করতে করতে বেলুড় বাজার পর্য্যন্ত গেলেন। কথার মধ্যে বেদবিদ্যালয়ের কথা উঠলো। প্রশ্ন করলেন প্রেমানন্দজী : বেদপাঠ করে কি উপকার হবে স্বামিজী?

স্বল্প কথায় ভাবপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন : অন্ততঃ অনেক কুসংস্কার নষ্ট করবে!

মঠে ফিরে এলেন। বারান্দায় বসলেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। ছোটদের সস্নেহে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। সময়োচিত উপদেশও দিলেন।

সন্ধ্যারতির সময় হল। ব্রহ্মচারিবৃন্দ তাঁকে প্রণাম করে ঠাকুর ঘরে ফিরে গেলেন। স্বামিজী ধীরে ধীরে ফিরে এলেন দোতালার ঘরে। সঙ্গে সকল সময় একজন ব্রহ্মচারী থাকতেন। তাঁকে ঘরের দরজা জানালা খুলে দিতে বললেন। বাইরে ঘন জমাট অন্ধকার। গঙ্গার জল ভাঙা ভাঙা আলোর প্রতিবিম্ব নিয়ে দুলে দুলে কাঁপছে। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আত্মমগ্ন হয়ে তাকিয়ে রইলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে।..... কেটে গেল বহুক্ষণ। চৈতন্য ফিরে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মচারীকে বাইরে বসে জপ করার আদেশ দিয়ে, নিজে পদ্মাসনে বসলেন, জপমালা নিয়ে। কেটে গেল একটি ঘণ্টা। আসন থেকে উঠে চৌকিতে দেহটা এলিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারীকে বাতাস করার আদেশ দিলেন। হাতে জপমালা, স্থির ও নিস্পন্ন দেহ। নিদ্রিত শিশুর মত অস্ফুট স্বরে কেঁদে উঠলেন একমুহূর্ত্ত। নেমে এলো গভীর দুটো শ্বাস— উপাধান থেকে হেলে পড়লো মাথাটি।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মচারী ছুটে গেলেন নীচের তলায়। উঠে এলেন সকলে। পরীক্ষা করে দেখলেন, যোগীবর অনন্ত নিদ্রায় শায়িত। জগন্মাতার ক্রোড়ে লীন, রণক্লান্ত সন্তান— অমানিশার তিমিরাবগুণ্ঠনের অন্তরালে.....!

রাত্রে নিবেদিতা স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ যেন সেই রাত্রে পুনরায় দেহত্যাগ করেছেন। ঘুম ভাঙলো প্রত্যূষে। দ্বারে করাঘাত। এক সংবাদবাহক সন্ন্যাসী অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্য। তিনিই তাঁর হাতে তুলে দিলেন একটি খাম। পাঠিয়েছেন স্বামী সারদানন্দজী। খুলে দেখলেন— The end has come. Swamiji has slept last night at nine, never to rise again— রাত্রি নটায় স্বামিজী নিদ্রাভিভূত হয়েছেন পুনঃ জাগরণ তাঁর আর হবে না!

চিঠিখানা পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। ক্ষণকালের জন্য তাঁর সত্তালোপ হয়ে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে। চোখের পাতায় ভেসে উঠলো : গত সন্ধ্যায় ধ্যানের সময় অনিবার্য্যভাবে শিবগুরুর দিকেই ধাবিত হয়েছিল তাঁর মন, যার প্রতিলিপিতে খুঁজে পেয়েছিলেন : বুদ্ধ গোড়ায় ছিলেন শুদ্ধজ্ঞান ও সন্ন্যাসের প্রতীক, পরে শিব সেই স্থান নেন— যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সত্যগুলিকে পুনশ্চ আত্মসাৎ করে নিল হিন্দুধর্ম্ম। স্বামিজী, তাঁর চোখে শিব ও বুদ্ধের মিলিত প্রকাশ।

কালবিলম্ব করলেন না। বেরিয়ে পড়লেন মঠের পথে। মঠে এসে পৌঁছলেন। উপর উঠে গেলেন। দেখলেন : স্বামিজীর দেহের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। যেন নিদ্রাভিভূত। মনে হল কি সবল সুস্থ ও জীবন্ত। যেন সমাধিস্থ মহাদেব।

শয্যাপাশে উপবেশন করে একখানি পাখা নিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগলেন। একদিন আগেও যখন এসেছিলেন, তখনও অনুমান করতে পারেন নি, 'মহাসমাধির' সময় এত কাছে। তাঁর অন্তরের বেদনার বহিঃপ্রকাশ নেই, পরিপূর্ণ ধীর ও স্থির। একভাবে বসে বেলা দুটো পর্য্যন্ত সমানে বাতাস করে চললেন।

স্বামিজীর দেহ নীচে নামিয়ে আনা হল। নূতন গৌরিক বস্ত্রে দেহটি আচ্ছাদিত করা হল ফুলের মালায় সাজানো হল, তারপর আরতি করা হল, তাঁর নির্দ্দেশমত গঙ্গাতীরে বিল্ববৃক্ষের সমীপে নিয়ে যাওয়া হল।

সকলের অনুসরণ করে নিবেদিতাও এলেন সেখানে। শয্যার উপর যে বস্ত্রখানি ছিল তা শেষবার স্বামিজীকে পরতে তিনিই দিয়েছিলেন।

এটাও কি অগ্নিসাৎ করা হবে? এই প্রথম মৌনতা ভাঙলেন। উত্তরে স্বামী সারদানন্দ জানালেন : তিনি এবস্ত্রখানি তাঁকে দিতে পারেন। কাজটি শোভনীয় কিনা মনে সংশয় থাকায় তা গ্রহণে রাজী হলেন না। মনে হয়েছিল, জো (ম্যাকলাউডের) জন্য যদি ঐ বস্ত্রের একটুকরো কেটে নেওয়া যায়! ধীর মাতার (মিসেস বুল) কথাও স্মরণে এলো। কয়েকমাস মাত্র আগে তিনি চলে গেছেন এটাও তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। জগতে কতই না অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। কত বিচিত্র আলোড়ন মনে —জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলেন।

সন্ধ্যা প্রায় ছটা, সহসা মনে হল কে যেন তাঁর জামার আস্তিন ধরে টানছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন : জ্বলন্ত চিতার মধ্য থেকে তাঁর প্রার্থিত বস্ত্রখণ্ডের একটা টুকরো তাঁর পায়ের কাছে সরাসরি উড়ে এসে পড়েছে। সাগ্রহে সযত্নে তুলে নিলেন সেটি।

চোখের সামনে যিনি ছিলেন— আজ আর তিনি নেই। পড়ে রইলো সেই অতীত দিনের স্মৃতিপথের নিদর্শনরূপে।

ফিরে এলেন বোসপাড়ায়। বিশ্বভূবন তাঁর বিচূর্ণ। মহাশূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত তিনি। ডাইরীটি তুলে নিয়ে লিখলেন : 'Swami dead'.

•

মঠ, শোকে মূহ্যমান। আর তিনি স্তব্ধ একা। একেবারে একা— শুধু চোখের পাতায় ভাসছে তাঁর অপূর্ণ কাজের দায় ও দায়িত্ব। পূর্ণ, হ্যাঁ... পূর্ণ তাঁকে করতেই হবে আর সেটাই হবে তাঁর শোকের শেষ-অশ্রু-বিসর্জ্জন।

ইয়ুরোপ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে যে আগুন জ্বলেছিল তাঁর অন্তরে, সেটা তো তাঁরই বাসনার স্ফুলিঙ্গ। অথচ সেই স্ফুলিঙ্গ দেখে বিচলিত হয়েছিলেন তিনি। অবশ্য তখন তাঁর ভগ্ন দেহ, দীর্ঘ রোগক্লান্ত-অবসন্ন-মন। তাঁর সে মত ও পথের দিশায়, সাময়িক পার্থক্য দেখা দিয়েছিল মাত্র! তিনি চেয়েছিলেন প্রস্তুতির অবকাশ আর তাঁর পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল বিপ্লবের ঝটিকার বেগ। কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল একই! আজ এই মহাশূন্যতায় নিক্ষিপ্ত জীবনে, তাঁর অবলম্বন কি? স্বপ্ন সফল করতে হলে পথ তো একটা বেছে নিতে হবেই! স্বামিজী, জীবনের শেষের দিকে মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন আর সে-গঠনের পিছনে ছিল মূল লক্ষ্য কি? ত্যাগীর সৃষ্টি। ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনে, নিজেকে আহুতি দেওয়া— দেশ ও দেশবাসীর জন্য। তা হলে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য শুধু গতিবেগের। ঝটিকার আবর্ত্ত, সৃষ্টি করে গতিবেগ। সেই গতিবেগই উড়িয়ে নিয়ে ছোটে, ভাঙে গাছপালা, ভাঙে বাড়ী, সৃষ্টি হয় নোতুনের।

জাগতে হবে, জাগাতে হবে— তারজন্য চাই প্রাণবেগ। আর এই প্রাণবেগের সৃষ্টি হয়, জঙ্গী নীতিতে। প্রাণ চাই, বলিদানও চাই, তবেই সার্থক সৃষ্টি হয়। মৃত্যু আছে বলেই তো, জীবনের জয়গান সার্থকতা লাভ করে! ভয়ে পিছিয়ে থাকলে, কি জীবনকে উপভোগ কর যায়? ...না ...না পিছলে চলবে না, হাঁটতে হবে সমুখ পথে! যে আদর্শের চেতনা যুগিয়ে গেছেন তিনি, সেই চেতনাই হোক আজ পাথেয়। জয়, না হয় মৃত্যু- দুয়ের একটা পথ বেছে নিতে তাঁকে হবেই।

স্বামিজী বিদায় নেবার আগে, নিজেকে দুভাগ করে দিয়েছিলেন —রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেত্রে, ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের মধ্যে। একজন ব্যবস্থাপক বা পরিচালক, অন্যজনকে সম্পাদক-রূপে। অবশ্য নিবেদিতার নিজস্ব চিন্তাধারা ছিল অন্যরূপ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ হোন আধ্যাত্মকেন্দ্রের কর্ত্তা। আর স্বামী সারদানন্দ জাপানে কিছুদিন অতিবাহিত করে আমেরিকায় যান সেখানের দায়িত্ব তুলে নেওয়ার জন্য। তাতে, ক্রিস্টীনীর কাজের (শিক্ষার) জন্য টাকা তোলার অধিক সুবিধা, এমন কি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চারদিকে তরুণ বয়স্কদের স্থাপন করার দায়িত্ব তাঁকেই সমর্পণ করা উচিত। তিনি কাজের মানুষ নিঃসন্দেহ, তথাপি সংগঠনের কাজ ও দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ, মঠের

সর্ব্বাঙ্গীন সুপ্রতিষ্ঠার কায়েমী প্রচেষ্টা। যে সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি তাঁকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন, স্বামিজী, বিদায় নেওয়ার কয়েকদিন পরেই, শুরু হয়ে গেল সংঘাত। একপাশে মঠ ও তার কর্ম্মধারা, অন্যপাশে তাঁর স্বকীয় আদর্শ।

৪ঠা জুলাই স্বামিজীর দেহত্যাগের খবর ৬ই জুলাই সংবাদপত্রে সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হল। ৮ই জুলাই তিনি ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে মঠে গেলেন। মঠ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায় পুর্নবিবেচনা করার অনুরোধ জানালেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় স্বামিজী নিজেই স্থির করেছিলেন : মিশনের কাজ হবে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জনসাধারনের সেবা, রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকবেনা (The aims and idials of the mission being speritual and humanitarian, it shall have no connection with politics)। তিনি রইলেন তাঁর কর্ত্তব্য পথে অনড়, নীতিগত ভাবে মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ সে রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত। বোঝাপড়ার জন্যই আজ তাঁর মঠে আগমন। তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি, উভয়ের পক্ষে আলোচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো।

৭ই জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন: আগামী সপ্তাহে টাকাকড়ির ব্যাপারে পরিষ্কার করে লিখতে সমর্থ হবেন। ওকাকুরার পিছনে তাঁর প্রদত্ত টাকার ব্যয় হচ্ছে প্রচুর। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একান্ত অবসন্নপ্রায়। (স্বামিজীর অকালমৃত্যুর সংবাদ অবগত হয়ে ম্যাকলাউড ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এসংবাদ অবগত হয়ে) লিখলেন : যে কোনভাবে তাঁর বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজন। কারণ তাঁর চাইল্ড (ওকাকুরাকে) বিশ্বাস করতে হবে ও সুযোগ দিতে হবে, প্রমাণের জন্য, স্বামিজী বিদায় নেওয়ার কয়েকদিন পরেই, বর্ত্তমানের কাজে কতখানি নির্ভরশীল তিনি। তাঁর সহযোগীতার উপরেই বর্ত্তমান কর্ম্মনীতির যাবতীয় কিছু নির্ভর করছে। স্বামিজী বলুন বা না বলুন, ভারতের স্বাধীনতাই আসল কাজ। তোমার এই অপূর্ব্ব জলন্ত ভালবাসার ছোঁয়া কতই না চাই আমি! যে মানুষটিকে তুমি দিয়েছ, সর্ব্বাংশে কত না মহৎ।

১০ই জুলাই ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : গ্রিগুলের সাহায্যে ডাঃ বসুর মারফৎ তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।

১০ই জুলাই পুনরায় মঠে গেলেন। ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল— তখনও মনস্থির করতে পারলেন না। নিজের কার্য্যকলাপের কথা খুলে বললেন। তাঁর স্বভাব : বক্তব্যকে প্রচণ্ড তোড়ে ছবির মত ফুটিয়ে তোলা— স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে এটা অন্তরায়, কারণ তিনি ভাল ইংরাজী জানতেন না, সব কথা যে বুঝছেন না, তাও বলতেন না। তিনি গভীর আলোচনার ধারে না গিয়ে, সস্নেহে হেসে শুধু বললেন : মা খুব ভাল করেছ। নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে উৎসাহ দিলেন : অগ্রাভিযান যেন অব্যাহত থাকে। একটু থেমে বললেন : তোমার এ কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দর কাজ নয়— বলে, সহযাত্রী অনেকেই তোমার মন ভেঙে দিতে চাইবে, — তাদের কথায় কান দিওনা। সমস্ত জগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও সঠিক যা বুঝেছ- তা ছেড়ো না ....আলোচনা ক্রমে, তলিয়ে গেল ধ্যান তন্ময়তায়।

আধঘণ্টা পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ চোখ খুলে তাকালেন, নিবেদিতা তখনও নিস্পন্দ— অক্ষুব্ধ শান্তি পারাবারে ডুবে রয়েছে।

ম্যাকলাউডকে চিঠি লিখলেন : ওকাকুরার মধ্য দিয়ে জাপান ভারতের সেবা করছে। জোবে এই ব্যবস্থাপনার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

স্বামিজীর উপস্থিতিতে যা ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। ঘনীভূত চরম সঙ্কটের সম্মুখীন তিনি। সমস্যা ও দ্বন্দ্ব কত গভীর বর্ত্তমানে। কে পরামর্শ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করবে বা নির্দ্দেশ

দেবে কোন পথ শ্রেয়! প্রাণের বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ব্রহ্মানন্দকেও শ্রদ্ধা করেন, ভালওবাসেন, অথচ সেই সঙ্ঘ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চলেছেন— এ বেদনাও মর্ম্মান্তিক— নিজস্ব কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তনও সম্ভব নয়। সত্য বলে যা উপলব্ধি করেছেন, তার কাছে খাঁটি তাঁকে থাকতেই হবে।

অসহনীয় এ বেদনা! শান্তি কোথাও নেই, মঠেও নেই, শোকের অবকাশও নেই। কর্ম্মপ্রবাহে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছাড়া জীবন ধারণ অসম্ভব প্রায়। মিসেস লিগেটকে লিখলেন : আমাদের প্রিয় আরাধ্য চলে গেছেন চিরদিনের মত। জীবনের সান্ধ্য বেদনা সমাপ্ত, পৃথিবীর নীরবতা, মুক্তির সম্ভাবনা শেষ, তাঁর প্রকৃত সেবা করার জন্য, হৃদয় আমার অধীর— পরিণাম যাইহোক! একাজের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা যদি করতে হয়, তাতেও আনন্দ পাবো। তাঁর কাজ করার জন্য শক্তি, বিশ্বাস ও জ্ঞানলাভ করি— এটাই প্রার্থনা। - এর বেশী আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষা নেই— আর কিছুই চাই না। আমাদের প্রিয়জন মারা যান নাই, সঙ্গে আছেন আমাদেরই সঙ্গে। শোকের অবসর নেই, শুধু কাজ করে যেতে চাই আমি।.....

মিস ম্যাকলাউডকে ১৬ই জুলাই ১৯০২ লিখলেন— ডঃ বসুর মারফৎ আমার পাঠানো বার্ত্তা কি পেয়েছিলে?

১৬ই জুলাই ম্যাকলাউডকে জানালেন : রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বামিজীর সঙ্গে মতভেদ ও তাঁর দেহ ত্যাগের পর মঠের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। সেই সঙ্গে আত্মভিমানের সুর : তাঁর মূল ভাবাদর্শকে বহনের মূল অধিকারী একমাত্র তিনিই।..... হ্যাঁ তুমি নিগুর বিষয়ে যা বলছ তা ঠিক। নিগুর মত ও ঠিক বলে আমার নিশ্চিত ধারণা। কিন্তু তাঁর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে পথের পার্থক্য এমন চূড়ান্ত যে, মঠ থেকে আমি পুরো বিচ্ছিন্ন। আমি অনুভব করছি- এক্ষেত্রে স্বামিজী আমাকে যে যথার্থ মিশন দিয়েছিলেন- তাকেই বহন করছি, যদিও তিনি স্বয়ং দৈহিক অস্তিত্বের উৎপীড়নে, শেষের দিকে ভিন্নতর চিন্তা করেছিলেন।

আমার কথা বুঝতে পারছো? আমার নিশ্চিন্ত ধারণা তুমি বুঝবে। সেই তদানুযায়ী কাজ করবে। আমিও নিশ্চিত বোধ করি যে, তুমি সবশেষে যেকথা বলেছিলে, তা তোমার মনে সর্ব্বদা জাগরুক থাকবে "ঐক্যবদ্ধ থাকলেই খাড়া থাকবে, ভেদ এলেই পতন"। বহু সময়ে ঐ কথাগুলো আমার কানে বেজে উঠছে, তা নিগুকে সরে যেতে না দিতে, সতর্ক করছে। ওকাকুরা মনে করে : সন্ন্যাসীদের অত্যধিক সতর্কতা ও যুক্তিনির্ভরতা সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশের কারণ হয়েছে। ওঁরা (সন্ন্যাসীরা) মনে করেন আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংশের পথে যাচ্ছি। এরবেশী আমি আর বলতে পারবো না।

ওকাকুরার আরও হাজার টাকার প্রয়োজন। প্রিয় য়ুম, তোমাকে ছাড়া চলবে না। সুতরাং আমাদের সকলের জন্য, সুস্থ হয়ে ওঠো, সর্ব্বোপরি ভাল হয়ে ওঠো কাজের জন্য! আমাদের বিশ্বাস সঞ্জীবিত রাখো, আমাদের মনে জাগারুক রাখ যে : ঐ বিশ্বাস ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় কাজ করবো, কোন বিশ্বাসঘাতকতা হবে না—হতেও পারে না।

এখন মঠে কান্নাকাটি ও পূজা প্রার্থনায় তাঁরা ডুবে আছেন। অসুস্থতা বা ঝোঁকের মাথায় তিনি যা বলেছিলেন, তার মধ্যে সবাই ডুবে পড়তে চায়— বুঝতে পারছো? ঐ কথা চিন্তা করলে আমি যেন বদ্ধ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কিন্তু ওঁরা, নিজেদের পথ নিজেরাই করে নেবেন।

হে স্বামিজী! প্রিয় স্বামিজী! আমাকে শক্তি দিন! যাতে আমি আপনার গভীরতম আকাঙ্ক্ষারে সফল করতে তুলতে পারি! আপনার ব্যক্তিগত খেয়াল অথবা দুর্ব্বলতা প্রসূত আকাঙ্ক্ষাকে নয়! আমি মনে করি, তুমিও কি মনে কর না মহান শিষ্যত্বের সঙ্গে দীন শিষ্যত্বের পার্থক্য সর্ব্বদা সূচিত হয় আচার্য্যের ব্যক্তিগত নয়, নৈর্ব্যক্তিক দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করার শক্তির দ্বারা। যদি অ্যালবার্টা (ম্যাকলাউডের বোনঝি) মিসেস রোয়েথার্লিস বার্জারকে (মিষ্টিক নারী) চিঠি লেখে,

তাহলে সে কি আমার হয়ে একটুকরো কাগজ বা অনুরূপ কিছু তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবে, যেটিকে ধরে তিনি আমার জন্য বার্ত্তা পাঠাবেন- সত্যই আমি ঠিক পথে চলছি কি না?

যা স্থির ছিল তার থেকে কত না পৃথক হয়ে গেল সব ব্যাপারটি। স্বামিজী দু'মাস আগে কত না ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলেন, আর মঠের লোকেরা নিশ্চিতভাবে মনে করেছিলেন, তিনি যা করতে বলছেন, আমার তাই করা উচিত। কিন্তু আমি এখন যা করছি তার থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি না। আমি এখন আদর্শ মূর্ত্তি। এখন নতিস্বীকার করার চেয়ে মৃত্যুও সহজতর!.....

... কী অসাধাবণ মহান হয়েছিল সে দৃশ্য— তা কি জানো? শত্রুরাও রুদ্ধশ্বাসে পূজা করছে। সান্ধ্য ধ্যানের অন্তে, নিঃশব্দে দেহত্যাগ জীর্ণ বস্ত্রের মত। "আমার মরণ হবে হর! হর! হর! বলতে বলতে চলে যাবো" বহুদিন আগে বলেছিলেন মনে পড়ে। সে কথাই সত্য হল। মালা এখনও শুকোয়নি, কর্ম্ম অটুট— সবই ঠিক আছে বলে, চলে গেলেন।

স্বামিজী! স্বামিজী! আপনার অন্তরের অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ করতে পারি! আপনার ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার অনুসরণের পরিবর্ত্তে, মহান শিষ্যত্বের সঙ্গে দুর্ব্বল শিষ্যত্বের পার্থক্য হল : প্রথম ক্ষেত্রে আচার্য্যের নৈর্ব্যক্তিক দিকেরই, ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয়— ব্যাখ্যা করা হয়।

যা হওয়া উচিত ছিল, তার থেকে কত বদলে গেল। দু'মাস আগে তিনি কত না কষ্ট হয়েছিলেন, আর সন্ন্যাসীরাও কত নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেছেন তাই আমার পালন করা উচিত কিন্তু এখন যা করছি- তা না করে পারলাম না। আমি এখন ভাবরূপ, আমার পক্ষে অন্যকিছু মেনে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যু অধিকতর সহজ।

আর বেশী লিখবো না। সমস্ত পৃথিবীটাই পূজারত। কিন্তু জানি : তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ-পূজা-মন্দির তোমার হৃদয়। তুমি পীড়িত আর তোমাকে ক্লান্ত করবো না!....

'আইডিয়ালস' বইটি রচনায় ... নিবেদিতা, তাঁর ভারতব্রতের অন্তর্গত কাজ বলে ধরে নিয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউডের সহায়তায় বইটির সূচনা; পরে তাঁর তত্ত্বাবধান—তাই কখনো কখনো ওকাকুরা ও মিস ম্যাকলাউডের উভয়ের সৃষ্টি মনে করতেন। ১৬ই জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে জানালেন, 'সেন্ট সারা' (মিসেস বুল) সদ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন তোমার পরবর্ত্তী চিঠি বলে পাঠাবে- তোমার ও নিগুর বই প্রকাশের জন্য (জন মারে কর্ত্তৃক) গৃহীত হয়েছে। লাভ আধাআধি। অবশ্য বইটির কিছু কেটে দিয়ে প্রকাশে রাজি আছেন এঁরা। ১৬ই জুলাই, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন— ডঃ বসু মারফৎ তোমাকে পাঠানো বার্ত্তা কি পেয়েছিলে?

১৭ই জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে, তাঁব অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য পত্র দিলেন! ১৮ই জুলাই উত্তর এলো : প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী,আজ সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেলাম। তার প্রাপ্তি-স্বীকার করছি। আপনি সঙ্ঘের ও আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করুন। ব্যাপারটি বেদনা দায়ক, তথাপি আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন— তাতে আমার সম্মতি অছে।... বিশ্বাস আছে, আপনি ও সঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমার শ্রীগুরুর ভস্মাবশেষের বেদীমূলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভুলবেন না।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে যথাসম্ভব সহজভাবে আমার নূতন পরিস্থিতির বিষয় জানিয়ে দেবো।

কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততাসহ রামকৃষ্ণের নিবেদিতা

কন্যাকুমারীর শেষ প্রান্তে বসে ধ্যানমগ্ন স্বামিজী দেখলেন : তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সাগরের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে অনুসরণের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। এর পরই তাঁর ধর্ম্ম-মহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যাত্রা ১৮৯৩ সালে। এই মহাসম্মিলনের শেষ

থেকেই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচারের শুরু। ১৮৯৫ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত একাদিক্রমে প্রচারের শেষে ইংলণ্ড থেকে আমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারিস হয়ে ১০ই সেপ্টেম্বর পৌঁছলেন ইংলণ্ডে। নভেম্বরের মাঝামাঝি এক ড্রইংরুমে ধর্ম্মীয় আলোচনার বৈঠকে সাক্ষাৎ হল মিস মার্গটের নোবলের সঙ্গে। সে বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সে আলোচনাকে মামুলি বলে এড়িয়ে গেলেও - একজনের জিজ্ঞাসুচিত্তকে আলের সন্ধান দিতে সমর্থ হলেন। তিনি তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় যোগদান করলেন, বার বার প্রশ্ন তুলে চিত্তবৃত্তির মীমাংসা খুঁজে চললেন। মনের সেই সংযোগ ক্রমশঃই ঘনীভূত হতে লাগলো।

স্বামিজী পেলেন অগ্নিশিখার সন্ধান। আর একজন পেলেন ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকের মধ্যে দেবত্বের প্রতীক। স্বামিজী চেয়েছিলেন তাঁর সহযোগীতা আর অন্যজন ব্যাকুল হলেন আত্মোৎসর্গে ৭ই জুন ১৮৯৬। ব্যাপৃত রইলেন তাঁর বেদান্ত প্রচারের কাজে সুদূর ইংলণ্ডে। এরপর স্বামিজী পুনরায় ফিরে গেলেন আমেরিকায়। ভারতে ফিরলেন ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৬ সালে।

স্বদেশে ফিরে তিনি আর একটি দেশীয় বিদুষী মহিলার সন্ধান পেলেন। তাঁকে ৬/৪/৯৭ ও ২৪/৪/৯৭ তারিখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভারতীয় নারী শিক্ষার কাজে আহ্বান জানালেন।

তাঁরও স্বামিজীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, তাঁর কাজে আত্মনিয়োগের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেও নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনে।

নারী জাগরণ ছাড়া দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। চাই শিক্ষা। শিক্ষাই জাগরণের মূল ভিত্তি ভূমি। স্বামিজীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন মিস নোবল। ভারতবাসীর সেবায়, আত্মনিয়োগে ব্যাকুল তিনি। স্বামিজীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। মিললো সেই অনুমতি, ২০শে জুলাই ১৮৯৭ সালে। আর তিনি ভারতের মাটিতে পা দিলেন ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সাল (কলকাতায়)।

স্বল্পদিনের মধ্যে কর্ম্মধারায় শিক্ষিত সমাজে নিজের স্থান করে নিলেন মিস নোবল বিশেষ করে, ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে। যদিও মিশনের উদ্দেশ্য দেশের সেবা, ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ 'সমাজ' সংস্কার আর ছিল সেইসূত্রে স্বদেশের জাগরণ। মিস নোবল চাইলেন উভয় সংঘ মিলে মিশে কাজ করুক। স্বামিজী জানতেন, এ চেষ্টা বৃথা, কিন্তু নিরুৎসাহ করলেন না। সমাজে মেলামেশার দিলেন অবাধ স্বাধীনতা। তিনি ভারতে ফিরলে, একমাত্র আনন্দমোহন বসু ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করলেন না। বরং তাঁরা হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা ও বিরূপ সমালোচনায় নানা কুৎসা প্রচার করে চললেন। এরপরই হল তাঁর নবজন্ম—সর্ব্বত্র পরিচিত হলেন নিবেদিতা ওরফে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা' নামে।

১৯শে জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হল : জনসাধারণকে একথা অবগত করানোর জন্য আমরা অনুরুদ্ধ হয়েছি যে স্বামী বিবেকানন্দের শোক দিবস সমাপন্তে বেলুড়মঠের সদস্যগণ ও ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে স্থির হয়েছে : এরপর ভগিনী নিবেদিতার কার্য্যাবলী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, মঠ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

একটা আলোড়নের ঝড় বয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত স্বামিজীর দেহত্যাগ, তারপরই সংঘ থেকে নিবেদিতার সম্পর্ক ত্যাগ। শিক্ষিত ভারতবাসীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা যে সংঘকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, শোক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশেই নিবেদিতার নাম উল্লেখ ছিল, এবং স্বামিজী প্রয়াণে সে দায়িত্ব যে তিনিই বহন করবেন এমন কথার উল্লেখ ছিল সর্ব্বত্র, সেই সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁরই সম্পর্কচ্ছেদ! একদিকে হতাশা, অন্যদিকে উল্লাস। অপরদিকে অযাচিত সহানুভূতি নিবেদিতার প্রতি।

সঙ্ঘবিরোধীদের উল্লাস, মিশনের উপর আক্রমণ, স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর প্রচণ্ড আঘাত, ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা, শ্রীযুক্তা সরলা ঘোষালের সম্পদকীয় কটূক্তি, আবার অন্যদিকে

নিবেদিতার অকুণ্ঠ প্রশংসা : স্বামিজীর পরিত্যক্ত দায়িত্ব গ্রহণের উত্তরাধিকারিণী (কাল্পনিক) বেলুড়মঠে অধ্যক্ষা ইত্যাদি..... ইত্যাদি.....

প্রচারাভিযানে ব্যথিতা ও শোকাভিভূতা নিবেদিতা এইসকল মন্তব্যের ও সঙ্ঘের উপর আক্রমণের উত্তর দিবার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

ইতিমধ্যে স্বামিজীর স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য নানাজায়গা থেকে অনুরোধ আসছিল। নিবেদিতা ১৯শে জুলাই যশোর যাত্রা করলেন। সেখানে তিনদিন অবস্থান করে স্বামিজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

অহরহ চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। স্বামিজীর অভিপ্রেত কর্ম্ম : নারীজাতির শিক্ষা ব্যবস্থা। সে কাজেও হারিয়েছেন পূর্ব্বের সেই উৎসাহ। মন কিন্তু সে কাজ ত্যাগ করতে চায় না! মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। সমস্ত পরিকল্পনা 'বিধবা আশ্রম বা অনাথ আশ্রম স্থাপনের আশা, তিরোহিত। মনে প্রশ্নজাগে : প্রাচ্য নারী-জীবনের গতি, যে-খাতে বয়ে চলেছে তার গতি পরিবর্ত্তনের, অধিকার কি তাঁর আছে? দশবারোটি মেয়ের মধ্যে শিক্ষা বা আদর্শ প্রচারে লাভ কতটুকু? বরং পুরুষের মত মেয়েদের মধ্যে জাতীয়-চেতনা সঞ্চার করে, বৃহত্তর সমস্যা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি অবহিত করা যায়, তা কি বহুগণে বেশী কার্য্যকরী হবে না? নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চার করতে পারলে তারা নিজেরাই তো বুঝতে সক্ষম হবে, তাদের প্রয়োজন কি? এযুক্তি হয়তো ভ্রান্ত কিন্তু তাঁর কাজ কি? কাজ : জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা কয়েকটি মেয়েকে প্রভাবিত করা নয়। সফলতা বা অনিশ্চত অযোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন তবু কাজে শৈথিল্য করা উচিত হবে না। তবে উত্তীর্ণ হওয়ার ভার মহামায়ার উপর। স্বামিজীই তো বলেছিলেন : মহাপুরুষ যখন তাঁর কর্ম্মীদের প্রস্তুত করে তোলেন —অন্যত্র তাঁর সরে যাওয়া উচিত। কারণ তাঁর উপস্থিতিতে কর্ম্মীদের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়ে থাকে!

২৪শে জুলাই ম্যাকলাউডকে লিখলেন : 'নারী তৈরীর কাজকে' নিজের কাজ মনে করতে পারছি না। ভাবছি : ১০/১২টি মেয়েকে তৈরী করে বিশেষ কোন সুরাহা হবে! পুরুষের মত নারীদের মধ্যে জাতীয়-চেতনা সঞ্চারিত করে, তাদের বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করাই আজ উচিত কাজ।

জাতিকে কাজে লাগানোই আমার কাজ, মাত্র কয়েকটি নারীকে প্রভাবিত করা নয়। একটি মানুষ এসে, আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে সে-কাজ করতে পারি। তবে সেটা আমার তরবারির বাড়তি ধার দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কারণ আগেই ওজিনিষ আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

হ্যাঁ, আমার কাজের কথা : আমি সফল নাও হতে পারি, যেভাব অমি অনুভব করছি, তুমি সেভাবে, অনুভব করতে পারবেনা কদাপি ভাবতে পারবে না- সে কী অসম্ভব কাজ, আর কত না আমার অসমর্থ্যতা। কিন্তু তাতেও কি উল্টো ঘটবে— আমি কি কাজ ছেড়ে দেবো? মাতৃসমুদ্রে আমরা কি ঝাঁপ দিয়ে পড়বো না? কোনদিন তটে উত্তীর্ণ হতে পারবো কিনা, সে ব্যাপারটা কি মহামায়ার হাতে ছেড়ে দেব না! কেন তিনি (স্বামিজী) ঠিক এই সময়টিতে নিজেকে সরিয়ে নিলেন? তা কি প্রতিটি পরমাণু, যাতে তাঁকে যন্ত্রণা না দিয়ে অব্যাহতভাবে করে যেতে পারি, সেইজন্য না? তাঁর জীবন প্রবাহ যে বিরাট ভবিষ্যতের দিকে আমাদের চালিত করছে। তাঁকে যাতে পেতে পারি, সেইজন্য নয় কি?

সম্ভাব্য কর্ম্মীদের সঙ্গে কোন ধরণের ব্যক্তিগত আলোচনায় আগ্রহী জানাচ্ছি : আমি তাদের কাছে 'গেডেস ভঙ্গীতে, সমাজনীতি বা অনুরূপ বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছি।' তাদের ভাবাতে চেয়েছি জাতীয় কংগ্রেস বা সরকার সম্বন্ধে কী, তুমি জানোই।

ওকাকুরার আত্মতুষ্টি রাজতন্ত্রে (জাপানী রাজতন্ত্রের অনুগামী দেশপ্রেমিক) আর আমি অনুগত্যহীন ইংরাজনারী (বর্ত্তমান সময়ে) অবশ্য একদিন গোঁড়া রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলাম, এর জন্য স্বামিজীর সঙ্গে প্রথম জীবনে ঘোরতর মানসিক সংঘাত চলেছিল।

জানাচ্ছি : আমাদের রাজপরিবার, সাম্রাজ্যবাদী শাসন পদ্ধতির যে চূড়ান্ত শিখরকে কল্পনায় আনা যায়— তারই চরম বিন্দু আগাপস্তা পরজীবি বুর্জোয়া।

২৪শে জুলাই ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমার জীবন সম্বন্ধে সেন্ট সারার ধারণা আমাকে কুঁকড়ে দেয়। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে কারো জন্য ব্যক্তিগত ভালবাসা বোধ করা অসম্ভব। স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হোক, কাজ হোক একথা নিজেকে বলেছি বার বার, কিন্তু ওভাবে আর নয়, যদি তা না হয়, তাহলে আমি তাঁর (মিসেস বুলের) উপস্থিতি এখানে চাইবো কিন্তু কাজ আমি একলাই করবো।

ওঃ য়ুম, তুমি দৈবী, কারণ তুমি আমার প্রতিটি কথা বোঝ। যে সাহায্য দিয়েছি, তার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি তাঁর জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছি। ভাবছি, তাকি ভাল হয়েছে! আমি তাঁর (মিসেস বুলের) বিবেচনাকে বিশ্বাস করিনা, তুমিও করো না। তিনি নিজের ইচ্ছার গোটা ভার চাপিয়ে দেবার ক্ষেত্রে একেবারে বিবেচনাহীন।

২৭শে জুলাই মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকায় বেরুল জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ভূমিকা : (The National Significance of the life of Swami Vivekananda)

পৃথিবীর কাছে 'বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত মানুষটির দৈহিক অস্তিত্ব এখন একমুষ্টি ভস্মমাত্র। পাঁচ বছর ধরে আমাদের নদীতীরে যে আলো নিঃসঙ্গে জ্বলেছে, তা নিব্বাপিত। দেশে দেশে প্রতিধ্বনিত সুমহান স্বরধ্বনি— মৃত্যুতে নীরব। এক বিশাল আত্মার কাছে জীবন এনেছে ঝঞ্ঝা, হেনেছে আঘাত, সমাপন— কিন্তু শান্তি! শান্তি! সান্ধ্য অরাত্রিকের শেষ শব্দ যখন মিলিয়ে গেল— ঘনিয়ে এলো মহাকালীর মহারাত্রী— তখনই এল মৃত্যুর আশীর্ব্বাদ, নিঃশব্দে। আহত, ক্লান্ত, দেহ শায়িত রইল, বিজয়ী আত্মা ফিরে গেল 'নিজ নিকেতনে' চির-সমাধিতে ।

তিনি চলে গেলেন— প্রথম সাফল্যের মালা কণ্ঠে এখনও অম্লান। তিনি চলে গেলেন, যখন নূতনতর, বৃহত্তর আহ্বান কর্ণে ধ্বনিত। মধ্যে দু'একবারের কথা বাদ দিলে, অসুস্থতায় বেশী সময় তাঁর কেটেছে নদীতীরের সুদৃশ্য আবাসে। অবহেলায় বিশাল খ্যাতিকে উপেক্ষা করে তিনি সেখানে থাকতেন উদ্যানের বৃক্ষলতা পশুপাখীর মধ্যে, আর শিক্ষা দিতেন সমবেত শিষ্যদের সহজ ছন্দে। নিজের করণীয় কর্ত্তব্যকে কঠোরভাবে সংযত করে বলতেন: 'মানুষ তৈরীই' আমার ধর্ম্ম। আর সেই মানুষ তৈরীর কাজ করেছেন দিনের পর দিন, আব্যাহত পরিশ্রমে— গুরুরূপে, পিতারূপে, শিক্ষকরূপে, যখন যেভাবে প্রয়োজন, সেইভাবে। তাঁর বিদায় দিনের অপরাহ্ন পর্য্যন্ত কি তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের শিক্ষাদান করেননি তিন ঘণ্টা ধরে? এমন মানুষের কাছে বাইরের সম্মান বা নেতৃত্বের গৌরবের মূল্য কিছুই নয়। পাশ্চাত্যবাসের সময়, ধনী ও প্রতিপত্তিশালী অনেক বন্ধু তাঁর হয়েছিল, যাঁরা পারলে সানন্দে তাঁকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতেন। কিন্তু তাঁর কাছে সমস্ত বিলাস ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও প্রাতীচ্য পৃথিবী আকর্ষণহীন। ভিক্ষুকের জীর্ণকন্থা, কলকাতার নোংরা গলি, স্বজাতির অক্ষমতা অনেক বেশী প্রিয় তাঁর কাছে— বিদেশীয় গৌরবময় জীবনের তুলনায়। প্রাচ্য-অভিমুখে এই চিরযাত্রী, এঁকে পাশ্চাত্যে যাঁরা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, মুষ্টি তাঁদের আলগা করে দিতে হয়েছিলই। পাশ্চাত্য তাঁর কাছ থেকে কোন বার্ত্তা পেয়েছিল, যার জন্য মানুষ তাঁকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের অন্যতম বলে বন্দনা ও বরণ করেছিল? নিজের সপক্ষে বিশিষ্টতার দাবি তিনি করতেন না, ব্যক্তিগত জীবন কথা বলতে চাইতেন না। গুরুভাইদের অপেক্ষা অধিক

বিশিষ্টতা— তিনি দাবি করেছেন, এমনক কথা তাঁর মুখে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত ও আস্থাভাজন একজনও কখনো শোনেননি। বাইরের মানুষের কাছে কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের বিশেষ নাম বা কোন বিশেষ গুরুর পক্ষে প্রচার করতেন না। অপরপক্ষে, তাঁর মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম্মের বেগবান ধারা প্রবাহিত হত। যেন হিমালয়ের মহা রহস্য রাজ্য থেকে প্রত্যক্ষ আহূত নির্ম্মল পুন্যবারি তিনি বুদ্ধিজীবি, অধ্যাত্মরস পিপাসু পৃথিবীর মানুষের উপর বর্ষণ করতেন। ভারতের বিরাট বিচিত্র ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও পুন্যাত্মাদের প্রত্যক্ষে দর্শন অবশ্যই করেছেন। তথাপি তিনি উপনিষদ ছাড়া প্রমান্যরূপে আর কিছু উদ্ধৃত করতেন না, বেদান্ত ভিন্ন প্রচার করতেন না। আর মানুষের অন্তরাত্মা তাঁর কথা শুনে শিহরিত হয়ে উঠত, কারণ এই একজন ধর্ম্মাচার্য্যের কথা তারা প্রথম শুনলো যিনি : সত্যে ভীত নন।

শিবের সেই গানটি আমাদের জানা আছে : 'শিব পথ দিয়ে যাচ্ছেন, কেউ বলে তিনি পাগল, কেউ বলে দানব, আর কেউ বলে উনি কে জানোনা? স্বয়ং ঈশ্বর!' এইভাবে ভারত জানে প্রত্যেক বিরাট চরিত্র, বিরোধী আদর্শের মিলন ভূমি। শিষ্যদের কাছে বিবেকানন্দ চিরদিন সন্ন্যাসের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, তাঁর সকল প্রেরণার মধ্যে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রকাশই মুখ্য। 'আমার গুরু যেমন, তেমন আমিও যেন বিদায় নিতে পারি খাঁটি সন্ন্যানীরূপে, কামকাঞ্চন ও খ্যাতিতে 'নির্ব্বকার থেকে' তিনি একদা তীব্র আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন। 'ঐ তিনের মধ্যে খ্যাতির প্রলোভন, দূর করাই সবচেয়ে কঠিন' তিনি যোগ করেছিলেন। অথচ যে নিয়তি তাঁকে তীব্র বৈরাগ্যের জ্বলন্ত তৃষ্ণায় অস্থির করেছে, সেই নিয়তিই তাঁর মধ্যে গৃহীর আদর্শকে মূর্ত্ত করেছিল; পালনে ও রক্ষণে ব্যগ্র, পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন অনুধাবনে ও অনুধাবন করানোয় উৎসুক, জীবন সংগঠন ও ইতিহাস রচনায় অগ্রসর আদর্শ গৃহী। একদিক থেকে তিনি বাস্তবিকই Benedict, Bermard, Robart de citeaux এবং Layela-র সমগোত্র। একথা বলা যায়, ক্যাথলিক চার্চ্চের ইতিহাসে সেন্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসির অপ্রতিদ্বন্দী মহিমায় স্থাপন করলেন, এমন প্রচণ্ড যুক্তির সঙ্গে যে উক্ত ইংরাজ একেবারে তচ্‌নচ্ হয়ে গেলেন। এমনই সব ক্ষণে, যখন জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করছেন, তখন ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কোন মূল্যই ছিল না তাঁর কাছে। এমন মনোভাবকে সবসময়ে ন্যায় সঙ্গত বলা যায় না। ক্ষেত্র বিশেষে তা যথার্থই অপ্রীতিকর। কিন্তু কি প্রচণ্ড পৌরুষ, শত্রুরাও স্বীকার করবে। পুনশ্চ বলা যায়, বিবেকানন্দের কাছে ভারতের সবকিছু সমানভাবে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র: 'মুক্তিকামী সকলকেই এই ভূমিতে জন্ম নিতে হবে,' তাঁর ধর্ম্মবোধ স্নিগ্ধ নির্ঘোষে জানিয়েছেন। চিকাগোর বিশ্বমেলায় আগত যেকোন ভারতীয়কে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, পার্শী যাই হোক না কেন— যে বাড়ীতে তিনি অতিথি, যেখানে আপ্যায়নের জন্য হাজির করতে পারতেন, যদি সমাদরের কোন ত্রুটি হয়, বিবেকানন্দকে তৎদণ্ডে হারাতে হবে।

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি তিনি, তবু যখন দেখলেন: ভারত-উদ্ভুত এক ধর্ম্মের প্রতিনিধি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিনিধি অনাগরিক ধর্ম্মপাল নিজ ধর্ম্মের পক্ষে বক্তব্য সুচারুরূপে প্রকাশ করতে পারছেন না, তখন তিনি তাঁর জন্য ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন, যে ধরনের উচ্চাঙ্গের বক্তব্য নিজ ধর্ম্মের পক্ষে হাজির করা উক্ত প্রতিনিধির পক্ষে কদাপি সম্ভব ছিল না।

হাতে করে খাওয়ার মত হিন্দুজীবনের সহজ রীতিগুলি ইউরোপীয় শিষ্যগণকে শেখাতে তিনি অসম্ভব যত্ন নিতেন। ...'মনে রাখবে, যদি ভারতকে ভালবাসতে চাও, তাহলে সে যেমন আছে সেইভাবে তাকে মেনে নিয়ে ভালবাসবে,' নিজের মনোমত ভেবে নিয়ে নয়— তিনি প্রায় বলতেন।বাস্তব ভারতীয় জীবনযাত্রার মর্য্যাদার পক্ষে তাঁর প্রচণ্ড দৃঢ়তা, পর্ব্বতের মত উন্নত মহিমায় বর্ত্তমান থেকে, তাঁর অনুরক্ত ইউরোপীয় শিষ্যগণের নিকটে যে অপরূপ কাব্যের সৌন্দর্য্য ও শক্তিকে উন্মোচন করেছে, তার নাম ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনকাব্য। সদ্য দাঁত ওঠা

কোন মত বা পথের পক্ষে সোৎসাহ সমর্থন' জানানোর মত ব্যাকুলতা তাঁর কখনও ছিল না। প্রতি দেশের সর্ব্বোত্তম বস্তু, তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি পুরানো হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন। সরল জীবনের সৌন্দর্য্যে এতই গর্ব্বিত ছিলেন যে, পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেন নি। রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী. মৃত্যুর প্রায় দুদিন পূর্ব্বেও বলেছিলেন। ঐ কথা বলার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বহুবার বলা গল্পটি আবার বললেন : কিভাবে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত, ধুতি, চাদর, পায়ে খড়ম ঠক ঠক করতে করতে ভাইসরয়ের আলোচনা কক্ষে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁর বেশবাসে আপত্তি করা হলে, বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলেছিলেন, যদি আমার চালচলন এতই অপছন্দ, তাহলে আমাকে ডাকা হয়েছে কেন?

স্বামিজীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এইসব ঘটনার আকর্ষণ আছে। গুরুর কথা বলেই, এই কাহিনীগুলির মধ্য দিয়ে, কোন বিশ্বাসের মূর্ত্তি উন্মোচিত? কী তার লক্ষ্য? উত্তরে বলা যায়, 'তাঁর সমস্ত জীবন এক কথায় হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি অবিষ্কারের সাধনা'। এক পয়সার ডাকটিকিট, সস্তায় রেল ভ্রমণ, কাজ চক্ষার জন্য একটা সাধারণ ভাষণ, এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। যদি ভারতের সত্যই কোন মৌল ঐক্য থাকে, তা হলে ঐ সমস্ত জিনিষগুলি বড়জোর তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্ব্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন, প্রতিগ্রামে, ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন; প্রতিটি মানুষের কাছে। তার ফলে, যে ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গভীর ও ব্যাপক। এই মহাসন্ধানের সিদ্ধি গৌরবে মহীয়ান হয়েই তিনি ধর্ম্মমহাসভায় এবং তার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন: হিন্দু ধর্ম্ম একটি পরম সত্য ঘোষণা করেছে— 'মুক্তি'! আর হিন্দুধর্ম্মের সেই বাণী, যে কোন ধর্ম্মের বিরোধী আক্রমনকে প্রতিহত করতে সমর্থ। তাঁর স্বদেশবাসী অন্যদেশীয় মানুষের সমকক্ষ নয় এ কথা তাঁর কখনোই মনে হয়নি। ভারতের কেন্দ্রীয় জাতীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে ধর্ম্মের মধ্যে, একথা মনে রেখেও তিনি মনে করতেন, ভবিষ্যতে ধর্ম্মশক্তির সঙ্গে আরও বহু শক্তির অভ্যুত্থান হবে এদেশে।

বর্ণাশ্রম প্রথার সুগভীর অনুশীলন তিনি করেছিলেন। কথাবার্ত্তার সময়ে ঐ প্রথার আত্মবিরোধ কিংবা বৈশিষ্ট্যের বহুরূপ তিনি উন্মোচন করতেন। তিনি দেখেছিলেন, ভারতের ঐক্যের সূত্র আছে— তার আত্মসংরক্ষণে! সকল মুসলমানই একজাতি, সকল খ্রীষ্টানও তাই, কিংবা সকল পার্শীও। এদের মধ্যে পার্শীদের বাদ দিলে মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা জাতি প্রথায় অবিশ্বাসের দ্বারা এক জাতি। সেই কথাই বলা যাবে, ব্রাহ্ম-সমাজ বা সেইধরণের অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধেও। কিন্তু সকলেরই পশ্চাৎপট রচনা করে আছে সাধারণ মৃত্তিকায়, প্রাচীন সভ্যতার সুন্দর ঐতিহ্যের পুনরাবর্ত্তন আর জীবনের অনিবার্য্য প্রয়োজনগুলি যা সাধারণ প্রেম বা ঘৃণার সৃষ্টি করে।

প্রতিটি ভারতীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আশা আদর্শকেও তিনি কেবল শিক্ষা করেননি, তাদের গৌরব স্মৃতিকেও বরণ করেছিলেন। কলকাতার হিন্দুপল্লীর এই সন্তান, কলকাতার গঙ্গাতীরেই জীবন সমাপন করবার জন্য ফিরে এসেছিলেন তবু পাঞ্জাব সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপনা দেখে মনে হত পাঞ্জাবই বুঝি তাঁর জন্মস্থান, কিংবা একই কারণে রাজপুতনা বা হিমালয়খণ্ড এমনই অন্যত্রও। গুরু নানকের, মীরাবাইয়ের, তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কৃত হত তাঁর কণ্ঠে। পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ সিংহের বীরকাহিনী, দিল্লী বা চিতোরের ইতিকথা, শিব, উমা, রাধা-কৃষ্ণের বা বুদ্ধের জীবন গাথা জড়াজড়ি হয়ে থাকতো তাঁর মুখে। বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা, সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত। তাঁর প্রাণ, মন, আত্মা এক জলন্ত মহাকাব্য যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্যব্যাকুল।

বেলুড়ের বিশ্রাম কক্ষে বসে বিবেকানন্দ সর্ব্ব পৃথিবীর মানুষকে গ্রহণ করতেন প্রত্যক্ষে বা পত্রে। বাইরের কোলাহল নীরব হয়ে এলেও ভারতের হৃদয়ের গভীরে তাঁর অটল আসন। তাঁকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না কিম্বা কম ক্ষেত্রেই তেমন অভিপ্রায় ছিল। এমন কোন আশার বাণী ছিলনা তাঁর কানে বাজেনি, এমন কোন বেদনা ছিলনা যা তিনি জানেন নি, তিনি চেয়েছেন এরমধ্যে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে, উদ্দীপিত করতে। ধর্ম্মনেতার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, তাঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁর দেখা ভারতের সঙ্গে, অন্যের দেখা ভারতের কোন ঐক্য ছিল না। কারণ তিনি মুঠিতে ধরেছিলেন যা অখণ্ড, ধূলীভূত, প্রাণগত। প্রাণের উৎসরণরহস্য তিনি জানতেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার ভাষা তিনি জানতেন। আর এই সকল জ্ঞানের দ্বারা তিনি নিশ্চিন্ত, স্পষ্ট আশা বোধ করতে পেরেছিলেন।

অন্যেরা যেখানেই ভুল করুক, তাঁর কাছে এদেশ নবীন। ভারতের ভাষাসমূহ অকর্ষিত, সম্ভবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভোযন্ত্রণা ও সহনের মধ্য দিয়ে আজ যে নবচেতনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাবী পরিবর্ত্তনের তা প্রথম সুরু মাত্র। তাঁর মতে, ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি। একথা সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে, সারা মানুষের পক্ষেই আশার বাণী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তিনি অপরপক্ষে, অন্যের সাহায্য ভিক্ষারী ছিলেন না। দানের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দাতারই, গ্রহীতার নয়। বাইরে থেকে তিনি আশাও করতেন না, আপষও নয়। ভারতের আত্মিক স্বরূপের পুনর্ঘোষণা, সমুদ্রলক্ষ্যে জাতির প্রাণগঙ্গাকে নবপ্রবাহে সঞ্জীবিত ও উন্মিলিত করাই তাঁর সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য। তাঁর কাছে সন্ন্যাস মানে— পরিপূর্ণ সেবা ও আত্মদান। ভারত তাঁর কাছে, হিন্দু, আর্য্য, এশীয়। যে ভারতের যৌবনকামনায় আধুনিক সভ্যতার বিলাস দ্রব্য নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করতে পারে, সে অধিকার নিশ্চয় তার আছে কিন্তু প্রত্যাবর্তন সে কি করবে না? করবেই, কারণ তার প্রাণের গভীরে আছে নীতি, তপস্যা আর আধ্যাত্মিকতা। গঙ্গাতীরে প্রশান্ত চিত্তে যে জাতি মৃত্যু প্রতীক্ষা করে, তার পক্ষে দীর্ঘদিন যান্ত্রিক ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে বিক্ষিপ্ত চিত্ত থাকা সম্ভব নয়।

বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন — তার ফলে ভারত দুই শতাব্দীর মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্যের রূপ ধরলো। সে ভারতে আবার সকল ধমনীতে তার জীবন-স্পন্দন অনুভব করুক। তাহলে জগতের কোন শক্তিই নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখীন হতে পারবে না। শুধু দেখতে হবে, ভারত যেন তার নিজস্ব জীবনের মধ্যে জীবন লাভ করে, অন্যের অনুসরণে নয়; বিদেশীর কাছ থেকে আদর্শ ধার না করে, সে যেন নিজের অতীত ইতিহাসের সত্যরূপের থেকে প্রেরণা পায়।

যে নিজেকে দুর্ব্বল ভাবে, সে দুর্ব্বল হয়ে যায়। যে নিজেকে শক্তিমান মনে করেছে, যে দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তাই জাতির জন্য, প্রতিটি মানুষের জন্যও বটে, বিবেকানন্দের একটি বাণী ছিল তাঁর কণ্ঠে নিশিদিন মন্দ্রিত। সেই মন্ত্র : 'ওঠো! জাগো! শ্রেয় লাভ না করে নিবৃত্ত হয়োনা' পরে এটি পুনর্মুদ্রিত হল ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০২ কলকাতা 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়। যশোরের 'ব্রহ্মচারিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হল (ইংরাজিতে) 'দেশ প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda as a Patriot)। পুনর্মুদ্রিত হল বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে ২রা অক্টোবর ১৯০২ :

স্বামিজীর দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য তা দেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। 'দেশ' কি নিয়ে গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে ভারতের সকল ধর্ম্মাচার্য্যের মত তাঁর ধারণাও জটিল ও ব্যাপক। বিদেশীদের চরিত্র ও রাজনীতি থেকে তিনি বেশী কিছু পাবার আশা করতেন না। মাঝে মাঝে তিনি

ইউরোপীয়দের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের মনে কঠোরভাবে মুদ্রিত করিয়ে দিয়েছেন একটি কথা : তাদের কাজ করতে হবে কালা আদমীর অধীনে।

ভারতে, পাশ্চাত্য অনুকরণের আন্দোলন থেকে, যা কিছু পাওয়া সম্ভব হবেই, তিনি পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে। রামকৃষ্ণ দর্শনের পরে তাঁর জীবন হয়ে দাঁড়ালো, জাতীয় ভাবধারার প্রগতিশীল পুনরুদ্ধার সংগ্রাম। অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের নিষ্ঠাবান ছাত্র তিনি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রাচ্য সহজবুদ্ধি ও অসাধারণ অন্তদৃষ্টির কাছে একথা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল যে, পাশ্চাত্যে, যেখানে বিশাল ভূমিখণ্ডকে একলা হাতে চাষ করতে হয়, সেখানকার শ্রম-বাঁচানো যান্ত্রিকতাকে, প্রাচ্যদেশে যেখানে ছোট একটি ভূমিখণ্ডের উপর একটি গোটা পরিবার বেঁচে থাকে, সেখানে তা প্রবর্ত্তন করলে, অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশকে ডেকে আনা হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রকৃতি তাঁর নিজের মানুষেরা অবলম্বন করুক এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু ব্যাপারটা ঘটুক চিন্তাক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ চিন্তাপদ্ধতি সঞ্চারিত হোক ভারতে, কিন্তু পরিবেশের ওলট-পালট না ঘটে। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালযের মত করে তিনি বুঝেছিলেন (বিদ্বজ্জনেই জাতীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যার চরিত্র বোঝে, রাজনীতিকেরা নয়!) উর্দ্ধশ্বাসে নূতনের পশচাৎধাবনের পরিবর্ত্তে আজ, এশিয়ার প্রধান দায়িত্ব যে-কোন মূল্যে তার পুরাতন সামাজিক সংগঠনের সংরক্ষণ। মহত্তম দেশপ্রেমিক তিনি, তিনি রাজনৈতিক নন।

এই ভারতের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে অপরূপ 'শ্যামা জননী'। এদেশের সর্ব্বপর্য্যায়ের শ্রম সংগঠন, আদর্শের বিকাশ, চিন্তা ও কর্ম্মের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের ফল পরিণতি, এ সকলই তাঁর কাছে রত্নসমতুল্য। এর ভিতর থেকে তাঁর শ্রদ্ধাদীপ্ত বিশাল মনস্বিতা নিরন্তর নূতন ও গভীর ভাবরত্ন আহরণ করত, যা সাধারণের কাছে আদর্শ ও আলোকরূপে বিরাজিত। বিশাল বিশ্বের সামনে এই মহান আচার্য্য, শুধু ধর্ম্ম বা দর্শনে বা 'সমাধির' মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেননি। ভারতীয় চেতনার সাক্ষীপুরুষ, ভারতের প্রচণ্ড নিজস্ব প্রতিভা প্রবাহের নির্গমন স্বরূপ। তাঁর বিরাট ক্ষত্রশক্তি, নিযুক্ত ছিল আক্রমণে নয়, আত্মরক্ষায়। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে যা কিছু বলা যায়, সে সবই তাঁর নব দর্পণে ছিল। বর্ণাশ্রমের পক্ষে ও অন্যের অনায়ত্ত সর্ব্বোত্তম যুক্তিও তাঁরই অধিকারে। কিন্তু এই সকল যুক্তিতর্কের বিবাদ যখন চলত, তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতো অন্যক্ষেত্রে, মৌল প্রয়োজনে আগে চাই শক্তি, যে শক্তি নিজপ্রশ্নের সমাধান করবে, নিজ প্রয়োজনে নিজেদের 'জাতি' ভাঙবে বা গড়বে নিজেরাই।

ভারতীয় জনগণের নৈতিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, তাদের অবস্থার গুণগান করলে তাঁর কাছে ফল পাওয়া যেতো না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলতেন, শবদেহের চেয়ে সচ্চরিত্রকে? জীবন, জীবন চাই। তা শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা যাই আসুক। শক্তি চাই, তাতে যদি যন্ত্রণা আসে, বিক্ষোভ আনে, তবুও 'জীবন' আর 'শক্তি' এই ছিল তাঁর দেশপ্রেমের লক্ষ্য— তুচ্ছ কতকগুলো সমাজসংস্কারের কাকুতি নয়। আকাঙ্খিত 'জীবন' কিন্তু ঐতিহ্যপটে সংগঠিত জাতীয় জীবন হওয়া চাই। ভারত এশিয়ার সন্তান, তারই অঙ্কে তার স্থান, সে স্থান যেন নির্দ্ধারিত না হয় অর্ব্বাচীন জার্ম্মানীতে নির্ম্মিত ইউরোপের কুক্ষিত। ভবিষ্যৎ অবশ্যই অতীতের প্রতিচ্ছবি হবে না, কিন্তু অতীতের প্রতি সুগভীর সজীব শ্রদ্ধাতেই তার ভিত্তি দৃঢ় হতে পারবে।

এই কারণেই জাতীয় চৈতন্যের মূল্যানুসন্ধানে স্বামিজীর নিরন্তর নিরলস, আপোষহীন প্রযত্ন। এই জন্যই সামান্যতম গাথা, কাহিনী, ব্যক্তিজীবন ও তার রীতি নীতি সম্বন্ধে তুচ্ছতম সংবাদও তাঁর বুদ্ধিজালকে এড়াতে পারতো না। এই কারণই, রয়েছে হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসন্ধানে, তাঁর বিরাট প্রয়াসের মূল। সুমুহৎ অতীতের উপরে গড়ে উঠুক মহত্তর ভবিষ্যৎ। প্রতিটি মানুষ মহাভারতীয় চরিত্র হোক। হোক ভীষ্ম, হোক যুধিষ্ঠীর। তাঁর দিগদিগন্তর ব্যাপ্ত

আহ্বানের আর্ত্তনাদ, 'সম্মোহিত হয়ে আছি আমরা।' আমরা ভাবছি আমরা দুর্ব্বল, তাই আমরা দুর্ব্বল। একবার যদি ভাবি, আমরা শক্তিধর, কে আমাদের জয় করবে? এই কথায়— ধর্ম্মীয় ও জাতীয় উভয় অর্থই আছে। কতকগুলি নির্ব্বোধ প্রগলভ সমালোচকের বাচালতাকে যেমন তিনি সহ্য করতেন না, তেমনি অপরদিকে তাঁর দেশবাসীর পরাভবের চিন্তা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুরাতনী ভারতবর্ষ, তাঁর কাছে সর্ব্বদেহে নবীনা, কারণ তার প্রাচীন সভ্যতায় সঞ্চিত আছে ভাবী বহুযুগের নব দৃষ্টির প্রেরণা। সে ভারতে, মানুষের ভাগ্য তার নিজের মাটিতে। আর সে মাটির ভাগ্য, মানুষেরই হাতে।

২৮শে জুলাই ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আশা করি তুমি আমার ছোট খোকাটিকে একেবারে যা তা মনে করনি। বেচারা শিশুটি! তাকে এখানে নিরাপদে ফিরে পেতে খুবই ইচ্ছা হয়। প্রিয় মধুর নীড় সুখী প্রাণী! সদাই তার আশ্রয় ও আনন্দ চাই।

২৮শে জুলাই ম্যাকলাউডকে লিখলেন : সদানন্দ অতীব চমৎকার। আমার কাছে প্রথম পেলেন স্বামিজীর অবস্থার বিবরণ। ৪ঠা মে তারিখে চলে যাবার আগেই বুঝেছিলেন (নেপালে যাওয়ার পূর্ব্বে কিছু ঘটবে) কারণ স্বামিজীর করুণা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল, খুব নত কোমল লাজুক ভাবে তিনি তাকাতেন, নিজের মনে হাসতেন। ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন- এবার ও চলে যাবে, ঠাকুরের মতই, কারণ প্রতিদিন ঠাকুরকে ওর মধ্যে দেখছি।

সদানন্দ জানেন : তিনি সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে আছেন। যদি আমরা অন্যায়ও চাই, তিনি রক্ষা করবেন। সদানন্দ যখন ওঁর কাছে সন্ন্যাস নেন হৃষীকেশে, তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: স্বামিজী, যদি আমার পতন হয়? উত্তরে তিনি বলেছিলেন : হাজার পতন হোক, কিছু এসে যায় না, আমারই দায়িত্ব, আমিই তোমাকে বেছেছি, তুমি আমাকে বাছোনি।"

শেষের তিন চার মাস ভোরের তিনটে চারটের সময়ে সকলকে ডেকে তুলতেন, ধ্যানের জন্য। নদীতে ডুব দিয়ে সাড়ে চারটার সময়ে মন্দিরে সবাই হাজির হতেন। বহুদিন প্রভাতে আমিও জেগে উঠতাম, তারপর বসে শুধু প্রণাম করতাম।

২৯শে জুলাই ক্লাসিক থিয়েটারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বার্ষিক স্মৃতি সভায় তিনি বক্তৃতা দিলেন। সভাপতি শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত। বিপুল জন সমাগম। বললেন : এই ধরনের সভায় কেউ বলতে পারেন না বাংলাদেশে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিরাজমান। এই বিরাট জাতির সদস্য হিসাবে সকলেই এখানে যোগদান করেছেন এক মহাপুরুষের স্মৃতি পালনের উদ্দেশ্যে।....

২৯শে জুলাই পুনরায় ম্যাকলাউডকে লিখলেন : শনিবার ওকাকুরা দলবলসহ এক মাসের জন্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। মনে গভীর আশঙ্কা বোধ করছি। মন্দ সম্ভাবনা আছেই।.... বর্ত্তমানে তিনি এদেশের অতিথি, ওর খুন হওয়া চলে না। ওঁকে তুমি আমাদের জন্য আনিয়েছ, যদি উনি আবার আসেন, বলছেন, আসবেন সেই সব প্রকৃত রসে মনের ক্ষেত্রে, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ওঁর জানা। সুরেন ঠাকুরকে উনি ভালবাসেন। কি অপূর্ব্ব ওঁর চরিত্র। সংস্কৃত শিক্ষা দেন, তাদের ভালবাসেন। তাই শিষ্যরূপে শক্তিশালী মানুষ পেয়ে যান অদ্ভুত কিছু ব্যাপার নয়।

৩১শে জুলাই ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন :

গভীরতম বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি : কোন কোন মহলে বলা হচ্ছে আমার মহানগুরু স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে আমার নিম্নের বিবৃতিটিকে সর্ব্বাধিক ভাবে প্রচার করেন।

(১) রামকৃষ্ণ সাঙ্ঘের কেন্দ্র বেলুড়মঠ, হাওড়া। এই সঙ্ঘের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের উপর ন্যস্ত—যাঁদের তুল্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অল্পই দেখা যায়।

(২) এই সঙ্ঘ তাঁর গুরু ও প্রতিষ্ঠাতার— (শ্রীরামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ) নিকট থেকে ধর্ম্মদর্শন এবং ধর্ম্মীয় উপলব্ধির সুনির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডার লাভ করেছে। অতঃপর যার সংরক্ষণ এবং বিস্তার সাধন করা এই সঙ্ঘের কর্ত্তব্য হবে।

(৩) এই ধর্ম্মীয় সম্পদ ভাণ্ডারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীন শিক্ষার্থীনীর— ব্রহ্মচারিনীর, পূর্ণব্রতী সন্ন্যাসিনীর নয়। আমি সংস্কৃতজ্ঞ এমন কোন অভিমান আমার নেই, ধর্ম্ম ব্যাপারে আমার উর্দ্ধস্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা, বিশেষ অনুগ্রহ করে তাঁদের নির্দ্দেশ বা নিয়ন্ত্রণের বহির্বর্ত্তী সামাজিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাগত কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে আমার গুরুর দেহত্যাগের পরে গুরুভগিনী ভিন্ন গুরুভাইদের সঙ্গে অধিক যোগাযোগ না রাখাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

(৪) ধর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দুর জন্য ইউরোপীয় নেতৃত্ব প্রয়োজন—এর থেকে বেদনাদায়ক ভ্রান্তি, আমার মতে, সম্ভব নয়। উল্টোটাই হওয়া উচিত, আমার ধারণা তাই। ভরসা করি আমার পত্র অনেক সংবাদপত্র লেখকের দৃষ্টিগোচর হবে এবং পত্রটিকে তাঁরা তাঁদের রচনাপাঠের স্বীকৃতি এবং উত্তররূপেই গ্রহণ করবেন।

মিরার সম্পাদক এর সঙ্গে যোগ করলেন :

সিস্টার নিবেদিতা সহযোগী হিন্দুকর্ম্মীদের সম্বন্ধে আদর্শ ব্যবহার করেছেন। এ আচরণ তাঁরই যোগ্য— যদিও এ পত্রের প্রয়োজন ছিল কিনা সন্দেহ। আমাদের এই উচ্চাশয়া ভগিনী বহুজ্ঞানান্বিতা, প্রতিভাময়ী। যদিও তিনি নিজ বিষয়ে নম্রভাবে উল্লেখ করেছেন— দীন শিক্ষার্থীনী।

অতিদীন শিক্ষার্থিনী লিখেই তৃপ্ত। মর্ম্মস্পর্শী এই দীনতাবোধও অহঙ্কার! জনসেবায় ব্রতী কর্ম্মীদের কাছে আদর্শ হোক এ জিনিষ।

আগস্ট মাসের প্রথমেই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ মঠ থেকে চলে এলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ওষুধ পথ্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত রইলেন।

সুস্থ হয়ে উঠে অনুভব করলেন, বাহ্যতঃ তাঁরা ছিন্ন হলেও, স্বামিজীর গুরুভ্রাতারা বিশেষ করে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দজী তাঁকে ত্যাগ করেন নি। সঙ্ঘকে নিরাপদ রাখার অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র। তাও স্বামিজীর ইচ্ছা পূরণের অভিপ্রায়ে। বিপদে, আপদে তাঁদের সাহায্য লাভের আশা তিরোহিত হয়নি। মনোবেদনার গুরুভার লাঘব হল।

সামনে তাঁর কঠোর জীবন। বাড়ীভাড়া, লোকজন রাখা, আহার বিহার, বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় সবই সামলাতে হবে, অথচ অর্থাগমের পথ রুদ্ধ। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা মুহূর্তেও এলো না। কঠোর জীবন ব্রতহিসাবে, গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছায়। স্থির করলেন, 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়া' বইটি শেষ করে আয়ের ব্যবস্থা করবেন।

সুস্থ হয়ে ওঠা মাত্র, জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ালো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা। চোখের পাতায় ভেসে উঠল একটি মাত্র চিন্তা— এটা যে স্বামিজীর কাজ! শ্রীরামকৃষ্ণ নয়— বেদান্ত নয়— জনসাধারণের মধ্যে, মনুষত্বের জাগরণই তাঁর উদ্দেশ্য। জাতীয়তাবোধের জাগরণই ছিল স্বামিজীর অভিপ্রায়।

১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী, স্বদেশে ফিরে স্বামীজী যে সকল বক্তৃতা দিয়েছেন, তা অনুধাবনে সিদ্ধান্তে এলেন : নিছক ধর্ম প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। অগ্নিগর্ভ সে সব বক্তৃতার মধ্যে রয়েছে, মানুষ গড়ে তোলার চেতন-বিস্তার— Man making মানুষ তৈরীই ছিল তাঁর অন্তরের একান্ত বাসনা। সমগ্র দেশকে আত্মস্থ হওয়ার প্রেরণা দান ও তা জাগ্রত রাখাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সর্বত্র ঘোষণা করতে হবে : তাঁর বাণী। প্রচার করতে হবে : তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তিই ছিল তাঁর স্বপ্ন। বাস্তবে তা পূর্ণ করা ও ভারতে সে মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য, নরনারী নির্বিশেষে, উচ্চতর জীবনের সন্ধান দানই, ছিল তাঁর মূলমন্ত্র।

৭ই আগস্ট ১৯০২, মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : ওকাকুরা বাইরে আছেন। কাজ করছেন, যে কাজ কেবল উনিই করতে পারেন! সত্যই আমি তাঁর ঠিকানা পর্য্যন্ত জানি না— তবে ইচ্ছা করলে, জানতে পারি।

উপরের বইটির ভূমিকা লেখা আরম্ভ করেছি।

২১শে আগস্ট চিঠি লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে, খুবই অসুস্থ ছিলাম। গত সপ্তাহে মাত্র তোমাকে ও খোকাকে ছোট চিঠি দুটি পাঠাতে সমর্থ হয়েছি।

খোকার হতাশভাবের কথা যে লিখেছ, তাতে আমি খুব উৎকণ্ঠিত হবো না তুমি জানোই, আবিষ্কারের জ্বরের আগুনে যে একটু কমেছে, তাতে আমি খুব খুশী। কোনো মানবমস্তিষ্ক, ও জিনিষ আর সইতে পারতো না। তার সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত, তাহলে বিরতিগুলো বিশুদ্ধ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠতো।

বিচিত্র! ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি কত অসহায়। তুমি জানো না, কতখানি মঙ্গল তার করেছ তুমি। সে বিষয়ে আমি খুবই নিশ্চিন্ত। বেচারা শিশুটি!! বড়কিছুর সঙ্গে সর্বদা সংস্পর্শ থাকা তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

২১শে আগস্ট মিস ম্যাকলাউডকে পর পত্রের লিখলেন : ওকাকুরা ও সুরেন কলকাতা ফিরে এসেছেন। তাঁরা কি না করছেন— সব কিছু। এখন আমাদের পথ দেখতে পাচ্ছি।... স্বামীজী একটা

প্রচণ্ড 'ভাব' দিয়ে গেছেন। সেই 'ভাব' যখন পূর্ণরূপে উন্মোচিত হবে, তখন স্বামীজীর চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হবে।...

ইতিমধ্যে কলকাতার নানাস্থানে, বিভিন্ন সমিতির ডাকে, যে সব স্মৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন হল, সেখানে স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চললেন।

২৩শে আগস্ট বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপনের উদ্যোগ হল। তিনিই হলেন তার অন্যতম হোতা। বক্তৃতা দিলেন : স্বামিজীর আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের জন্য এরূপ 'সোসাইটি' প্রতিটি শহরে স্থাপন করা কর্তব্য।

২৪ আগস্ট মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : নিগুর দ্বিতীয় বইটি উল্লেখযোগ্য নয়। এটি আমাদের সকলকে জেলে পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। একেবারে বেপরোয়া শিশু উনি! এখন নিজেও তা বুঝছেন। বইটির নাম 'ওয়েকিনিং অব জাপান' কিছু কিছু অংশ সংশোধন করেছি। অবশ্য পরে স্বামিজীর শিষ্যা মিস ওয়ালডো— নিউইয়র্কবাসী, বইটির রূপদানে সচেষ্ট।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯০২ : চিঠি দিলেন মিস ম্যাকলাউডকে :

বুঝতে পারছি, পরবর্তী কয়েক মাস খোকার কাজই, আমার মূল দায়িত্ব হবে।

১০ই সেপ্টেম্বর লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : নিগু ও সুরেন যে ফিরে এসেছেন তা পূর্বেই জানিয়েছি। যা করবার তাঁরা করেছেন। বেশীও করেছেন।... বালিগঞ্জের ছেলেদের মধ্যে এই 'মিথ' ছড়িয়েছে "উনি কল্কি"... যার বিষয়ে অনেক কথাই শোনা যায়... ছেলেরা নিগুকে বলে 'কৃষ্ণ'।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০২ লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : বোম্বাই থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, সেখানে স্বামিজীর কথা বলার জন্য। তারপর আরম্ভ হবে বক্তৃতা সফর। সুতরাং খোকা যখন ঘরে ফিরবে, তখন জগন্মাতা আমাকে অন্যত্র রাখবেন। তাতে দুঃখিত নই। কেবল বোম্বাই বন্দরে দাঁড়িয়ে তার জাহাজের আগমন দেখতে চাই।

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০২, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বসুদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে বোম্বাই জাহাজ ঘাটায় মিলিত হব।

১৪ই সেপ্টেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : মিসেস বুল ইচ্ছামত কলম চালিয়ে বইটির সুর ও সঙ্গতি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন। বাতিল অংশ পুণঃসংযোজন করে দিলাম। জানাবে— এরকম নিজের বুদ্ধি যেন কদাপি না ঘটানো হয়।

পূর্বের মতই ওকাকুরা পরিশ্রম করছেন— ক্ষুদ্র জিনিষে যেমন, বৃহৎ জিনিষেও তেমনি— এক জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ। একেবারে আত্মচেতনা নেই, মানুষের পক্ষে সবিশেষে অর্চ্চনার বস্তু! বাস্তবিক তুমি যে মানুষটিকে এনেছ, দর্শন না করে উপায় নেই।

প্রথমে সূক্ষ্ম, পরে স্পষ্ট অনুভব করতে শুরু করলেন : স্বামিজীর চিন্ময় সত্ত্বাকে। সমস্ত মন ও চিন্তা উচ্ছ্বসিত হল স্বামিজী প্রদর্শিত পথরেখায়। তাঁর মূলগত চিন্তা গ্রহণ করে, ধীর ও স্থির-চিত্তে পর্য্যালোচনা শুরু করলেন। ধরা পড়লো তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা জগতের ত্রুটি। স্বচ্ছ হল দৃষ্টি। জেগে উঠলো আত্মবিশ্বাস। বুঝলেন, ওকাকুরাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই। সকল কিছুতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো ওকাকুরার ব্যক্তিগত চরিত্র। অতিরিক্ত নেশায় তার যেমন আসক্তি, প্রেমে পড়ার ঝোঁকও তেমনি প্রবল, ব্যক্তি হিসাবে হেয় প্রতিভাত হয়ে উঠতে লাগলো দিনের পর দিন। শোচনীয় ব্যর্থ প্রেমান্তে তার ভারত আগমন। পরবর্তীকালে, ঠাকুরবাড়ীর এক কন্যার প্রেমে হাবুডুবু, অবশেষে তাঁকেই 'প্রপোজ' করে বসেছেন। আরও নানা সংবাদ তাঁর কানে এসে পৌছাতে থাকায় তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

স্বামিজীর দেহত্যাগ, গভীর নৈরাশ্য ও মর্ম্মবেদনা সামলে নিজেকে অনেকখানি খাড়া করে তুললেন। বুঝতে শুরু করলেন : বর্ত্তমান ভারতে রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রসারণের একান্ত প্রয়োজন। তা বাস্তবায়িত করতে হলে, যে ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার দ্বারা— তা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাজ হবে (১) ভারত সফর ও উদ্দীপ্ত সে ভাবের ব্যাখ্যা। (২) এই ভাব প্রচারের জন্য প্রবর্ত্তক সংঘ স্থাপন ও ব্যক্ত ভাব প্রসারণে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও উৎসাহিত করা। (৩) জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি, আত্মবোধ ও সংহতি জাগরণ দ্বারা সরকারের প্রতিটি কাজের সমালোচনা। (৪) প্রয়োজনবোধে সেই আত্মবোধ ও সংহতির জন্য জাতি-চিত্তে 'জাতীয় তত্ত্ব' প্রবেশ করিয়ে দেওয়া ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী চক্রান্তের বিরোধিতা করা অর্থাৎ মিশনারী কর্ত্তৃক বিরোধী প্রচারের মোকাবিলা। (৫) জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিদ প্রতিষ্ঠা ও সে আন্দোলনের জন্য জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করা।

জাগ্রত গুরু বিবেকানন্দ বিরাজিত সেই চিন্তা ধারায় যুক্ত, জাতীয়তাকে ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত হলেন, সারাভারতে। আজ : এই ভারতই তাঁর ধর্মক্ষেত্র। হাতে সেই পতাকা— যার নাম 'বিবেকানন্দ'। প্রথমে লিখলেন : কয়েকটি উদ্দীপ্ত প্রবন্ধ। প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাটি দারুণ উন্মাদনা সৃষ্টি করলো। ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন পত্রিকায় পুণঃমুদ্রিত হল সে প্রবন্ধটি।

ভ্রমণ; বক্তৃতাপর্ব সূচিত হল : ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯০২। নাগপুর হয়ে পৌছলেন বম্বে ২৪শে সেপ্টেম্বর, সঙ্গে স্বামী সদানন্দ। বক্তৃতাব অন্যতম উদ্যোক্তা মিঃ পাদশা।

এখান থেকে পত্র দিলেন মিঃ র‍্যাটক্লিককে : জীবনের শিক্ষা তুমি নেবে সুতীব্র সহনের মধ্য দিয়ে। তার যন্ত্রণা বইবে, যাদের ভালবাস তাদের জন্য। তার দ্বারা অর্জিত ফল, অগ্নিদগ্ধ হয়ে তোমার চরিত্রে প্রবেশ করে যাবে, শেষে তুমি এমন বৃহৎ মানুষ হয়ে দাঁড়াবে— যা তোমার কল্পনাতেও আসেনি। ভারত তোমাকে এমন কিছু একটার জন্য নির্মাণ করবে। কী সেটা আমি জানি না। তবে, তা তোমাতে অন্তর্নির্হিত হয়ে আছে।

'গেটী' থিয়েটার পরপর ২৬শে, ২৯শে, ৩০শে সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দিলেন "স্বামী বিবেকানন্দ", 'এশিয়ার জীবন' ও 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দুস্থান'। প্রতিটি সভায়, প্রায় হাজার ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলেন। শেষ দিনে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন : ভারতের যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়, ভারতীয় স্বাধ্যায় ব্রহ্মচর্য্য পালনে অবশ্যই ব্রতী হবেন। ব্রহ্মচর্য্যই, উচ্চ জাতীয়-আদর্শ, যা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও শক্তি প্রদানে সমর্থ। এই ব্রত পালনে, যে কেউ স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশলাভে জীবনের সকল সমস্যা সমাধানে ও জাগতিক মোহ দূর করে পরব্রহ্মে লীন হতে পারে।

যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায় তাঁর বক্তৃতামালায় বিশেষ উৎসাহিত ও অনুপ্রেরণা লাভ করলো। ১লা অক্টোবর 'হিন্দু ইউনিয়ন' ক্লাবের সদস্যগণ তাঁকে একটি চায়ের আসরে আমন্ত্রণ জানালেন। উদ্দেশ্য: নিজনিজ পরিবারের মহিলারা তাঁর সঙ্গ ও পরিচয় লাভে সমর্থ হবেন ও তাঁর বক্তৃতা শোনার অবকাশ পারেন। অধ্যাপক পাধা উপস্থিত সকলের সঙ্গে ইংরাজীতে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ, মারাঠী-ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখে ভগিনী নিবেদিতার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

উত্তরে, তিনি সমবেত মহিলাবর্গকে বললেন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ লাভে সত্যই মুগ্ধ ও আনন্দবোধ করছি। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যার সঙ্গে পরিচয়ের পরিবর্তে, যদি

স্বয়ং স্বামিজীকে দেখতেন ও পরিচিত হতেন, তাহলে আরও আনন্দলাভে সমর্থ হতেন। মারাঠী ভাষা ভাষণে আমি অক্ষম, সেই হেতু বিশেষ দুঃখবোধ করছি। কারণ মনের যোগ, স্থানীয় ভাষা ছাড়া সম্ভবপর হয় না।

এই তারিখে, মিস ম্যাকলাউডকে বিরক্তি প্রকাশে লিখলেন : চিঠিতে খুব সামান্য লেখা যায়। 'ব্যানারচীফ', এককথায় আমি সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে, তোমার সকল চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছি।... আমি তোমাকে প্রথম বক্তৃতার দীর্ঘ বিবরণ, তিলকের 'কেশরী' কাগজে বেরিয়েছে, তা পাঠাবো। তুমি কাগজটি মারাঠী ভাষায় বলে পড়তে পারবে না কিন্তু বিবরণটি কোথায় আছে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না। বিবরণটি সচিত্র।

১লা অক্টোবর ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

দেখতে পাচ্ছ, আমার ছোট খোকাটি স্বর্গীয়। কিন্তু যেখানে দেশের ব্যাপার— সেখানেই আমিই গুরু। সেন্ট সারার প্রবল প্রভাবে, ওব্যাপারটা সাময়িকভাবে যেন ভুলে যাওয়া হয়। তুমি জানোই, আমার মিষ্টি শিশুটি, ইদানীং কি সব বাজে কথা বকছে, যার প্রতিটি শব্দকে সেন্ট সারা সশ্রদ্ধভাবে পুণরুচ্চারণ করছে। যেন সেগুলিকে আমার ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মাবলী। এখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি, সেটাই অদ্ভুত। আর যদি না, বসু নাগপুর হয়ে কলকাতা যেতে মনস্থির করে, তা করলে ১৬ মিনিটের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আমরা ১৯শে বা ২০শের আগে তার দেখাই পাবো না। তার জন্য দুঃখিত নই। তখনও আমি আলাসিঙ্গা ও মাদ্রাজের দিকে ডানা মেলে আছি। আর যদি তোমার শিশু (ওকাকুরা) সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে, গুপ্ত আন্দোলনের ব্যাপারে... তাহলে হয়ত এই দাঁড়াবে, খোকা ও আমি, আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে, নিতান্ত ঘটনা চক্রে মাত্র কখনো সখনো মুখোমুখি হয়েছি। বিচিত্র! বিচিত্র! তবে কদাপি ভেবো না। আজ, যেহেতু জীবন সম্বন্ধে বৃহত্তর, সত্যতর দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে, সে কারণে, তার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে। না, তা সত্য নয়, আসল বস্তু, পূর্বের মতই একই ভাবে বর্তমান। তবে তা নৈর্ব্যক্তিক বস্তু, নামের দ্বারা সীমায়িত নয়। মনে রেখো, যা ঘটেছে, তার প্রয়োজন ছিল, প্রাণ ও মস্তিষ্ককে রক্ষার জন্য, এবং সম্ভবতঃ আমার কর্মক্ষয়ের জন্যও। এ যে শ্রীরামকৃষ্ণের, খ্রীষ্টের, মহম্মদ বা নারী পূজার মত ব্যাপার, একবার তা সম্পন্ন করবার পরে, তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন!

২রা অক্টোবর হিন্দু লেডিজ সোস্যাল ক্লাবে একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হল। তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। ছোট একটি মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। তিনি মঞ্চে উঠে সমবেত মহিলা ও উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন : সমাগত যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় নারী। তাঁদের এই 'হিন্দু নারী' সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আপনারা বরং আমাকে প্রশ্ন করুন— তার উত্তর দিতে, আমি আপনাদের সম্মুখীন।

শ্রোতৃবর্গ তাঁকে স্বধর্ম ত্যাগের কারণ জানতে চাইলেন।

উত্তরে বললেন : বয়স যখন আমার আঠারো, খৃষ্টধর্মের মতবাদ সম্বন্ধে মনে গভীর একটা সংশয় জাগলো। পরে স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের পর, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, সে সন্দেহের অবসান হল। ...শেষে যোগ করলেন আমি ভারতকে ভালবাসি, কারণ জগতের ধর্মমতগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, ভারত তার জন্মদাত্রী। ...হে ভগিণীগণ, আপনাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত ভালবাসা আছে। কারণ, আপনারা এই প্রিয় ভারতভূমির কন্যা! আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্তে, এই মহিমময় প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন করুন। আপনাদের সাহিত্যই, আপনাদের উন্নত করবে। আপনাদের পারিবারিক জীবনের, যে সরলতা ও

গাম্ভীর্য্য তা যেন অটুট থাকে। প্রাচীন কালে, এই পারিবারিক জীবনে যে পবিত্রতা ছিল এবং যা এখনও আপনাদের ঘরে রয়েছে, সেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

পাশ্চাত্যের আধুনিক রীতিনীতি ও আড়ম্বর এবং তার ইংরাজী শিক্ষা, যেন আপনদের বিনম্র সৌজন্য, নষ্ট না করে। ...এই আমার অনুরোধ। আপনারা সকলেই আমার ভগ্নী, কারণ যে দেশকে আমি স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছি, সেখানে, আমি আমার গুরুদেব বিবেকানন্দের অভিপ্রেত কাজ করে যাওয়ার আশা পোষণ করি, আপনারা সেই দেশের কন্যা।

ক্লাবের অধ্যক্ষা মিসেস এন এস কোঠারী। তাঁকে তাঁর এই মূল্যবান বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁর এই আগমন স্মরণীয় রাখার জন্য, এক প্রস্থ ঋকবেদ ও ১০৮ রুদ্রাক্ষের মালা উপহার ও কপালে তাঁর কুমকুমের টিপ পরিয়ে দিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এই মালার প্রত্যেকটি রুদ্রাক্ষের উপর এই ভারতীয় ভগ্নীগণের জন্য মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন।

৪ঠা অক্টোবর গিরগাঁও অঞ্চলের অধিবাসীগণের উদ্যোগে একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হল। সভামঞ্চে টেবিলের ওপর স্বামিজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি রাখা ছিল। তা লক্ষ্য করে তিনি তাড়াতাড়ি জুতা খুলে ফেললেন। সানন্দে বললেন, এরূপ সভায় তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য আপনাদের বহু বহু ধন্যবাদ। আমাদের মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ, সামনে হরিৎ বৃক্ষ, এই পাম জাতীয় বৃক্ষ ইউরোপে বিজয়লাভের সূচনা জ্ঞাপন করে।

এরপর স্থানীয় পুস্তকাগার দর্শন করে ফিরে এলেন।

৬ই অক্টোবর 'গেটী' থিয়েটার হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। বক্তৃতার বিষয় 'ভারতীয় নারী'। সংরক্ষিত আসন সুতরাং টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য উল্লেখে বললেন : আধুনিক যুগে ইউরোপে, নারীগণ সমাজে, যে পদমর্য্যাদা উপভোগ করেন, প্রাচ্যে বৈদিক যুগে, নারীগণ অনুরূপ মর্য্যাদালাভ করতেন। পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ, দান্তের 'বিয়াত্রিচে'। আর ভারতে, যুগে যুগে সীতা ও সাবিত্রী পূজা পেয়ে চলেছেন। ধর্মানুভূতিই সমগ্র এশিয়ার নারীজাতির আদর্শ। এই বৈশিষ্ট্যদানেই নারী, সমগ্র এশিয়ার পূজা পেয়ে আসছে।.

ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারীর উল্লেখে বললেন : শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে শিক্ষা কী? কী ধরনের? প্রশ্ন এটাই। ...ইংরাজী লিখতে ও পড়তে পারলেই কি শিক্ষার শেষ? না— সে বস্তু 'মানুষ হওয়ার।' 'শিক্ষা' লাভের দ্বারাই তা সম্ভব! উন্নতির সম্ভাবনার মূলে যে অন্তরায়গুলি বর্তমান, তা দূর করতে পারলেই, ভারতীয় নারীর যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সম্ভব।...

সারা বোম্বাই শহরের পুরুষ ও মহিলাবর্গ তাঁর সংস্পর্শলাভে মুগ্ধ হলেন। ছাত্রসমাজ, তাঁর স্বদেশ প্রেমের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বোম্বাই গেজেট ও টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সংবাদপত্রে তাঁর বক্তৃতার পূর্ণবিবরণ প্রকাশিত হতে লাগলো। তাঁদের প্রত্যেকটি সম্পাদকীয় স্তরে, তাঁর প্রশংসা প্রকাশ পেতে লাগল।

৭ই অক্টোবর যাত্রা করলেন নাগপুরে। বিচারপতি মিঃ কোলহটকারের বাড়ীতে উঠলেন। ৮ই থেকে ১০ই পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিলেন। জনমণ্ডলি অত্যধিক হতে থাকায় এগারো তারিখে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনটি বক্তৃতা দিলেন।

এখানেও পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা। শ্রোতাদের মধ্যে গভীর উদ্দীপনার সাড়া পড়ে গেল বিশেষ করে স্কুল ও কলেজের ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারা দলে দলে দেখা করতে এল। তাদের কাছে স্বামিজীর প্রসঙ্গ তুলে, তাদের অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন।

স্থানীয় 'মরিস' কলেজে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হল দশেরার দিন। তাঁকে সভা পরিচালনা ও পুরস্কার বিতরণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, সে কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ। তিনি যথারীতি সে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন ও পুরস্কার বিতরণ-কালে ছোট একটি ভাষণ দিলেন : আপনারা স্বদেশীয় খেলাধুলাকে অবহেলা করে, বিদেশী খেলার গৌরব কুড়াতে চেষ্টা করছেন দেখে আমি সত্যই বেদনাবোধ করছি। আজ পূণ্য দশহারা। দেবী দূর্গার অর্চ্চনার দিন। তাঁকে কি তবে, আমরা ভুলে গেলাম? ভুলে গেলাম তাঁর খড়্গকে? তাঁর শক্তির বাণীকে? ভোঁসলে রাজার রাজধানীতে, মারাঠা বীরত্বের কিছু চিহ্ন দেখবার আশা করেছিলাম! তরবারির খেলা, মল্লযুদ্ধ! কোথায় গেল সে সব? অবশ্যই আশা পোষণ করতে পারি, আগামী কাল সেসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবো!

উদ্যোগীরা বিপদে পড়ে গেলেন। ওসব প্রদর্শনীর ছাত্র, কলেজ শিক্ষা গ্রহণ করে না। তাঁদের ছুটতে হল স্থানীয় সব আখড়ায়, যেখানে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষায় অস্ত্র চালনার শিক্ষা দেওয়া হয়। সভ্য-সমাজে এশিক্ষার প্রচলন নেই। উঠে গেছে বলা চলে! কারণ, ও সব শিক্ষা, বস্তুতঃ এখন অচ্যুত। শেষ পর্যন্ত তাদেরই শরণাপন্ন হতে হল উদ্যোক্তাদের।

পরদিন অনুষ্ঠান হল কলেজে। তাঁর সম্মান রক্ষার্থে। অনুষ্ঠান শেষে, তিনি উদ্যোক্তা ও ছাত্র সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন : বর্তমানে আমরা বেশীরকম উচ্চশিক্ষা লাভ করছি, প্রচুর পরিমাণে গ্রাজুয়েট, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর বেরুচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা ভগ্ন দেহ, বিপদের দিনে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ নন। মা বোনেদের মর্যাদা রক্ষায়ও অসমর্থ। এসব ধ্বংস পুঞ্জ নিয়ে, দেশের বা সমাজের কোন উপকার সম্ভব নয়! আক্ষেপের সঙ্গে বললেন : আজ দেশ কি চায় জানো? চাইছে : দেহ-মনে বলিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক। চায় না, বিদেশী সরকারের পদলেহন। চায় না বর্ব্বর, শাসক সম্প্রদায়ের হাতিয়ার হয়ে দেশের মানুষকে করবে শোষন ও পেষন। আমি নিশ্চয় আশা রাখবো— তোমরাও প্রত্যেকেই সেই আদর্শ অনুসরণ করবে, যাতে দেহের পুষ্টি সাধন হয়, মন সবল ও সতেজ থাকে। মনে রেখো— দেশ প্রেমিকরাই, দেশের সেবা করে, দেশের মানুষকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। দেশ গড়াই হয় তাদের আদর্শ, নেশা ও পেশা। তারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। আর যারা বিদেশী সরকারের দাসত্ব করে, তারা স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার সাহায্য করে— সুনিশ্চিত জেনো— তারা দেশের, সমাজের শত্রু। তাদের ঘৃণা করতে শেখ!

ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন : তোমাদের মুখে অপরিমেয় শান্তি দেখলে, আমি দুঃখ বোধ করি। আমি চাই, তোমরা যুদ্ধ কর, বক্সিং কর, তরবারি খেল কিন্তু তাতে নীচতা বা তিক্ততা না থাকে। আজ প্রয়োজন, শক্তিধর মানুষের! আমার দাবী, তোমরা বীর হও, সেই বীর যে লড়াই করে, লড়তে ভালবাসে। লড়াই, লড়াই কেবল লড়াই— যখন সংগ্রামের ডাক আসবে, তখন যেন ঘুমিয়ে থেকো না।

১১ই অক্টোবর ১৯০২, মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : আগামীকাল খোকার অবতরণ করার কথা। আমি যেরকম অনুরোধ করছি, সেইভাবে তারা যদি নাগপুর হয়ে কলকাতা যায়, তাহলে এখানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, রবিবার সকালে, এক কি দেড় ঘন্টা একত্র বেড়াবো। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছি না, কারণ খোকার মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত জিনিষ আছে, যা আশাভঙ্গ করে। আর যদি-তারা, এ কথায় রাজি না হয়, তাহলে ২০শে নভেম্বর নাগাদ কলকাতায় দু'তিনদিন তাদের পাবো, তারপরে পুনশ্চ বিচ্ছেদ। তারপরে বড় দিনের সময়ে যদি, সে নূতন কোন আহ্বান পায় এবং গ্রহণ করে, তাহলে আমাদের পুনশ্চ সাক্ষাতের সম্ভাবনা ক্ষীণ। সবই স্বামিজীর হাতে। এখন সবই তাঁর জানা। সুতরাং সবই ঠিক।

বোম্বাইয়ে একজন ফটোগ্রাফার আমার ফটো তুলতে চেয়েছিল। এসে সে খোকাকে দেখলো। দেখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো— এ যে মস্ত ঋষি। আমার সুখের পরিমাণ বুঝতেই পারছ।

নিগু বড় চমৎকার, আমার সঙ্গে কথা বলে, আমার ভাবগুলি বুঝে নিয়ে, সেগুলি আমার কাছে পুনশ্চ পৌঁছে দিয়ে সে আমাকে বিরাট সাহস দিয়েছে, যাতে করে ভাবগুলোকে খোকার সঙ্গে বিনিময় করতে পারি। ব্যক্তিগত ভাবটুকু চলে গেছে মনে হচ্ছে, কিংবা হয়ত সবই আমার কল্পনা। পুনরায় একই তারিখে ম্যাকলাউডকে জানালেন : ওকাকুরা ভারত ত্যাগ করে, স্বদেশ যাত্রা করেছে।

১৪ই অক্টোবর ওয়ার্ধা পৌঁছলেন। সেদিন সন্ধ্যায় 'খ্রীষ্টধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। পরদিন দিলেন 'স্বামীজী', 'ভক্তি ও শিক্ষা'। এছাড়া সারাদিন বহুলোকের কাছে "স্বদেশ ও স্বামীজী" সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনায় ব্যস্ত রইলেন।

১৬ই অক্টোবর ওয়ার্ধা থেকে অমরাবতী গেলেন। ১৭ই ও ১৮ই অক্টোবর 'এশিয়ার মহাপুরুষগণ' ও 'আধুনিক চিন্তায় হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সেখান থেকে সুরাট হয়ে বরোদায় উপস্থিত হলেন, রাজ-অতিথি রূপে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একটি কমিটি তৈরী হয়েছিল। শ্রী অরবিন্দ সমিতির পক্ষ থেকে কাশী রাও-এর সঙ্গে, তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এলেন। সেখান থেকে শহরে আসার, পথে কলেজের বাড়ী পড়লো। তাঁর উঁচু গম্বুজের সৌন্দর্য্যহীনতা লক্ষ্য করে তিনি নিন্দা করলেন। কাছাকাছি ধর্ম স্থানগুলির গঠন সৌন্দর্য্যেরও প্রশংসা করলেন। কাশী রাও অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। ভাবলেন, মহিলাটি, সম্ভবতঃ কিছু অপ্রকৃতিস্থ!

অরবিন্দ, ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষের প্রথম পুত্র। জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট। পেশায় কৃষ্ণধনবাবু ছিলেন সিভিল সার্জেন। চালে চলনে পুরোদস্তুর সাহেব। ছেলের বয়স যখন সাত, শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সস্ত্রীক বিলাতে গেলেন। সেখানে তাঁর শিক্ষা শুরু। তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসলেন— পাশও করলেন কিন্তু অশ্বচালনা পরীক্ষার দিন অনুপস্থিত থাকায় সরকারী চাকরী পেলেন না। ১৮৯২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' লাভ করে, বরোদায় এলেন, বরোদা কলেজের অধ্যাপকের পদ নিয়ে, ১৮৯৩ সালে। সে বছরেই স্বামিজী আমেরিকায় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে আলোড়ন তুলেছেন— হিন্দু ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন, বেদান্ত ধর্ম প্রচারে। অরবিন্দও আকৃষ্ট হলেন সারা ভারতবাসীর মত। ক্রমে তাঁর বাণী ও রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁর আদর্শকে, জীবনের ব্রত করে নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন, তাঁর গভীর সাধনা ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাগমনের পর, তাঁর দেশাত্মবোধের ডাক : তাঁকে নতুন পথ প্রদর্শন করলো। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগপ্রবর্তক পুরুষ ও স্বামিজীকে যুগপ্রবর্তক নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

মানুষ হয়েছেন স্বাধীন দেশে, স্বাধীন পরিবেশে। ভারতে পা দিয়ে চমকে উঠলেন, ভারতবাসীর নিঃস্ব ও অসহায় আবস্থা লক্ষ্য করে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। চিন্তা শুরু হল : এদের মুক্তির উপায়?

বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, তুলনায় ব্রিটিশ জাতির বসবাস ক্ষুদ্র একটি দ্বীপপুঞ্জে। আর তারা সাম্রাজ্য চালায় মুষ্ঠিমেয় পরিচালক ও গোরা সৈন্যের বাহিনী নিযুক্ত করে। এদের অধীনে, সাম্রাজ্য পরিচালনায় নিযুক্ত যারা, তাদের অধিকাংশ সকলেই ভারতীয়। সকলেই এদেশের অধিবাসী। এরা বিবেক শূন্য, দৃষ্টিহীন, লৌহ মানবের দল। এদের প্রাণ আছে, অনুভূতি নেই, হৃদয় আছে, বিবেচনা নেই, সজীব অথচ চেতনা বিহীন। কোনমতে বেঁচে থাকাটা, এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।— বেদনাবোধ করলেন অরবিন্দ।

যত বিশ্লেষণ করেন নিজের মনে— ততই বিস্মিত হন। বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। সেখানে মাত্র একজন ভাইসরয় ও প্রদেশে বিভক্ত রাজ্যে ইংরাজ পরিচালকবর্গ। রয়েছেন এক একজন গভর্নর। তাঁরা প্রত্যেকটি প্রদেশকে ভাগ করেছেন জেলারূপে; তাদের পরিচালনা করেন ম্যাজিস্ট্রেট। সকলেই

অভারতীয়। তার অধীনে কালেক্টরেট ও ডিভিশন্যাল অফিসার, মহকুমা অফিসার, এঁরাও ইংরাজ। তাঁদের সাহায্যে নিযুক্ত থানা অফিসার। তাদের সাহায্য করছে জুনিয়র পুলিশ বাহিনী। তাদের সাহায্য করছে গুটি কয়েক দফাদার— তাকে সাহায্য করছে, চৌকিদার বাহিনী, তাও পাঁচ-ছয় গ্রামে একজন! কি বিচিত্র এদেশে! কোটি কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রতা এরাই।

সৈন্য পরিচালনায় নিযুক্ত একজন সর্বাধিনায়ক (কমাণ্ডার ইন চীফ)। তাঁর অধীনে প্রদেশে, প্রদেশে অবস্থিত সেনা ব্যারাকে থাকে গোরাবাহিনী। তাদের সাহায্যে যারা নিয়োজিত, তারা সবাই ভারতীয়— বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করে, তৈরী হয় ইউনিট বা রেজিমেন্ট। এরা সকলেই গোরা সৈন্যের অধীনে, যুদ্ধের সময় এরাই প্রথম যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয়, পিছনে থাকে এই সব গোরা সৈন্যের দল। পরিচালকের কাজ করে। পরিচালনায় নির্দেশ দেয় ও এদের দায় দায়িত্ব, আহার, বিহার, মাহিনা— সবকিছু ইউরোপীয়দের মত। নীচুতলার মানুষ হল ভারতীয় বাহিনী, এদের সবকিছুই ভারতীয়দের মাপে— এদের জীবনের মূল্য কয়েকটি টাকা। আহার, বিহারও সেইরূপ। এরা কামান, গোলা, বন্দুক— গোরা সৈন্যদের নির্দেশ মত ব্যবহার করে। এদের স্বাধীন কোন স্বত্ত্বা নেই। পরিচালক সবাই গোরা— তাদের নির্দেশমতই চলতে হয় এদের। এইতো দেশ রক্ষার বহর! এরপর শাসন পরিচালনার কাজ করে যারা— তারা হল সিপাহী বা পুলিশ বাহিনী, এদের অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু ব্যবহারের নির্দেশ আসে ওপরওয়ালার কাছ থেকে, আর যারা এদের পরিচালনা করে তাদের কাছে থাকে পিস্তল বা রিভলবার, তবে অস্ত্র জমা থাকে থানায়। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এদের নীচে যারা কাজ করে, তাদের অস্ত্র : বেতের লাঠি, তাদের নীচের বাহিনীদের সম্বল বেল্ট, পাগড়ী ও বাঁশের লাঠি।

ওপাশে স্বামী বিবেকানন্দ ডাক দিচ্ছেন : উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত... জাগো, জাগো— হে ভারতবাসী, তোমরা জাগো! তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা ও বাণীর মধ্যে সুপ্ত জাতির ঘুম ভাঙানোর গান। সে সুরে অরবিন্দের প্রাণের তন্ত্রী স্পন্দিত হল। চিন্তা শুরু করলেন:- গোপনে যদি এদেশে অস্ত্র তৈরী করা যায় বা বিদেশ থেকে আমদানী করা যায়, গোপন ব্যবস্থায় দল গঠন করা যায়, বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা যায়, প্রচার মাধ্যমে তাদের চিত্তে বিদ্রোহী মনোভাব জাগরণ করা যায় ও স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন সত্ত্বাবোধের বীজ বপন করা যায়, বিদ্রোহ অনিবার্য্য। সেই যুদ্ধ যদি তিরিশটা বছর চালানো যায় একাদিক্রমে, দেশের শৃঙ্খল মুক্তি অনিবার্য।

'ওঠো বৎস; জাগো! বেরিয়ে পড় বীরের মত। বহন করো দায়— পুরুষের মতো। করণীয় কাজ সমাধা করো পূর্ণ শক্তিতে; নির্ভয়ে। ভুলো না— আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমার মাতা।' ধ্বনিত হতে লাগলো কানের মধ্যে বারবার!

...জীবন বিমর্ষ কিছু নয়। নিয়তি তোমার, মায়ের খেলা ছাড়া আর কি! এসো, আমার সঙ্গে, খেলো খানিক। যাই ঘটুক, স্ফুর্তিতে তার মুখোমুখি হও!

উদ্দেশ্যের ভাবনায় উৎকণ্ঠিত তুমি? ভাবছো, যে বলগুলি নিয়ে মা খেলছেন— তাদেরই বা প্রয়োজন কি? জানো নাকি মায়ের খেলার নাম বজ্র, পৃথিবী গুঁড়িয়ে দেবার শক্তি তাতে আছে, হাতের এক মোচড়ে ছুঁড়ে দিলেই হল! পরিকল্পনার কথা শুধিয়ো না— জ্যা-মুক্ত তীরের কোন পরিকল্পনা থাকে? তুমি সেই তীর। জীবন যাপন করো, তাহলেই পরিকল্পনা উন্মোচিত হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, হে মহাকালের সন্তানেরা, কিছু জানতে চেয়ো না।

অভ্রান্ত আমার খেলা। এ খেলায় যোগ দিতে, দিনের যাত্রা শুরু করো। ভেবে নাও— আমার খুশীর জন্য এ পৃথিবীতে তুমি এসেছ। যখন রাত্রি ঘনাবে, চরিতার্থ আমার আকাঙ্ক্ষা, তখন তারই

খুশির টানে তোমাকে ফিরিয়ে নেব, আমারই আশ্রয়ে! প্রশ্ন করো না, সন্ধান করো না, পরিকল্পনা করো না। আমার ইচ্ছা প্রবাহিত হোক তোমার মধ্যে— যেমন শঙ্খের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্র।

এইটুকু কেবল বুঝে নাও— কোন পদক্ষেপ ব্যর্থ হবে না। একটি চেষ্টাও বিফল হবে না, পরিণতিতে। কর্ম থেকে অল্প হোক স্বপ্ন। এখানে-ওখানে তুচ্ছ কারণে ঘুরবে, ফিরবে তুমি, কিন্তু তোমার সকল যাতায়াত, শেষ পর্যন্ত বিরাট পরিণতির সহায়ক হবে। তুমি অনেকের সাক্ষাৎ পাবে, কথাও বলবে তাদের সঙ্গে, কিন্তু জেনো, কেবল কয়েকজনই শুরু থেকে আমার; তাদের সঙ্গে গোপন সংকেত বিনিময় করবে, আর তারা অনুসরণ করবে তোমাকে।

কী সে সংকেত?

যারা আমার— তাদের হৃদয়ে ঝলসায় কালীর বলিদানের খড়্গ। মাতার খড়্গ-অবতারের, তারা অন্যতম উপাসক। তারা মৃত্যু প্রেমিক—। জীবন প্রলুব্ধ নয়, তারা ভালবাসে ঝড়-ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তারা আসবে, তোমার কাছে না জ্বালা মশাল নিয়ে— আগুনের জন্য। উপচীয়মান পৃথিবীর উপর দিয়ে আমার কণ্ঠ ডাক দিয়ে ফিরছে, জীবনের জন্য— নরপতিগণের প্রাণ ও রক্তের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে। মনে রেখো— যে আমি চীৎকার করে ডাকছি, সেই ডাকে উত্তর কি করে দিতে হয়, তাও দেখিয়ে দিয়েছি। এইটুকু জেনো— সর্বক্ষেত্রে মাই সর্ব্বপ্রথম— মৃত্যুতে ঝাঁপও দেন তাঁর শাবকদের রক্ষার জন্য। ধর্ম্মকে যে নামই দেওয়া হোক, তা চিরদিনই মৃত্যুপ্রেম। তার মধ্যে আজ, বিশেষভাবে সেই দিন এসেছে, যখন আমার হাতে জ্বলছে ত্যাগের আগুন, যা মানুষকে বিচারবুদ্ধি থেকে ছিঁড়ে এনে দগ্ধ করবে দারুণ বাসনায়। আমার চিহ্নিত মানুষেরা, প্রথম ঝাঁপ দেবে ত্যাগে, যেমন অন্য মানুষেরা ছুটছে ভোগে। শ্রম, সেবা, পীড়ন, যন্ত্রণাকে তখন মিষ্ট লাগবে— তিক্ত নয়। মহাকালের বুকে মহান এই লগ্ন— এখন আমি মহাকালী, সেই আমিও জাতি-সমূহের জননী!

সঙ্কুচিত হয়ো না পরাজয়ে, আলিঙ্গন কর উপাস্যকে। সুখের থেকে ভিন্ন নয় যন্ত্রণা— এখন উভয়কে, চাই আমি। অশ্রুর জগতে এসে, তাই আনন্দ করো, আর দেখ, আমি হাসছি। মানুষের সঙ্গে এখানেই আমার মিলনকুঞ্জ। এখানেই হৃদয়ের গভীরে, আমি তাদের টেনে নিই।

আমার বিরোধী-স্বার্থের শিকড়, উপড়ে ফেলো। আমি যখন কথা বলব, তখন প্রেম, বন্ধুত্ব, সুখ, আশ্রয়— কোন কিছুর স্বর যেন শোনা না যায়, প্রাসাদ ছেড়ে এসে ভয়ানকের সমুদ্রে নিমজ্জিত হও। বিলাসের কক্ষ ছেড়ে এসে, জ্বলন্ত নগরীর প্রহরী হও। এই জানো যে, একটির মত, অন্যটিও মায়া। নিয়তির সামনে দাঁড়াও সহাস্যমুখে।

নিজের জন্য করুণা চেয়ো না। তোমাকে আমি অপরের জন্য করুণাবারি বহনের আধার করে তুলবো। সাহসের সঙ্গে মেনে নাও নিজের অন্ধকারকে, আর তোমার প্রদীপ উৎফুল্ল করুক বহুজনকে। নিম্নতর কাজ করো সানন্দে; উচ্চপদ ত্যাগ কর অনাকাঙ্ক্ষায়।

যে কঠোর কাজে তোমাকে নিয়োগ করেছি, খাড়া থেকো তাতে। বয়নের কাজ করো সযত্নে। তোমার কাছে দাবি করা হয়েছে— সে দাবী পূরণে পিছু হটো না। ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কথা, ভুলে যাও, পুরস্কারের প্রত্যাশা রেখো না। কঠিন 'নির্ভয়' প্রতিজ্ঞায় স্থির তুমি।

সূর্য্য যখন অস্ত যাবে, খেলা যখন সাঙ্গ হবে, তখন তুমি অবশ্যই জানবে, হে বৎস আমার "আমি কালী; আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমাদেরই মাতা।"

হাতে এসে গেল। নিবেদিতার "কালী দি মাদার" বইখানি। পাঠে বিচলিত হলেন। আর স্থির থাকা সম্ভব হল না। এ যে স্বয়ং চণ্ডীর ডাক : আমি কালী, আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ। নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে— আমি তোমাদের মাতা!.. চাই বলি, যে বলি হবে বুকের রক্ত

দিয়ে, আত্ম-নিবেদনের মধ্যে। শুধু আত্মনিবেদন নয়, প্রয়োজন নরমুণ্ডের। — এরই নাম মাতৃপূজা! ...কাজের মধ্যে ঘুরে ফিরে ধ্বনিত হতে লাগলো এই কাহিনী।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। 'হিন্দু প্রকাশ' কাগজে লিখলেন কয়েকটি প্রবন্ধে। কোন সাড়া পেলেন না। মন দিলেন সংগঠনের কাজে। স্ত্রীকে পত্র দিলেন : অন্য লোক স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত, বন, পাহাড় পর্ব্বত, নদী বলে জানে। আমি স্বদেশকে 'মা' বলে জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসে যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহলে ছেলে কি করে? নিশ্চিত ভাবে, আহার করতে বসে— স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করতে বসে? না— মাকে উদ্ধার করতে ছুটে যায়।

সঙ্গী পেলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুরু হল লোক বাছাই, সংগ্রহ ও দল ভুক্ত করার চেষ্টা। সেই সঙ্গে পত্তন হল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুকরণে নানা আখড়া— চলতে লাগলো ব্যায়াম। লাঠিখেলা— ঘোড়ায় চড়া ও অস্ত্র শিক্ষার প্রসার।

ইতিমধ্যে খবর পেলেন স্বামিজীর দেহত্যাগ, শিষ্যা নিবেদিতার সঙ্ঘত্যাগ, সরলা দেবী, ওকাকুরা ও সুরেন ঠাকুরের দল গঠনের কাহিনী। খবরের কাগজে পেলেন নিবেদিতার সফর বক্তৃতার ধারা।

বরোদায় এলেন নিবেদিতা। পরিচয় হল উভয়ের। লোক চিনতেন নিবেদিতা। প্রথম আলাপেই চিনলেন। বললেন: নিশ্চয় আপনি কালী উপাসক! উপহার দিলেন স্বামিজীর 'রাজযোগ'। ইঙ্গিতে বিপ্লব পথযাত্রী! সুতরাং মনের দ্বার খোলা হয়ে গেল। প্রকাশ করলেন পরস্পর স্বকীয় সংগঠনের গোপনে বার্তা। শলাপরামর্শ করে স্থির করলেন: তাঁরা সমষ্টিগতভাবে পরস্পরের মত বিনিময় ও কাজ একত্রে শুরু করবেন।

নিবেদিতা ২১শে অক্টোবর বক্তৃতা দিলেন 'প্রাচীন ও নতুন', ২২শে দিলেন 'এশিয়ার ঐক্য'। ২৩শে দিলেন 'শক্তিপূজা'। রাত্রে মহারাজার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। চিঠি পড়ে উৎসাহিত হলেন।

২৩শে অক্টোবর ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন, আমার খোকা এসেছিল। আমার আশঙ্কা সত্য হয়েছে, তারা অন্যপথে কলকাতায় গেছে। ২৯শে নভেম্বর তার সঙ্গে কয়েক ঘন্টার জন্য সাক্ষাৎ হবে বলে মনে হয়। কিন্তু শুনছি জানুয়ারীতে সে পাশ্চাত্যে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষণিক সাক্ষাতই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। পরদিন অরবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজা ও মহারাণীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং নানা আলোচনার পর তিনি বিপ্লবী সঙ্ঘকে সাহায্য দানের অনুরোধ জানালেন। আরও বললেন— অধ্যাপক মারফৎ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। কাকপক্ষীও কেউ জানবে না।

বরোদা থেকে আহমেদাবাদ এলেন ২৬শে অক্টোবর। এখানে ২৬শে, ২৮শে ও ৩০শে বক্তৃতা দিলেন! 'কর্ম্ম', 'এশিয়ার ঐক্য' ও 'স্বাধীনতা'। একদিন মহিলাগণের আসরেও উপস্থিত হলেন।

১লা নভেম্বর ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে চিঠি লিখলেন : খুব সম্প্রতি আমার এক শিষ্য হয়েছে। ...যে কিছুটা লজ্জিতভাবে পাশ্চাত্য চরিত্রের শক্তি সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করে কিছু বললো, তাকে উত্তরে বললাম— যেখানে এক বছর কি দু'বছর আগে আমি শিশু ছিলাম, সেখানে এখন আমি মা।...

আজ তিন ঘন্টা আমার খোকাকে পেয়েছিলাম— ফলে, আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। গতকাল সে এসেছিল তারই ভাষায় কঠিন, শীতল ও হিংস্র হয়ে— তারপর চলে গিয়েছিল আলোকে ও মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে। আজ কিন্তু সারাক্ষণই সব কিছু পবিত্র ও সুন্দর। অন্যের সঙ্গে যেমন বলি,

তেমনি তাকে সহজভাবে খোলাখুলি সব বলেছি। দায়িত্ব হবে তারই। আমি যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছি, তা সে বোঝে। এবং তার কথায় সে তন্ময়— পূজার সুর বা অর্দ্ধসচেতন এবং অজানিতে উন্মোচিত— আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, আদর্শকে আমি তার কাছে নামাইনি এতটুকু। আর তুমি জানো, আমার মধ্যে কোথাও কোন কপটতা নেই। সুতরাং সব কিছু ঠিক ঠাক। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম— আমি কি কোন প্রলোভনের কারণ হয়েছি? সে বললো— তুমি আমাকে স্বাভাবিক করেছ, তুমি আমাকে ঈশ্বরের সন্তান করে তুলেছ।

ইতিমধ্যে বলি, আমার খোকার কলেজীয় পার্থিব জীবন পুণরায় স্বচ্ছন্দ হয়েছে। মিঃ র‍্যাটক্লিফের মারফৎ তার স্বতন্ত্র প্রমাণ আমি পেয়েছি— সত্যই তা হয়েছে, হবেও!

এখান থেকে গেলেন বেদিয়া। কনহেরি গুহাগুলো পরিদর্শন করে দৌলতাবাদ গেলেন। সেখান থেকে ইলোরার বিখ্যাত গুহাগুলো দেখে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় ফিরে এলেন। হায়দ্রাবাদ যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অত্যাধিক বক্তৃতার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হল।

১৯শে নভেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : আমার ছোট খোকাটিকে ভালভাবে দেখতে পেয়েছি। সেইসঙ্গে যোগ করলেন ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর কোন সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই এবং তাঁর পূর্ব নির্ধারিত জাপান যাত্রার পরিকল্পনাকে যেন সুনিশ্চিত বলে ধরে না নেওয়া হয়। ওকাকুরা দু'একবছর জাপানে অবস্থা করে অচঞ্চলভাবে কাজকর্ম করুন।

ভারতের জন্য আমার কাজ এতই বিশাল যে, আমি মনে করিনা তাকে কয়েকমাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া যাবে— যে রকম প্রায় আমি কিছু আগে, প্রিয় নিগুর মোহে পড়ে কল্পনা করেছিলাম। আর এই দেশ থেকে বাইরে যাবার যথার্থ কোন প্রয়োজনও অনুভব করছি না। তুমি রিজলিতে। সবই কেমনভাবে না মনে পড়ছে! আঃ সেই ঘরটি, মহা আশীর্বাদের ঘরটি!

তোমাদের হলঘরের আগুনের পাশে বসে আছি— এই ছবি— অগন্যবার দেখি! ...আমি প্রায়ই-প্রায়ই যেন দেখি : বসে আছি, তোমাদের হল ঘরটিতে। আগুনের ধারে, ক্রমে ছায়া ঘনাচ্ছে, স্বামিজী কথা বলেই চলেছেন— অবিরাম, বাণীর প্রবাহ আর তারই মধ্যে অপরাহ্ন কখন গড়িয়ে নেমে গেছে, সন্ধ্যা ঘিরেছে অন্ধকারে। ...সব মনে হচ্ছে ব্যর্থ। শুধু ব্যর্থ নয় স্বামিজীর সেই মহাজীবন!

ফিরে এলেন কলকাতায়।

২৬শে নভেম্বর ১৯০২ লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : আজ সকালে বাইসাইকেলে করে মিঃ র‍্যাটক্লিক এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে মেঝেয় বসেছিলেন। মিঃ র‍্যাটক্লিকের ফিয়াসে আসছেন দিল্লী দরবারে। কাল দিল্লীতে। তাঁদের হনিমুন। দরবার সম্বন্ধে এটাই একমাত্র উত্তম জিনিষ।

ডিসেম্বরে মিঃ র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে কে এম জিভমের বিয়ে হল। উনিও লেখিকা। রাজনৈতিক বিষয়েও বিশ্বাসভাজন। ইতিমধ্যে নিবেদিতা রাজনৈতিক সহযোগিতায় পৌঁছে গেছেন মিঃ র‍্যাটক্লিকের সঙ্গে। স্টেট্সম্যানে এঁরই সহযোগিতায় সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করেছেন।

বারবার মাদ্রাজ থেকে ডাক আসতে লাগলো। ৮ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ যাত্রা করলেন। উঠলেন 'ফ্যাসন কার্নানে'। সঙ্গী স্বামী সদানন্দ, কর্মাধ্যক্ষ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সেখানে বাস করছিলেন— তার সঙ্গেই তাঁরা অবস্থান করতে লাগলেন।

স্বামী সদানন্দ ভুবনেশ্বরে খণ্ড-গিরিপাহাড়ে 'ক্রীসমাস-ইভ' পালনের প্রস্তাব করলেন। বক্তৃতা সূচী পূর্বেই নিদ্ধারিত, সুতরাং তাঁর ১৩ই ডিসেম্বর ঐ দিনটি পালন করবেন স্থির করলেন। সেই

উদ্দেশ্যে তাঁরা উভয়ে ব্রহ্মচারী শঙ্করানন্দকে সঙ্গে নিয়ে খণ্ডগিরি পাহাড়ে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সেন্ট লুক প্রণীত ঈশার জীবনকাহিনী। সন্ধ্যার সময় তাঁরা মোটা জ্বলন্ত গুঁড়ির চারধারে বসলেন।

একদিকে পাহাড়ের গায়ে আবছা আবছা গুহা সমূহ। অন্যদিকে নিস্তব্ধ রজনী। সুপ্ত অরণ্যানীর বায়ুকম্পিত মৃদু শব্দ। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছেন স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী। অস্পষ্ট আলোকে তাঁদের দেখাচ্ছে কৃষকের মত। পূর্ব্ব পরিকল্পনা মত পাঠ শুরু করলেন তিনি। গভীর তন্ময় হয়ে পড়ে চললেন অধ্যায়ের পর অধ্যায়। লুক প্রণীত বাণীর সরলতা স্পষ্ট অনুভূত হতে লাগলো। ক্রমে এলো মৃত্যু পর্ব্ব। সবশেষে এলো পুনরুত্থান। 'অলৌকিক' বলে অনুভূত হল না— সে কাহিনী। দিব্যমানবের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো— মনে হল, সমগ্র ঘটনা যেন প্রত্যক্ষ, সত্য ও জাগ্রত। স্বামী সদানন্দেরও অনুভূব হল— মহাপুরুষের সঙ্গে ঘটলো তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়।

সেই রজনীর তন্ময়তা ও অনুভূতি ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করলেন : ঈশ্বর করুন, আমাদের আচার্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা ও স্বয়ং মৃত্যুও যা আমাদের থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি, তা যেন তাঁর শিষ্য ও আমাদের কাছে শুধু স্মরণীয় বস্তু না হয়ে, সর্বদা জ্বলন্ত জাগ্রতভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, আমাদের সঙ্গে অবস্থান করেন। এক গভীর অনুভূতি নিয়ে তিনি স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী শঙ্করানন্দের সঙ্গে পুণরায় মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হলেন। পথে ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াড়া, গুন্টাকল প্রভৃতি স্থানে নামলেন এবং ১৯শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে ফিরে এলেন। অবস্থান করলেন এক মাস। ঐ দিন থেকেই প্রায় প্রতিদিন বহু লোকের সামনে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে চললেন। হিন্দু পত্রিকায় নিয়মিত ঘোষিত হতে লাগলো, কখন, কোথায় তিনি তাঁর বক্তৃতা বা আলোচনা করবেন। পরদিন বক্তৃতাগুলিও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ হতে লাগলো।

২০শে ডিসেম্বর 'ইয়ং মেনস হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে মৈলাপুর পাচায়াপ্পা হলে, 'ভারতের ঐক্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সভাপতি মিঃ এন সুব্বারাও। উপস্থিত থাকলেন মাদ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্র সম্প্রদায়। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন মিঃ নটেশান, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ। প্রারম্ভে তিনি শিবগুরুর নিকট প্রার্থনা করলেন : তারপর শুরু করলেন. 'ভারতের ঐক্য' কথাটি অনেকের কাছে পরিহাস্যব্যঞ্জক বস্তু, কিন্তু এই সন্ধ্যায় তাঁরা সমবেত হয়েছেন ভবিষ্যতে ভারতে ঐক্য স্থাপন সম্ভব কিনা অথবা অতীতে ঐক্য বিদ্যমান ছিল কিনা, তা চিন্তা বা আলোচনা করার উদ্দেশ্যে নয়।

হয়, এখনই ভারতবর্ষে 'একতা' আছে, নয় কোনদিনই আমাদের মধ্যে 'একতা' সম্ভব হবে না। 'একতা' নেই, একথা কাউকে উচ্চারণ করতে দেবেন না। যারা কেবল বলে বেড়ায় 'আমরা দুর্বল, বিভক্ত, আর্ত, অসহায়, পরাধীন, কিন্তু যদি আমরা লড়াই করি ও যত্নপর হই, তবে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি" তাদের এই ধরনের স্বদেশ প্রেম, ইংরাজীতে যাকে বলে 'কুমীরের কান্না'— কখনও যেন প্রশ্রয় না পায়। দেশ ও জাতির কছে মুহূর্তের জন্যও যদি, ঐ নিদারুণ ক্ষত দেখা দেয়, আমার ভয় হয়, হয়তো আমরা তাই, সত্য বলে ধরে নেব, আর কোন দিনই সেই ধারণা থেকে নিষ্কৃতি পাব না। ত্রিশকোটি লোকের সমষ্টি এক বিরাট জাতির জীবনে, একপুরুষ সময় কিছুই নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে, সাধারণ বুদ্ধি ও বিচারের প্রয়োজন, সম্পূর্ণ সুস্থতাও অপরিহার্য। 'স্বদেশপ্রেম' শারীরিক উত্তাপ বিশেষ। আমি আপনাদের নিকট একটি মাত্র শব্দ স্থাপিত করতে চাই, যে 'শব্দ' আপনাদের প্রতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যেন উচ্চারিত হয় —সেটি হল 'জাতীয়তা।'

মানব জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা অনুসারেই, মানুষ হয় মহান ও শক্তিশালী। এদেশে ভারতবাসীদের চেয়ে ইউরোপীয়েরা বেশী শক্তিশালী। এর কারণ অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট। তারা নিজ সম্প্রদায় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগ রেখে কাজ করতে সর্বদা

তৎপর। আর এদেশের লোকের কাজের ধরণ দেখলে মনে হয় না, দেশের সংহতি সম্বন্ধে এতটুকু হুঁশ এদের আছে কিনা।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি, ভারতবর্ষে এক অখণ্ড শক্তিশালী, অনুপম মহান, ঐক্যে বিরাজিত। আশা করি শীঘ্রই সেই সময় আসছে, যখন সকলে, সেই ধারণাই পোষণ করবে, সেই শক্তির বলে, কাজ করতে সত্যই সমর্থ সে সকল সময়।

পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুজাতিই প্রত্যক্ষ করেছে যে, মনই জগতের সৃষ্টিকর্তা; জগৎ মন সৃষ্টি করেনি। আমরাই জগতের স্রষ্টা? উদীয়মান তরুণ ছাত্রসম্প্রদায়, যাদের মন নবীন ও মুক্ত, যাদের সম্পর্ক কেবল আগামীকালের সঙ্গে, তাদের কাছে একথা বিশেষরূপে সত্য! আমরা শুনে থাকি যে, পঞ্চাশ বছর আগে ভারতে একতা বলে কিছু ছিল না। একথা সত্য যে, ডাকবিলির প্রচলন, রেলপথে যাতায়াত ও ইংরাজী ভাষার ব্যবহার, এক বৃহত্তর অখণ্ড ভারত গঠনে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের পূর্ব্বে ভারতে ঐক্য ছিল না, এই ধারণাকে আমি অবজ্ঞার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চাই। যদি ভারতের নিজস্ব ঐক্য না থাকত, তবে বাইরে থেকে কোন প্রকার ঐক্যসাধন সম্ভব হত না।

উপসংহারে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আপনার কোন মতেই জাতীয়তার জন্য ধর্ম পরিত্যাগ করবেন না। সব রকম শৃঙ্খল চূর্ণ করুন। প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে, অন্তরের অন্তঃস্থলে হৃদঙ্গম করে, তাকে নূতনভাবে প্রকাশ করা চাই। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এই দক্ষিণাত্যে, স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল— ভারতের প্রতি তাঁর সেই মহৎবাণী উচ্চারণ করে আমি বক্তব্য শেষ করতে চাই। উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত!

বক্তৃতা শেষে, মি. নটেশন ও অধ্যাপক রঙ্গচার্য্য তাঁর বক্তব্যের অকুণ্ঠ প্রশংসার পর ধন্যবাদ প্রদান করলেন।

২১শে ডিসেম্বর ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে পত্র দিলেন: সেদিন ১৩ই ডিসেম্বর, শনিবার সন্ধ্যা, সদানন্দ বললেন, খণ্ডগিরিতে ক্রীশমাস ইভ উদ্‌যাপন করতে গেলে কেমন হয়! মর্ম্মরিত বৃক্ষসহ, দক্ষিণে খাড়া পাহাড়, আর জনহীন গুহাগুলি আর আমরা নীচে ঘাসের উপরে বসে আছি, দীর্ঘ শিখা, কাঠের আগুনকে ঘিরে। সদানন্দ ও ভাইপো স্বামী শঙ্করানন্দ রাখালিয়ার সাজে দীর্ঘদণ্ড নিয়েছে। কম্বলে আধখানা ঢেকেছে মাথা। আমরা পড়তে লাগলাম প্রাচ্যের জ্ঞানী মানুষদের কথা, মঠবাসী রাখালদের কাছে রাত্রে দেবদূত আগমণের কথা।

পাতার পর পাতা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় এগিয়ে গেলাম। সেই শেষ অধ্যায়ের সত্যতা ও সরলতা কী অপূর্বভাবে অনুভূত হয়ে উঠলো— যার মধ্যে ফেলে-যাওয়া শিষ্যদের কাছে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরপুত্রের আকুতির ইতস্তত রেখাঙ্কন।...

পুনরুত্থান আর আমার কাছে স্পষ্টস্থূল আলৌকিকতা নয়। অতি গভীর আধ্যাত্মিক মানুষের কাছে যা প্রায়শঃ অনুভূত হয়, এমন বাস্তব সান্নিধ্য, একবার সে অনুভূতির সূচনা হলে, তা একেবারে সর্ব্বগ্রাসী চেতনা। পাকা সন্দেহবাদীর ক্ষেত্রেও একই ঘটে। পুণরুত্থিত জীবনের চল্লিশটি দিন— ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্ব্বেকার তিন বৎসরের অপেক্ষা বহু বহুগুণে ঘনিষ্ঠতর, মধুরতর, পবিত্রতর অথচ তথা অধরা ও অতীন্দ্রিয়!

আমার কি মনে পড়েনি যে— শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সপ্তাহ মধ্যে স্বামিজী একটি জ্যোতির্ময় রূপ দেখেছিলেন। আমার নিজের ক্ষেত্রেও তাঁর জ্বলন্ত চিতা থেকে উড়ে আসা বার্তা, অন্য একজনের কাছে পাঠানোর জন্য, মঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হল, সেই গোড়ার দিনগুলিতে এইসব মুহূর্ত কি আমাকে স্মরণ করতে হয় নি? এই পুণরুত্থানের সত্যতা কি বুঝিনি।

এবং সেইকালে 'পুণরুত্থান' লেখকের দুর্গতিকে আমি স্বয়ং উপাসনা করিনি, যে লেখককে এখানে ওখানে ফুটে ওঠা ইশারাকে ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করতে হচ্ছে, কিন্তু দেখেছেন, তাঁর নিজ লেখনীতেই ইশারাগুলি স্থূল অবয়বে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

মেরী ম্যাগডালেনের গল্পটি। এই লোকটি যদি প্রফেট হয়, তাহলে এর জানা উচিত, এই নারীকে এবং কি জাতীয়? একেবারে সঠিক ঘটনা। আমরাও কি অনুরূপ ক্ষেত্রে হাজারবার ছিদ্রান্বেষী সমালোচনা না শুনিনি?

মনে উদিত ভাবনার তৎক্ষণাৎ উত্তরও এসেছিল— প্রত্যক্ষ উত্তর একইসঙ্গে, অপ্রত্যক্ষও এবং সুমহান। অপরূপ কথা— প্রাচ্যের প্রাণবাণী যেন উন্মোচিত হয়েছিল একটি মাত্র ভাষণে। আমিও শুনেছি, ঠিক একই ধরনের উত্তর, একই জাতীয় ভাবনার ক্ষেত্রে।

প্রান্তরবাসী রাখালদের বিষয়ে সদানন্দ বললেন, দেবদূতরা নিশ্চয় তাদের কছে এসেছিলেন, কারণ তারা সাদামাটা লোক। সদানন্দের মতে, রাখালদের অমার্জিত ভাব কাহিনীর সত্যতা দেখিয়ে দেয়, কারণ তাদের পক্ষে কথার কারুকার্য করা সম্ভব নয়। 'কিন্তু মেরী' এই সমস্ত জিনিষ অন্তরে ধরে রেখেছিলেন এবং তার অনুধ্যান করতেন...

The story of Mary and Martha

The last judgement 'In as much as ye did it upto one of the last of these, ye did upto the India if the three disciples who offered themselves....

অতএব খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের পুরাণ কথা পুণরায় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে পুণঃ নির্দ্ধারিত পুণঃ প্রতিষ্ঠিত— এই প্রাচ্যদেশের প্রজ্ঞা, চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনের দ্বারা আলোকিত হয়ে।

২১শে ডিসেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে চিঠি দিলেন :

লোকজনকে চালিত করার ব্যাপারে প্রিয় নিগুর শক্তি এত বেশী যে, তাঁর ছোঁয়ায় তারা যোজনদূর এগিয়ে যায়, আর সে না থাকলে পিঠ উল্টে পড়ে।... তোমাকে সত্যি কথাটা জানাচ্ছি : গোটা বালিগঞ্জ সম্পর্কে আমার মোহমুক্তি ঘটেছে। সরলা এখন জগন্মাতার পার্থিব প্রতিনিধিত্বে প্রতিষ্ঠিত। সে আমাকে লিখে পাঠাচ্ছে, ডঃ বসুকেও বলছে, তার বাহিনীতে ঢুকে পড়তে। তাঁর পত্রিকা নাকি দারুণ কাজ করছে। কালী উপাসনা ইত্যাদি প্রচার করছে। মধ্যবর্তীকালে তাদের একটি প্রাণীও দেখতে যাচ্ছি না, যে তার মূল্যবান মস্তক সম্বন্ধে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি। যতই তাদের তীক্ষ্ণ কাকলি ও বকবকানি এগিয়ে চলে, ততই আমি চুপ করে যাই। নিগুর সময় বৃথাই ব্যয়িত হয়েছে।

...কি অদ্ভুত আমি। এখন এই গোষ্ঠীর সর্ব্বপ্রচার সংস্পর্শ থেকে নিজের ছেলেদের সরিয়ে রাখার জন্য অতীব উৎকণ্ঠিত! সেটা দেখিয়ে দেয়, স্বামিজী এই গোষ্ঠীর সঙ্গে কেন আমার সংযোগের বিষয়ে এত বিরক্ত ছিলেন।

২১শে ডিসেম্বর ১৯০২, মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন :

আমার ছোট্ট খোকা এখন বিশেষ শক্ত সামর্থ ও সুন্দর। একে ভালবাসার আগে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, আমি এত ভালবাসতে পারি! আমরা আমাদের সকল সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা বলছি। সে মুক্ত আত্মা, কোন কিছুর উপরই নির্ভরশীল নয়, আমার প্রাণ শান্তি পেয়েছে, তা শুনে। সেন্ট সারার কাছে অনন্ত ঋণ— আমাদের এই কথাবার্তা সম্ভব হয়েছে বলে। তবু ব্যাপারটা যেভাবেই হোক, শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়াতো। কেবল জানতাম, আমি তাকে (ডাঃ বসুকে)

অকারণ বেদনা দিতাম। আহা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ তিনি যেভাবেই হোক আমাকে সেবা ও ত্রাণ করার শক্তি দিয়েছেন।

২৩শে ডিসেম্বর এক মহিলা সভায় তাঁর বক্তৃতা দিবার কথা ছিল কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ সে সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না। ২৭শে ডিসেম্বর পুণরায় সে সভায় অভিবেশন হল। নির্দ্ধারিত দিনে বক্তৃতা না করার কারণ দেখিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে মাদ্রাজের মহিলাদের উদ্দেশ্যে "খোলা চিঠি" নাম দিয়ে এক বিবৃতি দিলেন। হিন্দু পত্রিকার ২৪শে তারিখে তা প্রকাশিত হল।

'আমি বুঝেছি, আমার গুরুদেবের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবশতঃই আপনারা দলে দলে সভায় সমবেত হয়েছিলেন। যদি আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হত এবং আপনাদের নিকট বর্ণনা করতে পারতাম, পাশ্চাত্যে আমাদের নিকট তাঁর আগমনের কি অর্থ এবং তাঁর স্বদেশবাসীর উপর তাঁর কী প্রচণ্ড আশা ছিল, তাতে সত্যই আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করতাম।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ, ভারতের পুরুষের চেয়ে নারীর উপরেই বেশী নির্ভর করেছে। আর আমাদের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ। একমাত্র ভারত ললনাই প্রাচীনকালে সানন্দে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করতো, তাকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারতো না। সীতা, ভারতের নারী ছিলেন, সেইরকম সাবিত্রী ও উমা। কঠোর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে লাভ করা এই হল ভারতীয় নারীর 'চিত্র'। সকল দেশেই, জাতি তার পবিত্রতা ও শক্তি, এই দুই সম্পদ, রক্ষার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত করে এসেছে, পুরুষের উপরে নয়। মুষ্ঠিমেয় পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত হয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশকেই জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি এবং মহত্ত্বের উৎস যে গৃহপরিবেশ, 'তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত।' ভারতীয় মাতা ও বধু, আপনাদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্য, তাঁদের মায়ের কাছে কতদূর প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অসংখ্য নারী, তপস্বিনীর মত নীরব, শান্ত, জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন! বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐ সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে বহির্জগতে, সংগ্রামের দ্বারা নয়।

আজ আমাদের দেশ ও ধর্ম দারুণ দুর্দ্দশায় এসে পড়েছে। ভারতমাতা এই মুহূর্তে তাঁর মেয়েদের বিশেষভাবে আহ্বান করছেন, তাঁরা যেন প্রাচীনকালের মত, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে, তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। কী করে তা সম্ভব হবে? আমাদের সকলেরই এই প্রশ্ন! প্রথমতঃ হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলুন। এছাড়া, জাতীর পক্ষে, তার প্রাচীণ বীর্যলাভ, সম্ভব নয়। ভারত ছাড়া, পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান আদর্শ নেই, যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর কোথায় তাকে রক্ষা করার আশা পোষণ করা যেতে পারে? ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যেই, সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁর সন্তান মহৎ হবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই দুঃখ কাতরতা— সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরাবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদগ্রস্ত, তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, দেশে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে, এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই স্বদেশের কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েছি, জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন ও শ্রদ্ধা। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত জননী নন? আমরা কি তাঁকে মহাভারতরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করব না?

প্রিয় জননী ও ভগিনীগণ, আমার মনে হয়, আমার গুরুদেব এই সকল কথাই আমার চেয়ে আরও সুন্দর ভাষায় আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতেন।

একান্ত অযোগ্যা আমাকে, সম্মান দেখিয়ে আপনারা যে তাঁকেই সম্মান দেখিয়েছেন, সেজন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার সতত অনুরোধ, যিনি আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করে, আপনাদের স্বদেশবাসী করেছেন, তাঁর জন্যই আমাকে আপনাদের কনিষ্ঠা ভগিনীরূপে (এই সুন্দর এবং পবিত্র ভূমিকে ভালবাসে ও আপনাদের সেবা করবার আকাঙক্ষা পোষণ করে) স্মরণ করবেন ও আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। এই সঙ্গে আমি স্বামী বিবেকানন্দের পিছনে সর্বদা অবস্থিত তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও সেই জগজ্জননী কালী; যাঁর শক্তি এই দুই মহামানবের মধ্য দিয়ে কাজ করেছিলেন এবং নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যেও কাজ করবে, তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

সেই মহামায়ার নামের ভরসা করেই আমি নিজেকে আপনাদের সামনে দাঁড় করিয়েছি।

১৯শে ডিসেম্বর থেকে বক্তৃতা ছাড়াও প্রতিদিন নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করে চললেন। সেগুলি সকলের চিত্ত জয় করল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের দূরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' খোলা হয়েছিল, যেখানে সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাশে পাঠ, পূজা, ভজন ছাড়া গরীব ছাত্রদের শিক্ষার সাহায্যদানের ব্যবস্থা তিনি চালু করেছিলেন। এসব দর্শনে মুগ্ধ ও আনন্দবোধ করলেন। তাঁদের কাছে, বক্তৃতাও দিলেন। এই সমিতি গুলির কাজ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করলেনঃ (Notes on National Education in India)। যার বিষয়বস্তু ছিল : স্বামিজী, অধ্যাপক, শিক্ষক ও শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে আলোচনার দ্বারা আকৃষ্ট ও উৎসাহী করে তুললেন। দলে দলে সকলে যে আহ্বানে যোগ দিলে, তাঁদের কাছে ভারতীয় ধর্মের ব্যাখ্যায় অতীতকে প্রাণোজ্জ্বল করে তুললেন। সেই সঙ্গে দৃঢ় কণ্ঠে দুঃখিনী দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে জীবনপণ করার ...হ্বানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আবেদন করলেন : আপনারা জাগুন। দেশের হিতে জীবনপণ ব্রত গ্রহণ করুন।

উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হলেন শ্রোতৃবৃন্দ। ফলে তাঁর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের আয়োজন করা হল। কমলেশ্বরম, পেটাপ্রোগ্রেসিভ, ইয়ুনিয়নের উদ্যোগে স্যার আন্নামালাই মুদালিয়র রিডিং রুম হলে, হিন্দু ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'মৈলাপুর পাচয়াম্পা হলে এবং ট্রিপ্লিকেন লাইব্রেরী হলে' তিনি পর পর ভাবণ দিলেন। কাঞ্চীর স্টেশন ও উচ্চবিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতায় অধিক সমাগম হল। প্রত্যেক বক্তৃতার মধ্যে নবীন বার্তা : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাপুরুষগণ', 'হিন্দু দর্শনে ধর্ম'। প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশে নূতন আলোকপাত করে চললেন।

২১শে ডিসেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : স্বামিজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই জীবনই ভারতের অখণ্ড সত্য। ...মনে পড়ছে, ২৯শে জুন, রবিবার স্বামিজীর কথা : ঠিক, মার্গট ঠিক, আমি দেখতে পাচ্ছি— এখন তোমার এই এই বিশ্বাসের কাল। আগে তোমার ব্রাহ্ম বিশ্বাস ছিল, টেগোর বিশ্বাস ছিল, বর্তমান তোমার ঐ সকল (ওকাকুরা কেন্দ্রিক) বিশ্বাস। এগুলিও যাবে যেমন গেছে অন্যগুলি। সেদিন মনে হয়েছিল— এটা তাঁর ব্যক্তিগত খেয়াল বা অসুস্থতার ঝোঁকের কথা— আর আজ সেই শব্দগুলি আমার কানে মধু বর্ষণ করছে। স্বামিজীর অনুসরণে বুঝতে পাচ্ছি, ভারতের মত বিরাট দেশের মুক্তি খুব অল্প সময়ে কয়েকটি খুচরো সন্ত্রাসমূলক কাজের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়— তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে, নিগুকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তার ওপর কোনরকম দাবী যেন আমরা না রাখি।... আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের জন্য কোন সাহায্যের দরকার নেই।

স্বামিজীর বাণী ছিল : উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত! ভারতবাসী তোমরা উঠো, জাগো... তাদের ডাক দিয়ে বললেন : দেশের জন সাধারণ, মানুষ হও? স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হও, দিবারাত প্রার্থনা কর 'মা আমায় মানুষ কর।...

নিবেদিতা তাঁর এই আদর্শকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন তাঁর বাণীকে। জাতীয়তা, জাতীয়ভাবের সমন্বয় ছাড়া ভারতের ঐক্য সম্ভব নয়। ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া ধর্মের সংরক্ষণ বা ধর্মের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তিনি নিজের মধ্যে একটা অস্থিরতা অনুভব করছিলেন। কী উপায়ে তা সমগ্র দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধের জাগরণ আনতে পারবেন। মনের মধ্যে সর্বদাই একই চিন্তা : স্বামিজীর অসমাপ্ত কাজ To awake the nation' —জাতির মধ্যে জাগরণ আনায়ন।

স্বামিজী সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন, জলদগাম্ভীর কণ্ঠে যুবকগণকে আহ্বান করেছেন : "আগামী পঞ্চাশ বছর, সেই পরম জননী মাতৃভূমিই হোক তোমার উপাস্য দেবতা— অন্যান্য দেবতাগণকে এই কয় বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই।"

তিনি দেশকে জাগ্রত করার কাজ আরম্ভ করে গেছেন। তাঁর অগ্নিগর্ভ ভাষণে দেশের সর্বত্র একটা গভীর উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল— তা উদ্দীপ্ত রাখার দায়িত্ব এখন তাঁর। স্বামিজীর উদ্দেশ্য: অখণ্ড ভারতের উজ্জ্বল, গৌরবময় চিত্র প্রদর্শনী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ, ভাষাগত, বহু অনৈক্যের মধ্যে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন প্রভৃতির মধ্যে যে গভীর ঐক্য, যে অপূর্ব সমন্বয় বিরাজ করছে— সেটা মৌলিক ও প্রাথমিক। এটা বহুত্বের মধ্যে একত্ব, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য। নিবেদিতা তাঁর ভাষণে তাঁর গুরুর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর আদর্শ ও মহিমা প্রচার করে চললেন। বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনুধাবণের একান্ত প্রয়োজন, প্রচার করতে লাগলেন : দেখতে পাচ্ছি। আমাদের জনসাধারণ ভারতবর্ষের সর্বত্রই সমবেত হচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনায়। এখন কর্ম নয়, কেবল প্রার্থনা। আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করুন— এই দুই মহাজীবনের মধ্যে সমগ্র ভারতের ঐক্য রয়েছে। এই দুই মহাপুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করার, সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

স্বামিজীকে আবিষ্কারের দাবী মাদ্রাজবাসী করতে পারেন। তাঁরাই তাঁকে শিকাগো মহাসভায় প্রেরণ করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। আবার বিজয়টীকা নিয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তনে, অধীর মাদ্রাজবাসীগণ, তাঁকে রাজোচিত সম্বর্ধনায় সম্বর্দ্ধিত করেছেন। তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা, তাঁর গুরুর মতই সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ, জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় ব্রতী। প্রত্যক্ষ করলো সমগ্র মাদ্রাজবাসী।

এক সময়ে স্বামিজী বলেছিলেন, সমগ্র ভারত তাঁর ভাবে মুখর হয়ে উঠবে (India shall sing with her)। 'সেই বাণী' সফল করে তুললো নিবেদিতার সফর।

নতুন বছর এসে গেল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রথম স্বামিজীর জন্মতিথি পালনের উদ্যোগী হলেন। ইতিমধ্যে খবর এল, ক্যাসল কার্নান ভবনটি হস্তান্তরের ব্যবস্থা চলছে। এই ভবনটির মালিক ছিলেন মিঃ বিলিগিরি আঙ্গায়ার। স্বামিজী আমেরিকা থেকে প্রথম যখন প্রত্যাগমন করেন, এখানেই অবস্থান করেন। এবাড়িটি স্বামিজীর পাদস্পর্শে পূত। এখানেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ শুরু করেন ও এখনও অবস্থান করছেন। নিবেদিতা অত্যন্ত বেদনাবোধ করলেন; যদি তাঁর অর্থ সামর্থ্য থাকতো তিনি কখনই হস্তান্তর হতে দিতেন না।

২০শে জানুয়ারী স্বামিজীর জন্মতিথি পালন করা হল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও নিবেদিতা তাঁর স্মৃতিভারে উদ্বেলিত চিত্ত। সারা সকাল পূজাপাঠে তাঁরা মগ্ন রইলেন।

ক্রমাগত একটানা বক্তৃতায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত নিবেদিতা। তখনও সমানে তাঁর বক্তৃতার অনুরোধ আসছে— অথচ শরীর প্রায় বিপর্যস্ত। কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। স্থির করলেন তিনি কলকাতা ফিরে যাবেন। হিন্দু পত্রিকায় ২০/১/১৯০৩ তারিখে ঘোষণা করা হল : একান্ত বিশ্রাম প্রয়োজনে নিবেদিতা মাদ্রাজ ত্যাগ করছেন।

বিকেল তিনটে। ক্যাসল কার্নানে থেকে চিঠি লিখতে বসলেন মিস ম্যাকলাউডকে : স্বামিজীর জন্মতিথি আজ, সুতরাং তোমাকে কিছু লিখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারা সকাল পূজায় কেটেছে। এখন ঘন্টা খানেক বিশ্রাম নিচ্ছি। আগামীকাল সকালে কলকাতা যাত্রা করবো। বাড়ী পৌছে, তৃপ্তি পাবো। স্বামিজীর প্রতিটি মতকে এখন ফিরে ফিরে অনুভব করতে পারি। আমি যেন অনুভব করছি দশহাজার বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারি, যাদের কথা তিনি সর্বদা বলতেন, যেমনভাবে তিনি রামকৃষ্ণ তৈরী করার কথা বুঝতেন, ভাবতেন।

নিবেদিতার বক্তৃতা সফরকে সার্থকভাবে সাহায্য করলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। প্রতিটি সভায় দিনের পর দিন উপস্থিত থাকলেন, উৎসাহ দিলেন। ঘনিষ্ঠতা তাঁদের আন্তরিকতার পর্য্যায়ে উপস্থিত। তিনিও ব্যাথা বোধ করলেন কিন্তু বহুকাজ যে তাঁর সম্মুখে।

নিজেকে বিস্মিত রাখার জন্যই ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করে বেড়ালেন নিবেদিতা। অনুক্ষণ বিরাট কর্মপ্রবাহে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। এছাড়া অন্য উপায়ও তাঁর ছিল না। শোকে মুহ্যমান হওয়ার অবকাশ কোথায়? অসমাপ্ত তাঁর কাজ, পূর্ণ তাঁকে করতেই হবে। সে ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত করে গেছেন স্বামিজী। সে শূন্যতা ও উত্তেজনার ক্রমহ্রাসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে ধীর ভীবে চিন্তা করার মানসিক স্থৈর্যলাভ করলেন। বার বার মনে মনে পড়তে লাগলো স্বামিজীর কথা : "স্বদেশের নারীগণের উন্নতিকল্পে আমার কতকগুলি পরিকল্পনা আছে, তুমি একাজে সাহায্য করতে পার"। তাঁকে ভারতে আহ্বানের পশ্চাতে : এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। মাদ্রাজে অবস্থানের সময় স্বামী সদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন— বোসপাড়া লেনকে কেন্দ্র করে নানা কাজের প্রসার ঘটাতে হবে। বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন অথচ সে কাজ একার দ্বারা সম্ভব নয়। শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের প্রয়োজন। ১৯০২ সালে স্কুলটি পূর্ণ চালু করার পরে নিজে পরিপূর্ণ মনযোগ দান করতে পারেন নি। বেটের উপর সে ভার অর্পণ করেছিলেন। বক্তৃতা সফর বর্তমানে শেষ। জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ, এবার স্কুলের দিকে মন দেবেন ও আরব্ধ পুস্তকটি শেষ করবেন স্থির করলেন।

বিগত ২৩শে আগস্ট, তাঁর উদ্যোগে তাঁরই অনুগত মিঃ জি. এন. মুখার্জী বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল : এখান থেকে জাতীয়তাবাদের প্রচার কার্য চালাবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটি পরিণত হল ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানে। ২৪শে জানুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন: নতুন ধরনের মঠ তৈরীর কথা ভাবতে শুরু করেছি। সেখান থেকে ছাত্রদল জাতীয়তাবাদ শিক্ষা লাভ করবে।

এমন কিছু করো না। বালীগঞ্জ গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক পূণঃস্থাপিত হতে পারে। এ সম্পর্ক অপদার্থ, অপদার্থ, অপদার্থ! ...ওদের বচনে বীরত্ব, কর্মে প্রস্থান, সে বিষয়ে কিছু তথ্য যোজনা করা যায়।

২৭শে জানুয়ারী থেকে নিয়মিত স্কুলের কাজ আরম্ভ করলেন। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক তখন ছিল না কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালীতে মুখে মুখে পাঠ দেওয়া হতো। এছাড়া সেলাই, ছবি আঁকা ও খেলাধূলাই ছিল প্রধান। তিনি নিজে শিক্ষাবিদ। জানেন, স্নেহ, মমতার মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনের ভিত তৈরী করা সম্ভব। সেইসঙ্গে স্থির করলেন প্রতিটি ছাত্রীর, প্রগ্রেস রিপোর্ট তৈরী করবেন।

২৮শে জানুয়ারী লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : আমি শুধু শক্তি চাই, সর্বপ্রকার শক্তি। ...শক্তি আর আলোক— তাহলে দশবছরই যথেষ্ট। ...সত্যই আমি একাকী কাজ করে আনন্দ পাই স্বামিজীর মতই! প্রিয় য়ুম। তিনি মানুষ চাই বলে আর্তনাদ করতেন কিন্তু তিনি জানতেন না যে, যবনিকা পতনের পূর্বে, কোন ভাবের জন্য তিনি দেহধারণ করেছিলেন তা পরিষ্কার হবে না। সেই 'ভাব যখন উন্মোচিত হবে, তখন তার চারদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে সমবেত হবে। রামকৃষ্ণের মত, তিনিও ছিলেন অচেতন, যদিও তিনি যে অসচেতন হতে পারেন, একথা ভাবতেই পারতেন না। ...মানুষ নিজেরাই আসবে— কারও সাহায্যের দরকার নেই। তিনি চুম্বক; তার টানে ইস্পাত টুকরো হয়ে ছুটে আসে।

ওকাকুরাকে অনুভব করিয়ে দেবে— আমাদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব নির্ভর করে না, করে সাফল্যের উপর, একহাতে গীতা, অন্যহাতে 'খড়্গ নিয়ে মাতৃভূমি আবার জাগ্রত হবে কখন? হে ঈশ্বর! আর কতদিন—কতদিন...

২৮শে জানুয়ারী ১৯০৩ মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : সেন্ট সারা এখানে এসে খোকার রক্ষাকর্ত্রী ও আশ্রয়দাত্রী হলে খুব খুশী হব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোকা হয়ত এখানে থাকবে না। সেক্ষেত্রে সেন্ট সারা খোকার কাছাকাছি থাকুন তাই চাই।... আমি জানি, সারার পারিপার্শ্বিক সুন্দর, যদিও সর্বাংশে তা খোকার প্রয়োজন পূরণ করবে না, তবু নিঃসঙ্গতার তুলনায় শতগুণে ভাল।

অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হল। নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও কিছু কিছু ছাত্রী তাঁর কাছে হাজির হতে শুরু করলো। তারা তাঁকে রাস্তায় দখলেই ছুটে আসতো— তিনিও তাদের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যেতেন, আদর করতেন। ফলে, কিছু উৎসাহী ছাত্রী বৈকালে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বাংলা শেখাতে আরম্ভ করলো। এদের কারও কারও ছিল আঁকার সখ। রং তুলি নিয়ে চিত্র বিচিত্র ছবি এঁকে, রং তুলি নষ্ট করতো। তার নতুন বই-এ রং মাখিয়ে একটি বই নষ্ট করে ফেলল। তাঁরা অপরাধ স্বীকার করায় তিনি রুষ্ট তো হলেনই না বরং খুশী হলেন। তাদের আদর করলেন, এই ভেবে : এরাই ভাবীকালের আলো— এরা অকপটে সত্য বলতে জানে, কপটতা শেখে না।

স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু নিয়মিতের সংখ্যা স্বল্প। ছুটলেন অভিভাবকদের কাছে। কিন্তু তাঁরা মেয়েদের শিক্ষা দিতে আগ্রহী নন। অনুনয় করে তাদের সম্মত করালেন, কিন্তু শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করা যাচ্ছে না। কারণ স্বল্প কয়েক মাসের শিক্ষার পর তাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই বাল্যবিবাহই শিক্ষার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো। শিক্ষার সঙ্গে তাদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা সত্ত্বেও, তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। যারা, সত্যই আগ্রহী ও মেধাবী, তাদের প্রতি যত্ন নেওয়ার অবকাশ থাকছে না। চিন্তান্বিত হলেন তিনি নিজে ও কৃষ্টীনও। যাদের বিবেক তীক্ষ্ণ, অনুভূতি প্রবল, তাদেরও গড়ে তোলার অবকাশ নেই, উপলব্ধি করলেন উভয়েই। এদের সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই, অন্যথা, তাদের সফলতা লাভের চেষ্টাই বৃথা! স্থির করলেন, ওঁদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ভারতে পা দিয়েই, ভারতীয় নারীগণের সঙ্গে সংযোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে ব্যগ্র হয়েছেন। করেওছিলেন। কৌতূহলী, এমনকি স্বেচ্ছায় তাঁদের বাড়ী গিয়ে আলাপ করেছেন। যেখানে, বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানেই মহিলা সভার আয়োজন করেছেন। তাঁদের স্বদেশের, প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব পালনে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন। জানতেন, মেলামেশায় সহযাত্রী হওয়ার সুযোগ আসে, বক্তৃতায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কার্যকরী ফললাভ হয় না।

ইতিমধ্যে স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক মিঃ পল নাইট ও তাঁর ভাই মিঃ রবার্ট নাইটের সঙ্গে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। মিঃ র‍্যাটক্লিফ হলেন 'একটিং' এডিটর। ফলে স্টেটসম্যানের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলো। এডিটর কলম লেখার কাজে মিঃ র‍্যাটক্লিফকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। নিয়মিত লেখা ও পরামর্শ দিতে শুরু করলেন।

মার্চ্চ মাসে কৃষ্টীন মায়াবতী থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন এবং স্কুলে যোগ দিলেন। নিশ্চিন্ত হলেন নিবেদিতা।

শিক্ষার ভার দিয়ে গেছেন স্বামিজী। সে ভার তাঁকে বহন করতেই হবে। পরস্পরের সহযাত্রী হয়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতা লাভের আশায়, তাঁদের বাড়ী কৃষ্টীন সহ গিয়েছেন, তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যেই ১৯০২ সালের নভেম্বরে 'কথকথা' ও চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা করেছেন স্কুলে। পাড়ার বাড়ী বাড়ী ঘুরে মহিলাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, উঠোনের মাঝখানে ছোট বেদী তৈরী করে কথক ঠাকুরের বসার ব্যবস্থা করেছেন। মহিলাদের বসার জন্য বারান্দায় চিকের আড়াল দিয়েছেন, ধূপ ধূনায় সুন্দর পরিবেশ তৈরী করেছেন। গঙ্গায় স্নানের পথে যাঁরা কখনও উঁকি দিতেন বা তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকে দেখতেন, তাঁদের মৃদুহাস্যে অভ্যর্থনা জানাতেন, অনুষ্ঠানে তাঁদের আমন্ত্রণ করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন : বিদেশিনী হলেও, তিনি তাঁদের মধ্যে বাস করছেন 'হিন্দু-জীবন অবলম্বনে'।

ফল পেয়েছেন বই কি! মেলামেশার অবকাশে অন্তরের সংযোগ ঘটেছে। তাদের সুখ-দুঃখের সহযাত্রী হতে পেরেছেন। যাঁরা দূর থেকে তাকাতেন, আজ তাঁরাই অবসর সময়ে তাঁর কাছে আসেন। তাঁদের ঘরের কথা বলেন, সুখ-দুঃখের কথা শোনান। তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে, সোফায় বসিয়ে নিজে তিনি মেঝের উপর বসে, তাঁদের ঘরকন্নার কথা মন দিয়ে শোনেন। এমনি করেই পরিচিত হয়েছেন এদেশের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে। মুগ্ধ হয়েছেন সে চিত্র দেখে। কৃষ্টীনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাড়ীতেও গেছেন— তাঁদের আদর যত্নে, সরলতায় আনন্দ উপভোগ করেছেন। এমনি করেই পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আত্মিক পরিবেশ। তখনই চিন্তা শুরু হয়েছিল এঁদের নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে, সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তাঁর মনের সংকল্প জানালেন। তিনি উৎসাহ দিলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ওকাকুবা জাপান থেকে কাজ করলেই ভারতের বেশী উপকার করবেন। এখান থেকে কাজ করতে চাইলে তিনি উপকারের চেয়ে, ক্ষতি করবেন বেশী। তাঁর দলের ছেলে জি এন মুখার্জীকে জাপানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করলেন। ৩রা মার্চ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : জি, এন, মুখার্জী হয়ত তোমাকে জাপান থেকে চিঠি লিখতে পারে। সে তোমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবে, কি তা জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত জানি যে, ঠিক বিষয়েই লিখবে। এই ছেলেটিই একান্ত ভক্তিতে, এখানে বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছে।

২৩শে মার্চ চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : হতভাগ্য দেশ! রুটি, রুটি-রুটি চাই তা অসুক বারুদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের দেবতা শিব কি প্রলয়ের প্রভু নন? স্বামিজীর ভবিষ্যৎ বাণী 'ভারতবর্ষ ঝঙ্কারিত হবে নিবেদিতার সুরে'— তা কি সফল করতে সমর্থ হবো?

২৬শে মার্চ ১৯০৩ মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন :

আমার 'বেচারা খোকা' তার কি যে যা-তা সময় যাচ্ছে!

২রা এপ্রিল ১৯০৩ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

আমার খোকার কাছে জীবন বোঝা হয়ে উঠেছে। ভগবান জানেন, তার ফল কি হবে। সেদিন সন্ধ্যায় তার সঙ্গে একলা ছিলাম, মনে হল যেন জমাট বিষণ্ণতার সামনে বসে আছি। তাকে যেন

নড়ানো যাবে না। ঈশ্বর করুন লক্ষ লক্ষ লোকের এই অবরুদ্ধ যাতনা, যেন শীঘ্র দূরীভূত হয়ে যায়। ছোট্ট বউটি মাতৃত্বক্ষণটির দিকে ধীরভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তাকে কত সুখী দেখাচ্ছে।

৯ই এপ্রিল চিঠি দিলেন মিস ম্যাকলাউডকে :

খোকা ডিমনষ্ট্রেশন সহ দুটি অপূর্ব বক্তৃতা করেছে। মিসেস বসু, দিন পনেরো দিনের মধ্যে সন্তান আশা করছে। অপূর্ব্ব নয় কি? এর দ্বারা নূতন জীবন ও নূতন আশার সূচনা হবে, তাই আশা করি। তুমি ভাবতেই পারবে না কী যে মধুর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে।

এপ্রিল মাসের (১৯০৩) 'বিবেকানন্দ হোম' নামে একটি আবাসিক ছাত্রাবাস খোলা হল, ৬৪/১ নং মেছোবাজার স্ট্রীটে, ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুলের পাশে। চারদিকে মুসলমান বস্তি। 'ভূতুড়ে' বাড়ী বলে দুর্নাম থাকায় স্বল্প ভাড়ায় তা পাওয়া গেছে। অধ্যক্ষ হলেন স্বামী সচ্চিদানন্দ। সঙ্গে যুক্ত রইলেন : স্বামী সারদানন্দ, বিপ্লবী নেতা মিঃ পি মিত্র, টাকীর জমিদার যতীন্দ্র মোহন রায়চৌধুরী ও নিবেদিতা স্বয়ং। তত্ত্বাবধানের ভার বিবেকানন্দ সোসাইটির। উদ্দেশ্য ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দান। সাকুল্যে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন। এই সঙ্গে বোসপাড়া লেনকে ধীরে ধীরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা পরিকল্পনাও যুক্ত হয়েছে। এটা হবে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে, সন্ন্যাসী স্বরূপ চরিত্র গঠন করা হবে। যারা ভালবাসাবে দেশমাতাকে, তাঁর সেবায় উৎসর্গ করবে জীবন। ছ'মাস পঠন পাঠন, বাকী ছ'মাস সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে, দুঃসাহসিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ভারতের অখণ্ড স্বরূপ, প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করে, নিজেদের দেশপ্রেমিক গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। স্থির করলেন : শিক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হবে, প্রত্যক্ষ পরিচয়ে। শুধু পুস্তক পাঠ নয়, শিক্ষকের উপদেশ নয়, দেশের প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে প্রতিটি প্রদেশের অধিবাসীর সঙ্গে, পরিচয়েই ঘটবে শিক্ষার প্রসারতা। উপলব্ধি করতে শিখবে সেইদিন, জাতীয়তা বা একত্বের মর্মবাহী প্রতীকী শিক্ষা। ছাত্রদের ভ্রমণ ব্যবস্থায় উদ্যোগী হলেন। স্বামী সদানন্দ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এক মহিলা এই উদ্দেশ্যে দু'শো টাকা নিবেদিতার হাতে তুলে দিলেন।

১৪ই এপ্রিল 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' নামে ভারতীয় সংস্কৃতিক সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যার বইটি লেখা শেষ করলেন। বইটির পরিকল্পনা ১৯০১ সালে। রচনায় তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু তা কার্যকরী হল নরওয়ে বসবাসের সময়। যখন তিনি মিসেস ওলিবুলের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে বসবাস করছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত আমন্ত্রিত সেখানে। তিনি তাঁকে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করলেন, এই পুস্তক রচনায়। ১৫ই মার্চ ১৯০১ তিনি কয়েক অধ্যায় লিখেও ফেললেন। ইচ্ছা ছিল পাশ্চাত্যে থাকাকালেই বইটি শেষ করবেন। কিন্তু ১৯০২ সালে ভারতে ফিরে আসার জন্য, তা সম্ভব হল না। কারণ মিস ম্যাকলাউড তাকে জাপান থেকে অধ্যাপক ওকাকুরার কিছু নোট পাঠাতে শুরু করেন এবং সেটির রূপদানের জন্য তাঁর (নিবেদিতার) সহযোগিতা কামনা করেন। নিবেদিতা ভারতে পা দেওয়ার পূর্ব্বে যে চিন্তা ও ধারনার পরিপূর্ণ ধারক ও সমর্থক ছিলেন, ভারতের বর্তমান নীতি ও নিপীড়নের চিত্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ পরিপূর্ণ উদঘাটিত হওয়ায়, এবং স্বামিজীর প্রতি মর্ম্মভেদী ব্যবহারে, ক্ষুব্ধ চিত্ত তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছিল। এর পরই দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা, তাঁকে পরিপূর্ণ ভারতসমর্থক তথা স্বাধীন ভারতপ্রেমিকে পরিণত করে তুললো। এখন স্বাধীন ভারতের স্বপ্নই তাঁর চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত। প্রথমতঃ স্বামিজীর প্রতিকাজে বিঘ্ন উৎপাদন, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতি বিরূপ আচরণ, তৃতীয়তঃ তাঁর ব্যক্তিগত কার্য্যক্ষেত্রে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘোরতর সন্দেহ, তাঁকে ভারত পথিক গড়ে তুললো। সেদিন স্বাধীন ভারতের স্বপ্নই তাঁর মজ্জাগত হয়ে উঠলো।

নিরাশ করিনি! এই-এই-এই আমার প্রার্থনা। আমি কেবল চেয়েছি তাঁর ভার বহন করতে। আমি চাই বিরাট আকারে সেবা করতে, অন্ততঃ চূড়ান্ত আকারে। উৎসর্গ করতে, যাতে নিশ্চিন্তভাবে অনুভব করতে পারি— দিয়েছি সব কিছুই!

পরিকল্পনার শেষ নেই। একটি মাসিক পত্রিকা বার করার ইচ্ছা জাগলো। বর্তমানে প্রকৃত কাজ কি তাঁর বিরাট তাৎপর্য ও অর্থ, সর্বত্র 'জাতীয়তা' শব্দটি প্রচার করা সম্ভব হবে তার মাধ্যমে। এই বিরাট চেতনা, সকল সময় ভারতকে পূর্ণরূপে অধিকার করে থাকা আবশ্যক। এই 'জাতীয়তা' দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান, দেশের প্রতি এক গভীর অনুরাগে একত্রিত হবে। ইতিহাস ও রাজনীতিকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করবে। ধর্মের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবনার সমাবেশ, 'সর্বধর্ম সমন্বয়' স্পষ্টতর হবে। বুঝতে সমর্থ হবে, রাজনৈতিক প্রণালী ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাক, গৌণমাত্র। ভারতবাসীদের 'ভারতের জাতীয়তা' উপলব্ধিই হবে প্রকৃত কাজ। পত্রিকায় এই জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

অর্থও অপ্রত্যাশিত এলো কিন্তু প্রতিবন্ধক দেখা দিল অসংখ প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য মাত্র। বাধ্য হয়ে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধ লিখে সে মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার চেষ্টা করলেন, মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাক্লাউড তখন ইউরোপে ভ্রমণ করছেন। তাঁকে তাঁদের সহযাত্রী হতে আমন্ত্রণ জানালেন।

মিসেস লেগেটকে জানালেন : আমার বইটির শেষ অধ্যায়গুলি এখনও বাকী। পত্রিকা বার করার চেষ্টায় আছি। ভারতে অবস্থান আমার একটি আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই আদর্শের সঙ্গে যুক্ত এমন কোন প্রয়োজন ছাড়া, ভারত ত্যাগের অর্থ— সেই আদর্শকে বিপন্ন করা— এমনকি জাপান যাওয়ার প্রস্তাবও ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আমাদের সামনে বহু বছরের সংগ্রাম ও তার জন্য কাজ করে যাওয়া সম্ভবতঃ এর পরিণাম পরাজয়! তাছাড়া আর কিছু দেখিনা। আমাদের কাজ একটি 'ভাবসৃষ্টি করা'— সে 'ভাব' স্বামিজীর। এই ভাবকে জন্ম দিতে পারে ধুলিমাখা ছাপাখানায়, ভীড়ের রুদ্ধ বাতাসের মধ্যে। গ্রীষ্মকালে, শৈলাবাসে এর স্থান নেই। অতীতের দিকে যখন ফিরে তাকাই মনে হয়, প্যারিসে আপনার আতিথেয়তা না পেলে কী করতাম।

মিস ম্যাকলাউডের পত্র পুণরায় ফ্লোরেন্সে থেকে এলো। একসময়ে তার কাছে 'ফ্লোরেন্স ছিল স্বপ্ন'। কত সাধ ছিল এই নগরী পর্যটন করবেন! অতীত ইতিহাস অনুধ্যান করবেন! এখন আর তাঁর ভারতত্যাগ করে যাওয়া চলে না। ইলোরা ও অজন্তাই এখন তাঁর ইটালীর ফ্লোরেন্স— যা এক বৃহত্তর ও পরিপূর্ণ কল্পনার ইটালি। ব্যর্থতা বা সফলতা যা আসে আসুক, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন সে বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বামীজীর কাজ করে যেতে পারি--- এটা প্রাণের একান্ত বাসনা!

বরোদায় বক্তৃতা সফরের সময়ে অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরিচয়টা ক্রমে ঘনীভূত হলে, তাঁকে জানিয়েছিলেন : তাঁর দলের মত, কলকাতায় একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়েছে, যার সভাপতি মিঃ পি. মিত্র, সহসভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও আরও অনেকে— তার সঙ্গে স্বয়ং যুক্ত তিনি। এছাড়া, বালীগঞ্জের সুরেন ঠাকুর সহ জাপানী আর্ট অধ্যাপক ওকাকুরাও সংযুক্ত।

১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথমে অরবিন্দ গোপনে কলকাতায় এলেন। তখন নিবেদিতা মাদ্রাজ সফরে ব্যস্ত। যোগাযোগ করলেন সুরেন ঠাকুর ও সরলা গোষ্ঠীর সঙ্গে।

১৯০২ সালের প্রথম দিকে, স্বামিজীর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। তিনি জগন্মাতার কাছে বাঙালী জাতিকে 'মানুষ করার' প্রার্থনা জানালেন। আগেও যুব সম্প্রদায় তাঁর কাছে বেলুড়ে যাতায়াত করতো, কিন্তু বিশেষ করে আকৃষ্ট হলেন, সতীশ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আদর্শ অনুসরণে এগিয়ে এলেন সতীশচন্দ্র বসু। সতীশ মুখোপাধ্যায় গঠন করলেন 'ডন সোসাইটি'। আদর্শ হল : শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জাতিকে সংগঠিত করা। আর সতীশ চন্দ্র বসু, মদন মিত্র লেনে স্বামিজীর আদর্শ অনুসারে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলেন। উদ্দেশ্য : বাঙালী জাতিকে শৌর্য্যে-বীর্য্যে একটি স্বাধীন সত্তায় উদ্বোধিত করা। প্রথমে প্লেগ, পরে একাদিক্রমে সাতদিন বৃষ্টি হওয়ায়, স্বামিজীর আদর্শ অনুসরণে 'ওয়েন' সাহেবের সঙ্গে রিলিফের কাজে নেমে বিশেষ উৎসাহিত হলেন। এলেন বেলুড়ে। দেখা করলেন সারদানন্দের সঙ্গে। তিনি স্বামিজীর উপদেশের কথা তাঁকে শোনালেন ও স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন, যে কাজ করছো, তা কখনও ছাড়বে না। দেখছো না : একটা কাককে দড়ি দিয়ে বাঁধলে, সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। তেমনি নিজেদের মুক্তির চেষ্টা সকল সময়ে চালিয়ে যাবে। নিজেদের মুক্তির জন্য, জীবন দান করবে না কেন?

সিস্টার নিবেদিতাকে যা বলেছি— তা ছেড়ো না। দেখা করলেন, নিবেদিতার সঙ্গে। তিনি বললেন, : তোমরা স্বামিজীর উপদেশ জানো। বস্তীতে বস্তীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাজ করবে, লাঠি খেলবে; মুগুর ভাঁজবে, শরীর চর্চা করবে, দেশ জাগানোর জন্য 'ক্ষত্রিয় ধর্ম' প্রচার করবে।

পূর্ণিমার দিন ক্লাবের পত্তন হল। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেড মাস্টার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' অনুসরণে নামকরণ করলেন 'অনুশীলন সমিতি'। তেঘোরিয়ার শশী চৌধুরী, সতীশবাবুকে পাঠালেন ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে। ক্লাবের সভাপতি নেই শুনে, তাঁকে পত্র দিয়ে পাঠালেন ব্যারিস্টার পি. মিত্রের কাছে। বাঙালী জাতিকে শৌর্য্যে, বীর্য্যে সকল জাতির শীর্ষে, প্রতিষ্ঠা করে, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের আশা পোষণ করে চলেছেন বহুদিন। সতীশবাবুর মুখে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা শুনে উৎসাহিত হলেন ও সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর পরিচালনায় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। যুবসম্প্রদায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে যে সমিতিতে যোগ দিতে লাগলো। এমন কি সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রও সমিতির সংশ্লিষ্ট হলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সে সমিতিতে উপস্থিত হয়ে জাতীয়-সংগীতে, উৎসাহিত করতে লাগলেন।

অরবিন্দ বালীগঞ্জ গোষ্ঠীর মারফৎ যোগাযোগ করলেন প্রমথবাবুর সঙ্গে। তাঁর মুখে অবগত হলেন তাঁকে সভাপতি করে ইতিপূর্বেই একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। নিবেদিতাও তার সঙ্গে যুক্ত। অরবিন্দ, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায়, নতুন একটি কমিটি গঠন করা হল। সভাপতি পি. মিত্র, সহসভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ স্বয়ং। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী) দলে যুক্ত হলেন, অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের শ্যালক) ও নিবেদিতা। এছাড়া এঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন রাসবিহারী ঘোষ (ব্যারিস্টার), সারদাচরণ মিত্র (বিচারপতি)। আর্থিক দায়িত্বে রইলেন, প্রমথ বসু, সুরেন হালদার, চিত্তরঞ্জন দাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, রজত রায়, এইচ. ডি. বসু প্রমুখ ব্যারিস্টারগণ।

অরবিন্দ ফিরে গেলেন বরোদায়। সরলা দেবীর কাছে পরিচয় পত্র দিয়ে, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠালেন দল সংগঠনে। সরলাদেবী মিঃ পি. মিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। পি. মিত্র মশায় সতীশবসুকে ডেকে বরোদা থেকে আগত দলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে অনুশীলন সমিতিকে তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিলেন : উভয়দলের উদ্দেশ্য যখন এক,

সমন্বিত হয়ে চলাই যুক্তিযুক্ত।' সতীশ বসু রাজী হলেন। অরবিন্দের বিপ্লবী গোষ্ঠী, অনুশীলন সমিতি ও কলকাতার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিপ্লবী গোষ্ঠী একযোগে কাজ করবে স্থির হয়ে গেল।

শক্তি-সাধনা ছিল সেদিনের যুগধর্ম। বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার ভার নিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুশীলন সমিতি থেকে মিঃ পি. মিত্রের সহযোগীতায়, ছেলে বাছতে শুরু করলেন। নাম দিলেন 'গুপ্ত সমিতি'। মদন মিত্র লেনের সমিতি, হল শাখা অফিস। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য সুকিয়া স্ট্রীটে থানার কাছে, সারকুলার রোডে, একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। সেখানে বাস করতে আরম্ভ করলেন সস্ত্রীক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল শেখা, সাঁতার শেখানো, মুষ্ঠিযুদ্ধ শিক্ষা ও লাঠি খেলা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হল। লোকে জানলো ব্যায়ামাগার, আসলে এটাই হল বিপ্লবী-নীড়।

নিবেদিতা, কলকাতায় ফিরে নতুন কমিটি গঠনের সংবাদ পেলেন। তাঁর আদর্শ : প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি দল যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে এবং সে কাজ যদি দেশ গঠনের আদর্শ হয়, তাকেই সমর্থন জানানো এবং তাদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করা। তিনি নিজে গ্রন্থ রচনা ও স্কুল পঠনের কাজে নিযুক্ত থাকলেও তাঁর যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধনে, যারাই সহযোগীতা করবেন, তাঁরাই হবেন তাঁর আপন-জন। সুতরাং বিনা দ্বিধায় যুক্ত হলেন নব প্রতিষ্ঠিত সমিতির সঙ্গে। তিনি তাঁর সংগৃহীত যাবতীয় বই— যা বিপ্লবীদল গঠনে সহায়তা করবে, সমিতির নবগঠিত কমিটির কাছে (১০৮ নং সারকুলার রোডে) দান করলেন। পরামর্শ দিলেন : প্রথম কাজ, কর্মী বাছাই। বাছাই ছেলেদের নিয়ে দল গঠন। তাদের, এই সঙ্গে বইগুলি পাঠের সুযোগ দেওয়া। মন উদ্বুদ্ধ হলে, কাজ হবে সমিতির। তাদের সংগঠিত করা; তাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি শেখানো; তাদের চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। তারা হবে সৎ, অকপট বিশ্বাসী ও সংগঠনশীল ও নির্ভীক কর্মী। এরপর আসবে দীক্ষা। তারা হবে মৃত্যুঞ্জয়ী- বীর— মৃত্যুই হবে তাদের একমাত্র সাধনা। হয় জয়, না হয় পতন। তাদের নীতি হবে তীরের ফলার মত। স্থির হল : সমিতির মধ্যে পত্তন হবে গুপ্ত সমিতি। তাঁরাই বাছাই করবেন কর্মী। এরপরে শুরু হবে শিক্ষা। সভ্যগণকে শিক্ষা দিয়ে, বিভিন্ন শহরে পাঠানো হবে। তারা আবার গ্রামে, গঞ্জে, ছড়িয়ে পড়ে নতুন সভ্য ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকবে। মুখোশ তাদের ব্যায়ামাগার। কাজটা হবে, প্রতিটি মানুষকে, বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিতি করানো। কি উপায়ে বিভিন্ন দেশনেতা, সে দেশের দেশবাসীকে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরিবেশে, কেমন করে স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে সক্ষম হয়েছে। সচেতন করতে হবে, অর্থনীতিতে। বুঝিয়ে দিতে হবে, কেমন করে দিনের পর দিন, তাদের শোষণ করে নিজেদের পুষ্ট করেছে সাম্রাজ্যবাদীরা। যত তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, ততই তারা সচেতন হবে, ততই স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রত হবে, জনগণের মধ্যে। ভীরু বলে যে দুর্নাম আছে, তা ধুয়ে মুছে হয়ে উঠবে তারা সবল। ঘোষনা করবে, আমরা স্বাধীনতা চাই, স্বাধীন মানুষ হিসাবে জগতে, বাঁচার অধিকার চাই। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে নেবে সেদিন। এই স্পৃহা, জাগবে জনগণের মধ্যে, মুছে যাবে মৃত্যু ভয়। বিদ্রোহীর দল বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, সেদিনই আসবে "বিপ্লব"।

নিবেদিতা যে বইগুলি দান করলেন, তাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হল : আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ইটালীর মুক্তিদাতা ম্যাটসিনির জীবনী, গ্যারিবল্ডীর জীবনী, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র, ডিগবী ও দাদাভাই নৌরজীর অর্থনীতির বই। এছাড়াও, টডের

রাজস্থান, টমকাকার জীবনী, ভারতের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ক্রমওয়েলের জীবনী, ব্লক-এর ওয়ার 'মেড ইমপসিবিল', আধুনিক ব্যাপক ধ্বংসমূলক বৈজ্ঞানিক মারনাস্ত্রের বিবরণ সম্বলিত বই ইত্যাদি।

শুরু হল কাজ : শারীরিক উৎকর্ষের নানাবিধ ব্যায়াম, মানসিক উন্নতির জন্য পড়ানো চললো পৃথিবীর, বিভিন্ন দেশের বীরপুরুষদের জীবনী, পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও অর্থনীতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি রবিবার চালু হল, 'মরেল ক্লাশ'। রামায়ন, মহাভারত, গীতা, চণ্ডীপাঠ, সেই সঙ্গে কথকথার ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য : সাধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা, সংযম শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য পালন ইত্যাদি। এগুলির ভার নিলেন সত্যচরণ শাস্ত্রী, শরৎ মহারাজা (স্বামী সারদানন্দ)। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ। শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পত্তন হল 'রাইডিং' ক্লাব। যোদ্ধার বেশে যতীন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়ে শহর পরিভ্রমণ করলেন— 'ক্ষাত্র-শক্তি' উদ্বোধনের আশায়। উদ্দেশ্য : ক্ষাত্রশক্তি জাগ্রত করার একান্ত প্রয়োজন— শুধু শারীরিক ও মানসিক শক্তি সংগ্রহের জন্য নয়— ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির অবকাশ। প্রথমদিকে যতীন্দ্রনাথ নিজেই শিক্ষা দিতে লাগলেন।

সমিতি কাজ চালু হওয়ার পর অরবিন্দ কলকাতা কেন্দ্রে পাঠালেন ভাই বারীন্দ্রনাথকে। তিনিই হলেন সে লাইব্রেরীর প্রথম ছাত্র। সমস্ত বই বারবার পড়ে যুক্তিতর্কে অপরাজেয় হয়ে উঠলেন। এরপর এলেন দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রমুখ অনেকেই। সকলেই শিক্ষিত ও বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে। এঁরা নিবেদিতার আদর্শ অনুসরণে সখারাম দেউস্কর ও অরবিন্দের পরিচালনায় নিজেদের বিপ্লবী গড়ে তুললেন। যতীন্দ্রনাথ 'রাইডিং' ক্লাবের ভার তুলে দিলেন দেবব্রত বসু ও নলিন মিত্রের হাতে। ইতিমধ্যে গুপ্ত সমিতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা উপদল গঠিত হয়ে গেছে। তার নেতা হলেন বারীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথ সেই উপদলকে ভাঙার জন্য দেবব্রত বসু ও নলিন মিত্রকে সরিয়ে নিলেন। কিন্তু তাঁর কাজ সিদ্ধ হল না। নিবেদিতা ও অরবিন্দ-দলের সব শলা-পরামর্শ, সরলা গোষ্ঠীকে পাচার করতে শুরু করলেন— নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য। ফলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন অরবিন্দ গোষ্ঠী। ওপাশে উৎসাহিত হলেন সরলা-গোষ্ঠী। সব গোপন খবর যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের পত্রিকা মারফৎ কালী উপাসনা ইত্যাদি প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নিজ গোষ্ঠীকে বলবতী করার প্রচেষ্টায়, ডঃ বসু ও নিবেদিতাকে তাঁর দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন।

অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত রইলো গুপ্ত সমিতি। নিবেদিতা বালীগঞ্জ গোষ্ঠীর সংস্রব ত্যাগ করলেন। নিজের দলকে গুটিয়ে নিলেন, কিন্তু যুক্ত রয়ে গেলেন পূর্বের মতই, গুপ্ত সমিতির অনুশীলন দলের সঙ্গে। অবশ্য তার কাজ দাঁড়ালো স্বতন্ত্র। তিনি ভিতর ও বাইরে থেকে আঘাতের পক্ষপাতী। কিছু কংগ্রেসের মডারেট দলের সঙ্গে সহযেগিতায়— তাঁদের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করে স্থানীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করায় মন দিলেন। ইংলণ্ডের লিবারেল দল মারফৎ কিছু কিছু ভারতবাসীর স্বপক্ষে চাপ সৃষ্টির দ্বারা কিছু কিছু সুযোগ আদায়ের চেষ্টা চালাতে লাগলেন। দেশ বিদেশে ব্রিটিশ শোষণনীতির বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে ব্যস্ত রইলেন মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলের সহযোগীতায়। যে কোন উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই তাঁর মূল লক্ষ্য। এছাড়াও ভারতীয় সভ্যতাকে জগতের কাছে, স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় জগদীশ চন্দ্রকে সাহায্য করে চললেন। তাঁর কাছে ভারত শুধু ভারতীয়দের নয়, সারা বিশ্বের কাছে ভারতীয় সভ্যতা আকর্ষণীয় ও বরণীয়। যে সভ্যতা ভারতীয় ঋষিগণ প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ভারতীয় হিন্দুধর্ম, বর্ণে বর্ণে

সত্য ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও তা সত্য বলে প্রমাণিত। কুসংস্কার বলে যা প্রচার চালানো হচ্ছে তা, সর্বৈব মিথ্যা। ভারতের 'যত্র জীব, তত্র শিব'— একথা মিথ্যা নয়— সর্বত্র বিরাজ করছে প্রাণের সত্তা— তা প্রমাণে জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করে চললেন স্বামিজীর সমর্থনে।

বর্তমানে তাঁর কাজ দাঁড়ালো, স্বামিজী প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির পুণঃ সংগঠন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনায় সাহায্য দান, নিজ দল সংগঠন এবং গুপ্ত সমিতিকে পরামর্শ ও উৎসাহ দান ও নিজ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা সাময়িক পত্র-পত্রিকাদের জন্য। যার মূল উদ্দেশ্য : ভারতীয় জনগণকে, তাঁর অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতার পুণঃপ্রতিষ্ঠা।

অনুশীলন সমিতি গঠনের সময় পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব ছিল কমিটির। কিন্তু কমিটির প্রদত্ত অর্থে গুপ্ত সমিতি চালানো সম্ভব ছিল ততক্ষণই, যতক্ষণ ছিল তা, একটি মাত্র সংগঠন। সদস্যরা যখন তা কার্যকরী করতে উদ্যত হল, দেখা দিল প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নিবেদিতা পরামর্শ দিলেন, এ সব কাজে, প্রত্যেকেই হতে সবে সৎকর্মী। লক্ষ্য যেমন সৎ, কর্মও হবে সৎ ও আদর্শনীয়। তোমরা সকলেই একাজে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করো অর্থাৎ নিজ নিজ প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালাও। কমিটির তরফে আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

কাজে নামতে গেলে, চাই অস্ত্র। পরামর্শটা মনঃপুত হল না গুপ্ত সমিতির। তাঁরা ধরলেন, অন্য পথ। করতে হবে তড়িৎ অর্থ সংগ্রহ। কোন কোন নেতা এতে সায় দিলেন। স্বদেশী ডাকাতির কাজে নেমে পড়লো তারা। চাইলে, কেউ অর্থ দেবে না, সাহায্যও করবে না। ছিনিয়ে না নিলে, স্বেচ্ছায় কেউ দান করবে না। সুতরাং অর্থ সংগ্রহের একটি পথ— তা স্বদেশী ডাকাতি!

এঁদের মধ্যে কয়েকজন, নিবেদিতার রিভালবার কয়েক দিনের জন্য ধার চাইলেন। প্রশ্ন করলেন নিবেদিতা— কি উদ্দেশ্যে? তাঁদের সব কথা শুনে তিনি যতীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ করলেন, ছেলেদের সংযত কর। এভাবে অর্থ সংগ্রহের ফল, শুভ হবে না। তাদের কাজের বিশ্লেষণ, করবে না— নাম দাঁড়াবে "ডাকাতের দল।"

এ পরামর্শে তাঁরা কান দিলেন না— ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁরা নানা জায়গায় ডাকাতি শুরু করলেন, অস্ত্র সংগ্রহ হতে লাগল কিন্তু অপরিমেয়— সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে উচ্চ সরকারী কর্মচারীকে হত্যা শুরু হল গোপনে, গোপনে।

যতীন্দ্রনাথও সরলা গোষ্ঠীর কাছে দলের গোপন কথা ফাঁস করতে লাগলেন। সরকারও সচেতন হলেন। উদ্যোগীদের ধরার চেষ্টা শুরু হল। সতর্ক হলেন সরলা গোষ্ঠী। দোষ চাপালেন, নিবেদিতা ও অরবিন্দ গোষ্ঠীর উপর। নিজেদের ছিন্ন করলেন, দায়িত্ব বহনে অপারগ হয়ে।

এ গোপন সংবাদ ফাঁস হল কেমন করে? ক্ষিপ্ত হলেন অরবিন্দ গোষ্ঠী। সন্দেহ করলেন, যতীন্দ্রনাথকে। এপাশে গুপ্ত সমিতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। আর তারা মিঃ পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথের ঢিমেতালে চলা নীতিকে সমর্থন করতে চাইলেন না। ফলে, ভেঙে গেল কমিটি।

প্রথম জীবনে, নিবেদিতা রাজনীতিদলে যুক্ত ও নিহিলিষ্ট নীতিরসমর্থক ছিলেন। তিনি সচেতন ছিলেন : সংগঠনের যেমন প্রয়োজন, প্রয়োজন গণচেতনারও। জনগণ যতক্ষণ না সংগঠনকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে— বিপ্লব কোনদিন সফল হবে না। তাই তিনি তাঁর গণজাগরণ নীতিকে আঁকড়ে থাকলেন। যদিও কিছু দিন পূর্বে ওকাকুরার পরামর্শে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—

এমন কি স্বামিজীর নিষেধকে অতিক্রম করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কুহকের আকর্ষণে। বর্তমানে উপলব্ধি করেছেন, স্বামিজীর বাণী। এখন তাঁকেই তিনি অনুসরণ করতে চান। এখন তাঁর ব্রত গণজাগরণ। বর্তমানে তাঁর কাজ : সংগঠন ও গণজাগরণ উভয়ই!

তাই সফর শেষ করে মন দিলেন স্বামিজীর ইচ্ছা পূরণে। শিক্ষা— প্রথম; তারপর দীক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষা দ্বারা মনের ভিত তৈরী করা। যাকে বলা চলে— লাঙল দিয়ে ক্ষেত চষা, এরপর বীজ বপন। এরই নাম দীক্ষা। বীজ অঙ্কুরিত হলেই গড়ে ওঠে মন।

জনমনের প্রস্তুতির জন্যই স্বামিজী ডাক দিয়েছিলেন তাঁকে। তিনি এসেও ছিলেন সে ডাকে সাড়া দিয়ে। এখন তাঁর প্রধান কাজ : সেই শিক্ষা মন্দেরের ভিদ প্রতিষ্ঠা করা। স্কুলটি সঠিকভাবে গড়ে তুলতে মন দিলেন। সেইসঙ্গে সংগঠনে মন দিলেন অরবিন্দের সঙ্গে। এর সঙ্গে অঙ্গীভূত হল ভারতের অতীত সংস্কৃতিকে, জগতের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সে কাজ ছাড়া জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যকে ভাষায় রূপান্তরিত করা। স্কুল পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। মন দিলেন নিজ পুস্তক রচনায়। ভাব প্রচারের জন্য রচনা— প্রবন্ধ, চাহিদা মত দিতে লাগলেন নানা পত্র পত্রিকায়। জনগণের সুখ সুবিধার জন্য, জাতীয় নেতাগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ও থাকলো সরকারের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায়ের চেষ্টা, মডারেট দলের সহযোগিতায়। বিদেশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ মারফৎ, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা, ও দেশ বিদেশে, সরকারের নিপীড়ন নীতির স্বরূপ প্রচার করা।

১৭ই মার্চ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ওকাকুরাকে তিনি ভারতে একেবারেই চান না।... ছেলেদের কাছে শুনলাম : মিঃ ওকাকুরা ৯ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার উদ্দেশ্যে জাপান ত্যাগ করেছেন। আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি, যদি তিনি ভারত হয়ে না ফেরেন, তাহলে আমি খুবই খুশী হবো। তাঁর আগমনের অসচেতন তাৎপর্য খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর কাছে এবং যে লক্ষ্যের প্রতিরোধের জন্য তাঁর প্রয়াস; তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর সচেতন উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত ছিল না এবং সরলা ব্যাপারটিকে যেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, তা দেখার পর আমার পক্ষে আর পূর্ব ভূমিকা নেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

ইতিমধ্যে ওকাকুরার 'আইডিয়্যানস অব দি ইস্ট' বিলাতের জন মারে কোম্পানী থেকে প্রকাশিত হল। বইখানি প্রকাশ হওয়ার পর ওকাকুরার ইংরাজী ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকের মনে জাগলো। অনেকে তার মধ্যে নিবেদিতার হাতের ছাপ ও ভাষার সন্ধান পেলেন। ওকাকুরা ভাঙা ভাঙা ইংরাজী ভাষা বলতেন, অতি কষ্টে মনের ভাব প্রকাশ করতেন। এপ্রিল মাসে, তিলকের 'মারাঠা' কাগজে সম্পাদকীয়তে বেরুলো : আট মাস আগে জাপানের হিন্দু-বৌদ্ধ সম্মেলনে প্রতিনিধি সংগ্রহের জন্য তিনি পুণায় এসেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব আকৃষ্ট করার মত নয়। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ইংরাজী বলতেন— নিজের বক্তব্য বোধগম্য করতে পারতেন না— অথচ বইটি লিখেছেন প্রথম শ্রেণীর ইংরাজ লেখকের মত। ওঁর মন, গভীর দেশপ্রেমে পূর্ণ। যদিও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত হিন্দু-বৌদ্ধ সম্মেলন হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে এই বইটির মাধ্যমে। এর আগে ভারতবাসীর কাছে, জাপানের মনের গভীর কথা এইভাবে প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদক সংক্ষেপে বইটির মূল বক্তব্য উল্লেখে বললেন— বইটিকে বিশ্বসমাজে পরিচিত করার দায়িত্ব ভগিনী নিবেদিতা নিয়েছেন— সেটা উপযুক্ত ব্যাপার। তিনিই, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে লোকজনের সঙ্গে এঁর পরিচয় সাধন করিয়েছিলেন।

রেভারেণ্ড মি. এফ. এণ্ডরুজ 'দি ইস্ট অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট' নামে কোয়ার্টালি পত্রিকায় বইটির সমালোচনায় বললেন : উত্তর ভারতের শিক্ষিত মানুষের উপরে রুশ-জাপান যুদ্ধে, জাপান বিজয়ের

ফল মুহূর্তে চাঞ্চল্যকর। আমাদের এখানের সকল শহরের উপর দিয়ে উন্মাদনার স্রোত বয়ে গেছে। যা নূতন আশা ও আদর্শ জাগিয়েছে। প্রাচীন এক ব্যক্তি আমাকে বললেন : সিপাহী বিদ্রোহের পরে, এর মত আর কিছু ঘটেনি। যে সব ছাত্র আগে অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ যেতে উৎসুক ছিল, তারা এখন 'টোকিও' যেতে ব্যস্ত, কেউ কেউ ইতিমধ্যে যাত্রা করে ফেলেছে। ভারতীয় 'খ্রীষ্টান' মহলেও বিদ্রোহ। ভারতীয় এক খ্রীস্টান অধ্যাপক বলছেন : অতীতে ভারতের মানুষ ধর্ম-দর্শনের চিন্তায় অন্তর্মগ্নজীবন যাপন করার জন্য, ঐহিক ব্যাপারে বেশী নজর দেয়নি, তাই 'বর্ব্বর শক্তি'র শিকার হয়েছিল। তারা এশিয়বাসী ছিল বলে ভারতীয় হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমী আক্রমণকারীরা এসেছে, উচ্চতর যান্ত্রিক শক্তি নিয়ে, আর সেখানেই আছে, সত্যকার বিপদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই 'ইহবাদী কার্য্য' ও দর্শনের দিকটি আক্রমণকারী ও ধ্বংসকারী। ...অধিকন্তু তা, নীতি সংকোচ শূন্য। ইউরোপীয় দেশসমূহের বিবেকহীন জোটবদ্ধতা ও প্রাচ্য দেশগুলির উপর, তাদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে বললেন— এর নাম 'রিয়েল হোয়াইট পেরিল'। ঐ সব ঘটনা, জ্বলন্ত লৌহদণ্ডের মত প্রাচ্যবাসীর বুকে, পুড়িয়ে ঢুকছে। কিন্তু এখন জাপানের বিজয়, পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রাচ্যদেশ মুমূর্ষু জাতিসমূহের শ্মশানভূমি নয়, এশিয়া বহু শতাব্দীর নিদ্রার পর আবার জেগে উঠেছে।

...জাপানের বিজয়ে হিন্দু রক্ষণশীলতা দারুণ শক্তি পেয়েছে। তারা মনে করছে, পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবি, এমনকি যুদ্ধের যান্ত্রিক নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। জাপান, ইউরোপীয় অস্ত্র দিয়ে ইয়োরোপীয়দের হারিয়েছে। এখন জাপানের নেতৃত্ব অনুসরণ করে, অন্যপ্রাচ্য দেশগুলির এগিয়ে আসার অপেক্ষা কেবল? তাহলে আবার দেখা যাবে এশিয়া ঐক্যবদ্ধ। আরও বললেন, ভারত তার অধ্যাত্ম রত্নভাণ্ডার থেকে চিন্তারত্ন সরবরাহ করবে, চীন দেবে নীতিবাদ, জাপান দেবে কলাশিল্প।

ভারতের এই রেনেশাঁসের ভাবাদর্শ, তৎসহ এশিয়ার ঐক্যবিধান সম্পর্কেই আয়োজন, অনবদ্য জাপানী লেখক কাকাজু ওকাকুরার দুটি বই। 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' এবং 'আওকেনিং অব জাপান' এর বিষয়বস্তুর ভিত্তি। বই দুটি, ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে পঠিত ও অনুশীলিত হচ্ছে।"...

প্রাচ্য ইতিহাস ও এশিয়ার ঐক্য বিষয়ে, এই সকল ধারণা, পাঠকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' — ওকাকুরার প্রথম বইটির ভূমিকা লিখে। বাগবাজারবাসিনী এই পাশ্চাত্য মহিলা, ঐতিহাসিক খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে, বস্তুতঃপক্ষে হিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। খ্রীষ্টানদের কানে ওঁর কথাগুলি আপত্তিকর ঠেকবে। আমি সেগুলি উদ্ধৃত করেছি, কারণ বর্তমান সময়ে পরিষ্কারভাবে জানা খুবই প্রয়োজনীয়, ভারতে বর্ত্তমানে কোন ধরনের 'ভাবের' প্রচার চলেছে।

নিবেদিতার ভূমিকা উল্লেখ করে বললেন : পাশ্চাত্য দেশে বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচার ছিল : বিজিত ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতি, বিজয়ী জাতি সমূহকে আচ্ছন্ন করতে পারে...। এগুলি দুর্ভাগ্যজনক। গালভরা ও অনৈতিহাসিক। তবুও এগুলি মারাত্মক, যেহেতু এগুলি ভারতীয় ছাত্রদের প্রাণবায়ুতুল্য। যারা এখনো স্বপ্নজগতে... যারা কঠিন বাস্তব সম্বন্ধে নিরুৎসুক।

এমন যে প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ, লেখক হিসাবে : তার গৌরব ওকাকুরা পেলেও সেটা পুরো তাঁর প্রাপ্য নয়।

সেইসঙ্গে তুলে দিলাম নিবেদিতার বক্তব্যটি :

Within the last ten years, by the genius of a wandering monk- Swami Vivekanando– orthodox Hinduism has become aggressive as in the Asoken period. For six or seven years past, it has been sending missionaries into Europe and American. ...It would almost seem as if, it were the destiny of

Imperial peoples to be conquered in turn by the religious ideas of their subjects. 'As the creed of the down trodden jew has held that the earth during eighteen centuries, so to quote the great Indian thinker just mentioned, 'it seems not unlikely that, that of the despised Hindu may yet dominate the world! In some such event is the hope of Northern Asia. The process that took thousand years at the beginning of our era may now, with the aid of steam and electricity, repeat itself in a few decades and the world may again witness the Indianising of the East... the author (of the Ideals of the East) has talked in vain if he has not conclusively proved that Asia— The great Mother, is for ever one."

২৯শে এপ্রিল প্রার্থনা করলেন : ঈশ্বর শক্তি দিন, যাতে মৃত্যুর পূর্বে আমি স্বামিজীর নামে নির্ভয় সত্যবাক্য উচ্চারণ করতে পারি— যে বাণীতে তাঁর জীবন অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হবে।

৪ঠা মে ১৯০৩ লিখলেন— মিস ম্যাকলাউডকে : এখন বছরের সেই সময়টি চলছে, যে সময়ে একদিন বেলুড়ের কুটীরে সুখময় দিনগুলি কেটেছে।

রাঙা আগুনের মত ফুল ভরে গেছে গাছে। লিচু খাচ্ছি প্রতিদিন। মনে পড়ে তোমার কলকাতার দোকানে কেনাকাটা করে দিন কাটছে, নৌকায় এসে সমস্ত ফলগুলি খেয়ে ফেলা, আর সারাকে বলা যে, ভোজনের গন্ধটুকুই তার জন্য বাকী আছে এখন। আজ অনেকটা ঠাণ্ডা, ঝড় ঘনিয়ে আসছে বলে সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে— বারান্দার এপাশ, ওপাশ পায়চারি করে চলেছেন স্বামিজী! আর বলে চলেছেন ঈশ্বর প্রেমের কথা।

আহা! তিনি যা আমাদের দিয়েছেন, তা আমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যদের দিতে পারতো!

আমার দীক্ষার দিনে মস্ত নীল একটি নৌকা আকারের-ফুলের কথা তোমার মনে পড়ে— যা আমরা হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলুম। ফুলটির নাম অপরাজিতা— যে পরাজিত হয়নি। ফুলটি, আলো সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একথা জেনে কি সুন্দর লাগছে না!

বিমিশ্র সেইদিনের সে চেতনা কী অপূর্ব আর মনোরম, কারণ সে চেতনা— তাঁর প্রতি ভালবাসার স্বর্ণসূত্রে বোনা। ... এখনও কখনো কখনো আমার শীতল চিন্তা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে— সে সব নিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠি। ক্লান্ত! সত্যই ক্লান্ত। যা 'ভাব'গুলিকে কাজে পরিণত করার মানুষ এত অল্প! কত অল্প, তুমি জানো না। দিনদিন, ক্রমে ক্রমে শিখছি, কাজের নিখুঁত যন্ত্র প্রায় বিরল— আর শিখছি একধরনের নৈতিককূটতা, যা আত্মাভিমান, আন্তরিকতা-হীনতা, অগভীরতা ও আবেগ শূন্যতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

যার ওবস্তু আছে, সেই বালক বা লোকটিকে আহ্বান করে লাভ নেই, কারণ যে কিছুই করবে না। ...এক সময় মনে হয়— আমার যেন 'একথা' বলার অধিকার এসে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতই— সৎ গুরু যথেষ্ট পাওয়া যায়— উত্তম শিষ্য পাওয়াই দুষ্কর!...

৭ই মে, ১৯৯৩, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তোমার ভালবাসা খোকাকে দিয়েছি, তোমাকে সে তার ভালবাসা জানাচ্ছে। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে। ছোট বউটি, বলবো কি মাতৃত্বে একেবারে জ্যোতির্ময়ী। যে কোনদিনই সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তার দর্শন পেতে আমার ব্যাকুলতার কথা কি করে বোঝাই বল!

•

সে মাসের প্রায় মাঝামাঝি মেদিনীপুর থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে যাত্রা করলেন সেখানে। সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ সেখানে। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ ও স্থানীয় অধিবাসীগণ

স্টেশনে উপস্থিত। ট্রেনটি থামতেই হর্ষধ্বনি উঠলো : হিপ হিপ হুররে! আতঙ্কিত হয়ে, তাদের হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে, বুঝিয়ে বললেন— এটা ইংরাজদের জাতীয় উল্লাস ধ্বনি— এদেশীয় উল্লাস ধ্বনি হওয়া উচিত নয়।

উত্তর পেলেন : এদেশে সেরূপ কোন ধ্বনির প্রচলন নেই।

নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে তিনবার ধ্বনি দিলেন, ওঁয়া গুরুজীকি ফতে, বোল বাবুজী কি খালসা।

উপস্থিত জনতা ও নেতৃবৃন্দ সকলেই তাঁর সঙ্গে সুর মিলালেন। ইংরাজ বিদ্বেষী এরূপ একজন ইংরাজ মহিলাকে পেয়ে তাঁরা সম্মোহিত হয়ে আনন্দে মুখর হয়ে উঠলেন।

গাড়ী করে তাঁকে শহরে নিয়ে আসা হল, তখন প্রায় বেলা একটা। যে বাসস্থানটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল তার মধ্যে প্রবেশ করেই জানালাগুলি খুলে দিয়ে খাটের পরিষ্কার গদিটি গুটিয়ে ছোট একটি মাদুর ও পাতলা কাঁথা পেতে সানন্দে আরাম করে বসলেন।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই জানলাগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল, আরামের জন্য গদি পাতা হয়েছিল— সেসব উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের মত আচরণ করতে করতে বললেন, যে কাজে ব্রতী আমরা, তাতে সংযম প্রয়োজন!

অবস্থান করলেন পাঁচ দিন। প্রতিসন্ধ্যায় ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির বক্তৃতা দিলেন। প্রথমদিনের সভায় প্রচণ্ড ভীড়, উৎসাহও তেমনি। জনসমাগমে প্রচণ্ড সুখী। পরে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হতে শুরু করলো। অবসর প্রাপ্ত একজন বয়স্ক লোক তাঁকে বোঝাতে সচেষ্ট হলেন— তাঁর বক্তৃতায় রাজনীতি বেশী— তাই এ সভায় সকলের উপস্থিতি সম্ভব হচ্ছে না।

যে উপলক্ষে তাঁর আগমন, সে আখড়ার উদ্বোধন হল। সমবেত সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকগণই জানতেন কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে এর পিছনে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তরোয়াল খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠি খেলে তাঁদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন। মেয়েদের সভা হল। যে সভায় বক্তৃতা দিলেন তিনি। তাঁদের কয়েকজনকে বন্দুক ছোঁড়া শেখালেন। সভ্যদের পড়ার জন্য ম্যাজিনির ও ক্রপ্টকিনের কয়েকখানি বই উপহার দিলেন।

১৮ই মে ১৯০৩, মিসেস অবলা বসুকে লিখলেন :

আমার ছোট্ট মা, আজ সারাদিন ধরে তোমারই জন্য যে কথাগুলি আমার মনের মধ্যে জটলা বেঁধে আছে, সেগুলি বলতে চাইছি বলে যেন অশালীন ভেব না। আমি একটা কথাই বলতে চাইছি— জানি না, বলার অধিকার আছে বলে তুমি মানবে কিনা— আমার কাছে তুমি এখনো সেই মা, মা রূপেই আছ। শিশুটি যেন আমাদের সকলের মধ্যে প্রাণময় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে।

এই সকালে এক বিচিত্র শোক নিয়ে ফিরছি। শিশুকন্যাটিকে দু'এক মুহূর্তের জন্যও আমরা হাতে তুলে নিতে পরিলাম না, আমাদের এই মানুষের পৃথিবীতে, সে আত্মাকে স্বাগত জানাবার জন্য, ব্যাপটিজমের মত কোন অনুষ্ঠান করা গেল না, তার আগেই সে চলে গেল, অনুদ্বিগ্ন, অকলঙ্করূপে? স্বামী সদানন্দ এলেন, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বললাম। তিনি বললেন— যে মাসগুলি জননী সন্তানের প্রতীক্ষা করে, সে মাসগুলিতে তুমি পরম ধৈর্য্যে, পরম মাধুর্য্যে প্রতীক্ষা করেছিলে। হিন্দুদের কাছে, সেইকালে শিশুর সত্ত্বা জীবন্ত; ব্যক্তিত্ব আকরিত, এবং সান্নিধ্য বাস্তব সত্য— তখনকার অনুষ্ঠানগুলি, শিশুকে ভালবাসা ও অভ্যর্থনা জানানোর অনুষ্ঠান ছাড়া, অন্য কিছু নয়। এই ভাবনাটি বড় সুন্দর তা কি তুমি মনে করো না! যার ফলে, অনুভব করতে পারবে সেই ছোট্টটি, এখনো তোমার সঙ্গেই আছে, সর্বদা তোমার সঙ্গে, মাও শিশুর যোগসূত্র রেখে যাচ্ছে, যদিও সেইসঙ্গে এও সত্য, তোমাকে অনেক নিষ্ঠুর সুখ ও সেবার তৃপ্তি ত্যাগ করতেই হবে। হয়ত তুমি বৃহত্তর মাতৃত্ব অর্জন করেছ, যেহেতু তোমার ক্ষেত্রে, প্রাণের না হয়ে

শোকের grand sacrament হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবেই হোক, আমি অনুভব করি, যেন তোমার কন্যার সান্নিধ্যি বেশী করে থাকবে, তোমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদের সময়ে, তোমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদ আগে তার কল্যাণ করবে, তারপর তোমার। মনে রেখ, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই— তা সর্বদাই পূর্ণ, জ্যোতির্ময়, বলীয়ান। যারা ভালবাসে, তাদের কাছে অসহায় দেহখানি কি মধুর! মনে হয়, তোমাদের তিনজনের মধ্যে এই সুন্দর সম্পর্ক সর্ব্বদা বজায় থাকবে! যদিও এখানে জন্মমুহূর্তেই হয়েছে, মৃত্যু-মুখের উন্মোচনক্ষণ। বোধ হয়, মুক্ত আত্মারাই প্রবেশ পথে পৃথিবীকে ত্যাগ করে যায়। তেমনই এক অতিথির সেবা, পূজা হয়ত তুমি করতে পেরেছ। সেইসঙ্গে সেই মহান জীবন্ত শক্তি লাভ করেছ, যার ফলে আরও বেশী করে সার্ব্বভৌমিক মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু পৃথিবীর লোক যাকে বিচ্ছেদে বলে। তারই অনুভূতি লাভ করেছ। সারদাদেবী নিজের একটি সন্তান চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, —ওগো, একদিন তুমি এত ছেলে পাবে যে, তাদের নিয়ে কি করবে ঠিক করতে পারবে না।

চিরদিন তোমারই, আমার অতিপ্রিয় তুমি।

ইতি— মার্গট

কোন লোকান্তরিত ব্যক্তিকে রোমান ক্যাথলিকগণ 'সেন্ট' পর্যায়ে উন্নীত করার অনুষ্ঠানে, তিনি যে 'সেন্ট', তার পক্ষে প্রমাণ দেবার জন্য জানায়— কিভাবে তাঁর মধ্যবর্ত্তিতায় মিরাকেল সংঘটিত হয়েছে। তাঁরা মৃতের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁকে জীবিত মনে করেন, মনে করেন জীবিত ও মৃতেরা, প্রার্থনায় সমবেত, প্রার্থনায় পরস্পরের হৃদয় নিহিত ও পরস্পরের জন্য কৃত, জগতের জন্যও। যখন তুমি দেহত্যাগ করবে, তুমিও তাতে যোগদান করবে, কে জানে তুমি হয়ত মধুর সেই আত্মাটিকে চিনে নেবে। যে তোমার দিকে দৃষ্টি মেলে ছিল। প্রার্থনা করছিল তোমারই সঙ্গে। নয় কেন? আমার তাই বিশ্বাস— মৃত্যুর অন্তরে জীবন নিশ্চয়, তা একটি মহান মিষ্টিক পবিত্রসত্য।

কলকাতায় ফিরে এলেন। মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ২০শে মে মেদিনীপুরে পাঁচ দিনে বারো কি তেরোবার বক্তৃতা দিয়েছি। শুনলাম, ছেলেরা আমার বক্তৃতা তেমন বুঝতে পারেনি। কথাগুলো তাদের জ্ঞানবুদ্ধির উপর দিয়ে ভেসে গেছে। সকলরকম পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পরিষ্কার দেখলাম, আমি জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ করতে পারি না। অন্যের মারফৎ কথা বলতে হয়। এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাবার ফলে 'ভাবগুলি' অবিকৃত থাকে না!

...এমন প্রচণ্ড জীবনকে আমি নিজের মধ্যে অনুভব করছি যাতে মনে হচ্ছে, পৃথিবী উল্টে দিতে পারি— কিন্তু হায়, কেবল বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছি— দীর্ণ স্বর। বাতাস কেবল আমার আর্তনাদের প্রতিধ্বনি বহন করছে।

...মনে হয়, মেদিনীপুরে, কাজের কিছুটা ফল ফলেছে।

মেদিনীপুর থেকে, আশা নিরাশা উভয়ই বহন করে কলকাতায় ফিরে এলেন। আশা : দেশকে জাগাতে হলে প্রয়োজন এমন এক ধ্বনি। যা বন্দনা, উৎসাহ, আনন্দ ও দৃঢ়তা প্রকাশে সমর্থ। বেছে নিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিকে। এই বাণীকেই জাতীয়জীবনের 'রণধ্বনি' রূপে বহন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

নিরাশা : যে ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ পায়, যা মনের কন্দরে ঘা দিয়ে চেতনার উদ্বোধন করে, তিনি সে ভাষায় তাঁর প্রতিটি বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে অসমর্থ। যে ভাষায় তিনি বক্তব্য রাখেন, জনসাধারণের তা বোধগম্য নয়। অপরের সহায়তায় তার মর্ম্মার্থটি অবিকৃত থাকছে না।

২০শে মে ১৯০৩ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : প্রিয় শিশুকন্যাটি, গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে জন্মেছিল, মৃত অবস্থায়, জন্মাবার আধঘণ্টা আগেই বোধ হয় গত প্রাণ। মায়ের জীবনই শুধু বাঁচানো গিয়েছিল, তাও কষ্টে। বেচারা, বেচারা-ছোট-জননী, হারিয়ে গেল কতখানি!

ভারতের বড়লাট জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জ্জন। প্রথমে ছিলেন ফার্স্ট ব্যারণ কার্জ্জন অব কেডলষ্টন, তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসক জীবনের সূচনা ১৮৯১-৯২, আণ্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া রূপে। ১৮৯৫-৯৮ আণ্ডার সেক্রেটারি ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স। ১৮৯৯-১৯০৫ পর্যন্ত ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া, যে সময়ে নিবেদিতা ভারতে পা দিলেন স্বামিজীর ডাকে সাড়া দিয়ে। এবং সেনানায়ক এইচ, এইচ কিচেনারের সঙ্গে মত ভেদে তিনি পদত্যাগ করেন শেষ পর্য্যায়ে। ১৮৯৪ সালে একটি বই লেখেন 'প্রবলেম অব দি ফার ইস্ট'। নিজস্ব কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে তিনি সকল সময়ে সচেতন। নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের প্রতিভূ বলে জাহির করতেন। শাসক সংস্কারক বলে, ছিল অহমিকা। বলা চলে এটা তাঁর ব্যক্তিগত মিশন— আইন ছাড়া নিম্নজাত বা পরাধীন জাতকে শাসন। জীবনের সহচর অহমিকা, কাজে অনলস আড়ম্বরপূর্ণ সে নাটকীয়তা। সবসময়েই জাহিরের চেষ্টা করতেন— দেখ হে, কি করে সরকার চালাতে হয়!

নিবেদিতার (মার্গারেট নোবেলের সময়ে) মনোভাব ছিল : ব্রিটিশ শাসনের দোষ অবশ্যই আছে, মাজাঘষা করলে, তা ভারতের মঙ্গলসাধন হবে। কার্জ্জন সে কাজ করতে পারবেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ চিঠিতে লিখলেন : সরকার অতীব জনপ্রিয়। লর্ড কার্জ্জন শক্ত মানুষ বলে প্রতীয়মান ও সহৃদয়। শক্তির চেহারায়, সকলকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিয়েছে। ...এই শাসনকালে বিভিন্ন দলের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করার পক্ষে চিত্তাকর্ষক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষ কি সহৃদয় হবার মত শক্তি ধ'রে এমন স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে সর্বাপেক্ষা সুখী হবে?

এই বছরের শেষের দিকে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি বদলাতে শুরু করলো। ১৯০১ সালে প্রচণ্ড ব্রিটিশ শাসন বিদ্বেষী। কার্জ্জনের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ ও দরিদ্র ভারতবাসীর অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর অসাড়তার নির্দশন ১৮০,০০০ পাউণ্ড ব্যায়ে দিল্লীর দরবার— যা রাজকীয় তামাশা— তাঁকে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তুললো। ২৯শে ডিসেম্বর ১৯০২ চিঠি লিখলেন, মিস ম্যাকলাউডকে, সকল ভণ্ড ও হতভাগ্যরা দরবারের জন্য দিল্লীতে গেছে।

২৮শে জানুয়ারী ১৯০৩ সালে লিখলেন : এই সেদিন যে দরবার হয়ে গেল, তার থেকে ভারত নূতন ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করলো। এখানকার একটি ছেলে, দেশীয় রাজ্যের রাজকর্মচারীর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল— দিল্লীর দরবার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? সে উত্তরে বললো, আমার ধারণা হচ্ছে আমাদের সকল রাজা মহারাজা চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছেন। সুতরাং ভারতবর্ষ পূর্ব দরবারের পরবর্তী পঁচিশ বছরের মধ্যে, না জানি কোথায় উপস্থিত হবে? ...লর্ড কার্জ্জন একটি বিকট ভাইসরয়। তাঁর বিষয়ে স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ আমাকে যা বলেছেন, তা পুরোপুরি সত্য : যেমন সমর্থ, তেমনি আত্মদরী। তেমনি উচ্চাভিলাষী। — এই পর্যন্ত তার ভালোর দিক। কাজকর্মে একধরণের ঔদার্য্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বাবস্থাপনার ক্ষমতায়, অবিচারের ভিত্তিতে নির্মিত আইনকে কঠোর বিচারের দ্বারা প্রয়োগের ইচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি...

সম্প্রতি একটি ইউনিভার্সিটি কমিশন পেয়েছি, যা সর্বপ্রকার শিক্ষাকে বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষাকে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতের সম্বন্ধে এই বিশেষ অন্যায়টি আমাকে জ্বালিয়ে তুলছে। ভারতের 'ভারতে' থাকার অধিকার, নিজের জন্য চিন্তা করার অধিকার, জ্ঞানের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। এই বিরাট অভিযোগটি যদি সামনে না থাকতো, তাহলেও তার খাদ্যের অধিকার, ন্যায় বিচারের অধিকার, বা অন্য অধিকারের পক্ষে জ্বলে উঠতাম। কিন্তু এখন পূর্বোক্ত ব্যাপারটি সব ঢেকে দিচ্ছে।

কার্জ্জন ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে মনে করতেন না। ভারতীয়দের চরিত্র ও বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে নিম্ন ধারণা নিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। সতর্কও ছিলেন, যাতে তাদের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির বিকাশ হতে না পারে। এই দ্বিমুখি উদ্দেশ্য নিয়ে উচ্চশিক্ষার মান উঁচুতে তোলার নামে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, এক শিক্ষা সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন। তাতে কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রণ করা হল না। ১৯০২ সালের জানুয়ারীতে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি' কমিশন গঠন করলেন, সেই কমিশন প্রদত্ত রিপোর্ট ধামা চাপা দিয়ে রেখে দিলেন।

১৯০২ সালে, নিবেদিতার পরিচয় ঘটলো লালা লাজপৎ রায়, মিঃ তিলোক ও মিঃ গোখলের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে মিঃ গোখলে ছিলেন মডারেট দলভুক্ত। উনি ধর্মীয়-ধারণা-সংস্কারক দলের নেতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডের অনুগামী। রাজনীতি ও অর্থনৈতিক চিন্তার অনুসরণকারী। আবার গান্ধীজির রাজনৈতিক গুরু। তখন ইনি ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য। রাজনীতিতে মডারেট পন্থী, কিন্তু আন্তরিকতায়, বিচক্ষণতায়, ব্যক্তিত্ব ও দেশাত্মবোধে অকপট বিশ্বাসী। এই বিশেষ গুণাবলীর জন্য নিবেদিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই প্রতিভাবান, প্রতিপত্তিশালী দেশপ্রেমিক মানুষটিকে প্রভাবিত করে সরকারের ভেতরের কথা সংগ্রহ করা সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদীর শোষণনীতির সমালোচনার দ্বারা দেশবাসীর কিছু সুবিধা আদায় করিয়ে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। ইতিপূর্বে যখন বক্তৃতা দিতে ভারতের নানা প্রদেশে গিয়েছেন, তখন লালা লাজপত রায় ও মিঃ তিলকের সমর্থন পেয়েছেন। তাঁর বক্তৃতা, তাঁরা তাঁদের পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। সম্পাদকীয়তে তাঁর নীতির প্রশংসা করেছেন ও সমর্থন জানিয়েছেন। চিন্তাধারায় এঁরা একই পথের পথিক। সেই সূত্রেই যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হল, তা শেষদিন পর্যন্ত অপ্রকাশ্যে সীমিত রয়ে গেল কর্মধারার মধ্যে ফল্গু ধারার মত।

২০শে মার্চ ১৯০৩ গোখলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি দিলেন :

ছোট ছোট পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা অনুভব করি, তুমি আমাদের নিতান্ত অন্দর মহলের লোক। তোমার জীবন ও কার্য্যের অসীম মূল্যকে আমরা স্বীকার করি। আমার কোন এক সময়ের উত্তপ্ত বাচালতা, যেন ঐ ব্যাপারটিকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। তোমার দেশপ্রেমে আমি সন্দেহ করতে পারি, এমন কথা তুমি লিখতে পারলে এই দেখে আমি গভীর বেদনা পেয়েছি— আমার কাছে এটা খুবই স্পষ্ট, তোমার সঙ্গে মত-পার্থক্যের অর্থ এই নয়— তুমি যাকে ন্যায় বলে মনে করো, তা পালনে তোমার সাহসের অভাব, আমাদের হতাশ করেছে। বরং আমি তো ভাবতে চাই, শেষ কঠিন পরীক্ষার সময়ে আমি পিছিয়ে পড়েছি। যতই যা হোক, আমি নারী, আর সানন্দে ভাবছি, অপরপক্ষে প্রতি বিন্দুতে তোমার, কতখানি পুরুষোচিত সাহস ও নাছোড় চেষ্টা।... কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমার ধারণা— আমি তোমার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে চাই। সেক্ষেত্রে বিষাদ নয়, অনন্ত আনন্দে তুমি পূর্ণ হয়ে যাবে। সে বস্তু তোমার প্রাপ্য। আমাদের চতুর্দিকে ক্রমজাগ্রত জীবন ও সংগ্রামের মহোৎসব। যদি কেউ বিভ্রান্ত বা বিপন্ন হয় তার কারণ— যে কাজে অগ্নি-শিখা লক্‌লকিয়ে ওঠে, সেই যথার্থ কাজের ধারাকে গ্রহণ করতে পারে নি। আর যদি কেউ তা পেয়ে যায়, তার কি দীর্ঘশ্বাসের সময় থাকে? আমরা যেন আর বলবৎ ব্যবস্থাকে নিন্দার দ্বারা সংস্কার করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত না করি— যেন নির্মাণ করি জীবন। পুরুষের পৌরুষ ও নারীর নারীত্ব— নিজের কর্মপথ নিজেই দেখে নেবে। মুক্ত করে দাও জীবনকে। বরণ করে নাও জীবনের পূর্ণ দানকে। সর্বাচ্চো মানসিক আবেগ এবং ত্যাগের দিব্য প্রেরণায় পূর্ণ একটি মহাজাতির প্রাণচেতনা। তার সম্বন্ধে তোমার আমার ভাবনাকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবে নিজস্ব গতিতে।

যে আনন্দে পূর্ণ আমি, যদি তাকে ইচ্ছামত তোমাকে দিতে পারতাম! আমি ভালবাসি দুঃখকে, সংগ্রামকে— দিব্য আত্মবলিদানকে। তার অধিকার আমাদের হোক।

আমি নিতান্তই বিশ্বাস করি— এখনো বহুযুদ্ধে লড়বার মত ক্ষমতা, তোমার হবে আর তোমার হাতে যতক্ষণ পতাকা ধরা আছে, সে পতাকা ধুলায় লুটোবে না। আমার এই বাসনার সমতুল্য আর কোন বাসনা যে নেই, তা তুমি আমার মতই জানো।

২৯শে মার্চ ১৯০৩ ভাইসরয় কাউন্সিলে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রশংসা করলেন। সঙ্গে যোগ করলেন : মহারাষ্ট্রীয় তুমি, নিজ কাজের দ্বারা যেভাবে প্রথম শ্রেণীর বাঙালীদের ভালবাসা অর্জন করেছ, তা আমাকে অসীম আনন্দ দিয়েছে। সে ভালবাসার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তোমার মনঃপ্রকর্ষ, সাহস ও নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা— তখন তা হয়ে দাঁড়ায় অমূল্য বস্তু।

ভাইসরয়ের উদ্দেশ্য তোমাকে পুরুষোচিত বক্তৃতার জন্যও অভিনন্দন জানাই। যতই আমরা ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর মানুষদের পাঠিয়ে যাচ্ছি, ততই তোমার শক্তির উপরে আমাদের অধিক নির্ভর করতে হচ্ছে।

এপ্রিল ১৯০৩, বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের প্রতিষ্ঠা হল। মিঃ গোখলেকে তাঁর বোর্ডিং হাউসে ছেলেদের কাছে বক্তৃতা দেবার কথা বললেন। মিঃ গোখলে সানন্দে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও ফার্গুসন কলেজেব বিবরণ উল্লেখ করে মহাদেব রাণাডের প্রেরণার কথা তুলে বললেন : কেবল বিদেশী সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ পাঠ নয়, স্বদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রতি জোর দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রকে সৎ ও আন্তরিক হতে হবে। মিথ্যা বস্তুটি ভারতীয়দের একচেটিয়া বলে প্রচলিত পাশ্চাত্যে যে ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে এই শহরে অবস্থিত হলওয়েল মনুমেন্টের কথা তুলে বললেন : মিথ্যাবাদী ভারতবাসী নয়, যারা এ বস্তুটি সৃষ্টি করেছে ও প্রচার চালাচ্ছে তারাই মিথ্যাবাদী। তোমরা কলকাতার বুকে অবস্থিত এই স্মৃতিস্তম্ভটি দেখে থাকো ও বইয়ে সেই ইতিহাস পাঠ করো— তা সৰ্বৈব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যে কক্ষে ১৮০ জন ইংরাজদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার চলেছে, সেই পরিধির মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিদের একটি যন্ত্রে পিষে ফেলে তাদের অস্থি ও মাংসপিণ্ড একত্রে যা দাঁড়ায় তা ঐ কক্ষে ধরানো যাবে না। সক্রোধে বললেন : It is a delibrate lie exhibited here।

মিঃ গোখলেকে বের্ডিং হাউসে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য লিখলেন : আমার ছেলেদের যেরকম বন্ধুত্বপূণ্য সহযোগিতা দেখিয়েছ, সেজন্য গত রবিবারের পর থেকে তোমাকে চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছি। সেদিন ছেলেদের কাছে— যেভাবে বলেছ তার থেকে ভাল কিছু আমি চাইতে পারি না। তোমার সহজ শান্ত কথাগুলি, তাদের কতখানি বাস্তব উপকার করেছে, তা তুমি ভাবতেই পারবে না— একথা আমাকে বলা হয়েছে।

মেদিনীপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'বন্দেমাতরম' বাণীটিকে 'মাতৃবন্দনা' মন্ত্রে পরিণত করতে বিপ্লবীদের পরামর্শ দিলেন। এটি সেই 'বাণী' যা বন্দনায় ব্যবহার করা চলে, অভ্যর্থনার জয়ধ্বনি রূপেও ব্যবহার করা চলে, রণধ্বনি রূপে জনমনে শক্তি সঞ্চারের প্রেরণা উদ্দীপ্ত করে।

মন দিলেন নিজ রচনায়। এ ছাড়াও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রূপ, ভাষাদানে সহায়তা করে চললেন। নানা পত্রিকা থেকে প্রবন্ধ রচনার তাগিদ আসতে থাকায়, সেগুলির রচনা ও স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় রচনার সহায়তা, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক-চেতনা সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও কাউন্সিলের সভ্যগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ দান, এছাড়াও নিজস্ব স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা, ডন সোসাইটি ও বোর্ডিং হাউসের ছাত্রদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা ও সময়োচিত উপদেশ দান ও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দ্বারা তাদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন।

এরই মধ্যে একদিন ভবানীপুর থেকে ফেরার পথে বোর্ডিং হাউসে উপস্থিত হলেন এবং ছাত্রদের তাঁর সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলেন। ছাত্ররা রবিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় তাঁর বাসায় উপস্থিত হল। তিনি তাঁদের নবীন ময়রার রসগোল্লায় পরিতৃপ্ত করে, তাদের স্বাস্থ্য, পড়াশোনার সুবিধা অসুবিধার কথা শোনার পর জিজ্ঞাসা করলেন— তোমরা এখানে আসছনা কেন? ছাত্ররা উত্তর দিল— ডন গোষ্ঠীর বা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যাওয়ার জন্য, একসঙ্গে সকলের আসা হয় না। উত্তরে খুশী হলেন। বললেন, সতীশবাবু তো ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তোমরা ধর্ম কথাটার মানে বোঝ?

উপস্থিত ছ'জন। একে একে চললো— ধর্ম মানে : ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা। সকল অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্ট থাকা।

ধর্ম মানে : মাতাপিতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করা। ভাই-বোনেদের ভালবাসা, শ্রেণী বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসা।

ধর্ম মানে : শাস্ত্রে যেসব বিধান আছে, সযত্নে পুরোপুরি পালন করা।

ধর্ম মানে : বাক্যে, মনে সত্যবন্ধ ও বিশ্বস্ত হওয়া, প্রত্যেকের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করা।

ধর্ম মানে : অপরের কল্যাণ করা, সাহায্য করা, তার জন্য বিপদ বা দুঃখ যাই আসুক না কেন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্তও।

ধর্ম মানে : মহাভারতে যা বলেছে, ধারণাদ্ধর্মমিত্যানু ধর্ম ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ ধারণা সংযুক্তম্ স ধর্মঃ ইতি নিশ্চয়ঃ।

প্রত্যেকের ব্যাখ্যা মন দিয়ে শুনে বললেন : I have heard you all most patiently and am much pleased with your views and versions and appreciate these highly.

True! that which you all have just said, is what SANATANA DHARMA teaches or senses.

But my dear boys, besides all your conception or knowledge of dhrama, I shall tell you something of a higher, nobler and more sacred factor in your lives which I would urge most honestly and emphatically to you all to follow or act as your subliment and greatest duty. the first and formost obligation.

You all are required first to know you Motherland, your great Mother. Mother Bharat barsha!

You must not discriminate, distinguish or differentiate between them, Mother Country or Mother.

I would advise you to see Her, go around Her, to know Her people, their religion, culture, literature, language, customs and traditions, in one word their history thoroughly to meet them and mix with them intimately often whenever such an opportunity occurs to love them. Just as a son

or a daughter behaves or mixes with his or her mother freely and intimately, so you should love Her, respect Her, serve Her, worship Her with most reverential salutation!

'BADE MATARAM'

এরপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তাঁর মুখমণ্ডল এক অনির্বচনীয় দিব্য জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সমবেত ছাত্ররা সম্মোহিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।... কিছু পরে তিনি বললেন, Go back to your Boording, you houses, think, ponder seriously and meditate, over this most siblime montra and secred subject and the word BANDE MATARAM.

পরদিন তিনি বোর্ডিং হাউসে বৈকালে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে একটি কাগজের বড় প্যাকেট। ঘরে পৌঁছাতেই ছাত্ররা ছুটে এলো। দারোয়ান প্যাকেটটি ফিটন গাড়ি (ঘোড়ার গাড়ি) থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে এলো। খোলার পর দেখা গেল প্রায় ছয় ফুট লম্বা পাঁচফুট চওড়া ভারতবর্ষের ম্যাপ।

তাঁর আগমন সংবাদে অধ্যক্ষ স্বামী মহারাজজী ছুটে এলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন: Swamiji last evening, some of your boys came to my place and I had a very happy time with them. Casually as controversy arose when I asked them what they meant by Dharma. The interpretations were interesting. One of them said it meant the observations of the moral order. One said that faith in god and his doings. One quoted a sloke from Mahabharat meaning that which holds together in Dharma. Another said, to help the poor or needy and distressed even at the sacrifice of one's life, is a Dharma. Their definations impressed me much and I told them, what they all said related to Sanatana Dharma, but for them, the young Indians, Dharma meant to think, treat, worship India, their Motherland as their own mother.

Swamiji with your kind permission, I wish to address few words to these boys : My dear boys, you have all read geography in you school days what you have read, heard or seen was only about the physical feature of India's mountains, hills, rivers, lakes, deserts etc. The Map which you sea now hung in the wall before you, is not merely a vast sheet of paper in printing but this is the picture of your Mother. From Kashmer to KunyaKumarika, is a living and throbbing entity. The Mountains the hills are Mothers' bones, the rever and streams are her arteries and veins. The Vacan spaces you see, are not mere heaps of clay, mud or sand but her flesh. The Treas., plants are her hairs.

আরও বলে চললেন : তোমাদের এই পূণ্যভূমিতে যুগে যুগে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছে, রচিত হয়েছে মহাগ্রন্থগুলি, যাদের তুলনা নেই। তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস— রচনা করেছেন তোমাদের সংস্কৃতির মূল ইতিহাস। মনু, যাজ্ঞ্যবল্কের নীতিশাস্ত্র, পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চাণ্যকের অর্থনীতি শাস্ত্রের মৌলিকতা ও বিচারক্ষমতায় সবাই বিস্মিত;

অর্থশাস্ত্রের জগতে নূতন দিশার সন্ধান দিয়েছে তা। কুরুক্ষেত্রে উচ্চারিত গীতা, পৃথিবীতে অতুলনীয়। সে সম্পদের জন্য যুগযুগ ধরে ভারতবাসী গর্ববোধ করতে পারে। কুম্ভমেলায় বিরাট উৎসব, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ, তার হোতা ঐ ভারতবর্ষ। পূণ্যতোয়া নদীতে স্নান করে, ক্লেদ মুক্ত হওয়ার কি সুন্দর সামাজিক উৎসব প্রতি বারো বৎসরে ভারতের চারটি বিশিষ্ট স্থান উজ্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার, ও প্রয়াগে এই উৎসব হয় স্মরণাতীত কাল থেকে।

এই ভারতবর্ষেই শান্তির দূত গৌতম বুদ্ধের মহানির্বাণ। ধর্ম-গুরু আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ ও চৈতন্যদেবের বাণী ও শিক্ষা, এখানে প্রচারিত হয়ে পৃথিবীকে আলো দিয়েছে। সাধক রামপ্রসাদের ভক্তিরসের সঙ্গীতগুলি, আপ্লুত করেছে এদেশবাসীকে। নবযুগের অবতার হয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সহজ, সরল অনাড়ম্বর অথচ সুগভীর উপদেশ, দেশে দেশে আলোড়ন এনেছে। তাঁর শিষ্য ও মন্ত্রপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ সর্বত্র প্রচার করেছেন, এই সত্য ধর্ম। তিনি পৃথিবীর কাছে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এই ধর্মের মর্য্যাদা।

রত্নগর্ভা ভারতমাতার আরও যে সব কৃতী সন্তান, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কার দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের উল্লেখ না করলে বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে, অজস্র তাঁরা। তাঁদের অগ্রণী, রাজা রামমোহন রায়, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য চিরস্মরণীয়। শত শত অসহায়া বিধবাকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছেন অথচ বিধবাদের চোখের জল শুকায়নি, সমাজের নিষ্ঠুর বাধায়, সমাজপতিদের বিচিত্র উন্নাসিকতায়, বিধবাদের জীবন সুকঠিন, যন্ত্রণাপূর্ণ। মুক্তিমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহের প্রচলনকারী তিনি। সামাজিক প্রথার কষাঘাতে যেসব নিষ্পাপ, নিরপরাধ ফুলের মত মেয়েরা কুঁড়িতেই শুকিয়ে যেত, তাদের তিনি প্রাণ ভরে পৃথিবীর আলো ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। পুণার মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, ডাঃ রঘুনাথ পুরুষোত্তম বাজপেয়ী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বাংলার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ শিক্ষার নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছেন। এছাড়া আরও অনেক মনীষী আছেন, যাঁদের নাম তোমরা ক্রমে জানবে, বিস্মিত হবে তাঁদের গভীর জ্ঞান ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তোমরা অবকাশ পেলেই ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান পরিদর্শন করবে। ভ্রমণের দ্বারা মাতৃভূমির স্বরূপ বুঝতে পারবে। যে প্রান্তে যাবে, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, আলাপ আলোচনায় তাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে সচেষ্ট হবে। বিচিত্র জ্ঞানের সন্ধান পাওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা হল দেশ বিদেশ ভ্রমণ।

তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পথ অবলম্বন করে, তাদের নির্দেশিত পথ অনুসরণে যেমন প্রকৃত উপকৃত হয়েছ, তোমাদের উত্তরসূরীরাও তেমনি, তোমাদের অনুসরণে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সমর্থ হবে।

তোমরা শিক্ষা বা বাণিজ্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাবে, স্মরণ রেখ, যে দেশেই যাও, তোমাদের হৃদয়-কেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যাবে ভারতমাতার মূর্তি। Wherever you go, your Mothers' portrait, which you see here, let occupy the centre of your heart and her thoughts crowd your memory.

কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে এলো। নির্নিমেষ নয়নে ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমরা বাহ্য দৃষ্টি বন্ধ কর। মানুষচক্ষে মায়ের চরণ দর্শন করে, প্রণতি জানাও। কণ্ঠে তোমাদের নিনাদিত হোক মাতৃবন্দনা— 'বন্দেমাতরম্'।

এই 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিই বিপ্লবী গোষ্ঠীর কণ্ঠে মাতৃবন্দনায় রূপায়িত হয়ে, দেশের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো 'মুক্তি-মন্ত্র' রূপে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 'বাণী' মন্ত্রপূত হয়ে জাতীয়তাবাদী রণধ্বনিতে পরিণত হল বিপ্লবী গোষ্ঠীর মাধ্যমে।

আর ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে বলা হত 'বাংলা প্রেসিডেন্সি'। আয়তন ছিল বিহার থেকে উড়িষ্যা, এমন কি পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত। বিশাল আয়তন। জনসংখ্যা ছিল প্রায় আট কোটি। এতবড় প্রদেশকে সুষ্ঠুভাবে শাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিভাগ ব্যবস্থার। হিন্দীভাষী বিহার বা ওড়িয়া ভাষীদের পৃথক করে যদি বিচ্ছিন্ন করা হতো, বাংলাভাষীদের প্রতিবাদের কিছু ছিল না। অবশ্য বাংলাভাষীদের ইচ্ছা ছিল— অসমের বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তবর্তী হয়ে গঠিত হোক বাংলা প্রদেশ। কিন্তু কার্জন বা অ্যান্ড্রু ফ্রেজার জাতীয় শাসক তা চাইলেন না। বাঙালীবাবুদের রাজনৈতিক চেতনায় সন্দিগ্ধ কার্জন। তিনি স্থির করলেন, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব সংরক্ষণে, শাসনতান্ত্রিক সুবিধার সুবাদে, বঙ্গ বিভাগের একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই প্রেসিডেন্সীর বাসিন্দার মধ্যে বাঙালীরাই রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ। এঁরাই প্রথমে এসোসিয়েশন-পত্তন করছেন। এঁদের কিছু অংশ বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়। এরাই স্বাধীন রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেন : স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তা। এরাই হৈ চৈ ও প্রতিবাদ শুরু করে সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধ উদ্যোগকারী। এরাই সারা ভারতে, নিঃশব্দে এই শোষণ-ব্যবস্থার প্রতি সরব ও সারা ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট ও স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সমর্থ। সুতরাং এই জাতটাই সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু। এদেশটাকে খণ্ড, বিখণ্ড, করে দিলে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে, পরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারলে— নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে আপনিই হীনবল হয়ে পড়বে। ফলে, শাসন ব্যবস্থাও দৃঢ় করা সম্ভব হবে। সেইসঙ্গে জাতীয় সংহতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল নিবেদিতার। তাদের মাধ্যমে এই গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন তিনি। নেতৃবর্গকে তা জানিয়ে দিলেন, তাঁরাও প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু সরকারী কোন ঘোষণা নেই। এঁদের অনেকের ধারণা 'ইংরাজ-শাসন' এদেশে ভগবানের আশীর্বাদ। মোঘল, পাঠানের শাসনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তির অভাব দেখা দিয়েছিল, ইংরাজদের শাসনে, আর কিছু না হোক, সুখ নিদ্রার সুযোগ এসে গিয়েছে। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছে। ইংরাজরা বিবেচক দেশ। তাদের দ্বারা বিচার বিবেচনাহীন কাজ সম্ভব নয়।

এদেশে পদার্পণের পর থেকেই তাঁর ইচ্ছা ও শক্তিকে, রুদ্ধ করে রেখেছিল অর্থাভাব। প্রতিটি পদক্ষেপকে রুদ্ধ করে দিচ্ছিল কঠোর বন্ধনে। ফলে, তার পরিকল্পনা রূপ নিতে পারছিল না। আলোচনাকালে শ্রীমা (সারদা মা)ও আশঙ্কা প্রকাশে বললেন, তোমাকে এই উদ্দেশ্যে আবার হয়তো এই পাশ্চাত্যযাত্রা করতে হবে!

পাশ্চাত্য যাত্রার চিন্তা নিবেদিতার কাছে বেদনাদায়ক। স্থির করলেন, সঞ্চিত অর্থ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই ভারত ত্যাগ করবেন না। কলকাতা তাঁর বহু কাজ 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়া' শেষ করার একান্ত প্রয়োজন। এতে কিছু অর্থও পাওয়ার সম্ভাবনা। তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা বইখানি স্বামিজী, তাঁর হাত দিয়ে রচনা করিয়ে নিয়েছেন।

১৯শে জুন ১৯০৩ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : এক সপ্তাহ আগে সেন্ট সারা এসে পৌঁছেছেন, আমাশয়ে অত্যন্ত অসুস্থ, তাই অবিলম্বে দার্জিলিং যাওয়ার পরিবর্তে বসুর সঙ্গে তাঁকে থাকতে হল। তিনি এখন অনেক ভাল, সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যে যাত্রা প্রায় নিশ্চিত করছি।

রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর মেয়েকে পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন, সেইসঙ্গে প্রস্তাব দিলেন, তাঁর বাসভবনের একাংশে একটি বিদ্যালয় স্থাপনও

করতে পারেন! এ সুযোগ গ্রহণে অগ্রবর্তী হলেন কিন্তু মনে পড়ে গেল স্বামিজী তাঁকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন! স্থির করলেন, আমৃত্যু পর্যন্ত এখানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন। প্রলুব্ধ হলে চলবে না। এছাড়া, এক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। শিক্ষয়িত্রীদের বেতন ও আনুসঙ্গিক ব্যয় বেড়ে যাবে সেই অনুপাতে। সে অর্থ তাঁকেই বহন করতে হবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ তাঁর পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হল না।

বইখানি শেষ করার একান্ত প্রয়োজন, সম্মুখে কাজও অফুরন্ত, মনোমত করে বইখানি লেখার সময় ও নির্জ্জনতার একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে কৃষ্টীন মায়াবতী আশ্রম থেকে ফিরে আসায়, তাঁর উপর স্কুলের ভার দিয়ে জুলাই মাসে দার্জিলিং যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

কলকাতায় ফিরে এলেন দার্জ্জিলিং থেকে। ১৮ই আগস্ট ১৯০৩ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন · আমার মধ্যে বিরাট এক শক্তি অনুভব করছি— দর্শনের, অনুভবের, ভক্তির— দেখছি এমন শক্তি যা অতীব বিরল। পুরুষের বিচার শক্তিতে যেন নৈতিক পক্ষাঘাত এসে গেছে। যারা মানুষ হিসাবে ভাল, তারা আজেবাজে জিনিসে ব্যস্ত —যখন ধর্মযুদ্ধের হুঙ্কারে তাদের চারিদিক বিদীর্ণ করার কথা! আর যারা মন্দ, তারাতো তাতেই ডুবে আছে।

২৫শে অগস্ট মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমার লাঙলের ফলা ভারতের উপর দিয়ে কেটে এগিয়ে যাক, আরও গভীরে ঢুকে যাক একেবারে কেন্দ্রে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯০৩ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তোমার সেই চিঠিগুলি বড় ভাল লাগে, যাতে তুমি তাঁর কথা কিছু কিছু বল— যা আগে শুনিনি। এবারকার তেমন কথা, আমার শিক্ষার জন্য তিনি বছরের পর বছর ব্যয় করেছেন— যা অন্যকারো ক্ষেত্রে করেন নি! এখন এ কথা শোনাবার পরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯০৩ পুণরায় মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তুমি যে ভাবে বুঝবে, সেভাবে আর কেউ বুঝবে না যে, এটি মোটেই আমার বই নয়— স্বামিজীর বই। এখানে এই আশাই করতে পারি— তাঁর পছন্দমত করে আমি বলতে পেরেছি।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৩ লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : মনে হয় তুমি জানো যে, এই শীতঋতুতে আমি পাশ্চাত্যে যাচ্ছি না। মিঃ স্টেডকে লিখে তা বাতিল করে দিয়েছি। যে প্রস্তাব পেয়েছিলাম তা অবশ্য আমার উন্মত্ত কল্পনারও অতীত, কিন্তু এখানে এতবেশী পথ খুলে যাচ্ছে যে, 'বেটের' স্কুল, মুসলমান সংযোগাদি। আমাদেব সঙ্গে মিস লকউডের যোগদানের সম্ভাব্যনা এবং বিজ্ঞানের কাজ, পল্লীর জন্য হাজারো পরিকল্পনা— এইসব ব্যাপার দেখে মনে হয় স্বামিজী চান আমি এখানে থেকেই কাজ করি। সেটাই তো, ছিল তাঁর অটলও মূল ইচ্ছা। আর দান্তের 'আত্মার স্বর্গে' যে কথা বলেছে, সে তো আমারই কথা "তাঁর ইচ্ছাই আমার শান্তি"। আমি অবিরাম তাঁর জীবনের ধ্যান করতে চাই। ইতিমধ্যেই অনেক 'ভাব' মনে ঘনিয়ে এসেছে।

সাংবাদিকতা শিক্ষার সুবিধা সম্ভবতঃ পরোক্ষ। সে সুবিধার আকাঙ্ক্ষী ঠিক, তা জানতে পারলে ভাল হয়। লণ্ডন সাংবাদিক হিসাবে আমি অবশ্যই অধিক দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবো কিন্তু ঐ দুই প্রান্তের যুগ্ম ব্যাপারটি, আমার জীবনের এই পর্বে, ৬ মাসের বেশী সময় লাভ করার যোগ্য কিনা জানি না। তাদের তুলনায় ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে চাই। সেই সঙ্গে হাডসন রবার্টসনের মত মানুষ ও পজিটিষ্টদের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা পেতে চাই।

১৯০৩ সালের প্রথম দিকে মিঃ স্টেডের কাছ থেকে ভারতবর্ষ থেকে 'রিভিউ অফ রিভিউজ'-এর একটি সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব পেয়েছিলেন নিবেদিতা। কারণ তিনি নিবেদিতার রাজনৈতিক

বুদ্ধি ও সাংবাদিকতার দক্ষতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। স্বামিজীরও পরিকল্পনা ছিল নিবেদিতার দ্বারা একটি পত্রিকা চালিত হোক, প্রবুদ্ধ ভারত ও ব্রহ্মবাদিনের কাজ ছাড়া। এ সম্বন্ধে আলোচনাও হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে কিন্তু কার্য্যকারী হল না স্বামিজীর দেহত্যাগের ফলে। সে সুযোগ এসে যাওয়ায়, নিবেদিতা উৎসাহিত হলেন। ২৩শে এপ্রিল ১৯০৩, মিসেস লেগেটকে তিনি পত্র দিলেন কলকাতা থেকে : একটা 'ভাব' সৃষ্টিই আমার কাজ। সে 'ভাব' মানে স্বামিজীর আর 'ভাবের' জন্ম দিতে হয় ছাপাখানা ঘরের ধূলিজালের মধ্যে। ...মিঃ স্টেডের সঙ্গে এখন কোন একটা বিষয়ে কথাবার্তা চলেছে। আমি খুবই কৃতজ্ঞ হবো যদি আপনি বা মিঃ লেগেট কিংবা অ্যালবার্টা এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। ব্যাপারটি সম্বন্ধে তার অনুকুলে ও প্রতিকূলের গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন বক্তব্য তাঁর মনে জেগেছে। সেটি— তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তিনি কিভাবে বলবেন— তা আমি জানতে ইচ্ছুক। যদি আপনি উচিত বিবেচনা করেন এবং অ্যালবার্টা কাজটাকে ঝঞ্ঝাট মনে না করে, তাহলে মিঃ স্টেডের সঙ্গে, নিজ অফিসে সাক্ষাতে সানন্দে আলোচনা করতে রাজি। তাঁর অফিস মোরে হাউস, নরফোক্ স্ট্রীট স্ট্র্যাণ্ডে।

পরিকল্পনাটা যদি কার্য্যকর করতে পারি, তাহলে স্বামিজী কি যে খুশী হবেন! প্রশ্নটা এখন খোলাখুলি টাকার। অথচ প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ এত অল্প যে, তাঁকে সেটা জানাতেই পারছি না, পাছে তিনি তা হাস্যকর মনে করেন। মূলধন পুরো দু'হাজার পাউণ্ডও নয়। আমাদের মাসিক খরচ ৭০ পাউণ্ডেরও কম হবে. ঋণশোধও অবশ্য সেই অনুপাতে।

একই তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : পত্রিকাটির জন্য হয়ত তাঁকে ইংলণ্ডে যেতে হতে পারে। প্রার্থনা করো : পত্রিকাটি যেন সম্ভবপর হয়। স্বামিজীর তা হলে আনন্দের সীমা থাকবে না।

এক্ষেত্রে তাঁর আশা ছিল— মূলধনের টাকা লেগেটদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে— অবশ্য ঋণ হিসাবে।

পত্রিকার পরিকল্পনা কার্যকর হল না— তিনিও ক্রমে ভারতবর্ষের নানা কাজে জড়িয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন পত্রিকা চালানোর মত সর্বগ্রাসী কাজ নেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। ১৯শে জুন ১৯০৩, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

যদি তুমি মিঃ স্টেডের সঙ্গে দেখা করে না থাকো, তাতে কিছু এসে যায় নি, কারণ বর্তমানের জন্য সে বিষয়ে আলোচনা স্থগিত। তবে একই সঙ্গে আমার মস্তিষ্কের রাজনৈতিক বুদ্ধির বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট সম্ভ্রম প্রকাশিত হয়েছে, সেটি আমার পক্ষে অল্প আত্মপ্রাসাদের কারণ নয়।

১৬ই অক্টোবর ১৯০৩ বাংলা ৯ই কার্তিক, ১৭নং বোসপাড়া লেনে বিধবা ও বিবাহিতা মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে, একটি স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে সভার অধিবেশন ডাকা হল। প্রথম যখন নিবেদিতা কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীমা তখন ১৺নং বাড়ীতে থাকতেন। এখানেই স্বামীজী তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে ১৭নং বাড়ীতে বাস শুরু করেন স্বামিজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ও পরে এখানেই স্কুল স্থাপনা করা হয়। মিসেস ওলিবুল জাপান থেকে ঘুরে যখন এখানে এলেন, নিবেদিতার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। এই অধিবেশনে উপস্থিত মহিলা বৃন্দকে, তিনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে শোনালেন। স্বামী সারদানন্দ গীতাপাঠ ও বক্তৃতা করলেন। স্বামী বোধানন্দ গীতার ব্যাখ্যা করে শোনালেন। স্থির হল : এখানে ২রা নভেম্বর থেকে বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় চালু করা হবে। কৃষ্টীন সূচীশিল্প শিক্ষা দেবেন। জগদীশচন্দ্রের বোন লাবন্যপ্রভা বসু বয়স্কদের পড়ানোর ভার নেবেন। যোগীনমা, ধর্ম শিক্ষার ভার নেবেন। যথারীতি স্কুল খোলা হল। ছাত্রীগণ সকলেই প্রাচীনপন্থী পরিবারের কন্যা ও বধূ। সমাজে তখন পর্দাপ্রথা বর্তমান। সেজন্য মেয়েদের ঘোড়ার গাড়ীতে আনার ব্যবস্থা হল।

ইতিপূর্বে মিশনারী ব্যবস্থায় মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য স্কুলও স্থাপিত হয়েছে কিন্তু সেখানে শিক্ষার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার চালু থাকায়, অভিভাবকগণ মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ দেখাতেন। ঘরেই যৎসামান্য শিক্ষাদানের পর, মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন, এই ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে নিবেদিতার স্কুলে ছাত্রীরা কিছুদিন শিক্ষার পরই, স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হত। ফলে, নিবেদিতার শিক্ষার প্রচেষ্টা কার্যকর হওয়া অন্তরায় হয়ে ওঠায় নতুন এই বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার আয়োজন দেখা দিল।

এখানে 'হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুরীতি' নীতি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা চুল হলেও, স্থানীয় অভিভাবকগণকে অনেক সাধ্য সাধনায়, অনেক অনুরোধ ও অনুনয়ের পর, নিবেদিতা ছাত্রী সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কৃষ্টীনের গভীর আন্তরিকতা।

শিক্ষা ব্যবস্থা ১৭নং বাড়ীতে চালু হলে পর, স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৬নং বাড়িটি পুনরায় ভাড়া নেওয়া ব্যবস্থা হল। উপরের যে ঘরটিতে শ্রীমা থাকতেন, সে ঘরটিতে কৃষ্টীন বিবাহিতা ও বিধবাদের জন্য, ক্লাশ নেওয়া শুরু করলেন সোম ও বুধবার। অন্যদিন ছোটদের ক্লাশ চালু রাখা হল। যে ঘরটিতে নিবেদিতা থাকতেন, সেখানে কৃষ্টীনে শোবার ব্যবস্থা হল। ১৭নং এর ভিতরের দিকে গোপালের মা ও পরিচারিকা বেট এবং নিজের শোবার ব্যবস্থা করলেন। ছোট একটি ঘর ছিল। সেটি ঠাকুর ঘরে পরিণত করা হল। সামনের ঘরটিতে পাঠঘরের ব্যবস্থা করা হল।

মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : সকালে উঠে তাড়াতাড়ি পাঠ ঘরে এসে বসি। বেলা ন'টায় কয়েকজন ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রীকে ঘন্টাখানেকের জন্য কিণ্ডারগার্ডেন ট্রেনিং দিই। ছোট মেয়েদের ক্লাশ শুরু হয় বেলা বারোটায়। শেষ হয় সাড়ে চারটায়। তাদের চা বিস্কুট খাইয়ে দিই, তারা চলে যায় বেলা পাঁচটায়। কৃষ্টীনের বউরা প্রতিদিন একটা থেকে চারটা পঁয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত পাঠ গ্রহণ করে।

বছরের শেষে হয়, কার্জ্জন সরকার, বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা করলেন নিজ পরিকল্পনা মত। স্বামী সদানন্দ ও তাঁর ভাগিনেয় স্বামী শঙ্করকে জাপানে পাঠালেন নিবেদিতা।

কার্জন পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর ঝড় উঠলো। সারাবাংলা হিন্দু, মুসলমান, জমিদার, প্রজা, দেশী, বিদেশী ব্যবসায়ী, সচেতন সব শ্রেণীর মানুষ; প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন, শতশত পত্র মারফৎ। শতশত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। সরকার রইলেন নির্বিকার।

৮ই ডিসেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে চিঠি লিখলেন নিবেদিতা, ওঃ য়ুম, এক ছোকরার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক হল এক্ষুনি। এখানকার মানুষের মনের মধ্যে 'সেকুলার' জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ঘৃণা কী গভীরে প্রবেশ করে আছে— কি বলবো। আধ্যাত্মিক অহমিকা, এদের চিন্তা করতে উৎসাহ দেয়, খুব বড় বাসনা মানেই বিরাট মহত্ত্ব। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রাণপণে প্রচণ্ডভাবে কাজ করার এবং আত্মত্যাগ করার প্রয়োজন, যেন নেই! সন্ন্যাসী বেশধারী যে কেউ, তার থেকে অনেক সাহসী ও মহৎ। সে কোন মানুষ সম্বন্ধে ঘৃণাভরে কথা বলবে, যেহেতু অন্য মানুষটি সন্ন্যাসী নয়।

তবু, আমি নিজের উপর বা নিজের বুদ্ধির উপর, এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছি না। কারণ স্বামিজী অনেক সময়ে এটা ওটা বিষয়ে আমাকে ধমক দিতেন কিন্তু তবুও তিনি সেই সঙ্গে আমাকে সর্ব্ব মনপ্রাণ দিয়ে নিজের পথ বেছে নেবার জন্য সজোরে চালিতে করেছেন, এক্ষেত্রে আমার কাছে অন্য কোন পথ খোলা নেই।

হাজার হাজার শিষ্য যোগাড় করতাম— যদি পারতাম! ভবিষ্যতে, আত্মত্যাগে সমর্থ— সেই হাজার হাজার আত্মাকে হাটে বাজারে, বিদ্যালয়ে, ল্যাবটারীতে, স্টুডিওতে ছড়িয়ে দিতাম শিষ্যরূপে এবং যদি দেশের সেকুলার জীবনকে গঠন করতে পারতাম, তাহলে সেক্ষেত্রে ভগবান ও শয়তানের মধ্যে সন্ন্যাসীকে নিয়ে লড়াই বাঁধিয়ে দিতাম। অথচ আমি নিশ্চয়ই ধর্ম্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন নই।

১৭ই ডিসেম্বর মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : নূতন পুস্তক সম্বন্ধে খোকার 'আইডিয়াটি' অপূর্ব। কিন্তু আমরা একটা নতুন পেপার শেষ করছি।

৭ই জানুয়ারী ১৯০৪, 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' বইটিকে উৎসর্গ করলেন স্বামিজীকে। স্বামিজীর অন্তরের বাণী ছিল 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'। তাঁর নামের উল্লেখ না করে, ওই বাণীটির উল্লেখ করলেন মাত্র। 'উৎসর্গ' কথাটি তাঁর হয়ে লিখলেন জগদীশচন্দ্র। সেইসঙ্গে, লিপিবদ্ধ করলেন রমেশচন্দ্র দত্ত ও প্যাট্রিক গেডেসের কাছে ঋণস্বীকৃতি।

৭ই জানুয়ারী ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : 'ওয়েব' তাঁর, স্বামিজীর বই— তাই নয় কি? আর কোন উৎসর্গ পত্র নয়, শুধু লেখা— 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে! গুরুজীর জয়! প্রিয় য়ুম, তোমার সমস্ত জীবন মুখর হয়েছে এই কথায়— ওয়াহ্ গুরু! এই উৎসর্গটি খোকা নিজের হাতে লিখেছে— আমার পক্ষে।'

৯ই জানুয়ারী পড়ে ছিল স্বামিজীর জন্মদিন। সারাদিন কাটালেন বেলুড় মঠে। পরের দিন রবিবার সাধারণ উৎসব। মঠে গেলেন, বক্তৃতা দিলেন স্বামিজী সম্বন্ধে।

১১ই জানুয়ারী চিঠি দিলেন মিস ম্যাকলাউডকে : আমি এখন, জানার অধ্যায়ে পৌছে গেছি, আর অনুমানের মধ্যে নেই। তুমিও কি-- নিশ্চয়-নিশ্চয়-নিশ্চয় আরও।

স্বামিজী আমাকে যা দিয়েছেন, যদি ঈশ্বর সকলকে তা দিতেন! যদি তিনি, শুধু দিয়েই যেতেন সর্বোচ্চ দান! কারণ এখন আমি আর কোন মতে শিক্ষা করতে, প্রার্থনা করতে, দাবী করতে, লজ্জিত নই। অধিকাংশ লোককে, এখন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে, আমি পরাস্ত করতে পারি। আমি যা চাই, তা দারুণ ভাবে চাই। তাকে আমি পাবোই। প্রত্যাখ্যান? নৈব চ। যে ঘুটিতে নিজেকে বেঁধেছি, তার নাম ঈশ্বর— সুতরাং পাওয়ার বস্তু পাবোই।

আমার এই শক্তিবোধ কি বিচিত্র! কারণ আমরা দুই অন্ধকারের মধ্যবর্তী একটা বিন্দু ছাড়া আর কি? অনন্তের তিমির রাত্রে, ধূলির এক পরমাণু— অসীম শূন্যের গহ্বরে পতিত দৃশ্যমান পালক বইতো নই! তবু, প্রত্যেক মানবসত্ত্বায় সমগ্র শক্তি। কিন্তু— তাই ঠিক— অন্য কিছু হতে পারে না। সেটা জানাই রহস্যের বস্তু। কে যেন বলছেন : সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভার একটি তুষার কণাকে নিজস্থানে স্থির রাখে— তুষার কণাটি তা জানতো, জেনে উপভোগ করতো।

১৭ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দিরে স্বামিজীর জন্মতিথি উৎসব হল। বৈকালে একটি সভা হল সেখানে। সভাপতি স্বামী সারদানন্দ। বক্তৃতা দিলেন : রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, জি. চৌধুরী, সখারাম দেউস্কর, নেশান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এন. ঘোষ, শেষে দিলেন তিনি।

বক্তৃতাপর্ব শুরু হল দ্বিতীয়বার, ২০শে জানুয়ারী। যাত্রা করলেন বাঁকীপুর। ইতিমধ্যে স্বামী সদানন্দ ও তার ভাগিনেয় অমূল্যচন্দ্র পরে শঙ্করানন্দ জাপানে অবস্থিত লক্ষ্ণৌ- প্রাসাদ নামক এক ছাত্রের রচিত জাতীয় সঙ্গীত বহন করে আনলেন : 'আও মার্দানো, হিন্দু জোয়ানো, জলদি তোল হাতিয়ার, ফৌজ কর তৈয়ার।' এ গানটি বিপ্লবীগণের ভারতীয় লা-মার্শাই রূপে ব্যবহৃত হতে লাগলো।

২১শে জানুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : স্বামিজী-বিষয়ে চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। তিনি তাঁর শেষ অসুখে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। সহসা আমাদের সকলকে ব্যক্তিগতভাবে স্মরণ করলেন। খুব মৃদু মধুরভাবে কিছু বললেন। তারপর— মার্গট, তোমার এত চুপচাপ থাকার দরকার নেই, পরেরবার এই দরজায় এসো, কোন গাড়ীতে, আর খুব পাজি গাড়ী হোক তা— তিনি বললেন। স্বপ্ন কত উদ্ভট হয় জানোই, কিন্তু আমার ধারণা হল— এই স্বপ্নটি, আমি যে স্বামিজীর ব্যক্তিগত ভালবাসাকে স্মরণ করেছিলাম তারই ছদ্মবেশ। তিনি মুখরতা অপছন্দ করবেন না। তিনি খুবই জানতে চাইবেন, কেন মানুষ তাঁর কাছে এসেছেন।

বাঁকীপুরের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিলেন। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'ভারতে শিক্ষা সমস্যা', 'গীতা', 'স্বামিজীর মিশন'।

২৫শে জানুয়ারী যাত্রা করলেন পাটনার উদ্দেশ্যে। বক্তৃতার রিপোর্ট বিহার হেরল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগলো। সেইসঙ্গে মন্তব্য করলো : যৌগিক রহস্য শিক্ষা বা মূল ধর্মের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহ ব্যাখ্যার চেষ্টা করছেন না সিস্টার নিবেদিতা। বরং ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন, জাতি হিসাবে প্রত্যেককে প্রগতির পথে অগ্রসর হও। মুখে অপরিমেয় শান্তি নয়, মল্ল যুদ্ধ শেখ, বক্সিং করো. সেই সঙ্গে তরবারি চালানো শেখ। শক্তিধর পুরুষ হও। প্রত্যেকে বলিষ্ঠ হও, বীর্য্যশালী বীর হয়ে ওঠো। লড়াইয়ের ডাক এলে— সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলে জাতীয়শক্তি বিকাশ করবে। ঘুমিয়ে থেকো না।

অশোকের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। সেই পাটলীপুত্রের বর্তমান নাম পাটনা। এখানে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পাটলীপুত্র হিন্দু বালক সঙ্ঘ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে— ছাত্রদের উপদেশ দিলেন : তোমাদের সর্বদা চিন্তা করা কর্তব্য : 'ভারত' তথা জন্মভূমি আজ তোমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করে? তোমরা সাহসী হবে, সর্বদা মহাভারতের কথা স্মরণ রাখবে। তোমাদের প্রধান কর্তব্য : আহার ও নিদ্রাব প্রতি মনোযোগ দেওয়া, দ্বিতীয় হল: খেলাধূলায় যোগ দেওয়া। যে শিক্ষা বর্তমানে তোমরা লাভ করছো সে বিদেশী ভাষা আরব্ধ করতে তোমাদের অর্ধেক শক্তির ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং শরীর গঠনের দিকে নজর রাখবে সর্ব্বাগ্রে। শক্তিশালী যুবক হতে হবে তোমাদের। লক্ষ্য রাখবে, পড়াশুনায় সমস্ত শক্তি যেন ব্যয় হয়ে না যায়! লক্ষ্য থাকুক : মাতৃভূমির কল্যাণ। মনে রাখ : সমগ্র ভারত তোমার দেশ। আর এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন কাজ শুধু কাজ। তোমরা জ্ঞান ও শক্তি, সচেষ্ট থাকবে সুখ ও ঐশ্বর্য লাভে কিন্তু, জীবনের লক্ষ্যও হবে স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তির, সে কথা সদাই স্মরণ রাখবে। সংগ্রামের ডাক যখন আসবে. তোমরা যেন নিদ্রায় মগ্ন থেকো না।

মহিলাদের জন্য ও একটি বিশেষ সভার ব্যবস্থা হল। উদ্যোক্তা স্বামী সদানন্দ। বিষয় 'জাপান'। দেখানো হল ম্যাজিক লণ্ঠনে। দলে দলে মেয়েরা সকলে, সে সভায় যোগদান করলো। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবার থেকে এরূপ বক্তৃতার জন্য ডাক পড়তে লাগলো। মেয়েদের আগ্রহ দেখে খুশী হলেন তিনি।

'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতার সংবাদ প্রচার পেতে লাগলো। সম্পাদকীয়তেও তাঁর বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা বেরুতে লাগলো : তরুণ ছাত্রসম্প্রদায় তাঁর সংস্পর্শে এসে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও দেশাত্মবোধে উদ্বোধিত হচ্ছে ক্রমশঃ। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন : 'বিহার প্রদেশে এরূপ একজন বক্তার বিশেষ প্রয়োজন।'

পূর্বেই লক্ষ্ণৌ শহরে বক্তৃতার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। বুদ্ধগয়া দর্শনের ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের। স্বামিজী স্বয়ং ওকাকুরা ও মিস ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে প্রথমে বুদ্ধগয়া ও পরে কাশীধামে গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এটাই তাঁর শেষ ভ্রমণ। এত কাছে এসে বুদ্ধগয়া ও রাজগৃহ দর্শন না করে যাওয়াটা তাঁর মনঃপুত হল না। ২৪শে জানুয়াবী বাঁকীপুর ত্যাগ করে বক্তিয়াপুর হয়ে রাজগৃহ বা রাজগীরে উপস্থিত হলেন। পরের দিন হাতীর পিঠে চেপে নালন্দার ভগ্নস্তূপ দর্শন করে এলেন। ২৭শে রাজগৃহ থেকে যাত্রা করলেন। যানবাহনের অভাব, চন্দ্রালোকে সারারাত্রি পায়ে হেঁটে তিলাইয়া পৌছলেন। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও আহারাদির পর, ট্রেনে বুদ্ধগয়া যাত্রা করলেন।

এখানে মোহন্তের অতিথিরূপে ডাক বাংলোয় অবস্থান করলেন। এখান থেকে ফিরে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : সম্প্রতি বুদ্ধগয়া ঘুরে এলাম। মোহন্তের অতিথি হয়েছিলাম। মন্দির ও বোধিবৃক্ষ দেখে এসেছি। তুমিতো আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলনি? সত্যিই কি তুমি উপলব্ধি করিনি যে ভারতবর্ষে এই স্থানটির গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক?

চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত রজনী। নিঃশব্দে বোধিদ্রুমতলায় বসলাম। মুহূর্তে হৃদয় অধিকার করলো স্বামিজীর প্রথম বুদ্ধগয়ায় আগমনের স্মৃতি। কাশীপুরে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তিম শয্যায়। তরুণ শিষ্যগণের মধ্যে অবিরাম বুদ্ধের প্রসঙ্গ চলছে। বৈরাগ্যে অশান্ত হৃদয় স্বামিজীর। একদিন হঠাৎ স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন বুদ্ধগয়ায়। এই বোধিদ্রুমতলে উপবিষ্ট হয়ে বুদ্ধের প্রেম, করুণা ও মৈত্রী স্মরণে উদ্বেলিত হয়েছিলেন।

তারিখ নির্দিষ্ট। অপেক্ষার অবসর নেই। পুণরায় আসার সংকল্প নিয়ে অতৃপ্ত চিত্তে বুদ্ধগয়া ত্যাগ করলেন। পথের মধ্যে পড়ে সুজাতার গৃহ। দেখে নিলেন। কাশী হয়ে ৩০শে জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ পৌঁছলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতিদিন বক্তৃতা দিলেন : 'আজিকার সমস্যা' 'শিক্ষা' 'বুদ্ধগয়া' ও 'হিন্দুধর্মে ইহার স্থান'। 'ভারতে মুসলমান' 'প্রকৃত গুরুভক্তি' ও 'হিন্দু মুসলমান'। ৩রা ফেব্রুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ভারতের হাটে বাজারেও যুদ্ধের কথা জানা। জাপানীরা পীড়িত ও আহতের জন্য টাকা চায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থ সংগ্রহের কাজ আমি গ্রহণ করতে পারবো বলে মনে করি না। তবে আমার ইচ্ছা ভারত কিছু পাঠাক। টোকিও থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞ, কেননা, সেই সূত্রে ও দেশের জন্য পরস্পরের বিশেষ সহানুভূতির কথা জানানো সম্ভব হয়েছে। ...অধ্যাপক গেডেস ধন্য। তিনি আমাকে স্থান অনুশীলনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন।...

ওকাকুরা যা করবেন বলেছিলেন, তা করেননি, তবু তাঁর বইটির প্রয়োজন ছিল। এর গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে দাঁড়াবে। লোকটি বইটির মধ্যে দিয়ে সেবা করেছেন, বিপুল সেবা করেছেন!

৭ই ফেব্রুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

ঝিলামের উপরে যাপন করা দিনগুলিতে, কিভাবে না ফিরে যেতে চাই। রাত্রিগুলি— তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়া। আর হারিয়ে যাওয়া হাতের ছোঁয়া, নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠের শব্দ তাঁরই জন্য।

কিন্তু বল? বল! সে দিনগুলি যেমনভাবে চলে গেছে, আমরাও তেমনি চলে যাবো, তারকার নীচে, ঘুমিয়ে পড়া পার্বত্য সানুদেশের শান্তিতে, আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে অন্তর।

মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন ১৬ই ফেব্রুয়ারী :

প্রিয় য়ুম, আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি হয়ত ভারতে আর আসবে না! আমি হয়ত যাবো না পাশ্চাত্যে। যদি তাই হয়— আমরা আর কখনও মিলবো না! অদ্ভুত! অদ্ভুত! পৃথিবী রইলো, জীবনও রইল, তবু তোমার সাক্ষাতে এলাম না— বিচিত্র বটে! তবু তা ঘটতেই পারে। তবু মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপারের জীবনসম্বন্ধে, মানুষের ধারণা কতই সহজ হয়ে আসে। মৃত্যুর একেবারে পূর্ব পর্য্যন্ত, স্বামিজী কিভাবে তাঁর 'বুড়ো লোকটি'র সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার ভাবে, বিভোর থাকতেন, আমি তা দেখেছি। তা যদি সত্য হয়— সত্য হবে না কেন?— তা হলে অন্যদের ক্ষেত্রেও পুনর্মিলন ও হিসাব-নিকাশ থাকবে না কেন? যেমন, তিনি সেই প্রথম ভারতীয় সন্ধ্যায়, কতবছর আগে আমাকে বলেছিলেন— একপক্ষকাল আগে সে দিনটি গেছে, বৎস! তুমি খুবই ভাল করেছ, খুবই ভাল। এই হিসাব-নিকাশের জন্য কত না তৃষ্ণার্ত ছিলাম।

আমি নিশ্চিত অনুভব করি, তিনি যা ছিলেন আরও বেশী করে তাই হয়ে উঠবেন! যতখানি তা সহজে কল্পনা করা শক্ত। তার মধ্যে ছোটখাটো জিনিষ গুলি তাঁর চরিত্রের গভীরতম, বিশিষ্টতম লক্ষণ। ...কিন্তু যুম, ওঃ যুম— মনে হয় আরও কোথাও না কোথাও ফোডল এবং ক্রোকাসের প্রান্তর থাকবে, তার মধ্যে দিয়ে জলধারা প্রবাহিতও হয়ে যাবে— সেখানে তুমি এবং আমি, তাঁর জ্যোতির্মণ্ডলে বাস করবো। আর তাঁরই সঙ্গে ঘুরবো, ফিরবো, কাশ্মীরের স্বপ্নদর্শন কী অপরূপ! আমার আরও মনে হয়, মৃত্যুর পরে, সেই সময়ে অপার্থিব শান্তি ঘনাবে, তারই মধ্যে সমস্ত জীবনের সংস্কারকে সঞ্চিত করে নির্মাণ করা হবে নতুন চরিত্রের, নতুন প্রাণের। তখনকার প্রার্থনা— ঈশ্বরের হাতে যেন সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়ে ওঠার গলিত ধাতু হয়ে উঠতে পারি— যেন বিগলিত হই তাঁরই সঞ্চারিত ইচ্ছার তাপে— যেন আমাদের আমিত্ব কোথাও নির্মাণের কাজে, বাধার সৃষ্টি না করে।

তারপর প্রত্যাবর্তন— অবকাশের অন্তে, ভৃত্যের মত শান্তির অন্তে, সৈনিকের মত নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে। এমনি আমার উপলব্ধি ইচ্ছা শক্তির বোধ— যা বিস্তারিত হবে ভবিষ্যৎ নানা জীবনে, আর আচ্ছন্ন ও উৎসর্গ করতে তাদের সকলকে।

লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় 'বুদ্ধগয়া' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী চৈতন্য গ্রন্থাগারে কমিটির তত্ত্বাবধানে ডালহৌসী ইন্‌স্টিটিউটে 'ব্রহ্মচর্য্য বনাম বিবাহ' ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে 'ডাইনামিক রিলিজন'— বক্তৃতা দিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় সে বক্তৃতার রিপোর্ট বেরুলো। ৩রা মার্চ ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে পত্র দিলেন : গত শুক্রবার আমার টাউন হলে বক্তৃতা সফল হয়েছে। এমন বলা হচ্ছে। বারোশো'র মত দর্শক, কারণ মাত্র তিনদিন প্রস্তুতির জন্য পাওয়া গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এটা ভালই সমাবেশ। আশা করছি, এখন থেকে গ্রীষ্মকালের মধ্যবর্তী সময়ে থিয়েটার হলে বক্তৃতামালার আয়োজন করবো। ইতিমধ্যে আজ রাত্রে কয়েকদিনের জন্য বুদ্ধগয়া ও বারানসী যাচ্ছি। শেষোক্ত স্থানে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেব।

প্রথমতঃ স্থানটি স্বামিজীর স্মৃতি বিজড়িত। এছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে এখানে একটি বিদ্যায়তন স্থাপনের উৎসাহ দিয়েছিলেন। অবশ্য কাজে তা পরিণত হলনা। আরও একটা কারণ যখন তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন প্রথম জীবনে, বৌদ্ধধর্ম পাঠ করে তাঁর যুক্তিবাদী মন কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেছিল। স্বামিজীর সংস্পর্শে এসে বুদ্ধদেবের মানবপ্রেমের পরিচয়ে অভিভূত হয়েছিলাম।

এইসময়ে স্টেটসম্যান সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য উদ্ভূত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে মতামত প্রকাশের জন্য এবং সে সময়ে নিবেদিতাও যুক্ত আছেন স্টেটসম্যান পত্রিকায়, এডিটোরিয়্যাল কলম লেখার কাজে। মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিকের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত তখন তিনি। তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ র‍্যাটক্লিফের চাকরী ছেড়ে চলে যাওয়ায় কথা উঠেছে অবশ্য পরে তা আপাততঃ স্থগিত হয়ে গেল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী তাকে লিখলেন হ্যাঁ, তাহলে তুমি থাকছ! শেষ পর্য্যন্ত যদি সত্যই থাকো, তাতে আনন্দিত হবো। এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুমি আমাদের ছোট গোষ্ঠীর অঙ্গাঙ্গি অংশ হয়ে গিয়েছিল। যদি তোমাকে অগত্যা চলে যেতে হয়, তাহলে বুঝব যে, তুমি অধিক দূরত্বে থেকে, আমাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করছো। তুমি আমার সহানুভূতি চাও বলেছ। অনুভব করি তা সম্পূর্ণত তোমার জন্য রয়েছে। দানের অর্থ কি,— তা তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না। মুক্তদান-মুক্তগ্রহণ। মনে রেখো, যে পরিমাণে তুমি দিতে দেবে, সেই পরিমাণে আমি কৃতজ্ঞ হবো। কারণ সহযোগিত্বের অর্পণে কঠিন ভূমিতে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম, ভালবসার নির্ভয় দান—এই তো সকলের অনন্ত প্রয়োজন, নয় কি?

এইসঙ্গে তাঁর কাছে রক্ষিত স্বামিজীর যুববাণী দান করলেন : আমরা আমাদের স্মৃতিতে একটি বিরাট 'গসপেলে' বহন করছি। আজ এই সকালে তার থেকে কিছু উদ্বৃত করি। তা আমার ব্যক্তিগত মেসেজ বলে গ্রহণ করো : 'তুমি অরণ্যে উচ্চারিত আর কোন কণ্ঠস্বরে ধরা দিও না। ...যে জীবন তুমি যাপন করছো, ধনী বা দরিদ্রের মধ্যে, বিজ্ঞ বা অজ্ঞদের মধ্যে— সে জীবন যখন বিচারের সম্মুখীন হবে এবং হৃদয় ও মনের মধ্যে সংঘাত বাধবে, তখন হৃদয়কে অনুসরণ করো। ভুল করতেই পারো, তা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। ভ্রান্তি ছাড়া অগ্রগতি নেই। মন যদি হৃদয়ের স্থান পূরণ করতে পারে, উত্তম, নচেৎ হৃদয়কে পথ দেখতে দাও। সে হল নদী। খাল পথে তাকে চালিত করতে পারো, সেতুপথে তা পার হতে পার, কিন্তু নদীই গুরুত্বপূর্ণ। সে সকলই বহন করে, সকলই নির্মাণ করে— তাই হল বস্তুর প্রাণ।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব, যদি ভারতবর্ষ আমাকে যেভাবে অনুভব করিয়েছে, তোমাকেও সেইভাবে অনুভব করাতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে, আমাদের মধ্যে নিজস্ব বস্তু যা আছে, তা আমাদের দুর্বলতা নয়— পরন্তু শক্তি।

যাবার পথে পুণরায় বুদ্ধগয়া এলেন। সঙ্গে মিসেস সেভিয়ার। মোহন্তের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হল। কাশী গেলেন। মিসেস সেভিয়ার মায়াবতী চলে গেলেন। এখানে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিলেন: 'ধর্ম ও ভবিষ্যৎ', 'নাগরিক জীবন' ও 'শিক্ষা সমস্যা'।

১৭ই মার্চ ১৯০৪ ম্যাকলাউডকে লিখলেন: ছেলেদের কাছে শুনলাম মিঃ ওকাকুরা ৯ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার উদ্দেশ্যে জাপান ত্যাগ করেছেন। আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি, যদি তিনি ভারত হয়ে না ফেরেন, তাহলে আমি খুব খুশী হবো।

তাঁর ভারতে আগমন অসচেতন তাৎপর্য্য খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যে লক্ষ্যের জন্য তাঁর প্রয়াস, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাঁর সচেতন উদ্দেশ্য সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না এবং সরলা ব্যাপারটাকে যেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছে, তা দেখার পর, আমার পক্ষে পূর্বভূমিকা নেওয়া সম্ভব নয়।... তবে ওকাকুরার বইটির মূল্য আছে, এই ধরনের গ্রন্থ রচনার মত নির্দিষ্ট কাজে মিঃ ওকাকুরাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আরও লিখলেন : বছরের চাকা ঘুরে আমরা আবার একই দিনে ফিরে আসি। পরের শুক্রবার ২৫শে মার্চ, এই দিন আমার 'নিবেদিতা' নামের জন্মদিন। তাহলে আমি সাত বছরে পড়লাম। তাঁর সেবায় ধন্য হোক ঐ দিন। নির্দোষ, নিখুঁত হোক আমার সেবা— কিন্তু সে যে বড় বেশী আকাঙ্ক্ষা!

তোমার কি মনে পড়ে 'কিরো' ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন— আমি ৪২ থেকে ৪৯-এর মধ্যে মারা যাবো। এখন ৩৬ চলছে। সুতরাং বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে মনে হয়। মনে হয় মারা যাব ১৯১২তে।

য়ুম, এই বৎসরগুলোতে সত্যই কি ভারতের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন ঘটবে? আমি কি দেখে যেতে পারবো— সত্যিই আমি স্বামিজীর কাজে লেগেছি! আমি তাই চেয়েছি— শুধু তাই চাই। চাইবোও ভবিষ্যতে। শুধু চাইবো— যেন তাঁর কোন বোঝা, তাঁর পক্ষে, আমি বয়ে যেতে পারি! যদি আমি শুধু অনুভব করতে পারি যে, পৃথিবীর এপারে আমি তাঁর কাজে আছি বলে, ওপারে তাঁর বিরাট আত্মা কায়ামুক্ত, আনন্দে ও লীলায় ব্যাপৃত, তাহলে সেই অনুভূতিতেই আমার সবকিছু— আমার স্বর্গ, আমার নিত্য, শাশ্বত। মুক্তি আমার কাছে তুচ্ছ। এমন কি, কথাটা আমার মুখে উদ্ভট ঠেকবে, তবু বলছি— এমনকি আমি চাই না যে, তিনি আমার পাপ ক্ষমা করুন, তিনি মধুর হোন আমার কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করি না, আমি শুধু তাঁর দায় বইতে চাই, যাতে তিনি মুক্ত থাকেন. ঈশ্বরানন্দ ভোগে। যে কোন আত্মা, যাঁর বিষয়ে এমন স্বপ্ন দেখা যায়, এবং সে স্বপ্ন যে সত্য, তাও অনুভব করা যায়! সে আত্মা কি স্বয়ং ঈশ্বরের নয়?

কলকাতায় ফিরে এসে ২০শে মার্চ ১৯০৪, কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে মাদ্রাসা কর্তৃক আহুত হয়ে 'এশিয়ান ইসলাম' বক্তৃতা দিলেন।

১৭ই মার্চ ১৯০৪, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন :

এ চিঠি দীর্ঘ হবে না কারণ আমার নিতান্ত সময়াভাব। এ সপ্তাহে খোকাকে, অবার যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তার বালক ভাগিনের— যে তার নিজের শিষ্যও বটে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। কিন্তু আমি জানি, স্বামিজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ফিরিয়ে আনবেন। গতকাল সকালে মনে হয়েছে তার বিপদ কেটেছে। স্বামিজী কখনই প্রিয় কোন জীবনকে ত্যাগ করেন না। এই হল সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা। মধ্যবর্তীকালে এই সংকটের জন্য, খোকা ও ছেলেটির মধ্যে সম্পর্ক অপূর্বভাবে গভীর হয়েছে। সে এখন আমাদের ছোট খোকা আনন্দমোহনের মতই ঘনিষ্ঠ। কোন কিছু তাতে চিড় খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু খোকার (বসুর) যাতনা ছিল নিদারুণ।

একটি চিঠিতে জানাচ্ছি যে, অমুক ওয়েবোর, রয়্যাল সোসাইটিতে দাঁড়িয়ে উঠে ডঃ বসুর মত প্রকাশে, বাধা দেবার মত স্পর্ধা দেখিয়েছে! কল্পনা করতে পারো! তুমি হয়ত ভেবেছ, খোকার নাম শুনলে, সে মুখ লুকোবে। তার চিহ্নও নেই।

কিন্তু শক্তি সমর্থে আমরা কত না বেড়ে উঠেছি। ওসবের ভাবনায় একমুহূর্ত্ত ও ব্যয়িত হয়নি, শুধু শান্ত প্রশ্ন— এরপরে করণীয় কি? এবং তা করবার জন্য লেগে যাওয়া। এখন থেকে জুলাই পর্য্যন্ত আমার প্রতিটি উদ্বৃত্ত মুহূর্ত্ত তার কাজে দিতে চাই।

মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন একই দিনে : কয়েক সপ্তাহ যে তোমাকে লিখতে পারিনি তার জন্য মিষ্টি করে কিছু বলছি। আমি লক্ষ্ণৌ ও বারানসীতে সফরে গিয়েছিলাম, তারই মধ্যে প্রকাশকদের কাছে চিঠিপত্র ও আমার বৈজ্ঞানিক সহায়িকার কাজ— এসবের জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।

২৪শে মার্চ ১৯০৪ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আগামী কাল আমার জন্মদিন— মনে আছে তো? আজ লেখার সময় খুবই অল্প— কারণ এ সপ্তাহে বিজ্ঞানের দাবি ছিল প্রচণ্ড এবং সে চাপ বজায় থাকার সম্ভাবনা আছে।

২৭শে মার্চ ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন: ভারতে বর্তমানে, 'জাতীয়ভাব' উদ্ভিন্নমান, তাদের মূলগত কিছু বস্তুকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি 'ওয়েব' বইটিতে।

বইটিতে বর্তমান যুগ, ভারতবর্ষের উপর জাতীয়-চিন্তা-মাত্রা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা, আরোপ আছে। ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও পুরোহিততান্ত্রিক ভিত্তি সমূহের বিকাশশীল সংগঠনের পথে, কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় তার চেষ্টাই হবে চিত্তাকর্ষক।

...অপর চিন্তাশীল লেখকরা এ বিষয়ে লেখার সময়ে, অবাস্তবের কথাই ঘোষণা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যার পক্ষে নব সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করাই হবে উপযুক্ত কাজ।

১লা এপ্রিল ১৯০৪ ক্লাসিক থিয়েটারে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে পুণরায় বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীমা কলকাতায় এসে বাগবাজারে অবস্থান করছেন। বহুদিন পর, তাঁর দর্শনলাভে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। অসংখ কাজ, তারই মধ্যে সময় করে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পাশে বসে শান্তিলাভে নিজেকে স্নিগ্ধ করে নিতেন। জীবনের স্মৃতিপটে, যে দিনগুলি 'বিশিষ্ট' বলে চিহ্নিত, সেই বিশেষ দিনগুলিতে তিনি মার কাছে ছুটে যেতেন। বালিকার মত শান্ত হয়ে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। ১৮৯৯ সালে স্বামিজীর সভাপতিত্বে 'স্টার থিয়েটারে' প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১১ই মার্চ। এই বিশেষ দিনটিতেও মার পাশে বসে শান্তি ও শক্তি সংগ্রহ করে ছিলেন।

১৭ই মার্চ শ্রীমার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ লাভ। বেলুড়ে স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনার বার্ষিক দিবস, ২৫শে জুলাই গ্রীষ্মবাসের পর ১৬নং বাড়ীতে পুণরায় বিদ্যালয় আরম্ভ ও শ্রীমার স্কুলে পদার্পণ ও আশীর্বাদ লাভ, এদিনগুলিতে তাঁর শ্রীমার কাছে ছুটে যাওয়া চাইই-চাই।

মিঃ গোখলে নিবেদিতা ও কৃষ্টীনের কাছে কাজের পরামর্শ করার জন্য প্রায়ই আসা যাওয়া করছেন। কৃষ্টীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত। নিবেদিতা এসময়ে মিঃ গোখলেকে বিবেকানন্দ প্রবর্তিত পথে গোষ্ঠীভুক্ত করে এনেছেন। তবুও তিনি নিবেদিতা বা কৃষ্টীনের আগাম অনুমতি প্রার্থনা করে যাতায়াত করেন। কাউন্সিলের অধিবেশনের জন্য ব্যস্ত। কলকাতা ছেড়ে যাবেন। তারই মধ্যে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন।

১৯০৪, ৯ই এপ্রিল লিখলেন : তুমি মনে করো— এখন, একের প্রতি অন্যের একমাত্র উপযুক্ত প্রশ্ন হল— 'প্রহরী'! রাত্রি আর কত? ...আর আমার মনে হয়, সূর্য্য উদয়ের অনিবার্যতায়, সদা জাগ্রত বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের শক্তি। আমাদের মতভেদ যদি থাকে, সে সামান্যই। এই মুহূর্তে তা অবশ্যই ভুলে যেতে পারি। এদেশীয় মানুষ, বিদায় দেবার সময়ে যা বলে, বিদায় দেয় তাই তোমার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করছি দুর্গা-দুর্গা! এই সহজ প্রার্থনা জানিয়ে বর্তমানের কঠিন অর্জনের ভিত্তিতে তুমি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর দর্শন লাভ করতে পারো— সেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি।

এই শীতঋতুতে তুমি যে রকম শক্তিশালী ও ঘাঁটি যোদ্ধার ভূমিকা নিয়েছ, তাতে তোমার কলকাতা ছেড়ে যাওয়া খুবই বিপদজনক মনে হচ্ছে, বিশেষতঃ সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির কাছে, যারা কোন মতেই তোমাকে হারাতে প্রস্তুত নয়।

নিবেদিতার কাজ ভারত সরকারকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। বিশেষ করে তার প্রচারের কাজ, ভারতীয়দের সম্বন্ধে। তাঁরা পিছনে কর্ণেলিয়া সোরারজিকে লেলিয়ে দিলেন, ভিতরের খবর সংগ্রহের জন্য। ইনি ভারত সরকারের গুপ্তচর বিভাগে কাজ করেন। এঁর সঙ্গে পরিচয় আছে মিস ম্যাকলাউডের। মিঃ গোখলের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কৌশলে তিনি মিঃ গোখলেকে ধরে, তাঁর সঙ্গে নিকট পরিচয়ের আশায়, যোগাযোগের ব্যবস্থা করলেন ইস্টারের আগে। তাঁর (নিবেদিতার) সন্দেহ জাগলো, অযাচিত এই আগ্রহে। যদিও তখনও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়নি।

অনুরোধ মত ব্যবস্থা করলেও, সে ব্যবস্থা রুখে দেওয়ার চেষ্টায় মিঃ গোখলেকে পত্র দিলেন: প্রিয় মিঃ গোখলে, মিস সোরাবজিকে একথা জানানো উচিত যে, মঙ্গলবার অর্থাৎ ইস্টারের দিন সন্ধ্যায় আমি বাড়ীতে থাকতে পারছি না, যে সময়ে তুমি ব্যবস্থা করেছিলে। আশাকরি যথাকালে, তুমি এই চিঠি পেয়ে যাবে ও অসুবিধা দূর করবে। কৃষ্টীন অবশ্য মিস সোরাবজিকে সানন্দে অভ্যর্থনা করবে। আশা করি, তুমি মিস সোরাবজিকে আমার দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা জানিয়ে দিতে সমর্থ হবে।

১৪ই এপ্রিল মিসেস ওলিকুলকে লিখলেন : আমাদের প্রিয় খোকা এত কঠোর পরিশ্রম করছে।

এ সাক্ষাৎ এড়ালেও শেষ পর্য্যন্ত সফল হলেন না। ১৯শে এপ্রিল মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন: মিস সোরাবজি এখন কলকাতায়। সর্বপ্রকার উপায়ে আমার দ্বারা আমন্ত্রিত হবার চেষ্টা করে চলেছেন। শেষ পর্য্যন্ত, তা সরাসরি লিখে জানিয়েছেন সেকথা। ফলে, পরের শনিবার, চা পানের আসরে তাঁকে ডাকতে হয়েছে। বিরক্তির শেষ নেই।

ইস্টারের সপ্তাহে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তুমি জানো না যে, সরকার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তিব্বতে অভিযান, নূতন শিক্ষানীতি, বঙ্গভঙ্গ, অফিস বিল, প্রাচীন প্রদর্শনের সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রতি ব্যাপারেই সরকারে বিধিব্যবস্থার উৎপাত।

সরকার স্বেচ্ছাচারী— তাদের লক্ষ্য : স্বাধীনতা-চেতনার দমন।

৪ঠা মে ১৯০৪, মিস ম্যাকলাডউকে লিখলেন :

এখন বৎসরের সেই সময়টি চলেছে, যেসময়ে একদিন বেলুড়ের কুটীরে সুখময় দিনগুলি কেটেছে। রাঙা আগুনের মত ফুলে ভরা গাছ, গাদা লিচুও খাচ্ছি প্রতিদিন। মনে পড়ে তোমার, কলকাতার দোকানে, কেনাকাটা করে দিন কাটানো, নৌকায় এসে সমস্ত ফলগুলি খেয়ে ফেলা, আর সারাকে বলা যে, সেই ভোজনের গন্ধটুকুই তারজন্য বাকি আছে এখন। আজ অনেকটা ঠান্ডা, ঝড় ঘনিয়ে আছে বলে, সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে : বারান্দায় এখান থেকে ওখানে পাইচারি করছেন স্বামিজী, আর বলছেন ঈশ্বর প্রেমের কথা।

আ.. হা..। তিনি কি না আমাদের দিয়েছেন, তা যদি আমাদের মধ্যে কেউ অন্যদের দিতে পারতো।

আমার দীক্ষার দিনে বড়নীল একটি নৌকা আকারের ফুলের কথা তোমার মনে পড়ে— যা আমরা অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলুম? ফুলটির নাম অপরাজিতা (যে পরাজিত হয়নি), ফুলটি আলো সম্বন্ধে স্পর্শকাতর। একথা জেনে কি সুন্দর লাগছে না।

যে সব দিনের বিমশ্র চেতনা কী অপূর্ব্ব আর মনোরম ছিল, তাঁর প্রতি ভালবাসার স্বর্ণসূত্রে বোনা দিনগুলি! অথচ সে চিন্তা কখন কখন আমার শীতল, নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তো ক্লান্তিতে— হারিয়ে ফেলতো নিজেকে। আজ ভাবি "সে ভাব"গুলিকে কাজে পরিণত করার মানুষ কত অল্প। কতস্বল্প জানো না। দিন দিন ক্রমেই শিখছি। সে কাজের নিখুঁত যন্ত্র সত্যই বিরল। আরও শিখছি এক ধরনের নৈতিক কূটতা, যা আত্মভিমান, আন্তরিকতাহীনতা, অগভীর ও আবেগ শূন্যতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, আর যার ও বস্তু আছে, সেই বালক বা লোকটিকে আহ্বান করে লাভ নেই, কারণ যে কিছুই করবে না। এক এক সময় মনে হয়, আমার যেন একথা বলার অধিকার এসে গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতই — সদগুরু যথেষ্ট পাওয়া যায়, উত্তম শিষ্য পাওয়াই দুষ্কর।

মিসেস সেভিয়ারের অনুরোধে মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি নিবেদিতা, কৃষ্টীন, জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু ও লাবন্যপ্রভা বসু সহ মায়াবতী যাত্রা করলেন।

১৭ই মে জগদীশচন্দ্র ইংরাজীতে 'উদ্ভিদের সাড়া' লেখা আরম্ভ হল। মিসেস সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দের আতিথ্যে দিন গুলি কাটতে লাগলো। এর মধ্যে একদিন সকলে ধরমগড় বেড়িয়ে এলেন। খবর এলো —'দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ, এর ছাপার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ২৩ শে জুন তাঁরা ফিরে এলেন কলকাতায়। ৩০ শে জুন মিস ম্যাফলাউডকে লিখলেন : তুমি জানো যে, আমার বই বেরিয়েছে। আমার বিশ্বাস , তুমি অনুভব করবে, বইটি বাস্তবিক পক্ষে স্বামিজীর লেখা এবং এটিই তাঁর শেষ লেখা হবে না।... তুমি শুধু বলো যে, এটিকে তাঁর আশীর্ব্বাদ বলেই চিনতে পেরেছ। বলো যে, এটি তাঁকে খুশী করেছে, তিনি একে আশীর্ব্বাদ করেছেন, নচেৎ জিনিষগুলো যে অসাধারণ গতিতে ঘটে গেল, তার কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়? সত্যই তিনি আশীর্ব্বাদ করেছেন।

৪ঠা জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, সেই রাত্রি! স্বামিজীর মহাপ্রস্থানের মহারাত্রি। ঈশ্বরের সকল সন্তানের পক্ষে বিশেষ স্মরণের এক রাত্রি।

১৯০২ সালের ইন্ডিয়ান ইয়ুনিভারসিটিজ কমিশন প্রদত্ত রিপোর্টের পরিবর্তন করে ১৯০৪ সালে ইন্ডিয়ান ইয়ুনিভারসিটিজ অ্যাক্ট পাশ করালেন কার্জ্জন। ফলে, বেসরকারী কলেজগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লো। বসলো স্যান্ডলার কমিশন। তাঁরা মন্তব্য করলেন : নূতন আইনে ভারতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়গুলি পৃথীবীর মধ্যে চুড়ান্ত প্রকারে আগা পাশতালা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

নিবেদিতার মনে আগুন ধরে গেল।

অন্য একটি চিঠিতে লিখলেন : তোমাকে বলে, বোঝাতে পারবো না, জনগনকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার চাপ, ক্রমে কত বেড়ে উঠেছে! কিন্তু যদি চাকায় কাঁধ লাগাতে পারি, তাহলে আমার এই বড় রকমের আশা, চিন্তার স্বাধীনতার উপরে, সরকারের প্রতিটি আঘাত, জ্ঞানকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবে গভীর থেকে গভীরে, তাকে দৃঢ়তর, সত্যতর করে তুলবে। এমন মনে করার কারণ, জনগণ ন্যূনতম জিনিষটি পেয়ে গেছে। তার থেকে দেখা যাবে, তাদের আর বঞ্চিত করা যাবে না। যদি আমার বিচার ঠিক হয়, তাহলে দেখা যাবে লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষে, সর্ব্বাধিক বৃটীশ বিরোধী শক্তিরূপে উল্লিখিত হবেন। আমার কানে বাজছে স্বামিজীর বার্ত্তা। তিনি বলেছেন : সাহসী হও মার্গট। প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ কর। শুধু যদি তোমার সাহস থাকে, আমি তাহলে তোমায় পথ দেখিয়ে দেবোই।

৭ই জুলাই 'সানডেশন' পত্রিকায় বইটির প্রশাংসা বার হল। তাঁর শুভধ্যায়ী, তাঁকে সে কাপি পাঠিয়ে দিলেন। ২৬ শে জুলাই প্রকাশক মিসেস বুল্‌কে লিখে পাঠালেন : রাডিয়ার্ড কিপলিং ও এক, এ, ষ্টীল বইটির অনুরাগে উত্তপ্ত।

তিনি ঘোষণা করলেন : হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস এখানে, ধর্ম্মধারনায় তারা পৃথক, কিন্তু তারা শত্রুভাবাপন্ন — এ কথা বিশ্বাস করি না। উভয় সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন আছে এবং তারা পরস্পরের পরিপূরক।

তিনি কিন্তু সচেতন ছিলেন। প্রশাংসা অপেক্ষা, তাঁকে আক্রমনই হবে বেশী। মিসেস বুলকে তাঁর চিঠির উত্তরে লিখলেন একই দিনে : মিশনারীরা বইটির মোকাবিলা করতে চাইবে। তাঁরা চিরতরে বইটিকে এড়িয়ে যেতে পারবে,— এমন মনে করি না। রাজনীতিজ্ঞরা ও সমাজ সংস্কারকগণ ঝাঁপেয়ে পড়বে আমার উপরে।

সে সম্ভবনা পূর্ণ হলো। ·গাড়ী গাড়ী নিন্দা স্তূপকৃত হল। মিশনারীদের রাগ ও আক্রোশ, সংস্কার- পন্থীদের ক্ষুদ্ধ বিরক্তি, নানা রচনায় প্রকাশিত হতে লাগলো। মিশনারীপক্ষে মিস কারমাইকেল একটা বই লিখে ফেললেন 'থিংস এজ দে আর'।

বোম্বাইয়ের এক মুসলমান ভদ্রলোক, তাঁর 'ওয়েব' বইটি পড়েই কলকাতায় এসে, তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : গত রবিবার বোম্বাই থেকে আগত এক মুসলমান ভদ্রলোক বলে গেলেন, এ বইটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি, নিজ জননীর জন্য ভারতীয়দের অনুভূতির স্বরূপ কি এবং স্বামীর জন্য ভারতীয় নারীর অনুভূতি কি প্রকার।

১৪ই জুলাই ১৯০৪ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : আগামী কাল, তুমি আমাদের টেলিগ্রাম পাবে Victory, Royal Accepts অর্থাৎ জয় হয়েছে। রয়াল সোসাইটি বসুর পেপার প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস বসু নিজেই তোমাকে লিখবে। ট্রানজাকশানস এর জন্য গৃহীত হওয়ার অর্থ, ইংলন্ডের বিজ্ঞানের রেকর্ডের অন্তভুক্ত হওয়া। পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হওয়া। এ পর্য্যন্ত যা হয়েছে এটি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা।

২১শে জুলাই মিসেস ওলি বুলকে লিখলেন : আমরা 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশান' নিয়ে কী গর্ব্বিত! এখন যদি বোটানি বইটি লিখে ফেলতে পারা যায় তারপর আমরা আবার ফিজিক্স-এ ফিরে যেতে পারবো।

২৪ জুলাই মিসেস ওলিবুলকে লিখছেন : Philosophical Transaction এ খোকার পেপার প্রকাশের তাৎপর্য, বুঝতে পারো কি? এর অর্থ ১৯০১ এর ফেব্রুয়ারী-মার্চে সে বোটানিতে ডুব দেয় এবং ১৯০৪ এ এমন কিছু লিখলো, যাকে ইংরেজরা ঐ বিষয়ে 'বেদগ্রন্থে' প্রকাশ করতে পেরে, গর্ব্ব অনুভব করতে পারলো। ১৯০৪ শেষ হবার আগে, একটি বই প্রস্তুত করার যথেষ্ট

আশা রাখি, যা উদ্ভিদ-জগৎ পরিক্রম করে, ব্যাপারটার ইতি করে দেবে। সাড়ে তিন বছরের কাজ, একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানকে, তাঁর মূলীভূত ঐক্যের সমন্বিতরূপে অঙ্গীভূত করে ফেললো। ভাবো একবার! সব রেকর্ড গুড়ো! পরের মেলে, রয়াল সোসাইটিতে খবর পাঠাবার আশা রাখি। বর্ত্তমানে, দমবন্ধ করে আমাদের কাজ চলছে, গ্রহণ, বর্জ্জন, সংযোজন প্রভৃতি। আমার ক্ষুদি ক্ষুদি লেখার চেহারা দেখলে তুমি হাসবে।

ভারতের 'ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি' বা উচ্চতর বিজ্ঞানের জন্য একটি ভারতীয় বৃত্তির প্রবর্ত্তন করে, তোমার পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কি? খুব খরচ হবে কি? আমেরিকা, হয়ত একদিন, খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করবার কারণ খুঁজে পাবে।

'ওয়ের বইটি প্রকাশমাত্রই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। ভারতবর্ষ ও দেশ বিদেশে সমালোচিত হল বইটি। মিশনারী ও সংস্কার পন্থীদের কল্যানে, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায়, দেশে, বিদেশে— যে ধারণা ছিল ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে, প্রচন্ডশক্তিতে তা উদ্ঘাটিত হল : ভারত-আত্মা ও ভারতবাসীর স্বরূপ। সমালোচকেরা ভূয়সী প্রশাংসা করলেন। নিবেদিতও খুশী হলেন।

২৬শে জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে স্বামিজী কিভাবে 'বাণী' বীজ বপন করেছিলেন, তার উল্লেখে লিখলেন : যদি তুমি বইটির গভীরে প্রবেশ করে স্বামিজীকে দর্শন করতে পারো, তাহলে আমি বিপুল আনন্দবোধ করবো। অন্যের জন্য যখন কাজ করেছি, তখন কেবল হস্তরূপে বা যন্ত্ররূপে সে কাজ করেছি। কিন্তু কেবল তিনিই আমার হৃদয়, মন, সমগ্র অস্তিত্বকে দাবী করে ছিলেন— আর সেই সব বস্তুকে রেখে গেছেন, তাঁরই কাজে ব্যবহারের জন্য। সব রকমের কাজই, বৃহৎ ও উত্তম, কিন্তু স্বামিজীর কাজ সর্ব্বাত্মক— কারণ সে কাজ, পূর্ণ বিশ্বস্ততা সূচিত করে। অথচ কত সামান্য সময় তিনি আমার শিক্ষাদানে ব্যয় করেছিলেন। বেলুড়ের চত্বরে তাঁর উক্তি মনে পড়ে? তাঁর সেই উক্তি : 'এই ভ্রমণে— তুমি এক আছো, তোমাকে বিশ করে দেবো'। এখন বুঝতে পারছি, তিনি কেন একজনকে পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, যার মধ্যে তিনি নিজের সমস্ত মন ও চিন্তা ঢেলে দিতে পারবেন! তার এককণাও প্রত্যাখ্যান করার মত কাঠিন্য যেন আমার মধ্যে কদাপি না আসে। বিজলিতে শেষ হয়েছিল শিক্ষাদান,— তারপর আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পৃথিবীর ক্ষেত্রে। সব জড়িয়ে প্রায় দু'বছর তার বেশী নয়। অথচ এখন আমি তাঁর বিষয়ে কিংবা তাঁর চিন্তার বিষয়ে কোন ধারণা করব, সে সম্বন্ধে অন্য কেউ প্রশ্ন করবে, তা পর্য্যন্ত সহ্য করতে প্রস্তুত নই। সেখানে চাই আমার স্বাধীনতা, যেমন পাখীর চাই খোলা বাতাস। তখনই আমি পুরো পাখা মেলতে পারবো। তখন কেউ সমালোচনা করতে, নির্দ্দেশ দিতে বা কুৎসা করতে অন্ততঃ আমার শ্রুতিগোচরে থাকবে না, আমি জানি, তুমিও জানো প্রিয় মাতা য়ুম— সকলই স্বামিজী। সকলই তখন স্বামিজী—তার বাইরে আমার কিছু নেই।

ধরা যাক, ঐ সময়ে তিনি লণ্ডনে আসেন নি। জীবন তখন মুক্তহীন কবন্ধ হয়ে যেত— কারণ আমি সর্ব্বদাই জানতাম যে, কোন একটা কিছুর জন্য আমি প্রতীক্ষারত। আমি সর্ব্বদা বলেছি, আহ্বান আসবেই, আহ্বান এসেওছিল। এখন বইটির দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি, যদি তিনি না আসতেন! কারণ আমার মধ্যে সর্ব্বদাই এই শান্ত কণ্ঠ ছিল কিন্তু বাণী শূন্য। আর এখন তার কোন শেষ নেই। আমি যেমন সুনিশ্চিত ভাবে পৃথিবীর যোগ্য, তেমনি সেই পৃথিবীর প্রয়োজন আছে আমাকে! যেন প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি! ধনুতে তীর তার নিজের স্থান খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু যদি তিনি না আসতেন— যদি তিনি হিমালয়ের শিখরে বসে ধ্যান করতেন, প্রাজ্ঞ, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তাঁকে যেরূপ চেয়েছেন, তা হলে কখনো, এখানে আসতাম না।

... আমার কাছে যারা ট্রেনিং এ পড়ে, এই বিদ্যালয়েই পাঠ দেবার অভ্যাস করে। অন্তঃপুরিকাগণ ইউরোপীয় মহিলার ঘরে শিক্ষা লাভ করছেন ব্যাপারটা অশ্রুত। অথচ একদিনের জন্যও এপর্যন্ত কোন অসুবিধা দেখা যায় নি।

উচ্চতর রাজনৈতিক বিনিময় ছিল মিঃ গোখলের সঙ্গে, তাঁকে লিখলেন : ...লিবারেল সরকার ক্ষমতায় আসীন হলে কাকে, তুমি ভাইসরয় এবং ভারত সচিব (সেক্রেটারী অব স্টেট) হিসাবে চাইবে? লর্ড রীনা, স্যার এ্যান্টিনি ম্যাকডোনেলকে? নাকি উল্টোটি? স্যার ম্যাকডোনল না হতে পারলে তাঁর স্থানে অন্য কাউকে চাইবে? দু'চার মিনিট অবসর নিয়ে যদি তোমার মনোনয়নের বিষয়টি, কারণ সহ লিখে পাঠাও, কৃতজ্ঞ হবো। নূতন মন্ত্রিসভার বিষয়ে অগ্রিম কোন ধারণা আমার নেই, কিন্তু আমাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে এবং আমি তোমার মতামত পেলে বাধিত হবো।

এক ভারতীয় সম্পাদক ২৮শে জুলাই 'বইটি সম্বন্ধে লিখলেন : বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য গমনের তুল্যই বিরাট ব্যাপার।

এর পরেও তাঁর মনে হল এ পর্যন্ত কোন সমালোচক বইটিকে বুঝতে পারেন নি। মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বইটির 'প্রাণপাখী' কোথায়, আলোচকগণ বুঝতে পারেন নি।... বইটি প্রাচ্যের আচার ব্যবহারের নিছক উচ্ছ্বাসপূর্ণ 'গাথা' নয়। এতে আচার ব্যবহারকে, আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে সমন্বিত করে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মকে বর্ণনা করা হয়েছে ঐক্যঘোষক-রূপে। আসল বক্তব্য : বিরাট একটি জাতি নির্মাণের পদ্ধতি প্রদর্শন এবং জাতিসৃষ্টিকারী জাতীয়-চেতনার সৃষ্টি। নিবন্ধ ম্যাসেজ : নিজেদের আঙ্গিক সমবায়ে বিশ্বাসী হও। এমন জীবনের ধারণা কর, যেখানে সমস্বার্থে, সমপ্রয়োজনে এবং পারস্পরিক সহায়তায়, কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সকলে।

৪ঠা আগষ্ট ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউজকে জানালেন হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন :

How long o Lord—how long? Oh if, Mother would give me strength like Thunderbolt and words with unspoken mence in them and weight of utterance!

৮ই আগষ্ট ১৯০৪, বিবেকানন্দ বোডিং হাউসের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে পুণঃরায় স্বামী সদানন্দ দুর্গম পর্ব্বত ভ্রমণে বেরুলেন।

১১ই আগষ্ট ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন: বিবাহিত মেয়েরাও আমার ঘরে আসছেন এ ঘটনা এদেশের ইতিহাসে প্রথম। বর্ত্তমানে, কৃষ্টীনের ছাত্রী সংখ্যা কুড়ি থেকে ষাট। তার ছুটি রবিবার, আমার শনি ও রবিবার। প্রতি সোম ও বুধবার, দুপুরে যখন বড় সেলাইয়ের ক্লাশ আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সকলকেই খুব পরিশ্রম করতে হয়।...

আমার বইয়ের আসল বিষয় বস্তু হিন্দু ও মুসলমানের মুলগত ঐক্য এবং তাদের বিরাট ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যৎ।

১১ই আগস্ট ১৯০৪ মিসেস মে উইলসনকে (বোনকে) লিখলেন : ডাঃ বসু তোমার চিঠি শোনেন গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে। 'ওয়েব' বইটির বিষয়ে তিনি প্রতিটি শব্দ শুনতে চান— সেই সঙ্গে তোমার দুই মেয়ে— মার্গট ও সিসিলির সম্বন্ধেও। বলেন : যখন সুযোগ ছিল, তখন ছোট্ট মার্গটের উপরে তাঁর সমস্ত স্নেহ ঢেলে না দেওয়া তাঁর পক্ষে খুবই ভুল হয়েছে।

স্বামিজী ছিলেন মুক্ত পুরুষ। তাঁর দৃষ্টিও ছিল স্বচ্ছ। বুঝেছিলেন : পৃথিবীর সকল মানুষই একটা জাতি। তারা গোষ্ঠীবদ্ধ বলেই, পৃথক স্বত্তার দাবী রাখে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই, জাতি

কেন্দ্রিক করে, অথচ তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার অনুভূতি এক, চেতনাও অভিন্ন, পৃথক শুধু ধর্ম্ম-ধারণায়। এদের গোষ্ঠী বদ্ধতাই, মনুষ্যত্ব বিকাশের চরম অন্তরায়। আর 'সংস্কারের' জন্ম এখানেই। এই যে গন্ডী, এটা রান্নাঘরের ভাতের হাঁড়ির মত। তাঁর ব্রত : এই সংস্কার মুক্ত করার। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন : মানুষ যতক্ষণ না এই গন্ডীর বেড়াজাল ছিন্ন করতে সক্ষম হয়, দেশ-ভেদ, জাতিভেদ, দূর করা সম্ভব নয়। ততক্ষণ তারা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে না, প্রতিটি মানুষের আশা, আকাঙ্খা, সুখ, দুঃখ ও বেদনার রূপ এক, স্নেহ, দয়া, মায়ার রূপও এক, তারা একই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। মনের এই সংস্কার দূর কবার জন্যই, ভাঙড়ের হাত থেকে হুকা চেয়ে, সেই হুকায়, তামাক খেয়েছিলেন। কাশ্মীরের মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাকে উমারূপে পূজা করেছিলেন। পাঞ্জাবের মূসলমান-মিষ্টি দোকানীর কাছ থেকে, ওদের প্রিয় মিষ্টি খেয়েছিলেন। কাশ্মীরের এক মুসলমান মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা তোমার ধর্ম্ম কি? উত্তর এসেছিল : ঈশ্বরের কৃপায় আমি মুসলমান। উত্তর শুনে, তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন ধর্ম্মের প্রতি এমন নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু মা! এর উপরেও তুমি যে মা! সেটাই তো তোমার পরম-ধর্ম্ম, এর জাত নেই, কুল নেই। তুমি সেই মা, যিনি জগদেশ্বরী। তিনি কথায় কথায় নিজগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবনের উদাহরণ দিতেন শিষ্যদের কাছে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতেন : আমার গুরু, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে-শিক্ষাও অন্তরে গ্রহণ করেছেন নিবেদিতা। তাঁর ওয়েব 'গ্রন্থে, দি সিনথিসিস অব ইণ্ডিয়ান থট' ও 'ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া' তে মুসলমান সংস্কৃতির পরিচয় দিলেন। করলেন, জাতীয়-তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ১৮৯৯ সালের মে মাসে 'এমপ্রেস' পত্রিকায় 'মহরম' সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা পুণঃমুদ্রিত হলে, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : এই সপ্তাহে 'এমপ্রেস' পত্রিকায় 'মহরম' মোড়কে, ইসলাম সম্বন্ধে সমজদার প্রবন্ধ লিখবো। সেজন্য প্রিন্স জাহান্দার [illegible] ও দু'তিন জনের সঙ্গে চায়ের আসরে মিলিত হতে যাচ্ছি!...

বেরুলো অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির'। তিনি (অরবিন্দ) লিখলেন : What was the massage that radiate from the personality of Bhawan Ram Krishna Paramahansha? What was it that formed the kernol of eloquence with which the lion like heart of Vivekananda sought to shake the world? It is this, that in everyone of these three hundred million of men from Raja on his throne, to the coolie at his labour, from Brahmin... to the Pariaha....God Loveth. We are all Gods and Creators, because the energy of God is within us and all life is creation.

তিনি আরও বলেছেন :

It was to intimate this great work of hormonising all religion. Science, and philosophis and make mankind one soul. the greatest and most wonderful work ever given to a race, that Bhagavan Ramkrishna came and Vivekananda preached. It was Kali, who is Bhawani, Mother of strenghth whom Ramkrishna worshipped and with whom he become one.

বইটিতে নিবেদিতার Kali the Mother-র সুর বহন করছে। পুলিশের চোখে তা বিপদজনক সাহিত্য বলে প্রতিভাত হল। বইটিকে বাজেয়াপ্ত করা হল।

নিবেদিতার 'ওয়েব' বইটির বিরুদ্ধ সমালোচনায় মিশনারীর রোধ ও আক্রোশ প্রকাশ পেলে, মিস কারমাইকেল রচিত "Things As they Are"এ।

লেডি হেনরি সমারসেট ৩১ শে আগষ্ট ১৯০৪, বললেনঃ 'ওয়েব' বইটি যুগ সৃষ্টিকারী। কংগ্রেসর অধিবেশনে (১৯০৪) বাংলা প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হল। লালা লাজপত রায় 'ওয়েব' বইটির সমালোচনা করলেন :

Nivedita refers to the geographical synthesis. This is a Theme of abosorbing interest to all Indians intrested in the future of this country, because it is absolutly necessary to realise that the whole of india is necessary to the explanation of the history of each one of the pasts. It is at once the occasion and the explanation of the web of Indian thought.

যদি কোন দেশ ভোগলিক ভাবে নির্দিষ্ট আকার সম্পন্ন হয়, তাহলে জাতীয়তার লালন ভূমি হবার ক্ষমতা তার থাকবে। জাতীয়-ঐক্য স্থানের উপরে নির্ভরশীল। মানব সমাজে কোন জাতির স্থান তার দেহাংশগুলির জটিল বলত্ব এবং সম্ভবনা শক্তির দ্বার নির্দ্ধারিত হয়। তার কোন একটি অংশ অতীতে যাকে অৰ্জ্জন করেছে, জাতি সে বস্তুকে ভবিষ্যতে সামগ্রিক ভাবে অর্জনের প্রত্যাশা করতে পারে। উপাদান সমূহের মিশ্র জটিলতাকে 'স্থান' এর জাতীয়করণ অন্তবর্ত্তী করতে বাছলে, তা জাতির পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে শক্তির উৎস, দুর্ব্বলতার হেতু নয়।... 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিটি' এ মেড়ে অব থট' প্রবন্ধে দেখালেন : জাতীয়তার ক্ষেত্রে স্থানের ভূমিকা... 'ইউনিটি অব লাইফ অ্যাণ্ড টাইপ ইন ইণ্ডিয়া" প্রবন্ধে আলোচনা করলেন : কোন ভিত্তিতে, মিলিত হবে হিন্দু মুসলমান,... লিখে চললেন, সিভিক এনিমেস্টাস ইন-ইণ্ডিয়ান লাইফ— ইসলামের ব্যবহারিক সংস্কৃতির পরিচয়, 'প্রজেন্ট পজিশান অব উইমেন এণ্ড দি ফ্যামিলি ইন' ইসলাম-এর কথা। 'দি ইমাম ইপক অ্যান্ড দি ন্যাশান্যাল আইডিয়া'— বৌদ্ধদের পরে মুসলমানেরা কি ভাবে জাতীয়তা দান করেছে তার আলোচনা। সবই স্বামীজীর শিক্ষার সূত্র। লিখে চললেন প্রবন্ধে একের পর এক।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমার অযোগ্য মস্তকটির যে রেখাচিত্র মিস স্টাম করেছেন তার ফটোগ্রাফ ও মুর্দ্রন কী মনোরম হয়েছে। বিজ্ঞানের মানুষ বসু। শাসিয়ে রেখেছেন, এইটি ছাড়া অন্য কোন কিছুকে আমার পোরট্রেট বললে, শেষ করে ফেললেন! আর এটিকে সত্যই ভালবাসি, কারণ এর রচনায় স্বামীজীর সাহায্য ছিল। কী মধুর দিনই না ছিল তখন।

বিজ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ। গত এক বছর ধরে আমরা যা লিখেছি, তা একেবারে বোমা! প্রায় মাসে মাসে এক একটি পেপার। শেষের দিকে গতি একটু কমাতে হয়। কারণ আমাদের শারীরিক সামর্থ্য একেবারে নিঃশোষিত হবার মুখে। যাই হোক, ভরসা করি, এ অবস্থা স্থায়ী হবে না, অবকাশ যাপনের পরে, আমরা আবার নবোদ্যমে কাজ আরম্ভ করতে পারবো — একটা বিরাট বইয়ের কাজ — যা দুবছরের মত সময় নিতে পারে। কাজটি চলতি ধারণার থেকে অগ্রগামী এবং এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে যে, অবিলম্বে এর প্রকাশন সম্ভব হবে না। গত অক্টোবরের কাজ, ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক সমাজে কয়েক মাস আগে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা আরও ডজন খানেক কাজ করে ফেলেছি য়া বিবেচিত হবার সুয়োগ পর্যন্ত পায়নি।

ভেবে আনন্দ হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের দান, তার মূল রূপে যেমন, তেমন লেখায়, প্রকাশের ক্ষেত্রেও সামান্যতর ত্রুটি যুক্ত থাকবে না। এই দিক থেকে আমরা আশা করতে পারি, সর্ব্বকালে এটি ক্লাসিক হয়ে থাকবে।

পূজার ছুটি হ'ল। ৮ই অক্টোবর পুনরায় বুদ্ধগয়া যাত্রা করলেন। এবারের সহযাত্রী কৃষ্টীন, জগদীশচন্দ্র, অবনী বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিক, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী শঙ্করানন্দ। পাটনা থেকে সহযাত্রী হলেন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও মথুরানাথ সিংহ। সকলেই মেহন্তের অতিথি হলেন। প্রতিদিন ওয়ারেনের 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' বা এডউ আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' বইটি পড়া শুরু হতো। পরে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে গান ও আবৃত্তি করতেন। দিনের বেলায় মন্দিরের চত্বরে পাচারি বা পাশের গ্রামগুলিতে বেড়াতে যেতেন সকলে। সূর্য্য অস্ত গেলে, গোধুলির আধো আধো আলোতে নিস্তবধ হয়ে বোধিবৃক্ষতলায় বসে স্থানটির মাহাত্ম্য উপভোগের চেষ্টা করতেন। দারিদ্র এক জাপানী ছেলে 'ফ্যুজি' দীর্ঘ কৃচ্ছ্র জীবন যাপনে, অর্থ সঞ্চয় করে তার জীবনের স্বপ্ন পূরণের আশায় এই মহাতীর্থে বসবাস করছিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বোধিবৃক্ষাতলায় বসে গুণ গুণ করে স্তোত্র আবৃত্তি করতো :

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গোতম চন্দ্রিকায়।
নমো নমো অনন্ত গুণ নরায়, নমো নমো শাক্য নন্দনায়।

তার জাপানী কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্রটি, মৃদু ঘন্টা ধ্বনিরমত শোনাতো। অভিভূত হয়ে সে স্তব্ধ পরিবেশে, আত্মমগ্ন হয়ে পড়তেন সকলে।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো নিবিড় অন্ধকার। শুরু হলো বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাসের আলোচনা। বিতর্কের প্রশ্ন তুলতেন নিবেদিতা, সমাধানের চেষ্টা চালাতেন রবীন্দ্রনাথ। মুগ্ধ হয়ে শুনতেন সকলে। দু'তিনদিনের তীর্থবাস, কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শ, এর মধ্যে নিবেদিতা প্রস্তাব করলেন, চলুন সকলে সুজাতার বাড়ি দেখে আসি।

পরদিন চললেন সকলে। বসতির কোন চিহ্ন নেই, চারদিকে ঢাকা শুধু ঘাসে। পবিত্র সে স্থান, সুন্দর লাগানো সকলের। সুজাতা ছিলেন আদর্শ গৃহিনী। তিনি বুদ্ধদেবকে যথা সময়ে আহার্য্য দান করেছিলেন। স্থানটির পূর্ব নাম 'উরুবিল্ব'। নির্ব্বানলাভের পর বুদ্দদেব, সুজাতার হাতের পায়েস খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে ছিলেন। সুজাতার ঘরের কোন চিহ্ন নেই — নিবেদিতা কিন্তু আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। সেখানের মাটি তুলে, বুকে রেখে বললেন : পবিত্র এই স্থানটি!

সবাই ফিরে এলেন মন্দিরে। অন্ধকারে ঢাকা মন্দির, আকাশে নক্ষত্রের মেলা, ঝিক ঝিক করে তাকিয়ে পৃথিবীর দিকে। অতীত স্মৃতিতে তন্ময় সকলে। সহসা অনুপ্রানিত নিবেদিতা বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাখ্যা সুরু করলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে নূতন ধর্ম্ম ছিল না। বুদ্ধ একজন হিন্দু আচার্য্য ছিলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। তাঁর অনুগামীরাও ছিলেন হিন্দু সমাজ ভুক্ত। তাঁরা নিজেদের নতুন সম্প্রদায় বলে মনে করতেন না, তবে জানতেন তাঁরা প্রতিবেশীদের চেয়ে সৎ ও ধর্ম্ম বিশ্বাসী হিন্দু। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা যেমন নিজেদের হিন্দু সমাজের বহির্ভূর্ত মনে করেন না, ঠিক তেমনি । অন্যান্য আচার্য্য বা সন্ন্যাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বুদ্ধদেব। সারা বৌদ্ধযুগে জীবন্ত ছিল হিন্দু ধর্ম্ম। বৌদ্ধ লেখকরা এ বিষয়ে নীরব। আমি যদি আমার গুরুদেবের জীবন কাহিনী ও তাঁর শিক্ষা বর্ণনা করি। সম্ভবতঃই বৈষ্ণধর্ম্মের কোন উল্লেখ থাকবে না। আমার গুরুদেবের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ গুরুদেবকেই আমি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য বলে জানি ও বর্ণনাও করবো ঠিক সেই ভাবে। পরবর্ত্তীকালে কোন ঐতিহাসিক যদি আমার বই থেকে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, রামকৃষ্ণের বহিরঙ্গ ভক্তেরা বৈষ্ণধর্ম্ম থেকে চৈতন্যের অনুবর্ত্তীগনকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ও নিষ্ঠুরভাবে তাদের মেরে ফেলেছিলেন, তাহলে ঐ ঐতিহাসিক কোন ক্রমেই সমর্থন যোগ্য হতে পারেন না। হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধেরা ভারত থেকে বিতাড়িত, এ ইতিহাস আমার কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ইসলামধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ, হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তা কখনও ছিল না।

অভিভূত হয়ে সারারাত্রি তিনি অশ্রুবিসর্জন করলেন। সখেদে বিদায়ের কালে বললেন, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সে ঘোর গভীর নিদ্রা এখনও ভাঙেনি। জীবনের সঞ্চার দেখা যাচ্চে না এখনও। জনসাধারণ আমার কথা শুনতে আসে কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে গিয়ে গতানুগতিক পথে চলে। আমরা কিছুই করতে পারিনি। যে মহাজাগরণ একদিন ভারতকে বিশ্বের গর্ব্ব ও এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল, তার অন্তরাত্মার সেই পুনঃজাগরণ এখনও ঘটেনি। কবে, আবার সেই জাতি তার মহান উত্তরাধিকার ও মানবজাতির চিন্তা ও সভ্যতার সংগঠনে, একদিন যে বিশেষ স্থান অধিকার লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে কবে অবহিত হবে? আবার কবে সেই শক্তি, সেই উৎসাহ ফিরে আসবে?

১২ই অক্টোবর সকালে গয়া স্টেশন থেকে বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন। নিবেদিতা ও কৃষ্টীন পরদিন সেখান থেকে রাজগৃহে (রাজগীর) উপস্থিত হলেন। পূর্ব্বেই স্থির করেছিলেন, রাজগীর ও নালন্দা প্রভৃতির বিখ্যাত বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলি পর্য্যবেক্ষণ করবেন। কয়েকদিন পর জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক রাজগীরে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পূজার অবকাশ এখানেই কাটালেন। একা সেই সময় ধ্বংস স্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বহুদূর পর্য্যন্ত চলে গিয়ে, ইতিহাসের পদধ্বনি কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন। অতীত তাঁর কাছে মৃত নয়— জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ। নগরের যে প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রেম ও করুণার অবতার একটি ছাগ শিশুকে কাঁধে নিয়ে, রাজপ্রসাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা আবিষ্কার করলেন। আবিষ্কার করলেন, অম্বপল্লীর আম্রকানন। প্রতিটি স্তূপ, প্রতিটি ভগ্নাবেশ, যেন অতীতের বেদনা বুকে নিয়ে কাতর মৌন-নিশ্চল। কান পেতে কেউ যদি শুনতে চায় সে পদাধ্বনি, মুখর হয়ে উঠবে অতীত, সেদিনের অসংখ্য ঘটনা। জ্বলন্ত হয়ে ধরা দেবে চোখের পাতায়। রচনা করলেন 'রাজগীর প্রাচীন ব্যাবিলন'। ... সংগ্রহ করলেন, পাথরের টুকরো, মেশানো অতীতের স্মৃতিমালা। তন্ময় তিনি। কানে ভেসে উঠলো স্বামিজীর কাতর কণ্ঠস্বর : জাগো দেশবাসী, জাগো জনগণ— জাগো। দীর্ঘ রাত্রির হোক অবসান, জাগো, তোমরা জাগো! সমুখে উদিত আজি নোতুন প্রভাত। সাজ নোতুন সাজে; টুটে যাক ঘুম ঘোর। দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে তোমার পা। জাগো, ওঠো, স্বপ্ন হোক মুক্তির, সবে মুক্তির গান গাও। রুদ্ধ কর মুষ্টি! দ্বারে কর করাঘাত। শৃঙ্খল হবে ছিন্ন— সম্মুখে তোমার নতুন প্রভাত।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে পেলেন সম্বিৎ। দেখলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ। সম্মুখে পথ রেখা, দূরে কর্ম্মরত কয়েকটি কৃষক। সামনে পড়ে থাকা একটি পাথরের টুকরো। সেটি সংগ্রহ করলেন সযত্নে। পুনরায় কানে ভেসে উঠলো স্বামিজীর কণ্ঠধ্বনী : সাধন ভজানের অবকাশ আর নেই। মাতৃভূমি হোক তোমার ইষ্ট দেবতা। আগামী পঞ্চাশ বছর তোমরা, দেশজননীর সেবা কর। দেশমাতাই হোক, তোমার ইষ্টদেবতা।...

পাশে পড়েছিল আর একটি টুকরো পাথর, অতীতের স্মৃতির পরশে ধুলি-সিক্ত তা। আবার শুনতে পেলেন স্বামিজীর সেইকাতর প্রার্থনা : আমার কণ্ঠস্বর নীরব হতে চলেছে মা, তুমি ওদের নিদ্রাটুটে দাও মা! জাগ্রত কর ওদের চেতনা। ভেঙে দাও এই ঘুম ঘোর।... চোখের পাতায় ভেসে উঠলো: অতীতের সে দৃশ্যপট। স্বামিজী অসুস্থঅবস্থায় শয্যাশায়ী। জনগণকে সাক্ষাত দর্শনের, নির্দ্দেশজারি করেছেন গুরু ভ্রাতৃবৃন্দ। পর পর দুটি যুবক এলা স্বামী সারদানন্দের কাছে। তিনি তাদের পাঠালেন তাঁর কাছে। উভয়কেই পরামর্শ দিলেন : মানুষ গড়ে তোলাই স্বামিজীর স্বপ্ন। তোমরা নাও সেই শিক্ষা। 'সেবা, স্বাস্থ্য, শৌর্য্য ও বীর্য্যের দীক্ষা গ্রহণে ব্রতী হও।'

চকিতে ভেসে উঠলো সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মুখ। তিনি ভার নিলেন: শিক্ষা ও প্রচারের ভার। গড়ে তুললেন 'ডন সোসাইটি'। মুখপত্র হল 'ডন পত্রিকা'। তিনি নিয়মিত সে পত্রিকায়

লিখে চলেছেন মাঝে মধ্যে সোসাইটির ছাত্রদের কাছে বক্তব্য রাখছেন : স্বামিজীর আদর্শ ও বার্ত্তা, প্রচার চালাচ্ছেন: জাতীয়বাদের, 'জাতীয়তা প্রচার' মাধ্যমে। তাদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচার করছেন : অশোক ও আকবরের আদর্শ ও প্রেরণা। ছাত্রদের বোঝাতে চাইছেন : চাকরী। যে চাকরীই হোক, সরকারী বা বেসরকারী, তা কলুষিত করে চরিত্র, দাসত্বের বন্ধনে পিষ্ট হয় মনুষত্ব। ... সোসাইটির নব পর্যায়ে তাঁর নামও সেখানে তালিকাবদ্ধ। ১৪ই আগষ্ট পঞ্চম বর্ষীয় এম, এ ছাত্রদের কাছে প্রচার করলেন : সকল প্রকারের সংগঠন ও আন্দোলনের সমন্বিত সক্রিয়তা ছাড়া, জাতীয়তা সৃষ্টি সম্ভব নয়। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া, জাতীয়তার সৃষ্টি অসম্ভব। অবিরাম কর্ম্মই হল, জাতীয় কর্ম্মীর দায়িত্ব। স্পিরিচয়ালিটির নামে নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ বজায় রাখা আর কাজের সময় গা ঢাকা দেওয়া, ভণ্ডামী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

চতুর্থ বার্ষিক বি, এ ছাত্রদের কাছে বললেন: যেখানে বাসকরো, সেখানে জলমাটিকে ভালবাসতে শেখ। নিজস্বভাবে সৰ্ব্বোর্চ্চ আদর্শকে উপলব্ধি কর। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত মানব জাতিকে, নিজেদের মত অনুভব করতে শেখ। ...নিজের মনে নিজেকে প্রশ্ন করলেন : এগুলি কি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির 'অঙ্গীভূত বস্তু' নয়?

পাশাপাশি ভেসে উঠলো : সতীশচন্দ্র বসুর মুখ। হ্যাঁ তাকেও পরামর্শ দিয়েছেন। সে তা কার্যকরী করেছে, গড়েছে সমিতি। সে-স্বাস্থ্য ও সেবার কাজে এগিয়ে চলেছে। ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হাতে কলমে শেখাচ্ছে জাতীয়তার ভিত্তিভূমি। তৈরী করছে, ছেলেদের বিপ্লবের সৈনিক। তাদের উৎসাহিত করতে বিতরণ করেছেন তাঁর সংরক্ষিত ও সংগ্রহীত বই যা বিদ্রোহ, ও বিপ্লবের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে, অঙ্কুরিত হবে বিপ্লবী চিন্তা মনে ও প্রাণে। সেই সঙ্গে দিয়ে চলেছেন তাদের সংযোগিতা ও পরামর্শ।

স্বামিজী চেয়ে ছিলেন : তাঁর দেশকে পরিচালনা করবে ভারতবাসী। অরবিন্দকে তাই তিনি বেছে নিয়েছেন দেশনেতারূপে। মিঃ গোখলে মধ্যপন্থী হলেও, এখন স্বামিজীর অনুবর্ত্তী ও তাঁরই আদর্শে অনুপ্রানিত। তাঁকে যুক্তি ও পরামর্শ দিয়ে দেশের নানা দাবী পেশ করছেন 'কাউন্সিলে'। মিঃ কেশরী, লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল ও প্রমুখ সকলেই একই পথের পথিকৃত, সহযোগিতা রয়েছে পরস্পরের মধ্যে, জাতীয়তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করতে উদ্যোগী সকলেই। ...জনচেতনা ও জনমত তৈরীর প্রচেষ্টাও চালাচ্ছেন ঘরে ও বাইরে। সেখানে আছেন মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলেউড প্রমুখ অনেকেই, তাঁদের সহযোগীতায় প্রচার ও সংগঠন তৈরী করেছেন, আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনে। সেখানেও জনমত সৃষ্টির আশায় লিবারেল পার্টির নেতাদের সঙ্গে সংযোগিতা ও চাপ সৃষ্টি করছেন খোদ পার্লামেন্টে। একদিন লণ্ডল জার্নালিস্ট নামে পরিচিত ছিলেন, প্রেস মারফৎ সে দেশে ভারতের প্রতি অবিচারের চিত্র তুলে ধরে সেখানকার জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রার্থনা করে উঠলেন : প্রভু, শক্তি দাও তোমার ইচ্ছা পূরণের। নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তাদের পথ দেখিয়ে পরামর্শ দিতে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পরিচালনায় সহায়তা করতে— এখানে, কি কোন ত্রুটি রয়ে গেছে প্রভু?... যাদের নিজগোষ্ঠী ভুক্ত করেছি, তোমারই দূতরূপে পাঠিয়েছি দেশ বিদেশে বিশ্বজনমত সৃষ্টির আশায়। হে, প্রভু, শক্তি দাও, তোমার ইচ্ছা পূরণের। অশ্রু সিক্ত হয়ে ওঠলো চোখের পাতা। মনকে দৃঢ় করে তুললেন। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠ্লেন ... ইচ্ছা তোমার, পূর্ণ করতেই হবে। সেই দাবি পূরণে, দায়বদ্ধ আমাকে থাকতেই হবে!

ফেরার পথে জাতীয়তা জাগরণের আর একটা পন্থা তাঁর স্মরণে এলো। ইউরোপে বর্ত্তমানে যেমন অতীতেও তেমনি, বড় বড় রাজ্যগুলি ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে পদানত করে, তাদের স্বাধীন সত্ত্বার বিলোপ ঘটিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে, নিজেদের পুষ্টিসাধন করেছিল বা করেছে। পরাধীন

সেই সব দেশ, তাদের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জাগরণে, যে পথ অনুসরণে, সেদেশের জাতীয়তার ভীত দৃঢ় করেছে এদেশেও কি তা সম্ভব নয়? এখানকার অধিবাসীগণ, বহু যুগবর্ষ থেকেই 'শোভাযাত্রার' সঙ্গে পরিচিত। বিবাহে বা অন্য জাতীয় উৎসবে, পূজা ও পার্ব্বন উপলক্ষে মিলিত হয়ে শোভাযাত্রার দ্বারা আনন্দ প্রকাশে অভ্যস্ত। অতীত ভারতের স্তিমিত জাতীয় সংস্কৃতির রূপ, ইদানীং যদিও বিকৃত ও সে ইতিহাসও ক্ষয়িষ্ণু, তা সত্ত্বেও তার পুণঃজাগরণ কি সম্ভব নয়? সেই স্তিমিত জাতীয় সংস্কৃতিররূপ ও জাতীয় ইতিহাস, শোভাযাত্রার মাধ্যমে, যদি সমুখে তাদের উপস্থিত করানো যায়— জাতীয় সংহতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হতে পারে না! অবশ্য প্রয়োজন সর্ব্ব ভারতীয় একটি নির্দ্দিষ্ট দিন, যেদিনে শোভা যাত্রার মাধ্যেমে প্রতিটি সহরে, সকল জাতির 'বিভিন্নরূপ ও সজ্জায় সজ্জিত' হয়ে, অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহকরূপে মিলিত সব নরনারীর সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবে, হাতে থাকবে জাতীয় প্রতীক বা জাতীয় পতাকা। যে পথ ধরে এই শোভা যাত্রীরা এগিয়ে যাবে, সামনের দর্শকদের প্রতিটি দৃশ্যের অর্থ, কখন ও কোথায় ঘটেছিল বুঝিয়ে দেবেন সেই শোভাযাত্রার উদ্দ্যোক্তাগণ। শোভাযাত্রীগণ জাতীয় গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যাবেন। ফল দাঁড়াবে, দর্শকদের মর্ম্মে বিদ্ধ হবে জাতির জাতীয় ইতিহাসের ধারা, উপলব্ধ হবে জাতীয় সংস্কৃতির মর্ম্ম কথা। বুঝবে, শিখবে, সারা ভারত তাদের স্বদেশ, এখানে বিভিন্ন জাতির বাস— তারা সবাই এক, সবাই সবার ভাই!

যখন সকলে অবস্থান করছিলেন বুদ্ধ গয়ায়— একটি পাথরে খোদাই'বজ্র' চিহ্নের সন্ধান পেলেন এই যাত্রায় তিনি স্থির করলেন, এই চিহ্নই হবে জাতীয় প্রতীক। জাতীয় পতাকায় চিহ্নিত থাকবে তা।

১৫ই অক্টোবর ১৯০৪ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, খ্রীষ্টীয়মত নিঃসন্দেহে সত্য কিন্তু সে কেবল মূল সম্ভাবনায়। তাকে গতিশীল হয়ে উঠতে হলে কালোপযোগী নূতম ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। স্পেনে যে খৃষ্টীয় 'ধর্ম্মসংঘর্ষ' প্রবেশ করেছে, সে আর কিছু নয় প্রস্তরও কন্টকের পথে হাঁটার ব্রত। ভয়ের সূচনা তার পর থেকে। ... স্বামিজী এক সময়ে আমাকে বলেছিলেন, 'মার্গট, তোমার শিষ্যদের ধর্ম্ম তুমি তৈরী করে দাও, আর যদি পারো আরো তাতে কিছু সার্ব্বভৌমিক ভাব প্রবেশ করিয়ে দিও। কিন্তু মনে রাখবে, গোটা পৃথিবীতে ছজন লোকও ঐ ধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত নয়।... আমার মনে হয় একথা মোটামুটি সত্য। কিন্তু আর একটি জিনিষ সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত। তা হলে : সাম্প্রদায়িকতার (Sectorianism) অতি গভীরে প্রবেশ করার পরেই তবে মানুষ পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে পারে। ... যদি এই পথে আমি কিছু পেয়ে থাকি, তার কারণ একদা আমি ভয়ঙ্কর গোঁড়াখৃষ্টান ছিলাম। আর তোমাকে মনে রাখতে হবে, কালীপূজাও সাম্প্রদায়িক ব্যাপার।

স্বামিজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কালে, আমার মূল প্রয়োজন ছিল সংস্কারসমূহ (Superstitions) কি অর্থে সত্য, তাই জানা। সুতরাং অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব শিখতে পারে — আমার মূল শিক্ষার বিষয় ছিল, কিভাবে শাশ্বত সত্যের সঙ্গে প্রতিটি পুরাণ কথা বা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। সেই কালে, আমি সকল বিশ্বাসের মিথ্যাত্বে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে নিঃসংশয় হয়েছিলাম। তবু আমার ভক্তস্বভাব আমাকে বলেছে, এই শেষ কথা নয়! আমি নিদারুণ দোটানায় ছিলাম। তারপর পেলাম শিক্ষা।

কাশ্মীরের অরণ্যমধ্যে সেই রাত্রির কথা তোমর মনে পড়ে, যখন তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং আমি বলেছিলাম, সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে, তখন কি রকম দ্রুত তিনি সায় দিয়েছিলেন।

প্রিয় য়ুম ... আমার জন্য প্রার্থনা করো, কেবল প্রার্থনা করো, আমি যেন তাঁর ইচ্ছা প্রবাহের শূন্য ধারা পথ হতে পারি। তোমার সমস্ত জীবনও যেন আত্মসাৎ করে নিতে পারি, আর তার দ্বারা ঐ প্রার্থনা সফল করতে পারি। আমার সমগ্রজীবন এবং শক্তিও অপ্রচুর মনে হয়। সেবা করতে, দিতে, এত সময় চলে যায়, গ্রহণের সময় যে পাই না! আমাকে ঐ ভাবে পূর্ণ করে তোল, যাতে গতি স্তব্ধ না হয়!

৬ই নভেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : জাতীয়তার ধারণা হয়ে উঠুক ভারতের খড়্গ। ১৩ই নভেম্বর ১৯০৪ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন :

খোকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ? আমার নিজের অভিমত : সে আগামী অক্টোবরে, ১৯০৫ এর অক্টোবরে ছুটিতে থাকার অনুমতি চাইবে।

১লা ডিসেম্বর ১৯০৪ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

গতকাল ছিল খোকার জন্মদিন। এই দিনটিকে বলি বজ্রদিন, কারণ তার দশ বছর ব্রতের সমাপ্তি ঐ দিনে। এখন সে মুক্ত। মনে হয় স্বাধীনতা, সর্ব্বদাই ঐ রকম সকল বহিরঙ্গ বাধা ও বাধ্যকতার, 'সমাপ্তি' তখন। "আমার আর কিছু করার নেই, ঈশ্বর তার সহায় হোন"। আরও বলি, আমরা 'বজ্রকে' জাতীয় প্রতীক হিসাবে নিয়েছি। ফরাসীরা যেমন নেপোলিয়ানকে বলে L homme, তাঁকে ইঙ্গিত করবার জন্য আর কোন কথার দরকার হয় না, তেমনি প্রাচীনকালে বুদ্ধের নাম লেখার পরিবর্ত্তে 'বজ্র' বললেই চলে যেতো।

এ বিষয়ে আরও অনেক গভীর কথা আছে, যা এখনি তোমাকে বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নানা সময়ের কথা স্মরণ করতে পারবে, কখন স্বামিজী নিজের সম্বন্ধে 'বজ্র' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

১লা ডিসেম্বর ১৯০৪, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : খোকার জন্মদিন, তাকে যথেষ্ট সুখী করেছে। সে একটি অসাধারণ এক্সপেরিমেন্ট করেছে, যাতে একটি আকর্ষ তার ইচ্ছামত পাক খুলে বিপরীত দিকে পাক দিতে সচেষ্ট।

ঐ সন্ধ্যায় সামান্য কিছু নিয়ে গিয়ে ছিলাম আমরা। গিয়ে দেখলাম, পড়ার ঘরের সাজ বদল। বসুর ডেস্কের পিছনে পুরানো পিয়ানোর কাছ দিয়ে লম্বা তাক তৈরী হয়েছে। কোণের বিছানাটাকে নীচু করে ডিভানে পরিণত করা হয়েছে, দেওয়ালে ডিস্টেম্পার করে সবুজ রঙ, কাঠের রঙ সাদা।

তারপরে বুদ্ধগয়ার মোহন্ত আমাদের একটি স্তূপ দিয়েছেন, যাতে সুন্দর 'বুদ্ধ' বসে আছেন বহুশত ক্ষুদ্র বুদ্ধের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। এই স্তূপটিকে বসুর ডেস্কের কাছে একটি পদ্মস্তম্ভের উপরে বসান হয়েছে। সব বুককেস বিতাড়িত, তাদের জায়গায় তিনটি নীচু বুককেশ। ফলে এখন ঘরের মধ্যে হাত পা ছড়ানোর ও বিশ্রাম করার জায়গা হয়েছে।

তোমার পক্ষ থেকে আমরা ভারতীয় রীতিতে চারটি পশমী জিনিস দিয়ে ছিলাম — তার দুটি খাঁটি সাদা সিল্ক ও পশমী মিশিয়ে তৈরী, আর দুটি বিস্কুট রঙের ফ্ল্যানেলের। খুব একটা কায়দার ব্যাপার, বিশেষ আনন্দ দিয়েছে।...

তোমাকে জানাই, গতকাল দিনটিকে আমরা ভবিষ্যতে সর্ব্বদা 'বজ্রদিন' বলব, কারণ ঐদিন তার দশবছরের ব্রতের সমাপ্তি। আমরাও বাড়ীতে পতাকা নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে 'বজ্র' আঁকা। 'ভারতীয়' জীবনজাল' সম্বন্ধে আলোকিত রচনা 'ওযেব' গ্রন্থটিকে মসিলিপ্ত করার উদ্দেশ্যে মিশনের প্রচেষ্টায় বেরুলো, মিস কারমাইকেলের রচনা। মাদ্রাজ মেলে তার সমালোচনা বেরুলো: আমরা সিষ্টার নিবেদিতার আর্শীবাদ পছন্দ করবো, মিস এ্যানী কার মাইকেলের নৈরাশ্য কে নয়।

জাতি গঠনে যেমন দলের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জাতীয় পতাকার। এবার জাতীয় পতাকা নির্ম্মানে মন দিলেন। ছাত্রীদের সে কাজে লাগালেন। তাদের দিয়ে আঁকালেন ও সেলাই করালেন

বিভিন্ন ধরনের পতাকা। মাঝে 'বজ্র', চারপাশে (ব্যাক গ্রাউন্ড) লাল, উপরে কালো নক্সা, ঠিক চীনের যুদ্ধ পতাকার আদর্শে কোনটা বা লালের উপর হলদে নক্সা।

২৯শে জানুযারী ১৯০৫ মারাঠা পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে বেরুলোঃ স্মরণীয় গ্রন্থ ওয়েবের বিরুদ্ধে জৈনক লেডি মিশনারী মিস কার মাইকেল রচিত বইটি "হিন্দু ধর্ম্মের কুৎসাকারী এক নারী"। মাদ্রাজ মেলের ইংরাজ-সম্পাদকও এই বইটিকে ইচ্ছাকৃত তথ্য বিকৃতি, বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যচারের বিস্তার ছাড়া অন্য কিছু নয় বলেছেন। আরও বিস্ময় প্রকাশে বইটির অধ্যায়গুলিও চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরলেন A look into Hell, "Coils of the snake" 'The Brand of Hell' — কোন নারী মিশনারী এ প্রকার ময়লা লেখায় হাত নোংরা করতে পারেন! 'খুবই দুঃখের বিষয়, ভারতে থাকাকালীন অবস্থানে' এক মিশনারী কেবল পাপ ও দুঃখের আস্তানায় উঁকি দিতে পারলেন — একবার ও দেখতে পেলেন না নিবেদিত রচিত লোক জীবনের মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যকে! নিবেদিতার বইটির বিরুদ্ধে যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ অবশ্যই স্বাগত কিন্তু মিস কারমাইকেল কেবল কাদা ও গোবর গাদার মধ্য দিয়ে এগুতে চেয়েছেন। গ্রন্থ শব্দটিকে ব্যঙ্গ করবে এমন বস্তু প্রকাশিত হতে দেবার রীতি গর্হিত ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন স্বয়ং লেখিকা নিজে। দুঃখজনক এই আবর্জ্জনার জননী মিস কারমাইকেল, অবশ্যই আমাদের কৃপার পাত্রী তিনি।

অমৃতবাজার পত্রিকা মিস কার মাইকেলের বইটি সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকার উক্তি উদ্ধৃতি সহ মাদ্রাজমেলের সম্পাদকীয়টি উল্লেখে বললেন, মানুষ নিজের মতে অন্যের বিচার করে, মিস কারমাইকেল পঙ্গু রোগ গ্রস্ত। তদনুযায়ী ব্যাভিচার ছাড়া হিন্দুনারীদের মধ্যে আর কিছু দেখতে পাননি। অপর পক্ষে, নিবেদিতা হিন্দু নারীর সতীত্বের গুণগান করেছেন। যদি মিস কারমাইকেল হিন্দু জীবনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করাকে "নরকের মধ্যে দৃষ্টিপাত" মনে করেন, তাহলে বলতে হবে, তাঁর দুর্ভাগ্য যিনি নরকের কালিমা, সর্পের কুণ্ডলী ইত্যাদি দেখার নিয়তি নিয়েই এসেছেন। যদি স্বর্গেও তিনি থাকেন, তবু ঐ সব জিনিষ তাঁর উপভোগ্য বস্তু। পবিত্র হৃদয় মিস নোবল হিন্দু জীবনের স্নেহ, প্রেম, সৌন্দর্য্য ও স্বর্গীয় সুষমা দেখেন মিস কারমাইকেলর মত নরক দেখেন না। যদিও তিনি (মিস নোবল) তিন বছরেরও বেশী সময় একাদিক্রমে হিন্দুদের মধ্যে রয়েছেন। বিষের ওষুধ বিষ এই চিকিৎসানীতিতে বিশ্বাসী অমৃতবাজার প্রশ্ন করলেন 'শকুনী আকাশে উড়ে কেন।" উত্তর ও দিলেন, না সৌন্দর্য্য দেখতে নয়, পচা মড়া খুঁজতে। তাই বিষ্ময়ের কিছু থাকে না, যদি দেখা যায় মাদ্রাজের মন্দিরে নর্ত্তকীদের, যারা অনেকেই দেহপসারিনী মিস কারমাকেলের মন কেড়ে নিয়েছে, যদি তিনি যেদিক চোখ ফেরান, সেদিকেই হিন্দুদের মধ্যে বেশ্যা-বৃত্তি, সেটা তাঁর চোখের দোষ, হিন্দুদের নয়। পাঠকরা বিস্মিত হবেন, যা পুনার এক মিশনারী মিঃ রেভা নিকল ম্যাকনিকর বইটিকে (ওয়েব) অসামান্য বিবেচনা করেছেন। অমৃতবাজার মন্তব্য করলেনঃ মিস্ কারমাইকেলের বইটি, নিবেদিতার ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ বইটির দীপ্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। চন্দ্রের নিজস্ব আলো আছে, কিন্তু অন্ধকারের পটভূমিতেই তা সুন্দরতর দেখায়। যেখানে মিস কারমাকেলের বই শয়তানের কার্য্যাবলী ও দেবভাবারেপিত শয়তানিতে পূর্ণ, সেখানে নিবেদিতার বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা দিব্য ভাবে উজ্জ্বল। পবিত্রতা ও মাধুর্য্য, যার থেকে নিরন্তর বিকীর্ণ।

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখলেনঃ আমরা জাতীয় পতাকার জন্য একটা ডিজাইনে রেখেছি চক্র এবং তা দিয়ে ইতিমধ্যে পতাকা তৈরী করেছি। দুঃখের বিষয় আমি চীনা যুদ্ধ পতাকাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম রক্ত প্রচ্ছদের উপরে কৃষ্ণ বর্ণ নক্সা। ভারতের মনে সেটা সাড়া জাগায়নি, সুতরাং পরেরটা, হবে লালের উপরে পীত নক্সা। ... ঝিলামের উপর যাপন করা দেনগুলিতে কিভাবে না ফিরে যেতে চাই। রাত্রিগুলি তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়া। আঃ হাঃ! হারিয়ে যাওয়া হাতের ছোঁয়া, নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠের শব্দ তারই জন্য।

কিন্তু চল! চল! সেদিনগুলি যেমন ভাবে চলে গেছে, আমরাও তেমনি চলে যাবো, তারপর নীচে, ঘুমিয়ে পড়া পার্ব্বত্য সানুদেশের শান্তিতে, আছন্ন হয়ে থাকবে অন্তর।

১১ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হল। সিনেট হলে দাঁড়িয়ে, সে কনভোকেশন সভায় কার্জ্জন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় যত্ন করে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিলেন; 'কোন ব্যক্তির বাক্য বা কার্য্য, যদি কারও চরিত্র সম্বন্ধে' অপর মানুষের আচরণ সম্বন্ধে, ঘটনা সম্বন্ধে কিংবা জীবনের তথ্য সম্বন্ধে, ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি করে, তাহলে তার নাম অসত্য। ... আমার মতে, সত্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বহুলাংশে পাশ্চাত্য দেশীয় ধারণা। ... নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাচ্য দেশে সম্মানের স্থান গ্রহণ করার পূর্ব্বেই, পাশ্চাত্য দেশের নীতি কথায় 'সত্য' উচ্চতর স্থান অধিকার করেছিল।

... তোষামোদ সৎ বা অসৎ দুই হতে পারে। তা যে আকারেরই হোক, তোমরা তাকে পরিহার করবে। প্রথম প্রকারের হলেও তা মিথ্যা, আর দ্বিতীয় প্রকারের হলে, সে তো জঘন্য।...

হল ঘরটি প্রাচীন ও নবীন সুশিক্ষিত ভারতীয়দের উপস্থিতিতে পূর্ণ। সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। প্রতিবাদ উঠলো না।

এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা। ভারতীয়েরা মিথ্যাবাদীর বংশধর! তাঁর মর্য্যাদায় লাগলো। উত্তেজিত অবস্থায় গুরুদাস ব্যানার্জ্জীকে টেনে বাইরে বার করে নিয়ে এলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরীতে গেলেন। কার্জ্জনের লেখা 'প্রবলেমস অব দি উইস্ট' বইটি সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। সন্ধ্যায় ছুটলেন অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস। লিখিত একটি প্রতিবাদ পত্র ছাপার জন্য দিয়ে এলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী তা প্রকাশিত হল। প্রতিবাদ পত্রের পাশাপাশি কার্জ্জন-দত্ত বক্তৃতাটির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হল। শিরোনামাঃ নানারূপে কার্জ্জনঃ

'... রাজসভায় যাত্রার আগে, কেরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎকার উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তরের কিছু অংশ আমার স্মরণে আছে। আমাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল,আমি যেন কদাপি স্বীকার না করি যে, বয়স মাত্র বত্রিশ বছর, কারণ কোরিয়ায় এ বয়সে কেউ সম্মানভাজন হতে পারে না। তাই প্রেসিডিন্ট যখন আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন (যে প্রশ্ন, প্রাচ্য দেশে অবধারিত ভাবে প্রথমেই করা হয়) আপনার বয়স কত? দ্বিধাহীন চিত্তে আমি বললাম, 'পঞ্চাশ'। তিনি বললেন, প্রিয় মহাশয়, বয়সের তুলনায় আপনাকে তো রীতিমত তরুণ দেখায়। এটা কি ভাবে সম্ভব হল? উত্তর দিলাম, সম্ভব হল এই কারণে, মহামহিম মহারাজের রাজ্যের অপূর্ব্ব আবহাওয়া মাসাধিক কাল আমি ভ্রমণ করেছি। ... শেষে তিনি বললেন, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ইংলন্ডের মহারাণীর নিকট আত্মীয়! 'না-তো-আমি তা নই'। উত্তর দিলাম কিন্তু যখন দেখলাম আমার উত্তরে তার মুখে বিতৃষ্ণার ছায়াপাত, সানন্দে যোগ করলাম, অবশ্য আমি অদ্যাপি অবিবাহিত। এই নীতিহীন ইঙ্গিতের দ্বারা আমি সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রসন্নতার প্রসাদ পুণরায় পুরোপুরি অর্জ্জন করে ফেললাম।

অমৃতবাজার পত্রিকা সেই সঙ্গে যোগ করলোঃ ফোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লর্ড কার্জ্জনের এই সাক্ষাৎ বিবরণ 'প্রবলেমন অব দি ইশ্ট' গ্রন্থটির সর্ব্বশেষ সংস্করণে বুদ্ধিমানের মত বাদ দেওয়া হয়েছে!

১৪ই ফেব্রয়ারি স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'লর্ড কার্জন অ্যাজ ওরিয়েন্ট ডিপ্লোম্যাটি' শিরোনামায় লর্ড কার্জ্জনের কনভোকেশান বক্তৃতার উপর মন্তব্যে অমৃতবাজার পত্রিকার বিবরণ উদ্ধৃত করে বললো : একটি ক্ষুদ্র সুস্বাদু কমিডি দিয়ে আনন্দ আসরের সমাপ্তি হয়েছে — সেটি না থাকলে কনভোকেশান নাট্যের পূর্ণতা ঘটতে পারতো না। আহা। হিজ এক্সেলেন্সির প্রচুর দেঁতো হাসি

পরদিন প্রভাতে নির্ঘাত হাসতে হয়েছিল যখন তিনি দেখলেন আমাদের সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা পাশাপাশি দুটি ছবি তুলে ধরেছেন। কনভোকেশনে বিরাজিত চ্যান্সেলার মহোদয় এবং কোরিয়ায় অবস্থিত লর্ড কার্জ্জন! এই যে দুটি দৃষ্টি, ভারতবর্ষকে এত বিশুদ্ধ আনন্দ দান করলো— অনিতিবিলম্বে ইংলণ্ডেও তা একই কাজ করাবে। গোটা রোম্যান্টিকানুষ্ঠানটির দাম তা পুষিয়ে দিয়েছে। সুন্দরতম ব্যাপারটি হল: যে অভিনেতা জনগণের কাছে এহেন বিশুদ্ধ আমোদের উৎস খুলে দিলেন, তিনি নিজে সে সম্বন্ধে ছিলেন পুরো আসচেন।

অমৃতবাজারের সাংবাদিক চতুরতার নিদর্শনটি কার, তা অজানা রইলেও অন্তরঙ্গ মহলের সকলের জানাছিল। জগদীশচন্দ্র লিখে জানালেন নিবেদিতাকে, যে লেখাটি লিখেছ, শাসকরা জেনে ফেলুক তা আমি চাইনা। বজ্রকে তো কৃষ্ণ মেঘের অন্তরালে থাকতে হবে। নিবেদিতা অমৃতবাজারের সম্পাদকের সাহায্য গ্রহণ করলেও, তখন তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকার নিয়মিত লেখক। এমন কি, নিয়মিত লিখছেন সম্পাদকীয় পর্য্যন্ত।

১৪ই, ১৫ই ১৬ই তারিখে 'বেঙ্গলী'তে সম্পাদকীয় বেরুলো : কনভোকেশান বক্তৃতা সম্বন্ধে।. ১৪ই, ১৬ই ও ১৭ই সম্পাদকীয় বেরুলো অমৃতবাজারে। কনভোকেশান রির্পোটটিও বেরুলো স্টেটসম্যানে, এটিও নিবেদিতার কাজ। ১২ই ফেব্রুয়ারী সম্পাদকীয়তে বেরুলো : উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ চরিত্র সম্পন্ন ভারতীয়দের সামনে লর্ড কার্জ্জন শোনালেন : প্রাচ্যবাসীরা অসত্য ভাষী, ক্লাসিক সমুহে অবমিশ্র সত্যের উপস্থাপনা নেই, ভারতবাসী তোষামোদকারী, কুৎসামুখী, ইত্যাদি ইত্যাদি ... এ সব বস্তু শ্রোতাদের কানে কি ভাবে বেজেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসত্য ভাষণের একচেটিয়া অধিকার কিন্তু ভারতীয়দের নেই। বাণিজ্য ক্ষেত্রে, প্রতিযোগিতার মুখে, ইংরাজ আধিপত্য বিস্তারকামী এবং তাতে সফল দৃষ্টান্তে মন্তব্য করলো: কেবল এই কনভোকেশন বক্তৃতাতেই নয়, কাউন্সিল বক্তৃতাতেও কার্জ্জন শিক্ষা নীতির ব্যাপারে ভারতীয় জনগণের প্রতিবাদ সম্পর্কে নিতান্ত ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছেন। (এটি র‍্যাটক্লিকের রচনা। ইনি নিবেদিতা অন্তঙ্গের একজন, স্টেটসম্যানের সম্পাদক)

১৪ই ফেব্রুয়ারী স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছদ্মনামে " দি হায়েষ্ট আইডিয়্যাল অব ট্রুথ" একটি প্রবন্ধ লিখলেন : গত শনিবার প্রথম, ভারতবর্ষের কাছে প্রামন্যভাবে ব্যাখ্যাত হল — কেন অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁর "ভারতবর্ষ আমাদের কি শেখাতে পারে" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে হিন্দুদের সত্যাশ্রয়ী চরিত্র বিষয়ে আলোচনায় নিয়োজিত করেছিলেন? আমরা প্রথম, এই অক্সফোর্ডের পণ্ডিত মানুষটির এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে পারলাম। প্রায় প্রতিটি সিভিল সার্ভেন্টের মূলগত প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে : সকল ভারতবাসীই মিথ্যাবাদী। ... অসত্য ভাষনের অভিযোগ এত বেশী পরিমানে কথিত হয় এবং সচরাচর এমনভাবে তাদের বিশ্বাস করানো হয় যে, তার সঙ্গে লড়াই আমি করতাম না যদি না আমার স্থির বিশ্বাস থাকতো গোটা একটা জাতির বিরুদ্ধে আনীত এই ধরনের একটি অভিযোগ— অনুরূপ অভিযোগ গুলির মতই অত্যন্ত ক্ষীণ অনুধাবন ও যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তা অতীতে, বর্ত্তমানে না ভবিষ্যতে যে দুষ্কার্য্য ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে, বা ঘটাবে এমন তুলনা কি ভারতে ইংরাজরাজ্যের চরমতর শত্রুরাও আবিষ্কার করতে সমর্থ নয়!

কার্জ্জনের আক্রমণ লক্ষ্য হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়। কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় সেমিটিক সাহিত্য ও সেমিটিক শিক্ষকদের কাছ থেকেই ইয়ুরোপ সেই সকল নৈতিক আদর্শলাভ করেছে, আজ যাদের কথা সে গর্ব্ব ভরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষনা করে। হিন্দু কাব্যপুরাণ, শাস্ত্রগত সত্য সম্বন্ধীয় ধারণার থেকেও হিন্দু ধারণার উল্লেখ করা চলে। গ্রীকদের সত্য বিধায়ক ধারণার চেয়ে হিন্দু ধারণার মহত্ত্ব অধিক। প্রশ্ন তোলা যায়: উচ্চ আদর্শ কি হিন্দুর বাস্তব জীবনে পালিত হয়?

হিন্দুরা কি নিজেদের ঘোষিত 'আদর্শ' যোগ্য হয়েছে? দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে 'না' যদি হিন্দুদের মাপে বিচার করা হয়।... হ্যাঁ, যদি ইংরাজদের পাশে রেখে বিচার করা হয়, ভারতের সন্তানেরা এই ক্ষেত্রে নিজ কর্ম্মকৃতিতে অন্য যে কোন পাশ্চাত্য দেশীয়ের পাশে, তুলনা করতে ভীত বা লজ্জিত না হয় : "যে বস্তু 'সত্য' ব্যাকুলতা প্রকাশ করে না — তা কদাপি নিত্য সত্যের অংশ হতে পারে না।"

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে করেই কার্জ্জন ঐ সকল অপমানজনক কথা বলেছেন আর ছাত্ররা স্টেটসম্যানের রিপোর্টি উদ্ধৃতি করেই বলছি, তারা তা গ্রহন করে ছিল নিখুঁত নীরবতায়। তারা ভালই করেছে, কিন্তু সেটা যথেন্ট ভাল বোধ হয় না — যখন ভাবি ঐ সকল ছাত্ররা তাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষদের বিরুদ্ধে। তাদের জাতির নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনে গেল, প্রতিবাদের শব্দমাত্র উচ্চারণ করার মত পুরুষ মানুষ, হয়ে উঠলো না!

১৬ই ফেব্রুয়ারী মি ম্যাকলাউডকে লিখলেন ... এমন কি গত শনিবার, কনভোকেশন সভায় লর্ড কার্জ্জন প্রদত্ত বক্তৃতাটির, যাতে তিনি ভারতীয় জনগণকে অপমান করেছেন, সেটিও জাতীয়তাপূর্ণ, যে বস্তুটি আমার মন্ত্রবাক্য করতে শিখেছি। তিনি আশাহত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছেন: আকাশে আদর্শ খুঁজো না, মানুষের বাস্তবজীবনে ও বাস্তব কর্ম্মের সামনে, সে আদর্শ দেখ। ভারতের মুক্তি, বাইরে থেকে আসবে না, ভিতর থেকে তাকে নির্ম্মান কর। খাঁটি ভারতীয় হও, সেটাই তোমার জাতীয়তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

৫ই মার্চ্চ ১৯০৫, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন :

গতরাত্রি ছিল শিবরাত্রি। খোকা, আরবিন্দ মোহন বসুকে নিয়ে এসেছিল। একটি সংবাদপত্রে কিছু অসুবিধাজনক সংবাদই ছিল এই আগমনের মূল কারণ। বুধবার, আজ শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা। সকালে মঠে গিয়েছিলাম গোলাপ নিয়ে। দুপুর থেকে কাজ চলেছে। আমি এত ক্লান্ত তার ফলে। বহু দরকারের কথা বলবার আছে, কিন্তু এই মহূর্ত্তে ভালবাসার প্রার্থনার কিছু করবার জন্য প্রাণ তৃষিত। মন্দ খবরটি কি, তুমি তা নিজেই দেখবে। বলবার মত যা কিছু খবর সবই মন্দ খবর। এতদিন সংগ্রাম তীব্রতর, অসাধুতা জঘন্য, জঘন্যতর থেকে ক্রমে তিক্ততার বৃদ্ধি। জগজননী, মাগো! মানুষ কি করতে পারে বলো? ... হাত দিয়ে যেন সমুদ্র রুখবার চেষ্টা, তাই মনে হচ্ছে। ঠিক তাই।

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রিয় সারা দেখতে পাচ্ছ, উৎসাহজনক কিছু নেই কোথাও। মায়ের কাছে প্রার্থনা করো, ওরা যেন এখনো পেপারটিকে চেপে দিতে না পারে — তা যেন ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশানস এ প্রকাশিত হতে পারে। অবশ্যই প্রার্থনা করো।

গভীরতর শান্তি এনে দিতে কিভাবে না চাই! সেই ক্ষমতা যাতে পেতে পারি, তার জন্য প্রার্থনা কখনো থামিও না। আর বসুর জন্য, সেই স্থির আলোকের প্রার্থনাও কদাপি থামিও না। যেখানে সর্ব্বশক্তি, সব কিছু মাধুর্য্যেভরা। একবার তুমি বলেছিলে, এমন একদিন আসবে যখন, বসু আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের অংশীদারী হবে। নিশ্চয় করে বলতে পারি না, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে সে সময় এসেছে। এখন ভবিষ্যৎ বাণী আরও করবে তুমি—ঐসব কথা কিভাবে না শুনতে চাইছি!

পেপারটির বিষয়ে গণ্ডগোল হয়ত খোকাকে আর এক বছরের পরে য়ুরোপ যেতে বাধ্য করবে! কে জানে?

ইতিমধ্যে ব্রেন কিভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে বোসপাড়া থেকে বসুদের বাড়ির কাছাকাছি এক খালি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হল। ডঃ বসুর প্রাণপণ চেষ্ঠায় রক্ষা পেলেন এ যাত্রায়।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন : কার্জন কিন্তু যেকথা গুলি বলেছেন, যা আমি কয়েকবছর ধরে বলে আসছি স্বয়ং স্বামিজীর কথা। ভারতবর্ষের আত্মনির্ভরতার মন্ত্র।... স্টেটসম্যান সে বক্তৃতার সেই অংশটি উদ্ধৃত করলো :

In the latter part of the Speach, which contained more than one : wise and patent passage. His Excellency sets himself to answer the question. What scope is there for the young Indian in the life of his country? And he answered that in his openion there are much. Already, he reminded his hearers, men of Indian birth full with distinction, high judicial and administrative posts adorn the learned professions add to the intellectual wealth of the world in imaginative literature. It was not true that door were closed. Avoid said Lord Curzon in his direct and impressive fashion the tyranny of action and the passion of racial bitterness. Look for your Ideals, not is the air of heaven, but in the lives and duties of men, learn that the true Salvation of India will not come from without but must be created within... Be true Indian that in the prompting of nationality. But while doing to strive also to be true citizen of the Empire. There are admirable word Lord Curzon at times has an unapproachable gift of saying things. But may we....

ঝড় বয়ে চললো— প্রতিবাদের, কাগজ পত্রে। শব্দের বন্যা বইলো সভাসমিতিতে। কার্জ্জনের উক্তিকে ছিঁড়ে একাকার করা হল : ইউরোপীয়দের অসত্য ভাষনের ভূরি ভূরি নমুনা। দেওয়া হল শাস্ত্রমন্থন করে সত্য আদর্শের ধারাবহিক চেষ্টার ঝুলি খুলে, প্রতিবাদের ঢেউ খেলে গেল। দেশীয় কাগজ গুলো আলোড়ন তুলে সর্ব্ব ভারতীয় অভিমত ব্যক্ত করতে লাগলো, ফলে আন্দোলনের মানসিক ক্ষেত্র প্রসারিত হল সারা দেশে।

ইতিমধ্যে নিবেদিতা শয্যাশায়ী তবুও আর্ত্তবেদনায় ভারক্রান্ত চিত্তে ৫ই মার্চ্চ মিস ম্যাকলাউডকে চিঠি দিলেন

... চারিদিকে কেবল মন্দ আর মন্দ — এখানকার গোটা সংবাদ এই। দিকে দিকে সংগ্রাম তীব্রতর। অসাধুতা, জঘন্য থেকে জঘন্যতর, আর তার জয়। ... মা। মা! কি করতে পারি বলো। সমুদ্রকে যেন হাত দিয়ে রুখে দেবার চেষ্টা, তাই মনে হচ্ছে, ঠিক তাই! স্বাধীনতার উপর অবিরাম আক্রমণ চলছেই, দিন দিন তার চেহারা আরো খারাপ। নৈরাশ্য বাড়ছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অবিরাম আক্রমণ চলছেই জঘন্য থেকে জঘন্যতর...। এই কার্জ্জন লোকটা যেন একেবারে ঔদ্ধত্য ও পাপের মূর্ত্তি।

এই সময়ে তিনি মন দিলেন প্রতিদিনের ঘটনা ইংলণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থায়, যাতে সেখানেও একটা ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা যায়।

১৭ই মার্চ ইংলণ্ডের 'ইণ্ডিয়া' কাগজে ছাপা হল কলকাতার সভাসমিতির বিবরণ। দেশীয় আন্দোলনের চরিত্র, কার্য্যবলী, এমন কি সভাপতি স্যার রাসবিহারী বসুর বক্তৃতার সারাংশ। চিত্রিত হতে শুরু হল আক্রমন ও প্রতিবাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়। ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কার্জ্জনের উদ্দেশ্যে মূলক উক্তি। কলকাতার টাউন হলে লর্ড কার্জ্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে, ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে, উক্তির প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা সূচক বিবৃতি বিপুল প্রভাবশালী সংবাদ পত্রেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হতে শুরু হল। এমন কি মনিংলীডার, ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাগজেও।

১৭ই মার্চ্চ লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া" কাগজে বেরুলো : কলকাতা টাউন হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশানে, লর্ড কার্জ্জনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়ে গেছে। সেখানে আলোচিত হয়েছে, সেই কনভোকেশন বক্তৃতার প্রতিবাদ ও তাঁর প্রবর্ত্তিত ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল নীতির, আর স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের সঙ্কোচ, উচ্চতর শিক্ষার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রন ও অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট দ্বারা সংবাদ পত্রের কণ্ঠ রোধ, নিম্নতর সিভিল সার্ভিসের নিয়োগে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা লোপ প্রভৃতি নানা বিষয়ের।

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ যিনি স্থানীয় আদালতের নেতা, সুপ্রীম লেজিস লেটিভ কাউন্সিলের এ্যাডিশন্যাল মেম্বার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্টতম গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতম। তাঁর সভাপতিত্বে এই প্রতিবাদ সভার অধিবেশন পরিচালিত হয়েছে। তাঁর মন্তব্য : কনভোকেশন বক্তৃতায় ভাইসরয় সারা এশিয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করছেন, সেই মহাদেশই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদের জন্ম দিয়েছেন। মিউনিসিপ্যাল এক্টের দ্বারা কলকাতা করপোরেশানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস করেছেন। সেই তিনি, এখন দেশাত্মবোধ ও সর্ব্বজনীন আশা আকঙ্খার বিরোধী বঙ্গ ভঙ্গ চাইছেন। নিম্নতর চাকুরীর জন্য ভাইসরয় প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার বিলোপ ঘটিয়েছেন, যদিও সর্ব্বোচ্চ বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ পরীক্ষা ব্যবস্থা, সরকারী চাকুরিয়াদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছিল। তাঁর প্রবর্ত্তিত ইয়ুনিভারসিটি অ্যাক্ট কেবল যে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ ও স্বাধীনতার ক্ষতি করেছে, তাই নয়, শিক্ষা এখন অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয়দের সম্মিলিত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে 'ভাইসরয়' অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট পাশ করিয়েছেন। বস্তুতঃ ভাইসরয় জনমতের কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। নিজ ইচ্ছা বলবৎ করতে বদ্ধপরিকর এবং তাঁর প্রায় সকল ব্যবস্থাই সিমলার আমলাতন্ত্রকে জোরদার করতে এবং শাসনতন্ত্রে রুশীয় কাঠামো আনতে তিনি বদ্ধপরিকর।

ইংলণ্ডের উদারনৈতিক সংবাদপত্রগুলি কার্জ্জনের অপকর্ম্মে বিরক্ত ও বিচলিত হয়ে উঠলো। ভারতীয় বিক্ষোভের প্রবলতায় বিব্রত করলেন। ডেলি নিউজে সুকঠিন মন্তব্য প্রকাশিত হল :

লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যাবলী এবং বক্তৃতার বিরুদ্ধে জনগণের 'ঘৃণাপূর্ণ' ক্রোধ, পর পর বিক্ষোভ প্রদর্শনে ফেটে পড়ছে, যা পরাধীন ভারতের ইতিহাসে বিরলব্যাপার। ... যে মানুষদের শাসন করতে গিয়েছেন, তাদেরই বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদী বলার মত 'আহম্মকী কনভোকেশন বক্তৃতা' ব্যাপারটা চরমে নিয়ে গেছে। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকার ও ইচ্ছাকৃত অপমান, সংকটকে জটিল করেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঝড় এসে গেছে, ফলে কার্জ্জনের গোটা আমলাতান্ত্রিক ও স্বৈরাতান্ত্রিক নীতি আক্রান্ত। ওঁর নীতির লক্ষ্য: বাইরে বেপরোয়া ঝুঁকি, আর ভিতরে উৎপীড়ন। সমগ্র দেশীয় আন্দোলনকে ঠেলে পিছিয়ে দেওয়ার দ্বারা কেবল ন্যায় নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে না, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারানীর ঘোষনাও লাঞ্ছিত হচ্ছে। পাল্লার একদিকে আছে ভারতে উদার ও প্রগতিশীল সরকার, অন্যদিকে কার্জ্জনের শ্রম ও প্রদর্শনীবাতিক। শেষোক্ত জিনিষটি, প্রথম ব্যাপারের তুলনায় নিতান্ত লঘু ও তুচ্ছ।

এই সময়ে তিনি (নিবেদিতা) ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে দমদমে আনন্দ মোহন বসুর 'ফেয়ারী' হলে স্থানান্তরিত হলেন। শীঘ্র নিরাময়ের আশায়।

১২ই এপ্রিল ১৯০৫, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ডঃ বসুর বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। হ্যাঁ পরবর্ত্তী শরৎকালের মধ্যে আমরা বোটানির একটা বই বার করে ফেলতে পারবো যা বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে অতীব বিষ্ময়কর বোধ হবে, এ আশা আমরা রাখি। ডঃ বসু যে ভাবে দেখেছে, তাতে কাজটা সম্পূর্ণ শেষ করতে কয়েক বৎসর লাগবে, কিন্তু কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করে যাচ্ছে।

১২ই এপ্রিল পুনরায় লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : স্বামিজী অতীতের লুথার বা মহাত্মাদের মত। জাতীয়মানের ধর্ম্ম নির্ম্মানে : তাঁর বিশ্বাস, রূপ নেবে। সর্ব্ব মত ও জাতির ত্রিশ কোটি নরনারীর জীবনের উপরেই তাঁর স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মিত হবে। সেই সঙ্গে হয়ত, পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে, নূতন যুগের অভ্যুদয় হবে। ... সেই মন্দির ভবন নির্ম্মাণে, আমি যেন একটি ইট বহনের যোগ্য হই।

জ্বরে পড়ে থাকার সময় নানা অপূর্ব্ব চিন্তার ভীড় জাগতো। যেমন, ইতিহাসে এই প্রথম একজন পুরুষ তাঁর মিশন দিয়ে গেলেন এক নারীকে। অথচ আমি দেখছি ভবিষ্যতের শান্তি ও অবসরে— আমার মূল্য খুব বেশী মনে হচ্ছে না। দেখা যাক— কি হয়।

৪ঠা মে ১৯০৫ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : সেদিন সন্ধ্যায়, সহসা নদীতে ঝড়ে পড়ে সারদানন্দ প্রায় ডুবে মরেছিলেন— খুব বেঁচেছেন। সেই ঝড়ের কথা কি মনে পড়ে তোমাব, ঝড়, অন্ধকার, বারান্দা আর স্বামিজীর এপাশ ও পাশ পায়চারি! ওঃ যুম, তোমাদের সঙ্গে তখন থাকতে পেয়েছিলাম তার জন্য কত যে কৃতজ্ঞতা সীমা তার নেই।

...হ্যাঁ, একথা সত্য, যে নূতন আনন্দ, নূতন অভিজ্ঞতা ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। শুধু অতীতের উপর বাঁচা যায় না। স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতেই বেঁচে ছিলেন না, প্রতিদিন তিনি নূতন শিক্ষা দিতেন, জীবনকে নূতনভাবে তৈরী করতেন। সবই সত্য। আমি আর লিখতে পারছি না — বড় ক্লান্ত।

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে কার্জ্জন পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করে বাঙালীর জাতীয়তার শক্তি পরীক্ষা করে দেখলেন। ১৯০৩ সালের শেষের দিকে বাংলা প্রেসিডেন্সী বিভাগের অভিপ্রায় ঘোষনা করেছিলেন। তখন থেকেই প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু হয়। তার তেজ উত্তোরত্তর বেড়েই চলতে থাকে। রাজনৈতিক আবহাওয়াও ক্রমশয়ই উত্তপ্ত হতে থাকে। কংগ্রেস ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলো। এই উত্তপ্ত পরিবেশে 'ওয়েব' বইটির দ্বিতীয় সংস্কার বার হ'ল।

নিবেদিতার কলম থামলো না। লিখলেন : 'ইউনিটি অব লাইফ অ্যান্ড টাইপ ইন ইণ্ডিয়া'। প্রবন্ধটিতে দেখালেন মুসলমানরা কোন ভিত্তিতে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হবে। ... কোন না যদি ভৌগলিক ভাবে নির্দিষ্ট আকার হয়, তা হলে জাতীয়তার নানান ভূমি হবার ক্ষমতা তার থাকবে। জাতীয় ঐক্য 'স্থান' এর উপরে নির্ভরশীল মানব সমাজে। কোন জাতির স্থান তার দেহাংশ গুলির জটিল বস্তুত্ব এবং সম্ভাবনা শক্তির দ্বারা নিদ্ধারিত হয়। তার কোন একটি অংশ অতীতে যাকে অর্জ্জন করেছে, জাতি সে বস্তুকে ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে অর্জ্জনের প্রত্যাশা করতে পারে। উপাদান সমূহের মিশ্র জটিলতাকে যথাভাবে স্থানের, জাতীয়করণ প্রভাবের অন্তবর্ত্তী করতে পারলে তা, জাতির পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে শক্তির উৎস, দুর্ব্বলতার হেতু নয়।

প্রবন্ধটি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা অভ্যর্থিত হল। বিশেষ করে লাজপত রায় নিবেদিতার প্রশাংসায় পঞ্চমুখ হলেন। নিবেদিতা প্রচার চালাতে লাগলেন— জাতীয়তা নির্ম্মাণ করো, তোমাদের অতীত ছিল ডায়ন্যামিক, যতদিন না সকল তরুণ, এই ভাবটি ধারণ করছে, তারপর তাকে, অন্য প্রভাবগুলির ঘাঁটিতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, প্রতিটি দুর্গকে ভেতর থেকে 'ঘা' মেরে অধিকার করে নিচ্ছে, ততদিন আমি শান্ত হবে না।

৪ঠা মে মিঃ গোখলেকে লিখলেন : আমার সম্বন্ধে যেসব মহদয় উক্তি করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আমি তার যোগ্য নই। আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন যে আমরা ডঃ বসু, ক্রিস্টিন সহ আমি, উভয় পক্ষে বলছি, আপনাকে আমরা একেবারে অন্তরঙ্গ মণ্ডলীর অন্তভুক্ত বলে মনে করি।

১২ই মে ১৯০৫, 'ওয়েব' বইটির দ্বিতীয় সংস্কারণের সুদীর্ঘ আলোচনা বেরুলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজী পত্রিকা পায়োনীয়ারে। বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল: উত্তেজনা বহুল উগ্র রচনার চেয়ে এইটি বিপজ্জনক! এতে আছে জাতীয়তা সৃষ্টির প্রশাংসা যা জাতীয় চিত্তের গভীরে প্রবেশ করে 'বোধ' পরিবর্ত্তনী ঘটাতে সমর্থ। এছাড়াও আছে দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষার মূল্যবান ঐক্য বিষয়ক কতকগুলি.শক্তি ভারতে বিদ্যমান, তা সে বিষয়ে, সজ্ঞানতা সঞ্চারের প্রচেষ্টা। ইংরাজী ভাষী মানুষদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি ও মহিমার উৎকৃষ্ট বিবরণ দানে উচ্চ সংস্কৃতির এই দেশের স্বাধিকার লাভের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। লেখিকার অবশ্যই রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে।

বইটির গোড়ায় ইংলন্ডীয় প্রশংসার উল্লেখ আছে। হোমের লেখকরা এমন মন্দ বইয়ের এত প্রশাংসা করছেন, ফলে সরলচিত্ত পাঠকবর্গ বইটির বর্ণনাকে সত্য বলে বিবেচনা করবেন, বড়ই বিপজ্জনক ব্যাপার। বলা হচ্ছে : "সিষ্টার নিবেদিতার গ্রন্থ" সাধারণ পাঠকের ধারণালোকে, বিপ্লব এনে দেবে"। "অসামান্য শক্তিশালী এই বই, ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ট যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অবশ্যই সেই শ্রেণীভুক্ত। বিশুদ্ধ মানবতার সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাধিক প্রশস্ত ভাবরাজিতেপূর্ণ, বইটিতে সেই উদার কৌতূহল, যার কাছে মানব প্রকৃতির কোন প্রকাশই বিদেশী বলে বিবেচিত হয় না— তেমনই উদারতার আলোকে প্রতিটি পৃষ্টা সমুজ্জ্বল ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুঁদে সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা পায়োনীয়ার তিনকলমে ব্যাপী তীব্র কটু সমালোচনা করলো : বইটি ছদ্মবেশী রাজনৈতিক প্যামফ্লেট ছাড়া, অন্য কিছু নয়। আরও লিখলো, বইটিতে পরাধীন একটি জাতির ধারাবাহিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন জীবনযাত্রার রূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে, — তা করেছেন শাসক জাতির একটি মানুষ, এটা কি করে মানবতা বা উদারতা বলে গৃহীত হতে পারে? ঐ কুৎসা লক্ষ্য পরাধীন লোকগুলোর নোংরা বোঝাটা, এতদিন শ্বেত মানুষদের কাছে বোঝা বা দায়রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

অধ্যায়ের পর অধ্যায় তীব্র সমালোচনায় বলা হল: নিবেদিতা, ভারতীয় জীবনযাত্রার যে রূপ এঁকেছেন, তার সাহিত্যজ্ঞানের অবশ্যই প্রশংসা করা চলে কিন্তু তিনি বলেছেন যে দেশের 'কটি' বস্ত্রাবৃত মানুষ, শেক্সাপীয়ার বা শেলীর কাব্যালোচনা করে অথচ ইংরাজ অধ্যাপকরা বলেছে ছাত্রদের মাথায় শেক্সপীয়ার ঢোকানো যায় না। ভারতীয়রা গঙ্গা পূজা করে, ওদেশের ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদের মুখে ধর্ম্ম কথা, ওদেশের মা-বাবা ও বিধবাদের বিষয়ে লেখিকার কাহিনী চিত্র আগাপাশতলা মিথ্যা। অথচ এঁর কলমের এমনই যাদু, পাঠকরা হয়তো সত্য বলেই ধরে নেবে। ভাষায় কুহকে আচ্ছান্ন রাখার তথ্য দান, এমনই সুরচিত কৌশল— যা দ্বিতীয়বার পড়ার আগে পাঠক বুঝতেই পারে না— সে পাড়ছে অপাদার্থ বস্তু। ... চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত লেখিকার মতলব বোঝা যায় না। তা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির একপেশে প্রশংশায় পূর্ণ কিন্তু পঞ্চম অধ্যায় গুলিতে তিনি করেছেন কি? অত্যন্ত অনুচিত কথা পেড়েছেন, ভারতবর্ষে অখণ্ড জাতীয়চেতনা আছে এবং ভারতবর্ষ যেন নিজ ভাগ্যকে নিজে নির্দ্ধারণ করার অধিকার লাভ করে। ইংরাজ শাসকরা বহু বছর ধরে এর বিরোধী কথাই প্রচার করে আসছেন। কী স্পর্দ্ধা! সর্ব্বদা তার উল্টো কথা! যেখানে ভেদ ও বৈষম্যের ভিদ" চির প্রতিষ্ঠিত, রাজনৈতিক ভাবে তাদের মোকাবেলা করা ছাড়া সরকারের অন্য উপায় নেই।

As a matter of fact, the papers which have reviewed this book in such flattering terms and with the papers no doubt the home public must be included, have been guided by what is neither more or less than a political pamphlet in disguise .. So far the political intentions of the Book has been successfully kept in the back ground. The first four chapters deal or

rather shuffle with Indian life after the fashion we have described, without a time of political motive, other than that supplied by the strangely one sided character of their contents. In the fifth chapter however, the authoress feels the way to what presently reveals itself as the real object of the Book, the demonstration that India is a single nation but nor a congeries of divided race, and religions and on appeal to that nation to realise its destiny by becoming independent.

Of course these sentiments are not as planly stated in the Book as they are here. The conceptions of national unity is skillfully blended with verbiage about the synthesis of India thoutht, the study of caste and other miscellaneous matters which serve in succession as the objects nominally under discussion, while the appeal to India to throw off the British yoke, though often implied, is nowhere openly expressed.

এরপর সমালোচক বইটির নানা অংশ উদ্ধৃত করে টিপ্পনী করলেন: বাঙালীরা ভবিষ্যতে যুদ্ধজয়ী জাতিতে পরিণত হতে পারে এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে। লেখিকা ভারতীয় আন্দোলনের স্বার্থে, নিদ্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে কার্য্যকর করতে 'গতিশীল রক্ষণশীলতার' পক্ষে প্ররোচনা জাগিয়েছেন। ... ভারতে ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে ওর বক্তব্য; হায় আজ তার পেটে অন্ন নেই; আজ ভারতীয় নারীর পরণের সাধারণ শাড়ী পর্য্যন্ত তৈরী হয় সুদূর ম্যানচেস্টার ও গ্লাসগোর যন্ত্রে, এর অর্থ এই দেশ রাশি রাশি ইয়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরূপী পরগাছার আশ্রয়।

যেখানে হিন্দুও মুসলমানের হিংস্র লড়াই ইতিহাস বিদিত, লেখিকা সেখানে দেখিয়েছেন নানা ধরণের ঐক্য, অবশ্য এই জাতি প্রথায় বিষয়ে, লেখিকার সমাজবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণের মূল্য স্বীকার করা চলে না, যেহেতু একই ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সমাজের নানা অংশে তারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।

...বইটির কোথাও খোলাখুলি রাজনৈতিক প্রেরণা নেই, ক্রদ্ধ রাজনৈতিক চীৎকার নেই, পরিবর্ত্তে ভিতর থেকে উত্থানের পথ নির্দেশ ও প্রেরণা দান করেছে। তা অবশ্য খোলাঘুলি না বলে আবৃত ভাষায় রূপ দান করেছে। এই ছলনা, জঘন্য... জঘন্য। কেবল তাই নয়, লেখিকা শ্বেতদ্বীপের দেশোয়ালী ভাইবোনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ। তারা ভাববে, সত্যই তো ভারতবর্ষ সভ্যদেশ, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত। বইটিকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না— কেন না, এটি একই সঙ্গে নিরতিশয় বদ।

The work is, however, adopte to create a false impression on the English public. Persons ignorart and more specially women, will be apt to take the writer at her own valuation which is high, and to think that they are acquairing information, because she tells them so. Incidently they will imbibe the Idea that India is a untited and highly civilised country, to which autonomy may and should be entrusted. Had the book been merely silly gush of writer whose flow of language exceed her power of connected thought, the Reviewer would have fulfilled his duty when he had glanced at it and cast it aside in favour of something deserving serious creticism. It is not, however merely silly, on the contrary, its leading characterstic is cunning and its contents are mischievous.

সমালোচক উদার মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে কলমের আঁচড় কাটলেন: বাঙ্গালীদের খোলা খুলি রাজনৈতিক অধিকার দাবিকে তিনি তারিফ করতে প্রস্তুত কিন্তু কি নিন্দনীয় এই তলে তলে চক্রান্ত! জোয়ান অব আর্কের সঙ্গে ঝাঁসির রাণীর তুলনা করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা? মার্শম্যানের 'ভারতীয় ইতিহাস' যা বাইবেলের সমতুল্য তা থেকে উদ্ধৃতি করলেন : ঝাঁসীর রাণী কত নিষ্ঠুর ছিলেন, লর্ড ডালহাউসি কেড়ে নিয়েছিলেন, সে কথা ভুলতে পারার মত বৈরাগ্য না দেখিয়ে মিউটিনির সুযোগ নিয়ে ইংরাজ নারী পুরুষকে কোতল করেছিলেন — সে নিষ্ঠুরতাকে, স্মরণ করার পরিবর্ত্তে লেখিকা তাঁরই জয় ধ্বনি দিয়েছেন।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে স্বয়ং রাণী ঝাঁসি অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। লেখিকা সেই ঝাঁসীরাণীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন : জোয়ান অব আর্ক পর্যন্ত চাঁদবিবি অথবা অপরূপা ঝাঁসীর রাণী অপেক্ষা অধিক দেশ প্রেমিকা ছিলেন না। অথচ ১৮৫৭ সালে তিনিই বৃটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের এখনও একটি দৃশ্যের কথা বলাবলি করতে শোনা যায়" নগর প্রাচীরের অনেক উঁচুতে ফাঁসিকাঠে ঝোলা একটি মানুষ, যিনি রাণীরই পিতা, ঝাঁসি রাণীরই আদেশে তাঁর ফাঁসি। তিনি দুর্গের দ্বারের চারি ইংরাজদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। লোকে এখনও বলাবলি করে। তখন যুদ্ধ বিধস্ত শিবির, ঝিমোচ্ছে সৈনিকের দল। বিদ্যুৎ বেগে রাণী, সৈন্যদল নিয়ে ছুটে এলেন ঝিঙ্গল ঘোটকীর পিঠে চেপে। ঘোটকীর প্রতিটি পেশীতে টান, বাঁ হাতে উদ্যত বর্শা, সাঁ সাঁ করে ঝড়ের বেগে অপ্রত্যাশিত সে আক্রমণ। সম্মোহিত শ্বেত সৈন্যদল। সম্বিৎ যখন ফিরে পেল, অন্তর্হিত অশ্বারোহী সৈন্য দলের দিকে দু'একটা গুলি ছোঁড়ার অবকাশ পেয়ে ছিল মাত্র!

... প্রাচীন মানুষেরা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এখনও রাণীর জয়গান করেন।

পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট— নিবেদিতা সম্বন্ধে গোপন কাহিনী মন্তব্য করলেন পায়োনিয়ারের সেই সমালোচনা :

"Her Sister Niveditas second work the Web of Indian Life ... The Pioneer in their review of the Book on 12.5.05 pointed that it was nothing but political a pamphlet in disguise, the object of which was the demonstration that India is a single nation and not a congeries of divided races and religions and an appeal to that nation to realise its destiny by becoming independent family. Its leading characteristic is cunning and its content mischievous."

১৬ই মে মিস ম্যাকলউডকে লিখলেন: বাইরে ঝড়ের রাত্রি। ঘরে ঘরে ধাক্কা খেয়ে ঝড়ের ক্রন্দন। যেন মনে হয়, অনন্তের জন্য আত্মার ক্রন্দন।

কার্জ্জন দেড় বছর চুপ থাকার পর জুলাই মাসে মাঝামাঝি ৬ই থেকে ২০ শে জুলাইয়ের মধ্যে দফায় দফায় সরকারের চূড়ান্ত ঘোষণায় জানালেন : বাংলা প্রেসিডেন্সীকে দুটি প্রদেশে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। একটি অংশের নাম "ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম" থাকবে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী ডিভিশন পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, মালদা ও আসাম। অপরটির নাম 'বেঙ্গল'— যা বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হবে। জনমত এবং জনগণের অনুভূতির উপর প্রচন্ড আঘাত হানলো এই ঘোষণা। কল্পনাতীত, যা ছিল, তাই এলো অত্যাচারের সামিল হয়ে। ফলে, দেখা দেল প্রচন্ড উত্তেজনা, সরোষচিত্ত মানুষের সরব প্রতিবাদ বিশাল বিশাল সভা, হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষতি প্রতিবাদ পত্র, প্রেরিত হল সরকারী দরবারে।

সরকার পক্ষ অবিচল। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে স্থির ব্যাপার করে তোলার জন্য অদ্ভুত ক্ষিপ্র তৎপরতায় বিভক্তির দিবস ঘোষিত হয়ে গেল ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫। নূতন প্রদেশের গভর্ণর হলেন জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার।

কাগজ, পত্রে মুখে যতখানি প্রতিবাদ করা যায়, ততখানি করার পর, বাংলার অধিবাসীরা দেখলো — শাসকরা কথায় বিশ্বাস করেন না, নামলো কাজে। আর মৌখিক প্রতিবাদ নয়, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও বৃটিশ জনগণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের চরিত্র গ্রহণ করলো। ইঙ্গ ভারতীয় ইতিহাসে এই প্রথম ইংরাজি শিক্ষিত ভারতীয়েরা, আবেদনের ভিক্ষনীতি তাগে করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হল নব জাতীবাদের খাঁটি প্রেরণায়।

২৩ শে মে ১৯০৫, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বুঝে দেখ ১২ই মার্চ্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মেলা থেকে ৮ই মে তারিখ পর্যন্ত, আমি প্রায় কোন কাজ করিনি। আবার এখন আমরা বিজ্ঞানের নূতন কাজে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। সুতরাং একেবারে অকেজো নই।

২৪ শে মে মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : শুভ জন্মদিন বার বার আসুক। খোকা তোমাকে তার করতে চাইছিল। কিন্তু এখানে এত সুন্দর সব তিব্বতী জিনিস রয়েছে এবং সেগুলি এতই দামী যে খোকার মনে হল তারই কিছু ঐ টাকায় কিনে তোমাকে পাঠানো ভাল, যাতে স্থায়ী আনন্দ পেতে পারো।

খোকা আমাকে একটি শিয়াল ছানা দিয়েছে। যদিও তার দাম চার আনা কিন্তু যেহেতু কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার সুন্দর কালো চোখের দিকে না তাকিয়ে পারি না, খোকা বলে অমন ব্যয়বহুল জিনিষ কি দেখেনি। কয়েক দিনের মধ্যে ওটাকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছা।

ঠিক হয়েছে, আজ শেয়ালছানাটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে তোমার জন্ম দিনের সম্মানে। বলো, তুমি খুশী হওনি।

১৩ই জুন ১৯০৫ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন: খোকা বলছে, তুমি পাশ্চাত্য যাত্রার পরিকল্পনা বিষয়ে জানতে উদগ্রীব। তার ইচ্ছা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলি যে, এখানে নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং সেই একমাত্র লোক যে আত্মসমর্পণ করেনি, সুতরাং আরও একবছর কি দেড় বছরের জন্য এদেশে তার একাদিক্রমে অবস্থান প্রয়োজন। এখনি সে লেফটন্যান্ট গভর্ণরের কাছে পুনরাবেদন করতে চাইছে, তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য। যদি তার ফল হয় খুবই ভাল, না হলে পদত্যাগের কথাও ভাবতে পারছে না।

বইয়ের বিষয়ে। এই বইটি অপর বইয়ের চেয়ে আকারে ২ মিমি বড় হবার সম্ভাবনা। তবু খরচের হিসাব মাত্র ১৬০ পাউন্ড, তার উপর নক্সার জন্য ২০০ পাউণ্ড। আমাদের ধারণায় এ খরচ খুবই কম। অবশ্য তুমি যা বলেছ, আমার নিশ্চিত ধারণায় তা সত্য। কিন্তু খোকার সমস্ত মনপ্রাণ বইটির যোগ্য মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য এমনই পড়ে আছে যে — এটিকে একটি বজ্র করে তুলতে চায়। তাই আমি এর সম্বন্ধে কোন কিছুতে প্রতিবাদ করিনি। সব জড়িয়ে মনে হয় ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ড খরচ হবে। সে এখন এটিকে একখণ্ডে বের করবে বলে ঝুঁকেছে। যদি তাই হয় তা হলে খরচ কম হওয়ার কথা।

২১ শে জুন ১৯০৫ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : অবিরত কাজ করে যাচ্ছি, এবং বোটানির উপর নতুন একটি বই প্রায়ই শেষ। বিজ্ঞানের ভারতীয় মানুষটির মধ্যে আমরা এমন একজনকে পেয়েছি, যিনি তাঁর কাছে যা সাহায্য আসে তাই ব্যবহার করতে পারেন, এক্ষেত্রে গেডিসের মত তিনি নন। বৃথা ব্যয়িত বলে কিছু নেই এখানে।

২১শে জুন ১৯০৫ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন — জন্মদিনের মুখে লেখা তোমার চিঠি এখানে এসে পৌঁছেছে। গত রাত্রে কি আগের রাত্রে, খোকা আমাকে বলছিল — তুমি এবং আমি

বর্ত্তমান আছি, এইটে জানলেই চলে যায়। সে বলছিল, তার কাজের বিরুদ্ধে সকল বিক্ষোভ, মাপামাপির চেষ্টা এবং প্রতিঘাতের চেষ্টার উল্টোদিকে, সে রেখেছে তোমার অভ্যর্থনা, হৃদয়ের উত্তাপ এবং তারিফ। যদি বসু আর কিছু কখনও না করে, তা হ'লেও ইতিমধ্যে যা করেছে তাই যথেষ্ট। পরের শীতের কথা সে তোমাকে জানাতে বলেছে, তার সর্ব্বদা ভয় ভারতে আসার পথে তোমার ভালমন্দ কিছু হতে পারে। সুতরাং যে কোন দারুণ সংকটের জন্য তোমার আগমণ জমিয়ে রাখতে চাই। আমার অসুখের সম্বন্ধে যদি সে পূর্ব্বাহ্নে কোন সংকেত পেতে, তা হলে তোমাকে নিশ্চয় ডেকে পাঠাতো।

কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই তোমাকে চাই, এটা অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে।...

বোটানির উপর বইটির শেষের অধ্যায়গুলি এখন লেখা হয়ে গেছে।

২০শে জুলাই ১৯০৫ চিঠি লিখলেন: খোকা আজ এল বড়ই ক্লান্ত। আহা বেচারা! আমি এখন আরও শক্তি পেয়েছি। ফলে, দেখতে পাচ্ছি, আমার কাজ শুধু, দিয়ে যাওয়া। কেন, কোথায়, তার ফল কি হবে — এসব যাচাই করা নয়।

প্রতিবাদের সক্রিয়তা : 'স্বদেশী ও বয়কট'। 'স্বদেশী' অর্থে সক্রিয়তা, এদেশে যা তৈরী হবে দেশবাসী ব্যবহার করবে — সেইসব বস্তু : আর বয়কট বিদেশী পণ্য বর্জ্জন — তা যতই সুন্দর বা স্থায়ী হোক, মূল্য যতই সুলভ থাকুক, তা বর্জ্জন করুক দেশবাসী। কুঠারাঘাত কর, বণিক-শাসব ইংরাজের স্বার্থে।

প্রথমটি অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে জড়িত — আত্ম বা স্বনির্ভরতার পাথেয়। যদিও গোটা ব্যাপারটা অর্থনৈতিক — পিছনে কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব। পার্টিশন ঘোষিত হওয়ার পর ৭ই আগস্ট ১৯০৫ টাউন হলে ঐতিহাসিক সভার আয়োজন হল। সে সভায় 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হল। এর আগে তিন সপ্তাহ ধরে কলকাতা ও মফঃস্বলে বিভিন্ন সভা সমিতিতে বয়কট সমর্থিত হয়েছিল। মিলিত এই সভায় তা গৃহীত হল।

১৫ই আগস্ট ১৯০৫ মিঃ তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লিখলেন : 'সঙ্কট'। সরকার অগণিত মানুষের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে, আবেদন নীতির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কঠিন পথ গ্রহণ না করলে সরকারের চৈতন্য উদয় হবে না। সরকার আবেদনে কর্ণপাত করবেন না। তাই এখন কথা নয়, কাজ চাই — প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে কাজ। ইংলণ্ডের মানুষই, অত্যাচারী শাসককে, কি করে বিদায় দিতে হয়, সে পথ দেখিয়েছে। পরাধীন নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে সে পথ গ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের আছে বয়কটের পথ, যাকে বেআইনি বলা চলবে না। বাংলা সঠিক অস্ত্র নিয়েছে। সারাভারত ঐ অস্ত্র তুলে নিক্।

১৭ই আগষ্ট ১৯০৫, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : সুচীকর্ম্মকে তুমি আশাপ্রদ মনে করছ বলে আমি আনন্দিত। আমার মতে, উন্নতি হচ্ছে ক্রমেই। মহিলাদের মধ্যে একজন, সদ্য খোকার জন্য একটি পাতাকা প্রস্তুত করেছে, যা সে বরোদার মহারাজকে দেবে।

এখন বল দিকি, শুনে কি বলবে — ১লা জুলাই আমরা নতুন বইয়ের ১ থেকে ২০ অধ্যায় পর্যন্ত ডাকে পাঠিয়েছি। গতকাল পাঠিয়েছি ২১ থেকে ৩১ অধ্যায়। আরও ১১টি অধ্যায়। বাকিটা লিখতে হবে যা, অবশ্য মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়।

এ পর্য্যন্ত ১৬৮টি নক্সা এবং ২৭৯ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। কিন্তু বাকি আছে দ্বিগুণ পৃষ্ঠা যার অর্থ ৫০০ থেকে ৫৫০ পৃষ্ঠা।

গত সপ্তাহে এক ইংরাজ অধ্যাপকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছ থেকে খোকা সম্বন্ধে যথেষ্ট নাক সিঁটকানো কথা শুনলাম। আমি চুপ করেছিলাম। তাকে কিছু বলিনি কিন্তু মনোভাব? এখন শুধু চাইছি তাদের এমন কিছু দিতে, যাকে পৃথিবী স্বীকার করবে। তুমি এখানে না থাকায় ভ্রান্তির লজ্জা, কিভাবে না অনুভব করছি! তুমি থাকলে একটা দল তৈরী করা যেত, যার ফলে ওরা এত বেশী এগোতে সাহস করতো না। এই বিশেষ লোকটি আবার খোকার বন্ধুরূপে বিবেচিত হতে ব্যস্ত, ভেবে দেখ একবার! যে যাই হোক, এসব খোকার কাছে ধরা পড়েনি।

২৪শে আগষ্ট ১৯০৫, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চিঠি লিখব না। যেহেতু আমরা এই সপ্তাহে বইটির উপর কঠোর পরিশ্রম করছি।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে মিঃ গোখলে বাংলা ও ভারতের অবস্থা সেখান তুলে ধরার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন। নিবেদিতা চাইলেন, মিঃ গোখলে এই সুযোগে ইংলণ্ডে পজিটিভিস্টদের সঙ্গে পরিচিত হোন, ফলে তার সামাজিক দৃষ্টি প্রসারিত হবে। পজিটিভিস্ট দলের মিসেস হেস্টিকে ২.৯.০৫ লিখলেন : মিঃ গোখলে এই কয়েক সপ্তাহ ইংলণ্ডে গেছেন। আমার খুবই ইচ্ছা, তিনি সকল পজিটিভিষ্টদের সঙ্গে বিশেষতঃ আপনার বন্ধু মিঃ উইলসনের সঙ্গে মিলিত হোন।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫ মিঃ গোখলেকে লিখলেন : মিঃ স্টেডের সঙ্গে দেখা করতে পারো। ওঁর সঙ্গে কথা বলে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির ভিতরের কথা জেনে নাও। ওঁকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলা যায়। ওঁর কাছে কার্জ্জনের আমলে কাজের ধারা প্রকাশ করতে পার। বাংলার বয়কট ও স্বদেশীর প্রচণ্ড শক্তির কথাও তাঁকে অবহিত করতে পার। ...আশাকরি, ইংলণ্ডে থাকাকালে তুমি কতকগুলি ঋষিতুল্য ও সুমার্জিত চরিত্রের মানুষের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে না— আমার স্বদেশীয়রা ঠিক যা, তাদের সেইভাবে বিচার করে, সুযোগ গ্রহণ করো। তারা প্রায়শঃ রক্তপিপাসু, সর্ব্বদা অর্থ পিপাসু, অনুচিত যুদ্ধের কারণে অধঃপতিত এবং যে সব বস্তু এতদিন 'ইংরাজি' শব্দকে গৌরবান্বিত করেছে, তাদের দ্রুত বর্জ্জনকারী।

১৬ই অক্টোবর শাসনতান্ত্রিকভাবে 'পাটিশনকে বলবৎ করার আদেশ ঘোষিত হল। সেই দিনটিকে উভয়বঙ্গের অবিভাজ্যতার ঘোষণারূপে 'ফেডারেশন হলের' ভিত্তিস্থাপন করা হল। রোগশয্যা থেকে বাহিত হয়ে এসে যে কাজ সম্পাদন করলেন আনন্দমোহন বসু। মিলনের 'রাখীবন্ধন উৎসব' পালিত হল। দিনটি স্বীকৃত হল জাতীয় দিবস রূপে।

আলোড়িত বাঙালী জাতির হৃদয়, ছাত্ররা দলে দলে যোগ দিল সে আন্দোলনে। যে সমাজে ছাত্রদের ছিল অধ্যয়নই তপস্যা, শিশু বয়স থেকে বিদ্যাসাগরমশায়ের বর্ণপাঠ— "লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে" শুধু কণ্ঠস্থ নয় — ছিল জীবনের স্বপ্ন, সেই ছাত্রদল ঝাঁপিয়ে পড়লো নেত্রীবৃন্দের আহ্বানে। গতিশীল সে আন্দোলন, বন্যাতরঙ্গের মত আছড়ে পড়লো সারা বাংলায়।

বাঙালী জাতির প্রাণস্রোত, আন্দোলন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে গণ্ডীবদ্ধ রইলো না— তা উদ্বেলিত হল সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, অভিনয়ে, লোকসঙ্গীতে। জাতীয় সংস্কৃতির জীবনীশক্তি রূপ নিল মুকুন্দ দাসের 'স্বদেশী যাত্রায়'। পরিমার্জ্জিত সুর সঙ্গীত আবরিত হল রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেন প্রমুখের রচনায়। বার্দ্ধক্যে জর্জ্জরিত গিরিশ ঘোষ মঞ্চস্থ করলেন 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশিম' 'ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নাটক। রাখী বন্ধনের অমর সঙ্গীত রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। তুলি রঙে জাতির আত্মাকে প্রকাশ করলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীগণ। ভারতবর্ষের জীবন ও ইতিহাসের সত্যরূপ দানের ব্রত গ্রহণ করলেন, ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীগণ। জাতীয়বাদী বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র; পি সি রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এগিয়ে এলেন সে মিলন-মঞ্চে।

জগদীশচন্দ্র মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন, এই রাখী আপনার কাছে পাঠাবার সময়টুকু পেয়েছি। সেটি আমি বেঁধে দিচ্ছি আপনার হাতে। আইনের দ্বারা ওরা আমাদের বিভক্ত করেছে, কিন্তু আমরা সমগ্র ভারতবাসী, এই রাখীর প্রতীক বন্ধনের দ্বারা নিজেদের বেঁধে ফেলেছি। যাতে আমরা চিরকালের জন্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে, আইনের যত বাধা আসুক না কেন, তার সম্মুখীন হতে পারি সকলে। এই হল আমাদের যথার্থ মিলন। আজ থেকে নূতন জাতীয় জীবনের সূচনা। আর বহিরাগতদের উপরে নির্ভরতা নয়, এখন আমরা ভারতের, আমরা আমাদেরই।

সুরু হল জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন। এগিয়ে এলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কেবল তাত্ত্বিক ব্যাপারের আবর্জনা থেকে নানা কারিগরী শিক্ষার দিক প্রসারিত করা হল। জাতীয় আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশে স্মরণীয় ভূমিকা ছিল ইংরাজী ও বাংলা পত্রপত্রিকার। জন্ম নিল নূতন নূতন পত্রপত্রিকা। সেসব রচনার মধ্যে, ছড়ানো বিবেক জাগরণের রূপকার উত্তেজনা। এছাড়াও প্রকাশিত হতে লাগলো মহৎ সাহিত্য যা সাহিত্যগুণে সমুচ্চ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় সমৃদ্ধ ও অনিক্রান্ত। এইসব পত্রপত্রিকায় লিখতে লাগলেন অরবিন্দ, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিত প্রমুখ চিন্তাশীল ও মুক্তিকামী নেতৃবৃন্দগণ।

এই আন্দোলন বঙ্গভূমিতে সুরু হলেও তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হল।

কংগ্রেসও চিন্তাধারায় দ্বিধারা হয়ে গেল। মডারেট বা মধ্যপন্থী তখনও আবেদন নিবেদনে নির্ভরশীল। আর একদল চরমপন্থা অবলম্বনে আগ্রহী। তাদের বলা হতে লাগলো চরমপন্থী বা এক্সট্রিমিষ্ট। এই চরমপন্থী দলের সহযোগী হল পাঞ্জাবের লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের তিলক, খার্দাপে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতে ও ভারতের বাইরেও। সকলের লক্ষ্য বিবেকানন্দ ও তাঁর বাণী। তাঁকে স্মরণ করে, অরবিন্দ বললেন : এই হল পৃথিবীর উদ্দেশ্যে প্রথম প্রকাশিত সংকেত — ভারত জেগেছে কেবল বাঁচতে নয়, জয় করতে।

ইতিহাসের বিচিত্র গতি। বৃটিশের শাসনকালেই শুরু হয়েছিল ধর্ম্মান্তরের হিড়িক। জীর্ণ হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে 'ক্রীশ্চান' হতে শুরু করলো। সে স্রোতরুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন রামমোহন রায়, প্রিন্স দারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ; পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। প্রবর্ত্তন করলেন নবধর্ম্ম। সৃষ্টি হল ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দুশাস্ত্রের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র শাস্ত্র থেকে সংকলিত করলেন ব্রাহ্মধর্ম্মশাস্ত্র। মেশানো হল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের রুচি ও স্বাধীনতা। বৃটিশ শাসকদের সহায়তায় আইন পরিমার্জ্জিত হল বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার, পাশবিক সতীদাহ প্রথা। ফলে, সৃষ্ট হল নতুন জটিলতা। মৃত্যু থেকে রেহাই পেলেও জাগতির সুখ থেকে বঞ্চিত হল বালবিধবা সম্প্রদায়। এলেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মশায়। তিনিও ইংরাজ শাসকদের সহায়তায় প্রচলন করলেন 'বিধবা বিবাহ'। শিক্ষা প্রচারে, অশিক্ষিত ও গোঁড়া ধর্ম্মান্ধদের শিক্ষার আলোকে নারীপুরুষ নির্বিশেষে উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন ডেভিড হেয়ার, বেথুন সাহেব ও রোজারিও প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ওপাশে ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়রে মধ্য থেকে প্রতীক পূজারী (কালী সাধনায় ব্রতী 'গদাধর' দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে, সাধনপথে অগ্রসর হয়ে, সিদ্ধিলাভ করলেন। এখানেই সে সাধন, তাঁর শেষ হল না, একে একে সকল ধর্ম্ম অবলম্বনে অগ্রবর্তী হয়ে প্রমাণ করে দিলেন সব ধর্ম্ম এক, কেবল সাধন পথ আলাদা। বললেন : যত পথ তত মত— লক্ষ্য সব এক। ওটা পাহাড়ের চূড়— ওঠার সিঁড়িটা শুধু আলাদা। গোঁড়া সম্প্রদায় ও সংস্কারপন্থীর দল উপহাস করলেন তাঁকে। বললেন, উন্মাদ ও নিরক্ষর।

ঠিক সেই সময়ে খ্রীষ্টান পাদরীদের কাছে পরাভূত হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দুশাস্ত্রের বেদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি সংসার, বিষয়, ত্যাগ করে বেদ ও উপনিষদ নিয়ে চলে গেলেন হিমালয়ের সিংগ্রী পাহাড়ে।

উন্মাদ ও নিরক্ষর 'গদাধর' পরিচিতি লাভ করেছেন 'তখন' পরমহংস নামে। সাড়া জেগেছে, গোঁড়া হিন্দু সমাজে। এগিয়ে এলেন ব্রাহ্ম উপাসক কেশবচন্দ্র সেন। নিরাশ্বরবাদী তিনি পরমহংসের সাহচার্য্যে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। সাড়া পড়ে গেল শিক্ষিত সমাজে। সকলের দৃষ্টি তখন দক্ষিনেশ্বরে। লোকসমাদর বেড়েছে, যাতায়াত করছেন উত্তর কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহলে। মার নির্দিষ্ট মানুষটিকে খুঁজে পেলেন শিমলাপাড়ায় নাম তার নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ডেকে নিলেন 'নরেন'কে নিজের কাছে। গুরু দেহত্যাগ করলেন। ঠাকুরের 'নরেন' ঘুরে বেড়ালেন সারা ভারত পদব্রজে। শিষ্য করলেন রাজারাজড়াদের। তিনি তাঁদের কাছে রাজোদ্রোহের ডাক দিলেন — পরিবর্তে প্রেরিত হলেন আমেরিকার ধর্ম্মমহাসভায় — হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিরূপে। জগত-সমাজে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বেদ'। প্রচার করলেন বেদান্তিক মতবাদ — বেদান্তধর্ম্ম। বিশ্বকে শোনালেন নূতনবাণী 'সব ধর্ম্মই এক' — বিভেদ শুধু মত ও পথ — গুরুর সেই বাণী। কেউ ছোট, কেউ বড় নয়।

আকৃষ্ট হলেন আমেরিকাবাসী, খোদ ইংলণ্ডেও পড়লো ডাক। সেখানের শিক্ষিত সমাজে এলো আলোড়ন — জয় করলেন তিনি পাশ্চাত্য ও আমেরিকার হৃদয়। প্রতিষ্ঠা করলেন জনসমাজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে।

ফিরলেন স্বদেশে। পরাধীন ও পদানত তাঁর জন্মভূমি। সর্ব্বত্রই দলাদলি ও কুসংস্কার, জাতপাত আর হাঁড়ির লড়াই। পা দিয়ে বুঝলেন : এদেশে ধর্ম্মের প্রয়োজন নেই, বেদান্ত এদেশের মর্ম্মবাণী। প্রয়োজন সে চেতনার উদ্বোধন। ডাক দিলেন : তোমরা জাগো, তোমাদের স্বাধীন সত্ত্বাকে জাগ্রত করো। বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা করো— অতীতকে। ছিন্নকর পরাধীনতার শৃঙ্খল। প্রতিষ্ঠা কর জাতি ও ধর্ম্মের অভেদ্য সূত্র জাতীয়বাদকে।

সে ডাকে জাগলো 'চেতনা'। যদিও তারা ঘুম ঘোরে তখনও আচ্ছন্ন। অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন তিনি। কাতরকণ্ঠে জগদম্বার কাছে নিবেদন করলেন — মা, ওদের নিদ্রাভঙ্গ করো মা! তারা যে জেগেও জাগছে না। উদ্বিগ্ন বিবেকানন্দ। যে শক্তি তিনি লাভ করেছেন শ্রীগুরুর কাছ থেকে, সেশক্তি অর্পণ করবেন কাকে? শেষে স্থির করলেন : সে শক্তি তিনি ভাগ করে দিয়ে যাবেন শিষ্যা মিসেস ওলিবুল ও নিবেদিতাকে। আমেরিকায় যে শক্তিরস্ফুরণ, সেই শক্তি অর্পণ করলেন সুদূর সেই আমেরিকায় দুই প্রিয় শিষ্যার মধ্যে। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজের ভার দিলেন নিবেদিতার ওপর। আর তা সংরক্ষণের ভার অর্পণ করলেন মিসেস বুলের উপর। যখন তিনি ব্যাপৃত দ্বিতীয়বার আমেরিকার সফরে।

ভারতে ফিরে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিবেদিতা ফিরলেন ১৯০২ সালের জানুয়ারী। নিবেদিতা তখন নূতন উদ্যমে নিয়ে ফিরেছেন, গুরু-ইচ্ছাতেই করবেন জীবনপাত। ভারতের স্বাধীনতাই তাঁর মূলমন্ত্র। তিনি তাকে সংযত হতে নির্দেশ দিলেন। দেশ এখনও জাগেনি। সে কাজই হবে তাঁর জীবনের ব্রত। বিদ্রোহী নিবেদিতা এ বাণীকে তাঁর শারিরীক অসুস্থতার লক্ষণ ভাবলেন। হল যবনিকাপাত। স্বামিজী দেহত্যাগ করলেন। শোকে মুহ্যমান নিবেদিতা সম্বিত ফিরে পেলেন কিছুদিনের মধ্যে। বুঝলেন, স্বামিজীর নির্দেশ অনুসরণই হবে সেই পথ। জনজাগরণের পথই হবে তাঁর লক্ষ্য।

জাতীয় জীবনের ভিত প্রতিষ্ঠাই হবে তাঁর কর্ম্ম। সহযোগী পেলেন অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের।

এসেছে সেই জাগরণের দিন। ইংরাজরা স্বকীয় শোষণ-স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দ্বিখণ্ডিত করতে চাইলো বঙ্গদেশ। একদিন, সেদেশীয় শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার উদ্দেশ্যেই চালু করে ছিল—

শিক্ষাব্যবস্থা। আর সে শিক্ষার প্রভাবে বাঙালীরাই হল অগ্রগামী। হল ডাক্তার, হল আইনব্যবসায়ী, সামাজিক পেশার সহকারী, হল জজ, ম্যাজিস্ট্রেট। ছিল "পেশার" শিক্ষা কিন্তু বিদেশী শিক্ষার আলোক প্রভাব পড়লো মনে, হল চিন্তার বিস্ফোরণ। বিচার করতে শিখলো 'ন্যায়-অন্যায়'। অনুভব করতে শিখলো 'স্বাধীনতা ও পরাধীনতার জ্বালা' প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল : ব্যক্তিত্বের। দৃষ্টি হল মুক্ত। ভালমন্দের বিচারবোধ থাকলেও, এতদিন তা ছিল সংস্কারবদ্ধ। শিক্ষার আলোকে তা হল স্বচ্ছ, শিখলো 'বিশ্লেষণ'। শিখলো 'প্রতিবাদের ভাষা'।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মানুষ হল দলবদ্ধ। প্রতিবাদের ভাষা হল স্পষ্টতর। জাতিগত বিভেদ ভুলে 'জাতীয়তার' ভিত হল প্রতিষ্ঠিত। জনমনে এলো জাতিসত্তার প্রভাব। সুরু হল সাংস্কৃতিক আন্দোলন, এক জাতি, এক প্রাণ — এক হউক সব।

আবেদন, নিবেদন, সভা, সমিতি, প্রতিবাদ সব ব্যর্থ। আজ জাতি-বিবেক জাগ্রত, একত্ববোধে সবাই তারা আপন — সবাই তারা এক। আর প্রতিবাদ নয় — নবজাগ্রত শক্তি — 'প্রতিরোধ'! 'স্বদেশী ও বয়কট' হল সে মন্ত্র।

ক্ষুব্ধ দেশবাসীকে পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন অরবিন্দ। সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, সহযাত্রী নিবেদিতা। যদিও তিনি তখন 'ব্রেনফিভারে শয্যাশায়ী'। স্থির হল বৃটিশ জাতিকে, 'ভাতে না মারলে তাদের সম্বিৎ জাগরিত হবে না'। 'বয়কট'ই হোক, প্রধান অস্ত্র। সেই সঙ্গে নিজেদের স্বাবলম্বী গড়ে তোলার পথ হোক 'স্বদেশী'। সে পথ বাৎলালেন বিপিনচন্দ্র পাল। অরবিন্দ অনুমোদন করলেন সে 'বয়কট'। বিদেশের তৈরী— সে বিলেত বা অন্য দেশেরই হোক, তা বর্জন কর সব। নিজেদের স্বাবলম্বী করার জন্য গড়ে তোল কলকারখানা — ব্যবহার করো সেসব পণ্য, ভালমন্দ কোন বাদবিচার নয়। আওয়াজ তুললেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে-রে ভাই'। বঙ্গ ভঙ্গের দিনটিকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভঙ্গের দিন হিসাবে গণ্য করা হোল।

ইতিপূর্বে পাঞ্জাব সরকার ভূমি রাজস্বকর বৃদ্ধি করেছিলেন। জলকর বাড়িয়ে করলেন দ্বিগুণ। সেটা ছিল সাধারণ লোকের কণ্ঠপেষণ করে রসনিষ্কাষণের ব্যবস্থা। বিক্ষোভে ফেটে পড়লো পাঞ্জাব। সুরু হল আন্দোলন। এই বিক্ষোভ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করলেন লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সফল হলেন তাঁরা। বুদ্ধিমান সরকার পরিচালকের কিছু কিছু লোক, উপলব্ধি করলেন, এই জলকর বৃদ্ধিটা অসমীচীন, তা বরবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু প্রেষ্টিজের ঠাট বজায় রাখার উদ্দেশ্যে লাজপত রায়ও অজিত সিংকে নির্ব্বাসনে পাঠানো হল দাঙ্গার সঙ্গে যোগসাজসের ছুতো করে। তিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে 'জাতীয়—চরিত্র দিতে সচেষ্ট হলেন। মহারাষ্ট্রের নেতা তিলক অভ্রান্ত দৃষ্টিতে অনুধাবন করলেন বাংলার আন্দোলন, জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্র বিস্তারে নূতন অধ্যায় খুলে দিতে পারে। বুঝলেনঃ পার্টিশন কেবল বাংলার কাছে চ্যালেঞ্জ নয়, অবশিষ্ট ভারতের কাছেও চ্যালেঞ্জ, অবশিষ্ট ভারত এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে, ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর মৃত্যুঘণ্টা বাজবে। বাংলার এই অসন্তোষের মধ্যে তিনি নবতর রাজনৈতিক সংঘাতের লক্ষণ দেখতে পেলেন। মহারাষ্ট্রে তিনিই শিবাজী ও শিবাজী উৎসবের স্রষ্টা। উপলক্ষ্য : জাতিতত্ত্বে দেশকে সচেতন করা। কলকাতাতেও শিবাজী ও শিবাজী উৎসব উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হল। তিলকও উৎসবে যোগ দিলেন। তাঁদের বিপুল সংবর্ধনায় এগিয়ে এলেন অনুশীলন সমিতি, ভবানীপুর সন্তান সম্প্রদায়, বন্দেমাতরম সম্প্রদায়, জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়। অ্যান্টি পার্টিশন পার্টি সামরিক প্রথায় তাঁদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করলো। বিভিন্ন বক্তা শিবাজীর অসম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মুসলমানদের আপত্তি দূর করার চেষ্টায় এই উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মিলন উৎসব পালিত হল।

লর্ড কার্জ্জন চাইছিলেন তাঁর শাসনকালের মধ্যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করবেন। বাংলার নবজাতীয় চেতনা, ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিদ দৃঢ়তর হবে। সে উদ্দেশ্যেই জনগণের আবেদন, নিবেদন, অনুনয়, বিনয় প্রত্যাখ্যান করে ২০শে জুলাই ১৯০৫ 'বঙ্গভঙ্গের'র ঘোষণা করলেন।

পাথুরিয়া ঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে বিক্ষোভ প্রতিবাদের আয়োজন হল। সিদ্ধান্তে অটল রইলেন কার্জ্জন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের প্রাসাদে প্রতিদিন প্রতিবাদ সভার আয়োজন চলতে লাগলো। অসন্তোষের আগুণ ধিক ধিক করে জ্বলছিল এতদিন — তা প্রকাশ্যে আন্দোলনে পরিণত হল। মধ্যপন্থী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বুঝলেন : প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া, অন্যকোন পথ খোলা নেই। ৭ই আগস্ট টাউন হলে সে প্রতিবাদ সভার দিন স্থির হল।

ইতিমধ্যে নিবেদিতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর দলভুক্ত ও বিশেষ অনুগত মিঃ জি এন মুখার্জীকে পাঠালেন আমেরিকায়। ৩রা আগস্ট ১৯০৫ মিসেস বুলকে পত্র লিখলেন: ... যদি জি এন মুখার্জী এখনো 'বস্টনে' থাকে ও যদি ইহুদীদের বিশ্বসংগঠন সম্বন্ধে (ইহুদীদের বিশ্বব্যাপক ধনতন্ত্রী সংগঠনের বিষয়ে) তাঁর বিমূঢ় প্রশ্ন, ওঁদের সামনে উপস্থিত করতে বল, তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হবো। মডেরা ওঁকে নিউ ইয়র্কে সিস্কোভিচদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতেও পারেন। ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার এই যে সংখ্যাটি পাঠিয়েছে, তাতে মঁসিয়ে সিস্কোভিচদের 'রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি আমাদের সকলকে এমনই মোহিত করেছে যে বলে বোঝানো যাবে না। খোঁকা (ডাঃ বসু) এটিকে বিশেষভাবে পছন্দ করেছে। আমার ধারণা জি এন মুখার্জী তার আদর্শ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, ঠিক নয় কি? অবশ্য আমি সঠিকভাবে তা বলতে পারবো না। সে অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ কিনা। যদি তাই হয়, তাহলে অধিকতর মনন ক্ষমতা বিস্তারের দিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কিনা বিবেচ্য। শেষোক্ত বিষয়ে আমি গোড়া থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি স্বতঃই চেয়েছিলাম তার মত কেউ 'ভাবটাকে' আয়ত্ব করুক। এক্ষেত্রে তার ক্ষমতা বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হতে পারে। আর তা যদি ভুল হয়ে থাকে, তাকে যা বলেছিলাম, ফেরবার পথে ইউরোপে কিছু সময় কাটিয়ে ক্রপ্টকিন ও হাইডম্যানের কাছে শিক্ষা নিতে — মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য সেক্ষেত্রে তার পক্ষে উত্তম হবে শিল্পবাণিজ্য ও তার বিজ্ঞান, তৎসহ বিশেষ বিষয়টি সে অনুশীলন করছে, যদি সেই বিশেষ বিষয়টি অনুল্লিখিত থাকলো, এদের সকলের বিষয়ে মনসংযোগ করা এবং জাপান ও চীন ঘুরে আসা। আমি তাকে জাতীয় ভাবের প্রতিনিধি করে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম — চেয়েছিলাম, তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সে সম্পন্ন হয়ে উঠুক। মতলব করে এটা করেছি — তা অবশ্য নয়। আমার মনে হয়, মঁসিয়ে সিস্কোভিচের মত দু'একজন রুশ রিফিউজি অর্থাৎ জারতন্ত্রের হাত এড়িয়ে অন্যদেশে পলাতক রাজনৈতিক কর্মী — তাকে খুব সাহায্য করতে পারবেন। কোন অবস্থায় শক্তির বিস্ফোরণ প্রয়োজন আর কোন অবস্থায় অন্য উপায়ের দ্বারা অধিতর ফল লাভ সম্ভব — সেই উভয় পরিস্থিতির পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া। যেকোন ক্ষেত্রেই হোক মুখার্জী জাপান চরিত্রের 'ইনসিনসিয়ারিটির কথা জানে। সেটা বড় রক্ষা কবচ।

৭ই আগস্ট ১৯০৫, টাউন হলে সভার অধিবেশন হল। অনেকেই বক্তৃতা দিলেন। সভায় 'বয়কট' বা বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। বর্জ্জনের সঙ্গে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের প্রশ্ন জড়িত, সুতরাং একই সঙ্গে 'বয়কট' ও স্বদেশী আন্দোলন এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

১৩ই আগস্ট ১৯০৫, 'মারাঠা' পত্রিকায় টাউন হলের প্রতিবাদ সভার সংবাদ পরিবেশিত হল। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হল 'বয়কট' প্রস্তাবের ব্যবহারিক ও ঔচিত্য নিয়ে। প্রশ্ন করা হল নিয়মতন্ত্রের পথে তার সফলতা লাভ, কতখানি সম্ভব?

চীন আমেরিকার পণ্যকে, আমেরিকা বৃটিশ পণ্যকে বয়কট করেছে। বয়কটের দ্বারা ইউরোপকে শায়েস্তা করা সম্ভব। ভারত থেকে প্রবাহিত অর্থস্রোত বন্ধ হলেই বৃটিশের সম্বিৎ ফিরবে।

২০শে আগস্ট ১৯০৫ মারাঠার কেশরী বিশ্লেষণ করলো : শাসকরা কেন বাংলাকে পার্টিশন করতে চান। (১) কলকাতার রাজনৈতিক প্রাধান্য দূর করা (২) বাঙালী জাতির মারাত্মক ঐক্য নাশ (৩) হিন্দু-মুসলমানে ভেদ আনা (৪) হাইকোর্টের মর্য্যাদা সঙ্কুচিত করা (৫) শিক্ষা সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে বাংলার প্রতি সারা ভারতের সহানুভূতি। সেই সঙ্গে প্রশ্ন করলো : 'বয়কট' কি সারা ভারতে ছড়াবে? স্মরণ করিয়ে দিল, গোটা ভারতবর্ষকে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত করেছিল পূর্বের সিপাহী যুদ্ধ — তার সূত্রপাত বাংলা থেকেই।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে গেলেন মিঃ গোখলে, বাংলা ও ভারতের অবস্থা সেখানে তুলে ধরার জন্য। নিবেদিতা চাইলেন, তাঁর সামাজিক দৃষ্টিপ্রসারের। ইংলণ্ডের পজিটিভিস্টদের সঙ্গে পরিচিত হোন। সেই উদ্দেশ্যে পজিটিভিস্ট দলের মিসেস হেষ্টিকে লিখলেন ২রা সেপ্টেম্বর ১৯০৫ ঃ মিঃ গোখলে ইংলণ্ডে গেছেন কয়েক সপ্তাহ। আমার খুব ইচ্ছা তিনি সকল পজিটিভিষ্টের সঙ্গে বিশেষতঃ আপনার বন্ধু মিঃ উইলসনের সঙ্গে মিলিত হোন।

নিবেদিতা আরও চাইলেন মিঃ গোখলে, উইলিয়াম স্টেডের সঙ্গে কথা বলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ভিতরের কথা জেনে নিন। সেইলোক তিনি, যাঁকে বিশ্বাস করে সব কথা বলা যায়। মিঃ স্টেডের কাছে কার্জ্জনের আসল কার্য্যবলী সব খুলে বলুন অর্থাৎ বাংলার 'বয়কট' ও স্বদেশী আন্দোলনের ধারা যেন তাঁকে অবহিত করেন। এই উদ্দেশ্যে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫ তাঁকে চিঠি দিলেন, আশা করি ইংলণ্ডে থাকাকালে তুমি কতকগুলি ঋষিতুল্য ও সুমার্জ্জিত চরিত্রের মানুষের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে না। আমার স্বদেশীয়রা ঠিক যা, তাদের সেইভাবে বিচার করার সুযোগ গ্রহণ করবে। তারা প্রায়শঃ রক্তপিপাসু, অনুচিত যুদ্ধকারণে, অধঃপতিত এবং যে বস্তু এতদিন ইংরাজি শব্দকে গৌরবান্বিত করেছে, তাদের দ্রুত বর্জ্জনকারী।

হয়ত, ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে মিঃ গোখলে চতুর ইংরাজ রাজনৈতিকদের প্রভাবে পার্টিশন সম্বন্ধে মনোভাব তাঁর দ্বিধান্বিত হতে পারে— তার মনে এ আশঙ্কা থাকায় একই চিঠিতে বেনারস কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন: আমি বিশেষভাবে চাই, তুমি মিঃ স্টেডের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে এবং লর্ড কার্জ্জনের সম্বন্ধে তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বস্তু দিয়ে তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবে। মিঃ স্টেডের কাছে তোমার কোন মনোভাবই গোপন করার প্রয়োজন নেই। তবে কোনটি ব্যক্তিগতভাবে কথিত সংবাদ (অর্থাৎ প্রকাশযোগ্য বা কারো নামে প্রকাশযোগ্য নয়) তা পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া ভাল।

তুমি কংগ্রেস সভাপতির পদগ্রহণ করেছ জেনে বাস্তবিক আনন্দিত। মনে হয় এই বৎসর থেকে সংগঠননীতির নূতন সম্ভাবনার রূপ গ্রহণ করবে। ধরা যাক, ভারতের সকল গ্রাজুয়েটকে একটি ইউনিয়নের অর্ন্তভুক্ত করা হল, কিংবা সকল হিন্দু ও মুসলমান কেরাণীকে নিয়ে একটু কাজ করা হল। শেষোক্ত সংগঠনের সামনে মালিকদের কোন সংগঠন দাঁড়াতে পারবে না। শুনেছ কি এখানকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'বার্ণ অ্যাণ্ড কোম্পানী'র ৩০০ জন কেরাণী কিভাবে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে?

আমাদের মত পর্য্যবেক্ষকদের কাছে সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা হল স্বদেশী ভ্রাতৃগণের প্রতি ভারতীয় জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য, যারা এই ধরণের ব্যাপারে এতাবৎ সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞতাহীন। শোনা গেছে, এমন কি মাদ্রাজেও এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানটি কেরাণী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। উত্থানে বা পতনে তারা ঐক্যবদ্ধ। এরই নাম সত্যকার একতা।

'বয়কট' এমনকি নারী, পুরোহিতদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে, আত্মত্যাগের পরিমাণ সত্যই অসাধারণ। অজানা মানুষ সব সামাজিক চেতনার প্রবল প্রভাবের অধীন হয়ে যেসব বিচিত্র অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ করে যাচ্ছে, আমার সর্ব্বাদাই মনে হয়, তার দ্বারাই কোন নীতির শক্তিসম্ভাবনার যথার্থ পরিমাণ করা সম্ভবপর। রাশিয়ার মানুষদের মধ্যে প্রকাশিত এই শক্তির প্রকাশেই নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযানকে বিপর্য্যস্ত করেছিল। ফরাসীদের মধ্যে এই শক্তির প্রকাশেই নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল। এর দ্বারাই স্বাধীনতা পেয়েছিল আমেরিকা ইত্যাদি। কয়েকমাস আগেও এই শক্তি আমাদের মধ্যে ছিল না, আর আজ সর্ব্বদিকেই তা প্রকাশিত। এখানেই আশার ভিত্তি, যা অন্য সকল কিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় খরিদ্দার বিদেশী দ্রব্য কিনতে চাইলেও ছোট ছোট দোকানদার পর্য্যন্ত আপত্তি জানাচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম— পূর্ব প্রদত্ত শিক্ষাগুলি বধির কর্ণে পড়ছিল। এখন দেখছি — সে সকলই উঠে আসছে। দেখছি তারা মরে নি, কেবল সুপ্ত ছিল। অভ্যস্ত অপমানগুলিকে নূতন চোখে দেখা হচ্ছে তার চেহারা দেখে অবাক হবে যাবে।

মিঃ স্টেডকে লিখলেন : প্রিয় মিঃ স্টেড। মনে হয় আপনি আমার বন্ধু মিঃ গোখলের বিষয়ে শুনেছেন। তাঁর সম্বন্ধে এই পরিচয়জ্ঞাপক পত্র দিচ্ছি।

মিঃ গোখলে কংগ্রেসের ভাবী নেতা। তিনি ভাইসরয় কাউন্সিলের অগ্রণী ভারতীয় সদস্য। তিনটি শীতকালীন অধিবেশন জুড়ে তিনি লর্ড কার্জ্জনের সঙ্গে শিক্ষা প্রশ্নে মুখোমুখি লড়াই করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপর্য্যায়ের শিক্ষায় মিঃ গোখলের ব্যক্তিগতকৃতিত্ব এমনই যে, শিক্ষাব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে আছেন। তাছাড়াও, তিনি এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ভারতের মতামত প্রতিধ্বনিত করেছেন। গতকাল পত্রটি আরম্ভ করেছিলাম, তা আজ আবার শুরু করেছি তাই গতকাল সিমলায় প্রদত্ত লর্ড কার্জ্জনের পুরো বক্তৃতাটি এর সঙ্গে দিয়ে দিতে পারলাম। এই বক্তৃতায় ছড়ানো মিথ্যার জালকে উদ্ঘাটিত করার পক্ষে মিঃ গোখলের তুল্য যোগ্যতা সম্পন্ন আর কেউ নেই। আর বেশী বলার দরকার নেই। আমি অবশ্যই আশা করি আপনারা পরস্পরকে পছন্দ করবেন। কেননা আমার একান্ত ইচ্ছা — আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে সর্ব্বাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপন করবেন।

চিরতরে আপনার, হে প্রিয় মিঃ স্টেড,

ইতি — রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

একটা গুজব রটেছে, সরকারী লোকেরা বলছেন, তুমি নাকি পার্টিশনের পক্ষে মত দিয়েছে। আমি অবশ্য জানি কথাটা সত্য নয়। অথচ, কথাগুলিকে মানসিক ক্ষতসৃষ্টির কাজে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা, তোমার স্বাক্ষাৎ ওসব সরাসরি অস্বীকার করাই হবে প্রতিকারের পথ। আচ্ছা এমন হয়েছে কি যে, কাউন্সিলের কোন ইউরোপীয় সদস্য তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, আর তুমি পরীক্ষামূলক এমন কোন প্রস্তাব করেছিলে, যার থেকে উক্ত ভ্রান্ত প্রচারের উদ্ভব হতে পারে? যদি তেমন কিছু তুমি করেও থাকো, স্পষ্ট করে লিখে জানাতে পার — জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত হওয়া উচিত।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ মিস ম্যাকলাউড্‌কে লিখলেন : য়ুম, আমি দুঃখিত যে, অ্যালবার্টাকে চিঠির উত্তর লিখে উঠতে পারলাম না। আমাদের সেরা একটি মানুষ এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে জাতীয়তার কথা বলতে অনেক সময় গেল। তুমি খুব খুশী হবে যদি শোন কিভাবে সমগ্রজাতি জাতীয়তাকে বরণ করে নিয়েছে।

চিঠি উত্তর এলো মিঃ গোখলের কাছ থেকে : তাঁর মত বিকৃত করে উপস্থিত করা হয়েছে।

এ পাশে আন্দোলন ব্যাপ্ত হতে লাগলো। ১লা সেপ্টেম্বর সরকারী ঘোষণা হল। প্রতিবাদে পরদিন সর্বত্র শোকসভা পালিত হল। ২২শে সেপ্টেম্বর পুনরায় প্রতিবাদ সভা হল। সরকার সারকুলার জারী করলেন : 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি ব্যবহার নিষিদ্ধ। আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি হল। চারিদিকে উদ্দীপনার বিস্ফোরণ। ছাত্রদের মধ্যে গভীর উত্তেজনা। ১৬ই অক্টোবর পালিত হল 'রাখী বন্ধন' উৎসব। পালন করা হল 'অরন্ধন'। শহরের সর্বত্র দোকান, বাজার বন্ধ হল। এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। এই উপলক্ষে রচনা করলেন।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান।

এই একই তারিখে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপত্তন করলেন আনন্দ মোহন বসু। তিনি অসুখে শয্যাশায়ী। তাঁকে স্টেচারে বহন করে নিয়ে এসে ভিত্তিপত্তন করা হল।

বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হল 'সে গানে'। বহুদিনের জড়তা ও ঔদাসীন্য বিদূরীত, প্রাণের বন্যায়। জাগরণ, জীবনের— মহাতরঙ্গের। ডন, নিউ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কাগজে এতদিন জাতীয়তার সুর ঝংকৃত হচ্ছিল— এখন সন্ধ্যা, যুগান্তর ও বন্দেমাতরমে রাজনৈতিক মতবাদ ও বিপ্লববাদের নিনাদ ধ্বনিত হল। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বিপ্লব বহ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল, অনুকূল বাতাসে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

নিবেদিতা ১৩ই মার্চ ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে প্রায় একমাস শয্যাশায়ী ছিলেন। সেবাশুশ্রুষার ব্যবস্থায় নার্স রাখা হয়েছিল। এই কঠিন পীড়ায় স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে গেল। কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পরে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কৃষ্টিনের সঙ্গে দাৰ্জ্জিলিঙ-এ গেলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন বসু দম্পতি। ৩রা জুলাই ফিরে এলেন কলকাতায়। ডন সোসাইটির ছাত্র ও অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে তিনি স্বদেশমন্ত্র প্রচার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দিনের পর দিন। চরমপন্থী নেতৃবর্গের সঙ্গে উগ্র রাজনৈতিক আলোচনা ও পরামর্শ দিয়ে চলেছিলেন। চরমপন্থী নেতা বিপিন পালের নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রধান লেখিকা আবার মধ্যপন্থী ও নরমপন্থী নেতা রমেশচন্দ্র দত্ত ও গোখলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরামর্শদাতা। রমেশচন্দ্র দত্ত বর্তমানে বরদা স্টেটের অর্থসচিব। যদিও এঁদের আদর্শ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন তবুও এঁদের কাজকে তিনি অনুমোদন করে চলেছেন কারণ এঁরা বিভিন্ন পথের যাত্রী হলেও প্রত্যেকেই আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক। দেশকে গড়ে তোলার জন্য এঁদের প্রত্যেকের আত্মত্যাগকে যেমন স্বীকৃতি দিতে হবে, তেমনি তাঁদের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে হবে— প্রত্যেকেই যে দেশকৰ্ম্মী। রমেশচন্দ্র তখন কৃষকগণের কর লাঘব করছেন, ধনী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বিভিন্ন মিল ও শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরী করাচ্ছেন— লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন দ্বারা শাসন সংস্কার পরিচালনা করে চলেছেন। তাঁর কর্মপদ্ধতি সবিস্তারে লিখে পাঠাচ্ছেন। উত্তরে, এদের কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন। মিঃ গোখলেকে জাতীয়তা সম্প্রসারণের উপায় সম্বন্ধে আদেশ দিচ্ছেন, আলোচনা করছেন, তাঁর ১৭নং বোসপাড়ার বাড়িতে বসে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতে তিনি চরমপন্থী, তবুও চেষ্টা করে চলেছেন উগ্রপন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে সংগঠনমূলক কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুক। কংগ্রেসও সে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল দীর্ঘ দিন ধরে। দেশের স্বাধীনতার চিন্তা যেখানে, সেখানেই তাঁর অবারিত সমর্থন ও সাহায্যদান ছিল, জীবনের ব্রত। স্বামিজীর ইচ্ছাও ছিল তাই। তিনি চাইছিলেন চিন্তাধারা ও কাজের সামঞ্জস্য। সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সবেতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরাভ্যুদয়। স্বামিজীর হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত প্রচার যেন ব্যর্থ না হয়। বিদেশীর অনুকরণ নয়, ব্যবহারে খাঁটি ভারতীয় হওয়া

চাই। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনর্জাগরণ তাঁর কাম্য। ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে 'এগ্রেসিভ হিন্দুয়িজিম সম্বন্ধে' তিনটি প্রবন্ধ রচনা করলেন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক মিঃ নটেশন তা পুস্তকারে প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্মকে সক্রিয় ও সম্প্রাসরণের ইচ্ছা স্বামিজীর কাশ্মীরে প্রকাশ করেছিলেন। তা যেন বলবৎ থাকে, এই প্রবন্ধের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের সার্ব্বভৌম প্রদর্শন করে, দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, হিন্দুধর্ম অপর সভ্যতাকে আত্মসাৎ করার শক্তি রাখে। ভবিষ্যৎবাণী করলেন দৃঢ়তার সঙ্গে : বিপ্লব ও বিবর্ত্তনজনিত ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে, বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে জাতীয় মনের পরিচয় ঘটে উঠেনি ও তার স্বরূপ ভাষায় রূপায়িত হয়নি। এখন প্রথম পর্বের কাজ শেষ। বর্ত্তমানে ভারতীয় জীবন আর জড়গ্রস্ত নয়, নূতন শক্তির সন্ধান পেয়েছে তারা। বিগতকালের সামগ্রিক জীবনকে বিশ্লেষণ করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে, সেই পটভূমিকায় তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজ তিনি কৃতসঙ্কল্প।

বললেন : হে ভারত সন্তান, তোমরা প্রাচীনের ঐতিহ্যকে পূজা করতে শিক্ষা কর, নীরন্ধ্র আগ্রহে জ্ঞান আহরণ কর, যে চিন্তা ও ভাষা তোমাকে প্রাচীনের সেই গভীরে নিহিত অতুল সম্পদ অধিকার করতে সাহায্য করবে। সে সকল বস্তু তোমার নিকটে আছে, বিদেশীর কাছে নয়। এই প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসা ও সত্য উদ্ঘাটনের উপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ। সে মতকেই কেন্দ্র করে চলাই উৎসাহ উদ্দীপনা হবে তোমার পাথেয়। অফুরন্ত সেই শক্তি তোমার নৈরাশ্যতাকে প্রতিহত করতে পারবে। ভারতীয় ভাষাতেই আজ বৃহৎ সাহিত্য রচনা করতে হবে। এই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীনকে করতে হবে মুখর, বর্ত্তমানকে দিতে হবে রূপ। উভয়ের এই সমন্বয়ে ফুটে উঠবে ভারতের অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য।

জগতের সামনে ভারতকে পরিচিত করা শুধু নয়, তার মর্মবাণী জগতবাসীর যাতে হৃদয়ঙ্গম হয়— সেটাই হবে প্রকৃত সাধনা। বর্ত্তমানে সেটাই হবে কর্ত্তব্য। জাতীর সামনে আজ আত্মপ্রকাশ করেছে এক বিরাট সংগ্রাম— যা জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে সংগ্রামশীল (Aggressive Hinduism)

এই সময়েই স্বামিজীর জীবনী লেখার সঙ্কল্প জাগলো তাঁর মনে। মনে জাগলো দৃঢ়বিশ্বাস স্বামিজীর জীবনী ও চিন্তাধারার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। ৩রা জুলাই ১৯০৫, সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। জগদীশচন্দ্রের 'Plant Response' বইটির লেখাকাজ চলছিল তখন। বিশ্রামের অবকাশ নেই। ২২শে জুলাই বঙ্গ বিভাগ ঘোষিত হল। ৭ই আগস্ট টাউন হলে প্রতিবাদ সভা হল। তাঁর পক্ষে নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব নয়। ডায়েরীতে লিখলেন : Partition of Bengal meeting. The black shadow. বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভা। কাল ছায়া। সভায় যোগ দিলেন। দেশের নেতারাই বক্তৃতা দিলেন শুধু। এটা তাঁর কাজ নয়, স্বামিজীর অভিপ্রেত ইচ্ছাও তাই। নীরবে কাজ করে যাওয়াই হবে তাঁর নীতি।

ঘোষিত পার্টিশনের দিন ১৬ই অক্টোবর। ১৫ই অক্টোবর ১৯০৫ মিঃ কেশরী মারাঠা পত্রিকায় লিখলেন: ঐ দিনটিকেই 'জাতীয় দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাই। একটি সর্ব্বভারতীয় দিবসের প্রয়োজন ছিল, কার্জ্জন সেটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই দিনটি 'ভারত দিবস' হয়ে দাঁড়াবে, ব্যাপারটা শুধু বাংলার নয়। জাতীয়তত্ত্ব ও জাতীয়দিবস ব্যাখ্যার পর বললেন : জাতির ঘুমন্ত ঐক্যবোধ এখন আবার জাগরণমুখী। ২২শে অক্টোবর ফেডারেশন হল ভিত্তি স্থাপনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কেশরী পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হল : আমরাও 'বয়কট' কাকে বলে জানি। ইংলণ্ড কিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পসমৃদ্ধ ভারতের বস্ত্র বয়কট করেছিল, স্বদেশী শিল্পের স্বার্থে। বাংলার বয়কটের সাফল্য বিষয়ে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার

স্বীকৃতি উদ্ধৃত করলেন : We do not feel to minimise the reality of the boycott. In magnitude and cohesion it has reached dimension which we had hardly considered possible a few weeks ago. It cannot denied that it affords distinct evidence of some amount of genuine though mistaken feeling.

১৬ই অক্টোবর পরিকল্পনা মত বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেল এবং তা ২৯শে অক্টোবর আইনে পরিণত হল। ১৬ই অখণ্ড বাংলার নিদর্শন স্বরূপ কিছু সংগঠনমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মিলনমন্দির (Federation Hall) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবের প্রথম সমর্থক হলেন নিবেদিতা ও তারকনাথ পালিত। এই মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হল। অসুস্থ অবস্থায় বাহিত হয়ে সভাপতিত্ব করলেন আনন্দমোহন বসু ও তার ভিদ ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। অবশ্য এ উৎসবে নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারলেন না। কারণ তিনি পূজার ছুটিতে ৩রা অক্টোবর দার্জ্জিলিং চলে গিয়েছিলেন। ডায়েরীতে অবশ্য লিখে রাখলেন— All India Day meeting. প্রতিটি বছর কিন্তু এদিনটি তিনি আজীবন পালন করে চলেছেন।

'বঙ্গ' বিভাগ আইনে পরিণত হওয়ার আগে এবং পরে ছাত্রদের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে ও ফীল্ড অব একাডেমীতে, যেসব সভা হল, তাতে তিনি বক্তৃতা দিলেন, পরপর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ডন সোসাইটিতে 'ভারতীয় আদর্শ', ২৩শে ফেব্রুয়ারী আর্টস্কুলে 'ললিতকলা', ১৩ই অগস্ট রামমোহন লাইব্রেরীতে 'কি কি পুস্তক পঠনীয় ও কেন', ২০শে অগস্ট পুনরায় 'ডন সোসাইটিতে 'পরিবার না স্বদেশ' সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিলেন। এরপর থেকে প্রতিটি সভায় উপস্থিত হয়ে বিপ্লবাত্মক বক্তৃতার পরিবর্তে, স্বদেশ ও জাতীয়মূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সেইসঙ্গে ধরলেন লেখনী। যা প্রকাশিত হয়ে আন্দোলনের গতিপথ নির্ণয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করে চললো। এ আন্দোলন তো রাজনৈতিক জাগরণ নয়, এর মধ্য দিয়ে ভারতের 'আত্মোপলব্ধির সাধনা' মূর্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। এইসব বক্তব্যে, বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা প্রচারিত হতে লাগলো। দৃঢ়তার সঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাতে লাগলেন— ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা সর্ব্বক্ষেত্রেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে রূপদান কর। স্বদেশী আন্দোলনকে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের আন্দোলন করে তুলে জাতীয় অর্থনীতিতে স্বাবলম্বী হয়ে দেশকে শক্তিশালী গঠন কর। স্বদেশী শিল্প-গঠনে মরণপণ কর। ইণ্ডিয়ান রিভিউতে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের সম্ভাবনার, নিশ্চয়তা সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করে চললেন। বহু ক্ষুদ্র শিল্প গঠনে সাহায্য দানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

নিজে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার ও তা প্রচলনে উদ্যোগী হলেন। দিশী পেয়ালা নিজে ব্যবহার করলেন। অতিথি অভ্যাগতদের সেই পেয়ালায়, আপ্যায়ন করতে শুরু করলেন। ডাঃ শশীভূষণ ঘোষের স্ত্রী নগেন্দ্রবালা উৎসাহিত হয়ে সাবানের কারখানা খুললেন। তিনি ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠদের মধ্যে একজন। তাঁর তৈরী সাবান নিজে ব্যবহার তো করলেনই। স্কুলের মেয়েদেরও ব্যবহার করাতে লাগলেন, প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে তা নিজে বিক্রী করে, স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থকমণ্ডিত করতে এগিয়ে এলেন। স্বদেশী দ্রব্য, যতই তুচ্ছ হোক, তা অমূল্যবস্তু। দেশকে স্বাবলম্বী হতে হলে, প্রতি দেশবাসীর তা গ্রহণ করা 'একান্ত কর্ত্তব্য' প্রচার চালাতে লাগলেন।

এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন : একথা বলা প্রয়োজন যে, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনগণ, সমগ্র জগতের কাছে, সম্মানলাভের পথ পেয়ে গেছে। যেখানে শক্তি, বুদ্ধি ও কাজের

সম্মিলিত প্রয়াস, সেখানেই শ্রদ্ধার উদ্রেক, আমাবস্যার অবসান। স্বদেশী আন্দোলনের মূলকথা : নিজেদের বীর্য্যবান ও স্বাবলম্বী করে তোলা। সেখানে সাহায্য বা সুবিধালাভের কাঁদুনী নেই। নিজের যতটুকু ক্ষমতা, ভারতবর্ষ তা করবে। বর্ত্তমানে যা করা সম্ভব নয়— ভবিষ্যতে তা ভেবে দেখা যাবে।

ব্যবসায়ী মহলের ষড়যন্ত্রে, স্বদেশ ও স্বজাতি সর্ব্বশান্ত হয়েছে, তা যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করা— ভারতীয়গণের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। যদি কেউ বলে — সস্তায় বিদেশী দ্রব্য পাওয়া গেলে, স্বেচ্ছায় বেশী দাম দিয়ে দেশী পণ্য কিনতে কেউ চাইবে না— উত্তরে আমি বলবো— যারা কেবল স্বার্থরক্ষার জন্য দশজনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিখেছে, সেই ইউরোপীয়গণ সম্বন্ধে একথা খাটতে পারে। আর যারা চিরদিন পরার্থে আত্মত্যাগের আদর্শে শিক্ষিত, সেই ভারতীয় জাতির পক্ষে একথা কোনদিন খাটে না।

অগ্রবর্ত্তী প্রতিটি নেতাকে তিনি পরামর্শ দিতে লাগলেন : এটা 'স্বামিজীর নির্দেশ' নেতৃত্বের পরিবর্তে তাঁর কাজ হবে, আরও ব্যাপক। চাই আন্দোলনের সাফল্য। এ বস্তুই তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা। জাতীয় নেতৃবৃন্দ বা শিক্ষিত মহলও সে কথা উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। শুধু কথা নয়, কাজই হোক তাঁদের ব্রত। স্কুলের ছাত্রীগণের মধ্যে 'দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে' স্তব পাঠের সঙ্গে চালু করলেন 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় নারীগণের কাছে বক্তৃতা ও কখনও বা তুলি কালি বুলিয়ে চললেন :

ভারত রমণীর কণ্ঠস্বর আমাদের আহ্বান করছে : যতদিন না আমাদের জীবনের রুদ্ধদ্বার সকল মুক্ত করে আগবাড়িয়ে সাদরে আমাদের মধ্যে 'মুক্তির বার্ত্তা' বহন করছি, এই মাতৃভূমি, বিশ্বের দ্বারে দৃষ্টিহীনা, নিষ্ক্রিয়া, অবগুণ্ঠিতা থাকছেন। সেই মহাদেশ মাতৃকার আলোকোজ্জ্বল রূপ পুণরায় উদ্ভাসিত করতে হলে, তাঁর এই কন্যাগণকে উত্তরকালের ভারত কন্যার মত, তাঁকে কেন্দ্র করে দলে দলে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। যখন এই কন্যাগণ গর্ব্বোন্নত শিরে দেশমাতৃকার চরণ স্পর্শ করে সঙ্কল্প গ্রহণ করবে ও স্বামী পুত্রসহ নিজ জীবন উৎসর্গের ব্রত গ্রহণ করবে, ভারত জননী বিজয় মুকুট ধারণে মানস্রোত শিরে বিশ্বসভায় দণ্ডায়মান হবেন। ছায়াগ্রস্ত এই দেবালয় পুণঃ আলোকে উদ্ভাসিত হবে। আধারের কালিমা বিদূরিত হয়ে প্রভাতের মধুর আলো প্রস্ফুটিত হবে সেইদিন।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে আগুণের মত। সরকারী দমন তীব্র আকার ধারণ করলো। অত্যাচার শুধু অত্যাচার। জোর কদমে এগিয়ে চললো ধরপাকড়। ততই, তীব্র আকারে ছড়িয়ে পড়লো বিপ্লবের আগুণ। পুড়লো কাপড়, পুড়লো বিদেশী অর্থে বিলেতি দ্রব্য। মেয়েরা ভাঙলো সৌখীন সেই কাঁচের চুড়ি। সবার মুখে 'বন্দেমাতরম ধ্বনি'! মৃত্যুভয় জয় করেছে বঙ্গবাসী! ভাবমগ্না নিবেদিতা। এ আগুণ ছড়িয়ে পড়ুক সারা ভারতে। ভবভারতী ভারতবর্ষ মা-মা-মা।

ছাত্ররা আন্দোলনের প্রাণশক্তি। ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা। জয়লাভ করলো 'বয়কট'। সরকার আতঙ্কিত হল। ২০ই অক্টোবর অর্কিমেয়েটিভ্ চীপ সেক্রেটারী আর ডবলিউ কারমাইকেল জারী করলেন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর : ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদান "নিষিদ্ধ" সর্ব্বত্র।

আবেদন নীতি থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অস্ত্র হল 'বয়কট'। এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রূপ দিলেন। বিপিন পাল ও অরবিন্দ। সেইসঙ্গে আহ্বান জানানো হল সরকারের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ। চাকুরীজীবি, চাকরী ছাড়ো, ছাত্র দল স্কুল কলেজের গণ্ডী ছেড়ে, আন্দোলনের সহযাত্রী হও। নিবেদিতা বহুপূর্ব্ব থেকেই এ নীতির অনুসরণকারী। ছাত্রসভায় বহুপূর্ব্ব থেকেই তিনি

ঘোষণা করেছিলেন, 'সরকারী চাকরী ছাড়, ওর মত চরিত্রনাশক বস্তু আর নেই। সে চাকরী সরকারী বা বেসরকারী যে প্রকারের হোক, এ বস্তু চরিত্রনাশক'। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ সেই ডাক দিলেন। সাড়া জাগলো ছাত্র ও যুব সমাজে। আন্দোলনের বাহক ও ধারক তারাই। দিশেহারা সরকার রাষ্ট্রে দমননীতি প্রয়োগ করলেন।

২৪শে অক্টোবর আবদুল রসিদের সভাপতিত্বে কলকাতায় এক মহতী সভার অধিবেশন হল। প্রস্তাব নেওয়া হল 'স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার'। পূর্ব্ববঙ্গেও সেখানকার চীফ সেক্রেটারী পি সি লায়ন একই সারকুলার জারী করলেন। এই সারকুলারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হল। ছাত্র ও শিক্ষকগণ নির্যাতিত হলেন। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হল। তা অগ্রাহ্য করে বরিশাল কনফারেন্স ডাকা হল। পুলিশের হাতে প্রচণ্ড মার খেল কিশোর চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

বয়কটের সাফল্যে আতঙ্কিত হল বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ। এঁদের কিছু অংশ ব্যবসায়িক স্বার্থে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেন। সরকার পিছু হটতে নারাজ। এ পাশে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে বয়কট সাফল্য হল। অত্যাচার কঠিনতম হলেও আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রইল। সরকার লেলিয়ে দিলেন গুর্খা সৈন্য। উৎপীড়িত ও লাঞ্ছনার শিকার বয়কট সমর্থকগণ বিশেষ করে ছাত্র সমাজ। সৈন্যদলের অত্যাচার অন্যত্রও চললো। তবুও আন্দোলনকে দমানো গেল না। সরকার তখন চাইলেন: 'সাম্প্রদায়িক বিভেদ এনে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্ব্বল করে তোলো এবং দ্বিজাতীয় তত্ত্বের উস্কানি দিয়ে শাসনতান্ত্রিক মেশিনারীকে দৃঢ় করে তোলা হল'। পূর্ব্ববঙ্গে ছিল হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের প্রাধান্য। এঁদের মধ্যে হিন্দু জমিদারের সংখ্যা বেশী। প্রজা অধিকাংশই মুসলমান। জমিদাররা প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাতো খাজনা আদায়ের জন্য। হিন্দু বা মুসলমান জমিদারদের স্বরূপ এক। ঢাকার নবাব তখন সলিমুল্লা। কার্জ্জন জয় করলেন তাঁকে। নবগঠিত প্রদেশটির হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্তি দেবেন আশ্বাস দিলেন তাঁদের। অর্থনৈতিক সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৪ লক্ষ টাকা ধার দিলেন অল্প সুদের হারে। সলিমুল্লার সুযোগ এসে গেল। মোল্লাদের ধর্ম্মান্ধতায় উস্কানি দিয়ে, হিংসা বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। অশিক্ষিত, দরিদ্র, কৃষক সম্প্রদায়, সেখানে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই — সকলেই নিপীড়িত। সকল জমিদার, সে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, নির্বিচারে শাসন ও শোষণ করেন তাদের, তথাপি রোষটা চাপানো হল হিন্দুদের উপর। সলিমল্লাও উৎপীড়িত সামন্ত। মোল্লাদের লেলিয়ে দিলেন উগ্র সাম্প্রদায়িক বিষের আগুণ ছড়াতে। দাঙ্গা বেধে গেল কুমিল্লা ও জামালপুরে। হিন্দুরা উৎপীড়িত হল মুসলমানদের হাতে। সরকার, অত্যাচারী গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিলেন, লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর ফুলারের চাল সফল হল। মুসলমানরা সুয়োরাণী, হিন্দুরা দুয়ো। কালছায়া নেমে এল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তার উপর।

বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যে আঘাত করেছিল, সরকার সে আঘাত ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হল সাম্প্রদায়িক আগুনকে জাতিভেদের মানদণ্ড করে। জয় হল কুটবুদ্ধির।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা পর্বে, মিসেস বুলকে ১৭ই অগস্ট ১৯০৫ সালে লিখলেন: এখানকার বিরাট স্বদেশী আন্দোলনের কথা কি তোমাকে বলেছি সেই সঙ্গে বিলেতি দ্রব্য 'বয়কটের' সহসা সঙ্কল্প?

১৩ই সেপ্টেম্বর লিখলেন : এখন সারা ভারত যেন জ্বলে উঠেছে। কার্জ্জনী দুঃস্বপ্নের আকারটা সরে গেছে। তুমি অবশ্যই বয়কটের কথা শুনেছ। কেউ জানে না কোথায় এর সমাপ্তি। কারণ জনগণ নিজেদের শক্তি অনুভব করতে শুরু করেছে। কার্জ্জন বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে দিয়েছে।

অথচ যে দৃশ্য চোখের সামনে অভিনীত দেখলেন, তাতে তিনি আশা-হত হলেন না। আত্মঘাতি এইসব সংঘর্ষকে উপেক্ষা করার জন্য হিন্দুদের আত্মরক্ষার পরামর্শ দিলেন।

৩১শে অক্টোবর ১৯০৫ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : খোকাকে লেখা তোমার চিঠিগুলি দীর্ঘপথে ঘুরেছে এবং সে এখনও তোমার শেষ চিঠি পায়নি। সুতরাং আজ যতখানি পারি, ততখানি সংবাদ তাকে দিয়েছি। আমরা বইখানি প্রায় শেষ করেছি। সে বলছে আগামী বছর, এই সময়ে দু'বছরের জন্য ইংলণ্ড যেতে চাইবে। এবার আমেরিকা যেতে চায়। ফিরবে, জাপান হয়ে যাতে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বুঝে নিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমরা জাপানের জন্য যে পরিচয় পত্র দিতে পারি, তা সে চায় না। তার ধারণা আগামী মে ও অক্টোবরের মধ্যে তার একটা বই লিখবে, ইলেক্‌ট্রো ফিজিওলজি অ্যাণ্ড পল্যান্টের উপর। আকার হবে অনেকটা প্রথম বইয়ের মতই। এ বইটা হয়ে যাবার পরেই, সে যেতে পারবে। এ সব তোমাকে জানাচ্ছি, যাতে করে তুমি তার পরিকল্পনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পার। বেশ বুঝতে পারছি যে, তাকে পাশ্চাত্যে যেতেই হবে, যখন তার বইটি পঠিত হতে আরম্ভ হবে।

১লা নভেম্বর ১৯০৫, মিঃ গোখলেকে লিখলেন : তোমার চিঠি ও কাগজ পেয়ে উৎফুল্ল — 'বিশেষ ধন্যবাদ'। না — তোমার বন্ধুরা একেবারেই প্রভাবিত হয়নি। তাঁরা জানেন যে, এ বিবৃতিটি কুৎসা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং তাঁরা ওটা খণ্ডন করার পূর্ব শর্ত চেয়েছিলেন। তোমার ম্যাঞ্চেষ্টার বক্তৃতাটি নিজস্বভাবে তা কাজ করেছে। শুনছি, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটি 'হিন্দু পেট্রিয়টে'ও বেরিয়েছিল। আমাদের বেশীরভাগই ওটা পড়িনা। কিন্তু স্বার্থসন্ধ লোকেরা গুজব ছড়াতে চাইলে তাকে মারা, কখনও কখনও কঠিন হয়।

১৫ই নভেম্বর ১৯০৫, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : খুবই মনে হচ্ছে, তুমি এই শীতে আমেরিকায় থাকবে। তোমার আশ্রয়ের শান্তি ও মধুরতা আর স্বামিজীর স্মরণ, অনেক কিছুর বিনিময়ে এ জিনিস পেতে আমি ব্যাকুল। তবু একথা বলাও যেন অন্যায় কৃতজ্ঞতা। যখন মনে পড়ে, কি পরম দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে। নিজ জীবনের সামনে, সম্ভ্রমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে আমাকে বিশেষ পর্দ্দাটির সামনে, যার উপর নিজস্ব ঈশ্বর দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। সেই দর্শনকে বাস্তবে, বহিরঙ্গে জীবনদান করার দায়িত্বে, স্বামিজী যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে সর্ব্বাধিক সত্যবোধ হয়: তাঁর নিরন্তর সচেতন করানো আমাদের, যেখানে সেবা করেছি আমরা, সেখানে আসলে আমরা পূজার অধিকার পেয়েছি।

বহু জিনিষ আবিষ্কার করতে পারছি : সর্ব্ব সময় স্বাধীনতার সন্ধান। স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক হলে, মধুরতম সুখের সঙ্গেও মুহূর্ত্ত মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার ক্ষমতা— এই হল সত্যের সেরা প্রকাশ। উত্তম ও অধম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার সামর্থ্য— বরং ক্ষুধার্ত্ত থাকবো— তবু কদাপি অখাদ্য গ্রহণ করবো না— এ জিনিস মুক্তির অধিক নিকটবর্ত্তী, যা আগে এমনভাবে আমার কল্পনায় আসেনি।

আর একটি জিনিষ, সেই অপূর্ব্ব সরলতাই যথার্থ ধীরতার অঙ্গ। দার্জ্জিলিং ত্যাগের কালে আমার টেবিলের উপর থেকে Burn Jones এর আঁকা Holy Grail-এর একটি ছবি আমি নিয়ে আসি। সেই সময়ে আমার মনে হল Holy Grail-এর Angel হতে পারলে কী অপূর্ব্ব না হয়। এক্ষেত্রে যদি কেউ বুঝতে পারে যে, এরকম একটি অখণ্ড পূজাই একজনের সমগ্র কর্ত্তব্য এবং সেইবুঝে সম্পূর্ণ আত্মদান করতে হবে। তারপর দেখলাম— আমাদের প্রত্যেকেরই পূজার Holy Grail আছে, তাকে পাওয়ার পরে থেকে অতন্দ্র নয়নে তার অর্চ্চনাই হয় অখণ্ড কর্ত্তব্য।

মসীময় যখন দিন, ঈশ্বর ঘোষিত হন মানুষের ভালবাসা ও আত্মদানের সামর্থে। তারপর যবনিকা পাত। প্রিয়তমের আবির্ভাবে বাত্ময় কণ্ঠ। সত্য নয় কি?

লাজপত রায় হিন্দুস্থান পত্রিকায় 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন, স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকারের একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমরা চাই পলিটিক্যাল সন্ন্যাসী। বক্তা ও লেখক সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ থেকে আত্মোৎসর্গের মানুষ বেরিয়ে আসুক। প্রয়োজনে, লেখকরাও সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করুন। কিভাবে আন্দোলন করতে হয় বাংলা তা সদ্য দেখিয়েছে, পার্টিশন বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা। বাংলা যা করেছে, ভারতের প্রতিটি দেশের তা করা উচিত — অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য, সারা ভারত 'বয়কট'কে গ্রহণ করুক।

'বিবেকানন্দ মেডেল' দানের ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের। 'ভারতের জাতীয়তা' সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি একটি পুরস্কার দেবেন — তার নাম হবে 'বিবেকানন্দ মেডেল'। ডন পত্রিকায় ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে বিজ্ঞাপন দিলেন, এই উদ্দেশ্যে। প্রতিযোগীদের নিম্নবিষয়ে রচনা পাঠাতে হবে।

1. That the work of the Indian Religious Teachers has always been more or less fruitful in some of the national sense.

2. That great man have a passionate love for the common people.

3. That his country has a greater claim on a man than his family.

4. That all the Indian peoples together form an organic unity.

(Note : This may be taken that as the parts of the human body are all different from each other and yet united to form a single organism, so there may be some such relationship among the India peoples.)

5. That Hindu and Mohamedan life and thought are alike in many important characteristics. which distinguish them both from Western.

6. That the lives of Asoke and Akbar, taken together prove that in India the Idea of democracy is essential to nationality.

(Notes : It will be understood that word democracy carries with it the Idea that everyone is free to develop himself to the utmost, regardless of his birth.)

মারাঠায় তিলকের 'কেশরী' সেটি উদ্ধৃত করলেন ২২শে নভেম্বর ১৯০৫।

মিঃ ম্যাকলাউডকে লিখলেন, ২২শে নভেম্বর ১৯০৫, আমরা ক্রমে খোকার বোটানি বইটির আকাশ প্রমাণ কাজ শেষ করে আনছি। এখন উপসংহার অংশটি লেখা হচ্ছে। আশা করি তার জন্য দিন ৩০শে নভেম্বর তারিখে এর আনুষঙ্গিক বাড়তি আবিষ্কারগুলিও বইয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে, এমনকি ভূমিকা পর্য্যন্ত। এর মানে কাজের একেবারে সমাপ্তি নয়— তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন রচনা নয়— এই পর্য্যন্ত। আশা করছি শেষ হলে, মাসখানেক কি দুমাস বিশ্রাম ও ভ্রমণ করবো। এখন আমরা সপ্তাহে তিন কি চারদিন কাজ করি, সকাল আটটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত, মধ্যে ঘন্টাখানেক কি ঘন্টা দুই আহারের জন্য বাদ। ছুটির দিনে প্রায়ই এর থেকে বেশী করি। বুঝতেই পারছ, এর ফলে আমরা দুজনেই কি রকম শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কারণ প্রায় প্রতিদিন একাদিক্রমে এমনই চলছে ১৯০৪ অক্টোবরের সূচনা থেকে।

গত রবিবার আমরা একটি মাল বওয়ার নৌকা ভাড়া নিয়েছিলাম, তাতে করে নদীতে বহু ঘণ্টা কাটিয়েছি। এ ধরণের নৌকায় লেখাপড়া এবং শোওয়া-বসা করা যায়। অনেকটা ছোট ড্রইংরুমের মত। আমরা বালি পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, যাওয়ার পথে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চা, মঠে খেয়েছিলাম। তারপর ফেরার সময়ে দক্ষিণেশ্বরে নেমেছিলাম। এর প্রতিটি স্থান, যার সঙ্গে স্মৃতি বিজড়িত সম্পর্ক আছে, সেগুলি এখন কত না সুমধুর ভাবনায় আমার মন ভরিয়ে দিয়েছিল, তা বলে বোঝাতে পারবো না।

বামপন্থী দলভুক্ত নেতা মিঃ কেশরী ও লাজপতরায় বিপ্লবপন্থী নিবেদিতার সহযাত্রী। ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৫ 'মারাঠায়' লিখলেন : রাশিয়ার 'বিপ্লব' এখনও থামেনি। আর্মি ও নেভি কেবল জনগণের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নয়, বস্তুতঃ জারের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করছে। জার, রাজতন্ত্রকে ঈশ্বর বিধান বলে প্রাচর করে জনগণকে ধাপ্পা দিয়ে গেছে দীর্ঘদিন। কিন্তু সেখানকার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে, কোন আমলাতান্ত্রিকই দীর্ঘকাল জনগণের উপর চেপে, শাসন করতে পারে না। ... এর থেকে ভারতের আমলাতন্ত্র যেন শিক্ষা নেয়। রাশিয়ার সরকার নিপীড়ন নীতি নিলেও সেখানে ব্যবসা, বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্তব্ধ। এক্ষেত্রে ফুলারপন্থী ভারতীয় শাসকরা যদি ভাবেন, জনগণের উপর গুর্খা লেলিয়ে দিয়ে বৃটিশ দ্রব্য চালানো সম্ভব হবে, তাহলে সে অলস কল্পনা। .... ও চেষ্টা রাশিয়ার ব্যর্থ হয়েছে। ভারতে একই পীড়ন নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে যদি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বজায় রাখা হয়, তা কেবল বাঙালীরাই নয়, কালক্রমে সামরিক গুর্খারাও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হবে।

৬ই ডিসেম্বর ১৯০৫ নিবেদিতা মিস ম্যকলাউডকে লিখলেন : পুরানো চিঠি উল্টেপাল্টে দেখতে পেলাম : তুমি লিখেছো, কোন একটা জায়গায়, এমনকি কোন মানুষকে দুবার দেখতে প্রায় চাওনা। দেখলে, ভালবাসার আবেগ নাকি শুকিয়ে যায়। এই রহস্যময় সম্পর্কের সূত্র কি? আমি কখনই মানবো না— স্বামিজীর স্মৃতির সূত্রে আমি বাধা আছি! কারণ কখনই মানবো না— স্বামিজী স্মৃতিসূত্রে কখনও পর্য্যবসিত হতে পারেন কিংবা আমরা, যারা তাঁকে ভালবাসতাম, তাদের কাছে নিত্য গরীয়ান উপস্থিতি ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারেন? তবু পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিতে তোমার, আমার সম্পর্ক ডাক মারফৎ।

কত না ইচ্ছা করে আবার মিলিত হয়ে কোন শান্ত স্থানে দীর্ঘদিন কাটাই। যেখানে থাকবে বৃক্ষরাজি, প্রবাহিত তটিনী, আকাশের তারা এবং বিশ্রাম, সেখানে আমরা স্বর্গকে পাবো— ইন্দ্রিয়ের স্বর্গ নয়, আত্মার স্বর্গ। তুমি বোধ হয়, এখন আর নির্জ্জন জায়গা অপচ্ছন্দ কর না। কিন্তু আমি এমন একজনের সঙ্গে থাকতে চাই, যে এই নির্জ্জনের শান্তিতে তৃপ্তি পাবে নিশিদিন, চিরদিন। আমি এত ক্লান্ত! বছরের পর বছর বিশ্রাম, কাকে বলে যেন জানিনা!... সদাই রণ শব্দ আমাকে ঘিরে, নয় তখন দু'পা দুরে। অসুখে পড়েও ব্যস্ত হতে হয়েছে নিরাময়ের জন্য — যাতে শীঘ্র কাজে যেতে পারি। আর কাজ? সে কাজের চেহারা অযোগ্য, জঘন্য, ইচ্ছা ও বিষাদের নানা রেখায় আঁকাবাঁকা।

ভারত সম্বন্ধে নীতি পরিবর্ত্তনের আভাস না পেয়ে, অধিকতর প্রজ্ঞাসংগ্রহ করে বিষাদ হৃদয়ে ফিরে এলেন মিঃ গোখলে।

৬ই ডিসেম্বর ১৯০৫, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তুমি জানো আমার বিজ্ঞানপূজা সত্ত্বেও আমি ক্যাথলিক মতকে ভালবাসি। যখন আমার খুবই অল্প বয়স, সবে বাল্য অতিক্রম করেছি,

তখন ভাবতাম, এখনো তাই ভাবি— আমার একমাত্র বাসনা হবে সত্যেরই বাসনা। এই সত্যের সন্ধানের সঙ্গে মধ্যযুগপ্রীতির সংঘাতেই আমার জীবনযন্ত্রণার সূত্রপাত। স্বামিজী সে যন্ত্রণা মোচন করে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন নতুন জগতকে। সকল পুরাতন পৃথিবী এই নতুন জগতের অন্তর্গত। কি বিচিত্র। জানো কি, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য, যখন তাঁকে একমেবাদ্বিতীয়ম এর বিষয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই অন্তর্লীন, তখন নিজের মনে বলেছিলাম, বেশ কথা, তবে এই তত্ত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে দিতে হবে। তত্ত্বটিকে এখনকার মত কাজ চালাবার জন্য মেনে নিলাম! আর এখনকার মত পাঁচ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহায়ে ঐ তত্ত্বের পরীক্ষা করে, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। কারণ একথা অবশ্যই সত্য, অন্যের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ভারতীয় কর্ম্মী যে সাফল্যলাভ করে, তার মূলে ভারতীয়ের 'ভিশনের' প্রকৃতি। নূতন বইটির উপসংহারের কথাগুলি গতকাল আমরা লিখেছি। এসব কথা অপরকে জানিও না। কিন্তু আমাদের আনন্দ, কল্পনা করতে পারো তুমি। অন্য জিনিষও করবার আছে। সে সব সেরে, সদানন্দকে নিয়ে দার্জ্জিলিং যাবার ইচ্ছা আছে বিশ্রামের জন্য। কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরে প্রবন্ধগুলি শেষ করার আশা রাখি। তারপরে ভরসা করি মাসখানেক ভ্রমণ।

আগামী মে মাসে একটি নতুন বিজ্ঞানের বই আরম্ভ করার ইচ্ছা। তার আগে, শুরু করতে গররাজি হয়েছি।

১০ই ডিসেম্বর 'মারাঠা' পত্রিকায় রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ একটি সম্পাদকীয় বেরুলো: ...শাসকদের সর্ব্ববিধ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বিপ্লব ছড়াচ্ছে। জারের জীবননাশের চেষ্টা হয়েছিল। গ্রাণ্ড ডিউকরা পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছে। যারা ভেবেছিলেন, জার শাসনতান্ত্রিক সুবিধা দানের প্রস্তাব করে সোসালিষ্টদের পালের বাতাস কেড়ে নিয়েছেন, তাঁরা ভ্রান্ত। রাশিয়ার পরিস্থিতির জটিলতা বেড়েছে। সেখানকার নানাস্বার্থের টানাপোড়েনে, সংঘাতে, নিযুক্ত রক্ষণশীল সম্রাট, রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী নেতৃগণ, অভিজাতবর্গ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিকে নিহিলিষ্টরা জারকে খুন করার জন্য পবিত্র ব্রতধারী। মুর্খ দুরাত্মা প্লেভে ছিলেন এই দলের প্রধান। বর্হিমণ্ডলে আছে আর এক ডিটেকটিভ দল, যারা কেবল ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়ে জারকে আতঙ্কিত রাখছে — ফলে জার নিজের ছায়াকে ডরাচ্ছেন। রাশিয়ার অভিজাত মহল, একেবারে পচে গেছে। শাসনতন্ত্র টলমলে, ভেঙে পড়ার মুখে। আমলাতন্ত্র সেখানে সর্ব্বোচ্চ— মন্ত্রী থেকে দূর প্রাচ্যপ্রদেশের কনিষ্ঠ কেরানী পর্যন্ত। সকলে মনে করেন: রাষ্ট্র ও জনগণ লুঠ করার সামগ্রী। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবের বাণী, রাশিয়ার অন্তর্দেশ ভেদ করে গেছে। সেই শিকড় ওপড়ানোর সাধ্য, জারের নেই। চলেছে সেখানে সর্ব্বাত্মক বিক্ষোভ। শিল্প শ্রমিকরা করেছে ধর্ম্মঘট। ন্যাশানাল ডিমক্র্যাটরা উস্কানি দিচ্ছে তাতে। সেস্যাল রিভলিউশনিষ্টরা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটে মদত দিচ্ছে। বিরাট কৃষিজীবীরা তাদের দীর্ঘ অভিযোগ দূরীকরণের জন্য আন্দোলন করছে, উদারনৈতিক দেশপ্রেমিকরা, সংস্কারকদের ব্যস্ত করছে— অধীর হয়ে। তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা নিঃসহায়, ইহুদী ইত্যাদির উপরে প্রাণের সুখে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

১৩ই ডিসেম্বর ১৯০৫ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আসন্ন বেনারস কংগ্রেসে উপস্থিত থাকবার আশা করছি। সেখানে কিছু কিছু মগজে করাত ও হাতুড়ির কাজ করতে পারবো। তবে একথা মোটামুটি সত্য যে, উত্তেজনা চায় কিন্তু চিন্তা করতে চায় না— এমন জনতার সামনে বক্তৃতা করার কথা আমি ভাবতে পারি না। ...পনেরো হাজারের কম লোক হয়, এমন সভা এখন পাওয়াই মুশকিল।

২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৫, মিঃ সি আর দাসের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হল 'স্বদেশমণ্ডলী'। নাম দেওয়া হল 'ফীল্ড এ্যাণ্ড একাডেমী ক্লাব' চরমপন্থীদের রাজনীতির কার্য্যকরী সমিতি। নিবেদিতা যুক্ত হলেন এই মণ্ডলীতে। তিনি এখনে দিতে লাগলেন জ্বালাময়ী বক্তৃতা — যা বিদ্যুত শিখার মত শ্রোতাদের অন্তরকে দেশপ্রেমে উদ্বোধিত করে চললো। এখান থেকেই পরে পান্থির মাঠে স্বদেশী আন্দোলন হল শুরু।

বারাণসীতে এ মাসের শেষের দিকে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। ২৫শে ডিসেম্বর বারানসীতে পৌঁছলেন। তিলেশ্বর ভাণ্ডারে একটি বাড়ীতে অবস্থান করলেন। এ বাড়ীটিই হল নেতৃবৃন্দের আলাপ আলোচনার স্থান। নিজে চরমপন্থী কিন্তু মধ্যস্থ হলেন নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে, কার্য্যকরী একটা ব্যবস্থা সম্পাদনের প্রচেষ্টায়। স্টেটসম্যান পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ও জাতীয় স্বার্থরক্ষার অনুকূলে তা পুরোপুরি ব্যবহার করে চলেছেন।

কংগ্রেসের নরমপন্থীদল, বৃটিশের স্বার্থবিরোধী কোন লড়াইকে, স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। অথচ চরমপন্থীরা চান : 'চরমপন্থা' অবলম্বনে বৃটিশের উপরে চাপ সৃষ্টি করা এবং জাতীয় কংগ্রেস সে লড়াইকে স্বীকৃতি দান করুক। অর্থাৎ 'স্বদেশী ও বয়কট'কে কংগ্রেস রেজলিউশন দ্বারা তাদের 'নীতি' হিসাবে তা গ্রহণ করুক। 'বঙ্গবিভাগ'কে উপলক্ষ্য করে বাংলার চরমপন্থী নেতারা পূর্ব্বেস্বদেশী ও বয়কট নীতি গ্রহণ করেছেন, জনগণও সে ডাকে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে— এখন তাঁরা চান সর্ব্বভারতীয় স্বীকৃতি, অর্থাৎ তা উন্নত হোক জাতীয় স্তরে, সারা দেশ এই লড়াইকে সমর্থন করুক। এ লড়াই ব্যাপ্ত হোক সারা ভারতে, ও তা— ভারতের 'মুক্তি-যুদ্ধ' রূপে পরিণত হোক।

নরমপন্থীরা তাঁদের, আবেদন-নীতিতে বদ্ধ পরিকর। বৃটিশরাজকে তাঁরা ভগবানের দান বলে মনে করেন। তার 'স্বার্থ' ক্ষতি হয় এমন কিছু করতে তাঁরা নারাজ।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে নিবেদিতা একটা সমাধান পথ প্রস্তুত করতে আবেদন জানালেন — নেতৃবৃন্দের কাছে। নরমপন্থীর দল বামপন্থী দলের দাবী 'বাংলা পার্টিশনের' নিন্দা তার নথিভূক্ত করবেন। কিন্তু বাংলার 'স্বদেশী ও বয়কট' নীতিকে সমর্থন করবেন না। কারণ এ বস্তুর অনুমোদনের অর্থ : বৃটিশ স্বার্থের বিরোধী কাজ করা, বৃটিশের রোষ বৃদ্ধি করা।

বামপন্থীর দল বলতে বোঝায়— লালা লাজপত রায়, খাপার্দ্দে, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সর্ব্বভারতীয় নেতা— দলে তারা ভারী। ওঁরা বেঁকে দাঁড়ালেন, যদি 'স্বদেশী ও বয়কটকে' সমর্থন না করা হয়, আমরাও প্রিন্স অব ওয়েলসকে 'অভ্যর্থনা প্রস্তাবের' বিরোধীতা করবো। এ প্রস্তাব পাশ না হলে মডারেটের মুখে কালি লেপন হবে। নিবেদিতার প্রস্তাব মত মুখরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন মিঃ গোখলে। স্থির হল : মডারেটরা বাংলার আন্দোলন সমর্থন করবেন, চরমপন্থীর দলও প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভ্যর্থনায় সম্মতি দেবেন।

অধিবেশন শুরু হল ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৫ মিঃ তিলককে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে। এ সভায় কৃস্টীনও উপস্থিত। উভয়েই একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত গাওয়া নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দিল। সমবেত সভ্যগণের অভিমত "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হোক। বাংলা থেকে অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন সরলা দেবী। তিনি গানটি এত সুলোলিত কণ্ঠে গান— যা সকলের মর্ম্মস্পর্শ করে। বাধা এলো নরমপন্থী দলের পক্ষ থেকে : 'ও গানটি গাওয়া' সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ। সমবেত সভ্যদের প্রতিবাদ : নিষিদ্ধ, ঠিক কিন্তু বাংলাদেশে। এটা তো বারাণসী। এখানে 'নিষিদ্ধ' কথাটা এলো কি করে? বামপন্থীদের যুক্তি, বাংলা আর যুক্তপ্রদেশ এক হতে পারে না — তাছাড়া সরকারের সর্ব্বভারতীয় আদেশ বলে তা বলবতী হয়নি। এছাড়া গানটির

দেশাত্মবোধক এক অবদান আছে। এটি নিছক 'মাতৃবন্দনা'। আর যিনি গানটি এখানে গাইবেন তিনিও 'দেশপ্রেমিকা' দেশে, বীরাষ্টমীর প্রবর্ত্তক।

বিপদে পড়লেন মিঃ গোখলে। সভার অভিবেশন ভেস্তে যায় উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদে। তিনি নিবেদিতার সঙ্গে যুক্তি করে স্থির করলেন : গানটির প্রথম লাইনটি গেয়ে, অধিবেশনের কাজ শুরু হবে।

সুলোলিত কণ্ঠে প্রথম লাইনটি গাওয়ার পর সভ্যদের চাপ : গানটি পুরোপুরি গাইতে দিতে হবে — কারণ এটাতো 'মাতৃবন্দনা'।

সভাপতি মিঃ গোখলে সভ্যগণের আবেদন মেনে নিলেন। সরলাদেবী শেষপর্য্যন্ত গানটি গেয়ে গেলেন। সে সুরে প্রভাবিত হলেন সভ্যবৃন্দ। এবার শুরু হল সভার কাজ। মিঃ গোখলে প্রথমেই বাংলা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। যোগ করলেন 'বাংলার উপর পার্টিশন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে' — এটা ইংরাজদের পক্ষে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ভ্রান্তি। পরিকল্পনাটি গোপন অন্ধকারে উদ্ভাবিত। গত অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাসে প্রচলিত সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'নয়ানীতির' তীব্র বিরোধিতা করা সত্ত্বেও গায়ের জোরে তা বলবৎ করা হয়েছে। এখানে দেখা গেছে, আমলতান্ত্রিক ও শাসনপদ্ধতির জঘন্য দিকের পরিপুষ্ট নমুনা— যা জনমত সম্বন্ধে ষোল আনা ঘৃণা, নিজেদের উচ্চতর জ্ঞানসম্বন্ধে 'উদ্ভ্রান্তকারী' এবং জনসাধারণের একান্ত প্রিয় 'অনুভূতি' সম্বন্ধে বেপরোয়া উপেক্ষা।.... সর্ব্বোচ্চ স্বদেশীয় আদর্শের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তির যে নিবেদন প্রকাশমান, তার প্রভাব এমনই প্রাণব্যাকুল ও এমনই সুগভীর যে, তার ভাবনাতেই শিহরণ জাগে, আর তার বাস্তবস্পর্শে মানুষ নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করে উত্থিত হয়। আজ ভারতের সর্ব্বোপরি প্রয়োজন ঐ দেশভক্তির মহাবাণী প্রচারিত হোক : উচ্চ, নীচ, রাজ্য, প্রজা, নগর ও গ্রাম সর্ব্বত্র, যে পর্য্যন্ত না মাতৃভূমির সেবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছে 'সর্ব্বগ্রাসী চেতনা'য় পর্য্যবসিত হয়।

...বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এদেশের 'জনজীবন' অধীর গুরুত্বপূর্ণ শক্তি অর্জ্জনের উপযোগী ঘটনা পেয়ে গেছে, আর সেজন্য 'গোটা ভারতবর্ষ', বাংলার কাছে ঋণী।

২৭শে নিবেদিতা মিঃ তিলকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তারপরই অধিবেশনের শুরু। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে মাডারেট গোখলে যে বক্তৃতা দিলেন, তা মডারেটদের কাছে অত্যন্ত গরম ও বিস্ময়ের বস্তু, এটি রচিত নিবেদিতার প্রয়াস ও সহযোগিতায়। চরমপন্থীদের উল্লাস মিঃ গোখলে এখন নিবেদিতার প্রভাবে পরিপূর্ণ, অভিনন্দন করলেন : মানুষ বিবেকানন্দকে। পূর্ব্ব দিন স্থির হয়েছিল মিঃ খাপার্দ্দে 'স্বদেশী ও বয়কট' প্রস্তাব তুলবেন ও বাংলার প্রতিনিধিরা সমর্থন করবেন কিন্তু যখন তিনি এ প্রস্তাব তুললেন, বাংলার প্রতিনিধিরা বেঁকে দাঁড়ালেন বিরোধী মডারেটদের বিরোধিতায়। মিঃ খাপার্দ্দে বিস্মিত হলেন এঁদের আচরণে। রাত্রে, খাপার্দ্দে বাংলা ক্যাম্পে গেলেন, আলোচনা হল। গেলেন বিহার ক্যাম্পে, তাঁরাও তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করায়, বাংলার : প্রতিনিধি মিঃ জি এন রায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং জানালেন বাংলার ডেলিকেটদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে ও স্থির করা হয়েছে স্বদেশী ও বয়কট রেজলিউশন তাঁরা সমর্থন করবেন। এরপর সকলে পাঞ্জাব ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে মিঃ লাজপত রায়কে তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করলেন। স্থির হল : তাঁরাও প্রিন্স অব ওয়েলকে ধন্যবাদ জানানোর বিরোধিতা করবেন না। সাবজেক্ট কমিটিতে, উপস্থিত ভগবতরাম, রামভূজ দত্তচৌধুরী প্রভৃতি আরও অনেকে। তখন মাঝরাত্রি। ফিরে এলেন যে যার ক্যাম্পে।

২৮শে ডিসেম্বর সকালে সভাপতিকে জানানো হল তাঁরা ধন্যবাদ দানের রেজলিউশনের বিরোধিতা করবেন এবং বাংলার বয়কট রেজলিউশন পাশ করবেন এবং বাংলার মডারেট নেতা

মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করলেন মিঃ খাপার্দ্দে সঙ্গে নিবেদিতা। পরে এলেন মিঃ তিলক ও মিঃ দত্ত তারা সকলেই সম্মত হলেন। স্থির হল : 'বয়কট' রেজলিউশনকে সমর্থন করবেন ও ধন্যবাদ 'রেজলিউশনের এ্যামেণ্ডমেন্ট চাইবেন, মদনমোহন মালব্যের প্রদত্ত বিবরণ পঠিত হবে না। ডক্টর মুনজীও ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ দেজি অবজি খানও মিঃ গোখলের মধ্যস্থতা চাইলেন। চরমপন্থীরা রাজী হলেন অবশ্য যদি মডারেট দল, তাঁদের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন। চুক্তিমত কাজ হল। উভয় রেজোলিউশন পাশ হল। মিঃ খাপার্দ্দে লেজিসলিটিভ কাউন্সিলকে বাড়ানোর যুক্তি দেখালেন। তাঁর বক্তব্যকেও সকলে হর্ষধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দন জানালো। সাবজেক্ট কমিটিতে বহুবাধা বিপত্তির পর স্বদেশী ও বয়কট রেজলিউশন পাশ হল।

এই কংগ্রেসের অধিবেশনকালেই মিঃ রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তাঁর প্রবাসী পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি কার্য্যকারী সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গেও পরিচিত হলেন নিবেদিতা এখানে। প্রবাসী পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা কালে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন : উনি, ওঁর লেখনী দ্বারা ভারতবর্ষকে নানাভাবে সেবা করবেন, আকাশ প্রদীপের মত।

ক্ষিতিমোহন সেন বিস্ময় প্রকাশে বললেন— 'প্রবাসী' বাংলা পত্রিকা।

ইতিপূর্বে জগদীশচন্দ্র তাঁকে রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পত্রিকায় লেখা দেওয়ার জন্য। উত্তরে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি (নিবেদিতা), ওঁর লেখার অভাব হবে না। ক্ষিতিমোহন সেনকে বললেন— ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি আছে— এটাই ওঁর ভবিতব্য।

পরে মর্ডাণ রিভিউ প্রকাশিত হলে পরিচয় আরও নিবিড়তর হলেও। ওঁর পত্রিকাটিই তাঁর লেখনীর প্রভাবে ভারতীয় মুখপত্রে পরিণত হয়ে গেল।

২৯শে ডিসেম্বর দেখা গেল 'বয়কট' রেজোলিউশন পাশের কথা লেখা হয়নি। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বললেন, ওটার সংশোধনী প্রস্তাব আছে। মিঃ তিলক, মিঃ মুনজীব্রহ্ম, দেজী ইত্যাদি সকলে ক্রুদ্ধ হলেন। প্রবল উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় সংশোধনী প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া হল। দুপুরে একটা মিটমাট হয়ে গেল। বয়কট প্রস্তাব মেনে নেওয়া হল। হর্ষধ্বনিতে মুখর হল সভা। এরপর বেরুলো বন্দেমাতরম প্রসেশন। মহাসভা চললো রাত্রি ৮টা পর্যন্ত— এরপর অধিবেশন স্থগিত রইলো।

৩০শে ডিসেম্বর ১৯০৫, সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের পর পুনরায় অধিবেশন শুরু হল চললো ১২টা পর্য্যন্ত।

অধিবেশন সমাপ্তির কালে নিবেদিতা মিঃ গোখলেকে ধন্যবাদ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বললেন: এই মহৎ মানুষটির শক্তি ও ইস্পাত চরিত্রকে আপনারা ইতিমধ্যে পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য : সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা দান। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বৈধতা নিয়ে মডারেটদের মনে সংশয় ছিল : প্রত্যক্ষ এই সংগ্রাম শাসকজাতির পক্ষে, বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। ইয়ুরোপীয় হিসাবেই তিনি বলতে চান, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত যদি সংগ্রাম শুরু করে, তাহলে ইংলণ্ডকে ফিরিয়ে দেবে আর অপহৃত আত্মা।... আমার বিবেচনায়— ভারতবর্ষের বিপুল চৈতন্যের উদ্বর্ত্তন এবং তার বিরাট 'কণ্ঠস্বর' ইয়ুরোপের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন— যদি ইয়ুরোপকে অমানবতার গহ্বরে উৎকট 'মৃত্যু' থেকে উদ্ধার পেতে হয়! সহস্র সহস্রবার মানুষ ভারতের জন্য যে সকল আত্মোৎসর্গ করতে পারে, সে সকলই ইউরোপের পরিত্রাণের জন্য কৃত— এইভাবে সে কাজ চিহ্নিত হতে পারে। ...ভ্রাতৃগণ মনে রেখো, ইতিহাস পুণরাবৃত্ত হয়, তাই নিয়ম। একশো বছর পিছনে, এসে দ্যাখো। দেখবে, ইউরোপে জাতীয়তার জন্ম হল। ত্রিশ চল্লিশ

বছর এগিয়ে এসে দেখবে, তোমাদের দেশের প্রাচীন ঋষি, প্রাচীন ভারতীয় পার্শি ঋষি মিঃ নওরোজি ইংলণ্ডের কাছে অশ্রুসজল কণ্ঠে আবেদন করেছেন : বহুমুক্তির দেশ ইংলণ্ড কি এখন তার বিরাট ভূমিকা দুঃখজনকভাবে ভুলে গেল! নাকি ইদানিং তার সমুচ্চকর্ত্তব্য নিয়তিকে দুঃখজনকভাবে পদদলিত করতে যে উৎকণ্ঠিত? ভারতের জনগণ, উঠে দাঁড়াও, উদ্ধার কর ইংলণ্ডের ঐতিহ্যকে, তাকে নূতন করে তৈরী করো, নূতন করে সৃষ্টি করো— ইংলণ্ডকে বাধ্য কর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে। ইংলণ্ডের স্বার্থে নয়, কেবল— এর দ্বারা তোমরা শেষপর্যন্ত পৃথিবীকে রক্ষা করবে একটি মহাদেশের (পাশ্চাত্য মহাদেশের) অধঃপতনের দুঃখদৃশ্য থেকে, যে মহাদেশের প্রাণবায়ু জাতীয়তার প্রাণবেগরূপে সূচিত হয়েছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী সংহতি ও কেন্দ্রীকরণ প্রায়সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চেষ্টারূপে!

তাঁর কণ্ঠস্বর হর্ষধ্বনিতে ডুবে গেল। সে ধ্বনি প্রশমিত হলে, তিনি বললেন, আমার কথা শেষ হয়নি। প্রিয় ভ্রাতৃগণ! ইউরোপের ঐ যে প্রাণবেগ, জাতীয়তার প্রবাহ রূপে নির্গত হয়েছিল, তা মানবতা অর্চ্চনার মনোভাবকে ত্যাগ করেছিল বলে, সেই মূলধারা পথ থেকে সরে গিয়ে এমনই নিম্নগত হয়েছে, যার ফলে তোমরা কেন দেখতে পাচ্ছ, ছয়টি কি সাতটি, কি আটটি সশস্ত্র সেনা নিবাস থেকে ইয়ুরোপীয় শান্তির— বৃটিশ শান্তির বচন শোনা যাচ্ছে। আমরা ইংলণ্ডকে রক্ষা করবো ইউরোপকে রক্ষা করবো পৃথিবীকে রক্ষা করবো ঐ বিকট দৃশ্য থেকে।

ভারতের জাতীয়তার স্বপ্ন, ভারতের পক্ষে কোন স্বার্থের স্বপ্ন নয়, এ হল মানবতার স্বপ্ন, যেখানে ভারত, বিরাট আদর্শের জননী, যা কিছু মহৎ, প্রেমময় এবং বৃহৎ, তারই পালিকা ধাত্রী। ঐ স্বপ্ন রূপায়নের কাজ যদি আরম্ভ করতে পারো — তাহলে দেখবে যে, ভারত তার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নেই, পরন্তু যে বিরাট সংগ্রাম আরম্ভ হবার মুখে, ভারত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার স্বীকৃত প্রতিনিধি। ঐ সংগ্রামে ইশ্বরের ইচ্ছায়, ইংলণ্ডের রাজনীতির আসল প্রশ্নগুলির রূপ, স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে : কনজারভেটিভ ও র‍্যাডিকালের সংঘর্ষের পুরানো ধরণের বস্তাপচা ধারণা চিরদিনের জন্য ভেসে গেছে, তার জায়গায় ইংরাজ সাম্রাজ্যের মূলগত প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে— সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তা, জাতীদাসত্ব বনাম জাতীয়তা, জাতিদাসত্ব বনাম পৃথিবীর সর্ব্ব মানুষের জাতীয়তার সংগ্রাম।

মিঃ গোখলের বক্তৃতার পর নিবেদিতা ২২ সংখ্যক প্রস্তাবের সমর্থনেও স্বল্প বক্তৃতা দিলেন : ভারতের স্বজাত্য-বোধ কেবল ভারতবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় ইংলণ্ডের পক্ষে এবং সমগ্র বিশ্বের পক্ষেও তার প্রয়োজন আছে। ইংলণ্ড সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলকথা যে স্বাধীনতা— তা বিস্মৃত হয়েছে। ইয়ুরোপ যুদ্ধমান জাতিদের ক্রীড়াক্ষেত্র হতে চলেছে।

এরপর উভয় প্রস্তাবই গৃহীত হল।

সোমবার ১লা জানুয়ারী ১৯০৬ সকলে পরস্পরকে বিদায় অধিবেশন সমাপ্ত। পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে নেতারা ফিলে চললেন যে যার গন্তব্যস্থলে। নিবেদিতা কিন্তু রয়ে গেলেন বেনারসে। এখানে এখনও তাঁর কিছু কাজ বাকী। স্বামিজীর উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদে একটি 'সেবাশ্রম' গড়ে উঠেছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর সেটি রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯০৩ সালে। এস্বত্বেও সেবাপ্রতিষ্ঠানটির কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তিনি কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করে ইংরাজীতে প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যবিবরণী ও আবেদনপত্র লিখলেন শহরবাসীর জন্য।

এরপর বেরিয়ে পড়লেন ভ্রমণে। বহুদিনের ইচ্ছা : রাজপুতনায় একবার ভ্রমণে যাবেন। কাশী থেকে যাত্রা করে প্রথমে গেলেন রাঁচী। বিখ্যাত সেই স্তূপ। পরিদর্শন করে গেলেন উজ্জয়িনী, চিতোর, আজমীর, অম্বর ও আগ্রা হয়ে পুনরায় ফিরে এলেন কাশী। পরপর তিনটি বক্তৃতা দিলেন। অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে দেখা হল। নানা বিষয়ে আলোচনা হল উভয়ের।

৭ই জানুয়ারী ১৯০৬, বালগঙ্গাধর তিলকের পত্রিকা মারাঠায় সম্পাদকীয় বেরুলো : বাহ্যতঃ মস্কোর বিপ্লব দমিত। তার মানে সাময়িকভাবে বিপ্লবীরা পর্যুদস্ত— জারের নৈতিক জয় বলে ঘোষিত, যদিও এটাকে অনেকে দুর্নীতির জয় বলছে। ধন্য সেই দেশ, যেখানে হাজার হাজার মানুষের মত মানুষ পাওয়া যায়, যারা রাজনৈতিক মুক্তির মহৎ আদর্শের জন্য মাছির মত মরতে প্রস্তুত। এখানেই আমাদের গভীরে দৃষ্টিপাত করতেই হয়। প্রথমে যা চোখে পড়ে, তা হল : যদি হাজার হাজার লোক প্রাণ দেয়, তা মুহূর্তের পাগলামিতে ঘটেনি। তার পিছনে আছে নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা— সেটা সোসালিষ্ট, অগ্রণী উদারনৈতিক এবং অগ্রণী চরমপন্থীদের সম্মিলিত প্রজ্ঞায় তা সৃষ্টি— আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। গত দুই সপ্তাহে, মস্কোর পথে লড়াইয়ে যে পাঁচ হাজার লোক মরেছে, যে চোদ্দ হাজার লোক আহত হয়েছে..., তাদের ছাড়াও এক বৎসর আগে, যখন রাশিয়ার রাজনৈতিক সংস্কার কর্মীরা সত্যকার বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু করেন, তখন থেকে এতাবৎ সময়ে, আরও পাঁচিশ হাজার লোক হয় নিহত, না হয় চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং ত্রিশ হাজার মানুষ সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছে। রাশিয়ায় অবশ্যই উন্মাদ আছে, যেমন সর্ব্বত্র থাকে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এখন রাশিয়ায় যা ঘটেছে, তা স্বাধীনতার বেদীতে রাশিয়ার দেশপ্রেমিকদের প্রাণরক্ত উৎসর্গ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়!

৭ই জানুয়ারী ১৯০৬ স্টেটসম্যান কার্জ্জনের একটি নোট ছাপা হল— যার মধ্যে সম্বলপুর জেলার আদালতের ভাষা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কার্জ্জনের মন্তব্য উদ্ধৃত হল।" ঐ নোটটি গোপন চরিত্রের এবং তা সংগৃহীত হয়েছে অসাধু উপায়ে"— এই অভিযোগে সরকার ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্টেটসম্যানের উপরে। গ্রহণ করলো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। বন্ধ হল সকল প্রকার সরকারী সংবাদ। সংবাদ সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল, কাজটা গর্হিত, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর স্থূল হস্তক্ষেপ। দেশী বিদেশী সমস্ত সংবাদপত্র সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ শুরু করলো।

১২ই জানুয়ারী ১৯০৬, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন, আমি যেন আমার ভবিষ্যৎ জীবন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। যে ইঙ্গিত চাই, যে জিনিসটি সন্ধান করছি, বারাণসীর এক গণকের কাছ থেকে তা পেয়ে গেছি। এখন আমার একটি মাত্র উৎকণ্ঠা : এই লেখার (স্বামিজীর জীবনী) কাজ দ্বারা স্বামিজীর কাজকে নিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপন করা, তারপর অবশিষ্ট বৎসরগুলিতে অপর কর্ত্তব্যে নিজেকে নিয়োগ রাখা। ভাবতে বড় ভাল লাগে, ব্যাপারটা তুমি অবিলম্বে বুঝেছ, গভীরভাবে নিয়েছ, এবং পরম বিশ্বাসে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ। তোমার নিশ্চয় স্মরণ আছে, স্বামিজী, আমাকে পরিস্থিতিকে একটু এগিয়ে দেবার জন্য স্বাধীনতা দিয়েছিলেন — ব্রিটানীর সেই সুমধুর সন্ধ্যায়। বলেছিলেন : ও জিনিসও মায়েরই। যদি আমি মারা যাই, আমার অত্যন্ত ইচ্ছা, তুমি আমাকে ব্রিটানীতে নিয়ে যাবে, যে বাগানে স্বামিজী আমাকে তাঁর শেষ শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। যেখানে, প্রফেটের উত্তরাধিকার আমার উপর অর্পিত হয়েছিল— সেই স্থানটি দেখাবে। এর পূর্ব্বেও স্বামিজীর জীবনী লিখবো, ইয়ুরোপ যেতে ইচ্ছুক লিখেছিলাম। ফল : জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কাজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়তি যেন টেনে নিয়ে চলেছে। এর পূর্ব্বেও লিখেছিলেম, খোকাকে বলো, তুমি আমাকে চাও— এতে বিচ্ছেদ সহজতর হবে।

১২ই জানুয়ারী ১৯০৬, আশ্রমে স্বামিজীর জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হল। সেখানে যোগদিলেন তিনি। পূজাপাঠ শেষ হওয়ার পর বৈকাল পাঁচটার পর টাউন হলে স্বামীজির স্মৃতিসভায় সভায় 'হিন্দুধর্ম্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। স্থানাভাবে বহুলোক বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলেন।

বাসায় ফিরে মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : বাড়ী চারিদিকে ঝড়ের হাহাস্বর। শুনলে তোমার মনে হত, ওপার থেকে ভেসে আসা বেদনাভরা কণ্ঠস্বর— এই পৃথিবীর জন্য। শান্তি। শান্তি। মহাপ্রাণ। রাত্রি, আঁধার। তবু দর্শন জেগে আছে। মায়ের ডাকে সাড়া আসবেই। বলিদান তিনি পাবেন। নোতুন যুগের অরুণোদয় হবে।

২১শে জানুয়ারী ১৯০৬ মিঃ তিলক জনচেতনা উদ্বুদ্ধ করার আশায় 'জাস্টিস পত্রিকা থেকে এক রচনা উদ্বৃত করে পত্রস্থ করলেন মারাঠায় : বিদেশী ও দেশী ধনতন্ত্র ভারতবর্ষকে শোষণ করছে। তাদের থেকে মুক্তি পেতে হলে 'সমাজতন্ত্র' একমাত্র উপায়।

"Virulent capitalism is making headway in India. A great agitation is being carried on for the encouragement of home Industries as against the importation of foreign manufactured articles and expotation of Raw materials. This is chiefly being engineered by native capitalistis and is being shrouded with usual Patriotic verbiage and flavour. The Lancashire Mill owners have a hopeless task in front of them in trying to successfully compete with mellowners of Bombay, who have not only cheep labours and raw materials at hand. The only hope for India lies in Socialisem. It is absolutely necessary that an agitation should be started at once for the better pay working condition by Indian proletariat. Otherwise we shall witness spectacle of on object, crushed native population, the deligent desire of capitalists class, toiling and slaving their wretched lives away."

২১শে জানুয়ারী ১৯০৬ ফিরে এলেন কলকাতায়। ২৪শে জানুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন:

ভারতের প্রায় সকল সংবাদপত্রে, উক্ত বিবাদ সম্পর্কে যে মত প্রকাশিত হয়েছে, তার সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। ভারতের সংবাদপত্র সমূহ তাঁদের রায় দিয়ে দিয়েছেন গত সপ্তাহে। ভারত সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিকে, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া চিহ্নিত করেছে — এই বলে ভারতবর্ষের সাংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপের মারাত্মক দরজা খুলে গেল। পায়োনীরের মতে, সরকারী ব্যবস্থা, আইনমান্যকারী সংবাদপত্রের উপর হুমকি, যা এই দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই ঐ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্বন্ধে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনার তাৎপর্য্য, যে প্রকার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপলব্ধ হয়েছে, সরকারের কার্য্যকে যে প্রকার, সর্ব্বসম্মতভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, তা ভারতের ইংরাজি সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে প্রায়শঃ শ্রুত অভিযোগের চূড়ান্ত খণ্ডন। অভিযোগ ছিল, ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনতা রক্ষা ও ঐক্য রক্ষায়, যে গর্ব্বের ভূমিকা গ্রহণ করে আছে, তা কিছু পরিমাণে ভারতে অনুপস্থিত। ভারতীয় সাংবাদিকতার সাম্প্রতিক ইতিহাসে, নিঃসন্দেহে বর্তমান ক্ষেত্রের অনুরূপ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে নি। প্রত্যক্ষ করা গেল, সুখজনকভাবে সদ্য সমস্ত ঘটনাটির সূত্রে, ইংরাজী ও ভারতীয় সহযোগীগণ, সংবাদপত্রের অধিকার রক্ষায় প্রচুর সংখ্যক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন এই সম্বন্ধে। শেষে যোগ করলেন ভারত সরকার নিজেকে সমর্থনের অযোগ্য যে অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিলেন, সেখান থেকে তাঁদের উঠে আসার সুযোগ দিয়ে, স্টেটস্‌ম্যান পরিচালকগণ বিশেষ উদ্যমতার পরিচয় দিয়েছেন। সরকারও সে সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করে বিজ্ঞতা দেখিয়েছেন।

সরকারী আক্রমণ এবার এলো ঘুর পথে। কলকাতা পুলিশ বিভাগের ছজন ব্যক্তি যৌথভাবে স্টেটস্‌ম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ ও বেঙ্গলী পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা জুড়ে দিল। ঘটনাটা বিস্ময়কর। কারণ ব্যক্তিবিশেষের উপর মানহানির মামলা ব্যক্তিবিশেষ আনতে পারে, কিন্তু জনপ্রতিনিধিমূলক কোন সংস্থার বিরুদ্ধে কোন সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মানহানির অভিযোগ আনতে পারেন না। যাই হোক মামলায় জড়িয়ে পড়লো স্টেটসম্যান। লক্ষ্য সেই মিঃ র‍্যাটক্লিফ।

এবার স্বামিজী বেনারসে তাঁর জন্য কিছু কাজ করতে দিয়েছেন। কংগ্রেসের কাজ ছাড়া, বক্তৃতার দ্বারা মানুষকে স্বামিজীর ভাবধারা কিছুটা অনুধাবন করাতে পেরেছি।

কলকাতায় ফিরেই স্বদেশী সমর্থনে লিখলেন 'দি স্বদেশী মুভমেণ্ট' একটি প্রবন্ধ। সেটি মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ'তে বেরুলো। দীর্ঘ সে প্রবন্ধ : স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতি সমগ্র পৃথিবীতে নিজেদের মর্য্যাদাভুক্ত করে তোলার সুযোগ পেয়েছেন। ভয়ের বস্তুকেই পৃথিবী সম্মান করে, আর সুদৃঢ়, বুদ্ধিযুক্ত, ঐক্যবদ্ধ প্রায়সকে, সে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। ....স্বদেশী আন্দোলনে আদ্যন্ত পৌরুষ ও আত্মশক্তি বিঘোষিত। আর ভিক্ষা নয়, আর একটু সুবিধা দাও বলে প্রার্থনা নয়। ভারত নিজের জন্য যা করতে পারে— তা সে করবেই।

...স্বদেশীর বিরুদ্ধে একটা আপত্তি : দুর্ব্বল, অপুষ্ট দেশীয় শিল্প প্রোটেকশন ছাড়া বাঁচতে পারে না। সেখানে প্রোটেকশনহীন স্বদেশী শিল্প বাঁচানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতের মত দরিদ্র দেশের মানুষরা সস্তায় জিনিষ পেলে কিনবেই, তারা দেশী বিদেশী বিচার করবে না। আর স্বদেশী দ্রব্যের চেয়ে, বিদেশী যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত দ্রব্য সস্তা হবেই ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐসব কথা পাশ্চাত্য দেশীয়দের পক্ষে সত্য হতে পারে। যারা আত্মস্বার্থের প্রয়োজনে সংগঠিত, সহযোগিতার শিক্ষায় লালিত হয়েছে, ওসব কথা— একই সঙ্গে অসত্য হতে পারে। ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে, বলা চলে, যাঁরা আত্মোৎসর্গের ভিত্তিতে 'সংগঠিত', সহযোগিতার নিশ্চয় তারা শিক্ষা পেয়েছে।

.... মানুষ সর্ব্বদা সহজতম পথকেই বেছে নেয়, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন সমাজ বর্ব্বরতা থেকে উত্থানের আশা করতে পারে কি? সদাকুণ্ঠিত, পরাজয়ের পূর্ব্বেই পরাজিত ভারতীয় সমালোচকদের বোঝা উচিত, কেবল নির্ব্বোধ ও কাপুরুষেরাই বিরোধিতার সামনে বধ্যমাথা নামিয়ে দেয়। স্বদেশী কি ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, ছোট ছোট কত শিল্প গড়ে উঠেছে, আত্মবিশ্বাসের এটাইতো মূল ভিত্তি।

....আশা ও বিশ্বাস এসে গেছে জনগণের মধ্যে। ক্ষতি, বিলম্বিত লাভ ছাড়া আর কিছু নয়!

পূর্ব্ববঙ্গে যে সংগ্রাম চলছে, তার দিকে তাকিয়ে আছে সারা ভারত। যে সংবাদ কচিৎ সংবাদপত্রে বেরোয় — সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য। তথাপি সে বিষয়ে ধারণা সর্ব্বব্যাপ্ত। সুকঠিন বীরত্বেপূর্ণ মানুষগুলি, স্বদেশী পণ্যের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে— প্রত্যাশায়, সহানুভতিতে, গর্ব্বে থমথম করছে আকাশ-বাতাস।

...আমরা ব্যর্থ হবো না। কারণ ভবিষ্যতের সকল শক্তিই আমাদেরই। দূর হয়ে থাক ম্যাঞ্চেস্টার। দূর হোক লণ্ডন। ভারতের জনগণ ব্রতী হোক নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে।

...ন্যায়ের পথে রোধ করে যারা দাঁড়িয়ে আছো— সাবধান! সকল ইতিহাসেই এমন লগ্ন ঘনায়, যখন নির্ম্মম নিষ্ঠুরেরা কেঁপে ওঠে, ঈশ্বরের করুণার প্রার্থনায় চীৎকার করে, কিন্তু দেখে তা অদৃশ্য।

৩০শে, ৩১শে, জানুয়ারী, ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী, স্টেটস্‌ম্যান, অন্যান্য সংবাদপত্রের মন্তব্যগুলি ছাপালো স্টেটসম্যান। সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ নির্দ্দয় নিন্দাধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল — তা সংকলিত হতে থাকলো সেগুলি, দিনের পর দিন। অমৃতবাজার লিখলেন — প্রশ্ন হচ্ছে, কোন

সংবাদপত্র একটি নির্দ্দোষ ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছে বলে, সরকার কি এরূপ দানবিকভাবে ক্ষতি তার করতে পারে? যদি পারে, তাহলে বুঝতে হবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অদৃশ্য। সরকারের আক্রোশের রূপ, কল্পনা করুন। সরকার স্টেটস্‌ম্যানের প্রতিনিধিকে প্রেসরুম ও সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশ করতে দেবে না, ঐ কাগজে সরকার, তার সরকারী তথ্য ও প্রকাশমাধ্যমগুলি পাঠাবে না, এমনকি বিচার বিভাগ ও জনসংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকেও তা অনুসরণ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছে।

'মার্স্ক'-এর ক্যাপিটালে মন্তব্য করলো : 'কার্জ্জনের উক্ত প্রেমপত্রটি অবশ্যই গোপন প্রেমপত্র, যেমন হয়েই থাকে। তবে একথা সত্য যে, সময় পেরিয়ে গেলে সেই প্রেমপত্রের তাপ কমে যায়। আহা, কার্জ্জনের প্রেমপত্রের ক্ষেত্রে বুঝি তা হয়নি! মিঃ রিসলে স্টেটসম্যানকে সাংবাদিক ঔচিত্যের চূড়ান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে দোষী করেছেন। ঐ প্রকাশ সম্বন্ধে সম্পাদকের কোন কৈফিয়ৎ শুনতে তিনি রাজি নন। তিনি ফরিয়াদীর ভূমিকার সঙ্গে বিচারকের ভূমিকাটি জুড়ে নিয়ে স্টেটসম্যানের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বসেছেন— এমন একটি অপরাধ, যার কথা আইনের জগতে কুত্রাপি শোনা যায়নি।

উল্লেখ করলো : The Statesman has always been ably conducted and its tone as a first class liberal paper has always been of a high order. Its present editor Mr. Ratcliffe, was specially selected by the Government for a fellow-ship of the Calcutta University and there is no journalist more careful than he is, while fealess and outspoken in honest cristisism, to keep within the four corners of journalistic proprity and fairplay. (Feb.2.1906)

প্রতিবাদের মুখে, সরকার অপমান হজম করে আপস করলো। ৩রা ফেব্রুয়ারী সংবাদ বেরুলো, সরকার বয়কট প্রত্যাহার করেছে। উভয়পক্ষের চিঠি ছাপা হল, দেখা গেল : ভদ্রতা বিনিময়ে যেমন মানুষ একটু মাথা নোয়ায়, সম্পাদক তাই করেছেন, মাথা নামিয়েছেন সরকার। র‍্যাটক্লিফ তাঁর বয়ানের শেষে যোগ করেছেন— "আমাদের পূর্বতন মত বজায় রাখছি— লর্ড কার্জ্জনের নোটটি প্রকাশ করা সাংবাদিক ঔচিত্যের লঙ্ঘন নয়, কিন্তু ভারত সরকার এই নোটটি প্রকাশে স্বাভাবিক যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন— তদানুযায়ী এর প্রকাশ বিবেচনাসম্মত হয়নি।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী সম্পাদকীয় রচনায় ভারতের সাহেবী কাগজগুলির উচ্ছ্বাসিত কৃতজ্ঞতা জানালেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের দৃপ্ত মত ঘোষণার জন্য।

বেনারস কংগ্রেসের অধিবেশনের পর থেকে ইতিমধ্যে স্বদেশী সমর্থনে জোরালো প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। লিখলেন 'ভারতের জাতীয় মহাসভা, স্বাধীনতা সংগ্রামের যাঁরা অগ্রদূত, তাঁদের দলাদলি ও মতপার্থক্য দুর্ভাগ্যের পরিচয়। যদিও কংগ্রেসই ভারতবর্ষে একমাত্র রাজনৈতিক সংস্থা, তাঁদের কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী কোন প্রস্তাব বা উপায় গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি— এটা যেমন সত্য, তেমনি প্রত্যেককে স্বীকার করতেই হবে জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব এই সংস্থারই। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাকে সমর্থন করলেই, এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনেররূপ গ্রহণ করে সারা ভারতে ব্যাপ্তির সম্ভাবনা বেশী— একথা অস্বীকারের কোন কথা নেই। ....নব্য ভারত আজ ইয়ুরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে মুগ্ধ। কেবল মুগ্ধ কেন, মোহাচ্ছন্ন বলা যেতে পারে। তাঁদের ধারণা, বিভিন্ন দলের হট্টগোলের স্থানরূপে পরিগণিত হতে না পারলে, পাশ্চাত্য স্বদেশিকতার আন্তর্গত, শক্তি ও উদ্যমের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে না। অন্ততঃ আমাদের মধ্যে পরস্পরকে অভিযুক্ত ও আক্রমণ করার

যে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে, এসবের একমাত্র কারণ তাই। একই দেশের অধিবাসীগণের লড়াই-এর অর্থ, সময় ও যুদ্ধের উপকরণ নষ্ট করা— বর্ত্তমান ভারত, এখনও তা উপলব্ধি করেনি। তাদের যে আন্দোলন, তা কোন দলীয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নয়, এটা একটা জাতীয় আন্দোলন। ভারতবর্ষের যাঁরা খাঁটি লোক, তাঁদের মধ্যে জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে, মতভেদের অবকাশ থাকা উচিত নয়। দেশের বহু কাজ, এখন বিপথে পরিচালিত, কারণ রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তাধারা অসংবদ্ধ। ভারতীয় রাজনীতি,অধিকাংশ অনুকরণ প্রবণ এবং মন্দ জিনিসের অনুকরণের দিকে ঝোঁক তার বেশী। কংগ্রেসকে পূর্ব্বের সমস্ত ধারণা পরিহার করে, প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা বিচার করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হোক, দক্ষিণপন্থী থেকে বামপন্থী সকল সদস্যগণকে ঐক্যমতে পরিচালিত হওয়া। স্মরণ রাখা উচিত, কংগ্রেসের কাজ রাজনৈতিক বা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব নয়, কংগ্রেস হচ্ছে, জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকমাত্র।

আজ স্বদেশী বক্তৃতা দিচ্ছেন একজন মুসলমান কারিগর। তিনি বোঝাচ্ছেন সহকর্ম্মীদের, পেটের জ্বালায় চুরি করে জেলে যাওয়া ছাড়া পথ ছিল না এতদিন— আজ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে আমরা শ্রমের বিনিময়ে দুমুঠো অন্নের স্বাদ গ্রহণ করছি।

স্বদেশী ও বয়কটের নৈতিক ঔচিত্য নিয়ে আজ যারা কচকচানি করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলা চলে— ভারতের নিম্নশ্রেণীর এইসকল ক্ষুদ্র ভ্রাতাদের জন্য হাজার হাজার অপরাধ করা যায়, চিরদিনের জন্য নিজের আত্মাকে অগ্নিকুণ্ডে ডুবিয়ে রাখা যায়।

হে আমার ভারতীয় জনগণ! হে পদদলিত, অজ্ঞ-অসহায় জনগণ! উচ্চে তোল স্বর, যাতে তোমারই রক্ত মাংস আমরা— তোমার কান্না যেন শুনতে পাই, তোমার সহজ সুখকে যেন জানতে পারি। আর আমাদের হস্ত ও হৃদয় মিলিয়ে দিতে পারি তোমাদের সঙ্গে, সমবেত যন্ত্রণায়, সমবেত ভালবাসায়।

পাঞ্জাবের এক গ্র্যাজুয়েট 'শিবনারায়ণ' জাতীয়তার সূত্র রচনা করে বিবেকানন্দ গোল্ড মেডেল পেলেন। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় সে সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হল ফেব্রুয়ারী ১৯০৬। সেটি পরে ইংলণ্ডের রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় ১৯০৬ প্রকাশিত হল :

(1) I believe in India, one and indivisible, (2) I believe in India, beloved mother of each and all her many million children (3) I believe in India's divine mission. (4) I believe in the saints of her birth and heroes of her breeding (5) I believe in India the invincible whom the world's loftiest and holiest mountains defend (6) I believe in the invigorating power of the ocean, on whose lap lies my mother secure (7) I believe in India the beautiful Natures own paradise of loveliest flowers and streams. (8) I believe in the santity of her every particle. (9) I believe in India's departed sons, whose ashes are mingled in the air, earth and water, that give me any food and form my very blood. (10) I am bone of their bone and flesh of their flesh. (11) I believe in the abiding relationship of Indians of all times and all communities. (12) I believe in brotherhood of all who belong to India's soil, be they of whatsoever casts or creed. (13) I believe in their living Indian nation, dearer to her children than aught else of earthly

kinship. (14) I believe in its golden past and glorious future. (15) I believe in the righteousness, valour and patrotism of India manhood. (16) I believe in the tenderness, chastity and selflessness of Indian womenhood. (17) I believe in India for the Indian people to live for and to die for. (18) I believe in one land, one nation, one ideal and one cause. (19) The service of my countrymen in the breath of my life– the be-all and end all of my existence (20) So help me Bharat ! Bande Mataram.

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, মঁসিয়ে লালীকের-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেন আমার হয়ে কয়েকটি কথা জেনে নেন। 'মেডাল'কে 'গোল' হতেই হবে এমন বাধ্য বাধকতা আছে কিনা, মেডালে 'এনগ্রেভ' না 'রিলিফ' করা উচিত। যোদ্ধার ঢালের আকারে তৈরী করলে কেমন হয় কিংবা গলার পেনডেন্ট এর আকারে করা সম্ভব কি? সেইসঙ্গে মেডালের বিভিন্ন স্কেচ করে পাঠালাম। মেডালে আড়াআড়িভাবে 'বজ্র'চিহ্ন স্থাপন করবো। 'বজ্র'কে ভারতের জাতীয় প্রতীক বলে গ্রহণ করেছি। 'জাতীয়তা' নামক ভাবটিকে আমি সর্ব্বপ্রকারে জনপ্রিয় করতে চাইছি। আমি নিশ্চিত যে মঁসিয়ে লালীক আমাকে উপদেশ দেবেন। আমি সর্বদাই চেয়েছি কিন্তু সফল হইনি— বিবেকানন্দের প্রতীকরূপে একটি মশাল তৈরী করতে, যাতে শিখাগুলি পার্শে ও উর্দ্ধে উচ্ছ্রিত। জানিনা তার সঙ্গে ভারতীয় ত্রিশূলকে যুক্ত করে দেওয়া যাবে কিনা, বোধ হয় না। যদি বাঙালী নারীকে মেডাল দিতাম, তাহলে ত্রিশূলটিকে একটি তারকাযুক্ত করতাম, সেইসঙ্গে বাংলা বা সংস্কৃতিবাণী 'ধ্রুব তারাকে দেখ'। কারণ ঐ কথাগুলি শিব বিবাহকালে উমাকে বলেছিলেন। ইউরোপীয়রা সাধারণতঃ যেভাবে মশাল আঁকে, ছাগশৃঙ্গের আকারে, আমি তা অত্যন্ত অপছন্দ করি। অপরপক্ষে, প্রাচ্যে নানা ধরণের মশালের আকার সর্ব্বদা দেখা যায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হল : যথেচ্ছ বাঁধা আঁটি বা পাকানো দড়ির আকার। মঁসিয়ে লালীক যাতে কিছু উপদেশ নির্দ্দেশ পাঠিয়ে দেন, তাঁকে অবশ্যই সে অনুরোধ করো। তাঁকে বলো, আমি নিতান্ত অজ্ঞ, আঁকতে জানিনা, তবু কখনো কখনো সুন্দর চিন্তা মাথায় আসে, আর আমি কোন বিষয়ে অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে ঘৃণা করি।

১৫ই মার্চ, ১৯০৬, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ইয়ুরোপের অনেক কিছু দেখতে চাই, অনেক মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বাসনাও আছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মনে হচ্ছে যে, সেখানে আর কখনও যেতে পারবো না। ভারতে যে প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমি ব্যয় করেছি, তাতে স্বামিজীর অভিমতে কাজ হচ্ছে এবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

১৪ই এপ্রিল ১৯০৬ সালের বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্স বসলো। উগ্রদমন নীতি অনুসরণ করলেন স্থানীয় সরকার। নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদের উপর নির্ম্মম আঘাত হানা হল। আহত হলেন বহু লোক। বন্দী হলেন অনেকে। নিপীড়িত হল চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা। চরমপন্থীর দল বরণ করলেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। অবলম্বন করলেন : গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা।

বরিশাল কনফারেন্স পণ্ড হবার পর কলকাতায় বহু প্রতিবাদ সভার আয়োজন হল। চললো উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা। যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায় ঝাঁপিয়ে পড়লো আন্দোলনে। উৎসর্গ করলো জীবন। ধ্যানজ্ঞান তাদের 'হয় জয়, নয় মৃত্যু', পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করাই হবে জীবনের আসল উদ্দেশ্য।

২২শে এপ্রিল ১৯০৬, কলকাতা হাইকোর্টে মিঃ জাস্টিস চেট্টি মানহানি মামলা খারিজ করে দিলেন। ২৩শে এপ্রিল স্টেটস্‌ম্যানে সংবাদ বেরুলো— Police libel actions case against the Statesman withdrawn. Joint suit declared illegal. Plaint to be amended.

সম্পাদকীয়তে বিচারপতি চিট্টির রায়কে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিরাট সমর্থন বলে অভিনন্দন করা হল। মিঃ জাস্টিস চিট্টি যদি অন্যপ্রকার রায় দিতেন তাহলে কালক্রমে সংবাদপত্রের পক্ষে করপোরেশন, পোর্ট কমিশনার, বঙ্গ সরকার বা ভারত সরকারের কোন কাজকে সমালোচনা করা অসম্ভব হয়ে উঠতো। মিঃ জাস্টিস চিট্টির রায় যার মধ্যে সহজবুদ্ধি ও উত্তম আইন জ্ঞানের প্রকাশ রয়েছে যৌথভাবে মামলা দায়ের করার আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

মিঃ র‍্যাটক্লিফ স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকরূপে, এবারও জয়ী হলেন— কিন্তু মালিকগণ আর জয় চাইছিলেন না। মিঃ র‍্যাটক্লিফকে চেয়ারে বসিয়ে কলম কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলে মিঃ র‍্যাটক্লিফ পদত্যাগের উদ্যোগী হলেন।

আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে শুরু হল। ২রা মে মুসৌরি থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন. সেন্ট সারা (মিসেস বুল) অবিলম্বে ইয়ুরোপ যেতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু প্রিয় য়ুম, তা আমি পারবো না, আর যাবার দরকার নেই। কারণ এখানে তিন সপ্তাহ ধরে রিক্রুট করছি। কয়েক দিনের মধ্যে কাজ আরম্ভ করার আশা রাখি। সে কাজে ৬ কি ৭ সপ্তাহ্ লাগা উচিত। কাজ শেষ হবার পরেই, পুণরায় আরম্ভ করা প্রয়োজন হবে অবিলম্বে, না হয় তা করতে হবে কলকাতায় পৌঁছেই।

আমি এখন বুঝতে পেরেছি, ঠিক মেডালের সঙ্গে ভুল মেডালের পার্থক্য কোথায়। সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে, গোল্ড মেডাল অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ জিনিস, নয় কি? সেদিন বিবেকানন্দ মেডাল দিয়েছি জাতীয়তত্ত্বের জন্য— এটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতা। কিন্তু সেটি দীন ব্যাপার আর মেডালই নয়। যদি মঁশিয়ে লালীকে অথবা কোন ইউরোপীয় শিল্পীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়, মঁশিয়ে লালীক অবশ্যই সর্ব্বোচ্য অথরিটি— তাহলেও তাঁকে অনেক প্রশ্ন করবো। দুবছর পরে আমাকে আর একটি মেডাল দিতে হবে : ঘোষিত ৬/৭টি বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ রচনার জন্য। সেটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতাই হবে পুনরায়। 'বিবেকানন্দ মেডাল', যাতে উৎকীর্ণ হবে দেবনগরী অক্ষরে 'বন্দেমাতরম' — যা এখন হয়ে উঠেছে রণধ্বনি এবং 'ওয়া গুরু কি ফতে — যে ধ্বনি ছিল স্বামিজীর অত্যন্ত প্রিয়।

মিসেস বুলকে লিখলেন : আমি, এমন কি হানাহানির মধ্যে বরিশাল যেতে চাই না।

কারণ আশঙ্কা ছিল প্রাদেশিক সম্মেলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু সরকারের 'চূড়ান্ত অপ্রেশনে' কনফারেন্স পরিণত হল সংগ্রামে।

এপাশে তিনি মিঃ গেডেসের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হলেন। তাঁর ইচ্ছা, জগদীশচন্দ্রের জীবনী তিনিই লিখুন। সেই সঙ্গে স্বীকার করলেন মিঃ গেডেসের কাছে অন্যদের ঋণের তুলনায়, তাঁর ঋণের পরিমাণ অনেক বেশী।

২রা মে ১৯০৬ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বসুরা মনে হয় না মিঃ গেডিসকে চিন্তাবিদরূপে জানেন। ...ডঃ বসুর এক ভাগিনেয়র প্রতি মিসেস গেডিস একবারে মাতৃসুলভ আতিথ্য জানিয়েছেন। ডঃ বসু, মিঃ গেডিসকে তাঁর বই এক কপি পাঠাচ্ছেন।

২রা মে ১৯০৬ মঁসিয়ে লালীকের পত্র পেলেন : মেডাল গোলাকার হবে, তাতে অনুচ্চ রিলিফ থাকবে।

এই সময়ে পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘটে গেল 'রায়ট'। সুযোগ পেয়ে গেলেন সরকার। ৯ই মে, ১৯০৭ লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসনে পাঠান হল।

নিবেদিতা সংবাদ পাওয়া মাত্র ডায়েরীতে লিখলেন : সরকার কি উন্মাদ?

১২ই মে স্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকীয় বেরুলো : ভারতীয় জনগণ যদি লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনকে অতিরিক্ত হৃদয়ঘাতী ব্যাপার বলে মনে করে, তাহলে খুবই ভুল করবে। এরপর ভারতীয় সংবাদপত্রের কট্টর সমালোচনা ও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিদানের সমর্থন। বলা হল, অনেক যোগ্য বিচারপতি, যাঁরা ভারতীয় আশা-আকঙক্ষার প্রতি মোটেই শত্রুভাব পোষণ করেন না — দেশীয় সংবদপত্র সমূহের অবিরাম ক্রুর কঠিন তিক্ততায় স্তম্ভিত। অতি সাধারণ প্রশাসনিক কাজের উপর জঘন্যতম উদ্দেশ্য আরোপের স্থায়ী অভ্যাস, কোন প্রশাসক কোন ক্ষেত্রে জনগণের সুলভ অনুভূতির বিপরীত কিছু করা মাত্র তার মানবিকতায় সন্দেহ, তৎসহ ঐসব পত্রপত্রিকার কোন-কোনটির ঘোর অসাধুতা— এইসকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশীয় পত্রিকাগুলি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। ...শিক্ষিত ভারতবাসীরা অবশ্যই মুক্তভাবে স্বীকার করবেন যে, বৃটিশ সরকার ছাড়া ইউরোপের আর কোন সরকার এই ধরণের পত্রপত্রিকা মারফৎ প্রচারিত সভায় বক্তৃতা-মারফৎ উদ্গারিত হিংসা-প্রচারকে এক সপ্তাহও সহ্য করবে না— কিন্তু ইংলণ্ড ধৈর্য্য ধরে, এতগুলি বৎসর সহ্য করে এসেছে। চরমপন্থীদের শাস্তি প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য্য। দাঙ্গা ও রাজাদ্রোহীতাকে কোন সরকার সহ্য করতে পারে না। আর যেসব ব্যক্তির কথাবার্ত্তা বিশৃঙ্খলা বা বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে, ফলভোগ তাদের করতেই হবে। অবশ্য সরকারকে সংযমের উপদেশ ও ন্যায়বিচারের অনুরোধ জানানোও হল। সেই সঙ্গে জনগণকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে নীরবে নতভাবে গ্রহণের উপদেশও দেওয়া হল।

১৫ই মে ১৯০৬, দ্বিতীয় সম্পাদকীয় বার হল, স্টেটসম্যানে : অনেকেই পাঞ্জাবে, ওল্ড রেগুলেশন প্রয়োগে ক্ষুব্ধ। কিন্তু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা তত মন্দ নয়। নির্ব্বাসন কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও বস্তুতঃ খারাপ নয়। আদালতের বিচারের পর শাস্তি দিয়ে সাধারণ অপরাধীর মত জেলে পাঠানোর চেয়ে নির্ব্বাসন তো তোফা ব্যবস্থা। নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ভালই থাকবেন— তারপর যখন দেশে ফিরবেন তখন তো এক ঝটকায় মহাদেশনেতা। এই ধরণের নির্ব্বাসন রাজনৈতিক বন্দীর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তাই লাজপত রায়রা মোটেই রাজনৈতিক বন্দীর মর্য্যাদা পেতে পারেন না। সাধারণ বিচারের মধ্য দিয়ে এঁদের নিয়ে যাওয়ার কিছু অসুবিধা থাকার জন্য এই প্রকার নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের শাস্তিবিধির সঙ্গে তুলনা করলে, দেখা যায় ইংরাজরা কত নরম। রাশিয়া প্রভৃতি অসভ্য দেশের নিষ্ঠুর ব্যবস্থার কথা তোলবার দরকার নেই, জার্ম্মানী ইত্যাদি দেশে ইংরাজদের কোমল আচরণ সম্বন্ধে ঘৃণার অন্ত নেই।...

অবস্থা অত্যন্ত তিক্ত। মিঃ র‍্যাটক্লিফ আইনের পরামর্শ নেবার ইচ্ছা করলেন। ১৯শে মে ১৯০৬, তাঁর বাসভবন (৪১ চৌরঙ্গী) থেকে নিবেদিতাকে এই বিষয়ে লিখলেন :—

প্রিয় সিস্টার নিবেদিতা, এই পত্র সংলগ্ন দ্বিতীয় রচনাটি প্রকাশের জন্য আমি দু'তিন দিন পদত্যাগ করেছি। ঐ রচনাটি যাতে প্রকাশিত না হয়, সেজন্য পূর্ব্বাহ্নে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। পি. কে ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গেও তারপর দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেইকালে, তিনি তাঁদের ঐ কাজের দ্বারা কোন অন্যায় হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না এমন বলেন। ঠিক ভাবে বলতে গেলে, তাঁরা আমাকে দিয়ে যৎপরনাস্তি বলিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন যে, আমি পদত্যাগের জন্য চাপ দেব না, অন্ততঃ এক বছরের আগে ছাড়বো না। তাঁরা চুক্তি শর্তের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জোর করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু যুক্তি দেখাচ্ছেন— গত বৎসর ইংল্যণ্ড যাতায়াতের ভাড়া ও ছুটির আংশিক মাইনে নেওয়া মানে আরও কয়েক বছর কাজ করার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা। এখানকার ব্যবসায়িক চুক্তি পদ্ধতির সম্বন্ধে অবহিত নই বলে ব্যাপারটি এক সলিসিটরের কাছে যাই। তিনি বললেন :

ওঁদের বক্তব্য উদ্ভট। সুতরাং আমি একটি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখেছি — যাতে বলেছি, উক্ত কথাবার্ত্তার বিষয় পুনর্বিবেচনা করার পরেও আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখছি এবং শরৎকালে চলে যেতে চাই। সলিসিটর যদি এই চিঠিতে অনুচিত কিছু বিবেচনা না করেন, আগামী কাল পাঠিয়ে দেব।

৩০শে মে, ১৯০৬ ম্যাকলাউডকে লিখলেন : জেলের জীবন মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ দেয় কি? তোমার মেয়ের (নিবেদিতার) বিষয়ে তা সত্য হোক — তা খুবই চাই।

এবছরটি ভারতের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড মত সংঘর্ষ। ডন সোসাইটির উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠিত হল। অরবিন্দ বরোদা কলেজ থেকে পদত্যাগ করে সে শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করলেন। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি নিষিদ্ধ হয়েছে। রাজা সুবোধ মল্লিক 'বন্দেমাতরম' নামে জাতীয় পত্রিকা বার করলেন। সে পত্রিকার সম্পাদক হলেন অরবিন্দ। বাস শুরু করলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রাজভবনে। বিপ্লবী গোষ্ঠীর গোপন আড্ডায় পরিণত হল সে ভবনটি। এতদিন তিনি বরোদা থেকে তাঁর দলকে পরিচালন করে আসছিলেন। প্রয়োজনে কলকাতায় এসে দলকে নির্দ্দেশ দান করে বরোদায় ফিরে যেতেন। এখন স্থায়ী বাস হল কলকাতায়। ফলে চরমপন্থীদের দলবৃদ্ধি ঘটার সুযোগ এসে গেল।

নিবেদিতার নিজস্ব দল সংগঠন ছিল। তাদের কাজ সারা ভারতে 'জাতীয় তত্ত্ব' প্রচার ও বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ইংরাজ শাসনপদ্ধতির (শোষণপদ্ধতির) চিত্র পরিস্ফুট করে দেশবাসীর হৃদয়ে জন্মভূমি 'ভারত' সম্বন্ধে সহানুভূতির জাগরণ ও জনমত সৃষ্টি করা। ইংরাজ শাসকবর্গ ও ধর্ম্মপ্রচারক খ্রীষ্টান পাদ্রী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রচারিত বিকৃত সংবাদ : ভারত একটি অসভ্যজাতি। তাদের সভ্য করে তোলার দায়িত্ব ইংরাজ সরকার ও পাশ্চাত্য দেশবাসীর। প্রচার ছিল : ভারতবাসীরা অশিক্ষিত কুসংস্কারচ্ছন্ন। তাদের— তন্ত্রমন্ত্র, ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার, এমনকি পুতুল পূজা করে। এক কথায় : ওরা আদিম ও বর্ব্বর দেশ। বহু বিবাহের প্রচলন ওখানে। তারা, অসত্যভাষী, মিথ্যার পূজারী। নৈতিক চরিত্র বলে কিছু নেই। তাঁর দলের কাজ : ভারতে সভ্যতা, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারা প্রচার দ্বারা, বিকৃত সংবাদের বিকৃতিরূপকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা। এদেশ প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি। তাদের সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যে কোন উন্নত দেশ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ও মহান।

আর অরবিন্দ গোষ্ঠী তথা চরমপন্থীদলের কাজ : জনচিত্তে বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্বলিত করা। বঙ্গ ভঙ্গ অন্দোলন এনে দিল সেই সুযোগ। বিক্ষোভ প্রকাশে জাতীয় আত্মার নবজাগরণের পথ প্রশস্থ হল। শাসকশ্রেণী, তাদের করে রেখেছে নিরস্ত্র, এমনকি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, প্রমাণ বাঁশের লাঠি ব্যবহারের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। তাই সে আন্দোলনে "বয়কট" হল প্রধান অস্ত্র। বিপিন পাল অরবিন্দকে দিলেন 'বয়কট' ও 'অসহযোগ' মন্ত্র। সেটাই প্রযোজ্য হল শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসাবে। সেই সঙ্গে যুক্ত হল স্বদেশী অর্থাৎ স্বদেশজাত দ্রব্য গঠনের অঙ্গীকার। শিল্পকে বিধ্বস্ত করেছে বণিক সরকার। হোক সেই শিল্পের পূণঃ জাগরণ। জনগণকে প্ররোচিত কর : স্বদেশজাত দ্রব্য গ্রহণে। স্বাবলম্বী হবে দেশ। দেশের অর্থ, দেশে থেকে যাবে। অর্থের বুনিয়াদ হবে দৃঢ়।

নিবেদিতা এতদিন বক্তৃতায় যা প্রকাশ করে এছেন, নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছেন, জাতির জাতীয়তার ভিত্ত প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ সেই চেষ্টা চালিয়ে এসেছিলেন লেখনীর দ্বারা। উদ্বোধিত জনচিত্ত,

প্রয়োজন আজ তাকে সংগঠিত করা। ব্যক্তিমাত্রের স্বতন্ত্র্য মত থাকবে, তা থাকাও উচিত, সেটাই সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু তা যেন, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি না করে। দলমত ব্যবহার করে, দলীয় স্বার্থ সিদ্ধিলাভই হবে সে 'মন্ত্র'। সংঘর্ষ নয়, মিলিত শক্তির প্রয়াসে সে হবে 'বজ্র'। মিলিত পথ, মিলিত মতই, সৃষ্টি করবে সর্বগ্রাসী এক শক্তি, যার গতি হবে অপ্রতিরোধ্য। সে ঝড়, সে উল্কা, সে বজ্র, সেই গতি নিয়ে এগিয়ে চলবে— নূতন সৃষ্টির পথে।

ইতিপূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন উচ্চ শিক্ষা সংকোচন করার উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান ইয়ুনিভারসিটি অ্যাক্ট' পাশ করিয়েছিলেন ১৯০৪ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের তাঁবেদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল তার ফলে। ডন সোসাইটি উদ্যোগী হলেন, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অর্থ সাহায্যে এগিয়ে এলেন। গড়ে উঠলো জাতীয় শিক্ষা পরিষদ —সম্পূর্ণ স্বাধীন তার কাজ। এগিয়ে এলেন অরবিন্দ, বরোদা ছেড়ে এসে, যোগ দিলেন সে প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষরূপে। খুশী হলেন নিবেদিতা। তিনি নিজে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। 'তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য' : বলিষ্ঠ স্বাধীনতা ও গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাব, বিস্তারিত হয়েছিল শিক্ষিত মহলে। জাতীয় পরিষদ তা কার্য্যে পরিণত করতে উদ্যত হল।

'ডন' ছাড়া বেরুলো দুটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। অনুশীলন সমিতির 'বিপ্লবী গোষ্ঠী' বার করলেন 'যুগান্তর'। যারা এই পত্রিকা পরিচালনে সংঘবদ্ধ, তারাই চিহ্নিত হলেন 'যুগান্তর পার্টি' রূপে। 'সন্ধ্যা' নামে আরও একটি পত্রিকা বার করলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। অরবিন্দের সম্পাদনায় 'বন্দেমাতরম' জাতীয় জাগরণের মুখপত্র রূপে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে অরবিন্দ 'যুগান্তরে' বিপ্লবী মানোভাব প্রচার করতে শুরু করলেন। যা যুব চিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করলো ও তার প্রভাব সুদূর প্রসারী হল। 'সন্ধ্যা' চড়াভাষায় জাতীয় মতবাদ প্রকাশ করে চললো। এই তিনটি পত্রিকার ভাব ও ভাষা জাতীয় চিত্তকে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন করে তুললো। 'বন্দেমাতরম্' ইংরাজী পত্রিকা। যুগান্তর ও ও সন্ধ্যা বাংলা পত্রিকা। এর সঙ্গে যোগদিলেন গিরীশচন্দ্র ঘোষ। তিনি মঞ্চস্থ করলেন জাতীয়তাবাদী নাটক সমূহ, একের পর এক। ফলে বাংলাভাষীদের আন্দোলন সর্ব্বভারতীয় রূপদানে অগ্রসর হল। এদের সঙ্গে যোগ দিলেন পাঞ্জাবের লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক।

'ধর্ম্ম' অন্তরের অনুভূতি। স্বামিজীর মুখে শুনেছিলেন, গোপালের মার কথা। যিনি ছিলেন গ্রাম্য, নিতান্ত সরলা — লৌকিক বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অথচ তন্ময়তায় জপ করতেন 'গোপাল'কে। এই জপেই তাঁর সিদ্ধিলাভ। দর্শন করেছিলেন স্বয়ং গোপালকে — দেখেছিলেন বাহিত সেই গোপাল মিলিয়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে। সেই থেকেই তাঁকে ডাকতেন সকলে 'গোপাল-মা' বলে। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় 'পা' দিয়ে নিবেদিতা যখন স্বামিজীর সঙ্গে শ্রীমার বাসস্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, প্রথমেই দেখা হল গোপালের মার সঙ্গে। তাঁকে দেখেই সাদর সম্ভাষণ করলেন 'এই বুঝি নরেনের মেয়ে'! এসো মা। তারপর শ্রীমার সঙ্গে পরিচয় — তাঁর বাড়ীতে অবস্থান সে পুরনো ইতিহাস, তা হলেও আজ তা সত্য। এই গোপালের মার বাসায় গিয়েছিলেন কামারহাটিতে নৌকায় চড়ে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে। ফিরে এলে, স্বামিজী তাদের বলেছিলেন — আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ। উপাসনা, উপবাস আর রাত্রি জাগরণ — সে ভারত বিদায় নিয়েছে!

নিজেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গোপালের মা — শ্রীমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীমাও সাদর অভ্যর্থনা জানালেন — এসো, বসো মা। বসালেন একান্তে, তাঁর পাশে। সে এক গভীর

অনুভূতি। সেদিন মনে জেগেছিল — সে এক অপূর্ব্ব শিহরণ। অভিভূত হল মন — গর্ভধারিনী মায়ের বিচ্ছেদ বেদনা — অপহৃত এক নিমিষে। মনে হল : তিনি বসে আছেন নিজ-মায়ের কাছে। এ যেন ভূবনমোহিনী মা, বিশ্বলোপ করে আপন করে টেনে নেন — অনুভূতির অপূর্ব জগতে।

গোপালের মার প্রতি তাঁর এই যে আকর্ষণ, আজও তা অক্ষুণ্ণ। উচ্চস্তরের সাধিকা তিনি। তাঁর সঙ্গ লাভের আশায়, সময় পেলেই নৌকায় চড়ে ছুটে যেতেন কামারহাটিতে। সেই গোপালের মা বার্দ্ধক্য হেতু, অসুস্থ ও অশক্ত। শ্রীমার বাসের নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা তখনও হয়নি। কলকাতায় তিনি এলেই ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করতে হয় তাঁকে।

স্বামী সারদানন্দ গোপালের মাকে বলরাম বসুর বাড়ীতে (৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে) নিয়ে এলেন। নিবেদিতা প্রস্তাব করলেন : তাঁর বাড়ীতেই গোপালের মার থাকার ব্যবস্থা করবেন ও তাঁকে দেখাশুনার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করবেন।

নিশ্চিন্ত হলেন স্বামী সারদানন্দজী। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে নিয়ে আসা হল তাঁর বাসায়। ব্যবস্থা হল একটি স্বতন্ত্র ঘরের। দেখাশুনা ও পরিচর্য্যার জন্য রাখা হল কুসুম নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে।

মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, গোপালের মা এখানে আছেন। আমার কি যে আনন্দ। সারদানন্দজী মত দিয়েছেন। তিনি আমাদের কাছে থাকবেন — আমাদের আদরের ছোট ঠাকুরমা। তাঁর আগমণে এ গৃহ পবিত্র। সেবার অধিকার পেয়ে তিনি ধন্য।

দীর্ঘ আড়াই বছর তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন তাঁকে। অসংখ্য তাঁর কাজ। তার মধ্যেও একবার তাঁর কাছে এসে বসবেনই। সে মুহূর্ত্তে তিনি অন্য নিবেদিতা। ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, কর্ম্মদক্ষতা লুপ্ত হয়ে যায় সেই মুহূর্ত্তে, আধ্যাত্মিক জীবনের স্পর্শলাভ করেন তখন। তিনি শয্যাশায়ী, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে, পা টিপে দিতেন আস্তে আস্তে। মনে অনুভব করতেন গোপালের মার সবটুকই গোপালময়। নিজেই তিনি গোপাল।

৭ই জুন ১৯০৬, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন ঃ ঐ গ্রীষ্মে খোকার শরীর বিশেষ দৃঢ় নয়। সেই বিরাট গ্রন্থটি তৈরী করা, তামাসার কাজ ছিল না। কিন্তু এই বছরটি যদি কোনভাবে নিরাপদে কাটে, আমার আশা ও বিশ্বাস জগন্মাতা, তাহলে তাকে বসন্তকালে দু'বছরের অবকাশ যাপনের সুযোগ দেবেন। অতীব, অতীব প্রয়োজন তার। বেচারা খোকা! আমার মনে হয়, ঐ হল তার বাইরে যাবার সেরা সময়। কারণ আমি যখন এখানে নেই, সে অত প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারবে না। তাকে অবশ্যই কিছু পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে। বিরাট এই সাফল্যের আনন্দ, সান্ত্বনারূপে তো থাকবে!

নিবেদিতা ৮/৯ই জুন ১৯০৬, র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : আমার মনে হয়, গোড়ায় তোমার যে ঝঞ্ঝাট হয়েছিল, তা আবার ঘটবে? কথা হচ্ছে, কিভাবে বন্ধন ছিন্ন করে, তুমি কবে চলে যাবে? তা করতে হবে উভয় পক্ষের অমায়িক সম্পর্কের কালে—যখন ওরা মনে করবে, ব্যাপারটা বেশ তো স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে — সেই সময়ে সরে গিয়ে ওদের অসুবিধায় ফেলতে হবে। সুতরাং তোমাকে পি. কে'র বিদায় সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাব জানতে হবে। মধ্যবর্ত্তীকালে ইংল্যাণ্ডে কাজের জন্য যোগাযোগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? ভারতীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কি? আমার ইচ্ছা, তারা জোট বেঁধে ইংলণ্ডের একজন ভাল সংবাদদাতাকে পোষণ করুক। ওটা কি অসম্ভব?

মিঃ র‍্যাটক্লিফকে ভারতীয় কাগজে নিযুক্ত রাখার গভীর আগ্রহ ছিল নিবেদিতার। তিনি র‍্যাটক্লিফের চিঠিখানির কপি পাঠিয়ে দিলেন মিঃ গোখলেকে। লিখলেন :

সংলগ্ন পত্রটি মোটামুটি গোপনে রাখবে। বেশ বুঝতে পারছি, নূতন পার্শী কাগজটির কাজে, আমাদের বন্ধুকে লাগানো যাবে না। তোমার নীরবতা থেকে তা ধরে নিয়েছি। কিন্তু তুমি কি ভূপেনবাবু (বসু) বা অনুরূপ কাউকে পত্র লিখবে এবং প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে যাতে, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ কিনে নিয়ে সেটি ওঁকে অর্পণ করা হয়? বন্ধুর দিক দিয়ে বিচার করলে, আমার পক্ষে তাঁকে ইংলণ্ডে স্বজনগণের মধ্যে অনাড়ম্বর সহজ জীবনে ফিরে যেতে লেখাই উচিত হবে। কিন্তু যখন তাঁর ঐকান্তিকতা ও সামর্থ্যের কথা, সেইসঙ্গে তাঁকে আমাদের কতখানি প্রয়োজন, সেকথা চিন্তা করি, তখন আমার পক্ষে এটি সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে যে, ভারতবর্ষ নিষ্ক্রিয় থেকে, তাঁকে চলে যেতে দিচ্ছে।

জুলাই ১৯০৬, ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকা লিখলেন, 'দি টার্মস্ অব দি ন্যাশনাল মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। সে প্রবন্ধে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। বেনারসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ অনেক কষ্টে থামিয়ে ছিলেন। কিন্তু সে ঐক্য রক্ষা ক্রমশঃই কঠিনতর হয়ে উঠছে। বেনারস কংগ্রেসের পর থেকেই চরমপন্থীরা সংগঠিত হয়ে শক্তি প্রকাশ করে চলেছেন। ফলে, উভয় গোষ্ঠীরই মত পার্থক্য অধিকতর তীব্র ও তিক্ত আকারে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগালো। নিবেদিতা এই ধরণের সংঘাতকে শক্তির বৃথা অপচয় ও শত্রুপক্ষের সহায়ক বলে মনে করলেন। প্রবন্ধটি সেই উদ্দেশ্যেই রচিত।' সূচনায় তিনি দুঃখের বিদ্রুপ কণ্ঠে বললেন : তরুণ ভারতে (চরমপন্থীগণ) ইউরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক দৃশ্যদর্শনে মোহিত। শুধু মোহিত নয় সম্মোহিত। তরুণ ভারত ভাবছে, ইয়ুরোপীয়দের নকল করে, কতকগুলি বিবাদমান দল তৈরী করলেই পাশ্চাত্য দেশপ্রেমে, তেজ, বীর্য্য, এসে যাবে। ইয়ুরোপের কাছ থেকে তরুণ ভারত শিখতে চাইছে কী না, পারস্পরিক অভিযোগ, প্রতি অভিযোগ ও পরস্পরিক আক্রমণ, নিন্দা ও নৈরাশ্যের রোষ, জ্বালা, বিপথচালিত কর্ম্ম ও বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক চিন্তা! 'নকল নবিশি এইসব ঘদবস্তুকে' পরিহার করার অনুরোধ জানিয়ে ভারতীয়দের সচেতন করার উদ্দেশ্যে লিখলেন : ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব নেই। কংগ্রেসের প্রাণসত্তাকে অনবদ্যভাবে প্রকাশে বললেন, "কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধি নয়, তারা জাতীয়তা আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকের প্রতিনিধি। ঐ জাতীয় আন্দোলনের দায়িত্ব সমগ্র জাতির সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা— যা, পরস্পরকে ঐক্যভূমির সঙ্গে জীবনের ঐক্যবোধের ভিত্তি প্রদান করবে।

উদ্বুদ্ধ করতে হবে নারীকে, স্পর্শ করতে হবে অশিক্ষিত, অসহায় অস্ফুট বাক জনগণকে। শেষোক্ত কাজ হোক স্বদেশী ব্রতের লক্ষ্য 'শিল্পের পুনর্গঠনের দ্বারা'। স্বামিজীর ভাষার প্রতিধ্বনি করলেন : 'নারী ও জনগণের উপরেই দেশের উত্থান নির্ভরশীল। ছাত্র প্রচার করুক ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে, ভারতের মানচিত্র সহ ভারত ভ্রমণ করুক। তাদের হৃদয়-মন পূর্ণ থাক, গাঁথা ও কাহিনীতে, ভৌগলিক বিবরণীতে। সমস্ত কিছুর ধূয়া 'শেষে পর্য্যন্ত হোক' ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!...

বেনারস কংগ্রেসের পর মিঃ গোখলে, মডারেটপন্থীর নায়ক হিসাবে ১৯০৬ সালের প্রথমে ইংলণ্ড গেলেন, যদি কিছু সুবিধা আদায় করা যায়। কারণ চরমপন্থীদের শক্তি তখন ক্রমবর্দ্ধমান। শাসনতান্ত্রিক অল্পবিস্তর সুবিধালাভের একান্ত প্রয়োজন। ইংলণ্ডে লেবারেল দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ভারত সচিব হয়েছেন, প্রগতিশীল জন মর্লে, যিনি বার্ক, মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের একান্ত অনুরক্ত। নিবেদিতা অবশ্য মিঃ গোখলের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আশাবাদী নন। মিঃ মর্লেকে চিনতেন প্রথম

থেকে। ভারত সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা প্রতিক্রিয়াশীল। বরং চাইলেন মিঃ গোখলে ইংলণ্ডে গিয়ে মিঃ প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন ও তাঁর কাছ থেকে অর্থনীতির পাঠগ্রহণ করুন। মিঃ গেডেসের অর্থনীতি সুদূর প্রসারী। বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত অভিমত জানালেন ২২শে মার্চ ১৯০৬; নিজস্ব অর্থনীতিজ্ঞানে তুমি পরিতৃপ্ত। বহুপঠন সত্ত্বেও সে চিন্তার মৌলিকতা নেই। মিঃ গেডেসের মনের সাহচর্য্য তোমার কাছে বিশেষ উপকারী হয়ে উঠবে।

কর্ম্মধারা ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ১১ই এপ্রিল ১৯০৬ পুনরায় মিঃ গোখলেকে চিঠি দিলেন, বিপ্লবী ক্রপ্টকিনের সঙ্গে দেখা করবে। বর্ত্তমানে, রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংলণ্ডে বসবাস করছেন।

অরবিন্দের উপর বেশী নির্ভর করতেন। তিনি বাংলায় ফিরে এসে আবার লেখার কাজে মন দিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ ছিল প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই। ১৮৯৯ সাল থেকেই ওর সঙ্গে স্বামিজীরও যোগাযোগ ছিল। প্রায়ই আসতেন স্বামিজীর কাছে। প্লেগ পরিচর্য্যার সময়ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতির কাজেও আসা-যাওয়া ছিল যতীন্দ্রনাথের। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে একটি ছোরা নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, বাঘটিকে মেরে ফেলেন। সেই থেকে তিনি পরিচিত হলেন 'বাঘাযতীন' নামে। তাঁর নিজস্ব একটি দল ছিল। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।

বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সংকীর্ণতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি গেডেসকে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষতার জন্য অন্যদের প্রণোদিত করলেন। পরিষদের পক্ষে : সঠিক মানুষ মিঃ গেডেস। ইতিপূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জনের উচ্চশিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিরোধ করতে জামসেদজী টাটা বহু লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করেন। সে টাকায় বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইয়ে স্বামিজীর সমর্থনে টাটার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সেই সূত্রেই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পাশ্চাত্য মনীষীদের মত চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। তার উত্তরে মিঃ গেডেস দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখে পাঠান। সেগুলি মাদ্রাজ মেলে ১৬ই, ১৭ই আগস্ট বেরিয়েছিল ১৯০১ সালে। মারাঠাও সেগুলি ছেপে ছিল, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০১ সালে। তখন থেকেই মিঃ গেডেসকে ভারতে আনার চেষ্টা করে চলেছেন। স্বামিজী পরিচয় সূত্রে মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা প্রত্যেকে পরস্পরের অন্তরঙ্গ। নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখেছিলেন, ১৯০১ সালের ৩০শে অক্টোবর, মিঃ গেডেস! ওরা আমাদের। ...ওদের একদিন না একদিন প্রাচ্যে আমাদের চাই।

৯ই জুন, ১৯০৬ লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে, ... তোমার সঙ্গে অনেক কথাই আছে। কখনো কখনো আমি ভাবাভিভূত হয়ে পড়ি, যখন ভাবি খোকার জীবনীর কয়েক অধ্যায় অন্ততঃ, তোমার সঙ্গে বসে, আমার প্রস্তুত করে ফেলা উচিত!

সংবাদ পেলেন ২৭শে জুন স্বরূপানন্দ ইহজগত ছেড়ে চলে গেছেন। মায়াবতীর কাজ বেড়ে যাওয়ায়, উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে নৈনীতালে গিয়েছিলেন। সেখানে 'নিউমনিয়া' রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেছেন।

চোখের পাতায় ভেসে উঠলো স্বরূপানন্দের মুখ। স্বামিজীকে কেন্দ্র করেই পরিচয় তাঁর সঙ্গে। পরে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পরিচালনার কাজে সাহায্য করে এসেছিলেন, "Occassional Notes" লিখে। তাঁর এই আকস্মিক তিরোধানে বিচলিত হয়ে পড়লেন।

অতীত— ভেসে উঠলো চোখের পাতায়। তাঁর দীক্ষার কয়েকদিন পরেই স্বরূপানন্দের দীক্ষা। স্বামিজীর কাছে পূর্ব্বে তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসার বাণী শুনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বাংলা শিক্ষার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করলেন স্বামিজী। দিনটি ছিল ২৮শে এপ্রিল ১৮৯৮। এর পূর্ব্বে ৩১শে জানুয়ারী তাঁর ভারতে আসার অব্যবহিত পরে, অন্য একজনকে বাংলা শেখানোর ভার দিয়েছিলেন স্বামিজী। প্রথম দিনেই তিনি তাঁকে দুটি বই দিয়ে বলেছিলেন : বাংলা শেখার পর এই বই দুটি ইংরাজীতে অনুবাদ করবেন— আমাদের প্রভু 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী'।

মায়াবতী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৯৮ এর জুলাই-এ। এর আগে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাটি প্রকাশিত হত মাদ্রাজ থেকে। স্বরূপানন্দকে সম্পাদক নিযুক্ত করে মায়াবাতীতে তা স্থানান্তরিত হল। আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বরূপানন্দের কাছে প্রতিদিন বাংলা ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ নেওয়া শুরু।

স্বরূপানন্দের পূর্ব্ব নাম ছিল অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮০১ সালে জন্ম তাঁর ভবানীপুর অঞ্চলে। আশৈশব তিনি বিদ্যানুরাগী। প্রতিভা বলে তিনি উচ্চশিক্ষিত, নীতিবোধ সম্পন্ন ও পরিমার্জিত। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভের পর বৈদিক ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে উৎসাহী হয়ে অধ্যাপক রেখে ব্যুৎপত্তি লাভের পর নিজ সম্পাদনায় 'ডন' নামে মাসিক পত্রিকা বার করেন। সেইসঙ্গে ভাগবৎ চতুষ্পাঠীও স্থাপন করে শাস্ত্রদর্শনাদির চর্চ্চার ব্যবস্থা করেন। ১৮৯৭ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন' সোসাইটি স্থাপন করলেন— সেই সমিতির পরিচালনায় 'ডন' পত্রিকাটি নূতন রূপ নেয়। সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র, যুগ্ম-সম্পাদক হলেন অজয় হরি।

স্বামিজী 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ' প্রতিষ্ঠার পর সংঘের মুখপত্র প্রকাশে উন্মুখ তখন। ঠিক সেই সময়ে, আদর্শবাদী রাজম আয়ার মাদ্রাজ থেকে তাঁর সম্পাদনায় একটি পত্রিকা বার করতে উদ্যত হলেন। স্বামিজীর কাছে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি পত্রিকাটির নাম দিলেন, ''প্রবুদ্ধ ভারত'। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে, রামকৃষ্ণ আন্দোলনের ক্ষতি অপূরণীয় হয়ে উঠলো।

অজয় হরি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। স্বামিজীও সন্ধান করছিলেন একজন খাঁটি অদ্বৈতবাদীর। ভক্তি-স্রোতে ভেসে থাকা বা সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজক হলে এমন বহুলোকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অথচ, অ-ভারতীয়দের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে বেদান্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন ও সেই আদর্শের বার্ত্তাবহ হবেন, এমন একটি লোকের সন্ধান করেছিলেন তিনি।

অদ্বৈতবাদী ইংরাজ দম্পতি ফেস্টেন ও মিসেস সেভিয়ার হিমালয় অঞ্চলে একটি অদ্বৈত কেন্দ্র স্থাপনে ইচ্ছুক, স্বামিজী পেয়ে গেলেন অজয় হরিকে। তাঁকে দীক্ষা দিলেন ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। কয়েক সপ্তাহ পরে সাধারণ নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে তাঁকে দিলেন সন্ন্যাস। নাম দিলেন 'স্বরূপানন্দ'। তাকে সম্পাদক করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে দিলেন পাঠিয়ে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও স্থানান্তরিত হল 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব ও ভাবনা' প্রচারের উদ্দেশ্যে।

বিরোধ বাঁধলো স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গে। এঁরা উভয়েই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পূজক। মায়াবতীর আশ্রমের একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পটস্থাপন করে পূজাপাঠ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার স্বামিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্ষুব্ধ হলেন স্বামিজী। পটটি সরিয়ে নেওয়া ব্যবস্থা করলেন। ওঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীমা সারদামণির কাছে অভিযোগ করলেন। ইতিমধ্যে স্বামিজী দেহত্যাগ করেছেন। উত্তরে শ্রীমা ১৯০২ সালের ৩১শে আগস্ট, জানালেন, আমাদের গুরু যিনি, তিনি অদ্বৈত, সেই গুরুর শিষ্য তোমরা, তোমরাও অদ্বৈতবাদী।

চোখের পাতায় ভেসে উঠলো স্বরূপানন্দের মুখ। মনে পড়লো : জীবনে যখন অন্তঃসংঘাত তাঁর তীব্রতর, শান্তির আশায় মনটা একান্ত ব্যাকুল, সেদিন স্বরূপানন্দই তাঁকে দিলেন ধ্যানের শিক্ষা, যার সহায়ে ভুলে ছিলেন নিজেকে। প্রস্তুতি হল মন : খুঁজে পেলেন জীবনের সাধনক্ষেত্র— পেলেন মহামিলনের সে শুভলগ্ন। বুক ভেদ করে নেমে এলো দীর্ঘশ্বাস। হায়! সে স্বরূপানন্দ যাত্রা করেছেন বহুদূরে নাগালের বাইরে।

এই তো ৮ই জুন ১৯০৬, সহসা মাথায় একটা আইডিয়া, এলো বৈদান্তিক স্বরূপানন্দের এখন লণ্ডনে যাওয়া উচিত। চিঠিও লিখেছিলেন: জানো ইদানিং মাথায় আমার একটা চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। মিসেস সেভিয়ারকে স্বরূপানন্দের সঙ্গে লণ্ডনে ফিরতে প্রণোদিত করা— সেখানে এখন বেদান্ত প্রচারের কাজ আরম্ভ করা উচিত। সে কাজ সম্ভব হলে; স্বামিজী কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন, একথা না ভেবে স্থির থাকতে পারছি না। হায়! চিন্তা, চিন্তাই রয়ে যায়। কাজের ফসল ওঠে না।

স্বরূপানন্দ আলমোড়ায় তাঁর শুধু বাংলা শিক্ষক ও গীতা পাঠের সহায়ক ছিলেন না। যখন প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যা বেরুলো সেটা অগস্ট ১৮৯৮, স্বামিজীর একটি চিঠি, "To the Awakened India' কবিতায় পরিণত করে সেটি ছাপা হল। স্বামিজী তাঁকে আলমোড়ায় পাঠাবার স্থির করলেন সম্পাদককে সাহায্য করার জন্য। এ সময়ে তাঁর মাথায় এসেছিল কোন এক সোসাইটি পরিচালিত 'Great thought' নামক পত্রিকাটির কথা। চিঠি দিয়েছিলেন, মিসেস হ্যাম্পকে, স্বরূপানন্দ ও তিনি ওই ধরণের রূপ দিতে চান সদ্য প্রকাশিত প্রবুদ্ধ ভারতের। যদি ওই ধরনের কোন পত্রিকা তাঁর কাছে থাকে, তা যেন পাঠিয়ে দেন। নূতন পত্রিকাটির দায়িত্ব পড়েছে, এবিষয়ে তাঁরও আকর্ষণ আছে বিশেষ ধরনের, এঁকে আমি সেরা সুহৃদ মনে করি!

১৯০৪ থেকে ১৯০৬ স্টেটসম্যান পত্রিকা জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন— র‍্যাটক্লিফের উপর নিবেদিতার প্রভাবের জন্য। এটি খাঁটি ইংরাজের কাগজ। ইংরাজ ও ইঙ্গভারতীয় মহলে এর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। এই কাগজে সংযত ও দৃঢ়ভাব যুক্ত জাতীয় আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ ও সহানুভূতি সম্পন্ন সম্পাদকীয় যথারীতি প্রচারিত হয়ে চলেছে। ১৪ই জুন ১৯০৬, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন র‍্যাটক্লিফ ভারত সম্বন্ধে একেবারে দিব্য ভূমিকায়। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সে স্টেটসম্যানের সম্পাদকরূপে প্রভৃত সাহায্য করে চলছে।

স্টেটসম্যান সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত। সেই কাগজ, জাতীয় আন্দোলননীতিকে সমর্থন করছে, কর্তৃপক্ষের কাছে এটা সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। ডাক পড়লো র‍্যাটক্লিফের। ছুটি নিয়ে ইংলণ্ড গেলেন। ফিরেও এলেন। নিবেদিতা লিখলেন— তোমাকে ফিরতে না বলার জন্য মনে বিশেষ তাগিদ বোধ করেছিলাম। কারণ বুঝতে পেরেছিলাম স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। সেই কারণেই চাইছিলেন ইংলণ্ডে প্রভাবশালী মহলে র‍্যাটক্লিফের জন্য একটা স্থান করে দেওয়ার ব্যবস্থা। ১৪ই জুন তারিখেই মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, র‍্যাটক্লিফদের জুলাই মাসে কিছুটা হস্তগত করবে। তোমার সঙ্গে তাদের পরিচিতি হতে দেবে। অ্যালিস বাকটন, মিস ফ্র্যাঙ্কন, ফ্রেডরিক হ্যারিসন দম্পতি ও তোমার জানা পজিটিভস্টদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে— এটা কি আমি আশা করতে পারি?

এরপরে আবার চিঠি লিখলেন, আমি বিশেস আনন্দিত হব যদি তুমি র‍্যাটক্লিফদের সঙ্গে মিঃ গেডেস ও পজিটিভিস্টদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। তুমি জানো না — এবছরগুলিতে স্টেটসম্যানের সম্পাদকরূপে সে ভারতের স্বার্থে কতখানি কাজ করেছে এবং সে কতখানি বিশ্বস্ত ও সশ্রদ্ধবন্ধু!

আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই সরকার দমননীতি অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু সেরূপ রুদ্রমূর্তি ধারণ করলো এপ্রিল ১৯০৬। ১৪ই এপ্রিল বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্স শুরু হওয়ার কথা ছিল—' কিন্তু তীব্র দমননীতির ফলে তা ব্যর্থ হল। নেতারা নিপীড়িত হলেন। তাঁরা কলকাতায় ফিরে এসে একাদিক্রমে কলকাতার নানা জায়গায় আগুন জ্বালানো বক্তৃতা শুরু করলেন। তার প্রতিক্রিয়ায় চরমপন্থী দল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জোরদার করলেন। বিপ্লবী দল গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টায় দলবদ্ধ হলেন। জুন মাসে লোকমান্য তিলক কলকাতায় এলেন। তাঁর উপস্থিতিতে 'শিবাজী' উৎসব

ও স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হল। প্রকাশ্য আন্দোলন ও অন্তরালে বিপ্লবী দলের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র দানা বাঁধলো। ছোটলাট ফুলারকে হত্যা করার পরিকল্পনা গৃহীত হল।

২৯শে জুন ১৯০৬ চিঠি লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : স্বরূপ নেই। আর কিছু ভাবতে পারছি না। — স্বরূপ নেই। ...স্বামিজীর জীবনী নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু স্বরূপের সাহায্যের উপর কত না নির্ভর করেছিলাম। ছায়ান্ধকারের মধ্যে আছি। ...কিন্তু কি অদ্ভুত স্বরূপ! আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বছরের পর বছর শীতলতা গেছে। স্বামিজীর সেই দেহত্যাগের পর তাঁর রাজনীতির প্রেরণা ত্যাগ করে, প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে আত্মনিয়োজিত করি — আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন তিনি। এই পত্রিকাটি ছিল স্বামিজীর প্রাণ-প্রতিমা। সে ইচ্ছা তাঁর পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন — স্বামিজীর মনোগত ইচ্ছা পূরণের আশায়। তিনি একান্তে চাইতেন ভারতের স্বাধীনতা প্রথম, ভারত স্বাধীন হোক, এটা শুধু তাঁর ইচ্ছা ছিল না। এটাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা — এই উদ্দেশ্যেই 'মানুষ' তৈরীর পথ অনুমোদন করেছিলেন। ইদানিং পুরনো ঘনিষ্ঠতা ও নিষ্ঠার পরিবর্তন। তার মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম সে শক্তি পেয়েছে তার প্রয়োগ করতে যাচ্ছে — কিন্তু এজিনিস ভাবিনি। অপূর্ব্ব পরিত্রাণ ঘটলো, তার ক্ষেত্রে। তাঁর উপর চাপানো নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সে অধীর, অস্থির, এখন সে খাঁটি সন্ন্যাসের অধিকারে বর্ত্তমান। এর দ্বারাই সর্ব্বোত্তম কাজ করতে পারবে।

প্রবুদ্ধ ভারতে শোকলিপিতে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানালেন : 'প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ও মায়াবতী আশ্রমের সভাপতি স্বামী স্বরূপানন্দের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম। তাঁকে হারিয়ে, আমরা কতখানি হারালাম —সদ্য বিয়োগের এই পটভূমিকায় তা এখনই লিখে জানানো সম্ভব নয়। এইটুকু জানি এ ক্ষতি অপূরণীয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র আটত্রিশ । ১৮৯৮ সালের গোড়ারদিকে স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস পান। সন্ন্যাস প্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর উপরে হিমালয় কেন্দ্রের ভার অর্পণ করা হয়। সেইসঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক হন। এই দুই স্তর দায়িত্বের কাজ গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতরা, তাঁর পূর্ণ শক্তির কথা জানতেন। সে মহান জীবনাদশর্নের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। তারই প্রচারে ঐ শক্তি সদাই প্রস্তুত ছিল। তিনি একনিষ্ঠ শঙ্করপন্থী ও সংস্কৃতে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। পূর্ব্বাশ্রমে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশজাত। অন্যান্য কাজের মধ্যে এই পত্রিকার সম্পাদক। এঁর সম্বন্ধে স্বামিজীর কতখানি উচ্চধারণা ছিল যখন দেখি বেলুড়মঠে যোগদানের অব্যবহিত পরেই তাঁকে সন্ন্যাস দান করলেন। অন্যদের মত প্রস্তিক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের মধ্য দিয়ে এঁকে যেতে হয়নি। স্বামিজীর বিশ্বাসের মর্য্যাদা তিনি পরিপূর্ণ রক্ষা করে বছরের পর বছর অবচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

যাঁরা তাঁর কাছে 'ধ্যান ও যোগ' শিক্ষা করতে আসতো, ধৈর্য্যশীল সহৃদয় শিক্ষকরূপে সাহায্য ও উন্নীত করার পথ তিনি দেখিয়ে দিতেন। জীবনে সঙ্কটক্ষণে যাঁরা তাঁর উপর নির্ভর করতো, তাদের নিরন্তর স্নেহপূর্ণ আশ্রয় দিয়েছেন। যে ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাকুল অভিসার সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের কাছে সে জীবন মূর্ত্তবিকাশরূপে প্রতীয়মান ছিল। তথাকথিত ত্যাগ ও বৈরাগ্য অনেক সময়ে আধ্যাত্মিকতার আবরণে কাপুরুষতার প্রশ্রয়, তার ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর মননশীল বুদ্ধি, বাস্তব সমস্যার অনুসন্ধানে সমর্থ ছিল, তার সমাধানে ছিল তাঁর অকুতোভয় মন।

আমরা, যাঁরা স্বামী স্বরূপানন্দকে জানতাম, বিরাট সম্ভাবনাশীল উন্নত তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যান করার সময়ে, একথা ভাবতেই পারিনা — সে জীবনের সমাপন হয়েছে মৃত্যুতে। খুলে গেছে দ্বার — গভীর নীরবের পূর্ণ নৈঃসঙ্গের। আত্মালয়ে চির আকাঙ্ক্ষী সাহসী আত্মা — সেখানে প্রবেশ করেছে ত্বরিত বেগে। এ জীবনের চরমত্যাগে অর্জ্জিত সেই মৃত্যুর মহানসন্ন্যাস, নিশ্চয়ই আবার নবজন্মে বিদীর্ণ হবে পূর্ণ তেজে, নতুন প্রাণে ও দানে, প্রেমে, জ্ঞানে— যখন পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হবে, তাঁর আবির্ভাবের।

গোপালের মার জীবনীশক্তি নিষ্প্রায় হয়ে এলো ঠিক একই সময়। শ্রীমা একদিন তাঁকে দেখে গেলেন। জুলাই ১৯০৬ তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত। গঙ্গাতীরে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হল। নিবেদিতা নিজেই তাঁকে ফুল, মালা, ও চন্দন পরিয়ে দিলেন। সাজালেন, মনের মত করে। খোল করতালে কীর্ত্তন সহ খালিপায়ে তাঁকে অনুসরণ করে গঙ্গাঘাটে পৌঁছলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত, অবস্থান করতে লাগলেন। মাথার কাছে বসে অপলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কাটালেন দুটি রাত। তখনও তাঁর পূর্ণজ্ঞান, অন্তরে বিরাজ করছে শান্তি। 'এলো মাঝ রাত' কল কল শব্দে এলো জোয়ার। নিবেদিতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন — এবার তাঁর বন্ধু, গুরু; অতি প্রিয় যিনি তাঁকে বিদায় দিতে হবে।

পূর্ণিমার পূর্ণ জোয়ার। গঙ্গার জল উপচে দুকূল প্লাবিত। উপস্থিত সকলে 'ওঁ গঙ্গা নারায়নায়ান ব্রহ্ম' ধ্বনি তুললেন। গোপালের মা অনন্তে যাত্রা করলেন। একজন ব্রহ্মচারী তাঁর শেষকৃত্য করলেন।

শোকতপ্ত হৃদয়ে ফিরে এলেন নিবেদিতা। সেদিন ৮ই জুলাই। দশদিন শোক পালন করলেন। শেষ দিন, তাঁকে স্মরণার্থে শ্রীরামকৃষ্ণের বড় একটি ছবি পুষ্পপত্রে সাজালেন সভামণ্ডপে। পাশে ছোট গোপালের মায়ের একটি ফটো। কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমন্ত্রিত পল্লীর মহিলাবৃন্দ। সকলেই উপস্থিত, সে শোকসভায়। এঁদের সকলকে তিনি আপ্যায়ন করালেন সাশ্রুনয়নে।

১৬ই জুলাই ১৯০৬ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন, তোমার প্রতিশ্রুত অর্থের বাকি তিন হাজার পাউণ্ড — খোকার হাতে থাকবে। সে টাকা মিঃ দেবেন (দেবেন্দ্র মোহন বসু) বা খোকা (অরবিন্দ মোহন বসু) বা দুজনের জন্যই খরচ করবে। অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানের সেবায় তাদের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য নিযুক্ত হবে কিনা তা বিবেচনা করে। ...ভারতীয় শিল্পের পুনুরুত্থানের জন্য, কিছু অর্থ রেখে যাওয়া উচিত। যদি জনগণ, তাঁর স্মৃতি ভাণ্ডারে কোন অর্থদান করে, তাহলে সে টাকা যাতে শিল্পের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়, সে বিষয়ে ডঃ বসু মনে রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২৫শে জুলাই ১৯০৬, মঁসিয়ে লালীককে লিখলেন, বিজয়ীর নাম মেডাল মুদ্রিত থাকা আবশ্যক কি?

নিজে কিন্তু আবশ্যিক মনে করেছিলেন। চিন্তা শুরু করলেন, ট্যাকশালে অথবা কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে করিয়ে নিতে হয়তো হবে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, মেডালে আড়াআড়িভাবে বজ্র চিহ্ন স্থাপন করবো। 'বজ্র'কে ভারতীয় জাতীয়-প্রতীক বলে আমরা গ্রহণ করছি। জাতীয়তা নামক 'ভাবটি' আমি সর্ব্বপ্রকারে জনপ্রিয় করতে চাইছি। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত যে, মঁসিয়ে লালী আমাকে উপদেশ দিয়ে দেবেন। আমি চেয়েছি, সর্ব্বদাই চেয়েছি। কিন্তু সফল হইনি।

— বিবেকানন্দের প্রতীক রূপের একটি মশাল তৈরী করতে চাই শিখাগুলি পাশে ও উর্দ্ধে উচ্ছ্রিত। জানিনা তার সঙ্গে ভারতীয় ত্রিশূল যুক্ত করা যাবে কিনা, যদি বাঙালী নারীকে মেডাল

দিতাম, তাহলে ত্রিশূলটিকে একটি তারকাযুক্ত করতাম। সেই সঙ্গে বাংলা বা সংস্কৃতবাণী — 'ধ্রুবতারাকে' দেখ। কারণ ঐ কথাগুলি শিব বিবাহকালে উমাকে বলেছিলেন। ...ইউরোপীয়রা সাধারণতঃ যেভাবে মশাল আঁকে ছাগশৃঙ্গের আকারে, এলোমেলো পুষ্পসজ্জা ও জিনিষটি আমি পছন্দ করিনা।

ইতিমধ্যে 'কেশরী' পত্রিকায় বেরুলো : রাশিয়ার জনগণ যেমন জারের স্বেচ্ছাচারী 'শাসনব্যবস্থার বিরোধী' ভারতীয় জনগণও তেমনি ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সবর। যে আগুন জ্বলেছে বাংলায়, সেই আগুন জ্বলে ছিল পাঞ্জাবেও। রাশিয়ার জনগণ নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় গোপন আন্দোলনকে অগ্রবর্ত্তী রেখেছে। হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। পীড়ন ও অত্যাচারে তা যদি স্তিমিত হয় — তা সাময়িক — যেমন ঘটতে দেখা যাচ্ছে রাশিয়ায়।

মহারাষ্ট্রে মিঃ তিলক, শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সফলতাও পেয়েছেন। সেই শ্রমিক আন্দোলন, তাদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেরূপ, জাতীয় আন্দোলনেও সেই প্রকার অংশগ্রহণ করুক — সেদিকে তিনি সচেষ্ট। এপাশে বাংলায় 'বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি'র সদস্যগণ কার্য্যকরী অবস্থা গ্রহণে উদ্বেল। এঁরা অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী। অস্ত্র চাই, নিধনযজ্ঞ ছাড়া অন্য পথ খোলা নেই। যারা অত্যাচার চালাচ্ছে জনগণের আন্দোলন রোধে, সাদা-কালো যেকোন ব্যক্তিই হোক, তারা এই নবজাগ্রত বোধের পরিপন্থী। তাদের নিধনছাড়া অন্য পথ চাই। এঁদের নেতা অরবিন্দ, দলের পরিচালকও তিনি। মৌন সম্মতি তাঁর একাজে।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯০৬, মারাঠা পত্রিকায় ছাপানো হল: রাশিয়ার রিভলিউশন কমিটির ম্যানিফেষ্টো। মন্তব্য করলেন সম্পাদকীয়তে। ম্যানিফেস্টো কথিত পরিণতি ঘটবে সুনিশ্চিত, কেবল সময়ের অপেক্ষা। যেসব সন্ত্রাসবাদী ঘটনা রাশিয়ায় ঘটে চলেছে, তা আরও ব্যাপক বিপ্লবের ভূমিকা। গত ডিসেম্বরের, মস্কো দাঙ্গা দমনের নায়ক জেনারেল মিন্যু, এক রেল স্টেশনে বালিকার গুলিতে মারা গেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে এক সামাজিক সম্মেলনের সময়ে। 'বোমা' পড়ে প্রচুর লোক আহত হয়েছিল। এই 'টেরারিজম' কি? তা জানতে হলে অনেক বছর পিছিয়ে যেতে হবে। শাসন সংস্কারের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু তা নিষ্ফল হল। ১৮৭৬-৭৭ সোসালিস্ট ও অন্য নৈতিক অন্দোলনকারীদের অতি দুর্ব্বৎসব। ঘৃণায়, আক্রোশে, তাদের চূর্ণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত নিলেন : কথায় যখন কাজ হল না, কাজ আরম্ভ করা হোক। কিন্তু তার চরিত্র কি হবে? স্থির হল : তারা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবে। তা কার্যকরী করা সম্ভব হল না। এলো আংশিক উৎপাত সৃষ্টির পরিকল্পনা। যথেষ্ট ফল পাওয়া গেল না— এলো গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা। প্রথমে গুপ্তচর, তারপর অন্যশ্রেণীর মানুষকেও। বর্ব্বর সরকারের বিরুদ্ধে, যে কোন কাজই ন্যায়কাজ। ঘৃণার পাত্র এই সরকার। তার বিরুদ্ধে যখন বড় রকমের আঘাত করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন সুবিধামত আঘাত হানো — তার অসতর্ক স্থানে।

ঘৃণায় উপ্ত, দেশপ্রেমে লালিত, উন্মাদনায় প্রসারিত, বৈদ্যুতিক প্রেরণার সৃষ্টিতে আকাঙ্ক্ষিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্দীপ্ত এক নারী ভেরা জামুলিকা, ২৪শে জানুয়ারী ১৮৭৮ সালে 'জেনারেল ত্রেপটকে গুলিবিদ্ধ করলো — কারণ উক্ত জেনারেল রাজনৈতিক বন্দীদের বেত্রাঘাতের অপরাধ করেছিল। ভেরা পাকাপোক্ত সন্ত্রাসবাদী না হলেও তার কাজ উদ্দীপনার দৃষ্টান্ত' হয়ে দাঁড়ালো। এরপরই ক্রমান্বয়ে হত্যা চলতে লাগলো।

"আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশিয়া"র লেখক স্টেপনিয়াককে অনুসরণে সম্পাদক বললেন, টেরারিষ্টরা মহান ভয়ঙ্কর, নিদারুণ আকর্ষক চরিত্রের। তাদের মধ্যে মানব চরিত্রের সর্ব্বোচ্চ ঐশ্বর্য্যগরিমার সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে বীর শহীদদের উৎসর্গিত জীবনাদর্শ। যে মুহূর্ত থেকে স্থির করেছে, দেশের

জনগণকে মুক্ত করবে, তখন থেকেই সে মৃত্যুতে নিবেদিত শহীদ। তার ঝঞ্ঝা জীবনের প্রতি পদক্ষেপ যে মৃত্যুর মুখোমুখি, প্রয়োজন হলেই মৃত্যুর সাক্ষাতে সে উদগ্রীব। ..... সে দরিদ্র, অপরিচিত তথাপি সে মোহিত মানবতায়, পদদলিত সমাজিক অধিকার রক্ষায় অবতীর্ণ — মৃত্যু মূল্যে চ্যালেঞ্জ করছে, পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে।

...সে তার কঠিনবাহুকে নিয়োজিত করেছে জনগণের স্বার্থে। যদি মন্দবুদ্ধি কেউ তাকে বলে — দাসত্বকে মেনে নাও, সে সদর্পে চেঁচিয়ে বলবে— 'না' এবং অগ্রসর হয়ে যাবে সামনে বিরোধীদের বাধা ও ক্রোধকে অগ্রাহ্য করে। কারণ তার এই বিশ্বাস আছে — তার কবরের উপরে একদিন ন্যায়বিচারের বার্ত্তা লিখিত থাকবে — এরাই হল 'টেরারিষ্ট'।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬, মিঃ তিলক 'বয়কট'কে বহিষ্কার যোগ' বলে অভিহিত করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে 'বয়কট' বিরোধী সমালোচকদের অসারযুক্তির অসারত্ব খুলে ধরলেন। বাকচাতুরীতে 'বয়কট' ভিতর থেকে বানচালের চেষ্টা চলছে। সম্পাদকীয়ের গোড়ায় বললেন, 'লড়াই শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। লণ্ডন টাইমস, রুশ-জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কারণ ধর্ম্মঘটের দ্বারা তারা 'জার'কে জনগণের দাবী স্বীকারে বাধ্য করেছে। যে লণ্ডন টাইমস রাশিয়ার প্রতি ক্রিয়াশীল আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে এত তৎপর, সে কিন্তু ভারতে অনুরূপ আন্দোলন লক্ষ্য করতে অপারাগ! বাংলার আন্দোলনের সমালোচকদের ধিক্কার দিয়ে বললেন, : খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনি 'থেমেপড়ো আওয়াজ তুলেছেন, যদিও যুদ্ধ প্রায় আরম্ভই হয়নি। কি নির্ব্বোধ, এই লোকগুলি! জাতীয় সংগ্রামের তত্ত্ব বা তাৎপর্য্য বোঝে কিনা সন্দেহ। তারা ধরে বসে আছে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। কেবল স্বদেশী জিনিস ব্যবহারে করার উৎসাহ দিতে। দেশে কিছু সাবান কারখানা, কি ছাতার কারখানা তৈরীতে প্রেরণা দেওয়ার বেশী সে এগুবে না। আমাদের উদ্ধত ও চতুর শাসকরাও চান এই ধারণাই বাহাল থাক। কিন্তু যে কেউ সহজে দেখতে পাবেন, স্বদেশী আন্দোলনের অস্ত্র, বাঙালী নেতারা তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। শিল্পোন্নয়ণের জন্য 'স্বদেশী' অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু এর রাজনৈতিক তাৎপর্য্য অনেক বড়— বাংলায় তা দেখা গেছে। সেই কারণে লেফট্ন্যান্ট গর্ভনর ফুলার খ্যাপা কুকুরের মত আচরণ করছেন। তিনি তা বুঝে নিয়েছেন, বাঙালীরা এখন, এই যে অস্ত্র ব্যবহার করছে, একদিন তা আমাদের পরাজয়ের কারণ হবে। তাই চটে অস্থির তিনি। আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর।

১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পূর্ব্ববঙ্গে বন্যায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামলো সেখানকার অধিবাসীদের উপর। তারা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে দিনপাত করায় সেবাকাজে ব্রতী হলেন মঠ কর্ত্তৃপক্ষ। নিবেদিতা স্থির থাকার লোক নন। ছুটলেন, সেবাকাজে ক্লিষ্ট জনগণের পাশে। জলকাদা ঘেঁটে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় ও ত্রাণ বিতরণে সাহায্য করার জন্য। কাদা ও জলে এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ফলে, আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়ায়।

৭ই অক্টোবর মিঃ তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় লিখলেন : সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রস্ত করতে রুশ সরকারের প্রচেষ্টা 'একজন সরকারী কর্ম্মচারী খুন হলে' গোটা প্রদেশে রক্তের বন্যা বহিয়ে দেবার হুমকি, এতে কতটুকু ফললাভের সম্ভাবনা? যে বিপ্লববাদীরা, নিজ জীবনের পরোয়া করে না, তারা, তাদের কাজে, অনেক নির্দ্দোষ মানুষের ধ্বংসের কারণ হতে পারে— জেনেও ভ্রূক্ষেপহীন। .....তারা বোধহয় চিন্তা করে : তাদের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ তুলতে, যেসব নির্দ্দোষ মানুষকে মারবে সরকার, বিরাট জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে — তারা হবে শহীদের দল। এমন

শহীদ যত হবে, ততই মঙ্গল, বোধহয় এই তাদের যুক্তি।.... এই ধরনের চিন্তাধারা অভিনব। রুশ বিপ্লবীরা অনন্য। ইংরাজ ও ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য আছে।

১৯০৫ থেকে ১৯০৬ সাল জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনে যেমন রুশ জাপান যুদ্ধের প্রভাব বিস্তার করেছিল, 'রুশ বিপ্লবীদের কার্যকলাপ'ও নেতাদের মনে বৈপ্লবিক চিন্তা ও আন্দোলনের ধারা, আকৃষ্ট করেছিল, কারণ বাংলার জাতীয়বাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই রাশিয়ার 'বৈপ্লবিক উত্থান' ঘটেছে। সংবাদপত্রে সেসব বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, জনগণ লক্ষ্য করলো, এখানে যেরূপ নিপীড়ন, সেখানেও সেই অত্যাচার, আন্দোলনকারীদের উপরে। নিবেদিতাও বার বার জারতন্ত্রী পীড়নের কথা উল্লেখ করলেন তাঁর চিঠিপত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে।

'মারাঠা' সম্পাদকও ভারতীয় জনমনের একাংশে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হলেন রাশিয়ার মৃত্যুভয়হীন সন্ত্রাসবাদীদের প্রশস্তিতে।

১৮৯৫-১৮৯৬ স্বামিজী লণ্ডন ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে যখন ব্যস্ত, মিঃ বালগঙ্গাধর তিলক সে সময়ে দক্ষিণ ভারতে একজন উল্লেখযোগ্য পরিচিত নেতা। তিনি বম্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার। ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আক্রমণ করছেন সরকারকে, পুণা মিউনিসিপ্যালিটিকে কব্জা করে ফেলেছেন — শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের ওপর তাঁর প্রবল প্রভাব। দুর্ভিক্ষ হল ১৮৯৬ সালে, তিনি শুরু করলেন করবন্ধের আন্দোলন। ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভ্রাতৃগণ কর্তৃক 'র‍্যাণ্ড' আয়াস্ট' হত্যাকাণ্ড ঘটলো তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় 'শিবাজী' বক্তৃতায় প্রকাশ পেতে লাগলো। মিথ্যা কেসে তাঁকে জড়িত করে, ১৮ মাস জেলে পাঠালেন সরকার। কারামুক্তির পর তাঁর দৃষ্টি পড়লো সংগঠনের কাজে। বোম্বাইয়ে তখন বস্ত্র শ্রমিকদের চমর অবস্থা। তিনি যুক্ত হলেন, শ্রমিক সংগঠনে। এছাড়াও স্কুল ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষা চালু করলেন। চালু করলেন — 'শিবাজী' ধ্বনি। তাঁর পত্রিকা সরব হল সরকারের ত্রুটি সম্বন্ধে, প্রকাশ পেতে শুরু হল জাতীয়তাবাদীদের বচনা। স্বামিজী যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করছেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। ১৯০১ সালের শেষে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের পর ১৯০২ সালের প্রথমে, দেখা করতে গেলেন স্বামিজীর সঙ্গে বেলুড় মঠে। পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় হল। তার কিছুদিন পরেই স্বামিজী দেহত্যাগ করলেন। নিবেদিতা ওকাকুরা সহ জাতীয়বাদী আন্দোলনে তখন গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। ওকাকুরা মোহ ভাঙতেই নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন ভারত সফরে জাতীয়বাদের জাগরণে। পরিচয় হল উভয়ের মধ্যে। মত বিনিময় হল। যোগাযোগও সংঘটিত হল। কিন্তু সে সূত্র রয়ে গেল অন্তরালে, অপ্রকাশ্যে। মিঃ গোখলেকে সম্মুখে রেখে জাতীয়-স্বার্থ সিদ্ধির আশায় ব্যাপৃত রইলেন বেশ কিছুদিন। শুরু হল 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন — বাংলা গ্রহণ করলো স্বদেশী ও বয়কট। এগিয়ে এলেন তিলক। সে আন্দোলনকে শুধু সমর্থন করলেন না — মুখরিত হলেন তিনি। জাতীয় জাগরণে— ধরলেন লেখনী, মুখর তাঁর কেশরী পত্রিকা।

নিবেদিতার লেখনী নবসৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বেলিত। বিপ্লবীদের কণ্ঠে জয়ধ্বনি। 'বন্দেমাতরম'। আকাশ-বাতাস মুখরিত বন্দেমাতরমের সুরে। বাংলার নরনারীর প্রাণবায়ু স্পন্দিত বন্দেমাতরম মন্ত্রে। ইংরাজের শাসনযন্ত্র ধারণ করেছে রুদ্ররূপ। বাংলার ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায় মার খাচ্ছে। তবুও মুখে তার জয়ধ্বনি 'বন্দেমাতরম'! দলে দলে বরণ করছে কারা, মুখে সেই দেশমাতার জয়ধ্বনি 'বন্দেমাতরম।'

উচ্চ ইংরাজ মহল থেকে ডাঃ গ্রীয়র্সন লণ্ডন টাইমসে বললেন, এ ধ্বনি ও সঙ্গীতের মধ্যে ধ্বংসের দেবীকে আহ্বান করা হয়েছে। সুতরাং কঠোরভাবে রুদ্ধ কর এ ধ্বনি।

মিঃ ভি জি আপ্তে সে আপত্তি খণ্ডন করলেন 'কেশরী' পত্রিকায়। তিনি বললেন ২৮শে অক্টোবর ১৯০৬, ডাঃ গ্রীয়ার্সন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কাছ থেকে ভূরি ভূরি আলোচনা চলেছে এই সঙ্গীতটির বিরুদ্ধে, বাংলার এই দেশাত্মবোধক গানটি, আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে। তবুও অগ্নিপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণও হতে পারবে।

৫ই ডিসেম্বর ১৯০৬, মিসেস ওলিবুলকে লিখেলেন, রবিবার, আমরা খোকার ...জন্মদিন পালন করছি। কী মনোরম। প্রাচ্য বীররূপে একমাত্র সে সম্মান তার উপর আর্পণ করা হয়েছিল, তাহল একটি সুসজ্জিত চেয়ারের প্রস্তাব — তা সে অস্বীকার করল, আর বৌ-এর জন্য যে সামান্য উপহারের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম, তাতে সে এতই বিস্মিত ও বিব্রত হল যে, টেবিলের অপরপ্রান্তে নিছক লজ্জায় সরে গেল।

যখনই আমরা সবাই মাসখানেকের মত সময় একত্র থাকি তখন এই ধরণের দু'চারটি ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করি। এগুলি কতখানি সুখ এনে দেয় যদি দেখতে।...

তোমাকে কি বলেছি বিজ্ঞানের মানুষটি আমাকে রবিবার মহাভারতের সমগ্র ইংরাজী অনুবাদ দিয়েছে। দশ ভল্যুমে বাঁধিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপর এর মধ্যে প্রবেশ করে, ক্রমে সংশোধন করা যাবে। বিজ্ঞানের মানুষটি মনে করছে যে, দুবছরের মধ্যে শেষ করা উচিত। কিন্তু যদি চার বছরের মধ্যে হয়ে ওঠে খুশী হব। কারণ এই কাজকে জীবনের পরমকাজ করতে চাই না এবং মানুষ যেসব অপকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে তার সীমা আছে। বিজ্ঞানের মানুষটি নিজের আগ্নেয় উদ্দীপনা নিয়ে বিচার করে, যদিও তার নিজের কাজ একটি এবং তাতেই যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন আমরা এমন ভাল একটা রাঁধুনী পেয়েছি, 'বউ' আমাদের ঈর্ষা করছে।

১২ই ডিসেম্বর মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : গত রবিবার খোকার সুন্দর প্রাপ্তি ঘটেছে। পৈতৃক গ্রাম দর্শন ও সেখানে অভিনন্দন। নিকট, দূর, সর্ব্বস্থান থেকে, লোক জড়ো হয়েছিল। আশীর্ব্বাদ, অভ্যর্থনা ও নমস্কার জানাতে। স্কুলের ছেলেরা তার পালকী ও বেয়ারাদের, বইতে দেয়নি। সমস্ত জায়গাটা তার জন্য উৎসবে মেতে উঠেছিল — কুড়ি বছর আগে এই বালকটি নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি, এক আত্মীয়ের কাছে বেচে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সামনে, সৎসাহসের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উগ্র বাসনায়। ঐ উৎসব অবশ্য আসল জ্ঞানীর প্রতি, প্রাচীন সভ্যতার অর্ঘ্য। জয় হোক তার। অপূর্ব্ব মনে হচ্ছে নাকি?

অধ্যাপক ভাই নম দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। তাতে ডঃ বসুর "প্ল্যান্ট রেসপন্স" বইটিকে কী কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে — তা বলা হয়েছে। বেচারা খোকা! — চিঠিটি তাকে ক্রমান্বয়ে মুহ্যমান ও ক্রুদ্ধ করেছে। আজ সকালে আমরা তার উত্তর লিখছি। ভরসা করি, তারপর ওরা আর খোঁচা দেবে না।

অপরের নামোচ্চারণ সে খুব কম করেছে বা উদ্ধৃতি কম দিয়েছে বলে একটা প্রচণ্ড চেঁচামেচি হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি জান ত, সে একাজ ভেবেচিন্তেই করেছে, কারণ নাম উল্লেখ না করাই ভাল। উল্লেখ করলে, সেটা তাদের কাছে শাস্তিস্বরূপ হবে, কারণ নির্ব্বুদ্ধিতা ও ভ্রান্তি দেখাবার জন্যই তা করতে হবে। সোজা এই দাঁড়ায়, আমি খোকাকে বলেছি— তাকে অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। যে প্রবীণদের সে অতিক্রম করেছে, তারা শুধুই ঘৃণা করে যাবে, কিন্তু নতুনেরা তার কথা শুনবে — অনুসরণ করবে তাকে। নেতা যাঁরা প্রত্যোদিষ্ট তাঁরা — নিঃসঙ্গ তাদের হতেই হয়। তাই, যদি সমস্বরে জয়গান না হয়, খোকা আশা করে তুমি তীব্র নৈরাশ্যবোধ করবে না।

১২ই ডিসেম্বর ১৯০৬ মিসেস ওলি বুলকে লিখলেন, স্বামিজী আমার জীবন কিভাবে কল্পনা করেছিলেন, আর কত পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব যখন ভাবি, তখন বুক ভেঙে যায়। যদি সর্ব্বক্ষণ উষ্ণ আবহাওয়া সহ্য করা সম্ভব হতো, তাহলে তাঁর ইচ্ছামত মেয়েদের নিয়ে বাস করা সম্ভব হত। কিন্তু গরম সহ্য করা অসম্ভব, সত্যই অসম্ভব—আমার অসুস্থতা তারই প্রমাণ। এই কারণের জন্য, স্বার্থপরতার জন্য নয়, কাজের বদল হয়েছে।

ইংলণ্ডে যাবার আগের রাত্রি ব্রিটেনেতে—মনে পড়ে তোমার! আমি তোমাকে বলেছিলাম : অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি— শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের দিকে, কিন্তু মধুময় পিতার থেকে সরে যাচ্ছি, তখন তুমি সহৃদয়তার সঙ্গে আমার কথা নিয়েছিল।

কখনও কখনও মনে হয়, এই তো প্রথম প্রয়াস, আবার বহুবার কাজের সুযোগ আমি পাবো। এগারোশো বছর আগে খৃষ্টধর্ম্ম 'সেন্ট্ ফ্র্যান্সিসকে সৃষ্টি করতে পারেনি, পনেরো'শো বছর কাটার আগে থের্বেসাকে'। কে জানে তারা কতবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং নিজেদের ব্যর্থতাকে অনুভব করেছিলেন!

পুনশ্চ— আমি কিন্তু ঐরকম কীর্ত্তির কোন লক্ষণ দেখছি না। আমার ক্ষেত্রে বরং কিছু নিম্নাবতরণ। তবু-তবু-আমি আঁকড়ে থাকবো চেষ্টা করে যাবো — কিন্তু এখানে পথ খোলা নেই, মনে হচ্ছে। যেখানে নিজের পথ বেছে নিয়ে, নিজ আদর্শ প্রয়োগ করার অনিবার্য্য প্রয়োজন — সেখানেও নীরবতা ও আনুগত্যই একমাত্র পথ। কিন্তু — কিন্তু — আমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করছি — তা কি সত্য? আমার হয়ে উত্তর দেবে কে? — কে?

ডিসেম্বরের শেষের দিকে (১৯০৬) কংগ্রেসের অধিবেশন হল। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অন্যকাজে জড়িত থাকায় সক্রিয় কোন ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হল না। কংগ্রেসের এক্সিজিবিশন হল। তাতে তিনি তার পরিকল্পিত জাতীয় পাতাকার দুটি নমুনা পাঠালেন। তাঁর স্কুলের মেয়েকে নির্দ্দেশ দিয়ে পাতাকটি তৈরী করিয়েছিলেন। মেয়েদের হাতের তৈরী জিনিসগুলিও প্রদর্শিত হল সেই একজিবিশনে— জাতীয় পতাকার দুটি নমুনাও।

লাজপত রায়কে সভাপতি করার চেষ্টা করলেন চরমপন্থীর দল। অপ্রকাশ্যে রইলেন নিবেদিতা। দক্ষিণপন্থীরা বা মডারেট দ্বারা ভারতীয় রাজনীতির সুমহান বৃদ্ধ পিতামহ 'দাদাভাই নৌরজি নির্ব্বাচিত হলেন সভাপতি রূপে।

গোপালের মার সব কিছু কুসুমকে দিয়ে, নিজে তাঁর জপের মালাটি রেখে দিলেন। আজ নিরানন্দ তাঁর জগত। গোপালের মার বিচ্ছেদ বেদনা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, খবর এলো পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে জুলাইয়ের মাঝামাঝি। বেলুড় থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী যাত্রা করেছেন সেবার কাজে। দুঃভিক্ষের ভয়াবহ সংবাদ আসতে লাগলো দিনের পর দিন। স্থির থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। প্লেগের মড়কে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন পূর্ব্ববঙ্গে। যাঁরা পূর্বেই সেবাকাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি যোগ দিলেন, সেপ্টম্বরের প্রথম দিকে। নৌকা করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে সাহায্য করতে লাগলেন।

স্বামিজী তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন সেবা কাজে নিপীড়তের মধ্যে কাজ করতে হলে, তাদের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, নইলে তাদের সুখ দুঃখের 'মর্ম ও বেদনা' উপলব্ধি সম্ভব হয় না। তাদের ভাষায় কথা না বললে তারাও তোমার সঙ্গে 'মনের কথা ও প্রাণের ব্যথা' ব্যক্ত করবে না। সেবাও আপনজনের মত গ্রহণ করবে না। সে উপদেশ তিনি জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, পূর্ব্ববঙ্গকে ভাল করে চেনা ও জানার অবকাশ তিনি পেলেন। কৃষক রমনীদের সঙ্গে আলাপে,

তাদের সংসারের সুখ ও দুঃখের কথা শুনে, তাদের একান্ত আপন জনে পরিণত হলেন। তাদের সঙ্গে এক হয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরলেন। তাদের সেবা ও সহানুভূতি দ্বারা আপন জনে পরিণত হলেন সকলের। যে বাড়ীতে গেলেন, তারাই তাঁকে বিদায় দেবার জন্য নদীতীর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে নৌকায় তুলে দিয়ে গেল।

কাদাজলে, রোদে দুঃর্ভিক্ষপীড়তদের পাশে পাশে ঘুরে, দুঃখের কিছু লাঘবে কলকাতায় ফিরে এলেন। কিন্তু মালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিতে বাধ্য হলেন। এর পূর্ব্বে ব্রেন কিভাবে আক্রান্ত হয়ে, স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল, এবারেও দীর্ঘদিন ভুগলেন। কৃষ্টীন তাঁকে সেবা করে চললেন। পাশে দাঁড়ালেন বসু দম্পতি। খবর পেয়ে ছুটে এলেন স্বামী ব্রক্ষানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ। একটু সুস্থ হলেপর আনন্দমোহন বসুর দমদমের বাগানবাড়ী 'ফেয়ারী হলে' নিয়ে যাওয়া হল। স্কুল বন্ধ হলো সাময়িক। এবার Cradle Tales of Hinduism' শেষ করায় মন দিলেন। লংম্যানস কোম্পানী এ রচনাখানি প্রকাশে সম্মতি দান করেছে, যোগীনমা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

❧

১৯০৬ সালের শেষভাগ। ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থতা ও বিশ্রামের জন্য নিবেদিতা বাস করছিলেন আনন্দমোহন বসুর দমদমের 'ফেয়ারী হল' নামক বাগানবাড়ীতে। ভারতী যখন দেখা করতে গেলেন তাঁর সঙ্গে তখন তাঁর স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্য নিবেদিতার কাজ ও নামের সঙ্গে ভারতীয় পরিচয় ঘটে গেছে। এসেছেন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য। নিবেদিতা লক্ষ্য করলেন, যুবকটি দীর্ঘকায়, দক্ষিণ ভারতীয় মাথায় উত্তর ভারতীয় পাগিড়ী, রং গৌর বর্ণ, মুখে দাঁড়ি, যত্ন সহকারে চার্চ্চিত গোঁফ, প্রফুল্লচোখ, বিস্ফারিত ও দীপ্ত। তবে তাঁর মধ্যে আছে ইতস্ততঃ ভাব। মন খুলে কথা বলায়, একজন অ-ভারতীয়ের কাছে। তাঁর পুর্ব্বনাম সুব্রহ্মণ্য আয়ার। 'ভারতী' তাঁর প্রাপ্ত উপাধি। জন্ম মাদ্রাজের তিরুনেলভেলি জেলার এট্রায়াপুরম গ্রামে। বাবার নাম চিরস্বামী আয়ার, মার নাম লক্ষ্মী দেবী। বাবার ছিল আধুনিক মন, যন্ত্রশিল্পে আগ্রহী। এট্রায়াপুরমে কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠা করেন। একমাত্র ছেলে সুব্রহ্মণ্য। আশা করেছিলেন, ছেলে তাঁর মতই হবে। ছোটবেলায় মাতৃহারা। ছেলের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ তিনি। মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারে সে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার অনাগ্রহী। বাবার কড়াশাসনে তাঁর স্বপ্নাতুর মন দুরন্তপনার শিকার হল। পিতামহের স্নেহে, যত্নে, মননগত ধীরতা ফিরে এলো। তিনি প্রাচীন কবিতার পাঠ দিতে লাগলেন। গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা সফল হল না— পাঠানো হল তিরুনেলভেলির হাইস্কুলে। কিন্তু এই রসহীন শিক্ষা তাঁর ভাল লাগলো না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হলেন। বাবা নিজের কাছে ফিরিয়ে আনলেন। স্থানীয় রাজতদারী এক জমিদারের কাছে চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। ক্রমে রাজার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। বিদ্রুপকারী বিরোধী লোকদের প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধে হারিয়ে পেলেন 'ভারতী' উপাধি। স্থানচ্যুত হল আয়ার পদবী। পরিচিত হলেন সুব্রহ্মণ্য ভারতীরূপে। ১৮৯৭ সালে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৭ বছরের ছোট মেয়ে চেল্লামনকে বিয়ে করলেন। কবিতা লেখায় ডুবে রইলেন একটি বছর। বাবা মারা গেলেন ১৮৯৮। অসফল ব্যবসায়ী তিনি। জীবনে নামলো দারিদ্র্যের ছায়া। সে কারণেই চেন্নামনকে পাঠিয়ে দিলেন বাবার বাড়ীতে। সহৃদয় এক আত্মীয়ের আহ্বানে এলেন বারানসীতে। এখানে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে পড়ে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করলেন। শেলী প্রমুখ ইংরাজ কবিদের কবিতার রসে তন্ময় হয়ে রইলেন। রাজনীতি নয় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সমান অধিকারের দাবী উঁকি মারতে শুরু করলো মনের কন্দরে। আর্থিক কষ্ট লাঘবের জন্য পুরানো রাজার চাকীরতে যোগ দিলেন কিন্তু রাজার চালচলন, তার মন্দ অভ্যাসকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। চলে এলেন মাদুরায়। নিলেন স্কুল শিক্ষককের অস্থায়ী চাকরী ১৯০৪ সালে। এই সময়ে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কবিতা 'বিবেকভানু' এক তামিল পত্রিকায়। পরিচিত হলেন প্রখ্যাত

জাতীয় নেতা জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সঙ্গে। তাঁর দৈনিক 'স্বদেশীমত্রম' কাগজে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ পেলেন। এখানে তাঁকে পরিশ্রম করতে হল প্রচুর। বেতন স্বল্প। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক ভাবনার সূত্রপাত এখানেই। তাকে ইংরাজী থেকে তামিল ভাষায় অনুবাদ করতে হত, ফলে তামিল গদ্য লেখার ক্ষমতা অর্জ্জন করলেন। প্রথম জীবনে সম্পাদক মিঃ আয়ারের মত মধ্যপন্থী। কিন্তু মনটা সেই ঘেরাটোপে সীমাবদ্ধ রইলো না। বাংলায় পার্টিশনজনিত আন্দোলন শুরু। সেই বিদ্রোহের লাভা বইতে শুরু হয়েছে সারা ভারতে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ 'স্বদেশমিত্রম' পত্রিকায় সেই বিদ্রোহের জয়ধ্বনি দিলেন 'বন্দে বঙ্গ' কবিতায়। স্বদেশমিত্রমের তরফে সাংবাদিক হিসাবে বেনারস কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন। পরের বছর কলকাতাতেও কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে এলেন। এখানেই তাঁর জীবনে ঘটলো তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা।

প্রথম কথা বললেন নিবেদিতা : দেশ সেবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, সাদা চামড়া বিদেশীর বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে প্রস্তুত থেকো। এর পরেই প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বিবাহিত না অবিবাহিত?

উত্তরে ভারতী বললেন, বিবাহিত, একটি কন্যাও আছে। শুনলেন নিবেদিতা— তা হলে পত্নীকে সঙ্গে আনোনি কেন? সসংকোচে ভারতী বললেন, আমাদের সমাজ স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় যাওয়ার রীতি নেই। তাছাড়া রাজনীতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তাঁর নেই।

জ্বলে উঠলেন তিনি। বললেন, গভীর দুঃখের সঙ্গে আরও একজন ভারতীয়কে দেখলাম— নারীকে ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না। শিক্ষার কী মূল্য আছে যদি তুমি তোমাদের নারীজাতিকে নিজের স্তরে উন্নত করতে না পারো? জাতীর অর্দ্ধাংশ কি ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে, অর্দ্ধাংশকে পরাধীন রেখে? বুঝতে পারছো না— দেশের অর্দ্ধাংশ যদি পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারচ্ছন্ন থাকে, দেশে কি কখনও অগ্রসর হতে পারে? যাক্ এখন থেকে তোমার স্ত্রীকে তোমার থেকে পৃথক কিছু ভেবো না। নিজের হাতকে যেভাবে তুলে ধরো, সেইভাবে তাকেও তুলে ধরবে। তাকে দেবদূতীর মত স্তুতি জানাবে। তাঁর কথায় অভিভূত ভারতী। ক্ষমা চেয়ে নিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করবেন না।

নিবেদিতা আরও বললেন : ভুলে যেও জাতিভেদ, সকল ভারতবাসীকে ভালবাসবে, সমভাবে। তিনি এমন উন্মনা— যেন মনে হল ভারতীর সমাধিমগ্না তিনি।

বিদায়ের সময় হলে নিজস্ব সংগৃহীত একটি শুষ্ক পত্র তাঁর হাতে প্রসাদী প্রতীক তুলে দিলেন। বললেন, এটি সযত্নে রক্ষা করো। আশীর্ব্বাদ করলেন, মনের সকল বাধা দূর করে, জাতি ভেদ, বর্ণ ভেদ,— বর্ব্বর ভেদাদিভেদ ত্যাগ করো, হৃদয়ে প্রেম এনো, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তুমি দিব্যরূপে অঙ্কিত থাকবে।

ফিরলেন ভারতী, দেবীশক্তি দর্শন করে। আধ্যাত্মিক পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। খুঁজে পেলেন সামাজিক জাগরণের পথ। প্রাণোদিত করলো তাঁকে রাজনৈতিক চরমপন্থীর পথে। বার বার ধ্বনিত হল তাঁর বাণী। ভারতবর্ষকে দেখবে শৃঙ্খলবদ্ধ রোরূদ্যমানা জননীরূপে, যাঁরা ঐ শৃঙ্খল ছেদনের সংগ্রাম নিয়োজিত, তাদের কোলে সমর্পিত করো নিজেকে।... ভারতী সেই মুহূর্ত থেকেই মেনে নিলেন ইনি তাঁর গুরু। এরপর থেকে ভারতীয় কলম ছুটলো দেশ জাগরণের পথে।

১১ই অক্টোবর ১৯০৬ তিনি মিঃ র‍্যাটক্লিককে পত্র লিখলেন— তখন তিনি ভারতে ফিরতে উদ্যোগী হয়েছেন : আমি তোমাকে না ফিরতে বলার জন্য তো তাগিদ করেছিলাম। যাইহোক ফিরছো কিন্তু তুমি কোথায় ফিরছ, সে সম্বন্ধে কি বলি বলো? বলতে শঙ্কা হচ্ছে, তবু বলি, ও বিষয়ে জানার উত্তম হুইটম্যানের 'মুক্তপথের সঙ্গীত' খুলে শুন ঐ শব্দগুলো — 'শোন আমি সৎ

হব তোমার সঙ্গে' 'হে আমার হতভাগ্য বন্ধু!' এই হল ন্যায় প্রেমিক, সকল মানুষের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তবু ঐ সব মানুষের এমনই দুর্ভেদ্য প্রকৃতি যে, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সঙ্গী হয়ে সে দুঃখ পেতে চায় — তার নির্ব্বাচনের অসমর্থ্য কি, মানবজীবনের ক্ষেত্রে সর্ব্বাধিক ক্ষতি নয়?

আর না, থামছি। কেবল স্মরণ রেখো, তোমরা ফিরছ ভালবাসা-কৃতজ্ঞতা ও সমর্থনের একটি জগতে — যদিও সে ভ্রান্তি তোমাদের প্রাপ্যের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র?

ইতিপূর্ব্বে মঠের তরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দজী স্বামিজীর জীবনী রচনার ভার তাঁর হাতে অর্পন করেন। তিনিও সমস্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ করার জন্য যাঁদের কাছে স্বামিজীর চিঠি ও তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে, তাঁদের চিঠিও লিখেছিলেন কিন্তু কলম তুলে নিয়ে সে বাসনা পরিত্যাগ করলেন। মনে প্রশ্ন জাগলো কে আমি? তাঁর জীবনী লিখবো? কত বিভিন্ন রূপে, কত বিভিন্ন মানুষের কাছে কত রূপে প্রতিভাত ছিলেন তিনি— সাধ্য কি সে সকলরূপকে সম্মিলিত করে বিরাট এই চরিত্রের রূপাঙ্কন করেন॰স্থির করলেন, নিজে যা দেখেছেন লিপিবদ্ধ করবেন। লিখতে সচেষ্ট হলেন আচার্য্যদেবকে যেরূপে দেখেছি। চোখের পাতায় তাঁর ভেসে উঠলো লণ্ডনের সেই উপবেশন কক্ষ, প্রথম দর্শন, স্বামিজীর সঙ্গে। মাঝে মাঝে বিচিত্র উচ্চারণ করছেন 'শিব' শিব! 'শিব'! মুখে ধ্যানীর মগ্নতা বিহ্বল কোমালতা।... বেলুড়ের সেই শেষের দিনে খ্রীষ্টের মত ইঙ্গিতময় ভাষা, মাঝে যাঁকে মনে হয়েছে শিব, কখন বুদ্ধ, কখনও বা মনে হয়েছে আলো শুধু আলো। দেখেছেন আলো শুধু আলো। দেখেছেন: অন্তরে বিশ্বপ্রবাহী প্রেম, ধূমায়িত বেদনা— 'স্বদেশ মুক্তির কামনায়', যে ভারতে তিনি বসে,— তিনিইতো দেখিয়ে ছিলেন তার রূপ, সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন, বর্ণনা করেছেন তার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহ। মনে পড়ে সেই বাণী, জগতকে আলো দেখাবে কে? আত্ম বির্সজ্জনই ছিল অতীতের কর্ম্ম রহস্য। যুগ যুগ ধরে তাই চালিত থাকবে। যারা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য; তাঁদের চিরদিন "বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়" আত্মবিসর্জ্জন করতে হবে। জগতের একান্ত প্রয়োজন সেই চরিত্র, জগত এখন চায় যাঁদের জীবন প্রেম-দীপ্ত ও স্বার্থশূন্য, সেই প্রেম, প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্রে মত শক্তিশালী করে তুলবে। আমার চাই— জ্বালাময়ী বানী তার চেয়ে জ্বালাময়ী কর্ম্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো, জগৎ দুঃখে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তোমার কি নিদ্রা সাজে?

অবশেষে সেই ডাক : এদেশে যে কী দুঃখ, কী সংস্কার, কী দাসত্ব যে, তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এদেশে এলে দেখবে চারিদিকে অর্দ্ধনগ্ন, অগনিত নর-নারী, জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উৎকট ধারণা, শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে, ভয়ে বা ঘৃণায়, উল্টোপক্ষে পায়ও ঘৃণা। ... অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গেরা মনে করবে তোমার মাথা খারাপ, তোমার প্রতিটি গতিবিধি, তারা সন্দেহের চোখে দেখবে — তা ছাড়া এখনে দারুণ গরম, আমাদের শীতকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মত। দক্ষিণে তো সর্বসময় আগুনের হলকা। শহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখ স্বাছন্দ্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস করো 'স্বাগত' তুমি শতবার স্বাগত।

স্থির করলেন জীবনী নয় তিনি লিখবেন, 'দি মষ্টার এজ আই স'হিম' আমি ঠিক যেমন দেখেছি তাঁকে।

স্বামী স্বরূপানন্দের দেহ ত্যাগের পর প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া 'Occasional Notes' প্রতিমাসে লিখতে লাগলেন। এখানেই famine and food নামে প্রবন্ধ রচনা করলেন। আরম্ভ করলেন "The Master as I saw him"। জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করলেন তাঁর Electro Physiology পুস্তক রচনায়।

দশ মাসে চল্লিশটি অধ্যায় লেখা শেষ করলেন। এছাড়া রামায়ন ও মহাভারতের ইংরাজি অনুবাদ। পরিকল্পনা ছিল 'Myths of the Hinduism and Bhudhism নাম দিয়ে আরও একটি রচনা করবেন ভবিষ্যতে।

• ৮ই আগষ্ট ১৯০৬ মিসেস ওলি বুলকে লিখলেন : আজ অবলা বসু-এর জন্ম দিন। আমি তোমার জন্য একটু উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু খোকা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, তুমি ফেরার পরে তোমার পাঠানো বার্ত্তা সে পেয়েছে।

২৯শে আগষ্ট ১৯০৬ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : যে পর্য্যন্ত আমরা 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' লিখেছি, সে অবধি, তার বাইরে কোন কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার কাজের অংশ দমবন্ধ করে দিয়েছিল। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান বইটি সম্বন্ধে একই পরিমান কাজ করি কিন্তু মনের দিক দিয়ে অনুভব করি, আমি মুক্ত। মনের আধখানা অংশ আমি, দিনান্তরে কোন দায়ভার বোধ না করে, নিজের চিন্তায় দিতে পারি— এটা কি বিচিত্র প্রাপ্তি নয়।

পরপর শোক, পরিচিত সহকর্ম্মীকের মৃত্যু তাঁর মনে আঘাত হেনে ছিল। শরীর জীর্ন, তবুও দ্বিগুন উৎসাহে লেখনী তাঁর এগিয়ে চললো। অরবিন্দ হাল ধরেছেন, বিপিনচন্দ্র প্রচার চালাচ্ছেন অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রনাথ, স্বামিজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রমুখ প্রকাশ করেছেন, যুগান্তর। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মুখর সন্ধ্যা, মুখর মিঃ তিলকের 'কেশরী'— মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে লাজপত রায়, মাদ্রাজে বালভারতী, এগিয়ে এসেছেন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে।

সর্ব্বত্রই, জাগো— জাগো রব। আগুন ছড়াচ্ছে জন-গন-মনে, আর দমদমের ফেয়ারী হলে বসে তিনি জপ করছেন : 'এ আগুন ছড়িয়ে পড়ুক সারা ভারতে'। মারাঠায় মিঃ কেশরী উল্লেখ করে চলেছেন : রাশিয়ার জনগণের মর্ম্মবানী — উল্লেখ করছেন : বিপ্লববাদীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ইতিহাস।...

২৫শে জুলাই ১৯০৬ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ১৯০৪ সাল থেকে একটি নির্দিষ্ট দিনে সমারোহপূর্ণ প্রদর্শনী ও শোভাযাত্রার কথা ভেবে আসছি। ...দু'বছর আগে সরবোন শোভাযাত্রা দেখার পর থেকেই, সে ভাবটি এখানে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। তোমার চিঠি নূতনতর প্রেরণা এনে দিচ্ছে। ১৬ই অক্টোবর 'সর্বভারতীয় দিবস' উপলক্ষে ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত একটি নাগরিক শোভাযাত্রার কথা বলছি বা লিখছি। ব্যাপারটি এগোবে— 'ওয়ার উইক পেজন্ট'-এর সঙ্গে তুলনা করে। আমাদের সামর্থ্য খুবই সামান্য, আয়োজন সাদামাটা। এসবের ক্ষেত্রে আসল হল প্রাণ, বহিরঙ্গ সজ্জা নয়। এখানকার গলিতে তুমি পূজা বা বিয়ের শোভাযাত্রা দেখেছ— ওগুলি মধ্যযুগীয় নাগরিক শোভাযাত্রা। ভারতীয় জনগণ সে নৈপুণ্যে অভ্যস্ত। তাই দিল্লীর দরবারকে ওরূপ অপূর্ব করে তুলেছিল। আহা! এখানকার জীবন নিজ মৌল পদার্থে কিনা সমৃদ্ধ, সুন্দর ও মহান— শিল্প, নাটক, জাতীয়তা— সবকিছু। আহা! যদি বিরাট কেউ উঠে পড়ে এই সবকিছুকে সংগঠিত করতে পারে! আমি অবশ্য ব্যাপারটা দর্শন করতে পারছি, কিন্তু আমার কাজে ও কথার শক্তি আগের থেকে অনেক হ্রাস পেয়েছে, অসুস্থতার জন্য। এত হ্রাস পেয়েছে যে, আমি যা দেখছি, তার অর্ধেক ও প্রকাশ করতে পারছি না।

এই রচনাটি জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেরুতে শুরু করছে 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায়। এ রচনায় জাতীয়তাকে সর্বাত্মক করে তুলতে চেয়েছি। ভারতবাসী ব্যাপক ইতিহাসচেতনা লাভ করুক, যার দ্বারা তারা সৃষ্টিশীল ও গতিশীল ভারতীয় জীবন ধারার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হয়ে

উঠতে পারে। আকাঙ্ক্ষা করি, একদিকে আসবেন নূতন ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ প্রেমে, প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসন্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দাসত্ব না করে সত্যের সন্ধানে একান্ত শ্রমে উদ্ধার করবেন, অজ্ঞাত উপাদান এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সজীব দৃষ্টিতে করবেন ঐসব তথ্যের পর্য্যালোচনা। একথাও স্বীকার করি : ঐ সকল গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলভোগ সাধারণ মানুষ করতে পারবে না, তা নিবদ্ধ থাকবে শিক্ষিতশ্রেণীর পাঠক্রমে। অর্দ্ধশিক্ষিত বা নাতি শিক্ষিত জনসাধারণকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রবহমান ধারার সম্মুখীন করার উপায় : ধর্মীয় উৎসব ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে ভারতের ধর্মধারার রূপ সম্বন্ধে অবহিত করা। এই ধরনের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা হোক জাতীয় চেতনাসৃষ্টির ক্ষেত্রে। পূর্বেই এ প্রকার প্রয়োজন অনুভব করে মিঃ তিলক পুণায় 'গণপতি উৎসব' ও 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেছেন। উৎসবটি সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহাসিক হলে তা মুসলমানদের সন্দেহ লক্ষ্য। ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার প্রসঙ্গে সতর্কতা অবলম্বনে বললেন : দরিদ্র, পরাধীন দেশ, সঙ্কুচিত সামর্থ্য 'ওয়ার উইক পেজন্ট'র মত পশ্চাদপট থাক নদী, মুক্ত আকাশ, বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, হাজার হাজার মানুষের শোভাযাত্রা, প্রাচীনকালের সাজ পোশাকে অনুকৃত ভঙ্গিতে।

এখানে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ঐভাবে প্রদর্শিত করতে সমর্থ হবো। কারণ, জাতীয় চৈতন্য আত্মপ্রকাশিত হয় ইতিহাসের মধ্যে, যেমন মানুষে আত্মবোধ ঘটে, নিজ জীবনের স্মৃতি ও আনুষঙ্গিকের মধ্যে।

ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঐতিহাসিক নাটকের আগমন ঘটেছে। আমাদের এই শহর অনুভব করছে : থিয়েটারগুলি, জগৎ পরিবর্তনকারী ভাব সমূহের দর্শন ও বিস্তারের সর্বোচ্চ ও সর্বমহৎ কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে।

ধরা যাক : ভারতের ঐতিহাসিক নগরীগুলির ট্যাবলো : একটি মূক অভিনেতা দল, দিল্লী, চিতোর, বারানসী, অমৃতসর, পুণা প্রভৃতি নগরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তাদের সাজপোষাক হবে বর্ণময়— নাটকীয় বাস্তবতায়, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে, যেসব নগরী প্রাধান্য পেয়েছে, তারা আসবে ক্রমান্বয়ে— কেন্দ্রে থাক দিল্লী। সামাজিক ও ধর্মীয় শোভাযাত্রার সঙ্গে পরিচিত এরা। জাতীয়তা খাতে, যে শিক্ষা ও প্রেরণা প্রবাহিত হলে জনগণ ক্রমে ঐতিহাসিক ভাবাবহের সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হবে।

গ্রামে, গ্রামে, বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে, হাটে, ঘাটে, খেলার মাঠে, সর্বত্র হোক এর অনুষ্ঠান। শিশুরা, অশিক্ষিতরা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোট বেঁধে এইসব ভূমিকায় অংশ নিক, যাতে তারা স্বদেশের ইতিহাস চেতনা লাভ করে। তাদের কাছে হয়ে উঠুক, প্রবল বাসনার ধন— যেমন পাঞ্জাবের শিশু ও কৃষকদের কাছে 'রামলীলা উৎসব', উত্তর পশ্চিম ভারতে শিয়াদের কাছে 'মহরম', হিন্দুদেশীয় রাজ্য সমূহের 'বীরাষ্টমীর' শোভাযাত্রা, ঢাকার 'জন্মাষ্টমী'। তেমন বাসনা যদি জাগে, আমরা আশা করতে পারবো— নিজেদের মহাশক্তিশালী জাতিতে সংগঠিত করার জন্য। যারা মাতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের হৃদয়, মন এখন উদ্বেলিত হয়েছে সক্রিয় জাতি-চৈতন্যে। জাতীয়তাকে বাস্তবরূপ দিতে গেলে, সকল শিশু সন্তানের কাছে, তার দেশের ইতিহাসকে, প্রত্যক্ষভাব মাধ্যম করে তোলা আবশ্যক। প্রস্তাব রাখলেন : পরবর্তী ১৬ই অক্টোবর 'জাতীয় দিবসে' ছাত্ররা যেন রাখী বন্ধনের ধর্মীয় উৎসবের অতিরিক্ত হিসাবে, 'ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা' পথে পথে সংগঠন করে। বারো থেকে কুড়িটি 'দৃশ্য' গাড়ী করে অগ্রসর হবে, সামনে শঙ্খ বাদকেরা, পিছনে যন্ত্রসঙ্গীত, সঙ্গে ধ্বজ পতাকা। সর্বশেষ দৃশ্যটিতে দেখা যাবে আধুনিক ভারত, শোকাভিভূত আকারে। শোভাযাত্রা, দিনেও হতে পারে কিন্তু রাত্রেই সুন্দর— সার সার জ্বলন্ত মশাল, মাঝে মাঝে তাতে ইন্ধন নিক্ষেপ আর উচ্ছ্বসিত অগ্নি ঝলক।

রামায়ণ মহাভারতকে যদি শোভাযাত্রায় আনা হয়, ইতিহাসের অংশ হিসাবে মুসলিম যুগের গৌরবজ্জ্বল অংশও, স্থানীয় ইতিহাসের উল্লেখ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

আমোদ আহ্লাদের বস্তু সরবরাহ নয়, সংস্কৃতির এক নূতন বাহনকে হাজির করতে চাই জনসমক্ষে। দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত হোক অনুষ্ঠান সূচী, প্রতিটি দৃশ্যের নাম ও যে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থাক সেইসঙ্গে। দর্শক আসন হোক, গৃহ, ছাদ, বারান্দা, ফুটপাত, মহিলাবৃন্দ যেখানে দর্শক, উপস্থিত থাকুক অভিভাবক, প্রতিটি উৎসুক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তুলুন তাঁরা সকলের সমক্ষে। শোভাযাত্রাটি পরিণত হোক বিদ্যালয়ে, যার হৃদয় আছে, কাজ করবে মস্তিষ্কও সেইসঙ্গে।

সুকৌশলে সভাপতি নির্ব্বাচন করলেন, কিন্তু তিনি ঘোষনা করলেন কংগ্রেসের লক্ষ্য 'স্বরাজ'। এ প্রস্তাবকে ঠেকানো গেল না। 'বাংলার স্বদেশী ও বয়কট', পুনরায় প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করানো হ'ল। কলকাতার এই অধিবেশনে এক্সট্রিমিস্ট বা ন্যাশন্যালিশ্ট দল শক্তিশালী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো।

১৯০৬ সালের এপ্রিলে বরিশাল কনফারেন্সে অরবিন্দ যোগদান করতে গিয়েছিলেন। সরকারের নিষ্ঠুর পীড়নে, তিনি নীতি পরিবর্তন করলেন। যদিও তিনি, 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলনে 'অসহযোগ ও বয়কট' নীতির প্রবর্ত্তক। অবশ্য এ পরিকল্পনার উদ্যোক্তা বিপিনচন্দ্র পাল সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেরই সহযোগিতায় আন্দোলন শুরু। যদিও মতপার্থক্য ছিল। অরবিন্দ ছিলেন এক্সটিমিস্ট আর এঁরা উভয়েই ছিলেন মধ্যপন্থী বা মডারেট দলভুক্ত। এমন কি 'গুপ্ত-বিপ্লবে'র বিরোধী। অরবিন্দ 'দেশের স্বাধীনতার জন্য যে কোন পথ গ্রহণে উদ্যোগী' নিবেদিতার মতই। বালগঙ্গাধর তিলক, ও লাজপত রায় উভয়েই চরমপন্থী। দেশের মুক্তি-পথে যে-কোনও পথ অবলম্বনে আগ্রহী। তবে রাজনৈতিক ডাকাতির পথে অবলম্বনের ঘোর বিরোধী, নিবেদিতার মত : দেশের কাজ বা দেশের মুক্তি জন্য যে কোন পথ অবলম্বন 'এমনকি প্রাণ বিসর্জ্জন বা কারাবরণ আদর্শ হওয়া উচিত কিন্তু এমন পথ অবলম্বন করা উচিত নয়' যে পথকে দেশবাসী 'হীনকাজ' বলে গন্য করবে। শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তারা 'অশ্রদ্ধেয়' হয়ে উঠবে নিজ দেশবাসীর চোখে। কিন্তু সে গতি রুদ্ধ করা গেল না। বিপ্লব-পন্থীদের যুক্তি, সংগ্রামের পথে, অস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। তা স্বদেশে তৈরীই হোক বা অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করা হোক। সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন অর্থের, তা আসবে কোথা থেকে? স্বেচ্ছায় কেউ দেবে না, বরং যারা বিত্তশালী, তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান বর্ত্তমানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অরবিন্দ মৌন সম্মতি জানালেন। গুপ্ত সমিতি নিজের পথে অগ্রসর হলেন। হেমচন্দ্র কাননগোকে ফ্রান্সে পাঠানো হলো বোমা তৈরী শিক্ষার জন্য। রডাকোম্পানী থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা শুরু হল। সরকার পরিচালনায় যেসব লোক অত্যাচারী, যাদের আদেশে দেশবাসীর উপর নির্ম্মম পীড়ন চলেছে,— তারাই দেশের এক নম্বর শত্রু। চললো : গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা। মুখপত্র হ'ল 'যুগান্তর' পত্রিকা। পরিচালক যুগান্তর গোষ্ঠী। কর্ম্মী সংগ্রহের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন অনুশীলন সমিতি। বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্বে সবাই এঁরা। পরিচালনার দায়িত্বে রইলেন, দলনেতা আর মানিকতলার বাগানবাড়ী পরিচিত হল আশ্রমবাড়ী রূপে।

ইতিপূর্ব্বে ১৯০৬ সালের মার্চ বা এপ্রিলের গোড়ার দিকে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ (স্বামীজীর ছোট ভাই), গুপ্ত সমিতির মুখপত্র প্রকাশে নিজেদের নিযুক্ত করলেন।

মূলধন সংগ্রহীত হ'ল ৩০০ টাকা। নামকরণ হ'ল, শিবনাথ শাস্ত্রীর সামাজিক উপন্যাস 'যুগান্তর' নাম অনুসরণে। পত্রিকা বার হওয়ার পর দলে যোগ দিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অরবিন্দ, সখারাম দেউস্কর প্রমুখ হলেন পরামর্শ দাতা। পত্রিকা পরিচালনে রইলেন যুগন্তর গোষ্ঠী। সম্পাদক রূপে কাউকে নির্দিষ্ট রাখা হল না। টাকা সংগ্রহ, মতামত প্রকাশ ও লেখনীর দায়িত্ব সবই সম্পাদক মণ্ডলীর। রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক ইংরাজীতে তার পূর্ব্বে একটি 'বন্দেমাতরম' নামে পত্রিকা বার করেছিলেন অরবিন্দ সে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তাতে রচনা বেরুতো ইংরাজীতে, উচ্চ ধরনের চিন্তাধারা সমৃদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য। যুগান্তর হ'ল বাংলা পত্রিকা। বেরুতে শুরু হল : সরকারের প্রতি উগ্র আক্রমণ, মুক্ত বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সমন্বিত প্রবন্ধ সমূহ। যাকে বলা চলে জনগণ মনে বিস্ফোরণের আগুণ জ্বালানো সে সব ভাষা।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের বিস্ফোরণ। প্রথম পাঁচ হাজার, পরে দশ হাজার, একবছরে বিক্রয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার। এই পত্রিকার চোখা চোখা লেখা থেকে সংকলিত হল 'মুক্তি কোন পথে' 'বর্ত্তমান রাজনীতি'। প্রথমটির উদ্দেশ্য জনমত গঠন। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য অস্ত্র সংগ্রহের দ্বারা বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা। অর্থ সংগহের জন্য ব্যবস্থা হল : রাজনৈতিক ডাকাতি। প্রচার চললো : ট্রিগার টিপে ইংরাজদের 'নিকেশ' করতে গায়ের জোরের প্রয়োজন আর নেই। বোমা তৈরী করতে অসুবিধা কি? দেশীয় সৈন্যরা পেটের দায়ে সৈন্য দলে ঢোকে, ওরা এদেশেরই মানুষ, ওদেরও রক্ত মাংসের শরীর, স্বদেশের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হলে, তারাও অস্ত্রশাস্ত্র নিয়ে এই স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করবে না।

'সিডিশন' কমিটির দৃষ্টি আকর্ষিত হ'ল। 'বর্ত্তমান রাজনীতি', রণনীতি, আধুনিক যুদ্ধরীতি ও অস্ত্র সম্বন্ধে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে রচিত এ বই। ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষায় উদ্দীপ্ত করার প্রচেষ্টা লুকিয়ে আছে এই পুস্তকটিতে।

আগস্টে (১৯০৬), জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষ হয়ে অরবিন্দ সুবোধ মল্লিকের রাজবাড়ীতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পিছনে দিকে বসবাস সুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন বিপ্লবী গোষ্ঠী। ফলে, এই বাড়ীটি হয়ে উঠলো বিপ্লব পরিচালনার গোপন আড্ডা। এখানে বারীন ঘোষ ও সত্যেণ বসু বাস শুরু করলেন। ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা হল। আর যুগান্তর পত্রিকার অফিসটি হ'ল যুগান্তর পার্টির কেন্দ্রস্থল। আসবাবের মধ্যে ছেঁড়া মাদুর, তার উপরে বসে তিন চারটি যুবক। এরাই দেখছেন ভারত উদ্ধারের স্বপ্ন। গোলাগুলির সম্পর্ক নেই, সম্বল বচনবাক্য। এর দ্বারাই, এরা ইংরেজকে দেশ ছাড়া করবেন।

শুধু তাই নয়, তাঁর জয় করবেন গর্ভমেন্ট হাউস, তুলে নিয়ে যাবেন সেখানে তাঁদের এই বর্ত্তমান অফিসটি। এঁদের মধ্যে আছেন দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামিজীর ছোট ভাই), বারীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। এঁদের সংসারের গৃহিণী অবিনাশ ভট্টাচার্য্য। সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ বন্দোপ্যাধায়। এঁদের নেতা বারীন্দ্রনাথ। ম্যালেরিয়া রোগী, বর্ত্তমানে পলাতক দেওঘরে। নবাগত উপেন্দ্রনাথকে এঁরা বোঝালেন, দশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হয়ে যাবে। এঁদের এমন বাকচাতুরী ও যুক্তি, যা বিশ্বাস না করে উপায় রইলো না। এঁদের বক্তব্য : ইংরাজদের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেশিনগান সবই মায়া! এটা ভোজবাজীর রাজ্য। তাসের ঘর। এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন এসব মায়ার খেলা।

এঁদের কলমে এমন যাদু, ভাষার এমন রূপ, দেশের প্রাণ পুরুষ, এঁদের হাত দিয়ে সকলের অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত হয়ে চলেছে। এঁদের পত্রিকায় উদ্ধৃত 'অগ্নির ঝলক' পাঠক পাঠিকার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

সরকার সতর্ক হলেন। এঁদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা সুরু হল। বারীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন — এটা বৃথা শক্তিক্ষয়। শুরু হল হাতে কলমে কাজ। কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হল মানিকতলার বাগান বাড়ীতে। সাজ, সাজ, রব উভয় পক্ষের। কিংসফোর্ড সাহেব কাগজওলাদের জেলে পাঠাতে শুরু করেছেন। দলে এসে গেলেন উল্লাস কর। পুলিশের হাতে একতরফা মার খেয়ে, হাঁপিয়ে পড়েছে দেশের লোক। ঠিক হল : কিংসফোর্ডের মাথা উড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু মাথা তো ফ্রেজারের— তিনিই তো 'ছোটলাট' তাঁর মাথার দাম সবচেয়ে বেশী। তাঁর মুণ্ডুপাতের ব্যবস্থাই করা উচিত সর্ব্বাগ্রে। স্থির হ'ল ডিনেমাইট দিয়ে লাট সাহেবের গাড়ীটা উড়িয়ে দিতে হবে। চন্দননগরের স্টেশনে রেল লাইনে গোটা কয়েক কার্টিজ রাখা হল। গাড়ী উড়লো না, একটুও হেললো না, দুললো না।

এরপর পরিকল্পনা হলে : রেলের লাইন জোড়ার মুখে মাটির নীচে, বোমা পুঁতে রাখা হবে। সে কাজটা সফল হল কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন লাটসাহেব। পুলিশের ঘোরাঘুরি বাড়তে লাগলো। বোমার কারখানা তুলে নিয়ে যাওয়া হল বৈদ্যনাথের দেওঘরের কাছে। মাঠের মধ্যে ছোট একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হল। একমাস পুরোদমে কাজও চললো— কিন্তু সমস্যা দেখা দিল রেলের খরচ ও বাড়ী ভাড়া নিয়ে। সে খরচা সামলানো দায় — সুতরাং কারখানাটা ফিরিয়ে নিয়ে আশা হ'ল কলকাতায়। অর্থ সংগ্রহের জোর চেষ্টা শুরু হল। শুরু হল রাজনৈতিক ডাকাতি, সেই সঙ্গে চললো গুপ্ত হত্যা, একের পর এক।

নিজেকে গুটিয়ে নিলেন নিবেদিতা। তাঁর নিজের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা— প্রয়োজন যেখানে রাজনৈতিক বিপ্লব। কিন্তু ডাকাতি? সে ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যেই হোক সে বস্তু নিপীড়ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। সর্ব্বাগ্রে আজ প্রয়োজন জনগণের সহযোগ ও সহমর্ম্মিতা। লেখার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন তিনি।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় ১৩ই অক্টোবর : বইটিকে সম্বর্ধনা জানালো : 'বর্তমান রাজনীতি' বাংলায় এই বইটি জাতীয়চিত্ত ও নব ভাবনার উদ্দ্যোতক। সংকীর্ণ জীবন ও আবদ্ধ আকাঙ্খায়, আমরা রোমান্টিক কবিতা ও উপন্যাস পাঠে পরিতৃপ্ত ছিলাম। এখন জাতীয় চিত্ত নব পর্য্যায়ে উন্নত। বর্ত্তমানে, ইতিহাস, দেশাত্মবোধক নাটক, জাতীয়তার গান, প্রাচীন ও সজীব ধর্ম্মে নিত্য উৎসবের বারি ছাড়া অন্য কিছু পড়ানো হয় না। বর্ত্তমান রণনীতিতে এ ধরণের বক্তব্যও ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণ যোগ্য নয়। আমাদের কাজ হ'ল দেশবাসীকে জাতীয় জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের জ্ঞান ও কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করা। ঐ সকল জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকার বর্ত্তমানে যদিও আমাদের নেই, কিন্তু তা জাতির ভাবী পূর্ণাঙ্গ গঠনের জন্য আবশ্যক।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে গঠিত হল 'মুসলীম লীগ'। কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে নিবেদিতা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন না — কিন্তু মিঃ গোখলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। কারণ তাঁর সাহায্য তখনও অপরিহার্য।

নিবেদিতা ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ মিঃ গোখলেকে ডেকে পাঠালেন পরামর্শের জন্য। তিনি তখন ভাইসরয় কাউন্সিলের সভ্য ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তা থেকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলেন। মিঃ গোখলের কাউন্সিলে থাকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তাঁকে বোঝালেন, ভিতরে থেকে কাজ করানোর উপযুক্ত লোকের, এখন একান্ত প্রয়োজন। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন মিঃ র‍্যাটক্লিফ। ভারতে তাঁর থাকার একান্ত প্রয়োজন। একটা চাকরীর ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এসময়ে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষনার কাজের জন্য সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।

১৯০৫ সালের জুন মাসে লর্ড কার্জ্জন, লর্ড কিচর্ণারের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়া পদত্যাগ করে লণ্ডনে ফিরে গেছেন! এরপর, ভারতের ভাইসরয় হয়ে এসেছেন মিঃ মিন্টো। কিন্তু কার্জনের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সুযোগ এলেই তিনি তার সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করে চলছেন। ১৯০৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের এক ক্ষুদ্র সমাবেশে ভারতের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে বক্তৃতা করে ভারতবাসীর দুঃখ নিবারণের প্রচেষ্টায় বৃটিশ শাসকবর্গ কি ভাবে কাজ করে চলেন তার প্রশস্তি গাইলেন:— 'ভারতের জল বায়ু, এবং মানুষ যদি একই প্রকার থাকে, তা হলে বৃটিশ সরকার দৃষ্টিগোচর কালসীমার মধ্যে ভারতের দুর্ভিক্ষ দূর করতে পারবেন, তার কোন সম্ভবনা আছে কিনা সন্দেহ গুরুতর। আশা করা যায় দুর্ভিক্ষের হার হ্রাস করা যাবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : "নেচার" পত্রিকায় বহু আশঙ্কিত সমালোচনা এসে পৌঁছেছে পাঁচকলম ব্যাপী। সমালোচক, কাগজটির মতই 'ভাইটালিষ্ট' সুতরাং সে প্লান্ট রেসপনসকে 'বেদ' বলে ছাড় পত্র দেবেই না। কিন্তু ইঙ্গিত করেছে। সে জিনিসটি স্পষ্টই তাকে অভিভূত করেছে, তার বিষয়ে সে বলেছে "বইটির চরম স্বাতন্ত্র্য, লেখকের বিজ্ঞান গত অতীতের ধারা ব্যাথ্যাত হয়েছে, যিনি পদার্থ বিজ্ঞান থেকে এসেছেন ইত্যাদি। বস্তুতঃ আলোচক যদিও বইটিকে তৃপ্তচিত্তে নিতে নিতান্ত গররাজি, তবু আমার মতে এটি একটি প্রচন্ড আলোচনা। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বোষ্টন 'ট্রান্সক্রিস্ট' এ যা অল্প কিছু বেরিয়েছে, সারা ভারতে তা পুনরুল্লিখিত হয়েছে।... খোকার স্বাধীনতা সংগ্রহের পরিকল্পনা সাফল্যের জন্য প্রার্থনা কর।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ভারতীয় সংস্কার হল ১২ বছরে কোন চিন্তা পূর্ণ বিকশিত হয়। তাই ডঃ বসু তাঁর বই বর্ত্তমানে মে-মাসের আগে শেষ করতে চান— তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশের পর ১২ বছরের মাথায়।

গ্রীষ্ম এখন দুয়ারে। কাজকর্ম্মকে তা এত বেঁধে দেয়! ইতিমধ্যে বসুরা মে ও জুনের জন্য কাশ্মীরের কথা বলে রেখেছে। যদি যাওয়া হয়, মিসেঁস সেভিয়ার যোগদান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি এবং বৌ ডান্ডি নেবেন, আমরা তিনজন হাটবো। ভয় হয় — এটা বসুদের পক্ষে বিরাট খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, তারা প্রায় সকল ছুটির বেড়ানোর খরচ বহন করে। এধারে, দার্জিলিং-এ বসন্ত দেখা দিয়েছে।

মার্চের মাঝামাঝি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেঁধে গেল কুমিল্লা ও জামালপুরে। সরকার জাতীয়তাবাদী ও আন্দোলনকারীদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। দাঙ্গা বাধায়, তারা ভেদনীতির রোলার চালাতে শুরু করলো। মুখ্য মন্ত্রী আমানুল্লা মৌলবীদের লেলিয়ে দিলেন। নির্যাতীত হল হিন্দু সম্প্রদায়। চললো হিন্দুনিধনযজ্ঞ। জাতীয়তা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন। হাল ছাড়লেন না নিবেদিতা। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে, নিপীড়িতদের বললেন : আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও। উপদেশ দিলেন : জাতীয়তা যাতে অটুট ও উৎজীবিত থাকে, সে চেষ্টায় প্রাণমন সমর্পন কর। লিখলেন : হিন্দুমুসলমান পরস্পরের পরিপূরক। মিলিত শক্তি ছাড়া জাতীয় মুক্তি অসম্ভব।

কৃস্টীনের সঙ্গে মিঃ গোখলের বন্ধুত্ব নিবিড়। নিবেদিতা কৃস্টীনকে পরামর্শ দিলেন সবিস্তারে মিঃ গোখলেকে চিঠি দিতে।

২৭শে মার্চ কৃস্টীন মিঃ গোখলেকে পত্র দিলেন। পত্র সংলগ্ন ডঃ বসুর কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নিবেদিতা আপনার কাছে পাঠাতে বলেছেন, যা, ইচ্ছামত আপনি ব্যবহার করতে পারেন বা নাও পারেন। ওঁর ধারণা এটিকে আপনি হয়ত প্রয়োজনীয় বোধ করবেন। ডঃ বসু গতকাল এসেছিলেন।

তিনি বললেন : আপনি এই ধরনের একটা কিছু চাইছেন। কিন্তু সেটা লেখার সময় যখন এলো, তিনি 'বেয়াড়াপনা' করলেন এবং সবকিছু বাতিল করেদিলেন। জিনিসটি তাঁর চলে যাওয়ার পরেই লেখা হচ্ছে। এর কথা তিনি জানেন না— তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকেই এটি পাঠানো হচ্ছে :

প্রিয় মিঃ গোখলে, একটা খসড়া করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করছি, এর থেকে আপনি যা উত্তম বিবেচনা করবেন তাই নেবেন।

'গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভারত কিছু পরিমাণে আধুনিক শিক্ষা পেয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অধিকার তার জন্মেছে। ভারত সে যোগ্যভাবে তা করতে সমর্থ, তা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। এখন একমাত্র প্রশ্ন : এর জন্য অধিকতর সুযোগ সংগ্রহের ব্যাপারে সরকার কি পন্থা গ্রহণ করবে? সমুচ্চ বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসা অর্থাৎ কোন বিশেষ ধারায় কাজ করার জন্য বিজ্ঞানকর্মীর ব্যক্তিগত অনুরাগ এবং তাকে ধরে থাকবার জন্য তীব্র মননগত ব্যাকুলতা— এ জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করা যায় না বা কেবল সংগঠনের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে উৎপাদন করা যাবে, এমন আশাও করা যায় না। হায়! ঐসব উচ্চগুণাবলী নশ্বর মানবের ইচ্ছামত 'ওঠ-বোস' করে না।' একমাত্র যা করা যায়, ব্যক্তিবিশেষ বা সরকার যা করতে পারে, তা হল যেখানে স্বতঃই তা স্ফুরিত হয়েছে। সেখানে, সুযোগ নিয়ে, সে তার লালনের ব্যবস্থা করতে পারে।

আমার স্বদেশীয় ডঃ জে, সি বসু, যে কাজ, ইতিমধ্যেই করেছেন, তা জগতের সামনে উপস্থিত আছে। তথাপি এইতো গবেষণার সূত্রপাত, যাকে প্রাণপাত করেই মাত্র তিনি সমাপ্ত করতে পারেন। সরকার অতীতে, এইক্ষেত্রে তাঁর দানের সমাদর করেছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষে এই সমাদরকে পূর্ণভাবে কার্যকর করাই কি সর্বোত্তম নীতি হবে না? সরকারের গৌরব ঘোষণার পক্ষে উপযুক্ততর জিনিস আর কি থাকতে পারে? তাঁর হাতে, উচ্চতর গবেষণার কোন বিরাট কেন্দ্রের সংগঠন দায়িত্ব অর্পণ করার উপযুক্ত সময় কি এখনই নয়? যার জন্য ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক সমাজ ইতিমধ্যেই প্রস্তাব করেছেন! আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেসব আবিষ্কার তিনি ইতিমধ্যেই করেছেন এবং ভবিষ্যতে করতে পারেন, সেই পথে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য যাতে তিনি নিজের সমস্ত সময় নিয়োগ করতে পারেন, সেই বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করে তাঁর প্রতিভা ও উৎসাহের যথাসম্ভব সৎব্যবহার করাই কি সরকারের ন্যূন্যতম কর্তব্য হবে না?

এদেশে বৈজ্ঞানিক সুযোগ সুবিধার জন্য যে দাবী উঠেছে, টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন তার মোটেই উপযুক্ত উত্তর হবে না, কারণ হাত-ফিরি হওয়া জ্ঞান দু'দিনেই অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং তা কদাপি প্রাণসঞ্চারক হয়না। যতক্ষণ না জনগণ নিজেদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা সঞ্চারিত করতে পারছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না, সে মৌলিক চিন্তার অভ্যাস ও মানুষের মৌল জ্ঞানরাশিবে অগ্রসর করিয়ে দেবার সামর্থ অর্জন করছে, ততক্ষণ অপর দেশের মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির প্রয়োগ-চেষ্টা, উত্তরোত্তর অযোগ্য মনে হবে।

২৮শে মার্চ ১৯০৭, মিঃ গোখলেকে লিখলেন : আগামী কাল গুডফ্রাইডে, আমরা সবাই একত্র হব আশা করছি। এমন কি মিসেস বসু পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগদান করছেন। কয়েক ঘন্টার জন্য ফাঁক কেটে আপনি কি আসতে পারেন না? আপনাকে কত না পেতে চাই। ...ডঃ বসু বিশেষ ভাবে এটা চান এবং আজ রাত্রে দেখা পেতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে তাগিদ দিচ্ছেন।...

আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরে আসছেন না কেন? আপনার প্রতিশ্রুতি পেলে এ বিষয়ে আমরা মনস্থির করতে পারি। বিরাট অরণ্যের মধ্যে পাইন, দেওদারের নীচে— যেখানে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকবো, কিংবা সন্ধ্যার ছায়া যখন নদীর উপরে, ঘনতর হয়ে উঠবে তখন সেখানে বসে

আমরা সুমহান বিষয়ে কথা বলে যাব। এমন সুযোগ যাঁরা পান— তাঁরা পরবর্তী জীবনের জন্য, পেয়ে যান আলোক ও শক্তির ঐশ্বর্য্য।

২৮শে মার্চ্চ ১৯০৭ মিঃ গোখলেকে, কৃস্টিন জগদীশচন্দের বিশেষ প্রীতি অনুরাগের কথা জানিয়ে, কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিশেষ অনুবোধ করলেন। নিবেদিতা লিখলেন : না, তুমি কাউন্সিল ছাড়তে পারবে না— এটাই আমার বিশেষ আশা। কাউন্সিলে তোমার স্থান, সেখানে তোমার অসীম মূল্য। ...উৎসাহিত করার আশায় লিখলেন ...তা ছাড়া বিরাট সংকটকালে প্যারিসে 'লা-মার্টিন' যা ছিলেন, তাই একদিন তুমি ভারতের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াবে। সেটাই তোমার ভবিতব্য— সর্ব্বদা ভেবেছি। তুমি, কাউন্সিলে থাকো, বা না থাকো ও জিনিস তোমার কাছে আসবে। জীবনের ক্ষেত্রে, তোমার জন্য নির্দ্ধারিত স্থান, তোমার পশ্চাৎধাবণ করছে সুতরাং তাকে সন্ধানের প্রয়োজন তোমার নেই।

মিস ম্যাকলাউডকে একই তারিখে লিখলেন : বছরের এই সময়েই তোমার কাছে বেলুড়ে প্রথম এসেছিলাম। সে কথা কি মনে পড়ে? সেসব দিনের কথা সদাই মনে জাগে। কারণ এখন আমি আবার এক বিস্তীর্ণ সবুজ স্থানে রয়েছি। সন্ধ্যায় ঝড় ওঠে— স্মৃতিতে ভেসে আসে সেই সন্ধ্যা এবং ভগবানের প্রতি ভালবাসা। ঈশ্বর-প্রেম, যদি কেউ দেখে থাকে তার মধ্যেই দেখোছো। অনত্র আমরা ঈশ্বর প্রেমের যে রূপ দেখি, তা আসলে মানবপ্রেমের দুর্বল নিষ্কাশন ছাড়া কিছু নয়। ...সময় ছুটে দ্রুত। কাজে আর পুণ্যে ভরা দিন, ক্যালেণ্ডারের পাতায় কাড়াকাড়ি করে ছুটছে। সচেতন হবার আগেই বছর কেটে যায়। একটি বছর। যাকে আর ফেরানো যাবে না। ফেরাতে চাইও না— কারণ সমাপ্তি হবে মধুরতম-মহত্তম। কিন্তু যাওয়ার পথে তার মূল্য এমনভাবে স্বীকার করা হয় যে, চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ করা উচিত হবে না। আমাদের 'সোনার' বছরটির সম্বন্ধে আমি তাই ভাবি। সে সময়ে আমাদের আনন্দ এতই তীব্র হয়ে ছিল যে, তার থেকে বেশী কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। তাই নয় কি? আর সেই চিন্তাতেই তো সান্ত্বনা।

৩রা এপ্রিল ১৯০৭ লিখলেন : ইউরোপে দীর্ঘ ভ্রমণের সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে ভাবছি— এর ফল কী হবে? কি ভাবে না প্রার্থনা করছি, বিশ্বস্ত থাকতে। শেষের এই বছরগুলি এত অনন্দ ও মধুরসে ভরা যে, ভয় হয়— পাছে জীবনের মধুমায়ায় আটকে পড়ি, এর লুতাতন্তুতে বাধা পড়ে যাই, সুখের ও আসক্তির বন্ধনে। আমি আদর্শকে উপলব্ধি করতে চাই। ঘটনার ঘটনা নয়। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছি। অনেক ছোট, সঙ্কীর্ণ জিনিষের মধ্যে বড় হয়ে উঠলে, ত্যাগের অর্থ হারিয়ে যায়। এখানেই সৌভাগ্যবান পায় তত্ত্ব, রাজনীতির পরিবর্তে, মানব দেখে 'মূর্ত আদর্শ' পূজার জন্য। আমার নিজস্ব যারা— এসো আমার কাছে— যতই হোক, আমাদের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা তাঁর নিজস্ব।

৪ঠা এপ্রিল ১৯০৭ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমরা যদি কাশ্মীর যাই, মিসেস সেভিয়ার বেরিলেতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। সে যাই হোক, এতদিনের মধ্যে এই প্রথম বিজ্ঞানের মানুষটির ও আমার কাছে ছুটি হওয়ার সম্ভাবনা। (দার্জিলিংয়ে ছুটি মানে বিজ্ঞানের কাজ)।

৮ই এপ্রিল ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আবার যখন আমরা বোসপাড়া লেনে গেড়ে বসেছি, তখন আশাকরি হলিস্টার আমাদের এখানে এসে পৌছাবে জুলাই মাসে। ভারতীয় জীবনের সমস্ত মজা দেখাবার ব্যবস্থা, অবশ্যই আমরা করবো। বসুরা, রায়েরা এবং অন্যান্যরা তার সঙ্গে সুসজ্জিত সুন্দরী রমনীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে এবং আমরা তাকে মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে দেবো।

...আমরা হয়ত কাশ্মীরে যেতেই পারবো না কারণ বসু পরিবারের একটি মেয়ে ক্ষয়রোগে দ্রুত মৃত্যুর পথে। আহা রে!

১১ই এপ্রিল মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : কাশ্মীর যাত্রার পরিকল্পনা, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, মনে হয় পরিত্যক্ত হয়েছে। তার পরিবর্তে সম্ভবতঃ অমরনাথ জাতীয় তীর্থযাত্রায় যাব। কিন্তু হায়! তা ঘটবার আগে বসুরা হয়ত মস্তশোক পাবেন। কারণ তাঁদের প্রিয় এক ভাইঝি ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে।

১২ই এপ্রিল ১৯০৭ ক্রিস্টীন জানালেন মিঃ গোখলেকে : নিবেদিতার সর্বশেষ মতলব বদরীনারায়ণে তীর্থ করতে যাওয়া। আমাদের সঙ্গী হবার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানালাম।

বদরী নারায়ণ পরিকল্পনা বদলে মায়াবতী যাওয়া স্থির হল। ১৪ই এপ্রিল ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : মায়াবতীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুব খানিকটা হাঁটা চলা করার আশা রাখি। প্লেগ যেহেতু খোকার পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেহেতু আমাদের যাত্রাকে পূর্ব পরিকল্পনার চেয়ে আগে অবশ্যই ঘটাতে হবে।

তাহলেও, বসুর বইয়ের শেষ অধ্যায়গুলি ও আমার শেষ গল্পদুটি সমাপ্ত করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বসুর প্রথম পেপার প্রকাশনের পর, পয়লা মে তারিখে ঠিক ১২ বছরে পুরোবে এবং এ বিষয়ে তার কুসংস্কার রয়েছে। ভারতে ধরা হয় যে ১২ বছরে কোন চিন্তা পূর্ণতা পায়। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, সকল সাধু বলেন : তাঁরা সিদ্ধি পেয়েছেন ১২ বছরে। ২৪শে এপ্রিল ১৯০৭ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : খোকার বাড়ির এক ভৃত্যের প্লেগ হয়েছে। সুতরাং তারা সবাই ছড়িয়ে আছে। আমরা অমাদের নিজ নিজ কাজটুকু শেষ করা পর্য্যন্তই মাত্র অপেক্ষা করবো, তারপরেই পাহাড়ে যাত্রা করবো। মায়াবতী যাবার পথে এবং মায়াবতীতে থাকাকালে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পায়ে হাঁটার ও তাঁবু জীবনের আশা রাখি। একমাত্র অসুবিধা, ঐ অঞ্চলে একটি নরখাদক বাঘ ঘুরছে।

ভাবো একবার, আমি কৃষ্ণ বিষয়ে লেখা শেষ করছি। দশটি কাহিনী। কিভাবে না উপভোগ করছি। খোকা অবশ্য বলেছে— অপরেও উপভোগ করবে। ...নিতান্ত বাসনা ছিল, তার সমস্ত জীবন মহাভারতের প্রতি ভালবাসায় মুখর, বইটি তাকেই উৎসর্গ করবো। কিন্তু সে বললো পরিবর্তে একটি শূন্য পৃষ্ঠাই সে চায়।

এখন আমরা নির্দ্ধারিত দ্বাদশ বৎসরের শেষ সপ্তাহে। অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণ চারটি অধ্যায়ের উপর কাজ করছি। সজীব পদার্থের সাড়ার উপরে, সমস্ত কাজের পদার্থগত ফলের উপসংহার করা হয়েছে দুটি অধ্যায়ে— গভীরতম অপরূপ রীতিতে। নিজের দানের বিষয়ে, তার খোলাখুলি বক্তব্য, তা 'Molecular Theory' এর দুটি অধ্যায় যুক্ত করেছে। দারুণ অপূর্ব। তাহলে, ঐ দ্বাদশবর্ষের যোগ্যভাবের পরিসমাপ্ত। সবিস্ময়ে ভাবি, এর পর আছে কি! নূতন আবিষ্কার কি! হয়ত বাস্তব প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত জয়। কে বলতে পারে!

নতুন বইটি, শেষ বইটির মত বোধ হয় ৭০০ পৃষ্ঠার হবে। অধ্যায় সংখ্যা মনে হয় ৪৫।

'আমার ধারণা, খোকা আজ সন্ধ্যায় ফিরবে, আর বউ আগামী কাল কিংবা শনিবার। মুমূর্ষু ভাইঝির স্বামী এসেছে। যদি মেয়েটির মৃত্যু হয়, তার স্বামী কাছে থাকাকালেই সে চলে যাবে এই আমার বিশ্বাস।

২৪শে এপ্রিল ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : যদি স্বামিজী চান, আমি একটা কিছু করি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমার যাত্রার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেবেন এবং আমাকে ফিরিয়েও আনবেন তিনি। এখন তাঁর হাতেই সব ছেড়ে দিতে পারি সহজে!

২৭শে এপ্রিল ১৯০৭, মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বেনামা একটি প্রবন্ধ লিখলেন নিবেদিতা। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের এক ক্ষুদ্র সমাবেশে লর্ড কার্জ্জন ভারতের দুর্ভিক্ষের বিষয়ে যে বক্তৃতা

করেছেন, সেটি, ওই ব্যক্তিটিকে যেভাবে উম্মোচিত করেছে, অন্য কোন বিষয় তা করতে পারতো না। ধনী ব্যক্তিদের আত্মপ্রশংসা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। তাঁদের অহমিকা—তাঁদের সংশ্লিষ্ট যে কোন বস্তুকে বৈচিত্রভাব, আদর্শ রঞ্জিত করে তুলতে তারা সমর্থ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঐ প্রবণতার জোয়ার, এমন অকপট উদ্দীপনায় উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়নি, যা ঘটেছে উল্লিখিত ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে! আর কখনো কোন ব্যক্তি, নিজেকে এমন সুগভীরভাবে গ্রহণও করেন নি। আর কখনো কোন ব্যক্তি অসজ্ঞানক্ষণে এইভাবে নিজের মুখোশ খোলেননি। ইনি যেভাবে নিজের বরেণ্য বস্তুর হিসাব দাখিল করেছেন, তার দ্বারা, নিজ হৃদয় গহনে অন্যদের দৃষ্টিপাত করার সহজ সুযোগ করে দিয়েছে, যে বস্তু কদাপি, আর কারো দ্বারা সংঘটিত হয়নি। তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে, হৃদয় মনের গহন অংশে, কোনপ্রকার মহিমার লেশ পর্যন্ত নেই।

'ভারতে দুর্ভিক্ষ ও তার প্রতিবিধান' কার্জ্জনের মতে, ঐ নীতি অতীব বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার মত নমনীয় এবং এমন সুনির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট যে, স্বচ্ছন্দে সূত্র গথিত হতে সমর্থ।

'সাড়ম্বর দুর্ভিক্ষ নীতির' কথা তো শুনলাম, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয় কেন? নির্য্যাতিত দেশ ব্যর্থ ক্রন্দন করে যাচ্ছে— কেন দুর্ভিক্ষ হবে? স্বাভাবিক অবস্থায়— কোন দেশে, কোন সভ্যতায়, এই ধরনের বিপর্যয় ঘটনা ঘটে কোন দেশে? কোনো খণ্ডকালে, সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনে এরূপ কালো ছায়া নেমে আসা উচিতও নয়। কিন্তু ভারতে দুর্ভিক্ষ স্থায়ী ব্যধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনৈক ইংরাজ সম্পাদক ভারতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংবাদে বলেছেন : বুঝতেই পারছো, ভারতে দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে, কেউ কিছু করে উঠতে পারবে না। এটা স্থায়ী ব্যাধি।

রেভাঃ ডাঃ আর্কেড-এর দুর্ভিক্ষ হিসাব উদ্ধৃত করে বললেন, ভারতে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি, যতদিন যাচ্ছে, তত মন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঊনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে ২টি দুর্ভিক্ষে ৫ লক্ষ লোক, তৃতীয় পঁচিশ বছরে ৬টি দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক এবং শেষ পঁচিশ বছরে ১৬টি দুর্ভিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক মরেছে। সোজা কথা হল : আমদের শাসনকাল যত দীর্ঘায়িত হবে, ততই অবস্থার অবনতি ঘটবে।

এবস্তু অবধারিত। দুর্ভিক্ষ হচ্ছেই! সাম্রাজ্যবাদ, দুর্ভিক্ষ বাদ দিয়ে চলতে পারে না। কেবল শাসিত দেশেই নয়, শাসকদের দেশেও সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে, অল্প বিস্তর দুর্ভিক্ষের অবস্থা থাকবেই।

খোদ ইংলণ্ডে, সাধারণ মানুষ এখন ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্রের শিকার, আর তার মুখের গ্রাস উত্তরোত্তর হরণ করে নিচ্ছে সুবিধা-ভোগী-শ্রেণী। কোন শীতকালের দশটি দুর্যোগের দিন, পূর্ব ও দক্ষিণ লণ্ডনের শ্রমজীবিদের দুর্ভিক্ষের অবস্থায় ঠেলে দিতে পারে! অবশ্যম্ভাবী তা। দেশের পূর্ণ উন্নতির জন্য, তা সকল মানুষের শ্রম প্রয়োজন। কিন্তু দেশ সাম্রাজ্যবাদী হলে, জনসংখ্যার বেশ খানিক অংশকে, স্থলসৈনা ও নৌসৈন্য হয়ে পড়তে হয়, না দেশ রক্ষায় নয়, দেশের সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি পৃথিবীর অন্যত্র যেসব জায়গাকে 'মুনাফা লোটার' জন্য অধিকার করে রেখেছে, তাদের বজায় রাখার জন্য। ঐ স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী স্বদেশের পক্ষে নিছক অলসজীবী। তারপর অবশিষ্ট জনগণের বহু অংশকে টেনে নিয়ে আসা হল শহরে, যেখানে তারা পূর্বোক্ত অধিকৃত দেশের জন্য 'বস্তু' উৎপাদন করবে, তার দ্বারা লাভবান হবে না হাজার হাজার শ্রমিক;— সব লাভ লুটে নেবে কারখানার মালিক।

গ্রাম সমূহ পরিত্যক্ত, কৃষিক্ষেত্র অকর্ষিত, শ্রমজীবীরা কৃষি অঞ্চলের উপর নয়, কারখানার দিন মজুরির উপর নির্ভরশীল। তাদের প্রতিদিনের কাজের চেহারাই বা কি? বিরাট যন্ত্রের, একটা ক্ষুদ্র অংশ চালাবার কাজে তারা নিযুক্ত, সংস্কার উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয়, বন্টনের সামান্য

অংশেই সংশ্লিষ্ট। যদি তাদের জাতির কর্তৃত্বাধীন দেশ গুলিতে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন বিপর্য্যয় ঘটে; তাহলে তাদের পেটে হাত!

এই যদি শাসকজাতির জনগণের অবস্থা হয়, শাসিতের অবস্থা সেখানে কি না শোচনীয়! সাধারণভাবে কোন দেশে, সরকার পোষার খরচ বেশী নয়— কর্মচারীদের মাইনেটুকুই খরচ। অথচ পরাধীন দেশে, বিরাট মাইনে দিয়ে সরকার তৈরী করতে হয়। সাধারণভাবে, কোন দেশের শিল্প, সে দেশের কৃষকদের দেয় খাদ্যবস্তু। কিন্তু পরাধীন দেশে, শিল্প শ্রমিকরা ঠিকঠিক কাজ পায় না, কৃষকরা হয়ে দাঁড়ায় কুলি, যথা রেলে, কিংবা তারা নিযুক্ত থাকে শাসক সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থবস্তুর উৎপাদনে যথা— চা, আফিম, পাট, নীল ইত্যাদি ইত্যাদিতে। পরাধীন দেশ এমন কি সাম্রাজবাদীদের কাছ থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনার কলা-কৌশল পর্য্যন্ত শিক্ষা করার সুযোগ পায় না, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদীরা তা সযত্নে কুক্ষিগত করে রাখে।

যেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে, নিজদেশের স্বাভাবিক সুস্থ অর্থনৈতিক জীবনকে অব্যাহত রাখতে, সেখানকার সকল মানুষদের পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেখানে পরাধীন দেশের অবস্থা কী? ভারতের ক্ষেত্রে আমরা কী আশা করতে পারি? যেখানে এদেশের শ্রমিকদের সকল শ্রম, ইংলণ্ডের উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য, সেই সঙ্গে সেখানকার ব্যবসা, বাণিজ্য, সংস্থা ও কলকারখানার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পুরো নিয়েজিত?

এই ব্যবস্থা চললে দুর্ভিক্ষ বন্ধ হতে পারে না। দুর্ভিক্ষ শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ্জন বলছেন: ভারতে ইংরাজরা কি করেছে তা জানতে হলে, সেখানে স্বাচ্ছন্দের সময়ে গেলে চলবে না, যেতে হবে দুর্ভিক্ষের দুঃখের দিনে, কেননা তখনই বোঝা সম্ভব, ভারতে ইংরাজরা কী অপূর্ব কাণ্ড ঘটাতে পেরেছে। 'নগ্ন-লজ্জাহীন' ঐ লোকটি যেসব মানুষের মধ্যে গেছে, তাদের জীবনের মূলগত সংবাদ জানাননি— জানিয়ে চলেন তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রূপ, চিন্তা, প্রকৃতি, কাব্যকৃতি বা অনুরূপ বস্তু। সেই তথ্যগুলি সর্বদাই আমলাতান্ত্রিক, সেনসাস; আমদানী রপ্তানি, যানবাহনের সুযোগ সুবিধা— যা রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক শোষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিখুঁত ম্যানুয়াল। কোন দেশের অন্য কিছু দেখেন না— দেখেন স্বশ্রেণীর স্বার্থ সংগঠনের সুযোগ আছে কিনা। নিজ ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লোকটি শুধু দুর্নৈতিক নন, অনৈতিক বা নিম্ন-নৈতিক ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতি যেমন অনৈতিক। "He is not immoral in his geographical outlook, he is merely un-moral or Sub-moral, as un-moral as nature herself."

ভারতে জলবায়ু এবং মনুষ্য যদি একই প্রকার থাকে, তাহলে ব্রিটিশ সরকার; দৃষ্টিগোচর কালসীমার মধ্যে, ভারতের দুর্ভিক্ষ দূর করতে পারবে, তার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ? তবে আশা করা যায় দুর্ভিক্ষের সংখ্যা হ্রাস করা যাবে।" —বলেছেন ঐ বন্যপ্রকৃতির লোকটি। হ্যাঁ, এই একটি জায়গায় আমরা লর্ড কার্জ্জনের সঙ্গে একমত। বৃটিশ সরকার যে ভারতের দুভিক্ষ সংখ্যা হ্রাস করতে পারবেন, অবশ্যই সেটাকে শুভ বাসনা বলে ধরে নেওয়া যাবে। আর তাঁরা, এ অবস্থা যদি একই রকম থাকে, তাহলে দুভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু করবেন না, তা আমরাও লর্ড কার্জ্জনের মতই মনে করি 'অতীব অসম্ভব'।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে 'রায়ট' বেঁধে গেল। এখানে সরকাব বিরোধী আন্দোলনের নেতা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিং প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল ৮ই মে ১৯০৭। দাঙ্গার দায়ে বিনা বিচারে লাজপত রায়কে নির্বাসনে পাঠানো হল।

এই সময়ে বেশ কিছুদিন, মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্র পাল আগুন ধরানো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। 'পাঞ্জাব রায়ট' হয়ে গেল। পাঞ্জাব নেতা লাজপত রায় প্রমুখ নেতাদের দাঙ্গা হাঙ্গ

মায় জড়িত করে বন্দী করা হয়েছে। রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও গ্রেপ্তারের সংবাদটি প্রচারিত হল। সে সংবাদ পেয়ে বিপিনচন্দ্র পাল সতর্ক হলেন। তাঁরও গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা, ফিরে এলেন কলকাতায়।

ইতিমধ্যে সরকার, 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য মামলা দায়ের করলেন। যদিও তিনি তাঁর সম্পাদনাকালে একটি বিপ্লবী সমিতি কর্তৃক প্রচারিত 'লিপলেট' সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করায় 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা থেকে তিনি বিতাড়িত; তথাপি মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস, বন্দেমাতরম সম্পাদক ও পত্রিকাটিকে বাঁচানোর চেষ্টায় তাঁকে বোঝালেন : মাদ্রাজে আপনি যেসব প্রলয়ঙ্কর বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন, তার জন্য লাজপত রায়ের মত গভর্নমেন্ট আপনাকেও অনির্দিষ্টকাল মান্দালয় দুর্গে নির্বাসনে পাঠাতে পারেন। আর যদি এ মামলায় আপনি সাক্ষী না দেন, প্রমাণ অভাবে অরবিন্দকে জেলে পাঠাতে পারবে না— পত্রিকাটিও বাজেয়াপ্ত হবে না। আর এই উত্তম কাজটি করার জন্য আপনার বড় জোর ৬মাস জেল হবে। ফলটা দাঁড়াবে আপনি Vicarious Mortyrdom হয়ে যাবেন। ভেবে দেখুন, কাগজটি বাঁচে, নূতন চরমপন্থী দলও জখম হবে না।

র‍্যাটক্লিফের দুর্গতিতে গভীর দুঃখ বোধ করলেন নিবেদিতা। এছাড়া এখন তাঁর (র‍্যাটক্লিফের) দ্বিতীয়পথও উন্মুক্ত নেই!

২৭শে মে ১৯০৭ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ১১ই তারিখে কলকাতা ছেড়ে ২৩শে তারিখে মায়াবতীতে পৌঁছেছি। ফলে সারা সময়টিতে আস্তানার বাইরে, রাজনৈতিক কারণে— কিছু সময়ের জন্য। সরকার যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। পাইকারী হারে গ্রেপ্তার ও নির্বাসন ইত্যাদির দ্বারা জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইছে কিন্তু এটা তো তা ঘটাবার শেষ উপায়!

৩০শে ১৯০৭ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : জেলের জীবন মানুষের চরিত্র পরিবর্তনের পক্ষে সুযোগ দেয় কি? তোমার মেয়ের বিষয়ে সত্য হোক— তা খুবই চাই!

২রা জুন ১৯০৭ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : প্রিয় য়ুম, জানিনা তোমার সঙ্গে দেখা আর হবে কিনা? পুণরায় সকলই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত বিরোধী ঢেউ— আর জনগন বিপর্য্যস্ত। সরকার এখন ভারত বিরোধীনীতি কতখানি নগ্নভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছে, তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা, বিদ্যালয় ও তার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত। এখন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড বেঁধে যাবে— ওদেরই কাজের ফলে। এসব কথা কাউকে যেন বলো না। তবে সংবাদপত্রে, সকল সংবাদ জানতে পারবে।...

স্বামীজির সুমহান কথা মনে পড়ে? যতদিন না তাদের কাল ঘনাচ্ছে! কিন্তু যখন ধ্বনিত হয় কালের ঘণ্টা, তখন স্মৃতিভ্রংশ হয় মানুষের। হাত থেকে লাগাম খসে পড়ে। বুদ্ধিদাতাদের বিচার বুদ্ধি হারিয়ে যায়। নেমে আসে বিনাশ। হ্যাঁ ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে, তার প্রথম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ৯ই জুন ১৯০৭।

ভারতী মাদ্রাজে ফিরে এলেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হয়ে। খুঁজে পেলেন জনজাগরণের পথ। গ্রহণ করলেন রাজনৈতিক চরমপন্থাকে। তাঁর চোখে প্রতিভাত হল: জন্মভূমি ভারতবর্ষ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, রোরুদ্যমানা জননীর স্বরূপা। মনটা চাপা উত্তেজনায় টগবগ করছে। কাজ, চাই কাজ। তাঁর নবোদবোধিত অগ্নিময় চেতনার বাণী বহনে রাজী হল না স্বদেশ মিত্রম কাগজ। তিনি হৃদয়ের রক্তপদ্ম স্থাপন করবেন কোথায়?

সুযোগ পেলেন অবশেষে। দুঃসাহসী মাদ্রাজী দেশপ্রেমিক ও বিত্তশালী মাণ্ডেয় ত্রিমূলাচার্য্য তাঁর সমস্ত সম্পদ স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করে প্রকাশ করলেন তামিল 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা।

১৯০৬ সালের এপ্রিল। ভারতী পেলেন যে পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখার কাজ। আরম্ভ ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে। লিখতে শুরু করলেন রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও কবিতা। বার করলেন 'বালভারত' ১৯০৬ নভেম্বরে— সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা রূপে। কিছুদিন চলার পর তা বন্ধ হয়ে গেল। মন দিলেন দেশাত্মবোধক কবিতা রচনায়। সেগুলি সবই নিবেদিতার ভাব পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

১৯০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে বয়ে চলেছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত। ভারতী 'স্বদেশমিত্রম' কাগজে সমস্ত কবিদের কাছ থেকে, দেশপ্রেমের, কবিতা আহ্বান করলেন। কবিরা এই বিপজ্জনক কাজে নিজেদের জড়াতে রাজি হলেন না। ভারতী ক্ষুণ্ণ হলেন না বরং জোর কদমে কলম চালিয়ে চললেন। কিন্তু সেসব কবিতা প্রকাশে, কেউ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। আগ্রহ বোধ করলেন প্রকাশক জি. এ. নটেশন। অবশ্য তিনি নিজে একাজে ব্রতী হলেন না, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন মাদ্রাজের আইনজীবি ও মডারেট নেতা ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ারের কাছে। যাঁর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে দিনের পর দিন তিনি আক্রমণ করে চলেছিলেন। অবশ্য তিনিও চরমপন্থীদের উন্মাদ ও বজ্জাত বলে স্থির করে রেখেছিলেন। কিন্তু কবিতাগুলি পড়ে মোহিত হলেন। প্রতিভাকে অনুভূতির শক্তি ছিল তাঁর। ছিল সেই দৃঢ়তা— যা তিনি কর্মে প্রকাশ করতে পিছপা হতেন না। বেছে বেছে ভারতমাতার বন্দনা সূচকে তিনটি কবিতা ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন।

১৯০৭ সালে সেইসব কবিতাব মধ্যে তিনটি ১৫০০০ কপিতে ছাপিয়ে একটি পুস্তকে বার করলেন। সেটিই ভারতীয় প্রথম কবিতা পুস্তক। এবং বিনামূল্যে সে পুস্তকটি বিতরণের ব্যবস্থা করলেন, মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ার।

ভারতী সে বক্তৃতা মঞ্চের আয়োজনে ব্যস্ত। অন্যদিকে সচেষ্ট ছিলেন তাঁর বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকাটি যাতে মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই উদ্দেশ্যেই মিঃ এস. এন. ত্রিগুনাচার্য্যকে দিয়ে নিবেদিতাকে পত্র লেখালেন ৭ই এপ্রিল ১৯০৭ সালে।

১৬ই এপ্রিল ১৯০৭, মাদ্রাজ থেকে নিবেদিতাকে পত্র দিলেন : পূজনীয় মাতা,

কয়েক বছর আগে ১৭নং বোসপাড়া লেনে, আপনার আশ্রমে দু'জন জ্ঞাতিভ্রাতাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম ও আলাপও করেছিলাম। তারপর আপনার সঙ্গে জনজীবন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কিছু পত্রালাপও হয়েছে। সেজন্য আপনার কাছে নিজেকে পরিচিত করবার প্রয়োজন বোধ আর করি না। আমি আর্লাসিঙ্গ পেরুমলের ভ্রাতুষ্পুত্র। আপনি যাতে আমাকে স্মরণ করে চিনতে পারেন, সেজন্য আমার চেহারার দুটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা জানাচ্ছি। বেঁটে-খাটো যুবক, চোখে চশমা। আমাকে বোঝাবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট।

আশা করি আমার 'বাল ভারত' পত্রিকাটি যার মালিক আমিই, আপনার দিব্য আবাসে নিয়মিত পৌঁচচ্ছে। পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্য ভারতী যথার্থ উৎসাহী। এক সামাজিক চরিত্র— তাঁর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। আপনি তাঁকে যে চিঠি লিখেছেন তা তিনি আমাকে দেখিয়েছেন।

মাতাঃ! এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে, আমরা যে ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে চালাতে পারছি না— সেজন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। এই ধরনের একটি পত্রিকা চালানোর মূল উদ্দেশ্য: আমাদের জনগণের সামনে, তাদের অধিকার ও দায়িত্বের আদর্শ উপস্থিত করা, যা তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত। আমার আশা, ও বিশ্বাস— পত্রিকাটি জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে কিছু কাজ করছে।

আমাদের মাতৃভূমির কোন কোন অংশে, যে নীতিতে কার্য্যকলাপ চলছে, সেই ধারায় পত্রিকাটি চালাতে আমি ইচ্ছুক। আমি এটিকে আপনার অভিপ্রায়ের অনুগত করতে চাই— যাতে

এটি আরও ভালভাবে ব্যবহৃত ও পরিচালিত হয়। এর উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে আপনার উপদেশ-নির্দেশ পেতে চাই। আপনি যা স্থির করে দেবেন, সে ধারাতেই পত্রিকাটি চালনা করতে প্রস্তুত। খুবই দুঃখের বিষয় স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত কোন যথার্থ মানুষের আবির্ভাবে মাদ্রাজ ধন্য হয়নি। 'প্রগতি দল' বলে মাঝে মাঝে যাদের উল্লেখ করা হয়, এখানে তাদের আদর্শের একমাত্র পত্রিকা 'বালভারত'। তার যথার্থ আগ্রহী কোন মানুষ যদি, একে মাঝে মধ্যে সাহায্য না করেন, তা হলে এই ধরনের কাগজ চালনা সত্যই দুষ্কর।

সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্রত্তোরের প্রত্যাশা সহ—
হে অতি পূজনীয় মাতা
আপনার অনুগত সেবক—
এস. এন. ত্রিমূলাচার্য্য।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় মন্তব্যের প্রতিবাদে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এডিটোরিয়াল লিখলেন : জুন মাসে (১৯০৭)। বাহবা যুক্তি!... স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, সরকার পৃষ্ঠদংশক বা গুপ্তচরদের ঈর্ষাপূর্ণ কাপুরুষোচিত কুৎসা দ্বারা চালিত হচ্ছেন। তাঁরা আতঙ্কে অস্থির। এটা শক্তির আস্ফালনের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়। বিচিত্র নীতি সরকারের— যেখানে প্রমাণের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, সেখানে লাজপত রায় গ্রেপ্তার, আর যেখানে কুমিল্লা ও অন্যান্য দাঙ্গার সঙ্গে ঢাকার নবাবের পরিষ্কার সম্পর্ক আছে, সেখানে 'নবাব পুরস্কৃত'। কেন না-দাঙ্গাগুলি হিন্দুদের বিরুদ্ধে বাধানো হয়েছে। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায়— লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত। ঘরবাড়ি ভস্মীভূত, পুরুষ প্রহৃত ও নিহত— গ্রাম জনশূন্য, তার চেয়েও বর্ব্বর কাণ্ড ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রশাসকদের নাকের ডগায়, নারীরা অত্যাচারিত। সরকারী কর্তারা জনগণকে রক্ষা বা সাহায্য করার জন্য কিছুই করেনি, ক্ষেত্র বিশেষে গুণ্ডাদের নারকীয় কাজের সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হিন্দুদেরই গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনার জন্য দায়ী পাষণ্ডের দল, মুক্ত এখনও আছে, যদিও তাদের বে-আইনি কথাবার্তা ও প্রকাশ্য কার্য্যাবলী অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণরূপে বর্তমান।

সেই নবাব সালিমুল্লা ছাড়া থাকবে— নির্বাসনে যাবে লাজপত রায় প্রমুখ। কেন? পাঞ্জাবের ক্যানালকরের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে, সেখানে সরকার আন্দোলনকারীদের হাতে পরাজয়ের অপশাসন কোনমতে হজম করতে পারেনি! তারা বর্দ্ধিত হারে কর দিতে অস্বীকার করেছিল। সেই শোধ তুলতেই কোন একটি ঘটে যাওয়া উৎপাতের ধুয়ো তুলে, লাজপত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারণ পাঞ্জাবে তিনিই প্রধান ব্যক্তি।

বিচিত্র ব্যাপার : মর্লের মাপের বৃটিশ রাজনীতিকও বুঝতে অসমর্থ যে, দমননীতি অশান্তির নিরাময় ঘটায় না— তার নিরাময় ঘটে অশান্তির কারণ দূরীকরণে। ইণ্ডিয়া অফিস, মর্লের উদারনৈতিক খ্যাতির সুনিশ্চিত সমাধিভবনে পরিণত হয়েছে। আমরা অনেক দিনই এ আশা ছেড়ে দিয়েছি যে, ভারতের জন্য তিনি যোগ্য কিছু করবেন না। অবশ্যই তিনি করবেন না, তা যদি না আমরা তাঁকে বাধ্য করতে পারি। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা একথা কদাপি ভাবিনি যে, তিনি ভারতীয় প্রশাসনকে রুশ জারতন্ত্রী করে তুলবেন!

কমনস সভায় লালা লাজপত রায়ের নির্বাসন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মর্লে, স্বৈরাচারী শাসকের পুরাতন ছুতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে বলেছেন : পার্লমেন্টে এই বিষয়ে কোন আলোচনা বা এক্ষেত্রে কোন মতভেদ প্রশাসন কর্তৃত্বকে দুর্বল করে ফেলবে। আহো-উদারনৈকতা! তোমার কি পরিণতি।.. কিন্তু প্রশাসন কর্তৃত্ব কি অভ্রান্ত? ১৮১৮ সালে রেগুলেশন, যার বলে লালা লাজপত

রায়কে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। অবিলম্বে তা বাতিল করার জন্য কিছু সদস্য দাবী করায় মিঃ মর্লে বলেছেন— ভারত সরকারকে, সে দেশীয় বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য প্রয়োজনী কোন আইন-অস্ত্র থেকে বঞ্চিত না করতে তাঁর সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেননা সেখানে বজ্জাতির পরিমাণ সুবিপুল। এবার আমরা উদারনৈতিকতার অর্থ বুঝলাম। লিবারেল মানে বড় মাপের টোরি!

লর্ড মিন্টো একটি অর্ডিনান্স জারি করেছেন, যার সাহায্যে প্রাদেশিক সরকারগুলি নির্দ্ধারিত স্থানে সভা সমিতি করার অধিকার জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নেবার অধিকার পেয়েছে। ভালই। মুখোশ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন আমার বৃটিশ শাসনকে তার নিজস্ব ঢঙে ও আকারে দেখতে পেলাম।

আমাদের মন্দ অবস্থার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠকে আহরণ করতে হবে। আঘাত বিশেষভাবে এসেছে স্বদেশী ও বয়কটের উপর, এবং সাধারণভাবে এসেছে জাতীয়তার ক্রমোত্থিত চেতনার উপরে। যদি আমাদের প্রাণের চিহ্ন থাকে, তাহলে উৎপীড়নেই আমাদের পরিত্রাণ।

৯ই জুন ১৯০৭ র‍্যাটক্লিক দম্পতিকে লিখলেন : আর সাড়ে পাঁচবছর বড় জোর তিনি জেলের বাইরে থাকতে পারবেন। দ্রুত সে সময় ঘনিয়ে আসছে, যখন কোন ইউরোপীয় পর্য্যন্তও বিশেষ মত পোষণ করবার জন্য কারারুদ্ধ হবে।

যদিও মিঃ র‍্যাটক্লিক, পদত্যাগপত্র মে মাসের মাঝামাঝি দাখিল করেছেন, ছাড়পত্র জুন মাসেও পেলেন না। নিবেদিতা তাঁকে ৮/৯ জুন তারিখে জানালেন : আমার মনে হয়, গোড়ায় তোমার যে ঝঞ্ঝাট হয়েছিল— তা আবার ঘটবে। কথা হচ্ছে, কিভাবে বন্ধন ছিন্ন করে সরে যাবে? তা করতে হবে উভয়পক্ষের অমায়িক সম্পর্কের কালে— যখন ওরা মনে করবে ব্যাপারটা বেশ তো স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে— সেই সময় সরে গিয়ে ওদের অসুবিধায় ফেলতে হবে। সুতরাং তোমাকে পি. কে'র বিদায় সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে। মধ্যবর্তীকালে ইংলণ্ডে কাজের জন্য যোগাযোগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? ভারতীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কি? আমার ইচ্ছা, তারা জোট বেঁধে ইংলণ্ডের একজন ভাল সংবাদদাতাকে (তোমাকে) পোষণ করুক। ওটা কি অসম্ভব?

তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত— র‍্যাটক্লিক ভারতে থাকুন আর সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর পদত্যাগ সিদ্ধান্তের চিঠিটি কপি করে মিঃ গোখলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন : সংলগ্ন পত্রটি মোটামুটি গোপন রাখবে। বেশ বুঝতে পারছি, নূতন পার্সী কাগজটির কাজে আমাদের বন্ধুকে লাগানো যাবে না। তোমার নীরবতা থেকে তা ধরে নিয়েছি। গত ৮ই মার্চ ১৯০৭ সালের চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম তুমি কি ভূপেন বসু বা অনুরূপ কাউকে পত্র লিখবে এবং প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে, যাতে ইণ্ডিয়ান 'ডেইলি নিউজ' কিনে নিয়ে সেটি ওঁকে অর্পণ করা হয়? বন্ধুর দিক দিয়ে বিচার করলে, আমার পক্ষে তাঁকে ইংলণ্ডে স্বজনগণের মধ্যে অনাড়ম্বর সহজ জীবনে ফিরে যেতে লেখাই উচিত হবে। কিন্তু যখন তাঁর ঐকান্তিকতা ও সামর্থ্যের কথা, সেই সঙ্গে তাঁকে আমাদের কতখানি প্রয়োজন— সে কথা চিন্তা করি, তখন আমার পক্ষে এটা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে যে, ভারতবর্ষ, নিষ্ক্রিয় থেকে তাঁকে চলে যেতে দিচ্ছে।

১৭ই জুন ১৯০৭, লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : স্বামীজী অবশ্যই সারা পৃথিবী জয়ের জন্য জন্মদিলেন, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কত সীমাবদ্ধ! যেমন আমি— আত্মার কলম সংগ্রহ করতে পারি না!

দৈনিকপত্র আতশবাজি। যতই চোখাচোখি লেখা বেরুক, তা আতশ বাজির মত। তার ঝলকানি দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য লেখাগুলি সংকলিত হল পুস্তকাকারে: 'মুক্তি কোন পথে' ও

'বর্তমান রণনীতি'। উদ্দেশ্য জনমত সংগঠন, সেই সঙ্গে চাই অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা, তবেই বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। এরজন্য প্রয়োজন অর্থের। সমিতির সংগঠকগণ স্থির করলেনঃ প্রয়োজন হলে রাজনৈতিক ডাকাতি! কারণ, স্বেচ্ছায় কেউ শুভকাজে বা শুভ উদ্দেশ্যে অর্থ দান করে না।

১৭ই জুলাই ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ডঃ বসুর বিদেশযাত্রা হঠাৎ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক আমি ১৫ই অক্টোবরের আগে ভারত ছাড়তে পারবো না।... যাই হোক, খুব সুন্দর হবে, যদি মাদাম ওয়েলারস্টিন ডঃ বসুর জন্য বোডেনেক্সে একটি আমন্ত্রণ যোগাড় করেন, এবং আমরা যদি সকলে একত্রে কিছু সময়ের জন্য 'অ্যারিখে' যেতে পারি। কিন্তু এবছর তা হওয়া সম্ভব হবে না— কারণ বোধ হয় ডঃ বসুর যাওয়া এবং ভিসবাডেনে 'বাথ' নেওয়া দরকার। সে ওখানে অক্টোবরের শুরুতে যেতে পারে।

১৯শে জুলাই ১৯০৭, মিঃ গোখলেকে লিখলেন :

আজ খবর পেয়েছি, চিকিৎসকদের চাপে ডঃ বসু দু'বছরের ফার্লো পেয়েছেন। অবর্ণনীয় স্বস্তি এতে, কারণ এর ফলে তিনি পালাতে পারবেন। তাঁর মন মরে যেত, যদি আরও বেশি দিন রাশীকৃত লোকের সঙ্গে তাঁকে কাটাতে হত। নির্বোধ লোকেরা, প্রতিভাকে যে-রকম শক্তগুড়ির গাছ মনে করে, সেরকম নয় তা। তা অতি স্পর্শকাতর, নমনীয় সে সৃষ্টি।

কিন্তু ডেপুটেশনের বদলে যে ফার্লো হল, এতে আমি একেবারে সন্তুষ্ট নই। যখন আমি এই দেশ— ভারতের কথা ভাবি— কি ভাবে বিদেশীরা এই দেশের উদারতাকে শোষণ করে— মেদস্ফীত হচ্ছে, আর অন্যদিকে এর মাটির সন্তানরা, দেশের সেবায় ব্রতী হয়ে, নিতান্ত ক্লেশ স্বীকার করছে— যা শাস্তিরই তুল্য! আমি ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধও। এল এল রায় (লালা লাজপত রায়)-এর প্রশ্নটি কী যথার্থ: ইংরেজরা কি এদেশকে আকাশ থেকে পেড়ে এনেছে?

ইতিমধ্যে মিঃ গোখলে মিঃ র‍্যাটক্লিফের জন্য একটি চাকরী সংগ্রহ করে নিবেদিতাকে জানালেন।

১৯শে জুলাই ১৯০৭ মিঃ গোখলে কে লিখলেন :

মিঃ র‍্যাটক্লিফ, সম্বন্ধে তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আশঙ্কা হয়, এটা সম্ভব করতে তোমাকে নিরতিশয় পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে র‍্যাটক্লিফদের মনোভাব কী এখনও জানি না। ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা— ভারতবর্ষ ঐ কাজটা করতে পেরেছে! মিঃ র‍্যাটক্লিফের মূল্য অতুলনীয়, আমি তা অবশ্যই জানি। তবে ওদের পক্ষে, স্বাস্থ্যের প্রশ্নটা পূর্বের অপেক্ষা ইদানীং বেশী। ব্যাপারটা তাই অনিশ্চিত।

২০শে জুলাই ১৯০৭, মিসেস বুলকে চিঠি দিলেন : স্বামীজির সর্ব কনিষ্ঠ ভাই, যাকে তুমি স্মরণ করতে পারবে, সে রাজদ্রোহাত্মক লেখা প্রকাশের জন্য বিচারাধীন। একটু আগে যে আমাদের বলছিল কিভাবে জাতীয়তার ভাব, সারা দেশের চেহারা বদলে দিয়েছে। কত সব খারাপ ছোকরা, যারা রাস্তায় 'লোফার' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, তারাই এখন চমৎকার ন্যাশান্যাল ভলেনটিয়ার।

৬ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত ভূপেনের জেল হতে পারে। কী চমৎকার সাহসী সে। কারাবাস নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে। তবে এ কথাও স্বীকার করছে, ও ব্যাপারটি ভদ্রলোকের পক্ষে মনোরম নয়। আর জানোই তো, আমি অহঙ্কারী দত্ত বংশের ছেলে। ঠিক একেবারে স্বামীজির মত।

২০শে জুলাই ১৯০৭, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : আমার পক্ষে শীতকালের জন্য কোন পরিকল্পনা করা নিরর্থক, কারণ খোকার সমস্ত স্কীম এখন তচনচ। বর্তমান পরিস্থিতি কি তুমি বুঝতে পারবে না। চাপানো কাজ দ্বিগুণ, ডিরেক্টর দুর্লভ, ফলে, তার হত-বুদ্ধিকর অবস্থা। সরকার নিতান্ত ভারত বিরোধী। ওগো প্রিয় সারা, অবস্থা যৎপরনাস্তি মন্দ

আজ একজন ইংরেজ ডাক্তার তাকে দেখে গেছেন কারণ তার বাতের মত হয়েছে যাতে এক ধরনের জার্মানি 'বাথ' দরকার। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সুপারিশে হয়ত ছুটি পাওয়ার কারণ হতে পারে। বলা শক্ত তবে, এটা খুব স্পষ্ট— মা যেন পথ দেখান—

২১শে জুলাই ১৯০৭ মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : ...আমাদের ছোট্ট খোকাটির জন্য প্রার্থনা করো, মা যাতে সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকেন, সবকিছু যাতে তার অভিপ্রায়ের অনুকূল হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারত যেন তার বিজ্ঞানের অভিযানে বিজয়ী হয় অবশ্য সমরিক অভিযানে কদাপি নয়! 'যুগান্তর' একটি গোষ্ঠীর পত্রিকা। এর কাজ ছিল যুবকদের চিত্তে বিস্ফোরকের কাজ করানো। তীব্র বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করা। প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে বেছে বেছে তৈরী করা হল বই "মুক্তি কোন পথে"। 'বর্ত্তমান রাজনীতি', প্রথমটিতে, জনমত গঠন, অস্ত্র সংগ্রহ দ্বারা বিপ্লব ঘটানো। উপেন্দ্রনাথের রচনা "ভয় ভাঙো" ও "লাঠৌষধি"— মিথ্যা দম্ভের উপর স্থাপিত সাম্রাজ্য (প্রথমটি)। পাঞ্জাবের বীরত্বের প্রশংসা। প্রতিরোধ তারা খাল বৃদ্ধিকর রোধ করেছে, মাথা ফাটিয়ে ঘর পুড়িয়ে সরকারকে ঠান্ডা করেছে। — 'কাবলি দাওয়াই' দিয়ে। ... পুলিশ আবিষ্কার করলো এটা পাশ্চাত্যের নিহিলিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। বইগুলিতে যুদ্ধ সৃষ্টির দর্শন, লক্ষ্য গোরিলা যুদ্ধ, পরাধীনতায় পচে যাওয়া দেশে বিপ্লবের ভাব প্রেথিত করা। আলিপুরের জজের মন্তব্য: থাকতে পারে, যদি ভারতে ইংরাজের চির অধিকার মেনে নেওয়া যায়।

জামালপুর থেকে ফিরে সবে পত্রিকা অফিসে এসে বসেছেন, অরবিন্দ নির্দ্দেশ দিলেন: এ মামলায় তুমি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ কর। ভূপেন্দ্রনাথ হাসিমুখে সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ২২শে জুলাই ১৯০৭, যুগান্তর মামলায় আদালতে বললেন; আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, একথা জানাচ্ছি যে, আমি যুগান্তরের সম্পাদক, এবং আমি প্রশ্নাধীন সকল প্রবন্ধের জন্য দায়ী। আমি 'সৎ' বিশ্বাসে আমার দেশের জন্য যা করা উচিত মনে করি, তাই করেছি। আমি কোন বিবৃতি দেব না এবং বিচারে আর কোন অংশ নেব না।

২৪শে জুলাই ১৯০৭, বৃটিশ ভারতে, বিচারালয়ের সঙ্গে প্রথম অসহযোগের জন্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল ভূপেন্দ্রনাথকে।

২৫শে জুলাই ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ২ বছরের ফার্লো মঞ্জুর হয়েছে! হতে হবেই। মা যদি কলকাঠি নাড়েন, সে ডেপুটেশন যাবে— যার অর্থ বিজ্ঞানের সংস্থান, কিন্তু মধ্যবর্তীকালে তার অর্থ স্বাধীনতা! আর পৃথিবীতে স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় জিনিস। সম্ভবতঃ ৩০শে আগস্ট বসুরা বোম্বাই ছাড়ছে, নামবে— মার্সাই বা ব্রিন্দিসিতে, বোডেনিক্সে একটি আমন্ত্রণ এবং... আরিখ সত্যই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এ সকলই সেন্ট সারার তারবার্তা অনুযায়ী— ইতালী বা লণ্ডন, তিনি যেখানে অবতরণ করতে বলেন, সেই— অনুযায়ী ঠিক হবে।

২৫শে জুলাই ১৯০৭ বন্দেমাতরমে প্রশস্তি লিখলেন অরবিন্দ : বেদীমূলে আর একজন— One more for the Altar. ভূপেন্দ্রনাথ অতিরিক্ত দাপটে সত্য কথনের জন্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই, কারণ ওটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাসির সঙ্গে ভারতীয় ডিমোক্রেসির সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু ব্যুরোক্রেসির করায়ত্ত যেখানে, সকল পার্থিব শক্তি তার, সেখানে ডিমোক্রেসির করায়ত্ত আছে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মোৎসর্গের বীর্য্য শক্তি, অটল সাহস, আদর্শের জন্য আত্মবলিদানের সামর্থ্য। ...ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন, যেহেতু পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য সর্বাদি প্রয়োজন, তাই আমাদের সংগ্রাম কেবল আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নয়, পরন্তু সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য।

সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হল : Brupendra Nath Dutta imprisoned for telling the truth with too much emphasis.

২৮শে জুলাই ১৯০৭ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে কারাদণ্ড সূত্রে চরমপন্থীদের দৃষ্টির বিশ্লেষণ করা হল :

'বন্দেমাতরম' প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তত্ত্বের এটি বাস্তব প্রয়োগসাধক রূপ। যুগান্তর মামলার শাস্তি বিধানে জাতীয় জীবন সুস্পষ্টভাবে লাভবান হয়েছে। এর ফলে, মানুষের নৈতিক আধিপত্য বিদেশীয় আধিপত্যকে দূরীভূত করে, তাদের শারীরিক শ্রেষ্ঠত্বকে বরবাদ করে দেবে।... যুগান্তর সম্পাদক তাঁর অপূর্ব নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা এই অন্যান্য সাধারণ ফলোৎপাদন করেছেন। আত্মসমর্থনে তাঁর অস্বীকৃতি বহু চাঞ্চল্যকর মামলার ফলাফলের সমতুল্য। সারাভারতের জনচিত্তে তা বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। তাতে নৈতিক সাহস, নীরব সহন দেশের জন্য. মানুষকে সহজ কর্তব্য সাধনের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে বলেই নয়, যেখানে দেখা গেছে উৎপীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে আপসহীন স্বরাজী আদর্শের প্রথম বাস্তব প্রয়োগরূপ। এই প্রথম একজন মানুষকে পাওয়া গেল— যিনি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে বলতে পারেন : তোমার সাম্রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর ও অধিপত্য নিয়ে যে তুমি, জনসম্পদ, অর্থসম্পদ, কামান, বন্দুক নিয়ে যে তুমি, সেই তুমি আইনের শক্তি, কারারুদ্ধ করার শক্তি, পীড়নের শক্তি, হননের শক্তি, নিয়ে যে তুমি— সেই তুমি কিন্তু আমার অন্তর্নিহিত যথার্থ মানবসত্ত্বার কাছে কিছুই নও। তুমি স্বল্পকালীন এক অধ্যায়, চলমান একদৃশ্য, অপশৃয়মান এক মায়া ছাড়া অন্য কিছু নও। আমার কাছে চিরসত্য— জগন্মাতা ও স্বাধীনতা।

মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজে বেরুলো :

"Bhupendra Nath Dutta, the Editor of Yugantar has been sentenced to one years' imprisonment. The talented young man, has been sentenced to hard labour for Sedition. There is indeed much that is heroic and pathetic in the way in which he has gone to jail to suffer like a common criminal. When he was first arrested, some of the most leading gentleman of Bengal, offered to stand Surity for him, Sister Neuedita was also among those who kindly come forward. The sympathy that was felt for him, was extremely note-worthy. His youth, his culture, his patriotism and his kinship to Swami Vivekananda were the cause of this remarkable sympathy. But he needed not the sympathy of any one. The blood of the Martyr is in his vein. He was threatened with criminal proceedings by the government but he heeded not and persisted in what seemed to him to be the most proper cause for one of his patriotism. He was then charged and put up before the Magistrate for offence under sec. 124A of I.P.C. What was his answer? I am sole responsible for all the articles is questions. I have done what I have consider in good faith to be my duty to my country. I do not wish the prosecution to be put to the trouble and expense of proving what I have no intention to deny. I do not wish to make any other statement or to take any further action in the trial. He refused to plead. He was in him the stuff of which heroes one made. In a free country, the reward for such a man would have been astonishingly great, but in India, it is only the Jail.

Mr. Dutta knows of it and unhesitatingly submitted to it. Attempts are now being to crush the Yugantar. The Sadhana Press, where the Yugantar is printed, has been ordered to confiscated. In the history of sedition the facts of its kind, where the incriminated Editor, instead of trying to twist the facts or the law in his favour in the least, has courageously stood by what he said fearlessly met what he knew to court certain punishment in a court of laws. If only a few editors should court punishment in this fashion either there would be no sedition trial in future or patriotic newspaper as a body will cease to exist.

২৮শে জুলাই ১৯০৭, মিঃ তিলক মারাঠায় লিখলেন : যুগান্তর মামলায় অভিযুক্ত সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবৃতি অভূতপূর্ব। কাঠগোড়ায় দণ্ডায়মান নেতার উক্তি আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের সমতুল্য। উনি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র; অসামান্য পৌরুষের অধিকারী।

স্বামীজির দেহত্যাগের পর থেকে নিবেদিতা তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। ভূপেন্দ্রনাথ জেলে গেলে তিনি কথা দিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ দেখাশুনার ভার তিনি গ্রহণ করছেন।

এরপর যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হল পুরুষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রইলো না। সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গও ডাঃ নীলরতন সরকারের বাসভবনে (৬১নং হ্যারিসন রোড) মিলিত হয়ে জননী ভুবনেশ্বরীকে অভিনন্দন জানাতে সমবেত হলেন। তাঁকে মানপত্র দেওয়া হল :

'আমরা কতিপয় বঙ্গনারী যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদভার হৃদয়ে পোষণ করিয়া আপনাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। আপনার পুত্র অকুণ্ঠিত সাহসভরে স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া যে নিগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাহাতে আমরা প্রতিবঙ্গনারী গৌরব অনুভব করিতেছি।'

উত্তরে ভুবনেশ্বরী বললেন : ভূপেনের কাজ সবে শুরু হয়েছে। দেশের জন্য আমি তাকে উৎসর্গ করেছি।

১৯০২ সাল থেকেই নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে দেশাত্মবোধের পরিচয় পেয়েছেন। ২৮শে জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, ভারতবাসী সকলের কাছে জীবন কি কঠিন সংগ্রামময় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশ, তার নিজের সন্তানদের কবরভূমি, আর প্রতিটি বর্ব্বর গুণ্ডার কাছে স্বর্গভূমি, যারা তার উপর অত্যাচার করতে চায়— স্বামীজির ছোট ভাইয়ের উক্তি প্রায় একই ভঙ্গীতে। মামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই ভূপেন্দ্রনাথের মুখের সেই বীরত্বপূর্ণ উক্তি শুনে খুশী হয়েছি— তার জেলে যাওয়ার ভয় নেই।

স্বদেশী যুগের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী আইনজীবি অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন : ভূপেনের শাস্তিতে অত্যন্ত ব্যথিত। বিচারের ব্যাপারে করুণার প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে, এমন দেখানোর প্রয়াস লক্ষণীয়; কিন্তু সবাই মনে করছে, ভূপেন আত্মসমর্পণ করলে শাস্তির পরিমাণটা কম হতো। সে যাই হোক, ভূপেনের 'ওয়ান মোর ফর দি অন্টার' প্রবন্ধটি অপূর্ব। যতদূর জানি ওটা ভূপেনের লেখা নয়— অরবিন্দের লেখা।

৩১শে জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বসুরা 'পি এণ্ড ও' জাহাজে বোম্বাই ছাড়ছে ৩১শে আগস্ট এবং প্যারিস হয়ে ভিসবডেন যাচ্ছে তার ব'ত সারানোর জন্য। মনে হয় প্যারিসে সে কয়েক ঘন্টা কাটাবে— তখন তোমার সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা তাদের নেই কি বলো? সময়

দাঁড়াবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। সেন্ট সারাকেও তার করেছি যাতে আগস্টের শেষে যাত্রা করতে পারে। তা হলেই সারার পরিকল্পনা সর্বাধিক কার্যকরী হবে।

কৃস্টীন মিঃ গোখলেকে জানালেন ৩১শে জুলাই ১৯০৭, কয়েক দিনের জন্য আমরা দমদমে ফেয়ারী হলে আছি। দুই লেখক, জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা তাঁদের বই শেষ করছেন।... বসুরা সম্ভবত: ৩১শে আগস্ট বোম্বাই থেকে যাত্রা করবেন। নিবেদিতার নিজের যাত্রার বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয় কিন্তু ১৫ই সেপ্টেম্বর নাগাদ যেতে পারবে মনে করে।...

নিবেদিতা এখুনি আমার কাছে হাজির, যাত্রার বিষয়ে আলোচনা করতে। ফলকথা যে পূর্ব নির্ধারিত ১৫ কি ১৭ আগস্ট বোম্বাই থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তাতেই যাবে। আপনাকে সে দু'একদিনের মধ্যে লিখবে মনে হয়।

এই মামলা সূত্রে সরাসরি শাসকদের রোষ দৃষ্টিতে পড়লেন নিবেদিতা। বিপ্লবী গোষ্ঠীর পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্ক হলেন তিনি। ভূপেন্দ্রনাথ রাজদ্রোহের মামলায় জড়িয়ে পড়ায় বিচলিত হয়ে সর্বপ্রথম তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন জামিনদার হিসাবে এবং কুড়ি হাজার টাকার জামিন দিতেও প্রয়সী ছিলেন, তবে ভূপেনের মাসতুতো ভাই, চারুচন্দ্র মিত্র ও ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এগিয়ে এসে আদালতে প্রার্থনা করায় এবং কোর্টের নির্দেশমত দশ হাজার টাকা উভয়ে প্রতিভূ হলেন, ফলে সে কাজে তিনি নিরত হলেন। এসত্ত্বেও বৃটিশস্বার্থের মূলে তাঁকে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও পরে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট উদ্ধৃতি হল : ৯ই জুলাই ১৯০৭।

বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করে স্থির করলেন : জেলে গিয়ে তিনি ভারতের কোন উপকার সাধন করতে পারবেন না। হয়ত জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হবেন, কিন্তু ওবস্তু তো তাঁর গুরুর অভিপ্রেত নয়। তিনি সব সময়েই বলতেন : জনগণই হবে দেশের নেতা, আর তাঁর কাজ হবে এদেশের জনগণকে জাগ্রতকরে জাতীয়তার ভিত প্রতিষ্ঠিত করা। দেশবিদেশে, বৃটিশ শাসনের ক্রুররূপ জগতের সামনে তুলে ধরা। এখন দেশ জেগেছে, দেশের নেতৃবর্গ পরিচালনার হাল ধরেছেন, এখন তাঁর কাজ? গ্রেপ্তার নয়, জেলে গিয়ে নিশ্চিন্তে আরাম উপভোগ নয়, তাঁর কাজ হবে মাটির নীচে তার শিকড় বিস্তার করানো। বিপ্লবের আগুন সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া, জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, দেশীয় স্বার্থে, জাতীয়তা প্রথিত করা। বৈপ্লবিক কার্য্য সাধনের এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। নৈতিক কারণেই তাঁর এই ভারত ত্যাগের প্রয়াস।

১৯০৩ সালের ২৬শে মার্চ চিঠিতে জানিয়েছিলেন— ভারত ছেড়ে তিনি যেতে পারবেন না, ৯ই এপ্রিলেও জানিয়েছেন একই কথা। ১৯০৪ সালের জানুয়ারীতে লিখলেন পাশ্চাত্যে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী ও ১৭ই মার্চ ও এপ্রিলের ইস্টার সপ্তাহে জানালেন পাশ্চাত্যে যেতে পারবেন না। ১৯০৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন আশা করছি ইয়ুরোপে যেতে পারবো কিন্তু পথ পরিষ্কার নয়। সেন্ট সারা যথারীতি এই বিশ্বাস করে যাচ্ছেন— আমি যাবো কিন্তু এখানকার ব্যাপারটি ঠিকভাবে দেখা সম্ভব নয়। অপরের রাজনৈতিক সংকট সমূহ উত্তরণের ব্যবস্থাদি করার আছে— সুতরাং কোন পরিকল্পনা করতে সমর্থ নই। ১৫ই মার্চ ১৯০৬, লিখলেন : ইউরোপের অনেক জিনিসই দেখতে ইচ্ছা হয়, অনেক মানুষের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের বাসনা জাগে, এ সত্ত্বেও আমার ধারণা আমি কদাপি ইউরোপ যাবো না। ভারতে অবস্থান কালে প্রতি মূহর্তে যা করি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তা স্বামীজির অভিপ্রেত কাজ। ইউরোপে গেলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। ২রা মে ১৯০৬ জানালেন— তিনি

পাশ্চাত্যে যেতে পারছেন না— দল রিক্রুট করতে হচ্ছে। ২১শে জুন ১৯০৬ লিখলেন— সারার চিঠিগুলিতে বুঝতে পারছি যে, আমি না যাওয়ায় তিনি নিরাশ হয়েছেন। উল্টোটাই চেয়েছি, অর্থাৎ তাঁর কথামত কাজ করতে চেয়েছি— কিন্তু তা অসম্ভব। আমার কাজ এখানেই। আর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কর্মবিরতি চাইছি না। তা এখন পুরোপুরি পুনর্গঠিত। পূর্বের মতই ভাল— মেজাজটি ছাড়া। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক হয়ে উঠছি। অথচ পুণরায় রথের দড়ি ধরে ফেলার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করে চলেছি। অত্যুত্তম স্বাস্থ্যের উপর দায়িত্ব কতখানি নির্ভরশীল তার হিসাব কেউ জানে না।

বেশ কিছু দিন ধরেই পাশ্চাত্যগমনের কথা চলছিল। স্বামীজির জীবনী রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছাড়া প্রয়োজন পাশ্চাত্যে ভারতীর আন্দোলনের সংগঠন। এছাড়া ভারতের শিক্ষাকাজের জন্যও অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কাজের সাহায্য তো আছেই! উপরন্তু ভাঙা স্বাস্থ্য পুণরুদ্ধারের সমস্যাও রয়েছে।

১৯০৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী লিখেছিলেন ১৯০৮ সালের আগে ইউরোপে যাওয়া হবে না। ৬ই ফেব্রুয়ারী ও ২০শে ফেব্রুয়ারীতেও জানিয়েছেন আগামী বছরের গোড়ার দিকে যাত্রা করতে পারবেন। ১৫ই মার্চ ১৯০৭ পুণরায় জানালেন এখন যাওয়া সম্ভব না। ২০শে মার্চ থেকে ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত (২০শে মার্চ, ৪ঠা এপ্রিল ও ১১ই এপ্রিল) পর পর চিঠি দিলেন— সময় পাল্টে। জুলাই, আগস্ট বা অক্টোবরে হয়ত সম্ভব। ৯ই জুন লিখলেন, এবছর যে যেতেই পারবো এমন কিছু বলা খুবই শক্ত। ১৭ই জুন লিখলেন : তুমি ইতিমধ্যে জেনেছো যে সকলই অনিশ্চিত। পশ্চাত্যে যেতে পারছি না। ১৭ই জুলাই লিখলেন, দেশের পরিবেশ। ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। যেমন অন্দোলনের মাত্রা তীব্রতর হচ্ছে। অবস্থার পরিবেশ ক্রমশঃ উত্তপ্ত হচ্ছে।

১৯০৬ সালের শেষে কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস দ্বিভাগে বিভক্ত হয়েছিল, মডারেটদের ষড়যন্ত্রে। মিঃ গোখলের উপর ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর চাপ। তাঁকে সম্মুখে রেখে লর্ড মিন্টো চাইছিলেন তার কাজ হাসিল করতে : 'বর্তমানের আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ুক। পূর্ববর্তী কংগ্রেস যেমন সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে চলছিল সেইরকম চলুক। বামপন্থীদের শক্তি হ্রাস পাক।' ফলে, বামশক্তি গঠন করলেন 'নিউপার্টি'। দলনেতা লাজপত রায়, লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ কৌশলে লাজপত রায়ের পরিবর্তে নরোজীকে কংগ্রেসের সভাপতি করলেন মর্ডারেট দল। কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন : বামপন্থীদের প্রতিধ্বনিত সুর সেই 'পূর্ণ স্বরাজ'! দেশের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হল না— আন্দোলন চলছে— কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা বয়কট ও 'স্বদেশী' আন্দোলন অনুমোদিত হল। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে বৃটিশের ঘুটির চাল সার্থক হল। দ্বিজাতি তত্ত্বকে কাজে লাগালো আমানুল্লার সহযোগিতায়। কুমিল্লায় দাঙ্গা বাঁধালো মার্চেই। এপ্রিলে সেই দ্বিজাতি তত্ত্বে 'হিন্দু মুসলমানে' দাঙ্গা বাঁধলো জামালপুরে। পরিবেশ তিক্ত হয়ে উঠছে। মিলিত আন্দোলন ভেঙে পড়ার মুখে, মে মাসে পাঞ্জাবে 'রায়ট'। নেতা লাজপত রায়, সর্দার অজিত সিংহ বন্দী হয়ে নির্বাসিত হলেন। ডায়েরীতে লিখলেন সরকার 'কি উন্মাদ'?

জুলাই মাসের প্রথমে ভূপেন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে বিচারাধীন বন্দী। স্বামীজির ভাই, তাঁর বিশেষ প্রিয় পাত্র। জামিন দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন। সরকারের 'কু-দৃষ্টিতে' পড়লেন তিনি। তাঁর সঙ্গে মিঃ গোখলের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। তিনি সন্দেহভাজন হয়ে দাঁড়ালেন সরকারের কাছে। ঘনিষ্ঠ ও পরিচিতদের কাছ থেকে নানা সংবাদ আসতে লাগলো। বিপ্লবীদলের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য সরকার উঠেপড়ে লেগেছেন। যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট, সে দিকে লক্ষ্য রেখেছেন সরকার। প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলেই তাঁকেও বন্দীকরা হবে। আরও গোপন সংবাদ পেলেন, লর্ড মিন্টো, মিঃ মর্লেকে বার্তা পাঠাচ্ছেন, মিঃ গোখলেও তাঁর সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য ভারত ছেড়ে যেতে চাইছেন। তাঁরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, যেহেতু নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বর্তমান।

স্থির করলেন : ১৫ই অক্টোবরের আগে যাত্রা করতে পারবেন না। যাত্রাকাল খুবই অনিশ্চিত। ২৫শে জুলাই (১৯০৭) লিখলেন : ১৫ই সেপ্টেম্বরের আগে যাত্রা করতে পারবো না।

এই কয়েকদিনের মধ্যে মনস্থির করে ফেললেন। সেইমত ব্যবস্থাও গ্রহণ করলেন। স্বামীজির মায়ের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ও কিছু টাকা 'ফিক্সড' ডিপোজিট ও মাসিক আয়ের ব্যবস্থা করলেন। ভূপেন্দ্রনাথ জেলে থেকে ছাড়া পেলে, তার পরবর্তীকালের ব্যবস্থা করলেন। স্কুলের যাবতীয় ভার, কৃষ্টীনের উপর তুলে দিলেন। কৃষ্টীনকে কিছু টাকা দিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ ছাড়া পেলেই তাঁকে আমেরিকা পাঠানোর ব্যবস্থার জন্য।

৩১শে জুলাই চিঠি দিলেন মিস ম্যাকলাউডকে, আগামীকাল গ্রিগুলের মারফৎ টেলিগ্রাম করেছি, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জেনেভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো। গতকাল, বিকালে আমার সকল চিঠি লিখে ফেলার পর সন্ধ্যায় সহসা স্থির করেছি ১৫ই আগস্ট জেনোয়র উদ্দেশ্যে যাত্রা করা উচিত। আরও ঠিক করলাম, লণ্ডনের টিকিট করা উচিত হবে না। জেনোয়া পর্য্যন্ত টিকিট নেওয়াই ঠিক।

১আগস্ট ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : খোকা ৩১শে আগস্ট প্যারিস হয়ে ভিসবাডেনের জন্য যাত্রা করছে। হয়ত তুমি এবং আমি প্যারিসে কয়েকদিন কাটিয়ে, তাদের ধরতে পারবো এবং তাদের বিদায় জানাতে পারবো। যদি তাই হয়, তাদের কদাপি বলো না— চমক দিতে হবে। ১২ থেকে ১৪ই অক্টোবরের মধ্যে তাদের পৌঁছানো উচিত।

১লা আগস্ট ১৯০৭ মিঃ গোখলেকে লিখলেন : ইতিমধ্যে আপনি জেনেছেন, ডঃ বসুর ডেপুটেশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মহাভাগ্য যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি ফার্লোটুকু পেয়েছেন। শিক্ষা বিভাগে যে অসহ্য দল তৈরী হয়েছে এবং যেভাবে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার মুখে, তাতে যদি তাঁকে নির্ধারিত সময়ে কাজ করে যেতে হয়— সপ্তাহের কুড়ি ঘন্টার কাজ এবং অশেষ রকম সরকারী চিঠিপত্রের হয়রানি-- তাহলে পরিণতি কি দাঁড়াত, বলতে পারি না। যাই হোক, এখন যা দাঁড়িয়েছে, তিনি 'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রোফিজিওলজি' বইয়ের শেষ বাক্যগুলি লিখছেন এবং অন্যদিকে উন্নতির লক্ষণ ও দেখা গেছে।

ভূপেনবাবুর (বসু) কাছ থেকে অবশ্য শুনলাম, স্বয়ং Mr. Earle মত প্রকাশ করেছেন — ডঃ বসু ফেরার পরে তাঁর চাকরির যে কয়বছর থাকবে, সেই সময়ে তিনি পেনসন সহ অগ্রিম অবসর নিতে পারবেন, তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগারে কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার বাড়তি আয়ও থাকবে — তাঁকে মুক্তি দেবার এই একটি পথ। তাঁরা নিতান্ত শীতল মস্তিষ্কে এর একটা হিসাব পর্য্যন্ত কষে ফেলেছেন — মাসে ৭০০ কি ৮০০ টাকা। অর্থাৎ গবেষণার সর্বোচ্চ সম্মান— আয়হ্রাসের শাস্তি! শিক্ষাবিভাগের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তা পাঁচশ থেকে হাজার পাউণ্ড এবং বারশো পাউণ্ড পর্য্যন্ত মাহিনার লোকেদের ভর্তি করা আছে, যারা ইংলণ্ডে থাকলে বহু কষ্টে বছরে সত্তর থেকে একশো পাউণ্ডের বেশী রোজগার করতে পারতো না। আর এই লোকটি, যেহেতু ভারতীয়, সেই কারণেই তাঁকে তাদের সকলের তলায় স্থাপন করতে হবে! এ্যাকাউন্টস্ অফিসে সন্ধানের দ্বারা অধিকন্তু বার করা গেছে, ঐ যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্য্যকরী হতে হলে তাকে অন্তত লালফিতার ফাঁস খুলে বেরুতে হবে, যেখানে

নিতান্ত সহজ ব্যাপার হত এই অর্ডারটি দেওয়া— 'এই ব্যক্তি বিশেষ কর্তব্যে অবশিষ্টকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত হলেন এবং এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ হবে।'

অবিরত এইরকম অর্ডার বেরুচ্ছে। এক্ষেত্রে এটাই একমাত্র উচিত কাজ হতো। যদি এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, তাহলে আকাশ পাতাল তোলপাড় করে আপনার মুসাবিদা করা তাঁর মূল আবেদনপত্রটি উদ্ধার করাই আমার কাজ হবে, যার দ্বারা, যখন তিনি পাশ্চাত্যে আছেন তখনকার জন্য প্রয়োজনীয় সহকারীর ব্যবস্থা, ভ্রমণ ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে। এ পর্যন্ত আমি জানি না ভূপেনবাবু কি রকম সফল হয়েছেন। লর্ড অ্যাভেবরী লিখেছেন, তিনি এ ব্যাপারটা মার্লের দৃষ্টিতে আনবেন এবং ইংলণ্ডে লর্ড মিন্টোর জনৈক বন্ধু, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পত্রে তাঁকে লিখেছেন। কিন্তু ফ্রেজারের হাত ছাড়িয়ে ব্যাপারটা বার করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভূপেনবাবু নভেম্বর মাসে প্রীতি ও আস্থার পরিবেশের মধ্যে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি বলেছেন : এ জিনিসটি তিনি ব্যক্তিগত পুরস্কার রূপে দাবি করবেন।

১লা আগস্ট ১৯০৭, চিঠি লিখলেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে (ইনিও একজন জাতীয়তাবাদী নেতা)। ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। প্রথমে রাজনৈতিক পত্রাদি লেখা শুরু করেন ইণ্ডিয়ান মিরারে। যুক্ত হলেন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে। ১৯০৩ সালে কুমিল্লায় বক্তৃতাকালে ডাক দিলেন আত্মনির্ভরতার। বললেন : সর্বাগ্রে জাতির প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জন, সঙ্গে যুক্ত থাক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞানবৃদ্ধির প্রচেষ্টা। ১৯০৪ সালে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলেন। আদিপর্বে মিঃ পি. মিত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত। ইনি জ্বলন্ত বাগ্মী ও স্বদেশী আন্দোলনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্যকারী আইনজীবি। এ সময়েই তিনি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। এক সময়ে ট্রেডইউনিয়ন নেতা ছিলেন প্রভাত কুমার রায়চৌধুরী। অপূর্ব কুমার বসু, প্রেমতোষ বসু প্রমুখ। ইনি বার্ণ কোম্পানী, সরকারী প্রেস, চটকল, ট্রাম কোম্পানীর 'ধর্মঘট' সংগঠক। ১৯০৬ সালে বয়কট সমর্থক। এই সমর্থকদের সহায়তায় পরে করপোরেশনের কাউনসিলার। অবশ্য এই রূপান্তর রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু নিবেদিতার কাছে এটা তিক্ত বস্তু ছিল না। যাঁরা দেশপ্রেমিক, দেশের ও দশের কাজে সংযুক্ত, তাঁরা সব সময়েই ছিল, তাঁর সহযাত্রী। এঁদের সকলকেই প্রয়োজন, এঁদের সহযোগিতায় যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হয়। কাজে সিদ্ধিলাভও করা যায়।

অশ্বিনীবাবু ওঁকে মনের আশা ব্যক্ত করায়, তিনি জানালেন... আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের বাড়ী নিশ্চয় খোলা থাকবে। আমি ও সিস্টার ক্রিস্টিন একযোগে আপনাকে উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি— যাতে আপনার চিন্তাভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জানবার সুযোগ আমাদের দিতে পারেন। আপনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেন 'অসংশোধনীয় অলস'— অবশ্যই তা নন এবং একথাও সত্য, প্রত্যেক মানুষের এমন সঙ্গ চাই, যেখানে তার ইচ্ছাও আদর্শের স্বীকৃতি আছে, যদি সে নিজ জীবনকে মহৎ ও বৃহৎ করতে চায়।

নিবেদিতা ভারতে থাকাকালেই 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা শুরু হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনাকালে কয়েকটি প্রবন্ধের সমালোচনার জন্য তিনি সম্পাদক গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কৃত হলেও প্রায় দেড় বছর পরে, হল এ মামলার সূচনা। মে মাসে, মাদ্রাজ থেকে বক্তৃতা সফর বন্ধ রেখে ফিরে এলেন কলকাতায়। লাজপত রায় তখন নির্বাসিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে পরামর্শ দিলেন, তুমি যদি সাক্ষ্য না দাও, তোমার জেল হবে ছ'মাস— কিন্তু সম্পাদক অরবিন্দ রক্ষা পায়, আন্দোলনের হাল ধরা থাকে।

৪ঠা আগস্ট ১৯০৭, মিঃ তিলক তাঁর 'মারাঠা' পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের সংবাদ ও অন্যান্য পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করলেন। সঙ্গে যুক্ত হল সরকারকে চাপা আক্রমণের ব্যঙ্গ।

বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে জরুরী নানা খবর আসতে লাগলো : সরকার শ্যেন দৃষ্টি রাখছে। কোন উপায়ে তিনি যেন এ দেশত্যাগ করতে না পারেন সরকার সে ব্যবস্থা অবলম্বনে সতত সচেষ্ট।

স্থির করলেন : ছদ্মবেশ ধারণ করে দেশত্যাগ করবেন। যাত্রাপথ জানবে একমাত্র অন্তরঙ্গ রা। এমন কি মিঃ গোখলেকেও জানালেন না। হাতে সময় অল্প। তাঁকে ১৪ই আগস্ট (১৯০৭) জানালেন : আমার সঙ্গে দেখা করতে পারনি বলে দুঃখিত হয়ো না। আমার কেবল ভয় ছিল, তুমি অসম্ভব চেষ্টা করে বসবে এক্ষেত্রে। আমার মন এই ভেবে হালকা হয়েছে যে তুমি অবস্থাটা শান্তভাবে মেনে নেবে।

'ভারত ত্যাগে পূর্বে' প্রবুদ্ধ ভারত ও মডার্ণ রিভিউর জন্য কয়েক মাসের লেখা লিখে, প্রতিটি পত্রিকা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পরিচিত সকলের সঙ্গে, এমন কি ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গেও দেখা করে এলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বর ও বেলুর মঠে গেলেন। বিদ্যালয়ের ভার কৃস্টীনের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর অসুস্থতার জন্য বহুদিন বিবাহিতা ও বিধবাদের ক্লাশ বন্ধ থাকায় তাদের (সেই সব স্নেহের ছাত্রীদের) সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না।

১লা আগস্ট চিঠিগুলি হস্তাগত হওয়ার পর ৭ই আগস্ট ১৯০৭ লর্ড মিন্টো, মিঃ মর্লেকে লিখলেন :

As to Gokhale, if he chooses to play with fire, he must take the consequence... I am thoroughly disappointed in Gakhale. I had liked what I had seen of him and believed he was honest at heart, but the part he has played of late, has disgusted me. As an honest moderate, he has lost a great opportunity of discountinucing rank Sedition : এ সংবাদ নিবেদিতার কাছে এলো।

১২ই আগস্ট কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বোম্বাই পৌছলেন। ১৫ই আগস্ট ১৯০৭, জাহাজ ছাড়লো। জাহাজে বসে 'The Master as I saw Him' ও অন্যান্য লেখা আরম্ভ করলেন। ক'দিন বেশ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল। এডেনে পৌছে কৃষ্টীনের চিঠি পেলেন। লিখেছেন : বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যথারীতি স্কুলে আসছে। বিবাহিতা ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে। সুধীরা ও অন্যান্য সকলের নিয়মিত ক্লাশ নিচ্ছেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে হাল্কা করে নিলেন।

৩০শে আগস্ট ১৯০৭ জাহাজ থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তোমার প্রতিভাময়ী কোন পরিচারিকা আছে নাকি? 'ভেল' দিয়ে ভিন্ন ধরনের 'হেড ড্রেস' করতে চাই। একটা আইডিয়া মাথায় এসে গেছে— তা কার্য্যকর করতে বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ড পৌছলেন। পাঁচবছর পরে মা ও ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। মা মেরী, স্বামীর ভবিষ্যৎবাণী স্মরণে সুখী হলেন। মার্গট যখন শিশু, তিনি বলেছিলেন মহৎ, উদ্দেশ্যে মেয়ে তাঁর ভারত গমন করে আত্মোৎসর্গ করবে। সত্যই বর্তমানে তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবন। পারিবারিক গণ্ডী তার ভেসে গেছে। কথাবার্তা চাল চলন, চিন্তাধারার কত পরিবর্তন। আধ্যাত্মিক জীবন বরণ করেছে সে। তাঁর সেই আস্বাদ, তাঁর প্রিয়জনকে দেবার কি গভীর আগ্রহ। সঙ্গে এনেছে মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানী, নানারকমের মালা, কবচ, পাথরের নুড়ি, ছোট ছোট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার ছোট ছোট পট। যদিও তুচ্ছ বস্তু, তাঁর কাছে সৌন্দর্য্য বোধে তুলনাহীন এগুলি।

মার কাছে 'গোপালমার' গল্প করলেন। তাঁর রক্ষিত মালাটি মাকে স্পর্শ করতে দিলেন। তিনিও অভিভূত। কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় ভারতবর্ষ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে তাঁর মেয়ে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছে কত পরিচিত ও প্রিয় আজ সেসব।

মার কাছে কয়েকদিন অবস্থানের পর ভিসবাডেনে, জগদীশচন্দ্র ও অবল বসুর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা সেপ্টেম্বরের প্রথমে ভারত থেকে যাত্রা করে পৌছেছেন। এখানে অবস্থান করছিলেন মিসেস লিগেট ও মিস ম্যাকলাউড। স্বামীজির দেহত্যাগের পর মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। অতীতের কত স্মৃতি ভেসে উঠলো দৃশ্যপটে। এখানেই স্বামীজির সঙ্গে ইউরোপে বাসকালীন শেষ সাক্ষাৎ। 'দি মাস্টার অজ স হিম আই লেখা চলছে' অনুভূত হলে লাগলো সে সময়টি।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : আমার খুবই বিশ্বাস, খোকা এখন পোর্ট সইদে।

১লা অক্টোবর ১৯০৭, মিঃ গোখলেকে চিঠি দিলেন : সাপারের সময় প্রতিদিন কৃষ্টান মিঃ মর্লের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যায়। তা প্রতিদিন সকালে মিঃ মতিলাল ঘোষ, অমৃতবাজারের সম্পাদক কার্জ্জনকে যে ভাবে উৎপীড়ন করেন ঠিক তারই মত আনন্দদায়ক। কি বিচিত্র সময়েই না আমরা বাস করছি! শুনছি, এমন কি তুমিও নিরাপদ নও একেবারে। অবশ্য তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দেখতে খুব ইচ্ছুক!

ইংলণ্ডে ফিরে এলেন অক্টোবরে। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র তখন ক্যাম্পহোমে অবস্থান করছেন। মিসেস বুল আমেরিকা থেকে এলেন— জগদীশচন্দ্রের অভিযান যেন সার্থক হয়। উভয়েই সচেষ্ট হলেন।

বেরুল লংম্যানমের প্রকাশনায় 'Cradle tales of Hinduism' ইতিপূর্বে 'The web of Indian life' বইটি পাশ্চাত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সুতরাং বইটি পরিচিত মহলে সমাদৃত হল। শেষ হল ১৯০৭। ৩১শে ডিসেম্বর ডায়েরীতে লিখলেন : অপূর্ব বছর। দমদমে আরম্ভ লণ্ডনে শেষ। দুখানি বই Comparative Electro-Physiology ও Cradle Tales of Hinduism বেরুলে। অন্যান্য বইয়ের কাজ চলছে, মডার্ণ রিভিউ ও প্রবুদ্ধ ভারতের লেখাও। আহা ধন্য এ বছরটি। মা! মা! মা! স্বামীজি গ্রহণ করুন।

১৯০৮ সালের প্রথম থেকে পরিচিত মহলে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। বক্তৃতার বিষয় প্রধানতঃ বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত। ক্যাক্সটন হলে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে চললেন রামায়ন ও মহাভারত। লিক্রেম ক্লাব, হায়ার হট সেন্টার ও ফেবিয়ান সোসাইটিতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বক্তৃতা দিলেন: 'ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব' ২৯শে মার্চ বক্তৃতা দিলেন : 'স্বামীজির জীবন ও কর্ম'। চেষ্টা করলেন ইংলণ্ডের বেদান্ত সোসাইটিকে পুনরায় চালু করার। এখানেও সেই একই উদ্দেশ্য, ভারতের সেবা। এসে গেলেন গোখলে, রমেশ দত্ত ও আনন্দ কুমার স্বামী। মিঃ র‍্যাটক্লিক সস্ত্রীক পূর্বেই ইংলণ্ডে এসে গেছেন। লেখক হিসাবে যুক্ত হয়েছেন 'নেশন' ও 'ডেইলি নিউজে'। এছাড়াও উদারনৈতিক কাগজেও যুক্ত হয়েছেন। নিজস্ব পরিচিতি মহলও লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে বর্তমানে ভারতবর্ষে কিরূপ অত্যাচার চলছে তার স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করলেন। 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় বেরুতে লাগলো প্রবন্ধ ও বক্তৃতা। ১০ই জানুয়ারী ১৯০৮, বেরুল : 'র‍্যাটক্লিক অন দি রিলিজ অব লাজপত রায়'। ১৪ ফেব্রুয়ারী 'ম্যানচেস্টারে' বেরুল 'হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন ইণ্ডিয়া', নিউ এজ পত্রিকায় লিখলেন

'দি স্টোরি অব বেঙ্গল পার্টিসন', এপ্রিল ১৯০৮। ভারতীয়গণের সাহচর্যে চললো রাজনীতি চর্চা, কুমার স্বামীর সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ ও আলোচনা। কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ই বি হ্যাভেলের সঙ্গে ভারতীয়·শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা। সংগৃহিত মুল্যবান তথ্যের সঙ্গে সুচিন্তিত অভিমত দানে তাঁকে সাহায্য করে চললেন।

১৫ই আগস্ট ১৯০৭, যখন জাহাজে ভারত ত্যাগ করেছিলেন তিনি, ভারতে, চলছে প্রচণ্ড ধরপাকড়। চলছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচারের প্রহসন। 'বন্দেমাতরম'-র বিরুদ্ধে আনা হল রাজদ্রোহের মামলা। প্রায় দেড় বছর আগে প্রকাশিত রচনার জন্য। সম্পাদক হিসাবে বিপিনচন্দ্র পালের কারাদণ্ড হল ছ'মাস। যদিও তিনি বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না— সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তাঁকে বাঁচাতেই মিঃ সি আর দাশের পরামর্শে ধরা দিলেন বিপিনচন্দ্র এবং ২৬শে আগস্ট ১৯০৭ কিংসফোর্ডের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন। বেশ কয়েকমাস আগে তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ করেছিলেন, অরবিন্দের অনুগামী বিপ্লবীদের গোপন প্রচারিত 'গোল্ডেন বেঙ্গল' নামে সন্ত্রাসবাদী প্রচার পত্রের কঠোর সমালোচনা করার জন্য, ৩রা অক্টোবর ১৯০৬। বলেছিলেন: 'পাগলা গারদের বাইরে এমন কেউ নেই, যে ভারতবর্ষে, সহিংস বা অবৈধপন্থা গ্রহণের চিন্তা করবে, বা সে বিষয়ে পরামর্শ নেবে। বর্তমানে কোন, 'গুপ্ত সংস্থার গঠন' কেবল কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেবে— সেই সঙ্গে গুপ্ত সমিতিগুলি, তাদের স্বভাবগত গোপনতার কারণে আমাদের জনজীবনের কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই সে কর্কটরোগের মত প্রবেশ করে আছে— তাকে বাড়িয়ে তুলবে'। ফলে, গুপ্ত সমিতির রাগ, 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। মাদ্রাজ ছেড়ে প্রত্যাবর্তনের পর অরবিন্দের যখন সম্পাদক হিসাবে বিচারের কাঠগড়ায়, তখন চিত্তরঞ্জন দাসের উপদেশে নিজেই অরবিন্দকে মুক্ত রাখার আশায় সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং বিচারের সাক্ষ্যদানে, অসহযোগ নীতি পালন করলেন।

মিঃ সি আর দাস, আদালতে বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করে প্রমাণ করলেন: অরবিন্দ গুপ্তসমিতি বিরোধী। ১৯০৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ছাপা 'The sinful desire' লেখাটি বিপিন পালের ও ৩রা অক্টোবর ১৯০৬ 'Golden Bengal scare' লেখাটিও বিপিনচন্দ্রের। যেহেতু বিপিনচন্দ্র আদালতে সাক্ষ্যদানে অসহযোগিতা করেছেন, আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হলেন ছ'মাসের জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ বন্দেমাতরম পত্রিকায় বেরুল : 'দি মাটারডাম অব বিপিনচন্দ্র'... The Nationalist orator and propagandist, the most prominent public figure in the New party in Bengal... the man with a historic mission.

It was distinctly declared by Bipin Babu that it was not as a boycotter, not with the political intention of making the working of the bureaucratic law-courts impossible, that he declined to give evidence or take the oath... A few man like Bhupendra Nath dutta have realised freedom in their souls and refuse to be bound by any limitations of an alien making, may decline to have anything to do with the law which the nation has hand in framing and the courts over which the nation no control, but this has not yet become the adopted policy of the New Party and there was no moral compulsion on its leader to make any such refusal.

The country will not suffer by the incarnation of the great orator and writer, the spokesman and prophet of Nationalism, nor will Bepin Chandra himself suffer by it. He has risen ten tines as high as he was before in the estimation of his countrymen, if there are any among them, who disliked or distrusted him, they have been silenced, for good. we hope, by his manly, straight forward and conscientious stand for the right as he understood it.

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ নবশক্তিতে বেরুল : যদি শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কিছু সক্রিয় পন্থায় বিপিনবাবুর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে তা হলে সমগ্রদেশ প্রেরণার কারণ হবে এবং জনগণের ঐক্যকে জোরদার করবে। আমরা আশা করি বাবু অপূর্ব কুমার ঘোষ এবং বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারায় কিছু করবেন। তিলকের শাস্তির পরে মহারাষ্ট্রের শ্রমিকরা অনড়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এদেশের গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক সহযোগ তুলনায় সামান্য, তার জন্য জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাই দায়ী। উৎপীড়নকালে কি ভাবে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাতে হয়, আজ তা রাশিয়ার শ্রমিকরা পৃথিবীকে শিখিয়ে দিচ্ছে— ভারতীয় শ্রমিকরা কি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে না?

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে বৃটিশ লেবার পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা কেয়ার হার্ডি ভারতে যে আন্দোলন চলছে, তার স্বরূপ কি অবগত হওয়ার জন্য কলকাতায় এলেন। নিবেদিতা তার পূর্বে ১৫ই আগস্ট ভারত ত্যাগ করে ইউরোপে যাত্রা করেছেন। কেয়ার হার্ডি দেশীয় কাগজগুলির তরফে উদ্দীপ্ত সম্বর্ধনা পেলেন। ভারত ভ্রমণ করে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন তিনি। নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ খবরের কাগজে বার করতে লাগলেন।

১১ই নভেম্বর ১৯০৭ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন নিবেদিতা : তুমি নিপজিগে যাচ্ছ! খোকা বলেছে সেও যেতো যদি সে জানতো তোমার সঙ্গে যেতে পারবে! বউ বলছে, তোমার কোন 'বন্ধন' নেই। বউ বড় মিষ্টি।

২১শে নভেম্বর ১৯০৭ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : এখানে শুধু রাত্রিটুকুর জন্য এসেছি। ...আগামীকাল খোকার জন্মদিন। ...আমি চলে গেলেও খোকার ল্যাবরেটরীতে যেতে পারবে।

২৭শে নভেম্বর ১৯০৭, 'লেবার লীডার' কাগজে ভারতে পুলিশ নির্য্যাতনের সমালোচনা করলেন। বললেন, রাশিয়ার সমতুল্য এই অত্যাচার। আর এই অত্যাচারই চরমপন্থীদের তৈরী করে দিচ্ছে। ভারতে অশান্তির কারণ ও চরিত্র এবং তা দমনে সরকার অযৌক্তিক প্রায়স চালাচ্ছে।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমরা গতকাল লর্ড কেলভিনের সমাধিকৃত্যে গিয়েছিলাম। খোকা বলছে, তাঁর বিয়োগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব অপসৃত হল। তাঁর মত শিশুর আনন্দ নিয়ে নূতনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আর কেউ রইলো না— আর কেউ তার মত কর্তৃত্ব প্রবণতা বা ঈর্ষা থেকে মুক্ত নয়!

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, ডেইলি ক্রনিকল ও গ্লাসগো হেরাল্ডের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে এলেন ডবলিউ নেভিনসন। উদ্দেশ্য; ভারতে বর্তমান অসন্তোষের কারণ যথাসম্ভব আবিষ্কার করাও। গোঁড়ামি না রেখে ভারতীয় ও সরকারী কর্মচারীদের মতামতের বিবরণ দেওয়া। অসন্তোষের প্রধান কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

মানবতাবাদী, সাংবাদিক, সচেষ্ট প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার রূপে পরিচিত তিনি। জার্মানীতে শিক্ষা নেবার সময় সামরিক সম্বন্ধে ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেন, কিন্তু সমর ইতিহাস বিষয়ে কৌতূহলই তাঁর কাটেনি। তিনি তাঁর প্রজন্মের অধিকাংশ যুদ্ধ ও ব্যাপক বিক্ষোভের প্রত্যক্ষদর্শী। প্রথম জীবনে, ক্রীশ্চান সায়েনটিস্টদের প্রভাবাধীনে, এইচ এম হাইগুম্যানের ডেমোক্রাটিক ফেডারেশানে অন্তর্ভুক্ত। মার্কসবাদে অবিশ্বাসী আবার অজ্ঞেয়বাদীদের অনড় মতবাদের বিরোধী। তাঁর মধ্যে ক্রপ্টকিন ও এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের প্রভাব বর্তমান। শ্রমিকদের সঙ্গে বাস করতেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন আবার সমর সংবাদদাতা হিসাবে স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করতেন। তিনি নারী ভোটাধিকারের সমর্থক। ইংলণ্ডে নারী ভোটাধিকার প্রবর্তনের মূলে ছিলেন ইনি। ভারতে আসার আগে বহু বইয়ের রচয়িতা।

তিনি এলেন, বহু গুরুত্বযুক্ত স্থান পরিদর্শন করলেন। চিঠির আকারে অভিজ্ঞতার বিবরণ ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাঠাতে আরম্ভ করলেন। পড়লেন, ভারত সরকারের বিষ দৃষ্টিতে। ২০শে ডিসেম্বর ১৯০৭, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে জনসভায় বললেন : ভারতবর্ষে, রাজদ্রোহ নেই, আছে সরকারের সমালোচনা। সরকারী কর্মচারীদের আক্রমণ করছি না তবে গোয়েন্দারা আমাকে অনুসরণ করছে, আমার টেলিগ্রাম আটকাচ্ছে, চিঠি ছিঁড়ছে, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের কপি তাঁকে দিচ্ছে না।

বললেন : ন্যাশনাল ভলেন্টিয়াররা রাজদ্রোহী নয়। সমালোচকরা একদিকে বাঙালীদের কাপুরুষ বলছে, অথচ তারা শরীরচর্চা করলে বলছে রাজদ্রোহী— দুটো জিনিস একসঙ্গে চলে না।

মিঃ নেভিশন ভারত সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা যখন প্রবন্ধাকারে লিখে চলেছেন, নিবেদিতা ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : "নেভিশন অনবদ্য সব প্রবন্ধ লিখছেন। তিনি তাঁর চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন।

মিঃ নেভিশন ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে। প্রকাশ্য জনসভায় খোলাখুলি ভারতের রাজনৈতিক অধিকার দাবির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগলেন।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৭ 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় বেরলো : অসম্মানিত মিঃ নেভিনসনকে সহানুভূতি জানাচ্ছি। তবে দুঃখিত নই, কারণ এর থেকে বুরোক্রেসির চেহারাটা খুলে গেছে।

ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক 'উইলিয়াম স্টেড'। এঁর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ভারতে আসার অনেক আগে। তিনি কি প্রকৃতির ও কি চরিত্রের মিঃ স্টেড, ভালভাবেই জানতেন। মিঃ স্টেড ২২ বছর বয়সে নরদার্ণ ইকো নামক উদারনৈতিক পত্রিকার সম্পাদক। এঁর জন্ম ১৮৪৯ সালে। ন'বছর সম্পাদকরূপে কাজ করার পর ১৮৮০ সালে পলমল গেজেটের সহকারী সম্পাদক। জনমর্লে তখন সম্পাদক, এঁর সঙ্গে কাজ করেন তিন বছর। ১৮৮৩ সালে হলেন সম্পাদক। সাত বছর এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এই সময়েই তাঁর খ্যাতি আকাশস্পর্শী। রাজনৈতিক, সামাজিক ও নানা আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। সাংবাদিকতার নব প্রবর্ত্তক বলাও চলে সেই সঙ্গে। ১৮৯০ সালে নিজে রিভিউ আর রিভিউজ নামে পত্রিকা বার করেন। কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান সংস্করণ বার করেন। এই সময়ে গুপ্ত রহস্যবাদ ও প্রেততত্ত্বের আগ্রহী হয়ে বর্ডার ল্যাণ্ড পত্রিকা বার করেন। তার মধ্যে বিদেহী গণের উক্তির অনুলিখন ও আনুষঙ্গিক বিষয় প্রকাশ করতে থাকেন। হয়ে উঠলেন ঘোর থিয়জফিস্ট। ১৮৮০ সালের পর দেশে যা কিছু ঘটেছে, তা তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর। যখন তিনি পলমল গেজেট চালাতেন নরদামবারল্যাণ্ড ষ্ট্রীট থেকে, সেই ছ'টি বছর তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য চালাতেন, বলা চলে। তাঁর বাড়ী ও অফিস সর্বসময়েই খোলা — সকলকেই অভ্যর্থনা করতেন সে শ্রমিক হোক — সুলতানই হোক — কোন বাদ বিচার তাঁর ছিল

না। ভারত সম্বন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ। ভারতবাসী তাঁর কাছে বিশেষভাবে অভ্যর্থিত। ভারতের প্রতিটি জননেতা, তাঁর বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পেতেন। হুল্লোড় হাসি, বোকা-নোকা ভঙ্গীতে আগন্তুকদের জেরা করে, জেনে নিতেন ইংলণ্ডে আসার উদ্দেশ্য কিংবা জানতে চাইতেন তাঁর স্বদেশের অবস্থার কথা, ঠিক যেমন রবিবারের বিকেলে সদর ঘরে আগত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বা আমোদ হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরের মাসের রিভিউ এর রিভিউজে দেখা যেত সেই আগন্তুকদের,কাজ ও জীবনোউদ্দেশ্য সম্বলিত চরিত্র চিত্রণ। কোন একটা বিষয় তুলে প্রকাশ করার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সেদিনের ভারতীয় আন্দোলনের পাঠানোর চিঠির উপর তিনি প্রবেশ করে, সেই প্রদেশ বা জেলার জনসাধারণের মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ তথ্য প্রকাশ করে চলতেন। তিনি আমেরিকান রিভিউ অব রিভিউজের ও অস্ট্রেলিয়ান সংস্করণের মত ভারতীয় সংস্করণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যাবতীয় ব্যবস্থা হবে ভারতীয়, মায় সম্পাদক, সাংবাদিক পর্য্যন্ত, কারণ তিনি ভারতীয় পাঠকদের পরিতুষ্ট করতে চাইলেন, প্রাচ্যদেশীয় প্রবন্ধ বা চরিত্র চিত্র বা সাক্ষাৎকার বিবরণ দিয়ে— যাতে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে নিবেদিতার।

ভারত সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর আগ্রহ। শুধু তাই নয় সহানুভূতিসম্পন্ন। সেদিন ভারত পরাধীন, কিন্তু তাঁর কাগজে ভারতীয় যথাযথরূপ নিয়মিত প্রকাশ পেতো। স্বামিজীর সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় ছিল কিন্তু তিনি ছিলেন ঘোর থিয়জফিষ্ট। স্বামিজী তা পছন্দ করতেন না। তাই তাঁকে তিনি মাঝে মাঝে হাস্য পরিহাস করতেন অথচ নিবেদিতার সঙ্গে ছিল তাঁর আমৃত্যু সংযোগ। একটি অকল্পনীয় চরিত্র। নিবেদিতা ১৯০১ সাল থেকে তাঁর পত্রিকায় লিখতেন। ১৯০২ সালে তাঁর লিখিত জগদীশচন্দ্রের 'দি রেসপনস্ অব ম্যাটার' বইয়ের উপর প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। ১৯০৩ সালে তাঁর চরিত্র চিত্র (The Star and Stain at Delhi নামে) অঙ্কন করেছেন। এই সালেই তাঁর পত্রিকার ভারতীয় সংস্করণ বার করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতার সহযোগিতায়। ১৯০৫ সালে 'সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন প্রকাশিত 'ওলিবুল সংক্রান্ত' রচনার সার সংক্ষেপ করেছেন। ১৯০৬ সালে নিবেদিতা প্রবর্তিত বিবেকানন্দ মেডালের পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা প্রকাশ করেছেন। ঐ বছরেই প্রকাশ করেছেন, স্বদেশী বিষয়ক রচনা। ১৯০৫ সালের মিঃ গোখলেকে পরিচয় পত্র দিয়ে নিবেদিতা পাঠিয়েছেন মিঃ স্টেডের কাছে। নিবেদিতা ১৯০৬ সালে ২৪শে মে মিসেস ওলিবুলকে পত্র দিয়েছেন, পার্টিশনের ব্যাপারে মিঃ স্টেড চমৎকার কাজে করছেন, নয় কি? স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ ভারতীয় পত্রপত্রিকা থেকে সংকলন করেছেন মিঃ স্টেড এবং সেগুলি এমনভাবে সাজতেন যাতে সম্পাদকের পরিপূর্ণ সহানুভূতি বর্ত্তমান। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি পাশ্চাত্যে ফিরে গেলেন নিবেদিতা। ভারতীয় আন্দোলনের সংবাদ বিদেশে উপযুক্তভাবে প্রকাশে তাঁকে সাহায্য করলেন। কিন্তু যখন জাতীয় আন্দোলনের একাংশ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার দিকে ঝুঁকলো, শান্তিবাদী মিঃ স্টেড নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। ইতিপূর্বে তিনি নিবেদিতার রচনার সংকলন করেছেন, এপ্রিল ১৯০৬ 'India a Nation. How we are digging our own grave' ১৯০৭ সালের মে মাসে 'India for the Indian', 'The Meaning of the Movement', জুলাই মাসে The Crisis In India : A Symposium of Representative Indian Opinion. Lala Lajpat Rai : A Character in Sketch. এরপর ১৯০৭ সালে মিঃ স্টেড পরমেশ্বর লালের ইণ্টারভিউর সংবাদ প্রকাশ করেন। An Indian Policy for India. : Mr. Parameshwar Lal. ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে Trouble in India, What ought to be done. The Arrival of the Bomb in India. Shall we lose India, আগস্ট: The Situation in India, The unrest in India : The people of India : Anti position, সেপ্টেম্বরে : The Birth Pangs of the Indian Nation : Symptoms of coming Labour,

Governments and Newspapers : The Indian Press Commissionership, The Situation in India. অক্টোবরে : Religious Awakening in India. ডিসেম্বরে : India seething in Sidition. ইত্যাদি।

ইনি সেই পরমেশ্বর লাল, যিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ওকাকুরা গোষ্ঠীর (১৯০২ সালে) সৃষ্ট বিপ্লবী গোষ্ঠী, যার সঙ্গে ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর নিবেদিতা একাঙ্গীভূত হয়ে মিস ম্যাকলাউড প্রদত্ত অর্থে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্ঠায় মেতে ছিলেন অন্তর্ভুক্ত হিসাবে এবং দিল্লীর দরবারী শোভাযাত্রায়, কার্জ্জনকে গুলি করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর সঙ্গে জড়িত চারুচন্দ্র দত্ত, আই সি এস, পরে ..... অরবিন্দ গোষ্ঠী ভুক্ত হয়ে পড়েন।পরমেশ্বর লালের জন্ম বিহারে, জোয়ান ও বলিষ্ঠ কিন্তু তিনি সেকাজে সমর্থ হলেন না, পিছিয়ে এলেন কার্য্যকালে। তখন দলের কাছে তিনি কাপুরুষ। কিন্তু নিবেদিতার চোখে তা প্রমাণিত হল না। স্বামিজীর দেহত্যাগ পরে, ওকাকুর সংযুক্ত দলের দক্ষতা তাঁকে বীতস্পৃহ করে তুললো এবং কয়েক মাসের মধ্যে স্বয়ং গুরু আবির্ভূত হলেন তাঁর মনজগতে। বুঝতে সমর্থ হলেন, গুরুর ইচ্ছা। তা কার্য্যকরী করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে ইচ্ছা পূরণে। ব্রত নিলেন: জাতীয়তার ভিদ পত্তনের। জাতি না জাগলে, দলবদ্ধ না হলে, দু-একজনের বিপ্লব-প্রচেষ্টা, কোনদিন সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বর লালের মধ্যে কর্ম্মকুশলতা, তিনি লক্ষ্য কবে ছিলেন; তাকে সফলকামী করার উদ্দেশ্যে, বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। মিঃ ম্যাকলাউডকে ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে লিখলেন :

তোমাকে জানানো উচিত যে, ঠিক এখন লণ্ডনে আমার দলের একটি চমৎকার মানুষ রয়েছে — নাম পরমেশ্বর লাল। বেশী শীতের সময়ে সে ফ্রান্সে বা আরও দক্ষিণাঞ্চলে কাটাতে ইচ্ছুক। সেজন্য মঁসিয়ে নোবেলের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি দিয়েছি। তার সঙ্গে যদি তুমি লণ্ডনে দেখা করো, কৃতজ্ঞ হব। আমার মা, যেকোন সময়ে তার সন্ধান তোমাকে দিতে পারবে।

এই পরমেশ্বরলাল মিঃ পি. মিত্রের অন্তরঙ্গ। লণ্ডন থেকে নিবেদিতাকে চিঠি দিলেন : আপনার পত্রের জন্য অজস্র ধন্যবাদ — ২১শে অক্টোবর ১৯০৪।

'যতদিন না যথেষ্ট সময় পেয়ে ঠিক কী বলব নির্দ্ধারণ করতে পারি, ততদিন আপনার পত্রের পুরো উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না' বলেই মনে হয়। বর্ত্তমানে আমি আপনাকে কেবল অর্ধাংশ বুঝতে পেরেছি। তাও পেরেছি কি? সংবাদের জন্য ধন্যবাদ। জেনে আনন্দিত যে (ভারতে), শিল্প জাগরণ সত্যই হয়েছে তা। কেবল বাইরের হৈ-চৈ নয়। ইউনিভার্সিটি বিল, শিক্ষার উপরে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার কোন ভয় নেই। এই ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল একটা ব্যবস্থা, সেইসঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটিতে ভোটাধিকার হরণ— এরা আমার জানা, অন্য যে কোন কারণ অপেক্ষা, অধিক পরিমাণে সমাগত ভয়ানক বিপদ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ও উদ্বোধিত করে তুলবে। মন্দ থেকেই শুভোর জন্ম — শিব! মৃত্যু ও জীবন উভয়েরই দেবতা তিনি। ...আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, একদিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও আপনার বিরাট আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ -- আমারই গুরু। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, একেবারে আশাহীন ছিল আমার জীবন। আপনি আশা দিয়েছেন — আমার নৈরাশ্য কিছুটা দূরীভূত এখন। এবিষয়ে আপনি যা বলেছেন, তা খুবই সত্য। মিঃ পি মিত্রের অসুস্থতার সংবাদে আমি দুঃখিত। আশা করি, এরপরে যখন চিঠি লিখবেন, তার মধ্যে ওঁর বিষয়ে ভালো সংবাদ দেবেন। মিস সরলা ঘোষালের অ্যাথেলেটিক ক্লাবের কোন অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানাবেন কি? শুনলাম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উপলক্ষে, অন্তঃপ্রাদেশিক স্পোর্টস সংগঠনের অভিপ্রায় তাঁর আছে। তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা কি রকম?

পরমেশ্বর লাল সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউডকে চিঠি দিলেন ২৬শে জানুয়ারী ১৯০৫।

....তোমার কাছে পরমেশ্বর লাল নিজেকে মেলে ধরুক। এটা আমার ইচ্ছা। আমার ছোট ভাই রিচ মনে করে, পরমেশ্বর লাল নেতা চরিত্রের। বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় রক্তে তার জন্ম। সে, যেন তোমাকে তার পিতামহের কাহিনী শোনায়। কিন্তু সে আবার অনেক সামরিক ব্যক্তির মত, মতামতের ক্ষেত্রে ক্ষিপ্র ও সংকীর্ণ। এ ধরণের লোক প্রশাসনিক কাজের জন্যই জাত। মননগত বিচার বিশ্লেষণের জন্য নয়। এরা অন্যের মতের কাছে, আত্মসমর্পণ করতে নির্দ্ধারিত। ভারতের প্রয়োজনঃ এক নতুন ধরণের মনঃপ্রকৃতি। সেটা এলেই তার প্রযুক্তি-কার্য্য, নিরাপদ হতে পারবে। সেই প্রকার মন এসে গেলে, — কাজ সঙ্গে না এসে পারবে না। তবে এসব বিষয় বুঝবার সামর্থ অর্জ্জন করতে হলে, পরমেশ্বর লালকে আরও অনেক পরিণতও হবে। তার অসামর্থ্য হাত বর্ত্তমানে আরও জটিল ধরণের। যেহেতু তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কেবল আইনজীবি হিসাবেই— আর তা মানুষকে পৌরুষ লাভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে ফেলে। তুমি বলেছঃ সে আমার অনুগত। শুনে আমি খুশি। সে আরও অনুগত হোক — হবে কি? এই তার একমাত্র সুযোগ। আমি চাইঃ সে খাতে ঢুকে পড়ুক — একই রক্তধারায়।

১৯০৭ সালে ভারতীয় সমাজে তিনি বিশিষ্ট চরিত্র। ইনি লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। স্থির মস্তিষ্ক। চতুর ব্যারিষ্টার। মর্লে, তখন ভারতে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। প্রথম দিকে, এ প্রস্তাবটি ছিল উদার চরিত্রের।

১৯০৫ সালে মিঃ মর্লে ভারত সচিব। ভাইসরয় মিঃ কার্জ্জন ফিরে যাওয়ার পর ভাইসরয় হয়েছেন মিন্টো। প্রথম জীবনে, মিঃ মর্লে উদার চরিত্রের লোক। কিন্তু ভারত সচিব হওয়ার পর, তাঁর সেই উদারনৈতিক চরিত্র নিঃশেষিত। নির্বেদিতার মতেঃ এটা তাঁর স্বেচ্ছাপরাজয়। তিনি মিঃ বার্কের ভক্ত কিন্তু চরিত্রে মিঃ ক্রমওয়েলীয়। আর মিঃ মিন্টো, প্রথম জীবনে সৈনিক পরে প্রশাসক। তিনি আফগান যুদ্ধ করেছেন ১৮৭৯ সালে, যদিও ১৮৭৭ সালে তুরস্কের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত। মিশর অভিযানে গিয়েছিলেন ১৮৮২ সালে। ১৮৮৫ সালে চীফ অব দি স্টাফরূপে, কানাডার বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত। অংশও নিয়েছেন। কানাডার গভর্ণর জেনারেল ১৮৯৮ সালে। ১৯০৫ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল। আর মিঃ মর্লে, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, সম্পাদক ও জীবনীকার। ভাইসরয় হিসাবে কাজের ভার নেওয়ার পর, মিভিলিয়ান রাঁ তাঁকে বোঝালেন স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে রয়েছে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সমর্থন। কার্জ্জন, কংগ্রেসের শক্তিকে উপেক্ষা করে ভেদ আনো 'শাসননীতি অনুসরণ' করেছিলেন। মিঃ মিন্টো সতর্ক হলেন। তিনি গ্রহণ করলেনঃ কংগ্রেসের মডারেট ও এক্সট্রিমিস্টদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি ও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাঁধানোর। ভেবেছিলেন, মডারেটরা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সমর্থ। সেই ধারণায় বশবর্তী হয়ে মিঃ গোখলেকে বশীভূত করে, কংগ্রেসের 'বয়কট' বিরোধিতার বানচালের চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টায়, সুরাটে মডারেট ও এসেট্রিমিষ্টদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলো।

মিঃ মর্লো সুযোগ গ্রহণ করলেন। ভাবলেন, ভারতীয়দের কিছু শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিলে — তাদের দাবী আর বেশী বাড়তে পারবে না। সে অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। মিঃ গোখলের সঙ্গে আলোচনা কবলেন, ভাইসরয় কাউন্সিলকে প্রসারিত করে ভারতীয় সদস্য গ্রহণের পরিকল্পনা করলেন। যৌথ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে, অবশ্য সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুপাতে নির্দ্ধারিত হবে। বাসনাটা শুভ হলেও, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুরোক্রেসিরা ক্রুদ্ধ হলেন। মিঃ মর্লে শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন, ভারত সরকার গড়ি মসি করতে লাগলেন। মিঃ মর্লে ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁর দম এখানেই ফুরিয়ে গেল। কারণ, মিন্টো গভর্ণমেন্টের সঙ্গে নিত্য সংঘাত।

তিনি দমননীতির বিরুদ্ধে। লেফ্‌ণ্টন্যাণ্ট গর্ভনর ফুলারকে সরাতে চাইলেন। মিঃ মিণ্টো ও ইবার্টসন আপত্তি করলেন। মিঃ মিণ্টো দমননীতির বিরোধিতা করলেন, মিঃ তিলকের কঠোর শাস্তি নিবারণের চেষ্টা চালালেন। অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাস্তির বিরুদ্ধে মিঃ মিণ্টোর বাগযুদ্ধ শুরু হল। সর্ব্বত্রই তিনি ব্যর্থ। ক্রমাগত মিঃ মিণ্টো ও বুরোক্র্যাটদের চাপ ও ইংলণ্ডের কনজারভেটিভদের বিরোধিতায় মর্লের রিফরম স্কীম শুধু ছাঁটাই হল না — প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়ালো, মুসলমান নেতাদের অযৌক্তিক দাবীর কাছে নতি স্বীকার করায়। প্রথম দিকে মিঃ কার্জ্জন ও ফুলারের চেষ্টা ছিল, মিঃ মিণ্টো ও মিঃ হেয়ার সেই একই নীতি অনুসরণ করে চলুন, মিঃ মর্লের যৌথ নির্ব্বাচন বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। অক্টোবর ১৯০৬ সালে বুরোক্র্যাটদের প্ররোচনাতেই মিঃ মিণ্টোর কাছে ডেপুটেশনে গেলেন: মুসলমান সম্প্রদায়। মিঃ হেয়ারের অভিমত : "ভারতে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনই প্ররোচিত।" মিঃ মিণ্টো মুসলমান প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণরদের সহযোগে যৌথ নির্ব্বাচন প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। আর সে কাজে সহায়তা পেলেন মিঃ মিণ্টো ও কনজারভেটিভ বন্ধুদের কাছ থেকে। তাঁদের উস্কানিতে দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী মিঃ আমীর আলির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল হাজির হলেন ইংলণ্ডে, মিঃ মর্লের কাছে। তিনি (মিঃ মর্লে) আমীর আলির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ আনলেন না বরং সাম্প্রদায়িক মুসলমান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাটদের দাবি মেনে নিলেন। সেই দাবী ক্রমে বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছালো, রক্ষণশীল মিঃ মিণ্টো পর্য্যন্ত অস্বস্তিতে পড়লেন। মিঃ মর্লে, স্থির করেছিলেন ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান সম্প্রদায় পাবেন ১৪ শতাংশ আসন। সেখানে, ৪০ ভাগের বেশী আসনেও তাঁদের সন্তুষ্ট রাখা গেল না। নির্ব্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্রেও তাঁদের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হল : আরও ঠিক হল হিন্দুদের টাকা সম্পত্তি যেখানে ২০০০০ হাজার, তারাই ভোট দানের অধিকারী হবেন — অর্থাৎ তাঁরাই হবেন ভোটার, দিতে পারবেন ভোট। আর মুসলমানরা ৫০০০ হাজার টাকার সম্পত্তির অধিকারী হলেই, তাঁরাই হবেন ভোটার বা ভোট দানের অধিকারী। সরকারী নাটিফিকেশনও হবে সেই অনুপাতে।

নিবেদিতার কাছে মিন্টোর চরিত্র বোধগম্য। তিনিই নিপীড়নের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী কিন্তু এত নন, কারণ মিঃ মর্লে ভঙ্গিপ্রধান রাজনীতিক। উদারতার আচ্ছাদনে তাঁর চোয়াল, ভারত-বিরোধী-কঠিন। ইনি যখন ভারতসচিব হবেন স্থির হয়েছিল, সেই ২৮ ডিসেম্বর ১৯০৪ সালে লিখেছিলেন: মিস ম্যাকলাউডকে : জন মর্লের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার নিয়ে গোড়ায় বেশ উন্মাদনা বোধ করেছিলুম। পরে মনে পড়লো, কে যেন আমায় বলেছিলেন— উনি ভারতের ব্যাপারে চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। লর্ড-জর্জ হ্যামিল্টনের মতই তিনি মন্দ ভারতসচিব হবেন কিংবা মন্দতর। আমি কখনও শুনিনি, উনি দৃঢ় বিশ্বাসের মানুষ। যে মহান মানুষটি লোকান্তরিত হয়েছেন সেই গ্লাডস্টোনের শিষ্যত্ব করার জন্য, ইনি তরুণ বয়সে অনাড়ম্বর সত্যান্বেষী ছিলেন মাত্র!

পরমেশ্বর পাল তখন ভারতে ফেরার পথে। তিনি মিঃ স্টেডের কাছে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করলেন। সেটি জুলাই ১৯০৭ রিভিউ অব রিভিউজে প্রকাশ পেল। দেখা গেল: পরমেশ্বরলালের চড়া মডারেটী ভঙ্গী। মি: মর্লের সমালোচনায় বললেন, প্রথমে প্রস্তাবটি ছিল উদার। এরপর তিনি যেন তাঁর প্রস্তাবটি গুটিয়ে নিতে চাইছেন। তবে এ প্রস্তাব ভারতের মেনে নেওয়া উচিত।

নিবেদিতাও চাইলেন: নেই মামার চেয়ে, কানা মামা ভাল। প্রস্তাব যখন এসেছে মানলে ক্ষতি কি? তবে তিনি আশাবাদী নন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চেহারাকে তিনি চেনেন— শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা কি দাঁড়ায় পর্য্যবেক্ষণের প্রতীক্ষা করা উচিত।

মিঃ নেভিসমন বিলেতে ফিরে গিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় খোলাখুলি ভারতের রাজনৈতিক অধিকার দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানালেন।

অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিপিনচন্দ্রের মত বিপজনক ব্যক্তি। ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবশালী নেতা, আইনজিবী, স্বদেশী আন্দোলনে ধৃত বা বিচারাধীন ব্যক্তিদের স্বপক্ষে লড়াই করেছেন আদালতে। তিনিও রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে আদালতের ক্ষমা প্রার্থনা করে ১৯০৭ সালের নভেম্বরে রাজদ্রোহীর অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে এলেন। ১২ই নভেম্বর ১৯০৭ নবশক্তি লিখলো : ইনি কি সেই অশ্বিনীবাবু! ধর্ম্মঘটী প্রেস কর্মচারীদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মত সাহায্য চেয়ে ফিরেছেন! একদিন বার্ন কোম্পানীর ধর্ম্মঘট সফল করিয়ে ছিলেন! এঁর এবং ট্রেড ইউনিয়ানে উৎসাহী অন্য নেতাদের পশ্চাৎ অপসরণ, বাংলার স্বদেশী আন্দোলণের রাজনৈতিক দিকটি দুর্ব্বল করেদিল।

১৯০৭ সালের ২৪ শে নভেম্বর সাম্রাজ্যবাদী "ন্যাশন্যালে" বেরুলো :

"It never occured to anybody to question the Complete accuracy of Maculays Contemptuous openion of the people of Lower gaeges Vellay and when the Late Mr. G.W. Steevens said that the Bengali had the leg of Slave, the Bengalis raved out the onlookers nodded acquiescence. Recent events in Eastern Bengal, have shown beyond doubt that the Bengali has perhapes only of late devoloped for more Capacity for active offence than he has been credited hetherto. A crowd of Bengalis can now give considerable trouble if they like and their agile intellects suggest plenty of appropriate methods.

সেই সঙ্গে আরও যুক্ত করলো — চন্দননগর ও অন্যান্য স্থান থেকে অস্ত্র খরিদের উৎসাহও বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

মারাটা উক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করে বললো : এক বছর আগে লণ্ডন স্পেকটেটর যখন বাঙালীদের বিরুদ্ধে ঘৃণাসূচক উক্তি করেছিল, তখন আমরা বলেছিলাম, বাঙালীদের পিছনে সামরিকতার ঐতিহ্য না থাকতে পারে, কিন্তু তারা বর্ত্তমাণে কর্ম্মের দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য, এ ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশ গত ১২ মাসের ঘটনাবলী আমাদের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করেছে।

৫ই ডিসেম্বর ১৯০৭, সিমলায় ভাইসরয় লেজিসলেটিভ কাউন্সলে "সিডিসাস মিটিংস বিল" আলোচনার সময় মিঃ গোখলে বললেন : সরকার এখন এই সকল প্রচণ্ড দমন অধিকার গ্রহণ করলেন। আমি সবিনয়ে লর্ড বাহাদুরকে বলতে চাই — এই সকল ক্ষমতা তুলে রাখুন, এখুনি তার ব্যাপক ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না, বাংলাকে ঠাণ্ডা করুন। গণ্ডগোলের মূল, এখানেই। পার্টিশনের ব্যাপারে বাংলা যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হচ্ছে, ততক্ষণ যথার্থ শান্তি আসবে না। কেবল বাংলায় নয়, ভারতের অপরাপর প্রদেশেও। এদেশের জনজীবনের সকল ধারাই বাংলার পার্টিশান থেকে উদ্ভূত, তিক্ততার দ্বারা বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমি বাঙালী নই, তাই কিছুটা খোলাখুলিই এ সব কথা বলতে পারছি, আমার কথা ভুল বোঝার সম্ভাবনাও কম। সারা ভারতের সবচেয়ে ভাবপ্রবণ মানুষ বাঙালীরা, তারা ঐহিক ব্যাপারে ক্ষতি শীঘ্র ভুলে যায়— কিন্তু অনুভূতির উপর আঘাতকে ভোলে না। এখন এই পাটিশান ব্যাপারটি, যার ভালমন্দ দিক নিয়ে, এখানে কথা তুলতে আগ্রহী নই— নিঃসন্দেহে বাঙালীর গভীর অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারা অনুভব করছে, তাদের

পদদলিত করা হয়েছে, আর যতক্ষণ তারা এইরকম ভাববে, ততক্ষণ শান্তি আসবে না। ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্গে তাদের বিশেষ রকম শত্রুতার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, প্রতিদিন অবস্থার অবনতি ঘটছে, সাম্প্রতিক গণ্ডগোলের সময়ে ভুক্তভোগীরা মিঃ ওয়াটসনের কাছে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে — বাংলায় যে পরিবর্ত্তন এসেছে, সে সর্ম্পকে এটি একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। সরকার দমননীতির দ্বারা এই পরিবর্ত্তনের মোকাবোলা করতে চান। বাঙালীদের যতটুকু আমি জানি, তদনুযায়ী, এই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি, পাশব বলে তাদের নত করা যাবে না।

বাঙালীরা নানাদিক দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অসাধারণ জাতি। কিন্তু তাদের দোষের কথা সহজেই বলা যায়। সেগুলিতো উপরেই ভাসমান, কিন্তু তাদের আছে বিরাট গুণাবলী, যেগুলি কখনো কখনো অগোচর থেকে যায়। ভারতীয়দের সামনে যেসকল পথ উন্মুক্ত আছে, বাঙালীরা সে সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বধিক বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। সম্প্রতিককালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজসংস্কারকদের অনেকে বাঙালীদের মধ্য থেকে এসেছেন। সার্বাধিক উচ্ছলশক্তি বাগ্মী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিকদের অনেকু বাঙালী। এঁদের বিষয়ে এই ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কিছু বলবো না, কারণ এখানে ওঁরা হীনমূল্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্যের কথা ধরা যায়, সারা ভারতে, কোথায় মিলবে ডঃ জে. সি. বোস, ডাঃ পি. সি. রায়ের তুল্য বৈজ্ঞানিক, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের তূল্য আইনজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুল্য কবি? এই ধরণের সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টিতে, বাঙালী জাতি সদাসমর্থ আর এই প্রকার সামর্থ্যযুক্ত জাতিকে, আমি পুনশ্চ বলছি, বলপ্রয়োগে দমন করা যায় না। তাদের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ শারীরিক সাহস তাদের নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার থেকে মুক্ত। ঐ নিন্দাকে, বাংলার তরুণরা এমন আঁতে নিয়েছে যে, কোন কোন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের কথা বিশ্বাস করতে হলে, বলবো তারা শারীরিক সংঘর্ষ থেকে সরে তো যায়ই না, বরং তাকে খুঁজেবেড়ায়। সরকার ও বাঙালীদের মধ্যে একজনের মনেও ইংরাজদের সম্বন্ধে সহৃদয় মনোভাব থাকবে না। সরকার সেক্ষেত্রে প্রচণ্ডরকম সমস্যার সম্মুখীন হবে, কারণ বাঙালীর সংখ্যা তিন কোটি তিরিশ লক্ষ। (নবগঠিত বাংলার জনসংখ্যা), আর এই জন সমষ্টির মনে অসন্তোষকে প্রথিত করার অবিবেচনা ও বিপজ্জনকতা তখন স্বতঃস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইংলণ্ডের ডেইলি নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঘৃণিত বাঙালী' লেখার উল্লেখ করে বললেন : সে মনোভাব সংস্কারের প্রয়োজন আছে। ইংরাজের সাধারণ ধারণা : বাঙালী শান্তশিষ্ট, জড় কিংবা বাচাল, অগভীর, উৎসাহশূন্য, ইচ্ছাশক্তি শূন্য, রসবোধ শূন্য, তার কৃতজ্ঞতা নেই, দয়ামায়া নেই— সে বিচিত্র নীতিবোধের দাস, সত্য দর্শন বা সত্য কথনের অসীম অসমর্থ্য পূর্ণ পদার্থ। বাঙালীদের হীনাচতুরতা সম্বন্ধে মেকেলে বলেছেন— লম্বা প্রতিশ্রুতি, পিচ্ছিল সাফাই, যথাস্থানে মিথ্যার বুনন, ছলচাতুরী, জাল-জুয়াচ্চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য— এ সকলই নিম্নবঙ্গের লোকজনের আক্রমণ বা আত্মরক্ষার অস্ত্র। এছাড়া বাঙালীর কাপুরুষতা— মেকেলের এই ঘৃণাপূর্ণ উক্তি ও প্রতিধ্বনি পরবর্তী ইংরাজ লেখকগণের কাছে প্রচলিতও তা দীর্ঘদিন ধরে।

কেবল বাজার, আদালত বা মার্চ্চেন্ট অফিসের মানুষদের দেখে, গোটা জাতির বিচার করা উচিত নয়। বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, বহুলাংশে ইংরাজদের শাসননীতি ও শিক্ষানীতির উৎপাদন। আজ বাঙালীর সৃষ্টি গৌরব অস্বীকার করা যাবে কি ভাবে? বস্তুতঃপক্ষে সর্বাপেক্ষা মননশীল মানুষ, সর্বাপেক্ষা স্বীকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ বাঙালীজাতি। বৃটিশ ভারত বাঙালী ছাড়া কল্পনাতীত।

বৃটিশ ভারতের শাসনযন্ত্রের, দক্ষ শ্রমিক হিসাবে, বাঙালীরা মনোযোগের বস্তু হয়নি সত্য— কিন্তু নবভারতের নির্মাতা সেই বাঙালীজাতি। সাম্প্রতিক আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতে হলে, প্রথমেই আলোকপাত করতে হবে বাঙালীর উপরে।

বিরাট বিরাট আন্দোলনের জন্মভূমি, বিরাট পুরুষদের বাসভূমি, যদিও কোন কোন দিকে সে দক্ষিণ ও পশ্চিমভারত থেকে পিছিয়ে। আধুনিক ভারতের ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি, যদিও ইংরাজদের লিখিত ইতিহাসে, ইংরাজরা এদেশে কি করেছে, সে উজ্জ্বল চিত্রের বর্ণনায় মুখরিত কিন্তু আধুনিক ইতিহাস যখন রচিত হবে, সদ্য শেষ শতাব্দীর প্রচুর দৃষ্টান্ত লিখিত থাকবে : রামমোহন, কেশবচন্দ্র সেনের অতিসাহসী ধর্ম সংস্কারের নমুনা, সাক্ষাৎকার, প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, পাওয়া যাবে আটলান্টিকের উভয়দিকে, বাগ্মিতায় নবজাগ্রত ভারতের অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বিগ্রহ বিবেকানন্দকে। আরও পাওয়া যাবে সাহিত্যে, ঐশ্বর্য্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান বীর ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য পি সি রায়কে। এ তালিকা দীর্ঘ, আরও পাওয়া যাবে অনেককে!

১৯০৭ এর ডিসেম্বরের শেষে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। রাজনীতিতে ওলটপালক ঘটে গেছে। আন্দোলন চলছে জোরকদমে। তবে তার গতির পরিবর্তন হয়েছে। লাজপত রায় নির্বাসনে। বিপিন পাল কারাবন্দী। নিবেদিতা ভারত ত্যাগ করে ইয়ুরোপে ফিরে গেছেন। সেখানে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মিঃ গোখলে, মর্লে, মিন্টোর চাপে আছেন ন্যাশনালিস্ট দলকে তিনি রুখতে ফিরোজ শা মেটা গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রিত হচ্ছেন। সন্দেহের চোখে তাঁকে, দেখতে শুরু করেছে সরকার। তাঁর আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। তবুও বামপন্থীর দল, যাঁরা তখন ন্যাশান্যালিস্ট বলে পরিচিত, তাঁরা এককাট্টা হলেন। চলছে চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক মতের প্রচার। ফলে, গুপ্ত সমিতি রুখে দাঁড়ালো, বৈপ্লবিক হত্যার চেষ্টা শুরু হল, সাফল্যও দেখা গেল কোন কোন ক্ষেত্রে। সরকারেরও রুদ্র দমননীতির রোলার চালালেন। নির্বিবাদে চললো কারাদণ্ড, নির্বাসন ও প্রাণদণ্ড। কংগ্রেস প্রায় দ্বিধা বিভক্তের সম্মুখীন। বাংলার ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার প্রচেষ্টা হল। ৫ই জানুয়ারি ১৯০৮-এর আগে 'কংগ্রেস প্রায় দ্বিধাবিভক্তের সম্মুখীন'। ১৯০৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর নিবেদিতা মিঃ র‍্যাটক্লিফকে কিভাবে আন্দোলণের কাহিনী লিখতে হবে জানালেন : আমার মত তুমি জানো কার্জ্জনের এডুকেশন বিল, মূল কাজটা আরম্ভ করেছে, তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতা, চেতনা জাগিয়েছে। পার্টিশন, যুদ্ধ ঘোষণা করিয়েছে এবং পার্টিশন বলবৎ করার ক্ষেত্রে কার্জ্জনের নিপুণ কৌশল পরিষ্কার করে দিয়েছে, যুদ্ধের পথ।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৭ মিঃ কেয়ার হার্ডি, 'লেবার লীডার' পত্রিকায় তাঁর ভারত ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ (ময়মনসিংহ ও বরিশাল ভ্রমণের) প্রবন্ধাকারে বার করলেন : 'How 'Extremists are made'— ভারতে পুলিশী নির্যাতনই তৈরী করেছে চরমপন্থীদের। ভারতে অশান্তির কারণ ও চরিত্র এবং তা দমনে, অযৌক্তিক প্রয়াসের চিত্র তুলে ধরলেন। লণ্ডনে বক্তৃতা ও সভাতে তাঁর অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্র প্রচার করে চললেন। শেষ পর্য্যন্ত সে সব বক্তব্য, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন। রামজে ম্যাকডোনাল্ডও ভারত ভ্রমণের শেষে এই একই কাজ করলেন। এরা বৃটিশ পার্লামেন্টে ও বাইরে, ভারতে সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচার দ্বারা ইংলণ্ডে হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন।

মিঃ কেয়ার হার্ডি, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯০৮, লেবার লীড়ার পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী বার করলেন The people in East Bengal what he saw. সেটি ভারতে পুণঃ প্রকাশিত হল ১২ই জানুয়ারি ১৯০৮।

নিবেদিতা-হতাশ হলেন না। ইংলণ্ডে ভারতে কি চলছে— তাঁর দেশবাসীকে সবিশেষ জ্ঞাত করানোর চেষ্টা চালালেন। তিনি সেখানে বক্তৃতা দিয়ে চললেন। ৫ই জানুয়ারি 'এসেক্স হলে' লণ্ডন

পজিটিভিস্ট সোসাইটিতে মিঃ এস এইচ সুইনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'ফ্যামিলি এ্যাণ্ড ন্যাশন্যালিটি ইন ইণ্ডিয়া' বক্তৃতার শেষে বললেন :

The recent events at Surat, showed that in this respect of applying representative system to affairs of state, there was progress. Indian politics were becoming serious. The younger men were making it plains that they were prepared to risk even separation from elder in order to find expression for their own conviction.

৫ই জানুয়ারী ১৯০৮ এসেক্স হলে পজিভিষ্ট ইউনিভারসিটি হলে যে বক্তৃতাটি দিলেন—

সেটি ১০ই জানুয়ারি ১৯০৮ ইণ্ডিয়া কাগজ এ বেরুলো। সেটি ২৯শে জানুয়ারী ১৯০৮, অমৃতবাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত হল : The Method of self-Government in the family life of India, has not bad until recent times of a political agitation, but India is now discovering that she is a cohesive mass and the struggle to assert the fact before the world, is her true national movement. The disruption of the congress, she maintained, would be good for India, it was no use to make onlooker believe that there was a smooth surface when beneath was a volcano.

মর্ডাণ রিভিউ পত্রিকায় ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ লিখলেন : অবশ্যই আমরা অন্তর্দ্বন্দ্ব, বলপ্রয়োগ, গুণ্ডামি, অনুচিত বাধাদান, রীতিহীন পদ্ধতির কুণ্ঠিত সমর্থক বা উৎসাহী প্রচারক হই— দ্বিধাহীনভাবে সজোরে তাদের নিন্দা করছি। সুযোগ সন্ধানী শাসক বা তাঁদের বিরুদ্ধে, যারা এই ধরনের একটা সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের যোগ্য নয়, প্রমাণ করতে ব্যস্ত, আমরা তাঁদের খোলাখুলি বলছি, কিছু কিছু লোক ভায়োলেন্স সম্বন্ধে বলবার সময়ে যে ধরনের মর্মপীড়ন ও আত্মগ্লানি দেখাচ্ছে, সেটা... ভায়োলেন্স আমাদের যতটা লজ্জা দিয়েছে, তার থেকেও বেশী লজ্জাজনক। পৃথিবীর নানাস্থানে, পার্লামেন্টে, সুরাট কংগ্রেসের অনুরূপ সংঘর্ষ হয়েছে; সে সব ব্যাপার যদি ঐ দেশগুলির স্বীয় ও শাসন লাভের অধিকার নষ্ট না করে থাকে, ভারতের ক্ষেত্রেই বা তা কেন করবে? কেন আমাদের তরুণদের রক্ত টগবগ করে ফুটবে না, কেন তাদের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হবে না — যেরকম অন্য দেশে হয়? ....না—না মানুষ, মানুষই — ভারতেও। অতীব আত্মনিন্দা, দুঃখপ্রকাশ, মৃদুতা — এসকলই একেবারে মেয়েলি। এ সব যদি আন্তরিক হত তাহলে, আর যদি মৌখিক হয় — আদিখ্যেতা। চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যদি গাজুরি বা গালাগালির অভিযোগ করা হয়, তাহলে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে মিনমিনে, তাঁবেদারি এবং জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনাস্থা পোষণের অভিযোগ আনা যাবে।

মডারেট ও এক্সট্রিমিষ্ট নাম করণে আপত্তি আছে। সবাই নেশান্যালিস্ট, পদ্ধতি প্রশ্নে— মতভেদ আছে। কংগ্রেসে, দুইমত গোষ্টীর অস্তিত্ব ও স্বাধীন বিকাশের পক্ষপাতী আমরা। ন্যাশনালিষ্ট পার্টির দুই বিভাগ থাকলে, ভারতীয় জাতীয়তা আব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে দ্বিগুণ প্রসারিত করতে পারে। একরূপতার অভাব, মানে ঐক্যের অভাব নয়। বাকপটুতা, সাজানো যুক্তির চালাকি বা সাবলীল রচনাশক্তি কাউকে, ভক্তিগত হৃদয়েব অধিকারী করতে পারে না। কেবল সেবার দ্বারাই আত্মনিবেদিত দেশপ্রেমিকগণ, নেতৃত্বের শিরোভূষণ অর্জ্জন করতে পারেন।

সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনের পর অরবিন্দ পুনা গেলেন। তখন তিনি বক্তৃতা ভ্রমণে বেরিয়েছেন এবং পর পর বক্তৃতা করে চলেছেন। পুনায় বক্তৃতা দিলেন: বাংলায় নবভাবনা প্রবেশ

করেছে, পূর্ব্বে যা কদাপি সম্ভবপর হয়নি, বাঙালীরা এখন, তারই সম্পাদনে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ। জনগণ যা যথার্থই করতে ইচ্ছুক, তা সে করতে পারেই। কংগ্রেসের পূর্ব্বতন নীতি বাংলায় ব্যর্থ। তার আবেদন নীতি, কেবল নিরর্থক, তাই নয় ক্ষতিকারক। বাঙালীকে খর্ব করতে কার্জ্জন সচেষ্ট। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল, ইউনিভারসিটি অ্যাক্ট, পার্টিশন তারই ক্রমিক চেষ্টা। পার্টিশনের বিরুদ্ধে আবেদন ব্যর্থ হলে, 'স্বদেশী ও বয়কট নীতি' গৃহীত হয়েছে। প্রথমে নেতৃবৃন্দ বয়কটকে অসম্ভব বিবেচনা করলেও যখন জনগণ এগিয়ে এল, তখন তাকে গ্রহণ করতে হল।

"The Calcutta leaders however first proclaimed it (boycott) as impossible... But people did not listen to the advice. ...The current of public openion grew so strong that the leaders had ultimately to give their consent to the new movement... People ... refused to hypnotised and consider themselvs cowards. Its was Swamivivekananda who preached this doctrine to his countrymen. This was believed by the new party.

তিনি বলে চললেন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল রঙপুরে। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রস্তাবে আপত্তি জানান অনেকেই। কিন্তু টাকা এসে গেল, স্থাপিতও হল। কাপুরুষ বাঙালীর চরিত্র বদলে গেল। ভাবা হত তাঁরা খাঁটি ও নিষ্ঠাযুক্ত কাজ করতে অসমর্থ। কোন প্রকার আত্মত্যাগ করতে পারে না তারা। ধরে নেওয়া হয়েছিল ওরা কাপুরুষ। এই ভাবটি ইংরাজি সাহিত্যের অংশীভূত হয়ে গেছে। তাদের বিদ্যালয়গুলিতে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়। ফলে, বাঙালীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল — তারা অবশ্যই কাপুরুষ। তাদের পুত্রপৌত্ররা তাই হবে, কিন্তু রাজনৈতিক নাস্তিকতায় আক্রান্ত নন এমন মানুষও আছেন। তাঁরা জাতির শক্তিতে বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁদের স্থির প্রত্যয় ছিল : কাপুরুষজাতি বীরের জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ন্যাশান্যালিষ্ট ও মডারেটদের মধ্যে তফাৎ এখানেই। ন্যাশান্যালিষ্টরা দেশের মানুষের শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী আর মডারেটদের মনে সে বিশ্বাস নেই। নবভাব বাঙালী তরুণদের এমন শক্তিশালী করেছে, যাতে তারা পুলিশের আক্রমণ, সরকারের আক্রোশের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছে, জেলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি যুবক তো অভিযোগ করে বলেছে, যুগান্তরে যথেষ্ট পরিমাণে উগ্ররচনা বেরুচ্ছে না। সমগ্র ভারতের উদ্দেশ্যে আমার বাণী : আমরা যা করছি, তোমরাও তাই করো।

১৯০৮, ১৯শে জানুয়ারী তিলক বললেন, এখন পথ হল : অনুকূল সময়ের কল্পনা করা নয়, বা তার জন্য প্রতীক্ষা করা নয় — তাকেই 'সৃষ্টি' করা। সরকারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে অথচ মধ্যপন্থীতার শিকল আমাদের পিছনে টানছে। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে: আত্মশক্তিতে, ঈশ্বরে এবং জনগণের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতিতে।

নিবেদিতা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে লিখেছিলেন : ভারতবর্ষের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমত সংগঠনের প্রয়োজন। ঘটনাচক্রে, সেই কাজই তাঁর প্রধান ও অন্যতম হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল অধ্যাপক গেডিজ, অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ টি কে চেইন, বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ র‍্যাটক্লিক ও মিঃ ব্লেয়ারা তখন ইংলণ্ডে। এঁরা প্রত্যেকেই নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ।

বর্ত্তমান কাজ তাঁর দাঁড়ালো: ভারতীয় স্বার্থে, প্রতিটি বৃটিশ নরনারীকে আকৃষ্ট করা। ভারতে কি ঘটছে, কি ঘটে চলেছে তা অবগত করানো।

জার্ম্মানীতে সেন্ট মাইকেলের সামনে বাতি জ্বালিয়ে গভীর প্রার্থনা জানালেন, ভারতবর্ষ যেন স্বাধীনতা লাভ করে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতীয় আদর্শ - ভারতীয় সমস্যা, ভারতীয় নারী সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও প্রচার চালাতে লাগলেন। এছাড়া নানা পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রচার চালালেন ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিদেশী শাসকবর্গের দুর্নীতির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশে, প্রতিটি বৃটিশ নরনারীর মধ্যে ভারতের প্রতি অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি ও উদার দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হলেন। পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও পার্লামেন্টের কমনসভার কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি দল গঠন করলেন। এঁদের সহায়তায় নতুন উদ্যমে ইংলণ্ডে প্রচার চালাতে লাগলেন।

মার্চ্চ, ১৯০৮ মডার্ণ রিভিউ সংখ্যায় লিখলেন, "রিলিজম অ্যাণ্ড রিফর্ম'। চরিত্র ভিন্ন আত্মত্যাগ হয় না এবং সে, চরিত্রের মূলে বলবান করে ধর্ম্মবিশ্বাস। যতদিন আমরা স্বার্থের ভিত্তিতে, আত্মত্যাগের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করবো, ততদিন অনুগামী মিলবে। শুধু বাক্যে, কার্য্যে নয়। ঈশ্বর বিশ্বাস বিনা কেউ যথার্থ — কর্ম্মপ্রেরণা লাভ করতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর বিশ্বাস, সঞ্চারিত না করতে পারলে কদাপি [illegible] শিক্ষাদাতা আচার্য্যের ভূমিকা দিতে সমর্থ হবে না।

Character makes individuals and nations free and great..... And character is not mere passive, harmlessness is certainly not submission to evil in any forms, it is rather the active power to resist evil within oneself and without and to do something positively good. When a man is one with the power making righteousness, he is invincible, character is form of. Faith in this oneness.

৯ই মার্চ ১৯০৮, মিসেস ওলিবুল ও মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, তোমাকে গোড়ায় কোনটির বিষয়ে বলবো? 'নেচার' পত্রিকায় ৫ই মার্চ্চ কাগজপত্রে আলোচনাটি বেরিয়েছে। সেটি পড়ে মনে হবে, "শয়তানও বিশ্বাসী হয়" — অতখানি অমিত্র যখন প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। অধিকন্তু ঐ আলোচনায় ফার্ণ এবং ফুলকপির মধ্যে উদ্ভিদ স্নায়ুর আবিষ্কারের কথা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং ইতিমধ্যেই ওয়েলারের পালের বাতাস কেড়ে নেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং স্পষ্টতঃ সে কাজ করছেন তাঁরই দলের একজন যিনি আবার ভিবিশেকশনিষ্ট। এই ধরণের আলোচনা দেখিয়ে দেয় যে, পৃথিবী, ওহেন আবিস্কারকে স্বীকার করার পক্ষে এখনো প্রস্তুত নয়, এবং সেটাই সবচেয়ে মূল্যবান স্বীকৃতি। আজ আমি তা বুঝতে শিখেছি।...

ইতিমধ্যে বসু গতকাল ১১-৩০ মিঃ এর সময়ে পরীক্ষা কাজে গিয়েছিলেন। ৯-১৫ মিনিটের সময় ফিরলেন নাচতে নাচতে। অভিপ্রেত ফল সব ঘটেছে। অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে মনে হয় চূড়ান্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তা হল: সমগ্র উদ্ভিদ স্নায়ুকে বিচ্ছিন্ন না করে, তার এক প্রান্ত সাধারণ পেশীতন্ত্রীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখার পরে উন্মুক্ত তন্তুর সঙ্গে একটি সংযোগ এবং পাতার সাধারণ পেশীতন্ত্রীর সঙ্গে অপর একটি সংযোগ করে তিনি সমস্ত স্নায়ুকে উন্মুক্ত করে এক প্রান্তে সংযোগের জন্য দিতেন, কিন্তু এই জিনিসটি (এখানে পত্রের মধ্যে একটি নক্সা আঁকা ছিল)— যা কলকাতায় প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী ছিল, এই আবহাওয়ায় তার ফল শুভ হয়নি।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছ। গতকাল দিনটি উত্তম। বড়, ধন্য দিন শনিবার।...

মিসেস লেগেটের কন্যা— অ্যালবার্টাকে বলো, তার স্বামী জর্জ্জ মন্টেগু যিনি পরে লর্ড স্যাণ্ডইউচ, তাঁর তুল্য প্রিয় জিনিস আর কিছু হয় না। যখন অক্সফোর্ড থেকে ওয়ারেনের উত্তর সম্বন্ধে, তাঁর চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলাম, তখন বিজ্ঞানের মানুষটির মুখের চেহারা যদি দেখতে! বিশ্বাস করি,

জগন্মাতা এখন আমাদের কৃপা করতে আরম্ভ করেছেন। মায়ের করুণাহস্ত উত্তোলিত হচ্ছে— পদ্মের কাছে উড়ে আসছে মধুকর। কত আশা, কত আশা আমার!

৬ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের পর ৭ই মার্চ মুক্তি পেলেন বিপিন চন্দ্র পাল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ সম্পাদকীয়তে লিখলেন : ১০ই মার্চ ১৯০৮ 'ওয়েলকাম টু দি প্রফেট অব ন্যাশন্যালিজিম' "The voice of the prophet will once more be free to speak to our hearts, the voice through which God has more than once spoken, we shall remember once more that the movement for prophets, martyrs and heroes to inspire, help and lead, not for diplomats and pinchbeck Machiavels... Bipin Chandra Pal stands before India as the exponent of the spiritual force of the Movement. The welcome back today not Bipin Chandra Pal, but the speaker of a God-given massage, not the man but the voice of the Gospel of Nationalism."

২৭ মার্চ ১৯০৮ 'ফেডারেশন হল' মাঠে বিপিনচন্দ্র পালের সম্বর্ধনার ব্যবস্থার হল। ২৭শে মার্চ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'টুমরোজ মিটিং' নামে সংবাদ লিখলেন অরবিন্দ : বিপিন পাল পূর্বে বক্তৃতা করতেন, ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে; এবার বক্তৃতা করবেন স্রষ্টার কণ্ঠস্বরে। তিনি এমন একজন চিন্তাবিদ, যাঁর চিন্তাস্রোত তাঁর নিজের ভিতর থেকে নির্গত নয়। তা-- অন্তর, সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আগামীকাল জাতীয় জীবনধারা, তাঁর মহাশক্তিশালী গতিকে, পুনশ্চ লাভ করবে। বিপিনচন্দ্র পাল নামক আলোক, আবৃত হয়ে থাকায় প্রায় অন্ধকারে তাঁরা ছিলেন, অনিশ্চিত ও বিভ্রান্ত, দুর্বল হাতে ধরাছিল পতাকা, সম্মানের আসনগুলিতে উঠে বসেছিল অপ্রতীক্ষিত সমর্থকরা, কিন্তু এখন আর ভয় নেই, বিপিন চন্দ্র এসে গেছেন! হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ভুখণ্ডে, প্রেরণার লাভাস্রোত বইয়ে দিয়ে জাতীয় জীবনকে, নানা তাপমাত্রায় আঘাত করে, উৎকৃষ্ট ইস্পাতে পরিণত করতে পারেন তা সে ইস্পাতে প্রস্তুত অস্ত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ প্রভু , সারা পৃথিবীতে অজ্ঞতা ও বর্ব্বরতাকে ধ্বংস করতে পারবেন।

৭ই এপ্রিল ১৯০৮ 'দি নিউ আইডিয়াল' নামে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে অরবিন্দ লিখলেন : ঐ আদর্শ হল: ঐশ্বরিক মানবতা এবং মানবে ঈশ্বরত্ববোধ, যা সনাতন ধর্মের প্রাচীন আদর্শের বর্তমান প্রয়োগরূপ— যা ইতিপূর্বে কখনও রাজনীতি বা জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে করা হয়নি।

শ্রীযুক্ত পাল এখন এক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে বক্তৃতা করছেন, যার সংবরণে, তিনি সমর্থ নন। জনসাধারণ তাঁর কাছ থেকে, স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শুনতে চায় সেই সব পুরাতন বিষয়ে তিনি তুলনাহীন বাগ্মিতা দেখিয়েছেন, তিনি নিজেও হয়ত ঐসব বিষয়ে বলতে ইচ্ছুক, কিন্তু প্রফেটের কণ্ঠ তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রিত নয়, যে কণ্ঠ অন্যের কথা প্রফেটকে বলতেই হবে।

১৭ই এপ্রিল ১৯০৮ মিঃ কেয়ার হার্ডি, এম. পি. ও মিঃ লেভিনসন 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় যুক্তভাবে প্রকাশ করলেন 'Thier visit And Its Impression'।

৩০শে এপ্রিল ১৯০৮ মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করলেন। প্রফুল্লচাকী প্রথমে রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে, সেখানকার ছাত্রদের ব্যায়ম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ছেলেদের লাঠিখেলা, মুষ্ঠিযুদ্ধ শেখানো হত শরীর পুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। গোপন উদ্দেশ্য ছিল নির্ভীক সৈন্যবাহিনী তৈরী করা— যারা ভবিষ্যতে দেশ-মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে ও স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জনে কুণ্ঠাবোধ না করে। বারীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে তাঁকে রংপুর থেকে কলকাতা নিয়ে এলেন ছোট লাট ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি মানিকতলায় বোমা তৈরীর আড্ডায় বাস করতে থাকেন। কিংসফোর্ড তখন ম্যাজিস্ট্রেট— তিনি স্বদেশী আন্দোলনে-যুক্ত ব্যক্তি বা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে নির্বিচারে রায় দানে কঠোর শাস্তি দিয়ে চলেছেন। ফলে, গুপ্ত সমিতি তাঁকে খতম করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সহসা তাঁর পদোন্নতি ঘটলো। তিনি জজ হয়ে মজঃফরপুরে বদলি হলেন। বিপ্লবীদল তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন— পাঠানো হল প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুকে।

ক্ষুদিরামের জন্ম মেদিনীপুর শহরে। বাল্যকালে মাতৃপিতৃহীন। বড়দিদি অপরূপার কাছে মানুষ, ভগ্নীপতি অমৃতলাল রায় সরকারী চাকুরে। যখন তিনি তমলুকে, ক্ষুদিরামকে ভর্তি করা হল তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে। প্রথম শিক্ষা এখানেই কিন্তু অমৃতলাল সদর মেদিনীপুরে বদলি হওয়ায় ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন।

তখন রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু উভয়েই কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। প্রথম জীবনে রাজনারায়ণ বসু ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য ও পারশোন্যাল সেক্রেটারী ও বন্ধু। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথের উপর ব্রাহ্মধর্ম পরিচালন ও প্রচারের ভার দিয়ে চলে গেলেন ইংলণ্ডে। এরপর পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরও ইংলণ্ডে গমন করলেন। তার আগে ছেলে দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়ে, তাঁর ব্যবসাও জমিদারীর ভার অর্পণ করলেন। বিলেতে যাওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার তাঁকে নিযুক্ত করলেন। ইংলণ্ডে তিনি রাজার মত থাকতেন— তাঁর আচার ব্যবহার ছিল সত্যই রাজার মত। চাল, চলন ও ব্যয় বাহুল্যে তিনি সেখানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁকে সকলে 'প্রিন্স' নামে অভিহিত করতে লাগলেন। তিনি রাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। সহসা তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটায় দেনার দায়ে তাঁর সমস্ত স্টেট যখন বিক্রী হওয়ার পথে, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দিলেন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কাজে। কলকাতার মতই মেদিনীপুরে তখন ব্রাহ্ম আধিপত্য। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তখন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সংস্কৃতি গ্রহণে ব্যস্ত। রাজনারায়ণ বসু এখানে আসার পর বিয়ে করেন ও সস্ত্রীক বসবাস করতে থাকেন। তাঁর বড় মেয়ের সঙ্গে ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বিয়ে হল। এঁদের প্রথম পুত্র অরবিন্দ। উনি প্রথম জীবনে এখানেই মানুষ হন, পরে তাঁর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সস্ত্রীক কৃষ্ণধন ইংলণ্ডে গমন করেন। সমুদ্রে বারীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। অরবিন্দের শিক্ষার শেষ ইংলণ্ডে। ১৯৯২ সালে আই এ এস পরীক্ষা দেন, কৃতকার্য্যও হন কিন্তু অশ্বপরিচালন পরীক্ষা না দেওয়ায় সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত হন। পর বছর ১৮৯৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' বৃত্তি লাভ করেন ও বরোদা কলেজের অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করে ভারতে ফিরে আসনে। তখন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত ধর্ম প্রচার করে চলেছেন। অরবিন্দ ভারতেই স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামীজি দেহ রাখলে তাঁর শিষ্যা নিবেদিতা, তখন তাঁর 'আকাঙ্ক্ষিত জাতীয়তা তত্ত্ব' দেশে প্রবর্তনের আশায় সারাভারত ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন, বরোদার মহারাজের আমন্ত্রণে অতিথি রূপে তিনি বরোদা যাত্রা করেন। নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের পরিচয় এখানেই। স্বামীজির 'রাজযোগ' তিনি ওঁকে উপহার দিলেন।

ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন অরবিন্দ। বারীন্দ্রনাথ তখন দাদার কাছে অবস্থান করছেন। নিবেদিতার মুখে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কথা জ্ঞাত হলেন। এরপর ১৯০৩ সালের প্রথমদিকে তিনি কলকাতা এসে প্রমথ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, নিবেদিতা তখন মাদ্রাজে জাতীয়তা-তত্ত্ব প্রচারে ব্যস্ত। এর পরই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রনাথকে কলকাতায় প্রেরণ করেন।

রাজনারায়ণবাবু অবসর গ্রহণের পর বৈদ্যনাথে বসবাস শুরু করেন। জ্ঞানবাবু তখনও মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। ১৯০৩ সালে তাঁতশালা, ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন সমিতির শাখা পত্তনকালে নিবেদিতা মেদিনীপুর আসেন। পাঁচদিন অবস্থান করে বিপ্লবী সমিতিকে উদ্বুদ্ধ করার আশায় বক্তৃতা দিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য 'হিপহিপহুরে' ধ্বনি ব্যবহার করা হয়। উনি সমবেত জনতাকে বলেন, এটা ইংরাজদের আনন্দ প্রকাশ ধ্বনি— তোমাদের জাতীয় কোন ধ্বনি নেই যাতে আনন্দ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা সম্ভব? স্বামীজির 'গুরুজী কি ফতেহ' ধ্বনি আছে, সেটি আমার সঙ্গে তোমরা তিনবার জয়ধ্বনি দাও। এই বছরই কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠাকালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের মাতৃবন্দনা মন্ত্র 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হন, দেশবন্দনা ও রণধ্বনি রূপে।

রাজনারায়ণ বাবু মিঃ পি মিত্রের সঙ্গে 'স্বদেশী আন্দোলনে' যুক্ত ছিলেন। দেশপ্রীতি জ্ঞানবাবুর মধ্যেও সঞ্চারিত। তিনি শিক্ষকতাকালে ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। ছাত্রদের ফরাসী বিপ্লবের বা বিপ্লবীদের জীবনী গল্প করে শোনাতেন। এই জ্ঞানবাবুর সাহচর্যে ক্ষুদিরামের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির জাগরণ। সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন বসু) এঁর ভ্রাতা। ইনি বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্য। কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষাকালেই ক্ষুদিরাম সত্যেন বসুর সাহচর্যে আসেন। দিদি আবাস ত্যাগ করে তাঁতশালায় অবস্থান শুরু করেন। কাপড় বোনা, ব্যায়াম ও বিপ্লবীদের জীবন-পাঠে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন ছাত্রাবস্থাতেই। এসে গেল ১৯০৬ সালের বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন। ক্ষুদিরাম পিকেটিং শুরু করলেন। বিলাতী 'দ্রব্য বর্জন' ও 'বিলাতী লবন' বয়কট আন্দোলনে নদীপথে আগত বিলাতী নুনের নৌকা ডোবাতে শুরু করেন। মারাঠা কেল্লার মাঠে মেলা বসলো। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে 'সোনার বাংলা' প্রচারপত্র বিলি করার সময়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন কিন্তু ছাড়া পেয়ে গেলেন স্বল্প বয়সহেতু। সমিতির অর্থের প্রয়োজন। পোস্টাল ব্যাগ লুট করে সমিতিকে টাকা এনে দিলেন। কংসাবতীর বন্যায় গ্রামবাসীরা সর্বস্ব খোয়ালো— তাদের ত্রাণসেবায় ছুটলেন ক্ষুদিরাম। তার কাজে খুশী হলেন সমিতি, তাঁকে পাঠালেন প্রফুল্ল চাকীর সহযাত্রী করে।

মজঃফরপুরে প্রথমে উঠলেন এক পান্থশালায়। কিংসফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য। কাটলো কয়েকদিন। স্থির হল : রাত্রে ক্লাব থেকে ফেরার পথে তাঁর গাড়িতে বোমা ছুড়বেন। সেইমত কাজ হল কিন্তু কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেন— কারণ তিনি তখন ক্লাবে অবস্থান করছিলেন। তাঁর পরিবর্তে তাঁরই গাড়িতে যাত্রী হয়েছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। গাড়ীর উপর বোমা পড়লো। নিহত হলেন উভয়ে। এপাশে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন উভয়ে, বিভিন্ন পথ ধরে। প্রফুল্ল চাকী সারা রাত্রি পায়ে হেঁটে রওনা হলেন মোকামাঘাট। ধরলেন রেলগাড়ীতে। সে গাড়ীতে ছিলেন দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বেই বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। উস্কখুস্ক চেহারা দেখে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলেন নন্দলাল। পালানোর পথ না পেয়ে নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করলেন প্রফুল্ল চাকী। আর ক্ষুদিরাম। দীর্ঘপথশ্রমে ক্লান্ত, অভুক্ত ও পিপাশার্ত্ত হয়ে যখন কলে জলপানে উদ্যত— সন্দেহবশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। ইতিপূর্বে সংবাদ পেয়েছিলেন তাঁদের নিশানা ব্যর্থ। কিংসফোর্ডের পরিবর্তে নিহত হয়েছেন নিরপরাধ দুটি স্ত্রীলোক। মর্মাহত হলেন ক্ষুদিরাম।

সারা দেশ বোমা বিস্ফোরণের সংবাদে বিচলিত। শুরু হল ধরপাকড়। মজঃফরপুরে বিচার শুরু হল ক্ষুদিরামের। এপাশে মানিকতলার বিপ্লবীদের হেডকোয়ার্টারে তাল্লাসীর সংবাদ এলো। বারীন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়ে অরবিন্দ সতর্ক করেদিলেন। বললেন: সংবাদ এসেছে, আড্ডা থেকে সব মালমশলা সরিয়ে দাও। পুলিশের লোকও আগাম সংবাদ দিয়ে গেছে : কাল সকালেই বাগানবাড়ী তল্লাশী হবে। কিন্তু কোন আদেশই মানলেন না বারীন্দ্রনাথ। কাউকে খবর না দিয়ে মানিকতলার বাগানবাড়ীতে মাটির তলায় বন্দুক, রিভলবার, গুলি, সেলআদি পুঁতে ফেলতে আদেশ দিলেন।

এরপরে সদলবলে গ্রেপ্তার হবেন স্থির হল। অবশ্য বোমা ফাটার পরের দিন বারীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন উপেন্দ্রনাথ ও উল্লাসকর। পরামর্শ করে স্থির হল : সকল দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দোষ স্বীকার করবেন তাঁরা। সে সভায় উপস্থিত, বারীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, বিভূতিচরণ, ইন্দ্রনাথ নন্দী। আরও স্থির হল: হেমচন্দ্র এলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে রাজী হয় ভালই ত না হলে আর কারও নামপ্রকাশ করা হবে না। উপস্থিত হলেন হেমচন্দ্র। তিনি রাজী হলেন না বরং এই বেকুবী কাজ করতে নিষেধ করলেন। অরবিন্দকে এঁর মধ্যে জড়াতে রাজী নন বারীন্দ্রনাথ। তিনি মুক্ত থাকলে আন্দোলন চালু থাকবে। সুতরাং মরিয়া হয়ে যুক্তিখাড়া করলেন: দেশের কাছে হিরো সাজার এই তো সুযোগ! এতবড় কাণ্ড কারখানা, মাত্র এই কয়েকজনে করেছেন, গোটা দেশ উদ্ধারের আশায়। শৌর্য, বীর্য্য, ত্যাগ তপস্যার প্রতীক হওয়ার এই সুযোগ, হাতছাড়া করা উচিত হবে না। নির্বিচারে পুলিশের কাছে স্বীকারক্তি বা কনফেশন করলেন। এমনকি এর মধ্যে নরেন গোঁসাইকেও যুক্ত করলেন, কারণ তাঁকে চন্দনগরের 'মেয়র'কে হত্যা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

বারীন্দ্রনাথের খোলামেলা বিপ্লবখেলা দেখে আশঙ্কিত হলেন হেমচন্দ্র। এমনকি অরবিন্দও। বারীন্দ্রনাথকে সতর্ক হতে বললেন। হেমচন্দ্র তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। বললেন, বারীন্দ্রনাথকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন অরবিন্দ। বিপ্লবের প্রচেষ্টা কলমী শাকের ঝাড়ের মত। একটা ডগা টানলেই গোটা ঝাড়টাই টানা হয়ে আসবে— সবাই জালে জড়িয়ে পড়বে, কেউ মুক্ত থাকবে না। কোন যুক্তিই মানতে রাজী হলেন না বারীন্দ্রনাথ। অবশেষে, অরবিন্দের নাম করে বললেন : অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আমাদের পাঁচজনের দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছেন : বারীনের সঙ্গে দেখা হলে বুঝিয়ে বলো— যা কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তা যেন প্রত্যাহার করে নেয়। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে, স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনও, উচিত হবে না।

বারীন্দ্রনাথ কোন কথাই কানে তুলতে রাজী নন। হেমচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা! বললেন, বিবেচনা করে দেখ— এরকম স্বীকারোক্তি 'দেশদ্রোহিতা' বলে বিবেচিত হতে পারে।

আরও মরিয়া হয়ে বারীন্দ্রনাথ বললেন : সে স্বীকারোক্তি দিয়ে যা করেছে— তা বোঝবার ক্ষমতা মেজদার বা কোন উকিলের নেই! আমরা সব ভীরু কাপুরুষ! অরবিন্দ এসব কী বোঝে?

হেমচন্দ্র প্রশ্ন করলেন : তুমি অন্যদের নাম প্রকাশ করলে কেন?

উত্তরে বারীন্দ্রনাথ বললেন : তোমাদের মত মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নই!

উত্যক্ত হেমচন্দ্র বললেন— তোমার সব অপবাদ আমরা স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু তুমি তো জানো, তোমার মিথ্যা কথার উপরেই অনেকের মৃত্যু ঘটে গেছে! আর এতই যদি সত্যবাদী নেতা, অরবিন্দের নাম করনি কেন? অযথা নরেন গোঁসাইয়ের নাম জড়ালে কেন?

ধৃত হলেন নরেন গোঁসাই। তিনি অরবিন্দের নাম ফাঁস করে দিলেন। ধৃত হলেন অরবিন্দও? আলিপুরে বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হল।

একদিকে মজঃফুরপুরে ক্ষুদিরামের মামলা— অন্যদিকে আলিপুরে বোমাষড়যন্ত্রের মামলা। সারা দেশময় চাঞ্চল্য এমন কি ইংলণ্ডেও!

১২মে ১৯০৮ কেশরীতে একটি প্রবন্ধ বেরুলো : 'দেশের দুর্ভাগ্য'। ইতিপূর্ব্বে মিঃ তিলক, ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে লিখলেন: মজঃফরপুরে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। ফলে তোলপাড়, মানিকতলাও অন্যত্র বোমা ও অস্ত্র আবিষ্কার, বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায় গ্রেপ্তার, অরবিন্দের গ্রেপ্তার। সকলের বিচারের মামলা চমকে দিয়েছে সারাভারতবর্ষকে। মিঃ তিলক বুঝেছিলেন এর তাৎপর্য্য। মহারাষ্ট্রেও কয়েকটি সংবাদপত্রকে দমন করা হয়েছে, সম্পাদকের বিচার ও শাস্তি হয়েছে, তবুও মিঃ তিলক এগিয়ে এলেন। লিখলেন : ভারতবর্ষের মত শান্তিপ্রিয় মৃদু স্বভাব দেশ, ইউরোপের রাশিয়ার দশায় উপনীত। এই দেখে, অস্বস্তি ও দুঃখবোধ করবে না, এমন কেউ নেই। রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমরা কদাপি ভাবিনি, ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত শীঘ্র ঐ পর্যায়ে পৌছবে। আমাদের দেশের শ্বেত অমলাতন্ত্রের ঐদ্ধত্য ও বিকৃতি, এত দ্রুত আমদের তরুণদের মধ্যে এমন নৈরাশ্য বোধ জাগ্রত করছে যে, দেশের অগ্রগতি ঘটাবার জন্য তারা বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করবে, তা আমরা ভাবিনি।

কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঘৃণাবশে এই ধরনের কাজ তারা করেনি, তারা মাথামোটা পাগল নয়, তারা জানে যে, দু'একটা বোমা ছুঁড়ে ইংরাজকে তাড়ানো যাবে না, তারা ব্যক্তিস্বার্থে চালিত নয়, তারা চোর বদমাসও নয়— তারা এই পথে নেমেছে শ্বেত আমলাতন্ত্রের বেপরোয়া শক্তি মত্ততায় অতিষ্ট হয়ে। সকলেরই জানা আছে, নিহিলিস্টদের বিদ্রোহ, স্বদেশী প্রশাসকদের উৎপীড়ন ব্যবস্থায়, সেখানে যা ঘটেছে তার কারণও একই। এই দৃষ্টিতে দেখলে, বলতেই হয়— রাশিয়ার স্বদেশী প্রশাসকদের উৎপীড়ন ব্যবস্থায় সেখানে যা ঘটেছে, তাই এখানেও ঘটেছে, বিদেশী প্রশাসকদের অত্যাচারে। সবাই জানে— বৃটিশরাজ কতখানি শক্তিশালী। কিন্তু লাগামছেঁড়া ক্ষমতা ব্যবহারকারী শাসকদের এও জানা উচিত— মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে। বাংলার পার্টিশনের কথা তুলে বললেন— এর পরেও যদি দু'একজনের মাথা খারাপ না হয়ে যায়, সেটাই হবে বিস্ময়ের বস্তু। একটা বিড়ালকেও ঘরে বন্ধ করে রাখলে, সে ছাড়া পাওয়া মাত্র যে তাকে বন্ধ করে রেখেছে— তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালীরাও তো মানুষ, যত শক্তিহীনই তাদের মনে করা হোক!

একথা ঠিক, বহু বছর বিদেশী শাসনে থেকে ভারতবাসীর মন থেকে স্বাভাবিক রাগ, তাপ, তেজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই, তা শূন্য ডিগ্রিতে বরফ ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে না।

একথা নিশ্চিন্তে বা দ্বিধাশূন্য চিত্তে বলা যাবে, যে দেশে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধকে সর্বদা নির্দিষ্ট মাপে বেঁধে রাখা হয়, যেখানে চিরদাসত্বই নিয়তি।... নিজ স্বার্থেই অপরকে দাস করে, কিন্তু সেই স্বার্থেরও সীমা থাকা উচিত। শাসকরা সর্বদা ভাবে, তারা যা করে, তা ন্যায়। তাকেই অধীনস্থরা আশীর্বাদ বলে শিরধার্য করতে বাধ্য। কিন্তু অপরপক্ষে, সে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন— এই ধারণা ভারতে ক্রমবর্ধমান, আর তাতে বিচলিত শাসকরা, উৎপীড়ন বাড়িয়ে চলেছে। বিনা অভিযোগে লালা লাজপত রায়কে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। শাসকরা যদি এইপ্রকার রুশ ধরনের পদ্ধতি নিয়ে চলে, তা হলে ভারতীয় প্রজারা অংশতঃ রাশিয়ার জনগণের পদ্ধতি অনুকরণ করতে বাধ্য। কেন না— যেমন 'বপন তেমনি ফলন'। শাসকরা যদি প্রজাদের বলে : আমরা ইচ্ছামত অত্যাচার চালিয়ে যাব, বিনাবিচারে যাকে ইচ্ছা নির্বাসনে পাঠাবো, যে-কোন প্রদেশকে বিভক্ত করবো, মিটিং বন্ধ করবো, রাজদ্রোহী বলে যে কোন লোককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো, তাকে গারদে পুরবো— আর তোমাদের কাজ হল: এই সকলই নিঃশব্দে সহ্য করা, রাগ তাপকে মন থেকে বেরুতে না দেওয়া— তা হলে বুঝতে হবে, ওঁরা পৃথিবীর উদ্দেশ্য ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা

করছেন ওঁরা: মানবচরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সাহেবী কাগজগুলোর অভিযোগ : ভারতীয় নেতাদের উগ্র বক্তৃতা ও লেখার জন্য মজঃফুরপুরে এ কাণ্ড ঘটেছে। দায়ী ওঁরা নন, দায়ী হল স্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী শ্বেত আমলাতন্ত্র। তারা দিন দিন জনগণের কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।... অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাধারণতঃ দুটি উপায়ে এতাবৎ হয়েছে: আবেদনের পথ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ। তিরিশ কোটি মানুষের দেশে কিন্তু তৃতীয় কোন প্রতিবাদের পথ নেওয়ার মত মানুষ মিলবে না, একথা বললে, সেটা অবাস্তব কথা হয়ে দাঁড়ায়। আসল কথা— যত অত্যাচার করাই হোক, মজঃফরপুর ধরণের কার্যকে কখনও বন্ধ করা যাবে না। যদি না— মূল ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়।

অধিকারহীন ভারতবাসী আর স্বাধিকারে প্রমত্ত ইংরাজ। রাশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে আকৃষ্ট করে বলা চলে, নিপীড়নের দ্বারা গুপ্তহত্যা বন্ধ করা যায় না। সরকারের, সারা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আনা অন্যায়। শিক্ষিত সকল ভারতবাসীই সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নয়। তবে সরকার যেন এই শিক্ষা নেয়, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ব্যর্থতাই, কিছু যুবককে হিংসার পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে। উপায় না থাকলে, হরিণও ব্যাধকে আক্রমণ করে।

মজঃফুরপুরেরের ঘটনাকে জঘন্য বলে ঘোষণা করেই যেন আমাদের কর্তব্য শেষ না হয়। মানুষের ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌছলেই এই ধরণের কাজ করে— এটা জানাও আমাদের কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সেইসময় এসে গেছে, যখন রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নিহিলিস্ট দলের মত দল এদেশেও সৃষ্টি হবে। এই কথাগুলি আমলাতন্ত্রের কাছে মিষ্টি লাগবে না। তবুও কথাগুলো বলতে হয়েছে, বিপর্য্যয়ের দিন সমাগত। আমলাতন্ত্রকে আত্মসংশোধন করতে হবে। যদি সে কর্তব্যে, অবহেলা করা হয়, মজঃফরপুর ধরণের দুর্বিপাক অবসম্ভাবী।

কেশরীতে ১২ই মে ১৯০৮, মিঃ তিলক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন : কেউ কেউ বলছেন, স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যখন বোমা এসেছে, তখন স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত— বাংলা পার্টিশনের জন্য স্বদেশী আন্দোলন শুরু,— এক্ষেত্রে পার্টিশন রদ করলেই তো সব গণ্ডগোলের অবসান হয়। এলাহাবাদের 'পায়োনীয়ার' বলেছেন 'প্রতিটি বোমার ঘটনার জন্য, সন্দেহভাজন ২৫টি নেতাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।' এটা জনগণকে আতঙ্কিত করার একটা উপায়— সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়— এই প্রকার ব্যবস্থায় সন্ত্রাসবাদী প্রবণতা বেড়েছে বই কমেনি।

সাহেবী কাগজগুলো তীব্র বিদ্বিষ্ট প্রচার চালাতে শুরু করলো। কিছু অনুগত ভারতবাসীও সে সুরে, সুর মিলিয়ে বলতে শুরু করলেন: মিঃ তিলক প্রমুখ নেতারাও এই গুপ্তহত্যাদির কাজে সংশ্লিষ্ট। ১৯শে মে, মিঃ তিলক এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবন্ধে বললেন : ভুললে চলবে না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই বোমার জনক, আর বোমার দ্বারাই সরকারের সামরিক ক্ষমতার দর্প, নাড়া যায়। ... যখন শাসনকর্তারা অযৌক্তিকভাবে জনসাধারণকে নিতান্ত ভীতত্রস্ত করতে আরম্ভ করে, তার দ্বারা জনগণকে একেবারে বশীভূত করে রাখতে চায়! অথচ বোমার শব্দ, কর্তৃপক্ষকে এই জ্ঞান দান করে যে, যে জনগণ পূর্বতন ন্যাতাকাতা অবস্থায় শাসকদের কাছে অত্যাচার সত্ত্বেও হাতজোড় করে, দাঁড়িয়ে থাকতো, তারা এখন সেখান থেকে উর্দ্ধতর অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

মজঃফরপুরে আরম্ভ হয়ে গেছে ক্ষুদিরামের বিচার। এপাশে আলিপুরে শুরু হয়েছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচার। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস এগিয়ে এলেন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে

সওয়াল করতে। ধরপাকড় তখনও চলছে সমানে। ইতিমধ্যে নরেন গোঁসাইকে সরকার রাজসাক্ষী দাঁড় করিয়েছেন, আদালতে অভিযোগ প্রমাণের জন্য। বিচারে, অরবিন্দের শাস্তি অবধারিত। বারীন্দ্রনাথ প্রমুখের ফাঁসি আটকানো সম্ভব নয়। সর্বত্রই চাপা উত্তেজনা— বিরাজ করছে থমথমে ভাব, সরকারী মহলের দাপাদাপি হুঙ্কার ও বজ্রনিনাদ: বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন? এতবড় হটকারীতা! যত সব নষ্টামি! ধুলিসাৎ করতেই হবে! যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায়নি, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ! গুঁড়ো করে দাও সে হাত। এটা সাহেবী কাগজের দাবী নয়— অনুগত এদেশীয় রাজভক্তদেরও!

নিবেদিতার বন্ধু মিঃ কেয়ার হার্ডি, 'নিউ ক্যাসল' পত্রিকায় লিখলেন The Indian police as agents provocations ও ২৮শে মে ১৯০৮, 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখলেন The regime of repression'

৩১শে মে ১৯০৮ পাঞ্জাবী পত্রিকায় থেকে 'বর্তমান রণনীতি'র উপর আলোচনায় উদ্ধৃত করলো 'মারাঠা'। প্রশ্ন তুললো : বাংলায় যে নিহিলিষ্ট আন্দোলন, পুলিশ সদ্য আবিষ্কার করেছে, তার সঙ্গে কি বইটির কোন সম্পর্ক আছে? সম্পর্ক আছে বলেই সন্দেহ করেছিল— কারণ বইটিতে গোরিলা যুদ্ধের কথা উত্থাপনা ছিল এবং অসাধারণ উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বইটির কেন্দ্রীয় দর্শন: যুদ্ধ সৃষ্টির, ধ্বংস সৃষ্টির দর্শন। দেহের কোন অংশ পচে গেলে যেমন তাকে বাদ দিতে হয়, তেমনি পরাধীনতায় পচে যাওয়া দেশের মধ্যে, বৈপ্লবিক আঘাত না আনলে জাতির প্রাণশক্তি ফিরবে না। বইটি প্রকাশনের কি উদ্দেশ্য ভূমিকায় বলা হয়েছিল।

The people of India have been disarmed under the order of the king. For self protection the alien king has deprived a whole people of arms, lest the people, being oppressed should overthrow the king. The Sikhs, Mahrattas, Rajputs, and Telangis are admitted into the army and obtain a little training in war tactics. But intelligent Bengalis and the Brahmins of Poona can not carry even long sticks for self protections, for should the intellect and the strength of arms combine, who can say for a certainty that such combination will not result in an end of the British Rule? The faint hearted king may have established an unjust law. And because of this, should the Bengalis eight millions strong and the Mahratta, Rajputs and other various warlike races over two hundred millions remain as beasts? What if we have opportunity of learning war like tactics, how to drill and march, openly and by fair means? If the Bengalis should take upon themselves the task of training in this direction ...they can get grounded in the secrets of science of war. It is to lay the formation of this new training that the book is published.

৯ই জুন ১৯০৮ বেরুল তিলকের আরও একটি প্রবন্ধ। বেরুলো : 'এ সকল প্রতিবিধান ব্যবস্থা স্থায়ী হবে না।'

সরকারের ঘাড়ে শয়তান চড়েছে, তাই নূতন উৎপীড়ন ব্যবস্থা এসেছে— সভা নিষেধ, সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ, বিস্ফোরক আইনের পরিবর্তন ইত্যাদি। সরকারের দমননীতি এদেশের

অতীতের অর্জিত স্বাধীনতাগুলি কেড়ে নিচ্ছে। আগে ছিল বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, এখন তার কিছু চিহ্ন নেই। সরকারের বুদ্ধি ভ্রান্তি হয়েছে— তা সর্বনাশ সম্যুৎপাত করবে।... বাঙালীর বোমার পিছনে রয়েছে, দেশপ্রেমের আতিশয্য।... বাঙালীরা অহেতুক উন্মত্ততায় সমাজ ধ্বংস করবার জন্য বোমা ফেলেনি। বাংলার বোমার পিছনে রয়েছে দেশপ্রেমের আতিশয্য।...

বাঙালী নৈরাজ্যবাদী নয়। তারা কেবল নৈরাজ্যবাদীদের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। পর্তুগালে বা রাশিয়ায় বোমার দ্বারা যে শাসন সংস্কার সম্ভব হয়েছে, বাঙালীর বোমা একই উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। শাসন সংস্কার হলেই তবে বোমা থামবে। সাধারণতঃ খাঁচার পাখীকে, দানাপানি দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, ভারত সরকার কিন্তু কেবল খাঁচার দরজা বন্ধ করে দেয়নি, একই সঙ্গে তাঁর পাখা টেনে ছিঁড়ছেন, পা ভেঙে দিয়েছেন, পাছে খাঁচা থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। ইউরোপের অতিবড় স্বৈরাচারী দেশও তা করেনি। এমন কি মুঘলরাও করেনি। জনগণের হাতে হালকা অস্ত্র থাকলে, তার দ্বারা শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে পরাভূত করবে— হাস্যকর এই কথা সাম্রাজ্যবাদীরাও ভাবে না, তবে ওকাজ তারা করছে কেন?

অস্ত্র আইনের দ্বারা ভারতবাসীর পৌরুষকে হত্যা করে, তাদের এমন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে ক্ষুদে শাসকরাও বিনাদ্বিধায় স্বার্থপর শাসন চালিয়ে যেতে পারে এবং জনগণ 'স্বরাজের' অধিকার দাবী করতে না পারে। মুঘল শাসন কি সামরিক শক্তিতে, কি ঐদার্য্যের মহত্ত্বে, ইংরাজ শাসনের চেয়েও অনেক বড় ছিল? তারা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দেখালেও, শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বহুলাংশে— হিন্দুদের কাছে হস্তান্তরিত করেছিল এবং তারা ভারত থেকে অর্থ লুট করে স্বদেশে পাঠাতো না। লুণ্ঠক ইংরাজ, তেমন কোন ঔদার্য্য দেখায়নি। বোমা না ফাটালে সরকার বুঝতেই পারতো না, তার স্বৈরাচার কতখানি অস্থির করেছে। এর আগে পর্যন্ত নিরস্ত্র মানুষ, নীচুগলায় কাতর প্রার্থণাই কেবল জানিয়ে গেছে। বোমা সরকারের সামরিক শক্তির দর্পে ঘা দিয়েছে। যদি মুঘলদের মত, ইংরাজরা, জনগণের মধ্যে শাসন ক্ষমতা বন্টন করে না দেয়, তাহলে তার ভাগ্যে অশান্তি আছে। বোমা তো বন্দুক জাতীয় অস্ত্র নয়— তাঁর উৎপাদন বা বন্টন আইনের দ্বারা বন্ধ করা যাবে! তার নির্মাণ কৌশল সহজ, তা বিজ্ঞানের কল্যাণে, অনেকেরই জানা হয়ে গেছে। বারীন্দ্রের বোমার কারখানায়, কয়েকটি জালা ও বোতল ছাড়া কিছু ছিল না, কিন্তু সরকারী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন: সরকারের বড় বোমা কারখানার মতই নিখুঁত ছিল এই ছোট কারখানাটি।

সরকারের কঠোর নিপীড়ন ব্যবস্থা যদি বহাল থাকে, তাহলে, বোমা বাংলার কুহকভূমি থেকে সারা, ভারতে ছড়াতে আর কতদিন বা লাগবে?

বোমা বস্তুটি যখন কিছু বিজ্ঞান জানা মানুষের কাছে খেলনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে বিস্ফোরক আইনে, বোমাকে আটকানো যাবে কি? আইনটি যে, ভাল লোকের উপর, পুলিশী উৎপীড়নের হাতিয়ার হয়ে উঠবে!

বোমা বন্ধের যথার্থ স্থায়ী ব্যবস্থা হল জনগণের হাতে: স্বরাজের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তুলে দেবার ব্যবস্থা শুরু করা।

নিবেদিতার প্রবন্ধ মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত হল : 'দি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন'। তিনি লিখলেন : কাপুরুষ বলে ধিকৃত বাঙালীরা, অকস্মাৎ ঐ ধরণের বেপরোয়া কাজে কেন লিপ্ত হল? বাঙালী ও আইরিশ মানসিকতার তুলনা করলেন : সেইসঙ্গে ভারতের প্রশ্নে মর্লের অনড় মনোভাব সম্পর্কে বললেন, এ বস্তু বিসমার্কের মনোভাবের তুল্য! ওঁরা জার্মানির লৌহ রাজকুমার বিসমার্কের মতই বিশ্বাস করেন--- রাজনীতির সঙ্গে অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। আরও বিশ্বাস করেন--- ভারতের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক নিছক রাজনৈতিক— অর্থনৈতিক শোষণের জন্য তা

স্থাপিত, কিংবা সেরূপ কী, যা বলতে পারেন : সাম্রাজ্য— ভারত লুণ্ঠনের জন্য কৃত। ...অবশ্য আমাদের বর্তমান ভারত সচিব দি অনারেবল ভাইকাউন্ট মর্লে অব ব্ল্যাকবার্ণ— যিনি একদা 'সাধু'জন নামে পরিচিত ছিলেন— তিনি অবশ্যই ভারতে, ইংলণ্ডের রাজশাসনের ব্যর্থতার কারণ অন্বেষণে প্রয়াসী হবেন না, কিংবা তার প্রতীকারের যথার্থ চেষ্টাও করবেন না। তাঁর কাছে যদি ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যর্থকাণ্ড হয়, তবু তা 'সেট্‌ল্ড ফ্যাক্ট'।

মর্লের ১৮৮৫ সালে লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলেন : ইনি শিক্ষিত ভারতবাসীকে ইংলণ্ডের শত্রু বলে বিবেচনা করেন। ওঁর মত হল— 'পার্লামেন্ট বা পার্লামেন্টরি কমিটি, ভারতের মঙ্গল করার ব্যাপারে অকেজো ও অর্থহীন। পরিস্থিতি যখন এই — 'রাজহস্তে ভারত শাসন হস্তান্তরের পর থেকে প্রতিবৎসরের ভারতের অবস্থা যখন মন্দ থেকে মন্দতর, ইংলণ্ডে, ভারতীয় সমস্যা কোন আগ্রহ সৃষ্টি করে না। ভারতের এই অপশাসনের একমাত্র প্রতিকার— স্বরাজ বা হোমরুল'।

নিবেদিতা তাঁর ইংলণ্ডে অবস্থানকালে স্বদেশী আন্দোলনে দুটি ব্যক্তির সহযোগিতা পেয়েছিলেন একান্তে। 'র‍্যাটক্লিফ ও মিঃ ফেডারিক ম্যাককারনেস'। এঁরা ভারতের পুলিশী অত্যাচারের ঘটনা প্রচার করেছেন এবং ইংলণ্ডে হৈ চৈ বাঁধাতে সহযোগিতা করে গেছেন। মিঃ মর্লের ভারত সফরকালে ভারতে ইংরাজ অপশাসনের বিরুদ্ধেলড়াই চালিয়েছেন। কারণ তখন ভারতে চলছে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, পুলিশী উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্য ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিয়া সিভিল রাইটস' কমিটি গঠন করেন। তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন মিঃ ম্যাককারনেস, অন্যতম সেক্রেটারি হলেন মিঃ র‍্যাটক্লিক। যেখানে অন্যায়, নির্ভয়ে তার প্রতিবাদ— এইছিল মিঃ ম্যাককারনেসের চরিত্র। প্রশাসনিক দমনের কাজ ও উৎপীড়নের প্রশ্নে, সরকারকে আক্রমণের সেনাপত্য ছিল এঁর। এ ভূমিকার জন্য 'ক্রীশ্চান কমনওয়েলথ' পত্রিকায় বেরুলো 'ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের পক্ষে পার্লামেন্টে নিউবেরীর সদস্য ফ্রেডারিক কোলরিজ ম্যাককারনেস অপেক্ষা আর কোন কণ্ঠ নিনাদিত হয়নি। নিজ দলের হুইপ ও নেতাদের অসন্তোষ ভাজন হবার ঝুঁকিও নিয়েছেন তিনি।'

সরকার মিঃ তিলককে শায়েস্তা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। এবার, তাঁকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলেন। বাংলার আন্দোলনের পিছনে সর্বভারতীয় শক্তি নিয়োগে যুক্ত তিনি। কংগ্রেসের বামপন্থী দলের মুখ্যনেতা তিনি। মডারেটদের প্রভাব খর্ব করতে সচেষ্ট, অসাধারণ তাঁর দৃঢ়তা। সেইসঙ্গে বাস্তববোধে সমৃদ্ধ তাঁর নেতৃত্বশক্তি। এমন যে ব্যক্তি, তাকে ঠাণ্ডা করতে একটা ছুতো চাই। হাতে পাওয়া গেল তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ। উল্লাসিত হলেন সরকার।

অসাধারণ শক্তিশালী চরমপন্থী লেখক, যিনি মহারাষ্ট্রে 'বিপ্লবের প্রফেট'— সেই অধ্যাপক শিবরাম পরাঞ্জপে— 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক। সরকারের কাছে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন সরকার বোম্বাই'-এ। মিঃ তিলক, এই মামলা তদবিরের জন্য পুণা থেকে বোম্বাই এলেন। এর আগে সরকার তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন : পুণায় যেন তিনি তাঁর কাজের সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে বোম্বাই আসেন, এখানে এলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

বন্ধুরা তাঁকে সতর্ক হতে বললেন। তিনি হাসলেন। বললেন— কি আর ব্যবস্থা করবো! ট্রেঞ্চ খুঁজবো, না সৈন্য সাজাবো— যাতে দুর্গ রক্ষা করতে পারি। সারা দেশকেই তো সরকার কারাগারে পরিণত করেছেন। সকলেই আমরা বন্দী। নতুন করে বন্দী হওয়া মানে, বড় খাঁচা থেকে ছোট খাঁচায় ঢুকে পড়া।

তিনি বোম্বাই এলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ২৩শে জুন ১৯০৮ গ্রেপ্তারের পরোয়ানা সই হল কিন্তু সারাদিন জারি করা হল না। সন্ধ্যা ৬টায় সেটি ধবানো হল। কারণ, জামিনে তাঁকে মুক্ত করা যাবে

না। প্রশাসন সহায়ক, বিচারে জামিনের আবেদন খারিজ করে দিলেন। ২৫শে জুন তাঁর বাসভবন, 'কেশরী' ও 'মারাঠা' অফিস তল্লাসি করা হল। কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আনলেন সরকার। স্থির ছিল, যে কোন উপায়েই হোক, মিঃ তিলককে কঠোর শাস্তি দিতেই হবে এবং সেইমত 'কেস' সাজানো হল।

স্পেশাল জুরি নিয়োগ করা হল। প্রবন্ধগুলি সবই মারাঠা ভাষায় লেখা— তার ইংরাজী অনুবাদ করা হল। ইচ্ছাকৃতভাবেই অনুবাদ বিকৃত করা হল। ঠিক ছিল মিঃ জিন্না তাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন না। নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন। নিজের মুক্তির জন্য যত না চেষ্টা করলেন, তাঁর বেশী সওয়াল করলেন সাহেবী সংবাদপত্রগুলি, কি পরিমাণে ভারতবাসীর কুৎসা করে চলেছেন। তাঁর মতে এগুলোও সমপরিমাণে মানহানিকর ব্যপার অথচ তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন না। ২১ ঘণ্টা ধরে তিনি সওয়াল করলেন। অবশ্য মিঃ মহম্মদ আলি নিজেই জানিয়েছেন: কোন ব্যবহারজীবির পক্ষে একাজ করা সম্ভব ছিল না'— তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ছিল ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। তিনি একদিকে অভিযোগের উত্তর দিলেন, সেই সঙ্গে অভিযোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, ভারতবর্ষের কুসংস্কারকে, সাহেবী কাগজগুলির বিকৃত তথ্য এবং ভারতের স্বাধীনতা অপহারক বৃটিশ সরকার, একইশ্রেণী ভুক্ত। আমি এখানে সরকারের দয়া ভিক্ষা করতে আসিনি— এসেছি আমার কাজের ফলাফলের সম্মুখীন হতে। আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না— ঐ সকল প্রবন্ধ আমি খ্যাপামির ঝোঁকে লিখেছি— আমি পাগোল নই, লিখেছি জনস্বার্থে। ওগুলি 'লেখা' কর্তব্যবোধ করেছি। আমার স্বদেশবাসীর মতও তাই, আমি মনে করেছি।

রাত্রি তখন ৮টা বিচারক মামলার মূল কথাগুলি জুরিদের বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণতঃ জুরিদের সিদ্ধান্ত, পরদিন জানান হয়। কিন্তু এ মামলায় তার বিপরীত নিয়ম অনুসরণ করা হল। শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে জুরীগণ ভিতরে চলে গেলেন। আর মিঃ তিলক, খাপার্দে, কোলকার প্রমুখ বন্ধুর সঙ্গে বসে চা খেলেন। খাপার্দে বললেন, অন্য দিনটির মত, এদিনটি নয়। মনে হচ্ছে— বড় শাস্তি হবে যাবজ্জীবন নির্বাসন! হয়ত এই আমাদের শেষবারের মত চা খাওয়া।

মিঃ তিলক হাসলেন। বললেন, যাতে অন্যরা কাঁদতে না পারেন। কারণ বিচার চলাকালে আগ্রহী ও উত্তেজিত জনতা, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিল।

মিঃ বিপিনচন্দ্র পাল মার্চ ১৯০৮, জেল থেকে মুক্তির পর তাঁকে ফেডারেশন হল মাঠে সম্বর্ধনা জানানো হল। ১০ই মার্চ ১৯০৮, বন্দেমাতরম পত্রিকায় অরবিন্দ সম্পাদকীয় লিখলেন— 'ওয়েলকাম টু দি প্রফেট অব ন্যাশন্যালিজম'। বক্তব্যের শেষে যোগ করলেন : স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল, প্রথম জাগরণ ঘটাবার জন্য— এখন প্রয়োজন সর্বজয়ী বিশ্বাসের ভাষা, যা বিপিনচন্দ্র দিতে সমর্থ। আরও আভাস দিলেন: যদি বিপিন চন্দ্র তা না দিতে পারেন— তিনি নিজেই যে কাজ সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হবেন।

এরপরই বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ড পাড়ি দিলেন। যখন সেখানে পৌছলেন— দেখলেন, ভারতীয় ছাত্ররা শ্বেতজাতি সম্বন্ধে আশা, বিশ্বাস হারিয়ে বসেছেন। এবার তাঁর 'মিশন' হল: এঁদের এই নৈরাশ্যকে ধুয়ে মুছে দেওয়া। কিন্তু সে নৈরাশ্য এত গভীর যে, তাঁরা মানব-সমাজে শ্বেত মানুষদের অচ্যুত ভাবতে শুরু করেছে। তিনি অবিলম্বে একটি পত্রিকা বার করলেন। নাম দিলেন 'স্বরাজ'। ভারতীয়দের এই মনোভাব দূর করতে হলে তিনি অনুভব করলেন : তাঁর ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং তাঁর কাগজে মানবতার মূল্য নিরূপিত হতে লাগলো। তিনি

ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখতে শুরু করলেন:— সমগ্র মানবজাতিই ঈশ্বরোদ্ভুত। তারা অন্যায়কারী হতে পারে, অত্যাচারী হতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত যে তারা মানুষ, এ বোধ জাগ্রত করতেই হবে। এ শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে— মানবতা প্রমাণের দ্বারা, আধ্যাত্মিক চেতনা বিস্তার দ্বারা। ভারতীয় ছাত্রদের বোঝাতে চাইলেন : মানবতার উপর স্থির বিশ্বাস রাখা উচিত। এর দ্বারাই মানুষের চিত্ত জয় করা যায়, মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্বে পরিণত করা যায়। ইংরাজরাও মানুষ, তাদের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। আমাদের মধ্যেও ভাল মন্দের অবস্থান একই রূপ। তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যেকে মানুষ, আমাদের প্রত্যেকের সহ্ অবস্থানের প্রয়োজন। আজ সর্বপ্রথম প্রয়োজন্ : এই আধ্যাত্মিক চিন্তায় উদ্বোধিত করতে হবে ইংরাজদের। তাদের বোঝাতে হবে সহযোগিতা দ্বারাই, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। হিংসা, দ্বেষ, অধিকার, প্রতিপত্তি, শোষণ এগুলো আমাদের প্রত্যেকের মজ্জাগত বস্তু। এগুলো জয় করাই হল, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ও সভ্যতার চরম লক্ষ্যবস্তু। এগুলো উদ্বোধিত করাই হবে ভারতীয় ছাত্রদের একমাত্র কর্তব্য। আজ ভারত ও ইংলণ্ডের সহযোগিতার প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে আমরা উপনীত হলে, শ্বেতজাতি ও কৃষ্ণকায় জাতির সংঘর্ষ নিবারিত হবে, দূরীভূত হবে প্যান ইসলামের আক্রমণভীতি।

এরপর তিনি থিসিস উপস্থিত করলেন : বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন ভারতবর্ষকে তিনি চান না— ভারতবর্ষকে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেখতে চান। অন্তর্ভুক্ত থাকালেই ভারতবর্ষের মর্য্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে জগতে।

তিনি লিখলেন : Let us suppose that the British Government in India were to be reconstituted on a basis which could give the fresh Possible scope of self-fulfilment to India, and yet continue the association known now as the British Empire. It would be a federal constitution, the freedom of the federated parts being realised in and through the unity of the federal whole, such a partnership between Great Britain and India, speaking as a man who has the broadest interest of humanity at heart, would be preferable to an isolated Independence for India.

আরও বললেন : ধরা যাক, সর্বশক্তিমান ভগবান একদিক আমাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভারতবর্ষ দান করলেন, অন্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে এই রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই— অন্যদিকে তিনি দিলেন এমন একটি ভারতবর্ষ যা গ্রেট ব্রিটেন ও তার কলোনিগুলির সঙ্গে এবং মিশরের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা ও ন্যায়বিচার নির্ভর অনুগত্য সম্পন্ন অংশীদারত্বে যুক্ত, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় প্রথমটি অপেক্ষা, দ্বিতীয়টিকেই বেছে নেব।

ভারতে যখন এপ্রিলের শেষ থেকে মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণের পর ধরপাকড় ও নিপীড়ন জোর কদমে চলছে—নিবেদিতা তখন ইউরোপে। ক্ষুদিরামের বোমা ফেটেছে, সে বোমায় কেনেডিদের মৃত্যু, মানিকতলার বোমা কেন্দ্র আবিষ্কার, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির স্বীকারোক্তি, প্রভৃতি ঘটনা ঘটে চলেছে, মডার্ন রিভিউতে পর পর কয়েকটি নোট পাঠালেন লিখে। পত্রিকা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কোনটি স্বরূপে, কোনটি ভারতীয় আইন অনুযায়ী সংশোধন করে, সে মন্তব্য ছেপে চললেন পর পর। প্রথমটি পলিটিক্যাল এসোসিয়েশন এণ্ড ওয়েষ্টার্ণ সেন্টিমেন্ট — দ্বিতীয়টি 'দি জেনেসিস অব টেররিজম ইন বেঙ্গল'।

"The ultimate course of terrorism in Bengal must be sought, in the utterly high handed and tyrannical policy of the government and in the

contemptuous and insulting manner in which most official and non-official Anglo-Indians have spoken of and treated Bengalis... The Russianiezation of the administrations in spirit and method, has led to the conversion of a small section of the people to the methods of Russian terrorism. It is simply a question of action and reaction, 'stimulus' and response."

The result has been a mistake horrible in its consequences. Instead of the man they wanted to kill, they have murdered two innocent women whose death is deeply mourned.

তৃতীয় নোটটি 'political Enfronchisement by Assaninations.'— রচনা সম্পাদকের :

That is almost invariably a feature of assassination by bomb-throwing. More often than not, it is innocent persons who die, not those whom the bomb throwers consider guilty. Even when the latter are killed, some innocent persons are killed along with them. So that the method is esentially reckless and wicked and we may add, cowardly. For there is no heroism in killing an unarmed person. whom, moreover, the assailant has not the courage to face.

চতুর্থটি "পলিটিকেল এনফ্রেঞ্চমেণ্ট বাই এসশিনেশন"। পঞ্চমটি "হাউ টু ডেয়ার এণ্ড ডাই" সম্পাদকের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। ষষ্ঠটি "দি প্রবলেম অব পাথ" — Both Government and the people are in the presence of a most difficult problem. To Government, we have nothing to say. For, the bureaucracy may not understand that the highest courage and statesmanship consist in recognising one's mistake and retracing one's steps from path of selfish tyranny and that any further Russianization of the administration is sure to be confronted with a fiercer Russian response on the part of at least a section of the people.

Let them dare but dare righteously and die, if need be, in the country's cause. Let them not indulge in cowardly and ensconcore exaggeration in courdemning young men under trial. It is not for us to judge-God will judge. It may be easy for arm-chair critics who are incapable of risking or sacrificing anything for humanity to inveigh in unmeasured terms against persons who have made a terrible mistake, but who, nevertheless, were prepared to lose all that hold dear, for their race and country :– persons whose fall has been great, because, perhaps, equally great was their capacity for rising to the heights of being; but for ourselves, we pause we struck in the presence of this mysterious tragedy of mingled crime and stern devotion.

Deplore as we do the death of the two European womens and strongly condemn the muderous deed, we scorn to associate ourselves,

even in our condolence and condemnation, with those Anglo-Indian editors and others who have not even a word of regret to expres when brutal Anglo-Indians kill inoffensive and defendless Indians or assault helpless Indian women.

অক্টোবর মাসে সস্ত্রীক ডঃ বোসের সঙ্গে পুনরায় ফিরে এলেন মায়ের কাছে। এখানে ডঃ বসু অবস্থান করতে লাগলেন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চালাতে লাগলেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক অভিযান সাফল্য মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে। লংম্যান তাঁর Cradle Tales of Hunduism বইটি প্রকাশ করলেন। এর আগে তাঁর The web of Indian Life বইটি পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন তুলেছিল। ডঃ বসুর কাজে সাহায্য ছাড়া, পরিচিত মহলে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। ক্যাম্পটন হলে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে চললেন : বেদ, পুরাণ, রামায়ন ও মহাভারত সম্বন্ধে। লিক্রেম ক্লাব, হাইয়ার থট সেন্টার ও কেবিয়াণ সোসাইটিতে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ বক্তৃতা করলেন 'ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব', ২৯শে মার্চ বক্তৃতা দিলেনঃ 'স্বামীজীর জীবন ও কর্ম্ম'। এই সময়ে ইংলণ্ডের বেদান্ত সমিতিটিকে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে ভারত থেকে এসে গেলেন মিঃ গোখলে, মিঃ রমেশ দত্ত ও আনন্দ কুমারস্বামী। চললো রাজনীতিব চর্চা। কুমারস্বামীর সঙ্গে চলতে লাগলো রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ ও আলোচনা। কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই, বি, হ্যাভেলের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প সমন্ধে চললো আলোচনা ও সুচিন্তিত অভিমত বিনিময়।

এপাশে অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ টি.কে.চেইন, সাংবাদিক মিঃ নেভিনসন তাঁর বাড়ীতে ডাঃ বসু ও তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আলাপ ও আলোচনা করতে উপস্থিত হতে লাগলেন। পূর্বে ঘনিষ্ঠ বহু সম্পাদকের সঙ্গে বর্ত্তমান 'ভারতের আন্দোলন' সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগলো। বিশেষ করে 'রিভিউ অব রিভিউজ' সম্পাদক মিঃ উইলিয়ম স্টেড্‌ "দি কামিংডে" সম্পাদক মিঃ জন পেজ হপ, মিঃ র‍্যাটক্লিক, ও মিঃ ব্লেয়ার প্রমুখের সঙ্গে।

১৯০১ থেকে ইংলণ্ডে ভারতের অনুকুলে জনমত সংগঠনের প্রয়োজন, চিন্তা করে আসছিলেন। এসে গেল সে সুযোগ। গ্রহণ করলেন ব্রিটিশ নরনারীকে বর্ত্তমান ভারতের উপর যে অপশাসন ও নির্যাতন চলেছে "জ্ঞাত করানোর কাজ"। শাসকবর্গ ও মিশনারীরা প্রচার চালিয়ে আসছিলেন: ভারতবাসীরা অনগ্রসর, বর্ব্বর, কুসংস্কারচ্ছন্ন। জনসাধারণও সেরূপ বার্তায়— ভারত আজও সেই আদিম, অনগ্রসর ও বর্ব্বর ভেবে চলেছেন। সে বদ্ধ ধারণা দূর করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে লাগলেন: 'ভারতীয় আদর্শ', 'ভারতীয় সমস্যা' ও 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধে 'প্রবন্ধ'; সম্পাদকীয় মন্তব্যে বার করতে লাগলেন—ভারতের বর্তমান অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিদেশী শাসনের দূর্নীতির চিত্র। এ ছাড়া, গঠন করলেন পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সহ পার্লামেন্টের কমন্স সভার কয়েকজন সদস্যদের একটি দল। এরা প্রত্যেকেই ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ উৎসাহী।

১৯০৮ সালে নিবেদিতা আহূত হয়ে উপস্থিত হলেন লণ্ডনে ইউটোপিয়ানদের সমাবেশে। সভাপতি মিঃ গেডেস নিবেদিতার সঙ্গে এ সভায় আহূত হলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি, :

I have much pleasure in introducing sister Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda, who has been a student of social matters, first in Europe and now in India. In India, she has found that the great problems of

Indian life turn on nature and occupations and natural conditions of all kinds, turn on the family, and largely on Indian thought : primarily on Indian religion and steeped as she has been in this great world of idealism. She is particularly welcome to us in being an interpretation, of the East which is still uncommon among us. We have heard vague and mysterious presentments of Indian thought, and it is something to have a reverent and sympathetic student who still keeps grip of sence and the relation of the world :

তাঁর প্রবন্ধ পাঠের পূর্বেই মিঃ গেডেসের উদ্দেশ্যে বললেন : মিঃ গোডেসকে আমরা ভারতীয়েরা— ভারতবর্ষে চাই— যাতে, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা করে, আমাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে পারি। ভারতীয়দের পক্ষে পাশ্চাত্যে আগমন করে তাঁর কাছে শিক্ষা নেওয়া ভাল, তাতে পদ্ধতির বিশেষ রূপটি তারা শিখতে পারবেন আর তিনি যদি ভারতে গিয়ে ভারতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে শিক্ষা দিতে চান— তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাত এসে যাবে কি না, তা কে জানে বা কে বলতে পারে?

এরপর সভায় নিবেদিতা একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। এই প্রবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা অনুসরণে লিখিত।

তিনি সেই লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করলেন : ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তার ধারার পার্থক্য : ভারতবর্ষে মহাদেবকে প্রভু নয়, পিতা নয়— ভিক্ষুকরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ধারণার মধ্যে রয়েছে, অতুলনীয় কাব্য সৌন্দর্য্য, গভীরতাও সেই সঙ্গে। পাশ্চাত্যে অপরিচিত কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচলিত ঈশ্বর বিষয়ক ধারণা: ঈশ্বর সমদর্শী। ... কি ভাবে এই ধারণায় তারা উপনীত, সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়: ইন্দ্রিয়পথে 'বহু' বলে প্রতীয়মান বস্তুগুলি, মনলোকে 'অভেদ' বলে গৃহীত হয়, পাশ্চাত্যবাসীর কাছেও। কেবল তাত্ত্বিকভাবে অভেদকে স্বীকার করেনি ভারতবাসী। তাকে, উপলব্ধি করতে চেয়েছে। সত্যকার অদ্বৈতের উপলব্ধির সময়ে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-র পার্থক্যবোধ বিলুপ্ত হয়,— যে অভিজ্ঞতা বাক্যমনাতীত, তখনই সমাধি। এটাই অদ্বৈতবোধ। প্রোটেস্টানদের ধর্মতত্ত্বে তা না থাকলেও, ক্যাথলিকদের 'বীটিফিকমিশনে' কিন্তু অনুরূপতা আছে, অবশ্য পার্থক্যও যথেষ্ট। ক্যাথলিকদের কাছে, মরণোত্তর শুদ্ধির পরেই ঐ অবস্থানলাভ সম্ভব, আর হিন্দুরা সে বস্তু চায়, প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের অস্তিত্বে।

প্রশ্ন উঠলো সভায়, তাহলে দিব্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে, সামাজিক কর্তব্যকর্মে যুক্ত হবে?

'সমাধিলব্ধ মানুষ হয়ে যান মুক্তপুরুষ। অনন্ত তার স্বাধীনতা। তিনি দ্রষ্টা ও সাক্ষী পুরুষ। কর্তব্যে নিযুক্ত কিন্তু নির্লিপ্ত।' উত্তর দিলেন তিনি।

প্রবন্ধ পড়তে লাগলেন তিনি : সুখ-দুঃখ, শুভ ও অশুভকে একই শক্তির বিভিন্ন-মুখী বিকাশ বলে হিন্দুরা জানেন। একারণেই, ভারতবর্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। তিনি মধুরের মধ্যে মধুর, ভীষণের মধ্যে ভীষণ।

সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে, কেবল বহির্গত বস্তুর উৎপাদনই বিবেচ্য নয়— জনজীবনের অন্তর্গত অনুভূতি ও প্রত্যয়ের বিচার বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন।

মিঃ গেডেস স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এই তত্ত্ব জেনেছিলেন।

১৩ই জুলাই ১৯০৮ মিসেস লেগেটকে লিখলেন— মিসেস বুল এখানকার পরিকল্পনা মত বোস্টনের উদ্দেশ্যে ভাসছেন।... বসুরা এবং আমি ২৬শে সেপ্টেম্বরে যাত্রা করার আশা রাখি।

১৮ই জুলাই ১৯০৮ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : পরের মঙ্গলবার খোকার বক্তৃতা গুরুত্বপূর্ণ ও ঘোরাল ব্যাপার হবে। তোমার উপস্থিতির কত না প্রত্যাশা করি।

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮ মিসেস উইলসনকে লিখলেন : ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে আমি বসুদের সঙ্গে আছি।

মডার্ণ রিভিউতে ১৯০৮ সালে 'দি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন : যখন আলিপুরে মামলা শুরু হয়ে গেছে, বিপ্লবের সাক্ষাৎ ও ব্যাপক প্রভাবের কথা ব্যক্ত করলেন এই প্রবন্ধের মধ্যে। তিনি মাৎসিনী-পন্থী। মনে প্রাণে চাইতেন তিনি, তরুণদের উপর এর প্রভাব পড়ুক। এর পূর্বেও তিনি মাৎসিনী-নীতি পত্রিকা মারফৎ ছড়ানোর চেষ্টা করে এসেছেন : পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ ও সর্বাত্মক সংগ্রাম। মাৎসিনীর বইগুলি বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন, নিজের মুখে তাদের কাছে আলোচনা করে উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন, কারণ ছাপা লেখায়, তা খোলাখুলি উপস্থাপনা করা সম্ভব ছিল না। লিখলেন : টমাস কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লবের' ইতিহাস। আলোচনাকালে মাৎসিনী প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন— একটি বাস্তিল, একটি শাসনতন্ত্র এবং একটি গিলোটিন— এই কি ফরাসী বিপ্লবের সামগ্রিক তাৎপর্য্যের যথার্থ প্রকাশ? ঐ বিরাট ব্যাপারটি কি আমাদের অন্য কিছু শিক্ষা দেয় না? এর উত্তর : না, কদাপি নয়, হতে পারে না। আড়াই কোটি লোক, একদেহে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের আহ্বানে, অর্ধেক ইউরোপ জেগে উঠেছিল। তা অবশ্যই ঐ প্রকার একটা শব্দ, ফাঁকা ফরমুলা বা ছায়া ব্যাপারের জন্য ঘটতে পারে না। বিপ্লবের বিক্ষোভ ও রোষগর্জন স্তব্ধ হয়ে যাবে কিন্তু বিপ্লবের ভাব থাকবে জাগরুক। প্রতিটি মহান ভাবই, অমর ফরাসি বিপ্লব : 'অধিকার বোধ', 'স্বাধীনতাবোধ', 'মানবসত্তার সাম্য বোধ', পুনর্জ্জ্বলিত করেছে, তাকে কদাপি নির্বাপিত করা যাবে না, ...প্রতিটি মানুষের মধ্যে, তা 'সমষ্টি সংকল্পের শক্তি সম্বন্ধে' প্রত্যয় এনে দিয়েছে, এনে দিয়েছে সর্বশেষ বিজয় সম্বন্ধে বিশ্বাস, যার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।

কলকাতায় সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়েছে, বিচারের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। বিচারকদের কর্তা বিদেশী। শাসকগণ ও সাহেবী কাগজগুলি প্রচার করে চলেছেন: বৈপ্লবিক অভিপ্রায়, কেবল ধরাপড়া মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ নেই, তার হাজার হাজার সমর্থক আছে।... এই বিদ্রোহের সাক্ষাৎ ফল কী? । হল, এই পৃথিবীর সব কিছু খোয়ানো, নিজেদের জীবনশুদ্ধ। মানুষ এই প্রকার কাজ করে কেন?

ভারতীয় পরিস্থিতির মধ্যে, তা হলে নিশ্চয় অতি অদ্ভুত কিছু ব্যাপার আছে— যা কাপুরুষ ও বাচাল বাঙালীদের স্নায়ুতে, শক্তি ও সাহস সঞ্চারণ করে, তাদের বোমা ছোঁড়ায় প্রাণোদিত করেছে। শুধু ফুৎকার দিয়ে আগুন জ্বালানো যায় না। স্ফুলিঙ্গ অন্ততঃ থাকা চাই এবং অবশ্যই ইন্ধন। সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ, নিছক একটা ছায়াবৎ ব্যাপারের জন্য, এক দেহে উত্থিত হয় না।

সেপ্টেম্বরে ডঃ বসুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আয়র্ল্যাণ্ডে। ঘুরে বেড়ালেন নানাস্থান। এটা তাঁর জন্মভূমি। মনে পড়লো: শৈশবের কথা। মাতামহের কাছে তাঁর দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা। একদিন এই আয়াল্যাণ্ড ছিল তাঁর স্বদেশ: আর আজ? ভারতবর্ষ তাঁর স্বদেশ। তবুও একটা আকর্ষণ বোধ করলেন মনেপ্রাণে। মনে পড়ে গেল শৈশবের সহজ অনাবিল আনন্দের দিনগুলির কথা। এ-বাড়ীটিই ছিল ডঃ বসু বক্তৃতা সফরের কেন্দ্রস্থল।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯০৮ ডঃ বসুদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজযোগে আমেরিকা যাত্রা করলেন। সেখানে পৌছলেন ৫ই অক্টোবর। মিসেস বুলের অতিথিরূপে অবস্থান করতে লাগলেন।

আমেরিকার বক্তৃতা সফরে ডঃ বসু মিসেস বুলের বাড়ীটিকে প্রধান কেন্দ্র করে, অন্যান্য জায়গায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। এ সময়ে ভূপেন্দ্রনাথ কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর ব্যবস্থামত কৃস্টিনের সহায়তা ছদ্মনামে ইউরোপ হয়ে আমেরিকা উপস্থিত হলেন। নিবেদিতা তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন, ডঃ বসুর পরামর্শ মত নিউইয়র্কে। ডঃ বসু নিজস্ব কাজে ব্যাপৃত রইলেন।

এরপর বেড়াতে গেলেন গ্রীন একারে। মিস কার্ম্মারের আমন্ত্রণে স্বামীজী এখানে কয়েকদিন অবস্থান করে ছিলেন নদীর ধারে। তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করেছিলেন। বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া, গাছের নীচে বসে ক্লাশ নিতেন। এটা ছিল প্রকৃতির অপূর্ব লীলাক্ষেত্র। মনে হল নিবেদিতার : ঠিক সেই দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড়ের মত! পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হল এখানে। মিস এমা থার্সবি, মাদাম কালভে, মিস কার্ম্মার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দবোধ করলেন। তাঁর ও তাঁর কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। ফিরে গেলেন রিজলিম্যানরে। কয়েকদিন মিসেস লেগেটের কাছে থাকলেন। মিস ম্যাকলাউডও এখানে অবস্থান করছিলেন। তিনজনের মনে স্বামীজির সঙ্গে অবস্থানের চিত্র, জাগরিত হল। তখন তাঁর The Master as I saw Him লেখা চলছিল।

৮ই অক্টোবর ১৯০৮ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ঠিক এইক্ষণে ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্যই অবশ্য, প্রধানতঃ মন অধিকার করে আছে। এখন, ঐ ব্যাপারটিই ভারতের বিরাট দায়ভার। ওটা মন থেকে কিছুটা নেমে যাওয়ার পর, প্রকাশকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবো।

২২শে অক্টোবর ১৯০৮ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ৯.৩০ মিনিটে এখানে পৌছে প্রিয় মানুষগুলিকে দেখলাম। মনে হচ্ছে, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের বায়োলজিক্যাল ক্লাব, তাঁর কাজকে যথার্থ প্রাপ্য মূল্যদান করতে পারবে— ওঁরা ওঁর কাজ সম্বন্ধে একেবারে খুশীতে মত্ত! নতজানু হয়ে আমেরিকাকে নমস্কার। বিকাল ৪টার সময়, অধ্যাপক সেজরিক ও তাঁর অধস্তন অধ্যাপক এবং ২০-৩০ জন অগ্রসর ছাত্রের কাছে উনি বলবেন, তার পরে ক্লাস ভেঙে, সমবেত সকলে এখানে দেখতে আসবেন। ফলে, মিসেস বসু চা বিতরণ করবেন।

অধস্তন অধ্যাপক জানালেন : বসুই হবেন আগামীকালের বক্তৃতার সম্পূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এমনই প্রগাঢ় সমাদর। ...ডঃ বসুকে প্রদীপ্ত দেখাচ্ছে। সেন্ট সারাকে পর্য্যন্ত তাঁর ভাই মিঃ থর্প মারফত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সুতরাং মিঃ থর্প পর্য্যন্ত এই তারকার বিশালত্ব বুঝেছেন অথচ ইংলণ্ডে গেডেসই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এই সমস্ত কিছুকে যথার্থ অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছিলেন! জানতেই পারবে না, মা কি খেলা খেলছেন!

১৫ই অক্টোবর ১৯০৮ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : কিছুদিন মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে ইয়ুরোপে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। আমার মতে, সেটা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দিক দিয়ে খুবই সহায়ক হবে। কিন্তু স্বীকার করছি যুদ্ধ ও ধর্মঘটে খুবই আতঙ্ক হয়।

১লা নভেম্বর ১৯০৮, মিঃ র‍্যাটক্লিককে পত্রে বোঝাতে চাইলেন : আমেরিকা আগমনের মূল্য কত! এখানে লেখার জন্য ভাল পয়সা পাওয়া যায়। এখানে এলে, সফল হতে পারবে। সেই সঙ্গে জানালেন, আমেরিকার আগ্রহ কোন কোন বিষয়ে। আমেরিকার আগ্রহ বিষয়গুলি সম্বন্ধে বললেন: চেষ্টা করলে, এখানের ধারণার ক্ষেত্রে, অল্পাধিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

এখন দেখছি, আমেরিকায় ভারত সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ জন্মেছে। ভারতের বিক্ষোভ, এখানে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। আমেরিকার সরকারী মনোভাব অল্পই জানা গেছে, তথাপি অন্যদিকে সাধারণের মধ্যে, সে অবস্থা জানার জন্য যথার্থ ইচ্ছা রয়েছে, এটা সত্যই ভালো।... এখানকার লোক বিক্ষোভের উদ্ভবে কার্জ্জনের ভূমিকা বিষয়ে জানতে দারুণ উৎসুক। ...হ্যাঁ এডুকেশন বিলের উপর পূর্ণ আলোকপাত করলে, তা এখানে সাদর অভ্যর্থিত হবে। কনভোকেশন বক্তৃতাটি সম্বন্ধে

রসালো ক্ষুদ্র কাহিনীটি, এখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাছাড়া টাটা পরিকল্পনার ইতিহাস মূল্যবান। একটি প্রদেশ, কিভাবে বিভক্ত হয়েছে— সেটিও আর একটি রত্ন বিশেষ।

এখন কাজে লেগে পড়। তারই মধ্যে নিজের অর্থভাগ্য গড়ে নাও এবং সত্যকে প্রকাশ করো। আশঙ্কা হয়, আমার কাছ থেকে, যে মতামত তুমি চাইছ, তা ভাল নয়, মন্দই করবে। আমার কাছে চিত্তাকর্ষক বস্তু হল— সরকারী প্রশাসকদের দিব্য প্রতিভা। তা প্রযুক্ত হয়, সেইসব লোককে পাড়কানোর কাজে, যারা আক্রান্ত না হলে কোন প্রকার অনিষ্টকার্য্যে অসমর্থ ছিল কিন্তু এখন উদ্বুদ্ধ ও রূপান্তরিত— অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণে। কি আছে বিলাপের, ক্রন্দনের। আমরা ভয়ঙ্করের উপাসনা করি। যন্ত্রণা, ক্ষতি, কৃচ্ছ্রতা আর মৃত্যু ভিন্ন আদর্শ নেই!

৩রা নভেম্বর ১৯০৮ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : খোকা ৮/৯ ডিসেম্বর হয়ত নিউইয়র্কে যেতে পারে। তাঁদের এবং সেই সঙ্গে তাঁদের একজন সহকারীর থাকার জন্য কি কোন বোর্ডিং হাউসের নাম করতে পারো, কিংবা কোন মাঝারি হোটেল কিন্তু মনে হয় বোর্ডিং হাউসই উপযোগী হবে।

১০ই নভেম্বর ১৯০৮ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : হোটেলের ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ। খোকা আজ এখানে বক্তৃতা করবে।

নভেম্বর থেকে তাঁর বক্তৃতার পালা আরম্ভ হল, কারণ তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। গেলেন : উইনসলো, কন্‌কর্ড, হার্টফোর্ড অ্যালবেনী, পিটস্‌বার্গ, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর। বক্তৃতা দিলেন 'ভবিষ্যৎ জগতে ভারতীয় চিন্তার স্থান', 'প্রাচ্য নারীর শিক্ষা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ,' বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়।

নিউইয়র্কে গায়িকা মিস এমা থার্মবির কাছে কয়েকদিন কাটালেন। এখানে এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্বর্ধনা সভায় যাত্রাকালে পথে সাংবাদিক এফ. জে. আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। ভারত সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব কৌতূহল। তিনি তাঁকে ভারত সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন। তাঁকে দেখেই মনে হল : শুধু উৎসাহী বা চিন্তাশীল নন— খাঁটি একটি ভারতীয় মহিলা। সে সভায় তিনি (নিবেদিতা) বক্তৃতা দিলেন : 'ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি', 'পাশ্চাত্য জীবন ও চিন্তা ধারার উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন। 'মধ্য এশিয়াই আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল'। আরও উল্লেখ করলেন আলোচ্য 'সাম্রাজ্য গঠন ও জাতি গঠনের' মধ্যে পার্থক্য আছে। সভ্যতার অগ্রগতির কাজে 'জাতিগঠন' প্রকৃত সংগঠনাত্মক আর সাম্রাজ্য গঠনের কাজ ধ্বংসাত্মক'। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ক্ষুদে বিদ্যালয়ের বর্ণনা দিলেন। ভারতীয় শিশু, তাদের পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষা প্রনালীর। শ্রোতাদের কাছে 'অভিনব'। মিঃ আলেকজাণ্ডার এতদূর আকৃষ্ট হলেন যে, এই হৃদ্যতা আমৃত্যু অমলিন রয়ে গেল।

বস্টনে তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে লাগলেন। মিসেস বুলের বাড়ীটি তখন ডঃ বসুর কর্ম্মকেন্দ্র।

ভূপেন্দ্রনাথ কারাবাসকালে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষন করলেন। তাঁরা তাঁর কাজকর্ম্মে পরিতুষ্ট হয়ে, একমাস পূর্ব্বেই মুক্ত করে দিলেন। এই সময়ে একজন সরকারী জেলার তাঁকে পরামর্শ দিলেন : 'বন্দেমাতরম' ও 'যুগান্তর পত্রিকার গোষ্ঠী, মানিকতলার বোমা কেসে ধৃত হয়েছেন ও তাঁদের আদালতে বিচার চলছে। তুমি সে দলভুক্ত। বাইরে থাকলেই তোমাকেও জড়ানো হবে। তোমার গ্রেপ্তার পরোয়ানা ঝুলছে, যদি সম্ভব হয় গা ঢাকা দিও।

জেল থেকে বেরিয়েই বিপ্লবী নেতা হরিদাস হালদারের কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন : এই এক্ষুনি বৈদেশিক রাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করো। ভূপেন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরে এলেন। মেজদা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বাড়ীতে ছিলেন। তিনি জানালেন, তোমার আমেরিকায় আশ্রয় লাভের

ব্যবস্থা নিবেদিতা করে রেখে গেছেন। তুমি সিস্টার ক্রিষ্টিনের সঙ্গে দেখা করো। মা ভুবনেশ্বরীও সেই পরামর্শ দিলেন। সিস্টারের ব্যবস্থামত তিনি কলকাতা ত্যাগ করে তিন চার দিন পরে, ইউরোপ হয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন 'ওসানস্ প্রোটাজে' ছদ্মনাম গ্রহণ করে।

২৩শে আগস্ট, ১৯০৮ সিস্টার কৃষ্টিনের লেখা চিঠি পেলেন : 'ওসানস্ প্রোটাজে' (ভূপেন্দ্রনাথের) সাহায্য প্রয়োজন। মিস ওয়ালডোর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি তার কাছে আছে, কিন্তু মনে হয় তিনি গ্রীষ্মকালের ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। ভূপেনের হাতে প্রায় কোন টাকা নেই। ওর মার কাছে তখন হাজার টাকা ছিল। সেটার সুদের ব্যবস্থা তাঁকে করে দিয়েছিলাম, তা মাস খানেক কি দু'মাস ভাঙানো যাবে না, তার পরে সে টাকা তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তুমি তো জানোই, সেটা ওঁর (ভুবনেশ্বরী দেবীর) পক্ষে কি পরিমাণ আত্মত্যাগের ব্যাপার হবে। ওর (ভূপেন্দ্রর) গোড়ায় আশ্রয় চাই, তারপর সে নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে মনে হয়। সেন্ট সারা (মিসেস বুল) তাঁকে আশ্রয় দেবেন বলে মনে হয়? মিস ওয়ালেডোরে কিছু করা উচিত। ওর ভাই (মহেন্দ্রনাথ) কিছু আগে তোমাকে লিখতে বলেছিল, সাহায্য জোগাড়ে উদ্যোগী হবার জন্য। আমি কিন্তু এর আগে লিখি উঠতে পারি নি।

ডাবলিন থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮ মিস ম্যাকলাউডকে পত্র দিলেন : তোমার ও ক্রিস্টিনের চিঠি গতরাত্রে এসে পৌছেছে। ক্রিস্টিনের চিঠি তোমাকে একসঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্বামীজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ক্রিস্টিন যাকে 'The ocean's protge' বলে উল্লেখ করেছে, তার বিষয়ে আমি তোমাকে লিখছি— সারাকে (মিসেস বুলকে) নয়। কারণ আমেরিকায় হাজির কোন যুবককে সাহায্যের জন্য, পারলে সারাকে অনুরোধ করবো না। কিন্তু সারার কাছে তোমার পক্ষে চাওয়ার কোন বাধা নেই, যদি চাইতে ইচ্ছা করো। ভূপেন্দ্রনাথ এগারো মাস জেলে ছিল। এই অগ্রিম মুক্তির জন্যই ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে দেশত্যাগ সম্ভব হয়েছে। তার চরিত্র অপূর্ব। কিন্তু দেখছি যে, স্বামীজির বিরাট মনীষার কোন চিহ্ন তার মধ্যে নেই। বিজ্ঞানের মানুষটি (ডঃ বসু) এবং আমার ধারণা— যদি সে মিঃ লেগেট বা মিস বোয়েথলিস বার্জারের কোন একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লেগে যায়, তার থেকে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে নেয়, সেই সঙ্গে ব্যবসাপদ্ধতি শিখে নিতে পারে— তাহলে উপযুক্ত হয়। কিন্তু তার ভাবনাচিন্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকেই এসব কথা বলছি। এসব কথায় তুমি খুব গুরুত্ব দেবে না। যথার্থ চমৎকার মানুষ সে— তার হাসি অনিবার্যভাবে তার বিরাট ভ্রাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরোষিত, বীরোচিত তার আচরণ। জেলে গিয়েছিল নিছক অপরকে বাঁচাতে। 'সব দায়িত্ব আমার' বলেছিল সে, অথচ অভিযুক্ত পত্রিকাটির সম্পাদকও সে নয়, মালিকও নয়। বিয়ের ব্যাপারে সে সর্বদা 'না' করেছে। স্বামীজি যখন তাকে এই ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখেছিলেন— তখন— বাঃ মস্ত বড় মানুষ, বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। যাই হোক, তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করার দরকার নেই। ক্রিস্টিনের চিঠি থেকেই দেখতে পাবে : মিস ওয়ালডোর ২৪৯ মনরো স্ট্রিট, ব্রুকলিন, এই ঠিকানা মারফৎ তার সন্ধান পাবে।

ভূপেন্দ্রনাথ নিউইয়র্কের 'ইণ্ডিয়া হাউসে' প্রথম উঠেছিলেন। সে সময়ে, যেসব ভারতীয় বিপ্লবী, আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন, এখানেই তারা আশ্রয় নিতেন। তিনি বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ে ইউরোপ হয়ে নিউইয়র্কে নামলেন। মইরণ এইচ ফেলপস এখানে ইণ্ডিয়া হাউস স্থাপন করেছিলেন। এইটি ছিল ভারতীয়দের আড্ডা। এখানে যারা আগে এসেছেন, তারা আমেরিকানত্ব পেয়ে গেছেন। নূতন যাঁরা আসছেন, তাদের পাশ্চাত্য আদবকায়দা শেখানো হত কারণ তারা সে দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন না। অবশ্য স্বদেশে যারা, সেসব আদব

কায়দা শিখে আসতো, তাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হত না। তিনি যখন আমেরিকায় পৌছলেন কিছু ছাত্র বাড়ী থেকে পাঠানো টাকা পেত, আবার কেউ কেউ স্কলারশিপ পেতেন— কিন্তু যারা স্বাবলম্বী' তাঁরাই ছিল শ্রদ্ধার-পাত্র। এঁরা দেশ বিদেশের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতেন— বিশেষ করে বৈপ্লবিকরা। এজন্য ভারতীয় ছাত্রদের প্রশংসাও ছিল, স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত বলে।

ইতিমধ্যে ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার গ্রীণএকারে দেখা হল। ৩রা নভেম্বর ১৯০৮ মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : 'যে মিটিং-এর কথা তোমাকে বলেছিলাম তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কেউই যেন, তার বিষয়ে ইঙ্গিতেও কথা না বলি। ওটা যেন হয়নি, এমনই মনে করতে হবে। ...কিন্তু বুঝেছি যে, ইণ্ডিয়ায় তার থাকা সম্ভব নয়। আমার নিজের ইচ্ছা ভূপেন্দ্রনাথ যাতে নিজের ভরণপোষণের অর্ধ্বাংশ নিজে রোজগার করে, তা দেখতে হবে। এটা তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন। আর সে কাজ করতে হলে, তাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঠাতে হবে, সেখানে রোজগার করা সহজতর এবং আবহাওয়া আরও ভাল। আমি মনে করি, পড়াশোনার ব্যাপারে কেউ যেন তাকে সঠিক পথে স্থাপন করে সাহায্য করে। সাংবাদিকতা শিক্ষায় সাহায্য করে। শুনেছি, আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'পলিটিক্যাল সায়েন্স' বলে একটি বিষয় পড়ানো হয়। সেই বিষয়টি কিংবা ইতিহাস কিংবা সমাজতত্ত্ব কিংবা সবেরই কিছু কিছু অংশ তার পক্ষে যথার্থ বস্তু হবে। কিন্তু এসব বিষয়ে তাকে উপদেশ দেবার আগে তার, বিশ্বাস অর্জন করে নিতে হবে— খুব কৌশলে, সাবধানতার সঙ্গে। আর যদি সে ক্যালিফোর্নিয়ায় যায়, তাহলে সেখানে স্বামীজির নামের সুযোগ না নেওয়াই পুরুষোচিত কাজ হবে। অন্যেরা যেভাবে, নিজের চেষ্টায় সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়, তারও তাই করা উচিত, আর ইতিমধ্যেই যে অর্থ সাহায্য তাকে করা হয়েছে, তাকে যেন মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে। 'ইণ্ডিয়া হাউসের' কর্তা মিঃ ফেলপস্ একেবারে বুদ্ধি বিবেচনাহীন। অসৎ নয়, কিন্তু নির্ব্বোধ, সেই ধরনের নির্ব্বোধ, যে আবার ক্ষমতা-প্রিয়।

আমেরিকায় নিউইয়র্কে মিঃ মইরন ফেলপসে 'ইণ্ডিয়া হাউসের' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের আশ্রয়স্থল হিসাবে। ভারত থেকে যাঁরা আসতেন, শিক্ষা বা বসবাসের উদ্দেশ্যে, যে কোন উপলক্ষেই হোক, তাদের সে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের সে উদ্দেশ্য সাধনে, সহযোগিতা করতেন। তিনি স্বামীজিকে দেখেছেন এবং যে সব বিপ্লবী যুবক, ভারত থেকে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন, তাদের তিনি আশ্রয় দিতেন। অবশ্য অর্থের বিনিময়ে। সে অর্থ পরে তাদের পরিশোধ করতে হতো, স্বাবলম্বী হয়ে। বাড়ী থেকে টাকা যাদের পাঠাতো বা যারা স্কলারশিপ পেত, তারাও যেমন, সেখানে স্থান পেতো— বেকার বা ভবঘুরেদেরও স্থান মিলতো সেখানে। তারা সেখানে অবস্থান করে, শিখে নিত তাদের পেশা। কিছুদিন পরে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতো। তাদের সকলকেই, তখন সকলের সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠত। বসবাসকারী এখানে ভারতীয়রা স্বদেশের স্বাধীনতা সম্প্রচার-প্রতীক হিসাবে কাজ করতেন। তারা বিদেশের মানুষদের, জুলুমশাহী ইংরাজদের শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ বোঝাতে সচেষ্ট হতেন। এঁরাই ইংলণ্ডের হাইণ্ডম্যান, ফ্রান্সের জয়রে ও লংগে, জার্মানীর অধ্যাপক রুডলফ অটো, আমেরিকার রেভারেণ্ড স্যাণ্ডারলান্ড, মাইরন ফিলপস্, জর্জ ফ্রিম্যান প্রভৃতি নানা দেশের বড়বড় মনীষীদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভে সচেষ্ট হয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন লণ্ডনে বক্তৃতায় ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রশংসায় মুখর, মাইরন ফিলপস বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সংবাদপত্রে তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশ করে চলেছেন। শেষ জীবনে গেরুয়া কাপড় পরে ভারতে এসেছেন। সাত বছর ভারতে বাস করেছেন, সে সময়ে

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লেখালিখি শুরু করেন। মডার্ণ রিভিউতেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি এদেশেই দেহরক্ষা করেন।

১০ই নভেম্বর ১৯০৮ নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউকে লিখলেন : দত্তের বিষয়ে কিছু করতে পারছি না— করতে চাইছিও না। কিন্তু তার জন্য কোন উপদেশ সম্ভবতঃ প্রয়োজন, তা আমি পেয়ে গেছি। তা চিঠিতে বলা চলে না। নির্দেশ তোমাকে পাঠাচ্ছি, তুমি সুযোগ না আসা পর্যন্ত ব্যবহার করবে না। আর যখনই করো, অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে, নিজের বিচার বুদ্ধির সঙ্গে সে কাজ করবে। (উপদেশগুলি কি তা আমরা জানানোর সুযোগ পাইনি)। কিভাবে এই ধরনের উপদেশ স্বচ্ছন্দে দিতে হয়, তা তুমি জানো বলেই, তদুপরি তোমার সঙ্গে পূর্বাহ্নেই কথাবার্তা বলা আছে বলে, আমি এটি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেন্ট সারাকে নয়, যিনি হয়ত চুলের মুঠি ধরে, হয় এইপথ নিতে, না হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ নিতে, তাকে বাধ্য করবে— আমার কথাসূত্র: যখন যেরকম খেয়াল তাঁর মাথায় চাপবে, তদনুযায়ী তিনি করাবেন। দত্ত অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর চরিত্র— নচেৎ তার কর্মজীবন নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন থাকতো না। সে যাই হোক, জ্ঞানলাভের প্রয়োজন তার আছে, আর তাকে জানতে হবে, বস্তুর মধ্যে ঝুটা অংশ কোথায়। এক্ষেত্রে কোন কোন জিনিস তুমি তাকে ধরিয়ে দেবে। এর চেয়ে সদুপায়ের কথা জানি না। মনে হয়, তুমি বুঝবেও। কত কি আছে, যাদের বিষয়ে চিঠিপত্রে আলোচনা করা যায় না— চিঠি খুলে পড়া যাবে, এই ভেবে একথা বলছি না— কাগজপত্রে ওসব কথা লেখা প্রাজ্ঞোচিত হবে না। আমি অবশ্যই চাই না যে, তুমি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। তবে তার সঙ্গে কোন না কোন সময়ে, দেখা হবেই। এই সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কিছু চিন্তা তোমার মনে থাকলে সেসব দরকারী বোধে প্রয়োগ করবে।

বস্টনে যখন তিনি (নিবেদিতা) বেদান্তের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, তখন ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারক দাস ও আরও কয়েকজন এসময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললেন। তিনি তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য গঠিত আমেরিকান লীগের সভাপতি মিঃ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন।

এ সময়ে বেলুড়মঠে স্বামী বিরজানন্দ, স্বামীজির পূর্ণাঙ্গজীবনী রচনার জন্য উৎগ্রীব। তিনি তাঁকে (নিবেদিতাকে) মায়াবতী থেকে স্বামীজির রচনা ও পত্রাবলী সংগ্রহের তাগিদ দিতে লাগলেন। কারণ স্বামীজির রচনা ও পত্রাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা তখন চলছে। তাঁর সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন।

নিবেদিতা আমেরিকায় যাঁরা স্বামীজির সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের চিঠিপত্র লিখে ও তাঁর পরিবারকে যেসব পত্র, স্বামীজি লিখেছিলেন সমস্তই তাঁর কাছে পাঠাতে অনুরোধ করলেন।

মেরী হেল তাঁকে ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিকে লিখিত পত্রগুলি পাঠালেন, সেগুলির নকল করে মায়াবতী পাঠিয়ে দিলেন। মেরি হেল তাঁকে শিকাগো যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু হাতে তাঁর এত কম সময় যে, তা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ ও পরবর্তী ঘটনা মানিকতলার বাগানবাড়ী তল্লাসী, বারীন্দ্রনাথের আত্মসমর্পণ ও অরবিন্দ ধৃত, সব খবরই তিনি পেয়েছিলেন বিলাতে। স্বদেশী আন্দোলনে দমননীতির প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। এসব খবরে বিচলিত ছিলেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুলিত। কিন্তু ডঃ বসুর কাজ তখন শেষ হলেও আমেরিকা থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতার আহ্বান আসছে, তখন আলিপুরের মামলা শুরু হয়ে গেছে। স্থির করলেন ডঃ বসুর

সহযাত্রী হয়ে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে তাঁর স্কুল ও স্বামীজির ইচ্ছামত বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ও স্বামীজির অপ্রকাশিত রচনা ও পত্রাবলী সংগ্রহের কাজ শেষ করে, ভারতে ফিরে যাবেন। এছাড়াও পূর্ব ব্যবস্থামত ভূপেন্দ্রনাথের আমেরিকা আগমন ও তার পড়াশুনার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

আমেরিকায় মিসেস বুলের বাসাকে কেন্দ্র করে ডঃ বসু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তিনিও, তাঁর বক্তৃতা সফরে বেরিয়ে পড়বেন স্থির করলেন অথচ মনটা তাঁর পড়ে রয়েছে ভারতে, তাঁর স্কুল ও আন্দোলনের নিগৃহীত ব্যক্তিগণের পাশে। তবুও স্থির করতে হল ডঃ বসুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা শেষ হলেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

আমেরিকায় তাঁর কাজ যখন জোর কদমে চলছে সংবাদ আসতে লাগলো তাঁর মার শরীর ভাল যাচ্ছে না।

১লা ডিসেম্বর ১৯০৮ মিসেস লেগেটকে লিখলেন : হঠাৎ হয়ত পরের শনিবার বসুদের নিয়ে আমি তোমার ওখানে গিয়ে মিঃ লেগেটের সঙ্গে বিজলিতে দেখা করতে পারি, নিউইয়র্কের বদলে। এ যদি হয়, তাহলে আমি অতীব আনন্দিত হব। এতে, শুধু আবার তোমার সাক্ষাৎ পাবার সুন্দর সুযোগ মিলছে তাই নয়, অধিকন্তু আরও বহু দিক থেকে সুবিধা হয়ে যাবে। রাত্রে ৭-৩৭ মিনিটে আমাদের কিংসটনে পৌছতে হচ্ছে, যেহেতু আমি সঙ্গে আছি, সেক্ষেত্রে ছোট ট্রেন যদি পাই (ট্রেন মিলবে বলেই ধারণা) তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। ...তারপরে, খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিজলি ছাড়তে হবে সোমবার সকালে, কারণ মিঃ বসু বিশেষভাবে চান, নিউইয়র্কের ...'ফরেস্ট প্লেস', আমি তাঁকে সঙ্গে করে দেখাই তারপরে, মঙ্গলবার সকালে পিটারবার্গে উপস্থিত হতে হবে। তবে আশা করি, এই ব্যবস্থায় তুমি কিছু মনে করবে না। এই ভ্রমণে বসুদের সঙ্গে থেকে যে সাহায্য করতে পারছি, এতে আমার আনন্দের সীমা নেই, আর সঙ্গে থাকলে সাহায্য করাটা খুবই সোজা আমার পক্ষে।

৮ই ডিসেম্বর ১৯০৮, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ ৯জন বিশিষ্ট নেতা বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার হলেন। ভারতের পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে মিঃ ম্যাককারনেস হাউস অব কমনস'এ প্রশ্ন তুললেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রশ্নের কোন উত্তর পেলেন না। দু'বছরের উপর তিনি ভারত-প্রশ্ন নিয়ে ধারাবাহিক কঠিন সংগ্রাম করে চলেছেন। 'মর্নিং লিডার পত্রিকা'য় ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য নিয়োজিত ১৯০৫ সালের কার্জন কমিশনের রিপোর্ট, যার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার, তার অংশ উদ্ধৃত করে তিনি পুলিশী উৎপীড়নের চিত্র তুলে ধরেন। তাতে তিনি বলেছিলেন— গত দু'বছরে ভারতে, সরকার অত্যন্ত দ্রুতবেগে ও ক্রুদ্ধভাবে নিপীড়নমূলক আইন পাশ করাচ্ছেন। বিস্ফোরক পদার্থ আইনের কথা যদি নাও তুলি, দেখা যাচ্ছে জনসভা, সংবাদপত্র এবং সরকারের দৃষ্টিতে 'বেআইনি' সংস্থার বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তাও ব্যবহৃত হয়েছে জুরির সাহায্যে বিচারের বিরুদ্ধে, অভিযুক্তের অনুপস্থিতে গোপন তদন্তের পক্ষে এবং কোনপ্রকার অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই কারারুদ্ধ করা বা নির্বাসিত করার সমর্থনে।

মিঃ র‍্যাটক্লিক 'ডেইলি নিউজে' এই পত্রের সমর্থনে লিখলেন : ভারতের বৈশিষ্ট্য— পৃথিবীতে তা একমাত্র দেশ, যেখানে পুলিশ সরকারীভাবে অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্থ এবং উৎপীড়নকারী বলে ধিকৃত হলেও, তাদের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতায় ভূষিত করা হয়েছে।... সঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্ত করা যায়, ভারতবর্ষ, পুলিশী রাজ্য। (৮ই জানুয়ারী ১৯০৯)

২৩শে ডিসেম্বর ১৯০৮, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : দোষ তোমারও নয়, লেডী বেটীরও নয়, তোমাদের লোকটির, যে তোমাদের নির্দেশের উপর বুদ্ধি ফলাতে গিয়েছিল। ডঃ বসু আগামী সোমবার জোনস হপকিনস্ সভায় আমেরিকান বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। এটি বিশেষজ্ঞের সমাবেশ, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের মত। কয়েকমাস আগে এক ছোকরা, যার নিজস্ব কোন অধিকার নেই বা ডঃ বসুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের স্বার্থের কথা ভেবে, ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপ্যালের কাছে হাজির হয়— ডঃ বসুর বক্তৃতার জন্য। ব্যাপারটা শোনামাত্র আমরা তাকে থামিয়ে দিয়েছি। কারণ ডঃ বসুর গবেষণার মর্য্যাদার পক্ষে, তা হানিকর হবে। ডঃ বসু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা বক্তৃতার জন্য সরাসরি আহুত হবেন— তাইতো প্রত্যাশিত! আমি যখন ছিলাম না, তখন বসুরা আবিষ্কার করেন যে, বাল্টিমোরে বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ডেলিগেট হোটেল রয়েছে। সেখানে তিনি ঘর নিয়ে নেন। তোমার পরামর্শ মত আমি গতকাল বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীকে একটি গোপন চিঠি লিখেছি, তিনি যেন হোটেল কর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু অতিথির বিষয়ে কথা বলেন। আমি যে লিখেছি তা বসুদের বলিনি।

৩০শে ডিসেম্বর ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বসুরা বাল্টিমোরে। আর আধঘণ্টা বাদে ডঃ বসু তাঁর পেপার পড়বেন। জগন্মাতা তাঁকে আশীর্বাদ করুন— সফল হোন তিনি।

আমি লক্ষপতি হবার বিশেষ চেষ্টায় আছি, যাতে আগামী বৎসরগুলিতে ভারতের নারী শিক্ষা ও বিজ্ঞান দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আর ওটা কি শুধুই গালভরা আশা মাত্র? ভারতেই আমার হৃদয় উত্তাল— শুধু লিখতেই তাই! আর হে মাতঃ, আমি তো লিখে ফেলেছি, এখন সেটা সমাধা করে ফেলাই আমার কাজ হবে।

পুণরায় সংবাদ এলো তাঁর মার শরীর খারাপ। তখনও তিনি ব্যস্ত তাঁর করণীয় কাজে।

শেষ হল ১৯০৮। ঠিক এই সময়ে খবর পেলেন : এক দারুণ সংবাদ : শেষ শয্যায় মেরী। অবিলম্বে না এলে দেখা হবে না।

ক্রমাগত মিঃ গোখলে মডারেট হয়ে পড়ছেন, সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, বিরোধীদের কাছে তাঁকে ছোট করে দিচ্ছে— যদিও তখনও তিনি আমেরিকা সফরে তাঁর স্কুল ও বিধবা আশ্রমের জন্য বক্তৃতা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে চলেছেন— তথাপি ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি লিখলেন ৯ই জানুয়ারী ১৯০৯ হতভাগ্য মারাঠা ব্রাহ্মণটি! জীবনকে কিভাবে না কাটা ছেঁড়া করছো!"

উদ্বেল হৃদয়, মার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য গভীর ব্যাকুলতা। প্রতিপত্তিশালী মিঃ লেগেটকে ১১ই জানুয়ারী ১৯০৯ চিঠি দিলেন : প্রিয় মিঃ লেগেট,

এই দারুণ সংকটকালে আপনার নিকট প্রার্থনার সুযোগ গ্রহণ করছি। যদিও জানি, এর দ্বারা কী অসুবিধা ঘটাচ্ছি এবং জানি, আপনার সময়ের মূল্য কতখানি! মিসেস বুলের নামে টেলিগ্রাফ করছি, অনুগ্রহ করে 'ক্যাম্পানিয়া থার্টিনস্থ এ' মার্গটের জন্য আসন সংগ্রহ করুন। যদি সম্ভব হয়, ইণ্ডিয়ান মেশনারী রেটে। তার উত্তর জানান। আমরা এখানে হিসাব করে দেখেছি ক্যাম্পানিয়া (কুনার্ড লাইন) নিউইয়র্ক থেকে পরশু ১৩ই সকাল ছাড়বে। আমাদের ধারণা— সস্তাতম স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে অন্য যে কারো চেয়ে আপনার ক্ষমতা বেশী।

আর একটি নিবেদন করতে পারি কি? আপনার পক্ষ থেকে টেলিফোনে, যদি কেউ জেনে নেয় যে, আগামীকাল, মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠে বসতে পারি কি না এবং সেই খবরটি যদি টেলিগ্রাফ করে কেউ আমাদের জানিয়ে দেয়। মিসেস বুল স্থির করেছেন : ট্রেনে বিকাল তিনটে কি চারটেয় আমার সঙ্গে নিউইয়র্ক যাবেন। তারপর স্টেশন থেকে গাড়ী করে মারী

হিল হোটেলে। সেখানে আমার মালপত্রের জন্য ওয়াগন নেবেন, জাহাজে উঠবেন আমার সঙ্গে এবং যদি সম্ভব হয়, রাত্রিটা জাহাজেই কাটাবেন।

এ সমস্ত হতে পারে, এমন জানিয়ে যদি একটি টেলিগ্রাম এসে পৌছায়— কী যে কৃতজ্ঞ হব আমরা।

গভীর ভালবাসার সঙ্গে এবং যে অসুবিধা ঘটাচ্ছি তার জন্য শতসহস্র দুঃখের সঙ্গে।

১২ই জানুয়ারী ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

আগামী কাল সকালে ক্যাম্পানিয়া-যোগে বিদায়। মিঃ লেগেটকে তার করেছিলাম, তিনি টিকিট কেটেছেন। তার এসেছিল শনিবার দুপুরে।... জানি তুমি আমার জন্য এই প্রার্থনা করবে যে, শেষক্ষণে আমি যেন মায়ের সেবায় লাগতে পারি। আহা আমার প্রিয় জননী!

তাঁর কাছে যেতে পারছি, তাতে গভীর শান্তি আর আনন্দ।

১৬ই জানুয়ারী ১৯০৯ জাহাজে থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

এই যাত্রায় সব কিছুই বিষাদের নয়। আমাকে আহ্বানের কারণটি দারুণ, নিশ্চয়ই, কিন্তু এই অপরূপ ব্যাপারটি রয়েছে— আমি যেতে পেরেছি— হয়ত সময়েই পৌছব।

বহুবার মনে হয়েছে— মার প্রতি কর্তব্য পালন তিনি করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু সম্মুখে তাঁর নানা দায়িত্ব। সেগুলি শেষ না করা পর্যন্ত সে অবকাশ তাঁর কোথায়?

এবার ডাক এসেছে মার কাছ থেকে। একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ফিরে এলেন ইংলণ্ডে— হোয়াট ডেল-বার্লি। মা সেখানেই শেষ শয্যায় শায়িত।

মার পাশে ফিরে এসে, সেবা শুশ্রূষার মন দিলেন। মাও শেষ সময় কন্যাকে কাছে পেয়ে খুশী হলেন। কিন্তু অবস্থা তাঁর ক্রমশঃই খারাপের দিকে এগিয়ে চললো। ২৩শে জানুয়ারী ভ্রাতা ও ভগ্নী মিলে একসঙ্গে 'হোলি কমিউনিয়ন' অনুষ্ঠান করলেন, গ্রামের যাজকের উপস্থিতিতে। মেরীও নিশ্চিন্তে শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

২৬শে জানুয়ারী সকাল [illegible]ই অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। বুঝলেনঃ তাঁর শেষ সময় উপস্থিত। মনে পড়ে গেল গোপালের মার কথা। ঘরের জানলা খুলে দিলেন। স্তব্ধ পরিবেশ। মার শয্যার পাশে ফুলের গুচ্ছ সাজিয়ে রাখলেন। বাতি জ্বাললেন। ধূপ জ্বেলে দিলেন। গন্ধে ভরে গেল ঘর। বিরাজিত হল অনির্বচনীয় প্রশান্তি। মার মাথার কাছে বসলেন। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে লাগলেন 'হরি ওম্'। পারের যাত্রী তিনি— কানে যেন— শেষ শব্দ হয় এটি। চোখের পাতায় ভাসতে লাগলো গোপালের মার মুখখানি। উদ্বেগহীন, প্রশান্ত অপূর্ব সে মূর্তি। অনন্ত সত্ত্বায় নিমগ্ন হয়ে যাওয়াই হল মৃত্যু।

২৭শে জানুয়ারী, ১৯০৯, মিসেস বুল মিঃ লেগেটকে লিখলেন : গতকাল মার্গটের কাছ থেকে একটি তার এসেছে। শুধু লেখা শান্তি! ... তাহলে, ছোট্ট মা-টি, মার্গটকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রাণটি ধরে রেখেছিলেন। মার্গট প্রার্থনা করতে পেরেছে কয়েকদিন। মায়ের সঙ্গে, ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে সংঘর্ষ ছিল। তিনি যাজকের পত্নী। কন্যার ধর্মীয় স্বাধীন আচরণে ক্ষুব্ধও ছিলেন দিনের পর দিন। শেষ পর্যন্ত কন্যাকে অনুমতি দিয়েদিলেন স্বামীর শেষ ইচ্ছা পূরণে। পরে স্বামীজি ও কন্যার সংস্পর্শে এসে ভেসে গিয়েছিলেন সেই অমৃতের পরশে। তিনি শেষক্ষণে আকাঙ্ক্ষা করলেন: ভারতীয় মৃত্যু।

২৯শে জানুয়ারী ১৯০৯ টাইমস পত্রিকায় দীর্ঘ পত্র লিখলেন মিঃ ম্যাককারনেস ...অশ্বিনীকুমার দত্ত উচ্চ চরিত্রের লোক।... শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে তাঁর দীর্ঘ সেবা...। আইন ও

বিচারের ভক্ত ইংরাজদের শুনিয়ে দিলেন— 'ম্যাগনাকার্টা', 'পিটিশন অব রাইট', হেবিয়াস 'কর্পাস অ্যাক্ট' এবং ভারতের রাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের কেন অবহেলা ঘটছে ভারতবর্ষে!

৩০শে জানুয়ারী ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে সকল বিবরণ দিয়ে চিঠি দিলেন! গত মঙ্গলবার সকালে মা মারা গেছেন— তখন নিম (ছোট বোন) আর আমি শুধু ছিলাম তাঁর কাছে। আমি চাপাস্বরে বললাম : 'হরি ওঁ!' যাতে তাঁর কানে সেই হয় শেষ বাণী! ঈশ্বরের করুণার শেষ নেই— ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম। বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, এখন তিনি যাচ্ছেন পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে। ২৪ ঘণ্টা একত্র ছিলাম আমরা। দেখলাম— তাঁর সমস্ত আত্মা ফিরল পরজীবনের দিকে। শুক্রবার সকাল থেকে মোটামুটি সারাক্ষণ ওষুধে নিঝুম ছিলেন।

'শেষ যে, সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা তিনি বলেছিলেন, তা হল 'ভারতীয় মৃত্যু' হচ্ছে আমার। আমরা ভাবলাম তিনি অগ্নি সৎকার চাইছেন— যা পূর্বেও চেয়েছেন। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তাঁর সে ইচ্ছা পালিত হল। আমাদের পারিবারিক যাজক সৎকার মন্ত্র পড়লেন— আহা, কী সুন্দরভাবে! একমাত্র এই পরিবর্তন করেছিলেন— "Commit her body to the fire, in the sure and certain hope of the resurrection of the body."

এর শরীর অর্পিত হোক অগ্নিতে, এই স্থির নিশ্চিন্ত প্রত্যাশায়— পুণরুত্থিত হবে দেহখানি।

কী আনন্দ হল শুনে, কারণ ঐ অর্থে তিনি ইতিমধ্যেই পুণরুত্থিত হয়েছেন। যে দেহবস্ত্রখানি আমরা সরিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে (পুণরুত্থানের) ঐ দেহের কোন সম্পর্ক নেই!

তাঁকে হারিয়ে কত না হারিয়েছি। তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আর কিছু চাইবার হেতু নেই। এখন একমাত্র কাজ, যতদ্রুত ও নীরবে সম্ভব ভারতে ফিরে যাওয়া। বুঝতে ও পারিনি কতখানি গুরুত্ব নিয়ে তিনি জীবনের ক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন। এখন দেখছি, তাঁর উপস্থিতি কত জিনিষের মূলে। কিন্তু তিনি, প্রিয় ছোট-মা-টি আমার, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ দিন পেয়েছিলেন। কী সুখী, একেবারে শিশুর মত নিশ্চয় এখন তাই হয়ে উঠেছেন। কত উদার ছিলেন, প্রেমপূর্ণ, নিঃস্বার্থ বিরাট প্রেমের তরঙ্গ তাঁর উপর ভেঙে পড়বে, উন্নীত করবে তাঁকে, স্থাপন করবে সমুচ্চ তরঙ্গ চূড়ে।

পুণ্য! পুণ্য! পুণ্যপ্রাণ! শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

মা মেরী ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল তাঁর জন্ম ও মৃত্যু একটা মহাপ্রবাহ। এক জীবন থেকে নবজীবনের সঙ্গে যাত্রা! নীরবে প্রার্থনা করলাম : এ যাত্রা শুভ হোক, শান্তিপূর্ণ হোক।

মনকে দৃঢ় করলেন— কিন্তু বাঁধ ভাঙা স্রোতে তলিয়ে গেলেন তিনি, বিস্মৃত সেই হারিয়ে যাওয়া দিন গুলির সঙ্গে : ... তাঁর সেই ছোট্ট মা। কি গভীর ভালবাসতেন তাঁকে। নাম ছিল তাঁর মেরী হ্যামিল্টন। জন্ম ১৮৪৫, বাবার সঙ্গে বিয়ে ১৮৬৬ তখন স্বচ্ছল ছিল অবস্থা, প্রথম সন্তান তিনি। আদর্শের টানে, ব্যবসা ছেড়ে যোগ দিলেন ধর্ম্ম যাজকের কাজে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, কঠোর শ্রমে, তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হল, ধরলো ক্ষয়রোগ। কয়েক বছরের মধ্যে দেহ ত্যাগ করলেন তিনি। মার বয়স তখন বত্রিশ। একপাশে স্বামীর মৃত্যুশোক, অন্যপাশে দারিদ্র্যের মধ্যে দুই কন্যা ও একটি সন্তান নিয়ে শুরু হল সে কঠোর সংগ্রাম। নিজের চোখে দেখেছেন দুশ্চিন্তা ও কঠোর সে পরিশ্রম, কুরে কুরে খেয়েছে মায়ের প্রাণরস। স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ পাননি সেই বৈধব্য জীবনে। মেয়ে, ছেলে বড় হল, দুঃখের অবসান হওয়ার পথে, তিনি পাড়িদিলেন অজানা এক দেশে। মনের দিক থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। যাত্রা করলেন ভারতবর্ষে, তাঁর ছোট্টমাটি পড়ে রইলো সুদূর ইংলণ্ডে। ভারতে পা দিয়ে, পেলেন নোতুন মা, সম্পর্কটা দাঁড়ালো টানাটানি, নিজে পেলেন শান্তি নোতুন মার সংস্পর্শে এসে। তবুও মনের কোনে ছিল স্পর্শকাতরতা। খুঁজে বেড়াতো ফেলে আসা,

বেদনাহত পিছনের টানে, কিন্তু লুকিয়ে থাকতো স্পষ্টই একটা ভীতি, কি দুঃসংবাদ আসে কে জানে? যারা পরিচিত, যাঁদের একান্ত আপনার জন বলে মনে হতো, তাঁদের কাছে চিঠি লিখে, মনের সে-বেদনা, প্রশমিত করতে চেষ্টা করতেন। অবশ্য তাঁরাই এগিয়ে এসে তাঁর ছোট্টমাকে সহায়তা দান করেছেন, সেই সে দুঃখের দিনে। পরিবর্ত্তিত সে মনের ধারা প্রকাশে, দ্বিধা জেগেছে মনে, ভয়ে, আতঙ্কে, পাছে, ছোট্ট মা ব্যথা পান মনে। কারণ তিনি যে আদর্শ স্বামীর একনিষ্ঠা সহধর্ম্মিনী! বোনের বিয়ের সব ঠিক, যাত্রা করলেন আচার্য্য সহ খোদ ইংলণ্ডে, উদ্দেশ্য: প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ। গুরুর চরণে নতজানু সবাই। মা, নিম এখন কি বোনে স্বামী পর্য্যন্ত। কি অপরূপ সে দৃশ্য! পরিবারে কাটালেন কয়েকটা দিন। স্বামিজী চলে গেলেন আমেরিকায়, ঠিক হল বোনের বিয়ে শেষ হলে পাড়ি দেবেন, নিজ উদ্দেশ্য সাধনে। সব সংশয়, সব দ্বিধার, শেষ হয়ে গেছে। তাঁর বাড়ীর সব কিছু উৎসর্গীত ভারতের জন্য। অনুভব করলেন: ভাইও স্বামিজীর সন্তান হয়ে দাঁড়াবে, তবে মা বেঁচে থাকতে নয়। অবশ্য রিচ, স্বামিজীর ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত— যদি তিনি ডাক দেন, কিন্তু তিনি মাকে দুটি সন্তান থেকে বঞ্চিত করবেন না, কারণ তিনি করুণার প্রতিমূর্ত্তি। যে সশরীরে তাঁকে দেখেছে, সেই জানে, তাঁকে জানার অর্থ খ্রীষ্টকে কিছু জানা।! নিজ ধর্ম্ম ধারণার প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও, উদার আধ্যাত্মিক বোধে জাগরিত হওয়া। এ গর্ব্ববোধ যত গভীর, দাবীও তাঁর উচ্চতর। তিনি মায়ের কাছে এসেছেন। কয়েকদিন থাকবেন, সব ভূলে যাবেন, এমন কি তাঁকেও। আবার অভিমানও সুগভীর। তিনিই তাঁকে মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, অথচ জগন্মাতার নিত্য সান্নিধ্য নিজে ভোগ করছেন, সান্নিধ্যে নিত্যবাস করছেন অথচ সেই মাতার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত করেছেন! তখন তাঁর ছোট্ট মাটি ছাড়া গতি কি? এক্ষেত্রে নিজের মাই ঈশ্বর মা। ... সেই মাই শেষ বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন মিলন-কুঞ্জে, যেখান তাঁর বাবা, প্রতিক্ষায় করছেন মহালিনের আশায়। অজ্ঞাতে বুক ভেদ করে নেমে এলো দীর্ঘশ্বাস। পশ্চাত্যের সব বন্ধন থেকে মুক্ত আজ তিনি। এখন... হ্যাঁ... এখন তিনি শুধু ভারতীয়। ভারত সত্তার প্রতীক তিনি। হ্যাঁ... এখন তাঁকে ফিরে যেতে হবে ভারতেই।...

ভারতে তখন চলছে আলিপুর বোমার মামলা। কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও মেদিনীপুরের মামলা খবরও অবগত হচ্ছিলেন। খবর পাচ্ছিলেন, শুরু হয়েছে গোয়েন্দা ব্যবস্থার, কানাঘুশায় শোনা যাচ্ছে, শাসক মহলের ভিতরের কথা, এমন কি শাসকবর্গের অনুভূতিহীন, ন্যায়বোধহীন, কর্মকাহিনী— সেই সঙ্গে খবর ভেতরের দুর্নীতির কথাও।

৩০শে জানুয়ারী ১৯০৯ তারিখে একজন অন্তরঙ্গকে জানালেন:

তোমাকে জানাতে চাই : বলা হচ্ছে যে, নর্টন পুরো অহাম্মক, তাঁর আইনজ্ঞান সামান্যই বা কিছুই নেই, উপস্থিত বুদ্ধি নেই, আইন-কৌশলও অনায়ত্ত। মামলা চলাকালে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল যে, সরকার পক্ষের আসল ঘুঁটি আশুতোষ বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকলে মামলা ভেঙে যাবে। তাছাড়া নটনের পত্নীকে গর্বভরে বলতে শোনা গেছে— যদি এই মামলা আরও ছ'মাস চলে, তাহলে তার একটা মোটর গাড়ী হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝতে পারছ, বাইরে থেকে যা দেখা যায়, ব্যাপার সর্বদা আসলে তা নয়। ইতিমধ্যে নর্টন যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছে, তা জুয়াখেলায় নষ্ট, এইরকমই শোনা যাচ্ছে।

এই মামলার পুলিশ সংগঠককে, মেদিনীপুর মামলায় তার সহকর্মী সম্বন্ধে খোলাখুলি ঘৃণা প্রকাশ করতে শোনা গেছে; লোকটাকে দেখ একবার। ধনী ও রাজাদের জড়িয়ে মামলা ফেঁদে বসে, কিন্তু ঐ সব ব্যক্তিরা সেরা আইনজীবী স্বপক্ষে দিতে পারেন, ফলে মামলা ফেঁসে যায়! এদিকে আমাকে দেখো! আমি সতর্ক থাকি— কোন ধনীকে না জড়াতে! কলকাতার পুলিশ!

অতীত ভেসে ওঠে চোখের পাতায় : মেরী হ্যামিল্টন... হ্যাঁ তাঁর মা বিয়ে হল ১৮৬৬ সালে স্যামুয়েল নোবলের সঙ্গে তখন তিনি সাফল্য ব্যবসায়ী। তিনিই তাঁর প্রথম সন্তান। এক বছর পরে, তাঁর বাবা স্যামুয়েলের আদর্শের পরিবর্ত্তন হল। জাগালো: জনসাধারণের মধ্যে কাজের আকাঙ্ক্ষা। ব্যবসা বেচে ফিরে গেলেন মায়ের কাছে। সঞ্চিত অর্থের শেষ, এলো অর্থ কষ্ট। গ্রহণ করলেন যাজকের বৃত্তি। অস্বাস্থ্য পরিবেশ, কঠোর শ্রমে— নষ্ট হল স্বাস্থ্য। ধরলো ক্ষয় রোগ। শেষ পরিণতি দেহত্যাগ। মেরী হলেন বিধবা বত্রিশ বছর মাত্র বয়স। এগারো বছর বিবাহিত জীবন। আদর্শ স্বামীর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সঙ্গিনী। সম্বল দুই কন্যা - একটি পুত্র। কঠোর সে জীবন। মেয়ে দুটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত, ছেলেটি শিক্ষিত ও প্রাপ্তবয়স্ক, ঠিক তখনই, বড়টি অজানা দেশে পাড়ি দিল অজানা ধর্ম্ম ও অজানা আশঙ্কার মধ্যে। জানতেন তিনি, মনের দিক দিয়ে মেয়ে তাঁর স্বতন্ত্র। প্রথম সন্তান সম্ভবা হয়ে আশঙ্কিতা মেরী, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন : শুভ প্রসব হলে তিনি তাকে দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। সেই সন্তান তিনি। স্বামীর মৃত্যুকালে, পত্নীকে উপদেশ দিয়েদিলেন : কন্যা তাঁর ধর্মের জন্য আত্মদান করবে, বাধা তাকে দিওনা।

...এরপর তাঁর মনে জাগলো ধর্ম ও ব্যক্তিগত জীবনের সংঘাত। সংশয় মন। যখন সে-পথ অন্বেষণে ব্যাপৃত, সহসা সাক্ষাৎ পেলেন ভারতীয় এক সাধু সন্ন্যাসীর। খুঁজে পেলেন পথ, শেষে তাঁরই আহ্বানে যাত্রা করলেন ভারতের উদ্দেশ্যে। সেখানে পেলেন, পরমমাতার স্নেহস্পর্শ। তাঁর মা হয়ে গেলেন "ছোট মা"!

বাল্যকালে ছিলেন অভিমানী, জেদী, গর্বোন্নশির এমনকি মায়ের কাছে মাথানত করে খাবার চাইতেও পারতেন না। অথচ ১৮৯৯ সালে ভারতে গিয়ে মিস ম্যাকলাউডের পরামর্শ মত — সেই পরম মাতার সঙ্গে নূতন সম্পর্ক পাতালেন। ফলে : তিনিই হলেন পরম-মা, মা তাঁর ছোট্ট মা-ই রয়ে গেল জীবনে। নাম পরিবর্তিত হল। গুরু দিলেন নূতন নাম। পরিচিতা হলেন নিবেদিতারূপে। পেলেন মন্দিরের সন্ধান, পেলেন মাতৃত্বের বিগ্রহরূপী বিগ্রহকে। তবু মনে জাগরুক ছিল: ছোট্ট মা-টির কথা- একান্ত নিভৃতে।

মনে পড়লো : মনের সংশয় ও আকুতিপূর্ণ দিনগুলির কথা। ফেলে আসা মা-র সংবাদ জানার গভীর আকাঙ্ক্ষা, অথচ তাদের চিঠি পেলে পাছে মনের দ্বার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ভয়ে সে চিঠি পুড়িয়ে ফেলার বাসনা, সেইসঙ্গে পরিবারের বিষয়ে কিছু মিষ্টি খবর জানার প্রতীক্ষায় তৃতীয় পক্ষকে অনুরোধ করা এমন কি পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে নিজের হৃদয়হীনতার ক্ষোভ প্রকাশও!

পরম মাতাকে জীবনে গ্রহণ করার কথা — ফেলে আসা সেই ছোট্ট মা-টির কাছে প্রকাশে মনের কোণে ছিল কত না কুণ্ঠা! পরিবর্তিত ধর্ম বিশ্বাস, কালীতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁর মন, নিজ পরিবারের গোচরে আনার কত না শঙ্কা! একথা জানা জানি হলে, ছোট বোনের হয়ত বিয়েই হবে না - কি দুশ্চিন্তা! এরপর ১৮৯৯ সালের শেষ সময়, বোনের বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা - স্বামিজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যযাত্রা - সকল সংশয়ের অবসান। তাঁর আচার্য্যদেবকে সকলের স্বীকৃতি। এমনকি মা, বোন, রিচ (ছোট ভাই) বোনের প্রণয়ীর ভক্তি আপ্লুত শ্রদ্ধায়নতচিত্ত তাঁদের ঘিরে। অনুভব করেছিলেন সেদিন : তাঁর বাড়ীর সবকিছুই ভারতের জন্য উৎসর্গকৃত। ভাইও একদিন স্বামিজীর সন্তান হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু স্বামিজী মার জীবন থেকে দুটি সন্তানকে ছিনিয়ে নিলেন না।

এলো ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। সব দ্বার খুল গেল। স্বামিজীর প্রভাবে এগিয়ে এলেন মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউডরা। যে সমস্যা তাঁকে বিচলিত করেছিল, তাঁরা তাঁর মা ও ছোট ভাইটির স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেদিলেন। মর্মস্পর্শী সহৃদয়তা পেলেন লেডী বেটী (মিসেস লিগেটের) কাছ থেকে। সবসময়েই তাঁর মনে জাগরুক ছিল : মার দুঃখময় জীবনের কথা। ১৯০৫ সালে ব্রেন ফিভারে যখন তিনি মৃত্যুমুখে, মাকে খবর দেননি। এমনকি সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও সে সংবাদ মা'কে

জানাতে নিষেধ করেছেন মিস ম্যাকলাডডকে। ১৯০৭ সালের যখন ইংলণ্ডে ফিরবেন স্থির করছেন, তখনও মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে পাশ্চাত্য যাচ্ছি।... যেসব বন্ধুদের বন্ধুত্বের মূল্য দিতাম, তাদের কতজন শেষবার ইংলণ্ড ছাড়ার পরে মারা গেছে। মাকে দেখতে আবার গিয়েছি, ভাবতে ইচ্ছে করছে। বেচারা ছোট্ট মা-টি — কত রোগাও পাতলা হয়ে গেছেন যেন! ... ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭, মিসেস ওলিবুলকে লিখেছিলেন : তুমি ইংলণ্ডে আসছ, এ সংবাদ পূর্ণ তৃপ্তিকর। আবার মিষ্টি ছোট্টমা, ছোট্ট নীড়টি তাঁর তৈরী করে রেখেছেন — আমাদের সকলের আসার অপেক্ষায়। সুতরাং শুভশ্য শীঘ্রম।

মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, বাড়ী ফিরতে কী সুখ? কি আনন্দ! যেখানে স্নিগ্ধতম আত্মাটি বিরাজ করছে। মা তাঁর নিজের রাজ্যে—মাধুর্য্যে, সাহায্যে — সেবায় পূর্ণ। প্রতিটি জিনিষ ওখানে অপরূপ সুন্দর।

এরপর আমেরিকা কাজের মধ্যে যখন গভীরভাবে ব্যাপৃত, খবর পেলেন — মা শেষ শয্যায়। অবিলম্বে না এলে দেখা হবেনা! ভুবন তখন তৃষাতুরা...

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন মিঃ ম্যাককারনেসকে সমর্থন করে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটে চিঠি দিলেন। "এটা আশা করা যায় না যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সরকারী মহল নির্ব্বাসন সম্বন্ধে টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ ম্যাককারনেসের কঠিন ও শীতল তথ্যবাহী পত্রটিকে উপেক্ষা করতে পারবে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ মিসেস বুলকে লিখলেন : "সূর্য্যের একটি কিরণরেখা ছড়িয়েছিল, আমাদের প্রত্যেককে সকলকে সেবা ও আশীর্বাদ করতে — তোমার এই কথাগুলি কি সুন্দরভাবে মায়ের বিষয়ে ভাবপ্রকাশ করছে। আহা! আমার পৌঁছানো, তাঁর কাছে কতখানি না হয়ে উঠেছিল! মিঃ অ্যাডামস্ যা বলেছিলেন - তা যেন আন্তরিকভাবে সত্য হয়েছিল। নিম, বলেছে আমি যে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম, এরপরে সে আর কখনো ঈশ্বর-করুণায় অবিশ্বাস করতে পারবে না। তোমার উপস্থিতি বড়ই চেয়েছিলেন। সেকথা প্রায়ই বলতেন। ...প্রার্থনা ঘরে শান্ত প্রহরটির জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কারণ আমি জানি, তুমি তাঁকে সাহায্য করেছিলে। কত না মনে হয়, অপর জীবনের মধ্যে জন্মলাভ, এই পৃথিবীতে জন্মলাভের মত ব্যাপার — প্রেম ও প্রার্থনা তাতে বহুল সহায়তা করে।

নিম, খুব শোক পেয়েছে। পুত্রশোকের মত বেদনা। আর্নেষ্ট ও রিচ এই দু'জনই ছিল শুধু কফিনবাহক — এখানে ও অগ্নিসৎকার স্থানে। তাঁর বিষয়ে ভাইকারের কত ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সুকোমল আন্তরিকতা।

শেষ সন্ধ্যায়, শেষের শিহর যখন দেখলাম, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর কাছে প্রার্থনা করলাম — এঁকে তুলে নাও করুণা করে, যত শীঘ্র সম্ভব, মধ্যরাত্রির আগেই। তারপরে ভাবলাম, প্রার্থনা তো করছি, এখন আর কিছু চাওয়া উচিত নয়, তাঁদের কাছে বা অন্য কারও কাছে। অপরপক্ষে পরম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যাশা করতে হবে — যা শ্রেয়, তাই তাঁরা করবেন এঁর জন্য। আরও দেখলাম, আমার প্রার্থনার পরে, তাঁরা যা কিছু শ্রেয় বলে স্থির করবেন, তাকেই বরণ করতে হবে।

সকালে যখন তাঁর কাছে গেলাম, দেখি শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে। নিম বললো, পাঁচটা নাগাদ এমন হতে শুরু হয়েছে।

প্রাতঃরাশে গেলাম, যদিও মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যাওয়া কঠিনছিল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম, তৎক্ষণাৎ নিমকে ডাকলাম। কিন্তু অর্নেষ্ট যতক্ষণ না গিয়েছে এবং নিম আর আমি শুধু

তাঁর কাছে আছি, ততক্ষণ মৃত্যুক্ষণ দেখা দেয়নি। তারপর শেষের শুরু। আহা — তিনি যা চেয়েছিলেন, ঠিক সেই জিনিসটি সর্বাংশে একেবারে আক্ষরিকভাবে যেন ঘটে গেল। বলে, সেকথা বোঝানো যাবে না।

আমি সাক্ষাৎ অনুভব করলাম — স্বামিজী এসেছেন এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দ্বার তিনি নিজে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। আমি চাপা স্বরে বললাম, 'হরিওঁ'! যেন তার কানে পৃথিবীর শেষ শব্দ হয় ঐগুলিই। এত স্তব্ধ — গভীর আমরা, এত সুগভীর মৃত্যুর অপূর্ব নিরোধের তীব্রতা, আমাদের এতই অভিভূত করে ফেললো যে, চোখের জল বা তেমন সব কিছু আবেগ স্তম্ভিত হয়ে রইল, ছেয়ে গেল অনুপম শান্তি আর আনন্দে, ঊর্দ্ধলোকের বস্তু যা সারাদিনের জন্য।

মা দেহ রাখলেন ৬৪ বছর বয়সে — যখন আমি ৪২ বছর। স্বামী হারান ৩২ বছর বয়সে — বাকী ৩২টি বছর স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় প্রতীক্ষিত ছিলেন। আত্মা তাঁর ঊর্দ্ধপ্রয়াণ করেছে।

বাবার সব কটি উপদেশ রিচি ও তার সন্তানদের জন্য সাজিয়ে রাখতে বলেছিলেন আমাকে।.... অপূর্ব সে ভাষণগুলি, একজন কবি যেন তার হৃদয় উদ্ঘাটিত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের জনগণের স্থূলমস্তিষ্কে কিন্তু প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উপরে। এগুলো যে পড়তে হল, তার জন্য আনন্দিত। সেই সঙ্গে এই কথা ভেবে বুকে আঁচড় লাগলো — বেঁচে থাকতে মা কতখানি সুখ পেতেন এগুলি থেকে।

১৮৭৫ বা ১৮৭৬ সালের ভারতীয় দুর্ভিক্ষের উপরে লিখিত একটি ভাষণ পেয়েছি — সেটি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে।

এই ভাষণগুলি মায়ের কাছে হৃদয়ের সামগ্রী, যাদের ধারণ করে তিনি তাঁর অপূর্ব বৈধব্য জীবন যাপন করেছেন।

জনৈক আই, সি, এস টাইমস পত্রিকায় সরকার তরফে উত্তর দিলেন : মিঃ ম্যাককারনেসের।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ মিঃ ম্যাককারনেস টাইমস পত্রিকায় তার উত্তর দিলেন। কয়েকমাস পরে ১৪৬ জন এম পি (লিবারেল ৮৪ লেবার ৬২ ও আইরিস) সহ প্রধানমন্ত্রী এইচ এম অ্যাসকুইথের কাছে অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ বিনাবিচারে নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯, মিস ম্যাকলাউডকে ভূপেন্দ্রনাথকে সাহায্যের জন্য লিখলেন, আমি গোপনে তোমাকে 'কালী দি মাদার' বই থেকে প্রাপ্ত একটি 'চেক' পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটি স্বামিজীর ভাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হোক, তাই চাই। তুমি জানো, আমি তাকে লিখতে পারিনা। যখন আমি ভাবি যে স্বামিজীর লোকেরা আমার ভাইয়ের জন্য কি করেছেন, তখন তাঁর রক্তের ভাইয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়া নিশ্চিত উচিত কার্য মনে করি। (মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডই তাঁর ভাই রিচমণ্ডকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল এঁরা স্বামিজীর শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তি)।

ভূপেন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত নিবেদিতা। তাই তাঁর শিক্ষার প্রসঙ্গ তুললেন। আমি চাই, সে ইতিহাস পড়ুক এবং পাশাপাশি যদি সে চায়, সাংবাদিকতার জন্য তৈরী হোক। একটির শিক্ষা অন্যটিকে সাহায্য করবে। আমি এই কাল্পনা না করে পারি না — ভারতবর্ষের যে বিরাট ইতিহাস লিখিত হবার অপেক্ষায়, আমার আশা, তা রচনার সামর্থ্যযুক্ত মানুষ ঐ পরিবার থেকেই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তা সৃষ্টির জন্য, প্রয়োজনীয় ব্যাপক সংস্কৃতিবোধ তাকে অর্জন করতে হবে, যার সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত সে, সচেতন কিনা সন্দেহ! বই, মিউজিয়াম শিল্পদর্শন এবং শেষতঃ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের দর্শন — এসকলই ভূপেনের শিক্ষার আবশ্যিক অংশ হোক।

১৯০২ সালের চিঠিতেও মিস ম্যাকলাউডকে একই কথা লিখেছিলেন, মিসেস বুল ভূপেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে উৎসুক, আর সে ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন সিস্টার ক্রিস্টিন, যিনি ভূপেন্দ্রনাথকে খুবই পছন্দ করেন।

এপ্রিলের ইস্টারে, তিনি ভাইবোন সহ যাত্রা করলেন ডেভেনশায়ারে। যে পল্লীতে তাঁদের কেটেছে শৈশব, নাম তার গ্রেট টরেন্ট পল্লী। সেখানেই সমাধিত করা হয়েছিল তাঁর বাবাকে। উদ্দেশ্য : মা-র দেহ ভস্ম ও সমাহিত করবেন বাবার সমাধির পাশে। সমাহিত করলেন দেহভস্ম। মৃত্যু দিনটিই তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ দিন। সেখান থেকে ফিরে ৫ই এপ্রিল ১৯০৯। মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

পিতার সমাধিতে মায়ের ভস্ম স্থাপন করার জন্য ডেভনশায়ারে গিয়েছিলাম মে ও আর্নেস্টের সঙ্গে। ইণ্টার ইভের দিনে সেকাজ করা হয়েছে, সুন্দর নয় কি? স্থানীয় লোকজনই সে কাজ করেছে, মাকে সম্মান জানাতে। সুতরাং তাঁরা দু'জনেই এখন একই বিশ্রামস্থানে পাইন ঘেরা জায়গাটিতে। আমরা যেন অনুভব করেছিলাম — তাঁরা আবার তাঁদের তরুণ জীবনে ফিরে গেছেন। আহা — হায়! কত অধৈর্য্য আর অবহেলার স্মৃতিকে, বেদনাশ্রুর সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে! তোমার কাছে যেন কখনো দুষ্ট না হই— হতে দিওনা কখনো।

মাতার মৃত্যুর পর তিনি কয়েকদিন ভাইবোনের সঙ্গে কাটালেন। মনে হতে লাগলো — এটাই হয়তো তাদের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। মনের কোণে সন্দেহের দানা — আবার কি লণ্ডনে ফিরবেন? স্থির বিশ্বাস, ভারতের পবিত্র ধূলিতেই তাঁকে তাঁর নশ্বর দেহত্যাগ করতে হবে বিধাতার নির্দেশ। তাঁর শ্রীগুরুর আত্মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে গেছেন অমরধামে, যেতে তাঁকেও হবে, শুধু সময়ের প্রতীক্ষা।

মার প্রতি কর্তব্য তিনি পালন করেছেন — এইটুকুই যা সান্ত্বনা। এখন তাঁর অনুরোধ পূরণের সচেষ্ট হলেন। বাবার ভাষণগুলি সযত্নে লিখলেন। সুবিন্যস্ত করলেন রিচমণ্ডের জন্য। এরপরই শুরু হল স্বামিজীর কাজ। তাঁর লিখিত চিঠিগুলি মিঃ স্টাডির কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন। সেগুলির নকল করলেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকায় বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা শেষ করে ডঃ বসু সস্ত্রীক ইংলণ্ডে ফিরে এলেন মার্চে। স্থির হল মে মাসের শেষে তাঁরা ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯০৯, মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন : বউয়ের বক্তৃতায় খুব খুশী।

মর্লে স্কীম প্রকাশিত হল। ভারতীয় চরমপন্থীরা এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করুন এটা চাইলেন নিবেদিতা। এটা তাঁর রাজনৈতিক কৌশলগত কারণ। ২৩শে ফেব্রুয়ারী মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন ঃ যদি তুমি এই সপ্তাহে মডার্ণ রিভিউ-এ লেখ এবং আমি লিখি — তাহলে একটা ঘোষণার দিকে এগিয়ে যায়। কাছাকাছি থাকলে আমরা সেই ঘোষণা প্রস্তুত করে ফেলতে পারতাম। ভারতীয় দল 'নিউস্কীম' সম্বন্ধে উত্তপ্ত সমাদর ঘোষণা করুক— তাই, আমি চাই। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের তীব্র বিরোধিতার সামনে (ভারতের ইংরাজ প্রশাসক) এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। আগেও ভেবেছি, এখনও ভাবছি — নিউ স্কীমের পক্ষে সমাদর ও গ্রহণের মনোভাব দেখানোই আমাদের পক্ষে প্রাজ্ঞতম ও সুন্দর ভঙ্গি হবে।

নিবেদিতা যা ভেবেছিলেন, কার্যতঃ তাই ঘটলো। ভারতের ইংরাজ আমলাতন্ত্র, বিরোধিতায়, উঠে পড়ে লাগলেন। মিঃ মর্লে পিছু হটলেন। তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন — নাড়া দিতেই ঢলে পড়বেন।

জানুয়ারী ১৯০৯ মডার্ণ রিভিউতে মিঃ মর্লের 'রিফর্ম' বক্তৃতায় যে প্রস্তাব আনলেন, তিনি তার সমালোচনা করলেন, এ স্কীমে কি পাওয়া যাবে — কি যাবে না।

প্রথমেই বললেন, স্বদেশী আন্দোলন দমনে, সরকার পার্টিশন তরফে যে বৃহৎ অন্যায় ও তা দমনের উদ্দেশ্যে যে উৎপীড়ন চালিয়েছে, সেটা ছিল ভ্রান্তনীতি। বাঙালী জাতির অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব্ব করার জন্যই তা কৃত। কার্জ্জনের অনুচিত শিক্ষানীতি, বিনা বিচারে নির্বাসন, সমিতিগুলির বিরুদ্ধে নতুন ফৌজদারী আইন, আপদজনক থানা তাল্লাসে রাজদ্রোহের মামলা — এইসব বিশ্লেষণের পরে, দেখতে হবে প্রস্তাবিত স্কীমের ত্রুটি ও তার সীমাবদ্ধতা। প্রাদেশিক আইন সভায় যে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের কথা আছে, যেভাবে সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি স্থির হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় — জনগণের যথার্থ নেতা কাউন্সিলে যেতে পারবেন না। কারণ দুটি, প্রথমতঃ সরকার শিক্ষাপ্রসারে অনিচ্ছুক, অথচ কাউন্সিলে যথার্থ সদস্য নির্বাচনে শেষপর্য্যন্ত জনগণের বুদ্ধিশক্তি ও রাজনৈতিক চেতনার সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। সে অবস্থা কখনই লাভ করা যাবে না, যতক্ষণ না প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল বিস্তারের ফললাভ জনগণ করতে পারছে। সরকারের পরিকল্পনা হল দ্বিতীয়তঃ, কাউন্সিলে শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব। সরকারের যুক্তিঃ ঐ পদ্ধতিতে অনগ্রসর শ্রেণীরা প্রতিনিধিত্ব পাবে। এই ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে চিরদিনের ভেদ-প্রাচীরের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সকল শ্রেণীকে সম্মিলিত করে ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের প্রতিবন্ধকতা করবে, এই ব্যবস্থা। যেখানে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ণের প্রশ্নটি সর্ব্বাধিক বিবেচ্য, সেখানে অনুন্নত শ্রেণীর এক ধরণের ভোটের অধিকারী। তাদের কাছেই ভোট চাইতে যেতে হবে, তখন তাদের অনুভূতি ও স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনার মনোভাব রাখতে হবে, আর ছুঁতমার্গ চলবে না। কাউন্সিল কক্ষে, ব্রাহ্মণ ও পারিয়া, ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলতে হবে।

আমাদের মুক্তি আছে, আমাদেরই হাতে, সরকার আমাদের জন্য কী করতে পারে তার মধ্যে নয়। একথা যেন আমরা কদাপি ভুলে না যাই।

যদি আলস্য ও স্বার্থপরতা ঝেড়ে ফেলে, কেবল সম্ভাব্য সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করি, যাতে তা জাতীয় ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সজাগ ও সক্রিয় আগ্রহের উদ্বোধন মন্ত্র হয়ে উঠতে পারে — তবেই সর্ব্বাধিক ফললাভ ঘটবে।

এরপরেই নির্ব্বাচন পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করতে আমলাতন্ত্রের প্ররোচনায় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবিকে উচ্চতর করা হল। মার্চ মাসে মুসলমান রিপ্রেজেনটেশন পাঠান হল।

নিবেদিতা এই অহেতুক দাবিকে তথ্য ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করতে চাইলেন মার্চ ১৯০৯ সালের মডার্ণ রিভিউর সম্পাদকীয়তে : কোন কোন মুসলমান নেতা ও তাঁদের অনুগামীরা পৃথক মুসলমান প্রতিনিধিত্ব চান — তার অর্থ তাঁরা মুসলমান ভারত ও অমুসলমান ভারত — এই দুই ভারত চান — যা আওরঙ্গজীব পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবেন নি।

ইংরাজ আমলাতন্ত্র, প্রত্যুত্তরে উদ্ভট অসংলগ্ন উক্তি বিস্তার করলো। বললো, এটা উচ্চতর রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য পশ্চাদপদ মুসলমানদের জন্য অধিক আসন, তাদের রক্ষা কবচ।"

উত্তর দিলেন নিবেদিতা— "ব্যাকওয়ার্ড অথচ হিন্দুত্বের অপেক্ষা সুপিরিয়র পলিটিকাল ইম্পটন্সি যুক্ত? নিশ্চয় ইংরাজী শব্দ তাদের অর্থ বদলে ফেলেনি? দৃঢ়তার সঙ্গে লেখনী চালালেন, আমরা কদাপি মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরোধী নই, এবং জ্ঞানত : কখনও তাদরে সম্বন্ধে অন্যায় করিনি। আপত্তির হেতু : যেসকল মুসলমান নেতা ও তাঁদের অনুচরগণ এই প্রকার দাবি করছেন, তাঁরা কখনও তাঁদের হিন্দু ও অপরাপর দেশবাসীদের সঙ্গে নাগরিক অধিকারলাভের

প্রায়সে হাত মেলান নি। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলসমূহ বিস্তৃত কারর ইচ্ছা, যখন থেকে সরকার ঘোষণা করেছে, তখন থেকেই এইসকল মুসলমানেরা, আসন সংখ্যার সিংহভাগ পেতে চাইছেন, যেন তাঁরা গত কয়েক দশকের নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির সংগ্রাম ও অন্যান্য আন্দোলনে সিংহভাগ অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁদের ভূমিকা কি 'ভেদ ঘটাও শাসন করো' নীতির প্রয়োগকর্তাদের হাতের যন্ত্রে পরিণত হওয়ার সামিল নয়?

মডার্ণ রিভিউতে নিবেদিতা একটি নোট লিখলেন ফেব্রুয়ারী ১৯০৯। নোটটির নাম "দি ক্যারকটার অব দি পুলিশ'। মনিং লীডারে মিঃ ম্যাককারনেস একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন ভারতের পুলিশ চরিত্র সম্বন্ধে। ডেইলি নিউজে মিঃ র‍্যাটক্লিফের একটি চিঠি বেরিয়েছিল। সেগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করলেন : ভারতে ইংরাজ প্রশাসকরা যে কোন সংখ্যায়, খ্যাত, অখ্যাত, ব্যক্তিকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে, তারা যে কোন সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু ঘটনাগতি নিয়ন্ত্রণের শক্তি তাদের নেই। এর সঙ্গে মৎসিনী থেকে উদ্ধৃতি দিলেন। 'জীবন মানে আদর্শের জীবন। কর্তব্য, তাই তার প্রথম নীতি। ...তরুণ ভ্রাতৃগণ! যখন তোমরা তোমাদের আত্মার মধ্যে, আদর্শ ধারণা করবে, তখন সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সফল করো— তাতে তোমরা প্রেমের আশীর্বাদ পাও বা ঘৃণার মুখোমুখি হও— কিছুতে পশ্চাতপদ হয়ো না। যদি দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনা ও ছলনা সত্ত্বেও তোমরা ঐ আদর্শকে শেষপর্যন্ত অনুসরণ না করো — তাহলে তোমরা কাপুরুষ, নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস হন্তা।'

ইতিপূর্বে তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলে 'অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলের' উপর বিতর্ক শুনতে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখলেন, লিবারেল মর্লে ও কনজারভেটিভ কার্জন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। ৫ই মার্চ ১৯০৯ চিঠি লিখলেন : মর্লে ও কার্জন পরস্পর উভয়কে অভিনন্দন বিনিময় করছেন। মর্ডান রিভিউতে লিখলেন এপ্রিল সংখ্যায় : 'দি ইণ্ডিয়ান ডিবেট ইন দি হাউস অব লর্ডস'। লর্ড সভায় কার্জন বা মর্লে কারও বক্তৃতাই উচ্চাঙ্গের হয়নি। আইরিশ ন্যাশানালিস্ট লর্ড ম্যাকডোনেল কি ভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফেলেছেন, তার উল্লেখে ক্ষোভ জানালেন : উদারনৈতিক মর্লের অধঃপতনে। লর্ড মর্লে ও লর্ড কার্জনের বক্তৃতায় পরস্পর উচ্চ ও বিস্তারিত প্রশস্তিবাক্য শোনালেন। মুসলমানদের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে যেগুলি তাদের অজ্ঞতা, অন্ধ গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের হাতের পুতুল হওয়ার পুরস্কার। .....লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে, 'যেকোন সংখ্যায় মুসলমান নেওয়া হোক, ব্যক্তিগতভাবে আমদের তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বজ্জাতির মূল, রয়ে গেছে একটি ক্ষেত্রে, সেই মুসলমানদের দাবি সমর্থনের দ্বারা, তাদের কৃতজ্ঞতার উপরেও নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। ভারত সচিব মুসলমানদের আন্দোলনের কাছে, সত্যই নতিস্বীকার করেছেন একথা ঠিক নয় — তিনি নতিস্বীকার করেছেন, টোরী প্রেস ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কাছে, যারা প্রতিনিধিত্ব প্রশ্নটিকে, ব্যবহার করেছে 'মুসলমান ও হিন্দুদের সামাজিক শত্রুতাকে' বাড়িয়ে তুলতে।

ইংরাজগণের পৃথিবী শাসনের অধিকার বিষয়ে, দৃঢ় বিশ্বাসী এক ব্যক্তির নাম লর্ড কার্জ্জন। যিনি জগতে, শ্বেত মানুষদের বিরাট জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী। হাড়ে হাড়ে টোরী তিনি। এক নম্বর স্বৈরাচারী, গণতন্ত্রে বিশ্বাস নেই তাঁর। বক্তৃতার আবেগে, অজ্ঞ অগণিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে কাতর হয়ে বলেছেন, 'জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনে, ভারতের অগণিত মানুষের কোন প্রয়োজন নেই, তাদের প্রয়োজন উত্তম সরকার, এবং উত্তম সরকার বলতে ইংরাজ সরকারকে বোঝে। তাদের মনপ্রাণের সেই সরকার, যা তাদের দুষ্ট মহাজন ও জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা করবে, রক্ষা করবে স্থানীয় উকিল ও অন্যান্য মানবদেহী হাঙরদের মুখ থেকে। এই সুখহীন মানবগুলি, মহাজন, উকিলদের হাতে অসহায় শিকার।

মানবদেহী হাঙর সত্যই কারা? শেষবাক্যটিকে পুরো চালু করার জন্য কার্জ্জনের তালিকায় যোগ করা উচিত ছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ট্যাক্স কালেকটর, অ্যালো ইণ্ডিয়ান চা মালিক, এবং অ্যালো ইণ্ডিয়ান ভাগ্যান্বেষী, যাদের হাতে থেকে ভারতীয় জনগণকে রক্ষা করা অবশ্যই দরকার। এই সকল লোকগুলির তুলনায়, দুষ্ট মহাজন বা জমিদার, স্থানীয় উকিল কিছুই নয়। কেননা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা, চাতুর্য্য কৌশলে বহুগুণ অধিক সমৃদ্ধ। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সাম্রাজ্য ও বিরাট এক সভ্যতা। তাদের আয়ত্তে রয়েছে এমন হননের যন্ত্র, যা সামান্য সংখ্যাতেও লর্ড বাহাদুরের বক্তৃতায় উল্লিখিত, ভারতীয় শ্রেণীগুলির হাতে নেই। হতভাগ্য কুলিদের, বিশেষত চা-বাগানের কুলিদের, হৃদয় বিদারক অবস্থা, রায়তদের অসম্ভব নিষ্পেষণ, দারিদ্র্য, সরকার কর্তৃক রেলপথে, পূর্তবিভাগে, কলকারখানায় ও অফিসে নিযুক্ত শ্রমিকগণের যৎসামান্য বেতন ও নিদারুণ ঘর্মাক্ত পরিশ্রম, যে কাহিনী রচনা করেছে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে, নরদেহী হাঙরদের কবল থেকে ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশকে, আমরা কেবল রক্ষা করছি বা করতে পারি— 'ভারতের ইংরাজ প্রশাসকদের এই বড়াই' কতখানি সমর্থনযোগ্য?

আমার মনে হয় : নরদেহী হাঙরের সংজ্ঞা ও বর্ণনা যদি আমরা, লণ্ডনের বেকাদের কাছ থেকে এবং তাদের পক্ষ সমর্থক পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্যদের কাছে থেকে লাভ করতে পারি, সেটা বড়ই মনোহারী দাঁড়ায়। দুভার্গ্যবশতঃ আমরা ভারতীয় হাঙরদের সঙ্গে, তাদের ইংরাজ প্রতিরূপদের— দেহ-মনোগত মস্ত কিছু পার্থক্য দর্শন করতে সমর্থ নই। ....অনেক ইংরাজ লর্ড মহাশয় ও জমিদার, এই ধারণা করে বসে আছেন — এই পৃথিবীর হতভাগ্য মৎসকুল, কেবল হাঙরদের জন্যই দেহধারণ করবে — তাইতো স্বাভাবিক ও বিধিসঙ্গত।

একই মাসে সম্পাদকীয়তে লিখলেন, মর্লে স্কীম অ্যাণ্ড দি সিচ্যুয়েসন। সেটি শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার দায়িত্বহীন রচনার সমালোচনা। মডার্ণ রিভিউতে মার্চ মাসে ১৯০৯ সালে লিখলেন, কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা, নিজেদের দেশের মানুষকেও শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'ডিমক্র্যাটিক ফিলিং ইন ইংল্যাণ্ড' এ বললেন, 'গণতান্ত্রিক সংগা'র অর্থ দাঁড়ায় বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, অথচ গ্রামের অবক্ষয় ও কৃষির ক্ষতি ঘটাচ্ছে— সাম্রাজ্যবাদ। ইংলণ্ড এখন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, কারখানা অঞ্চলে। নিটফল বাণিজ্যের ওঠা পড়ায়, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অগণিত মানুষের ভাগ্যের ওঠাপড়া। বেকার ভর্তি, মুখে তাদের নৈরাশ্যের কালছায়া। দরিদ্র যখন দরিদ্রতর হচ্ছে, ধনী সেখানে টাকার স্তূপ জমিয়ে যাচ্ছে। দুই শ্রেণীর ব্যবধান ক্রমেই বর্ধিত আকারে মুখব্যাদান করছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড তার শিক্ষাপদ্ধতিও তত্ত্ববিজ্ঞানের বদলে কারিগরী বিজ্ঞানের প্রাধান্য বাড়িয়েছে। ফলে, জার্মানী প্রভৃতি দেশের কাছে সে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। এ অবস্থার আসল চেহারা সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত, যেহেতু সাম্রাজিক বাজার তার মুঠোর মধ্যে।

...যারা বিশেষ অধিকারভোগী, স্মরণ রাখা উচিত তারা দেশের পক্ষে পরগাছা। আর বিশেষ অধিকারভোগী দেশ, পৃথিবীর পক্ষে পরগাছা। ইংলণ্ড মৃত্যু-পথবর্তী। যে জাতি তার সকল সন্তানের সুখকে, কয়েকটি লোকের সুখ সম্পদের কাছে উৎসর্গ করে দিয়েছে, সে জাতি ইতিমধ্যেই মৃত্যুপথে পা বাড়িয়েছে।

ক্রমবর্দ্ধমান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে বললেন, বেকার লোকেরা সর্বত্র সোস্যালিষ্ট বাগ্মীর চারপাশে সাগ্রহে ভীড় করছে। যদিও সোস্যালিজম শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য্য সাধারণভাবে অস্পষ্ট। ভবিষ্যৎবাণী করলেন : ঐ অস্পষ্ট অর্থ শীঘ্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেই অর্থ অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পদ, যা মানুষ নিজে অর্জন করেনি, বা অবশিষ্ট মানব সমাজের উপর অত্যাচার ও বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। যেকোন ইন্ধন ঘটনা, যথা নিউ ইয়র্কের কর গণ্ডোগোল — পাশ্চাত্যে ধনতন্ত্রের বারুদখানায়, অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। অনিবার্য্য

নিয়তি তাই। অধিকার ভোগীদের প্রতিটি প্রজন্ম ভূমিষ্ঠ হয়, ক্রমবর্দ্ধিত নির্বুদ্ধিতা ও লাম্পট্যের মধ্যে। আর সর্বহারাদের প্রতিটি প্রজন্ম, উত্তরোত্তর বঞ্চিত হয় জাতীয় উত্তরাধিকার থেকে। নিঃসন্দেহে, দারিদ্র ও নৈরাশ্য অতীব দাহ্য সামাজিক পদার্থ।

৩রা মার্চ ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ডঃ বসু সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনার কথা যে চিঠিতে লিখেছ, তা আমার কাছে এসে পৌঁছায় নি, কেবল তার বিষয়ে উল্লেখ আছে এমন দুটি চিঠি পেয়েছি। তোমার আইডিয়া কি, তা অনুমান করতে পারছি না। কিন্তু যদি কোনভাবে তার কোন সাহায্য করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়— সেক্ষেত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞই হবো, আমার একমাত্র অনুভূতি।

৯ই মার্চ ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তুমি কি এপ্রিলে লণ্ডনে যাবে? ঐ সময়ে আমি ওখানে থাকার আশা রাখি।

৯ই মার্চ ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, তুমি কি এপ্রিলেও লণ্ডনে যাবে? সেখানে বসুদের সঙ্গে আমার থাকার কথা। স্থানত্যাগের আগে আমি তোমার কাছে গিয়ে যে কোন একটা পুরনো মসলিন গাউন নিয়ে নেব — জাহাজে পরার জন্য। যদি তোমার কাছ থেকে একটা যোগাড় করতে পারি, সেই সঙ্গে অ্যালবের্টা ও মিসেস হেলীয়ারের কাছ থেকে একটা করে, তাহলে সেকুলার পোষাক পরে চলতে পারবো। স্থির আছে এই সেক্যুলার পোষাক পরে নতুন 'হেড ড্রেস' সহ কলকাতার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য থেকে যাত্রা করবো।

মার সঙ্গে শেষ দেখা করার সময়ই তিনি জানতে পেরেছিলেন, ভারত সরকার, তাঁর ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে যাওয়া রোধ করবেন। সুতরাং তিনি ছদ্মবেশে ইয়ুরোপ যাবেন — সেখান থেকে ভারতে পাড়ি দেবেন এটা স্থির করে ফেলছেন— সেই মত এই চিঠি।

৪ঠা এপ্রিল ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : এখন যেন হাসপাতালে আছি। বউ লিভার পুলে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে নেমেছে। ....গত শনিবারের এক সপ্তাহ আগে এখানে এসেছি, কিন্তু তার খারাপ সময় এখনও কাটছে না, ডাক্তার তাকে আরও তিন দিন শয্যাগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।....

ডঃ বসুর ল্যাবরেটরী? এ বিষয়ে কদাপি কোন কথা নয়। ঐ নামে অভিহিত করার সাহস নেই। শোনামাত্র সরকার তেলে বেগুনে— এ ধরণের বোঝাপাড়ার কোন ফিসফিসানি শুনলেও।

৪ঠা এপ্রিল ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানকে সরকার রাজনৈতিক মনে করে — যাই হোক তুমি যেভাবে রাজনীতি কথাটা বলে ফেল, তা চিঠিতে আর বলবে না। কেননা কোন ডিটেকটিভ তোমার চিঠি পড়ে নির্ঘাত বলে বসবে —"এই মহিলা জানেন যে, তাঁর পত্র প্রাপক রাজনৈতিক কার্যাকলাপে নিয়োজিত। তিনি নির্ঘাত খুব মারাত্মক ব্যাপারে লিপ্ত, নচেৎ কেন আমি তার হদিশ করতে পারছি না। বস্তুতপক্ষে আমি রাজনীতিতে নেই — সেই ভাবটি বাইরে ছড়াতেও পারছি না। সুতরাং রাজনীতি কথাটি যেন তোমার চিঠিতে কদাপি না থাকে।

৯ই এপ্রিল ১৯০৯ মর্ডান রিভিউ পত্রিকার তাঁর একটি প্রবন্ধ বেরুলো, Our Friends in Parliament and outside" লিখলেন, আমাদের স্বার্থের প্রতি যে সকল বন্ধুগণের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি আছে— তাঁরা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কমন্সসভায় ভারতের বন্ধুগণ আছেন : সার হেনরী কটন, মিঃ ফ্রেডারিক ম্যাককারনেস, ডক্টর রদ'রফোর্ড, মিঃ কিয়রে হার্ডি, মিঃ জে, হার্ট ডেভিস, মিঃ জেমস ওগ্রেডি, মিঃ ও ডনেল, মিঃ সুইফ্‌ট ম্যাকনীল ও মিঃ উইলিয়াম রেডমণ্ড — এছাড়াও আছেন যাঁরা আমাদের কাজে নীরবে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, প্রয়োজনে, ন্যায় ও

সুবিচারের জন্য তাঁদের ভোট ও ক্ষমতা প্রয়োগে সমুৎসক। এছাড়া ইংরাজ সাংবাদিক দলে আমাদের অগণিত বন্ধু আছেন, যাঁরা আমাদের দাবীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও পক্ষ সমর্থনের জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। এঁদের মধ্যে আছেন মিঃ নেভিনসন, কলকাতার ভূতপূর্ব স্টেটসম্যান সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফ ও ভারতে সর্বাপেক্ষা পুরাতন বন্ধুবর্গের অন্যতম মিঃ হাইণ্ডম্যান।

ইংলণ্ড, কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি নামে একটি সংস্থা আছে, তাঁরাই "ইণ্ডিয়া" পত্রিকাটি চালান। এসময়ে ন্যাশালিস্টরা এই কমিটির প্রয়োজনকে অস্বীকার করে নানা মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকেন। এঁদের কাজ ছিল নানাসূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সুশৃঙ্খল ও সংহতভাবে প্রকাশ করা। কমিটির অফিসে, ভারত বিষয়ক মূল্যবান নথিপত্র রাখা হয় যা প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব। পার্লামেন্টেই ভারত পক্ষে প্রশ্ন তোলার সময়ে সহজেই এ সব তথ্য উদ্ধৃত বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে। অনেকে ঐ পত্রিকাটি বন্ধ করার প্রস্তাব তুলেছেন। নিবেদিতা এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত অসমীচীন মনে করে প্রবন্ধটি রচনা করলেন। বললেন : কোন স্বাধীনতাই যোগ্যপ্রাপ্তি নয়— যদি না তা স্বাধীনতাকামীদের সক্রিয় আত্মঘোষণার দ্বারা সমর্থিত হয়। তীক্ষ্ণভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন, সমর্থিত 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় যা 'ভিক্ষানীতি' দেখা দেয়, তার দায়িত্ব বৃটিশ কমিটির নয়— দায়িত্ব ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি, যা উক্ত পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়। উল্টে বলা যায় বৃটিশ কমিটির সদস্যরা অনেক সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের অপেক্ষা অধিক সাহসিক মনোভাব দেখান, যাকে ভারতীয় নেতারা আবার অপছন্দ করেন। 'ইংলণ্ডে যাঁরা স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক, তাঁরা ভারতে ইংরাজ অধিকার বলবৎ রাখার আগ্রহী।' এই ধারণার প্রতিবাদে বললেন : কোন জাতিরই অপর জাতিকে শাসনাধীনে রাখার অধিকার নেই — একথা বোধ করার ও বলার মত মানসিক উদারতা এঁদের আছে। এঁরা সাম্রাজ্যের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন। সর্বাত্মক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা স্বদেশের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করার ঝুঁকি দেখা দেয়— সেকথা বলবার মত দেশপ্রেমের অধিকারী এঁরা। ইংলণ্ডের ভারত সমর্থকরা, যেসব ত্যাগ স্বীকার করছেন, তাদের মূল্য স্বীকার না করে, ভারতবাসী নিজেদের অকৃতজ্ঞ প্রতীয়মান করছে— এটা সত্যই দুঃখজনক মনে হয়। যাঁরা কমনস্ সভায় ভারতের স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন, তাঁরা সে কাজ করে, মস্ত ঝুঁকি নেন, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের আসন হারানোর সম্ভাবনার সম্মুখীন পর্যন্ত হন। স্বাধীন চিত্ততা দেখিয়ে, দলভুক্তদের চটিয়ে দেবার ফলে, নির্বাচনে মনোনয়ন না পাওয়া থেকে শুরু করে বৃটিশ মন্ত্রীসভায় স্থান না পাওয়া বা ভারতের গভর্নর জেনারেল পদ পর্যন্ত হারানের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এরা ছাড়াও সঙ্গে আছেন মনিংলীডার, ম্যাঞ্চাস্টার গার্ডিয়ান, ডেইলি নিউজ, স্টার, নিউ এজ, লেবার লীডার, জাস্টিস প্রভৃতি কাগজের সম্পাদকবৃন্দ।

২৯শে এপ্রিল ১৯০৯, ম্যাকলাউডকে লিখলেন : মনে হয়, আমরা হয়ত ভিসবাডেনে যাব বিজ্ঞানের মানুষটির জন্য। কেন না তার পা আবার কষ্ট দিচ্ছে।

২রা মে ১৯০৯, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আশঙ্কা হয়, বিজ্ঞানের মানুষটি ভাল নেই। হয়ত বাত নয়... আমি খুবই উৎকণ্ঠিত।

১১ই মে ১৯০৯, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তোমার পরিচ্ছদগুলি একেবারে ঈশ্বর প্রেরিত যেন! এখানকার কাজ শেষ করার পরমূহূর্ত থেকে কলকাতা পৌঁছানো পর্যন্ত আমাকে সেক্যুলার পোশাক পরতে হবে। এমন অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতেও হবে— আমি মিস বা মিসেস বুল। সুতরাং কথাটি কয়ো না।

১১ই মে ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : যদি আমরা ভিসবাডেনে যাই, সম্ভতঃ তুমি এবং আমি ভিলাহার্থাতে একই ঘরে কাটাতে পারি। বসুরাও থাকবেন। এটা যদি তোমার পচ্ছন্দ হয়, অবিলম্বে জানাতে হবে যাতে বউ, ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারে।

১৪ই মে ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

সরকার পক্ষ চুপ করে বসে নেই। বাংলার সি-আই-ডি বিভাগের প্রধান মিঃ গ্লউডনকে ইংলণ্ডে ডেকে পাঠানো হয়েছে মিঃ মর্লের জ্ঞান বলধানের জন্য। বেসরকারী শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত ভারত সরকারের কার্য্যবলীর প্রশংসায় কোমর বেঁধে লেগেছেন। তিনি ভাইসরয়কে তাঁর অনন্য সাধারণ সাহসের জন্য জয়ধ্বনি দিয়েছেন। বলেছেন, শ্রেষ্ঠ ভারতীয়গণের মধ্যে তিনি বিপুল পরিমাণে জনপ্রিয়। ....চরমপন্থীদের বিষয়ে সামান্যই সহানুভূতি আছে জনগণের, তবে তাদের, মধ্যে বেশকিছু মূক অসন্তোষ আছে, তাকে চরমপন্থীরা ভাঙিয়ে চলতে পারে। ...যেসব লিবারেল সদস্য ভারতীয় শাসনের সমালোচনা করছিলেন, বৃটিশ সরকার তাঁদের মুখবন্ধের চেষ্টা করছেন। পার্টিশন বিরোধী লর্ড ম্যাকডোনেলকে চুপ করিয়ে দিলেন আউটলুক পত্রিকা। তার বিবরণে বেরিয়েছে ভারতীয়দের নির্বাসনী প্রশ্নে লিবারেল দলকে নীরবতার কোলে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

১৫ই মে ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, আমাকে নীল সার্জ্জের চুপি পাঠাবার জন্য তোমার কাছে বৈজ্ঞানিকপ্রবর— ডঃ বসু প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তুমি কি দিতে পারবে? তিনি বলছেন — আমার সেকুলার পোষাকের সঙ্গে ঐরকম একটা টুপি চাই-ই।

মিঃ ম্যাককারনেস ও তাঁর সমর্থকগণ দমবার পাত্র নন। হাউস অব কমনস্ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন। ডেইলি নিউজে এক পত্র লিখলেন, : ঐ সকল ব্যক্তিকে, কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়না সংগ্রহ না করেই, বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ....আজ পর্যন্ত তাঁদের বলা হয়নি, কী তাদের অপরাধ। হাউস অব কমনসকে একইভাবে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আমরা জেনেছি যে, তারা এমন কোন অপরাধ করেনি, যা নির্দিষ্টভাবে ঘোষিত হতে পারে; তাদের বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ নেই যা আদালতে দাখিল করা সম্ভব এবং তাদের অপরাধ সম্বন্ধে সংবাদদাতাগণ এমন সব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছেন, যাদের নাম সকল সময়েই অকথ্য। (২৮শে মে ১৯০৯)।

এই প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার করে বললেন, কোন স্বাধীনতা যোগ্যপ্রাপ্তি নয়, যদি না, তা স্বাধীনতাকামীদের সক্রিয় আত্মঘোষণার দ্বারা অর্জিত হয়। ....আমাদের ভাগ্য আমাদেরই হাতে, সে ভাগ্য আমরা নির্মাণ করবো ভারতবর্ষেই।

ঠিক এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই ইংলণ্ড গিয়ে নিজ মত পরিবর্তন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'সহযোগিতা' প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের অবস্থিতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্র-সমাজের মধ্যে নিজস্ব মত ব্যক্ত করে চললেন।

মর্লে স্কীম সূত্রে বিচিত্র মতামত প্রকাশিত হচ্ছিল। কার্জ্জন ও ম্যাকডোনেল প্রচার চালাচ্ছিলেন: এক ব্যক্তির শাসন বা স্বৈরতন্ত্রের স্বপক্ষে। মর্লের উপকারের জন্য, মে মাসের মডার্ণ রিভিউতে লিখলেন নিবেদিতা : 'পার্সোনাল অর ওয়ান ম্যান রুল''। এটি সম্পাদকীয় নোট। প্রচারিত মতামতগুলি তিনি জনস্টুয়ার্ট মিলের রচনা উদ্ধৃত করে, ওইসব বক্তব্যকে, ছিন্নভিন্ন করলেন। শেষে সংযুক্ত করলেন, উত্তম সরকার কদাপি স্বাধীন সরকারের বিকল্প হতে পারে না। ঠিকভাবে বলতে গেলে — যে সরকার স্বাধীন নয়, সে কখনও উত্তম সরকার হতে পারে না।

মে মাসের শেষে যাত্রা শুরু হবে স্থির ছিল। প্রথমে ইউরোপ ঘুরে দেখবেন তাঁরা, সঙ্গে মিসেস বুল। মিস ম্যাকলাউড আসছেন শীঘ্র তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

১৫ই মে ১৯০৯ বোন মেকে লিখলেন :

মার স্মৃতি শান্ত স্তব্ধ — এই ভাবটি আমাকে অনেকখানি শান্তি দিয়েছে, কারণ আমার মনে হত তা যেন সঞ্চরমান। তোমাকে কি বলেছি, সংবাদটি যখন সেই সকলে ওলিয়ার কাছে পৌঁছেছিল — সে তারই প্রতীক্ষায় ছিল। খুব ভোরে তার ঘুম ভেঙে যায়, তার মাথার দিকে কে যেন দাঁড়িয়ে, জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সরে যায়— বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ওলিয়া আধো তন্দ্রায় আধো স্বপ্নে শিশুকে বললো, সিলভিয়া ও একটা অশরীরী আত্মা। কিন্তু শিশু বললো, না, না মানুষ। ওলিয়া বললো না, অশরীরী। সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে পুরোপুরি জেগে উঠলো, ব্যাপারটা মনে এতই প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে উঠে ঘড়ি দেখলো, তখন তিনটে বাজতে পনেরো। ব্যাপারটা স্বপ্ন হতে পারে, একথা কিন্তু পরেও তার মনে হয়নি।

সুতরাং প্রিয় বোনটি, আমি অনুভব করছি, মা তাঁর সুদীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করার পরে আমরা যেন আমাদের পরম প্রিয়ের নিশ্চিত বার্ত্তা পেয়েছি। কিন্তু দীর্ঘ এ যাত্রা নয়,— এতো শুধু বর্ত্তমান থেকে চিরন্তন প্রেমে নিমজ্জন।

সুইডেনবরী আমাকে খুবই সান্ত্বনা দিয়েছে। আর্নেস্টও যে পছন্দ করেছে, তার জন্য খুবই আনন্দিত। কারণ সুইডেনবরী অনুভব করিয়ে দেয়, যবনিকার এদিকেই যত যাতনা; আর কেউ যখন তা অনুভব করে, তখন প্রিয়তম মানুষের মৃত্যুতে পর্য্যন্ত বেদনা দংশনটুকু থাকে না। হায়! পূর্ণ দিব্য সুখে অবস্থিত কাউকে ভালবাসতে, যে আমরা প্রায়ই অভ্যস্ত নই, মিঃ স্টেডের লিপিটুকু তোমাকে পাঠিয়ে দেবো, আশা করি রক্ষা করবে। ...আমাদের প্রিয়তম মৃতের বিশ্রাম কী সুপবিত্র।

সে শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য গভীর উদ্বিগ্ন আমি। সে শান্তি থেকে মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের যাতনাপূর্ণ চৈতন্যে তিনি অবতরণ করুন আমাদের আহ্বানে — তাও আমি সহ্য করতে পারবো না। এক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবনা কী সত্য! একটি অস্তিত্ব প্রকৃতি আছে, যাকে এই সব ক্ষণে নিজেদের মধ্যে অনুভব করতে পারি— যেখানে সবই আনন্দ, যেখানে বিচ্ছেদের কল্পনাও অচিন্তনীয়, মৃত্যুতেও যেখানে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এখানেই আসল সান্ত্বনা, সেই পরমে, অভেদে, নিত্যে, শান্তি থেকে কাউকে টেনে জাগানো যায় না। এই অসত্য হইতে আমাদের সেই সত্যে লইয়া যাও"।

১৯০৯, মে মাসের শেষের দিকে সকলে ইউরোপ ভ্রমনে বেরিয়ে পড়লেন। পরে যোগ দিলেন মিস ম্যাকলাউড। প্রথমে গেলেন প্যারিস। যাবতীয় দর্শন শেষে, ভিসবাডেনে গমন করলেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত জোয়ান অব আর্কের জন্মভূমি পরিদর্শন করলেন।

১৪ই মে ১৯০৯ প্রধানমন্ত্রী এইচ, এস, অ্যাসকুইথ ১৪৬জন এম-পি'র প্রতিবাদের উত্তর দিলেন। নিবেদিতা জুন মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয় নোটে লিখলেন : অ্যাসকুইথ যে সব অস্পষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করেছেন — তা দায়িত্বহীন এবং অপমান জনক। এ বিবৃতি সম্বন্ধে মানহানির আইন প্রযুক্ত হোক — সে ইচ্ছা আমরা অবশ্যই করতে পারি। তা হলে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত কর্ম্মকর্ত্তা নিজ বক্তব্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক সাবধান হবেন। মিঃ অ্যাসকইথ বলেছেনঃ ৯ জন বাঙালী নেতার নির্ব্বাসন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয় — তা কেবল নিবারক ব্যবস্থা। হ্যাঁ, অবশ্যই শাস্তি নয়! আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া, স্বাভাবিক আহার্য্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, স্বাভাবিক কাজ কর্ম্মের অধিকার অপহৃত হওয়া — সত্যই কত না সুখের ব্যাপার! যুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) ভয়ানক গুমট রাত্রে ও বায়ু চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থাহীন, প্রায় আলোকশূন্য, নীচু হাত কয়েক ক্ষুদ্র একটি কক্ষে, তালা চাবি বন্ধ

অবস্থায়— কালাতিপাত করা অবশ্যই শাস্তি নয়। মধ্যে মধ্যে দু'একটি চিঠি লেখার সুযোগ ছাড়া, কাগজ কালি কলম না দেওয়াও শাস্তি নয়। ...আরব্যরজনীর জিন এখন নয়। নচেৎ আশা করতে পারতাম, আহা, সেখানকার জিন যদি আগ্রা জেলের নির্জ্জন কক্ষে কেবল একরাত্রের জন্য মিঃ অ্যাসকুইথকে স্থাপন করার ব্যবস্থা করে দিত!

শেষ পর্য্যন্ত মিঃ মর্লেকে উত্তর দিতে হল। তিনি বললেন : কেবল ভারতবর্ষে আইন ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিরাট এক ষড়যন্ত্রের সংযোগ আছে। অবশ্য এসব বিষয়ে কোন প্রমান নেই। তবে প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করেই, এ কাজ তিনি করেছেন, যদিও সেই সংবাদের প্রকৃতি বা তার উৎস পার্লামেন্টে জানানো সম্ভব নয়— হতভাগ্য অভিযুক্তদের কাছেও নয়। (২৫শে জুন ১৯০৯)

৪ঠা জুন ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমার ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ তোমার পোষাকের কারণে।

ইতিমধ্যে মিঃ পালের একটি প্রবন্ধে মিঃ গোখলে বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, তার উত্তরে প্রবাসীতে একটি নোট লিখে পাঠালেন। নিবেদিতা লণ্ডনে পৌছবার পর, মিঃ গোখলে সম্বন্ধে নানা কাহিনীর খবর পাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন মিঃ গোখলে চাপে পড়ে, তিনি তখন পরিপূর্ণ মডারেট। মডারেটদের মতই রাজভক্তিতে ডগমগ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের কথা, তাঁর কাছে পাগলের প্রলপ। অরবিন্দের চোখে তখন তিনি বিভীষণ, তবুও নিবেদিতা বিশ্বাস করতে পারছেন না। মিঃ গোখলে সজ্ঞানে ভারতের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে পারেন। অথচ সংবাদ আসছে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে চক্রান্ত করে বিরোধী রাজনৈতিকদের, বিশেষ করে মিঃ তিলককে জেলে পাঠিয়েছেন। মিঃ বিপিন পাল তাঁর স্বরাজ পত্রিকায় সে অভিযোগ আনলেন। তার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ নোট লিখলেন: যা জুলাই ১৯০৯ মডান রিভিউ পত্রিকায় বেরুলো, 'সংবাদটি দায়িত্বহীন ও অবিবেকী। মিঃ গোখলের সঙ্গে মতৈক্যের 'সুখানন্দ আমরা সর্ব্বদা উপভোগ করতে পারিনি এ কথা সত্য, কিন্তু কোন স্বদেশবাসীর মধ্যে সাহস ও মর্য্যাদাবোধ দেখলে, তাকে স্বীকার না করার মত অধঃপতন আমাদের হয়নি। ঐরকম এক মানুষ, তাঁর প্রতিদ্বন্দীকে নিজপথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য, ভারত সচিবের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন, এমন ইঙ্গিত, চুড়ান্ত অধঃপতন, এখনও আমাদের হয়নি। এক্ষেত্রে আমরা সন্দেহ না করে পারছিনা যে, এই ধরনের অভিযোগ, যে প্রকার নৈতিক ঘৃণতা সূচক, তার পরিমান নির্দ্ধারণে অসমর্থই, 'স্বরাজ' পত্রিকার লেখককে, ঐকাজে প্রনোদিত করেছে। জাতীয়তা নামের আবরণে, ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও দম্ভের উচ্ছ্বাসকে— ঢেকে রাখার চেষ্টা, সামাজিক অপরাধ। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শক্রতা বাড়ানোর সে মতই, আমাদের বিভিন্নদলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টিতে নিয়োজিত থাকাও চরম বজ্জাতি। যে ব্যক্তি সে কাজ করে, সে স্পর্শের অযোগ্য।

টাইমস পত্রিকায়—

১৯শে জুন ১৯০৯ মিঃ মর্লের বক্তব্যের উত্তর দিলেন মিঃ ম্যাক্কারনেস ২৫শে জুন ১৯০৯। নেশান পত্রিকায় বেরুল ঃ আমরা যখন দেখি এই ধরনের উচ্চ চরিত্রের মানুষকে বিনা অভিযোগ, বিনা বিচারে পাকড়াও করে, ঝটতি নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন ভাবতেই হয়, জনসাধারণ ও ভারত সরকারের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। যে ভাবেই হোক, এটা না ভেবে পারা যাচ্ছে না যে, 'রাষ্ট্রীয়করণ' নামক ব্যাপারটাকে ন্যায়-বিচার ও ব্যক্তির-অধিকার সম্বন্ধীয় পুরাতন উদানৈতিক ধারণার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করানো হচ্ছে।

১লা জুলাই ১৯০৯ বোন মে'কে লিখলেন:

আহা, সেই পরম মুহূর্ত্ত গুলিতে তুমি এবং আমি, আমাদের বড় ভালবাসার মায়ের পাশে উপস্থিত ছিলাম, সে মুহূর্ত্তগুলি আমার নিত্যমনের সাথী। এ পৃথিবীতে আর বেশী যন্ত্রনা মাকে সইতে হয়নি, তারজন্য গভীর কৃতজ্ঞ। প্রিয় বোনটি, আমি হাজির হলে, তিনি তোমাকে ভুলে

গিয়েছিলেন, এ কথা সত্য নয় মোটই। এদিন গুলিতে আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে তাঁর মনে ছিলাম। ... মৃত্যু এলো কী অপরূপ। জীবন থেকে প্রস্থানের সেই মুহূর্ত্ত কয়টিতে, তিনি যতখানি জীবন্ত, এমন আর কখন্য ছিলেন না।

২ রা জুলাই ১৯০৯, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সস্ত্রীকে ডঃ বসু ও তিনি, মার্সেলিস থেকে ভারতগামী জাহাজে উঠলেন।

১লা জুলাই স্যার কার্জ্জন ওয়াইলী ইংলন্ডে এক পাঞ্জাবী যুবক দ্বারা নিহত হলেন। অনেকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধালো, নিবেদিতার ইউরোপে বসবাসকালে সরকার বিরোধীপ্রচার চালানোর ফলে, ঘটেছে এই ঘটনা।

নিবেদিতা তখন জাহাজে খবর পেলেন সব। মিশরে জাহাজ ভিড়লো ৭ই জুলাই। তিনি লিখলেন: লণ্ডনে কার্জ্জন ওয়াইলীর নিদারুণ হত্যার সংবাদে আমরা স্তম্ভিত। খবরের কাগজে বেরিয়েছে, ওই বালকটির সঙ্গে তাঁর বক্তিগত সর্ম্পক ছিল। সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেই ঘটিত এই হত্যাকাণ্ড। সংবাদটি দুঃখের, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা যাত্রা করছি।

১৬ই জুলাই ১৯০৯, জাহাজ বোম্বাই এসে পৌছলো। তিনি সস্ত্রীক বসু সহ কলকাতায় এসে পৌছলেন, সোজা ট্রেনে ছদ্মবেশে মিসেস মার্গট নামে। তিনি উঠলেন তাঁর স্কুলে, ডঃ বসু চলে গেলেন তাঁর বাসায়।

সিস্টার দেবমাতা তখন সিষ্টার কৃষ্টীনের কাছে এই স্কুলে অবস্থান করছিলেন। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে এসেছেন। নিবেদিতাকে এবেশে দেখে, বিস্মিত হলেন। একেবারে আধুনিকতম ফ্যাসানে সজ্জিত তিনি। মাথায় মস্ত সাদা হ্যাট, পালক গোঁজা, পরিপাটি জমকালো গাউন। বললেন, কি কাণ্ড? আমি ভেবে ছিলাম— তুমি সন্ন্যাসিনীর বেশ পর। নিবেদিতা সহাস্যে উত্তর দিলেন ঃ এটা আমার ছদ্মবেশ। আমাকে গ্রেপ্তারের শাসানি দিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমি ফিরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমি জানতাম আমার এই পোষাক দেখে তারা সন্দেহ করতে পারবে না।

এই ছদ্মবেশেই তিনি ১৯ শে জুলাই ডঃ বসুর বাড়ী গেলেন। ২০ শে বৈকালে এলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় তিনি গেলে শ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে। ২১ শে সকালে দেখা করতে এলেন স্বামী সারদানন্দ। ২২ শে পুনরায় ডঃ বসুর বাড়ী গেলেন।২৪ শে সন্ধ্যায় গেলেন শ্রীমার কাছে। বেশ কিছু সময় তাঁর কাছে অতিবাহিত করে, ফিরে এলেন স্কুলের আবাসস্থলে। ২৫ শে জুলাই প্রথম গেলেন কাশীপুর, তারপর বরানগর। ওখান থেকে গেলেন দক্ষিনেশ্বর। দেবমাতাও শ্রীমার কাছে প্রায়ই যেতেন। বাগবাজারের গলির মধ্য দিয়ে যখন যেতেন, পুলিশ তাঁকে প্রায়ই প্রশ্ন করতো : আপনি কি 'সিস্টার নিবেদিতা'? উত্তরে প্রতিবারই তিনি বলেছিলেন : না। পুলিশ তাঁকে স্কুলের দ্বিতীয় সিস্টার বলে ধরে নিত। আর কোন বাধার সৃষ্টি করতো না। এ ঘটনা প্রায় ঘটায় বুঝলেন, নিবেদিতার কথা সত্য। পুলিশ তার সন্ধানে লেগে আছে, সঠিক মানুষটির সন্ধান তারা পাচ্ছে না।

এই সময়ে, তিনি স্বামীজির দেহত্যাগের পর মঠের সঙ্গে বিচ্ছেদের সমস্ত কাহিনী শোনালেন। সাশ্রুনয়নে বললেন : স্বামিজীর ইচ্ছা পূরণই আমার জীবনের ব্রত। তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ গ্রহন করেছি, তাঁর প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখার জন্যই আমি খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশে আগ্রহী হয়েছি। কিন্তু যখন সেই কথাগুলি পরদিন ছাপার অক্ষরে দেখলাম, সেদিন আমার অন্তরের বেদনা তোমাকে বোঝাতে পারবো না— মনে হয়ে ছিল, এর চেয়ে আমার মৃত্যুই ছিল সব চেয়ে শ্রেয়বস্তু!

দেবমাতা তাঁর আত্মগোপনে সহায়তা করলেন। নিবেদিতাও তাঁকে কলকাতায় আটকে রাখার চেষ্টা করলেন।

২১ শে জুলাই ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

নানা দিক দিয়ে অবতরণ ব্যাপারটি শিক্ষণীয় বস্তু। আগ্নেয়াস্ত্র ও তার রসদের উপরে শুল্ক সংক্রান্ত যে সব অগ্রপূর্ব্ব নিয়ম ফাঁদা হয়েছে, সেগুলি থেকে মনে হবে যে, ভবিষ্যতে প্রচণ্ডতম বিধিনিষেধের বেড়াজাল না কাটিয়ে, কিংবা সুনির্দিষ্ট ছাড়পত্র ছাড়া, কোন আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না। নিয়মগুলি অবশ্য ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে স্থগিত রয়েছে। ভারতীদের বিরুদ্ধে কিন্তু সে বস্তু প্রয়োগের চেহারা নৈতিক উৎপীড়নের উৎকৃষ্ট নমুনা! আমার এজেন্ট গ্রিন্ডলেজ স্টেশনে আমার মালপত্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরা আমার চাবি পর্য্যন্ত নিতে গররাজি অর্থাৎ আমার মালপত্তর পরীক্ষায় প্রয়োজন বোধ ছিল না, কারণ ওর প্রয়োজন নেই। একজন ভারতীয় বন্ধুর ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিটি বাক্স খুলে পরীক্ষা করা হবে, শেষ ফার্দ্দিং পর্য্যন্ত কঠোর ভাবে আদায় করে নেওয়া হবে। — এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিবেচনা থাকবে না। আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রটিতে, এই বিরক্তিকর ব্যাপারটি অবশ্য সৌভাগ্যবশতঃ এড়ানো গিয়েছিল, যদিও তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছিল। কিন্তু যখন আমি নালিপথ পেরুচ্ছি, দেখি যে, দুজন অফিসার হাঁটুগেড়ে ঝুঁকে আছে একটা নিতান্ত তুচ্ছ চেহারার ছোট স্টীল ট্রাঙ্কের উপরে। তার মাপ হবে আড়াই ফুট ও দেড় ফুট — তার মধ্যে একটি তোয়ালে, সাবান এবং টুকিটাকি জিনিষ, যা আমরা হ্যান্ডব্যাগে ভরে নিই। হাঁটু গেড়ে বসা পরীক্ষকদের, ভাব, ভঙ্গীতে এমনই দুর্দ্দান্ত প্রচন্ডতা যে, আমি তাদের কিছু লজ্জা দেবার জন্য বললাম — ওটা খুব নিরীহ চেহারার বাক্স! নয় কি? তারা মজা বোধ করে মুখ তুলে বললো :— ঠিক, কিন্তু এটা যে নেটিভের বাক্স! মনে হল, এক্ষেত্রে, ওসব সম্বন্ধে ভদ্র ব্যবহার স্পষ্টতই মহাপাপ। দেখা গেল, দুটি লম্বা চওড়া ইউরোপীয় পুঙ্গ গিল্টি করা কাঁচের ছোটখাটো তুচ্ছ একটা খাঁজকাটা গয়নাদানী, উপরে তুলে আলোয় এধার ওধার নাড়িয়ে পরীক্ষা করছে, যে এ বস্তুটির মালিক ভদ্রলোক স্পষ্টতঃই, তাঁর তরুণী পত্নীর জন্য নিয়ে এসেছেন। ভাবছি, এই সকল পরীক্ষাকারী ব্যক্তিগণের হাতে যে ধরণের দায়িত্বশূন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের শীকাররা যে প্রকার আত্মরক্ষায় অধিকারহীন, তাতে পরীক্ষকরা কতদিন এইসব জিনিসের ছিঁচকে চুরি থেকে নিজেদের সামলে রাখবে! দেখা যাচ্ছে, ভোলা, পৌছাবার পরে তার ট্রাঙ্ক তন্নাস করা হয়েছিল এবং তার চিঠি পত্র ও পাণ্ডুলিপি আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয় অনুবাদ করে পড়ে নেবার জন্য। লালা লাজপত সম্বন্ধেও নিশ্চয় একই প্রকার ব্যবহার করা হয়েছিল। এসব ব্যাপারের মোকাবিলা ভাল ভাবে করা যাবে মনে করি না। আমার একটুও সন্দেহ নেই, এই ধরণের কানুনকেও কৌশলে পরিহার করা সম্ভব, যদি লোকজন এই সব ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাবার চাতুরী পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলে। নীট ফল : পৌছানোর পর থেকে তিক্ত সম্পর্ক। কিন্তু কি দৃশ!— মানুষ তার নিজের দেশে এই ভাবে অবতরণ করছে— অপূর্ব্ব! ১৬৬০ সালের বোম্বাই, ১৯০৯ সালে সেই একই স্থান, উভয়ের মধ্যে শিক্ষানীয় বৈপরীত্য বটে। ইতিমধ্যে আমি আমার লেখার টেবিলে প্রত্যাবর্ত্তন করেছি। ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে? আমার তো হচ্ছে না। সন্ধ্যায় পূজার ঘন্টা বাজছে— প্রতি সন্ধ্যায় বাজে— সেটা, এখানেই...। আগে যেমন বাজতো। গত দুবছর একটা স্বপ্নের মত!

২২ শে জুলাই ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তোমার পোষাক গুলি, এখনও পরছি ছদ্ম থাকার প্রয়োজনে।

২২ শে জুলাই ১৯০৯ মিসেস বুলকে লিখলেনঃ সিস্টার দেবমাতা, এখন এখানে আছেন। খুবই মনোহারিণী, আমার মতই পোষাক পরেন। তোমার চিঠিতে, যেন আমার নামোচ্চরণ করো না। আমি আড়ালে আছি, রাস্তায় বেরুচ্ছি না। দেবমাতাকেই সকলে, আমি বলে ধরে নেয়। আমার ভারত ত্যাগের পর, অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তিরিশে অরবিন্দ ধৃত। আসামীদের বিচার আলিপুরে বর্ত্তমানে চলছে।

বাংলায় বিপ্লবী দল পরস্পর বিচ্ছিন্ন। নিবেদিতার নিজস্ব দল ছিল — অরবিন্দের দলই পরে সন্ত্রাসবাদীরূপে পরিচিত, যদিও আসল অনুশীলন দলও দ্বিধাবিভক্ত। যে দল, খন্ডিত বাংলা জোড়া দেওয়ায় আন্দোলন সুরু করেছিল, পরে সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণের ব্রত নিয়েছিল, তারাই বিপ্লবীদল রূপে পরিচিত হল— তারা ছাড়াও একটা অনুশীলনদল ছিল তাদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল পূর্ব্ব বাংলায়। যদিও পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ছিল কিন্তু কর্ম্ম-ধারা ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলা।

২৩ শে জুলাই ১৯০৯ মিঃ মর্লে অক্সফোর্ড বক্তৃতায় উদারনৈতিদের বিষয়ে বললেন : ওঁরা ভারতীয়দের চেযে ও ভারতীয়। নিজের পক্ষে মিঃ গোখলের দৃষ্টান্ত দিলেন। মিঃ ম্যাককারনেস জুলাইয়ের ওয়েস্ট মিনিস্টারে গেজেটে তার উপযুক্ত উত্তর দিলেন।

১৯০৮ সালের মে মাসে আলিপুরে বোমার মামলা শুরু হয়েছিল। সে মামলার পরিচালক মিঃ নর্টন। তদবিরে এগিয়ে এলেন আশুতোষ বিশ্বাস ও গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট মৌলবী শাসমুল খাঁ।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় থেকে। একসঙ্গে কাজ করেছেন। স্বামিজীর কাছে প্রায় আসতেন। এঁর বাড়ী যশোহর জেলার 'রিশখালি'। বাবার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৮ সালে কৃষ্ণনগরের এ.ভি.স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে এফ, এ পড়তে শুরু করেন। পরে শটহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং শিখে অমহুতি (Amhuty) কোম্পানীতে কাজ সুরু করেন। পরে মজঃফরপুরে কেনেডি সাহেবের স্টেনোগ্রাফারের কাজ করেন। এর পরে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে হুইলার ও মালী সাহেবের স্টেনো। এই সময়ে কুষ্টিয়ায় ছোরা হাতে একটি বাঘ মারেন। এর পর থেকেই 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিত হন। ১৯০৩ সাল থেকে অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক দলের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজস্ব একটি দল গঠন করেন। ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ওঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। ওঁর কাছে তিনি আসতেন ও পরামর্শ করে কাজ করতেন। ১৯০৭ সালে বারীন্দ্রের আত্মসমর্পন, সত্যেন্দ্রবসু ও কানাইলাল দত্তের ফাঁসীর পর বিপ্লবীরা আন্দোলন থেকে সরে গা ঢাকা দিলেন। এই সময়ে যেসব বিপ্লবী তখনও বাইরে, তাদের সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিতে সুরু করলেন।

আলিপুরে বোমার মামলা চলাকালে অরবিন্দ ও বারীন্দ্রনাথের দলের বিরুদ্ধে মামলা তদাবির করতে থাকেন আশুতোষ বিশ্বাস ও গোয়েন্দা বিভাগের শামসুল খাঁ। পরিচালক নর্টনসাহেব। এই আশুতোষ বিশ্বাস ও নটনসাহেব উভয়েই কংগ্রেসদল-ভুক্ত এবং বিগত জীবনে রাজনীতিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এঁর জন্ম, হাওড়া জেলার মথুরাবাটির সম্ভ্রান্ত কায়স্ত পরিবারে। প্রথম জীবনে সৎ ও উন্নতচেতা, ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহলে সমাদৃত। শিক্ষা হেয়ার স্কুলে। ১৮৬৮ সালে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডিন্সি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে এম. এ ও বি, এল ডিগ্রী গ্রহণ করে আদালতে বারে যোগদান করেন। প্রথম জীবনে অ্যাসিসটেন্ট হেডমাষ্টারী করেন। আশুতোষ মুখার্জী ওঁর ছাত্র। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৭৭-৭৮ সালে রাজনৈতিক সফর করেন। দীর্ঘদিন সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক, পরে সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। কলকাতা করপোরেসানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি অন্যতম কমিশনার হন। আইন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করার পর, রাজনীতি ত্যাগ করে আলিপুর ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের সেরা উকিল রূপে পরিচিত হন। ১৮৮৩ সালে লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলে পেশা করা 'ইলবার্ট' বিলে, সিভিল সার্ভিসে ইউরোপীয় ও ভারতীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে, তিক্ত জাতিবিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। ভারতীয়দের পক্ষ

থেকেও ঝড় ওঠে। এই উত্তেজনার চরমকালে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। সেটি আশুতোষ বিশ্বাসের রচনা। সুরেন্দ্রনাথ ওর নাম প্রকাশ না করায়, কলকাতা হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে দুমাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আশুবাবুর বিশ্বাসঘাতকতায় যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী দল প্রতিশোধ পারায়ণ হয়ে উঠলেন। স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ তাঁর দলের দুটি ছেলেকে পাঠালেন। নাম তাদের চারুচন্দ্র বসু ও অশোক নন্দী। চারু বসুর জন্ম থেকেই ডান হাতের তালু ও আউল ছিল না, প্রায় অকর্ম্মন্য বলা চলে। সেই হাতে রিভলবার বাঁধা। আশুবাবু গভর্নমেন্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, মিঃ বিচক্রফটের এজলাসে বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা চালাচ্ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে তিনি আলিপরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী আবদুল্লার এজলাসে উপস্থিত হয়ে সরকার পক্ষে মুদ্রা জাল, করার একটি মামলা পরিচালনায় নিযুক্ত। ৩-৪০ মিনিটের সময়, যখন তিনি আদালত থেকে বেরুছেন, দর্শকদের মধ্য থেকে চারুচন্দ্র ছুটে এসে, শার্টের মধ্য থেকে রিভরবার বার করে বাঁ হাতে টিগার টিপে আশুবাবুকে গুলি করলেন। গুলি ফুস ফুস ভেদ করে বেরিয়ে গেল। আশুবাবু পালাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু চারুচন্দ্র পুনরায় গুলি করায়— আশুবাবু পাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চারুচন্দ্র আরও একটি গুলি করলেন সেটি কাজে লাগলো না, ধরা পড়ে গেলেন। অশোকনন্দী পালিয়ে গেলেন।

২রা মে ১৯০৮, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড থেকে অশোক নন্দীকে গ্রেপ্তার করা হল। এটি মুরারি পুকুর বাগান বাড়ীর দ্বিতীয় অফিস ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল (১) নিজের সংগ্রহে বোমা রেখেছেন। (২) বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে বৃটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যড়াযন্ত্রকারী।

চারুচন্দ্রের উপর সকল প্রকার নারকীয় অত্যাচার চালানো হল — এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গেল। ঢাকার এক পাঁচকড়ি সান্ন্যাল তাঁর কাছে এসে বলেন — আশু বিশ্বাসকে খুন করার ভার তার উপর এসে পড়েছে। পাঁচকড়ি বেনেটোলা লেনের অধিবাসী, অবশ্য পুলিশ তার কোন হদিস পেল না।

তাকে রাখা হল যে সেলে তার পাশে রাখা হয়েছিল অশোক নন্দীকে। তার খুব কাছের সেলে থাকতো আপীলের আসামী উল্লাসকর দত্ত। তাঁদের মুখে জানা গেল, চারু চন্দ্র বসুকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হত, চীৎকার করতো— অব্যাহিতি পাওয়ার জন্য ভাওতা সংবাদ দিত — সেটা মিথ্যা প্রমানিত হওয়ার পর পুনরায় নির্য্যাতন চালানো হতো, তবুও তার কাছ থেকে কোন খবর বার করা সম্ভব হল না।

প্রাথমিক তদন্তে চারুচন্দ্র বলেছিলেন আমি আশুতোষকে খুন করেছি কারণ তিনি দেশের শত্রু। তিনি নির্দ্দোষ মানুষদের বিরুদ্ধে মামলা চালান, ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে যৎপরনাস্তি চেষ্টা করেন। তদন্ত শেষ হলে, তিনি বললেন, সেসন কোর্টে বিচারের কোন প্রয়োজন নেই। আজকেই না হলে কালকেই, আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। আশু বিশ্বাস আমার হাতে মরবে এটাই নিয়তি— সেজন্য আমি ফ্যাঁসিতে ঝুলবো।

সেসন কোর্ট ও হাইকোর্টে তাঁর মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হল। যখন তাঁকে দণ্ড মকুবের জন্য আবেদন করতে বলা হল, তিনি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। ১৯ শে মার্চ্চ ১৯০৯, তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। আর আশোক নন্দী। তাঁর মামলা শুরু হল ২৮ শে জুলাই ১৯০৮, শেষ হল ৭ই আগষ্ট ১৯০৮ হাইকোর্টে। বিচারে নির্দ্দোষ প্রমানিত হল। কিন্তু মুক্তি পেল না, দ্বিতীয় মামলায় আটক করা হল। এ সময়ে তিনি যক্ষায় আক্রান্ত। আলিপুর কোর্টে দোষী সাবস্ত হলেন। — পেলেন ৭ বছরের নির্ব্বাসন দণ্ড। অবস্থা তখন তাঁর সঙ্কটজনক। বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও, তাঁকে আটক রাখা হল। বহু টালবাহনার পর

২রা জুলাই ১৯০৯, তাঁকে জামিন দেওয়া হল। ১৭ই আগষ্ট ১৯০৯, চিত্তরঞ্জন দাস আদালতকে জানালেন : অশোক নন্দী প্রস্থান করেছেন সেই স্থলে,— যেখানে আইনের দীর্ঘ করাল বাহুও পৌছাতে অসমর্থ। অবশ্য মামলা তার গতি নিয়ে চললো— অবশেষে ২৬ শে নভেম্বর হাইকোর্ট অশোককে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন : কোর্টের সেই দৃঢ় বন্ধন থেকে।

উল্লাসকর দত্ত, মানিকতলা বোমার মামলার আসামী, প্রথম বোমা তিনিই তৈরী করে ছিলেন। ছোটলাট অ্যানড্রু ফ্রেজারের স্পেস্যাল ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। রেল লাইনের উপরে যে ডিনেমাইট স্থাপন করা হয়েছিল, এটি তাঁরই দ্বারা নির্ম্মিত। আলিপুরের বিচারে বারীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত তিনি। হাইকোর্টে সে শাস্তি মকুব হল। বহাল হল দ্বীপান্তর। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় এঁরই রচিত ও মিঃ বিপিন পাল কর্তৃক আলোচিত সেই দুটি প্রবন্ধ 'That Sinful Desire' ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬, ও Golden Bengal Scare' ৩রা অক্টোবর ১৯০৬, এ বেরিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে ওই রচনা দুটি বিপিনচন্দ্রের রচনা বলে চালিয়ে চিত্তরঞ্জন দাস প্রমান করলেন, অরবিন্দ চিরদিনই গুপ্ত সমিতির, বিরোধী। ঐ দুটি প্রবন্ধই অরবিন্দকে বাঁচালো প্রথমে, বন্দেমাতরম মামলায়। দ্বিতীয় আলিপুর বোমা কেসের মামলায়।

নিবেদিতা, ডঃ বসু ইংলণ্ডে ফিরে আসার পরই ভারতে ফেরার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ভারত সরকারও চাইছিলেন, তিনি যেন ভারতে পুনরায় ফিরতে সমর্থ না হন। খবরটা তিনি বিদেশে বসেই জানতে পেয়ে ছিলেন বন্ধু-বান্ধবের চিঠি মারফৎ। তিনি দমবার পাত্র নন। প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন ৩রা এপ্রিল ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে পত্র দিলেন সতর্ক করে, ১১ই মে ১৯০৯। পুণরায় চিঠি দিলেন মিস ম্যাকলাউডকে, কলকাতায় আসার জন্য যে সব চিঠি যাবে, তাদের ঠিকানা ক্রিস্টিনের নামে হবে, কেবল কোণের দিকে লেখা থাকবে-২। এসব করার কোন দরকার নেই। কেবল আমি যতক্ষণ না পৌছচ্ছি, ততক্ষণ দৃষ্টি এড়ানো ভাল বলেই মনে করি। জাহাজে থাকার সময়ে খোকা (ডঃ বসু)র ঠিকানায় চিঠি দেবে।

২৬শে জুন ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : বৃহস্পতিবার রাত্রে যাত্রার আশা রাখি। সকাল দশটায় ছাড়বে— এম. এস. ইজিপ্ট। সেখানে কিংবা যাত্রাপথে সকল চিঠি 'হিমসেলফ্'-এ (ডঃ বসুর) ঠিকানা পাঠাবে।

একটা ব্যাপারের চিন্তা, আমাদের মন অধিকার করে আছে। যে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে স্থিরভাবে বিচার বিবেচনা করে নেওয়া ভালো, যাতে কলকাতা থেকে পাঠানো চিঠিপত্র বেশী স্পষ্ট করার প্রয়োজন হবে না।

১লা জুলাই ১৯০৯ বোন মিসেস উইলিসনকে লিখলেন : এখন থেকে চিঠিপত্রে সতর্কভাবে ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন হবে— প্রথমে 'হিমসেলফ্' -এর নামে, পরে ক্রিশ্চিনের নামে— ২ঃ এই লিখে। ভাল হয়, গ্রিগুলের মারফত যদি পাঠাও। সেগুলি হারিয়ে যাক বা গায়েব হোক, বা খুলে পড়া হোক, তা আমি চাই না।

১লা জুলাই ১৯০৯, র‍্যাটক্লিক দম্পতিকে লিখলেন : এখানে অবস্থানের শেষ বিদায়। অতঃপর চিঠিপত্র সম্বন্ধে অতীব সতর্কতা।

১৬ই জুলাই নামবো বোম্বাইয়ে। কৃস্টীন সেখানে দেখা করতে আসবে বলেছে। কুড়ি তারিখ, নাগাদ কলকাতায় পৌছানোর কথা। চিঠিপত্র ডঃ বসুর ঠিকানায় পাঠাবে— ভিতরে আমার নাম।

২০শে জুলাই ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : সরকার ভারত বিরোধী। অবস্থা যৎপরনাস্তি মন্দ।

২২শে জুলাই ১৯০৯ (কলকাতা থেকে) লিখলেন মিসেস বুলকে : চিঠিপত্রে যেন আমার নামোল্লেখ করো না। আমি চুপচাপ আছি, বাইরে বেরুবার চেষ্টা করছি না।

৫ই আগস্ট ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : 'দি হন' সম্বোধনে অ্যালবার্টাকে চিঠি পাঠিয়েছি। তাকে দয়া করে জানিয়ে দিও যে, এই ভুলটি কখন সখন করা হবে— জিনিসপত্তর নিরাপদে পাঠাবার প্রয়োজনে।

মাতা ঠাকুরানী অপরূপ। গতরাত্রে বৌ (অবলা বসু) গিয়েছিল তাঁর পাদস্পর্শ করতে। চমৎকার নয় কি? সকল মহান জাতীয়বাদীই এখন, তাই করেন। সকলেই স্বীকার করছেন— আহ্বান এসে ছিল স্বামীজির মধ্য দিয়েই। সেদিন, যখন মাতা ঠাকুরাণীকে বললাম— মা, শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আপনার অসংখ্য সন্তান এসে জুটবে— সেদিন তো এসে গেছে! সারা দেশই তো এখন আপনার! শ্রীমা বললেন : তাই তো দেখছি!

নিবেদিতা তাঁর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণের সময়েও ভারতের আন্দোলন সম্বন্ধে সংবাদ সময়ে ওয়াকিবহল ছিলেন। প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে মর্ডার্ন রিভিঙ কাগজে, কখনও প্রবন্ধ বা কখনও নোট লিখে পাঠিয়েছে এবং সেগুলি যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে।

মর্ডান রিভিউতে ৯ই মে ১৯০৯ একটি নোট লিখছিলেন : মিঃ মর্লে ভারতের জন্য একটি মিক্সচার প্রস্তুত করেছেন, যার মধ্যে তোষন ও পীড়নের ঢলাঢলি। তোষণ অংশে মুসলমানদের দান করে নিঃশোষিত, উদ্বৃত্ত রয়েছে পীড়নের অংশ।

১৯০৯ জুন মডার্ন রিভিউতে অরবিন্দের লেখা "To the Sea" নামে একটি কবিতা বেরুলো তখন তিনি হাইকোর্টের রায়ে মুক্ত। ইতিমধ্যে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার পরিবর্ত্তে 'কর্ম্ম-যোগীন' 'ও' 'ধর্ম্ম' নামে দুটি পত্রিকা বার করেছেন। তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁর আন্দোলনের মূল নীতি বিশ্লেষণ করে চলেছেন।

৪ঠা জুন ১৯০৯ হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়, ৫ই জুন ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হল : মেদিনীপুর মামলার প্রথম অংশ। মন্তব্য করলেন : স্যার লরেন্স জ্যেনকিনস্ নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থ। ফল : প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে পুলিশী ক্রোধ। মনে হয়, কেবিয়ান সোসাইটি বইটি প্রকাশ করতে, কিংবা তাদের পৃষ্ঠ পোষকতার সুযোগ দিতে রাজি হবে।

২১শে জুন ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : সম্ভব হলে, অরবিন্দের প্রকাশিত রচনাগুলি আর সেই সঙ্গে বিচারের কালে উত্থাপিত অন্য জিনিষগুলি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করতে ইচ্ছা আছে, যার শেষে থাকবে খাঁটি হিন্দুধর্ম্মের অসাধারণ নমুনা "To the Sea", ভূমিকা অংশে থাকবে বিচারের বিররণ, সওয়াল ও জবাবের নির্ব্বাচিত অংশ এবং বিচারপাতি কৃত সারসংক্ষেপ বিবরণী। সেই সঙ্গে মর্ডান রিভিউতে প্রকাশিত এই ছবিটি। ইংলণ্ড থেকে প্রকাশ করতে পারলেই ভাল — তাতে যদি খরচ দিতে হয়— তবুও। তুমি কি ক্রপ্টকিনের সঙ্গে যোগসাজসে কোন প্রকাশক যোগাড় করতে পার — হেইম্যান বা অন্য কাউকে? ইংলণ্ডে প্রকাশের সুবিধা তুমি বুঝবে, আর পুস্তকটি তৈরী হয়ে গেলে তুমি সম্ভবত : সাজেশন দিতে রাজি হবে।

না! কিংবা ইন্ডিয়াও (পত্রিকা) নয়?

যেক্ষেত্রেই হোক, তুমি এখন তথ্যগুলি জানলে। অতঃপর আমরা বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্টতার সঙ্গে উল্লেখ করতে পারবো।

অরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। উভয়ের প্রতিভা, বিদ্যা ও রচনা শক্তি একই শ্রেণীভুক্ত। তাঁর ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, বৈপ্লবিক দৃষ্টি ভঙ্গিও প্রায় এক। তিনি নিজপথ ধরে চলতে চান অপর মতের মানুষের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু বা উদাসীন, উভয়ের ব্যক্তি জীবনের পার্থক্য এখানেই। তিনি

নিজে নিঃস্বার্থ অপর মানুষদের যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান দিতে প্রস্তুত। গুপ্ত আন্দোলনের রীতিনীতি সম্বন্ধেও সচেতন। যথাস্থানে গোপন ছদ্মনামে ভূষিত করেছেন পরস্পরকে। কোথাও 'A. G', কোথায়ও Recalcitrant Leader, সংক্ষেপে R. L, কোথাও Bengali Mozzin কোথাও বা Missing journalist or Leader of the Nation. আন্তরিক সম্পর্ক রাজনীতির ক্ষেত্রে, শুধু এক তানে বাঁধা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তির ক্ষেত্রে, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আর্বিভাব ও তাঁর বিপুল চিন্তারাশির অভিজ্ঞতাসিদ্ধ আধ্যাত্মিক শক্তিকে কর্ম্মে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না আর অরবিন্দের চিন্তা সীমাবদ্ধ— তাঁর ভবানী মন্দির। যদিও সেখানে মানব দেবতা হলেন রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস : জাতীয় জীবনের মূল প্রেরণার উৎস এঁরা উভয়েই। এই স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে আছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শক্তি। তাঁর বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরের মাটি ভয়ঙ্কর তেজ বিশিষ্ট স্ফোটিক পদার্থ। তবু চিন্তা শক্তি তাঁর সীমাবদ্ধ, ব্যক্তি জীবনকে কেন্দ্র করে। তিনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন 'অবতাররূপ' নিয়ে। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য এসেছেন মানুষের কঠোর স্বার্থপূর্ণ হৃদয়ে, প্রেমের সঞ্চারণ ক্ষেত্রটি প্রস্তুতি করার উদ্দেশ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই, এঁরা তার বেশী নন। কোনো দিন ঈশ্বর তাঁর সম্পূর্ণ শক্তিকে বিকাশ করেন নি। সেই জন্যই তিনি উৎকণ্ঠিত।

২৪ শে জুন ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : মডার্ন রিভিউতে অরবিন্দের "To the Sea" নামে একটি অপূর্ব্ব কবিতা বেরিয়েছে, তা বিপিনের কারগারের রচনা ফসলের তুলনায় কত না পৃথক।

আমরা কেবল 'ডেইলি মেল' পড়তে পেয়েছি, গতকাল অর্থাৎ সোমবার বরিশালে অরবিন্দের বক্তৃতার কথা আছে যার মধ্যে অশ্বিনীর/(অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রশাংসা করেছেন এবং বয়কটের প্ররোচনা দিয়েছেন। পুলিশ নোট নিয়েছে।

কিভাবে বোমা বানানো হয় — মেদিনীপুরের ষড়যন্ত্র মামলা

মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় তিন ব্যক্তির আপীলের রায় হাইকোর্ট আজ রায় দিয়েছে। তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তি (পূর্ব্ব আদালতে দণ্ড-প্রাপ্ত) মুক্তি পেয়েছেন। হাইকোর্টের রায় বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মেদিনীপুর সেনস্ কোর্টে গত বছর এই মামলা শুরু হয়। আদিতে বিবাদী ছিলেন ২৬ জন— কিন্তু সরকার পক্ষের প্রধান একজন সাক্ষী বক্তব্য প্রত্যাহার করায় ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। বাকি ৩ জন দণ্ড পান— দীর্ঘ মেয়াদী নির্ব্বাসন।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটগনের হত্যার এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল, যাতে ১৫৪ জন জড়িত। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শোনেন প্রধান বিচারপতি স্যার লেরেন্স জেনকিনস ও বিচারপতি মিঃ মুখার্জী। এঁরা দশদিন শুনানির পার, দণ্ডাদেশ বাতিল করে তিনজন ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিয়েছেন।

রায়দানে হাইকোর্ট বলেন : অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে সব স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সেগুলি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত নয়, পুলিশ অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধ ভাবে আদায় করেছে; তাদের লিপিবদ্ধ করেছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট তিনি আইনের ভাষা বা ভাব কোন কিছুই মান্য করেননি। একজন দণ্ডিতের বাড়ীতে একটি বোমা পাওয়া গিয়েছে এই অভিযোগের বিষয়ে বিচারপতিরা বলেছেন, বিবাদীদের তরফে যে বলা হয়েছে, ঐ বোমা পুলিশই স্থাপন করেছিল, সেই কথা তারা উড়িয়ে দিতে অসমর্থ। পুলিশ এই মামলায় যে ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তদনুযায়ীই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত।

এই হল সাম্প্রতিক তৃতীয় গুরুত্ব পূর্ণ মামলা : যাতে হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ অগ্রাহ্য করলেন। পুলিশী সাক্ষ্যকে পুরোপুরি বাতিল করলেন, সেই সঙ্গে তাঁদের অবলম্বিত

পদ্ধতির নিন্দা করলেন। জানা গেছে লেফটন্যান্ট গভর্নর গোটা মেদিনীপুর ব্যাপারে বিশেষ রকমের তদন্ত করবেন। মধ্যবর্ত্তী কালে তিনি আদেশ দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের কেউ যেন কোন অজুহোতে ছুটিতে না যায়।

সেই সঙ্গে উদ্বৃত হল জেমস ক্যাম্বেলের গোপন রিপোর্ট : The decission in these two cases (Howrah-shibpur and Netra Docoity cases) were heavy blow to the police. In the former they saw the men admittedly guilty against whom evidence has been collected with greatest deficulty released with no more serious punishment than a lecturer from the chief Justice, in the later the sentence passed appeared to indicate that to make the disclosure to the police, was regarded by the High Coart as on eggravation to the offence. These may have been reasons of highpolicy behind both decission but there were unknown to the police to whom the time and labour spent had brought no commendation but only what was regarded by their friends and enemies alike as a sence re-primand (Junior Compleeker political Trouble in India).

১৮ই জুলাই ১৯০৯ কলকাতায় পদার্পন করার সঙ্গে পরিচিত মহলে সাড়া পড়ে গেল— তিনি ভারতে পা দিয়েছেন ছদ্মবেশে-ছদ্মনামে। সংবাদ পেলেন অরবিন্দ। পর দিন দেখা করতে এলেন। ইতিমধ্যে সরকারী মহলের গোপন কথাও তাঁর কানে এসে গেছে। আলাপ আলোচনার মধ্যে জানালেন: গুজব শুনছি : নতুন লেফটন্যান্ট গর্ভনর তোমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাবার কথা বিবেচনা করেছেন, খোলা মেলা রাজনীতি বন্ধ কর। মনে হয়, শীঘ্রই চালান দেবে। গা ঢাকা দাও কিংবা বৃটিশ ভারত ত্যাগ কর। বাইরে থেকে অব্যাহত কাজ করে যাও।

অরবিন্দ সে পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। উত্তরে বললেন : ও সবের প্রয়োজন কি? কর্ম্মযোগীনে বরং খোলা চিঠি লিখি, তা হলেই সরকার প্রতিনিবৃত্ত হবেন।

২১শে জুলাই ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

আমাকে যদি চিঠি লেখো, কদাপি আমার নামোল্লেখ করো না। কারণ আমি এখন ছদ্ম পরিচয়ে আছি। এবং যতদিন সম্ভব অনেকের কাছে সেই ভাবে থাকবো। 'বন্দেমাতরম' এর জায়গায় নতুন একটি 'কর্ম্ম যোগিন' নামে কাগজ বেরিয়েছে। অরবিন্দ ব্যাপক বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। আমার বিবেচনায় সেটা বুদ্ধির কাজ হচ্ছে না। বর্ত্তমানে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর চালিত মনে করছেন। সুতরাং গ্রেপ্তার হবেন না। আমরা অনেকেই অবশ্য, অনেক সময়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করি। কেন করি, তা শুধু আমরাই জানি। আমরা কিছুরই পরোয়া করি না। কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয় কাউকে ক্ষয় ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেননি। 'জোয়ান অব আর্ক' এক্ষেত্রে স্থায়ী বিপরীত সাক্ষ্য । কেবল যখন আমরা, সকল সহন সয়েছি, তখনই কখনো কখনো বলি, হাঁ আমার কণ্ঠস্বর — ঈশ্বরেরই।

কিন্তু তার আগে বলতে পারি ধর্ম্মীয় অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক রণকৌশল, কোনমতেই সমবস্তু নয় এবং তাদের গুলিয়ে ফেলাও উচিত নয়।

অরবিন্দ জেল থেকে বেরনোর পর, নিছক ঈশ্বর চালিত পুরুষ মনে করেছেন। নিবেদিতা কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তায় নিশ্চিন্তে হতে পারলেন না। চোখের সামনে ভাসছে 'জোয়ান অব আর্কের' দৃষ্টান্ত। তাঁকে পুড়ে মরতে হয়েছিল। স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র যীশুকে, পেরেকে ঠুকে মারা হয়েছিল।

পার্থিব রাজনৈতিক বুদ্ধি চালিত নিবেদিতা, কিভাবে তাঁকে (অরবিন্দকে) বাঁচানো যায়, সে চেষ্টা শুরু করলেন।

২২শে জুলাই ১৯০৯, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : মুক্তপ্রাপ্ত লোকগুলি মাতাদেবীকে প্রণাম করতে আসেন। তিনি বললেন : কী সাহস! কেবল ঠাকুর ও স্বামীজীই এরকম মহান সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁদেরই তো দোষ।

৩০শে জুলাই ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : শুনছি : নতুন লেফটন্যান্ট গভর্ণর, বাঙালী মৎসিনীকে ৭ই আগষ্ট নাগাদ, নির্ব্বাসন পাঠাবার কথা বিবেচনা করেছেন —পুলিশের কাছ থেকে সরকারীভাবে আবেদন এলেই তা করবেন। ওঁর পূর্ববর্তী লেফটন্যান্ট গভর্নরের ইতিহাস অপরপক্ষে, শিকার লক্ষ্য ব্যক্তিটির জনপ্রিয়তা, এই দুটি বিবেচনা করলে বলতে হবে এটা গভর্নরের পক্ষে চরম যুদ্ধ ঘোষনা।

জুলাই ১৯০৯, অরবিন্দ মুক্তি পাবার পর, অ্যানী বেশান্ত 'ডেইলি ক্রনিকালের' প্রতিনিধির কাছে বললেন :

চরমপন্থীরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তাদের মধ্যে দু'তিনজন বিরাট শক্তি ও প্রভাব সম্পন্ন মানুষ আছেন। সদ্যোমুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মাৎসিনী প্রকারের লোক, পার্থক্য হল উনি ফ্যানাটিক, মৎসিনী যা ছিলেন না। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ইনি। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের মানুষ, একেবারে নিঃস্বার্থ, নিজে কিছু গুছিয়ে নেবার বাসনা নেই, তথাপি মারাত্মক। কারণ, বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করতে— যে কোন পদ্ধতি গ্রহণে প্রস্তুত।

মিঃ র‍্যাটক্লিককে ৩০শে জুলাই অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা জানানোর সঙ্গে যোগ করলেন: ফিমেল পোপ, এ সম্বন্ধে নিজমত ব্যক্ত করেছেন— একি সত্য? কি বিচিত্র এই মহিলাটি! নিজের অতীতের সঙ্গে, নিজেকে পুনশ্চ যুক্ত করছেন!

জুলাইয়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামনন্দ চট্টোপাধ্যাকে একটি নোট লিখে তাঁর মন্তব্য করতে পরামর্শ দিলেন। সম্পাদক মন্তব্য করলেন : বেশান্তের ইতিহাস জ্ঞান কিছু নেই, কারণ মাৎসিনী ইতিহাসে ফ্যান্যাটিক বলেই কথিত। যদি মহাত্মারা বেশান্তের কাছে অরবিন্দ সম্বন্ধে কোন তথ্য সরবরাহ করে থাকেন, তাহলে সাম্রাজবাদী ইংরাজ রমনী হিসাবে, আলিপুর মামলার সময়ে সাক্ষ্য না দিয়ে, বিচারপতি, অ্যাসেসর ও জনসাধারণের জ্ঞানোদয়ের জন্য প্রাপ্ত তথ্যগুলির উল্লেখ না করে কর্ত্তব্য চ্যুতির দোষে দুষ্ট হয়েছেন।

আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি না দেখাবার জন্য তাঁকে কেউ দোষ দিতে পারবেন না, কেননা তিনি সেই বিজাতির অন্তর্ভুক্ত, যারা ভারতে এসেছেন, কল্পতরু নাড়া দিয়ে, থলি ভর্ত্তি করার জন্য। ... ঠিক বেঠিক, যে ভাবেই হোক, ভারতীয়গণের এক বিরাট অংশ, তাঁকে গুপ্তচর মনে করে, আর সেই ধারণা তাঁর সাম্প্রতিক উক্তি সমূহের দ্বারা দৃঢ়তর হল।

৩০শে জুলাই ১৯০৯ 'কর্ম্মযোগীনে" অরবিন্দের খোলা চিঠি বেরুলো। মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন: স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য সরকার রাজকোষ উজাড় করে খরচ করছে। সরকার গোয়েন্দাগিরির খরচ যোগাতে দেউলিয়া।

খোলা চিঠিতে অরবিন্দ লিখলেন :

Remour is strong that a case for my deportation has been submitted to the Government by the Calcutta Police and neither the tranquility of the country nor the Scrupulous legality of our procedure is a guarentee

against the contingeney of the all powerful fiat of the government watch dogs silenceing scrupules on the part of these who advice at Simula...

এই খোলা চিঠিতে তিনি আরও লিখলেন : তাঁর খোলা চিঠির পরেও যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে ন্যাশন্যালিস্টপার্টি কি ভাবে কাজ করবে তিনি তার নির্দ্দেশও দিয়ে যেতে চান।

এই ঘোষণা 'খোলা চিঠির' মারফৎ দিলেন : তার পদ্ধতি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আইন অনুসারে ঘোষিত :

The Nationalist principle is the principle of no control, no cooperation.... A respect for the law is a necessary quality for endurance as a nation and it has always been a marked Characteristic of the Indian people. We must therefore scrupulously observe the law while taking every advantage both of the protection it gives and the latitude it still leaves for pushing forword our cause and our proparganda. With the stray assassinations which have troubled the country, we have no concern and having once clearly and firmly dissociated ourselves from them. We need notice them no father. They are the rank and noxious fruit of a rank and noxious ploicy and until the author of that policy turn from their errors, no human power can prevent the poision tree from bearing according to its kind.

Our ideal of Swaraj involves no hatred to any other nation nor of the administration which is now established by law in this country... our methods are to... evolve a government of our own for our internal affairs so for as that could be done without disobeying the law or questioning the legal authority of the bureacratic administration. ...The Nationalist party stood for democracy the constitutionalism and progress.

এই খোলা চিঠিতে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করলেও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বয়কট নীতিকে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের অস্ত্র রূপে চিহ্নিত না করে ঘোষনা করলেন : এগুলো আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভের উপায় রূপে। বয়কট সর্ব্বাত্মক রূপে নয়, এমন কি মডারেটকের সঙ্গে হাত মেলাতে কুণ্ঠা তার নেই। পূর্ণ স্বাধীনতার পূর্ব্ব প্রস্তুতি হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনকেও স্বীকৃতি দিতে তিনি প্রস্তুত।

নিবেদিতা এই খোলা চিঠির মধ্যে অরবিন্দের নম্র সুরে দেখে ভাবলেন : অভিপ্রেত ফল এক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি কিন্তু আতঙ্কিত হলেন: এ চিঠিটি ভারত সচিব মিঃ মর্লের কাছে পৌছাতেও না পারে। ভারত সরকারের মনোগত ইচ্ছা তিনি জানেন, সে সংবাদও তাঁর কাছে পৌচেছে, অরবিন্দকে চালান দেওয়ার প্রস্তুতি, প্রায় সম্পূর্ণ। ভারতস্থ ইংরাজ শাসককুল ভারতীয় ন্যাশন্যালিস্টদের রীতিনীতি সম্বন্ধে উর্ধ্বতন মহলকে ভুল বুঝিয়ে অরবিন্দকে চালান দেবার অনুমতি আদায় করে নিতে পারে।

তিনি সচেষ্ট হলেন তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুবান্ধবকে প্ররোচিত করতে। উদ্দেশ্য ভিতর ও বাইরে চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন। ৫ই আগষ্ট ১৯০৯ র‍্যাটক্লিক দম্পতিকে লিখলেন : মনে হয় এই সপ্তাহেই তোমাদের কাছে কর্মযোগীন পৌছবে। আমি অফিসে তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে যে

খোলাচিঠি আছে, তা ওমহলে চাঞ্চল্য ঘটিয়েছে। ওর কপি, আমার ধারনা, মর্লে ও সকল সাংবাদিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলো পৌঁছতে না পারে। অ্যালবার্টাকে লেখা চিঠির ভিতরে আমি একটা কপি পাঠাচ্ছি প্রেত দর্শকের (উইলিয়াম ষ্টেড) জন্য। সুযোগ করে নিয়ে তুমি অ্যালটার্টাকে অবশ্যই জানাবে। আমি জানি যে, সে 'The Hon' নয়, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে খামের উপরে নামের আগে তাকে ঐ সম্বোধন করেছি। প্রয়োজনটা কি, তা তুমি তাকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারবে। খোলা চিঠির লেখককে যদি চালান দেওয়া হয়, তাহলে দিন দু'য়েকের মধ্যে তা ঘটবে। এবং এই চিঠি পৌঁছবার আগেই তুমি তা জানতে পারবে। তোমার ব্যবহারের জন্য, তোমাকে কর্ম্মযোগীনের আর একটি সংখ্যা পাঠাতে চেষ্টা করব।

অরবিন্দ ঘোষকে যদি সত্যই চালান দেওয়া হয়, তাহলে তার আসল কারণ তুমি অবশ্যই বুঝবে— ৯ জন নেতাকে জেলে দেবার পরে সমস্ত দেশ সহসা ঝিমিয়ে পড়েছিল, আর তা দেখে সরকার তার মহাপ্রস্তার মূল্য বুঝেছিল। আবার আলিপুর মামলার বন্দীরা মুক্ত হয়েছে, অমনি পুনঃ জাগরণের লক্ষণ দেখা গেছে। সুতরাং নীতিকথা এই জাগরণের কর্ত্তাটিকে পাকড়াও, ফটকে ঠেলে দাও। এই পদ্ধতি তাদের অনন্তকাল চালিয়ে যেতে হবে। নৈতিক নয়, কেবল ফৌজদারী আইনের শক্তি। একটা সরকার কতদিন এই নীতি ধরে চলতে পারে? আর তাদের পক্ষে এমন নীতি আরম্ভ করার অর্থই হয় না যদি না, একে চূড়ান্তভাবে সর্ব্বাত্মক করে।

৫ই আগষ্ট ১৯০৯, মিসেস বুলকে লিখলেন : সকল বড় (ন্যাশন্যালিষ্ট) মাতাদেবীর পদস্পর্শ করে যান। সকলেই স্বীকার করেন, আহবান এসেছিল স্বামিজীর মধ্য দিয়েই।

৫ই আগষ্ট ১৯০৯, র‍্যাটক্লিক দম্পতিকে লিখলেন : তোমরা জানো কি সতেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসির আগে তাকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দেবার জন্য বৃদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রীকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল? তবে হ্যাঁ, ও কাজটা করতে হবে গরাদরের বাইরে থেকে— আর সেইকালে ঘিরে থাকবে ও তাদের কথাবার্ত্তা শুনবে পাঁচ কি ছয় জন ইউরোপীয় ও ভারতীয় ওয়ার্ডার ও গার্ড। কানাই দত্ত সম্বন্ধেও একই কাজ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ঐ সময়ে খুবই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী থাকলেও তিনি উঠে সেখানে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। কিন্তু কানাইকে দেখতে তাঁকে দেওয়া হয়নি। তোমাদের এসব কথা বলার কারণ— ভবিষ্যতেও এমন ব্যাপার ঘটতে পারে। মৃত্যু-দণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে যাজকের সাক্ষাৎ বন্ধ করা নিশ্চয় স্বাভাবিক রীতি নয়।

কি অপূর্ব্ব ভাবে ছেলেটি মৃত্যু দণ্ড গ্রহন করল। ঠিক হোক, ভুল হোক— বীরত্ব যা সত্যই বিশাল বীরত্ব তা ইতিহাস সৃষ্টি করে। ... কানাইয়ের আত্মদান তাকে জোয়ান অব আর্কের আত্মদাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ আত্মদানের প্রকৃতি এমন কি বৃহত্তর বলে মনে হয়। একেবারে গীতামূর্ত্তি।

৫ই আগষ্ট ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে জানালেন : জিনিসপত্র পাঠাবার জন্য তাঁর ভাইজি অ্যালবার্টাকে 'দি হন' টাইটেল দিয়েছি এবং একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। তাকে দয়া করে জানিয়ে দিও যে এই ভুলটি কখনো সখনো হবে।

অরবিন্দের খোলা চিঠির একটি কপি যা কর্ম্মযোগিনে প্রকাশিত, আমি অ্যালবার্টার মারফত প্রেতদর্শী স্টেডের কাছে পাঠাচ্ছি। দয়া করে সুযোগ করে নিয়ে অ্যালবার্টকে বলো, আমি জানি সে, দি হর্ন নয় — কিন্তু খামের উপর ঐ সম্বোধন বিশেষ উদ্দেশ্যেই করেছি । কারণটা তুমি তাকে ব্যাখ্যা করে বলবে।

নিবেদিতা ভারতে ফেরার পরই, পুনায় মিঃ গোখলে একটি সভার আহবান করে, বললেন: মদনলাল ধিংড়া কর্নেল উইলিকে ইংলণ্ডে খুন করে ভারতের নামে কলঙ্ক লেপন করেছে।

এর প্রতিবাদে নিবেদিতা "মডার্ন রিভিউতে", সে মন্তব্যকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নোট লিখলেন। 'ইণ্ডিয়ান সেলফ রুল অ্যাণ্ড এ ন্যারো ভিউ অব ইংলিশ ইন্টিরেস্টস' নোটে লিখলেন : ...এমন কি ভবিষ্যতেও ভারতের স্বাধীন রাজনৈতিক অস্তিত্বের কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কঠিনতম নিন্দার ভাষা মিঃ গোখলে খুঁজে পাচ্ছেন না।

আরও একটি পরের নোটে "মিঃ গোখলে অ্যাণ্ড দি সিভিলাইজড় ওয়ার্ল্ড" নামে লিখলেন : দি অনারেবল সি জি. কে. গোখলে, সি. আই. ই. মেম্বার অব দি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া, সম্প্রতি পুনায় বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছেন, তার দ্বারা তিনি নিজের রাজনৈতিক প্রচার-খ্যাতি বৃদ্ধি করেন নি।... "এই ঘটনা ভারতের নামে কলঙ্ক লেপন করতে পারে", সে প্রশ্ন তুলে তিনি লিখলেন : যখন কোন ইংরাজ, কোন ভারতীয়কে খুন করে, তখন ইংরাজরা সেই ঘটনাকে নিন্দা করতে, কিংবা নিহিত ব্যক্তির পরিবারকে সহানুভূতি জানাতে সভা আহবান করে না। কিন্তু সেজন্য আমরা তো সিদ্ধান্ত করি না যে, সকল ইংরাজ এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থক? ...মিঃ গোখলের বুদ্ধিতে কি কদাপি ধরা পড়েছে, কোন ইংরাজ তার জাতি-নিন্দায় অগ্রসর হয় না, যদি দেখে যে, তার স্বজাতীয় কেউ, কোন এক ভারতীয়কে খুন করেছে? তিনি আতঙ্ক প্রকাশ করলেন, ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের একাংশ "অ্যানার্ফিতত্ত্বের" প্রসারণকে সমর্থন করে।। এই মন্তব্যের হেতু সম্বন্ধে সন্ধান করে বলা যায়— এই উক্তির কারণ গত বৎসর লণ্ডনে এক সভায় ছাত্রের দল, তাঁর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাশ করে ছিল। যেহেতু তিনি মিঃ তিলকের শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় যোগদান করতে অস্বীকার করেছিলেন। অ্যানার্কিস্টদের শিরোমনি প্রিন্স ক্রাপ্টকিনকে ইংলণ্ডে মাথায় তুলে নাচা হয়। যে অ্যানী বেশান্ত রাজনৈতিক প্রশ্নে ভারতের ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধা বা মৌন, তিনিও 'ক্রপ্টকিন' এর অনুরাগী। ...আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে অ্যানার্কিজম্ দমনের নামে, ন্যায্য রাজনৈতিক আশা, আকাঙ্খাকে যেন চূর্ণ করা না হয়!

মিঃ গোখলে বক্তৃতায় বলেছিলেন : 'পাগলা গারদের লোকই কেবল স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে বা বলতে পারে।' এর উত্তরে তিনি আর একটি নোট লিখলেন : মিঃ গোখলে "অন আইডিয়াজ অব ইনডিপেনডেনস্"।

ভারতের ভাবী স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিখ্যাত ইংরাজ শাসকদের উক্তি উদ্ধৃতি করে প্রশ্ন তুললেন: ওঁরা কি পাগল? মিঃ গোখলে "স্বাধীনতা যেহেতু বলপ্রয়োগ ছাড়া কদাপি অর্জ্জিত হয় নি, তাই যারা স্বাধীনতার বিষয়ে বলেন বা প্রচার করেন তাদের অবশ্যই দমন করতে হবে। '— তিনি ঘৃণাভারে লিখলেন: এই উক্তি কি, সরকারকে উৎপীড়নের উস্কানি দিচ্ছে না?

৫ই আগষ্ট ১৯০৯, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : মাতা ঠাকুরাণী অপরূপা। গতরাত্রে বৌ (অবলা বসু) গিয়েছিল তাঁর পাদস্পর্শ করতে। চমৎকার নয় কি? সকল মহান জাতীয়বাদীই এখন তা করেন। সকলেই স্বীকার করছেন : আহ্বান এসেছিল স্বামিজীর মধ্য দিয়েই। সেদিন যখন মাতাঠাকুরাণীকে বললাম,'মা' শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন, আপনার অসংখ্য সন্তান এসে জুটবে--- সেদিন তো এসে গেছে। সারা দেশই তো এখন আপনার। শ্রীমা বললেন, তাই তো দেখছি!

তাঁর চিঠি পাওয়ার পর মিঃ র‍্যাটক্লিক ও মিঃ ম্যাক্‌কারনেস ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে এই খোলা চিঠিটির সম্প্রাসারণ করলেন, ফলে, সরকারী নীতি সাময়িক ধামা চাপা পড়ে গেল।

নিবেদিতা ও আশা পোষণ করলেন, তাঁর (অরবিন্দের) গ্রেপ্তার নিবারিত হয়েছে। অরবিন্দকে জানালেন: তাঁর চিঠির কাজ হয়েছে।

কাগজপত্র চলাচলের জন্য ক্রিস্টিন, জগদীশচন্দ্র, মিঃ ও মিসেস উইলসনকে ব্যবহার করেছেন এমন কি ইংলণ্ডের রাজ অন্তঃপুরের লোক লেডি স্যাণ্ডউইচকেও ব্যবহার করেছে। ইনি মিস ম্যাকলাউডের বোনঝি অ্যালবার্টা—অবিবাহিত কালে স্বামিজীর শিষ্যা। বিবাহ সুত্রে রাজ অন্তঃপুরবাসী। পূর্ব্ব নাম আলবার্টা স্টার্জেস। ইনিই ১৯০২ সালে এঁর ভাই হলিস্টার নিবেদিতাকে ৬ খণ্ড মাৎসিনীর জীবনী পাঠিয়ে ছিলেন বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণের জন্য।

এবারে তাঁর আমেরিকা যাত্রা ও অর্থ সংগ্রহ ছিল তাঁর স্কুলের ভবিষ্যৎ ও স্বামিজীর ইচ্ছা পূরণের জন্য বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। কিন্তু যেখানে যা কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন স্বামিজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথের শিক্ষার জন্য নিউইর্য়কে পাঠ্যের ব্যবস্থা ও হাত খরচার জন্য কিছু ব্যয় করলেন। এর কিছু দিন পরই "মার মৃত্যু শয্যায়" সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁর মৃত্যু ও তাঁর ইচ্ছামত বাবার ভাষণগুলি পুনরায় লিখলেন, ভাই রিচ ও বোন মেরীর জন্য। তাঁর দেহ ভস্ম, বাবার করব স্থানের পাশে সমাহিত করে ডঃ বসু ও মিসেস বুলির সঙ্গে ইউরোপে ভ্রমন শুরু করলেন, পরে মিস ম্যাকলাউড তাঁদের সঙ্গে যোগদিলেন। ভারতে ফিরে এলেন ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে। দেবমাতাকে কলকাতায় ধরে রাখলেন যত দিন সম্ভব আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর কাজ তিনি নীরবে করে চললেন। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। বিপ্লবী দলগুলিকে সমবেত হতে পরামর্শ দিলেন। সেই সঙ্গে গুপ্ত আন্দোলন যাতে পরিচালিত হয় তার নির্দ্দেশ দিলেন।

তিনি যখন ভারতে ফিরছেন তখন স্যার জন কার্জ্জন ওয়াইলী খুন হওয়ায়, অনেকে ধারণা পোষণ করতে লাগলেন দু বছর ইংলণ্ডে, আমেরিকা ও ইউরোপে বিপ্লবের বানী প্রচার করে বক্তৃতা দেওয়ার ফলে, জাতি-বিদ্বেষের জাগরণ ঘটেছে ও এই হত্যাকাণ্ড তারই ফসল। কিন্তু খবরে প্রকাশ পেল এটা ব্যক্তিগত ঘটনা, রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধে নেই।

নিবেদিতা ভারতে পৌছানোর পূর্ব্বেই অরবিন্দ মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তিনি 'কর্ম্ম যোগীন' ও 'ধর্ম্ম' নামে পত্রিকা বার করেছেন। ১৮ই জুলাই ১৯০৯ জুলাই তিনি বোসপাড়ায় পা দেওয়া মাত্র, তাঁর আগমন বার্ত্তা সর্ব্বত্র অনুগামী, পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়লো।

৩০শে জুলাই মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : সরকার গোয়েন্দাগিরির খরচ যোগাতে দেউলিয়া।

ইতিপূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে যান। সেখানে বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর সম্বর্দ্ধনা পান। তিনি প্রস্তাব করলেন : লণ্ডনে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া উচিত। ২১শে আগষ্ট ১৯০৯, "কর্ম্মযোগীনে" অরবিন্দ লিখলেন : সুরেন্দ্রনাথ নিজের বাগ্মিতায় মোহিত, লণ্ডনে কংগ্রেস অধিবেশনের পুরণো কথাটা পেড়েছেন তাতে অযথা বিপুল অর্থব্যায় হবে। ওটা ঘটলে, নির্ঘাত বিপুল মজার কাণ্ড দাঁড়াবে। ভারতীয় আন্দোলনের লড়াইতো বিলেতী গণতন্ত্রে সঙ্গে নয়, ও বস্তু ইংরাজের জন্য লণ্ডনে আবদ্ধ। ভারতের লড়াই, লণ্ডনের ভারত বিষয়ক দপ্তরের সঙ্গে এবং ভারতের ইংরাজ প্রশাসক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে। স্যার হেনরী কটন অথবা মিঃ ম্যাককারনেস পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষের কথাই বলেন।

২৮ শে আগষ্ট ১৯০৯ কর্ম্মযোগীনে নিজের মত পরিবর্ত্তন করে লিখলেন : হ্যাঁ, ইংলণ্ডে প্রচারে ফলোদয় হতে পারে, যদি বহু বছর ধরে ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়। সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন: ভারতীয় স্বার্থ সমর্থক ইংরেজগণ সর্ব্বদাই সংখ্যা লঘু থাকবেন, কেন না, মনে করা হবে তাঁরা বৃটিশ-স্বার্থের শত্রুতা করছেন।

মিঃ পাল তখন প্যারিসে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাবাদীদের বিরুদ্ধে বহু বক্তৃতা করে চলেছেন, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন, তুমি কি এই চিঠি পাবার পরে মরক্কোয় ইউ, কে লিখে বলবে, সে যেন দত্ত নামক একটি বালকের সন্ধান করে। বালকটি বিপিনের তত্ত্বাধানে ছিল, কিন্তু বিপিনের অকারণ কাপুরুষতা দেখে, তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়েছে, ভারতবর্ষে দুঃসাহসিকতার যুগ সৃষ্টির প্রচেষ্টায়। বালকটি উল্লাস করের ভাই। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দু'জনের অন্যতম সে উল্লাসকর, সুতরাং তার বিশ্বস্ততার সম্বন্ধে বলার প্রয়োজন নেই।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন :

আমি অ্যালবার্টাকে 'হন' উপাধি দিয়েছি এই কারণে, যাতে ব্যাপারটা উদ্ভট দেখায়। ... অলিখিত ইতিহাসের একটি টুকরো তোমাকে দেবার জন্য— বুড়ো ফক্স শেষ পর্য্যন্ত ঘুষ খেয়ে গেছে। শোনা গেল, মেদিনীপুর কেসে অভিযুক্তদের তালিকায় নাড়াজোলের রাজা ছাড়াও আর এক রাজাকে ঢোকানো হয়েছিল, কিন্তু পরে রহস্য জনক ভাবে তাঁর নাম অদৃশ্য হয়ে যায়, আর ৪০,০০০ টাকা হাতফিরি হয় ৫ টাকার নোটে, যাতে টাকার হদিশ করা সম্ভব না হয়। শোনা গেল, নাড়াজোল বোঝাপাড়ায় আসতে রাজি হননি, তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সর্ব্বদা যা বলেছি, এখানেও তাই তোমাকে স্মরণ করাচ্ছি — এসব শোনা কথা মাত্র। এদের মূল্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ...খুবই কৃতজ্ঞ হবো যদি আমাকে ২ নম্বর বলে চালিয়ে যাও। চমৎকার এই ভূমিকা। এডেন থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত 'পি, এ্যান্ড ও' কোম্পানীর ফাস্ট ক্লাস ক্যাবিনটি, ব্যাপার স্যাপার আমাকে সবিশেষ বুঝিয়ে দিয়েছে। দশ থেকে পনোর জন লোক, সেখানে চিঠি পত্র নিয়ে দারুণ খাটছে। রেজিস্টার্ড চিঠিও নিরাপদ নয়, তাকেও ছাড়া হচ্ছে না। নানা ধরণের লোককে লাগানো হয়েছে। আমি নানা সময়ে ঘরটির সামনে দিয়ে গিয়েছি, দেখেছি উচ্চপর্য্যায়ের কেরানীদের একজন চিঠি উঁচুতে তুলে সযত্নে পর্য্যবেক্ষন করছে— স্পষ্টতই বিবেচনা করছে— চিঠি খোলার দরকার আছে, কি নেই!

১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে জানালেন :

বাদীপক্ষে অর্থাৎ সরকার পক্ষে, আশুতোষ বিশ্বাসই আসল শক্তি। মনে হচ্ছে তার অপসরণ এতাবৎ যা ঘটেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সমালোচিত কাজ। (Ashutosh Biswas was the real strength of the prosecution and his 'removal' the most oppertune thing that has ever happened it seems) নর্টনের মত অধিকন্তু সেও স্বপক্ষত্যাগী দেশ প্রেমিক। পূর্ব্বে নর্টন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যুক্ত ছিলেন। বহু বৎসর আগে বিশ্বাস সেই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন — যা প্রকাশ করে বেচারা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি জেলে যান।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন: আমি অ্যালবার্টাকে 'হন' উপাধি দিয়েছি এই কারণে যাতে ব্যাপারটি উদ্ভট দেখায়। "...দমননীতি কতখানি ঘটাতে পারে? তা সম্ভবতঃ কিন্তু, নিশ্চিত ভাবে নয়, দেশের উপর মৃত্যুর নীরবতা ছড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু তখনো জনগণের হৃদয়ে স্বাধীনতা-প্রেম ধিক ধিক জলবে। অপ্রত্যাশিত ক্ষণে, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়। স্বাধীনতার আকাঙ্খা চূর্ণ করার ব্যাপারে, দমননীতি নিষ্ফল। তা বিশ্বনীতির পরিপন্থী বলে একই সঙ্গে অবিবেকী। যেহেতু আমাদের সকলের মধ্যেই স্বাধীনতার বাসনা অন্তর্নিহিত, তাই তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা, ন্যায় সম্মত হতে পারে না বরং সকল জাতীর মানুষকে স্বাধীনতার শিক্ষাদান ও তা অর্জ্জনে সাহয্যে দান, মানব সংসারের পক্ষে মঙ্গলকর। ...স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসা অনপনেয়। মিঃ গোখলের ধারনায় স্বাধীনতা-পন্থীরা বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী, সুতরাং তাদের মুখে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা নিছক একটা আচ্ছাদন, নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্য গায়ে চাপানো হয়েছে।

কেউ হয় ত কিছুটা সত্য কথা বলবে, যদি বলে যে, ঐ সব ব্যক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতাপন্থীরা নির্ব্বোধ, উম্মাদ, ফ্যানাটিক, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি বলা যায়, শ্রেণী হিসাবে তারা নিজেদের চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত, তা হলে সেটা হবে বিকট মিথ্যা। ... ওদের অনেকেই নিজেদের আচরণের দ্বারা এমন নির্ভীকতা দেখিয়েছেন, যা মিঃ গোখলে বা তাঁর দলের কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি।

অরবিন্দ নিশ্চিন্ত হলেও নিবেদিতার কানে নানা খবর আসতে থাকায়, সেটা তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

১৬ই সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন :

চোরের বাটপার ভাই। — কথিত যে, লেফটন্যান্ট গভর্নর হেয়ার মদ্যপ— স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন না। তিনটি ইংরাজের চক্রে তিনি আবদ্ধ, যাদের শ্যালকগনের পেট মোটা হচ্ছে, আর বাকি সিভিল সারভিসের লোক গজরাচ্ছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯ লিখলেন : ইতিমধ্যে আমি শুনেছি নির্ব্বাসিত কৃষ্ণ কুমার মিত্রে বিষয়ে দারুণতম কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণ কি করে চুপ করে বসে থাকতে পারে? লোক চক্ষুর অন্তরালে বিপুল ক্রিয়াকলাপের কথাই কেবল ভাবতে পারি — অর্থাৎ সেই ধরণের কাজের উপরই এখন ভরসা। শোনা যাচ্ছে, বেকার আরও বেশী নির্ব্বাসনে একেবারেই গররাজি। অপর পক্ষে মিঃ রিসলে অথবা অন্য যে আহাম্মক কর্ত্তৃত্বে আছে, ভাবছে যে, ভারত মাথা নামিয়ে দেবে — যেহেতু তা করলেই সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার ও কারাবাস এড়ানো যাবে। সুরেন্দ্রনাথের বর্ত্তমানে রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই, যার জন্য তাঁর গ্রেপ্তার, জনগণের কাছে হাহাকারের কারণ হবে। উল্টোপক্ষে সুরেন্দ্রনাতের মত নামী মডারেট নেতাও গ্রেপ্তার হচ্ছেন— এটা রাজনৈতিক প্রচারের সহায়ক হবে, সুতরাং তাঁর গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য জনগণের ব্যস্ত হবার কারণ নেই। এটা কি রি .লে সুলভ ব্যাপার হল না? কি অপূর্ব্ব তীক্ষ্মবুদ্ধি।

২৮শে সেপ্টেম্বর লিখলেন র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে : হ্যালিডে পুলিশ প্রধানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথা কৃস্টীন তোমাক জানাবে। সেই সঙ্গে বলি, সুন্দর ভাবে আমরা আমাদের মনে কোন কথাটা ধরে রেখেছিলাম, এস.বি.খুনের কেসে কত টাকা পেয়েছে? ঐ কেসটি তোমার কর্ম্মজীবনে মস্ত ভূমিকা নিয়েছিল। উত্তরটা সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার কাছে এসে হাজির। কথাটা কি তোমাকে বলেছি? মনিমানিক্য থেকে এক লক্ষ টাকা তোলা হয়। এটা তুলনামূলক ভাবে তুচ্ছ ব্যাপার বোধ হয়, যখন ভাবি যে ওরা নির্দোষ একটি লোককে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে কত ব্যস্ত ছিল। মোকাদ্দমা পরিচালনায় ফ্রেজারের কার্য্যধারা ক্রমেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। হাইকোর্টের এক বিহারী মুসলমান বিচারপতিকে, তাঁর নাম আশু ব্যারিষ্টার নিশ্চয় দিতে পারবে— একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, প্রস্তাবটা সদুদ্দেশ্যে প্রনোদিত, তা তিনি জানেন। কিন্তু বর্ত্তমাম পদে আরও পাঁচবছর তাঁকে থাকতে হবে, যাতে পদটি পেতে যে মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে, তা পরিশোধ করতে পারেন। অপরাধী ফ্রেজার। এসব ব্যাপারে সুপরিচিত, কিন্তু এদেঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা যাবে না। কারণ তা হলে আগে যা ছিল মানহানি, এখন তা রাজদ্রোহ।

৩০ শে সেপ্টম্বর মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : ১৬ই অক্টোবর যতই কাছে আসছে, সরকার ততই কম বেশী আতঙ্কের স্বীকার হচ্ছে। ন্যাশন্যালিষ্টদের নেতাকে গ্রেপ্তার ও কয়েক সপ্তাহের জামিন না দেওয়ার সম্ভাবনা।

নিবেদিতা যখন ভারতে ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে, নিঃশব্দে কাজ করে চলেছেন ঠিক সেই সময়ে মিঃ বিপিন পালের 'স্বরাজ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বেরুলে The Actiology of the Bomb

(বোমার নিদান)। তিনি বোমাকে ব্যাধি বলে ধিক্কার দিলেন। বললেনঃ বোমা সবচেয়ে জঘন্য পৈশাচিক হত্যা পদ্ধতি। বোমা নামক মারাত্মক ভ্রান্তিরও উৎকট বিজাতীয় রাজনৈতিক প্রচার চলেছে। ফলে, অধীর অনভিজ্ঞ তরুণেরা ... উন্মত্ত আবেগের শিকার হয়েছে। ... বোমার উদ্ভবের মূল আছে 'পার্টিশন' ও তজ্জাত আন্দোলন দমনে সরকারের ভ্রান্তনীতি। এই আন্দোলন চলাকালে দাঙ্গাবেঁধে ছিল, সরকার সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষায় চরম ঐদাসিন্য বা অসামর্থ দেখিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় একটি মারাত্মক উস্কানি দেওয়া হয়। তোমরা নিজেদের কালীমায়ের বোমায় সজ্জিত করো, যদিও ঐযুদ্ধ ঘোষণা সরকারের বিরূদ্ধে নয়, ব্যক্তির অধিকারকে যারা আক্রমন করছে, তাদের বিরুদ্ধেই, তবু তা একই সঙ্গে দারুণ বিপজ্জনক সাজেশন। ফলে, কিছু লোকের মনে বোমা তৈরীর ইচ্ছা জাগলো। যে কাজে অদ্ভুত সাফল্যও তারা পেল। "অতীব চতুর বুদ্ধির সঙ্গে ... বাঙালী বোমা নির্ম্মাতা নারকীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করে ফেললো।" তাদের এই "বালোকচিত মারাত্মক কলাকৌশল" আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। সরকারও একটি মারাত্মক ভুল করে বসলো। তারা এই খেলনার বিপ্লবকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, বিরাট 'রাষ্ট্রীয় বিচার' আরম্ভ করেদিল,— যা সমস্ত দেশে আলোড়ন এনে দিল। চাঞ্চল্যের পর চাঞ্চল্য, তা জাগরণের সুপ্ত দেশপ্রেমকে নাড়া দিয়ে গতিশীল করে তুললো, প্রবল ভাবাবেগ, নারী ও সাধারণ মানুষকে পর্য্যন্ত সর্বস্তরে গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিল।

প্রবন্ধটি বোমার মুক্ত নিন্দা প্রবাহ, যাতে বোমাতত্ত্বকে গৌরবান্বিত করা হয়নি ... কিন্তু রচনার বিষয়টি "বোমা" ও ছিল সরকারের ভ্রান্তনীতির সমালোচনা— বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ. এইচ. এসটোন এই প্রবন্ধটিকে, ভয়ানক অপরাধজনক কাজ মনে করলেন। লেখক বিপিনচন্দ্র পালকে, হাতে না পেয়ে, বাজেয়াপ্ত হল পত্রিকাটি। বোম্বাই এজেন্টকে এক মাসের জন্য গারদে পুরে দিলেন ৩১শে আগষ্ট ১৯০৯।

ইতিপূর্ব্বে নিবেদিতা ৫ই আগষ্ট ১৯০৯ তারিখে প্রেতদর্শক মিঃ স্টেউকে, যে সংখ্যায় কর্ম্মযোগীনে অরবিন্দের লেখা "ওপন লেটার টু মাই কান্ট্রিম্যান" বেরিয়েছিল পাঠিয়ে ছিলেন। বিলেতে তার সমর্থনে তিনি কি করে ছিলেন জানা না গেলেও এবার তিনি সচেতন হলেন। সরকারের এ কাগজটি তাঁকে স্তম্ভিত করে তুললো। প্রেস স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ! তিনি তাঁর রিভিউ অব- রিভিউজ পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যার্জিষ্ট্রেটকে উপলক্ষ্য করে, লর্ড মর্লেকে আক্রমন করলেন : হতভাগ্য লর্ড মর্লে। 'পনমল গেজেট' এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের এই চেহারা দেখে, হৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতি পাক খেয়ে উঠেছে। ইনি কি সেই মর্লে, যিনি সর্ব্বদাই আয়ারল্যাণ্ডে, অপরাধের নিদানের উপরে, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতেন। উক্ত মর্লের কর্ত্তৃত্বাধীন সরকার এমন একটি রচনার কণ্ঠ রোধ করলেন, যার প্রয়োজনীয়তা, ভারত আইন ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণে উৎকণ্ঠিত সকল ব্যক্তির কাছে কতখানি, তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিপিনপাল তাঁর প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদের পাপপদ্ধতির প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। স্বঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি প্রবন্ধটি লিখেছেন। তা যদি না করতেন, তাহলে ভারতে বোমার উদ্ভবের বিষয়ে এমন একটি সতর্ক' বিবেচনা সম্পৃত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে দেবার জন্য বিপিনপালকে লর্ড মর্লে ও তাঁর সরকার হাজার খানেক টাকা স্বচ্ছন্দে দিতে পারতেন, সেটি সদ্ব্যয়ই হত।

তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিপিনলালের রচনাটি পুনঃ মুদ্রিত করে। বললেন : বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট মিঃ এ. এইচ. এস অ্যাসটন ইচ্ছা করলে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোর্ডের ১২৪ এ ধারা 'রিভিউ অব রিভিউজ' এর উপরে প্রয়োগ করতে পারেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে এই অকল্পনীয় অত্যাচারকে বলা যায় "অন্যায়ের আচ্ছাদনের নীচে, মানুষের নীরবে বসে থাকা। এই যদি ভারত শাসনের পদ্ধতি হয়, তাহলে অ্যাস্টনগণ ভারতীয় জাতীয়বাদীদের যা করছেন, সেই ভাবে ইংরাজদেরও প্রতিকূল করে তুলতে সমর্থ হবেন।

Freedom of the Press in India – tipical Instance of Repression

সম্পাদকীয় কলমে মিঃ স্টেড 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি মুদ্রিত করে পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে বললেন : যদি স্বরাজ এর কণ্ঠরোধ করা হয়, তাহলে রিভিউজ অব রিভিডজ এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যাতে আমাদের ভারতীয় নাগরিকদের নিয়মতান্ত্রিক ও নির্দোষ সুবৃহৎ অংশ, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে কণ্ঠপেষণ ছাড়াই অতি গুরুতর সামাজিক সমস্যা সমূহের আলোচনা করতে পারে। ঐ সকল পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণ যেন অসন্তোষের কারণ সন্ধান ও অসন্তোষকারীর উস্কানির মধ্যে পার্থক্য করতে সমর্থ হয়। ভারতের সকলবন্ধুর কাছে থেকে, এই প্রকার পথ গ্রহণের যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে, মতামত জানতে চাই।

ভারত সরকার মিঃ স্টেডের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। রিভিউ অব বিভিউজ এর উক্ত সংখ্যা (১৯০৯ অক্টোবর) বোম্বাইয়ে বাজেয়াপ্ত করলেন। মিঃ র‍্যাটক্লিফকে, ভারতে পৌঁছে নিবেদিতা নিয়মিত তল্লাশ, গেপ্তার উৎপীড়নের সংবাদ, পাঠাতে লাগলেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : ১৬ই অক্টোবর যতই কাছে আসছে সরকার ততই কম বেশী আতঙ্কের শিকার হচ্ছে। ন্যাশন্যালিষ্টদের নেতাকে গ্রেপ্তারেরও কয়েক সপ্তাহের জন্য জামিন না দেওয়ার সম্ভাবনা।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : শুনলাম, আমি সি.আই.ডি'র তালিকাভুক্ত হয়েছি। 'যুগান্তরের' প্রেরণদাত্রী হিসাবে। হাস্যকর অভিযোগ, কেন না আমি জানিই না, তার মধ্যে কী থাকে— কিংবা কারা সেটি চালায়। আমি অবশ্যই সম্মানিত। তবে কিনা, ক্ষেত্র বিশেষে, সম্মান অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। ১৬ই অক্টোবর, যতই নিকটতর হচ্ছে সরকার ততই, অল্পবিস্তর তার বিশেষ গর্বে জেগে ওঠা আতঙ্কের অধীন হচ্ছে। বাংলা "হিতোপদেশ" পত্রিকা নিতান্তই মডারেট বলে কথিত, তার বিরুদ্ধে মামলা ছুড়ে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ পাল তখনও তাঁর নতুন, চিন্তাধারা প্রচার করে চলেছেন। অরবিন্দ, মিঃ পালের চিন্তা ও বাগ্মিতাশক্তি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ, তথাপি "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অক্টোবরে লিখলেন মিঃ পালের বিরুদ্ধে, আমরা সেইরূপ চেষ্টায় আস্থাবান নই। আমরা বর্ত্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্রকে বৈধ উপায়ে, প্রজাতন্ত্রে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সেই হেতু আত্মশক্তি অবলম্বন ও বৈধ প্রতিরোধ শক্তিকে সমর্থন করি।

১৬ই অক্টোবর এসে যাওয়া মাত্র এখানে, দার্জ্জিলিংয়ে, নারী ও পুরুষ গোয়েন্দার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অনেক বিচিত্র আগুন্তুকের সাক্ষাৎ প্রার্থনা আমি অগ্রাহ্য করছি।

'বুঝতে পারছো' — র‍্যাটক্লিক দম্পতিকে লিখলেন : মর্লে স্কীম এর ফলে দু কি তিনজন ভারপ্রাপ্ত ইংরাজ, সাম্রাজ্য শাসন করবে।

ওঁরা বলছেন, গতকাল থেকে ভারতীয়গণ ভোটাধিকার পেতে আরম্ভ করেছে , তার মানে ভোটার লিস্ট তৈরী শুরু হয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না, ভোটের অধিকার কে পাবে, কোন ভিত্তিতে পাবে? এইটি কেবল জানা গেছে, ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য হিন্দুদের ক্ষেত্রে যে সম্পত্তি পরিমান নির্দ্ধারিত হয়েছে, তার একের চার ভাগ থাকলেই মুসলমানরা ভোটাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে, এমন হয়েছে, হিন্দু মালিকের যেখানে ভোটাধিকার নেই, সেখানে তার কেরানীর ভোটের অধিকার আছে। এমন কি এটাও জানা যায়নি, গোপন ব্যালেটে ভোট হবে কিনা। তবে বহু মাস আগেই, অগ্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এমন একটি শাসন সংস্কারের জন্য — যা কেবল তাদেরই স্পর্শ করছে, যাদের সম্পত্তি আছে--- হিন্দু হলে ২০,০০০ টাকার আর মুসলমান হলে ৫,০০০ টাকা।

ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে জানো— তিনি মডারেট দলভুক্ত কাউন্সিলের সদস্য, সরকারের আস্থা ভাজন। কানাইলাল সম্বন্ধে প্রধান প্রশাসক ফক্সের সংবাদটি তোমায় জানাই। ফক্সের নিরীহ প্রশ্ন, ভূপেন বাবুকে— হিন্দুরা কানাই দত্ত সম্বন্ধে অমন উদ্দ্বাস দেখালো কেন? আদালতের বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত সাধারণ একজন খুনী— যার ফাঁসি হয়েছে!

ভূপেনবাবু উত্তরে বললেন— আমার জবাব তোমার কাছে মধুর ঠেকবে না। ফক্স চেপে ধরলো: আরে বলো, বলো— অরুচিকর কথা শুনতে আমি ভয় পাইনা।

ভূপেন বাবু বললেন : যীশুখ্রীষ্টকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করেছিল — জুডাস ইসকারিয়ট ছিল পুলিশের লোক, সেটা কিন্তু তাঁদের একজনকে পূজা করতে এবং অন্য জনকে ধিক্কার দিতে, তোমাদের বাধা দেয় না। অল্পাকারে সেটা এখানেও সত্য।

ফক্সের মুখটা লাল হয়ে উঠলো। ভূপেনবাবু বিষয়ান্তরে গেলেন। ফক্স প্রশ্ন করলেন— ওরা রিভলবার পেল কোথা থেকে?

তা আমি জানি না, উত্তর দিলেন ভূপেনবাবু । তবে, ওসব বস্তু খুব সহজে কোথা থেকে পেতে পারে, তা আমি জানি।

কোথা থেকে? ব্যগ্র ফক্স সাহেব।

সংক্ষেপে উত্তর দিলেন ভূপেনবাবু: পুলিশের কাছ থেকে।

কর্মযোগীন পত্রিকায় ৯ই অক্টোবর ১৯০৯, সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন : পাল ইংলণ্ডে ন্যাশন্যালিস্ট ব্যুরো বা এজেন্সি স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। মত বদল করে, পরে ন্যাশন্যালিস্ট দলের স্বীকৃত মতের বিরোধিতা করছেন। দলের অধিকাংশ মানুষ মনে করে, দেশ সংগঠনই আসল কাজ, ইংলণ্ডে প্রচার কাজ, কর্ম্ম, শক্তি ও টাকার অপব্যয়। পালের বক্তব্য ছিল, রয়টারের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে ঠিক তথ্য প্রচার করলে, বিলেতে ইংরাজরা ভারতের খাঁটি অবস্থা বুঝতে পারবেন। এর জবাবে অরবিন্দ বললেন : ওরা খাঁটি খবর জানলেও কোন ফলোদয় হবে না, কারণ ওরা ভারতীয়দের নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলে মনে করে। অবশ্য ম্যাকফারনেস ও তাঁর বন্ধুরা পার্লামেন্ট নির্ব্বাসিতদের মুক্তির জন্য যে প্রবল প্রচার চালাচ্ছেন, তা দেখে তাঁর মত পুনর্বিবেচনার কথা মনে ওঠে এবং কে জানে হয়ত কার্জন উইলির হত্যাকাণ্ড ঘটে না গেলে নির্ব্বাসিতদের মুক্তি ঘটে যেতোই।... ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ ইংরাজ একগুয়ে, বাস্তববাদী, কর্ম্মপুট, তারা পাথরে মাথা ঠুকে শিক্ষা নেয়, বুদ্ধিমত্তা ও সহানুভূতির ব্যাপারে তারা গোলমেলে, অনিশ্চিত।

১০ই অক্টোবর ১৯০৯, মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের কাছ থেকে চিঠি পেলেন। তাঁর (নিবেদিতার) অন্যতম ইংরাজ বন্ধু (সাংবাদিক) মিঃ ব্লেয়ারকে বরোদায় চাকরী দেবার ইচ্ছা জানিয়ে ছিলেন, চিঠিটি এলো তার জবারে। ইতিপূর্ব্বে মিঃ র‍্যাটক্লিফের চাকরীর জন্যও চেষ্টা করছিলেন কারণ এংরা প্রত্যেকেই ভারতহিতৈষী। এঁদের সবসময়েই ভারতের মাটিতে ধরে রাখতে চাইছিলেন।

মিঃ দত্ত লিখেছেন : প্রিয় নিবেদিতা, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে আমি লিখেছি, তবে মহারাজ মিঃ ব্লেয়ারের মাহিনা দেবার কোন প্রস্তাব করেছেন কিনা বলতে পারবো না। কারণ তা আমি জানি না, এ ব্যাপারে কথা বার্ত্তা যাতে সুখজনক পরিণতি লাভ করে সেজন্য ভূপেন্দ্রনাথকে চেষ্টা করতে বলিছি।

মহারাজা ও তাঁর পত্নী এখন দার্জ্জিলিঙয়ে আছেন তা তুমি জানো। এখানকার কাজকর্ম্ম আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণের। আমি শান্ত ও সতর্কভাবে বিরাট আকারে 'রিকর্ম' আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে হতভাগ্য মূক কৃষক-সমাজের জীবনে কিছুটা আলোক, আনন্দ এবং স্বচ্ছন্দ আসে।

আমার নিয়োগে এখানে বিরাট প্রত্যাশা জেগেছে। জনগণের ক্ষেত্রে, সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ হতে দেব না। তবে সফল হতে গেলে, সতর্ক, ধীর এবং সম্পূর্ণ নীরব থাকতে হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজ্যের কোন কোন অংশে দুর্ভিক্ষ দেখা গেছে। ত্রান কাজও আরম্ভ হয়েছে। কাজেই ডুবে আছি। স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকলে কাজ আমার পরম সমাদরের বস্তু।

তোমার চির স্নেহময় গড ফাদার

রমেশচন্দ্র দত্ত।

২৭ শে অক্টোবর ১৯০৯ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমরা বসুদের অতিথি দার্জ্জিলিঙয়ে। তবে আমরা ভিন্ন বাড়ীতে আছি, খাবার সময়ে নেমে আসি। এবারকার বৈজ্ঞানিক কাজের পর্ব এত নিদারুণ ঠাসা ছিল যে, আমি পরের বই আরম্ভই করতে পারিনি কিন্তু আরম্ভ করতে কত না চেয়েছি।

৩রা নভেম্বর ১৯০৯ লিখলেন : গত কয়েকদিনের মধ্যে একরাশ গ্রেপ্তার হয়ে গেল — ডাকাতির অভিযোগে। মনে হচ্ছে, আলিপুর ধাঁচে মস্ত আকারে দীর্ঘস্থায়ী নতুন এক মামলার মধ্যে আমরা চলে যাবো। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বেশীর ভাগই পুলিশের সাজানো ব্যাপার। পুলিশ সংখ্যায় অগণিত তাদের পেট ভরানো তো চাই।

২৫শে আশ্বিন মিঃ পালের বক্তব্যের বিরুদ্ধে পুনরায় লিখলেন : বিলেতে আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ে বিপিনবাবুর মত কত পরিবর্ত্তিত হয়েছে। মিঃ পাল প্রচার করছেন : ইংরেজ দেবতা নয় সত্য, তবে তারা পশুও নয়, তাদের গুণ আছে, বিবেক বুদ্ধি আছে, তারা অন্যায়ের পক্ষপাতীও নয়। তাদের বিবেককে জাগিয়ে তুলে, ভারতে তার নিগ্রহ-নীতি বন্ধ করতে হবে। ভারতীয় শাসকরা, বিলতে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তার নিরাকরণে বিলাতে সত্য প্রচার দরকার। ...উত্তরে অরবিন্দ বললেন : অবশ্যই ইংরেজ পশু নয়, তারা অবশ্যই মানুষ, এবং মানুষ নিজ স্বার্থেই অনলস যুক্তি দিয়ে নিজ স্বার্থকে ন্যায় ও ধর্ম্ম বলে অভিহিত করতে অভ্যস্ত। ... রামজে ম্যাকডোনাল্ড বিলাতের একজন প্রধান প্রজাতন্ত্র সমর্থক, বৃটিশ সাম্রাজ্য, প্রজাতন্ত্রবাদীর আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত মতও প্রকাশ করেছেন তিনি— কিন্তু তিনিও মর্লের শাসনসংস্কারের উদার নীতির প্রশংসাকারী, এক্ষেত্রে দেশ্যবাসী বুঝুন, বিলাতের আন্দোলন করায়— আমাদের পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের উপযুক্ত ফল লাভের সম্ভাবনা কত সুদূর পরাহত।

২৫শে নভেম্বর ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিককে লিখলেন : ভারতে, কার্জ্জন বিজ্ঞানের বিকাশকে ধ্বংশ করতে চেয়ে ছিল। শুনছি বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিজ্ঞানের কিছু নেই। এখানে জগদীশ চন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের অস্তিত্ব সরকারের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিজ্ঞান, নিরতিশায় ব্যয়বহুল, ফলে দুষ্প্রাবেশ্য, তার প্রসার অসম্ভব ব্যাপার করে তুলছে। কিন্তু বাংলা হল, আদর্শের জন্য অতিমানবিক সাধনার দেশ। এক বছরে ৭৫০ সতীর এই দেশ। এই বাংলাদেশ অসম্ভব বলে কিছু জানেনা। নতুন পথে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ দেখা যায় প্রতিটি অলি-গলি, বিএসসি পড়ার জন্য আগ্রহী ছাত্রে ভর্ত্তি। এখন থেকে ৫০০ বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করবে, তারা সারা ভারতকে শিক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। সেটাই আমাদের প্রাপ্তি। এই হল কালী! একই আঘাতে অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ, মৃত্যু যার নাম সর্বোচ্চ জীবন।

কৃষ্ণনগরের কথা শুনেছ, চারটি কি পাঁচটি সরকারী কলেজের অন্যতম। যখন সকল প্রাইভেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ, জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন এরাই আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এদরেও একে একে নিবিয়ে দিতে হবে। কৃষ্ণনগর ও হুগলী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণনগরের উপরই হল প্রথম আক্রমন। এই কলেজটি নির্ম্মান ও বহণের খরচ অর্দ্ধেক জনসাধারণ, অর্দ্ধেক সরকার বহন করেছে ও করছে। এখন সরকার থেকে চরমপত্র দেওয়া হয়েছে— যদি না জনসাধারণ সম্পূর্ণতঃ এটির ব্যয় বহন করে চলতে পারে, এবং বিরাট আকারে

এর বৃদ্ধির খরচ জোগাতে পারে, তাহলে অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। জনসাধারণের উত্তর : তারা সব দায়ই নেবে, কিন্তু ভবিষ্যতে নিজেরাই কলেজ চালাবে, নিয়োগের অধিকারও তাদেরই থাকবে। নিলর্জ্জ সরকার অগ্রাহ্য করে দিল। দায় অবশ্য জনগণের, নিয়ন্ত্রণ অবশ্য সরকারের। কলেজ বন্ধ। ইক্যুয়িজিসন কি এর থেকে মন্দ ছিল? প্রতিটি স্কুলের বইয়ের উপরে এখন লেখা থাকা চাই— সেন্টাল কমিটি দ্বারা অনুমদিত। এটা আমাকে "মিষ্টিরিয়াস টেন" এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষাই সংগ্রাম ক্ষেত্র।

প্রিয় মিঃ দত্ত (রমেশচন্দ্র) মারা গেছেন। খোকার জন্মদিন ৩০ শে নভেম্বরের সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শিব! শিব! এবছর কি ভয়ঙ্কয়!

১লা ডিসেম্বর ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : রমেশচন্দ্র দত্ত ও আনন্দমোহন বসুর মধ্যে এই অপূর্ব ব্যাপারটি ছিল— তাঁরা নবযুগকে প্রাণোত্তপ্ত অভ্যর্থনা জানাতেন, যদিও সে জীবনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি কেবল চাই এঁদের মত মহৎ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে যেন ভারতবর্ষ চালিত হয়। এঁরাই ঐ ভবিষ্যতের ভিত্তিস্থাপন করে গেছেন।

মিঃ স্টেডের পত্রিকা রিভিউ অব রিভিুজের সংখ্যাটি বোম্বাইয়ের ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর ডিসেম্বর সংখ্যায়। মিঃ স্টেড তাতে প্রশ্ন করেছেন : ইংলণ্ডে ও ভারতে আইনের চরিত্র এক, এমন কথা বলা হয়। তখন ইংলণ্ডে কেন বিপিনপালের — 'স্বরাজ' ও "আমার রিভিউ অব রিভিউজ"কে বাজে আপ্ত করা হবে না? যদি ঐ প্রকার একটি প্রবন্ধ ইংরাজ আইনে রাজোদ্রোহকর বিবেচিত হয়, তা হলে মিঃ মর্লের সম্পাদনাকালে 'পলমল গেজেটে' প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত রাজদ্রোহে পূর্ণ। তিনি আরও বললেন, খুবই বিরক্তি বোধ করতে হচ্ছে এই দেখে যে, কুড়িবছর ধরে 'রিভিউ অব রিভিউজ' যেখানে মুক্ত ও বিবেচক সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ও নির্ভয় সমর্থক, ... সেখানে কি না ভারতবর্ষে এক পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কার্য্যতঃ তাকে নিষ্পিষ্ট করেদিল!

তিনি দাবী করলেন : ইংলণ্ডে প্রেস সেনসারের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ইংলণ্ডে ছাপা কাগজ ভারতে গিয়ে নিপীড়ন ব্যবস্থার শিকার না হয়। (প্রেস সেনসার ইংলণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতার মহান ধ্বজা ধরী) ইংলণ্ড স্বক্ষেত্রে এটি করতে পারেন কখনো?... স্বীকার করি, আপনার মহিমায় কর্ম্ম জীবনের বিচিত্র চূড়ান্ত পূর্ব্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি — যদি আপনি, যিনি মনিং স্টার টর্টনাইফলি রিভিউ এবং পলমল গেজেটের একদা সুবিখ্যাত চরমপন্থী সাংবাদিক, এখন লণ্ডনে ভারতসংক্রান্ত সকল সংবাদ পত্রের প্রবন্ধের জন্য সেনসার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে, আপনার কর্ত্তৃতাধীন ভারত শাসন ব্যবস্থাকে শিরোমাল্যে সুশোভিত করেছেন!

আমি অবশ্যই এই বিষয়ে সচেতন, সংবাদপত্রের এই প্রকার কণ্ঠপেষণকে, পলমল গেজেটে আমার পুরাতন বড়কর্ত্তার তুল্য, তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে আর কোন জীবিত মানুষ্য দেখতে পাবেন না। আমি একথাও বিশ্বাস করি না যে, সম্পাদক থেকে ভারত সচিবের পদে উন্নতি কোন মানুষের, এ হেন জম্মান্তর ঘটাতে পারে, যার ফলে আপনি হাইকোর্টের দ্বারা সমর্থিত মিঃ অ্যাসটনের সিদ্ধান্তকে নিরতিশয় আত্মগ্লানির সঙ্গে দেখতে অসমর্থ হবেন— নৈরাশ্যের কথা না হয় নাই তুললাম।

মুক্ত ও বিবেচক সাম্রাজ্যবাদের নির্ভয় ও অনুগত সমর্থক উইলিয়াম স্টেন্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক ধারণার সমথর্ক নিবেদিতা উল্লাসিত হলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে, তিনি কতখানি স্পর্শকাতর! বোম্বাইয়ে রিভিউ অব রিভিউজ বাজেয়াপ্ত হল। ভারতের কণ্ঠরোধের ব্যাপারে তাঁকে প্রতিবার প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে, কিন্তু বৃদ্ধ স্টেডের পক্ষে পুরাতণ র‍্যাডিক্যাল সক্রিয়তা দেখানো সম্ভব হলো না!

যদিও ২৩শে এপ্রিল ১৯০৬ সালে মিসেস বুলকে লিখেছিলেন : সিভিলিয়ানদের মিঃ মিন্টোর অকুণ্ঠ আত্মসমর্পন তাঁকে বিস্ময়ে হতবাক করে তুলেছে। ৮/২ জুন ১৯০৭ সালে মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন : কি ভয়ঙ্কর অবস্থা এসে গেছে। মিঃ মিন্টোর দুর্ব্বলতায় তিনি স্তম্ভিত। মানসিক ও নৈতিক জাতিযুদ্ধ। দুই পক্ষ সহযোগিতায় নয়, যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি। ভাইসরয়ের উপর সিভিলিয়ানদের আধিপত্য হতবাক করে দিচ্ছে। সেই মিঃ মিন্টোর উপর ১৯০৯ সালের নভেম্বরে বোমা পড়লো আমেদাবাদে, এবং কোন ক্রমে বেঁচে গেলেন। তখন তিনি মনে করে ছিলেন এটা জাতীয় বুদ্ধি শক্তির স্খলন। কারণ কার্জ্জনের ক্রুর, নীচ, অবিবেচক কৃতকর্ম্মের বোঝা তাঁকে বইতে হচ্ছে। তবে একথা সত্য? মিঃ মিন্টোর আমলেই আতঙ্কজনক দমনমূলক আইন রচিত হয়েছে।

২৫ শে নভেম্বর ১৯০৯, মিঃ র‍্যাটক্লিককে লিখলেন : ... চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী ফিরোজ শা মেটা কাউন্সিল পুরো অধিকার করে বসে আছেন, গোখলে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করে দেশের কাজে মুখে পুড়িয়েছেন। তাঁদের হয়ে দু'চারটি কাগজ কেউ কেউ কিছু করলেও, তাদের ভবিষ্যৎ নেই।

সত্যকার গুরুত্ব যদি কোন দলকে পেতে হয়, তাদের নিশ্চয় করে গুপ্তভাবে কাজ করতে হবে। তারা কেবল কর্ম্মে, নিজেদের ব্যক্ত করবে।

২রা ডিসেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : অন্য কথা বলার আগে বলে নিই, খোকার মনে হয়েছে যে, সে ২০০ পাউন্ডের দুটি এবং ২০ পাউন্ডের একটি টাকার অঙ্ক তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়েছে। নিঃসন্দেহে তা তোমার দানের ফল। সে অবশ্যই তোমাকে নিজের লিখে ধন্যবাদ জানাবে কিন্তু তার আগেভাগে বলে নিই, এটা বড় স্বস্তির কারণ হয়েছে। তুমি তার ল্যাবরেটরীকে শৈশবে পালন করছে কী অপূর্ব্ব! ভারতে তোমার মহাভূমিকা!

অরবিন্দ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯০৯ তারিখে কর্ম্মযোগিনে রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বার করলেন 'The Man that Pass' রমেশচন্দ্র দত্তের 'অর্থনৈতিক ইতিহাস' বয়কটের রূপায়নে বৃহৎ ভাবে সহায়ক এবং এক্ষেত্রে তিনি বিরাট নিয়ামক শক্তি। কিন্তু গোটা লেখাটিতে রমেশ দত্তকে একজন সফল মাঝারি লোক বলা চলে। ১৮৪৮-১৯০৯ পর্য্যন্ত তিনি সফল পুরুষ। অস্বীকার করতে পারবো না। প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন, অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম। বিদ্যালয় ও কলেজে কৃতী ছাত্র। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কঠিনতম বলে কথিত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইংরাজ ছাত্রদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় বহু শত পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ, অ্যাসিট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কর্ম্ম জীবন শুরু করেন, প্রথম ভারতীয় ডিভিসান্যাল কমিশনার রূপে অবসর গ্রহণ, তারপর সর্ব্বাধিক অগ্রসর দেশীয় রাজ্য বরোদার অর্থমন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, পার্লামেন্টারি কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য, সরকারী সি আই-ই উপাধি প্রাপ্ত, দেশ-বিদেশের একাধিক সাহিত্য সংস্থার সম্মানিত সদস্য বা কর্ম্মকর্ত্তা। পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্ম্ম-শাস্ত্র ইত্যাদির বিষয়ে বহুতর ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা। ভ্রমন কাহিনী, কবিতা, এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক, উল্লেখযোগ্য অনুবাদকও। এই শ্বাসরোধী তালিকাকে আরও এগিয়ে দেওয়া যায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিল। অবসর গ্রহণের পরে, তিনি অধিকতর সময় ও উদ্যম নিয়ে ভারতের শাসন সংস্কারের পক্ষে এবং তার দ্বাবা ভারত ও ইংলণ্ডের দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে ঐকালের সর্ব্বোচ্চ সম্মান, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছেন ১৮৯৯ সালে। ব্যক্তি জীবনেও তিনি সুখী। ৪৫ বৎসরের আনন্দময় দাম্পত্য জীবনে, অনেকগুলি পুত্র কন্যার জনক, যাঁরা সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এমন মানুষ যে, লৌকিক অর্থে সমসাময়িক সকল ভারতীয় অপেক্ষা সর্ব্বাধিক এই সফলতাকে, কে সন্দেহ করবে? সুদীর্ঘ জীবন তাঁর— বহুমুখী অক্লান্ত প্রাণশক্তি ও কর্ম্মশক্তিতে পূর্ণ— বিখ্যাত, সম্মানিত, পরিণত, ভারতে ও ইংলণ্ডে খ্যাতনামা তিনি। সেই মানুষ; যিনি সর্ব্বদাই সাফল্যযুক্ত, সর্ব্বদাই ভাগ্যদেবীর

বরপুত্র। আর কোন মানুষকে, এমন বহুমুখী প্রায়াস, শক্তিতে, আশায়, উদ্যেমে,পূর্ণ দেখা যাবে কিনা সন্দেহ, যিনি নিজের সম্বন্ধে, বিশ্বাসে ভরপুর এবং আগাগোড়া সাফল্যময়। প্রকৃতিদেবী এঁর সম্বন্ধে, স্তনদাণে বদান্য, বাগ্যদেবী বদান্য, পক্ষপাতিত্বে ভাগ্যদেবী এঁকে সম্পন্ন, বিদ্যানুরাগী, সুপরিচিত এক পরিবারে স্থাপন করেছিলেন ... ইংলণ্ডে পাঠিয়ে সিভিল সার্ভিসের দরজা খুলে দিয়ে ছিলেন ... এবং এঁর বর্ণ ও জাতির মানুষকে ঐ সর্ব্বোচ্চ চাকুরীটি যে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার দান করতে পারে তার দ্বারাই একে ভূষিত করেছিলেন।... রমেশ দত্তর প্রশাসন-ক্ষমতা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ... সমকালের বৃহৎ বাঙালীদের মধ্যে রমেশদত্তই বোধ হয় সবচেয়ে কম মৌলিক। তাঁর সাবলীল কণ্ঠস্বর ও কলম কদাপি শব্দ ও চিন্তার জন্য অপেক্ষা করতো না। লেখক হিসাবে তিনি সাংবাদিক ও পামফ্লেট লেখকের বেশী বলা চলে না। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন না, অর্থনীতিবিদ রূপে তাকে রানাডে বা গোখলের সমপর্য্যায় ফেলা যাবে না। ভবিষ্যতে তাঁর রচনা গুলিকে স্মরণে রাখা হবে না। তাঁর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থে মৌলিক গবেষনা নেই, সে গ্রন্থ দ্রুত পুরাতন ও বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে...। ঋকবেদের অনুবাদ সম্পর্কে বলাচলে — অনুবাদ সুন্দর তবে ব্যাপারটা বেদ নয়...।

ভারতীয় প্রতিটি নেতার সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনে নিবেদিতার পরিচয় ঘটেছিল, যদিও মতে তাঁরা বিভিন্ন পন্থী। ব্যক্তিগত জীবনে চরমপন্থী বিপ্লবী হয়েও, স্বামীজির স্বপ্ন পুরণে আশায় একজোট হয়ে, স্বদেশের জাগরণের কাজে জাতীয়তাপন্থী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যারা দেশের কাজে ব্রতী, যাঁর উদ্দেশ্য বা কাজ দেশের সেবায় অর্থাৎ দেশজাগরণের কাজে উৎসর্গিত, তাঁর চোখে— তাঁরাই দেশ প্রেমিক। তাই তাঁর কর্ম্ম জীবনে, পাঞ্জাবের লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের তিলক, গোখলে, বাংলার পি মিত্র, চিত্তররঞ্জন দাস, বিপিন পাল, অশ্বনি দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর কর্ম্মজীবনের সহযাত্রী। এঁদের সকলকে নিয়েই ছিল রাজনৈতিক আসর। কিন্তু এঁদের মধ্যে, যাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও উদ্যোগী নেতা বলে সংগ্রহ করেছিলনে — তিনি অরবিন্দ। এঁর উপরেই ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস, ছিল তাঁর পরিচালন শক্তি। নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেমিক, মরণে তাঁর ভয় নেই। একথা তিনি ভূপেন্দ্র নাথ দত্তকে বলেছিলেন কথোপকথনোছলে, নিউইয়র্কে, 'অরবিন্দ মৃত্যুর ভয় করে না'। তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধাও করতেন, বন্ধু ও কর্ম পরিচালক নেতা হিসাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও পণ্ডিত্যকে সম্মান করতেন। কিন্তু রমেশচন্দ্রের তিরোধানের পরই "কর্ম্মযোগীনে" তিনি যে রচনাটি প্রকাশ করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তাঁকে লেখনী ধরতে হল। তা প্রকাশিত হল ১৯১০, মর্ডান রিভিউতে, জানুযারী সংখ্যায় 'Some Sort a Reply'.

রচনাসূত্রে অরবিন্দ একটি জায়গায় বলেন: "রমেশ দত্তের"— অর্থনৈতিক ইতিহাস, বয়কট রূপায়ণে বৃহৎভাবে সহায়ক এবং এক্ষেত্রে তিনি বিরাট নিয়ামক শক্তি। এতৎ স্বত্ত্বেও, সামগ্রিক ভাবে লেখাটি অত্যন্ত শীতল।"

"এই উক্তির প্রতিবাদে নিবেদিতা লিখলেন: অরবিন্দের মত লেখকের এই লেখাটি অশিষ্ট ও অসুন্দর, যত বুদ্ধির ঝলকই তাতে থাক না কেন!

ভবিষ্যৎকালের জন্মদাতাদের পংক্তিতে অবস্থিত এক মানুষের মৃতদেহ, যখন চিতাভূমে বহণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সম্মূখে স্তব্ধ হওয়া উচিত ছিল, নিন্দার কণ্ঠরব, স্থগিত থাকা উচিত ছিল বুদ্ধি চতুরতার প্রদর্শন।

অরবিন্দের সঙ্গে রমেশ দত্তর পরিচয় ছিল কিন্তু তাঁকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না বা সে সুযোগ তাঁর ঘটেনি। নিবেদিতার জীবনে এসেছিল সে সুযোগ। ব্যক্তিটিকে চিনতে চেয়েছিলেন এবং চিনেও ছিলেন। অরবিন্দ যখন লিখলেন : রচনা হিসাবে তা সুন্দর কিন্তু তা রমেশচন্দ্র দত্ত নয়।

মনে পড়ে সেদিনের কথা — সুদূর নরওয়েতে একই প্রিয় জনের (মিসেস বুলের) অথিতি যখন তাঁরা, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন। নিবেদিতা সেদিন বলেছিলেন — জীবনে কতখানি না ক্লান্তি জমেছে আপনার। উত্তরে শুনেছিলেন : আঃ! না! এখনো ক্লান্ত নয়। অতি সামান্যই যে করে উঠতে পেরেছি!

মনে পড়ে সেদিনের কথা ২৭ শে জুলাই ১৯০১ সালে মর্ডান রিভিউতে লিখেছিলেন, কখনো কখনো রাত্রে জেগে উঠে দেখেছি, যে অর্দ্ধমুক্ত দরজা দিয়ে বাতির আলো বেরিয়ে আসছে, পাণ্ডুলিপির উপরে ঝুকে পড়া চেহারাটি একনজরে চোখে পড়ছে। ... কয়েক ঘন্টা বিনিদ্ররজনী কাটাবার পরে, তিনি উঠে পড়ে কাজ করেছেন।

অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বড় চাকরী পেয়েছিলেন — তখনি তা গ্রহন না করে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয় জীবনে সে-গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে অরবিন্দকে বলতে হয়েছে। অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থটি এবং তাতে বর্ণিত ভারতে সঙ্গে ইংলণ্ডের বানিজ্যিক ও রাজস্বগত লেনদেনের জঘন্য কাহিণী। — এ ছাড়া বয়কটের জন্য, জনমত প্রস্তুত হত কি না আমাদের সন্দেহ। এই একটি ক্ষেত্রে বলা যায়, তিনি কেবল ইতিহাস লেখেননি — ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নিজের কানে শুনেছেন, ভারতের কথা বলতে, আমি বাঘের খাঁচায় যেতেও প্রস্তুত। তাঁর এই দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য উক্তি সমর্থন যোগ্য নয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিতঃ কোন বিজাতীয় পরিবেশে জন্মলাভ করে, রমেশদত্ত ক্রমে যথার্থ ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছিলেন। জাতীয়তার পথে তাঁকে চালিত করবার মত কেউ ছিলেন না, অথচ শেষে, তিনি নিজেকে পূর্ব্ব ধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন।... রমেশচন্দ্রের "সিভিলাইজেশান ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া" গ্রন্থ সমন্ধে বললেন — এই ধরণের বই সম্বন্ধে অতিছেঁদো কথা — এটি আউট ডেটেড — নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বাতিল — কেননা এর কখনই মৌলিক গবেষণা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল না। এই বইয়ে, সে ধরণের কিছু ঘটানোর চেষ্টা বা দাবিও করা হয়নি। বইটি যদি ঐ প্রকারে মৌলিক কিছু হতও, তথাপি একদিন না একদিন আউট-ডেটেড হতই। নিবেদিতা তাঁর কর্ম্মজীবনের নানা প্রকার সাফল্যের অল্প উল্লেখে স্মরণ করিয়ে দিলেনঃ প্রশাসক হিসাবে কর্ম্মজীবনের নানা সাফল্য। প্রশাসক হিসাবে কোন অর্থে দ্বিতীয় শ্রেণীর তা বলা শক্ত। — তবে প্রশাসণের ক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত কাজের চমক নয় — শান্ত সম্পাদনই বেশী ফলদায়ক। ওঁর বাংলা রচনাবলী দেশবাসীর মুখে প্রয়োজনীয় মানসিক খাদ্য তুলে দেবার দায়িত্বশীলতা থেকে এসেছিল, সাহিত্য সৃষ্টির সুখোল্লাস উপভোগের বাসনা থেকে নয়।

... অর্থনীতিবিদ হিসাবে রমেশবাবু, অরবিন্দ কৃতমুল্যায়ণকে গ্রাহ্য না করে বললেনঃ রানাডে বা গোখলে যেখানে বিদেশী পুস্তকলবধ পদ্ধতি অনুসারী সেখানে রমেশচন্দ্রের অর্থনীতি তথ্যভিত্তিক। এঁর অর্থনীতি ভূমি ও তার উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের অর্থনীতি। অর্থনীতিকে কদাপি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান মনে করার কারণ ঘটে নি — তা বিজ্ঞানেরই অংশ।

নিছক একজন 'সফল' মানুষকে দেখেছেন অরবিন্দ। জীবনের শিখরস্পর্শী সাফল্য সত্ত্বেও তিনি যথার্থ বিরাটত্বের সরলতাকে বজায় রেখে ছিলেন। রমেশচন্দ্র জনগণের অন্তর্ভুক্ত মানুষ। মৃত্যুর একবছর আগে সবিনয়ে তিনি স্বীকার করেছে। "ভারতে নব দিনোদয় হয়েছে, আমাদের দিন শেষ। যাঁরা এই কথাটিকে আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করার উত্তেজনায় দিশেহারা, তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ এমন সত্ত্যাসম্পন্ন মানুষের দিন কখনো শেষ হয় না। দুর্ভাগ্য সেই দেশ ও জনসাধারণের, যাদের মধ্যে এঁরা আর জন্মাবেন না। (রচনাটি ডিসেম্বর ১৯০৯)

বছর শেষ হয়ে এলো। হাউস অব কমনস সভাও শেষ হয়ে গেলো। সুরু হল পার্লমেন্টের নূতন নির্ব্বাচন। মিঃ ম্যাককারনেস, দলের হুইপ অমান্য করে তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ ও নীতি রক্ষা করে তিনি নিজেকে মুক্ত কণ্ঠ ও আপসহীন সংগ্রামের প্রতিভূরূপে পার্লামেন্ট থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তিনি দলের সমর্থন হারালেন শাসক সম্প্রদায়ক কর্তৃক ভারতীয়, কাজের প্রতিবাদ করায়। ঘোষনা করলেনঃ তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। তিনি অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটিতে যোগ দিলেন। ফলে, তাঁর শক্তিশালী লেখনী ও ব্যক্তিত্বের সহয়তা থেকে ভারত বঞ্চিত হলো না। মিঃ ম্যাককারনেস ইণ্ডিয়া পত্রিকায় নতুন আক্রমন সুরু করলেন। তিনি 'ভারতীয় পুলিশ চরিত্র' নামে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। ১৯০৫ সালের কার্জন কমিশনের দ্বারা উদ্ঘাটিত 'পুলিশ অত্যাচারের' বর্ণনা দিলেন। দু'বছরের বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারতের সকল স্থানের নির্বিচার নির্বাসন, বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার ও অন্যান্য পুলিশী আচরণের দৃষ্টান্ত তাতে দিলেন। উল্লেখ করলেন— পাঞ্জাবে ঘটিত একটি দৃষ্টান্ত। বললেন— এই ভয়ানক সংবাদ বিষয়ে এখনও কোন প্রতিবাদ করা হয়নি যে বৃটিশ প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত পুলিশ নির্দোষ মানুষের উপরে এমন অত্যাচার করতে পারে, যাতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়— একটি নারীকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে— যদিও নারীটি বহাল তবিয়তে বর্তমান ছিল।

তাঁর সমর্থনে ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৯ 'নেশন' পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হল : 'স্বরাজ' নামে উর্দু পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপালকে, এলাহাবাদের সেশনস্ জজ তিনটি প্রবন্ধ লেখার জন্য প্রতিটি প্রবন্ধের শাস্তি হিসাবে ১০ বছর করে নির্বাসনের আদেশ দিয়েছেন সে শাস্তি চলবে একসঙ্গে। এছাড়া এক লাহোর মামলায় অপরাধী প্রমাণ হওয়ায় আরও পাঁচ বছরের নির্বাসন। অ্যাসেরগণ সর্বসম্মতভাবে নির্দোষ বললেও বিচারপতি শাস্তির নির্দেশ দেন (২২শে এপ্রিল ১৯১০)।

২০শে জানুয়ারী ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে চিঠি দিলেন :

আমার কাছে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, যে ধরনের পীড়ন এখানে চলছে সৎ সমালোচনার প্রতিটি শব্দকে যেভাবে রাজোদ্রোহ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তা আপাততঃ যাই মনে হোক না কেন, বস্তুতঃপক্ষে মধ্যপন্থীদের উপরেই প্রচণ্ড আঘাত। কতকগুলি ক্রীতদাসের ঘ্যানঘেনে কাঁদুনি কেবল শোনা যাচ্ছে, অপরপক্ষে যথার্থ স্বাধীনচেতা মানুষ বাধ্য হয়ে নিশ্চুপ। এক্ষেত্রে একমাত্র যে আন্দোলনের বৃদ্ধির পথ আছে, তা হল সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবের পক্ষে গোপন প্রচার।

এই একেবারে প্রাথমিক মনস্তত্বের কথা বাদ দিলেও কণ্ঠরোধের মারাত্মক ফল, শাসক দলের চূড়ান্ত হটকারিতায় স্তম্ভিত হতে হয়। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে, এদেশকে তারা কিভাবে কব্জায় রাখবে? একদিকে বিরোধী মুসলমান জগত। অন্যদিকে জাপান, ওরা কি মনে করে, বৃটিশরাজের কোন বিকল্প নেই? আর ওরা তো ব্যক্তিগত লোভ, স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়ংন ছাড়া কিছু বোঝে না। চূড়ান্ত দায়িত্বহীন ইংলণ্ডে এই নির্বাচনের ফলে, যদি উচ্চতর শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এসে যায়, নিশ্চিত তাই হবে আমি মনে করি— সেক্ষেত্রে খোদ ইংলণ্ডেও ভবিষ্যতে একই ধরনের হটকারিতা, দায়িত্বহীনতার রাজ্য আসবে। তা যে ঘটতে পারে বুয়োর যুদ্ধই প্রমাণ।

২৭শে জানুয়ারী ১৯১০ মিসেস বুলকে লিখলেন : জনগণ সম্পর্কিত সংবাদ ভয়ঙ্কর। আর একটি খুন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে এর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯১০ অরবিন্দের ধর্ম পত্রিকায় বেরুলো :

গত সোমবার ২৪শে জানুয়ারী, বেলা ৫টা ১০ মিনিটের সময় কলকাতা হাইকোর্টে একজন আন্দাজ বিশ বছরের যুবক গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট মৌলবী শ্যামসুল খাঁ বাহাদুরকে গুলি করেছে। মি আলাম গত ১৯০৮ সালের মে মাস থেকে আলিপুর মামলার তদবির করে আসছিলেন। আশু বিশ্বাসকে হত্যার পূর্বে, আশুবাবু ওপরে ঐ মামলায় আলিপুরের ও

হাইকোর্টে নর্টন সাহেবের ডান হাতরূপে কাজ করেছিলেন। হাইকোর্টে যে বোমার মামলা এখন চলছে তার তদবিরও করছিলেন। পাঁচটা বাজতে তখন ১০ মিনিট বাকী, জজ উঠে গেলে আলাম কাগজপত্তর গুছিয়ে রেখে, কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন। ঘোরানো যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রিটে পৌঁছানো যায়, সেই সিঁড়ির কাছে যখন এসে গেছেন, ১৯/২০ বছরের একটি যুবক পিছন থেকে এসে আলোয়ানের ভিতর থেকে রিভলবার বার করে পিঠে গুলি করে। যুবকটিকে গ্রেপ্তারের জন্য তখন আলাম একবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সমর্থ হলেন না। চাপরাশি শাদিকে পাকড়ো পাকড়ো বলেই চিৎ হয়ে পড়ে যান। দু'একবার গোঁ-গোঁ করে গুলি খাওয়ার তিন-চার মিনিটের মধ্যে মারা যান।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯১০, মিসেস বুলকে লিখলেন :

হাইকোর্টে কোন এক পুলিশ অফিসারের নিধন সকলকে চমকিত শিহরিত করেছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

অবশ্যই তুমি আমাদের মতই প্রেসবিলের চেহারা দেখে হতবাক। অদ্ভুত লাগে যখন দেখি জনসাধারণ নিষিদ্ধ পত্রিকার কথা কদাপি ভাবেনি। শুনলাম ভূপেন বসু ও এলাহাবাদের মালব্য এই দুইজন মাত্র এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। কেটির বন্ধু (মিসেস র‍্যাটক্লিফ) মিঃ গোখলের উপর অভিশাপ এসে পড়েছে। উৎকট ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই করেন নি। ভূপেন বসু দেখিয়ে দেন ছাপাখানার বাড়তি খরচ— শিক্ষার উপর অধিকতর দণ্ডাঘাত ছাড়া অন্য কিছু নয়— কেননা তার ফলে পাঠ্য বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি ঘটাবে?

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, মিস ম্যাকলউডকে লিখলেন :

আশঙ্কা হয় মিন্টো ফিরে যাচ্ছেন। আমার ধারণা বেচারাকে যেসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, তার ফলে উনি একেবারে নার্ভ হারিয়ে ফেলেছেন। আর সেখানে কিনা ঐ আহাম্মক কার্জ্জনটা ক্রমাগত বাকবক করে যাচ্ছে। কি বিচিত্র, লোকটা লজ্জায় মাথা ঢাকছে না। ও কি ভেবেছে, এই নতুন পরিস্থিতির জন্য ছোটখাটো বেচারা মিন্টো দায়ী?

১৭ই ফেব্রুয়ারী মিঃ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : একথা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলা উচিত যে এই ঠিকানা (তোমার) ব্যবহার করি না, যতক্ষণ না শহরের কোন নিরাপদ ব্যক্তির দ্বারা তোমাকে লেখা চিঠি ফেলার ব্যবস্থা করতে পারি। এই কারণে আমি কখনো কখনো 'কেটির' (মিসেস র‍্যাটক্লিফ) পূর্ব ঠিকানায় চিঠি পাঠাই, বা অন্য উপায়ে পাঠাই। যখনই নতুন কোন সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটে, অমনি কিছু সময়ের জন্য উৎসাহের সঙ্গে ডাকব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়— সে সময়ে আমার এজেন্টরা বা আমার ভগিনী বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন :

পিছনে সর্বদা গোয়েন্দা লেগে আছে। সম্প্রতি তারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য বারবার অল্পবিস্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনে হয় সবক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। এ ব্যাপারে ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা আছেই, কারণ আমার কাছে সংবাদের জন্য এলে যে তীব্র ক্রোধের সঙ্গে সেই চেষ্টার মুখোমুখি হয়েছি এবং তাকে যেভাবে ঐদ্ধত্য বলে চিহ্নিত করেছি, তা তাদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেবে। আর যে শ্রেণীর লোক এখানকার মানসিক গতিবিধি বুঝতে আসে, তারাই এর মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও মজাদার ব্যাপার।

২রা মার্চ ১৯১০, লেডি মিন্টো নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাঁর বিদ্যালয়ে, একেবারে অতর্কিতে। ৩রা মার্চ ১৯১০ চিঠি লিখলেন মিসেস ওলিবুলকে : "গতকাল লেডি মিন্টো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।... বসু খুবই স্বস্তিবোধ করছেন। কারণ ইদানিং পুলিশের

উপদ্রব বড়ই বেড়ে চলছিল। তাই উনি চাইছিলেন, আমরা কয়েকজন রাজকর্মচারীকে বন্ধু হিসাবে লাভ করি। র‍্যাভির বন্ধু স্যার গাইক্লীট উড উইলসন ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটি স্থগিত রাখায় বসু উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময়ে এই ব্যাপার ঘটলো— যার ফল অনেক বেশী কার্যকরী ও কল্পনার অতীত।... ঘটনাটা এই, ২রা মার্চ ১৯১০, লেডি মিন্টো সহসা উপস্থিত হলেন— সঙ্গে এক আমেরিকান মহিলা, এবং এ ডি কং কর্নেল ব্রুক। বাগবাজারের গলিতে স্বয়ং ভাইসরায় পত্নী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসেছেন, বিপ্লবীদের উস্কানিদাতা বলে সন্দেহভাজন এক ইংরাজ নারীর সঙ্গে দেখা করতে— ব্যাপারটা আশ্চর্য্যজনকতা সম্বন্ধে স্বয়ং লেডি মিন্টোই জানালেন, আমরা যেন অতি অবশ্যই স্বীকার করি— এই বিশেষ কাজটি ইতিপূর্বে কোন ভাইসরয় পত্নী করেন নি।

সেকথা ঠিক। আমরাও সে বিষয়ে সন্দেহ করি না। অবশ্য তিনি এর আগেও আমার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন যখন চরমপন্থার প্রচারে বেপরোয়া। সরকারী মহলে এ ব্যাপারে নিবেদিতার হাত আছে বলে সন্দেহবিদ্ধ। ১৯০৭-এর মার্চ। তিনি তাঁর সঙ্গে ঘুরপথে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলেন স্বামীজির শিষ্যা মেরী হলস্টার। বিবাহের পরে মেরী হ্যামিল্টন কোটস। লর্ড মিন্টোর এক সম্পর্কের ভাইয়ের বাড়ীতে ছিলেন গভর্নেস। সেই ভাই মিন্টো গভর্নর জেনারেল হবার পর তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী হলেন। এই ভাইয়ের সূত্রে মিন্টো পরিবারের সঙ্গে মেরীর বিশেষ পরিচয় ঘটে। ভারতীয় নারীদের সাহায্য করতে উৎসুক ছিলেন লেডি মিন্টো। স্বামীজির ঋণশোধ করার ইচ্ছায় মেরী চান, নারী শিক্ষার ব্যাপারে নিবেদিতার সঙ্গে লেডি মিন্টো সহযোগিতা করুন। সেই উদ্দেশ্যেই উভয়ের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে উৎসুক মেরী, নিবেদিতাকে এক চিঠি লেখেন। নিবেদিতা সেই চিঠি মিস ম্যাকলাউডকে পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে নিজের মনোভাব জানিয়ে ১৪ই মার্চ ১৯০৭ তারিখে চিঠি লিখলেন। ইঙ্গিত ছিল লেডি মিন্টোর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটাবার চেষ্টার পিছনে কিছু অতিরিক্ত কারণ থাকা সম্ভবপর। স্পষ্টই জানালেন : লেডি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কোনই ইচ্ছা নেই। কদাপি ভেবোনা তিনি কিছু করতে পারবেন। যদি আমি সত্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তাহলে সেটা একমাত্র এই কারণে ঘটবে— এই সাক্ষাৎকারকে তিনি বাঞ্ছনীয় বলে স্থির করেছিলেন এবং আমাকে খোলাখুলি মতামত দেবার জন্য আহ্বান করেছিলেন, নারী শিক্ষার ব্যাপারকে নিঃসন্দেহে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে এবং আন্দোলনের সপক্ষে উচ্চমহলের বন্ধুও দরকার, এই দুটি কথা উঠতে পারে। কিন্তু আমার মতে ওদের দ্বারা বড় কিছু ফললাভ হবে না। আর আমি মনে করি না লেডি মিন্টো এক্ষেত্রে উপযুক্ত সাহস সংগ্রহ করতে পারেন। গত সপ্তাহে তিনি আমার সঙ্গে ঘুরপথে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে। আমি অবশ্যই এড়িয়ে গেছি। এসব কথা তোমাকে সাবধান করার জন্য বলছি— তুমি কদাপি যেন এই ব্যাপারটিকে এগিয়ে দেবার জন্য এখানকার বা অন্য জায়গায় কারো সঙ্গে যোগাযোগ করো না। মনে হয় না এমন, ইচ্ছা তোমার আছে, কিন্তু যদি ঘটনাচক্রে তার উদয় হয়, তাই তোমাকে এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় মনোভাব জানিয়ে দিলাম। লেডি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে বলাটাই, আমার কাছে বিভ্রান্তিকর ও বিপর্য্যয়কর বলে প্রতীয়মান। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা তো অপমানজনক। জনগণ নিজের জন্য যা করে, তাই শ্রেয়। ...আমার সকল আবেদনের লক্ষ্য— জনগণ। নৈতিকভাবে আমি তাদের সঙ্গে এক, শাসকদের সঙ্গে এমনকি সুদূর সম্পর্কও সেবার ক্ষেত্রে, লাভ নয় ক্ষতি।

এই ঘটনার ঠিক তিনবছর পরে সরাসরি নিবেদিতার কাছে হাজির হলেন লেডি মিন্টো। নিছক কৌতূহলবশে নয়— খুব সম্ভবতঃ আমেদাবাদে স্বামী বোমার হাত থেকে বাঁচবার পর, সন্দেহ লক্ষ্য নিবেদিতাকে প্রত্যক্ষ্যে যাচাই করার জন্য। খুব ঝুঁকি নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

৩রা মার্চ ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

লেডি মিন্টো তার জন্য কিছু স্বদেশী বিস্কুট আনতে বলেছেন। তাঁকে অজন্তার একটি স্কেচও আমাদের দিতে হচ্ছে। সেটি তরুণ বুদ্ধিমান এক শিল্পীর করা। নেহাৎ খোকার অনুরোধেই এটা করতে হল। নচেৎ এই ত্যাগ স্বীকার আর কিছুতেই করতে পারতাম কিনা সন্দেহ!

৩রা মার্চ ১৯১০ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : গতকাল সকালে এক আমেরিকান মহিলা এসে হাজির করলেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কাকে? লেডি মিন্টো! সমস্তটাই গোপন ব্যাপার— একজন এড ডি কং কেবল সঙ্গে। লেডি মিন্টো চার্মিং। বোমার বিষয়ে, নিজের মনোভাব শান্ত সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। পরের মঙ্গলবার তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে হবে। তার আগে পর্যন্ত এই সাক্ষাৎকার গোপন ব্যাপার।

৩রা মার্চ ১৯১০, বোন মিসেস উইলসনকে লিখলেন : গতকাল একটি অনন্যসাধণ ঘটনা ঘটে গেছে। যা পরবর্তী কয়েক মাসের জন্য আমাদের অবিরাম পুলিশের হয়রানি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। লেডি মিন্টো সকালে গোপনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দীর্ঘসময় ধরে অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা হয়েছে, আমরা তাঁকে স্কুল দেখিয়েছি। পরের মঙ্গলবার, তাঁকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা। তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত থাকবে।

এই চিঠি স্থগিত রাখাই বোধ হয় মঙ্গল, কেননা পোস্ট অফিসের এজেন্সির মারফৎ পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাঁদের উপরে বোমা ছোঁড়ার পর থেকে, তিনি চলাফেরা কাজকর্ম বিষয়ে সাবধান হয়ে উঠেছেন। আর বুঝতেই পারছ, আমি কোন বিপর্যয়কর ঘটনার পরোক্ষ কারণ হতে পারি না। একটি ছোট খাট আমেরিকান মহিলা কয়েক সপ্তাহ আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি এখানকার গোটা ব্যাপারটির ভালবাসায় পড়ে যান— তিনিই ওঁকে জানান। বসু বললেন— বেপরোয়া আমেরিকান ছাড়া, একাজ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

৩রা মার্চ ১৯১০, মিসেস বুলকে লিখলেন : তোমাকে আজ যে সংবাদটি দেবো সেটি কদাপি কল্পনায় আনতে পারবে না। লেডি মিন্টো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর যৌবন কেটেছে বস্টনে। আর, এইচ ফিম্পসন নামে ছোট খাট এক আমেরিকান মহিলা তাঁকে এনেছিলেন! মিষ্টি ছোট মহিলা বিয়ে হয়েছে এক ইংরাজের সঙ্গে। স্পষ্টতই খুব ধনী। তাঁর কাজকর্ম দৃষ্টি আকর্ষক। তৎসহ আমেরিকান সুলভ মৌলিকতার পুরো বরাদ্দ। যাইহোক, এই অসাধারণ ব্যাপারটি ঘটেছে, যা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। বসু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। পুলিশ উত্তরোত্তর ভয়ানক বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। লেডি মিন্টোর মহলে এটি প্রচারিত হবে না। তবে তাঁর স্বামী জানেন। কয়েকদিন পরে এর কথা পাড়ায় জানাবো এবং বুঝতেই পারছ সেটা সর্বাধিক মূল্যবান ব্যাপার হবে।

১০ই মার্চ ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : গত মঙ্গলবার ভাইসরয় পত্নীকে যথারীতি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর ছোট একটি নৌকা করে নদীপথে, নদীঘাটে প্রত্যাবর্তন। তার মধ্যে স্বদেশী কাপে চা পান, অন্তে তারকার নীচে বাক্যালাপ। উনি ছোট্ট মিষ্টি মাতৃজাতীয় মহিলা। নিজ স্বামীর জন্য তাঁর ভাবাকুলতা নিখুঁত সুন্দর।

১০ই মার্চ ১৯১০ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : লেডি মিন্টোর আগমন ব্যাপার পুরো সফল। আমরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সূর্য্যাস্তে নদীপথে প্রত্যাবর্তন। তিনি এখানে খাড়া নৌকার উপর দিয়ে ঘাটে নামলেন, নানা মন্দির যুক্ত সরুপথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে মোটরে পৌঁছলেন। মনে হল, এই ভ্রমণ তিনি পুরো উপভোগ করেছেন। ঠিক জনগণের মত করেই সমস্ত কিছুর মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করার এই কাজকে, তিনি নিজের অবিমিশ্র দীপ্ত বুদ্ধির

ফল বলেই মনে করেছেন। তাঁর এড ডি কং কর্নেল ব্রুক নদীর সৌন্দর্য্যে মোহিত। সে বিষয়ে তাঁর অনুভূতি মর্ম্মস্পর্শী। এই ঘটনা আমাদের কাছে যেমন, তাঁদের কাছেও তেমনি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরের দিন তিনি তোমার বন্ধু কর্নেলিয়া সোরাবজির সঙ্গে (বেলুড়) মঠ দর্শন করবেন।

১০ই মার্চ ১৯১০ মিসেস বুলকে লিখলেন : মিসেস হেরিংহোম সোমবার সকালে বসুদের বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর অজান্তা স্কেচগুলি মঙ্গলবার প্রদর্শিত হল। ঐদিন লেডি মিন্টোকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাবার কথা। তিনি ৯৩নং আপার সারকুলার রোডে বসুর বাড়িতে আমাকে তুলে নেবার জন্য এলেন, আনন্দের সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন, এবং বউ (অবলা বসু) ও ডঃ বসুকে তাঁর সামনে হাজির করা হল। চমৎকার নয়? লেডি মিন্টোর ব্যবহার কি সুন্দর! অত্যন্ত স্বস্তিকর তা, কারণ বউকে রেখে ঢেকে তাঁর কাছে হাজির করতে হয়নি। উনিই গৃহকর্ত্রীকে চিনে নিয়েছিলেন। পরদিন উনি সোরবজির সঙ্গে আকস্মিকভাবে মঠে উপস্থিত হন।

১০ই মার্চ ১৯১০ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন :

বুধবার কর্নেলিয়া সোরাবজি, লেডি মিন্টোকে হঠাৎ মঠে নিয়ে গিয়েছিল। মঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি রকম, মঠ কি এই এই জিনিষে, অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যাপারে, আগ্রহী ইত্যাদি। ওটা চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য। আমি থাকলে অসম্ভব হত।

১০ই মার্চ ১৯১০ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণের পরদিন লেডি মিন্টো মঠ দেখতে যান, তোমার বান্ধবী কর্নেলিয়ার সঙ্গে । কর্নেলিয়া যে গোয়েন্দা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তা এখন প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

১৭ই মার্চ ১৯১০ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : তোমাকে প্রায় বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, আগামীকাল দুপুরে বিশেষ আমন্ত্রণে লেডি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাতে যাচ্ছি। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, এখন দারুণ অবস্থা, মনে হয় ছোট নৌকা করে ভ্রমণকে উপভোগ করেছেন। তার কারণ তুমি বুঝবে। আমাদের তিনি কিছু স্বদেশী বিস্কুট নিয়ে যেতে বলেছেন। সেই সঙ্গে নতুন শিল্পীরীতির এক তরুণ শিল্পীর আঁকা একটি অজন্তার স্কেচ তাঁকে অগত্যা দিতে হচ্ছে, খোকার (ডঃ বসুর) অনুরোধে। খোকার অনুরোধ ছাড়া কোনমতে সেটি হাতছাড়া করতাম না।

৩১শে মার্চ ১৯১০ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : মিন্টো পরিস্থিতির, কাঠিন্যকে হ্রাস করার চেষ্টা যৎপরোনাস্তি করছেন।... ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বে ভাইসরয় ছিলেন বলে, নিপীড়িন মূলক আইন প্রয়োগের গতি বৃদ্ধি পায়নি বরং বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মিঃ মিন্টো তাঁর চরিত্রগত সৌজন্য ও মৃদুতার জন্য, অসম্ভব এক অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব সুরাহার চেষ্টা করছেন। কাউন্সিলগুলি তামাশা ছাড়া কিছু নয়, নির্বাসিতরা কারাগারে আবদ্ধ। কিন্তু তুমি এবং আমি জানি কার দোষে এসব ঘটছে। তার চিঠি যে কথা লিখেছে, তাতে আর চার ঘোড়ার গাড়ী চড়া ভাইসরয় আসার সম্ভাবনা দেখে, আতঙ্কিত। তার মনে আর একটি কার্জ্জনী ধরনের রাজত্ব। প্রতিদিন নতুন খুনের সংবাদ! যদি পার, তার থেকে আমাদের বাঁচাও। কার্জ্জন এখন এখানে থাকলে, তাঁকে আর বেঁচে ফিরতে হত না— সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

৬ এপ্রিল ১৯১০, মিসেস বুলকে লিখলেন : প্রচুর সংবাদ আছে, কিন্তু চিঠিতে আলোচনা করা অসম্ভব। মিষ্টি মহিলা লেডি মিন্টো, আমি যাতে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎকরি, সেজন্য তিনি এমনই ব্যাকুল যে, সে কাজ ঐ সপ্তাহে আমাকে করতে হয়েছিল। কমিশনার খুবই বিবেচনা-বুদ্ধি দেখিয়ে, অফিসে নয়— তাঁর বাড়ীতে যেতে বলেছিলেন। বারান্দায় বসে এক কাপ চা পান করা হয়। অতীব চার্মিং তাঁর ব্যবহার। অবশ্য জানা সম্ভব নয় তিনি কতখানি আন্তরিক ছিলেন। তবে কথাবার্তা, ভালভাবেই চলছে। তিনি বলতে পারতেন, যে রকম এনারা বলতে অভ্যস্ত, নেটিভ পল্লীতে বাস করা আমাদের পক্ষে লাভজনক নয় তার তুলনায় কথাবার্তা ভালই ছিল। অবশ্য 'হার এক্সলেনসির বন্ধু'—ব্যাপারটা তো অগ্রাহ্য করার বস্তু নয়।

৭ই এপ্রিল ১৯১০, র‍্যাটক্লিক দম্পতিকে লিখলেন : আমাদের নতুন ও মহিমান্বিত বন্ধু লেডি মিন্টোকে বাধিত করবার জন্য আমরা 'হ্যালিডে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। একসঙ্গে চা পানও হয়েছে। তিনি বললেন, তিনি জানেন যে, পুলিশ শয়তান এবং নজরদারি যাচ্ছেতাই ব্যাপার। কিন্তু উপরওয়ালারা তাঁকে বাধ্য করেছেন। বিস্ময়কর কথা! কিন্তু একটা প্রশ্ন কথাবার্তার সময়ে মন থেকে আমি বিতাড়িত করে রেখেছিলাম— যা কথাবার্তার আগে ও পরে মনে উঠেছিল— এস বি হত্যা কাণ্ডে (?) তোমার হাত কতখানি ছিল? ঐটির উত্তর পেতে চাই। তুমিও কি চাও না?

লেডি মিন্টো সত্যই প্রেমময়ী নারী। বৃদ্ধ স্বামীর শুভাশুভের ভাবনায় চিন্তিত। সত্যই তিনি নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট। তাঁর জার্নালে, নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরবর্তী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাস্তুপ, পঞ্চবটী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন :

সম্প্রতি জনৈক মিস নোবলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কলকাতার দরিদ্রতম পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করতে বিশেষ আগ্রহবোধ করেছিলাম। মিস নোবলে, ভারতীয় জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছেন 'সিস্টার নিবেদিতা' নামে আত্মপরিচয় দেন। আদর্শ বাদী, হিন্দু ধর্মের মধ্যে অপূর্ব সব তাৎপর্য্য দেখেন— যদিও তাঁর যুক্তিধারা অনুসরণ করা কঠিন। 'মিসেস ফিলিপসন' নামক একজন আমেরিকান মহিলা এবং ভিক্টর ব্রুকের সঙ্গে তাঁর স্কুল দেখতে অজ্ঞাত পরিচয়ে গিয়েছিলাম। এক বিশেষ শ্রেণীর বালিকাদের তিনি পড়িয়ে থাকেন। তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শাসন সংস্কারের বিষয়ে উল্লেখ করেন, সেইসঙ্গে মিন্টোর শাসনকালে ভারতীয়রা যে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছে তার কথাও। তিনি বললেন, যাঁদের মধ্যে তিনি বাস করেন, তাঁরা উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিরতিশয় দরিদ্র কিন্তু অতীব গর্বিত। মনে হল তাদের গুণাবলীকে তিনি আদর্শে বর্ণরঞ্জিত করে দেখেন। পৃথিবীর ধর্মচিন্তার বহু সহস্র বছরে বিবর্তনের ইতিহাস তিনি অনুশীলন করেছেন এবং মনে করেন— ভারতবর্ষ, জ্ঞান ও দর্শনের উৎস ভূমি।?

আমাদের বন্ধু সহসা উধাওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাককারনেসই এতাবৎ প্রধান রক্ষা ব্যূহ হয়েছেন দেখছি! শহরের দেশীয় অংশের কেন্দ্রস্থলে সঙ্কীর্ণ অন্ধকার এক গলি। ক্ষুদ্র বাড়ীতে সিস্টার বাস করেন। বর্তমান গোলযোগের অবস্থায় যদি সকলের জ্ঞাতসারে সেখানে যেতে হয়, বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা ছাড়া সেখানে কদাপি আমাকে যেতে দেওয়া হত না। সেকথা আমি জানি। চলে আসার আগে তাঁকে বলেছিলাম— ভাইসরয় পত্নী। তিনি বিস্মিত হলেন। মনোহারী তার মুখ, বুদ্ধিতে প্রভাবময়। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। যখন তাঁকে বললাম— কালীঘাটের মন্দির অপছন্দ করি। তিনি আমাকে নদীতটে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির দর্শন করার জন্য অনুরোধ করলেন, যেখানে তাঁর গুরু বিবেকানন্দ ১২ বছর ধ্যান ও সাধনা করে গেছেন যে পর্যন্ত না তিনি 'সত্য'দর্শন করে পূর্ণ সন্তোষলাভ করেছিলেন। কয়েকদিন পরে সেই ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

ভিক্টর ব্রুকের সঙ্গে একটি ভাড়া করা গাড়ীতে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে সিস্টার নিবেদিতাকে পেলাম। মন্দির পর্যন্ত গেলাম। কটকে মোটর গাড়ী ছেড়ে দিয়ে একটি নিমগাছ পেরিয়ে গেলাম। গাছটি পবিত্র বলে গৃহীত, দরিদ্র রমনীরা সেখানে পূজা করতে আসেন। ছোট ছোট অদ্ভুত চেহারা ঘোড়া, গাছের তলায় রেখে দেয়— দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ রূপে। আমরা অগ্রসর হয়ে পাথর বাঁধানো গাছের সামনে পৌঁছলাম। সামনেই হুগলী নদী। ঐ বেদীর উপর গাছের তলায় বিবেকানন্দ বসতেন। ধ্যানের পক্ষে সুনির্বাচিত স্থানটি, অস্ত সূর্য্যের আলোয় শান্ত ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখানে একজন সন্ন্যাসী এলেন, তিনি আমাদের মন্দির প্রাঙ্গনের বহির্বেষ্টিনীর পথ দিয়ে নিয়ে চললেন। আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। খিলানের মধ্য দিয়ে

যে মন্দিরের মধ্যে কালীমূর্তি আছে তা দেখলাম। পুরোহিতরা ইতস্ততঃ যাতায়াত করছেন, সিঁড়িতে ছোট ছোট শিশুরা খেলা করছিল। এই অপূর্ব মন্দিরটি শান্তি ও সন্তোষ বিকীর্ণ সযত্নে পরিচ্ছন্ন, কালীঘাট মন্দিরের সঙ্গে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তীর্থযাত্রীরা পুষ্প নিয়ে আসেন। তপস্যাপূত বৃক্ষমূলে অর্পণ করার জন্য। তাঁর ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। অতি পবিত্র বিবেচিত স্থানটি। প্রবেশের পূর্বে পাদুকা উন্মোচন করতে হল। স্থানটি দৈন্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিচিত্র মিশ্রণ।

মশারিসহ বিছানা স্বাচ্ছন্দ্যের সূচক। দেওয়ালে দেবদেবীর ছবির অদ্ভুত মিশ্র সংস্থান। নিমজ্জমান পিটারকে আমাদের প্রভু উদ্ধার করছেন— সে ছবিও এখানে। ঘরটি সিস্টার নিবেদিতার মনকে পবিত্রভাবে পূর্ণ করে দিয়েছিল। আমার কিন্তু এই সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও খাপছাড়া বোধ হচ্ছিল।

প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল নৌকায়। সিঁড়ি বেয়ে নামলেন ঘাটে। নির্ধারিত সময়ে দলে দলে মানুষ এখানে স্নান করতে আসে। তিন মাঝির ছোট দেশী একটি নৌকা, নদীপথে যাবার সময়ে সিঁড়িতে বসা লোকদের ছবির মত দেখাচ্ছিল। ব্যারাকপুর থেকে লঞ্চে যাতায়াতের সময়ে তাদের অনেক সময়ে দেখেছি কিন্তু ভাবিনি এরূপ ছোট নৌকায় কোনদিন চড়বো। আমার সঙ্গে সিস্টার নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন ছিলেন। বসার জন্য গদীর আসন আমাকে দেওয়া হয়েছিল। চা পান করানো হল চলতিপথে। মনে, টাইফয়েডের চিন্তা ছিল তাই দুধ ছাড়া চা দিতে বললাম। গন্ধে 'অরেঞ্জ পিকে' বলে মনে হল। কিন্তু ওরা বললেন সবই স্বদেশী, চা, চিনি, কাপ, ডিস। নৌকা থেকে নেমে অপেক্ষারত মোটর পর্যন্ত পথে ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়া চমৎকার লাগছিল। সেই অপরাহ্ণে, কেউ আমাদের চিনতে পারেনি। মাঝিকে একমাসের মাইনের চেয়ে বেশী টাকা বকশিস দিলাম— তারা বিস্ময়ে অভিভূত।

অতীব মনোহারী এই অপরাহ্ণটি। সিস্টার নিবেদিতা পারিপার্শ্বিকের সব কিছুতেই সৌন্দর্য্য দেখছিলেন। আলোচনার বিষয় অনুযায়ী পুরাতন পারসিক কবিতা আবৃত্তি করার অদ্ভুত সুন্দর ঝোঁক তাঁর। শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে বাঁধা বিচিত্র উচ্চসুরে সেগুলি আবৃত্তি করলেন। অপরাহ্ণটি যথার্থ উপভোগ করেছি দেখে তিনিও আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

৭ই এপ্রিল মিঃ র‍্যাকক্লিফকে অরবিন্দের অন্তর্ধান ও পরবর্তী ঘটনাবলীর কথা লিখলেন :

এই সপ্তাহে 'কর্মযোগীন' আক্রান্ত। একই অফিস থেকে 'ধর্ম' নামে বাংলা একটি সাপ্তাহিক ছাপা হত। ২০০০ টাকা জামানত দেওয়া না হলে তার ছাপা বন্ধ। জামানত দেওয়া হয়নি। এবং অরবিন্দ ঘোষ ও কর্মযোগীনের মুদ্রককে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সে প্রবন্ধটি এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। তুমি ইংলণ্ডে প্রবন্ধটির প্রচারে ব্যবস্থা করতে পারবে বলেই বিশ্বাস। এটা কি রাজদ্রোহ? অরবিন্দ ঘোষকে পাওয়া যায়নি। ১৮ই এপ্রিল মামলার দিন। যদি মুদ্রকের মামলায় জেতা যায়, তাহলে অপর ওয়ারেন্ট অরবিন্দের বিরুদ্ধে, যা জারি করা হয়েছিল অকেজো হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে কর্মযোগীনের আরও দুটি সংখ্যা বেরুচ্ছে। মুদ্রকের বিরুদ্ধে সরকারের তীব্র বিদ্বেষ কারণ— সে অশিক্ষিত 'নবশক্তি'র মুদ্রক হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছিল— একবছরের কারাদণ্ড পায়। শাস্তিটা কঠোর বলে বিবেচিত। কিন্তু জেল থেকে সে স্থির প্রতিজ্ঞ ন্যাশনালিস্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। পরে কর্মযোগীনের মুদ্রক হয়, কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাকে সতর্ক করেছিল। এইসব কারণে তার জামিন অগ্রাহ্য। সুইনহো বিচারক হবে মনে হচ্ছে।

গোটা মামলার বিচার করে সে বোধ হয় ওদের মৃত্যুদণ্ড দেবার চেষ্টা করবে। হাইকোর্টে আপীল একমাত্র উপায়। আর তা অবশ্যই করা হবে।

১৪ই এপ্রিল ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে জানালেন : কর্ম্মযোগীণের মুদ্রকের বিচার আরম্ভ হবে আগামী সোমবার।

১৪ই এপ্রিল ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

জানো কি, খোকা আমাদের গনেন বালকটির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। এই বইয়ের (দি মাস্টার) টাকায় আমাকে ভূস্বামিনী করে তুলবে। হলে নিতান্ত খুশী হব— তা যে স্বামীজির উপহার হবে!

১৭ই এপ্রিল ১৯১০, পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে লিখলেন :

প্রিয় মহাশয়,

আমার ভগিনীর শিশুগণের এবং ভগিনীর রান্নাঘরের গোপন সংবাদ সম্বন্ধে আপনার অধীনস্থ কিছু কিছু কর্মচারীর মাত্রাধিক কৌতূহলের বিষয়টি আমি সহজেই অনুধাবন করতে পারি। তবে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব, যদি চিঠিগুলি খুলে পড়বার পর তাদের আবার বন্ধ করে আমার কাছে পাঠাবার নির্দেশ উক্ত ব্যক্তিগণকে, আপনি দান করেন। বর্তমানে আপনারা যে বিরক্তি উৎপাদক ও পত্র হারাবার সম্ভাবনাসূচক পদ্ধতি নিয়েছেন— আমি কেবল তার থেকে অব্যাহতি চাইছি। অদ্য প্রভাতে আমি যে পত্রটি পেয়েছি, সেটি আমি এইসঙ্গে আপনার সকাশে পাঠাচ্ছি। সেটি যে আকারে পেয়েছি সেই আকারে রক্ষা করতে আমাকে খুবই চেষ্টা যত্ন করতে হয়েছে। তদুপরি আমার অভিযোগের একটি দীর্ঘ তালিকা সঞ্চিত হয়ে আছে। আমি প্রায়শই চিঠির প্রথম পৃষ্ঠা যথেচ্ছ ছিন্ন আকারে লাভ করছি, কিংবা দেখতে পাচ্ছি, সাহিত্যিক রচনা সমূহের উপরের মোড়ক অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আশা করতে ইচ্ছুক যে, আমার এই পত্রটি যার নকল রাখছি আপনার কাছে সরাসরি পৌঁছবে।

ইতি

ভবদীয়

১৭ এপ্রিল ১৯১০, মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফকে বলো, একটি লাইনকেই রাজদ্রোহকের বলে সন্দেহ করা যায়, যেটি গত ক্রীসমাসের দিন ছাপা হয়েছিল, 'আমরা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করবো, আমাদের কর্মনীতি, আইনের মধ্যে আমাদের আবদ্ধ থাকার প্রয়োজন অনুভব করে কি না করে? বর্তমানে তা আমাদের আইনের মধ্যেই আছে। কিন্তু যেহেতু অন্যায় আইন ভাঙাই নৈতিকতার দাবি, তাই এখানে (এই রচনার জন্য) শাস্তিপ্রাপ্তির কারণ দেখছি না— যদি না আদালত (সরকারের) ভয়ে মাথা নত করে দেয়।

১৯ এপ্রিল ১৯১০, মিঃ বেকার মিঃ মিন্টোকে লিখলেন : আলিপুর মামলা থেকে ছাড়া পেয়েছেন অরবিন্দ, কিন্তু তাঁর প্রভাব চূড়ান্ত ক্ষতিকর। তিনি নিছক কোন যুক্তিহীন অন্ধ যন্ত্রবিশেষ নন, তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারার সক্রিয় সঞ্চারক। অর্ধ ধর্মোন্মাদের ভাবে পূর্ণ তিনি; যা তাঁর পথে অন্যকে আকর্ষণ করার বিশেষ প্রেরণাশক্তি যোগায়। বাংলায় সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেও রাজদ্রোহাত্মক চিন্তাধারার বিস্তারে অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা, তাঁর ভূমিকাই অধিক বলে আমি মনে করি।

২৮শে এপ্রিল ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতি লিখলেন : বেপাত্তা সাংবাদিকের সন্ধান মনে হচ্ছে এখনো মেলেনি। মুদ্রকের বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত। দেখে আনন্দিত যে, ওরা ওয়ারেন্ট এড়াবার তাৎপর্য্য শিখতে পেরেছেন। মধ্যবর্তীকালে আশাকরি, তোমার কাছে পাঠানো প্রবন্ধটি পৌঁছেছে এবং তা বারুদ জুগিয়েছে— আর ধন্য-ধন্য রামজে ম্যাকডোনাল্ড, তাকে জ্বালিয়ে রাখবে। কেয়ার হার্ডি যেভাবে বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে, তা জেনে অপূর্ব লাগছে।

২৮শে এপ্রিল ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : অত্যন্ত চতুর একটি লোকের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করার জন্য। আমি উক্ত বুদ্ধিমানের ভাগ্য পেতে একেবারেই ইচ্ছুক নই। যার দেহ এখন থেকে সপ্তাহখানেকের কি সপ্তাহ দুই পরে নির্জন পাহাড়ে খাড়া খাদের পাশে আবিষ্কৃত হতে পারে।

২৮শে এপ্রিল মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বন্ধুর কাছে মারাত্মক খবর এসেছে অনুচ্চারিত প্রজ্ঞা বিভাগের অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগের খাতায় আমার নাম উঠে গেছে, সর্বাত্মক প্রেরণাদাত্রী হিসাবে। কিসের? মনে রেখো ডাকাতির! সুতরাং আমি নজরদারীর অধীনে।

২৮শে এপ্রিল ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : দু'এক সপ্তাহ আগে আমার একটি চিঠির প্রান্ত এমন করে কাটা ছেঁড়া করা হয়েছে যে, সেটি পোস্টমাস্টার জেনারেলকে পাঠিয়ে অনুরোধ করেছি, আমার চিঠিপত্র খুলে পড়ার পর সেগুলি আবার মুড়ে বন্ধ করে আমার কাছে পাঠাবার নির্দেশ তিনি যেন দয়া করে জারি করেন। তিনি আমার কাছে রেজিস্টার্ড পত্রে উত্তর পাঠিয়েছেন। এক ব্যক্তিকেও পাঠিয়েছেন। তাদের থেকে আমি জেনেছি, আমার নাম বিদ্রোহী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় নেই। তবে তাঁরা ট্রেনে বা জাহাজপথে চৌর্য্য বা হস্তক্ষেপ নিবারণের ব্যপারে ক্ষমতাহীন। অবস্থাটা আমি অধিকতর ভালই বুঝি, কিন্তু আমার চিঠিপত্র সম্বন্ধে আশ্বাস বোধ করেছি, একথা বলতে পারি না। যদি তুমি আমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠাতে চাও, তাহলে সিল করা সে চিঠি, আমার এজেন্টের হাতে দেবে। তাদের বলে দেবে— আমি নিজে গিয়ে ওবস্তু নেব, তারা যেন আমাকে সে কথা জানায়। সেটি পাবার জন্য হয়ত ডাকটিকিট চাইবে। যদি খুব জরুরী কোন ব্যপার ঘটে তবেই এরকম করার দরকার হবে।

৫ই মে ১৯১৩, মিসেস উইলসনকে লিখলেন : ডঃ বসু সর্বদা মার্গটের (বোনঝি বা ধর্মকন্যা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তুমি যা কিছু বলেছ, তা তাঁকে গতরাত্রে বলেছি। তিনি অবশ্যই চান, ছোট তাবিজটি ব্যবহার করা হোক। ডাকে যাবার সময়ে যদি পথিমধ্যে ভেঙে যায়, তুমি নিশ্চয় তা জানাবে, কারণ সহজেই আমরা নতুন পাঠাতে পারি। এই ছোট্ট মুসলমানী জিনিষটি সম্বন্ধে খোকার অসাধারণ বিশ্বাস। ব্যাপারটি বিচিত্র।

সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর অভিষিক্ত হলেন পঞ্চম জর্জ। এ্যালবার্টার গুরুত্ব বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ২৫শে মে, ১৯১০ র‍্যাটক্লিক দম্পতিকে লিখলেন :

অ্যালবার্টা রাজদরবারে ভারত সম্বন্ধে অধিকতর আনুকূল্য সৃষ্টিতে সমর্থ হবেন— এ ভেবে আমি আনন্দবোধ করছি।

১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর যতীন্দ্রনাথ বসুর স্বীকৃতি অনুসারে ধৃত হলেন নরেন গোঁসাই। তার স্বীকৃতি অনুসারে মে মাসে অরবিন্দ বন্দী হলেন। যে মামলা চললো একবছর। নভেম্বরে ফাঁসী হল কানাই দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর, নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করার জন্য। ইতিপূর্বে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসী হয়ে গিয়েছিল মজঃফরপুরে অগস্টে। আলিপুর বোমার মামলায় ও সেশন কোর্টের বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারাবাসী হলেন অরবিন্দ। হাইকোর্টের আপীলে মুক্তি পেলেন অরবিন্দ ৬ই মে ১৯০৯। তাঁর সঙ্গে মুক্তি পেলেন আসামী দেবব্রত বসু, নলিনী গুপ্ত, শচীন সেন প্রমুখ সাতজন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের যাবজ্জীবন; কারো হল দশ বছরের দীপান্তর। বারীন্দ্রনাথ ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসীর আদেশ, যাবজ্জীবন দীপান্তরের সাজা পেলেন আপীলে। ইতিপূর্বে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নির্দিষ্ট কারাদণ্ডের মেয়াদের পূর্বে ছাড়া পেয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁকেও আলিপুর বোমার মামলায় জড়ানোর চেষ্টা চলেছিল— কিন্তু সিস্টার কৃষ্টিনের সহায়তায় ছদ্মনামে তাঁকে এ্যারেস্ট করার পূর্বেই ইয়ুরোপ হয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন মেজদাদা মহেন্দ্রনাথ দত্তের পরামর্শে। অন্য বিপ্লবী দল, নেতৃত্বহীন হয়ে, স্বাধীনতা লাভের উপায় সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করলেন কিন্তু সন্ত্রাসবাদে সম্পূর্ণ নিরস্ত হলেন না। সরকার যে রুদ্র রূপের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা স্তিমিত হল বিনাবিচারে নির্বাসিত বা কারাদণ্ডী হওয়ার আশঙ্কায়। সেই দলছুটদের দলবদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা ভারতে পা দেওয়ার পর।

যে স্বাধীনতা মনে হয়েছিল আগত প্রায়, নেতৃবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও নির্বাসিত হওয়ায় ও সরকারের নিপীড়ন নীতি রুদ্রমূর্তি ধারণ করায়, তা সাময়িক স্তব্ধ বলে মনে হলেও দেশের সর্বত্র মহাজাগরণের সূত্রপাত হল। দেশের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হল। পরানুকরণের পরিবর্তে, অনেকের দৃষ্টি স্বদেশের প্রতি নিবদ্ধ হল। স্বদেশপ্রীতির যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল প্রকাশ্যে, তা ফল্গু নদীর অন্তঃস্রোতের মত উচ্ছ্বাসহীন বোধ হলেও মানুষের মনে, চালচলনে, বিলাসব্যাসনে, স্বদেশীকতায় গভীর দাগ প্রথিত হয়ে গেল।

জনসাধারণ স্বনির্ভরতার দিকে আকৃষ্ট হল। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠান ছোট খাটো কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগলো। জাতীয় শব্দটি শিল্প, শিক্ষা, সাহত্যি প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে দেশাত্মবোধের জাগরণ এনেদিল।

স্বামীজীর আদর্শ, ভাব ও বক্তৃতা, জণগণের মনে যে আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত জাতীয়তার ভিদ প্রতিষ্ঠিত করে দিল। বহুজাতির বাস, বহুভেদাভেদ, গণ্ডীবদ্ধ জীর্ণ তাদের সেই জীবন সহসা নাড়া দিল সাম্রাজ্যবাদীর শাসনযন্ত্রে। যা ছিল অটুট। যা, মুখে দানাপানি দিয়ে, যাদের শাসন ও শোষণ করেছিল এত দিন, শাস্তি ও সুখের নেশায় হতোদ্দম ও দাসজাতিতে পরিণত করে, অসভ্য ও বর্বর জাতি রূপে পরিচয় দিয়েছিল জগত সমাজে, এবার তারা নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে সচেষ্ট হল। তারা দাবী করতে শিখলো, 'ইংরাজ তোমার সভ্যতার আফিঙে জুর জুর হয়ে যে পরাধীনতাকে স্বর্গ সুখ রূপে বরণ করে নিয়েছিলাম এতদিন, তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দাও, আমাদের ভাগ্য, আমাদের গড়ে নিতে দাও'।

যে সব বিপ্লবী মুক্তি পেল, তাদের আদর্শ ছিল স্বামিজীর আদর্শ। দেশ মুক্তি যজ্ঞে সমার্পিত তাদের দেহমন। দেবব্রত বসু, ও শচীন রামকৃষ্ণ শঙ্খে যোগ দিলেন। যাঁরা করলেন না তাঁরাও রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা বহণ করে চললেন। শ্রীমা (সারদামনি) উদ্বোধন ভবনে বাস শুরু করলেন। অনেকে তাঁর কাছে এসে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

মে ১৯০৯ সালে মুক্তি লাভের পর, অরবিন্দ জুনমাসে ইংরাজীতে "কর্ম্ম যোগিন" পত্রিকা বার করলেন। প্রথম সংখ্যাতে আলোচ্য বিষয় হল: শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

নিবেদিতা ভারতে ছদ্মবেশে ফিরে শ্রীমার সঙ্গে দেখা করে এসে জুলাইয়ে ১৯০৯,পত্র দিলেন মিস ম্যাকলউডকে : সব দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলছেন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রেরণা এসেছে. কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দলে দলে শ্রীমাকে প্রণাম করে যাচ্ছে। আর মা, সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কি নির্ভীক এইসব ছেলে, দেশের মধ্যে কী পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে, সকলেই বলছে তাঁরা স্বামিজীর শিষ্য।

উৎসাহিত হয়ে শ্রী মাকে বললাম : মা, ঠাকুর আপনাকে বলেছিলেন; কালে আপনি বহু সন্তান লাভ করবেন। সে সময় এখন এসে গেছে, সমস্ত ভারতবর্ষই আপনার। শ্রী মা সহাস্যে উত্তরে বললেন তাইতো দেখছি।

নিবেদিতা জুলাই ১৯০৯ সালে ছদ্মবেশে ভারতে ফিরে এলেন বোস পাড়া লেনের নিজস্ব বাসভবনে সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন তখন সিস্টার দেবমাতা বসবাস করছেন সেখানে। ইনি মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে অবস্থান করতেন এবং তাঁকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে) সাহায্য করতেন। কলকাতায় অবস্থান কালে শ্রীমা সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন। শ্রীমা ও তাঁকে স্নেহ ও আশীর্বাদ করতেন। বেলুড়ে নৌকা যোগে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতেন।

নিবেদিতার দু'বছর বিদেশে অবস্থান করায় কৃস্টিনকে বিদ্যালয় পরিচালনে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। তিনি বিদ্যালয়ের ভার নিবেদিতার উপরে অর্পন করে আগষ্ট ১৯০৯ সালের প্রথম

সপ্তাহে দার্জিলিং গমণ করলেন, বিশ্রাম নেওয়ার আশায়। এই সময়ে কৃস্টিনকে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিলেন ভগিনী সুধীরা, ইনি বিপ্লবী দেবব্রত বসুর ভগ্নী। ১৯০৬ সালে এই স্কুলে যোগদান করেন। নিবেদিতার অসুস্থতা হেতু বহুদিন স্কুল বন্ধ থাকে। পর বৎসর স্কুল খুললে সিস্টার ক্রিস্টিনকে সাহায্য করতে থাকেন স্কুল খোলার সময় থেকেই। এর পূর্বে পুষ্পদেবী নামে এক শিক্ষায়িত্রী প্রথম থেকেই এ বিদ্যালয়ে শিক্ষতার কাজে সাহ্যয্য করতেন। তাঁর বিয়ে হয়ে যাওয়ায়, বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে উভয়েই বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই সময়েই সুধীরা স্কুলে যোগ দেন এবং প্রধান শিক্ষায়িত্রীর কাজ করতে থাকেন। ইনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না— অধিকাংশ সময়ই এখানে ব্যয় করতেন এবং আন্তরিক ভাবে ক্রিস্টিনকে সাহায্য করে চলতেন। এঁর জন্ম ব্রাহ্ম পরিবারে। ১৮ই নভেম্বর ১৮৮৯ সাল। বাবা আশুতোষ বসু ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। মেয়েকে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে আষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান। দাদা দেবব্রত বসুই, তাঁকে প্রেরণা দান ও সাহায্য করতেন। সাংসারিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দাদার উদ্দ্যোগেই নিবেদিতার স্কুলে যোগ দান করেন। এঁদের সংস্পর্শে এসেই এরূপ জীবন যাপনে আকৃষ্ট হন। ১৯০৯ সালে দাদা, বেলুড়ে যোগদান করলে, তিনি নিবেদিতার কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন স্থির করেন। স্বামিজীর আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। প্রথম জীবনে নিবেদিতাকে ভয় ও সমীহ করে চলতেন। পরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী হয়ে দাঁড়ান।

দু'বছর বিদেশে কাটানোর পর বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করে, বিশেষ অসুবিধায় পড়লেন নিবেদিতা। প্রতিটি জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের খরচ বহণের দায়িত্ব তাঁকে বিচলিত করে তুললো। প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ব্যয় মিসেস বুল গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে অধিক সাহায্য গ্রহণে সঙ্কোচ বোধ করলেন। কিছু অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য তাঁর কন্যা 'ওলিয়া' ও নিউইর্য়কের কয়েক জন মহিলার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালেন। কোন উত্তর পেলেন না। অগত্যা তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজন সংকোচে উদ্দ্যোগী হলেন। এটা ব্যতিক্রম নয়, এর পূর্ব্বেও তিনি একাজ করেছেন। ছোট ছোট মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা ছিল, তা অর্থাভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। এজন্য তিনি মনে গভীর বেদনা বোধ করলেন।

বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়া 'The Master as I saw Him' বইটি লেখা চলছিল। সেটি শেষ হতেই প্রকাশের ব্যবস্থা চালাতে লাগলেন। স্বামী সারদানন্দ অগ্রবর্ত্তী হয়ে বইটি ছাপানোর যাবতীয় ভার গ্রহণ করলেন। ফলে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিল।

সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সালে 'Footfalls of India History' লিখতে শুরু করলেন। পরিকল্পনা করলেন, এর পরে লিখবেন 'Studies from an Easterm Home' নামে আরও একটি বই। Statesman ও মর্ডান রিভিউতে প্রবন্ধ গুলি বেরুতে শুরু হল। বর্ত্তমানে শ্রীমা উদ্বোধনে অবস্থান করছেন। যোগীনমা অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে থাকেন। তিনি সুবিধা মত তাঁর কাছ থেকে পূজাপার্ব্বন সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। এছাড়া দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' ইংরাজীতে অনুবাদের সংশোধনের সহায়তা করে চললেন। প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য নিয়মিত সম্পাদকীয় ও 'মর্ডান রিভিউ'র জন্য নোট ও প্রবন্ধ রচনা, এছাড়াও Ananda Mohan Bose as a Nation Maker প্রবন্ধ রচনা, যা ওঁর জীবনী রচনার সঙ্গে যুক্ত করা হল।

আগষ্ট ১৯০৯ হঠাৎ খবর পেলেন স্বামী সদানন্দ পীড়িত হয়ে পীরগঞ্জে অবস্থান করেছেন। এত কাজের মধ্যেও ছুটলেন তাঁকে দেখতে। চিন্তান্বিত তিনি, তাঁর সবকাজেই তিনি সহযোগী। এ সময়ে সুধীরা তাঁকে অক্লান্ত সাহায্য করে চললেন। ইতিমধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের চেয়ে অমিয়া দেবী তাঁর স্কুলে শিক্ষার কাজে কিছুদিন সহায়তা করলেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ মিসেস বুলকে লিখলেন :

স্বামী সারদানন্দ আচার্য্যকে যেরূপ দেখেছি 'The master as I saw Him' বইটি প্রকাশনের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। বড় দিন বা নববর্ষে তোমাকে বইটি পাঠাবার আশা রাখি। স্বামী সারদানন্দ মুদ্রণকার্য্য ও বিতরণের ব্যয় বাবদ অগ্রিম অর্থ সাহায্য করছেন এবং প্রকাশনের জন্য কোন অর্থ নিচ্ছেন না। উনি বলছেন : বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে তাঁদের উপহার হবে ঐ অর্থ। আমার মনে হয়, এটি খুবই ভদ্রতা। আমি এখন বুঝতে আরম্ভ করেছি প্রকাশকদের কতখানি করতে হয়।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯, 'The master as I saw Him' ছাপতে দেওয়া হল। ২৯শে থেকে প্রুফ দেখা আরম্ভ হল। এ বইটি সম্বন্ধে তাঁর কত না উদ্বেগ।

অক্টোবর ১৯০৯ পূজার ছুটিতে দার্জ্জিলিং গেলেন। কলকাতার পেচপেচে গরম, তার উপর কাজের অত্যাধিক চাপ, ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে পার্বত্য অঞ্চলে দু'বার বেড়াতে যেতেই হতো স্বাস্থ্যের কারণে। মনে নানা পরিকল্পনা — সাফল্যের জন্য অর্থাভাব — তাঁকে মাঝে মাঝে বিব্রত করতো। ফলে মনের শান্তিতে বিঘ্নিত হতো। মিঃ লেগেট আগষ্ট মাসে (১৯০৯) দেহ রেখেছেন। মিঃ ও মিসেস লেগেট উভয়েই ছিলেন স্বামিজীর একান্ত ভক্ত, তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। তিনি (মিঃ লেগেট) নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন, ভবিষ্যতেও সে আশাও ঘোষণা করতেন। তাঁর মনে কাটার মত বিদ্ধ হতে লাগলো— তিনি স্বামিজীর কাজে শুধুই অবহেলা করে চলেছেন।

২৮শে অক্টোবর তাঁর জন্মদিন। তিনি ব্যকুল ভাবে স্বামিজীর কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁর কাজে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। স্বামিজী যেন আর একবার তাঁর সকল ভুল ত্রুটি মার্জ্জনা করে সেবার কাজে তাঁকে সুযোগ করে দেন, জীবনে যেন নতুন কর্ম্ম ধারায় প্রবাহিত হয়। তাঁর ভূল ত্রুটি আজ থেকে সংশোধন করেন।

১৫ই নভেম্বর দার্জিলিং থেকে ফেরার পর ডিসেম্বর মাসে মিসেস হেরিং হ্যাম ভারতবর্ষে এসে পৌছলেন। তিনি ডিসেম্বর মাসে অজান্তার চিত্রাবলীর প্রতিলিপি করে নিয়ে যাবেন। ইংলণ্ডেই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মিসেস হেরিং হ্যোমের শিল্পীর প্রয়োজন।

অবনীন্দ্রনাথকে বললেন, অজান্তায় মিসেস হেরিংহ্যোম এসেছেন, তুমি তোমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দাও তাঁর কাজে। দুই পক্ষের উপকার হবে। আমি চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

অবনীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন। স্থির হল : নন্দলাল বসু ও অমিত হালদার অজন্তায় যাবেন। মিসেস হেরিং হ্যামকে চিঠি দিলেন।

উত্তর এলো : বম্বে থেকে তিনি আর্টিস্ট পেয়ে গেছেন। নিবেদিতা ছাড়ার লোক নন। পুনরায় চিঠি লিখলেন, অজন্তায় নবীন শিল্পীরা গেলে শিক্ষা লাভ করবে দু'পক্ষের উপকার হবে। স্বয়ং উদ্যোগী হলেন। কিন্তু নন্দলালের বাইরে যাওয়ার আগ্রহ ছিল না। তিনি শুনলেন না। দু'চারদিন পরে পুনরায় এলেন। বললেন, তোমাদের যাবার সব ব্যবস্থা করেছি, তোমরা প্রস্তুত হও। অবশ্য শিল্পীরা আদৌ যাবেন কিনা স্থির নেই, তাঁদের মতামত না গ্রহণ করেই টিকিট কেটে, দিন স্থির করে, টাকা সঙ্গে দিয়ে লোক পাঠিয়ে দিলেন। ওঁর কাজের ধারাই এই। শিল্পীদের শিক্ষার প্রয়োজন। সামনে যে সুযোগ আসবে, তা নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ কর, এই তাঁর উপদেশ নয়, নির্দ্দেশনা।

তাঁর কথা অমান্যের সাধ্য কারও ছিল না। শিল্পীরা যাত্রা করলেন। অজন্তায় তাঁরা পৌছবার পরই নিবেদিতা ডঃ বসু, লেডি বসু, ও গগন মহারাজ একদিন উপস্থিত হলেন। টাঙ্গা থেকে নামলেন, দুর্গা, নাম স্মরণ করতে করতে। পরণে সাদা সিল্কের আলখাল্লা, চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও একটি স্ফটিকের, দীপ্ত মুখ, উদ্ভাসিত আনন্দের ছায়া। বড়দিন সামনে, স্কুল বন্ধ, বসুদম্পতিকে নিয়ে চলে এসেছেন সহযোগী শিল্পী ছাত্রদের কাছে। সঙ্গে এনেছেন ব্রহ্মচারী

গনেন্দ্রনাথকে। তিনি অজন্তার গুহগুলি পরিদর্শন করলেন। চিত্রগুলি সম্বন্ধে নোট নিলেন। এর পর ফিরে এলেন বসুদম্পতির সঙ্গে। রেখে এলেন গনেন্দ্রনাথকে শিল্পীদের তত্ত্বাবধানের জন্য।

কলকাতায় ফিরলেন। প্রবন্ধ রচনা করলেন : Ancient Abbey of Ajanta'। এ যাত্রায় তিনি পরিদর্শন করলেন। অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টা ও কনহেরীর গুহাগুলি।

·

১লা ডিসেম্বর ১৯০৯ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : দুর্দ্দম নেতাটি আমাকে বলে পাঠিয়েছেন — ভারত সরকার তাঁকে নির্ব্বাসনে পাঠানোর অনুমতি দেবার জন্য জন মর্লেকে তাগিদ দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, জন অপরাধী বন্দীদের মুক্তির জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তখন আই. আই. জি ঐ আদেশের দায়িত্ব বিষয়ে তাঁকে সুগম্ভীর সতর্কবাণী শোনালেন। সেই অল্প শাসানিতেই জনের দোলালো মন ও চিত্ত।

ম্যাককারনেসের প্রতিরোধ চেষ্টা ফলপ্রসু হয়ে অরবিন্দের গ্রেপ্তার ঠেকিয়েছে মনে করলেন।

৬ই জানুয়ারী ১৯১০, বোন মেকে লিখলেন :

তোমার হৃদয়ভাব খুবই অনুভব করছি, কিন্তু তার কাছে হারলে চলবে না। যখন আমরা ভাবি যে, আমাদের প্রিয় জননীর প্রভাব সর্ব্বদিকে বুঝি হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে,তখন ঐ ধরণের অনুভূতি তীব্রতর আকারে হাজির হয়। এক্ষেত্রে কী বলতে পারি বলো? শুধু বলি, পরিবর্ত্তন ঘটছে ভালোর জন্যই, তাঁর অনন্ত ভালোর জন্যই, আর এর মধ্যে তাৎপর্য্য আছে, যা আমরা একদিন খুঁজে পাবই যদি ধৈর্য্য ধরি। জীবন সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু অনন্ত অর্থে পূর্ণ, সুখ ও দুঃখকে যা নিজস্ব যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকি।

যখন এই চিঠি তুমি পাবে, সেই শেষ দিনগুলি পুনশ্চ যাপিত হবে পৃথিবীর দুই প্রান্তে এবং গত বৎসর যা শান্ত ও উন্নীত মনে হয়েছিল, এখন মনে হবে তা নিদারুণ! ...প্রিয় বোনটি, শোন, আমার কাছে সব কিছুর সার অর্থ হচ্ছে : প্রতিটি সম্পর্ক বন্ধনই মূল্যবান, যেহেতু মৃত্যু ছাড়া, বিস্তার যে কারো উপরেই হতে পারে। অহা, মাকে আবার যদি ফিরে পাই, তার মূল্য কত না বড় হয়ে ধরা দেবে। তাই এসো, আমাদের চারপাশের সবাইকে ভালবাসি, পূজাকরি। আমাদের আত্মার উদ্যান থেকে মানবিক সম্পর্কের শ্যামল ভূমিখন্ডগুলি এখনো শুকিয়ে যায়নি। আমাদের সকলেরই উপর সূর্য্যকিরণ ছড়ানো ... হ্যাঁ ভবিষ্যতে পুণঃপুণঃতা ঘটবে, যে পর্য্যন্ত না আমরা ব্যাকুল ভালবাসার এবং সেবার অনন্ত আকুতির শিক্ষা নেব, যাতে শোক করবার আর কোন কারণ থাকবে না এবং ঐসব কিছু থেকে উড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করে দেবে ঈশ্বরের দিকে, পাখা মেলে দেওয়া জন্য। আমরা আবার মাকে দেখবো দেখবোই, তুমি এবং আমি দুজনই। তাঁকে তখন ভালবাসব, সেবা করব, অতীতের সেই নিদারুণ ক্ষোভও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু আহা কী সে পবিত্র ভালবাসা ও আত্মিক উদারতা, তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁর দোষগুলি সবই বহিরঙ্গ, অনন্তে তাঁর তুল্য কেউ নয়। ঈশ্বর রক্ষা করুণ, তাঁকে সুখী করুন যেখানে তিনি আছেন। তিনি আমাদের চিরদিনের প্রেমপাত্রী।

তিনমাস পরে, শিল্পীরা ফিরে এলেন। তাঁদের খবর নিতে নিজেই ছুটলেন। কিন্তু ব্যথিত হলেন যখন তাঁদের মুখে শুনলেন তাঁরা তাঁদের আঁকা সব ছবিগুলি মিসেস হেরিং হ্যামকে দিয়ে এসেছেন।

শিল্পীদের মুখে সব কথা শুনে বললেন : তোমরা কষ্ট করে আঁকলে, সব কিছুই দিয়ে দিলে। অন্ততঃ কিছুতো তোমাদের জন্য রাখতে পারতে! এরপর মিসেস হেরিং হ্যামকে চিঠি দিলেন। তিনি শিল্পীদের যথার্থ মূল্য দিতে চাইলেন। নিবেদিতা রাজী হলেন না। শিল্পীর কাছে, শিল্পটাই বড়। সে তুলনায় মূল্য কিছুই নয়। অবশ্য একথা সত্য মিসেস হেরিং হ্যাম শিল্পীদের যথেষ্ট উৎসাহ

দিয়েছেন, ক্যাম্পে অবস্থানকালে এঁদের উদার আতিথেয়তা উপভোগ করিয়েছেন। এছাড়া শিল্পীরাও এ যাত্রায় নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়েছেন। সেই পরিশ্রম বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ তাঁর মনঃপুত ছিল না।

চিঠির বিনিময়ে স্থির হল : মিসেস হেরিং হ্যাম কলকাতায় আসবেন নন্দলাল প্রমুখ চিত্র গুলির কপি করে নেবেন। মিসেস হেরিং হ্যাম অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ীতে এলেন। সমস্ত চিত্রের কপি করা হল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হল। তিনি আশা পোষন করছিলেন, এই বইটি হবে স্বামিজীর শ্রেষ্ঠ অবদান। সুতরাং খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সূর্য্যেদয়ের পূর্ব থেকে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে প্রুফ দেখা সুরু করতেন। কখনও বা রাত শেষ হয়ে আসতো। খুব ক্লান্তি বোধ করলে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। একমাত্র তাঁর চিন্তা, এ বইটির মধ্যে স্বামিজীর চরিত্রের যথার্থ মাহাত্ম্য কি প্রকাশ করা সম্ভব হবে! তাঁর এবং স্বামী সারদানন্দের একান্ত ইচ্ছা ১লা ফেব্রুয়ারী স্বামিজীর জন্মতিথি, সেদিন বইখানি বার করবেন। জানুযারী মাসের শেষ দিক্ক খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন উভয়ে। ৩১ শে জানুযারী সারাদিন মুদ্রকের যাতায়াত। সকল চেষ্টার পর পরদিন 'The master as I saw Him' 'উদ্বোধন' থেকে প্রকাশ করা হল। স্বামী সারদানন্দ লিখলেন: গুরুর প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ বইটি জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করে, তাঁর গুরুর সকল ভ্রাতৃগণের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা লাভ করলেন।

বই খানির বাঁধানোর কাজ তখনও আরম্ভ হয়নি, কোন রকমে একখানি বই তৈরী করা হয়েছিল। সেটি নিয়ে বেলুড় মঠে ছুটলেন। স্বামিজীর কক্ষে প্রবেশ করে, যে সোফায় তিনি উপবেশন করতেন তার উপর বইখানি রেখে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মুদ্রিত চেয়ে গুরুকে বার বার স্মরণ করলেন। দীর্ঘ চার বছরের পরিশ্রমের ফসল, ভালমন্দের বিচারের ভার জগদবাসীর কাছে। রচনা কালে নিরন্তর তাঁর প্রার্থনা ছিল : 'প্রতিটি ছত্রে যেন তিনি তাঁকে সাহায্য করে চলেন।'

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের শিষ্য ও বন্ধুগণ বইটির জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই একই সঙ্গে লোংম্যানস গ্রীন বইটি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। মিসেস-বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁকে অজস্র প্রশংসা করে চিঠি দিলেন।

অরবিন্দ ১৯০৯ সালের মে মাসে মুক্তিলাভের পর তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিষ্কার করে বলতে শুরু করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যগুলি ছিল : নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগ, সম্মিলিত কংগ্রেস, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বয়কট, ও বিভিন্ন প্রদেশে সঙ্ঘ গঠন প্রভৃতি। ১৮ই জুলাই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন নিবেদিতা ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে। জুন মাসে কর্ম্মযোগীন (ইংরাজী), আগষ্ট মাসে 'ধর্ম্ম' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র বার করলেন । এই দুই পত্রিকাতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, যোগ, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ, এছাড়া বেরুতে লাগলো রাজনীতি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, ও সরকারের সমালোচনা। তিনি স্পষ্ট করে লিখতে শুরু করলেন তিনি সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত নন, শান্তিপূর্ণ বিপ্লবই তাঁর উদ্দেশ্য। সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যে বার বার নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন : তাঁরা যেন উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনার কোন কাজে লিপ্ত না থাকেন। এ পত্রিকাতে বিপিনচন্দ্রপাল প্রদত্ত ইংলণ্ডের বক্তৃতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ ও বার করতে লাগলেন। এখন তিনি নিবেদিতার মত ভাবরাজ্য ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষপাতী। ফলে পরস্পর ভাব বিনিময় ও আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। উগ্রদমননীতির ফলে, দীর্ঘ একটি বছর সর্বত্রই হতাশা ও অবসাদ দেখা দিয়েছিল। নেতারা প্রায় সব জেলে নয় নির্বাসিত।

কারাগারে অবস্থান কালে অরবিন্দের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। এখানেই, আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জনের জন্য 'যোগ' অভ্যাস শুরু করেন। এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেন, বর্ত্তমানে তিনি দৈব-শক্তি দ্বারা পরিচালিত।

মে মাস থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়ে দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করলেন। ফলে, মডারেটদের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল। লর্ড মর্লে শাসন সংস্কার চাইলেন, তিনি তা অস্বীকার করলেন। বিপিনচন্দ্র তখন ইংলণ্ডে। অন্যান্য নেতারা কারাগারে। একাকী বাংলা দেশে আন্দোলন পুণঃপ্রসারে উদ্দ্যোগী হলেন। নিবেদিতা তাঁকে পরামর্শ দিলেন আপনি লুকিয়ে থাকুন ব্রিটিশ ভারত পরিত্যাগ করুন, বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিন, যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। (and She wanted me to go into Secrecy or to leave British India and act from outside so as to avoid interruptions of my work) –Arabinda

অরবিন্দ রাজী হলেন না। ঠিক করলেন "কর্ম্মযোগিনে" খোলা চিঠি দেবেন পুনরায়। সরকারও তাঁকে নির্ব্বাসণের প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত হবেন। (I told her that I did not think it necessary to accept her suggestion, I would write an open letter in the Karmayogin which I thought, would prevent this action by government) - Arabinda সুতরাং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৯, কর্ম্মযোগিনে পুনরায় "খোলা চিঠি" প্রকাশ করলেন।

নিবেদিতার উগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত সকলেই। তথাপি উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্ম্ম চারীদের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব, অবাধ বিচরণ, ভিতরের খবর, সকল সময়েই তিনি অবগত। মতবাদে তিনি চরমপন্থী, সরকারও অবগত, কিন্তু এমন কৌশলে তিনি বিচরণ করতেন, সহসা তাঁর কেশ কেউ স্পর্শ করতে সমর্থ হত না। বিদেশ ভ্রমণের পর ভারতে পা দিয়েই অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ, পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি পড়লো তাঁর প্রতি। গোয়েন্দারা লক্ষ্য রাখছেন তাঁর গতি বিধির উপর। তিনি অতিষ্ঠ, ডঃ বসু শঙ্কিত।

১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে, লাহোরে, কংগ্রেসের অধিবেশন হল। তিনি সে অধিবেশনে যোগ দিলেন না। বড়দিনের ছুটি, বেরিয়ে পড়লেন অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি পরিদর্শনে ১৯১০ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ফিরে এলেন কলকাতায় ব্যস্ত রইলেন 'The master as I saw Him' প্রকাশনে। ২৪ শে জানুযারী ১৯১০, গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শামসুল আলামকে হত্যা করা হল। প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন। চিন্তা তাঁর বিশেষ করে অরবিন্দ সম্বন্ধে। কলকাতা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন অথচ তাঁর ধারণা তিনি বর্ত্তমানে দৈববশবর্ত্তী। তাঁর পরামর্শ গ্রহণে তিনি নারাজ।

এসে গেল ফেব্রুয়ারী। নির্বাসিত অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ নয় জন বন্দী মুক্তি পেলেন। নিবেদিতার আনন্দ ধরে না। মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানে সাজালেন তাঁর বিদ্যালয় গৃহ। দ্বারে বসালেন পূর্ণ কম্ভ, রাখা হল কলাগাছ। ছুটি দেওয়া হল স্কুলের মেয়েদের, পুণ্যদিনের প্রতীক হিসাবে।

নির্বাসিতদের মধ্যে ছিলেন ধর্ম্ম ভীরু ব্রাহ্ম প্রচারক। নির্বাসনে তাঁর স্ত্রী পুত্রদের দুর্গতির সীমা ছিলনা। এসময়ে তিনি তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। তাঁর মুক্তিতে নিবেদিতার মনে হল পিতা তাঁর স্বগৃহে প্রব্যাবর্ত্তণ করেছেন। ইতিপূর্ব্বেই সংগ্রাম পরিচালনায় দৃঢ়সঙ্কল্প অরবিন্দ, বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াছিলেন। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক উগ্রদমননীতির ফলে, দেশের সর্বত্রই হতাশা ও অবসাদ দেখা দিয়েছে। তাঁরা আর অরবিন্দের বক্তৃতায় বিশেষ সাড়া দিল না। কলম ধরলেন। ফল তথৈবচ। মডারেটদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধালো মর্লের শাসন সংস্কারে তাঁরা অস্বীকার করলেন। বিপিনপাল ইংলণ্ডে, কিন্তু সেখানে তাঁর নীতিরও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে গাঁঠছড়া বেধে স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তুলছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসনের দাবী ব্যাখ্যা করে চলেছেন ছাত্রসমাজের কাছে। সরকার বুঝলেন, অরবিন্দ একাকী, দেশে আন্দোলন

পুণঃপ্রসারে উদ্দোগী। এর পরেই বিপ্লববাদীদের ষড়যন্ত্রে শ্যামশুল আলামের হত্যাকাণ্ড। সরকার আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। যে কোন ছুতায় অরবিন্দকে চালান দিতে উদগ্রীব। এ কথা অরবিন্দও জ্ঞাত ছিলেন। ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯০৯, পুনশ্চ একটি খোলা চিঠি "কর্ম্মযোগিনে" প্রকাশ করে নিজের মত ও পথ সরকারের কাছে ও স্বদলের কাছে পরিষ্কার করে তুলতে চাইলেন। সুর তাঁর খুবই নরম। অথচ তার অংশ বিশেষ সরকারের কাছে রাজদ্রোহকর বলে বিবেচিত হয়েছিল। নিবেদিতা এই চেষ্টাকে ঠেকাতে উঠে পড়ে লাগলেন। উক্ত প্রবন্ধটি নানা স্থানে পাঠিয়ে তিনি ইংলণ্ডে ভারতবন্ধুদের প্ররোচিত করলেন : সরকার অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের চেষ্ঠা করলে: তাঁরা যেন বিরোধিতা করেন। একটি মাত্র লাইন রাজদ্রোহকর বিবেচিত হতে পারে— তা হচ্ছে: "অন্যায় আইন ভাঙ্গাই নৈতিকতার দাবি।"

২০শে জানুয়ারী ১৯১০ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : জানি না, ইংরাজি কাগজগুলিতে লাহোরের খবর কতখানে দিয়েছে? মনে হয় মুখোরাচক বস্তুর কোনটিই দেয়নি। যথা : তুমি কি জানো, অজিত সিং এর ভাই লালা কিষেনলাল ভারত সরকার সম্বন্ধে ব্রায়াণের প্রবন্ধ অনুবাদ করে তা প্রকাশের জন্য কাঠগড়ায়। অজিত সিং পালাতে পেরেছেন। দয়ানন্দ অ্যাংলো বেদিক কলেজের এক অধ্যাপক, ভাই পরমানন্দ গ্রেপ্তার হয়েছেন, ওঁরা একই বাড়ীতে বাস করতেন এই কারণেই সম্ভবতঃ। এই সেদিন আমাদের সম্পাদক বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সমন দিয়ে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, লাহরের আর একটি সম্পাদকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে, যিনি তাঁর পত্রিকায় (মডার্ন রিভিউ) প্রকাশিত ড়ুপ্লের বিষয়ে ইংরাজীতে লেখা একটি প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন।

ইংলণ্ডে নির্বাচনে, লিবারেলদের প্রত্যাবর্ত্তন প্রার্থনা করছি, কারণ মর্লের পতন মানে পাইকারী নির্ব্বাসনের নির্দ্দেশ। মধ্যবর্ত্তীকালে মর্লে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্তকে মুক্তি দেবার সাহস দেখাবেন এই একান্ত আশা। নির্জ্জন কারা কক্ষে আটক থেকে প্রথম ব্যক্তি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যু মুখে, তার জন্য জনসাধারণ রোষে উন্মত্ত। সন্ত্রাসবাদী কার্য্যের হঠাৎ আবির্ভাবে কেউ বিস্মিত হবে না। শোনাগেল তাঁর দুঃখের কিছুটা উপশম হয়েছে কিন্তু সে ব্যক্তিও আদেশের ব্যতিক্রম করতে সাহস করেন না, আর কৃষ্ণকুমার মিত্রও নীরবে মেনে নেওয়ার নীতি নিয়েছেন। মনে করি ঠিকই করেছেন। গ্রেপ্তারের পর থেকে কোন অনুরোধ উপরোধ করবেন না। তাঁবে কিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুনলে রক্ত টগবগ করে ফুটবে। পুলিশ তাঁর বাড়িতে এই খবর রেখে আসে যে, থানার সুপারিনটেণ্ডেন্ট তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। একটি দর্য্যাদ্র নির্দ্দোষ তিনি। সেখানে গেলেন, তারপর ৩৬ ঘন্টা ধরে তাঁর হতবুদ্ধি উদভ্রান্ত বাড়ির লোকজন, তাঁর তল্লাশ করতে লাগলো কদাপি সন্দেহ করতে পারলেন না যে, তিনি সোজা এগিয়ে গিয়ে বাঘের খাঁচায় পা দিয়েছেন।

রামচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রেসের কর্ম্মচারী। তিনি সংবাদ পেলেন জনৈক সি.আই.ডি'র কাছ থেকে অরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে এবং খুব সম্ভবত: সামিস্যুল আলামের হত্যার মামলায় জড়িয়ে তাঁর নামে ওয়ারেন্ট বার করা হবে।

ইতিপূর্ব্বে নিবেদিতাও তাঁকে এ সংবাদ জানিয়েছিলেন। অন্যত্রও কানাঘুষায় এ সংবাদ ভেসে আসছে। সংবাদ পেয়েই ছুটলেন নিবেদিতা 'কর্ম্মযোগীন' পত্রিকার অফিসে। অফিসটি শ্যামবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত, মালিক গিরিজা সুন্দর চক্রবর্ত্তী। অরবিন্দ যেমন বোস পাড়া লেনে নিবেদিতার কাছে প্রায়ই যেতেন, নিবেদিতাও প্রয়োজনে শ্যামবাজার স্ট্রীটের প্রেস বাড়ীতে এসে প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। "কর্ম্মযোগীন" ও "ধর্ম্ম" এ পত্রিকা এখান থেকেই ছাপা হত। এই পত্রিকার মুদ্রাকর অশিক্ষিত। পূর্বে "নবশক্তি"র মুদ্রাকর ছিল। মুদ্রাকর হিসাবে সেখানে

একবছরের কারাদণ্ড লাভ করেন। মুক্তি লাভের পর স্থির প্রতিজ্ঞ ন্যাশন্যালিস্ট হয়ে, বেরিয়ে আসেন। পরে "কর্ম্মযোগিনের" মুদ্রক হন। সরকার তাকে সতর্ক করলেও, সে এ কাজে ব্রতী হয়।

শামসুল আলাম হত্যার পর কর্ম্মযোগিনে একটি লেখা বার হল। তাতে সরকারের নিপীড়ননীতিকে দায়ী করা হল। এই লেখা বেরুনোর দু একদিন পরে সিস্টার নিবেদিতার কানে এ সংবাদ পৌছালো। তখন রাত প্রায় দশটা তখন কর্ম্মযোগীন অফিসে সহসা উপস্থিত হলেন। সম্পাদকীয় লেখায় মগ্ন তখন অরবিন্দ। তিনি তাঁকে বললেন, জানতে পেরেছি, সরকার তোমাকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতে চায়। তুমি অন্যত্র গা ঢাকা দাও। প্রত্যুত্তরে অরবিন্দ বললেন, কাগজের কি হবে? আন্দোলনের কাজের কি ব্যবস্থা হবে?

নিবেদিতা জোর দিয়ে বললেন, আমার ধারণায় তোমার একটা মিনিটও দেরী করা উচিত হবে না। কাজ সামনে থেকেও চালানো যায়, দূরে থেকেও পরিচালনা করা যায়। কর্ত্তব্য স্থির করে নাও।

অরবিন্দ তখনও নিশ্চিন্ত। বললেনঃ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, এত ব্যস্ততার প্রয়োজন কি? ফিরে গেলেন নিবেদিতা।

এর পরদিন তাঁর প্রেমের কর্ম্মচারী রাম মজুমদার পুণরায় খবর পেলেন এক সি. আই. ডি'র কাছে "কর্ম্মযোগীন" পত্রিকা সার্চ হবে দু'একদিনের মধ্যে। অরবিন্দকে চালান দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। রামচন্দ্র মজুমদার ছুটলেন গোলদিঘীর কৃষ্ণ কুমার মিত্রে বাড়ী। তাঁর মাসতোতো ভাই সুকুমার মিত্রের সামনেই সে খবরটি দিলেন। তখন বেলা প্রায় ১১/১২ টা। অরবিন্দ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কর্ম্মযোগীন অফিসে এলেন এবং কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন। অরবিন্দের বোন শ্রীমতী সরোজিনী দেবী কর্ম্মযোগীন অফিসে হাজির হলেন সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পরে। বললেন, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। তখন গভীর রাত হয়েছে গেছে। কোথায় এখন আত্মগোপন করবেন? সহসা মনে পড়ে গেল চন্দননগরের কথা। অন্তর সঙ্গে সঙ্গে সায়দিল। "সেখানেই আত্মগোপন করা উচিত। মতিলাল রায় সেখানে থাকেন। আপাততঃ আশ্রয় নেওয়া যাক। সেই গভীর রাতে ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে পাশের বাড়ীর খিড়কি দরজা দিয়ে বাগবাজার ঘাটে চলে এলেন। রামচন্দ্র নৌকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পাড়ি দিলেন চন্দননগরের পথে। খবর পরদিনই পৌছেগেল নিবেদিতার কাছে।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : হাইকোর্টে এক পুলিশ অফিসার গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেন্ট শামসুল আলামের হত্যা কাণ্ড সকলকে চমকিত করেছে। বলাবলি হচ্ছে এমন নিপীড়নের আইন করা হবে, যাতে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা, মাটিতে লুটিয়ে পড়বে আর কদাপি উঠে দাঁড়াতে পারবে না। ভাবছিলাম যে, এবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরেও অক্রমন করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেটা এমন প্রচণ্ড ভাবে করা হয়েছে যে, আর নতুন কিছু করা যেতে পারে— বলা সম্ভব নয়!

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন : কে একজন বলছিল, সরকার এখন বিভ্রান্তি ও উদভ্রান্তির চুড়ায় বসে। যাই সে করুক না কেন, তার দ্বারা মন্দতর করে তুলবে পরিস্থিতি।

...মিন্টো এই সেদিন গোয়া দর্শনে গিয়ে, চুক্তি বলে, আধ ডজন কাজের বাঙালী কর্ম্মীকে আটক করানোর ব্যাপারে চাপ দিলেন— লোকগুলো একটি ইংলিশ ফার্মে গৃহনির্ম্মান কাজে নিযুক্ত ছিল। মিন্টোর অবস্থান কালে তাদের জেলে রাখা হল, তারপর ছেড়ে দেওয়া হল। তাদের সম্বন্ধে সেখানে দারুণ গৌরবের উচ্ছ্বাস ও বন্ধুত্বপূর্ণ কৌতূহল। সরকার এখন এখানে প্রতিটি বিভাগে মাদ্রাজীদের বদলী করে আনছে ও এখান থেকে বাঙালীদের বদলী করে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত

ফলদানের দিক দিয়ে খুবই সন্দেহজনক নয় কি? ভালো, ভালো। এই কি শেষ, জানি না। কোন বজ্রপাত হবে এর পরে, তাও কেউ জানে না।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, সরস্বতী পূজা। ঘটা করে তিনি এ অনুষ্ঠান করতেন। পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রন করতেন। ছাত্রীরা ছোট বড় নির্বিশেষে প্রায় সারাদিন আনন্দ উৎসবে মাত্তোয়ার থাকতো। আর নিবেদিতা সকলকে আদর যত্নে, তৃপ্ত করতে ব্যস্ত থাকতেন। নিজে দেবীর হোমের ফোঁটা পরতেন, ছাত্রীদের পরাতেন। কিন্তু এদিন কৃস্টীণের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করে বেলা দেড়টায় নৌকা যোগে চন্দননগর যাত্রা করলেন। তখন নদীতে জোয়ার। অরবিন্দ চন্দননগর যাত্রার পূর্বে নিবেদিতাকে অপর লোক মুখে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন তিনি যেন 'কর্ম্মযোগীন' পত্রিকার পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। সেই প্রয়োজনেই তাঁর চন্দননগর যাত্রা। প্রথমতঃ তাঁর উদ্বেগ ছিল বৃটিশ ভারতের বাইরে অরবিন্দের অবস্থানের সকল ব্যবস্থা করা, এছাড়া কর্ম্মযোগীন পত্রিকা সম্বন্ধে সাময়িক একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা। রাত্রি এগারোটায় ফিরে এলেন বাগবাজার বাসস্থানে। "কর্ম্মযোগীন" যেরূপ প্রকাশিত হত সেরূপই প্রকাশিত হল। সরকার অরবিন্দের সন্ধান পেলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের আদেশ প্রচারিত হল। নিবেদিতা ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, পুনরায় চন্দননগর গেলেন অরবিন্দের সঙ্গে শলা পরামর্শের জন্য। কর্ম্মযোগীন নিয়মিত প্রকাশ হতে লাগলো তবে রাজনীতি অপেক্ষা তার (অরবিন্দের) পুরাতন রচনা, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারা বিশেষ ভাবে প্রচারিত হতে লাগলো, এমন কি স্বামিজীর জন্মতিথির বিবরণও প্রকাশিত হল। এই সঙ্গে নিবেদিতা প্রচার চালাতে লাগলেন : আমি বিশ্বাস করি: ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য এক আবাস, এক স্বার্থ, ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত। আমি বিশ্বাস করি : বেদ, ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে মনিষীদের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তা আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে এবং আজকের দিনে এরই নাম জাতীয়তা। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্ত্তমান, তার অতীতের সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ। আর তার সামণে জ্বল জ্বল করছেঁ এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ।

হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে বেশে ইচ্ছা, আমার নিকটে এসো, আমাকে তোমার করে নাও।

অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার চিন্তা ও চেষ্টা অব্যাহত ছিল সরকারের, মানিকতলা বোমার মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর মুহূর্ত্ত থেকে। এমন কি ৩০ শে জুলাই ও পরে ২৫ সে ডিসেম্বর ১৯০৯ সালের পর পর দুটি খোলা চিঠি প্রকাশের পরও সরকার নিশ্চেষ্ট ছিল না, সে কথা নিবেদিতা বার বার অরবিন্দকে জানিয়েছেন, কিন্তু অরবিন্দ তা কানে তুলেও তুললেন না কিন্তু সামসুল আলম খুন হওয়ার পর এই যড়যন্ত্রে তাঁকে জড়াতে সচেষ্ট হলেন সরকার। হাইকোর্টে সামসুল আলামকে হত্যায় নিযুক্ত ছিলেন বীরেন্দ্র দাস গুপ্ত ও সতীশচন্দ্র সরকার। বীরেন্দ্র গুলি করেন ও ধরা পড়েন, সতীশচন্দ্র গা ঢাকা দিতে সক্ষম হন। প্রথমে তিনি অখিল মিস্ত্রী লেনে গেলেন। সেখানে অবিনাশ চক্রবর্ত্তীকে সংবাদ দিয়ে, সোজা শ্যামবাজার স্ট্রীটে 'কর্ম্মযোগীন' অফিসে হাজির হলেন। সেখানে অরবিন্দকে খবর দিলেন। পরমুহূর্ত্তেই আত্মগোপনে তৎপর হলেন। বীরেন ধরা পড়লো। তাঁর শুরু হল বিচার।

নিবেদিতাও পেলেন শ্যামসুল আলামের মৃত্যু সংবাদ, জগদীশচন্দ্র তখন তাঁর বাড়ীতে। জগদীশচন্দ্র বিকালে তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন। কথাটা শুনলেন উভয়েই, পরামর্শ করে স্থির করলেন, অরবিন্দ যাতে পুনরায় বন্দী না হন সে ব্যবস্থাটা করতে হয়। নিবেদিতাই অনুরোধ করবেন: তিনি যেন আত্মগোনের জন্য তৈরী হন! নিজেই তিনি অরবিন্দের 'কর্ম্মযোগীন' অফিসে গেলেন এবং তাঁকে আত্মগোপনের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সে যুক্তিতে তিনি সম্মত হলেন না।

এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর পত্রিকার এক কর্ম্মী রামচন্দ্র মজুমদারের কাছে তাঁর অ্যারেষ্টের কথা অবগত হলেন : পত্রিকা অফিস দু'একদিনের মধ্যে তল্লাসী হবে এবং তাঁকে চালান দেওয়া হবে, এক সি.আই. ডি'র কাছ থেকে শুনেছেন তিনি। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর বিবেক সে কাজে সম্মতি দিলেন এবং সে রাত্রিতেই রামচন্দ্রের সংগৃহীত নৌকায় চন্দননগর পাড়ি দিলেন।

স্বয়ং ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের মামলার তদবীর করলেন। বিচার শুরু হল। তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। ৩১শে জানুয়ারী তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। জেলের মধ্যে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করে পুলিশ 'স্বীকারোক্তি' আদায় করলো। তাঁর ফাঁসির আগে একটি নকল যুগন্তর পত্রিকা ছাপলো, তাতে ছাপা বড় বড় অক্ষরে লেখা 'বীরেন্দ্র কাপুরুষ, নেতাকর্তৃক নিয়োজিত হয়েও ঠিক ভাবে কাজ করতে পারেনি। দলকে ফাঁসাবার জন্য ধরা দিয়েছে। পত্রিকাটি দেখে বীরেন্দ্র নাথ মর্ম্মাহত হলেন। মুখটা তাঁর অনুশোচন আরক্ত হয়ে উঠলো। সি.আই.ডি. অফিসার সেই সুযোগ গ্রহণ করে তাঁকে শোনালেন : তোমাদের নেতা যতীন মুখার্জ্জিই এ অপবাদ দিয়েছেন। তাঁর সে উক্তি, সত্য মনে করে অভিমানে বলে ফেললেন : মিথ্যা, মিথ্যা এ অপবাদ। দক্ষতার সঙ্গেই সামসুল আলামকে হত্যা করেছি! আদালতে বীরের নিষ্ঠা দেখিয়ে, বীরের মত শহীদ হতে চলেছি। ... কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে ফেললেন, যতীনদা কি জানেন না : আমি কাপুরুষ নই। তাঁর দেওয়া রিভলবার ঠিকমত ব্যবহার আমি করিনি। কান্নার বেগ কমতেই বুঝতে সমর্থ হলেন! এটা নিশ্চয় পুলিশেরই কারসাজি। মনোবেদনায় নেতার উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হাসি মুখে ঝুলে পড়লেন ফাঁসিকাঠে।

হাওড়ায় ডাকাতির কেসে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়েছিল ইতিপূর্ব্বে। সে মামলা চলছিল হাওড়া ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। বীরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তাঁকে জড়ানো হল, সামসুল আলামের হত্যা মামলার সঙ্গে। হাইকোর্টে, চীফ জ্যাস্টিস ২১ সে ফেব্রুয়ারী রুলিং দিলেন: যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'কেস' করা যাবে না। যেহেতু, আসামী বীরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিটির পরেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, জেরার প্রাপ্য সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি বা নিয়মমত জের করা হয়নি।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন: স্যামসুল আলামের গত খুনটি গোয়েন্দা বাহিনীর মলোবলে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা প্রাণ ভয়ে কাঁপছে। তাছাড়া এই বিভাগের মধ্যে আনিবার্য্য অসন্তোষ আছে, কারণ বিদেশী প্রভুরা জানে না কাকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে করা যায় না! ফলে সঙ্কটের সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ এবং সন্দেহপূর্ণ কঠোর শৃঙ্খলা বলবৎ করার চেষ্টা তারা করে যায়।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

তুমি অবশ্যই আমাদের মতই প্রেসবিলের চেহারা দেখে হতবাক হবে। অদ্ভুত লাগে না কি, যখন দেখি জনসাধারণ নিষিদ্ধ পত্র পত্রিকার কথা কদাপি ভাবেনি। শুনলাম, ভূপেনবসু ও এলাহাবাদের মালব্য মাত্র এই দুজন এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। 'কেটির' (মিসেস র‍্যাটক্লিফ) এর বন্ধু গোখলের উপর বোধ হয় অভিশাপ এসে পড়েছে। উৎকট ভ্রান্তি ছাড়া সে আর কিছু ঘটাতে পারছে না (ইনি প্রেসবিলের বিরোধিতা করেননি)। ভূপেনবসু দেখিয়েছেন, ছাপাখানার বাড়তি খরচ শিক্ষার উপর অধিকতর দণ্ডাঘাত ছাড়া কিছু নয়। কেননা তার ফলে, পাঠ্য বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন:

গুজব ইন্দ্রনাথ নন্দী বলে একটি ছেলে 'গোপনে' ইনফরমার হয়েছে। কর্নেল নন্দীর ছেলে। মানিকতলা বাগানে বারীন ঘোষের সহকর্ম্মী, আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য। বোমা তৈরীর প্রচেষ্টায়

লিপ্ত। যখন সে পরীক্ষা করতে গিয়েছিল, বিস্ফোরণে হাতের আঙুলগুলো উড়ে যায়। এই ঠুঠো অবস্থায়, ধৃত হয়ে, আলিপুর বোমার কেসের আসামী হয়ে ছিল, অবশ্য ফৌসিলীদের কারসাজিতে প্রমানিত হয়, একটা লোহার সিন্দুকের তলায় চাপা পড়ে হাতের এমন অবস্থা। গুজব : কর্নেল নন্দী সরকারের সঙ্গে রফা করেছেন, তাঁর ছেলে, এরপর ভাল হয়ে থাকবে। এই সব হত্যাকাণ্ড পুলিশকে কাপুরুষ করে দিয়েছে। সেটা স্বাভাবিক। আমরা কেউই প্রতিঘন্টায় গুলি বিদ্ধ হবার ঝুঁকি উপভোগ করতে পারি না।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন :

দাসগুপ্ত সম্বন্ধে একটি কদর্য্য কাহিনী চালিত। তার ফাঁসি হয়ে গেছে সোমবার ৩১ শে জানুয়ারী ভোরে। তার কাছ থেকে একটি লিখিত স্বীকারোক্তি আদায় করেছে, নির্য্যাতনের দ্বারা। ফলে অন্যদের জড়ানো ধৃতলোকটি উকিল, বাড়ী কৃষ্ণনগরে, রবিবার অপরাহ্নে সম্ভব হয়েছে তাকে জেরা করার জন্য দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হয় —বেকার, তা চড়া ভাবে সরাসরি নাকচ করে দেন ও বন্দীর অবিলম্বে ফাঁসির নির্দেশ দেন। সংবাদপত্রে যে তার স্বীকারোক্তি বেরিয়েছে, সেই স্বীকারোক্তিতে, সে যাই বলুক না কেন তা অসিদ্ধ করে দেয়! পার্লামেন্ট হাউসে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হবে না কেন?

৩রা মার্চ ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন:

বিগত খুন ও দত্তগুপ্তের ফাঁসির পর, এই অস্পষ্ট ঘোষণা ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বিরাট এক ষড়যন্ত্র ফাঁস হবার মুখে—তা সবাইকে জড়াবে। যাই বোঝাক, পুলিশের মনোযোগ যে আমাদের রীতিমত ঠেলা দিচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অক্সফোর্ড মিশনের ব্রাউন, তাঁর আধ্যাত্মিক ও ভাবাবেগ মুলক প্রভাব এই হতভাগ্য বালকটির উপর ঘটিয়ে তার দৃঢ় সংকল্পকে দুর্ব্বল করে তার কাছ থেকে সব কিছু টেনে বার করার চেষ্টা করেছিল, কিনা ভাবছি। ব্রাউনের মত লোক বোধ হয় এ কাজটাকে কর্ত্তব্য বলেই মনে করে। তাই যদি হয়, তাহলে ইংরাজরা 'যোয়ান অব্ অর্কের' ক্ষেত্রে তাদের পুরোহিত যৎসামান্য ব্যবহার করে কি নির্ব্বুদ্ধিতাই না দেখিয়েছিল! কেটির ব্রাহ্মণ বন্ধু গোখলের মারফৎ জানলাম, সে (দত্তগুপ্ত) ব্রাউরে প্রিয় ছাত্র ছিল, ব্রাউনও তাকে জেলে দেখতে গিয়েছিল। যাই হোক, স্বীকারোক্তি মধ্য রাত্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও এম. এন. রায়ের সমক্ষে করা হয়, স্বাক্ষরিতও হয়— তার ফাঁসির আগে। বেচারা বালকটি! মনের নিদারুণ এই যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে আত্মা তার প্রস্থান করলো।...

একান্তে নিবেদিতা চাইছিলেন অরবিন্দের গোটা প্রবন্ধটি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হোক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, স্বাধীন চিন্তা ধারায় অভ্যস্ত ইংলণ্ডের উদার নৈতিক মহলে থেকে অন্তত সেটিকে মারাত্মক মনে হবে না। সেই মত ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ১৯ শে এপ্রিল ১৯১০, 'What is Sidition? The offending Articles of Mr. Arabinda Ghosh' শিরোনামায় কর্ম্মযোগীনের ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৯ তারিখের প্রবন্ধটি ছাপা হল।

মন্তব্য করা হল: আমাদের পাঠক ইংরাজগণ যাতে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে, 'সিডিশনতত্ত্ব' কোন আকারে উপস্থিত হচ্ছে, তা অনুধাবন করতে পারেন, সে জন্য আমরা গোটা প্রবন্ধটি নীচে হাজির করছি। প্রবন্ধটি আপাদমস্তকে কোথাও সক্রিয় সিডিশন বলতে বুঝায় তার চিহ্নমাত্র নেই, কিংবা যৎসামান্যই আছে, প্রবন্ধটির সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়ে একথা বলতে পারি।

মিঃ র‍্যাটক্লিফ, নিবেদিতাকে পরিপূর্ণ সমর্থ করেছিলেন র‍্যাডিকেল লিবারেল দলের এম. পি. মিঃ ম্যাক্কারনেস স্বদেশী আন্দোলণের সময়ে, পুলিশী অত্যাচার সম্বন্ধে, সবচেয়ে হৈ চৈ বাঁধান তিনিই। মূল্য ও তাকে দিতে হল পরবর্ত্তী নির্ব্বচনে। তাঁকে দলীয় অনিচ্ছার বলি হতে হয়েছে।

অবশ্য তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কমিটিতে যোগ দান করেছেন। ফলে, তাঁর শক্তিশালী লেখনী ও ব্যক্তিত্বের সহায়তা থেকে ভারত বঞ্চিত হল না। তিনি নেশান পত্রিকায় ধারাবাহিক ভারতীয় পুলিশের চরিত্র 'নাম' দিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। ১৯০৫ সালের কার্জ্জন কমিশণের পুলিশী অত্যাচারের বিবরণ থেকে শুরু করে, তার পূর্ব্বে দুবছরের বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশও দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ ভারতের সকল স্থানের বিনা বিচারে নির্ব্বাসন, গ্রেপ্তার ও অন্যান্য অত্যাচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। পাঞ্জাবে ঘটিত একটি উৎপীড়নের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন : ভয়ানক সেই সংবাদটির কোন প্রতিবাদ করা হয়নি সরকারের তরফে। বৃটিশ প্রশাসক কর্ত্তৃক নিযুক্ত পুলিশ, নির্দোষ মানুষের উপরে এমন অত্যাচার করে, যাতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় একটি নারীকে তারা খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে, যদিও সে নারী বর্ত্তমানে বহাল তবিয়তে বর্ত্তমান।

প্রবন্ধগুলি ছিল চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী। এর সমর্থনে নেশান পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হল : এঁর অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে। "স্বরাজ" নামে উর্দ্দু পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপালকে এলাহাবাদের সেসন জর্জ তিনটি সিডিশাস প্রবন্ধ লেখার জন্য ১০ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। প্রতিটি প্রবন্ধ লেখার জন্য— শাস্তি চলবে এক সঙ্গে, এছাড়া লাহোর মামলায় অপরাধী প্রমাণ হওয়ায় আরও পাঁচ বছরের নির্ব্বসন। সর্ব্বসম্মত ভাবে অ্যাসেসরগণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করলেও বিচারপতি উক্ত শাস্তির নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আরও একটি কাণ্ড ঘটলো : মিঃ ম্যাককারনেসের নেশান পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, তা সংকলিত হল— 'The Methods of Indian Police in the Twenth Century' নামে।

প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, পরে ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাব ও বাংলা সহ ভারতের সর্ব্বত্র বাজেয়াপ্ত হল এই বইটি। ক্যালকাটা গেজেটে জনসংখ্যায় বলা হল : এই পুস্তিকায় এমন ধরণের কথা আছে, যা বৃটিশ ভারতে আইন ভিত্তিক সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অপমান সূচক মনোভাব সৃষ্টির প্রবণতা সম্পন্ন।

ফলে, বইটির চাহিদা বেড়ে গেল। প্রকাশের প্রথমে যে সাড়া পাওয়া যায়নি, বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর বইটির চাহিদা এত বেড়ে গেল যে, ম্যাককারনেস প্রতিদিন রাশি রাশি চিঠি পেতে লাগলেন। মানুষের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হল : বইটির মধ্যে কোন কোন মারাত্মক ঘটনা সম্বলিত হয়েছে?

লর্ড মর্লের পুরাতন সহকর্ম্মী উইলিয়াম স্টেড, তাঁর রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় মে, ১৯১০ সংখ্যায় অভিনন্দন জানালেন ম্যাককারসনের প্রচেষ্টাকে। সেই সঙ্গে মিঃ মর্লের চোখে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রবেশের চেষ্টা করলেন : অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভলটেয়ার যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন, মিঃ মর্লে ছিলেন সেই প্রশাস্তিকারক। তাঁর শাসনাধীন ভারতীয় পুলিশী ব্যবস্থাকে সংস্কারের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্টতম অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালো সাধারণ নীতি। তিনি কিন্তু সংস্কারের চেষ্টা করেন নি। মিঃ ম্যাককারনেসের বইটিতে যে সব অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে, সে গুলি অতীতের বস্তু নয়— বর্ত্তমানেও তা বলবৎ— যা চালিয়ে যাচ্ছেন মিঃ মর্লের সাক্ষাৎ শাসনাধীন ভারতীয় পুলিশগণ। যদি লর্ড মর্লে তাঁর পুলিশগণকে নিছক সন্দেহের অজুহাতে ধৃতব্যক্তিদের উপর উৎপীড়ন করা থেকে নিবৃত্ত করতে না পারেন, তাহলে ভাবীকাল তাঁর বিষয়ে কি ভাববে? ভলটেয়ারের উপরে তাঁর রচিত প্রশস্তি সাহিত্যের দ্বারা অবশ্যই বিচার হবে না, সে বিচার হবে তিনি কি পরিমান বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভলটেয়ারী আদর্শকে ভারতের পুলিশী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, তার দ্বারা।

প্রেস আইনের ভয়ে বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে ভারতের দেশীয় কাগজগুলি নম্র প্রতিবাদের বেশী করলেন না। কিন্তু কলকাতার 'ক্যাপিটাল' বা ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ প্রমুখ সাহেবী কাগজগুলি তীব্র আপত্তি জানালো। গোড়ায়, ইংলণ্ডের উদার নৈতিক কাগজগুলি নীরব থাকলেও 'স্ট্যান্ডার্ড', 'গ্লোব', 'ডেইলি এক্সপ্রেস' প্রমুখ বইটির সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করলো—।

১৯০৬ সালে যখন নিবেদিতা গুরতর অসুস্থ হয়ে দমদম 'ফেয়ারী হলে' এ অবস্থান করছিলেন, সে সময়ে দক্ষিণ ভারত থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সুব্রহ্মন্য ভারতী, তাঁর 'বাল ভারতী' পত্রিকার জন্য, তাঁর কিছু লেখা প্রবন্ধ প্রকাশের আশায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর রাজনৈতিক ধারণার পরিবর্ত্তন দেখা ছিল। তাঁকে শিক্ষাদাত্রী গুরুপদে বরণ করে ফিরে গেলেন। ১৯০৭ সালে মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা দানের আয়োজন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ডিসেম্বরে (১৯০৭) সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ তিলক, লাজপত রায়, অরবিন্দের মতাদর্শের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বেড়ে চললো। সরকারের বিষ নজরে পড়লেন। তাঁর নিরাপর্ত্তা বিঘ্নিত হল। পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য মান্ডেরম ভ্রাতারা গোপন কৌশলে, পণ্ডিচারীতে প্রেসটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন, সেখান থেকে নিরাপদে পত্রিকাটি চালাতে লাগলেন, তাঁর স্ত্রী পর্য্যন্ত এ সংবাদ জানলেন না। প্রথম দিকে অতিকষ্টে দিন কাটতে লাগলে। ইণ্ডিয়া পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় সেখান থেকে প্রকাশিত হতে লাগলো। তামিলনাড়ুতে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। এর পর বেরুলো—'বিজয়' নামে দৈনিক পত্রিকা। তারও সম্পাদক তিনি। কার্টুন পত্রিকায় চিত্রাবলী প্রকাশ করলেন। বৃটিশ সরকারের কুটনৈতিক চাপে পণ্ডিচারীতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি ১৯১০ সালে বন্ধ হয়ে গেল। এর কারণ রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো দক্ষিণ ভারত। মাদ্রাজবাসী তখনও রাজনৈতিক সচেতনা রূপ ধারণ করেননি। ভারতীর প্রকাশিত পত্রিকাগুলি সেরূপ দিতে সমর্থ হল। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতাপন্থী। ফলে ভারতের জনচেতনায় জাতীয়তাবাদ শুধু জন্ম নিল না— ভারতের জাতীয়বাদ, স্বাধীনতালাভ সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠলো। বৃটিশ স্বার্থে ঘা মারতে শুরু করলো। জনজাগরণের সৃষ্টি করলো।

মার্চ মাসে ভারতী নিক্ষিপ্ত হলেন বাধ্যতামূল নৈষ্কর্মে। ১৯০৭ সালে ১৪টি গান নিয়ে একটি কবিতার বই তাঁর প্রথম প্রকাশিত হল, যার ভূমিকায় ছিল ভারতমাতার চরণতলে এই পুষ্পগুলি অর্পণ করছি। ভারতমাতা 'ঐক্য ও নবযৌবনের প্রতিমা'। ভালভাবেই জানি আমার পুষ্প নির্গন্ধ, কিন্তু মহাদেব কি নীচ অন্ত্যজের দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড পুষ্পরূপে গ্রহণ করেন না? ভারতমাতা সেইভাবেই যেন সদয় হয়ে আমার এই ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি গ্রহণ করেন। বইটি উৎসর্গ করলেন নিবেদিতাকে। আত্মমোচনে বললেন : আমি এই ক্ষুদ্র বইটি আমার শিক্ষাদাত্রীর শ্রীচরণে বিবেদন করলাম। যিনি আমাকে ভারতমাতার ভাবমূর্ত্তি দর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যথার্থ আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, সেইভাবে তিনি আমার মধ্যে দেশাত্মবোধ অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন।

১৯০৯ সালে আরও একটি বইবার করলেন ভারতী 'জন্মভূমি' নামে। ভূমিকায় লিখলেনঃ স্বাধীনতা আলোকের জন্য, আমার ভালবাসার নিদর্শন রূপে ভারত মাতার চরণে আমি কিছু কাব্য পুষ্প স্থাপন করেছিলাম। সানন্দ বিষ্ময়ে দেখছি, ভক্তরা তাদের উত্তম বিবেচনা করেছেন। মাতা আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বইটি উৎসর্গ করলেন নিবেদিতাকে। এই গ্রন্থখানি আমি ভগবান বিবেকানন্দের ধর্ম্মপুত্রী শ্রীমতি নিবেদিতা দেবীকে উৎসর্গ করছি। তিনি শব্দ মাত্র উচ্চারণ না করে, একমুহূর্ত্তে, আমাকে দেশমাতার জন্য যথার্থ সেবার রূপ এবং আত্মোৎসর্গের মহিমা অনুধাবন করিয়ে দিয়েছেন।

এপ্রিল ১৯১০, অরবিন্দ পৌছলেন পণ্ডিচেরী। তখন আরও একজন চরমপন্থী ভি. ভি. আয়ারও পণ্ডিচারীতে আত্মগোপন করে আছেন। এঁরা তিনজনে সাহিত্য ও ধর্ম আলোচনায় নিমগ্ন হলেন। এখানে ভারতীর শূন্য কর্ম্মজীবন, কবিজীবনে রূপান্তরিত হল। তিনি বেদনির্ভর ও যোগনির্ভর অনেক কাব্যকবিতা রচনা করলেন। পৌরাণিক বিষয়ে লেখায় মন দিলেন যার মধ্যে রাজনৈতিক মত লুকানো ছিল। এ অবস্থায় তিন বছর দারিদ্র ও নিঃসঙ্গ জীবন শেষ করে, ঝুঁকি নিয়ে মাদ্রাজে ফিরে এলেন। তারপরই গ্রেপ্তার হলেন।

৭ই এপ্রিল ১৯১০, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে চিঠি দিলেন : অবস্থাটা বুঝে নাও। কোন সমালোচনার কণ্ঠ ওরা থাকতে দেবে না। যদি কোন সংবাদপত্র সামান্যতম স্বাধীনতার ভাব দেখিয়েছে, অমনি তাকে চুরমার করে দাও। সরকার স্পষ্টতঃ সেইদিনগুলির জন্য লালায়িত, যখন দেশের জন্য আত্মোৎসর্গেব্রতী মানুষদের কাছে 'হত্যার পক্ষে' প্রচারই হবে, একমাত্র দেশসেবা। আর সরকার যতই দেশ প্রেমের উপর ঘা মেরে পরীক্ষা করতে চাইবে, ততই ঐ ধরনের মানুষ উত্থিত হবে।

এই পরিস্থিতিতে গোপনপত্রই জনগণের পক্ষে একমাত্র উত্তর। আর শুনছি, ইতিমধ্যে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কয়েকটি তেমন কাগজের অবির্ভাব হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে সমর্থ নই। মনে হয়, ওরা ভাবছে, এগুলিকে স্বচ্ছন্দে বিনাশ করা যাবে। সম্ভব নাকি? শোনা যাচ্ছে আমাদের বন্ধু রামানন্দের পত্রিকাও বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। তা করলে পাগল উন্মাদ ওরা ঈশ্বরের হাতে ধ্বংস অনিবার্য্য।

সরকার দেউলিয়া। গোয়েন্দা বাহিনী ও নতুন প্রদেশ খরচ এসব নিয়ে তাদের মাথাখারাপ হবার যোগাড়। ধরো গোপন প্রেস, ক্রেডিট নিয়ে যুদ্ধ করলো! অবশ্যই মনে রেখো গোপান প্রেস — গোপন বলে — একেবারে বাঁধন ছেঁড়া। সেখানে বিচার বিবেচনার কোন দরকার নেই। শিব। শিব।

ইংলণ্ডে কোয়ার হার্ডি ও রামজে ম্যাকডোনাল্ড হাউস অব কমনসে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্ন তুললেন ২১শে এপ্রিল ১৯১০ উত্তর দিলেন আণ্ডার সেক্রেটারি, মণ্টেগু।

২৪শে এপ্রিল ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন, ...কিছু করার নেই শুধু অপেক্ষা — আর অন্তরালের গোপন বিশ্বাস। দুষ্ট অন্যায়কে ভাঙা যদি সর্বোচ্চ ন্যায় হয়, তাহল এইমুহূর্ত গোপন সংবাদপত্রের পরিচালক ঈশ্বরের খাঁটি সন্তান।

ভাইসরা কাউন্সিলের গঠনের সম্ভাবনা দেখা গেল। তাতে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিনহাকে প্রথম ভারতীয় আইন সদস্য করা হবে স্থির হল! তাঁর নিয়োগে ভারতের ইংরাজ আমলাতন্ত্র এবং ইংলণ্ডের রক্ষণশীল মহল উঠে পড়ে লেগে গেল। ভারত সরকারের শাসন পরিষদে একজন ভারতীয়ের প্রবেশ-এ চিন্তাবিস্তারে তাঁরা অসহ্য। নিবেদিতা তথ্য সহযোগে দেখালেন, প্রথম ইংরাজ আইন সদস্যটি কত অপদার্থ ও নীচ, অপর পক্ষে প্রথম ভারতীয় সদস্য পূর্ব্বর্তীর তুলনায় কতখানি উচ্চগুণ সম্পন্ন। সরকারের প্রথম যে 'মেম্বার মিঃ মেকেলে একজন দুঃস্থ ভাগ্যান্বেষী। উনি এই দেশে এসেছিলেন 'প্যাগোডা গাছ' নাড়া দিয়ে এদেশের সন্তানদের খরচে বড়লোক হতে, অথচ এ দেশীয় মানুষদের গালাগালি দিতে ওঁর বিবেকে বাঁধেনি। বোনকে লেখা মেকেলের একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিলেন : 'পেট চলছে না বলেই সরকারী কাজে ঢুকছেন। লিখে কখনও বছরে দুশো পাউণ্ডের বেশী রোজগার করতে পারিনি অথচ পাঁচশো পাউণ্ডের কমে, স্বচ্ছন্দে আমার দিন চলবে না। সেই জন্যই আইন সদস্যের পদনিয়ে ভারতে যাচ্ছেন। পাবেন, বছরে দশ হাজার পাউণ্ড।

হালচাল জানা লোকেদের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন — কলকাতায় বছরে পাঁচশো পাউণ্ড খরচ করে রাজার হালে থাকতে পারা যায়। বাকী মাইনে, সুদ সহ জমাতে পারবে। ফলে, যখন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইংলণ্ডে ফিরব, তখন দেহে মনে পুরোশক্তি তৎসহ ৩০ হাজার পাউণ্ডের ঐশ্বর্য্য।'

এহেন অর্থলোভী বাগাডম্বর প্রিয় ব্যক্তিকে নিয়োগের অনৌচিত্য কতখানি। হীন সেইব্যক্তি, যিনি আইন সদস্য হবার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ভারতের রীতিনীতি, জীবন যাত্রার বিষয়ে কেবল সম্পূর্ণ অনবহিত নন, অবগত হবার প্রয়োজনকে ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করেছিলেন, অথচ নথিপত্রে ঐ সকল বিষয়ে আইন সদস্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে লিখিত।

সত্যেন্দ্র প্রসন্নের নিয়োগে অসন্তুষ্ট লণ্ডন টাইমস : একটি আইন সদস্যের প্রত্যাশিত গুণাবলীর দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করছেন এবং বক্রভাবে বললেন মিঃ সিনহা ঐ সকল গুণের অধিকারী হলেও হতে পারেন, সেগুলি যে কোন জাতির মানুষের মধ্যে বিরল আর প্রাচ্যদেশীয়দের মধ্যে তো জঘন্যভাবে অনুপস্থিত! এর উত্তরে 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা বললো: ঐ সকল গুণ মিঃ সিনহার পূর্ববর্তী ইংরাজ আইন সদস্যদের মধ্যে কদাপি ছিল না। সেইসব ব্যক্তির তুলনায় আইন জীবনে সিনহার সাফল্য সমুচ্চ, এবং আশা করা যায়, ইংরাজ আইন সদস্যরা আইন বিভাগকে যে গহ্বরে গেড়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে সিনহা উদ্ধার করতে পারবেন। নিবেদিতা 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মন্তব্য উৎকলনে বললেন : মিঃ মেকলে সারাজীবনে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করেন নি। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের গৌরব তাঁকে দেওয়া হয়। সে কাজ তিনি কোন উচ্চতর উদ্দেশ্যে করেন নি, ইংলণ্ডের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধি ও খ্রীষ্টান ধর্মের বিস্তারের জন্যই করেছেন। তাঁর ধারণায় অসভ্য লোককে শাসনের চেয়ে, সভ্য লোকেদের সঙ্গে ব্যবসা, ইংলণ্ডের পক্ষে অনেক বেশী লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে। মিঃ মেকলে বলেছেন : এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস— যদি আমাদের শিক্ষানীতি বলবৎ করা হয়, তাহলে আগামী তিরিশ বছরের মধ্যেই বাংলার সভ্য শ্রেণীর মধ্যে একটিও পৌত্তলিক থাকবে না। প্রথম নিযুক্ত ইংরাজ আইন সদস্যের পাশে প্রথম আইন সদস্যকে স্থাপন করে বললেন নিবেদিতা: মেকলে যেখানে গাছ নাড়িয়ে টাকা কুড়াবার জন্য ঐ কাজ নিয়েছিলেন, সেখানে মিঃ এস. পি. সিনহা বৎসরে তিন লক্ষ টাকারও বেশী আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে ঐ পদ নিয়েছেন, সে পরিমাণ অর্থ ভাইসরয়ের মাহিনার চেয়েও বেশী। মেকলে যেখানে, কোন বড় আইনজ্ঞ নন, সেখানে মিঃ সিনহা একেবারে সর্বোচ্চ স্তরের আইনজীবী। মেকলে এদেশের বর্তমান বিক্ষোভের উৎপত্তিতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে দান করেছেন প্রচুর। যে কোন ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে, ঘৃণা পোষণ করেন তিনি। তাঁর 'শিক্ষা প্রস্তাব' এমনভাবে লিখিত হয়েছে, যা ভারতীয়দের অনুভূতির উপর প্রচণ্ড অত্যাচার। এই সুবৃহৎ উপদেশের, কোন ভাষা বিষয়েই কোন জ্ঞান তাঁর নেই। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের বিষয়ে, জানবার কোন ইচ্ছাই বোধ করেননি। সেই তিনি, ঐ সকলের সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাবার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন। যেভাবে, উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের সুখে বাঙালীদের কুৎসা করেছেন, বাংলার মানুষ তা কদাপি ভুলতে পারেনি। যদি, মেকলের ঐসব গালাগালি, প্রতিটি বাঙালীর বুকে বিঁধে গিয়ে মেকলের শ্রেণীভুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে, বাঙালীদের হতশ্রদ্ধ করে ফেলে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। উল্টোদিকে প্রতিভাবান সতেন্দ্রপ্রসন্ন, যাঁর কাছে তাঁর দেশবাসী অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হবে, যদি তিনি মেকলে ও তাঁর অনুবর্তীদের দ্বারা চাপানো অন্যায়ের প্রতিকার করেন। তাঁর কাজ 'জাতীয় শিক্ষার' পদ্ধতি নির্ণয়, ন্যায়সঙ্গত 'ভূমি-আইন', আইনের 'সরলীকরণ', অপরাধীদের শাস্তি বিষয়ে 'মানবিকতাবোধ' ও 'অস্ত্র আইনের' প্রত্যাহার। একাজে যদি অসমর্থও হন— তবুও, তাঁকে সমর্থন করবে ভারতবাসী, কারণ ভাইসরয় কাউন্সিলে তিনি সর্বদাই সংখ্যালঘু দলের।

শাসন পরিষদে আইন সদস্যকে কখনই পূর্ণ সদস্যের অধিকার দেওয়া হয়নি— না ইংরাজ সদস্যদেরও নয়। এক্ষেত্রে ভারতীয় সদস্যের কী দশা হবে সহজেই অনুমেয়।

এখন যেহেতু একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আইনসদস্য নিযুক্ত হয়েছেন, এক্ষেত্রে তাঁকে শাসন পরিষদের অধিবেশনে ও আলোচনা থেকে কৌশলে বাদ দিতে পারা অপেক্ষা, অধিকতর আনন্দদায়ক কাজ, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাটদের কাছে আর কিছু থাকতে পারে না।

তাকে তচনচ করে দিলেন মিঃ ম্যাককারনেস "ডেইলি নিউজ' ও 'মর্নিং লীডার' এ পত্র লিখে ২রা মে, ১৯১০।

ইতিমধ্যে মিঃ ম্যাককারনেসের প্রকাশিত প্রবন্ধ সংগ্রহ পুস্তকটি ভারতে বিভিন্ন জায়গায় বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ২১শে জুন ১৯১০, কলকাতা 'ক্যাপিটাল' ও 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি' নিউজে আপত্তি জানানো হল। বিলেতের 'স্ট্যাণ্ডার্ড', 'গ্লোব', 'ডেইলি এক্সপ্রেসে' মন্তব্য বেরুল জুলাই মাসে।

ভারত সরকারের সমর্থনে এগিয়ে এলেন ভারত সচিবের আণ্ডার সেক্রেটারী, মিঃ মণ্টেগু। ঢালাও মন্তব্য করলেন: ম্যাককারনেসের বইটিতে, প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিপুল সংখ্যক ভুল আছে? পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

মিঃ ম্যাককারনেস 'টাইমস' ডেইলি নিউজ ও অন্যান্য কাগজে চিঠির পর চিঠি লিখে মিঃ মণ্টেগুর দায়িত্বহীন উক্তিকে লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়ালো মিঃ মণ্টেগুর পক্ষে উপযুক্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না। ধিক্কার দিয়ে ইণ্ডিয়া লিখলো : ইংলণ্ডে ভারত সম্বন্ধে লজ্জাজনক অবজ্ঞতা বলবৎ — সেই সুপরিচিত ব্যাপারটি ভাঙিয়ে ভক্ষণ করা লিবারেল দলের আণ্ডার সেক্রেটারীর পক্ষে অবশ্যই উপযোগী কাজ হতে পারে।.... মিঃ ম্যাককারনেস কর্তৃক নির্মম উৎঘাটনের কোন নির্দিষ্ট উত্তর মিঃ মণ্টেগু দেননি। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ। এই বির্তকের মধ্য থেকে নিঃ ম্যাককারনেস অক্ষত অমলিনভাবে বেরিয়ে এসেছেন।

অরবিন্দ আত্মগোপনে চন্দননগর অবস্থান করলেন। 'কর্মযোগী' চালাতে লাগলেন নিবেদিতা। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তাঁর বিলেতের বন্ধুরা হৈ চৈ করে অরবিন্দের নির্ব্বাসন রোধ করবেন। সেই আশা অনুযায়ী তাঁরা বিলাতে প্রতিরোধের ঝড় তুললেন। কিন্তু সরকারের মনোভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। অগত্যা জগদীশচন্দ্রের পরামর্শমত অরবিন্দের পণ্ডিচারী যাওয়ায় উদ্যোগী হলেন। জগদীশচন্দ্রের দেওয়া টাকায় তাঁর যাত্রার ব্যবস্থা হল। তিনিও নিরাপদে পণ্ডিচারী পৌঁছলেন এপ্রিলে।

কলকাতা থেকে প্রস্থানের পর নিবেদিতা 'কর্মযোগী' দুই সংখ্যা প্রকাশ করলেন তাতে অরবিন্দের পুরাতন লেখা, বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচার করে চলেছিলেন। একই প্রেসে কর্মযোগীন ছাড়া আরও একটি পত্রিকা বার হতো। নাম 'ধর্ম' এই পত্রিকায় মতিলাল রায় 'নবতন্ত্র' নামে এক প্রবন্ধ লিখলেন। সরকার এই পত্রিকার বিরুদ্ধে দু হাজার টাকার সিকিউরিটি দাবী করলেন। টাকা জমা না দেওয়ায় পত্রিকা বন্ধ হল। প্রকাশক ও অরবিন্দের বিরুদ্ধে পরোয়ানা বার হল। কার্য্যতঃ দুটি পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। অরবিন্দকে এ্যারেস্ট করার জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সংবাদপত্রের উপর নানাপ্রকার নিপীড়ন শুরু হল।

৫ই মে ১৯১০, বোন মেকে লিখলেন :

আমি নিতান্ত নিশ্চিতভাবে জানি না, তুমি এবং আমি আবার একত্র হব। খুবই ভরসা করি যে, অন্য জীবনে, আমি তোমার উপর বোঝা চাপাবো না, যা নিতান্ত স্বার্থপরের মত এজীবনে করছি। সত্য সত্যই আশা করি তা। সত্যই আশা করি যে, আমার ছোট্ট মা-টির উপর ভালবাসা উজাড় করে দেব। যাইহোক না কেন, আমি স্থির নিশ্চিন্ত, সাহায্য তিনি পাবেন, কেননা আমাদের দ্বারাই আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে; তিনি তৃপ্ত হবেন, যা হয়েছেন, তা হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন বলে; তুমি আর

আমি তৃপ্ত হব তার জন্য, যা করতে চাই তা করার সমর্থ্য পেয়েছি বলে। জীবনের নবলব্ধ, স্বাধীনতা ও মহিমার আলোকে তখন দৃষ্টিপাত করতে পারবো, জীবনের সকল বৃহৎ ব্যাপারে তিনি কী, যথার্থ মহিমা ও মহত্ত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিতে কী অসহনীয় স্বভাবের প্রকৃতি তাঁর ছিল।

ডঃ বসু সর্বদা মার্গটের (মে'র মেয়ে তাঁর ধর্মকন্যা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তুমি যা কিছু বলেছ, তা তাঁকে গতরাত্রে বলেছি। তিনি অবশ্যই চান, ছোট তাবিজটি ব্যবহার করা হোক। ডাকে, যাবার সময় যদি পথিমধ্যে ভেঙে যায়, তা তুমি নিশ্চয় জানাবে। কারণ সহজেই আমরা নতুন পাঠাতে পারি। এই ছোট মুসলমানী জিনিসটি সম্বন্ধে খোকার অসাধারণ বিশ্বাস। ব্যাপার কি বিচিত্র!

৫ই মে ১৯১০, দ্বিতীয় সপ্তাহে স্কুল বন্ধ হল। জগদীশচন্দ্রের পরামর্শ মত স্থির হল : গ্রীষ্মের এই অবকাশে তাঁরা কেদারবদ্রী বেড়িয়ে আসবেন। যাত্রা হল শুরু। সঙ্গে স্ত্রী অবলা বসু সহ জগদীশচন্দ্র। প্রথমে হরিদ্বার। কঙ্খল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী কল্যানানন্দের সঙ্গে দেখা হল। তিনি তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করলেন। দর্শনীয় সকল স্থান দর্শন করে সন্ধ্যাবেলায় ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে গেলেন। গঙ্গায় সন্ধ্যার আরতি দেখে মুগ্ধ হলেন। মনে হল হরিদ্বার, বারানসীর ক্ষুদ্র সংস্করণ। হরিদ্বার ও কাশী ধামের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাশীতে লোকে যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে, আর হরিদ্বারে আসে তপস্যার উদ্দেশ্যে।

হরিদ্বার থেকে ১৭ই মে, তাঁরা হৃষিকেশে পৌছলেন। প্রকৃতিক-সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। খরস্রোতা জাহ্নবী, সাধু সন্ন্যাসীগণের শত শত কুটীর, অদূরে হিমালয় পর্বত। আরও কিছুদূরে কুলী, দাণ্ডী সংগ্রহ করার স্থান। তাঁরা হরিদ্বারে একজন ভাল পাণ্ডা পেলেন। এখান থেকেই কেদারবদ্রী যাত্রা শুরু। লছমনঝোলা সেতু পার হয়ে, গঙ্গার ধার দিয়ে উত্তর দিকে পথ চলে গেছে। যাত্রীরা সেপথ ধরে আপন মনে মালাজপ করতে করতে দলে দলে এগিয়ে চলেছে। কারও মুখে বিশেষ কথা নেই। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে শুধু অভিবাদন 'জয় কেদার-বদ্রীনাথ কী জয়।'

নিবেদিতা দেখলেন : মেয়েরা স্বচ্ছন্দে পথ চলেছে। কোন আড়ষ্ঠভাব নেই। চালচলনে সঙ্কোচ দ্বিধাহীন।

সাধারণতঃ ডাক বাংলায় যাত্রীরা আশ্রয় নেয়। যেখানে সে অভাব, সেখানে 'চটি' বা ধর্মশালাতে যাত্রীরা অবস্থান করে। সেই অবসরে তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ করে নেন। যদিও মনে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে, কৃত্রিমতা যা তাঁকে সাধারণ যাত্রী থেকে পৃথক করে রেখেছে। এঁরা সকলেই ভারতীয়, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত, কেবলমাত্র একাই তিনি বিদেশিনী বা বিশিষ্ঠ্যা। দেখা গেল সকলেই তাঁর সঙ্গে আলাপে আগ্রহী।

কখনও পদব্রজে, কখনও ডাণ্ডীতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করতে করতে কেদারের পথে শেষ চটিতে পৌছলেন তাঁরা। শেষের এই চার মাইল পথ খাড়া চড়াই। দুর্গম পথ। সহযাত্রী পাণ্ডা বললেন : স্বর্গের সিঁড়ি— স্বর্গধাম যাওয়ার রাস্তা এরকমই দুর্গম হয়।... অবশেষে মন্দির যখন দেখা গেল, মনে হল সবকষ্ট সার্থক। ৩০শে মে, সোমবার দুপুরে মন্দিরের কাছে পৌছলেন। মন্দিরদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। খুলবে সেই সন্ধ্যায় যখন আরতি হবে। অপেক্ষা করতে হল তাঁদের।

সন্ধ্যার পূর্বেই ঘন কুয়াশা চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শীত প্রচণ্ড। বিশ্রাম সেরে তাঁরা চললেন মন্দিরের দিকে। সকল যাত্রীই এগুচ্ছে পা চালিয়ে, এবার দেবদর্শনের অবকাশ জীবনে পাবেন তাঁরা।

কুয়াশা সরে গিয়েছে। চারপাশ ঘিরে নেমেছে ঘন অন্ধকার। মাথার উপর দেখা দিয়েছে নক্ষত্রের পিটপিটে আলো, সামনে সাদা সাদা বরফ— স্পষ্ট দেখা যায়।

শেষ হল আরতি। যাত্রীদের মধ্যে শুরু হল কোলাহল। কোনদিকে দৃষ্টি নেই, উন্মত্ত সব উঠছে সিঁড়ি বেয়ে। প্রত্যেকেরই এক আশা, এক লক্ষ্য— মন্দিরে প্রবেশ— দেবতাকে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা।

শেষ ধাপে পৌঁছে জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন নিবেদিতা। কত সুন্দর দৃশ্য দেখেছেন জীবনে— কিন্তু এ দৃশ্য চোখে তাঁর অন্যতম। উর্ধ্বে তুষার মৌলি কেদারশৃঙ্গ। পাদদেশে প্রসারিত সমগ্র ভারত। সকল প্রান্ত থেকে বিভিন্ন পথ ধরে, এসেছে জনস্রোত— সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে। সকলের হৃদয়ে একই আকাঙ্ক্ষা : দেবতার চরণ তারা স্পর্শ করবে। জ্ঞানী, সাধক, যোগী ঋষির চির আবাসভূমি কেদারবদ্রী! করজোড়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন নিবেদিতা। অপার শান্তিতে ভরে গেল মন। ঠোঁটের পাতায় ভেসে উঠলো মৃদু কণ্ঠস্বর— শিব! শিব! পরদিন বহুদূর বেড়িয়ে এলেন তাঁরা। নেমে আসছে প্রান্তরে ধীরে ধীরে গলিত তুষার ধারা! মন্দিরটি দূর থেকে ছোট একটি পল্লীর মন্দির বলে; প্রতিভাত হল।

অনেকক্ষণ পর্বতের ধারে বসে রইলেন নিঃশব্দে। উপরে অবিরাম হিমানী প্রপাত। ভেসে আসছে সেই ক্ষণে শব্দধারা! মনে পড়ে গেল পাণ্ডবগণ এই পথেই মহাপ্রস্থান করেছিলেন।

তুষারাবৃত পথধরে আরও কিছুদূর পথ এগিয়ে গেলেন। এখানেই মহাভারতের কাহিনীর পরিসমাপ্তি।... হ্যাঁ জাগতিক সকল সুখ দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা-বাসনার-নিবৃত্তি। নাম তার নির্ব্বান। এরপর যাত্রা উর্ধ্বে, অনন্তলোকে— পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। —এটাই ভারতবর্ষের চিরন্তন ইতিহাস। মনে মনে বলে উঠলেন— ধন্য ভারতবর্ষ!

এরপর কেদারনাথ থেকে বদ্রীনারায়ণ যাত্রা শুরু হল। পথে দু'জন বৃদ্ধা চলেছেন, একজন পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। নিবেদিতা ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন তাকে ধরে তুলতে। দুঃখ প্রকাশে শুধালেন, লেগেছে? উত্তরে হাসলেন বৃদ্ধা। বললেন : ভগবানই তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কৃপা করে দর্শন যখন তিনি দিয়েছেন, তখন এটুকুই আঘাতে কি এসে যায়!...

অন্ধ চলেছেন দুহাতে পাথর স্পর্শ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে! মন্দির তখনও কিছু পথ বাকী! বিস্মিত হয়ে ভাবলেন : নিবেদিতা এতদূর পথ সে এসেছে কী করে?

এদের ভক্তি, সরলতা ও নির্ভরতা দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের যথার্থ পরিচয় তীর্থস্থানেই পাওয়া সম্ভব। ধর্ম অন্দরমহলের। এখানে প্রবেশ না করলে, সাক্ষাৎ পরিচয়লাভ কোন দিনই সম্ভব নয়।

অলকানন্দার তীরে এক বৃদ্ধাকে দেখলেন; স্নান করে উঠছেন। ভিজা কাপড় পরে আছেন, মাথার চুল তাঁর সাদা, প্রবল এই শীতকে উপেক্ষা করে, ধীর স্থির চিত্তে দেবতাকে প্রমাণ করছেন— ভক্তি গদগদ চিত্তে, জোড় হাতে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে। কী সুন্দর তাঁর মুখ! আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন— ভক্তি বলে একেই।

এক প্রাচীনা; তুষারের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন বদরিকার পথে। পিছনে তিনি। বরফ গলে পিচ্ছিল সে পথ। পা পিছলে যাচ্ছে, ভয় হল বৃদ্ধা পিছলে পড়ে যাবেন হয়তো। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি? তাঁর হাতটা ধরতে পারি কি? উত্তরে, তাঁর মুখের দিকে ফিরে হাসলেন। কী সুন্দর সে হাসি! নিশ্চিন্ত নির্ভয় তাঁর লাঠি। তারই উপর ভর দিয়ে, এগিয়ে চলেছেন তিনি।

মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, ২৫শে মে ১৯১০,

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে এই যাত্রাটি যথার্থই তীর্থযাত্রা। সব ধরনের জায়গাতেই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে তিনরাত্রি মাত্র ডাক বাংলোতে, সুতরাং কল্পনা করে নাও! বসুরা, একেবারে অপূর্ব! এত সহজে তারা সন্তুষ্ট, কোন নিমেষের সেবারূপ দেখতে প্রস্তুত এবং ধর্মজীবনের অভিব্যক্তিতে আগ্রহী। এই উত্তপ্ত নদী উপত্যকায় বিপদ যথেষ্ট।

১২জুন ১৯১০, বোন মে'কে লিখলেন :

প্রতি রাতে মা'কে স্বপ্ন দেখি। করুণ সে স্বপ্নগুলি। মৃতের জন্য প্রার্থনার যোগ্যভূমি নাকি বদরী নারায়ণ! তোমাদের সকলের কথা কত মনে পড়ে! এই যাত্রাটি কিরকম হয়েছে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আমাদের সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়েছে। গত ৭/৮ দিন ধরে বেচারা মিসেস বসু অসুস্থ।

হরিদ্বার নামক মনোরম ক্ষুদ্র এক শহর থেকে, যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম আমরা। তীর্থ-যাত্রার পথ অনুসরণ করে পর্বতের মধ্যে দিয়ে যাত্রা। প্রথমে, কেদারনাথ দর্শন করতে হয়। যাত্রার সে অংশ শেষ হয়েছে। এটাই কঠিনতম পথ। এখন চলেছি বদরীনারায়ণের তুষারের অভিমুখে। প্রথম যে রাস্তা ধরে গিয়েছি, যেখানে ইউরোপীয় বা তাদের ভাবানুরূপ মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থাদি নেই। রাতের পর রাত আমরা মুশাফিরদের সরাইখানায় কাটিয়েছি, ঠিক বেথলিহেমের মত। এধরনের অবস্থানের চরম অভিজ্ঞতা ঘটেছিল যখন পার্শ্ববর্তী এক বিরাট মঠে আতিথ্য নিয়েছিলাম।... এখন আমরা তিব্বতের অভিমুখে, সামরিক পথেও প্রতিক্ষেপে থাকবার স্বাচ্ছন্দ্যকর জায়গা পাচ্ছি। সারাপথ অতি অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং অসাধারণ ঐতিহাসিক স্থান সমূহ। কষ্ট স্বীকারের উপযুক্ত পথ।... এখন দিনের পর দিন চলেছি। রাঙা গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে, মাঝে মাঝে পাতলা পাইন বন, তাছাড়া আর কোন গাছ নেই। ধূমল বর্ণ গিরিসংকট। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বা কাম্বারল্যাণ্ডের মত। আহা! অপূর্ব্ব, যেন দেবতাদের বিহারের স্থান।...

১২ই জুন ১৯১০, বদরী নারায়ণে এসে পৌঁছলেন। পরদিন ভোরে মঙ্গল আরতি দর্শনে গেল। তাঁকে ভেতরে যেতে দেওয়া হল না। হিন্দু ছাড়া প্রবেশ নিষেধ এখানে। মনটা ক্ষুণ্ণ হল, অদ্ভুত প্রথা! বাইরে দাঁড়িয়ে তীর্থযাত্রীদের দেখতে লাগলাম। তাঁরা জপ করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন। সকলেই নিবিষ্ট চিত্ত। কি শান্ত ও মধুর পরিবেশ। মনের ক্ষোভ মিলিয়ে গেল। হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো। দূর থেকে বদরীনারায়ণকে প্রণাম করলাম।

শিল্পী তিনি। সাহিত্যিক তিনি। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য, চোখে তাঁর স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়ে এলো। মন্দির প্রবেশের অধিকার তাঁর নেই, তিনি বিদেশজাত বিদেশিনী। তবুও অতীত ভারতের মাধুর্য্যকে উপভোগ করলেন নিভৃতে। মনে হল কেদারনাথ বহু প্রাচীন, বদরীনারায়ণের মন্দির পরবর্তীকালের। গঠনভঙ্গী আধুনিক। বহুজায়গা সংস্কার করা, প্রাচীরে ও ফটকে মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। মন্দির, পরিবেশ ও পূজার ব্যবস্থা উন্নততর। পাণ্ডারা যাত্রীর সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করে না। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। দূরে তুষারাবৃত্ত পর্বত শৃঙ্গ। তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, শুভ্র চন্দ্রালোক, চারপাশে সাদা বন্য গোলাপ ও ভায়োলেট ফুলের সমাবেশ।

এখানে কয়েকদিন অবস্থানের ইচ্ছা ছিল কিন্তু সম্ভব হল না— অবলা বসু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁরা চামেলী ও নন্দপ্রয়াগ হয়ে কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছলেন। এখান থেকে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেল। একটা গেল কাঠগোদামের দিকে, যাত্রীরা সাধারণতঃ এই পথ ধরে। অপরটি শ্রীনগর হয়ে হরিদ্বার বা কোটদ্বরায় চলে গেছে। ডাক বাংলোর সুবিধার জন্য তাঁরা কোটদ্বরার পথ ধরলেন।

২৯শে জুন ১৯১০, সমতলে এসে পৌঁছলেন। হিমালয় রয়ে গেল পিছনে। মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমাদের অপূর্ব তীর্থযাত্রা সমাপ্ত। স্বামীজি নিশ্চয় চাইতেন, আমরা এই তীর্থ করি। আগামীকাল ভাগ্যে কী আছে কে জানে; কিন্তু এ এক অমর সম্পদ এভাবে রক্ষিত ও পুণ্যাশীষপূত যে এমন কি খোকা পর্যন্ত তার মহিমা মেনে নিয়েছে। ভালবাবে নামছি আমরা— কী স্বস্তি।

জনৈক স্যার হ্যাবী জনস্টন 'কোয়ার্টালি রিভিউ পত্রিকায়' এক আড়ম্বরপূর্ণ রচনায় (Rise of the Native) বললেন : আমরা ইস্ট ইণ্ডিজ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত থেকে দূরপ্রাচ্যের বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেছি: ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্ব

থেকে, দেশী, বিদেশী মহাজনদের কবল থেকে, রক্তপিপাসু উৎপীড়ক ও ভ্রান্ত ধর্মপ্রভুদের হাত থেকে। তাদের কাউকে কাউকে তিরস্কার করেছি, নর মাংস ভোজন ও বহুগামিতা সম্বন্ধে। তারিফ করেছি— তাদের উন্মুক্ত আনুগত্যের কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা করেছি, তাদের দেশের রাজাদের ও অভিজাতবর্গের শিকারের আয়োজনকে। ...শ্বেত মানুষের দায়ভার বহনের জন্য অত পরিশ্রম করে কি ফল লভিনু হায়! অকৃতজ্ঞ প্রাচ্যবাসীরা কিনা বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করলো। ওরা ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পাবার জন্য আন্দোলন করছে!!

ওই লোকগুলো মিশনারীদের কাছ থেকে লেখাপড়া শেখা, ঐ ক্রীতদাসদের মস্তানগুলো, পার্শী মুদির কোল থেকে নেমে পড়া ঐসব সাংবাদিকগুলো, জনপ্রিয় গর্দভ চালকের ব্যাটারা— ওরা হয়ত এখন ছোটখাট খ্যাতি জোগাড় করে ফেলেছে কিংবা হয়েছে বড়জোর প্রাচ্য দোভাষী বা হাতুড়ে ডাক্তার — ওরা করছে আন্দোলন! ...চেঁচামেচি করে গাল পাড়লে বা অনর্থক হিংসার কাজ করলে কিছুটি হবে না—! ইংরাজের পূর্ণ প্রাণের সমাদর পাবার দুটি উপায়: এক, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত লড়ে যাওয়া— দ্বিতীয় পথ যা নিশ্চিন্ত পথ— খুব করে খাটো, আর অনেক টাকা করো। টাকাটাই উত্তম— আচরণের গ্যারান্টি। ...নিশ্চিতভাবে তা রাজনৈতিক সমর্থবৃদ্ধি করে, বিবেচনাসম্মত ভোটাধিকার প্রয়োগের পথে এগিয়ে দেয়।

নিবেদিতা মডার্ণ রিভিউ, জুন সংখ্যা ১৯১০ সালে 'নেটিভের উত্থান' নামে একটি নোট লিখলেন :

১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায়, দক্ষিণ ভারতের রক্ষণশীল বিদ্যাচর্চার দুর্গ কুম্ভকোনমের জনসভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজি পশ্চাদপদ জাতিতত্ব, (Backwork Race theory)-এর পাশাপাশি সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট ও হেরিডিটারি ট্রান্সমিশন থিয়োরি; সম্বন্ধে বলেছিলেন : আমি এও দেখতে পাচ্ছি, 'বংশানুক্রমিক সংক্রমণ' (হেরিডিটারি ট্রান্সমিশন) ও অনুরূপ নানাপ্রকার দানবিক, পাশবিক মতবাদকে, পাশ্চাত্যজগত থেকে এনে হাজির করা হচ্ছে, দরিদ্র মানুষের উপর অধিকতর বর্ব্বর উৎপীড়ন চালাবার জন্য।... যোগ্যজনের উৎবর্তন (সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট) মতবাদের দ্বারা প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি, নিজের বিবেকের ভর্ৎসনা থেকে অব্যাহতি পাবার যুক্তি খুঁজে পায়। এমন লোকের অভাব নেই, যাঁরা দার্শনিক বলে নিজেদের পরিচয় দেবার পরে, সকল দুষ্ট বা অনুপযুক্ত মানুষকে খুন করে মানুষ জাতিকে রক্ষা করার অভিপ্রায়বোধ করেন— তবে কারা বাঁচবার যোগ্য তা নির্দ্ধারণ করার একমাত্র বিচার কর্তা— এসকল দার্শনিকদেরও, তাও ধরে নিতে হবে।

...প্রায়ই শুনি যে ক্রমবিকাশবাদের ('থিয়োরি অব ইভলিউশন') একটি বিশেষত্ব— তা সংসার থেকে দোষভাগ বাদ দিয়ে দেয়। ফলে ক্রমাগত দোষের অংশ বাদ পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত কেবল উত্তমই বলবৎ থাকবে। কথাটা শুনতে চমৎকার। এ সংসারে যাদের প্রচুর আছে, তাদের দম্ভের পিঠচুলকানি এতে হতে পারে। এইসব ভাগ্যবানের কাছে ঐক্যবাদ অবশ্যই অতি উত্তম, অতীব সুখদায়ক। সাধারণ লোক কষ্ট পাক, মরে মরুক, তাতে ওদের কি!

...লোকে 'যোগ্যজনের উৎবর্তন' মতবাদ নিয়ে আজকাল অনেক কথা বলে— তারা মনে করে: যার পেশীর শক্তি বেশী, সেই জগতে টিকে থাকবে। ঐ মত যদি সত্য হত, তাহলে প্রাচীনকালে যেসব জাতি কেবল যুদ্ধ করে কাটিয়েছে, তারাই আজ জীবিত থাকতো।

না— তারা জীবিত থাকেনি পরন্তু দুর্বল হিন্দু জাতিই জীবিত আছে— স্বামীজি যোগ করেছিলেন।

...স্বর্ণ লালসার এই উলঙ্গ প্রদর্শনীতে, যে বর্বরের আত্ম উদঘাটন ঘটেছে, নিবেদিতা উত্তর দিলেন: নিজেকে নিয়ে তোমার স্ফূর্তি, দাগড়া দাগড়া পেশী আর এতাবৎ অপরাজিত তোমার এই ঔদ্ধত্যের উল্লাস, এসব দেখে মনে বুঝি একটু ঈর্ষার ভাব এসেছিল, কিন্তু তখনি দেখলাম— ঐ গুণগুলি আছে খাটো আকারে কুকুর ছানা কিংবা স্কুল বালকে। এটা দৈহিক স্বাস্থ্য ও জান্তব উদ্দীপনার ফল।

...শ্বেত মানুষরা দেবতা, বা দেবোপম ব্যাপার হতে পারে, যা হে লেখক ! তুমি সরল প্রাণে ভেবে বসেছ, নিশ্চয় তারা তাই, তবে তা নিজেদের কাছে, আর নিজেদের পত্নীর কাছে। নিয়তির কণ্ঠ যখন নিনাদিত হয়, তখন পার্থিব সম্পদে কি ফল? জমানো জমাট সোনা, মানুষকে ঈশ্বরের বিচার থেকে রাক্ষা করতে পারে নাকি?

সাম্রাজ্যবাদীদের স্বঘরে উত্থিত বঞ্চিতের আর্তনাদ ও ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের কথা শুনতে পাচ্ছ না, দেখতে পাচ্ছ না— বঞ্চিত শ্রেণীসমূহের মুক্তির ফলে, কোন যন্ত্রণাময় ভাবরাশি সকলের উপর আপতিত হচ্ছে? শুনছো না, তাদের চীৎকার? আমরা তোমাদের দ্বীপদেশের নেটিভদের দিকে, তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

...রাশিয়ার উপর জাপানের জয়ের সূত্রে, আমাদের গম্ভীর ভাবে জানানো হয়েছে, জাপানীরা প্রধানত: শ্বেতজাতি! জনস্টনের আমোদজনক ধারণা— শ্বেতজাতি অসীম অনন্তকাল ধরে মানবজাতির মধ্যে প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী অংশ! অপেক্ষাকৃত পিঙ্গল রোমক, ও গ্রীকদের পাশে বারবেরিয়ানরা হাজার বছর চেষ্টা করে তবে পিঙ্গল জাতির সংস্কৃতি ও সংগঠনশক্তি আয়ত্ত করতে পেরেছিল। অমাদের বিবেচনায় চীন মানবসভ্যতার একপাশে এমন উন্নতি দেখিয়েছে যা বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন অংশের তুলনায় নূন্য নয়।

জনস্টনের ছদ্ম নৃবিজ্ঞানের মতে নিওলিথিক মানুষ পলিওথিলিক মানুষের উপর সাম্রাজ্যবন্ধন বিস্তার করেছিল— তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের পরাভূত করেছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হবার আগে এই সাম্রাজ্যবিস্তার করনের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ হয়নি।

...কিন্তু এশিয়া 'ন্যায় ও করুণা' খ্রীস্টান মিশনারীদের কাছে থেকে শেখেনি—শেখেনি—শেখেনি।... যে সব শিক্ষিত ভারতবাসী ইতিহাস গড়েছেন— যাঁরা পেরু ও মেক্সিকোতে স্পেনীয়দের বিজয় কাহিনী কিছুটা জানেন, নিউজিল্যাণ্ড ও টাসমানিয়াতে কলোনি স্থাপন, সাউথ আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের ও সেকানকার যুদ্ধ কথার সঙ্গে পরিচিত আছেন, সেইসঙ্গে স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গেও তাঁরা মিশনারীর ন্যায় ও করুণার কথা শুনে দুঃখের হাসি হাসবেন।

...আমাদের মতে নিওলিথিকরা পলিওলিথিকদের মাংসহার করে বা তাদের নিকেশ করে বেঁচেবর্তে ছিল না— উল্টোপথেই আদিম মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রকার ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা ছিল। ...উদ্যত রণবাহিনীর পক্ষে পরিচ্ছন্ন দাম্পত্য জীবন সম্ভব নয়। কালগতে জানি, ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপক আকারে, সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বেঁচে থাকে, নৈতিকতার কতকগুলি পুরাতন ধারা, সেইসঙ্গে সেই মানুষগুলির মানবিক মর্যাদা সম্বন্ধে: যাঁদের ধারণা সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও ঐদার্য্যময়।

...প্রাতঃকালীন কফি, দৈনিক সংবাদপত্র ও মোটর গাড়ির সভ্যতার মধ্যে, শত শত মানুষগণ বিশ্বাসই করতে পারে না ওটা স্বর্গরাজ্য নয়— বা অনন্ত ব্যাপার নয়। ...আত্মতোষণে ভরপুর লোকগুলি, তারপর পৃথিবীর পিষ্টকের মস্তবড় অংশ কেড়ে কামড়ে বসাতে পেরেছে, নিজেদের সেই চালাকির কীর্তি দেখে, সরল গ্রাম্য বিস্ময়ে মোহিত। তার ভেবেই বসেছে : পেশীশক্তি ও ঔদ্ধত্যের প্রদর্শনীতে তারা যখন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পেরেছে, তখন অবশ্যই তা তাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করে দিয়েছে, মানসিক শ্রেষ্ঠত্বেরও—! হা ভগবান! ধর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বও!! বর্তমানের এই সাম্রাজ্যবাদী যুগের পটভূমিতেই ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ছদ্ম-নৃতত্ব, ছদ্ম-ইতিহাস, ছদ্ম-সমালোচনা।

তীর্থযাত্রা শেষ করে ফিরেই সংবাদ পেলেন মিসেস বুল অসুস্থ। উদ্বিগ্ন হলেন। একাধারে তিনি জননী, অন্তরঙ্গ বান্ধবী। শিক্ষাকাজে, প্রথম থেকেই তিনি অর্থ সাহায্য করে আসছেন। কৃষ্টিনের

সমুদয় ব্যয় তিনিই বহন করেন। বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্যেও তাঁর দান কম নয়। চিঠিতে তাঁকে লিখলেন : এ বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে তোমার, আমার যা কিছু রচনা, সমস্তই তোমার, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিও তোমার। ভবিষ্যতে যে ল্যাবরেটরী স্থাপিত হবে, তাও তোমার! তুমি কি জান না তোমার সাহায্যেই এসকল ভাল কাজ সম্ভব হয়েছে? আমার আশা আছে, শেষ পর্যন্ত হিন্দু নারীর শিক্ষার জন্য এই উদ্যম তোমার অন্যান্য সৎকাজের তুলনায় তুচ্ছ! তুমিই প্রথম থেকে এর ভার গ্রহণ করেছ।

জগদীশচন্দ্র এই সময় ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। তাঁর নিজের ইচ্ছাও সেইরূপ। প্রায়ই বলতেন : যদি মায়ের ইচ্ছা হয়, তিনিই তা সম্ভব করে তুলবেন। এছাড়াও তাঁর ইচ্ছা, বসুর জীবনচরিত রচনার। তাঁর ধারণা ছিল এর দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ভারতের মনীষিগণের সাধনা ও কৃতিত্ব কাহিনী দেশের জনগণকে ভাবীপথ প্রদর্শন করবে। বিশেষ করে ভারতের মত পরাধীন দেশে, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনার মূল্য অপরিসীম। প্রতিপদে, তাঁকে কি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, তা ব্যক্তিগতভাবে আর কেউ জানে না। এ কাহিনী রচনার জন্য তিনি ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন না।

১৯১০ সালে এক পত্রে মিসেস বুলকে লিখেছিলেন : আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বার বছর শেষ হয়ে আসছে, আশঙ্কা হয় জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখবার জন্য বেঁচে থাকবো না। কিন্তু জানি তুমি অন্ততঃ এক শত পাউণ্ড রেখে যাবে। এটি ভারতের খরচে ভারতেই ছাপা হতে পারবে, আর আমার সব কাগজপত্র তাঁদের হাতে তুলে দেব, তবু আমি যেভাবে তাঁকে দেখেছি, সেভাবে বোধ হয় আর কেউ কোনদিন দেখবে না। বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে, প্রতি মুহূর্তে তাঁর বিরামহীন সংগ্রাম এবং কি সাহস ও ধৈর্য্যের তাঁর এই সংগ্রাম, বোধহয় ভাল করে তার বর্ণনা দিতে সমর্থ হবে না।

অবগত হলেন মিসেস বুলের ইচ্ছা : তিনি আমেরিকায় যেন চলে আসেন। অথচ মাত্র একবছর পূর্বে তিনি ভারতে ফিরেছেন। কত কাজ এখানে। এইমুহূর্তে ভারত ত্যাগ করে যাওয়ার বাসনা ছিল না। তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলেন। শ্রীমা যে সময়ে উদ্বোধনের বাড়ীতে। তিনি তাঁর কাছে গেলেন। তাঁর আশীর্ব্বানী পাঠিয়ে দিলেন। গভীর উদ্বেগে দিনগুলি তাঁর কাটতে লাগলো।

মিঃ র‍্যাটক্লিফকে ৬ই জুলাই ১৯১০, চিঠি দিলেন :

এক সপ্তাহে একটি চিঠি ও একটি পোস্টকার্ড একই সঙ্গে উপস্থিত। এমন হবার কারণ, আমি ১৭নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কদাপি ব্যবহার করি না। যদি না মনে করি যে শহরে নিরাপদে পত্রটি পেয়ে যেতে পারি। এ সময়ে বিমূঢ়বোধ করে, আমি সেগুলি নেওয়া স্থগিদ রেখেছিলাম। কোন ভৃত্য গোপনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠতেই পারে। কোন ভদ্রলোকের উপরই এ ব্যাপারে ভার দিতে হবে।

প্রতিদিন খবর আসছে মানী লোকদের একে একে কাঠগোড়ায় শীঘ্র তোলা হবে— চুরি, ডাকাতি সংগঠনের জন্য। বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, কিছুদিন আগে আমি সেই তালিকাভুক্ত ছিলাম।

...হ্যাঁ লরেন্স জেনকিনসের আমিত্ব আছে সত্য, তবু আর কতদিন এইভাবে চলবে? সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এক চীফ জাস্টিস পেয়েছি, যিনি এই ধরনের অভিযোগকে পাত্তা দেবেন না। কিন্তু তাঁর পর কে? রামানন্দের বিরুদ্ধে সরকারের অনুচিত অভিযোগের প্রতিরোধ তাঁর দৃঢ়তাতেই সম্ভব হয়েছে।

...এস. পি. সিনহা, পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। এটা অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদ। তিনি দেখছেন যে, তাঁকে মোটেই ভিতরকার ব্যাপারে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁকে না জানিয়ে,

তাঁকে এড়িয়ে কাজ সমাধা করা হচ্ছে এবং সামাজিকভাবে তিনি বিচ্ছিন্ন। সিমলায় আছেন বলে, নিজ মানুষের সঙ্গেও বিচ্ছিন্ন। আর ওঁকে এদের প্রয়োজন নেই।

ভারতীয়দের মধ্যে একটা স্ফূর্তি জেগেছিল, একজন ভারতীয় যখন শাসন পরিষদের সদস্য হয়েছেন, তখন সরকারের ভিতরের খবর আর গোপন থাকবে না— সেই আহ্লাদে কিন্তু সায় দেওয়া যায় না। কমিটিগুলিকে এমন কায়দায় তৈরী করা হয় যে, অবাঞ্ছিতকে তাদের থেকে দূরে রাখা সহজেই সম্ভব। এস. পি. সিনহাকে সম্ভবতঃ কোন চমৎকার চাকরী দিয়ে কিনে নেওয়া হবে; সুতরাং সংবাদটি ব্যবহার করো না।

৬ই জুলাই বোনকে লেখা চিঠি : ৬ই জুলাই ১৯১০ তোমার স্বামী অস্বাক্ষরিত একটি পত্র পাবে। সেটি মিঃ র‍্যাটক্লিফকে পাঠিয়ে দেবে। ...বিজ্ঞানের মানুষটিকে সুস্থ, সবল, জ্যান্ত অবস্থায় কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে পেরে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। বেচারা বউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সে এখন ভাল হয়ে গেছে। সব জড়িয়ে ৪২দিন হেঁটেছি, ৬ দিন বন্ধ ছিল মোট ৪৮ দিন।

●

কলকাতায় পা দিয়েই অবগত হলেন মিন্টোর পর লর্ড কিচনারের ভাইসরয় হয়ে আসার কথা। কথাটা শুনেই শিউরে উঠলেন। পরে সে সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন কয়েকদিন পরে। ৬ই জুলাই বোনকে পুণরায় লিখলেন : কিচনার পরবর্তী ভাইসরয় হচ্ছেন না। খুবই আনন্দিত। কৃষ্টিন বলেছে, কিচনার এলে বড়জোর দিন পনেরো আয়ু দিতে পারা যাবে তাকে!

৭ই জুলাই ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

একথা না ভেবে পারছি না, বর্তমান রাজদরবারে অ্যালবার্টা বেশ বড় কিছু হয়ে দাঁড়াবে। শোনা যায় আয়ারল্যাণ্ডের ব্যাপারে সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রভাব অতীব মূল্যবান হয়েছিল। পঞ্চম জর্জ তা হলে কেন ভারতের জন্য অনেককিছু করবেন না? তার নিজের কী মনে হয়?

১৩ই জুলাই ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মুখ বন্ধ করার জন্য তাঁকে ডাকাতির মামলায় জড়াবার চেষ্টা করছে।

১৯/২০ জুলাই ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

কলকাতার পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাপূর্বক বিশ্বাসহানির কাজ করছে বলে সন্দেহ করি না। যেখানে পুলিশের কাছে কোন বিশেষ ব্যক্তির চিঠি পাঠাবার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না থাকে, সেখানে চিঠি খোলার কাজটা হয় জাহাজী পোস্ট অফিসে, আমার ধারণা ডিটেকটিভদের দ্বারা পরিচালিত— তবে তাতে কর্তৃপক্ষের কতখানি গোপন সমর্থন আছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। এখানকার পোস্টমাস্টার জেনারেল বলেছেন, তিনি ট্রেনে চিঠি খোলা বন্ধ করতে অসমর্থ। বড়বাজারের চিঠিপত্র অবিরাম চুরি! তিনি (পোস্টমাস্টার জেনারেল) এ সম্বন্ধে সবকিছু করেও হতবুদ্ধি। মনে হয়, তিনি সহজ বিশ্বাসেই কথা বলেন, কিন্তু—

...রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়নি। জনৈক জরাতুর ভদ্রলোক দেবীপ্রসন্ন রায়, যিনি প্রবল ভাবাবেগে বক্তৃতা করে থাকেন, বয়স ৬০-এর মত, কোন একটি পত্রিকার সম্পাদক, তাঁকে ধ্বংস করতে সরকার ইচ্ছুক। তদানুযায়ী তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারণ তিনি এক মুসলমানের লেখা কয়েক বছরের পুরোনো একটি বই ছেপেছেন। নামটা মনে হচ্ছে 'অনল ভারত' কথাটার মানে আমি জানি না। তরুণতর ব্যক্তিও গ্রেপ্তার। সেইসূত্রে প্রেসের কথিত অফিসে হানা। সাম্প্রতিক 'যুগান্তর' বাজেয়াপ্ত, সম্পাদকদের কেউ কেউ গ্রেপ্তার।

...অবশ্য তুমি বুঝবে বর্তমানে গোপন প্রেসের তুল্য পবিত্র ধর্মযুদ্ধের অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না।

...কিচনারের পতন হয়েছে। একটি ঐতিহাসিক পতনের তুল্য ব্যাপার— অ্যাফিলিস নিজের শিবিরে বসে গুমরাচ্ছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে, যদি ইংলণ্ড সত্যই যেভাবেই হোক কসাইদের ও কসাইবৃত্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করার জীবন থেকে নিবৃত্ত হয়!

ভাইসরয় হয়ে চার্লস হার্ডিঞ্জ আসছেন, সংবাদপত্রে তাঁর ছবি দেখলাম। তোমাকে বলি, যখন হার্ডিঞ্জের শাসন শুরু হবে, তখন আমাদের সকলের বিরুদ্ধে এ সকল গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা আরও কঠোর হবে। ঐ ইস্পাতের জাঁতিকল মুখ এবং রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়!

...মনে হচ্ছে, তিনি এই সকল দমন ও উৎপীড়ন বাড়িয়ে চলবেন। চার ঘোড়ার গাড়িচড়া নিরেট লৌহকঠিন ওহেন চেহারা! ঐ চেহারা অবশ্যই সক্রিয় হবে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নয়, জনগণের বিরুদ্ধে।

২৮শে জুলাই ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

আমার সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্রুর শত্রুকে জানো? তোমার বান্ধবী কর্ণেলিয়া। সে একেবারে গোয়েন্দা বিভাগের চর। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্ররোচনা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি, তাতে তোমারই নিরাপত্তা। যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, সে আমার ঘোর শত্রু। সে আবার আমার সঙ্গে পরিচয়ের গর্ব করে। অপরপক্ষে আমি মোলায়েম বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা খোলাখুলি শত্রুতা পেতেই চাইবো। ওঃ য়ুম, সে সত্যই-নীচ ঘৃণ্য। ভালকথা, তুমি যে আমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলে এবং লণ্ডনে সে আমাকে চিঠি লিখেছিল, সেগুলি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, নচেৎ আমি সোজা তার খপ্পরে ঢুকে যেতাম। তার পক্ষে সারাক্ষণ কত কথা শুনতে হচ্ছে। সুতরাং তুমিই বাঁচিয়ে দিয়েছ। মনে হয়, কিছুদিন আগে তোমাকে বলেছি, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা কিংবা সি. আই. ডি. বিভাগের ডেনহ্যাম আমাকে এই ধারণার দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন, আমি সকল ডাকাতির মূল প্রেরণা উৎস। মনে হয় না এমন কেউ, এমন কি তিনিও কথাটা সত্য মনে করেন। এর মানে আমার ধারণা তারা আমাকে দমন করবেন যদি পারেন।

২৮শে জুলাই ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

সংবাদপত্রগুলি চুপ। তাদের শিরোনামাগুলিও সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রিত আকারে ছাপতে হবে! দেশ কিন্তু দুঃখে পূর্ণ। কেবল কলকাতাতেই গত ১৩/১৪ দিনের মধ্যে প্রায় ২০ জন গ্রেপ্তার, ডাকাতি ও রাজদ্রোহের অভিযোগে। তাদের কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকারের মনের জ্বালার প্রশমনের জন্য। কিন্তু একবার গলার উপরে থেকে পেষনের হাত তুলে নাও, দেখবে বাক্যে ও রচনায় কোন নির্গমন। ওরা কি ভাবে— চিন্তা রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেহেতু শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

ভ্রমণ অর্থে, উপলব্ধি কর কর্মক্ষেত্র থেকে সাময়িক বিশ্রাম। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সে সময়টা মানসিক বিশ্রাম নয়, শান্ত পরিবেশে মনের খাদ্য সঞ্চয়, চিন্তা স্ফুরণের অবকাশ মাত্র! নিবেদিতা বছরে দু'বার পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন— নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনটাকে রাঙিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে; নির্জনে, কর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য। তাই উভয় চিন্তাশীল ব্যক্তি জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা একযোগে ভ্রমণে বেরুতেন, নির্জনে কাজের পরিবেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য নির্জনে বসে, পর্য্যালোচনা ও রচনার শক্তি-সঞ্চয়।

তাঁদের যাবতীয় কাজ পাহাড়ের নির্জন পরিবেশে রচিত হয়েছে— গ্রন্থের আকারে। ল্যাবরেটারীতে বসে পরীক্ষা, শান্ত পরিবেশে তার স্বরূপ প্রকাশনের ব্যবস্থা— এটাই ছিল তাঁদের উভয়ের ভ্রমণের উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিল স্বদেশবাসী ও স্বদেশকে পরিপূর্ণরূপে অবগত হওয়ার অবকাশ।

বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত এদেশ। প্রত্যেকের ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন তাদের ভাষা, চিন্তার বিকাশও সেরূপ, অথচ গ্রথিত তারা একই সূত্রে। ধর্ম সেই সূত্র। সত্যের বিকাশ ঘটেছে সেখানে—উপলব্ধির বিভিন্ন রূপরেখায়।

কেদার বদরীনাথ ভ্রমণের ইচ্ছা বহুদিনের। এবার সফল হল তা। যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন দুটি রচনায় তা প্রকাশ করলেন। (১) The Ancient Abbey of Ajanta এবং Elephantas, (২) The Synthesis of Hinduism চলার পথে মিস ম্যাকলাউডকে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন; ২৫শে মে, ১৯১০ : রুদ্রপ্রয়াগ থেকে যাত্রাটি যথার্থই তীর্থ যাত্রা। সর্বসাধারণের জায়গাতেই আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে তিনরাত্রি ডাকবাংলোতে। সুতরাং কল্পনা করে নাও। বসুরা একেবারে অপূর্ব। এত সহজে সন্তুষ্ট তারা, যে কোন জিনিসের সেরা রূপ দেখতে প্রস্তুত এবং ধর্ম জীবনের অভিব্যক্তিতে আগ্রহী।এই উত্তপ্ত নদী-উপত্যকায় বিপদও যথেষ্ট।

বদরীনারায়ণের পথে ১২ই জুন ১৯১০, বোন মিসেস উইলসনকে জানালেন : এই যাত্রাটি কি রকম হয়েছে তা তুমি ভাবতে পারবে না। আমাদের সমস্ত শক্তি তা হরণ করে নিয়েছে। গত ৭/৮ দিন ধরে বেচারা মিসেস বসু অসুস্থ। হরিদ্বার নামক মনোরম এক ক্ষুদ্র শহর থেকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ করে ছিলাম এবং অন্য তীর্থ যাত্রীর মত এদের পথ অনুসরণ করে পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করলাম। প্রথমে কেদারনাথ দর্শন করতে হয়। যাত্রার যে অংশ সমাপ্ত হয়েছে। এটাই কঠিনতম যাত্রা। এখন বদরীনারায়ণের তুষার অভিমুখে।

প্রথমে আমরা এমন একটা রাস্তা ধরে গিয়েছি যেখানে ইউরোপীয় বা তাদের ভাবানুরূপ মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থাদি নেই। রাতের পর রাত মুসাফিরদের সরাইখানায় কাটিয়েছি, ঠিক বেথলিহামের মত এবং এধরনের অবস্থানের চরম অভিজ্ঞতা ঘটেছিল যখন পার্শ্ববর্তী এক বিরাট মঠে আতিথ্য নিয়েছিলাম। আমাদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দানের লক্ষণরূপে একটি ঘোড়াকে তার আস্তাবল থেকে বিতাড়ন করে, সেখানে মিসেস বসু ও আমার স্নানাগার করে দেওয়া হল। কিন্তু কয়েক ঘন্টা কি দু'ঘণ্টা পরে যখন আমি হাত ধোয়ার জন্য গেলাম, তখন চমৎকৃত হয়ে দেখি অশ্ববরকেতার স্বস্থানে পুণঃ প্রত্যাবর্তন করে ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে। ...আমাদের যাত্রার এই অংশটি কি অচিন্তনীয়ভাবে পুরাকালীন! এখন আমরা তিব্বতের অভিমুখীন সামরিক পথে এবং প্রতি পদক্ষেপে থাকবার স্বাচ্ছন্দতা পাচ্ছি। ...সারাপথ অতি অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং অসাধারণ কষ্ট স্বীকারের উপযুক্ত পথ। এখন দিনের পরদিন চলেছি। রাঙা গিরিপথের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে পাতলা পাইন বন, তাছাড়া আর কোন গাছ নেই। ধূমলবর্ণ গিরিসঙ্কট— উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বা কাম্বারল্যাণ্ডের তটভূমির মত। আহা—অপূর্ব যেন দেবতাদের বিহারের স্থান। মিঃ র‍্যাটেলের নাছোড় তাগিদে আমি তাঁদের ও তোমার জন্য ছোট ডায়েরী রাখছি। কিন্তু তার থেকে তোমরা বিশেষ কিছু পাবে বলে মনে হয় না। কারণ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধে এমন কৌশল অবলম্বন করেছি, যার অর্থ কেবল আমার কাছেই স্পষ্ট নিজস্বভাবে। সেগুলি কিছুই নয়।

১২ই জুন ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমরা বদরীনারায়ণের পথে। দৃশ্যাবলী অপরূপ। কিন্তু যাত্রার অসুবিধা সবিশেষ। মিসেস বসু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তবু আমরা থামিনি, মনে ধরে রেখেছি অমরনাথের মহাস্মৃতি।

২৯শে জুন ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আমাদের অপূর্ব তীর্থযাত্রা সমাপ্ত। স্বামীজি নিশ্চয় চাইতেন : আমরা এই তীর্থযাত্রা করি। আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে কে জানে, কিন্তু আমরা এ এক অমর সম্পদ এমনকি খোকা পর্যন্ত তার মহিমা মেনে নিয়েছে। ভালভাবে নামছি—কী স্বস্তি।

এই ভ্রমণের অনুভূতি ছিল এক। লিখলেন প্রবন্ধে : কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের পথে কোন এক জায়গায় যেতে বসেছি— দলের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠলেন, ভেবে দেখ, এখান থেকে মানস সরোবর মাত্র দশ বারো দিনের পথ। এসব জায়গাটাই কৈলাশ! আমরা কৈ-লা-সে? সত্যই তাই। সেই পরম কাম্যলোকে প্রবেশ করছি প্রাচীন ঐতিহাসিক পথ বেয়ে। ক্ষুদ্র অথচ অবর্ণনীয় সুন্দর বারানসী তুল্য হরিদ্বার থেকে যাত্রা করে হৃষীকেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পায়ে পায়ে আমরা স্তরে স্তরে ভারতের সর্বস্থানের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছি এক পূণ্যভূমি থেকে অন্য পুণ্যভূমিতে, অবশেষে পৌঁচেছি সর্বতীর্থ সার কেদারনাথে, সেখান থেকে এখন চলেছি বদরীনারায়ণের পথে। সেখান থেকে ফিরে নামবো আমাদের সাধারণ জীবনে আমাদের সমতলের গৃহে, আমাদের প্রতিদিনের কাজে। অপূর্ব কথা কটি: আমরা অবস্থান করছি কৈলাসে! স্তব্ধ হয়ে রইলাম কয়েক মূহূর্ত। তাদের অর্থ ঘনালো মনের গহনে। পাইন ও দেওদারের মধ্যে বসে আছি, তলায় পার্বত্য কুসুমরাজি, পিছনে কালপ্রাচীন তীর্থভূমি, সামনেও তাই, মনে হল: কৈলাশ! হতে পারে! অসম্ভব কি?

এই তীর্থ যাত্রা থেকে প্রথম যে ভাবাটি জাগে, তা হল ভারতের সুগভীর ঐকবোধ। পথযাত্রীদের মধ্যে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, মালাবার, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বাংলার মানুষেরা আছেন, প্রতিক্ষণে তাদের দেখি, অতিক্রম করে যাচ্ছি। শুধু এইজন্যই ঐক্যবোধ করছি না, অধিকন্তু এই ব্যাপারটি আমাদের সামনে রয়েছে এই উত্তর তীর্থের মহান পূজারী ব্রাহ্মণ, মোহন্তরা সবাই দক্ষিণী। বদরী নারায়ণের পথে পাওয়া পর্যন্ত দক্ষিণদেশের লোক। কেদারের ক্ষেত্রে পাণ্ডাদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি যেভাবেই হোক, বর্তমানে তাঁরা একেবারে স্থানীয় অধিবাসী।... কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ বা অন্যান্য পূণ্যস্থানের মোহন্ত বা রাহুলেরা তাঁদের উত্তরাধিকারী দক্ষিণদেশ থেকে মনোনীত করতে বাধ্য। এইভাবেই আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে জীবন্ত রাখা হয়েছে গত হাজার বছর ধরে, যা সর্বদাই ভারতের অতি প্রান্তদেশ সমূহ্ থেকে উত্থিত ও প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমে মগধ, তারপর দ্রাবিড়দেশ থেকে তরঙ্গ উঠে ভাসিয়ে দিয়েছে হিমালয়কে। সেইসঙ্গে এও প্রমাণিত হয়েছে, মাতৃভূমি সত্যই এক, উত্তর দক্ষিণ অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, জাতিগত, ভাবগত বা রাজনৈতিক খণ্ডরূপের কোন কাহিনী কখনই সম্পূর্ণ ভারত কাহিনী হবে না।... কোন ভারতীয়ের কাছেও যদি তিনি তীর্থযাত্রা না করে থাকেন, এই পথের জীবন উদ্ঘাটিত করে দেবে নতুন আলোকে। ভারতের নারীর স্থান ও নারী জীবনের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কে?... পথে চলতে চলতে দেখি কখনও একাকী, কখনো জোড়ায়; কখনো দশ-বিশ বা তারও বেশী সার দেওয়া নারীর দলকে, তার মধ্যে তরুণী থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই আছেন। তাঁদের আচরণে একে বারে অহেতুক লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। কখনও দেখা যায়, কেউ হয়ত কিছুটা দলছাড়া হয়ে পড়েছেন, হাতে জপমালা নিয়ে মগ্ন হয়ে পথ হাঁটছেন। কখনও আবার এক বৃদ্ধাকে দেখলাম, তিনি যেন কোন দলেরই নন একাকী। সবাই আনন্দময়; দেশজ-রীতি অনুযায়ী সবাই প্রায় অলঙ্কার পরে আছে। মনে হচ্ছে: উৎসবের, আনন্দের ছড়ানো পরিবেশ— সবাই সবাইকে চেনে। পরিচিত, পৃথিবীর আড়ষ্ট, ক্ষুদ্রতা এখানে নেই, দেখা হলেই সবাই কথা বলে, নারী হোক, পুরুষ হোক, বলে ওঠে 'জয় কেদারনাথ স্বামী কি জয়'! কিংবা 'জয় বদরীবিশাল কি জয়।' প্রতি সম্বোধনের জয়ধ্বনিতে, সে মাধুর্য্য তা আলোকের ঝলক ওঠে, তা বর্ণনাতীত।... প্রাচ্য অভিবাদনের সৌকুমর্য্য লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে। হয় কেউ চলেছেন জপমাথা ফেরাতে ফেরাতে, হয়ত চান না নিজের মৌনভঙ্গ করতে, এসব ক্ষেত্রে কী না মর্যাদা ও মিষ্টি, তার সঙ্গে তিনি ঈষৎ নত হয়ে সেই অভিবাদনকে গ্রহণ করছেন।

শুষ্ক নদীখাতের উপরকার সুবৃহৎ পাথরগুলির উপর দিয়ে কঠিন পথ ভেঙে উঠবার সময়ে দুই বৃদ্ধাকে দেখলাম— তারা প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়া অথর্ব, বদরীনারায়ণ

দর্শন করে তাঁরা নামছেন। ভয়ঙ্কর পথ একজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন, আমরা এগিয়ে গেলাম সাহায্যের জন্য। আমাদের শিউরে ওঠা চীৎকারের উত্তরে : তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন— বিজয়ের আনন্দ সে ভঙ্গিতে— সাহায্যের দরকার কী? নারায়ণ কি পথ দেখাচ্ছেন না? তিনি যখন দর্শন দিয়েছেন— এ সবে কী এসে যায়?...

যাদের যাত্রা আরম্ভ হরিদ্বারে, তারা কি সুখী! চন্দ্রালোকিত রাত্রে, যাত্রীরা বেরিয়ে পড়ে পাণ্ডাদের সঙ্গে নিয়ে, গান গাইতে গাইতে চলে পথ— আর আহা, গঙ্গার সেই সন্ধ্যারতি! ব্রহ্মকুণ্ডের অর্ধচন্দ্রাকার সিঁড়ির শেষ ধাপে, ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুরোহিত দীপাধার দোলাতে থাকেন, শতদীপ জ্বলে একসঙ্গে, সেটিকে দেখায় ছোট আলোক তরুর মত। পিছনে, তাঁর পূজার্থীর দল, প্রধানত তাঁরা নারী; তাঁর সামনে সেতু ও অর্ধচন্দ্রাকারে দ্বীপের উপরে, যাঁরা বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের নানা বেশবাস, নানা আকারে আঁকা প্রদেশের চিহ্ন— গভীর স্তব্ধ— যতক্ষণ পুরোহিতের পূজারীতি চলছিল— শেষ হওয়ামাত্র উত্তাল হয়ে উঠলো, মন্ত্রগানে। সমবেত সে সঙ্গীতের তরঙ্গদল আছড়ে পড়তে লাগলো— ক্রমান্বয়ে, একের উত্তরে যেন, আর একটি গঙ্গার মহিমার অপূর্ব সঙ্গীতে। দূরে বিস্তৃত সবুজ ভুখণ্ড, বনরাজি নীল বন্ধুরতা— উপরে নেমেছে সন্ধ্যার আবছা কুয়াশার অঞ্চল— সমস্ত পরিবেশ— অপূর্ব এক পূজার পরিবেশ!...

কেদারনাথ এখন আটমাইল দূরে। শেষ দিনের পথ ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ শেষ চার মাইল খাড়া চড়াইয়ের অংশটুকু। জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়; কিন্তু ওঠার কষ্টও নিদারুণ। যন্ত্রনা কঠিন সিঁড়ির মত পথ, জীবনযন্ত্রণার মতই! পাণ্ডা কষ্টহাসির সঙ্গে জানালেনঃ স্বর্গের সিঁড়ি! সবই কিন্তু মন থেকে মুছে গেল, যখন অবশেষে উচ্চ অধিত্যকায় পৌঁছলাম। অনুভব করলামঃ কেদারনাথের এলাকার কাছাকাছি এসে গেছি এখন। তৃণাচ্ছাদিত বিশাল অধিত্যকা, কুসুমাস্তীর্ণ, মুঘল শিল্পীর আঁকা বেহস্তের ছবির মত। প্রতি পদক্ষেপে যাত্রীদের অতিক্রম করে যাচ্ছি বা অতিক্রম করে যাচ্ছেন তাঁরা। সমবেত ব্যাকুলতার রূপকে ভাষায় ফোটানো সম্ভব নয়।

অবশেষে সেই মুহূর্তটি দেখা গেছে মন্দির— বুকচিরে যেন আবেগধ্বনি বেরিয়ে এলো— আমাদের বাহকদলের, অন্যান্য সকলের।... সোমবার পৌঁছবার জন্য অশেষ চেষ্টা করেছিলাম— শিবের দিনে মন্দির দর্শন মহাপুণ্যের কাজ। কিন্তু হাজির হলাম দুপুরে। সন্ধ্যারতির পূর্বে মন্দির আর খুলবে না। বিকাল গড়িয়ে এলো, পাহাড় থেকে নামলো নীলাভ কুয়াশা। ঢেকে দিল সবকিছু— তার মধ্য দিয়ে পথের ধারে বসে দেখছি ধুসর কম্বলে ঢাকা সাধুদের অস্পষ্ট আকারগুলি, এপাশ ওপাশ করছে বন্ধদ্বারের সামনে। সহসা ডাক দেওয়া হলঃ আরতি হবে, দেখতে এসো তোমরা! অন্ধকার নেমেছে, কুয়াশা সরে গেছে, তারকা জ্বলজ্বল করছে। ঝলমলে আলো ও ঘন্টার ধ্বনিতে পূর্ণ মন্দির। বাইরে উৎসুক যাত্রীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছি তা। আরতিদ্বীপের শেষ দোলাটুকু যেমন থামলো, উন্মুখ যাত্রীদের 'আকুতি ধ্বনি' ছড়িয়ে পড়লো উচ্ছ্বসিত হয়ে। সে কী দৃশ্য— পথ করে দাও, পথ করে দাও। সবাই এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে— রুদ্ধশ্বাসে ঝুঁকে পড়ে স্পর্শ করছে, জড়িয়ে ধরতে চাইছে প্রতীক পর্বত খণ্ডটিকে। আসছে, আসছে, মানুষ আসছে! জীবনের পরমতম দৃশ্য দেখলাম সেখানে, সিঁড়ির উপরে নিকষ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে, ধেয়ে যাওয়া যাত্রীতরঙ্গের সেই ছবিটুকু!

মনে হল সমস্ত ভারতবর্ষ যেন পরম একের সামনে নত শায়িত কেদারনাথ, যে অদ্বৈত্যের শিখর। সমস্ত ভারতের সকল স্থান থেকে, সকল পথ বেয়ে, মানুষ যেন আসছে, কাড়াকাড়ি করে এগিয়ে এসেছে কেন— কিসের জন্য? আর কোন কারণে নয়— ঈশ্বরকে স্পর্শ করবে তারা।...

দ্বিতীয় দিনে এক বৃদ্ধ এলেন, দীর্ঘদিনের অসুস্থ— দর্শন করলেন কেদারনাথকে। ব্যস্ত হয়ে পূজা শেষ করছেন— পাছে পূজা শেষের আগেই, তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়। সবে পূজা শেষ,

প্রার্থণার শেষ শব্দটি ঠোঁটের কোন, সাফল্যের সুখাবেশ জড়িয়ে এখনো— তারও যুদ্ধ শেষ। প্রভাতের সোনার আলোয়, বাতাসে সুদীর্ঘ কয়েকটি নিঃশ্বাস, ব্যাকুলতায় মুক্ত হয়ে গেল আত্মা। মহাদেবের আশীর্বাদ ভক্তের প্রতি। এমনই করুণার স্পর্শ তার আত্মজনের উপরে।

৬ই জুলাই ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

লেফটন্যান্ট গভর্নর বেকার, আপাততঃ দৃঢ়চরিত্র মনে হলেও, বস্তুতপক্ষে একটি আকাট বর্ব্বর। কথিতঃ যে প্রচুর মদ টেনে এক সরকারী নাচের আসরে, বর্ধমানের মহারাণীর প্রতি অতি কামার্ত্তের আচরণ করেছেন। মহারাণীর স্বামী একেবারে কাপুরুষ— ডুয়েল না লড়ে ঐ বিষয়ে শুধু মৌখিব অভিযোগ জানিয়েছে। আঃ ধিক! জঘন্য সেই পুরুষ, যে জানে না কোন সময়ে খুন করতে হয়!

...পুলিশ আইন নিয়ে দেশ হতভম্ব। তীর্থযাত্রী এক বৃদ্ধাকে ২৪ ঘন্টা আটক রাখা হয়েছিল; কারণ তিনি তাঁর গ্রামের নাম, বা কিভাবে সেখানে যেতে হয় (লক্ষ্ণৌ গাড়ী বদল করে আরও ৮ মাইল এগিয়ে ইত্যাদি) বলতে পারলেও জেলার নাম বা পুলিশের বড় থানার নাম বলতে পারেনি। আমি সেখানে থাকলে অবশ্য ব্যাপারটা পুলিশের পক্ষে মঙ্গলজনক হত না। আমাদের একজন সন্ন্যাসী ওখানে ঘন্টাখানেক বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। যাইহোক, এই ধরনের জিনিস নিশ্চয় সর্বত্র ঘটছে।

১৩ই জুলাই ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

কিভাবে প্রেসের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, তা ধারনাই করতে পারবে না। হাড়ে হাড়ে রুশীয় কাণ্ড। ভাবতেই পারবে না, কিভাবে মানুষকে বিনা বিচারে, মাসের পর মাস জেলে আটকে রাখা হচ্ছে— তারপর কোন প্রমাণ নেই বলে— খালাস!

গতরাত্রে শুনলাম, কে-কে এম-কৃষ্ণকুমার মিত্র, ও-অন্যান্যরা পার্টিশন, স্বদেশী সংক্রান্ত মিটিং করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মিটিং ভেঙে দেওয়া হবে— সকলকে রাস্তায় ঠেলে দেওয়া হবে— যেখানে বক্তৃতাদি হবে— ফল, নেতারা গ্রেপ্তার। আসল কথাটা তুমি নিশ্চয় জানো— এখানকার কর্তৃপক্ষ রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য যেসব ক্ষমতা পেয়েছে, সেগুলিকে অসৎভাবে প্রয়োগ করছে— তা করছে সেই সকল মানুষের ধ্বংসকার্যে, যাঁরা স্বদেশী শিল্পের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলে পরিচিত। বহুজনকে ইতিমধ্যে ধ্বংস করা হয়েছে।

১৯/২০ জুলাই ১৯১০ তারিখে পুণরায় পত্র দিলেন মিঃ র‍্যাটক্লিফকে: দেখতেই পাচ্ছ, সরকার দেশকে রীতিমত যুদ্ধের অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। যখন আমরা একত্র হই, তখন হাসাহাসি করি— কিন্তু একথাও জানি, কেউ বলতে পারবে না, পরের পালা কার? তবে বিশ্বাস করি যে, আমরা তখনো হাসতে পারবো!

২৮শে জুলাই ১৯১০, লিখলেন মিঃ র‍্যাটক্লিফকে :

একটিক্ষেত্রে সংবাদপত্রের বিবরণে যাচ্ছি, পুলিশ রূপোর গহনা তুলে নিয়ে গেছে। এখন, রূপোর গহনা ডাকাতির জিনিষ হতে পারে না, কেননা তাদের দাম সামান্যই। সেগুলি স্পষ্টতই পারিবারিক অলঙ্কার। এই দরিদ্র লোকগুলির পক্ষে তাদের পারিবারিক অলঙ্কারের দর্শন ফিরে পেতে বহু বৎসর কেটে যাবে।

গত সপ্তাহে মেদিনীপুর জেলার প্রায় ১০০ তাঁতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে— যেহেতু তারা শাড়ীর পাড়ে একটি বিশেষ গান বুনেছিল। এই কাজটা রাজদ্রোহকর বস্তু, মুদ্রণের তুল্য। এ ব্যাপারে এমন অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে— যারা অশিক্ষিত, বুনেনের গানটির মানেই জানে না। গানটি তোমার

জন্য জোগাড় করার চেষ্টা করছি। সেটি নিশ্চয় দেখিয়ে দেবে— এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ, কী প্রকার মন্দ কাণ্ড। তুমি তখন প্রশ্ন করতে পারবে— ১০০ লোককে বিনা কারণে হাজতে রাখার কারণ কি? বস্তুত পক্ষে পুলিশ চায়, তাঁতীদের কেউ কেউ তাদের খদ্দেরদের বিষয়ে খবরাখবর দেবে। কিংবা শপথসহ পুলিশের সাজানো সংবাদে সায় দেবে। ব্যাপারটি সম্বন্ধে এইরকম ধারণাই করা হচ্ছে। এই বিশেষ কেসটির বিষয়ে, খুঁটিনাটি সংবাদ তোমার জন্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি, যাতে তুমি প্রশ্ন করতে পারো। আমার তরুণ সংবাদদাতা, আমাকে সংবাদ দেবার সময়ে এইবলে শুরু করেছিল— আমি মিঃ র‍্যাটক্লিফের জন্য একটি স্পষ্ট কাহিনী সংগ্রহের চেষ্টা করছি।

মনে করো না, আমি শুধু অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরছি। আমি কেবল যা ঘটছে, তাদের কয়েকটি কুটোর হিসাব দিচ্ছি। তুমি এখানে থাকলে, ওরা তোমাকে জেলে পুরতোই। কেননা তুমি ওদের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে উঠতে।

শুনলাম, এবছর আগে কৃষ্ণনগর ডাকাতি বলে কথিত ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে ১২টি ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর থেকে তাদের বিচার হয়নি, তাদের কোন খবরই জানা যায়নি। কেউ জানে না, তাঁরা বেঁচে আছে কি নিকেশ হয়ে গেছে।

২রা আগস্ট ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : তোমাকে কি বলেছি— প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিনস কয়েক সপ্তাহ আগে চিত্তকে বলেছেন যে, তাঁর নির্বাসনের সমস্ত ব্যবস্থাই হয়ে গিয়েছিল, হতে পারেনি কেবল তাঁর হস্তক্ষেপে? এধরণের জিনিস আপাততঃ অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা জেনকিনসকে বিশ্বাস না করে পারি না। নির্বাসনের কারণ? ওরা দেখতে পেয়েছে (চিত্তর চিঠি খুলে পড়ে) যে, চিত্ত কিছু লোককে টাকা পাঠিয়েছে, যাদের গায়ে মন্দ গন্ধ!

৪ঠা আগস্ট আগস্ট ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

আজ তোমাকে অল্পই লেখবার আছে। আইনের হস্ত উত্তরোত্তর দীর্ঘ। তোমাকে খুঁটিনাটি বলার প্রয়োজন নেই। বলাবলি হচ্ছে, মিউটিনির ২৫ বছর পরে, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আদালতে বিচার শুরু হয়েছে— লোকজনকে ধারাবাহিকভাবে ধরপাকড় করা হচ্ছে। এ এমন একটা পর্ব, যার কথা ইতিহাস কদাপি লেখে না, কিন্তু তা মুদ্রিত থাকে জাতির স্মৃতিতে, যেমন আয়ারল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলের কথা। শাসক-জাতির দীর্ঘ ধীর প্রতিহিংসা— তারই নাম, তার আইন ব্যবস্থা।

১০ই আগস্ট ১৯১০ লিখলেন মিঃ র‍্যাটক্লিফকে :

বর্তমান অবস্থার সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ— স্তব্ধতা। সংবাদপত্রের কণ্ঠপীড়ন এমনভাবে করা হয়েছে, যার তুল্য কিছু কোন সভ্য-দেশে পাওয়া যাবে না। সকল জনসভা নিষিদ্ধ। 'সিডিশাস মিটিংস' অ্যাক্ট, সদ্য সিমলায় প্রেরিত।... বেকার গতকাল ৭ তারিখে সভাসমিতি, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। প্রতিদিন গ্রেপ্তার, খানাতল্লাশ, ধৃতদের উপর উৎপীড়ন— যাতে তারা ইনফরমার হয়। এইভাবে প্রদত্ত, বেশীরভাগ সংবাদই অসার। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে তা কম গুরুতর নয়— তাঁদের বিচারের কাঠগড়ায় তুলবার নাম করে, নাগাড় আটক রাখা হয়, তারপর, যতদূর জানি গোপনে বিচার সমাধা করে ফেলা হয়— আইনজীবী বা সাক্ষীর উপস্থিত ছাড়াই!!!

এইসকল দৃঢ় নির্ধারিত পলিসি, 'স্বদেশী'কে ধ্বংস করার জন্যই।... বর্তমান শাসনের চেয়ে 'সিক্রেট টেন'-এর 'ইনকুয়িজিশন' অধিক নিপীড়নমূলক ছিল না। কোন অপছন্দের নাম বা কর্মযোগীনের কোন সংখ্যা— এদের যে কোন একটি কারও কাছে থাকলেই, তাকে বিচারকের সামনে টেনে আনার বা বিচারের উদ্দেশ্যে কারাগারে ঠেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একবার ভেবে দ্যাখো— আমরা এই সব জিনিসের মধ্যে বাস করছি। রাশিয়া কিংবা টিউডরদের রাজ্যকাল!!

১০ই অগস্ট ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

পুলিশ ডিটেকটিভ শশীভূষণ দে ৭ই রবিবার ভোরে মারা গেছে। তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি ক্রিস্টীনকে জিজ্ঞাসা করো। পুনশ্চ সেই ট্রাজিক নিয়তি। নির্ধারিত সর্বনাশের দিন।

...সরকার তার রিকর্ম স্কীমের দ্বারা কিভাবে দুরস্ত হয়েছে, তার কথা তুমি বলেছ। বস্তুত কেবল কাগজে কলমে সে দুরস্ত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না— সরকার সেটুকু বদলেছে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি তোমাকে সময়ে সময়ে যেসব সংবাদ পেয়েছি, তা জানিয়ে গেছি। তুমি জেনেছ যে, এস. পি. সিনহা দেখেছেন কিভাবে তাঁকে আসল জায়গা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। যে কোন শক্ত কমিটি সহজেই এ জিনিস করতে পারে— সামাজিক সম্পর্কের বৈষম্যকে নীতিহীন ভাবে ব্যবহার করে, কোন একজন সদস্যকে তা একেবারে অকেজো করে দিতে পারে।

২৫শে আগস্ট ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

I have been almost writing to you this week. Explain laboratory prince. I have asked my Journalistic friend to come and talk to you about it. It flashed across me one night at the Holy Mothers' evening service that the recent visitor at Hinching broke ought to be interested is the scheme by you or George. We have not been able to write to him about it. though we have tried because of the insecurity even of the registered post. I am more and more anxious that it should been a separate Building of its own and not merely in a broken and modified version of the family have! That was to have a source of income, but now owing to difficulty of buying land closely, it will be sacrificed in October, if Mother gives no definite heading in time to stop this. We want 3 things in building (1) Good working resources. (2) And equally insportant, a good lacture.

(3) A litarary and museum for all sorts of collections, instruments etc. and study. About this we need not. It is provided, I think it the rest is talk. Also garden for specimens. All this is private India context.

২৫শে আগস্ট ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

আশুতোষ বিশ্বাস বা শ্যামসুল আলমের শত্রুতা-নীতির সঙ্গে আর একজনের নাম করা যায়। ইনি আইনজীবী পি. এল. রায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জেলে পুরবার মতলব করেছিলেন ইনি। কেবল প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিনসের দৃঢ়তায়, সে বিষয়ে কিছুটা সমঝে গেছেন।... গত সপ্তাহের চাঞ্চল্যের বস্তু হল— ঢাকায় আদালতে সরকারী পক্ষে পি. এল. রায় দু'দিন ব্যাপী বক্তৃতায় কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে আক্রমণ করেছে। পতাকা বিষয়েও বলেছে— একথা আমায় জানানো হলে, তার বক্তৃতা পড়ে দেখলাম— সেটা সত্য নয়। তবু লোকটি একেবারে বেপরোয়া। সুধাংশু বলে, তার কোন বুদ্ধি নেই, জানে না কী করছে। সবাই বিবর্ণ মুখে তার বক্তৃতা পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন— সে মৃত্যু টেনে আনছে। পি. এল. রায়ের নিজের গোপন ব্যক্তিগত ইতিহাস চিত্তাকর্ষক। যা ছাপার অক্ষরে পড়লে সে দগ্ধাবে। সেটি সদ্য আমি পড়েছি।

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : ঢাকা মামলা সম্বন্ধে, ইতিপূর্বে যে সংবাদ পাঠিয়েছি, তার সংশোধনে বলা যায়— ঢাকা থেকে পাঠানো টেলিগ্রামের প্রভাবে তুমিও সব কথা লিখেছ। ওয়াকিবহাল মহল কিন্তু বলেন যে, সরকারপক্ষ নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারবে না এবং তাদের পক্ষে মামলাটা মন্দই দাঁড়াবে।

২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯১০, বোন মিসেস উইলসনকে লিখলেন : কতকগুলি পুরানো ডায়েরী তোমার কাছে পাঠাবার কথা ভাবছি। সেগুলি অপরাপর ডায়েরীর সঙ্গে রেখে দেবে। মিন্টোরা চলে যাবার আগে, যদি এইসব কাগজপত্র তোমার হাতে পৌঁছে যায়। তাহলে কিছুটা স্বস্তি পাবো যদি কিছু সত্যই ঘটে, তাহলে আমি চাইবো, ওরা অন্যদের নয়, তোমাকেই বা ডঃ বসু বা কৃষ্টিনকে খানাতল্লাশ করুক।

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ভাবন ও সাজানোর শক্তিতে, শ্যামসুল আলম সরকার পক্ষে অমূল্য ব্যাপার— এক্ষেত্রে তার স্থান পূরণ করা সম্ভব নয়। উচ্চতর ক্ষেত্রে, আশুতোষ বিশ্বাসের বিষয়ে, একই কথা সত্য— একথা বলা যায়। বিশ্বাসকে আলিপুরে গুলি করে মারা হয়।

...যদি কখনো আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে যাই, সেজন্য আমার কোন বন্ধুর দুঃখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ আমি অবিলম্বে ধ্যান শুরু করে দেব— চেষ্টা করবো, সেই অপূর্ব শিখরে উত্থিত হতে। যেখানে হোলি মাদার শ্রীমা সর্বদা অবস্থান করেন। তাঁর তুল্য মধুরিমা ও নির্মল প্রশান্তি কল্পনাও করা যায় না। সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার গভীরতা ও স্নিগ্ধ স্নেহ। (ইতিপূর্বে তাঁকে ২৫শে অগস্ট ১৯১০ তারিখের চিঠিতে তাঁর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন।)

মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকীয় নোটে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলেন: সতেন্দ্রপ্রসন্ন'র বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের অনুচিত আলোচনার জবাবে। বলা হচ্ছে, আর্থিক ক্ষতির কারণে, উনি পদত্যাগ করছেন। উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। অ্যাসকুইথ হ্যালডেন, লয়েড জর্জের আদর্শ অনুসরণ করতে। তাঁরা ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও মন্ত্রীত্বাদি করেছেন। অথচ এই সকল উচ্চভাবাপন্ন সাংবাদিকের মাথায় কি এটা আসেনি যে, পূর্বোক্ত ইংরাজ ক্যাবিনেটের মিনিস্টারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এক দশমাংশের অধিকারী মিঃ এস, পি, সিনহা ছিলেন না? আমাদের তো মনে হয়, কোন ব্যক্তি, তামাশার জন্য রাজকীয় আয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কেননা— তা করার মধ্যে কোন গুণের পরিচয় নেই। শেষে মন্তব্য করলেন :

In spite of an authoritative contradiction, most people seem still inclined to think that there may be something is the allegation of the correspondent of the Manchester Guardian that Mr. Sinha has been obliged to recognise that he cannot expect to enter the inner circle of the Executive council of the Government of India.

Our own guess is that Mr. S. P. Sinha has been obliged to recognise that his usefulness to this country in his present position has not been and cannot under present circumstances be at all commensurate with to the sacrifice he has made. It may also be for some reason or other he feels like a fish out of water. We are not thought readers, nor are we in the confidence of Mr. Sinha, but when a guessing competition is on, why should we have not our chance.

September 22, 1910. to May Wilson :

I am thinking of sending you a few diaries to place with my others. I think I shall feel better if such papers are with you, before that Mintes go and if anything should happen, you would always know that I would rather you searched them than anyone also, unless it were Himself (Dr. Bose) on Xtine (Christine);

Again– it might someday happen that material was wanted for a biography of Himself (Dr. Bose). I have asked that £100 should be left by anyone (Sara C. Bull) or Jagadish Ch. Bose to Mr. Ratcliffe, for this purpose. It so, my diaries would be found full of material. Probably Xtine would be the only person who could pick out the references with absolute certainty.

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : শোনা যাচ্ছে, ঢাকা মামলা শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাবে। হাজির করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য সরকারের কাছে ছিল না। মিঃ পি. এল. রায়কে, যা করতে বলা হয়েছিল সে তার থেকে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে— মারাত্মক ত্রুটি। মেদিনীপুর মামলাই এখানে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে গৃহীত, অবশ্য নাসিক মামলাও রয়েছে।

গভীর বেদনা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে জানাচ্ছি : মিঃ পি. মিত্রের মৃত্যু হয়েছে। অবর্ণনীয় শোক আমার। কী বিরাট শক্তি, তিনি চলে গেলেন। (মিঃ পি. মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনায়। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের তিনি পিতামহ্। বার্দ্ধক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত সমান সক্রিয় থাকতে পারেন নি, কিন্তু আদর্শে ছিলেন অটল। (তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল নিবেদিতার।)

১৪ই অক্টোবর ১৯১০ তারিখে মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন: মিঃ পি. মিত্র মারা গেছেন উত্তেজনাতেই সম্ভবতঃ এই দেখে যে, তিনি ঢাকায় পি. এল. রায়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বলাবলি করা হচ্ছে, ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে। আমি নিজেই স্মরণ করতে পারি— পি. এল. রায় আমাকে বলেছিলেন— পি. মিত্র তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষ। সুতরাং স্পষ্টতঃই দু'জনের মধ্যে বিশেষ ভাববন্ধন ছিল। বোঝা গেছে যে, ঢাকা মামলার শেষে তাঁর (মিঃ মিত্র) ও রজত রায় নামক একটি বালকের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছিল।

... সম্প্রতি ম্যাক্সলিখিত একটি প্রবন্ধ পড়লাম: হার্ডিঞ্জের আমলে কী ঘটবে তার থেকে দেখতে পাচ্ছি, সিভিল সার্ভিসের তখন হবে বেপরোয়া বাড়বাড়ন্ত। মিন্টোর আমলে যত দুর্দৈবই ঘটুক, তুলনায় তিনি ছিলেন এঞ্জেল।

১৪ই অক্টোবর ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে জানালেন :

আমার আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। হার্ডিঞ্জ সত্যই শক্ত মানুষ, যিনি দুর্নীতিপরায়ন সরকারী কর্মচারীদের কঠোরভাবে শায়েস্তা করেন। বেকার, স্ন্যাক, হ্যালিডে সম্পর্কে তাঁর ব্যবস্থা উচ্চ পর্যায়ের ইংরাজ শাসকদের চরিত্র সংশোধনে সহায়তা করবে।

মিঃ চিরল তিরিশ বছর আগে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তখন ভারতীয় যুবকগণ ইংরাজী সাহিত্যে ও ইংরাজী চিন্তায় মগ্ন। অনেক উচ্চবর্ণের যুবক খ্রীষ্টান হয়ে পড়ছেন। ভারতে ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে। আবেদন, নিবেদন ও কর্ম্মের মধ্যে ইংরাজ গুণ-স্বমহিমার সুরের উচ্চতান। ব্রহ্মসমাজ ও সমাজ সংস্কারকরা নিজেদের 'বর্ব্বর অবস্থার' চিন্তায় উচ্চরব। ইংরাজকে পবিত্রতার প্রণামী দিয়ে চলেছে।

এরমধ্যে, ভারতবর্ষে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল। তখন মিঃ চিরল ভ্রমণ শেষে ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন। পরে আবার ভারতে এলেন। দেখলেন: এখানে শুরু হয়েছে ধর্ম আন্দোলন। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ভারত সম্বন্ধে, শাসক-সম্প্রদায় প্রচার করে এসেছেন এতদিন : তারা পশ্চাতপদ-জাতির দেশ। তাদের সভ্য করে তোলার দায়িত্ব ইংরাজদের। মিঃ চিরলও সেই জাতের সমর্থক, বিশেষ করে, ইংরাজ শাসন ও শোষণের গোঁড়া সমর্থক তিনি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের প্রতিক্রিয়া দেখে, তিনি শয়তানকে পাওনা দেওয়ার ধর্মে,

উদ্দীপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী লেখক 'টাইমস' কাগজে ভারতীয় সংকট সম্বন্ধে ধারাবাহিক পত্রপ্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। তিনি লিখে চললেন : ভারতের বিরাট প্রাচীন সভ্যতা যা বহিরাগত বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে, উপনিষদ ও গীতা, তাদের অসাধারণ রচনা। এদেশে বহু মানুষের মধ্যে সমুচ্চ মনীষা ও সংস্কৃতি বর্তমান। এবং স্বীকার করলেন, বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম, তার আক্রমণের হাত প্রসার করেছে পাশ্চাত্যে। কিন্তু অসহ্য ঠেকেছিল ভারতীয় উত্থানের চরমপন্থী রাজনীতি দেখে, অথচ তার ভিত্তিমূলে আছে ধর্মীয় প্রেরণা। সুতরাং এই চরমপন্থাকে তাত্ত্বিক প্রতিঘাতের পথে অগ্রসর হলেন। বললেন : কুসংস্কারক 'ধর্মকে' ব্রাহ্মণরা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে।... ভারতে মডারেট দল হিসাবে যারা পরিচিত, তারা বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে অতীব সহিষ্ণু আর চরমপন্থীরা ইংরাজদের রক্ত পানেচ্ছু। বুঝেছিলেন মিঃ চিরল রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষায় ধর্মীয় উন্মাদনা যুক্ত হলে, প্রচণ্ড শক্তিলাভ করে, শেষ পর্যন্ত তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিতে পারে। সচেষ্ট হলেন, এদের মধ্যে, ভিন্ন চিন্তার ধারা ঢুকিয়ে দিয়ে, তা বিমিশ্র ও শিথিল করা আবশ্যক। মহারাষ্ট্রে মিঃ তিলক, জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁর প্রভাব যথেষ্ট। তাঁকে খর্ব করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, তিনি ধরে নিলেন, তিনিই ভারতীয় চরমপন্থাকে ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত করতে সমর্থ। এই সূত্রে, তিনি ভারতীয় ইতিহাসে, ব্রাহ্মণদের ভূমিকা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় বললেন : ব্রাহ্মণদের অসাধারণ প্রতিভা, তা যেমন গভীরচারী, প্রয়োজন ক্ষেত্রে তেমনি নমনীয়। বৌদ্ধ প্রাধান্য, পরবর্তী মুসলমান ও ইংরাজ অধিকার ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে দূর করতে পারেনি। ইংরাজ শাসনের সর্বস্তরে প্রবেশ করে, ব্রাহ্মণরা তাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। অনেকে উদারনৈতিক হলেও বেশ বড় অংশ গোঁড়া, তীব্রভাবে ইংরাজ বিদ্বেষী, তারাই ভারতীয় জাতীয়তার প্রবর্তক ও পরিচালক।

এই প্রবন্ধগুলি একত্র করে একটি পুস্তক বার করলেন। এর মধ্যে ছিল যত্নসহকারে তথ্য সংগ্রহ। যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন, ধৈর্য্য সহকারে, বিশেষ পরিশ্রমে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতীকরূপে খাড়া করতে সমর্থ হলেন।

'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকা সেপ্টেম্বর ১৯১০ সংখ্যায় লিখলেন: শীঘ্রই গ্রন্থাকারে মিঃ চিরলের প্রবন্ধগুলি বার হচ্ছে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি, সম্বন্ধে জানতে যাঁরা ইচ্ছুক, বইটি পড়লে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান থিয়োরী জানতে পারবেন।

বইটি বেরুলে মর্নিং লীডার পত্রিকায় মিঃ র‍্যাটক্লিফ চিরলের শীতল বুদ্ধি তীক্ষ্ণ রাজনীতির প্রশংসায় তারিফসহ বললেন : ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে একটি ব্যাপক ধারণা সম্বলিত চিত্র। তাঁর এই বই দীর্ঘ সন্ধান; অধ্যয়ন, পুণঃ পুণঃ ভ্রমণ, সেই সঙ্গে সরকারী নথিপত্র ব্যবহারের অসাধারণ সুযোগ গ্রহণের ফলদায়ী সৃষ্টি। ভারতীয় জাতীয়বাদ সম্বন্ধে মিঃ চরলের বৈরিতা সর্বত্র পুরিস্ফুট। বিচার বিবেচনার সুর আছে, যেভাবে অবস্থা বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, তা সম্ভ্রম-আকর্ষক, কিন্তু সে মত অসম্পূর্ণ এবং প্রত্যয়দ্যোতক নয়। ব্যাখ্যা করে বললেন : এঁর প্রধান বক্তব্য ভারতীয় আন্দোলন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শিক্ষার ফলজাত গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন নয়— এর মূলে আছে ইংলণ্ড ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দেশের ভাবধারার বিরুদ্ধে গভীর প্রোথিত শত্রুতার মনোভাব— যা প্রধানতঃ ভারতের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দেখা যায়। এই ধারণাটির উদ্ভাবক কিন্তু চিরল নন— এটি ইংরাজ শাসকদের পুরাতন ধারণা, চিরল যাকে সুষ্ঠু রচনায় প্রকাশ করেছেন। এ থিয়োরী 'ননসেন্স' বলে বাতিল যোগ্য।

এসব ঘটনার অনেক আগে ৬ই জুলাই ১৯১০, নিবেদিতা মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন : ভ্যালেনটাইন চিরলের বিষয়ে কিছুই জানি না। কি বিদঘুটে নাম।'

১৮ই অগস্ট ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : জাতীয় আন্দোলন, ব্রাহ্মন আধিপত্য, পুণঃ প্রবর্তনের জন্য একটি সুগঠিত ষড়যন্ত্রের অংশ। তুমি চিরলের এই থিয়োরীর উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারছ না? বুঝতে পারছি না... ওর মোকাবিলা করার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না! ঐ ধরনের একটি অর্থহীন থিয়োরী, শাসকদের মনকে কেড়ে নিয়ে থাকে, হয়ত থাক তা ভারতের পক্ষে ভালই হবে। কিন্তু ঐ ধারণাটা এমন উদ্ভট যে, আঁতকে উঠতে হয়। ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট সুস্পষ্টভাবে ন্যাশন্যাল— 'মোটেই পৌরোহিত্যপন্থী নয়।... তাহলে সেই প্লাবন, যা জাতিপ্রথার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করেও, তাকে বাতিল করে দেবে— এবং সকল ভগ্নাবশেষকে নূতন খাতে প্রবাহিত করবে, যার দ্বারা নতুন ভিত্তি নির্ম্মিত হবে। জাতীয় আন্দোলন, নতুন আদর্শকে জাতীয়-ভাব প্রত্যয়ের মধ্যে আনয়নের প্রয়াস, যার মধ্যে অতীত থেকে কিছু মৌল উপাদান মাত্র গৃহীত। এক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা, যা জাতীয়তা সৃষ্টিশীল অর্থে যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছে। পেজ হপস কে বিবেকানন্দের বিষয়ে প্রশ্ন করো— আমি তাঁর বিশ্লেষণণেব সঙ্গে একতম— বিবেকানন্দের প্রাণই গোটা জিনিষটিকে সৃষ্টি করেছে। ডাঃ বসু অবশ্য ওজিনিসের ধারণা করতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় চরিত্র। তোমাকেই কেবল বলছি, বরোদা (গায়কোয়াড) ব্রাহ্মণ্য বিরোধী, তিনি জনপ্রিয় দেশীয় রাজা।... ব্রাহ্মণ্য মনীষা, অবশ্যই ব্রাহ্মণ্য বিদ্যার স্রষ্টা— আতঙ্কজনক অপূর্ব কাণ্ড তা। এর ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি, এখনো লেখার আশা রাখি। কিন্তু নিছক ব্রহ্মণ্য বস্তু হিসাবে, এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। সর্বদাই, তা শিক্ষিত মানুষের জন্ম দেবে, কিন্তু তা অতিমাত্রায় প্রণালীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাই বেশ কয়েক শতাব্দী লাগবে তার বন্ধনের পোষণ-কষ্ট সামলে উঠতে। বিবেকানন্দ কায়স্থ। কায়স্থরা নিজেদের মৌর্যপূর্ব ক্ষত্রিয় বলে মনে করে— তারা সর্বদাই নেতৃজাতি। জাতি প্রথা ঘনীভূত হয়েছে এমন যুগগুলিতে (গুপ্তদের শিল্পে-সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত) যখন কায়স্থ মনীষা সর্বাধিক মুক্ত— আইন আদালতে, হিসাবরক্ষায়, গণিতে— তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ইত্যাদি। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এই জাতিই প্রাধান্য করবে। ইতিমধ্যে তা করতে আরম্ভ করেছে! বিবেকানন্দ, জে. সি. বোস, অরবিন্দ ঘোষ। ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিরাও আছেন— গিরিশবাবু, ভূপেন বোস, রমেশ দত্ত কায়স্থ। যদি এঁরা ক্ষত্রিয় হন, তাহলে বুদ্ধ এঁদেরই একজন। এবং বস্তুতপক্ষে এঁরা সূচনায় ব্রাহ্মণদের উপরেই ছিলেন। নবভাবনাকে গ্রহণের প্রবণতা এই জাতির মধ্যে সর্বাধিক।

আর জাতীয়তা ও জাতিসৃষ্টির রণধ্বনির মধ্যে হিন্দুদের মত মুসলমানরাও আছে। অতীতের পুণঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এ নয় (যদিও মারাঠি ও পাঞ্জাবীদের মতো অনমনীয় জাতিদের পক্ষে এবস্তু উপলব্ধি করা সর্বদাই কঠিন)। অতীতের সৃষ্ট রীতিনীতি নয়, এ হল অতীত আদর্শের ভিতর থেকে নতুন ভবিষ্যৎ গঠনের আন্দোলন। এমন কি চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ বলবৎ থাকবে না। তার মানে, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যা সর্বদাই ঘটে থাকে— পূর্বযুগের পুরোহিতদের কাজকে সংহত করে নারীদের হাতে তা অর্পিত হবে— ভবিষ্যতে শিশুদের প্রাথমিক জীবনগঠনের জন্য। পূর্ব আদর্শের প্রত্যাখ্যান নয়, ঘনত্ব বিধান। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের, ষড়যন্ত্র মোটেই নয়। মহামাতার বিশাল সমুদ্রে দিব্য আত্মদান তা। আমাদের জন্য আছে বিশ্বাস— আমাদের জন্য আছে পর্বতশিখর থেকে ঝাঁপ দেবার দুঃসাহস। মাতা, আমাদের যেখানে ইচ্ছা, ভাসিয়ে নিয়ে চলুন। সুতরাং স্বামীজি যেমন বলতেন— সকল পরিকল্পনাকারীকে আঙ্গুলি নির্দেশে বিদায় দাও। কিন্তু, ক্ষেত্রে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতায় পার্থক্যের কী না মুখর দৃষ্টান্ত মিলল! যতক্ষণ না কোন বস্তু ষড়যন্ত্রের পোষাকে অঙ্গ ঢাকছে, ততক্ষণ তার বাস্তবতায় পাশ্চাত্যবাসীরা বিশ্বাস করবে না! ধরা যাক, আন্দোলনের সাফল্য ঘটেছে— সময় ১৯— খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত

হয়েছে। আমার ধারণা, সেঘটনা ভারতীয় জনগণের মধ্যে সুগভীর গণতান্ত্রিক প্রবণতা উন্মোচন করে দেবে। দক্ষিণ ভারত ও মহারাষ্ট্রের জাতিপ্রথা— যে দুটি জায়গায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বলবৎ, যা আপদ, যা সামাজিক ইতরতা, মনে রেখো এখানে আমি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির কথা বলছি না— বন্যায় ভেসে যাবে হতমান হয়ে যাবে— কেননা কেন্দ্রে তখন সকলের জন্য কর্মক্ষেত্র খুলে গেছে।

এইভাবে বিদ্যালয়গুলিতে প্রকৃষ্ট সামাজিক সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য, বিপুল কাজ করা সম্ভবপর যার দ্বারা জাতিভেদের ইতর দিকটি (জাতিভেদের একাংশে আছে নিছক প্রাদেশিকতা এবং কুশিক্ষা) অবলুপ্ত হওয়া উচিত। জাতি, ভাষা, উদ্যম ইত্যাদি কতকগুলি ইতিবাচক আদর্শের বন্ধনকাঠামো হিসাবে জাতি প্রথার উপযোগিতা আছে। আর ব্যক্তিগত গর্বের স্ফীতি এবং সামাজিক উদ্যমের সংকোচনের ক্ষেত্রে তার দুষ্টপ্রকৃতি— জনগণের সম্বন্ধে প্রবল অনুরাগই, মাত্র ঐ বস্তুকে দ্রবীভূত করতে সমর্থ। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের পুণঃপ্রতিষ্ঠাকে, জাতীয়তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বলে যে মন নির্ধারণ করে, সে মন কতখানি না নীচ ও সঙ্কীর্ণ!

সমাজতান্ত্রিক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ ইংলণ্ডের মাটিতে সম্ভব নয় তিনি জানতেন। কিন্তু সে প্রবনতা দেখে ভাবলেন : বুঝি ইংলণ্ডে তা ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই 'লেবার ওয়ার' সম্বন্ধে ২১শে অগস্ট ১৯১০, মিঃ র্যাটক্লিফকে লিখলেন :

পাশ্চাত্যদেশ নবসৃষ্টির দ্বারাপ্রান্তে। ভাবছি, তাহলে কি শূদ্রসমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজির ভবিষ্যৎ বাণী সফল হবার পথে। জগৎ! জগৎ! পরিবর্তমান পৃথিবী! ঘটনার সর্পিল গতি, মানবাত্মা তার প্রত্যক্ষদর্শী।

২৫শে অগস্ট ১৯১০ পুণরায় মিঃ র্যাটক্লিফকে লিখলেন : আমি চিরিলের কিছু কিছু প্রবন্ধ পড়ছি। তুমি যা বলেছ, তা ঠিক— ওগুলি চতুর, কিন্তু আন্দোলনকারীদের ঐকান্তিকতায় বিশ্বাস করার অক্ষমতায় কলুষিত। ঐ কারণে লেখাগুলিতে মহিমা নেই। তুমিও কি তাই মনে করো না?

পূজার ছুটিতে যথারীতি বসু দম্পতির সঙ্গে দার্জিলিং অবকাশ যাপনে যাত্রা করলেন। টেলিগ্রাম এলো মিসেস বুল অত্যন্ত পীড়িত। তাঁর যাওয়া প্রয়োজন। এখান থেকেই ছদ্মবেশে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আশঙ্কা ছিল সরকার তাঁকে আর ভারতে ফিরতে দেবে না। আর্ত হয়ে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন ১৪ই অক্টোবর ১৯১০, : যদি কোন সাইকিককে পাও— যে কোন সাইকিককে আমার হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, এই কি আমার শেষবারের মত ভারত ত্যাগ? আমি কি খোকাকে (ডঃ বসুকে) আবার দেখতে পাব এবং তার সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারবো?... আঃ হাঃ—ফিরতে পারবো কি? ভবিষ্যতে কি আছে? ...এখান থেকে নিউইয়র্কে পৌছানো পর্যন্ত সময়ে যদি তুমি আমাকে চিঠি লেখ বা তার করো: তাহলে মিসেস মার্গট এই নামে করবে। আমি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছি।

ক্রিস্টিন টেলিগ্রাম করেছিল— 'Await you have Sara accepts.' তার অর্থ আমরা বুঝলাম সারার পাশে আমি যাই, সারা তাই চাইছেন। সুতরাং আমি কার্যতঃ দু'এক দিনের মধ্যেই যাত্রা করলাম। কিন্তু বলো, আমি ফিরবো তো? ভবিষ্যতে আছে কি? ১৬ তারিখে নেপলস্ অভিমুখে নর্থ জার্মান মেলডিক্লিনজারে যাত্রা করবো। ১৬ই নভেম্বর কানাডার কাসপাথিয়া হয়ে নিউইয়র্কে পৌছবার কথা। সুতরাং ১৭ই সারার কাছে পৌছচ্ছি।

ওঃ যুম, দুঃখ সাগর!...

...সারা নিঃসঙ্গ— নচেৎ হয়ত অমন বিপদ কিছু নেই!

সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হচ্ছি না। প্রিয় য়ুম, তাঁকে যে নিরাময় হতেই হবে! আমরা তাঁর সম্বন্ধে বিরক্ত হতে পারি. বিদ্রোহ করতে পারি, কিন্তু জীবনের কী অর্থ, যদি এইসব কঠিন শক্তির সঙ্গে সংঘাত না থাকবে! ভারত থেকে ওষুধ এবং ব্যবস্থাপত্র পাঠানো হয়েছে; যদিও সারার খুবই নিঃঝুম অবস্থা, তবু মনে হয় ঐ সবের ফল ভাল হবে।

প্রিয়, সদানন্দ রোগশয্যায় শায়িত, এখনও জানে না কি হয়েছে, কারণ আমি সোজা দার্জিলিং থেকে চলে এসেছি। আমি চাই যে, এসব জিনিষ যতদিন সম্ভব তাঁর কাছ থেকে ঢেকে রাখা হোক।

১৪ অক্টোবর ১৯১০, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন : তুমি বোধহয় জানো যে সেন্ট সারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।... এখানে ভারতীয় দিকে আর একটি পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে।

নিবেদিতা আমেরিকায় পৌছানোর পর দেখা হল ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। কৃস্টিন ভারতে যাত্রা করবেন ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। জাহাজ ঘটে কৃস্টিনকে বিদায় দিতে নিবেদিতার সঙ্গে উপস্থিত। ডিসেম্বরে প্রথম সপ্তাহ। ভূপেন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়, কৃষ্টিন নিউইয়র্ক থেকে ভারতে যাত্রা করলেন। জাহাজঘাট থেকে বিদায় দিয়ে যখন ফিরছেন সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ ও আর একজন, একটি ট্যাক্সি দ্রুত তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে অন্য একজন ভূপেন্দ্রনাথকে ফুটপাতে উঠতে পরামর্শ দিলেন। তাঁকে আশস্ত করে ভূপেন্দ্রনাথ বললেন— আরে ভয় নেই, এটা আমেরিকা, এখানে ভারতের মত জীবন সস্তা নয়।

সে কথা শুনে নিবেদিতা হাসতে লাগলেন। বাগবাজারের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। সাহিত্যিব দীনেশচন্দ্র যখন একটি ষাঁড় তাড়া করায়, কি ভাবে সকলকে ছেড়ে পালিয়েছিলেন— সেকথা বর্ণনা করে বললেন, ভূপেন ঐ আচরণ তুমি করনি!

এর পরেও ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ নিজেই আসতেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে। নিবেদিতা তখন ব্রুকলিনেঃ ভূপেন্দ্রনাথ এলেন তাঁর কাছে। কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বললেন: অ্যামিরিয়ার রাজা অসুর-বান-ই-পাল হলেন— পুরাণ কথিত বানাসুর!

ভূপেন্দ্রনাথ তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। নিবেদিতা ক্রুদ্ধভাবে বললেন— আমি যখন ফাঁসি যাব তার পরেই তুমি আমার কথা মানবে!

উত্তরে ভূপেন্দ্রনাথ বললেন— কখনও আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে না!

প্রশ্ন করলেন নিবেদিতা— কেন?

হাসলেন ভূপেন্দ্রনাথ— আপনার চামড়ার রঙই আপনাকে বাঁচাবে।

সখেদে উত্তর দিলেন— হয়ত সে কথা সত্যি! কিন্তু তোমাদের আন্দোলন কেমন চলছে?

এবার বাঁকা উত্তর দিলেন— আপনাকে আমি আপনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেব। স্বামী সদানন্দ জাপান থেকে ফিরে নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকার পক্ষে তাঁকে ইন্টারভিউ করার জন্য 'দেবব্রত বসু' যখন আপনার বাড়ীতে গিয়েছিল— আপনি তখন বলেছিলেন— গুপ্ত বিপ্লবের কথা কেউ যেন না তোলে!

এ বক্তব্যের অর্থ ছিল, একথা শুধু নিজে গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত. বারীন্দ্র গোষ্ঠীর মত খোলা মাঠে প্রচার করা উচিত নয়। যা গুপ্ত, তা বিপ্লবীদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত— পাঁচ কান করা উচিত নয়— কলমি শাকের ঝাড়ে মত, একটানে তা তোলার মত সবাই ধরা পড়ে যায়?

নিবেদিতা হাসলেন! বললেন, এটা তো আমেরিকা। এরপর বললেন : ভূপেন, আমি তোমাকে উৎসর্গীত মনে করি। তুমি বিয়ে করো না। ফাঁসির দড়ি অরবিন্দের পশ্চাদ্ধাবন করছে! তুমি ও উৎসর্গীকৃত!

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১০ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

এই চিঠি পাবার অনেক আগেই কৃষ্টীন তোমার কাছে চলে যাচ্ছে। গত বুধবারে আমি তাকে ম্যারিটানিয়া জাহাজে বিদায় জানিয়েছি। মনে হচ্ছে, সারা এখন ভালর দিকে। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমেরিকায় গুপ্ত রহস্যবাদীদের মধ্যে যতসব শয়তানী ধারণা। তাদের পাল্লায় পড়লে মাথা ঠিক রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। মনে হয়, যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিতে পারলে, সারা ক্রমে আরোগ্যলাভ করবেন। তবে কতকগুলি বিষয়ে তিনি নিতান্ত বেয়াড়া। তাঁর থেকেও জোরের সঙ্গে অসঙ্গত দাবি করতে আর কোথাও দেখিনি। তবু সীমাবদ্ধ সেগুলি এবং উর্ধ্বতর আকর্ষণে সাড়া দিতে পারেন অপূর্বভাবে। সম্ভবতঃ তাঁর সবচেয়ে মন্দদোষ: নিজ ইচ্ছাই চরম ভাষা— তাঁর জন্য অবিরত, তিনি নিজশক্তি ব্যয় করেন, সংরক্ষণ করেন না— আরোগ্যের জন্য, যা করার প্রয়োজন ছিল, সবচেয়ে বেশী খুব আদর্শ অবস্থা নিশ্চয় নয়, কিন্তু ধৈর্য্য ছাড়া পথ খোলা নেই। আর আমাকে যে বাস্তব সেবা করতে হয় না তার জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞ। তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণাই আছে, আমার সমস্ত কিছুই উৎসর্গীকৃত। সেজন্য সবচেয়ে সতেজ— মধুর মন নিয়ে আমি তাঁর কাছে যেতে পারি।

আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে জাহাজে উঠে বসলেন। ঘিরে রয়েছে শত দুশ্চিন্তা। কেদার-বদরী দর্শনের পর অন্তরে শান্তি অনুভব করেছিলেন। কর্মের অবসরে মন হিমালয়ের ভাবগম্ভীর শান্ত-নির্জন পরিবেশে ডুবে যেতে চাইছিল, তেমনি ভেসে উঠতে লাগলো স্বামীজি-স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলির কথা। প্রার্থনা জানালেন: শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁকে শান্তি ও আনন্দদান করেন— এছাড়া কোন অভিলাষ ছিল না তাঁর মনে। মনে ভেসে উঠছে শ্রীমার কথা : দক্ষিনেশ্বরে নহবতের সেই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে বাসের সময়ে— হৃদয় তাঁর আনন্দ ও শান্তিতে ভরে থাকতো সকল সময়! তিনিও মনপ্রাণ ভরে সেই শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করতে অধীর পিপাসু! একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই, চিন্তার ও বিরাম নেই। একমাত্র উপলক্ষ্য : এখন স্বামীজির কাজ, স্বামীজিই তাঁকে পরিচালনা করছেন। আবার নতুন ভাবনার সূচনা— তিনি কি প্রিয় এই ভারত ভূমিতে, ফিরতে পারবেন?

উত্তাল চিন্তার মধ্যে ১৫ই নভেম্বর বস্টনের কেম্ব্রিজে পা দিলেন। তাঁকে দেখে সারার কি আনন্দ! রোগেরও উপশম দেখা দিল। ওর স্থির বুদ্ধির জন্যই স্বামীজি তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ধীরামাতা' সেই ধীরামাতার বিচার বুদ্ধি আজ নিষ্প্রভ। তিনি ভুগছেন রক্তাল্পতায়, সেই সঙ্গে এক অজানা আতঙ্ক। তিনি তাঁকে একমুহূর্তের জন্য কাছছাড়া হতে দেবেন না।

নিবেদিতা পাশে বসে পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে লাগলেন। বেলুড়, আলমোড়া ও কাশ্মীরের ঘটনাগুলি তুলে ধরতে লাগলেন তাঁর স্মৃতিপটে। অতীতের ঘটনা, তবুও মনে হতে লাগলো— ঘটনা সেদিনের।

এসময়ে তিনি 'জ্ঞানযোগ'-এর সম্পাদন করছিলেন। তার কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাতে লাগলেন, কখনও বা ডঃ বসুর নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা প্রসঙ্গে, তাঁর মনে উৎসাহের সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হলেন। ধীরে ধীরে সারা সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। অবকাশ মেলায় পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে শুরু করলেন। লণ্ডনে তখন বিশ্বজাতি কংগ্রেস (Universal Race Congress) বসছে। তিনিও আহূত হলেন। ডক্টর ব্রজেন শীলও আহূত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়— তাই তিনি তাঁর বক্তৃতা পাঠাতে স্বীকৃত হলেন। তাঁর বক্তব্য বিষয় হল 'ভারতবর্ষে নারীর বর্তমান স্থান'। ১৫ই ডিসেম্বর সেটি কংগ্রেসের সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ও মিসেস বুলের লাইব্রেরীতে বসে 'জ্ঞান-যোগের' কাজ করে চললেন।

তিনি আমেরিকায় পৌঁছেই সারার ভাই মিঃ ই. জি. থর্প ও কন্যা ওলিয়াকে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন। এসময়ে তাঁর উপস্থিতিতে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দিল, কারণ সারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যের

মালিক। তিনি এসেছেন সারার ডাকে, ঐশ্বর্য্যের মোহে নয়। তাঁর অন্তর নিষ্পাপ। তিনি সর্বদাই সারার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

১৯১০ সালের নভেম্বর ডঃ বসুর জন্মদিনে চিঠি দিলেন জেনোয়া থেকে :

আমাদের প্রিয় তিরিশ তারিখটি শ্রেষ্ঠ তোমার জন্মদিবস। ঐ দিনেই এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছবে। অনন্ত-পুণ্যে পূর্ণ হোক এইদিন। নিত্য প্রসারিত মাধুর্য্যে ও আশীর্বাদে সম্পূর্ণ হয়ে অবিভূত হোক বারবার এই মহাদিন। বাইরে দেখতে পাচ্ছি, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সুমহান মূর্ত্তি, তার তলায় শুধু লেখা, 'লে পাতরি', আর ভাবছি, একদিন আসবে যখন এই কথাগুলি তোমার নামের নীচে মৌন-মুখর' শব্দরূপে উৎকীর্ণ থাকবে। ঐ বিরাট দুঃসাহসী মানুষটি এবং তাঁরই মত আরও দুঃসাহসীর দল, যাঁরা নিজ দেশবাসীর কল্যানের জন্য অজানা সমুদ্রপথ খুঁজছেন— ওঁদের সকলের সঙ্গে তুমিই ইতিমধ্যে কিভাবে না আত্মিকসম্পর্ক গ্রথিত হয়ে গেছ! জয়ী হও চিরজয়ী! মানুষের সামনে হও আলোক, পদতলে হও প্রদীপ। আর শান্তি, গভীর শান্তি পাও তুমি— তুমি নতুন ভুবনের আবিষ্কর্তা, চেতনাসমুদ্রের হে মহান নাবিক!

৭ই ডিসেম্বর ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

এখনো সূর্য্যোদয় হয় নি। চারদিক বরফে ঢাকা। চা আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুক্ষণ শুয়ে থেকেছি, প্রার্থনা করেছি, আমরা সবাই যেন আমাদের আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে ক্ষুদ্র গোপন স্থান রক্ষা করি, — যে স্থানটিতে আমরা তাঁর সঙ্গে মিলতে পারি, বেড়ে উঠতে পারি অব্যাহতভাবে, কোন হিপনোটিজমের প্রভাবের বশবর্ত্তী না হয়ে। এ আমার ন্যায়সঙ্গত বাসনা আমি জানি, কারণ, স্বামিজী এই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিলেন, এবং একে তাঁর ব্যক্তিত্বের সর্ব্বস্ব করে তুলেছিলেন। সেই ঠাইটুকুর বাইরে অনেকের সঙ্গেই তিনি স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতেন, কিন্তু যদি প্রত্যেকের ঐ নিজস্ব ভূখণ্ডে অনধিকার প্রবেশের কোন চেষ্টা, কোন পক্ষে কখনও, দেখেছেন, সহ্য করেন নি কোনমতে। এই অন্তর খণ্ডটির, অস্পৃষ্ট থাকাকেই. তিনি বলতেন স্বাধীনতা।

আমাদের এই স্বাধীনতা যত ক্ষুদ্রই হোক না, তার আকার— আমরা যেন তার মধ্যে অখণ্ড স্বরূপে থাকতে পারি! ক্রমেই যেন সৎ ও অসত্যের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি, অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গে!....

যারা প্রার্থনায় বিশ্বাস করে না, তাদের ব্যস্ত করার দরকার নেই। কিন্তু যারা করে, জর্জ্জ, অ্যালবার্টা, স্পেনস্, যে-কেউ তারা. যেন সেন্ট সারার জন্য প্রার্থনা করে, যাতে তিনি এই মহাবিপদের ক্ষণে, তাঁর আত্মবোধ ফিরে পান, সৎ ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

এসব কথা তাঁদের অবশ্য বলো না। এ সবকিছুই তুমি, আমি, খোকা ও কৃষ্টিনের মধ্যে থাকবে।...

আর করুণা করে আমার জন্য প্রার্থনা করো তোমরা সকলে, যাতে আমি প্রেমময়, ধৈর্যময়, গভীর আত্মসমাহিত মনের মধ্যে অবস্থান করতে পারি। ওঃ য়ুম, আমি এত আতঙ্কিত! ... প্রেম, ধৈর্য্য, আত্মসংযম—ভুলো না আমার এই সব প্রয়োজনের কথা।

৯ই ডিসেম্বর ১৯১০ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

মনে হয় সেস্ট সারার বিচিত্র ধারণা এবং মিসেস ব্রিগসের প্রভাব সম্বন্ধে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেছে। .... মিসেস এইচ এর ধারণাই বোধ হয় ঠিক, মৃত্যুর বা উন্মত্ততার আশঙ্কা হয়ত সত্যই নেই। আমি মাথা ঠিক রাখতে চাইছি। একই সঙ্গে অভিজ্ঞতা, কিন্তু অতি বাস্তব এবং সমাচ্ছন্ন বিভীষিকা! মোট ফল, সেই স্বামিজীর কথারই প্রতিধ্বনি—এই মায়াজাল ছিঁড়ে ফেল, মুক্তি খোঁজো। তারা যে ভাবে পারুক, নিজেদের ব্যবস্থা করুক। তাদের সাইকিক প্রভাবগুলি, নিজেরা লড়াই করে সিদ্ধান্ত করুক, কিন্তু ত্রাণ আছে একটি ক্ষেত্রে— মুক্তিতে। একটি উপায়েই সাহায্য করা সম্ভবঃ এই মুক্তি লাভ করে।

১১ই ডিসেম্বর ১৯১০, তিনি সেই রবিবারে গীর্জায় গেলেন, সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে বসে তাঁর মনে হল, শ্রীশ্রী সারদা দেবীই, যীশু জননী মেরী। বাড়ী ফিরে এসে ১১ ডিসেম্বর ১৯১০ শ্রীমাকে লিখলেন,

কেম্ব্রিজ, ম্যাস
রবিবার, ১১ ডিসেম্বর ১৯১০

আদরিণী মা,

সারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আজ ভোরে আমি গীর্জা গিয়েছিলাম। সবাই ওখানে যীশু জননী মেরীর কথা চিন্তা করছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা দৃষ্টি, পরণের সাদা শাড়ী, তোমার হাতের বালা, সবই যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, তোমার সেই দিব্য সত্তাই যেন বেচারী সারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্ব্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, জানো মা? ভাবছিলাম, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমার কী নির্ব্বুদ্ধিতাই হয়েছিল! আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মত বসে থাকতে পারাটাই তো যথেষ্ট। মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই, আমাদের বা জগতের ভালবাসার মত উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হল এক স্নিগ্ধ শান্তি, যা প্রত্যেককে দেয় কল্যানস্পর্শ— অমঙ্গল চায় না কারও। ও যেন লীলা-চঞ্চল একটি হৈমদ্যুতি! কয়েকমাস আগেকার সেই রবিবারটি, কী আশীষই না বয়ে এনেছিল! গঙ্গাস্নানে যাবার ঠিক আগে, আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্ত্তের জন্য দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। তোমার আনন্দময় ঘরখানিতে তুমি আমায় যে আশীর্ব্বাদ জানালে, তা আমায় দিয়েছিল এক অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ী মা, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমায় লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু তাতেও মনে হয়, বড় বেশী শব্দ করা হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মত! সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্য্যতম সৃষ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে, তাঁর প্রতীকরূপে। আর আমাদের উচিত, তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা— অবশ্য কখনো কখনো একটু মজা করা ছাড়া। বাস্তবিকই, ভগবানের যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি, সবই শান্ত, নীরব। গোপনে, অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে, আমাদের জীবনে সে মাধুর্য্য। এই সব শান্ত জিনিষই— তোমার তুলনা।

বেচারী এস সারাকে তোমার শান্তির উত্তরীয়খানি পাঠিয়ে দিও। রাগদ্বেষের ঊর্দ্ধে, গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি, পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত ভগবৎ সত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনও মলিন হয় না?

প্রিয়তমা মা আমার,
তোমার চিরদিনের নির্ব্বোধ 'খুকী'

চিঠিখানি লিখে মন অনেকটা শান্ত হল নিবেদিতার। সারার জন্য প্রার্থনা ছাড়া কিছু করার সামর্থ্য আছে কি? যে ব্যাপারটি এখন ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি না— তা আমাদের পক্ষে দ্রুত কাজ করার প্রয়োজন ঘটিয়েছে। উপর মহলে কোন ব্যক্তি, চতুর একটি মতলব ভেঁজেছেন, যা আমাকে সুবিধামত গর্দ্দভ বানিয়ে ছাড়বে—কিন্তু আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে দেবে না।

আমি মিসেস থেটা মার্গট নাম নিয়ে ছদ্ম পরিচয়ে ভ্রমণ করছি— নতুন নাম স্বাক্ষরে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯১০, মিসম্যাকলাউডকে লিখলেন : ভূপেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, সে কাজ করতে পেরেছি।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯১০ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

সারার কথা লিখে তোমাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়েছি—তার জন্য দুঃখিত। সহজ স্নিগ্ধ প্রভাবের মধ্যে সারার অবশ্যই উন্নতি হচ্ছে, যত ধীরেই হোক এবং বোধ হয় পরিস্থিতিকে যথার্থভাবে দেখা এখন সম্ভব। অধিকন্তু, লোকজন সম্বন্ধে যিনি আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলেছেন। ..... যে ভাবে নিয়ে তোমাকে গোড়ায় লিখেছিলাম তা জঘন্য মনে হচ্ছে। সম্ভবতঃ তা মিথ্যাই। ভালবাসা ও সরলতায় তিনি যে সাড়া দিচ্ছেন, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, আমি যে রোগ নির্ণয় করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুল নয়। অন্ততঃ মিসেস ওয়ালডেনের সতর্ক বানীকে সত্য প্রমাণ করবার মত যথার্থতা।

প্রিয় মিসেস হেলিজ বললেন— তাঁকে অর্থ দান করতে প্রণোদিত কর। এই বন্ধন মোচন কর। ঠিক এই পথেই আমি দু'একটা নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছি। এর ফল ভালই হবে মনে হয়। .....

মনে পড়লো : সেই অসাধারণ অহমিকা, ডাইনিতন্ত্রে বিশ্বাস ও সমালোচনার ও নিন্দার প্রবৃত্তি, গ্রীষ্মকালে কৃষ্টীনকে সরিয়ে দেওয়া, যা কৃষ্টিনের পক্ষে উত্তম, তবু নিজে কি ঝুঁকিই নিয়েছিলেন। .....

যাই হোক য়ুম, মিসেস হেগিজের সিদ্ধান্ত হল— এক মুহূর্তের নোটিশে চলে যাবার জন্য তৈরী থেকো। আমি প্রস্তুত। থাকার সময়, আমি কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িয়ে যাচ্ছি মাত্রা। তবু, এই সংগ্রামক্ষেত্রের তলদেশে দুঃখী, আশঙ্কাতুর মহান ও উদার হৃদয় রয়েছে— যা মানুষের জন্য এত কিছু বিরাট জিনিষ করেছে, শতগুণে তা ফিরে আশা উচিত তাঁর কাছে। আর আমার পরম সৌভাগ্য এই কাজে, বিশুদ্ধ প্রেম ও কৃতজ্ঞতার প্রয়াসে, আমি স্বামিজীর হাতের যন্ত্র হতে পেরেছি। আগস্ট মাসে সিরি যখন সারার কাছে এসেছিলেন, তখন সারা বলেন, তিনি সদ্য ভাবতে শুরু করেছেন যে, তিনি ভালবাসতে পারেন এমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই। ..... বেচারা, বেচারা! ... কিন্তু ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি, খোকা না থাকলে কৃষ্টিনের মতই আমার অবস্থা হত, কোন প্রভাবই থাকতো না। কখনও কখনও নার্ভাস হয়ে পড়ছি, যেমন হতাম ১৯০৮ সালে।

যথার্থই দেখতে পাচ্ছি, বন্ধুত্ব একটা বন্ধন। মুক্তির সন্ধানই অন্যের কাছে প্রাণরস এনে দেয়। যখন আমরা নিছক ভাল করতে চাই, তখন ক্ষতি করি, বোধ হয় কে জানে!

হ্যাঁ, সেন্ট সারার জন্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় করো, তাকে সত্যই ভালবাসো; তার উপর যথার্থ বিশ্বাস রাখো, স্বামিজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে তাকে দেখো, কিংবা সেই সঙ্গে শ্রীমার অনুধ্যান জুড়ে দিও। এই নিঃসঙ্গ আত্মার উগ্র সরব আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে, মাত্র এইগুলি প্রয়োগেই সাহস করতে পারি। কিন্তু সে সত্যই ভালবাসে, ভালবাসা চায়! কী বেদনা! সে যা চায়, ভাল বা মন্দ, সব কিছু করতে, তাকে সাহায্য করবো, যদি সত্যই নিশ্চিত বুঝতে পারি, তা যথার্থই তার ইচ্ছা। শিব! শিব! ভালবাসার সমুদ্র তোমার জন্য। অবশ্যই ভাল হয়ে ওঠো তুমি এবং ৯০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচো, নচেৎ দুঃখে আমার মৃত্যু হবে।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ১৯০৮ সাল থেকে সেন্ট সারার জীবনে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। যার বিচারবুদ্ধির জন্য তিনি বিখ্যাত, সেই তিনিই মিষ্টিক জীবনের, প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। যিনি ছিলেনঃ বদান্য, যে কোন প্রতিভাকে, জগতের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করে এসেছেন সারা জীবন, সেই তিনিই সহসা অহমিকা ও নিন্দা প্রবৃত্তিতে রূপায়িত হলেন। সর্ব্বদা দানে যার প্রবৃত্তি, সেই তিনি কৃপণের লোলুপ আতঙ্কে টাকাকে আঁক্‌ড়ে ধরলেন। বিশ্বাসী হয়ে উঠলেনঃ ডাইনি তন্ত্রে। যে মাতৃত্বের পিয়াসী ছিলেন, তিনি সেই মাতৃত্বের আধার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন নিজ

কন্যা ওলিয়াকে, এমন কি পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন যে জগদীশ চন্দ্রকে, তাঁকেও পরিহার করলেন। সন্দেহ-প্রবণতা জন্ম নিল, সে চরিত্রে। হলেন আত্মকেন্দ্রিক। অসুস্থ হয়ে পড়লেন অচিরে। যদি মিসেস বুলের পরিবর্ত্তন হতো, আক্ষেপের কিছু ছিল না কিন্তু, তিনি স্বামিজীর ধীরমাতা সেন্ট সারা! এ পরিবর্ত্তন অবিশ্বাস্য! লৌকিক মনস্তত্ত্ব বিশ্বাস করায় যায়, কিন্তু সারা যে অধ্যাত্মরহস্য সন্ধানী, আধ্যাত্মিক সেন্ট সারা। তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনাই হল তাঁর কাজ। দু'ভাবে তাঁকে সপ্রতিভ করে তুলতে চাইলেন—সম্প্রতি হারানো- মাতৃত্বের অনুভূতি ও মুক্তির আধ্যাত্মিক চেতনা- বিবেকানন্দের স্মৃতির অন্তর্লোকে।

তিনি অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত কিন্তু যে মুহূর্তে নিবেদিতা তাঁর বাড়ীতে পা দিলেন, তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন। সেবায়, শুশ্রুষায় অনেকটা সুস্থ হলেন কিছু দিনের মধ্যে। সহজ অবস্থায় খানিকটা ফিরে এলেন। সচেতন মন থেকে, যাদের (ওলিয়া ও জগদীশচন্দ্রকে) দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন অথচ আচ্ছন্ন চৈতন্যে তীব্রভাবে কামনা করছিলেন— সেই দুটি মানুষকে ধীরে ধীরে তাঁর মনের কোনে তুলে ধরে সহজ প্রবৃত্তির জাগরণে সহায়তা করলেন। মনপ্রাণ তাঁর, পুনঃ সত্য আধ্যাত্মিকতার নির্ম্মল আলোকে ফিরে এলো।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

সেন্ট সারা সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যাণ্ডে কাটাবার পরিকল্পনা করছেন। যদি যথেষ্ট শক্তি পান, তারপরে ফরাসী জাহাজে ভারতে যাবেন, চন্দননগরে বাড়ী ও নৌকা নেবেন। ...

সারার বিষয়ে কেবল প্রার্থনা করছি— কোন চিকিৎসা নয়। ... শুধু আমি প্রার্থনা করছি, ভালবাসার জন্য— অন্তরে বাইরে শুধু ভালবাসা, ভালবাসা দাও, নাও, — অনুভব করো। অনন্ত ভালবাসার তরঙ্গ— ভেসে যাক বন্দরের বাঁধন, ছিঁড়ে যাক জাহাজের নোঙর, তাই-তাই-তাই-চাই! ... প্রয়োজন তাঁর বিরাট প্রকৃতির পুর্নবাসন— শুধু ভালবাসা, স্বার্থবোধ না রেখে ভালবাসা। শেষের দিকে কয়েকবছর যেন তিনি চাবিটি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

ইংলণ্ডে উদারনৈতিক মহলে ভারতে "নিপীড়ন-নীতির" বিরুদ্ধে প্রচুর কলরব হতে থাকায়, শাসক দল অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। তাঁর বিবেক সাফ রাখার জন্য কিছু রচনা সম্মার্জ্জনী চাইছিলেন। চিরল সে বস্তু তাঁদের সরবরাহ করলেন। এঁর গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে বুঝিয়ে দেওয়া— ভারতের আন্দোলনকে তুচ্ছ ভেবো না। ওটা সাময়িক নয়, ওর মূল গভীরে প্রবিষ্ট। ওকে বাড়তে দিলে ভারতে বৃটীশ-সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে সুতরাং এখনি চরমপন্থীদের বিষয়ে চরম ব্যবস্থা নাও। অস্ত্রোপচারে দুষ্ট অঙ্গ ছেঁটে ফেলো, নচেৎ বিপত্তি ঠেকানো যাবে না। ... ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতীয়বাদের মধ্যে অস্বাভাবিক মৈত্রীকে আমাদের ভাঙতেই হবে এবং নিপীড়ণের অস্ত্রোপচার চিকিৎসাকে, চালিয়ে যেতে হবে।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯১০, মিস ম্যাকলাউডকে ভূপেন্দ্রনাথের কথা লিখলেন। বেচারা ভূপেন গতরাত্রে এখানে ব্রুকলিনে এসেছিল। বড়দিনের সময়ে কৃষ্টীনের সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখ-কথা খুবই আবেগের সঙ্গে বলছিল। কোন কোন দিক দিয়ে কি সুন্দর হয়ে উঠেছে সে। তার ভিতরে বস্তু ঠেলে দিতে কী যে চেয়েছিলাম কি বলব! কেননা, সে এখন প্রস্তুত যন্ত্র। কিন্তু আহাম্মকি ও যুক্তিতর্কে, সময় বা শক্তি ব্যয় করা, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এখানে এমন কেউ ছিল না, যে ব্যক্তি, তার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে এই কথাগুলি বলবে, শোন, ইনি তোমাকে সত্য দিতে পারে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করো। আমার সম্বন্ধে অপরের কাছে, ঐ ধরনের কাজ অতীতে সদানন্দ করেছেন। স্বামিজীর সম্বন্ধে আমার ক্ষেত্রে, সে কাজ তুমি করেছ। যিনি, তোমাকে সত্যই কিছু দিতে পারেন, তাঁকে বাজে বকাবকানির ঢক্কা দিতে পারো না, বা সে ঢক্কা

খেতেও পারো না। সত্য, কখনো আহাম্মকিতে নিজের সমকক্ষ বলে গ্রহণ করতে বা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।

তুমি হয় তো ভাবছো, কি আত্মম্ভরিতা? যেন, কেবল আমারই আছে, সত্যে অধিকার। একদিক দিয়ে কিন্তু কথাটা ঠিক। স্বামিজী, সূত্রের একপ্রান্ত আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি তার অনুসরণে অগ্রসর হতে চেয়েছি। দু'বছর আগে, ভূপেনের সঙ্গে দেখা হয়, তখন তার মধ্যে কাব্য ও কল্পনার সম্ভাবনা দেখেছিলাম। তারপর থেকে সে উৎসাহের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আর আজ তার মন, কর্ষিত ক্ষেত্রের মত। কিন্তু তাতে বীজ বপন করতে হবে। অথচ সে সত্যবস্তুর সঙ্গে, নানা প্রকার অস্থায়ী বস্তুর পার্থক্য বোঝে না। মানসিক শৃঙ্খলাবোধ ও তৎপরতা দানই, কেবল স্থায়ী বস্তুগুলোর মূল্য! .... সেন্ট সারা খ্রীসমাস দিনে ভূপেন ও সুবোধকে দেখেছেন, ওরা তোমার কাছে কতখানি মধুর, তাও অনুভব করেছেন। শায়িত অবস্থাতেই মিসেস বুল বললেন, অনপনেয়—ওদের মাধুর্য্য! তাই ভূপেন সম্বন্ধে যখন ডাঃ কোলটার-এর বার্ত্তা এল, তখন তিনি তাতে সুখী হলেন। সিরির কাছে ভূপেন সম্বন্ধে, যা শুনেছিলাম, তা বললাম— ভারতীয় নারী শিক্ষার বিষয়ে উচ্চাভিলাষ ভূপেনের আছে, আর এই তরুণী নারীকে এ ব্যাপারে সহকারিতার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে। এই সংবাদ সারাকে আনন্দিত করলো। সারা বললো, মার্গট! ভারতীয় নারীর জন্য ভূপেনের কাজ করার ইচ্ছা আছে এবং সে ব্যাপারে তোমার সাহায্য থাকবে। এরই ভিত্তিতে আমি ভূপেনের জন্য কিছু করতে আগ্রহী। ...

উত্তরে বললাম— হ্যাঁ, সেন্ট সারা, ঠিক, তবে তার মতো স্বভাবের মানুষের কাছে শর্ত্তারোপ করে কোন কিছু প্রস্তাব করলে ফল হবে না। সেক্ষেত্রে সে বিদ্রোহ করবে। সেকথা অবশ্যই ঠিক— আন্তরিকভাবে সারা বললেন, আমি পৃথিবী উল্টে গেলেও শর্তের কথা তুলবো না। তবে আমি তাকে সাহায্য করতে চাই এই ভিত্তিতে—"

"আমি ভূপেনকে সত্যই সাহায্য করতে চাই। অনুভব করো স্বামিজী আমাদের যা দিয়েছেন, সে তা পাবার যোগ্য। কিন্তু আমি তাকে স্বাধীনভাবে জয় করতে চাই— তার অন্তর্নিহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন লঙ্ঘিত না হয়। ...ইচ্ছা হয়, ভূপেনকে ডেকে পাঠিয়ে অনুনয় করে বলি, সে যেন আমাকে স্বামিজীর কাছ থেকে প্রাপ্তভাব অনুযায়ী গ্রহণ করে। অদ্ভুত লাগে যখন দেখি এইসব ছোকরারা বুঝতে পারে না যে, পাঠ অনুশীলনের সুবিধা এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে অথরিটি হিসাবে খ্যাতিসহ আমি হয়ত, ওদের তুলনায় ভারতীয় বিষয়সমূহ আরও ভালভাবে জানি, যার জন্য আমার মতামত অন্যের সমতুল্য নয়। ওরা না বুঝলেও কথাটা সত্য। মিঃ র‍্যাটক্লিফ বা খোকার (জগদীশ চন্দ্রের) মত মানুষেরা, যে প্রকার তৎপর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনে গেছে, তার দ্বারা সত্য (আমার ভেতর থেকে) প্রবাহিত হয়ে অজস্রভাবে অন্যের মনের উপর কাজ ক'রে, আমার মাথাটি খেয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, ভূপেনের সম্ভাবনা প্রচুর—অবশ্যই সে অতীব প্রিয়।"

মিঃ র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার কাছ থেকে সংবাদ প্রাপ্তির পর মিঃ চিরলের 'ইণ্ডিয়া আনরেষ্ট' বইটির আলোচনা করলেন— "ইণ্ডিয়া" কাগজে। "মর্নিং লীডার" পত্রিকা এই বইটির ব্রাহ্মণ্যবাদের থিয়োরীকে ছিন্ন ভিন্ন করে উড়িয়ে দিলেন। বইটিতে 'ভারতীয় সংকট সমাধানের দাওয়াই ছিল' : ভাইসরয় যেন ভারতসচিব এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের খবরদারি থেকে মুক্ত থাকেন, তাঁর কাউন্সিল য়েন বৃটিশ কেবিনেটের রূপ নেয়"। মিঃ র‍্যাটক্লিফ বললেন : চিরলের প্রস্তাব গৃহীত হলে, যে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন আমলাজাতির সৃষ্টি হবে, তাতে ভয়াবহ আকারে পীড়ন চলবে, ওর তুলনায় পুরোহিততন্ত্রও ভারতের পক্ষে অধিক স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক ব্যাপার। (৩০শে ডিসেম্বর ১৯১০)।

১লা জানুয়ারী ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

প্রিয় য়ুম, কাশ্মীরে আমাদের সেই বিরাট বছরটি, তা কী গভীর ও নিত্য বর্ত্তমান! মুখে মুখে বলে চিঠি লেখানোর ক্লান্তিকর চেষ্টার জন্য অপেক্ষা না করে সেন্ট সারা, এখনি তাঁর হয়ে আমাকে, তোমার কাছে লিখতে বললেন। আজ সকালে বড় মুহ্যমান ও দুর্ব্বল তিনি। ডাক্তারের চিকিৎসাগত একটা ব্যাপারের জন্য রাত্রি অস্থিরতায় কেটেছে। কিন্তু গতরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র ভাবতরঙ্গ অনুভব করে তবে বিদায় নিয়েছিলাম। আজ সকালে তিনি আমাকে কুণ্ঠিতভাবে সেই রাত্রিটির কথা বললেন, যখন এডউইনা মারা যাবার ফলে, তিনি স্বামিজীর সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁর জন্য কি করেছেন, কি বলেছেন সব কিছুর কথাই আমাকে জানালেন; অপূর্ব্ব তা, সেই তাঁর জীবনের মুল সুর। নিজে থেকে বললেন— অতঃপর নতুন জীবন তাঁর। তাঁর বিচারবুদ্ধি অন্য কাউকে নিন্দিত করতে নয়, কেবল নিজেকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে প্রযুক্ত হবে। প্রিয় য়ুম, — দেখ, কেমন ধীরে ধীরে মেঘ সরে যাচ্ছে। সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে হৃদয়। জানলা খুলে দিয়েছি, তারপর চলে এসেছি— এ যেন তাঁর জীবনের সংকট সন্ধিক্ষণ। শান্তি নেমেছে আমার মনে। আমি বুঝেছি, এই শারীরিক দুর্ব্বলতার মধ্যে হয় তাঁর আত্মা মুক্তি পাবে, নচেৎ প্রাণশক্তিপূর্ণ নতুন জীবন, সত্যই আরম্ভ হবে, যা তাঁকে সর্ব্বদা, যে রকম ছিলেন, আবার তেমনই দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে। আমি কোন একটি সম্ভবনাকে অনিশ্চিত বলে ধরছি না, কারণ দুটোই নিম্নমুখী, শুধু অনুভব করবো যে.. স্বামিজীর চরিত্র ও অভিপ্রায়ের গঙ্গাপ্রবাহ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাসাগরের দিকে। অনন্তের সেই মহাতরঙ্গের তুলনায়, আমাদের জীবন বা আমাদের মৃত্যু কী মূল্য তাদের! তুমি এখানেই আছ, সুতরাং আমরা কথা বলতে পারি! কত কি দেখছি, বুঝছি-আমি!

সেণ্ট সারা তোমাদের সকলের বিষয়ে বড় মধুর ভালবাসা ভরা কথা বলছেন।

ওঃ য়ুম, যে আত্মা সত্যই মহান ও আলোকিত, তার পক্ষেই এইভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব। ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তগুলি আবার আসবে, অবশ্যই, কিন্তু মনে হয় তাদের সংখ্যা কমে যাবে, এবং স্বাস্থ্য ফিরলে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রথমে খুব ধীরে, সন্তর্পনে, তারপরে আরও স্পষ্টভাবে কাশ্মীরের বৎসরটির পুরানো অপূর্ব্ব সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। মাতৃত্বের জন্য তীব্রবাসনা ওলিয়ার মধ্যে যা মূর্ত্তিমতী, সারার মধ্যেও তাই রয়েছে; কেবল সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানো চাই। স্বামিজীকে আবার শিশু ভগবানরূপে (হেলি চাইল্ড) দেখার ক্ষমতা ফিরে পেতে হবে। এখন তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন মনে হয় না, কিন্তু বুঝতে পারছি, তাঁর হৃদয়ে রয়েছে সেই অনুভব। ..

রাত্রে তিনি এখন, অনেক অনেক ভাল। একসঙ্গে সারাদিন, সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কাটাবার পরে বিদায় নিয়েছি। তিনি আমাদের বলেছেন, আমি যেন তোমায় তাঁর গভীর সহানুভূতি জানাই।

১২ই জানুয়ারী ১৯১১ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

সে যাই হোক ... ফরাসী জাহাজে যাওয়া হবে, আমরা থাকবো ফরাসি চন্দননগরে। আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁর (মিসেস বুলের) অতিশায়িত চিন্তাভাবনা ইত্যাদি। আমি অবশ্য পৌঁছবার পরে, ফরাসি ভূমিতে বাঁধা থাকতে খুবই ইচ্ছুক— যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিজের লেখা ও বসুর বৈজ্ঞানিক রচনার সম্পাদনার কাজ ঠিকমতো চালিয়ে যেতে পারবো। এই জিনিষগুলি সম্বন্ধেই কেবল করার অধিকার আমার আছে, মনে করি। আমি অবশ্য সেখানে সেকুলার পোষাকে ও ছন্দনামে থাকবো।

'দি মাস্টার' বইটির উৎকৃষ্ট আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬ই জানুয়ারী ১৯১১, ডঃ চেনীকে লিখলেন ঃ মিসেস বুল খুবই অসুস্থ। তাহলেও আপনাকে গভীর শুভেচ্ছা ও অনন্ত ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেন নি। যদি কোন কিছু, আমার সাফল্য বলে তিনি মনে করেন, তাহলে তাঁর হৃদয় উদ্বেল

হয়ে ওঠে এবং অপরিসীম গর্ব্বিত হন। হিবার্ট জার্নালে আপনার আলোচনাটির সূত্রে তিনি প্রায় একটি উৎসব খাড়া করে ফেলেছেন—তাঁর ঘরের ফুলগুলির মধ্যে, একটি উৎসর্গিত হয়েছিল প্রিয় ডঃ চেনীর পক্ষে।

১৮ই জানুয়ারী ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

শোক সংবাদ ইতিমধ্যেই তোমাকে তার করে দেওয়া হয়েছে। গতকাল কী উজ্জ্বল দিন কাটিয়েছিলেন। প্রদীপ নেভার আগে, শেষ উজ্জ্বলতা। আজ সকাল ৫টায় অল্প তিনটি গোঙানি। সেই হল সংকেত। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরেছিলাম, ৮টায় তাঁর দেহান্ত পর্য্যন্ত। মিঃ থর্পা, ওলিয়া, ডাক্তার—সকলেই এখানে ছিলেন। তাঁদের আসার আগে, যখন হয়ত সজ্ঞান তিনি, আমি মন্ত্রোচ্চারণ করলাম— "হরি ওঁ। রামকৃষ্ণ! ওঁ শান্তি!" শেষ যখন আমরা খ্রীষ্টীয় আশীষ বচন পাঠ করলাম— আত্মা নির্গত হয়ে গেল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবই মঙ্গল। আমি জানতাম তিনি চলে গেলেন স্বামিজীর সান্নিধ্যে— একেবারে সরাসরি। গতকাল তিনি চাপস্বরে বলেছিলেন : আমি এখনো আমার ডেস্কের ওপরে স্বামিজীকে এনে রাখিনি। তিনি বলেছিলেন— যিনি বীর। বুঝেছিলাম, তিনি বুদ্ধের কথা বলতে চাইছেন। তিনি বলেছিলেন— 'এ পর্য্যন্ত সে মূর্ত্তি দেখেনি। আমি উত্তর দিলাম, 'প্রিয় আমার, তুমি কাল সকালেই তা দেখবে।" অন্যভাবে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ যে ভাবেই হোক আমি একটা কিছু তাঁর জন্য করছিলাম যা সন্তুষ্ট করেছিল তাঁকে। কত ক্লান্ত ছিলেন! এখন তিনি দেখছেন— স্বামিজীকে বুদ্ধরূপে!

১৮ই জানুয়ারী ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

... ফেরার পথে শীঘ্রই তোমার কাছে হাজির হবার সুযোগ, তুমি আমাকে দেবে তা জানি। মের কাছে এবং তোমার কাছে একটু উঁকি দেব যদি সম্ভব হয় প্যারিসে দু'একদিন থেকে ব্যুতে দ্য মোভেল এর সঙ্গে দেখা করে চন্দন নগরের জন্য পরিচয়পত্র জোগাড় করব— তারপর ফিরে চলো — ফিরে চল— ফিরে চলো ভারতে এবং কাজে। সেন্ট সারাই আমার প্রত্যাবর্ত্তনের গোটা পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে যে, ফরাসি সরকারের সৌজন্য চাওয়ার ঔচিত্য আছেই। তারপর চন্দননগরে খোলাখুলি বাস করবো- এমন কি এই লেখিকার মর্য্যাদা সেই সঙ্গে থাকবে— যিনি সহজ জীবন চান ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিকল্পনাটি এখনো কার্য্যকর করার চেষ্টা করতে পারি। এর জন্য ফরাসি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্যে আমার নিজের নামে পরিচয়পত্র প্রয়োজন। তবে চন্দননগরে পৌঁছবার আগে পর্য্যন্ত যাত্রাপথ বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে টু শব্দ নয়। যাত্রাপথে ছদ্মনাম নিতে পারি। একথা তোমাকে বলছি, যাতে কোন সময় নষ্ট না হয়। অনুগ্রহ করে মিঃ র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে বিষয়টির আলোচনা করো। আমি মেশজেরি মারিতিম এর জাহাজ সম্বন্ধে জানতে চাই। দু'এক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই তোমার কাছে পৌঁছাচ্ছি। জানি যে তুমি আমাকে গ্রহণ করবে। দয়া করে একটা ব্যর্থ এর ব্যবস্থা করে রেখো। তোমারই জন্য করছো — এইভাবে।

১৮ই জানুয়ারী ১৯১১, মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

সকল পরিকল্পনা যেন একেবারে নিঃশব্দে, চূড়ান্ত গোপনে রাখা হয়।

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ, জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ার সঙ্গে। সেখানেই শেষ তার জীবনের ইতিবৃত্ত। কিন্তু যারা! রয়ে গেল ধূলার ধরণীতে প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে। তারাই করবেন, তাঁর সে স্মৃতির রোমন্থন।

দেহত্যাগ করে ঊর্দ্ধালোকে যাত্রা করলেন সারা আর নিবেদিতা ধূলার ধরণীতে বসে মনের পটে রোমন্থন করতে লাগলেন অতীতকে :

'বেলুড়ের সেই জীর্ণ বাড়ী, একত্রে বাস তিনজনের। তারপর উত্তর ভারত ভ্রমণ ... রিজলি ম্যানরে তাঁকেও সারাকে স্বামিজীর গৌরিক উত্তরীয় প্রদানান্তে আশীর্ব্বাদ দান। ... ব্রিটানীতে সারার ঘরে স্বামিজীর আগমন ... সব কাজে সারার প্রগাঢ় সহানুভূতি, প্রতিটি বই প্রকাশে অসীম উৎসাহ ও সাহায্য অকপটে প্রশংসা ... সব শেষ হয়ে গেল। ... একে একে সকলেই, মৃত্যুর ক্রোড়ে বিশ্রাম নিয়ে চলেছে।'

মিসেস বুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসম্পন্ন হল। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁর কন্যা ওলিয়া এসেছিলেন মার কাছে। এসেছিলেন ভাই মিঃ থর্প। তাঁর আর অনর্থক সময় নষ্ট করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অপেক্ষা তাঁকে করতে হল—সারার উইলের সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য।

ইতিমধ্যে তিনি শিব ও বুদ্ধের উপরে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত সারার উইলে ডঃ বসুর ল্যাবরেটরী ও তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকার কথা। এটা জানার জন্যই তিনি ওখানে অবস্থান করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ওলিয়ার ব্যবহারে তিনি ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রতি ওলিয়ার ভালবাসার অভাব ছিল না কিন্তু স্বভাব ছিল, কোন ধারনা মনে তার উঁকি দিলে, সহজে তা দূর করতে পারতো না। তার মনে দৃঢ়বদ্ধ ধারণা জন্মেছিল, নিবেদিতা মার সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য এখানে এসেছেন, তার মাকে বিষ প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য কারণ ছিল : নিবেদিতা সারাকে কবিরাজী ওষুধ 'মকরধ্বজ'— খাওয়াতেন যন্ত্রণা লাঘবের জন্য— ওলিয়া ও তার বন্ধুরা এটাকে বিষ প্রয়োগরূপে প্রচার করে চললো।

ওলিয়ার অস্বাভাবিক আচরণে তিনি আতঙ্কিত হলেন। তিনি সারার বাড়ি ত্যাগ করে বস্টনে মিস অ্যালিস লংফেলোর সঙ্গে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তিনি কি ঐশ্বর্য্যের প্রয়াসী? না স্বেচ্ছায় দারিদ্র ব্রত গ্রহণ করেছেন? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন : একি করলে ঈশ্বর!

কাজ পরিপূর্ণ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এটাও জানার প্রয়োজন : সারা, সে কাজের জন্য কি ব্যবস্থা করে গেছেন। সব কাজের প্রেরণা দাত্রী ও সহযোগী তো ছিলেন তিনিই!

শীঘ্রই মিসেস বুলের উইল প্রকাশিত হল। জানা গেল— উইলে বেশ কিছু টাকা ভারতের কাজের জন্য সারা নির্দ্দিষ্ট করে গেছেন। এত টাকা ভারতে যাবে? ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ওলিয়া। স্থির করলো: এ উইলের বিরোধিতা করবে।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। মিঃ ই. জি. থর্পের (সারার ভাই) উপরে ভার দিয়ে ইংলণ্ডে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যা সত্য, তাই হোক! শিব! শিব!— ধীর, স্থির রইলেন নিবেদিতা।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১১ সংবাদ এলো স্বামী সদানন্দ কলকাতায় দেহত্যাগ করেছেন। চোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি। স্বামী সদানন্দ জীবনে তাঁর পরমাত্মীয়। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর থেকে তিনিই সে স্থান পূরণ করেছিলেন। গত বছর যখন তিনি অসুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁর থাকার সকল ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। অনেক সময় তাঁর পথ্যাদি প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিতেন। অবসর মত তাঁর কাছে গিয়ে বসতেন, কথাবার্ত্তা বলতেন। মিসেস বুলের পীড়ার সংবাদের টেলিগ্রাম পেয়ে দার্জ্জিলিং থেকে চলে এসেছিলেন। সে সংবাদ তিনি অবগত ছিলেন না। দার্জ্জিলিং-এ যখন যান তখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তখন বুঝতেই পারেন নি এটাই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ।

একে একে অনেকেই চলে গেলেন। প্লেগের কাজে তাঁর কী উৎসাহ। কত প্রকারে, তাঁকে সাহায্য করেছেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, কাশী, সর্ব্বত্র তাঁর বক্তৃতা সফরে তিনিই ছিলেন তাঁর সঙ্গী। তাঁর কি অগাধ স্নেহ, কি অগাধ বিশ্বাস। The Master as I saw Him প্রকাশ হলে তাঁর কত আনন্দ। আজ সব শেষ। মৃত্যুর ধীর পদধ্বনি, অন্তরে অনুভব করতে লাগলেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না—জেনেছেন : মৃত্যুর অর্থ এক অনন্ত সত্তায় অবলুপ্তি।

আমেরিকা ত্যাগ করে ভারত আগমনের পথে ইংলণ্ডে এলেন। সংবাদ পাবামাত্র পুরাতন বন্ধুবর্গ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। মিঃ র‍্যাটক্লিফ, মিঃ নেভিনসন, অধ্যাপক চেইন সকলেই তাঁর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ লাভে আনন্দিত হলেন। এঁরা প্রত্যেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর উপদেশ, পরামর্শকে মূল্যবান মনে করতেন। তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে ভগবদ্গীতা, স্বামিজীর বক্তৃতাবলী পাঠ করে "হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে পারদর্শীতা লাভ করেছেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁরা অকপটে স্বীকার করেছেন— প্রাচ্যের নিকট, সাহায্যের প্রত্যাশী পাশ্চাত্যবাসী— বিশেষ করে নিবেদিতা ও তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে।

ইংলণ্ড থেকে প্যারিস এলেন। মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস লেগেট তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্বামিজীকে কেন্দ্র করে মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। মিসেস বুল সে বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন। বার বার স্বামিজীর কথা স্মরণ হতে লাগলো— শরীর আসে ও যায়, কিন্তু সত্যকারের বন্ধনের ক্ষয় হয় না, কারণ সকলেই সেই অনন্ত সত্তার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র! সকলেই এক!

পরস্পর সাক্ষাৎ হল। গভীর আবেগে শোকাতুরা নিবেদিতাকে বুকে তুলে নিলেন মিস ম্যাকলাউড। সান্ত্বনা দিলেন। ভবিষ্যৎ কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ দিলেন। মিসেস বুল দেহ রাখায় নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ওলিয়ার দেওয়া অপবাদে যে আঘাত পেয়েছিলেন, অনেকখানি লাঘব হল। নিজেকে ফিরে পেলেন নিবেদিতা। তাঁর ক্লান্ত ও ভাঙা মন পুনরায় কর্ম্মমুখী হল। বার বার মনে হতে লাগলো: স্বামিজীর কর্ম্মভার সম্পন্ন করাই তো তাঁর জীবনের ব্রত। হতাশায় অবরুদ্ধ হওয়া তাঁর চলে না!

২৩শে মার্চ্চ ১৯১১ মার্সেলিন সেই ভারতগামী জাহাজে উঠলেন। মনে মনে ইউরোপের কাছ থেকে বিদায় প্রার্থনা করলেন। জাহাজ ছাড়লো—আপন মনে বলে উঠলেন— দুর্গা!

২৭শে মার্চ্চ ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : আজ যখন জাহাজের ডেকে বেরিয়ে এলাম, তখন ক্রীট থেকে ৪/৫ মাইল তফাতে মাত্র! ক্রীট তার সুদীর্ঘ তুষার গিরিমালা নিয়ে অপরূপ। স্মৃতিতে ১৮৯৯ সালে পাশ্চাত্য যাত্রাকালের ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

২৯শে মার্চ্চ ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

... সে যাই হোক, আমি ঠিক করেছি যে, অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে আমাকে যেতে হবে, তার মুখোমুখি হব সাহসের সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে। ... মিঃ থর্পকে লিখেছি, যেখানে দরকার, সেখানে আশা করি আমার পক্ষে তোমাকে কাজ করতে দেবে। মনে হয়, আমার মনোভাব মামলায় অসুবিধা ঘটাবে। আমি মিঃ পার্কারকে লিখেছি, তিনি যেন বিশেষ বিশেষ সময়ে সেন্ট সারার সঙ্গে আমার কতকগুলি গোপনীয় বৈষয়িক আলোচনা হয়েছিল, সেগুলির স্বত্বরক্ষা করেন। তার বাইরে আমার কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা অবশ্যই নিরানন্দকর হবে, কিন্তু সহ্য করতেই হবে, সহ্য করা যাবে। এ পথ স্বামিজীই দেখিয়েছেন। বিচিত্র বিষয় লক্ষ্য করেছি আমি। খ্রীষ্টের বিচারের দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখবে যে, যখন সমস্ত পৃথিবী তাঁকে বিচারের কাঠগোড়ায় তুলেছে, তখন যথার্থতঃ তিনিই পৃথিবীর বিচার করেছিলেন। সুতরাং দৃঢ় হও। এখানেই অবতারের দেওয়া শক্তি। তাঁর (খ্রীষ্টের এবং স্বামিজীর) কোন একটি সহজ আচরণ বুঝবার জন্য সমস্ত জীবনের— জীবনের সুগভীর যন্ত্রণার প্রয়োজন হয়। এসব কথার উল্লেখ আর করার দরকার হবে না ভবিষ্যতে, এবং আমি আর কিছু জানতেও চাই না, যদিও আমি সম্মুখীন হতে পারবো—প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। শিব! শিব!

২রা এপ্রিল ১৯১১ ইউরোপ থেকে ভারতে ফিরছেন, জাহাজে ভাইসরয় কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য ফ্ল্যাকের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। স্বামিজী সম্বন্ধে তাঁকে অনেক কথা বললেন। মহিলা সেসব কথা শুনে মোহিত হলেন। আবেগভরে কর্ণেলিয়ার ভূমিকার কথা ফাঁস

করেদিলেন। সে কথা শুনতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করলেও শোনার প্রয়োজন তাঁর ছিল। মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

...ঘটনার সমাপ্তি হল এইভাবে— এই মধুর মহিলাটিকে বললাম : আমি যথার্থই কে? যাত্রা ছিল তাঁর ছদ্মবেশে। সেই সঙ্গে আমারে জীবনের সমস্ত কিছুর কথা বললাম তাঁকে৷ তার ফলে তিনি স্বামিজীর কথা শুনবার জন্য, সব কিছু জানবার জন্য একেবারে ক্ষুধার্ত্ত। শেষের দিকে প্রতিদিনই আমরা একসঙ্গে এক ঘন্টা কাটিয়েছি। তিনি মিস লংকেলোর মত সরে গিয়ে ব্যাপারটা রোমন্থন করেছেন— তারপর আবার এসেছেন, নূতনতর প্রশ্ন নিয়ে। এই ধরনের কাজ আমাকে করতেই হয়েছে, কারণ প্রথম যে সংবাদ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তা হল— কর্ণেলিয়া সোরাবজি তাঁর স্বামীর (মিঃ ফ্ল্যাকের অধীন কর্ম্মরত) সে কথা শোনবার সময়ে নিজেকে খুবই ছোট মনে হচ্ছিল। কারণ আর কিছু না, স্বামিজীর দিব্যবার্ত্তা শুনে মোহিত এক মহিলার কাছ থেকে রাজনৈতিক সংবাদ বার করেছি বলে।

৭ এপ্রিল ১৯১১, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : বোম্বাই বন্দরে উষার উদয়। রাত্রির আঁধারে আচ্ছন্ন দ্বীপখানি যেন, উত্থিত হল জলতল থেকে। ...ভারত-ভারত অবশেষে!

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষের তটরেখা। জাহাজ ধীরে ধীরে বোম্বাই এসে পৌঁছলো। নামলেন তটভূমিতে— হ্যাঁ এই তাঁর স্বদেশ, জীবনের সেরা তীর্থস্থান। সেখান থেকে ৯ই এপ্রিল বোসাপড়া লেনে এসে পৌঁছলেন। স্বস্তি ফিরে পেলেন। নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন তবে স্বনামে নয়-ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে। এছাড়া ভারতে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না।

১১ই এপ্রিল ১৯১১ শ্রীমা দাক্ষিণত্য ভ্রমণ সেরে পুরী হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। পর দিন সন্ধ্যায় উদ্বোধনে গিয়ে তিনি তাঁর পাদস্পর্শ গ্রহণ করলেন। শ্রীমার স্নেহস্পর্শে হৃদয় মন সান্ত্বনা লাভ করলো। মিসেস বুলের দেহত্যাগ সংবাদে স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সকলেই ব্যথিত। এ সংবাদ শ্রীমা তাঁকে জ্ঞাত করলেন। তিনি নিজেও এ সংবাদে বিশেষ বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করছেন।...

শ্রীমা এবার কলকাতায় অল্পকয়েক দিন রইলেন। ১৭ই মে জয়রামবাটী উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জীবনে শেষ বারের মত এই কয়েকদিন তাঁর পরিপূর্ণ সঙ্গলাভে নিজেকে পূর্ণ করে নিলেন। বোসপাড়া লেনে পা দেওয়া মাত্র শত কাজে তিনি লিপ্ত হয়ে পড়েছেন, তবুও যেটুকু সময় পান, মার পাশে ছুটে যান, তাঁর পরশে মনে শান্তি লাভ করে নোতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। অন্তর থেকে কে যেন বার বার বলতে থাকে— সময় আর নেই— যা করার সত্বর সেরে নাও!

১২ই এপ্রিল ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : রবিবারে পৌঁচেছি। ফেরার কি আনন্দ। আজ রাত্রে বিজ্ঞানের মানুষটি মামসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন এক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য। কিন্তু আজ তিনি অসুস্থ, আমরা ভয় পাচ্ছি। তবু আবার কাজ শুরু হওয়ার আনন্দ অপরূপ। কী শিথিল মুষ্টিতেই মানুষের আনন্দ ধরা থাকে, আর সুখের মধ্যে ঢাকা থাকে কতখানি দুঃখ।

মাতাঠাকুরানী গতকাল কলকাতায় পৌঁছেছেন দীর্ঘ তীর্থযাত্রা সেরে। আমি এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। এর ফলে একটু যে শান্তি পেলেন, তার জন্য মনে হয় তিনি কৃতজ্ঞ হবেন।

বিজ্ঞানের মানুষটি বলছেন, পরাজয়ের জন্য, আমাদের নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে। সুতরাং ৬ মাসের জন্য স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছি এবং খরচ একদম কমিয়ে আনছি। কৃষ্টিনের স্থান পরিবর্ত্তন দরকার। সে মায়াবতীতে গ্র্যানীর (মিসেস সেভিয়ার) সঙ্গে ৬ মাস থাকবে।

১৯১১ সালের প্রথমে কৃষ্টীন ভারতে প্রত্যাগমন করলেন। কিন্তু তখন নিবেদিতার সঙ্গে মতদ্বেষ দেখা দিয়েছে। নিবেদিতা ফেরার কয়েকদিন পর ১৯শে এপ্রিল ফ্রান্সিস জন আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মায়াবতী চলে গেলেন।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সকালে গঙ্গাস্নান করে বেলুড় মঠে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। স্বামিজীর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। বার বার মনে হতে লাগলো— যে ভার তিনি অর্পণ করে গিয়েছেন, তার কতটুকু তিনি সম্পন্ন করতে পারলেন? মনে পড়ে গেল মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন— "তোমার কি মনে পড়ে 'কায়রোই' (কিরো পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদ) বলেছিলেন : বিয়াল্লিশ বছর থেকে উনপঞ্চাশের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। বয়স তখন ছাব্বিশ, —একটা যুগ দেখার অবকাশ পাবেন। বর্ত্তমানে চলছে সেই যুগের শেষ প্রান্ত— ১৯১২ সালে আমার মৃত্যু! এই ক'বছরে ভারতের কোন পরিবর্ত্তন হবে কি? স্বামিজীর কাজে, এতটুকু লেগেছি কি? দেখে যেতে পারব কি? ... নিজের মনে বলে উঠলেন: হ্যাঁ এ কামনাই আমার পূর্ণ হোক। এর বেশী কোন আকাঙ্ক্ষা আমার নেই— শুধু সে ভার বহনের অধিকারটুকু চাই! মুক্তি চাই না— সে বাসনা আমার নেই।

এসে গেল মে মাস। স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ। ১২ই মে যাত্রা করলেন মায়াবতী। সঙ্গে গেলেন সস্ত্রীক ডঃ বসু ও ভাগিনেয় অরবিন্দ বসু।"

যাত্রার দিন শ্রীমাকে প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করলেন। এটাই শ্রীমার সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ। মায়াবতীতে মাস খানেক কাটালেন। কৃষ্টিনের সঙ্গেও দেখা হল। দিনগুলি আনন্দেই কাটতে লাগলো। বসুর নতুন বই লেখা আরম্ভ হল। নিজের নানাবিধ লেখা ছিল সেগুলোও লিখে চললেন নিয়মিত। ডঃ বসু আশ্রম বাসীদের কাছে বক্তৃতা দিলেন ১৮ই মে ১৯১১।

মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : শিব! শিব! প্রাচ্যের সুমহান পথে আরও এক পা এগোলাম, আনন্দ, আনন্দ আমার। কিন্তু তোমার জন্য বুকে মোচড় লাগবে— হয়ত তুমি নিজের দিকে নজর দেবে না মোটে, ফলে, হারিয়ে যাবে চোখের সামনে থেকে। না- না- না - বাঁচো - বাঁচো - বাঁচো তোমার জীবন মানে আমাদের সুখ! যতই বাঁচো, তার পরিণাম কম হবে না এতটুকু।

তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি একাকী, তার জন্য ভেঙে পড়ে কাঁদতে পারি। তোমার আছে শক্তি। আমার ভালবাসা দিও- সব কিছুতে, সকলকে বিশেষ করে র‍্যাটক্লিফদের আর যদি চাও মেকে। আমি চাই শুধু বিশ্বাস করতে, শুধু বিশ্বাস করতে, আর নীরব হতে। কোন গুহায় মাত্র ২০ বছর নিঃসঙ্গ বাস, এইসব আসক্তির ইন্দ্রিয়জ স্থানগুলি একেবারে মুছে দিয়ে, সত্যকার অনুভূতি দিতে পারে এবং যথার্থ আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে — একি সত্য নয়? কিন্তু সেক্ষেত্রেও ও জিনিষ ঘটবে না, যদি না ঐ নির্জ্জন জীবনের সমস্ত সময়ে, ব্রহ্মে নিমজ্জিত থাকা যায়! সেই অনন্ত উপলব্ধির মধ্যে, মানুষ চির আনন্দে পূর্ণ থাকে।

'ক্রাইস্ট দি মেসেনজার' পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম, তুমি কি ভাবে, কোন আলোকে, তাঁকে দেখেছো? হ্যাঁ, নিশ্চয়, তোমার আধ্যাত্মিক বোধ সত্যই প্রত্যক্ষ।

১৯শে মে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : গতকাল আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ডঃ বসুকে ভাষণ দিতে হয়েছিল। 'বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন' (Intellectual Culture)। তিনি বললেন : জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ধর্ম্মীয় ও জাগতিক, এইরূপে ভেদ করার প্রয়োজন নেই। আর আমি বললাম :

ধর্ম্মপথবর্ত্তীদের পক্ষে, সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান সাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা। তাতে তরুণদের কেউ কেউ ভড়ং করে বললো : শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত ছিলেন না। পরে খোকা বললো, ঐ কথা শুনে সে এতই রেগে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়েছিল। ওরা কি উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, গঙ্গার ধারে দিনের পর দিন বসে এক হাতে মাটি, অন্য হাতে টাকা নিয়ে এ হাত, ওহাত বদল করা এবং পরিশেষে দুটোকেই সমমূল্য জ্ঞান করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অর্থ কি? ওই নির্ব্বোধেরা কি অনুভব করতে পারে না— এর জন্য কতখানি মনঃশক্তির প্রয়োজন? ওরা কি মনে করে যে— তা গণিত, গ্রীক, পদার্থতত্ত্ব, বা ধর্ম্ম যাতেই প্রকাশিত হোক, কোনো পার্থক্য হয়? ওরা কি দেখতে পায় না— জ্ঞানের অভেদবোধই শিক্ষার মূল কথা?

নিবেদিতা মায়াবতীতে থাকাকালেই কৃষ্টীন তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বাসের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়— ব্রাহ্ম স্কুলে কাজ নেবার অভিপ্রায় জানালেন। যদিও উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। সুখে দুঃখে মিলিত হয়ে উভয়েই স্কুলের কাজ করে এসেছেন। মানসিক বিচ্ছেদের কারণটা অজ্ঞাত রয়ে গেল। নিবেদিতা কিন্তু তাঁকে দোষারোপ করলেন না। স্বামিজীর অভিপ্রেত নারীজাতির শিক্ষাকাজে সাহায্য করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রমও করেছেন। তবু মনে পেলেন আঘাত, বোধ করলেন বিচ্ছেদ বেদনা। উপলব্ধি করতে শুরু করলেন দিন তাঁর শেষ হয়ে আসছে।

নিবেদিতা ভারতে চলে এলেও মিস ম্যাকলাউড তাঁর মামলা বিষয়ে সংবাদ পত্রে যা প্রকাশিত হচ্ছিল, সেগুলির বিবরণ নিয়মিত পাঠাতে লাগলেন। কাগজে লেখা বিষয়গুলি তাঁকে দগ্ধ করতে লাগলো। শেষে তা, সহ্য করতে না পেরে মিস ম্যাকলাউডকে কাতরভাবে সেগুলি পাঠাতে নিষেধ করলেন।

এই মিথ্যার প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন আমেরিকার সুবিখ্যাত কবি ও লেখিকা এনা হুইলার উইলকক্স। তিনি নিউইয়র্ক ইভনিং জার্নবকে ২৭শে মে ১৯১১ লিখলেন :

The sensational statements made in the will contest case of Ms. Oli Bull regarding to the teaching of Vedants are most misleading and unjust to the great philosophy. It was my privilege to be a pupil of Swami Vivekananda during his two winters in Newyork.

This I regard at the greatest intellectual and speritual opportunity of my life. Neither in the lecture of Vivekananda, his books or the Vedata philosophy are to be found any of the "wield" 'uncanny or unwholesome teachings related by the witnesses as part of Mrs. Bull's' lessons'. The breathing exercises, inhaling, retention of the breath and exhaling using a word which means Gall, are a part of Vedanta teaching.

The very first physical act of a new born child is to breathe a long breath. After a few years children, especially in our Western World, cease to breathe deep breaths, because they wear restricting garments and live in doors and sit and stand with indrawn chest. In the orient, the morning devotions are begun with breathing exercises. Therefore, tuberculosis and catarrhal troubles are the least prevalent of all maladies in India. Vivekananda repeatedly warned his pupils against exces in these exercises. Properly practised, they produce physical, mental and spiritual strength. Overdone, they produce disaster. Precisely as the right use of the 'X' and violet rays cure disease, and the wrong use kill, or as a tonic may stimulate digestion and too much tonic may induce endigestion.

In all religious sciences, arts and professions there are too many teachers illy prepared for their work.

Vivekananda was a Master. He urged the more careful preparation and years of study and self development before his pupils attempted to be teachers. Despite his warnings, many of them rushed into field to import informations which they had not yet received.

The Vedanta philosophy teaches the full development of body, mind and soul and methods of concentration and the realisation that all life is one. Christ studied this philosophy in the Orient, and it was a part of 'Vedanta' when He said, "I and my father are one."

There are many foolish women who study Vedanta and think they must cease to be human, who strive to be disembodied spirits while still in the earthly form.

But, properly understood, the religion teaches each human being to make the best of life in the position to which he or she is called. The best wife, husband, parent, friend and citizen, and to perform every duty cheerfully and perfectly and to be happy in this life while conscious that it is only one plane of many—one room in the Fathers mansion.

If Mrs. Bull feared demons, and rubbed her furniture with oil to drive away uncanny influences, she did not learn these things from Vedanta philosophy. For that teaches, above all things, that each soul makes its own destiny and contains all devine powers within itself, and that through realisation of the one life we may all become Christ, "One with the Father."

Absolute fearlessness, absolute unselfishes, absolute kindness to all living things must result from a proper understanding of the real Vedant philosophy. It is profound as the ocean depths; all other religions, all other philosophies, all the science are contained in it, and, while it has its codes and the rules for those who wish to become adepts and masters, it has also its simple wholesome and helpful line of training for the man and woman who want to make happy homes and successful toilers. It teaches self-reliance, self conquest and self-development and these must be the [....] of immotality.

১৬ই মে ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

নৈনিতাল থেকে আলমোড়া যাওয়ার পথে ১৮৯৮ সালে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মসুয়ানালায় তুমি যে বিশেষ ঘরটিতে ছিলে, এখন তাতে আছি, সে আনন্দ বুঝতে পারো? স্বামিজী এখানেই আমাকে আমার জীবনের প্রথম তুষার শৃঙ্গ দেখান। শিব! শিব!

য়ুম, য়ুম গো! আমি অনুভব করছি কত বেশী, আর আমার বলার শক্তি কত অল্প। আজ বোধ হয় বসুদের বাড়ীতে নতুন ঘরের ইঁট গাঁথা হল। আজ মায়েরও জন্মদিন। প্রার্থনা করি এই দিনে, দিনটি পবিত্র। ডার্লিং, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। এইটুকুই তো চাইতে পারি শুধু!

ইংলণ্ডের রাজাকে ভারতসম্রাট রূপে অভিষিক্ত করা হবে, ভারতবর্ষের পক্ষে কিনা প্রকাণ্ড গৌরবের কাণ্ড হবে, মিসেস বেশাণ্ড বোঝাতে চাইলেন : যা প্রকাশিত হল ২রা জুন ১৯১১।

২রা জুন ১৯১১ 'India' পত্রিকায় প্রকাশিত হল অ্যানী বেশান্তের ভারতবিরোধী সুর : The Sentiment of India is not democratic, it is enterely aristocratic and royalist. The people would like a royal Viceroy. ...

Ibid-এ প্রকাশ করলেন : The National Movement was a thing of our own creation.

১২ই জুন ১৯১১ মিঃ র‍্যাটাক্লিফকে লিখলেন :

...নিষিদ্ধ সাহিত্যের জন্য বাড়ি বাড়ি তল্লাশ — স্কুল কলেজে ভর্তি বন্ধ করা, শিক্ষার খরচ বাড়িয়ে দেওয়া- অধিকাংশ উত্তর পত্রের উপরে 'ফেল' কথাটা লিখে দেওয়া, পাঠ্যসূচীর বাইরে থেকে প্রশ্ন দেওয়া— তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ করতে না দেওয়া— এসবের অর্থ কি আমরা অনুধাবন করেছি? এই সকলই করা হচ্ছে একটি বিরাট জাতিকে ধ্বংস করে, তার দ্বারা স্বশ্রেণীর মানুষদের স্বার্থসিদ্ধির 'নগ্ন' নিলর্জ্জ উদ্দেশ্যে।

কে উপলব্ধি করেছে যে, বর্ত্তমানে— এখানকার সরকারের শিক্ষানীতি, স্পেনীয় ইনকুয়িজিশনের বাড়বাড়ন্তকালের তুল্য করে তুলেছে, কিংবা ৬০ বছর আগে ইতালিতে পোপের অপরিমার্থিক শাসনকালের সমস্তরীয় করেছে?

এরপরে ২৩শে জুন ১৯১১ —Ibid-এ বেরুলো : The Conquest of one country by another is not, as many people think, an evil thing. It was the English who had made an Indian nation possible... The Indian civil Service on the whole a splendid service... which is trying honestly, bravely, thoroughly to accomodate itself to the new position.

ভারতে ফিরে এসে কাজের মধ্যে ডুবলেও, চিন্তা ছিল সবসময়ে স্কুলের ভবিষ্যৎ কি? একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পিছনে থাকে অর্থের প্রয়োজন। যে অর্থ এতদিন জুগিয়ে এসেছিলেন মিসেস বুল। আজ তিনি পাশে নেই। মিসেস বুলা উইলে কিছু রেখে গেছেন সেখানেও প্রতিবন্ধকতা অথচ তাঁকে (মিসেস বুলকে) তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন ১৯০৬ সালে চিঠির মারফৎ 'যদি তাঁর আগে মৃত্যু হয়, বিভিন্ন সৎকাজের জন্য কয়েক হাজার পাউণ্ড তিনি যেন তাঁর উইলে রেখে যান। তাঁর (নিবেদিতা) নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী সদ্ব্যায় করার উদ্দেশ্যে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ছিল জাতীয় শিল্পকলার পুনরুভ্যুদয়। প্রাচীন শিল্প কলার পুনরুত্থান যখন ঘটবে, তখনই শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে ভারত। ইচ্ছা ছিল ভারতীয় শিল্পকলার প্রতিযোগিতার জন্য এক হাজার পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট রাখবেন। তার সুদে প্রতিবছর ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচ্যধরণে অঙ্কিত চিত্রের জন্য ভারতীয় শিল্পীকে পুরস্কার বিতরণ করা হবে, ডঃ বসুর অভিপ্রায় অনুযায়ী কৃষ্টিনের কাজ অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁর সঞ্চিত এক হাজার পাউণ্ড, তাঁর রচনাবলীর বিক্রয়লব্ধ আয়, ও মিসেস বুলার দেওয়া প্রতিশ্রুত দু হাজার পাউণ্ড রেখে যাবেন।' সে পত্রে একথাও লিখেছিলেন আয়র্লণ্ডকে স্মরণ করতে পারলে আনন্দিত হতাম, তবে সে কাজ আমার নয়। কৃষ্টিনের যদি ইচ্ছা হয় তার জন্য সামান্য অর্থ রেখে যাবেন। সমস্ত ব্যবস্থাই অন্যরূপ হয়ে গেল। ওলিয়া তাঁকে এক হাজার পাউণ্ড দিতেও রাজী নয়। বার বার মনে হতে লাগলো যদি অর্থের দাবী তিনি পরিত্যাগ করতে পারতেন! বাস্তবে তাও সম্ভব নয়। নির্দ্দিষ্ট অর্থ ছাড়া কৃষ্টিনের পক্ষে স্কুল চালনা সম্ভব নয়। লেডি মিন্টোর সঙ্গে আলাপের পর তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, সে প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিদেশী শাসন উচ্ছেদ তাঁর লক্ষ্য, জাতীয় শিক্ষাকাজে বিদেশী সরকারের সাহায্য গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব কি? তাঁর শর্ত: বিদেশী সরকারে সঙ্গে তাঁর স্কুলের কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়।

এই কারণেই তিনি অর্থসঞ্চয়ে এত ব্যগ্র! ঠিক এই সময়ে মি. ই. জি. থর্পের কাছ থেকে সংবাদ এলো—উইলের মীমাংসা হয়ে গেছে। তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থের ব্যবস্থা হয়েছে। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি এবং মৃত্যুকে বরণ করতে পারবেন চিন্তাশূন্য হয়ে!

মনের কোনে উঁকি মারে, ওলিয়ার নৃশংস আচরণের কথা। শুধু তিনি নয়, নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও পীড়িত করেছিল। তার নিজের মামা মিঃ থর্প নিবেদিতার পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁর

মামলার তত্ত্বাবধানের ভার নিতে এগিয়ে এলেন। কবি লংফেলার কন্যা মিস লংফেলা (পরে তিনি মিঃ থর্পকে বিবাহ করেন) নিবেদিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলেন। যাঁরা ওলিয়ার সমর্থক, তাঁরা শুধু নিবেদিতাকে লাঞ্ছিত করলো না জড়ালো স্বামিজীকেও। মিসেস ওলিবুলের প্রাচ্য ধর্ম্মানুরক্তির মূলে বিবেকানন্দের প্রভাব। প্রচার চললো: মিসেস বুলের জীবনের শেষ ভাগে যে ভৌতিক চেতনায় আচ্ছন্নতা, তা বিবেকানন্দের প্রভাবেই সম্পাদিত। যে গুপ্ত রহস্যবাদের জাতশত্রু বিবেকানন্দ, তিনিই রহস্যবাদের প্রচারক। খবরের কাগজে স্বামিজী সম্বন্ধে নানা সংবাদ প্রচারিত হতে লাগলো।

২৬শে জুন সদলবলে মায়াবতী ত্যাগ করে কাঠগোদমের পথে ৩রা জুলাই ১৯১১ কলকাতায় ফিরে এলেন।

৪ঠা জুলাই ১৯১১, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

সবসময়ে শরীর বিশেষ ভাল থাকে না। কাগজের টুকরোগুলো যাতে মামলার বিবরণ আছে ভয়াবহ মুহূর্ত্ত এনে দেয়। ... অন্য কারো চিঠি আমাকে পাঠিও না। প্রতিটির উল্লেখ, যন্ত্রণা বাড়ায়।

৪ঠা জুলাই ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : জেনে খুশী হবে যে, মায়াবতীতে বসে বিজ্ঞানের মানুষটির নতুন বইয়ের ১২টি অধ্যায় শেষ করা গেছে তার সমস্ত লেখার মধ্যে এ পর্য্যন্ত যা কঠিনতম? সুতরাং আমি অলস হয়ে নেই, যদিও বুঝতে পারছি না আমার লেখা পূর্ব্বের মত বীরোচিত হচ্ছে কিনা! হোক, তাই চাই!

মিন্টোর পর ভাইসরয় হয়ে এলেন জবরদস্ত হার্ডিঞ্জ। নিবেদিতার আশঙ্কা হল, নিপীড়নের মাত্রা বাড়বে। কিন্তু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন যখন দেখলেন: তাঁর অতি উচ্চ পর্য্যায়ের ইংরাজ প্রশাসকরাও দুর্নীতির ক্ষেত্রের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন ৬ই জুলাই ১৯১১, নতুন ভাইসরয় অপূর্ব্ব। তাঁর হাতে খ্যাতিমানেরা ভেঙে চুরমার। বেকার যাচ্ছে, স্ল্যাক কাঁপছে — হ্যালিডে গ্রেপ্তার হয়ে সিমলায় প্রেরিত। গুজব এই হার্ডিঞ্জ নাকি বলেছেন, হ্যাঁ, আমি রাশিয়ায় ছিলাম, তবু বলছি, এখানকার মত দূর্নীতি অন্য কোথাও দেখিনি।

...সংবাদ পত্রের গলায় ফাঁসি। 'বাকেন্দ রায়টের' ব্যাপারে পান্নালাল বলে একটি লোকের সংবাদ আছে। লোকটির বাড়ী লুট করা হয়, তাতে পুলিশের হাত ছিল। তার পক্ষে, প্রমাণ সংগ্রহে সমর্থ হয়ে 'কেস' খাড়া করে। কিন্তু প্রতিটি সংবাদপত্রে যদিও তার বিবরণ টাইপ করে পাঠানো হয়, কোন সংবাদপত্রই, এমন কি সাহেবী কাগজ পর্য্যন্ত তা ছাপতে সাহস করে নি।... হ্যামিন্টনের দোকানে দশ হাজার টাকার দামী মুকুট বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়—সেটি দেশীয় এক জহুরীর সম্পত্তি — হ্যালিডের কাছ থেকে এসেছিল সাম্প্রতিক রায়টের লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল! ব্যাপারটির আবিষ্কর্তা স্বয়ং ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। হ্যালিডেকে কাঠগড়ায় না তোলার কারণ, হতভাগ্য জহুরী, পুলিশী প্রতিহিংসা অপেক্ষা, ক্ষতিই শ্রেয় মনে করেছিল।

... 'দুমরাও রাজ' কেস সম্বন্ধে, একটি বিকট গুজব চলছে। ঐ মাসলায়, ফ্ল্যাক শপথে নিয়ে মহারানী কর্ত্তৃক একটি শিশুকে দত্তক নেওয়ার কথা বলেছে—যদিও দত্তক নেবার কথিত মহারানী, ধরাধামে ছিলেন না। ফ্রেজারকে হলফ অনুযায়ী টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি পান মাত্র ৫০০০, বাকিটা ফ্ল্যাক ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়।

... সর্ব্বপরি চীফ জাস্টিস দেখলেন যে, তাঁর বাড়ী ডিটেকটিভরা ঘিরে আছে—তিনি ভারত সচিবকে সেজন্য তার করলেন। হ্যালিডেকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বলা হল। তিনি বললেন, ওখানে অনেক ভারতীয় সাক্ষাৎপ্রার্থী আসেন, তাদের সঙ্গে উনি রাজদ্রোহের কথা বলতে পারেন!!!! চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। ফলে, হ্যালিডেকে চারজন প্রহরীর অধীনে সিমলায় পাঠানো হল।

মিস লংফেলো তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি ওলিয়ার এই প্রতিঘাত সত্ত্বেও মডার্ন রিভিউতে সারার জীবনের উপর একটি প্রবন্ধ লিখলেন। মিঃ থর্প সেটি পড়ে প্রশংসা করে চিঠি দিলেন। ১৬ই আগস্ট ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

মিস লংফেলোর রচনাটুকুর জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ..... মিঃ থর্প মডার্ন রিভিউতে সারার প্রবন্ধটির প্রশংসা করে চিঠি পাঠিয়েছেন। গতকাল সেটি পেয়ে খুবই খুশী। তাঁরা যে সন্তুষ্ট, এতে আমার আনন্দের শেষ নেই। এখন কেবল আশা করি, তাঁরা পৃথিবীর বিখ্যাত কোন পত্রিকায় বড় আকারে এ বিষয়ে রচনার ব্যাপারে আমার পরিকল্পনায় সহযোগিতা করবেন। সেটি লিখবার আগে তাঁদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে আছি, কারণ প্রথমতঃ কাজটা কঠিন, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যদি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহলে বৃথা প্রভূত সময় ব্যয়। তবে যদি মিস লংকেলো সহযোগিতা করেন, কাজটা করে ফেলা যায়।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ মিসেস উইলসন (বোনকে) চিঠি লিখলেন :

আমি সব দিকে চিঠিপত্র লিখছি, যাতে মিঃ থর্প সারার জীবনী বার করার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান। শিব! শিব!

মানসিক যন্ত্রণায় যখন তিনি একান্ত বিচলিত, ঠিক সেই সময়েই তাঁর হাতে এলো মডার্ন রিভিউতে সমালোচনার জন্য "প্রিমিটিভ অ্যাণ্ড ট্রাডিশন্যাল হিস্টরি" — দুখণ্ডে। লেখক ছোটনাগপুরের প্রাক্তন কমিশনার মিঃ আই. এফ. হেউইট। তিনি অরণ্যচারী জাতিদের পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের অবকাশ পেয়েছিলেন তাঁর চাকরী জীবনে। তাদের ভাষাও শিখেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলেই ইতিহাসের উৎস উপাদানের উপর এই বই দুটি তাঁর গবেষণার বিষয়।

সমালোচনায় তিনি বললেন : সর্বোচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন এক পাশ্চাত্য মনের সাক্ষাৎ পেলাম— যাঁর ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সুগভীর। তিনি এমন এক ইতিহাসের ভিত্তি-পরিকল্পনার উপরে কাজ করেছেন, যার সূচনা সন্ধান করতে হলে ২৫০০০ বছরের মত পিছিয়ে যেতে হয়।

ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের সীমা নেই কিন্তু সেই অতীত ইতিহাসের সীমারেখা কোথায় সন্ধান করবো— যে সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। এই লেখকের মতে, কোন জনগোষ্ঠীর উৎসবাদি হচ্ছে তাদের ইতিহাস ও ধ্যানধারণার চিত্র বা মানচিত্র বিশেষ।

নৃতত্ত্ব, মানবজাতিতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব যেন অবশ্য করে জাতীয় সরকারের রাজনৈতিক বোধ ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশক বস্তু হয়। লেখক, বইটির মধ্যে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, সকল জাতি বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, ক্রমান্বয়ে মানব প্রগতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করেছে। তাদের ঐতিহ্য, ধর্ম্মাচার এবং জীবনচর্য্যার রীতিনীতির মধ্যে আবদ্ধ অতীত ইতিহাসের জ্ঞান না থাকলে, ঐ সকল বস্তুকে (নৃতত্ত্ব, মানবজাতিতত্ত্ব ইত্যাদি) কদাপি আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না।

হঠাৎ উঠে পড়া জাতিগুলির শ্রেষ্ঠত্বদাবীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। তাই সুপ্রচুর আনন্দের সঙ্গে লেখকের কথাগুলির উল্লেখে বললেন : যাঁরা সভ্যতার আদিম প্রবর্ত্তকদের নিন্দা করে বলেন— ওরা ছিল অজ্ঞ, বন্য, বর্বর—ওরা ইতিহাসের পরিবর্ত্তে রেখে গেছে অলৌকিক গালগল্প, অলৌকিক-ক্ষমতাধারী পুরুষের কাহিনী— তাঁরা ভুলে যান যে,— এই সব মানুষের কাছেই আমরা আমাদের সমাজ ও সংগঠনের জন্য ঋণী, এরাই প্রথম বন কেটেছে, জমি চষেছে, বন্য পশুকে গৃহপালিত করেছে, গ্রাম, প্রদেশ ও দেশের সরকার তৈরী করেছে, শিশুদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছে, যা পরবর্ত্তী প্রজন্মে ধারাবাহিকভাবে বলবৎ থেকে পূর্ব্ব পুরুষগণ জ্ঞানকে নব-নব উন্নতির পথবর্ত্তী করে তোলা সম্ভবপর হয়েছে।

মিঃ হেউইট, ভারতীয় ইতিহাসের অসাধারণ উৎসরূপে, বেদকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে লিখলেন : দেশপ্রেমিকদের অতি মাতোয়ারা স্বপ্নও ভারতের যে গুরুত্বের কল্পনা করতে পারেনি, সে বস্তুই ভারতকে দান করেছেন ইংরাজ পণ্ডিত। বেদের মধ্যে নানা উপজাতির সমন্বিত সভ্যতার রূপরেখা কি আকারে অঙ্কিত, সে বিষয়ে মিঃ হেউইট দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন : বৈদিক সভ্যতার উত্তরাধিকাররীরাই যে পৃথিবীর নানা স্থানে উদার গ্রহণশীল রীতি-নীতির প্রবর্ত্তন করেছে। বৈদিক সাহিত্যে, ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট নয়, উন্মত্ত কল্পনা বিলাসে যেখানে সত্যের বিদায় ঘটেছে—এমন কথা যে সব আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন, তাদের সমঝে দিয়ে প্রাচীন হিন্দুদের বিরাট ইতিহাস চেতনাকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন : প্রাচীন ইতিহাসের পরবর্ত্তী লেখকসকল, যদি বৈদিক ব্রাহ্মণদের মত করে অতীতের তথ্য সংরক্ষণে সতর্ক হতেন, তাহলে আমাদের একালের ধারণাসমূহকে, এত বেশী পরিমাণে সংশোধনের অবিরাম প্রয়োজন হত না!

২৫শে জুলাই ১৯১১, স্বামিজীর মা ভুবনেশ্বরী দেহ রাখলেন। তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ‘‘মাকে’’ তিনি দেখবেন। ভারতে অবস্থান কালে মাঝে মধ্যে ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কৃষ্টিন দেখাশোনার ভার নিতেন। তাঁর মৃত্যুর দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন। শ্মশান পর্য্যন্ত তাঁর মৃতদেহ অনুগমন করলেন। শ্মশান ঘাটে বসে ভূপেন্দ্রনাথকে সমবেদনা প্রকাশে সান্ত্বনাপূর্ন পত্র দিলেন। এর কয়েকদিন পরে সংবাদ এলো মিসেস বুলের কন্যা ওলিয়া মারা গেছে গত ১৮ই জুলাই ১৯১১। অপ্রত্যাশিত সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হলেন। তার প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক স্নেহ। যদিও ওলিয়া ছিল অত্যন্ত জেদী, খামখেয়ালী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ও হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত রোগী। একে নিয়ে মিসেস বুলও চিরদিন অশান্তি ভোগ করেছিলেন। সে নিজেও কোনদিন সুখী ছিল না, বেঁচে থাকলে হয়ত আরও দুর্ভোগ করতে হত। তবুও, এ মৃত্যু তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ও বেদনাদায়ক।চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। প্রার্থনা করলেন : পরলোকে সে যেন সুখী হয়।

১৬ই আগস্ট ১৯১১ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবশ্যই আমার উইল পুনর্লিখন করতে হবে, যেহেতু তুলনায় অল্প রেখে যেতে পারব কিন্তু এখনও মনে করি, কাজের যেন নতুন পর্ব্ব আরম্ভ হবে।

হঠাৎ খেয়ালে আলেকজাণ্ডার— গতকাল মায়াবতীতে চলে গেছে। মনে হয়, সে ও কৃস্টীন ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই ভাবিত, যদিও বুঝতে পারি না, কৃস্টীনের এত চিন্তার কারণ কি? কিন্তু কেউ অপরের জন্য কিছু নির্দ্ধারিণ করতে পারে না— পারে কি?

ওগো য়ুম, মরতে পারলে বেঁচে যেতুম। বহুদিক থেকেই জীবনকে এ ব্যর্থ মনে হচ্ছে। নারী শিক্ষার জন্য আমি কি সত্যই উপযুক্ত? তা যেন অনুভব করতে পারছি না। ... সব কিছুই মনে হয় ভাল চলবে যদি আমাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

একটি কি দু'টি মাত্র বই বাকী আছে, যেগুলো সত্যই আমার লেখা উচিত। তাদের মধ্যে — খোকার জীবনী অনেক ভাল লিখতে পারবে র‍্যাটক্লিফ। বাকী থাকবে ইতিহাস, কয়েকটি নিরীক্ষা গ্রন্থ এবং শিক্ষার বই। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখনো আমার কিছু বলার আছে। সেই সঙ্গে খোকাকে বিজ্ঞানের আর একটি পর্ব্ব এগিয়ে দেওয়ার সাহায্য। তারপরে, সকলেরই সুন্দর সমাপ্তি। তাই হোক, তাই চাই। যাদের ভালবাসি এমন কারোর চেয়ে, বেশীদিন বাঁচাকে আমি ডরাই। অবশ্য সবই অন্যরকম মনে হবে, যদি ১৮৯৮ সালের স্বর্ণোজ্জ্বল আমার স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে পারি। তাদের জন্য আর কত লিখবো! কত বলবো!

কৃস্টীন স্থির করেছে, সে ব্রাহ্মস্কুলে এক বছরের জন্য শিক্ষায়িত্রীদের শিক্ষাদানের কাজে যোগ দেবে, সেই সঙ্গে, ছোট স্কুলের প্রধানও হবে। এইভাবে সে অর্থোপার্জ্জন করতে পারবে, কিন্তু সেই কারণেই সে যায়নি, আরও পঞ্চাশটা কারণ রয়েছে। তার সিদ্ধান্তে আমি খুশী। এর দ্বারা মনে হয়, সে মনের প্রসার, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা লাভ করবে, যা তার পাওয়া খুবই দরকার। এখানেই

তার বাসস্থান থাকবে। আমার বিশ্বাস আমরা একসঙ্গে শনি, রবিবার ও ছুটিগুলি কাটাবো। অভিজ্ঞতা লাভের পরে, সে ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবে। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের কাজগুলিকে চালনার পক্ষে যোগ্যতা অর্জ্জন করবে।

আগস্ট ১৯১১ স্পেশাল পুলিশ ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টর জেনারেল এফ. সি. ড্যালী একটি গোপন নোট তৈরী করে ছাপলেন এবং সরকারের ভিতরের মহলের ব্যবহারের জন্য।

"The paper and in particular the Jugantor become more violent then ever, and when their publication was eventully put a stop, they continued to appear in the form of secretly printed leaflets."

১৬ই আগস্ট ১৯১১, র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লিখলেন :

অ্যানথ্রপলজি বনাম আইডিয়ালিজম— সর্ব্বদাই নাকি তারা অ্যান্টিথিসিস্। ব্যাপারটায় আমি বিমূঢ় কেন অ্যান্টিথিসিস? নৃতত্ত্বের দুর্ব্বলতা তার অপরিণত প্রারম্ভিক চরিত্রে। আর তার সফল দিক হল— তথ্য মানে তথ্য, যত অল্প সংখ্যকই হোক তারা, এবং নীতির দৃষ্টিতে যত গুরুত্বহীনই হোক। অপরদিকে আদর্শবাদের শক্তি আছে তার ভিত্তিমূলে। আদর্শবাদ নৈতিকতার পরিজ্ঞাত সুস্পষ্ট তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কোন মানুষের সম্পত্তি যখন চুরি করছি না, তখন কেন তার অধিকার চুরি করবো? সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল, শেষ পর্য্যন্ত সকলের মঙ্গলের উপরে নির্ভরশীল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আদর্শবাদের দুর্ব্বল অংশ তার লক্ষ্য অংশে নেই, তা আছে তার যুক্তির অংশে। কেন ভাববো না, কতকগুলি জাতি পশ্চাৎপদ নয়? পুনশ্চ, কোন একদিকের পশ্চাৎপদ মানে নয় সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ। পুনশ্চ, পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে কোন বিচ্ছিন্ন প্রতিভার উদ্ভব হবে না এমন নয়! কি যে জগাখিচুড়ি ব্যাপার গোটা জিনিষটি!

আমরা অবশ্যই অধিকতর শিক্ষাপ্রদ, মিত্রতাসূচক, সামাজিক ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আকাঙ্ক্ষা করি। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে স্বার্থের স্থূল, নোংরা ঘোর চিৎকার লাভের হিসাবের বিতৃষ্ণাকর গণনায় তারা পূর্ণ। এই পৃথিবী, তার মানুষ, তাদের ভবিষ্যৎ সবকিছুর বঞ্চনা সেখানে। একটা প্রজন্ম বা শতাব্দীতে মাথাপিছু গড়ে দশ হাজার পাউণ্ড হাতাবার গৌরবচ্ছটা! পরবর্ত্তী সহস্র বছরের দারিদ্র ও অধঃপতন। এসব কিসের জন্য? শহরতলীর স্ফূর্ত্তি! শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সভ্যতার এই হল অভীষ্ট!

আমি চাই, 'পশ্চাদপদ জাতি' কাকে বলে, সেই প্রশ্নের পুরো সমালোচনা। কেন জাতিগুলি পশ্চাদপদ এবং কেন? এদের বিষয়ে, অগ্রসর জাতিগুলির ঠিক মনোভাব কি?

'মর্ডার্ন রিভিউ'এ এই বিষয়ে নাড়াচাড়া করতে চাই। তুমি সোসিও-লজিক্যাল রিভিউ-এ একই কাজ করো না কেন? সেক্ষেত্রে এক এফ,আর, সি, কিছু ফলোৎপাদন করবে! আমার প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণে অত্যন্ত গর্ব্বিত। উত্তর হিসাবে, আমি কি পরে কখনো, আরও কিছু লিখবো? ব্রানফোর্ডের ভাব খুবই নৈর্ব্যক্তিক, এই বিতর্কে তাঁর কোন দায় নেই, কেবল দেখে যেতেই না আগ্রহ। হবসন বস্তুতঃপক্ষে সমালোচনারই বলাধন করেছেন। আমার অভিযোগ— অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি— আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই দেখাচ্ছে না। তা কেবল সদস্যদের মনোরম সন্ধ্যার আয়োজন করে যাচ্ছে, এবং চিত্তাকর্ষক রচনাদি উদ্‌গিরণের সুযোগ করে দিচ্ছে! কিন্তু যা, তার অনুশীলনের বিষয়, সেই সব সমস্যা বিষয়ে, তথ্যানুসন্ধান করে সমগ্র জগতে, 'সত্য' দানের আসল কাজটি করছে না। ও কাজটি কি কেবল গীর্জ্জার করণীয়? তা হলে সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি আত্মহত্যার পক্ষে অর্ডিনান্স পাশ করে পজেটিভিজম এর মধ্যে মিশে যাক। দুঃখের বিষয়, পজিটিভিজম পর্য্যন্ত এমন সব স্মিথ-এ ভর্ত্তি হয়ে আছে, যাদের আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

চীফ জাস্টিসের ন্যায়পরায়ণতা ও দৃঢ়তার জন্য, পুলিশের আক্রোশ বেড়েই চলেছিল। তারা বহুকষ্টে ও যত্নে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যেসব মামলা সাজিয়েছিল, যা নিম্ন আদালতে আসামীদের শাস্তি পাইয়ে, স্বদেশে বাহবা কুড়চ্ছিল, এমন কি ভারত থেকে অর্থও, তাদের অধিকাংশই পুলিশের কারসাজি বলে হাইকোর্টের রায়ে বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল। ঢাকার মামলায় যা দেখা গেল, মেদিনীপুরের মামলার ক্ষেত্রেই একই ফল ফললো। দণ্ডিত ব্যক্তিরা পরিত্রাণের শেষ উপায় বলে ধরে নিয়েছে— অবশ্য ততদিন তাদের হাজতবাসের পীড়ন সহ্য করে, হাইকোর্টের খরচ যোগাড় করা, যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়!

মেদিনীপুরের মামলায় হাইকোটের রায়, ভারত ও ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। পুলিশ টাকার লোভে, কিভাবে বিরাট বিরাট অর্থশালী ব্যক্তিদের জড়িয়ে মামলার চক্রান্ত করে, টাকার লেনদেনের কাজ হাসিলের চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে নাড়াজোলের রাজাও জড়িত। কখনও টাকার বিনিময়ে, কখনও বা জোচ্চুরি ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে, মামলা শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

মিঃ র‍্যাটক্লিফ জুন ১৯০৮ থেকে অগস্ট ১৯১১ ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করলেন: ইংলণ্ডের 'নেশন' পত্রিকায়। হাইকোর্টের রায় বার হওয়ার পর তিনি লিখলেনঃ "দি ট্রার্জিক ফার্স অব মিডনাপোর"।

ডোনাল্ড ওয়াটসন, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। মৌলবী মজারুল হক, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পুলিশ (মুসলমান), লাল মোহন গুহ, সাব ইনস্পেক্টর পুলিশ (হিন্দু), প্যারীমোহন দাস, পেনসনভোগী কর্ম্মচারী। রায় ৬৫, সন্তোষ (ওঁর পুত্র) শিক্ষানবিশী পুলিশ। আবদুর রহমান, পুলিশ স্পাই (মুসলমান), রাখালচন্দ্র লাহা, পুলিশ স্পাই (হিন্দু)। মেদিনীপুরের নাগরিকরা ১৫৪ জন— যাঁরা জমিদার, উকীল, দোকানদার, একজন রাজা এবং অন্ততঃ একজন ভিখারী।

পটভূমিকা : ১৯০৮ সালের সুবিস্তৃত বঙ্গভূমি। জুন মাসের আরম্ভ, ভারতীয় সমভূমির উত্তাপ চরম অবস্থার দিকে এগোচ্ছে না— মৌসুমীকালের পূর্ব্বসূচক। লর্ড মিন্টো ভাইসরয়, স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর। জাতীয় আন্দোলনের নিদর্শন সর্ব্বত্র প্রকট, যা বাংলা প্রদেশ বিভক্তির দ্বারা প্রবলতা পেয়েছে। লর্ড কার্জ্জন তাঁর কর্ত্তৃত্বের শেষ সময়ে, এখন থেকে তিন বৎসর আগে, বঙ্গ বিভাগ করেন। মজঃফরপুরে প্রথম বোমা নিক্ষেপ ও তার বীভৎস পরিণতির পরে মাসখানেকের বেশী সময় কাটেনি। ফৌজদারী আদালতের নথিপত্র রাজদোহের অভিযোগে পূর্ণ। সাহেবী কাগজগুলো লৌহশাসন প্রবর্ত্তনের পক্ষে কলরবরত। পুলিশ গৌরব লাভের জন্য উদগ্র। আর কখনো অসামরিক কর্ম্মচারীদের পক্ষে অধিক বিজ্ঞতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির সঙ্গে, কিংবা ঋজু কঠিনভাবে, সরকারের বিরাট খেলায় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা— এখনকার মত অনুভূত হয় নি।

হাইকোর্টের রায়ে যা প্রকাশিত হয়েছে, তিন বছরের মূল্য বিবরণী সহ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে বললেন : এ বস্তু ইংলণ্ডের শুভ্রনামের উপরে ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ পাপের প্রহার। প্রকাশ— মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত তিন ব্যক্তি, আপীলের মামলার রায়ে পূর্ব্ব আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মুক্তি পেয়েছেন। হাইকোর্টের রায় বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মেদিনীপুর সেসনস্ কোর্টে, গত বছর এই মামলা শুরু হয়, আদিতে বিবাদী ছিলেন ২৬ জন, কিন্তু সরকার পক্ষের প্রধান একজন সাক্ষী বক্তব্য প্রত্যাহার করায়, ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। বাকী ৩ জনের দীর্ঘমেয়াদী নির্ব্বাসন। .... পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটগণের হত্যার বিরাট এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, পুলিশ এনেছিল, যাতে ১৫৪ জন জড়িত। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শোনেন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিনস এবং বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জী। এঁরা দশ দিন শুনানির পর দণ্ডাদেশ বাতিল করে, তিন ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। —

রায়দানকালে হাইকোর্ট বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে সব স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সেগুলি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত নয়, পুলিশ অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধ ভাবে সেগুলি আদায় করেছে, তাদের লিপিবদ্ধ করেছেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি আইনের ভাষা বা তার কোন কিছুকেই মান্য করেন নি। একজন পণ্ডিতের বাড়ীতে একটি বোমা পাওয়া গিয়েছে—এই অভিযোগের বিষয়ে বিচারপতি বলেছেন—বিবাদীদের তরফে যে বলা হয়েছে, ঐ বোমা পুলিশই স্থাপন করেছিল, - সেই কথাকে তাঁরা উড়িয়ে দিতে অসমর্থ। পুলিশ এই মামলায় যে ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তদনুযায়ী তাঁদের এই সিদ্ধান্ত।

এই হল, সাম্প্রতিক তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মামলা, যাতে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ অগ্রাহ্য করলেন। জানা গেছে, লেফটন্যান্ট , গভর্নর গোটা মেদিনীপুর ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ রকম তদন্ত করবেন। মধ্যবর্ত্তীকালে তিনি আদেশ দিয়েছেন—সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের কেউ যেন কোন অজুহাতে ছুটিতে না যায়।

বেসরকারী মুখপত্র লণ্ডন টাইমস ছাড়া, অন্যান্য সংবাদ পত্র হাইকোর্টের রায়কে অভিনন্দন জানালো: জাতিবিদ্বেষের উপরে উঠে, ন্যায়বিচারের সামর্থ্য-প্রদর্শন করা হয়েছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান মন্তব্য করলো : এই প্রকার রায় : প্রশাসনের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করবে। হাইকোর্টের ন্যায়পরায়ণতা অসামান্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন, সেইসঙ্গে নিম্ন আদালত, সন্দেহের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন না, তারা এমন অতিক্ষীণ সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করেছে, যার সাহায্যে দণ্ডাদেশ দান অযৌতিক। ঐসব সাক্ষ্য অধিকন্তু এখন সব মানুষ দিয়েছে, যাদের না আছে চরিত্র, না আছে নীতিজ্ঞান, যার ফলে সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি।

ষ্টার পত্রিকা মন্তব্য করলো : এরায় ... ভারতীয় পুলিশ ও ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটদের পদ্ধতির হতবাককারী উদ্ঘাটন।

'ইম্পিরিয়াল স্ক্যাণ্ডলের' বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ এবং সংবাদ ঢেকে রাখার সমালোচনার শেষে, মিঃ প্রাইম কোলিয়ার মন্তব্য করলেন: আমরা বিস্মিত হব না, যদি দেখি যে, ভারত ও ইংলণ্ড তাদের শাসকদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করতে অস্বীকার করেছে— যাদের শাসনাধীন পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটরা ন্যায় বিচারের উপর, এহেন জঘন্য অত্যাচার করেছে যে, তাকে তুরস্ক বা রাশিয়াও অতিক্রম করতে পারেনি। এখানে একমাত্র সান্ত্বনা, হাইকোর্ট দায়িত্ব পালন করেছে।

'গ্লোব' পত্রিকা বললো : কলকাতা হাইকোর্ট সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। 'ডেলি নিউজ' বললোঃ স্যার লরেনস্ কর্ত্তৃত্বাধীন হাইকোর্টের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করা যায়।

ন্যায়বিচারের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের যে সুনাম ভারতবাসীদের মধ্যে স্বীকৃত, তার ঐতিহ্য পুনর্ঘোষিত হয়েছে। .... গত মঙ্গলবার মেদিনীপুর মামলার অবশিষ্ট তিন দণ্ডিত ব্যক্তিকে, মুক্ত করে দিয়ে, সে পুনশ্চ প্রমাণ করলো : জাতিগত অথবা রাজনৈতিক পক্ষপাতের উর্দ্ধে সে অবস্থিত এবং ন্যায়চক্ষু ভিন্ন, অন্য কোন চোখে সাক্ষ্য সমূহকে এবং তথ্যকে দর্শন করতে প্রস্তুত নয়।

১৮ই অগাস্ট ১৯১১ মিসেস এ্যানি বেসান্ত... লিখলেন : the anarchists have been succeeded the restoring to some extent the liberties before enjoyed in India but the seditions.

২১শে আগস্ট ১৯১১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্বোধন বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। স্বামিজীর যে কয়জন গুরুভ্রাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁদের অন্যতম। কলকাতায় ফিরে আশা অবধি তাঁকে দেখতে যেতেন। কত পুরাতন স্মৃতি চোখের পাতায় ভেসে

উঠলো : মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গে অবস্থান। বক্তৃতাকালে তাঁর উপস্থিতি, তাঁকে কতনা সাহায্য করেছিল। ১৯০৪ সালে বেলুড়ে এলে, স্বামিজীর জীবনী রচনার জন্য তাঁকে কত উৎসাহ দিয়েছিলেন। গৌরবময় ছিল তাঁর আধ্যাত্মজীবন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামিজীর কাজ করে গেলেন। কত না সুন্দর তাঁর জীবন!

নানা অশান্তি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। মিসেস বুলের প্রতিশ্রুত অর্থ উদ্ধারের জন্য চিঠিপত্র লেখালেখি করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে রয়েছে নানা উদ্বেগ। কৃষ্টিন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে। স্কুলের কাজ পরিপূর্ণ তাঁর কাঁধে চেপেছে। এর মধ্যে আর একটা অঘটন ঘটলো। তিনি দীনেশ সেনের কাছ থেকে একটি প্রস্তরময় প্রজ্ঞা পারমিতার বিগ্রহ চেয়ে নিলেন। বাধা দিয়েছিলেন দীনেশবাবু। বলেছিলেন: এ মূর্ত্তি আপনাকে দিতে আমি দ্বিধা বোধ করছি। আমার ইচ্ছা আপনি এটি গ্রহণ করবেন না।

জোর করে সে মূর্ত্তি নিয়ে এলেন। বললেন: আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে : দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করিনা। মূর্ত্তিটিকে ঘরে নিয়ে এসে তাঁর ঘরের কুলুঙ্গীতে রাখলেন এবং ফুল ও ধুপ-ধূনা-দীপ জ্বালিয়ে পূজা শুরু করলেন। কিন্তু সত্যই তার পর থেকে নানা অশান্তি দেখা দিতে লাগলো।

কৃস্টীনের অনুপস্থিতিতে সব দায়িত্ব তাঁর একার ঘাড়ে। স্কুল দেখা, তার অবসরে লেখার কাজ। "ইন মেমোরিয়াম" নামে সারা চ্যাপাম্যান বুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী মর্ডার্ন রিভিউতে প্রকাশ করলেন। Saying of Ramkrishna (রামকৃষ্ণ উপদেশাবলী) মায়াবতীতে বসে সম্পাদকীয় শেষ করেছিলেন। ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করলেন। এই সময়ে লং ম্যানস্ কর্ত্তৃক 'Studies from Eastern Home' ও Footfalls of Indian History প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। এছাড়া ডঃ বসুর নতুন পুস্তক রচনা, এছাড়া প্রবুদ্ধ ভারত ও মডার্ন রিভিউর সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখার কাজ।

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে জীবনের প্রতি আসক্তি তাঁর ছিন্ন হতে লাগলো। মনপ্রাণ গুরুর ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। পরিবেশও দ্রুত সেই কাজে তাঁকে নিক্ষিপ্ত করতে লাগলো। ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে নিজের মা দেহ রাখলেন। ১৯১১ জানুয়ারীতে মিসেস বুল, ফেব্রুয়ারীতে স্বামী সদানন্দ, জুলাই ১৯১১ স্বামিজীর জননী ভুবনমোহিনী দেবী, অগাস্টে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ চলে গেলেন। চারিদিকে মৃত্যু প্রবাহ! অনুভব করতে শুরু করলেন: স্বামিজী তাঁর স্বজনদের ক্রমে ক্রমে সরিয়ে নিচ্ছেন। নিজেও তৈরী হতে লাগলেন :

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ মিস লংফেলাকে লিখলেন তাঁর পত্রের জবাবে : অব্যাহত কাজের শান্তিময় অপরূপ এই দিনটিতে মধুরতম প্রহর হল সেটি, যখন তোমার চিঠি পেলাম, ব্রেকন ওয়েলস থেকে সেটি পাঠিয়েছে ১৪ই অগস্ট। এখন ঠিক সন্ধ্যাদীপের কাল, প্রদীপখানি জ্বালিয়ে আমার কাছে আনা হয়েছে এই মুহূর্ত্তে, আর সন্ধ্যারতির শাঁখঘণ্টা বাজতে শুরু হয়েছে চারিদিকে। এখন পূজ্য জিনিষের সামনে, লুটিয়ে প্রণাম করার যে অপরূপ গভীর পূর্ণ তরঙ্গ ডুবিয়ে দেয় আত্মাকে গোধুলির কালে! স্বামিজী সব সময়ে জোর দিয়ে বলতেন: জীবন এবং মৃত্যুর পরে, কদাচিৎ শুধু জীবনের বা শুধু মৃত্যুর পরে বলে তৃপ্ত হতেন না। যে কথা এই সব দিনে উপলব্ধি করার বড়ই প্রয়োজন। কারণ মৃত্যু, কতজন হায়, কত প্রিয় পরিচিতদের নিয়ে চলে গেল!

আমাদের ছোট বাড়িটি, যেভাবে সৌন্দর্য্যের প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে যাচ্ছে, কখন কখন বড় ভয় পেয়ে যাই!

আমাদের বাড়িতে এক বছর আগে চারধারে ফুলের বেড়া দিয়ে ঘেরা চৌক লন তৈরী করা গেছে।

বাগান আমাদের নিজেদের সদর-দরজার সামনে, দেওয়ালে ঘেরা, যার জন্য আমাদের হিন্দু বালিকারা বিকেল চারটের সময় শাড়ি পরে সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে।

ঘাস বেশ ঘন হয়ে উঠেছে, গাছগুলি ভালভাবে ধরে গেছে। গত জুন মাসের শেষ থেকে আমি একলা আছি। আর আছে ঝি, চাকর। ফলে, কাজের সুযোগ ও শান্তি অনবদ্য। তবে প্রিয় টমসন যখন বলেছেন, আমি মোটেই শরীরে সে রকম দৃঢ় হয়ে উঠিনি। আমি আতঙ্কে প্রায়— মৃতপ্রায়— যার সম্মুখীন হয়েছিলাম— ওঃ কী ভয়ঙ্কর কাহিনী অভিনীত হতে দেখলাম! তার মধ্যে ভয়ঙ্করতম হল— তমসাচ্ছন্ন আত্মা— স্বেচ্ছায় তমোময়-অসীম শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত। ত্রাণ পেয়েছি? হ্যাঁ আমরা সবাই, যে ভাবেই হোক, সমস্ত সময়টিতে ত্রান পেয়েছি। কিন্তু একই সঙ্গে সে আত্মা মুক্ত এই পৃথিবীতে, হায়! জনতো না তা। এই মৃত্যুর জন্য গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। যদি তিনি বাঁচতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি যন্ত্রনা পেতেন। দারুণ যন্ত্রনা। কিন্তু সেই যন্ত্রনার পথেই উপলব্ধি আসত। পাপীর শাস্তিতে অধিকার আছে। একথা কত না সত্য, প্রায়শ্চিত্তের জ্বলন্ত শুদ্ধি যাতনা। প্রিয় সেন্ট সারার জীবনের শেষ সপ্তাহগুলিতে, মাত্র প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, কিভাবে তিনি ওলিয়ার চেয়েও- যার বিষয়ে আমরা সকলেই জানি, গভীরভাবে— সারাজীবন ধরে কেবলই নিজেকে 'মাতৃরূপে' অনুভব করার জন্য সন্ধান করে গেছেন। শেষ সন্ধ্যায় তা সে বুঝতেই পারিনি— তার বিছানার পাশে উঁচু চেয়ারটিতে বসেছিলাম— আমি। তখন প্রবলভাবে একটি প্রার্থনার বিষয়েই সচেতন হয়েছিলাম- তাঁকে যেন 'মাতৃভাবে' নিজেকে অনুভব করতে দেওয়া হয়। আর পরদিন প্রত্যুষে আত্মা উড়ে গেল! প্রিয় মিস লংফেলো, বলো ঃ তাঁর মাতৃত্বের সেই উপলব্ধি কি ওয়ালিয়াকে ত্যাগ করা ঘটাতে পারে? সে তো পরম মুক্ত ভালবাসার উপলব্ধি! এমন অসাধারণ ঘটনায়, কোন আত্মা জাগ্রত না হবে? আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, সুযোগ যেন তিনি পান, এখন বা ভবিষ্যতে, যেভাবে তিনি গেঁথে রাখতেন ও সাহায্য করতেন, তার পরিবর্ত্তে নিজের অনন্ত ভালবাসাকে উপলব্ধি করে! যারা তাঁকে দুঃখ দিয়েছে, তাঁদের ক্ষমা করে, তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিরাট মহিমায়, যাকে অগ্রাহ্য করতে কেউ পারবে না।

এইসব কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, এই দেহ কী না বন্ধন, কী না অন্ধকার! কিভাবে তা আমাদের অন্ধকার রাখে, জড়িয়ে রাখে শিকলে? আমাদের সত্য স্বরূপকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। কী সত্য একথা! যে পর্য্যন্ত না আমরা বিরাট আত্মাদের নিকতনে উপস্থিত হতে পারি, তার পূর্ব্বে ওকথা অনুভবই করতে পারি না, নিজেদের হৃদয়ের রহস্যের গভীরেই নামতে পারি না! নিষ্ঠুর সত্য নয় কি কথাগুলি, অথচ কী সহজ সাধারণ সত্য!

এক প্রাচীন আইরিশ বীর কাহিনীর এক বীর বলেছে : শুধু বাঁচার কি অর্থ? সে কাজটা তো আমাদের হয়ে, আমাদের ভৃত্যরাও করতে পারে! অনন্ত ছাড়া লাভ করবার প্রিয় বস্তু আর কি আছে? আর মৃতরাই শুধু তা পায়। কিন্তু আমার মনে হয় না, সকল মৃত তাকে পায়, তা যদি পেত, তাহলে সকল জীবিত বা মৃত যে নামেই হোক না কেন, যে স্থানেই হোক না কেন— 'উপলব্ধি' করতে চাইতো।

"জ্ঞানযোগ" নামে স্বামিজীর একটি অপূর্ব্ব বই আছে, সেটির উপর কাজ করছি। কিছুদিনের মধ্যে সেটি প্রকাশিত হবে উৎকৃষ্টতর ইংরাজীতে। লংফেলো ভবনে থাকার সময়েও সেটি সম্পাদনা করেছি।

প্রিয় মিস লংফেলো, এই গ্রীষ্মে তোমার স্থির, দৃঢ় সহৃদায়তায় পূর্ণ যে, দুটি তিনটি চিঠি পেয়েছি, সেগুলি যে কতখানি শক্তি ও সান্ত্বনা আমায় দিয়েছে, বলে বোঝাতে পারবো না। ঠিকই বলেছ তুমি, বাঘেরাই সবচেয়ে মন্দসঙ্গী নয়। আর 'ট্রানসক্রিস্টে' তুমি যে ছোট বিবৃতিটুকু পাঠিয়েছ, তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি গভীর কৃতজ্ঞ। এ ধরনের লেখার মধ্যে, এর চেয়ে নিখুঁত আর

কিছু আমি দেখিনি, এত নৈর্ব্যক্তিক অথচ আস্থাপূর্ণ। প্রিয় সেন্টসারার জন্য এ ধরনের কাজ করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমি একটা বই করার পরিকল্পনা পর্য্যন্ত করে ফেলেছি, কিন্তু প্রবন্ধই শ্রেষ্ঠ হবে মনে হয়। ... কিন্তু যদি বই হয়, ওলিয়া সম্বন্ধে নিষ্ঠুর নগ্ন সত্য তাতে থাকবেই।

নানাদিক থেকে মিসেস বুলের জীবনটির বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর অর্থকে অপরের সাহায্যার্থে নিয়োগ করে, নিজের বৃহৎ শোকের 'প্রকাশ মাধ্যম' করে তুলেছিলেন, যার ফলে, বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল এবং নিজেকে তার দৃঢ় কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। তারপর প্রাচ্য চিন্তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তাছাড়া কতকগুলি ব্যক্তিগত আদর্শকে বাস্তবায়িত করাও হয়েছে। কোন কিছুকেই, বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন না করে পারতেন না!

আমরা বিবর্তনের একটি নতুন বইয়ের উপরে কাজ করছি। আমাদের হাত দিয়ে পৃথিবীকে নাড়া দেবার মত সমুচ্চ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অধ্যয়গুলি ক্রমেই বেরুচ্ছে। তারপর হ্যারাপের (প্রকাশক) জন্য 'মিথস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস' বইয়ের এক তৃতীয়াংশ লিখে ফেলেছি। আর স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা একেবারে আগেকার মত কমিয়ে ১২-১৬ জনে দাঁড় করানো হয়েছে কিন্তু উপযোগিতায় বিশেষ কমেনি তা, ছাত্রীরা সকলেই বিবাহিত মহিলা বা বিধবা, তাই কম গোলমাল করলেও এঁদের শেখাতে অনেক বেশী শক্তি লাগে, যা ১০০ জন বালিকার গোটা স্কুল চালাতে লাগতো না। মিসেস বনির ওখানে, শিক্ষাপদ্ধতির উপরে সপ্তাহে দু'দিন বক্তৃতা করছি। সুতরাং সময় নষ্ট হচ্ছে বলা যাবে না। এখন 'মিথস অ্যাণ্ড 'লিজেণ্ডস' ঘাড় থেকে নামাতে বিশেষ উৎসুক। তাহলে, ভারতীয় ইতিহাসের উপরে বইটির কাজে ফিরে যেতে পারব, সেই সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতির উপরে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বইটি লিখে ফেলবো। যদি এ সব কাজ সমাধা করতে পারি, তাহলে শান্তিতে মরতে পারবো। আর সেইজন্যই মনে হয়— সেকাজ হয়ে উঠবে না এখনি!

শরৎ এখনও আছে—তুমি সত্যই ভারতে আসবে, কত না আশা করি! তুমি এসো, যদি পারো মিসেস লেগেট, জর্জ্জ এবং অ্যালবার্টা এই শর্তে আসার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু এখন তা বাতিল। তাতে খুবই দুঃখিত। আমাদের নারী-নিবাসের বাগানটিকে শুধু নিজের জন্য ব্যবহারে রক্ষা করা বিরাট স্বার্থপরতা! এখন প্রিয় মিস লংফেলো শুভরাত্রি— পুনশ্চ শুভরাত্রি! .....

স্বামিজী বলতেন : জীবনের যদি নির্দ্দিষ্ট মান না থাকে, তাহলে ব্যবহারগত মানও থাকে না। কঠোর আত্মশাসনের দ্বারা এইসব আচরণমান নিয়ন্ত্রিত হলেই জীবন থেকে সরে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয় এবং সর্ব্ববস্তুতে বিরাজিত অভেদ সত্যকে অনুভব করার ক্ষমতা জন্মে। তারপর আসে সমদর্শন, প্রশংসা, নিন্দা, উত্তাপ, শৈত্য সব যখন সমান বোধ হয়। অন্য কথায়, যতক্ষণ আমরা স্বার্থপর থাকি, আমাদের জীবনের মানদণ্ডেও স্বার্থপরতা থেকে যায়। কিন্তু স্বার্থ যদি চলে যায়, তাহলে এই সব মানের প্রশ্ন থাকে না, কারণ কোন প্রলোভনই, তখন আকর্ষণ করে না। বাসনার মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে তখন।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ বোন মিসেস উইলসনকে লিখলেন : চিঠি পেয়েছি। মিস লংফেলোর চিঠি পেয়েছি। তিনি সত্যই যথার্থ অনুরাগী বিশ্বস্ত বন্ধু। তাঁর স্নিগ্ধ সান্ত্বনাপূর্ণ সব চিঠি। সব দিক দিয়ে চিঠিপত্র লেখালিখি করছি, যাতে মিঃ থর্প সারার জীবনী বারকরার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান। শিব! শিব!

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ মিসেস লেগেটকে লিখলেন, কারণ স্বামিজীর সমাধি মন্দির ও পাথরের রিলিফ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করতে তিনি আগ্রহী। গগেন্দ্রনাথ সেই অনুসারে জয়পুরে প্রস্তর শিল্পীর সঙ্গে ব্যবস্থা করেন। এই কাজটিকে 'মহা কর্ত্তব্য' কর্ম্ম বলে মেনে নিয়েছিলেন। টাকার হিসাব ও ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে, মূর্ত্তিটি কিভাবে তৈরী হবে, তার বিবরণ দিলেন সেই পত্রে।

... এহেন উদ্দেশ্যে টাকা খরচ অপূর্ব্ব ব্যাপার। এমন জিনিষের জন্য তো মানুষ তপস্যা করে।

তোমাকে মধ্যযুগীয় ভাব পরিবেশ, খানিক বর্ণনা করি। ভাস্কর, প্রস্তর নিহিত স্বামিজীর ভাবমূর্ত্তির প্রতি আহুতি দান করলেন। হে স্বামিজী। আমার হাতে আপনি আবির্ভূত হউন সুচারুরূপে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত তিনি কাজ করেন। কাজের মধ্যেই খেয়ে নেন। আমাকে বলে পাঠিয়েছেন, যদি কাজ সন্তোষজনক না হয়, এক পয়সাও তিনি নেবেন না, টাকা ফেরৎ দেবেন।

আমি অবশ্য ভয়েই আছি। কারণটা তুমি বুঝবে। ডঃ বসু সূচনা কালে, আমাকে দিয়ে লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন, জাতীয় 'গুরুত্বসম্পন্ন' এই কাজ। সত্যই তাই, যদি ভাল দাঁড়ায়!

১১ই সেপ্টেম্বর মিস লংফেলোকে লিখলেন (যে চিঠিতে তিনি তাঁর প্রতি ওলিয়ার অনুচিত ব্যবহারে মর্ম্ম পীড়িত সংবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন), স্নিগ্ধ সান্ত্বনাপূর্ণ চিঠিগুলি আমার অন্তর-জ্বালা অনেকখানি নিবারিত করেছে। তুমি যথার্থই অনুরাগী বিশ্বস্ত বন্ধু।

এত কাজ, এত ব্যস্ততা তবুও বিষণ্ণতায় তা ভরে উঠছে। হায়! কত কাজ অসমাপ্ত পড়ে রইলো। কৃতকর্ম্মের পরিণাম কত ক্ষুদ্র! স্বামিজীর অর্পিত কর্ম্মের কতটুকু সম্পাদন তিনি করতে পেরেছেন? তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী মেয়েদের আশ্রম বা ছাত্রী নিবাস স্থাপন করতে পারেন নি, যখনই মনে পড়ে, এসব কথা, হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কত আগ্রহ ডঃ বসুর বিজ্ঞান গবেষণার ন্যায় লেবরেটরী প্রতিষ্ঠার সাহায্য করবেন। ভারতীয় শিল্প কলার পুনরভ্যুদয় সবে আরম্ভ। নবীন শিল্পীগণকে সাহায্য করবেন! তাদের উৎসাহ দানের কত প্রয়োজন। নিজস্ব রচনাবলীর অধিকাংশ অপ্রকাশিত। দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি, জাতীয়তার পুনরুত্থানে কত করার আছে।

পরক্ষণে অন্তর থেকে কে যেন বলে ওঠে : জগতের বোঝা বহনের অধিকার, কে তোমায় দিয়েছে? নিজের কাজ করে চলো—অপরের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন কি? নিজের কাজ, সেটাই তোমার কর্ত্তব্য। শেষ কর প্রথম। জীবনের শেষ কথা আত্মসমর্পণ।

ধূমায়িত চিন্তা, মুহূর্ত্তে প্রশান্তিতে পরিণত হলো যে, দেবতার চরণে নিবেদিত তিনি— সেই জীবনদেবতার আহ্বানই চরম পাথেয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাঞ্ছিত দেবতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চরম ব্যাকুলতাই জীবনের পরম সার্থকতা। প্রিয়তম Beloved নামে কবিতা রচনায়— সেই অনুভূতির অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করলেন— কিন্তু তা অপ্রকাশিত রাখলেন গোপন কাগজপত্রের মধ্যে সমাহিত করে।

'আমি যেন সর্ব্বদাই স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্য ব্যকুলতাই জীবনে সম্পূর্ণ অর্থ। আমার প্রিয়তমই অতিপ্রিয়, শুধু তিনি এই বাতায়নের মধ্য দিয়ে চেয়ে আছেন, শুধু এই দ্বারে আঘাত করছেন। প্রিয়তমের কোন অভাব নেই, তথাপি তিনি মানুষের অভাবের পরিচ্ছদ ধারণ করে আসেন, যাতে আমি তাঁর সেবার সুযোগ পাই। তাঁর ক্ষুধা নেই, তথাপি প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে আমি দিতে পারি। তিনি আমার সঙ্গে, সাক্ষাত করতে আসেন, যাতে আমি বদ্ধদ্বার খুলে তাঁকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন, শুধু যাতে আমি তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করি। তিনি ভিক্ষুকের বেশে আসেন, যাতে আমি দান করতে পারি। প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, আমার যা কিছু, সকলই তোমার। হ্যাঁ, আমি একান্তভাবে তোমারই। আমাকে সম্পূর্ণরূপে লোপ করে, তুমি সেখানে এসে দাঁড়াও'।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯১১, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

শেষ চিঠিতে খোকার সম্বন্ধে যা বলেছ, কী প্রাণোত্তপ্ত সত্য কথাগুলি! তুমি বলেছ, তুমি বসুর জন্য গর্ব্বিত, কারণ বিজ্ঞানে অপারদর্শী ভারত, তাতে পারদর্শী হয়েছে। আমার ধারণা স্বামিজী ঠিক এই কথাই ভাবতেন। মনে হয়, তিনি এত ভালবাসতেন, যা আমরা ভাবতে পারি না। আমি নিজে সর্ব্বদা অনুভব করছি, ভারতের মহিমার বিষয়ে কখনো সন্দেহ করা যাবে না, যদি আধুনিককালে ভারতের বিপাকের অবস্থার কথা ভাবার পরে চিন্তা করে দেখি, তা সত্ত্বেও ধর্মে বা

বিজ্ঞানে পৃথিবীর জন্য ভারতবর্ষ কতখানি দিয়েছে! ডঃ বসুর কাজের মূল্য আমাদের উপলব্ধি করাতে হবে। ভারতে আরও যেসব মহান ব্যক্তি আছেন, ভারতের সেবার দ্বারাই তাঁরা মহান সীমাবদ্ধ— এই গোষ্ঠীর মধ্যেই, তাঁরা কাজ করেন কিন্তু ধর্ম্মে বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর জন্য দান রেখেছেন।

পূজার অবকাশ এসে গেল। প্রতিবারের মত বসু দম্পতির সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাবেন স্থির হলো। যাত্রার পূর্ব্বে মডার্ন রিভিউ'র জন্য প্রবন্ধ রচনা করলেন— "হোয়ট ইজ এ ব্যাকওয়ার্ল্ড নেশন"। অক্টোবর সংখ্যার জন্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। নিকটতম প্রতিবেশী— তিনি তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্রী। সুবিধা হলে তাঁর কাছে যেতেন। ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা উঠতো, সে আলোচনার মধ্যে। ডুবে গিয়ে বিশেষ আনন্দ ও বিলুপ্তি বোধ করতেন। তাঁর লেখা নাটক পড়ে আনন্দ পেতেন। তখন তিনি অসুস্থ। সেই অবস্থার মধ্যেও তিনি তাঁর শেষ রচনা "তপোবন" লিখে চলেছেন। তাঁকে নাটকখানি শেষ করার উৎসাহ দিলেন। বললেন, দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এসে যেন পড়তে পাই!

আর একটা আঘাত পেলেন সুধীরা তাঁর বিদ্যালয় ত্যাগ করে, সেই সেপ্টেম্বরে ব্রাহ্মগার্লস স্কুলে যোগ দিতে চলে গেল। সুধীরাকে বিশেষ ভাবে স্নেহ করতেন। তাঁর স্কুলে, সুধীরা যোগ দেওয়ার পরই তিনি দু'বছরের জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। কৃস্টীনের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করতেন তিনি। কৃস্টীন ও তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। সুধীরা তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন কারণ তিনি ছিলেন ধীর ও শান্ত প্রকৃতির। নিবেদিতার ছিল রুদ্রমূর্ত্তি। হৃদয়ের কোমলতা ঢাকা থাকতো, সকল সময়। তিনি স্পষ্টবাদী, মুখে তাঁর রাখ ঢাক ছিল না কোনদিন। তিনি তীব্র সমালোচক, মুখের উপর স্পষ্ট প্রকাশ করতেন, তাঁর মতামত। করতেন ভাল-মন্দের চুল চেরা সমালোচনা। কৃস্টীন ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। বন্ধুত্বও ছিল উভয়ের মধ্যে। তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদানের পরই সুধীরা তাঁর স্কুল ত্যাগ করে গেলেন, সেখানে যোগদান করতে।

দার্জিলিং যাত্রার পূর্ব্বে সুধীরার বাড়ী, নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় করলেন : পূজার ছুটির পর পুনরায় যেন তাঁর স্কুলে যোগদান করেন।

যথাসময়ে পূজার ছুটি হল। পরদিন যাত্রার আয়োজন চললো। স্বামী সারদানন্দ, ও যোগীনমার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন উদ্বোধন বাড়ীতে। যোগীনমাকে প্রণাম করার সময় বললেন : যোগীনমা, আমি বোধ হয় আর ফিরব না।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যোগীনমা। শুধালেন : সে কি নিবেদিতা, তুমি একথা বলছো কেন ? একথা কোনদিন বলবে না—চিন্তাও করবে না।

হাসলেন নিবেদিতা। বললেন : কি জানেন যোগীনমা, আমার মন বার বার বলছে, এই বোধ হয় শেষ! যোগীনমা প্রবোধ দিলেন— ওকথা চিন্তা করো না। চিন্তা করাও পাপ। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে যেন, কেমন একটা খোঁটকা! কেমন যেন উদ্বিগ্নতা!

বয়স্ক ছাত্রীগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে স্কুলে এলো। গিরিবালা, প্রফুল্ল আরও অনেকে। প্রফুল্লর শরীর খারাপ, তাঁকে ওষুধ কিনে দিলেন। দার্জিলিং এ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। যদিও তিনি জানতেন, বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার মেমসাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে যাত্রা কোনদিনই সম্ভব নয়!

রামলাল স্কুলের দরোয়ান। তাঁর উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সমস্ত জিনিষ রক্ষণাবেক্ষণের উপদেশ দিলেন।

যাত্রার পালা এলো। গুনমুগ্ধ প্রতিবেশীরা দেখা করতে এলেন। নিবেদিতা শেষ বিদায় নিলেন তাঁদের কাছে।

দার্জ্জিলিং-এ ডি, এন, রায়ের বাড়ী 'রায়ভিলায়' উঠলেন তাঁরা। প্রথম কয়েক দিন আনন্দের মধ্যে কাটলো। পরিচিত অনেকেই দার্জিলিং-এ এসেছেন। সকলেই দেখা করতে এলেন, আলাপ আলোচনা, নানা প্রসঙ্গে কাটতে লাগলো দিন, সেই সঙ্গে লেখার কাজও চলতে লাগলো।

'সন্দক-ফু' নামে এক তুষার গিরি শিখিরে অভিযানের প্রস্তাব এলো, দার্জিলিং থেকে কয়েক মাইল দূরে। সম্মতি দিলেন আনন্দে। দু'তিন দিনের যাত্রা, ঘোড়ায় চেপে যেতে হয়।

অভিযানের দিন স্থির হল। কিন্তু নিবেদিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন! কঠিন ব্যাধি—রক্ত আমাশয়। মানসিক উদ্বেগ, দৈহিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ও জীর্ন ছিল শরীর। সকলেই ভেবেছিলেন—বিশ্রাম ও স্থান পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু এ কঠিন পীড়ায় সকলেই উদ্বিগ্ন হলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার তখন দার্জ্জিলিংএ। সংবাদ পেয়ে তিনি চিকিৎসার ভার নিলেন। কখনও একটু ভাল থাকেন, উৎফুল্ল হন সকলে, আশা জাগে এ যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর শেষ সময় উপস্থিত। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত। ব্রেন কিভারে কয়েক বছর পূর্ব্বে শয্যাগত ছিলেন— মৃত্যু সেদিনও দ্বারে হানা দিয়েছিল। মৃত্যুর কথা যখন তিনি চিন্তা করতেন, মনে হত: সেই আনন্দ সত্তার সঙ্গে অতলগর্ভে মগ্ন হয়ে যাওয়ার নামই মৃত্যু। মনে পড়লো : স্বামিজীর কথা। বলতেন, শরীর যায়, আসে কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। জীবনের মত মৃত্যুও আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিরূপ প্রবাহের এক অংশমাত্র। চিন্তার বিষয় নয়—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি গোচর। সেই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত তিনি, মুখমণ্ডল আধ্যাত্মিক বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। উজ্জ্বল প্রশস্ত চোখ—সকলের প্রতি প্রেম ও করুণা পূর্ণ। হৃদয়ে অপার শান্তি— অপার আনন্দ।

মৃত্যুর মহিমা উপলব্ধি করছেন তিনি। মনে হল: সমগ্র জড় জগতের সঙ্গে সংমিশ্রিত ওতপ্রোত একটি সত্তা বিদ্যমান—সেটা গভীর ধ্যান, সম্ভবতঃ মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ এটাই। দেহবুদ্ধির কল্পনা থেকে ক্রমশঃ অধিকতর বিমুক্ত হয়ে পরম সত্তার গভীরে, গভীরতর স্তরে মগ্ন হয়ে যাওয়া— এটাই মৃত্যু।

অবলাবসু নিবেদিতার সেবা শুশ্রুষার ভার নিলেন। বিদেশে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। সে সুযোগ এসে গেল অবলাবসুর। দীর্ঘদিনের অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য্য, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। সব সময় পাশে বসে শুশ্রুষা করতে লাগলেন। ডাঃ সরকার চিকিৎসার ত্রুটি রাখলেন না। তিনি নিবেদিতাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু রোগের বৃদ্ধি ছাড়া, উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সকলে উপলব্ধি করলেন: এ কঠিন ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের আশা অতি ক্ষীণ। প্রত্যেকের মুখে বিষাদের ছায়া।

নিবেদিতা কিন্তু নির্ভীক ও তেজস্বিনী। জীবনেও যেমন, মরণের মুখবর্ত্তী হয়েও তেমন। প্রিয় বন্ধুবর্গের চিত্ত বিষাদমগ্ন, মুখে তাঁর এতটুকুও বিষাদের বা হতাশার ছায়ার লেশটুকু নেই। প্রশান্ত মনে মধুর হাস্যে সকলকে অভ্যর্থনার করে চলেছেন। গুরু তাঁর যে উদ্দেশ্যে তাঁকে এদেশে এনেছিলেন, সেই মেয়েদের শিক্ষার চিন্তাই এ মুহূর্ত্তে তাঁর চিত্ত অধিকার করে রয়েছে। তার ভবিষ্যৎ পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন।

৭ই অক্টোবর ১৯১১। তিনি বুঝলেন, যাত্রা-পথ নিকটবর্ত্তী। শেষ কর্ত্তব্য সমাধানের সময় উপস্থিত। তিনি উইল তৈরীর নির্দ্দেশ দিলেন।

উইলে লিখলেন : বস্টন শহরনিবাসী উকীল মিঃ ই. জি. থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যা কিছু দেবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার যে তিন শত পাউণ্ড আন্দাজ জমা আছে, পরলোকগত ওলিবুল পত্নীর সম্পত্তির মধ্যে আমার যে সাতশত পাউণ্ড রয়েছে, আমার যাবতীয়

পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ব আমার আছে, সেই সকল আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামিজীর মঠের ট্রাষ্টিগনকে দিতেছি। তাঁহারা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে, জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য, তাঁরা মিস কৃষ্টীন গ্রীনস্টাইডেলের পরমর্শমত, সে আয় মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন।

কর্ত্তব্য শেষ, আনন্দে— মুখ তাঁর উজ্জ্বল। আর করার কিছু নেই। একসময়ে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন— স্বামিজী আমাকে একটিমাত্র জিনিস দিয়ে গেছেন আজীবন রক্ষা করার জন্য, তা ব্রহ্মচর্য্য। শেষ দিন পর্য্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলে.. সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবো না। সে কাজ সম্পূর্ণ, স্বামিজীর কাজে একান্তভাবে জীবন উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর পূর্ণ। জীবনব্যাপী যা কিছু সঞ্চয়, পুস্তকের যাবতীয় ভবিষ্যৎ, সমস্তই স্বামিজীর প্রিয় কাজে, দেশমাতৃকার সেবায় তা উৎসর্গীকৃত।

সারাজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে পারেন নি। এবার একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করতে লাগলেন— চলে যেতে পারলেই তবে নিরঙ্কুশভাবে কাজ করার পথ উন্মুক্ত থাকবে সকলের কাছে।

দার্জ্জিলিং-এ আসার কিছু পূর্ব্বে থেকে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম থেকে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য একটি প্রার্থণা-বানী ইংরাজীতে অনুবাদ করে ছাপিয়েছিলেন। সেগুলি বন্ধুবর্গের মধ্যে বিলিয়েছিলেন। সমগ্রজীবন ছিল: মুক্তির ও নিরন্তর প্রার্থনা। সম্ভবতঃ জানতে পেরেছিলেন এই প্রার্থনাই তাঁর শেষ বিদায়বাণী। তিনি এবার অনুরোধ করলেন সেটি পাঠের জন্য।

জগতের সকল প্রাণী, শত্রুহীন, বাধাহীন, শোকজয়ী হয়ে আনন্দ চিত্তে স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজ নিজ মার্গে অগ্রসর হোক।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, সকল প্রাণী—যারা শত্রুহীন, বাধাহীন, শোকজয়ী. আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, তারা অবাধগতিতে নিজ নিজ মার্গে অগ্রসর হোক।

চিত্তের একাগ্রতা ও চিন্তা সকল কর্ম্মে তাঁকে তন্ময় করে রাখতো, ফলে তিনি দেহবোধ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হতেন, সেই চিত্তের একাগ্রতা-শেষের দিনগুলিতে তাঁকে অনন্তসত্তার ধ্যানে সমাহিত করে রাখলো। এতদিনের মালাজপের অভ্যাস, মালা জপ করার চেষ্টা করলেন— কিন্তু এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তা আর সম্ভবপর হল না। যে রুদ্রস্তুতি ছিল তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই জাগতিক সকল রকমের বন্ধন ছিন্ন করে সর্ব্ববিধ অজ্ঞানের পারে যাবার জন্য অন্তর তাঁর ব্যাকুল। শেষ মুহূর্ত্তে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন : আসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোমা-অমৃতংগময়। আবিরাবীর্ম এধি। —অসৎ হাতে আমাকে সত্যে নিয়ে চল, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম আমার কাছে জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হও।

উপনিষদের এই দিব্যবাণী উচ্চারণ করে অন্তর তাঁর আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

শান্ত হিমালয়ের নির্জ্জন ক্রোড়ে শেষের দিনগুলি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। এলো ১৩ই অক্টোবর ১৯১১। শুক্রবার। মেঘ সরে যেতে লাগলো। হিমালয়ের ঊর্দ্ধশিখর উদার ও প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তাকালো। নিবেদিতার শয্যাপাশে অবলা বসু। উমা হৈমবতীর উপাখ্যান, তাঁদের কাছে জলন্তভাবে তিনি বর্ণনা দিতেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে অবলা বসুর মনে হল: এই সেই শরৎ ঋতু, উমা এসেছিলেন তাঁর পিতার আলয়ে। এ যেন সেই উমা— হিমালয়ের সেই দুহিতা, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার ফিরে এসেছেন তাঁর নিজের আবাসে।

সকাল তখন সাতটা। সহসা নিবেদিতার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন : The boat is sinking, but I shall see the sunrise.—

তরী ডুবছে আমি কিন্তু সূর্য্যোদয় দেখবো! (ভারতের স্বাধীন সূর্য্যোদয়—আমি দেখবই—এই ছিল তাঁর জীবনের শেষ স্বপ্ন।)

তুষার শিখরে তখন সূর্য্যের আবির্ভাব, নবারুণ রশ্মির এক ঝলক - ঘরের মধ্যে এসে পড়লো—নিবেদিতার অমর আত্মা বিলীন হয়ে গেল; অসীম অনন্ত সত্তায়।

[চিঠি পত্রের ও কাগজের মধ্যে চাপা পড়ে রইলো শেষ সময়ের আকুতি— তাঁর দুটি লেখা : "প্রিয়তম" 'লীলা' ও "মৃত্যু"]

'ঈশ্বর-তৃষাই জীবনের সমগ্র অর্থ, একথা যেন চিরদিন স্মরণে থাকে। আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম ঈশ্বরই—তবে তিনি আমারই বাতায়নে দৃষ্টি মেলেছেন, আমারই দ্বারে করাঘাত করেছেন। এই প্রিয় পরমের কোন প্রয়োজন নেই, তবু তিনি মানবিক প্রয়োজনের আকার নিয়েছেন, যাতে আমি সেবা করতে পারি। তাঁর ক্ষুধা নেই, তবু তিনি প্রার্থী, যাতে আমি দিতে পারি। তাঁকে দ্বার খুলে আশ্রয় দেব বলেই তো তিনি ডাক দিয়েছেন। তাঁর বিশ্রাম রচনা করে দেব বলেই তো তিনি ক্লান্তি নিয়েছেন। আমার দ্বারে ভিক্ষাপাত্র ভরিয়ে নিতে ভিক্ষুকের সাজে তাঁর আগমন। প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম, আমার সবই তোমারই জন্য। আমি তোমারই তোমারই: আমাকে নিঃশেষ করে, তার পরিবর্ত্তে বিরাজ করো তুমি।"

"শরীর আসে যায়, আত্মা অবিনশ্বর। জীবনের ন্যায়, মৃত্যুও আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিরূপ প্রবাহের এক অংশ মাত্র। ... কালরাত্রে মনে হল: সব কিছুই এই সমগ্র জড় জগতের সঙ্গে সংমিশ্রিত। এর অন্তরে, ওতপ্রোত হয়ত আর একটি সত্তা বিদ্যমান, যাকে গভীর ধ্যান, চিত্ত বা যা ইচ্ছা বলতে পার, সম্ভবতঃ মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ ইহাই। একে, স্থানান্তরে গমন বলা চলে না, কারণ এই সত্তা জড় নয়, সুতরাং এর দেশরূপ আকার থাকতে পারে না। দেহবুদ্ধির কল্পনা থেকে ক্রমশঃ অধিকতর বিমুক্তি। সেই সত্তার গভীর থেকে গভীরে মগ্ন হয়ে যাওয়াই মৃত্যু। আমাদের মৃত স্বজনবর্গ, আমাদের স্থূলদেহেরই কাছে রয়েছে বলা যেতে পারে, যদিও তাদের সম্বন্ধে এই চিন্তা সান্ত্বনা দান করে, অথচ এই সংস্পর্শ থাকা সত্ত্বেও তারা বিরাটের সঙ্গে এক, চরম মুক্তি ও আনন্দে অভিন্ন।" চিন্তা করে দেখলাম : অসীম যেন মিলেছে অসীমের সঙ্গে আর আমরা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখার উপরে দাঁড়িয়ে। উভয়ের উপরে অধিকতর স্থাপন সীমার মধ্যে, অসীমের উপলব্ধি—এটাই আমাদের প্রতি নির্দ্দেশ। হৃদয়ঙ্গম কবছি—মৃত্যুর অর্থ কেবল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া, উপলখণ্ডের নিজ সত্তার কূপমধ্যে নিমজ্জমান। মৃত্যুর পূর্ব্ব শান্ত, দীর্ঘ প্রহরগুলির মধ্যেই এই অবস্থার সূচনা। মন যখন জীবনের বিশিষ্ট ভাবটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, ভাবটিতে তার সকল চিন্তা, ধর্ম্ম ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ থাকে। জীবাত্মা যখন দেহ থেকে পৃথক হতে আরম্ভ করে, নবজীবনের সূত্রপাত হয়ে যায় তখনই।

বিস্মিত হয়ে ভাবি : কারও সমগ্র জীবন, প্রেম ও মৈত্রী রূপে রূপায়িত সম্ভব কিনা, যেখানে বিরুদ্ধভাবের একটি তরঙ্গও উঠবে না, যাতে অন্তিম সময়ে, সে এক বিরাট ধারণায় চির সমাহিত হয়ে যেতে পারে। অন্ততঃ অনন্তের কোলে স্বার্থ-চিন্তা বিমুক্ত হয়ে, বিশ্বের সমগ্র অভাব ও দুঃখকে ধারণ করে, এক শান্তিময় ও শিবময় জাগ্রত আবির্ভাবরূপ, অনুভব করতে সমর্থ হবে!

• প্রিয় ছিল তাঁর রুদ্র স্তোত্র : "অসৎ থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলো। মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। আমার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রবেশ কর! হে রুদ্র; তোমার কল্যাণ মধুর সুখ দ্বারা আমাদের নিরন্তর রক্ষা করো! ...জন, গন, দেশ মুক্তির কামনাই হোক জীবনের মূলমন্ত্র— বিরাজিত থাক মুক্তি... মুক্তি, সর্ব্ব মানুষের, সর্ব্ব দেশের সারা বিশ্বের যেখানে সদা বিরাজিত মানবতা—শূন্য যেথা শোষণ ও পেষণ, মধুময় পৃথিবী সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নার বেদনা রোধে সব একাকার!

পরিশিষ্ট

কোন দেশকে বুঝতে হলে তার ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস ও শিল্প সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। কিন্তু দুর্গাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশ দীর্ঘদীন পরাধীনতায় আবদ্ধ থাকায়, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সে হারিয়ে ফেলে। ফলটা দাঁড়ায়ঃ জগতের চোখে তারা সর্ব্বহারা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিদেশীর চোখে 'অসভ্য' বর্ব্বররূপে প্রতিভাত ছিল সেদিনের ভারতবর্ষ।

আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত থাকা অবস্থায়, আর্য্যভারত, স্বাধীন ভারত, আক্রমণকারী দস্যুদের হাতে পদানত হল। শুধু পদানত বললে, পিছনে একটু অহমিকা থাকে, বস্তুতঃ আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে, গোলামের দেশে পরিণত হই। অনুকরণ প্রবৃত্তির ফলে, সকল সচেতনার সমাপ্তি ঘটে। আমরা আত্মসর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়াই জীবনের সীমারেখায়। ফলে জীবন 'কেন্দ্রিভূত হল কুসংস্কারে'। আমরা আমাদের জাতীর সর্ব্বস্ব হারিয়ে, গণ্ডীর বেড়াজালে নিবদ্ধ হয়ে, শুধু করেছিলাম আত্মঘাতী সংগ্রাম। সেই সুযোগ নিয়ে, স্বার্থান্বেষীদের সহায়তায় বিদেশী আক্রমনকারীরা, আমাদের বারবার পদানত করে রেখেছিল।

এলো হুন, এলো পাঠান, এলো মুঘল। ভারতের জ্ঞান গরিমা হল চূর্ণ— হল বিকৃত। শেষে এলো ইউরোপীয় সভ্য বণিকেরদল, ব্যবসার পসারে, —শাসকদের ভেদনীতি ও শাসনের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলো নিজেদের সাম্রাজ্য। এসেছে পর্ত্তুগাল, এসেছে ফ্রান্স, এসেছে জার্ম্মনী, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের চতুরতার কাছে, তারা পিছু হঠেছে। কয়েকটি সীমানায় চিহ্নিত হয়ে সীমাবদ্ধ থেকেছে তারা।— এটাই অতীত ইতিহাস।

সেদিন ইউরোপ ছিল-- আধুনিক সভ্যতার পীঠভূমি। ব্যবসার প্রসারই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সেই ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ই এখানে প্রতিষ্ঠা করলো রাজত্ব। নিপীড়নে উত্তিষ্ঠ হয়ে দেশবাসী যখন বিদ্রোহ শুরু করলো (মিউটনী) কুইন ভিক্টোরিয়া তখন ইংলণ্ডের রানী, অধিকার করে নিলেন বণিকের গড়া সাম্রাজ্যটি। এটাই ব্রিটীশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অতীত ইতিহাস।

ইংরাজ এলো, কিন্তু দেশশাসনের প্রয়োজনেই বিস্তার করলো— শিক্ষা (ইয়োরোপীয়)। হলাম তোতাপাখী। তাদের চলন, বলন, অনুসরণ করতে শুরু করলাম— জীবনযাপনের উদ্যেশ্যে। গ্রহণ করলাম রীতিনীতি, পেশাদারী, আচার ও আচরণ। ফলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। আচার অনুষ্ঠানে, নিজেদের নকলনবিশে রূপান্তরিত হলাম। তাদের ভাল' গ্রহণ না করে, তাদের মন্দগুলোকে সর্ব্বস্বরূপে গ্রহণ করলাম। পতনের এও একটা কারণ।

রক্তের মধ্যে সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের ভাবধারা, আমাদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সবটা বিলুপ্ত হয়নি, তাই আমাদের অনেকেই সুপ্ত যে দাহন শক্তি প্রভাবে, পুনঃজাগরিত হয়ে উঠলো। আমরা ফিরে পেলাম জ্ঞান, এলো সচেতনতা, আমাদের জাতির প্রাণে পুনঃ জাগরণ শুরু হলো।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের সকল কিছুই খারাপ নয়। শোষণকারীর সংখ্যা বেশী হলেও, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সেই পণ্ডিতের দল এগিয়ে এলেন পুরাতন ভারতের মর্য্যাদা ফিরিয়ে দিতে। কেউ লিখলেন ইতিহাস, কেউ করলেন এদেশের শিল্প ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা— জুড়ে দেওয়া হল শিল্প বিষয়ে মন্তব্য— অবশ্য ইউরোপীয় দৃষ্টি— ভিত্তি করে। প্রশংসিত হল অলঙ্কার-শিল্প ও কারু-শিল্পের কিন্তু সে ধারার মধ্যে ছিল না ভারতীয় শিল্পের মর্ম্মবাণী। 'গৌণ' করে ধরা ছিল তাঁদের সে চেষ্টার মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও শিল্প সভ্যতার অনুকরণ সে শিক্ষার প্রচলনে। আর আমরা জলবায়ুর মত তা সত্য বলে ধরে নিলাম। তখন ইউরোপের ধারণা ছিলঃ গ্রীক শিল্পের তুল্য অন্যকিছু হয়নি, হতেও পারে না— সবকিছুর মূল্য নির্দ্ধারিত হত— গ্রীক শিল্প বা তার অনুসরণকারী শিল্পের তুলনামূলক ভাবটি।

ভারত থেকে প্রথম প্রতিবাদ, তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই প্রথম ভারতের ধর্ম্ম, সংস্কৃতির যথার্থ মহিমাময় অংশ তুলে ধরলেন, শিক্ষিত সমাজ ও সভ্য দেশগুলির সামনে। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের কথা নয়, প্রাচীন শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা তুললেন। ভারত শিল্পের প্রকরণ ও মর্ম্মসত্যের বাণী সাধারণ বক্তৃতা-সভায় বললেন, তারও বেশী ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করলেন। সেই অনুসরণকারীদের মধ্যে নিবেদিতাই, সেই ভারত শিল্পের-রূপ ও সত্য-প্রচারে অগ্রসর হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য 'প্রতীকের' তাৎপর্য্য বুঝতেন। গুরু দেহ রাখলে, তিনি সুরু করলেন তাঁর পরিব্রাজক জীবন, ঘুরে বেড়ালেন সারা ভারতবর্ষ। যেখানেই গেলেন যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও লোকশিল্প। আগ্রহভরে দেখলেন, রাজপুত চিত্রকলা— লক্ষ্য করলেন তার লোকশিল্পের নিদর্শন। মুসলিম স্থাপত্য সম্বন্ধেও ছিলেন অত্যন্ত অনুরাগী। সিংহলে অনুরাধাপুরসহ নানা শহরে প্রত্নকীর্ত্তি দেখলেন। চীনের ক্যান্টন সহর ও জাপানের একাধিক শহরের শিল্প-কীর্ত্তি দেখলেন। আমেরিকার বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ঘুরলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সেসব শিল্পনমুনা। যখন এলেন ইংলণ্ডে, সেখানেও পরিদর্শন করলেন সবকিছু। প্যারিসের লুভারে গেছেন বিভিন্ন সময়ে। কন্টিনেন্ট ভ্রমণের সময় জার্ম্মনীর বিভিন্ন শহরে দেখলেন, খুঁটিয়ে সব। এলেন রোমে, ফ্লোরেন্স দেখলেন, সেখানের সবকিছু। এলেন নেপলস্— পম্পেই। আত্মহারা হলেন গ্রীস পদার্পণ করে। ঘুরলেন ভিয়েনা, দেখলেন শিল্পনমুনা। শিল্পী রণদা প্রসাদ দাশগুপ্তকে শুধালেন: পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের শিল্পনিদর্শন দেখে এলুম।

এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ছিল ব্যাপক পড়াশুনা। তাই তাঁর সহজ অন্তর্দৃষ্টি, বস্তুসত্যের মর্ম্মভেদ করে 'প্রতীকের' তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে ছিলেন। এ বোধ যেমন গভীর, সমর্থনও সুদৃঢ়। অতিপ্রতীকী তিনি ছিলেন না— জানতেন, তা প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে।

স্বামিজীর কাছেই, নিবেদিতার ভারতীয় শিল্পদীক্ষা। আর সে শিক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯শে জুলাই ১৮৯৮ কাশ্মীরে প্যাণ্ড্রে স্থানে মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে। তিনি (নিবেদিতা) নিজের স্বীকৃতিতে বললেন, স্বামিজীই আমাদের সকলকে প্রবেশ করালেন, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে। এখানেই শিখলাম, কিভাবে অভ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়।

১লা ডিসেম্বর ১৮৯৯ সালে 'ভারতের চারুশিল্প ও কারুকার্য্য' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করতে হবে। বিপদে পড়লেন তিনি। মেরী হেলকে লিখলেন: ভারতীয় চারুশিল্প ও কারুশিল্প বিষয়ে কিছুই জানি না আমি। মুশকিলের আসান স্বামিজী। তুমি যদি রাজি থাকো— তাহলে তোমাদের ওখানে শনিবার সন্ধ্যায় স্বামিজীকে ওই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করতে পারি। আমার বিশ্বাস, স্বামিজী আমাকে সাহায্য করবেন, তিনিই যথার্থ অনেক কিছু জানেন। তিনিই (স্বামিজী) নিবেদিতাকে প্রভাবিত ও চালিত করলেন। পরবর্ত্তীকালে এসেছিলেন, হ্যাভেলে, ওকাকুরা, কুমারস্বামী ও অরবিন্দ প্রভৃতি এবং তিনি তাঁদের কাছে পরবর্ত্তীকালে শিক্ষা লাভ করেননি বরং নিজ প্রভাবে প্রভাবিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন, বিবেকানন্দও ছিলেন, আদর্শ ও সাধনধারা বহনের আত্মাস্বরূপ— নিবেদিতাও ছিলেন ঠিক তেমনি বিবেকানন্দের কার্য্যবাহী-আত্মা। তিনি শিষ্যার কাছে স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন: (১) হিন্দুর শিল্পবস্তুর ভাব-উন্মোচন, 'প্রতীকী' সে ভাষা। (২) ধর্ম্মকেন্দ্রিক হিন্দুদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের 'হিন্দুশিল্প' ধর্ম্মকেন্দ্রিক। ধর্ম্ম ও শিল্প 'অঙ্গাঙ্গিক'। (৩) শিল্পের প্রতীকী ভাষাই হিন্দুশিল্পের শক্তিভিত্তিক হওয়ায় তা দুর্ব্বোধ্য ও উদ্ভট বলে সেই প্রাণহীন আলঙ্কারিকতার পতন। (৪) ভারতের শিল্প, ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি। বাইরের প্রভাবে ভারতীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। ইউরোপীয়গণ স্বদেশীয় গ্রীকপ্রভার দাবী করলেও তা অতিরঞ্জিত। ইউরোপীয় ধারণায় যৌন উপাসনার প্রবর্ত্তক 'শিবলিঙ্গ' এমনকি 'শালগ্রাম' শীলাও। (৫) হিন্দুশিল্প ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি,

তার সাধনার স্বরূপ। মধ্যবর্ত্তীকালে মুঘল-শিল্পও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মুঘলশিল্প বহিরাগত পূর্ব্বতন ভারতীয়, ধারায় অনুপ্রবেশের ফল তা ঘটেছে এবং তার ঠিকানা অসমান্য প্রাপ্তিতে। (৬) এদেশে শিল্প ছিল রাজপৃষ্ঠপোষিত, তবুও তা বুর্জ্জোয়া নয় সর্ব্বজীবনস্তরে পৌঁছে তা পরিণত হয়েছিল দৈনন্দিন জীবনের সৌন্দর্য্যস্বরূপ। (৭) আধুনিককালে যে পাশ্চাত্য অনুসরণকারী শিল্প ভারতের ঘরে, বাইরে, দেখা যাচ্ছে তা নকলনবিশী অসার্থক সৃষ্টি মাত্র।

নিবেদিতা গুরুবাক্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন: শিল্পের প্রতীকী ভাব— গ্রহণ করেছিলেন এবং তা ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ সালের কালী বক্তৃতায় অ্যালবার্ট হলে। কুমারস্বামী সে ব্যাখ্যা মেনে নিলেও ঠাকুর পরিবারের অনেকের কাছে, তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল, পূজা হবে সুন্দরের, কেন হবে ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তির? যেহেতু ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতা থাকা উচিত, সেহেতু সৌন্দর্য্যের উপাসনাটা তাঁর মনে লঘু বা অগভীর মনে হয়েছিল কিন্তু ২৮শে মে ৯৯ সালে কালিঘাটে সেই নামে 'কালীর বক্তৃতায়' ঠাকুর নামে যে সৌন্দর্য্য চেতনার আঘাত ছিল, তার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন— হিন্দু সমাজের উচ্চস্তর ব্যক্তিবর্গের কাছে।

তিনি সে যুগের সে সময়ের মানুষদের বোঝালেন : গভীরভাবে নিজেদের সৃষ্টির তাৎপর্য্য যদি অনুধাবন না করি, বিদেশী সৃষ্টির বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যটুকু বিভ্রান্ত হবে— সৌন্দর্য্যের পিছনকার গভীর প্রেরণা ও আদর্শের কথা উপলব্ধি হবে না। এর ফলেই, ভারতে আজ ইয়োরোপীয় ভাবধারা, তাদের স্থূল ও নিম্নগামী করে তুলেছে। ঘোষণা করলেন: বীভৎস মূর্ত্তির পূজা (কালী), শিল্প ও ভাস্কর্য্যের প্রতিবন্ধক হবে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করদের গ্রীস তীর্থ যাত্রা করে ডেলফির মন্দিরে যেতে হয় অথচ সেটা বেঢপ চেহারার উপাসনা মূর্ত্তি। আর মানুষ তাদের পাদমূলে প্রণত হয়। এঁরাই জন্ম দিয়েছিলেন ফিডিয়াসের।

সৌন্দর্য্যরসিকদের কাছে 'ম্যাডোনো' সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি। সেখানেও ধর্ম্মার্চ্চনা ও কলাশিলেপর স্থান পাশাপাশি। ধর্ম্মব্যাপারেও সেযুগে ধর্ম্মার্চনায় বাহ্যিক চাকচিক্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা মনে করেন না মেরী ও শিশুমূর্ত্তি, সবসময় বা সর্ব্বত্রই সুন্দর। যাদের মনে ভক্তির সচেতনতা নেই, তাঁদের কাছে বাইজান্টীয় চিত্রাবলী বা খোদাই কাজ, কুৎসিত ঠেকবে— যেমন ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন সমালোচকের কাছে "কালীমূর্ত্তী"টি ঠেকে।

তিনি ঘোষণা করলেন: উপস্থিত জনচেতনার সম্মুখে "যাঁদের কালীমূর্ত্তি ভয়ঙ্করী প্রতিয়মান হয়, মানুষের সৌন্দর্য্য চেতনায় আঘাত করে, সেইসঙ্গে চিন্তা করেন— ইউরোপীয় ভাস্কর্য্য অনেক উচ্চস্তরের, তাঁরা নিজেদের সৃষ্টির অনুধাবনের চেষ্টা করেন না— সে সৌন্দর্য্যের পিছনকার গভীর প্রেরণা ও আদর্শের কথা তারা বুঝেন না। ইয়ুরোপীয় ভাবধারা গ্রহণ করেই তাঁরা স্থূল ও নিম্নমুখী হয়ে পড়েছেন।

কালীর বীভৎস মূর্ত্তি পূজা—শিল্প ও ভাস্কর্য্যের প্রতিবন্ধক যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা মা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না— মাতৃমূর্ত্তির অবমাননা করেন। 'মা' দেখতে কুৎসিত হলেও তিনি মা। সন্তানের কাছে দেবী। ঠিক তেমনি এঁকেই তাঁরা 'মুক্তির প্রতীক' বলে সাধনা করেন দিনের পর দিন।

ইয়ুরোপেও একযুগে ধর্ম্মচর্চ্চা ও কলাশিল্পের উন্নতি, পাশাপাশি চলেছিল, এব্যাপারে বাহ্যিক চাকচিক্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধিও পেয়েছিল— একথা দারুণভাবে সত্য। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন সেই 'মেরী ও শিশুর' প্রতিমূর্ত্তি সবসময়েই সুন্দর ছিল ঠিক যেমনটি প্রতি মানুষের কাছে সুন্দর দেখায় নিজের ছেলেমেয়ের মত। যেখানে ভক্তির ভাবানুভূতি নেই, বা সে সচেতনতা নেই, প্রথম যুগের সেই বাইজান্টীয় চিত্রাবলী বা খোদাইকাজ— কুৎসিত ও প্রাণহীন ঠেকবে।

তথাকথিত "নিষ্ঠুর" কুৎসিতই অসম্ভব অপরিচয়ের উৎসাহিত উক্তি। মানুষ মাত্রেরই অভিজ্ঞতা ও ভাবনা অনুযায়ী—'প্রতীক'কে বিভিন্নভাবে দর্শন করে। খ্রীষ্টান ভক্তও 'রক্তপূর্ণ' উৎসের" কথা যখন বলেন— খাঁটি বস্তুর দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলে ভাববিহ্বল হন না। 'কালী' যাকে লোক রক্তপিপাসু ভাবে, বা কটুক্তি করে, ভক্তের চোখে তিনি মা, আর যিনি শুধু মূর্ত্তি গঠনের বিশ্লেষণ করে চলেন তাঁর চোখে তিনি সত্যই ভয়ঙ্করী।

যাঁরা কটুক্তি করেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত: ইউরোপীয় শিল্পের মাপকাঠিতে বা ওই শিল্পের আলোচনার দৃষ্টিতে 'কালীমূর্ত্তি' অসাধারণ নাটকীয় চরিত্রের — কোনমতে চোখ এড়িয়ে যাবার জিনিষ নয়। সকল শিল্প: চিন্তাও অনুভূতির প্রকাশ চেষ্টায় আঁকুপাঁকু— যেহেতু প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা অনুযায়ী, মানুষ প্রতীককে বিভিন্নভাবে দর্শন ও গ্রহণ করে থাকে। তাই 'কালীমূর্ত্তির' প্রগাঢ় অর্থদ্যোতক অভ্যস্ত চোখ, সুস্পষ্ট ও চককপ্রদ। যাঁরা ইয়োরোপীয় ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতার কথা তুলছেন বা বলছেন, যদি তাঁরা ইউরোপীয় হতেন এই অসাধারণ নাটকীয় রূপের কথা স্বীকার করতেন। ভারতীয়রা নিজেদের পুরাণ কথা বা সৃষ্টি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য থেকে চোখ সরিয়ে, সৃষ্টি করেছেন— এক্ষেত্রে তুলনা থেকে বিরত থাকা উচিত।

এই বক্তৃতার ছমাস পরে ২৫শে নভেম্বর ১৮৯৯ সালে শিকাগো বক্তৃতার "ভারতীয় চারুশিল্প ও কারুশিল্প" সম্বন্ধে মিসেস বুলকে লিখলেন: কালীমূর্ত্তির প্রতিলিপি ও ইউরোপীয় অনুকরণের অধোগত কিছু হিন্দুশিল্পের নমুনা পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত তখন তিনি স্বামিজীর সঙ্গে তাঁর স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহে যাত্রা করেছেন। মাঝপথে ইংলণ্ডে নেমেছেন ও সেখানকার মিউজিয়াম দর্শন করে মুর্শিদাবাদে স্বামী অখণ্ডানন্দকে ১০ই আগস্ট ১৮৯৯ চিঠি দিয়েছেন : সেদিন মিউজিয়ামে গিয়ে হাতীর দাঁতের খোদাই করা সুন্দর দুর্গামূর্ত্তি দেখেছি, স্বামিজী বললেন— এজিনিষ মুর্শিদাবাদে পাওয়া যায়। এসব কি খুব দামী? আমার ইচ্ছা পাশ্চাত্যে গিয়ে হিন্দু মূর্ত্তির প্রতীকগুলির তাৎপর্য্য কিছু ব্যাখ্যা করবো। যদি পেতলের বা কাঠের দুর্গামূর্ত্তি অসম্ভব দামী না হয়, তাহলে তা পেলে খুব আনন্দিত হব। হাতীর দাঁতের মূর্ত্তির কথা বলাবাহুল্য। স্বামিজী বলছেন: হিন্দুচিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য, জাতীয় প্রবণতা অনুযায়ী আত্মিক ও মানসিক বিষয়কে বাহ্য অবয়ব সংস্থানের মধ্যে প্রকাশ করতে গিয়ে উদ্ভট রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলা চলে, অধিকাংশ দৈহিক ও মানসিক বস্তুর ভাবপ্রতীক আছে যা প্রায়শঃ দেহের রূপের পাশে উদ্ভটভাবে পৃথক দেখায়। (মিস ম্যাকলাউডের লেখা ২৬/৭/১৯০০ চিঠি)

বালিকা জীবনে সাতটি বছর ছিল মর্ম্মান্তিক। এই বয়সই তাঁকে বলধান করে ছিল গ্রন্থশিল্প ও ধর্ম্মজগতে। এসেছিলেন সুপণ্ডিত রোমান ক্যাথিলিকদের সংস্পর্শে। এখানেই তাঁর মনোজগতের পুষ্টিসাধন। জন্ম, সহজাত সৌন্দর্য্য ও শিল্পবোধের। প্রাচীন শিল্প ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলনের ফলে, ঐতিহ্য ধারার বহুমূল্য জ্ঞানলাভ করেন। অর্চ্চনার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা বেড়ে যায়। প্রত্যক্ষ করেন ধর্ম্মচর্চ্চার ও বর্ণ গরিমা ও নাটকীয়তা। ভাবাকুতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে মন। যুক্ত হয়ে পড়েন অতীত সন্তযুগের সঙ্গে। এরপরই পরিচত হয়ে ওঠেন, উৎসাহী সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে। শিল্পী এবেনজার কুকের সঙ্গে হল বন্ধুত্ব। রাসকিনের অনুগামী এই শিল্পী বিদ্যালয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। উইম্বলডনের স্কুলে জড়িয়ে পড়েন। শিল্পকে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত, আগ্রহ এখানেই জন্মে। শিল্পের তত্ত্বচর্চ্চা ও শৈলী-চর্চ্চাতে আবদ্ধ ছিল মন— তা জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রসারিত। অপরিসীম নিসর্গপ্রীতি, সৌন্দর্য্যপ্রীতি, প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ, তাঁকে শিল্প ভুবনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। ২০ বছর বয়সে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে লিখতে সুরু করেন।

প্রথম দর্শনে স্বামিজীর ললাটে ও আননে দেখলেন বাস্কায়েনের আঁকা শিশু খ্রীষ্টের কোমলতা ও মহিমা। ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি সিস্টিন ম্যাডোনার ছবি ভারতে পাঠানো হল— স্বামী সদানন্দ শিশু খ্রীষ্টের মুখের সঙ্গে স্বামিজীর মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন। ৩১শে মে ১৮৯৯ পত্রে তা লিখে নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দেন।

যখন বয়স তাঁর ২১— নারীর অধিকার বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন ছদ্মনামে (ঠাকুরমার নামে)। লিখেছেন: শ্রমিক (লণ্ডনের) জীবনের পরিবেশ। ভারতে আসার পরে এদেশের জনজীবন, উৎসব: অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে। ফুটিয়েছেন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতকে জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে। আইরিশ জাতীয়বাদী, স্থানান্তরিত হয়ে ঠিক ভারতের ক্ষেত্রে ও নরওয়ের ক্ষেত্রেও সেই একই প্রবণতা।

স্বামিজীর কাছে শিখেছিলেন ধর্ম্ম, দীক্ষালাভ করেছিলেন ভারতীয় শিল্পের।

নব্যভারতীয় শিল্প আন্দোলনে নবচেতনার সৃষ্টি প্রেরণাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। অবশ্য তার অনেক আগেই শিক্ষিত সমাজের জাগরণ ঘটে গেছে— এদের মূলে ছিল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ। এদের কেউ কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছেন, সঙ্গে মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছেন। এই প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে ভারততাত্ত্বিকরাও যোগ দিয়েছিলেন। যদিও সেযুগটা ছিল ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণ শিক্ষা। ভারতীয় অলঙ্কারশিল্প ও কারুশিল্পের প্রশংসাও এসেছে এঁদের কাছ থেকে কিন্তু ভারতীয় শিল্পের মর্ম্মবাণী বুঝবার চেষ্টা দেখা যায়নি। প্রতিটি দেশের শিল্প যে সেইদেশের ইতিহাস ও ভূগোলের সাক্ষর নিয়ে উপস্থিত হয়, তা ভারতীয় বাইরের চোখে বিচার করা হতো। কারণ তাঁরা, তাঁদের জানা ইউরোপীয় নমুনার পাশে ফেলে ভারতীয় শিল্পের বিচার করতেন। নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিমত নিন্দা বা প্রশংসার বাণী বর্ষণ করতেন। এঁদের ধারনাকে, এদেশের মানুষেরা, জলবায়ুর মত সত্য শুধু বিবেচনা করতেন না, সত্য বলেও মেনে নিয়েছিলেন। এঁদের ধারনা ছিল গ্রীক শিল্পের মত তুল্য অন্যকিছু হয়নি বা হতে পাবে না। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ তুললেন স্বামিজী। জোর দিয়ে প্রচার করলেন: ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মর্ম্মবাণী। সাধারণ বক্তৃতায় যত বললেন, তার শতগুণ প্রচার চালালেন ব্যক্তিগত আলোচনায়। ফলে, তাঁর অনুরাগীরা ভারতশিল্পের রূপ ও সত্যের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হলেন। আর এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন নিবেদিতা। পরিব্রাজক জীবনে স্বামিজী, বছরের পর বছর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা ও লোকশিল্পের নিদর্শন লক্ষ্য করেছিলেন। আগ্রহভরে রাজপুত চিত্রকলা ও রবিবর্মার চিত্রাবলী দেখেছেন— যা তখনকার দিনে ভারতে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে পরিচিত ছিল। মুসলিম স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে ছিল অপরীসীম অনুরাগ। যখন সিংহলে গেছেন একান্ত যত্নসহকারে দেখেছেন অনুরাধাপুর সহ নানা শহর। চীনের ক্যান্টনে যখন গেছেন দেখেছেন শিল্পকীর্তি। জাপানে যখন গেলেন মুগ্ধ হলেন সেখানের একাধিক শিল্পকীর্ত্তি ভরা শহর দেখে। যখন আমেরিকায়, দেখলেন বিভিন্ন সংগ্রহশালা, যখন ইংলণ্ডে এলেন, সেখানেও ঘুরে বেড়ালেন সংগ্রহশালায়। প্যারিসে যখন, ঘুরলেন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বার বার। যখন তাঁর শুরু কন্টিনেন্ট টুর, জার্ম্মানীর শহরের পর শহর ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তার শিলপসমূহ। গ্রীসে গিয়ে হলেন আত্মহারা। ভিয়েনায় ঘুরে দেখলেন শিল্পতীর্থ, গেলেন নেপলস্, গেলেন পম্পাই, রোম, ফ্লোরেন্স, কনস্টান্টিনোপল, মিশর, তুরস্ক দেখেছেন শিল্পনমুনা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ব্যাপক পড়াশুনা, প্রতিভার সহজাত অন্তর্দৃষ্টিই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য উপলব্ধি করেছিলেন 'প্রতীকী' তাৎপর্য্য। আর তাঁর কাছে নিবেদিতার ভারতীয় শিল্পদীক্ষা। কাশ্মীরের থাকা কালেই সে শিক্ষার শুরু। নিজের দেখা ও তাৎপর্য্যে ব্যাখ্যা করলেন শিষ্যাকে মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য। সে কথা তিনি (নিবেদিতা) "নোটস অব সাম ওয়াণ্ডারিংস উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ" বইয়ে বিস্তারিত

লিখেছেন। এঁর 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' বইয়ে, তার উল্লেখ আছে। অবশ্য তিনি নিজেও ঘুরে দেখেছেন সারা ভারত, ঘুরেছেন অজন্তা, ইলোরা, আগ্রা, দিল্লী, বিহার, কাশী, চিতোর— দেখেছেন এসব স্থানের শিল্প-সৌন্দর্য্য। এসকলের বর্ণনা পাওয়া যায়—'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফে'' ''স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইষ্টার্ন হোম'' ''দি ফুটকলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি বইগুলিতে।

২৮শে মে ১৮৯৯ সালে তাঁর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ সালের বক্তৃতায় যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে বললেন : যাঁরা বলেন কালীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সুকুমারমতি মানুষের সৌন্দর্য্য চেতনায় আঘাত হানে, তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন— যদি ভারতীয়রা গভীরভাবে নিজেদের সৃষ্টির তাৎপর্য্য অনুধাবনের চেষ্টা না করেন, তাহলে তাঁর বিদেশী সৃষ্টির সৌন্দর্য্যটুকু দেখেই বিভ্রান্ত হবেন— কদাপী সে সৌন্দর্য্যের পিছনকার গভীর প্রেরণা ও আদর্শের কথা বুঝবেন না। ফলে, তাঁরা নিজেদের শিল্পের ইউরোপীয় ভাবাপন্ন করতে গিয়ে, অধিক স্থূল ও নিম্নগামী করে তুলবেন। কালীর বীভৎস মূর্ত্তির পূজা, শিল্প ও ভাস্কর্যের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক যাঁরা বলছেন, তাঁদের জানা উচিত : সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করের সময় থেকে সমগ্র গ্রীস তীর্থযাত্রা করে উপস্থিত হতো 'ডেলফি''র মন্দিরে, যেখানে ছিল প্রায় বেন্দাপ্পা চেহারার এক উপাসনার মূর্ত্তি সেইকালের মানুষেরা সে মূর্ত্তির পাদমূলে প্রণত হতো— এঁরাই জন্ম দিয়েছেন ফিডিয়াসের।

একথা সত্য, ইউরোপে একযুগে ধর্ম্মচর্চ্চা ও কলাশিল্পের উন্নতি চলেছিল পাশাপাশি, ফলে ধর্ম্মব্যাপারে চাকচিক্য ও আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল— এর দ্বারা কেউ যেন মনে না করেন মেরী ও তাঁর শিশু মূর্ত্তি সবসময়েই সুন্দর ছিল। বাইরের মানুষ, যাঁর মনের মধ্যে খ্রীষ্টান ভক্তের ভাবনাভূতি বিষয়ে সচেতনতা নেই, তাঁর পক্ষে প্রথম যুগের বাঈজান্টীয় চিত্রাবলী এবং খোদাই কাজ প্রাণহীন কুৎসিত ঠেকবে। ইউরোপীয় ভাবাপন্ন সমালোচকের কাছে কালী মূর্ত্তি যেমন ঠেকে। তথাকথিত 'নিষ্ঠুর', 'কুৎসিৎ', 'অবাস্তব' এসব হল অপরিচয়ের উক্তি। জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা অনুযায়ী মানুষ 'প্রতীক'কে বিভিন্নভাবে দর্শন ও গ্রহণ করে। খ্রীষ্টান ভক্ত যখন রক্তপূর্ণ উৎসের কথা বলে তখন কিন্তু যে খাঁটি বস্তুর ছবিটা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলে ভাববিহ্বল হয়না। রক্ত পিপাষু কালী ক্ষেত্রেও ভক্তের মনোভাব অনুরূপ। ইউরোপীয় শিল্পের মাপকাঠিতে বা ঐ শিল্পের আলোচকদের দৃষ্টিতে কালীমূর্ত্তি অসাধারণ নাটকীয় চরিত্রসম্পন্ন যা কোনমতে চোখ এড়িয়ে যাবার জিনিস নয়। সকল শিল্পই চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশচেষ্টা আঁকুপাঁকু করছে যেহেতু প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম তার আয়ত্তে ছিল না। এ মূর্ত্তি প্রগাঢ় অর্থদ্যোতক এমন কি বারবার দেখে অভ্যস্ত, চোখেও সুস্পষ্ট ও চমকপ্রদ আকার নিয়ে ধরা পড়ে। সে সব অভিযোগকারী ইয়োরোপীয় ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতার কথা বলছেন, তাঁরা যদি ইউরোপীয় হতেন তা হলে কালীমূর্ত্তি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ নাটকীয় রূপের কথা স্বীকার করতেন। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নিজেদের পুরাণ কথা বা সৃষ্টি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য থেকে চোখ সরিয়ে তাদের সঙ্গে অযথা তুলনাদির ব্যাপারে বিরত থাকলেই ভাল করবেন।

নিবেদিতা যখন তাঁর শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তখনও ইংলণ্ডে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা সকরুণ। তিনি যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, সেটা ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর, শিকাগো ট্রিবিউন কাগজে তাঁর এক প্রবন্ধ বেরুলো। এ সময়ে তিনি শিকাগো পাবলিক স্কুলগুলিতে শিল্প-শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। খুব দুঃখের সঙ্গে ইংলণ্ডের শিল্প শিক্ষার পশ্চাদগামিতার তুলনা করলেন। ইংলণ্ডে, গণতন্ত্রের অনেক কথা শুনেছেন, কিন্তু কার্য্যকালে আর চিহ্ন দেখেননি— আর আমেরিকায় খাঁটি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখলেন অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে। ইংলণ্ডের মানুষকে সচেতন করতে প্রয়াসী হলেন। রাসকিনের শিষ্য এবেনজার কুক তিরিশ বছর আগে থেকে সে চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি (কুক) বোঝাতে চাইলেন সকল মানুষের

পক্ষে অক্ষরজ্ঞান যেমন প্রয়োজন, তেমনি সকল শিশুর পক্ষে প্রয়োজন চিত্রাঙ্কন শিক্ষা। তাঁরই প্রচেষ্টায় অভিজাত মহলে কিছু নাড়াচাড়া দেখা যায়। অনেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিশু শিক্ষার ভার তাঁর হাতে তুলে দিলেন। অনেক চেষ্টার পর সরকারের তন্দ্রাভঙ্গ হল, স্কুলের উপর বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষাসূচী রচনার ভার দেওয়া হল। তার আগে ধারণা বলবৎ ছিল শিশুরা গতানুগতিক রীতিতে কালো রেখায় ড্রইং শিখবে। রঙের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। রঙের ভাষায় নিজের মনকে শিশুরা খুলে ধরবে— এ বস্তু ছিল চিন্তার বাইরে। যখন থেকে এবেনজার কুকের শিল্প-শিক্ষাসূচী গ্রহণ হল, নিম্ন শ্রেণীর শিশুরা রঙ ও তুলি ব্যবহারের সুযোগ পেল ইংলণ্ডে। অবশ্য শিকাগোতে মিঃ কুকের মত একজন অনুরূপ কজে শুরু করেছিলেন মিস জোসেফিন লক। তিনিই নিবেদিতাকে বলেছিলেন: শিক্ষার উদ্দেশ্য হল নগরবাসীদের মধ্যে প্রকৃতিজীবনের ·সংরক্ষণ। কথাগুলো তাঁর কাছে অসাধারণ প্রজ্ঞায়পূর্ণ মনে হয়েছিল। তিনি দেখলেন : পৃথিবীর নানা দেশের শিশু আমেরিকায় জুটছে, একত্রে শিশুগুলি স্ব স্ব দেশের সংস্কৃতিকে মিশিয়ে দিচ্ছে একস্রোতে, অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে আমেরিকার জাতীয় চেতনায়।

তিনি ১৩ই নভেম্বর ১৮৯৮, ১৬ নং বোসপাড়া লেনে তাঁর বিদ্যালয় শুরু করেন, শ্রীমা সারদাদেবী নিজে এসে পূজা ও প্রার্থনা করে যান। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে কয়েকটি শিশুকে নিয়ে কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন তার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মিসেস ওলি বুলকে চিঠি দিলেন: "এখানে যে বাচ্চাগুলিকে তুমি চিনতে, তাদের শিল্পক্ষমতা এতাবৎ সেরা, যা দেখেছি, তার মতই। এখানে তাদের সীমিত সুযোগের কথা মনে রাখতেই হয়। তাদের তুলির কাজ অদ্ভুত ভালো, রঙের ব্যবহার চমৎকার। তারা কী সুন্দরভাবে যে সেলাই ও কারুকাজ করে কি বলবো!"

তিনি উইলিয়াম মরিসের সিভিক শিল্পের অনুরাগী। তিনি যেমন উৎসাহী, তেমনি আঙ্গিক নৈপুণ্যের। ২০শে এপ্রিল ১৯০০ মিসেস লিগেট-কে লিখেছিলেন প্রয়াস : উইলিয়াম মরিসের ডিজাইন, তাঁর জ্ঞানের সৃষ্টি। তদনুযায়ী যখন কিছু সৃষ্টি তিনি করেছেন— তা মৌলিক, একইসঙ্গে মুদ্রণ শিল্পের সর্বোচ্চ ধারাবাহী। তিনি বিরাট কারিগর। যতক্ষণ না কোন কিছু নিখুঁত হচ্ছে, ততক্ষণ অনলস পরিশ্রম করে যেতে হবে। এই গুণকে রামকৃষ্ণ স্কুলের অন্তর্গত আমরা, আমাদের তা প্রকাশ করতেই হবে— নচেৎ সবই ভস্মে ঘি ঢালা। সস্তার কারুশিল্প, আজেবাজে হাতের কাজ, সেসব কদাপি টেকে না। তাই একটা সময়ে, একটি কাজই করণীয় আর সে কাজ করার সময়ে চাই অসীম যত্ন।

তিনি ৭ই জুন ১৮৯৯ সালে শ্রীমা সারদাদেবীর বাসস্থানে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সূচীশিল্পের প্রদর্শনী করেছিলেন— তার যে পুস্তিকা করেছিলেন তাতে অর্থ-সাহায্যের আবেদন ছিল—The Ramskrishna School for Girls এবং তাতে উল্লেখ ছিল— এমন সব হস্তশিল্প থাকবে, যার সঙ্গে প্রাচীন-ভারতীয় কুটীর শিল্পের পুনঃ জাগরণের সম্পর্ক আছে। মিসেস বুলের কাছ থেকে রাশিয়ান সূচী শিল্পের সম্বন্ধে একটি চিঠি পাবার পর, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : ভারতীয় নারীদের মধ্যে যে ডিজাইন চলতি আছে, তাদের গভীর অনুশীলন করছি। বিষটি দারুণ।

সূচীশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ অপরিসীম। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন— ফ্লোরেনটাইন থিম্বল বা সস্তায় পুরনো সূতীর কাজ পাঠাও। ক্রিস্টিন আমার স্বপ্নপূরণ করছে— আমাকে সে সূচীশিল্পের কাজ দিচ্ছে, তাতে কী সুখ পাচ্ছি— কি বলবো! আমার চাই আইডিয়া— বিশেষ রঙ সম্বন্ধে। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ লিখলেন : আমি ভারতের জাতীয় পতাকা প্রস্তুতে মন দিয়েছি। অবিরাম লেখার কাজ করছি। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের তৈরী করতে চেষ্টা

করছি, সূচীশিল্পের ডিজাইন প্রস্তুত করছি। শেষের কাজটি আমি বিশেষ ভালবাসি। মাদারকে (মিসেস লেগেট) দুই পাউণ্ড পাঠিয়েছি, কিছু বাছা বাছা রঙ কিনেপাঠাতে বলব ভাবছি। তিনি কৃষকশ্রেণীর তাঁতি শিল্পীদের কাছ থেকে কিছু হলুদ ও সবুজ রঙের ছাপানো কাপড়ের টুকরো কিনে পাঠিয়েছেন। সেগুলি ব্যবহার করছি কিন্তু চড়া হলদে, সবুজ ও বেগুনি রঙে ছাপানো লিনেনগুলি চিত্তাকর্ষক নয়। সেগুলি আচ্ছাদনী হিসাবেও ব্যবহার করা যায় না— লাইনিং করার পক্ষে শক্ত জিনিষ। এ বৎসর Liberty Scraps চাইব ভেবেছিলাম, কিন্তু খুব দেরী হয়ে গেছে।

১৯০৫ সালে ইস্টারে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : রুপো সম্বন্ধে তোমার আপত্তির অর্থ বুঝলাম না। পাড়, আঁচলরূপেই, তা নানাভাবে বার্ণিশ করা হয়, কিন্তু সেসব বুনটের বদল করা যায় না। আমার কথা হল : ও জিনিষ পৃথিবীর কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও সর্ব্বোত্তমের মধ্যে পড়ে, ধোয়ার পর এদের রঙ হয় তুষার শুভ্র। কিন্তু যতই দিন যায়, সোনার পাড়ের রঙ বদলায়। এটি জেনেছি সমঝদাররা (প্রতিটি ভারতীয় কৃষক বয়নশিল্পের সমঝদার) নতুন বস্ত্রে যেমন সৌন্দর্য্য দেখে, তেমনি পুরনো বস্ত্রে উপভোগ করে ভিন্নধরণের সৌন্দর্য্য। ২৪শে মে ১৯০৫ লিখলেন : ভারতীয় শাড়ীর সুন্দর বুনটকে, ঠিক যেমন আছে, সেইভাবে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে— যেমনটি করা হয় তুরস্কের কার্পেট বা পারস্যের টালির ক্ষেত্রে। না হলে একে অগ্রাহ্য করে দেওয়াই উচিত।

১৯০৬ ডিসেম্বর, কলকাতা শিল্প প্রদর্শনীতে দেবার জন্য যথার্থ যোগ্য একটি দুটি সূচীশিল্প দ্রব্য তৈরী হয়ে আছে। লিখলেন ১৮শে নভেম্বর ১৯০৬ মিস ম্যাকলাউডকে। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০৬ লিখলেন : র‍্যাটক্লিফরা ফিরেছে। আমার জন্য তারা অতি মনোরম লিনেন এনেছে। সপ্তাহখানেক কি দু-সপ্তাহের মধ্যে তাদের কিছু কিছু প্রদর্শনীতে যাবে আর যাবে অলিভকাঠের বাতিদান ও জপমালা। কিন্তু সহজ ভারতীয় জিনিস জোগাড় করে সর্ব্বত্র বন্ধুদের সবসময়ে পাঠাতে ইচ্ছা হয়। এদেশে সবই সহজ ব্যাপার হলেও, ওই বিশেষ ইচ্ছা করার জিনিষ নেই। ডাকে তো মাটির প্রদীপ কিংবা ছোট পাথরের জিনিস পাঠাতে পারি না— পার কি? ক্রিসমাস স্মারক হিসাবে অগণিত মালা পাঠানো, সস্তা ব্যাপার দাঁড়াবে না। ভারতের ঝুটো অলঙ্কার, সম্পদবিশেষ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার কিন্তু তার ওজন এমন যে, খুব ব্যয়সাধ্য দাঁড়ায়।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৯ তারিখে লিখলেন : ভারতীয় নারীদের তৈরী করা ডিজাইনের উৎস সন্ধান এখনও করা হয়নি। ওদের ডিজাইন অপূর্ব্ব বিস্ময়ের বস্তু, নানা ধরনের প্যাটার্নে ভর্ত্তি। আর সেগুলি কী যে সুন্দর।

বয়নশিল্প সম্বন্ধে গভীর তাঁর আগ্রহ। কাশ্মীর শাল সম্বন্ধে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ এখনও স্মরণীয়: সূচনায়, শ্রীনগণ প্রায় দুহাজার বছর আগে রাজনৈতিক দিক থেকে গৌরবান্বিত ছিল, যখন সে এক বৌদ্ধ নরপতির শাসনে বৃহৎ অংশের রাজধানী ছিল। এখন আর সে রাজনৈতিক গৌরব নেই। যেহেতু রাজনৈতিক গৌরব নেই, কিন্তু শিল্প গৌরবের দৃষ্টিতে কোণ অংশেই ন্যূন্য নয়। চিত্রিত রমণীয় পুরাতন নগরটি, নতুন ও বৃহত্তর গৌরব লাভ করেছে পৃথিবীর সেরা এক কারুশিল্প 'কাশ্মীরী শালের সৃষ্টিশালা' রূপে। তাঁতীরা চারশো কি পাঁচশো বছর আগে শ্রীনগরে শাল বোনার কৌশল আমদানী করে, পরে তা ভারতীয় রুচির উজ্জীবক প্রভাবের অধীন হয় এবং দ্রুত ঘরোয়া কারুশিল্প থেকে চারুশিল্পে বিকাশ লাভ করে। বর্ণনা দিলেন : কী ধরনের শাল প্রস্তুত হয়, আর শেষ করলেন সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক। বললেন : মণ্ডনশিল্পীর কাছে ভারতীয় রুচির তিনটি দাবী। সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি কারুকার্য্য, ঝলমলে ভাব ও বস্তু প্রাচুর্য্যের গরিমা। জলবায়ুর প্রভাবে নিসর্গ প্রকৃতিতে এমনই ছেদহীন সৌন্দর্য্যের সমারোহ দেখা যায় যে, শিল্পক্ষেত্রে ওই প্রকার প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পুষ্পৈশ্বর্য্যভরা উপত্যকাই কাশ্মীরের জাতীয় শিল্পে

প্রতিফলিত। এইভাবে যে শিল্পীরা তাজমহল নির্ম্মাণ করেছিলেন কিংবা আমেদাবাদে মর্ম্মর প্রস্তুত ছিদ্র করার শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের চোখ ও হাত তৈরী হয়েছে বনাঞ্চলের প্রাচুর্য্য দেখার অভিজ্ঞতা থেকে।

যে কারণে প্রাচ্য অলঙ্করণে চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য্য, সেই একই কারণে পাশ্চাত্য দেশে নিসর্গ প্রকৃতিতে প্রাচুর্য্য ও বর্ণোজ্জ্বলতার অভাব থাকায়, ভাবপ্রকাশের প্রতি পাশ্চাত্য শিল্পকে অধিক নজর দিতে হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেওয়াল সৌন্দর্য্যহীন ঠিক, তবু সেখানে রয়েছে উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য, রাফায়েলের মত শিল্পী, রসেটির মত শিল্পীও। সেখানে জাঁকজমক ভরা প্রাসাদ নেই কিন্তু প্রাচীন ক্যাথিড্রালগুলি? দিল্লীর রক্তগোলাপ রঙের প্রাচীরগুলি আরও ভেঙে গেলে, পৃথিবী যেন আরও দীন হয়ে যাবে, তেমনি তা দীন হবে ইংলণ্ডের পুরাতন গ্রাম্য গীর্জ্জার ধ্বংসে। গোটা মানব সমাজের কাছে ইউরোপের ভাঙা নির্জ্জন মঠের খিলান পথ বা ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, বা ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যের মতই চীনের পোর্সিলেন— শিল্প এবং আগ্রার মোজেইক সমগ্রভাবে প্রয়োজনীয়। অদ্বৈত তাঁকে শিখিয়েছে সমমূল্য স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা। সকল পথ এক জায়গায় মিশে যায়— তার দ্বারা মানুষের কাছে ধরা দেয় অভেদ।

শ্রীনগরের তাঁতশালা। কারখানাটি দোতালায়— তিনটি তাঁত, জানলার ধারে সমকোণে বসানো কর্ম্মরত নয়টি প্রাণী। একটিতে কাঠামোর আকার, দ্বিতীয়টি মাকুর চেহারা, তৃতীয়টিতে যন্ত্রের উপর দ্রুত সঞ্চারিত আঙুল। কারিগরদের সামনে ঝুলছে চমৎকার রঙ করা সূতোর গোছ আর ডিজাইন। একটানা সুরে গান গাইতে গাইতে কাজ করে চলেছে তারা। মনে হয় কাশ্মীরী তাঁত— যথার্থ একটি ছোট অর্কেস্ট্রা। প্রতিটি শাল রঙের সিমফনি. আর কারিগরের জীবনকর্ম্ম— যেন সমবেত গির্জ্জা-সঙ্গীতের একটানা সুর। ভারতীয় শিল্প-বস্ত্র বুনানির ক্ষেত্রে, বর্ণ ও শব্দের সম্পর্ক মৌলিক ব্যাপার।

সকলই মানুষেব সৃষ্টি। পুরাতন এবং নতুন। নীচের নেমে এসে দেখলেন : উঠোনে দেওয়াল ঘেঁষে ছায়ায় বসে আছেন তিন নারী। দুই পুত্রবধূকে— দুইপাশে বসিয়ে শ্বশ্রুমাতা, হাতের চরখায় সুতো বুনে চলেছেন। মূর্ত্তির মত রূপবতী— তিনজনকে দেখে মনে হল তিন গ্রীক দেবী। বোরোখার নীচে বৃদ্ধার মুখ— যাদের মুখে লেখা— ভালবেসেছেন জীবনকে; পেয়েছেন যন্ত্রণা— শেষে জয়ী হয়েছেন রাজ্ঞীর মত।

তিনি যখন ভারতে এলেন, সেদিন ভারতবর্ষে নারী, উচ্চশিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করবেন ছিল আশা। সেই রক্ষণশীল বাঙালীর গৃহকর্ত্তার পায়ের কাছে নতজানু, হয়ে তাঁর বাড়ীর মেয়েটিকে বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভিক্ষা করে আনতে হয়েছিল। সুতরাং তিনি যথাসম্ভব নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করে, হস্তশিল্পকে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন, যাতে তারা শিল্পসৌন্দর্য্য ও অর্থ-উপার্জ্জন একই প্রযত্নে সম্ভব করে তুলতে পারে। সেই সঙ্গে টেনে এনেছিলেন, বয়স্কা নারীদের, যারা সমাজে হয় পরিত্যক্তা বা বালবিধবা, শিক্ষায়, শিল্পানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে তারা যেন সক্ষম জীবনে পরিণত হয়। এই কারণেই, তিনি জোর দিয়েছিলেন নারী ও শিল্প রচনায়। এখানে কারুশিল্পের—শিক্ষা দেওয়া হত ছোটদের, বড়দের তিনি সূচীশিল্পের কারুশিল্পী, তৈরী করতে সচেষ্ট। লক্ষ্য : পুনরুজ্জীবনে, পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনি নারী ও শিল্প রচনায় সতর্ক হয়ে বললেন: কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন যেন অতীতের অন্ধ অনুকৃতিতে না পৌঁছায়। অতীতে যে-শক্তি সঞ্চিত আছে, খুঁজতে হবে এর দ্বারা নতুন প্রয়োগক্ষেত্র। একদা আমাদের কারুশিল্পের কারিগরি নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার দানে, নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তারা। পুরাতন নীতির বদল হচ্ছে, খোদাই মাটির পাত্র, পূজার মূর্ত্তি, দোরগোড়ায় সুন্দর আল্পনা, ক্রমেই জীবন থেকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু যে -শক্তিতে ওদের উদ্ভব হয়েছিল— সেই শক্তি, শিল্প. নকশা ও ভাস্কর্য্য শিক্ষাদান সে উদ্দেশ্যমুখী

মহান ভারতীয় শিক্ষাগারের জন্মদাত্রী হয়ে উঠুক। যদি বিরাট কোন সূচীশিক্ষালয় সৃষ্টি করতে হয়, ভারতের কারুশিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে, চোখ ও হাত ব্যবহারের যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে, যা কিছুটা আছে প্রতিটি অন্তঃপুরের হিন্দু নারীদের মধ্যেও, তার সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে জ্ঞান ও বুদ্ধির উদ্দীপনা। এই বুদ্ধি-শক্তি সরবরাহের চিন্তা কি আদৌ কেউ করছে? কেউ কি ভেবেছে এরসঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই ইতিহাসের শিক্ষা এবং ভূগোলের জ্ঞান?

প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে তাদের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করে ও ভূগোলের সহযোগে সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করতে চাইলে, তবেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। বেলজিয়ামের কনভেন্টের সূচীশিল্পের সঙ্গে তুরস্কের অবরোধবাসিনী বা চীনের পরিবারের নারীদের সূচীশিল্পের কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য বর্ত্তমান? গভীর ও জীবন্ত জ্ঞান এবং অনুভূতির দ্বারাই কেবল বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতীকের তাৎপর্য্য অনুভব করা সম্ভব। ভুলভাবে শিল্প প্রতীকের ব্যবহার করলে স্থূলকাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। বোখারার রক্তগোলাপ, ফ্রান্সের সোনালি পদ্ম এদের সাহায্যেই সূচীশিল্পের রাজনৈতিক বা জাতীয়তামূলক ব্যবহার করা হয়েছে। একালেও ইউরোপে সূচীশিল্প জীবন্ত, কারণ গীর্জ্জার জন্য অবিরাম তার প্রয়োজন। ভারতীয় নারীরা যেন সেই সুন্দরতম অথচ অবহেলিত এই শিল্পটির মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে ভরিয়ে রাখে কল্পনার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য!

ইতিহাসে দেখা যায়, মধ্যযুগীয় দুর্গপ্রাসাদের অলঙ্কৃত দেওয়ালের পর্দ্দাগুলি প্রস্তুত হয়েছে দলবদ্ধ নারীর পরিশ্রমে যুগ যুগ ধরে। হিন্দুরানীরা সেই ধরনের যৌথকাজে, দুর্গাপূজার শোভাযাত্রায় সময়ে ধ্বজ পতাকা নির্ম্মাণ করে কিংবা বৈষ্ণব সংকীর্ত্তনের পতাকা তৈরী করতে কি পারেন না? মুসলমান নারীরা প্রিয়জনের সমাধির ওপরে ফুলের চাদর বিছিয়ে দেন, নানা সুন্দর সূচীকর্ম্ম করা রঙিন চাদর, তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে কি তা তৈরী করবেন? স্বামীদের প্রতি ভক্তি ভালবাসায় যে মেয়েরা এদেশে পশমের বা সূতির পাদুকা তৈরী করতেন, তাঁরা তো এখন নৈপুন্য নিয়ে মূল্যবান বই বা টেবিলের আচ্ছাদনী তৈরী করতে পারেন!

কি বেদনার ব্যাপার, বাঙালী মেয়েরা জার্ম্মানীর তৈরী পশমী কাজ রঙীন গোলাপ, ফরগেট মি-নট ফুল (জার্ম্মানি ডিজাইনের) ছাপা রঙিন কাপড়ের সূচীকর্ম্ম করেন! যদি উত্তম পুরানো নমুনা সামনে রাখতে হয়, বেনারস বা রাজপুতনা থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। অন্ততঃপক্ষে চীনা বা মুসলমানী নমুনার অনুকরণ— সেও কদাপি বিদেশের বিকট দ্রব্যের অনুকরণ নয়!

২০শে মার্চ্চ ১৯০৪ সালেও বললেন : আমার দরকার ইউরোপের বৃহৎ গির্জ্জা, প্রাসাদ, সমাধিস্তম্ভ, স্থাপত্য-শিল্প, পোষাক পরিচ্ছদ বা এমন সব স্লাইড যা মহিলাদের সেই বিশেষ জায়গার বিশেষ রূপ বিষয়ে ধারনা সৃষ্টি করতে পারে। ম্যাপের স্লাইডও প্রয়োজন। কলকারখানার জাহাজ নির্ম্মাণের, যন্ত্রশিল্পের স্লাইড, সেইসঙ্গে কাগজ, কাঁচ, চকচকে বাসনপত্র তৈরী যেখানে হয়, এমন টেকনিক্যাল স্কুলের স্লাইড যা দরকার আমার মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনে।

কি অপরিসীম যত্ন ও আগ্রহে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন তিনি, সে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সমকালে সহযাত্রী শিক্ষিকা সরলাবালা সরকার। সকলছাত্রীদের সারি দিয়ে বসিয়ে আঁকতে শেখাতেন তিনি। যাঁরা স্কুলের শিক্ষিকা, তাঁদেরও বসতে হত ছাত্রীদের সঙ্গে। উদ্দেশ্য ছাত্রীদের শিক্ষা ও শিক্ষিকা তৈয়ারী করা, ভবিষ্যতের জন্য। এমন কি তাঁর সহকর্ম্মিনী ক্রিস্টিনকেও। ক্রিস্টিনীর স্বভাব ছিল শিশুর মত। মেয়েদের কাছ ঘেসে বসতেন পাছে তাঁর ছবি ভাল হলে, হাসবে ছাত্রীরা সেই ভয়ে। প্রথমে বৃত্ত আঁকা পেন্সিলের সাহায্যে, তারপর শিক্ষা দিতেন কেমন করে পেন্সিল চালাতে হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। প্রথমে পেনসিলের উল্টোদিক দিয়ে বৃত্ত আঁকার অভ্যাস, পরে পেন্সিলের সিস দিয়ে বৃত্ত আঁকা— তারপর নানা চিত্র আঁকা। ছবি ছাড়াও

শিল্পানুরাগ ও চিত্র প্রভৃতির উপর ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। ভারতীয় কলাবিদ্যার মূলে, আধ্যাত্মিক ভাবের বীজ নিহিত আছে, এ ধারণা তাঁর অন্তর্নিহিত। শিল্পীর তুলি যেখানে বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট, আর যেখানে উদাসীনতার ভাব পরিস্ফুট, সে চিত্রটিই তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। অপটু হাতে (বালিকাদের) যেখানে বাহ্যসৌন্দর্য্য হানি হয়েছে অথচ ভাবটি বিশেষ প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে তিনি মুগ্ধ। বিদেশের সুনিপুন ছবির অনুকরণের চেয়ে, মেয়েদের হাতে আঁকা ছবি বা আল্পনা ছিল আদরের বস্তু। তিনি মেয়েদের আঁকা একটি ছবি (আল্পনার) বড় একটি শতদল আর চারপাশে ছোট ছোট যুঁইফুল ঘিরে আছে চারপাশে, বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছিলেন নিজের ঘরে, চিত্রকলা বিচারক্ষম যে কেউ তাঁর কাছে এলে, সেটি তিনি দেখতেন এমন কি কুমারস্বামী এলেও দেখিয়েছেন এবং তাঁদের প্রশংসা আদায় করিয়ে নিয়েছেন। মেয়েদের পাথর ও ছাঁচকাটা শেখানোর চেষ্টা করতেন। কাজ শিক্ষা পূর্ব্বে ঠাকুরের বা অন্যের সাহায্য নিতেন। মেয়েদের আলপনা শেখা পছন্দ করতেন। আর তাঁর প্রিয় ছিল শ্বেত পদ্মের সহস্রদল। তাঁর ধারণা ছিল চিত্রকররাই কেবল এ চিত্র আঁকতে পারে, তাই তাঁর ছাত্রীর আঁকা শ্বেত পদ্মফুলের পাশে আঁকা জুই ফুলগুলিকে প্রায়ই বলতেন, কি সুন্দর! সাদা সাদা ফুলগুলি যেন বড় ফুলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলছে— বড় ফুলটিকে— তোমার কাছে যাই। একরাশি মাটি ও নরুণ নিয়ে বসতেন ছাত্রীদের কাছে। বলতেন : তোমরা সব এসে বসো, সকলে মিলে একসঙ্গে ছাঁচকাটা— আমরা সকলেই শিখবো। এরফলে, তাঁর অনেক ছাত্রী ভাল ছাঁচ কাটতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আর যেগুলি সুন্দর বলে মনোনীত হতো, তিনি আদরের সঙ্গে তুলে নিয়ে তাঁর ঘরে সাজিয়ে রাখতেন, তাদের তৈরী পুতুলগুলিও। বুঝিয়ে দিতেন: তাদের হাতের জিনিস, কেমন দিনের পর দিন উন্নতি লাভ করছে! এর সঙ্গে প্রতিসপ্তাহে মেয়েদের সংস্কৃত পাঠ দিতে শুরু করলেন— কত আশা তাঁর ছাত্রীদের হাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক— তালপাতাতে শোভা পাবে যেদিন, কি সুন্দর হবে তাঁর সাধনা।

সরলাবালা সরকার তাঁর রচনায় বর্ণনা করেছেন— তিনি জীবন চেতনা-সঞ্চারে প্রথমস্তরের শিক্ষা তাত্ত্বিক নন— আশ্চর্য্য চরিত্রের শিক্ষিকা। তাঁর 'উইমেন অ্যাণ্ড দি আর্ট' বই-এ বলেছেন জাতীয়শিল্পে ভারতের শ্বেতপদ্ম, শিল্পপ্রতীক। আত্মবিস্মৃত মহাজাতির পূর্ব্ব গৌরব জাগ্রত করা যেমন প্রয়োজন, সেরূপ বিগতকালের চিত্রভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পকলা সম্বন্ধে অনুশীলনও মহান কর্ত্তব্য। কাঁথাশিল্প, বিগতকালের চিত্রভাস্কর্য্য। এগুলি মহানভাবের প্রতীকস্বরূপ। ভারতের মনোবিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ করতে হলে, যেমন বেদ উপনিষদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন— প্রয়োজন তেমনি রামায়ন, মহাভারত ও পরবর্ত্তী যুগের যুগকাব্য ও কথাসাহিত্যের জ্ঞান। ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলাপ্রণালী এবং ভারতচিত্র প্রকাশভঙ্গীর ভাবমূর্তরূপ আয়ত্ব করার একান্ত প্রয়োজন।

এ চিন্তার ফসল দেখা যায় : শয়নগৃহটি হয়ে উঠেছিল বিচিত্র সংগ্রহশালা। মাটির ছোট ছোট পুতুল, দূর্গাপ্রদীপ, পাথরের উপর নরুন দিয়ে কাটা ছাঁচ, ও আলপনা, কাপড়ের উপর প্রাচীনকালের নানারূপ সূচী-শিল্প ও চিত্রাঙ্কন। প্রাচীন চিত্র এবং বৌদ্ধ-যুগের প্রস্তরমূর্ত্তি, দেবমন্দির সমূহের গঠন প্রণালী, পাথরের উপর নানাবিচিত্র কারুকার্য্য, কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আলোকে উঠান জোড়া শুভ্র আল্পনা, অজন্তাগুহার খোদিত নর্ত্তকীর নৃত্যভঙ্গী ও করযুক্ত আঙুলের বিশেষভঙ্গি— সবই অপূর্ব্ব আস্বাদ আর ভাবামগ্ন উচ্চারিত সেই শব্দ পূজা... পূজা... পূজা!।...

কাকুজো ওকাকুরা জাপানী শিল্পী মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু। তিনি, প্রথমে পত্র দ্বারা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ওকাকুরার সঙ্গে। তাই পাঠকালে সংগৃহীত নোট নিবেদিতার কাছে একটি বই রচনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেই ভাবসমৃদ্ধ নোটগুলি নিজ ভাষায় রচনা করে, স্বামিজীর

চিন্তাধারা যুক্ত করে একটি বই রচনা করেলেন "এশিয়া এক ও অদ্বিতীয়।" পরে ১৯০২ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন স্বামিজীকে জাপানে ধর্ম্মসভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। ফলে, নিবেদিতার ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে যায়। স্বামিজীর কাছে ইংরাজসাম্রাজ্য শাসনের শোষণ চিত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। শেষে হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ ভারতীয়। এরপরই স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন। যা ছিল স্বামিজীর হৃদয়বিন্দু, তখন স্বামিজী হাঁপানী রোগে আক্রান্ত ও ভগ্নশরীর। তাঁকে এড়িয়ে ওকাকুরার সাহায্যে ভারত মুক্তির চেষ্টা শুরু করেন। যদিও পূর্ব্বে, অনেক মনীষি এই স্বাধীন চিন্তার জন্ম দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলায় একটি বিপ্লবী দল গঠন করলেন। তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল স্বামিজীর অকাল প্রয়াণে। এরই ফলে, ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে ওকাকুরার গভীর সংযোগ ঘটে যায়। অনেকের ধারণা, ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ভারতে এসেছিলেন। অবশ্য কথাটার মূলে অনেকটা সত্য আছে ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, পরেও তিনি ভারতে এসেছেন। কিন্তু নিবেদিতার কাছে স্বরূপ তাঁর ধরা পড়া যায়। মিস ম্যাকলাউড তাঁর পিছনে বহু টাকা খরচ করেন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের আশায় কিন্তু সেসব অস্ত্র ধরা পড়ে যায়— স্বামিজীও এ ব্যাবস্থা অনুমোদন করেননি। কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বেই তাঁর রাজশিষ্য সহায়ে প্রথমদিকে ভারতের স্বাধীনতালাভে সচেষ্ট ছিলেন— কৃষ্টিনীর বিবৃতি অনুসারে। কিন্তু ভারতীয় রাজন্যবর্গ ছিলেন ইংরাজদের বন্ধু, তাঁরা ইংরাজদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। ছিলেন ইংরাজ সংস্কৃতি সভ্যতার প্রধান স্তম্ভ। তাঁদেরই ছত্র ছায়ায় জাগতিক সুখ সম্বন্ধে মুক্ত বিহঙ্গ অথচ তাঁদেরই উদ্দ্যোগ থেকেই আমেরিকা যাত্রার প্রথম প্রস্তাব উঠলো। পরে তা জনসমর্থিত (শিষ্যবৃন্দদ্বারা উৎসাহিত সমর্থন ও শিষ্য কর্তৃক সংগ্রহিত) আর্থিক সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা যাত্রা ও ভারতীয় ধর্ম্ম "বেদান্ত" প্রচার শুরু এবং বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তাঁর সাফল্য লাভ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রকাশ। জগত সভায় প্রতিষ্ঠিত হল— সর্ব্বধর্ম্ম এক এবং তা বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত— বিভিন্ন মত ও পন্থায় গতি তার পৃথক মাত্র। সূত্র এক—রূপে বিভিন্ন, মিলিত নির্দিষ্ট সেইস্থানে। বরেণ্য হলেন পাশ্চাত্য জগতে। স্বদেশে ফিরে এলেন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে। পরাধীন ভারতকে জাগ্রত করা শুরু করলেন বক্তৃতা দ্বারা। প্রথমে, সেভাব গ্রহণ করলো বাঙালীরা। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর মন্ত্রশিষ্যা নিবেদিতা হলেন ধারক ও বাহক। একা 'বিবেকানন্দ বাণী-পতাকা' নিয়ে ভ্রমণ করলেন সারা ভারতবর্ষ— জাতীয়তার ভিত প্রতিষ্ঠায়। সেকালে যাঁরা সমপন্থী ছিলেন, তাঁরা সেচ্ছায় যুক্ত হলেন লালালাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের তিলক, মহামতি গোখলে প্রমুখ হলেন সহযাত্রী। বরোদায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন অরবিন্দ। তিনিও নিজে একটি বিদ্রোহী দল গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বই পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বরোদা ভ্রমণকালে পেলেন তাঁর কাছ থেকে 'জ্ঞানযোগ'। পরে গোপনে তিনি এলেন বাংলায় তখন নিবেদিতা মাদ্রাজ সফরে ব্যস্ত। যুক্ত হল নবগঠিত বিপ্লবী দল, অনুশীলন সমিতির সঙ্গে। সে দলে যোগ দিয়েছিলেন অনেকেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনপাল প্রমুখ অনেকেই, একটি পরিচালক সমিতি গঠিত হল। শ্রদ্ধেয় পি. মিত্র মহাশয়ের অধীনে। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা জাগরণের আদিপুরুষ, আর সেটিই সংগঠিত 'স্বাধীন ভারতীয় চিন্তার স্ফূরণ' এই ঠাকুরবাড়ীতেই। প্রিন্স দ্বারকনাথই পুরুষসিংহ, যিনি ভারতে প্রথম 'ব্যাঙ্ক', কয়লা প্রভৃতি শিল্প গঠনের সূত্রপাত করেন। তাঁর একান্ত প্রিয় বন্ধু রামমোহন রায় বাঙালিদের স্বধর্ম ত্যাগ ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের স্পৃহা দূর করার জন্য প্রধান প্রধান হিন্দু শাস্ত্রের সার সংগ্রহে ব্রাহ্মধর্ম্ম শাস্ত্র রচনায় উদ্যোগী হলেন। অবশ্য সে কাজ শেষ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তাঁরই সহযোগীদের সহায়তায়। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ স্বকীয় কাজের জন্য বিলাত গমন করেন। উভয়েই যেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বাবকানাথ, দানে, ঔদার্য্যে ঋণগ্রস্ত

হয়ে দেহত্যাগ করেন। এখানে কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিয়োগে ব্যস্ত। পিতার অকাল মৃত্যুহেতু দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছেন যখন, রানী কুইন ভিক্টোরিয়া 'কুইনস প্রপাটি' রূপে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রক্ষায় এগিয়ে আসেন, পরে দেবেন্দ্রনাথ পিতার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেন। তখন তাঁর প্রিয় বন্ধুরা ও সাহায্যকারীগণ বাঙলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। এবং তাঁদের প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠিত করতে দেবেন্দ্রনাথই সচেষ্টা হলেন। রাজনারায়ন বসু মহর্ষির, শিষ্য ও প্রিয় সহচর। অরবিন্দ তাঁর প্রথম দৌহিত্র বারীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট দৌহিত্র। এর বাবা ছিলেন মেদিনীপুরের অধিবাসী সংক্ষেপে কর্নেল কে. ডি ঘোষ (ডাক্তার) আসল নাম কৃষ্ণধন ঘোষ। দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও পুরান (উপনিষদ) প্রচারে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কাছে পরাজিত হলেন। ফলে, এই বেদ ও উপনিষদ নিয়ে সুংগ্রী পাহাড়ে অতিবাহিত করেন সাত বছর। সিপাই মিউটিনীর সময়, 'গঙ্গার জল নীচে নেমে এসে অপবিত্র হয় কেন', চিন্তাধারার মধ্যে এক আদিষ্ট স্বর 'প্রাপ্ত হন সৃষ্টির জন্য' 'তুই ফিরে ঘরে যা'। তাঁর বুক ধড়পাড়ানি তাঁর শুরু হল সেই মুহূর্তে। ডাক্তারগণ তাঁর বুক ধড়পাড়ানীর কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারায় তিনি সিমলার বাসায় ফিরে তাঁর তফিলদার কিশোরীবাবুকে কলকাতায় ফেরার উদ্দ্যোগ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুক ধড়পড়ানিও বন্ধ হয়ে যায়। অতিকষ্টে ঘোড়ার গাড়িতে এলাহাবাদ পৌঁছে জাহাজে ওঠেন। সেখানে পুরাতন খবরের কাগজে তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাঠ করেন। কলকাতায় ফিরে শেষ সন্তান লাভ করেন। তিনিই বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনিও প্রথম জীবনে বিপ্লবী পার্টির সভ্য হন ও বহু স্বদেশী গান রচনা করেন। পরে সে সংস্রব ত্যাগ করে কাব্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, অবশ্য মনে প্রাণে সমর্থনশীল হলেও কাজে কলমে সুদূর প্রার্থী রয়ে গেলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তিনি নিবেদিতাকে তাঁর স্কুল তাঁর বাড়ীতে স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব দেন কিন্তু যেহেতু স্বামিজী বোসপাড়া লেনে তাঁকে দত্তক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেস্থানকে তিনি আমৃত্যু নিজস্ব বাসভূমি বলেই মেনে নিয়েছিলেন। কোনদিনই সেস্থান ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করতেন না, অবশ্য তাঁর অসুস্থতার জন্য সাময়িক বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেছেন, দমদমের ফেয়ারী হলে বা অসুস্থ হয়ে জগদীশ চন্দ্রের বাড়ীতে বসবাস করেছেন, আবার ফিরে এসেছেন তার ১৭ নং বোসপাড়া লেনে।

ওকাকুরা ছিলেন মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু। তাঁর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। স্বামিজী তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বেলুড় মঠে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে একান্ত আপন মনে হলেও তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন। সঙ্গে করে গয়া ও বারানসী দর্শন করান। তাঁর ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থাও করেন। নিবেদিতা তাঁর পথবর্ত্তী হয়ে পড়েন। স্বামিজী তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। নিবেদিতা জানতেন ভারতমুক্তিই স্বামিজীর একান্ত কাম্য। সে কাজে অগ্রদূত ওকাকুরা। তার চোখে এশিয়া এক! স্বামিজীর বাধাকে, তিনি তাঁর অসুস্থ মনের দুর্ব্বলতা বোধে, এড়িয়ে চলতে লাগলেন। আচম্বিতে তিনি দেহত্যাগ করলেন। নিবেদিতার-জগত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর ওকাকুরার স্বরূপ স্পষ্টতর হতে সুরু করলো। আশ্রমের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হল। 'বিবেকানন্দ' পতাকা নিয়ে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে স্বামী সদানন্দ, আশ্রয়দাতা হলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। বুঝলেন: কেন স্বামিজী বার বার তাঁকে সতর্ক করেছিলেন। আরও বুঝলেন: জাগ্রত করতে হবে জনগণকে। জাতীয়তাবোধের জন্ম দিতে হবে, একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে সারা ভারতবর্ষকে— তারা সবাই ভারতীয়— সবাই ভারতের নাগরিক— ভারতবাসীই তাদের পরিচয়। অবশ্য তিনি মিস ম্যাকলাউডকে পাঠানো নোটগুলি স্বামিজীর ভাব ও নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার সংমিশ্রণে 'আইডিয়ালস অব দি ইষ্ট'' বইটি লিখেছিলেন। তা স্বদেশী যুগে জাতীয়-চেতনাকে উদ্দীপ্ত

করেছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে ওকাকুরা বিতর্ক যোগ্য হলেও, শিল্পজীবনে তাঁর রাজকীয় উপস্থিতি, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

১৯০১ সালের শেষের দিকে যখন নিবেদিতা ইংলণ্ডে, মিস ম্যাকলাউড ওকাকুরার নোটগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। সেগুলি ছিল জাতীয়তা ও শিল্পসংক্রান্ত। ১৯শে জুলাই১৯০১ নরওয়ে থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন The japanese papers, you sent, gave infinite pleasure – I admired so much a paper that could use English and oriental type at will. As for me if gives me endless courage to have heard in America and in Norway and in some sense now from Japan, that I had exactly expresed the national Ideal.

এখানে অর্থ করা চলে যে লেখা মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন সেগুলি দেখে শুনে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। সেটি মিস ম্যাকলাউডের জাপানী বন্ধুর পছন্দ হয়েছিল। ভারত ফিরে কিছুদিন ইউ এস এ কনস্যুলেটে ছিলেন। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী ও ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং মত পার্থক্য বশতঃ গান্ধীজী বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরে আসেন। ১৯শে এপ্রিল ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : There is an article in the studio of March 15th last about the Bijitsuin by Miss Hyde with a reproduction of my lotuses. And another signed by Mr. Okakura. Both extremely opportune credentials, I think!

লণ্ডনের স্টুডিও পত্রিকায় ১৫ই মার্চ্চ যা বেরুলো তা নিশ্চয় বেশকিছু দিন পূর্ব্বে জমা দেওয়া হয়েছিল তা ভারতে ফেরার আগেই নিশ্চয় জমা দেওয়া হয়েছিল। তা ওকাকুরার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পূর্ব্বে। আর নিবেদিতা ফিরলেন ভারতে ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে। যখন স্বামিজী ওকাকুরা ও মিস ম্যাকলাউডকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ফিরলেন মার্চ্চ মাসের শেষের দিক। ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে। এখানে দেখতে পাই স্বামিজী, ওকাকুরা ও নিবেদিতা— শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে একত্রিত। স্বামিজী জাপানের শিল্প বিশেষজ্ঞ ওকাকুরাকে অভিনন্দন জানালেন : উৎসভূমি ভারতবর্ষে এসেছে, ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির প্রাণধর্ম্ম, ধর্ম্মক্ষেত্রে যেমন, শিল্পক্ষেত্রেও তার প্রভাব রয়েছে সারা এশিয়ার অন্যদেশগুলিতে। ওকাকুরাও অবশ্য সাক্ষাৎ ভারতের শিল্পনিদর্শনে, সে সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। নিবেদিতাই ঠাকুর বাড়ীর শিল্প অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর বিশেষ করে নন্দলালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে আধুনিক ভারতীয়-শিল্পে জাপানীধারা বিস্তার লাভ করলো। ১৯০২ সালের মার্চ্চ মাসে হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। শিল্প আন্দোলনে উভয়ে, উভয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। ওকাকুরার প্রথম ভারত আগমন স্বামিজীকে জাপানে ধর্ম্মসম্মেলনে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু জড়িয়ে পড়েন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে— নোতুন দল গঠনে। নিবেদিতা সে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। স্বামিজীর দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার পরিপন্থী তা। নিবেদিতাকে সতর্ক করলেন কিন্তু নিবেদিতার দৃষ্টিতে তাঁর অভিমত, অসুস্থতার লক্ষণরূপ বলে প্রতিভাত হল— সহসা বজ্রপতন, স্বামিজী দেহত্যাগ করলেন জুলাই-এ— নিবেদিতার জগত চূর্ণ হয়ে গেল। ওকাকুরার কাজ, স্পষ্টতর হয়ে উঠলো— তাঁর বিপ্লবী দলের স্বরূপ প্রতিভাত হল, বিবেকানন্দ ফিরে এলেন তাঁর মনজগতে। 'বিবেকানন্দ পতাকা' হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জাতীয়তার ভিত প্রতিষ্ঠায়। জনজাগরণই ভারতের মুক্তিপথ, সারা ভারতে বক্তৃতা দিতে বেরিয়ে পড়লেন। সেইসঙ্গে লেখনী তাঁর হয়ে উঠলো অসি। ওকাকুরা ফিরে গেলেন জাপানে। এরপরও তিনি এসেছেন ভারতে। প্রথমবারেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়। সে পরিচয় গাঢ়তর হয়েছে, পরের বারে। তিনি দুজন শিল্পীকে (টাইক্কান ও হিশিদাকে) সঙ্গে নিয়ে এলেন, যাতে জাপানের রচনানীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীদের পরিচিতি গভীরতর হয়ে ওঠে। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে আর

তাঁর যোগাযোগ ছিল না বা তিনি স্বেচ্ছায় তাঁকে এড়িয়ে গেছেন অথচ হ্যাভেলের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল যেমন ছিল ভারতীয় কলাশিল্পীদের সঙ্গে।

সরকারী আর্ট স্কুলে, 'ভারতীয়তা' এনেছিলেন হ্যাভেলসাহেব। তিনিই বৈদ্যের ভঙ্গীতে বিদেশীয় অনুকরণের উপাদান ও শিক্ষাপদ্ধতি দূর করেছিলেন। কিছু ভারতীয় শিল্পী তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা আমল দেননি। তিনিই চালু করলেন প্রদেয় শিক্ষার ভিত্তি হবে 'প্রাচ্য শিল্প'। শুধু তাই নয় জাতীয় আন্দোলনকালে সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এদেশীয় ভাবচেতনায় উন্মোচনের প্রতিষ্ঠান করে তুললেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন! হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্র সম্প্রদায় শিল্পধারাকে ভারতীয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৮৯৬ জুলাই হ্যাভেলে সাহেব কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। কিছুদিনের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অবনীন্দ্রনাথ দেশী রীতিতে শিল্পচর্চা আরম্ভ করলেও এদেশের শিল্পের প্রাণধর্ম্ম তাঁর কাছে তখনও ধরা পরেনি। গভর্নমেন্টের টাকায় আর্ট গ্যালারির জন্য জিনিস সংগ্রহ হচ্ছে, দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যাচ্ছে, এদেশের আর্ট সম্বন্ধে হ্যাভেলে সাহেবের মত কেউ পারদর্শী ছিল না। তিনিই রোজ দু'ঘন্টা পাশে বসিয়ে নিরিবিলিতে দেশের ছবির মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য ও তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতে লাগলেন অবনীন্দ্রনাথকে। তাই, অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে 'গুরু' বলে স্বীকার করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন "ভাবি সেই বিদেশী গুরু হ্যাভেলসাহেব আমায় যদি না বোঝাতেন ভারতশিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম— কয়লাই হয়ত থেকে যেতাম— মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটতো না দেশের শিল্প সৌন্দর্য্যের দিকে"। হ্যাভেল সাহেব, কী করে মুঘল শিল্প দেখতে হয় শেখালেন অবনীন্দ্রনাথকে। একটি আতসী কাঁচ দিয়েছিলেন— ছোট ছোট মুঘল ছবির খুঁটিনাটি দেখার জন্য। 'দেখেছেন আর অবাক হয়েছেন, ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি ঢেলে দেওয়া আছে সোনা-রূপো সব'! স্বীকার করেছেন অবনীন্দ্রনাথ— 'আতসী কাঁচটি দিব্যচক্ষু'!

১৯০২ সালে অবনীন্দ্রনাথের একটি মেয়ে মারা যায়। বড় ভালবাসতেন তাকে। বেদনাতুর পিতৃহৃদয় নিঙড়ে আঁকলেন "শাজাহানের মৃত্যু"। সে ছবিতে ঢেলে দিলেন "আত্মমূর্ত্তি"। ছবিটি দেখে, হ্যাভেল সাহেব পাঠালেন দিল্লী দরবারে। সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা পেলেন। এখানেই থামলেন না হ্যাভেল সাহেব, ইংলণ্ডের "স্টুডিও" পত্রিকায় ১৫ই অক্টোবর ১৯০২ সংখ্যায় বৈদেশিক প্রচারের দায় গ্রহণ করলেন। ভারতীয় শিল্পের ধারা-পথে অবনীন্দ্রনাথের জয় ঘোষিত হল : ঐতিহাসিক রচনা বলে নয়— অসাধারণ সাহস ও নতুনকে চিনে নেবার পূর্ণ রচনা বলে।

হ্যাভেল সাহেব প্রথম দিকে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, 'ভারতীয় শিল্পের সমাদর ভারতীয়দের মধ্যে নেই, এমন কি ভারতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষক বলে কথিত পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহী পর্য্যালোচক এবং প্রশাসকরাও, ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে উদাসীন। এদেশে অজান্তা আছে, যা দেখিয়ে দেয় হিন্দু শিল্পনীতির কঠোর রীতিবন্ধন এবং মুসলমানী গোঁড়ামীর বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত থাকলে ভারতীয় শিল্পীরা এদেশের জীবন এবং নিসর্গ প্রকৃতির অসীম কাব্যিক সম্ভাবনাকে, পুরোপুরি উপভোগ করে রূপায়িত করতে সমর্থ।

এই পর্ব্বের চিত্রাবলী গৌতমবুদ্ধের মানবাত্মিক ভাব দ্বারা যেমন গভীরভাবে প্রভাবিত, তেমনি উত্তর ভারতে বসবাসকারী, আলেকজাণ্ডারের অনুগামীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত গ্রীসের শিল্পনীতির প্রভাবও তার উপর আছে। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চিত্রশিল্পের অধোগতি ঘটে, কারণ হিন্দুদের মধ্যে জাতিপ্রথায় চিত্রশিল্পীর স্থান ছিল সকলের নীচে। ব্রহ্মান্যবাদ, মন্দির অলঙ্করণের জন্য ভাস্কর্য্যকে পছন্দ করতো। বৌদ্ধ পরবর্ত্তী ৯০০ বছর চিত্রশিল্পের দুর্গতি ঘটে, পরে মোঘলযুগে তার পুনরুত্থান ঘটে। প্রথম দিকে মুঘলরা পারস্য

থেকে শিল্পী আনিয়ে পুথিপত্র পাণ্ডুলিপি 'শাস্ত্রগ্রন্থ' অলঙ্করণের কাজ করাতেন। আকবরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুঘলশিল্পে ভারতীয় পরিবেশের চিহ্ন নেই কারণ সারাসেনিক আর্টে জীবজন্তু ও মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আকবর এইসব বাধা সরিয়ে, আনলেন নতুন জীবনদর্শন, সরিয়ে দিলেন বাধা। শিল্পীরা পেলেন সৃষ্টির স্বাধীনতা। এর ফলেই নূতন পরিবেশে বিশিষ্ট ভারতীয় চিত্রশিল্পের ধারক উদ্ভব হল আকবরের শাসনের শেষের দিকে। তিনি এই শিল্প ধারাকে রিয়ালিস্টিক বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তা প্রকৃতি থেকে সরাসরি প্রেরণা লাভ করত। আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীরা রিয়ালিজিমের নামে সমস্ত রীতিনীতিকে ঠেলে দেন, সে বস্তু তখন ছিল না। মুঘল শিল্পীরা পারসিক, শিল্পের অপূর্ব্ব আঙ্গিক কৌশল ও মণ্ডণ ধর্ম্ম স্বীকার করে, মানবচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে নোতুন মাত্রা এনেছিলেন। শুরু, আকবরের রাজত্বে, চলেছে জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সময় পর্য্যন্ত। আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতা, মুঘল শিল্পধারার বিকাশকে বিপর্য্যস্ত করে দেয়। কারণ তিনি শরিয়তী আইন কঠোরভাবে বলবৎ করায় তাঁর রাজসভা থেকে শিল্পীদের দূর করে দিলেন। যেসব স্থাপত্য বা শিল্পকলা তাঁর বিবেচনায় বিধর্ম্মী ব্যাপার মনে হল, তা হয় ধ্বংস না হয় বিকৃত করলেন। কিছু শিল্পী জয়পুর, লাহোর, দিল্লী, মহীশূরে সরে গিয়ে এই ধারাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তার পূর্ব্বেকার গৌরব যুগ আর ফিরে আসেনি। তথাপি মুঘলশিল্প তার অল্পস্থায়ী সমুন্নতির পর্বে এমন কি পরবর্ত্তী মুসলমানী ধর্ম্মান্ধতা, রাজনৈতিক নৈরাজ্য আর বৃটিশ অসংস্কৃত মূঢ়তার ক্রমাগত অনিষ্টকর আঘাতের কালেও ভারতীয় জীবন, রাজনীতি ও ইতিহাসের যে চিত্ররূপ দেখা যায়, সেসব বিরাট এই ভারত সাম্রাজ্যের শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে, যাঁরা আগ্রহ দেখান, তাঁদের কাছেও এবস্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছিল।

একথা বলেছিলেন হ্যাভেলসাহেব, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পসৃষ্টিকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য বলেছিলেনঃ সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্প প্রতিভাসম্পন্ন এক পুরাতন ভারতীয় পরিবারের সন্তান ইনি, এঁর কাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙালী কবি ও নাট্যকার। নিকটতম আত্মীয় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীতশাস্ত্রী, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাশ্চাত্যে স্বীকৃত। চিত্ররীতি পুনরুজ্জীবনবাদী গোঁড়ামীর উৎপাদন নন, অবনীন্দ্রনাথ লুপ্ত যুক্ত ধারাকে সঞ্জীবিত করে সাগরবাহিনী করার প্রযত্ন এটা। ইনি প্রচলিত ইউরোপীয় শিল্পরীতির ছাঁদে নিজের শিল্পচরিত্রকে ঢালাই না করে, মুঘলরীতির মধ্যে নিজের শিল্পবিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছেন। অথচ লুপ্ত রীতির নিছক অনুসরণকারীও তিনি নন। আধা ইউরোপীয় শহরগুলি বাদ দিলে ভারতবর্ষ এখনও মূল অংশে পাঁচশো বছর আগেকার ভারতবর্ষই। মুঘলরীতির শিল্প ঐতিহ্য এখনও সজীব। তার অনুসরণ করে, অবনীন্দ্রনাথ ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন না, এখনও পর্য্যন্ত সেরা মুঘলচিত্রের রেখাঙ্কনের অপূর্ব্ব আকার ও সুকোমল লাবণ্য আয়ত্ত থেকে অনেক দূরে আছেন, তবু শিল্পী জনোচিত আনন্দানুভূতির সঙ্গে পুরাণো যুগের ছবি আঁকছেন, আর মনোহারী কাব্যিক আবেগের প্রকাশও, বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ জিনিস তাঁর একেবারে নিজস্ব।

"জোড়াঁসাকোর ধারে" বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন "তাঁকে চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি। জ্যেষ্ঠের মত শ্রদ্ধা করেছি কি সাধে? উনি আমাকে Collaborator—সহকর্ম্মী বলে ডাকতেন আদর করে। কখনও চেলাও বলেছেন। ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসতেন। (আমি নন্দলালকে যতখানি ভালবাসি, তার বেশী ভালবাসতেন আমাকে)। অবনীন্দ্রনাথ স্বভাব-কুড়ে, ঢিলেঢালা মেজাজের শিল্পী, হ্যাভেলে সাহেব তাঁকে কি রকম মাতৃস্নেহে চাকরী করিয়েছেন ওই উক্তি অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই তা সম্ভব।

হ্যাভেল সাহেব ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু। উভয়ের বন্ধুত্ব ছিল শিল্পচর্চ্চা ও শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে। তিনি তাঁকে প্রভাবিতও করেছিলেন। নন্দলাল বসু তার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি (নন্দলাল) তাঁর

রচনায় বলেছেন— হ্যাভেল সাহেবের গ্রন্থগুলিতে তাঁর (নিবেদিতার) নাম নেই, প্রধানতম কারণ নিবেদিতার নিষেধ। তিনি চাইতেন না তাঁর সাহায্যের কথা অপরের বইয়ে থাক। এটা তাঁর আত্মবিলোপের সাধনা। দীনেশচন্দ্র সেনকে তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ইংরাজি রূপান্তরের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছেন। তাঁকেও তিনি নিষেধ করেছিলেন, তাঁর রচনায় তাঁর নাম যেন না থাকে। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দ্বারা উৎপীড়িত হ্যাভেল সাহেব, তাঁর মত সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষের সঙ্গে জড়িত হয়ে, তাঁকে আরও না বিপদে পড়তে হয়! তিনি যাকেই সাহায্য করেছেন তাদের বাঁচাতেও চেয়েছেন নীরব সাক্ষ্য হয়ে। বৃটিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে, যেরূপ জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন— যারা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন, তাদের তিন সেই ভাবেই সাহায্য করেছেন। নন্দলাল, বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে লিখেছেন, হ্যাঁ, সিস্টার হ্যাভেল সাহেবকে শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মনে হয় Aesthetics ও Philosophy of Art বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, উনি তাঁকে বুঝিয়েছিলেন। কারণ হ্যাভেল সাহেব ভারতীয় শিল্পের গূঢ় রহস্য ও অন্তরের কথা জানবার জন্য এসময়ে খুব ব্যাগ্র ছিলেন। হ্যাভেলের লেখা 'ভারতীয় শিল্পের' উপর বইগুলি পড়লে বুঝা যাবে। তিনি ইণ্ডিয়ান আর্টের উপর বইগুলি লেখা সময় ভারতীয় মনীষিদের সঙ্গে সদাই আলোচনা করতেন। সিস্টারের সঙ্গে হ্যাভেল, অবনবাবু, ওকাকুরা ও জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে শিল্প বিষয়ে আলোচনা চলতো এবং সকলেই সিস্টারের আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত— তাঁদের লেখা বই পড়লেই বুঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছিল, একবার পদ্মায় বোটে করে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও সিস্টার বেড়াতে গিয়েছিলেন। আলোচনার বিষয় আমার জানা নেই তবে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোরা উপন্যাসের হিরো 'গোরা' চরিত্রে সিস্টারকে মনে রেখেছিলেন।

হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে নিবেদিতাব পরিচয় কোন পরিস্থিতিতে হয়েছিল, তাঁর লেখা ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯০২ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়। এখান থেকেই নিবেদিতার যাত্রা হয়েছিল কলামন্দির অভিমুখে। তাঁর সহযাত্রী হয়েছিল বিদ্যালয়ের কয়েকটি বালিকা, দেশের সৃষ্টি-সমর্থ প্রতিভাবান শিল্পী ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনীষি লেখকরাও।

১৯০০ সালে পারিস কংগ্রেস "শিবলিঙ্গ" সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাহেবদের স্বচ্ছন্দ গৃহীত প্রচলিত ধারণাকে স্বামিজী মৌলিক যুক্তিতে নাড়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি বেদসংহিতা 'যূপস্তম্ভ' থেকে। অথর্ব্বসংহিতায় কি বক্তব্য আছে— আলোচনার শেষে বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধস্তূপের কথায় এসে বললেন: এই স্তূপ থেকেই শিবলিঙ্গ আকরিত হয়েছে। পরে ব্যাপারটা বৌদ্ধতান্ত্রিক কদাচারের সময়ে লিঙ্গোপাসনা দাঁড়ায়। শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতিঅর্ব্বাচীন এবং বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময়ে সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধতন্ত্রসকল এখনও নেপাল ও তিব্বতে খুব প্রচলিত। তিনি স্বীকার করলেন, পৃথিবীতে লিঙ্গোপাসনার অস্তিত্ব আছে। অবনতির যুগে ভারতেও কোন কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রচলিত অর্থে লিঙ্গোপাসনা দাঁড়িয়েছিল, যদিও অগণিত শিবপূজক এই স্থূল ব্যাপারটির চিন্তায় উদ্দীপ্ত ছিল না।

স্বামিজী কতকগুলি চিন্তাসূত্র দিয়ে গিয়েছিলেন তার প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রমাণ করার দায়বোধ করেছিলেন নিবেদিতা। বিষয়টি নারীর পক্ষে শোভন আলোচনার বস্তু নয়, তাই হ্যাভেল সাহেবকে ১৩ই মার্চ্চ ১৯০৮ এর গোড়ায় পত্র লেখেন। 'একথা জেনে অতীব উল্লাসিত, তুমি আমার বৌদ্ধ শিব প্রতীক তত্ত্বটিকে খুবই সুদৃঢ় মনে করো। আর আমি এও স্বীকার করি, বিষয়টি নিজ নামে এ সম্বন্ধে লিখতে পারি না। একথা ভাবতে পারছি না বিষয়টি আলোচনার ভার তুমি নেবে, কেন না তারজন্য শেষ পর্য্যন্ত বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রকাশ করার দায় ঘাড়ে চাপবে। তোমার মতামত পেলে খুবই কৃতজ্ঞ হব। খুঁটিনাটি তথ্যযুক্ত পূর্ণতর রচনা পরে, কোন ভারতীয়

পুরুষ লিখতে পারবেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, স্বধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষায় মানুষ তরবারি নিষ্কাশন করুক, আমি তারই জন্য উদ্‌গ্রীব। অথচ ২১শে জুলাই ১৯০৭ সালেও মিসেস বুলকে লিখেছেন : "ভেবে দেখ ভাইপো, (স্বামী শঙ্করানন্দ) ও একজন কুশলী ব্রহ্মচারী (গনেন্দ্রনাথ) কে, আমি ফটোগ্রাফি অভিযানে পাঠিয়েছি, উদ্দেশ্য শিবলিঙ্গ যে, উদ্ভবকালে মোটেই শিবলিঙ্গ ছিল না, আমাদের এই থিয়োরীর পক্ষে তথ্য সংগ্রহের জন্য!!! দারুণ নয় কি? এরপরে বিষয়টি লিখে ফেলার আশা রাখি। তবে ভাইপোর নামেই মঠ থেকে লেখাটি পাবে— নারী হিসাবে এই ক্ষেত্রে প্রকাশ্য যুক্তি তর্কে নামা সঙ্গত হবে না। তুমি খুশী হয়েছ তো? এই সময়ে টাকাকড়ি খরচ করায় তুমি হয়ত অবাক হবে। কিন্তু এই মরসুমেই এটা সেরে ফেলতে হবে, নইলে এরপরে ৬/৮ মাস আগে তা করা যাবে না। যদি কাজটা করা যায় তা হলে আমরা হয়ে দাঁড়াবো আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের দুর্গরক্ষী। স্বামিজী কি খুশী হবেন না? শিব! শিব!

১৯০৮ সালের ১৩ই মার্চ্চ হ্যাভেল সাহেবকে যুক্তিগুলি তুলে ধরলেন, মূল সিদ্ধান্ত গুলি যা তোমার কাজে লাগতে পারে।*

(১) আদিম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক ধরণের লিঙ্গোপাসনা ছিল। অক্সফোর্ডের অ্যাসমোলিয়াম এ ক্রীট ধ্বংসাবশেষের অংশ পবিত্র প্রস্তর এক কালো শিব। Maypole দ্যাখো মিশরের Crux Ausafa আর তার সঙ্গে ভারতীয় শিব। আমি একথাও মনে করি আমাদের ক্রুশও একধরনের স্মারক চিহ্ন, যার আদিম ক্রশবার উচ্চতর প্রতীকে পরিণত হয়েছে (অক্সফোর্ডের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতাত্ত্বিক অধ্যাপক টি. কে. চেনীর সঙ্গে এ বিষয়ে অনেকগুলি চিঠিতে আলোচনা করেছেন)। শিবমূর্ত্তির সঙ্গে জড়িত 'লিঙ্গ' শব্দটি নিয়েই আমার অসুবিধা, যে শব্দটির ব্যবহার অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া উচিত, সে কথা আমাকে বলা হয়েছে। আশা করি আমি দেখাতে পারবো দশম শতক পর্য্যন্ত শব্দটি ব্যবহার হত না। (২) এই 'লিঙ্গ প্রতীক' হিন্দু আর্য্যদের ধর্ম্মোপাসনার অঙ্গ ছিল না। (৩) বৌদ্ধদের স্তূপ ক্রমে ঈশ্বরাবতারের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সাধারণ স্তূপের পরে এসেছে চার বুদ্ধযুক্ত স্তূপ— উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে মূর্ত্তিগুলি সংলগ্ন। (৪) এই ক্রমবিবর্ত্তিত এবং কোনরূপ নেওয়া উচিত, সে বিষয়ে দ্বিধান্বিত ভাবনা গিয়ে পৌঁছায় চতুর্মুখযুক্ত স্তূপে। তাকে সাধারণত আমরা ব্রহ্মার মূর্ত্তি বলি এবং হিন্দুরা প্রায়শই সেইভাবে তাকে গ্রহণ করে। (৫) এই আকারটি তখনই গৃহীত হলো যখন ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিতদের 'মহাদেব' হিন্দু লোকসাধারণণের নিকট অধিকতর জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক শিব বা মহাদেবের ধারণার সঙ্গে মিশে গেল। জনগণের ভাবনায় বুদ্ধ, যে ছাপ রেখে গিয়েছিলেন এই শিব তার সুস্পষ্ট এবং মোটামুটি সচেতন পৌরানিকরণ। ক্রমে এই চতুর্মুখ মূর্ত্তি কখনও ব্রহ্মা কখনো মহাদেব বলে কথিত হতে থাকেন। (৬) এই সময়ে রাজপুতরা ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে— আর চতুমুর্খ মহাদেব হলেন রাজপুতনায় শিবের সবচেয়ে প্রচলিত রূপ। (৭) ক্রমে মুখগুলির প্রয়োজন রইল না। মূর্ত্তির বদলে নিরাকার ঈশ্বর বিশুদ্ধ প্রতীক রূপ পেলেন। এই যুগে অমসৃন, প্রায়শই নির্দ্দিষ্ট আকারহীন প্রস্তরাদি দেখা যায়। যার চারপাশে জলাধার গতিচিহ্ন প্রায় চৌকরূপের। (৮) পরে কোন সময়ে এই আকারটির সঙ্গে আদিম লিঙ্গ-প্রতীক মিশে যায় জলধারাপথ গোলাকার ধারণ করে। তাত্ত্বিকরা এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেন (জলধারা রেখা যৌনচিহ্ন, বাকী বস্তু লিঙ্গ-প্রতীক) কিন্তু বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে এখনও তা সচেতনভাবে লিঙ্গোপাসনা নয়। তা এখনো "নিরাকার ঈশ্বরের প্রতীক। এই বিশেষ প্রতীকটি কোথায় কীভাবে স্থাপিত তারা কখনও ভাবনা চিন্তার মধ্যে আনে না। যেমন আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত খ্রীষ্টীয় ভাষা 'রক্তের দ্বারা স্নাত' এই কথাটার স্থূল দিকটি সাধারণ খ্রীষ্টানের মনের মধ্যে আসেই না। যদি এর কোন অংশের অধিক ব্যাখ্যা চাও তাহলে দেখা সাক্ষাতের দরকার হবে। না, আমি ভিনসেন্ট স্মিথের প্রবন্ধটি পড়িনি। কিন্তু ভারতীয় শিল্প

প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত উদ্ভট জানি। তাঁর ইতিহাস বইয়ের কোন একটি বাক্য থেকেই তা দেখা যায়।

৬ই জুলাই ১৯০৯ তারিখে পুনরায় হ্যাভেল সাহেবকে লিখলেন আমেরিকা থাকা কালে, পীবডি মিউজিয়ম কেমব্রিজ এর অধ্যাপক পুটনাম আমাকে মেক্সিকোর চিত্রাবলীর এক স্পেনীয় বই দেখান, সেখানে দেখি যে, একটি মন্দিরের সামনে বাইরের দিকে শিবলিঙ্গের সামনে এক নারী পুত্র লাভের জন্য ধূপারতি করছে!! এই বইটি "মায়া সংস্কৃতির" অন্তর্গত, যার মূল, কোন সন্দেহ রাখে না মঙ্গোলনীয়। আমি তাই প্রায় নিশ্চিত এই ধারণায় পৌঁছে গোছি, ভারতে বৌদ্ধস্তূপের পরিবর্ত্তিত রূপের সঙ্গে লিঙ্গরূপ একীভূত হয়ে যায় রাজপুত অভিযানের পরে। আর এই বস্তুর উৎসক্ষেত্র মঙ্গোলীয় ছাড়া— কিছু নয়। আমরা জানি বৌদ্ধযুগ থেকে মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষ চীনা ও মঙ্গোলীয় প্রভাবে ভর্ত্তি ছিল। আমি আরও বলতে চাই, উক্ত দুই বস্তুর একীভূত হওয়ার ব্যাপারটা জনমনে এখনও পুরোপুরি স্বীকৃত নয়। কারণ তাদের কাছে শিব হলেন নিরাকার দেবতা।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে চিঠিতে লিখলেন: শিবপূজা (ইতিহাস) নিয়ে খুব খাটছি। খুব চিত্তাকর্ষক বিষয়, ইতিহাসে ভরা। চিন্তার বিবর্ত্তন কাহিনী : জনজীবন এবং আচার ব্যবহারে সেই চিন্তার অভিব্যক্তি, এ কী যথার্থ ইতিহাস নয়?

এই সপ্তাহের সদানন্দের সঙ্গে আমি কয়েক ঘণ্টা শিব ব্যাপার নিয়ে কাজ করেছি। তিনি সাহায্য করেছেন। শুনলে আবাক হয়ে যাবে যে, এই উপাসনাকে লিঙ্গোপাসনা বা কোন অপবিত্র ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত করার অভিপ্রায়, কোন কারণই নেই। আমি ক্রমেই স্থির বিশ্বাসে উপনীত যে, প্রতীকটি বৌদ্ধস্তূপের ধারা পথে উদ্ভিন্ন। জানো কি, মেয়েরা যখন পূজার জন্য মাটির ছোট ছোট শিব গড়ে তখন তারা প্রথমে তাকে একটি ছোট গোলমাটির উপরে স্থাপন করে, যাকে বলা হয় বজ্র! তারপরে পূজাকালে প্রথম কাজ হল ওই বজ্রটিকে সরিয়ে ফেলা। এটি অদ্ভুদ ব্যাপার। জগদীশচন্দ্রের মনে আছে, তার ঠাকুরমা খুবই এ জিনিস করতেন। এই অপূর্ব্ব ব্যাপারটি উপলব্ধি করা উচিত,'বজ্র' শব্দটি কত বেশী "বুদ্ধ" শব্দের বদলে ব্যবহার করা হয়। তাহলে দেখছো, হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসের বিষয়ে কিছু করার আশা রাখছি। তা সত্যই করতে পারলে স্বামিজী কত না খুশী হবেন।

১৩ই জানুয়ারী ১৯১০ স্যার জর্জ বার্ডউডের সভাপতিত্বে, হাভেল সাহেব ভারতের শিল্প প্রশাসন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেই সভায় বার্ডউড শিল্পজগতে ভারতীয় শিল্প গরিমা বিষয়ে অরুচিকর মন্তব্য করেন। সেই বিবরণ হ্যাভেল সাহেব ৩রা মার্চ্চ ১৯১০ পত্রযোগে ১৭ নং বোসপাড়া লেনে পাঠিয়ে দিলেন। উত্তরে নিবেদিতা জানালেন : তোমার চিঠির সঙ্গে "জার্নাল অফ দি সোসাইটি অফ আর্টসে'র যে সংখ্যাটি পাঠিয়েছ সেজন্য ধন্যবাদ। স্যার জি. বি. (জর্জ্জ বার্ডউড) লোকটা ডাহা শঠ। তবে ওয়ালটার ক্রেন ও অন্য দুজন তাঁর ধারণাদি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। উত্তম। গোটা ভবিষ্যৎ কিন্তু তোমার হাতে। সাম্প্রতিক প্রদর্শনীটি সর্ব্বাধিক সফল। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের কল্পনা ধর্ম্মিতা বিষয়ে, তুমি যা বলেছ তা ৪০ কি ৫০টি ভালো প্রদর্শনীতে একত্রে উপস্থিত করা যাবে, যা একেবারে প্রমানীকৃত। নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ভারতের ইতিহাস বিষয়ে প্রতিদিনই আমার জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটছে এবং তা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও। বুদ্ধ বিষয়ে বলবে বার্ডউড!!! যে বুদ্ধমূর্ত্তি মানব ইতিহাসে সম্ভবতঃ মহত্তম প্রতীক। ওই বুড়ো ইউরোপীয়ানের মন অপেক্ষা বহুগুণে উদরতর। মনই কেবল জগৎ সম্বন্ধে সহানুভূতি ও বোধের নবভূমির দ্বার খুলে দিতে কিংবা সেখানে স্বয়ং প্রবেশ করতে সমর্থ। অবশ্য ওঁর কারুশিল্প উপভোগের যথেষ্টে রুচি আছে আর অম্লরসাক্ত ভঙ্গিতে যা লেখেন, তাতে মনে হয় তাঁর আলোচনায় রয়েছে যেন

প্রতিভার ছাপ। কিন্তু সেখানেই শেষ। ওঁর সবটাই ওপর ওপর। যথার্থ কাজ করতে পারে— যে বিরাট বুদ্ধি ও হৃদয়, মন ও প্রেম— সে সকলের উপলব্ধি 'উনি' এবং 'উনি' মার্কাদের সাধ্য নেই।

৭ই এপ্রিল ১৯১০ চিঠিতে লিখলেন "আমরা সকলেই আপনার দারুন লড়াইয়ে আনন্দিত। তা বিশেষভাবে বুঝলাম 'টাইমস' পত্রিকায় পাঠানো ম্যানিফেস্টো আমার কাছে পৌঁছানোর পরে। ভারতীয় শিল্পের পক্ষে আপনি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। এখন দেখছি, এখানকার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ, কিভাবে বিরাট কাজ করার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আপনার পরে, যিনি আর্ট স্কুলে কার্য্যভার নিয়েছেন (পার্সি ব্রাউন) তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গুণ সম্বন্ধে তারিফ করার আছে এমন বলতে পারি না। অবশ্য চূড়ান্ত মন্দ কিছু যদি শেষপর্য্যন্ত ঘটেই, তাহলে টেগোরদের পক্ষে শিল্প আন্দোলনের সরকারী আওতা থেকে সরিয়ে আনা সব সময়েই সম্ভব। খুবই ভাগ্যের কথা এই, টেগোর-কুল যুগপৎ শক্তিশালী ও উৎসাহী। এখানে উল্লেখ থাকা উচিত, তন্ত্রসাধনায় জড়িয়ে পড়ে হ্যাভেল সাহেবের মাথায় গণ্ডগোল দেখা দেয় ১৯০৬ সালে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হয় ও ১৯/২০ জুলাই এর চিঠিতে কিন্তু সাময়িক মানসিক বিপর্য্যয়ের ধাক্কা সামলে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ভারতীয় শিল্প রক্ষায় অসাধারণ কাজ করে চলেন। এঁদের উভয়ের ছিল ভারতসত্ত্বায় বাধা মন। ভারত ছিল এঁদের রক্তের প্রতিটিবিন্দু। ভারতের নিন্দা এঁরা একবারেই সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষ করে নিবেদিতা। এঁর যত লেখা, পাশ্চাত্য জগতে ভারতমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত। যে ভারতকে পাশ্চাত্যবাসীরা পরাধীন, অসভ্য ও বর্ব্বর দেশ বলে প্রচার করে এসেছে।

শিল্প বিষয়ে কথাবার্ত্তার মধ্যে ভাস্কর্য্যের প্রসঙ্গ এসে গেল। ওই একই চিঠিতে বার্ডউডের স্থূল মন্তব্য বিষয়ে বললেন : ভারতীয় শিল্পের আদর্শ ও দর্শন শুনেই মন কেড়ে নিচ্ছে। প্রতিবার এলিফান্টা ও এলুরার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে মুসলমান পূর্ব্ব ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে বিস্ময় সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা গভীরতর হয়েছে। গ্রুণ্ডেলয়ে বলেছেন, হিন্দুরা খাঁটি ভাস্কর্য্যের রূপায়ণে অসমর্থ এ কথার কী যে মাথামুণ্ডু ধরতে পারছি না। যেহেতু এই মূর্ত্তিগুলি পাথরের গায়ে লাগানো। সেই জন্যই তারা রিলিফ!! তাছাড়া শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যা জানি, শুধু তাই হলো বেদবাক্য? অন্য দেশের মানুষদের ভিন্ন শিল্পাদর্শ মানে আদর্শচ্যুতি? ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে একত্রে বসে প্রতিলাইন ধরে প্রতি পৃষ্ঠা ধরে গ্রুণ্ডেলের লেখা পড়ি।

আমি সর্ব্বদা ভেবেছি এবং বলেছি, বার্ডউড শক্তিশালী আমলার বেশী কিছু নন। সেই ধারণার পটভূমিতে বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁর উত্থিত বর্বরাধিক বর্ব্বরের নিলর্জ্জ ঔদ্ধত্য। আমি এইটেই বলতে চাই— এমন কি তাঁর কাছ থেকে ওরকম নিরেট গবেট কথা আশা করিনি।

নিবেদিতার মনোজীবনে, বুদ্ধের স্থান সর্ব্বোচ্চে। শিব, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ নিয়েই তাঁর জগৎ। সেই বুদ্ধ বিষয়ে বার্ডউডের অশালীন মন্তব্য পদ্মবনে মত্ত হাতীর মাতামাতি। মিসেস বুলকে লেখা ২রা জুলাই ১৯০৫ সালের চিঠি উল্লেখ করা হলে বোঝা যাবে তাঁকে : "তোমার ডেস্কের উপরে ছোট বুদ্ধ মূর্ত্তিটি, দেখছি আর ভাবছি, কী প্রশান্তভাবে সমাসীন, শুধু তিনি চিন্তার, মহাদেশে অভিযাত্রী, চিরযাত্রী, উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে নিঃসঙ্গ। আবেগের স্নায়ুকেন্দ্রে স্থাপিত তাঁর হাত, কিন্তু কোন কাঁপন নেই তাতে। যে সমুদ্রের নাবিক তিনি, সেখানে দুর্ব্বলতার তরঙ্গদোলা তাঁকে বিচলিত করে না— তিনি একাকী অনন্তে।"

মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় মে ১৯১০ বার্ডউডের মন্তব্যের প্রতিবাদে সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ দীর্ঘ বিবরণ ও ইংলণ্ডে শিল্পী ও শিল্প-তাত্ত্বিকদের পত্র টাইমস পত্রিকায় শিল্প সমালোচকদের মন্তব্য সংকলিতও হল।

১৯০৯ মে মাস ইংলণ্ডে নিবেদিতা। প্যারিসের প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী নাগরিক জেরাল্ড নোবলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ইনি আবার মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু—

বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী। পুলিসের নজর এড়াতে, ফরাসী চন্দননগরে থাকার পরিকল্পনা থাকায় এঁর সাহায্য নেবার কথা ভেবেছিলেন। ৬ই মে তারিখে লিখলেন, আহা, আপনি কেন এসেছিলেন, আমি তখন বাড়ীতে থাকলে আমার বন্ধু মিঃ হ্যাভেলের লেখা নতুন বইটি দেখাতে পারতাম। জন মারে কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার অ্যাণ্ড পেন্টিং" দাম তিন পাউণ্ড তিন শিলিং। চমৎকার সব ছবিতে ভর্ত্তি, দেখলে আপনার মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যেত, আপনি বিশ্বাস করতে, প্রনোদিত হতেন যে, এখনও আধুনিক ভারতে, নতুন পথে চালিত অসাধারণ শিল্প প্রেরণা থাকা সম্ভব।

বইটি পাঠিয়ে ছিলেন। সঙ্গে মনোরম একটি চিঠি। যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় ৬ই জুলাই ১৯০৯ লিখলেন : আপনাকে উপযুক্তভাবে অভিনন্দিত করবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা। মাথায় নানা প্রশ্ন উপচে পড়ছে, সে সব সময়মত আপনাকে করা যাবে কিন্তু আগে তো সমাদর প্রশস্তি। ঠিক এই বইটি আমরা চাইছিলাম। এখানে পাচ্ছি, স্বচ্ছন্দে পাঠযোগ্য, প্রামাণ্য বিবরণ, যথেষ্ট চিত্রসমন্বিত, যার সাহায্যে যোগ্য ব্যক্তিরা ভারতীয়-শিল্পের মনো-দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার সম্মুখীন হতে পারেন।

আপনার বইটি হল এজাতীয় প্রথম প্রয়াস, সহজেই বোঝা যায়। ভবিষ্যতে শত শত অনুসরণকারী দেখা যাবে। কারণ এই গ্রন্থ উন্মুক্ত করে দেবে বিচার বিতর্কের এক যুগকে। সেই সঙ্গে তুলে ধরলেন : বইটির ত্রুটি কোথায়। তারানাথ থেকে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলি অপূর্ব্ব। তিব্বতী লেখকের স্টাইল কী আধুনিক। মগধের চৈত্যের নামের প্রয়োজন। প্রয়োজন ওয়াচেড্ডেলের আবিষ্কারের প্রামাণ্য। তিনি উল্লেখ করলেন পুরাতন পশ্চিম ভারতীয় শিল্পকলা, পূর্ব্ব ভারতীয় শিল্প-কলা, মধ্য-দেশীয় শিল্পকলা— এই ধরনের শিল্পযুগ বিন্যাসের কথা প্রচলিত, এদের তুলনায় লিমব্রিয়া টাসকনি ও ভেনিসের ধারাগুলির স্বাতন্ত্র্যের সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করেন নি। সেই ধারাগুলি কী আকারে এখনও বহমান, তাও বলেন নি। অথচ বইটি তাঁকে এত খুশী করেছিল যে, তিনি বইটি সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ লিখলেন মর্ডার্ন রিভিউতে। (1) Indian Sculpture and Painting (2) Havell on Hindu Sculpture (3) Havell on Indian Painting অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৯০৯ পর্য্যন্ত।

অজন্তা ও ইলোরা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন কিন্তু ১৯০৯ এর ডিসেম্বরের আগে নিজে পৌঁছতে পারেন নি। মিস ম্যাকলাউড যখন ফ্লোরেন্সে সংবাদ পেয়েছেন, তার সঙ্গী হতে চেয়েছেন, সেই সঙ্গে অজন্তা প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি জানালেন ফ্লোরেন্স আমার স্বপ্ননগরী। ফ্লোরেন্স কেবল সাভোনারোলা এবং জিয়োত্তর স্থান নয়— তা শিল্প কাজে সেন্ট ফ্রান্সিসের প্রাণস্বর সুস্পষ্ট ও সুমধুর ভাবে ধ্বনিত এবং দান্তের ডিভাইন কমেডিও। সেই শতাব্দীর সর্ব্বপ্রকার বিশ্বভাবনা যেন ফ্রোরেন্স-কমলের পাপড়ির নীচে সুখাশ্রয় পেয়েছে। ইলোরা অন্য এক ইতালীর অন্য এক ফ্রোরেন্স, এইজন্য ইতালি সুবৃহৎ এবং ভিন্ন চিন্তার আধার। আমরা যে স্বামিজীকে দেখেছি, যাঁর সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেছিল, একদা ইতালি ও ফ্লোরেন্স। ৯ই ডিসেম্বর ১৯০৩।

১৯০৪, ২৬শে জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন : অজন্তা ও চিতোর ভ্রমণে উৎসুক। সেপ্টেম্বর দলবল নিয়ে বুদ্ধগয়া (দ্বিতীয়বার) গেলেন, সেখানে বজ্রচিহ্ন আবিষ্কার করলেন। চাইলেন এই বজ্রচিহ্নকে জাতীয় প্রতীক করতে। এখানে মোহন্ত তাঁকে একটি স্তূপ উপহার দিলেন, সেটি জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে রাখলেন। তার মধ্যে চারটি সুন্দর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, তাদের চতুর্দিকে শত শত ছোট ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি। জানুয়ারী ১৯০৫ সালে চিঠিতে বললেন : সাঁচী স্তূপ নিয়ে পড়াশুনা করছি। ওটি দেখতে ইচ্ছা যে! ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে গেলেন সাঁচী। এরপর ভূপাল, উজ্জয়িনী, চিতোর, আজমীর, নাগপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ, ও বারানসী। পূর্ব্বের তুলনায় তাঁর রসদৃষ্টি ও রূপদৃষ্টি গভীর। প্রথমবার, যে রাত্রে তাজমহল দেখেছিলাম. তোমার মনে পড়ে সে

কথা? তাজমহল যেন এখন আরো আরো অনেক সুন্দর! মনের পরিণতি ঘটেছে। যাতে শাজাহানের প্রাণরূপকে উপলব্ধি করতে পারি। সদানন্দের ভাষায় "প্রেমের ভিখারী"! দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দেখেছিলাম দিনের রাজসিংহাসনে স্থাপিত তাজের উপরে ক্রমেই ধূসর হয়ে গেল আলো, ক্রমে রাত্রির সিংহাসনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাজ, নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল বিভায় ভারতের সেই সাজাহানকে কিন্তু তুমি এও জানো আগেরবার যখন তাজের সামনে ললাটে পরম সৌন্দর্য্যে স্থাপিত সেই নিখুঁত মুক্তামুকুট। সে জিনিষ তো এই উপলব্ধি সম্ভব করে দিচ্ছিলই পার্থিব সৃষ্টির গৌরব অপেক্ষা অনেক বড় হল প্রেমের আধ্যাত্মিক মহিমা। ভারতের সম্রাট হয়ে, পৃথিবীর সকল সম্পদ আহরণ করে, তার দ্বারা প্রিয়তমাকে ভূষিত করার মহিমা স্বপ্নের মতই অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব কিন্তু সৌন্দর্য্যের বিষয়ে চিন্তার আর একটি দিক আছে। কী বলবো সেই মহা মনীষার (স্বামিজীর) বিষয়ে যাঁর চিন্তা ও জ্ঞান প্রেম বিষয়ের সঙ্গে অদ্বৈতবোধে উপনীত। (২৪/১/০৬)

এইকালে সাঁচী, আগ্রা, এবং উড়িষ্যা বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বই পড়তে উৎসুক। মৃত্যুর পূর্ব্বে আরও দু'একটি বই লিখেছেন- যাতে শিল্পপ্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে।

তার মতে তীব্র পুরান প্রীতি, সৃষ্টি করেছে মধ্যযুগের শিল্প, আর তীব্র সত্যপ্রীতি মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের দিকে। এখানে রয়েছে ধর্ম্মে সত্য প্রীতি, যা উনিশ শতকে সৃষ্টি করেছে রেনেসাঁস— প্রাচীনের ভিত্তিতে ঘটেছে শিল্পের জাগরণ। সেই উদ্দেশ্যেই বললেন: ভারতকে নিতে হবে ইউরোপকে ও বিশেষত নাগরিক ও সামাজিক আদর্শের সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করার ব্যাপারে। সেই ক্ষেত্রটি 'প্যুভি দ্য শাভান এর পৌর চিত্রাবলী'। ফরাসী শিল্পী প্যুভি দ্য শাভানের জন্ম অভিজাত বংশে ১৮২৪ সালে। প্রথম যৌবনে ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছুক, ইতালি ভ্রমণের কালে শিল্পী। প্রথম দিকে তাঁর আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে প্রত্যাখ্যাত হলেও উনিশশতকের শেষ দুই শতকে শিল্পী বলে স্বীকৃত। খ্যাতি তাঁর প্রধানত বৃহদায়তন ম্যুরাল ছবির জন্য। যা রূপকথা যুক্ত, পৌরানিক ও ধর্ম্মীয় বিষয়ে। প্যারিসসহ ফ্রান্সের বড় বড় জনভবনগুলির দেওয়ালে তাঁর ম্যুরাল অলঙ্কৃত। সরল শৈলীতে আঁকা চিত্রাবলী, সিম্বলিস্ট চিত্রশিল্পী ও কবিদের কাছে নায়ক গৌরব লাভ করেছেন। প্রতীকী ভাষায় নিজ চিন্তা প্রকাশে সমর্থ এই শিল্পী গর্গ্যা, সোরা, লত্রেক, প্রমুখকে প্রভাবিত করেছেন। মিস ম্যাকলাউড তাঁকে স্যভান-এর ফটোকপি পাঠান ১৯০৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর। ছবিটি ছিল St. Genevieve watching out Paris সেটি এত ভাল লেগে যায় যে, ডেস্কের উপর তা বাঁধিয়ে রাখেন। তাঁর মনে হল : এটি একটি চিরন্তন প্রতীক"। ২৬শে জানুয়ারী ১৯০৫ তারিখে লিখলেন মিস ম্যাকলাউডকে : 'আমার কখনো কখনো মনে হয়, ভারতের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজ শিল্পের মাধ্যমেই করা যেতে পারে, পত্র পত্রিকা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নয়— যে শিল্প হবে নাগরিক চেতনা, জাতীয় চেতনা, ইতিহাস চেতনার বাহক। রাজনৈতিক বা বিশৃঙ্খল শিল্পে আমাদের প্রয়োজন নেই, পূর্ব্বোক্ত ধরণের চিত্রের জন্য ফ্রান্সের দ্বারস্থ হতেই হবে। Bobtet de Monval-এর আঁকা জোয়ান অব আর্কের ছবি পেয়ে খুশী হলেন কিন্তু তৃপ্তি পেলেন না কারণ সেটি ফ্রান্সের জাতীয় চেতনার মূর্ত্ত বিগ্রহ বা ঈশ্বরের করধৃত না করে, তাঁকে উনিশ শতকের চায়ের আসরের বা বল নাচের আসরের সুন্দরী নারী চিত্রিত করা হয়েছে। "স্যাঁত জেনভিভ' বিষয়ে শ্যাভন যদি চিত্রমালার অংশ হয় এবং সেই চিত্রমালা যদি কোন স্থাপত্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ওটি আরো সঠিক বস্তু। ওই ধরনের ছবি তিনি চেয়ে পাঠালেন। প্রবন্ধ লিখলেন : পৌরভাব রূপায়নের উপর। ১৯০০ সালে সেপ্টেম্বর স্বামিজী, সরবন অ্যাম্ফিথিয়েটার ম্যুরালের চিত্রণ কৌশলের প্রশংসিত ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, নিবেদিতা সে রুচির প্রশংসা করতে পারেন নি। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ সালে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: ছবি পিছু তিন ফ্রাঁ দামের বেশী নয় এমন যতসম্ভব স্যাঁতজেনভিভ-এর ছবি অর্ডার দিও মসিয়ে ওতক্যুর এর দোকানে। ওঁর সেরা হ'ল নগর কল্যাণের জন্য প্রার্থনারত ছবিটি যেটি তুমি পাঠিয়েছিলে। তবে

সবগুলিই সুন্দর তবে নগ্নপ্রায় সরবন চিত্রাবলী সহ্য করতে পারিনা। প্যাভি দ্যা স্যাভান-এর মত হয়ে ওঠো, তাঁর মত চিন্তা শক্তি লাভ করো, কী অপূর্ব্ব। প্যারিস যখন নিদ্রিত তখন তারজন্য প্রার্থনা করছেন স্যাঁতজেনভিভ! কী শান্তি। আত্মার কী বিপুল বিস্তার। (২শে নভেম্বর ১৯০৩, ২৪শে এপ্রিল ১৯০৭ সালে মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন : তুমি প্যারিস ঘুরে ঘুরে দেখছ, কী চমৎকার। কখনো আবার প্যারিস দেখবো কিনা জানি না। আমার সব সময়ে মনে হয় গতবারে প্যারিসে থাকার সময় প্রাপ্ত সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করিনি। যদি আবার ওখানে যাই, তা হলে মঁসিয়ে নোবল কি আমাকে দু'একবার ঐতিহাসিক জায়গাগুলি ঘুরে দেখবেন? আমি লুভার একেবারে ঘেঁটে দেখবো, প্যুভি-দ্য শ্যাভান-এর চর্চ্চা করবো সে আমার জীবনস্বপ্ন। ২রা মে ১৯০৬ সালে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন: প্যুভি দ্য শ্যাভান সম্বন্ধে নিউনেস প্রকাশিত একটি সস্তা বই পেয়েছি। যে তালিকা চেয়েছিলাম তা মিলেছে। জানো কি ভারতে বাস করার পর সাউথ কেনসিংটনে গিয়ে গ্রীক মূর্ত্তিগুলি দেখেছি, বিচারকের মনোভাব নিয়ে অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে। বুঝলাম, আমি এমন একটা দেশে থেকেছি, যেখানে মানুষ প্রায়-নগ্ন অবস্থায় থাকে, আর তাতে আমার চোখ তৈরী হয়ে গেছে। ফলে, মূর্ত্তিগুলিকে গ্রীকরা যেভাবে দেখতে পারতো সেইভাবেই দেখেছি। সেই দৃষ্টি নিয়ে বলতে পারি প্যাভি-দ্য-শ্যাভান এর সেকুলার ছবি অসহ্য। চূড়ান্ত জগাখিচুড়ি। কোন একটা ছবিতে আগাগোড়ায় একরীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। বিশেষভাবে সরবন ছবিগুলির ক্ষেত্রে। লাইট, কালার, স্পেস এবং কম্পোজিশন— একেবারে দিব্য কাণ্ড কিন্তু মানবিক বিচারে বিশৃঙ্খলার দুঃস্বপ্ন। ছবিগুলির কি এমনই গরম লেগেছে যে, গায়ে কাপড় রাখা যায় না? তাহলে বিদ্যা বা ভক্তি বা গির্জা ইতিহাস বা ওই ধরণের কিছুকে সন্ন্যাসিদের মত বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়েছে কেন? প্যাভি-দ্য-শ্যাভন-এর গোটা চিত্র তালিকা ধরলে তাঁকে পৌরচেতনার অপূর্ব্ব প্রতিভু শিল্পী বলে, অনুভব করা যায়। তাঁর সুন্দরতম চিত্রের অনেকগুলি, প্রতীক চিত্রাবলী মনে— পূর্ব্বলব্ধ অনড় ধারণার ফল, শরীর সংস্থান বিষয়ে চিন্তার ঐক্য ও ঔচিত্যবোধের অভাবের ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর নগ্নচিত্রের স্থানে আসুক শাড়ী, ও শুভ্র অবগুণ্ঠনে ঢাকা ভারতীয় নারী। লোকে যেমন বলে, সেইভাবেই আমার অমর আত্মাকে বাজী রেখে বলবো দ্বিতীয় ব্যাপারটা ঘটলে, পরিবর্ত্তে যা পাবো তা হবে মহামান্বিত গৌরবান্বিত। আহা! কোথায় সেই শিল্পী, যিনি এই বস্তু সম্ভব করবেন! হাই আর্ট নামে ভারতীয় শিল্পীরা, নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন ছবি এঁকে খুশী হতে চান। যুক্তি হাইআর্ট, আমাদের তৃপ্তি দেয়। তিনি বললেন এই প্রবণতা এড়িয়ে চলাই ভাল। কারণ এই ধরণের ব্যাপারকে ঠিকভাবে গ্রহণ করার মত মন বা চোখ এদেশের শিল্পীদের মধ্যে তৈরী হয়নি। কোন উচ্চ রসসৃষ্টি থেকে পাশ্চাত্য শিল্পে নগ্নচিত্র এসেছে তা তিনি জানতেন। বললেন "নৈর্ব্যক্তিক ভাবের মহিমা আছে এমন পুরাতন শিল্পে, যেমন ভিনাস ডি মিলো বা ডোনাটেলোর, পা থেকে কাঁটা তুলে ফেলছে তরুণী" কিংবা একালের ওয়টস ছবিতে যেখানে মানবদেহের শারীরিকতা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত নগ্নরূপ দেখা যায়।" কিন্তু যারা এই সব বিষয়কে সঠিক অর্থে গ্রহণ করতে অসমর্থ, তাদের পক্ষে এক্ষেত্রে অন্ধভাবে বিদেশী শিল্পের অনুকরণ করতে না যাওয়াই ভালো। গ্রীস ও রোমের সুদেহী দেবদেবী বা সুদেহী মানব মানবীর অন্ধ অনুকরণ, ভারতীয় শিল্প আন্দোলনের বিশেষ পর্য্যায়ে বরণীয় মনে না হলেও গ্রীক ও রোমক শিল্প সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণ ছিল। ১৫ই জানুয়ারী ১৯০৭ মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, কনস্টানটিনোপল এবং এথেন্স দেখার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন : এখন অবশ্য জেরুজালেম বা রোমের জন্য আঁকুপাঁকু নেই কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ স্প্যাগান রোম। তুমি তার সঙ্গে দিল্লীর তুলনা করেছিলে। সেইকারণেই তা দেখার বাসনা।

সামাজিক চেতনা-সমৃদ্ধ শিল্প-সম্বন্ধে তাঁর অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা, অনেকে বলবেন, এটা তাঁর দুর্ব্বলতা। এঁদের মতে শিল্প কোন কিছুর কাছে দায়বদ্ধ নয়, তা আপনাতে আপনি বিকশিত।

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি উর্ব্বশী। অথচ নিবেদিতার কাছে দায়হীন জীবন, চিন্তার বর্হিবস্তু! যদি গভীর কোন ভাবাশ্রয়ে, কোন কাজ করা না হয়, তা গতানুগতিক, স্থূলকাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। সেকথা ১৬ই ডিসেম্বর র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন "ভ্রমণের দিনগুলিতে (তখন তিনি ভারত সফর করছেন জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য) ফেডরিক হ্যারিসনের বই আমার সারা সময়ের আনন্দের বস্তু। মহান নগরগুলি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা অদ্ভুত, তাৎপর্য্য পূর্ণ এবং চমৎকার। তাঁর ব্যর্থতার ক্ষেত্র, কেবল আদর্শ নগরী সম্বন্ধে। সোস্যালিস্ট, পজিটিভিস্ট, রিফর্মার গোষ্ঠীভুক্ত আমাদের প্রগতিশীল বন্ধুগণের স্বপ্ন কেন দুঃখজনক ভাবে স্থূল হয়? আদর্শ কি সবসময়ে বাঁধা থাকবে, জলসরবরাহে, স্বাস্থ্যব্যবস্থায়,. আর ধনবন্টনের উন্নতর নীতিতে? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে আমি ডিসরেলীকে, তার ভূমি অধিকারী ও কৃষকযুদ্ধকে বেছে নেব। হায়, কেউই ভবিষ্যতের নাগরীক কোন আইডিয়ার দ্বারা জড়িত, সেকথা বলে না, কিংবা প্রশ্নপর্য্যন্ত তোলে না কিংবা কোন ক্ষেত্রেই পারস্পরিক স্বাচ্ছন্দ্যের বেশী কিছু ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করেনা যে, আদর্শ যুগের শিল্পের কী রকম বৈশিষ্ট্য হবে? আর ধর্ম্ম বা শিক্ষার কথাটা তো লেখকদের মাথাতেই ওঠেনা।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময়, প্লেগরোগীর সেবার কাজে। সেই পরিচয় গভীরতর হয়ে ওঠে ১৯০২ সালে যখন তিনি ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে (ফ্রেব্রুয়ারী মাসে)। মর্ডান রিভিউ জন্ম নেওয়া থেকে পরিচয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি ইংরাজী মর্ডান রিভিউ ও প্রবাসী-তে অবনীন্দ্রনাথের "ভারতমাতা" "সীতা", সাজাহানের তাজ স্বপ্ন', সাজাহানের অন্তিমশয্যা চিত্র, আলোচনা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথকে Leader of the Art বলে চিহ্নিত করেছেন। মিসেস হেরিংহামের 'ভারত' আগমনে উৎসাহিত হয়ে অজন্তায় ছবি কপি করার জন্য অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, জোর করে টিকিট কিনে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা কি অবস্থায় আছে দেখার জন্য শ্রীজগদীশচন্দ্র সহ নিজে গমন করলেন। তাদের থাকার খাওয়ার তদারকী ও তত্ত্বাবধানের জন্য গগনেন্দ্রনাথকে রেখে এসেছেন। নন্দলালের নিজের স্বীকৃতি 'নিবেদিতার তাগিদা ছাড়া অজান্তা যাওয়া সম্ভব হতো না।'

পরিবর্ত্তে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন বইয়ের জন্য, তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর দ্বারা ছবি এঁকেছেন বা আঁকিয়ে দিয়েছেন। ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজমে প্রচ্ছদপটে দুর্গার 'বজ্র' গ্রন্থমুখের ছবি, সন্ধ্যায় ভারতীয় কথক ঠাকুর। আসম্পূর্ণ বই মিথ্যাস অব হিন্দুজ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস, যা সমাপ্ত করেছেন কুমারস্বামী। এঁকেছেন 'বুদ্ধের বোধিলাভ' বোধিসত্বের হস্তীদণ্ড, রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিদায়, মহাভিক্ষুক বুদ্ধে মহাপরি নির্ব্বান। ফুট ফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি গ্রন্থের জন্য অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন বুদ্ধের জন্ম। গ্রন্থমুখের ছবি এঁকেছেন গগনেন্দ্রনাথ 'তীর্থযাত্রী'। তাঁর দেহত্যাগের পর অবনীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁর প্রেরণা ও সাহায্যের কথা বিস্তারে বলেছিলেন। এরপর লেখেন 'জোড়াসাঁকোর ধারে' যাতে শিল্প আন্দোলনে নিবেদিতার সহায়তার বড় আকারে লিখেছেন, তুলি নয় কথায় এঁকেছেন নিবেদিতার প্রতিমা। তাঁর দেহত্যাগের পর ২রা নভেম্বর হ্যাভেল সাহেবকে লিখলেন: গতমাসে সিস্টার দার্জ্জিলিঙ-এ দেহ রেখেছেন, হয়ত আপনি শুনেছেন। তাঁর মত কাউকে আর পাওয়া যাবে না। কী যে তীব্র তাঁর বিয়োগের ব্যথা কি বলবো!

মর্ডান রিভিউতে লিখলেন: কিভাবে, তিনি এদেশীয় বস্তুর বিষয়ে চোখ খুলে দেন, কিভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, এদেশীয় শিল্প ও সংগঠনসমূহের মনোহারিতা। "How she opened the eyes of the Indians to the beautiful in their country, thir own institutiions. নন্দলাল লিখেছেন: অবনবাবু উহাকে দেখে আমাদের বলেছিলেন: যেন তপস্বীনী উমাকে দেখলাম। কী বিস্ময়কর! প্রেম তপস্যার শ্রেষ্ঠ পৌরানিক কল্পনা উমার রূপচ্ছবি, সত্যই সেরূপে

বিরাজিতা— শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনে। তিনি একই রূপ ধরেছিলেন নন্দলালের মনে, জগদীশচন্দ্র বসুর মনে। কেবল উমা নন, অবনীন্দ্রনাথের কল্পনায় নিবেদিতা ছিলেন 'কাদম্বরী মহাশ্বেতাও'। কথার তুলিতে আঁকা জলরঙের ছবির মালার মত 'জোড়াসাঁকোর ধারে বই' তার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সেরাছবি নিবেদিতারই:

নিবেদিতাকে আমেরিকান কনসালের বাড়ীতে ওকাকুরার রিসেপশনের দিন দেখার কথা বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ "গলা থেকে পা পর্য্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাঘরা, গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। ঠিক যেন সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর মূর্ত্তি একটি।"

হোমউডের বাড়ীতে, আর্ট সোসাইটির এক পার্টিতে নিবেদিতাকে দেখার স্মৃতি : পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী করেই এসেছিলেন তিনি। বড়ো বড়ো রাজরাজড়া, সাহেব, মেম গিস্‌গিস্ করছে। অভিজাতবংশের বড়ঘরের মেম সব, কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধারই কত কায়দা, নামকরা সুন্দরী অনেকেই সেখানে। তাদের সৌন্দর্য্যে ফ্যাসানে, চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্পে, গানে বাজনায় মাত। সন্ধ্যে হয়ে এলো, এমন সময় এলেন নিবেদিতা। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কী বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমিষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগলো। উডরক, ব্লান্ট এসে বললেন কে ইনি? তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম। সুন্দরী, সুন্দরী কাকে বলো তোমরা, জানিনে! আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। 'কাদম্বরীর মহাশ্বেতা'র বর্ণনা সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্ত্তি যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠলো।

নিবেদিতা মারা যাবার পরে গনেন্দ্রনাথ (ইনিই নিবেদিতা মুখাগ্নি করছিলেন দার্জ্জিলিং-এ, বেদান্ত-মঠ তাঁর স্মৃতিবেদী তৈরী করে দিয়েছেন) নিবেদিতার একটি ছবি অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন, সেটি ওঁর টেবিলের উপর থাকতো। লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের খুবই ঘনিষ্ঠতা। তাঁর মত আর্টিস্টিক নজর বড় কারো ছিলনা। আমাদের নজরে, নজরে মিলছিল। লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফেটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, এ কার ছবি? বললুম সিস্টার নিবেদিতার। তিনি বললেন: এই সিস্টার নিবেদিতা? আমার একখানি এরকম ছবি চাই। বলেই, আর বলাকওয়া নেই, সেখানি বগলদাবা করে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোছ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয়, তেমনি ধীর স্থির মূর্ত্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে, মনোবল পাওয়া যেত।... নিবেদিতা ধীর স্থির! তাহলে ঝড় ঝঞ্ঝা, আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তাঁর তুলনাগুলি আক্রমনের মুখে জ্বলন্ত ইস্পাততুল্য, তাঁর চোখের নীল আগুনের কঠিন দীপ্তি এসব কোথায় পাবে, যা লিখেছেন দেশবিদেশের বিখ্যাত মানুষেরা! বহুব্যক্ত রূপে প্রতিভাত তিনি। সব দেখাই শেষপর্য্যন্ত ব্যক্তিগত দেখা। দিব্যচক্ষু ছিল শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় : Babu Abanindra Nath Tagore read a paper in Bengali pointing out how she had opened the eyes of the Indians to the beautiful in their country, their own art and their own institution.

প্রাচ্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক, পণ্ডিত আনন্দকুমার স্বামীর সঙ্গে নিবেদিতার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম স্যার উপাধিকারী সিংহলী হিন্দু ব্যারিস্টার মুথুকুমার স্বামীর ইংরাজ পত্নী এলিজাবেথ ক্লে বীরাই এর পুত্র। কলম্বোয় জন্ম ১৮৭৭ সালে। শিক্ষা লণ্ডনে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস. সি. উপাধি লাভের পর ১৯০৩ সালে পঁচিশ বছর বয়সে মিনারোলজিক্যাল সার্ভের পদে যোগদান করেন। ভূতাত্ত্বিক কাজে সিংহলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন।

ফলে, প্রাচীন শিল্প নিদর্শনাদির সঙ্গে পরিচয়। লিখলেন Mediaeval Sinhalese Art গ্রন্থ। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর অবসর নিয়ে ইয়ুরোপ ও ভারত ভ্রমণ করেন। জীবনের শেষ ৩০ বছর বস্টন শহরের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস-এর সঙ্গে যুক্ত। ১২টি ভাষায় বুৎপন্ন, পণ্ডিত ও দার্শনিক ব্যক্তি। ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ৬০টি পুস্তক লিখেছেন। কুমারস্বামী অনেকবার ভারতে এসেছেন, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কুমারস্বামী নিবেদিতার বাড়ীতে এসেছেন ১ই আগস্ট ১৯০৯। তাঁকে ব্রেকফাস্টে ডেকেছেন ২৮শে আগস্ট ১৯১০। তাঁকে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আঁকা ছবি দেখিয়েছেন। কুমারস্বামীর রামায়ন, ১৯০৭ সালের মে মাসে নিবেদিতা মর্ডান রিভিউতে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, 'ইনি সেই মানুষ, যাঁর নাম ভবিষ্যতে এক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্প সমালোচক রূপে নানাভাবে দেখা যাবে'। ভারতীয় শিল্প বিষয়ে হ্যাভেল সাহেবের প্রধান প্রধান গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন মর্ডান রিভিউয়ের পৃষ্ঠায়। কুমারস্বামীর Mediaeval Singhalese Art বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা করেন ১৯০৯ সালের মে সংখ্যায়, "প্রাচ্য দৃষ্টিতে রচিত একটি ক্লাসিক সৃষ্টি। ইনি পাশ্চাত্য বিষয় সম্বন্ধে একইপ্রকার বিশেষজ্ঞের অধিকারে প্রমাণ্য রচনায় সমর্থ্য। এই বইয়ের ইংরাজী ভাষা সুষমাচার বা মধ্যযুগীয় বীর কাহিনীর তুল্য, সহজ ও শক্তিপূর্ণ শব্দাবলীতে আকীর্ণ। যেমন মুদ্রণে, তেমনি ভাষা ব্যবহারে এর মধ্যে আধুনিক পৃথিবীর আচার্য্য কারুশিল্পী উইলিয়াম মারিসের ছাঁদ লক্ষ্য করা যায়। সিংহলী শিল্প, মূলে ভারতীয় শিল্প কিন্তু নানা দিক দিয়ে প্রাচীনতর চরিত্র প্রকাশক, তা বৌদ্ধ প্রেরণার সৃষ্টি হলেও ভারতীয় শিল্পের তুলনায় অধিকতর হিন্দুত্ব যুক্ত। ক্যাণ্ডীয় শিল্পকে যে আকারে পাই, তা ভারতীয় শিল্পের আদি ভিত্তি থেকে নির্গত, তবে নানা প্রভাবের দ্বারা অংশতঃ পরিবর্ত্তিত ও সমৃদ্ধ, আবার অনেক দিক দিয়ে আদিম লক্ষণাক্রান্ত। ভারতীয় জ্ঞানচর্চ্চা যা কখনো অর্থের কাছে মানবতাকে বলি দেয়নি, তারই খাঁটি সন্তান কুমারস্বামী কারুশিল্পের সামাজিক ভিত্তিভূমির কথা বিস্মৃত হননি। একটি সাধারণ পদ্মের রূপ, সকল পদ্মের প্রতিভূ, যেমন টিউডর গোলাপ সকল গোলাপের প্রতিভূ। সে সকল গোলাপের ভাবাবেগেকে বহন করে এনে, একটি বিমূর্ত্ত সংহত ভাব চেতনার সৃষ্টি করে। এই হল শিল্পরূপের ধারাবাহিকতার রহস্য। আদর্শরূপের উপস্থাপনার মধ্যে বহুবিধ জটিল আকারের এক সহজতম আকারে আবদ্ধ করার মধ্যে প্রকাশিত হয় বহুর মধ্যে এককে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। ...ভারতীয় শিল্পে গ্রীক প্রভার বিষয়ে কুমারস্বামীর বক্তব্যের প্রসঙ্গ বললেন, ভারত রত্নমানিক্যে পূর্ণ, কেবল কুড়িয়ে নেবার মানুষ নেই। কুমারস্বামী ছাড়া অন্য ভারতীয় আছেন কি? বাইরের মানুষেরা নিছক খাটাখাটুনির করে, যোগাড় যন্ত্র করার কাজ করে কিন্তু যোগ্য মানুষ তিনিই, যাঁর আছে প্রেমিকের তীব্র আকুতি, কবির অন্তদৃষ্টি, শিশুর কোমলতা আর সঠিক দেখার দৃষ্টি, সেইসঙ্গে মাথা ও হাত ব্যবহারের শিক্ষা।.... গবেষণার ক্ষেত্র তো সীমাহীন। প্রত্যেক ভারতীয় প্রদেশ, প্রত্যেক মধ্যযুগীয় নগর, যা পূর্ণ হয়ে আছে গৃহশিল্পে, ঐতিহ্যসম্পদে, আচার আচরণের বিশেষ চরিত্রে, কারুশিল্পজ্ঞানে, সেসব জিনিষ রচনার দ্বারা অমর করে রাখার যোগ্য। অমর করে রাখলেই মঙ্গল— সেই মুদ্রিত শব্দগুলির পাখায় ভর করে আসবে পরবর্ত্তী প্রভাবগুলি। কোথায় আছেন সেই মানুষেরা, যাঁরা স্বদেশীয় স্বম্পদের শ্রেণী নির্ণয় করে তাদের গৌরবখ্যাপন ওইভাবে করতে পারবেন?

১৯/২০ জুলাই ১৯১০ মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন, কুমারস্বামী সংশোধনের অতীত প্রতিক্রিয়াশীল পারলে মেকলেকে ধুয়ে মুছে ফেলবে।

মেকলের কঠোর সমালোচক নিবেদিতা। অথচ দেখা যায় তাঁর শিক্ষানীতির প্রতি ঈষৎ অনুরাগ। তাঁকে বৃটিশের শাসনকালে প্রচলিত শিক্ষানীতি আতঙ্কিত করেছিল। প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বে, বৃটিশ সরকারকে ব্যঙ্গ করেছেন, কারণ তাঁরা শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যবহার

করছেন। এই পাপ উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁরা টাকা খরচ করতেন না। বিদেশী শাসনে, একটি মাত্র আশা সকল মানুষের জন্য একই প্রকার শিক্ষা, এক্ষেত্রে এই শিক্ষার দ্বারা লব্ধ মানসিক উদ্‌ভ্রান্তির সঙ্গে এই শিক্ষার ভিতরকার চাবিটি হাতে এসে যায়। ইংরাজ যেভাবে স্বাধীনতাকে দেখে তা বিশুদ্ধ আত্মিক ও বৌদ্ধিক ভাব ছাড়া কিছুই নয়, সে-ই হল ইংরেজ-সৃষ্ট বিষের-প্রতিষেধক। তাঁর মতে আসল শত্রু হল ক্লাইভ, তুলনায় মেকলে বন্ধু। কারণ তিনি রীতিমাফিক বিদেশী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। মেকলে সম্বন্ধে কুমারস্বামীর মনোভাব জানার পর লিখলেন "মধ্যযুগীয় ভারতের সৌন্দর্য্য নিয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করার কী প্রয়োজন? সচেতনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে, সেইসকল সৌন্দর্য্যের চরিত্র আমাদের বুঝে নিতে হবে— কীভাবে তারা সৃষ্টি হলো— কেন হল? পুরাতন নীতিকে সজোরে পিছু হটে পুনর্বহাল করার প্রয়োজন নেই। যা কিছু উত্তম আছে, তাদের নিক্ষেপ করে বর্ত্তমানের ডাইনিং জ্বলন্ত কটাহে কী বেরিয়ে আসে দেখার জন্য। যখন কুমারস্বামী বিশুদ্ধ সংস্কৃতির বিষয়ে লেখেন, তখন তিনি মূল্যবান। বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে তাঁর অসহিষ্ণুতার জন্য তাঁকে মোটেই যোগ্য পথপ্রদর্শক মনে করিনা।

১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মর্ডার্ন রিভিউতে কুমারস্বামীর "Essay in National Idealism" বইটি সমালোচনায় বললেন : উইলিয়ম মরিসের ধাঁচে লেখা চিন্তার ওজস্বিতা ও শক্তিপূর্ণ এঁর ইংরাজীভাষা। লেখকের রচনা ১৫টি, বিষয় বহুবিধ, যোগতত্ত্ব থেকে গ্রামোফোন। যুক্তিনির্ভর, এবং আপসহীন প্রতিক্রিয়াপন্থী। লক্ষণীয় খাঁটি আদর্শগত সত্য ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ভালবাসা। বর্ত্তমান প্রজন্মের ভারতীয় নাগরিক আমরা, মাতৃভূমির সংস্কৃতি বিষয়ে যেন কিছুটা অনাথ সন্তানের চরিত্র নিয়ে কিংবা বিদেশী সুলভ অপরিচয়ের মনোভাব নিয়ে জন্ম। মিশরের বিখ্যাত মার্জার দেবতা, জাভার সুমহান বুদ্ধমূর্ত্তি, ভারতের চতুর্ভুজ দেবতা, এমনকি চীনের প্রখ্যাত ড্রাগন এ সকলই হারমিস অব প্রাক্সিকেলস কিংবা ভেনাসের ডি মিলোর তুলনায় কল্পনাশক্তিময় শিল্প হিসাবে মহত্তর। শেষোক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে আদর্শ সীমাবদ্ধ। যেহেতু আদর্শকে নিখুত ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সীমাহীনতার ভাবকে যদি সঙ্কেতিক দ্বারা প্রকাশ করা যায় সেই হবে মহত্তম শিল্প— এটি লেখকের মতাদর্শ। দেশের সংস্কৃতির চরম উদ্দেশ্য, বিশ্বসংস্কৃতির দিকে মনকে উন্মোচিত করা। সঙ্গীত সে নীতির ব্যতিক্রম হতে পারে না। ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার জন্য শ্রমস্বীকারের যৌক্তিকতা তখনই থাকবে, যদি তা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যথার্থ সুন্দর অংশকে সমাদর করতে সামর্থ্য দেয়। শিল্প অথবা জীবন সম্বন্ধে, যে ধরনের বৃথা কল্পনাবিলাসে আমরা অভ্যস্ত, তার অনুসরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়, এমন কি সংস্কৃতির প্রাচীন সংগঠকগণ কর্ত্তৃক নিদ্ধারিত পথরেখা ধরে অন্ধভাবে চলাও উদ্দেশ্য নয়— যদিও সে ব্যাপারটি অতীব তৃপ্তিদায়ক। নিজেদের এমনভাবে পরিমার্জ্জিত করে নেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে আমরা পুনর্ব্বার খাঁটি বাস্তব রূপ দর্শন করতে বা তার স্বর শুনতে পারি ও আমাদের আধুনিক চেতনার ভাষায়, সে সকলের পুনঃ প্রকাশ করতে পারি।

১৯১১ সালের মর্ডার্ন রিভিউয়ের আগস্ট সংখ্যায় কুমারস্বামীর "The Aims of Indian Art, The Influence of Greak on Indian Art, Indian Drawings, Selected Example of Indian Art—সমালোচনায় বললেন : ভারতীয় শিল্পালোচনার ও বর্ত্তমানের সম্পর্কে, সেতুতে আমরা দণ্ডায়মান। অতীতের মধ্যেই আমরা নির্ম্মান করেছি বর্ত্তমানকে। ভবিষ্যৎকে গঠন করেছি এই বর্ত্তমানের ভিতরে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য হলো ভারতীয় উত্তরাধিকারকে ধ্বংস না করে সমৃদ্ধ করে তুলবো আর স্মরণ রাখবো যে সেই উত্তরাধিকার কেবল ভারতের নয় সমগ্র মানবজাতির।

আর কুমারস্বামী নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' ও 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' বই দুটিকে জীবনব্যাপী সাধনার লক্ষ্য করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ

ছিল। বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের, বলেছেন ডাঃ লিংগম, যিনি কুমারস্বামী সম্বন্ধে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। কুমারস্বামী ম্যাসচুসেটসের ইন্সটিটিউট অব টেকনলজিতে ভারতীয় ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুদের বলেছেন : খ্রীষ্টধর্ম্ম সহ অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে গসপেল অব রামকৃষ্ণ অভূতপূর্ব্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। শেষজীবনে ইনি (কুমারস্বামী) অকৃত্রিম রামকৃষ্ণ অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। এঁর বিবেচনায় ইউরোপে খাঁটি 'বেদান্ত' দিতে হলে প্রচারের ক্ষেত্রে ইংরাজী জানা ভারতীয় বৈদান্তিক চলবে না— এমন কি বিবেকানন্দও নন। মহর্ষির মত ইউরোপে বাস করলে হয়ত খাঁটি বেদান্ত দিতে পারতেন, অবশ্য যদি তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারতেন! সে হতো অন্য ব্যাপার! কুমারস্বামীর কাছে বিবেকানন্দ তখনই গ্রাহ্য, যখন তিনি ভারতের নিম্নবর্ণকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমস্তরে তোলার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার বিধান দেন কিংবা সংস্কারকদের এবং সাত্বিক পদ্ধতির সমালোচনা করেন।

ইংলণ্ডের হ্যারাপ্পা কোম্পানী নিবেদিতাকে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী লেখার বরাত দেন। তিনি বইটি সুরু করে অনেকখানি এগিঁয়ে যান। এ বিষয়ে মিস ম্যাকলাউডকে ৪ঠা জুলাই ১৯১২, লিখেছিলেন : আমি হ্যারাপ-এর জন্য বইটি আজ সকালে লিখতে শুরু করেছি। খুবই আশা করি, কাজটি চালিয়ে গিয়ে অক্টোবর মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারি। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তা শেষ করতে পারেননি। সে বইটি জগদীশচন্দ্র সেইভাবে প্রকাশ করতে চান, লিখেছিলেন তাঁর বোন মিসেস উলসনকে কিন্তু হ্যারাপ কোম্পানী রাজী না হওয়ায় মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে দেখা যায় জগদীশচন্দ্র, বইটি ওই অবস্থায় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক জানালেন কিন্তু হ্যারাপ কোম্পানী তা প্রকাশে রাজী নন। তাদের বক্তব্য ছিল অন্যকারও দ্বারা শেষ করিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। এই কারনেই, কুমারস্বামী অবশিষ্ট অংশ লেখেন। নিবেদিতার Indo-Aryan Myths বইটি প্রকাশিত হল Myths of the Hindus and Budhists নামে, তাতে যুগ্মনাম নিবেদিতা ও কুমারস্বামী। কুমারস্বামী ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন : এই গ্রন্থরচনার ভার যাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল সেই ভগিনী নিবেদিতাকে ভাতরীয় বা পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে পরিচায়িত করার প্রয়োজন নেই। সুমহান রামকৃষ্ণের অনুগামী স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ শিষ্যা ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যের পর্য্যালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষাগত, সমাজবিজ্ঞান সম্মত প্রণালী সুদৃঢ়ভাবে ব্যবহার করেছেন। যে দেশকে তিনি স্বদেশ বলে বরণ করেছেন, সেই দেশ সম্বন্ধে এবং সে দেশের মানুষদের বিষয়ে অনুরাগের অনতিক্রমনীয় উদ্দীপনার প্রকাশ রয়েছে তাঁর রচনাবলীতে। তাঁর প্রধান গ্রন্থের মধ্যে পড়ে, 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ', হিন্দুসমাজ সম্পর্কে ইংরাজি ভাষায় লিখিত একমাত্র সৎ ও সঠিক বই একথা বলা যায়। তাঁর 'কালী দি মাদার' ভারতীয় শক্তি উপাসনার ভয়ঙ্কর ও সুকোমল দিকগুলি পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে প্রথম প্রকাশ সর্ব্বধর্ম্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য্যসহ উৎকৃষ্টভাব উন্মোচন করে দিয়েছে। এইসকল গ্রন্থদ্বারা কেবল পাশ্চাত্যের কাছে ভারতসংস্কৃতির ব্যাখ্যাত হয়নি আরও বেশী হয়ে উঠেছেন ভারতীয় ছাত্রদের এক নব প্রজন্মের কাছে বর্ত্তমান প্রেরণার উৎস। এইসকল ছাত্ররা আর পাশ্চাত্য অনুকরণের জন্য ব্যস্ত নয়। তারা এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, সকল যথার্থ প্রগতির (যা নিছক রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা নয়) ভিত্তিরূপে, গ্রহণ করতে হবে জাতীয় ভাবাদর্শকে, যা ইতিমধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ধর্ম্ম ও শিল্পের মধ্যে।

নিবেদিতা সহযোগী হয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিজস্ব একটি কাগজ বার করার ইচ্ছা ছিল তাঁর, তা সম্ভব হয়নি। রামানন্দের দুটি কাগজ প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউকে আমরা চিনি। ১৯০১ সালে প্রবাসী বার করেছিলেন তার পূর্ব্বে 'প্রদীপ' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। এক সময়ে ভারতের চিত্রশিল্প স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহান স্থাপত্য কীর্ত্তির

বা চৈত্যগুহার ভেতর ছবিসহ ভাস্কর্য্য, সজ্জিত প্রচলন, যা মন্দির বা গুহার বাইরেও পরস্পর শোভা পেত, এমন কি পারিবারিক ভবনও। চিত্রশিল্পের সঙ্গে ভাস্কর্য্য একই রূপে দেখা যেত, সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন রাজা বা অভিজাত পরিবার। বিশেষ করে এসবের উন্নতি হয়েছিল মুঘল, রাজপুত বা কাংড়া রাজত্বকালে। সেইসকল চিত্র প্রকাশ করতে এগিয়ে এলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এঁর 'প্রবাসী' ও পরে 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় সেসকল চিত্র ছাপা হতো। এছাড়াও চিত্রশিল্পী রবিভর্ম্মার ছবিও ছেপেছেন প্রথম দিকে। নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটল। এর পরেই বাংলার নবশিল্পী গোষ্ঠীর ছবি ছাপা সুরু হল প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউতে, ক্রমে তা শিল্পীদের পরিচয়পত্র হয়ে ওঠে। উভয়ের গভীর ভাব বিনিময়ের ফলে পরস্পর একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমন কি তাঁর মন্তব্য সংশোধনের অধিকার পর্য্যন্ত, তিনি দান করে দিলেন রামানন্দকে। এই পত্রিকা দুটিতে শুধু চিত্রচমালোচনা নয় প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ এমন কি সম্পাদকীয় মন্তব্যও রচনা করেছেন তিনি। অবশ্য রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সংশোধন করে ছেপেছেনও রামানন্দ।

১৮৯৬ সাল। প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোচনা যখন আধা রাজনৈতিক হয়ে দাঁড়ায়— স্বামিজী ব্রহ্মবাদিনে একটি প্রবন্ধ লেখেন— 'ডঃ পল ডয়সন অব দি ইউনিভারসিটি অব কিয়েল'। তিনি মন্তব্য করেন : 'ইউরোপ সংস্কৃত চর্চ্চার প্রথম যুগে পণ্ডিতেররা বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতার চেয়ে অনেকগুণ বেশী কল্পনাশক্তি নিয়ে সংস্কৃত অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা অল্পই জানতেন, সেই অল্পবিদ্যা ছিল তাঁদের ভরসাস্থল আর প্রায়ই তাঁরা সেই অল্পবিদ্যার আড়ম্বর করতেন— এরপর এলেন একদল প্রতিক্রিয়াশীল স্থূলদর্শী সমালোচক, যাঁরা আবার সংস্কৃতের সামান্যই জানতেন, বা প্রায় কিছুই জানতেন না, সংস্কৃতচর্চ্চা থেকে পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাসও তাঁদের ছিল না এবং সব কিছুকেই বিদ্রুপ করতে তাঁরা খড়ই দড় ছিলেন। যখন ভারতীয় শিল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এসেছিল, উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাপারে 'গ্রীসের ভূমিকা কি ছিল'? অবশ্য তিনি ম্যাক্সমূলার বা পল ডয়সনের মত যথার্থ সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করেছিলেন তবুও প্রয়োজন মত এঁদের মতের প্রতিবাদ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন "অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ অতি ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তকারী ও সহানুভূতি শূন্য। এঁদের হাতে পড়ে ভারতের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে? এক শুভ প্রভাতে হিন্দুরা জেগে উঠে দেখছে, যা কিছু তার ছিল সবই লোপাট হয়ে গেছে। এক বিচিত্র জাতি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তার শিল্পগৌরব, অন্য একজাতি নিয়েছে স্থাপত্য আর একজাতি হস্তগত করেছে তার প্রাচীন বিজ্ঞানের অবশিষ্ট বস্তুগুলি। শুধু কি তাই? তার ধর্ম্মও তার নয়। হ্যাঁ— হ্যাঁ— বর্হিদেশ থেকে সে বস্তুর ভারতে আবির্ভাব হয়েছে, পহ্লব জাতীয় প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে।"

তার ১৪ বছর পরে নিবেদিতা একই কথার সমধ্বনি করে লিখলেন-- বর্ত্তমানে ভারত বহু জায়গা থেকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ওই ধরনের আক্রমণাত্মক মতবাদের আসল পাওনা হল ওদের হেসে উড়িয়ে দেওয়া— কিন্তু হায় পরাধীন ভারত! বর্ত্তমানে সে অবস্থা তার নেই। সরল সত্যের নামে এই যে সব পক্ষপাতযুক্ত শরক্ষেপ করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে ভারতীয়দের কাছে নৈরাশ্যজনক হল এই মতের, এমন কি তাদের প্রাচীন শিল্পসম্পদ পর্য্যন্ত প্রধানাংশে বিদেশীয় উৎসের কাছে ঋণ নিয়ে তৈরী। সে ঋণকে সুচতুরভাবে ঢাকা হয়েছে সাড়ম্বর দেশীয় সাজে। স্বামিজী নানা প্রসঙ্গে হিন্দু ও গ্রীক দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে, এই দুই সভ্যতা দুটি ভাবের প্রতীক। অন্তর্মুখ অধ্যাত্মভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিন্দুসভ্যতায়, আর বহির্মুখ ঐহিক সভ্যতার উৎকর্ষ গ্রীক সভ্যতায়। তিনি বিশ্লেষণ করে বললেন : ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছে

সমগ্র প্রাচ্যভূমে আর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব সমস্ত ইউরোপে। ইংলণ্ড বস্তুতপক্ষে গোটা ইউরোপ, তার সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী— ইউরোপের সকল কণ্ঠস্বর গ্রীসেরই প্রতিধ্বনি। স্থাপত্যে, গৃহসজ্জায়, গ্রীসের রূপ। তার বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রীসীয় ছাড়া কিছু নয়। গ্রীকশিল্পের প্রাণ বস্তুর অনুকরণে সকল খুঁটিনাটি শুদ্ধ। গ্রীকশিল্প বা তাদের অনুকরণকারীদের শক্তি নিয়োজিত হয়েছে যেমন একখণ্ড মাংসচিত্রণে। তাঁরা এতই সফল যে, কুকুর পর্য্যন্ত সেটিকে সত্যকার মাংস খণ্ড ধরে কামড় দিতে ছুটেছে। এক্ষেত্রে কুকুরের সামনে একখণ্ড মাংস ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ভারতের প্রবণতা আদর্শকে, অতীন্দ্রিয়কে রূপায়িত করায় কিন্তু তা অধঃপতিত হয়েছে উদ্ভট মূর্ত্তি অঙ্কনে। খাঁটি শিল্প পদ্মের সঙ্গে তুলনীয়, যা মৃত্তিকা থেকে ওঠে। সেখানেই আহার্য্য সংগ্রহ করে, মৃত্তিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়না, সে মাথা তুলে থাকে উর্দ্ধে। প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক থাকা চাই— যেখানে ছেদ সেখানেই তার পতন হয়েছে। তাকে প্রকৃতির উপরে উঠতে হবে। স্থাপত্যের সঙ্গে ঘরবাড়ির তফাৎ হলো প্রথমক্ষেত্রে ভাব প্রকাশিত হয়, ব্যাবহারিক প্রয়োজনে একটা আকার খাড়া করা হয়। গ্রীক শিল্পের সমঝদার তিনি। বাস্তব ধর্ম্ম তার শক্তিকে শিল্পের গুণমহিমা স্বীকারও করেছেন, সেইসঙ্গে ভারতীয় শিল্পের আক্ষেপক শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা এক্ষেত্রে তিনি সচেষ্ট। ১৯০০ সালের প্যারিস কংগ্রেসের তিনি নিজে সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলেন : কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীক জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখে, ভারাতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেছিল বলে ভারতীয় যাবতীয় বিদ্যা, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিতে গ্রীক সহায়তার ছাপ দেখতে পান— শুধু তাই নয়, তাঁরা যাবতীয় ভারতীয় বিদ্যায় গ্রীকের ছাপ দেখেন। কালিদাস প্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখে যদি যবনাধিপত্য আপতিত হয়— তাহলে গ্রীক নাটকের সদৃশ আর্য্য নাটক কিনা প্রথমেই বিবেচনা করা উচিত। রচনাবলীর আলোচনা ওই সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনা জগতে, বাস্তবিক জগতে কস্মিনকালে তা বর্ত্তমান নেই। গ্রীক কোরাস কোথায়? গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্য্যনাটকে তা বিপরীতে। সে রচনাবলী এক, আর্য্যনাটকে আর এক। বরং শেক্সপীয়র প্রণীত নাটকের সঙ্গে ভুরি ভুরি সৌসাদৃশ্য আছে, অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হতে পারে শেক্সপীয়ার সর্ব্ব বিষয়ে কালিদাসের কাছে ঋণী। সমগ্রপাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের আপত্তি, প্রয়োগ করে বলা চলে, যতক্ষণ না তা প্রমাণিত হয় কোন হিন্দু, কোনকালে গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, ততক্ষণ গ্রীক প্রভাবের কথা মুখে আনা উচিত নয়।" তদ্বৎ আর্য্যভাস্কর্যে গ্রীক প্রাদুর্ভাব দর্শনও ভ্রমমাত্র"। উল্লেখ করা চলে ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গ্রীক প্রভাবিত-ত্ত্বকে খণ্ডন করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্বামিজীর পূর্ব্বেই। অশোকস্তম্ভ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। গ্রীকরা ভারত আক্রমণ করেছিলেন খ্রী-পূঃ দ্বিতীয় তৃতীয় শতকে। আর সে সময়েই স্থাপিত হয়েছিল অশোকস্তম্ভ। প্রমাণিত হয় গ্রীক আক্রমণের সময়ে ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী। রাজেন্দ্রলাল যেখানে ভূমি ছেড়েছিলেন সেখানে এসে দাঁড়ালেন স্বামিজী। নিবেদিতা ১৪ই জুন ১৮৯৮ তাঁর নিজস্ব ডায়েরিতে লিখেছেন "স্বামিজী, আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্য্যের কথা বর্ণনা করলেন, যা তিনি আগের বছর লাহোর মিউজিয়ামে দেখেছিলেন। 'শিল্প বিষয়ে শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোনদিন গ্রীসের চরণতলে বসেছিল' ইউরোপীয় থিয়োরী খণ্ডন করতে তিনি ঘৃণায় উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন। "নিবেদিতা" আইডিয়ালস অব দি ইষ্ট" বইয়ের ভূমিকায় লিখলেন ইতিমধ্যে যাঁরা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ সমস্যাদির গভীরে নিমজ্জিত, তাঁরাই কেবল ভারতীয় ভাস্কর্য্যের উপর গ্রীক প্রভাবের তথাকথিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মিঃ ওকাকুরার মতামতের অসাধারণ মূল্য উপলব্ধি করবেন। পৃথিবীতে অপর এক মহান শিল্পধারা আছে, সেই চীন শিল্পধারার প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ওকাকুরা উক্ত গ্রীক প্রভাবতত্ত্বের উদ্ভট অসারত্ব দেখাবার অধিকারী। ভারতীয় বিকাশধারার সঙ্গে প্রধান

আত্মীয়তা, চীনধারা, যার উপরকার তরঙ্গরেখা দেখা যায় গ্রীসের তটে। আয়ারল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রান্তের সর্ব্বশেষ অংশে ইট্রুরিয়া, ফিনিশিয়া, মিশর, ভারত এবং চীনে। এর আগে কে পরে? তাই নিয়ে মানসিক অবনতি বিষয়ক বিতর্ক ক্ষেত্রে উপযুক্ত সন্ধি, চুক্তির শর্ত এবং গ্রীস স্থাপিত হবে তার যোগ্য স্থানে, তবে সে গ্রীস প্রাচীন এশিয়া একটি প্রদেশ, যার সম্বন্ধে পণ্ডিতরা দীর্ঘ দিন ধরে মনে করে আসছেন— তা হলো মহান নর্ম (প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভীয়) গাথাসমূহের আসগার্ড পটভূমিকা। এই মতবাদের দ্বারা ভবিষ্যতের বিদ্যানুশীলনের সংশোধন করা যাবে অধিকতর সম্বন্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির দ্বারা।

অরবিন্দ ইংলণ্ডে মানুষ। গ্রীক রসানুভূতিতে মন তাঁর পুষ্ট। সুতরাং তাঁর চোখে গ্রীসের কাছে যা কিছু ... না গ্রীক তাই কুৎসিৎ। আরও একটা কারণ ইউরোপে সে সময়ে হিন্দুশিল্পের সমাদর আরম্ভ হয়নি। তিনি শুধু ইউরোপকেই জেনেছেন, তাই ১৮৯৪ সালে ভারতে এসে রাজনীতিক চিন্তায় উগ্রজাতীয়বাদী হলেও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয় তাঁর ঘটেনি। হিন্দু প্রকাশ পত্রিকায় ২৭শে আগস্ট Our Hope is the future রচনায় বলেছিলেন চিত্র ভাস্কর্য্য হিন্দু শিল্পীর কল্পনায় উচ্চশ্রেণীর নয়, পছন্দসই রীতিতে অমিতচারী, ঘোলাটে, তাদের দৃষ্টি ও বিকৃত রুচির চিহ্ন। ১৯০২ সালের আগেই তিনি নিবেদিতার 'Kali the Mother' বইটি পড়েছেন, অক্টোবর মাসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, নিবেদিতার মন্তব্য : "কী কদাকার স্তূপ" শুনেছেন কলেজের বাড়ী ও তার উচ্চ গম্বুজ সম্বন্ধে, অথচ ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য 'আ ঃ কী সুন্দর'। সেদিন সঙ্গী কাশীরাও ও কথা শুনে ভেবেছিলেন মহিলার মাথা খারাপ। পরে অবশ্য তাঁর মত বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁর সম্পাদনায় বন্দেমাতরম কাগজে শিল্প আন্দোলন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সেগুলি কার রচনা বলা সম্ভব নয় কিন্তু তাঁর সাপ্তাহিক "কর্ম্ম যোগীন" পত্রিকায় ১৩১৬ সালে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার উল্লেখ করেন 'The Awakening Soul of India' প্রবন্ধে। তৃতীয় সংখ্যায় Two Pictures সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণ আলোচনা করেছেন, পনেরো সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় রামায়ণের আলোচনা করেছেন "Indian Art and Old classic রচনায়। সতেরো সংখ্যায় Revival of Indian Art বিশ থেকে পঁচিশ সংখ্যা ধারাবাহিক আলোচনা করেছন The National Value of Art তেইশ সংখ্যায় হ্যাভেল সাহেবের বই Indian Art and Industry আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁর বিশ্লেষণ ধারা স্বামিজীর বিশ্লেষণের সমতুল্য। এখানে উভয়েই সহধর্ম্মী ও সহযোদ্ধা। এঁর আত্মগোপন সময়ে নিবেদিতা কিছুদিন 'কর্ম্মযোগীন' চালিয়েছেন শিল্পের উপরে অনেকগুলি লেখা পুনঃমুদ্রণ সহ বার করেছেন।

বিভিন্ন রূপে তিনি প্রতিভাত। লেখনী ধরেছেন যখন তিনি সাহিত্যিক। চিত্রভাস্কর্য ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর লেখনী একই রূপ সমৃদ্ধ। আবার তিনি সমাজসেবী, বিদ্রোহী দেশ প্রেমিকা, একনিষ্ঠা শিক্ষাবিদও। সেই সঙ্গে তিনি সাধিকা "কালী দি মাদার" বইয়ে পরমা মার চিরন্তনী রূপ ও সাধন পথের ব্যাখ্যাকারী। 'মৃত্যুরূপা কালী' রচনায় পরিপূর্ণ সাধিকা। তিনি বললেন : ঐ এক ভয়ঙ্করীর অলোক সামান্যা মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তিকে বীভৎস বলে, যারা তাদের স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করা চলে। তারা দেবায়তনের বাহিরঙ্গটি পার হয়েছে শুধু। মায়ের কণ্ঠ কানে আসে যেখানে গেলে, সেখানে তারা যায়নি একরকম ভালই তাদের পক্ষে। কিন্তু প্রতীচ্যের কাছে যা এক ভয়াবহ, মায়ের সেই প্রতিরূপটি বোধ হয় ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। শক্তি উপাসকের কাছে 'মা' অবশ্য শুধু ওই একরূপেই আবির্ভূতা হননি, শিখের কাছে তিনি অবশেষে রূপ ধরেছেন তার কৃপাণে। সব মেয়েই, বিশেষ করে খুকুরা তাঁর মূর্ত্ত বিগ্রহ। যশস্বিনী সীতা দেবীও ওই পরমা প্রকৃতির প্রকট হয়েছেন অনেকের কাছে। অথচ সকলের চোখে 'কালী' আমাদের বেশী আপন। জানি বা না জানি মায়ের সন্তান আমরা, সে খেলায় একবারে কাছটিতে খেলে বেড়াচ্ছি। এজীবন শুধু তাঁর সঙ্গে

লুকোচুরি খেলা। সে খেলায় একবার যদি কোনমতে, তাঁর পা দুখানি ছুতে পারি, শক্তির কি বিপুল স্পন্দন সঞ্চারিত হবে আমাদের সত্তায়— কে তার পরিমাপ করে? কে বুঝবে কি উল্লাসে 'মা' 'মা' বলে ডাকি আমরা!

'শিবানুধ্যান' এ বললেন : হিন্দুদের পিতৃপুরুষেরা পাহাড়কেই শিল্পের প্রতিরূপ ভেবেছেন, যা মৌন নির্ব্বিকার। চির অসঙ্গ। দেখেছেন সৌন্দর্য্যের মধ্যে আছে দুটি সত্তা, দ্বৈতভাবের পুনরাবৃত্তি আলো আর ছায়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, অণরোনীয়ান আবার মহীয়ান, কার্য্য এবং কারণ আবিষ্কার করেছেন, মানুষ বলতে নারী ও পুরুষ, দেহ আর আত্মায় বোঝায়।

প্রতীক কল্পনার ক্ষেত্রে বস্তুর প্রাণসত্তা এই পৌরুষ রূপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, আর তার শক্তিরূপ যা আমরা বলি : প্রকৃতি, তা ওই নারী বা তার মাতৃত্ব। নারী ও পুরুষ পরস্পরের পূরক, ঈশ্বর ও প্রকৃতিও পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য্য। প্রকৃতির প্রাণসত্ত্বরূপে ঈশ্বরই প্রকৃতি স্বয়ং। প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বরও প্রকৃতি কি অন্যোন্যা বিরোধী তত্ত্ব? এ কান্না মহাকবির নয়, প্রতীচ্যের বুক জুড়েই এই আর্ত্তনাদ। শত শতাব্দীর ধূসর অতীত থেকে ভেসে আসছে, হিন্দু ঋষিদের মৃদু গুঞ্জরণ 'ভাল করে চেয়ে দেখ ভাই, ওরা দুই নয় মোটেই, দুয়ে মিলে এক'। এই দৃষ্টিতে এক সন্মাত্রই পুরুষ ও প্রকৃতি, চৈতন্য ও শক্তি রূপে বিরাজিত। পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহাতত্ত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় 'এতত্ত্ব' উপস্থাপনের একটা দিক। জীবাত্মা ও তার স্থানুভঙ্গের আরেকটা দিক তুলে ধরে আমাদের সামনে। ডায়নামো যে শক্তিতে তা বিদ্যুদ্‌গর্ভ হয়, সেটি ওই তত্ত্বের তৃতীয় একটা দিক। শক্তি ও ক্রিয়া পরিণাম প্রকটনের জন্য একটা বস্তু অন্য একটা কিছুর অপেক্ষায় থাকে, এব্যাপার সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই যুগল সত্ত্বা শিব ও শক্তি নামে পরিচিত, 'নাইট' তার দয়িতার দেখা পাবার প্রতীক্ষায় থাকে, তার স্পর্শে উদ্দীপিত না হওয়া পর্য্যন্ত শক্তি হীন সে। শিষ্য থাকে গুরুর পথ চেয়ে, তাঁকে পেলেই নিজের অতীত জীবনের অর্থ শেষপর্য্যন্ত সে খুঁজে পায়। তেমনি, শুভলগ্ন না আশা পর্য্যন্ত চৈত্ত সত্ত্বাও থাকে স্থানু, নিষ্ক্রিয়, মাত্রাস্পর্শে অবিচল। এরপর কোন দিব্য সন্নিপাতে বিদ্যুচ্চকিত হয়ে চোখ মেলে চেয়ে এক চমকে সে দেখে নেয় তার অন্তঃরাজ্যের মত বাইরের যা কিছু সমগ্র জীবন, কাল, প্রকৃতি বিষয়ের ভোগ এসবও দেবতা স্বয়ং। প্রতীচ্যের মতে, এটা পরমা সংদৃক "Beatific vission" প্রাচ্যবলীর ঘোষণা : জীবন্মুক্তি, দেহে সেটা আত্মোপলব্ধি। তত্ত্ব দর্শনের ওই শুভক্ষণটি হয় প্রতীক কালীমূর্ত্তি। চৈত্য সত্ত্বা চোখ মেলে জগতকে দেখতে গিয়ে দেখেছেন জগন্ময়ীকে।

পশ্চিমের নরত্বারোপের ধারা হল পৌরুষ, তিনি রাজা, আচার্য্য, পিতা, তিনি অধিনায়ক, রাজ্যাধিপ, তিনি সেনাপরিকারের পুরোধা। সন্তান সন্ততির মাথার প্রতিটি চুল তাঁর আঙুলে গোনা। অন্যায় করলে শাস্তি দেবেন, রক্ষা করবেন মারী ভয় থেকে। তিনি স্নেহে, প্রেমে, অতুলন, শাসক হিসাবে অনিন্দ্যকর্ম্মা, প্রতাপে অদ্বিতীয়, আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক, আদর্শ নরপতি। আর ভারতবর্ষে ধারাটা আশ্চর্য্যরকম আলাদা। এখানে জীবনের কষ্টিকপাথর একটি মানদণ্ড। শুধু একটি মানুষ ভগবানকে জেনেছে কিনা— এটাই আসল কথা। ফলাফলের প্রশ্ন নেই, কর্ম্মকুশলতার প্রশ্ন নেই, সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে কোন কথা নয়। প্রশ্ন একটাই : প্রাণ কি দেওয়া হয়েছে, সত্য লাভের পিপাসায়। বাহ্য লক্ষণ : বিষয়বৈরাগ্য চিত্ত, ঈশ্বরানুরাগের রক্তকমলটি ফুটে উঠেছে হৃদয়দল মেলে, তখনই সাধক বলে ওঠেন তৃষিত হরিণ যেমন ছোটে ঝরণার সন্ধানে, প্রাণ তেমনি তোমায় চাইছে ঠাকুর! এশিয়াবাসী ভালো করেই জানে, তখন অন্যসব কিছুই খসে যায় সে মন থেকে। হাজারো রকম ইন্দ্রিয় পিপাসা, হয়ে ওঠে বোঝা। দুঃসহবোধ হয় এইসব। তখন আহার, নিদ্রা, জগৎসংসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, একটা বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুদের কল্পনায় দেবাদিদেব মহাদেব হয়েছেন ভিখারী। যজ্ঞভস্ম বিলেপনে তুষার শুভ্র তাঁর দেহ। অযত্নে জটা

বেঁধেছে রাশি রাশি, শীতোষ্ণে দৃকপাত নেই। যতবাক, বিবিক্ত সেবী, নিত্যকালে ধ্যানমগ্ন। অর্দ্ধনিমীলিত দুটি চক্ষু, প্রতি নিঃশ্বাসে উৎপত্তি ও বিলয় ঘটছে জগতের, কিছুই যায় আসে না। তাঁর একটি শক্তিই সমস্ত কর্ম্ম শক্তির মূল। সর্বেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রত্যাহ্মরে সংযত। ভ্রূমধ্যে উন্মলিত তৃতীয় নেত্র, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি। তাই মহতী দেবতা শিবকেই আদর্শ পুরুষ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, একটি নাম তাঁর বিরুপাক্ষ।

পশুপতি তিনি। সাপ জড়িয়ে আছে গলায়। তিনি ফেরান না কাউকে। উন্মাদ, খামখেয়ালী অপ্রকৃতস্থ, সৃষ্টিছাড়া, কি জড়বুদ্ধি শিবের কাছে সবারই স্থান আছে, যক্ষ পিশাচদেরও প্রেমালিঙ্গন দেন তিনি। সকলের যা ত্যাজ্য— তাই গ্রহণ করেন তিনি। বিশ্বের যত ব্যথা, বেদনা, যত অমঙ্গল তাঁর প্রাপ্য বলে, স্বীকার করে নেন। জগতকে রক্ষা করতে হলাহল পানে তিনি নীলকণ্ঠ। বাহন তাঁর বুড়ো বলদ, বাঘছালের একটি আসন, দু'একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা— আর কিছু নয়। তিনি আশুতোষ, শুধু নির্ম্মল জল, কয়েক দানা চাল, একটি কি দুটি বিল্বপত্র দিলেই তার চলে যায়। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, করুণা নিদান, অজ্ঞান তিমিরান্তক এই ছবি ফুটেছে ভারতীয় মনে। এই ছবিতে লেগেছে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে ছড়িয়েপড়া অস্পষ্ট আলোর আভাস এবং স্থির জলে প্রতিবিম্বিত প্রতিপদের একফালি চাঁদের ছোঁয়া— পূর্ণ বৈরাগ্য, সম্যক নিবৃত্তি আর অনন্ত সমাপ্তি— এ কেবল তাঁতেই সম্ভব যিনি সৌম্যাদ্ সৌম্যতব ঘোরাদপি ঘোর বিলোচোন বীরেশ্বর।

জন্মে আইরিশ, ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্ত, তিনি ভারত প্রেমিকা, ভারতের যা কিছু বিশ্বের কাছে, তা শ্রেষ্ঠ প্রমাণই ছিল তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য। পরাধীন ভারত, তারা অসভ্য বলে প্রচারিত মিথ্যা অপবাদকে মুছে দেওয়ার জন্য ধরেছিলেন লেখনী— ভারত দুহিতাসম। তিনি ভারতীয় অপেক্ষা ভারতীয়। তিনি সাধক রামপ্রসাদকে তুলে ধরলেন : জগতের কাছে যা, করেনি কোন ভারত সন্তান। বললেন "কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি-ঋষি তিনি। প্রেম, বেদনা অথবা বীরত্বের গাঁথার দীপ্তোজ্জ্বল খণ্ডাংশকে নির্ব্বিচন করে মনিখণ্ডবৎ রত্নমাল্যে গ্রথিত করা, ঋষি কবির কাজ নয়— তিনি জীবনকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করবেন, যে জীবন মূলত ধূসর, পাংশু মলিন উপাদানে গঠিত। সেইসঙ্গে কৃষ্ণতম এবং উজ্জ্বলতমকেও তিনি নেবেন এবং সমস্তের উপরে নোতুন আলোক সম্পাত করবেন, যার ফলে দেখা যাবে, জীবন যাদের যাতনা দিয়েছে, তারাও সুন্দর দেখেছে তাকে। তিনি শুধুই নাট্যকার। তিনি নাটকীয় ভাবটিকেই মাত্র বেছে নেন, কিন্তু ঋষিকবির কাছে সবকিছুই নাটকীয়। একটি শিশুর সামান্য চাওয়া আর ওথেলোর দারুণ বাসনা, যা হনন করেছে 'ডেসডিমোনা'কে বিশ্ব হৃদয়ের সঙ্গে যোগের ক্ষেত্রে, একটি অপরের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ঋষিকবির কাছে।

জীবনের পুরাতন সঙ্গীদের ভিতর থেকে যে নূতন তান ইনি পেয়েছেন, তাকে ধরতে হয়েছে ঝলকে ঝলকে, নানা স্বরে, সুরে সাধারণের মধ্য থেকে। মা, গুণ গুনিয়ে গান গেয়ে, ঘুম পাড়াচ্ছেন শিশুকে, কিংবা তার শেষ নিদ্রার শয্যাপাশে বুকফাটা কান্নায় লুটিয়ে পড়েছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে ফুঁসছে মানুষ কিংবা গুমরে উঠছে ভালবাসার পাত্রদের সামান্য একটু ভাল রাখতে না পারার দুঃখে। বীর শক্তিতে লাঙল ঠেলছে কৃষক, দিনের আলোয় খেলেছে শিশু, সবকিছুই কানাকানি করে গেছে এর কাছে, দিয়ে গেছে জীবনরহস্যের সবটুকু। বলা যায় প্রেরণা পুরুষের কণ্ঠে নয়, গণমানুষের অমার্জ্জিত বিশাল হৃদয়েই বিধর্ম্মের অরুণোদয়। এইরূপে অগণিতজনের কল্পনায় ও চেতনায় ভাবটি যখন ব্যাপ্ত ও প্রকাশিত, অবিভূত হন একজন মানুষ, যিনি ঐ ভাবের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ হয়ে দাঁড়ান। তাঁকে সকলে বন্দনা করে বলে আচার্য্য, শিক্ষক; কারণ তিনি তাদের জীবনভাষা দিয়েছেন, তাদের ব্যাকুল, প্রকাশ বাসনাকে। তিনি তরঙ্গচূড়া— তরঙ্গ ঐ অগণিত নগণ্য। এইভাবেই জাতিজীবন থেকে আবির্ভূত, হয়েছেন ঈশ্বরের মাতৃভাবের বাঙালী মহাকবি রামপ্রসাদ— তাঁর সাক্ষাৎ প্রবেশ করেছে জাতির

অন্তর্লোকে। দলে দলে মানুষ গঙ্গাতীরে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গাতীরে তাঁর সেরা গানগুলি শুনেছিল তাঁর কণ্ঠে। শেষ কথাটি উচ্চারণ করেই সেই বৃদ্ধ মানুষটি বলে উঠলেন 'দক্ষিণা হয়েছে' সেই মুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটলো কিন্তু তা মৃত্যু নয় রূপান্তর। এরপরে শতাব্দীও পেরোয়নি মনে করে সকলে, এতো গতকালের ঘটনা। ('কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে এ তনু তরণী ত্বরা করি চল ধেয়ে।' অন্যটি 'বল দেখি ভাই কি হয় মলে' এই বাদ্যানুবাদ করে সকলে)।

সেরেস্তার মুহূরীরূপে তাঁর কর্ম্ম জীবনের সূচনা, চাকরির কথা মনে রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে তিনি সচেষ্ট কিন্তু সপ্তাহ শেষে মালিক যখন খাতা চেয়ে পাঠালেন, দেখলেন : প্রথম পাতায় একটি কবি গান "আমায় দাও মা তফিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী। [Mother make me thy Accountant, I shall never prove defaulter]

হিসাবের খাতায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গান, লেখা ছত্রে ছত্রে, একই হাহাকার মা! মা! ধর্ম্মের পাগলামির মর্ম্ম বোঝে না এমন হিন্দু যেহেতু বিরল, তাই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত হল তৎক্ষণাৎ। বৃত্তি বরাদ্দ হল, মাসিক তিরিশ টাকা। তিনি অন্নের জন্য চাকরির দায় থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পেলেন। ফল : এক গুচ্ছ লোকসঙ্গীত, কালী উপাসনার ভাবে পূর্ণ রয়ে গেল জনগণের স্মৃতিলোকে। এখনো সংগৃহীত হয়নি হয়ত অনেক, ছড়িয়ে আছে তা বাংলার গ্রামে গ্রামে কিন্তু সেগুলি এমনভাবে গ্রামজীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, ভরসা করা যায় তা হারিয়ে যাবে না কোনদিন।

রামপ্রসাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, গ্রীষ্মের দিনে গঙ্গার উপরে নিজের ছোট ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে তিনি নবাব সিরাজদ্দৌল্লার বজরার কাছে গিয়ে পড়লেন। তরুণ প্রতিভাবান শাসক (জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় যখন নিবেদিতা ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন জাতীয়বাদ— যাঁরা ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জ্জনে লড়াই করেছিলেন, নেতা বলে প্রচার করেছিলেন সেইসব স্বাধীন বেতারে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ, অভিনয়ের মাধ্যমে। সেকারণেই নিবেদিতা নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে প্রতিভাবান তরুণ-শাসক সম্বোধন করেছেন) আদেশ করলেন : বজরায় উঠে গান গাইতে হবে। কবি বীণা হাতে স্থানকালের উপযোগী প্রাচীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করলেন, তখন উনি খুশী মনে বললেন, তোমার নিজের গান গাও— মায়ের গান গাও। কবি আনন্দে প্রাণ মন ঢেলে মায়ের গান শোনালেন।

এত সরল তিনি, কোন স্তুতি দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। তাঁর রচনার মধ্যে সমগ্রসাহিত্যের ইতিহাসে এমন এক বিরাট কবির সাক্ষাৎ পাই, যাঁর প্রতিভা ব্যায়িত শিশুর অনুভূতির উপলব্ধিতে। উইলিয়ম ব্লেক যে সুর তুলেছেন, তা অনেকটা তাঁর কাছাকাছি কিন্তু ব্লেক কোনমতে তাঁর উপরে নন।

সামজিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব ঔদাসীন্যের ক্ষেত্রে রবার্ট বার্নস, সাধারণ বস্তুর মহিমা ঘোষণার ক্ষেত্রে হুইটম্যান রামপ্রসাদের আত্মীয়, কিন্তু তাঁর সেই শুভ্র জ্যোতিঃপূর্ণ শিশুসত্ত্বা —তার কোন তুলনা নেই, তুলনা পাওয়াও অসম্ভব। বয়স তার এই স্বভাব নষ্ট করতে পারেনি বরং দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস আত্মস্থতা। শিশুর মতই কখন নিরাশ, কখনো সাহস, কখনো গম্ভীর কখনও প্রগল্ভ। শিশুর কাছে এসবই উদ্দেশ্য হীন, এঁর ক্ষেত্রে কিন্তু সুগভীর উদ্দেশ্যে তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি ছত্র জগজ্জননীর মহিমাধ্বনি। এঁর এত সরলতা, মনে না করি বিনা আয়সে তাঁকে বোঝা যাবে। রোমের এবং ফ্লোরেন্সের সমগ্র ইতিহাসের দ্বারাই মাত্র দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' বোধগম্য হয়েছে। যথার্থ যে সংস্কৃতি থেকে কবির উদ্ভব, তার বিষয়ে কিছু না জানা থাকলে, কোন কবিকেই বুঝতে পারা যায় না। দান্তে সম্বন্ধে যদি একথা সত্য না হয়, তাহলে যে কবি বহুসমুদ্র এবং মহাদেশের ব্যবধানে অবস্থিত, জটিল বহু শতাব্দী প্রাচীন সভ্যতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন, তাঁর বিষয় আরও কত সত্য হবে!

মনে প্রশ্ন ওঠে, প্রাচ্যের অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গী কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তিকর কি না! আমরা শুনি চীনা, জাপানী শিল্পীরা চার লাইনে এক নিসর্গ চিত্রে জাতীয় সভ্যতার সমসত্য তত্ত্ব প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন অথচ কোন ইউরোপীয় সন্দেহই করতে পারবেন না, ঐ নিসর্গ চিত্রের মধ্যে ভিন্নতর কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে। হিন্দুর বিষয়েও একই কথা বহুলাংশে সত্য। যেমন ধরা যাক 'মহাদেবের দেহে নিত্য সতীদাহ' এর গুণস্বাদের জন্য গভীর ঐতিহ্যজ্ঞান প্রয়োজন।

জাপানী শিল্পী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তা নিতান্ত সত্য, উপাদানে শুধু পার্থক্য। রামপ্রসাদ ভাঙা খেলনা, চৈত্র সন্ধ্যার বৃষ্টিপাত এবং শিশুর নানাভাবের নানা কিরণের মধ্যে বিশ্বরহস্য আবৃত।

জগন্মাতার প্রতি ভক্তির প্রবল আকুতি ছাড়াও রামপ্রসাদের মনে, জীবনের এমন এক পূর্ণাঙ্গিক বোধ রয়েছে যা আমাদের অজানা। 'হৃদয়ে যে পবিত্র, ঈশ্বরের দর্শন সে পাবেই' আক্ষরিকভাবে এই ধরণের কথাকে প্রাচ্যে গ্রহণ করা হয়। আদর্শ অবস্থা কেবল পরিত্রাণে (Salvation) নয় কিংবা পাপ থেকে উদ্ধাররের শর্তে নয়, তা আছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বোধের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই পবিত্রতার শক্তিতেই।

প্রাচ্য-মতে, চরমজ্ঞানের পথে শরীর বাধাস্বরূপ। অর্থ ভাষার দ্বারা বাহিত হয়, একথা সত্য নয়, ভাষা মনকে এনে দেয় অন্য মনের কাছে। অপরিণত ভাষা চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে না, অতীব পরিণত ভাষাতেও চিন্তার আভাস ইঙ্গিতের বেশী কিছু দিতে পারে না। স্নায়ু যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, একথা ঠিক নয়, যেহেতু কল্পনায় যে সুখ, দুঃখ, অনুভব করে, তা নিজস্ব সুখ-দুঃখের চেয়ে অনেক প্রখর। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ -শব্দ স্পর্শের দ্বারা সাধারণত আমরা যে, 'আমি' উত্তর বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হই, তা পরমকে আবৃত রাখে আমাদের কাছে, যে পর্য্যন্ত না আমরা সেই পরমকে সহ্য করার সামর্থ্য লাভ করি। এবং যে পর্য্যন্ত না ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য ঘটছে, এমন অবস্থায় আমরা পৌঁছাই, সে অবধি শরীরেই আমাদের অবস্থান করতে হবে কিংবা তাতে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু যখন সীমার বন্ধন ভেঙেছে, যখন আমাদের অস্তিত্বের গহণ স্তর পর্য্যন্ত চেতনা স্পন্দিত হয়েছে, সে জ্ঞান এই পরিচিত, ইন্দ্রিয় অনুভূতি নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ পরমানুভূতি, তখন কী দর্শন করি আমরা? তখন দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা যা 'বহু' বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তা হয়ে দাঁড়াবে "এক" অদ্বৈত ঈশ্বর। এই কারণেই প্রাচ্য ধর্ম্মের পরম লক্ষ্য মুক্তি বা নির্ব্বাণ। অর্থাৎ স্বাধীনতা। যাঁর মধ্যে এই চেতনা পূর্ণতা পেয়েছে, তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত। যথেচ্ছার মধ্যে বিহার করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ নন। অজ্ঞানের ঘুমঘোর ছেড়ে এসেছেন তিনি। তিনি চিরজাগ্রত। রামপ্রসাদ বলেছেন 'যে দেশে রজনী নাই.... [from the land where there is no light]

রামপ্রসাদের গানের মুখ্য বিষয়বস্তু জগন্মাতা। মাকে ডেকে তাঁর আদর্শ শিশু হয়ে ওঠেন তিনি। ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়, দেড়শো বছর আগে ইউরোপীয় শিল্পে শিশুভাব আবির্ভূত হওয়ার প্রায় এক শতাব্দী আগে একজন মহান ভারতীয় ঋষি কবি, ক্ষুদ্র শিশু-প্রাণের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন তাদের ভাবের পর্য্যায়। নিজেকে সঞ্চারিত করেছিলেন তাদের অনুভূতির প্রতিটি অংশে। তা করেছিলেন, যেন সে বিষয়ে সচেতন না হয়েই।

একবার তিনি বাস্তবিকই সাফাই গেয়েছেন : "আমি তেমন মায়ের ছেলে নই যে' কিন্তু আহত গর্ব্বের স্থানে এসে যায় গোপন নৈরাশ্য, তাতে মিশ্রিত সরোষ অধীরতা। ঈশ্বর কি আছেন — তিনি নেই, মরেছেন, নৈলে কোন মা কি ছেলের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে? মায়ের মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে বেরিয়ে পড়বেন সংসার ত্যাগ করে :

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাকলে, আসি দেখা দিত সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই।
বিমাতার (গঙ্গার) তীরে গিয়ে কুশপুত্তল দাহাইয়ে,
অশৌচান্তে—পিণ্ড দিয়ে কালশৌচে কাশী যাই।
[Mind, stop calling Mother, Mother!
Don't you know she is dead?
Else why should she not come?
I am going to the Bank of Ganges,
To burn the grass image of my Mother,
And then I will go and live in Beneras.

যখন তীর্থ যাত্রার কথা সত্যই উঠলো, তখন তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দর, সুগভীর উত্তর দিলেন। বড় দুরন্ত ছেলে তিনি, তাই যেতে চান না, কিন্তু না যাওয়ার কারণ নির্দ্দেশেও তৎপর। সন্দেহ নিয়ে যায় সন্দেহের মধ্যে ভ্রুকুটি পরিণত হয় পরম অবাধ্যতায়;

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূলে ভক্তি, মুক্তি হয় মন, তাঁর দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল
ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

[Why should I go to Benaras?
My Mother's lotus feet
Are millions and millions
of holy places.
The books say, man dying in Banaras
Attains Nirvna.
I believe it Siva has said it
But the root of all is devotion
And freedom is her slave
What good is there even in Nirvana?
Mixing water with water–
See I do not care to become Sugar,
I want to eat sugar!]

শেষ দুই ছত্রে কী আলোকচ্ছ্বাস! কৃষকের গ্রাম্য সহজ চতুর বুদ্ধি মিলেছে মহাকবির অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে। নিম্নাবস্থানে থাকার উল্লাসের মত অতি সুন্দর সুন্দরতম অনুভূতির প্রকাশেই তা নিয়োজিত নয় একই সঙ্গে সৃষ্টিরহস্যকেও ব্যঞ্জিত করেছে।

(অদ্বৈতবাদীর চিনি হতে না চাওয়া' নিম্নাবস্থানের অবস্থা, কিন্তু লীলায় অনন্দে থাকা লীলাবাদীর 'চিনি খেতে ভালবাসির মধ্যেই সৃষ্টিরহস্য রয়েছে, কারণ অভেদে প্রলয় এবং রূপভেদের লীলাকামনা সৃষ্টি।)

অপরূপের চেয়ে অপরূপ ঘুড়ির গানটি। মাতার খেলনা নিয়ে খেলবেন এটা শিশুর কাছে খুবই স্বাভাবিক চিন্তা। সব মাই তো তাই করে থাকেন। কালী কিভাবে খেলার সাথী হন? মায়ের খেলার জিনিস ঘুড়ি! সুতোর মাজা দেওয়া আছে, যাতে অন্যের ঘুড়ি কেটে যায়। কিন্তু মা এমন মোহিত করে রাখেন যে, ছেলে তার খেলা ভুলে যায়। সে ছুটে পালিয়ে যায়, আনন্দে গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখে আর তার মুখে অজান্তে গান বাঁধা হয়ে যায়। জীবনের সঙ্গীত তা, যে জীবনের খেলা সে দেখছে সামনে। যে ঘুড়ি কাটল তা হচ্ছে আত্মা মুক্তি পেয়েছে। তবু মা হাসছেন, খেলছেন যেন জানেন না যে, এসবই ছায়ার খেলা!

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি
ভব সংসার মাঝে।
ঘুড়ি লক্ষে দু'একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।
[In the market place of this world,
The Mother sits flying Her Kite.
In a hundred thousand
She cuts the string of one or two
And when the Kite soors up into the Infinite
Oh, how she laughs and Claps her hands!]

আবার কবি, কিছু নেই তবু মধ্য থেকে রহস্য সৃষ্টি করে শিশুর বড় আনন্দের লুকোচুরি খেলছেন।

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে,
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।...
ষড় দর্শনে না পায় দরশন
আগম নিগম তন্ত্র সারে।...
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে
আমি তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা, চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি,
বোঝনারে মন ঠারে ঠারে।

[The name of Her whom I call my Mother
Shall I tell that secret to the world?
Let Shall I break the pot before the Market?
Even then who Knows Her?
Lo, the six philosophies were not able to
find out Kali!

কবি আর শিশু নেই, যেখানে ব্যাকুল হয়ে তিনি নিজেকে শুধিয়েছেন 'ডুব দেবে মন কালী বলে, হৃদি-রত্নাকরের অতল জলে' সেই সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবতে বলছেন মনকে, যেখানে রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।

সুকোমল শিশু হৃদয়ের ব্যাকুল অর্চ্চনার শিল্পরীতির বিষয় এই পর্য্যন্ত। মায়ের সঙ্গে কবির এই ঘনিষ্ঠতার জন্য এই কবি হিন্দুদের কাছে কেবল প্রিয় ও মহান হয়ে ওঠেন নি। পরমভক্ত রূপে ও গৃহীত হয়েছেন। সেন্ট টেরেসার তিরস্কারের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিদিন যে সব মানুষ বা বস্তু আশেপাশে দেখি, তার থেকে ঈশ্বর অনেক সত্য আমার কাছে। ঈশ্বরের এত নিকট এই যে আত্মা, এ কি সেই শিশু নয়, যাকে খ্রীষ্টের জানুর উপরে স্থাপন করা হলে তিনি বলেছিলেন স্বর্গ রাজ্য এদের নিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামপ্রসাদের জীবন অনুসন্ধান করেন প্রথম। তিনি রামপ্রসাদের দেহত্যাগ বিষয়ে বলেছেন, প্রাচীন লোকেরা বলেছেন তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে পরিজন, স্বজন, বান্ধব সকলকে বললেন : আজ মায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন হবে। অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো, আমি পদব্রজে চললাম। এই কথা বলে বহুলোক সমভিব্যবহারে গান করতে করতে জাহ্নবী তটে এলেন। যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ভক্তি রসের বিদায়ী গান করলেন। প্রথমটি "কালী-গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে এ তনু তরণী ত্বরাকরি চল বেয়ে!" দ্বিতীয়টি "বল দেখি ভাই কি হয় মলে—এই বাদানুবাদ করে সকলে"

প্রসাদ বলে— যা ছিলি ভাই তাই হবিরে নিদান কালে,
যেমন— জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে যে মিশায় জলে"
নদীর জলে নেমে গাইলেন— "নিতান্ত যাবে দিন এদিন যাবে, কেবল ঘোষণা হবে গো?
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।।
এসেছিলাম-ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা, শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।।
দশের ভরা ভবে নায়, দুঃখী মনে ফেলে যায়।
ওমা তো তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।।
প্রসাদ বলে, পাষাণ মেয়ে, আসন দেমা ফিরে চেয়ে—
আমি ভাসান দিলাম —গুণ গেয়ে— ভবার্নবে- গো।।
এই গানটি শেষ গান। এ গান গাইতে গাইতে তাঁর মৃত্যু হল।
তারা, তোমার আর কি মনে আছে।
মাগো ওমা, এখন যেমন রাখছো সুখে
তেমন সুখ কি পাছে।।
প্রসাদ বলে, মন দড়, দক্ষিণার জোর, বড় মাগো,
মাগো ওমা, আমার দফা হল রফা দক্ষিণা হয়েছে।
দক্ষিণা হয়েছে বলেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর রচিত "সাধক কবি রামপ্রসাদ বইয়ে— কেরী সাহেবের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : রামপ্রসাদ কালী মূর্ত্তি বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম ভক্তিতে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি লিখেছেন— রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো, এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।

নিবেদিতা দেহ রাখার পর স্টেটম্যান পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরুলো : নিবেদিতা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজীবনের মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখতে পেয়েছেন। হিন্দু-পল্লীতে হিন্দুরীতিতে বাস

করেছেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুজীবনের গুণগান করার কাজে নিযুক্ত রেখে নিজেকে ও অন্যদের প্রতারণা করেছেন। এই আদর্শায়িতকরণের ক্ষমতা, সেইসঙ্গে হিন্দুনারীদের সঙ্গে সন্নিধানে জীবনযাপনের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান সঞ্চয় হেতু একটি বই লিখতে পেরেছিলেন, যা সর্ব্বপ্রকার অতিরঞ্জন ও কল্পনার উন্মত্ত পাখার ঝাপট সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে— যা অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে তিনি সর্ব্বপ্রকার হিন্দুপদ্ধতির সমর্থন করেছেন— বাল্য-বিবাহ, চিরবৈধব্য, স্বামীর কাছে পত্নীর দাসত্ব জাতিভেদ প্রথা ও আরও অনেক মন্দ বস্তু ভারতীয় সমাজসংস্কাররা যাদের ধিক্কার দিয়েছেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থটির পাঠকেরা এঁর রচনানৈপুণ্য ও দুঃসাহসিক কুযুক্তির তারিফ না করে পারবেন না, যার দ্বারা লেখিকা অতি বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকে শিল্পতুলিকার স্পর্শে কোমলাকার দিতে দিতে এমন পর্য্যায়ে নিয়ে গেছেন, যেখানে সেগুলির স্থূলতা প্রায় অর্দ্ধেক হারিয়ে গেছে। তবে তিনি নিজ শিল্পসৃষ্টির উপাদানসমূহের মহিমায় নিজে কতখানি বিশ্বাসী হয়েছিলেন সেটা কিছুটা সন্দেহের বস্তু, কেননা স্পষ্টই দেখা গেছে নিজেকে সুস্থ রাখতে কলকাতা থেকে অনুপস্থিত থাকার প্রয়োজন তাঁর হত। যে-কেউ সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারবেন, তাঁর মত মনস্বিতা সম্পন্ন, বহু পঠিত এক নারী তাঁর অবস্থানের ক্ষুদ্র জগৎটির মধ্যে কিছু সময়ের মধ্যেই আড়ষ্ট হয়ে পড়তেন— যে জগতে বসে তিনি হিন্দুধর্ম্মকে নিয়ে খেলা করবার ইচ্ছা করেছিলেন, ওটা খেলাই ছিল। হিন্দু তিনি কদাপি হতে পারেন না— যতই সে বিষয়ে উৎসুক হয়ে জ্ঞানার্জ্জন করুন, যতই তার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করুন জাতিপ্রথার লৌহপ্রাচীর তাঁকে বাইরে সরিয়ে রেখেছিল— যে জাতি প্রথার সমর্থনের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। অনিবার্য্য ফল যখন এমন, তখন কেবল এই দুঃখই করা চলে— ঐপ্রকার শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক এক ব্যক্তিত্ব খ্যাপামির কাছে আত্মবলি দিল। একমাত্র ক্ষতিপূরণ— 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ।

যখন পরিচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ নিবেদিতার মৃত্যুকে অপূরণীয় ক্ষতি বলে স্বীকার করছেন, স্টেটসম্যানের এই বক্তব্যে এগিয়ে এলেন পূর্ব্বতন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ : ব্যক্তিগত আচার আচরণের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্যাবলীর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় পরামর্শদাত্রী। অতুলনীয়, কারণ তা তৎপতায় অসাধারণ এবং সিদ্ধান্ত সুনশ্চিত। যদি কেউ সেই অপূর্ব্ব ও অদম্য চৈতন্য রূপিনীর পরিচয় পেয়ে থাকেন, তিনি কদাপি এই ধরণের এক সমালোচনার বিরুদ্ধে ভগিনী-নিবেদিতার পক্ষ সমর্থনকে কোন যোগ্য কাজ বিবেচনা করবেন না। যদিও তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এক কর্কশ আবির্ভাব হয়েছে এমন একটি পত্রিকায়, যেখানে তিনি তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিছু সাংবাদিক রচনা দান করেছিলেন। তবে 'খেলা' শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে যে-চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার মোকাবিলা করা যেতে পারে, কারণ শব্দটির উপর স্টেটসম্যানের লেখক জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা স্মরণে আনতে পারি, তাঁর ধারাবাহিক ও সুতীব্র উদ্যমের কথা। তাঁর মুক্ত ব্যাকুল সত্য সন্ধানের কথা, তাঁর অপ্রশমিত সাহস ও করুণাপূর্ণ মহান হৃদয়ের কথা। চিন্তা করতে পারি, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুগুলির পাশে বসে সেবাশুশ্রুষার কথা, অসহায়, পরাভূতদের জন্য হৃদয় সমর্পনের কথা, যাদের সঙ্গে নিজের জীবনকে বেঁধেছেন, তাদের প্রয়োজন নিজের ঐশ্বর্য্যশালী ও কূলপ্লাবী মানবতাকে রাজকীয় গরিমায় বিতরনের কথা এর পটভূমিকায় বলতে পারি এ যদি 'খেলা' হয়, তাহলে ঈশ্বর করুণ আমরা সকলেই যেন খেলাটা খেলে নিতে পারি।

১৮ই অক্টোবর ১৯১১ অমৃতবাজার প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন : দি স্টেটসম্যান 'গুডটেস্ট' নামে দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনায়। হিন্দুরীতিনীতির বিরুদ্ধে নিন্দার জবাবে ইউরোপীয় রীতিনীতির কার্য্য চেহারাটা খুলে ধরে ব্যাঙ্গ করে বললেন নিবেদিতা : অবশ্যই স্টেটস্ম্যানের উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা পেতেন যদি তিনি হিন্দু ধর্ম্মের কেচ্ছায়, নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করতেন। নিবেদিতাকে যারা মাথা খারাপ বলছে, তারা যে কতখানি নিরেট ও কাপুরুষ তা স্টেটসম্যানের শিভাল্‌রি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এইভাবে কথা বলার উদ্যম দেখায়নি, যেই তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, আত্মসমর্থনের জন্য প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা নেই, স্টেটসম্যান তাঁর বিরুদ্ধে পড়েছেন এই বলে— তিনি যা প্রচার করেছেন, তা বিশ্বাস করতেন না। এই-মনোবিকার, ঐ কাগজটির পক্ষে অবশ্যই সম্ভব, কেন না তা হিন্দু-বিরোধীতার জন্য কুখ্যাত এবং সরকারের কবলিত বলে কথিত।

অমৃতবাজার ২৬শে অক্টোবর ১৯১১ ফ্রেজারের রচনাটি পুনঃমুদ্রিত করলেন : আহা যদি এখন মিঃ র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সম্পাদকের আসনে থাকতেন— তাহলে চৌরঙ্গীর কাগজটির পক্ষে সেই মহীয়সী নারীর স্মৃতির অপমান করে, জনরুচির উপর ব্যাভিচার করা সম্ভব হত না— সেই নারী যাঁর সম্বন্ধে পরিচিত সকল মানুষের অত্যুচ্চ শ্রদ্ধাভক্তি।"

২রা নভেম্বর ১৯১১ অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেল সাহেবকে চিঠি দিলেন : গতমাসে সিস্টার দার্জ্জিলিঙে দেহত্যাগ করেছেন, আপনি হয়ত শুনেছেন। তাঁর মত কাউকে সহজে পাওয়া যাবে না। কী যে তীব্র তাঁর বিয়োগের ব্যথা কি বলবো!

নিবেদিতার মৃত্যুতে কুমারস্বামী গভীর আহত হন। ১৫ই জানুয়ারী ১৯১২ তারিখে প্যাট্রিক গেডেসকে লিখলেন : নিবেদিতার মৃত্যুতে ক্ষতি অপরিসীম; তাঁর শূন্যস্থান কিভাবে পূরণ হবে জানি না। ১০ই জানুয়ারী ১৯১২, দীনেশচন্দ্র সেন লিখলেন : নিবেদিতার বিয়োগে আপনার বেদানাভূতির পরিমাণ আমি বুঝতে পারি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ এখানে (ইংলণ্ডে) আমাদের সকলকেই বিশেষভাবে বেজেছে।

মিঃ গোখলে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন তাঁর স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে : ভগিনী নিবেদিতাকে দশবছরের অধিককাল জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব অপূর্ব্ব ও চমকপ্রদ। তা এমনই যে তাঁর সাক্ষাতে মনে হত, বুঝি কোন বিরাট নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছি। অসাধারণ তাঁর বুদ্ধি ও মননশক্তি, কাব্যময় রচনা প্রতিভা, বিপুল শ্রম-সামর্থ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসকে সুতীব্র আবেগে ধরে রাখার ক্ষমতা, সর্ব্বোপরি যে কোন বস্তুর আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করার যথার্থ বিরাট প্রতিভা— এইসকলই তাঁকে যেকোন দেশের, যেকোন কালের, এক অত্যাশ্চর্য্য নারী করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সর্ব্বপ্লাবী সীমাহীন ভারত প্রেম। যে প্রেমের অর্থ ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে প্রাণব্যাকুল অনুরক্তি, ভারতের সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন এবং ব্যক্তি জীবনে কঠোর আক্ষেপহীন, আনন্দময় কৃচ্ছসাধনা, যা আমাদের কল্পনাকে আলোড়িত করে হৃদয়কে অভিভূত করে বা চতুপার্শ্বের মানুষদের উপর সুগভীর সুদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। তাঁকে দেশ-সেবায় নিয়োজিত সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবগণের অন্যতম বলে যদি গ্রহণ করি আমরা, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি আমাদের উপকার করতে আসেননি আমাদের দুঃখযন্ত্রণা বা দৈন্যে বিচলিত হয়ে মানবতাবাদী কর্ম্মীরূপেও আসেন নি। ভারতের ডাক শুনেই এসেছিলেন ভারতের সম্মোহনে ধরা দিয়েই এসেছিলেন। এসেছিলেন তাঁর হৃদযের পূজা নিবেদন করতে। ভারতের সন্তানসন্ততিদের পাশে দাঁড়িয়ে, যে বিরাট কর্ম্মভার রয়েছে তার দায়িত্ব নিতে। তাঁর সেই অপরূপ সর্ব্বাত্মিক ভারত-বরণের মহিমাকে মানব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভারতের অতীত গৌরব যে সব শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির উপর নির্ভরশীল, শুধু সেগুলিকে বরণ নয়, অথবা ভবিষ্যতে ভারত যেসব গুণগৌরবের উপর আবার দণ্ডায়মান হবে, কেবল সেইগুলি নয়, তিনি গ্রহণ করেছিলেন, বর্ত্তমানের প্রতিদিনের ভারতকে, তার সকল দোষত্রুটি সমেত। আমাদের জীবনের ক্লেশ ও দৈন্য তাঁকে পরাভূত করেনি, তাঁকে আমাদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এমন কি মালিন্যও স্পর্শ করেনি।

তিনি গ্রহণ করেছিলেন আমাদের মতই ভারতীয় জীবন। যদিও তিনি জন্মেছেন, বর্দ্ধিত হয়েছেন হাজার হাজার মাইল দূরে, পৃথক পরিবেশে, বর্দ্ধিতও হয়েছেন, তবুও একাত্ম হয়ে জীবনযাপন করেছেন আমাদের মধ্যে, আমাদের সুখে দুঃখের সহযাত্রী হয়ে। একথা যখন ভাবি, চোখের সামনে আবির্ভূত হয় সেই মহানতমার প্রতিমাখানি, চরম কল্পনার একখানি সৃষ্টি। তাঁর সেই দর্শন আমাদের প্রেরণ করে বৃহত্তর, মহত্তর আদর্শের পথে।

১৯০২ সালের গোড়ার দিকে মহাত্মাগান্ধী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান কিন্তু সে সাক্ষাৎকার সুখকর হয়নি। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁকে (Valatine) অস্থিরচিত্ত নারী বলে বর্ণনা করেছিলেন। মর্ডান রিভিউপত্রিকায় তার প্রতিবাদ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত কেশরীতেও প্রতিবাদ করা হয়। ৩০শে জুন গান্ধীজী তাঁর ক্রটি স্বীকার করেন : আধুনিক ভারতের নির্ম্মাতাদের জীবনের সবকথা পড়ে বা জেনে উঠতে পারিনি তিনি। আত্মজীবনীতে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সব বিবরণ দিয়েছি, সেগুলি ঐসব ব্যক্তির বিষয়ে তাঁর শেষ বক্তব্য বা তথ্যগতভাবে সত্য এমন দাবি তাঁর নেই। কোন ক্রটি, সম্ভবতঃ সেই মানুষটির স্মৃতির মর্য্যদা ক্ষুন্ন করতে পারবে না, যিনি হিন্দুধর্ম্ম ও ভারতবর্ষকে এত ভালবেছিলেন। সে স্মৃতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

১৯০৯ সালে গান্ধীজী পরিচালিত মিঃ এস. এল. পোলক, জোহানেসবার্গে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদক যিনি দশবছর তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, জানতে পারেন নিবেদিতা নামে এক মহিলা কলকাতায় অবস্থান করছেন। ইনি গান্ধীজীর কাছ থেকে জানতে পারেন ইনি মহান আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। ভারতবর্ষে ইনি এসেছিলেন ট্রান্সভালের ভারতীয়দের অবস্থা ও তাদের দুঃখকষ্টের কথা জানাতে। সঠিক তাঁর স্মরণে না থাকলেও, সম্ভবতঃ লেডি অবলা বসু এঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানান। তাঁর বিদ্যালয়ে গিয়ে মিঃ পোলক দেখলেন : অনাড়ম্বর সে জায়গা। তিনি অত্যন্ত আকর্ষক ও মধুর চরিত্রের মানুষ। প্রথম যা ঘটলো তা আর কিছু নয় ফটাফাটি! জন্মে তিনি আইরিস তাঁদের সঙ্গে লড়াই বাঁধানো কঠিন নয়। যখন বললাম : তিনি ট্রান্সভাল থেকে এসেছেন সেখানে কি ঘটছে জানাতে। প্রথমেই তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটীশ নীতির সমালোচনা করলেন। উত্তরে যখন বললেন— ইংরাজরা অবশ্যই খারাপ কিন্তু তারা নয়, তাবেদাররাই এইসব ভয়াবহ জিনিস ঘটাচ্ছে। এইসব তীব্র কথাবার্ত্তার পর সহসা আমাকে বললেন : একদিন এসে আমার মেয়েদের কাছে ভাষন দাওনা কেন? শুনে ভাবলাম : কী মধুর! এই তো ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সৌন্দর্য্য সব একসঙ্গে।

নিবেদিতা ভারতে আসার আগে থেকেই সংবাদপত্রের লেখক। পরিচয় দিতে গিয়ে লণ্ডন জার্নালিস্ট বলেছেন, ভারতে এসে ইংলণ্ডের পত্রিকায় ভারতীয় সংবাদদাতার কাজ করেছেন। ভারতে আসার পর নিজে একটি পত্রিকা বার করার মনস্থ করেন, সে সুযোগ ও এসেছিল কিন্তু ভারতের নানাকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ায় (রাজনৈতিক) সে প্রস্তাব (রিভিউজ অব রিভিউজ এর সম্পাদক উইলিয়াম স্টেড কর্ত্তৃক ভারতীয় রিভিউ পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব)। প্রত্যাখান করেন। সে অভাব, তাঁর পূরণ হয়েছিল প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ পত্রিকা দ্বারা। জগদীশচন্দ্র তাঁকে প্রবাসী পত্রিকা বিষয়ে অবহিত করেছিলেন ১৯০৫ সালে। কারণ ১৮ই জুলাই ১৯০৫ তিনি তাঁর পত্রে 'বাংলা ম্যাগাজিনে' কিছু উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় চিত্রের পুণর্মুদ্রণ করার কথা ব্যক্ত করেন। ২৬শে আগস্ট ১৯০৬ পুনরায় জানান ইউরোপীয় চিত্রগুলি একটি বাংলা কাগজে টিপ্পনিসহ মুদ্রণের সুযোগ এসেছে। প্রবাসী ১৯০৬, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে টিপ্পনিসহ বিদেশী চিত্র পুর্ণমুদ্রিত দেখা যায়। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ তিনি রামানন্দবাবুর কাছে একটি চিঠি পাঠান; ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন আজ ৩০শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫, বাঙালী

জাতিকে আইনের সাহায্যে বিভক্ত করা হবে। যেহেতু এই দিনটি আমাদের বিভক্তির দিন হিসাবে ধার্য্য করা হয়েছে, তাই একে অতঃপর প্রতিবৎসর আমরা আমাদের জাতীয় ঐক্যের গভীরতর উপলব্ধির দিন হিসাবে নিদ্ধারিত রাখবো। বিভেদের এ হুমকির সম্মুখীন হয়ে, সমগ্র ভারতীয় জাতির মূলগত ঐক্যচেতনার প্লাবনে নিমজ্জিত বাংলার হৃদয় আমাদের সাধারণ মাতৃভূমির প্রতিটি অংশে উপনীত।

বঙ্গদেশের নিকট হতে আজ আপনাদের কাছে প্রেরিত হল এই রাখীবন্ধনের রাখী; যা কেবল প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের বা প্রদেশের অংশগুলির মধ্যে মিলনের সূত্র নয়— একই মাতৃভূমির সন্তান আমরা, যে বন্ধনে সকলে বাঁধা আছি— এ তারই সূত্র। বন্দেমাতরম্। (উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে-এর বিতরণ অভিপ্রেত।) রামানন্দবাবু, ১৯০৮ সালে এলাহাবাদ ছেড়ে পাকাপাকি কলকাতায় চলে আসেন। মর্ডান রিভিউ প্রথমে ছাপা হয়েছে এ লাহাবাদে। এইসূত্রে উভয়ের মধ্যে গাঢ় হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, এবং আমৃত্যু এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। নিবেদিতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন রামানন্দবাবু তিনি বললেন : এই পত্রিকার একেবারে সূচনাকাল থেকে ভগিনী নিবেদিতা লেখা দিয়ে, উপদেশ, নির্দ্দেশ দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে আমাদের অসামান্য ভাবে সাহায্য করেছেন। ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তার সময়ে তিনি আমাদের অসম্পূর্ণতা, দোষত্রুটি সম্বন্ধে কোনপ্রকার রেয়াত না করে যে সমালোচনা করতেন, তার থেকে আমরা কম উপকৃত হইনি। এইসকল সাহায্যের মূল্য প্রতিদিনই উপলব্ধি করছি। তাদের প্রকাশ করার চেষ্টা না করাই ভাল। তিনি ছিলেন জন্ম সাংবাদিক। দীপ্তোজ্জ্বল ভাবে তিনি লিখতেন, শক্তি ও মৌলিকতার সঙ্গে। সামান্য বিষয়ের মধ্যেও সঞ্চারিত করেদিতেন প্রেরণার উন্মাদনা। সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করতেন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ লেখায় কিন্তু তা গতানুগতিক হত না। নিতান্ত ছোঁদো বিষয়বস্তুও তাঁর কলমে নতুন শক্তি ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত হত সর্ব্বমানবের কর্ম্মনীতির মৌলতাদর্শের সঙ্গে এবং সর্ব্বশক্তির মুখ্য উৎসের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে দিতে পারতেন। তিনি ভাড়াটে লেখক ছিলেন না। প্রেরণা এসে গেলে তিনি তাঁর পছন্দের বিষয়ে লিখতেন, না হলে কলম ধরতেন না। জগদীশচন্দ্রের দার্জ্জিলিংএর বাসগৃহে, তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর শেষকৃত্য করেন গগন মহারাজ। যদিও জগদীশচন্দ্র তাঁর চেয়ে জ্যেষ্ঠ, এঁকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন ও তাঁর কাজে (পুস্তক রচনায়, আমৃত্যু সহযোগী ছিলেন। এঁর অকাল মৃত্যুতে জগদীশচন্দ্র কিরূপ মর্ম্মাহত হয়েছিলেন তা প্রকাশ পায় তাঁর বোনকে লেখা চিঠিখানিতে :

বিপিনচন্দ্র পাল বলেন : মিস মার্গারেট নোবল সারা ভারতে যিনি তাঁর গৃহীত নাম "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা নামে পরিজ্ঞাত এবং ভালবাসার সামগ্রী। নিবেদিতার অত্মবিলয় প্রায় সর্ব্বাত্মক। এই বৃটিশ নারী ভারতের জন্য, যে প্রকার সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসায় উদ্দীপ্ত ছিলেন তার তুল্য ভালবাসা খুব কম ভারতবাসীর মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে দেখা গেছে। নিবেদিতা যেভাবে আমাদের কাছে এসেছিলেন, সেইভাবে আর কোন ইউরোপীয় আসেননি। বিজ্ঞরূপে নয়, জ্ঞানার্থী রূপে, আচার্য্য রূপে নয়— শিক্ষার্থী রূপে তিনি এসেছিলেন। তিনি কদাপি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবি করেন নি, বিশেষ কোন সম্মান নয়। এই ভারতবর্ষ ও তার মৃত্তিকার যে রূপ ও ছবি তাঁর গুরু, তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন, তারই সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত সতী হৃদয়ের ভালবাসায় তিনি পূর্ণ ছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করেছিলেন। সেই আত্মহারা ভালবাসার দ্বারা নবরূপে নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সত্তা ও সংস্কৃতির যথার্থ দ্রষ্টা।....

একদা তাঁর সঙ্গে বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে বসে চা পান করছিলাম, বিচিত্র চেহারার স্বদেশী কাপে করে। সহসা আকাশ ঢেকে গেল ঘোর কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর মেঘে— গ্রীষ্মসন্ধ্যায় যেমন ঘটে

থাকে। আর তখন গৃহকর্ত্রীর সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন। দারুণ গতিস্পন্দিত নিসর্গ প্রকৃতির প্রতিফলন নিবেদিতার মুখমণ্ডলে। নতুন আলোকের উদ্ভাস সেখানে ভয়ঙ্কর অথচ মনোহর। স্তব্ধ হয়ে তিনি উপবিষ্ট, আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন অসচেতন, জানালা দিয়ে একাগ্র চোখে দেখছেন আকাশ ও পৃথিবীতে ঘনাচ্ছে কোন সর্ব্বনাশের সঙ্কেত। যেন মম্মাহিত হয়ে শুনছেন আসন্ন ঝঞ্ঝার ক্রমোচ্চ গর্জ্জন ধ্বনি। আর তখননি যেই ঝলসালো প্রথম বিদ্যুৎ, বিদীর্ণ হল প্রথম বজ্র, নিবেদিতা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন : কালী।

আমি সেই প্রথম বুঝতে পারলাম, দৈববশে খৃষ্টানদের মধ্যে জন্মপ্রাপ্ত, কিন্তু স্বরূপে প্যাগন এই নারী, কোন আকর্ষণে আমাদের দেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। অত উৎসাহে যে আমাদের কালীকে গ্রহণ করেছিলেন, তার মূল কারণ তিনি কালীর মধ্যে যাকে বলা যায় নৈসর্গিক শক্তি ধর্ম্ম (Nature Religion) তারই সবচেয়ে নিখুঁত রূপ দেখতে পেয়েছিলেন।....

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি লোকমাতা। গুরুর আশীর্ব্বাদ : 'তুমি ভারতের সেবিকা' বান্ধবী-মাতা, কতখানি সত্য করে তুলতে পেরেছিলেন— কবি কণ্ঠে ধ্বনিত সেইবাণী ''মহীয়সী নারী লোকমাতা তুমি, ভারতী ভারতে।

তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর স্মৃতিরক্ষায় এগিয়ে এলেন জগদীশচন্দ্র ও মিঃ র‍্যাটক্লিক। ইংলণ্ডের কাগজে, নির্বেদিতা বিষয়ে শোক রচনা বেরিয়েছিলেন তার অনেকগুলির পিছনে র‍্যাটক্লিকের হাত ছিল। তাঁর ডেইলি নিউজ পত্রিকায় নিবেদিতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, সে বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল ইণ্ডিয়া পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত বা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি, তিনি গ্রন্থকারে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর বোন মিসেস উইলসন এবং জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর অসমাপ্ত বই ইন্দো-এ্যরিয়ান মিথস্'' যা হ্যারাপ কোম্পানীর তরফ থেকে লেখার ভার পেয়েছিলেন। কুমারস্বামী দ্বারা বাকী অংশ লেখান হয় ও নামকরণ হয় 'মিথস অব দি হিন্দুজ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস্' যুগ্ম নামে। এই সময়ে মাদ্রাজের গণেশন কোম্পানী বেআইনি ভাবে তাঁর রচনা সংকলন করার চেষ্টা করায়, র‍্যাটাক্লিক বিরক্তি প্রকাশ করেন। জগদীশচন্দ্র মিঃ র‍্যাটাক্লিকের সহযোগিতায় ''সিভিক অ্যাণ্ড ন্যাশনাল আইডিয়ালস' বইটি প্রকাশ করেন। এবং ষ্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইষ্টার্ন হোম' বইটিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত করে বইটি প্রকাশ করেন। এই লেখাগুলি স্টেটসম্যান পত্রিকার মিঃ র‍্যাটক্লিফের অনুরোধেই লিখেছিলেন তিনি। র‍্যাটক্লিফ নিজে সোসিওলজিস্ট। এ লেখাগুলিতে তাঁর সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি ছিল। তাই বইটি দীর্ঘ ভূমিকা নিজে লেখেন এবং যুক্ত করেন তাঁর ইংরাজী জীবনীতে (প্রথম)। এর কয়েক বছর পরে র‍্যাটক্লিক তাঁর রচনা সংকলন ''রিলিজন অ্যাণ্ড ধর্ম্ম'' নিজস্ব ভূমিকাসহ বার করেন। এ বইটিতে তাঁকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সর্ব্বাধিক নিষ্ঠাবান ও সর্ব্বাধিক শক্তিশালী এক আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ন্যাশনালিজম রেনেসাঁস'', ধর্ম্ম ইত্যাদিতে অভিহিত করেন।

তাঁর স্বপ্ন সিদ্ধ হয়নি, তবে শিল্পক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্ন সিদ্ধ হয়েছিল বলা চলে। সূচনায় ছিল অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও নেতৃত্বে শেষ নন্দলালের ক্রমবর্দ্ধিত প্রভিভা ও আচার্য্যত্বে। নন্দলাল দেখেছিলেন ভারতবর্ষকে। রামায়ণ. মহাভারত, পুরাণের ভারতবর্ষ, ইতিহাস ও জনজীবনের ভারতবর্ষ তিনি পেয়েছিলেন শিব, বুদ্ধ এবং বিবকানন্দের ভারতবর্ষকে।

নন্দলাল প্রথম পরিচয়ের কথা বলেছেন : বোসপাড়া লেনে এঁর (নিবেদিাতা) বাড়ীতে আমি ও আমার সহযোগী সুরেন গাঙলী গেলাম তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। টেবিলের পাশে একটা লম্বা সোফা। তার উপর আমরা পা তুলে বসলাম। তিনি এসে বললেন : না পা মুড়ে নীচে আসন হয়ে বসো। মনে বড় আঘাত লাগলো। অভিমানও জাগলো। মেমসাহেব তো, নেটিভ বলে

আমাদের নীচে নেমে বসতে বলছেন। তাঁর নির্দ্দেশমত নীচে পা মুড়ে বসার পর তিনি আমাদের সামনে ওই সোফায় বসে একদৃষ্টে আমাদের দেখতে লাগলেন। বললেন, You are all Budhas তখন আমাদের অভিমান চলে গেল, তারঁ উদ্দেশ্য ধরে নিতে পারলাম। ব্রোঞ্জের একটি মূর্ত্তি দেখিয়ে বললেন— এ কার মূর্ত্তি? বুদ্ধমূর্ত্তি বলায় বললেন, না স্বামিজীর মূর্ত্তি। ওই রূপভাবে বসা স্বামিজীর মূর্ত্তি একটি এঁকে দাও পিছনে হিমালয় ও সামনে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। আমি সেরূপ ছবি এঁকে দিয়েছিলাম।

আর স্বামিজী সম্বন্ধে বলেন : স্বামিজী শিল্পীদের কাছে শিল্পের backbone এর মতো, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামিজী ছিলেন জ্ঞানের পথে চলে aesthetics পথের সাধন ও পূর্ণতা। তিনি (স্বামিজী) তাঁর শিল্পী বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে সচেতন করেছিলেন : আর্ট স্কুলের শিল্পীরা কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্যাগোডা রথে বসিয়ে কুরুক্ষেত্র ছবি আঁকেন। পুরাতনকালের ছবি আঁকতে হলে সেইযুগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। ইতিহাস পড়তে হবে, মিউজিয়াম যেতে হবে, Truth represent করা চাই। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ আঁকা উচিত— সমস্ত গীতাটা personified। অর্জ্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকে গীতা বলছেন— সেখানে Central idea টি তার শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে— সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন— ঘোড়ার পিছনের পা দুটো হাঁটু গোঁড়া সামনের পা-গুলো শূন্যে। ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। দুপক্ষের সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বান ফেলে দিয়েছেন তাঁর সখা [illegible]। ঘোড়ার রাশ টেনে শ্রীকৃষ্ণ হাতে চাবুক শরীর বাঁকিয়ে অমানুষী প্রেম-করুণামাখা বালকের মত স্থির-গম্ভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গীতা বলছেন : শরীরে intense action মুখ নীল আকাশের মত ধীর গম্ভীর প্রশান্ত।

নন্দলাল এসেই ছবি এঁকে স্বামিজীর কল্পনাকে যথাসম্ভব রূপায়িত করেছিলেন। আর্ট স্কুলে পড়ার বা ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে যুক্ত থাকার সময় সতীর্থ শৈলেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিয়মিত ৫/৬ বছর মহেন্দ্রনাথের (স্বামিজীর মেজভাই) কাছে নিয়েছিলেন তাঁর মুখে শিল্পতত্ত্বের কথা শুনেছেন। পরে মহেন্দ্রবাবুর Dissertation on Painting পড়ার পর শিল্প চেতনার মূল কথাগুলো সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনেন। তাই উপলব্ধি করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন aesthetics পথে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ... বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁরই অনুরূপ। কেবল process ভিন্নরকম। ঠাকুর অনুভব পথের শিল্পী, শিল্পীরা সেইপথেই চলেন বলেই রূপের উপাসক সাকারবাদী, জ্ঞানের উপাসক যাঁরা, তাঁরা নিরাকারবাদী। অবশ্য অনুভবের পথে চলে, জ্ঞান না থাকলে শিল্পীর পতন হওয়ার সম্ভাবনা, আবার জ্ঞানীর পক্ষে অনুভব ও রসের আস্বাদনে তা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। প্রফেটদের কথা আলাদা তাঁরা সবাই দুর্জ্ঞেয়।

নিবেদিতার দেহত্যাগের পাঁচ বছর পরে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে ডঃ বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে স্থির ছিল মিসেস ওলিবুলের মৃত্যুদিনে বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবেন। কিন্তু শুভ কাজ শুভদিনে উদ্বোধিত হওয়া উচিত স্থির হওয়ায়, জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন ৩০শে নভেম্বর উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেইমত কাজও চলতে থাকে। ২৭শে অক্টোবর ১৯১৮ তারিখে মিসেস উইলসন (নিবেদিতার ছোটবোন) কে একটি চিঠি লিখলেন "তুমি জানো না তোমার ও তোমার সন্তানদের চিঠি জীবনে সুখের ও সৌন্দর্য্যের যা কিছু আছে তারই স্পর্শ এনে দেয়। আমার প্রতি সহৃদয় এমন অনেক আছেন সত্য, কিন্তু আমি স্বভাবে সঙ্কুচিত, নতুন বন্ধু করতে পারিনা এমন বন্ধুর কথা বলছি, যাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা চলে। আমরা ১৩ তারিখিটি (নিবেদিতার মৃত্যুদিন) উদ্‌যাপন করেছি, কিন্তু আগামীকাল হল তাঁর জন্মদিন। ঐদিনটি যখন স্মরণ করবো, আমাদের মনে পড়ে যাবে তাঁর আত্মা উত্থিত হয়েছে, বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে যে শক্তি প্রতিদিন আমার মধ্যে জাগছে, যেভাবে আমি উত্তরোত্তর

ভার বহন করে চলতে পারছি, যা এককালে সুদূর স্বপ্নের বিষয় ছিল— এই সকলের মধ্যে থেকে আমি ক্রমেই বুঝতে পারি— সকলে বলছে কোন একা মানুষের পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব— তাহলে সে সবকিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে।...

বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপত্যের দিক দিয়েও সুন্দর হল। প্রবেশ পথের বামপার্শ্বে পাথরের বিরাট একটি পদ্ম— পদ্মটিই জলধারা, যার উপরে সত্যকার পদ্ম ফুটবে। তার উপরে রিলিফ মূর্ত্তি এক নারীর, তাঁর হাতে জপমালা এবং প্রদীপ। এই বিজ্ঞান মন্দির তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। ১৩ তারিখে চিতাভস্ম একটি আধারে করে পদ্মের ঠিক পাশে স্থাপন করা হল। দুটি প্রস্থরবেদী থাকলো, ঝুঁকে পড়বে একটি শেফালী গাছ, যা প্রতি সকালে ঝরিয়ে দেবে ক্ষুদ্র শুভ্র ফুলগুলি, মাটির উপরে, বিছিয়ে যাবে ঘন আস্তরণ। এর বীজ তিনি এনেছিলেন অজন্তা গুহা থেকে, এবং বিদ্যালয় ভবনে রোপণ করে যে কয়েকটি চারা তৈরী করেছিলেন, তারই একটি এনে বসিয়েছেন।

"ডঃ বসু দৈহিক ও মানসিকভাবে এখন ভাল। তিনি আমাদের মধ্যে বেশীদিন থাকবেন না— এ ভয় আর না করলেও চলবে। জীবন তাঁর কাছে নীরস, প্রাণহীন। অবিরত বলছেন, জানিনা কী করে আমার দিন কাটবে। মার্গট তাঁকে পুরোপুরি বুঝেছিল, সহানুভূতি, সাহায্য, উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছিল। বুঝতেই পারো কী শূন্যতা সৃষ্টি করে যে চলে গেছে।"

মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পরে লিজেল রেঁম ও জিন হারবার্ট উভয়ে জগদীশচন্দ্রের কাছে ফরাসী ভাষায় তাঁর জীবনী রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ এলেন যখন। মিসেস উইলসন, ডঃ বসু ও রেঁম হারবার্টের মধ্যে সে কাজে মধ্যস্থতা করলেন।

জ্বলন্ত চিতার ছবি

বিবেকানন্দের দেহান্ত। সম্মুখে জ্বলন্ত চিতাগ্নিঙ্গ নিবেদিতা শপথ নিলেন— হে গুরুদেব, আমার অন্তরে ধ্বনিজ হচ্ছে তোমার সেই বাণী জগতকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জ্জনই ছিল অতীতের কর্ম্মরহস্য। যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন বহুজনহিতায় বহুজনমুখায় আত্মবিসর্জ্জন করতেই হবে।... জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন 'চরিত্র'। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্রের মত শক্তিশালী করে তুলবে।... আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, এবং তার চেয়ে জ্বালাময়ী কর্ম্ম। হে মহাপ্রাণ! ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে— তোমার কি নিদ্রা সাজে?

প্রতিজ্ঞা করলেন : দীক্ষার দিনে এই অধমাকে সন্ন্যাসী দেবতা শিবের কাছে উৎসর্গ করে সন্ন্যাসী গুরু বুদ্ধের কাছে নমস্কারে পাঠালেন। উন্মোচন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্ম্ম সাধনার সমষ্টিভূত বিগ্রহকে। দেখালেন : ভারতবর্ষ নামক গ্রন্থটি খুলে— যার প্রতি পৃষ্ঠায় অতীত ভারতের কীর্ত্তি, কাব্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও জনপ্রবাহের ধোয়া, দেখালেন— মহিমার শিখর পতনের বিধ্বস্ত শ্মশান। আর ধ্বনিত সেই কণ্ঠ— ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! কৃষ্টিনকেও শুনিয়েছিলেন পাঁচটি শব্দের ক্ষুদ্রতরঙ্গ "INDIA" যাতে মেশানো ছিল ভালবাসার জ্বালাময় বাসনা, গর্ব্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য্য আর ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা সঙ্গে মেশানো গভীর ভালবাসা প্রস্ফুটিত ভারতে সবকিছু, আর জনগণ, ইতিহাস, শিল্প স্থাপত্য আচার ব্যবহার, নদনদী উপত্যকা, সমভূমি আর শিক্ষা, সংস্কৃতি ধর্ম্ম ধারণা।

চোখের পাতায় উদ্ভাসিত হল : হৃদয়ের সেই যন্ত্রণা পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের সেই গর্জন, কারাগরের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত— চূর্ণ করো অন্যায়কারীকে যাঁদের জন্য তাঁর যন্ত্রণা— সেই শীর্ণ দীর্ণ মানুষের মিছিল, অগণিত উৎপীড়িত, উৎপীড়নের উৎপীড়নে আতঙ্কিত, আর উৎপীড়কের বিকট সেই

উল্লাস আর সৈন্যবাহিনীর পদধ্বনি, নির্ঘোষ উত্থান পতনের। ...প্রেমার্থী আর্তকণ্ঠের বাণী : 'যত উচ্চ হৃদয় তোমার, দহনের দুঃখ তত জানিও নিশ্চয়'। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘূর্ণীয়মান আজও আকাশে বাতাসে। নির্ঘোষিত সেই বাণী— "প্রেমই পৃথিবীর প্রধান আগুন যা দগ্ধ করে, উজ্জ্বল করে, নিষ্ঠুর আকাঙ্ক্ষায়। যেমন আত্মদহনে প্রমিথিউস নিজেকে করেছেন বন্দী মানব প্রেমের জন্য দেবরাজ জিউসের ক্ষিপ্ত ক্রোধের অগ্নিতে। নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তিনি ককেশাস পর্ব্বতে।

শুনেছেন যন্ত্রণার সে কাহিনী— 'দৈবের সহায়তা পেয়েছি কিন্তু উঃ! প্রতিটি বিন্দুর জন্য রক্তমোক্ষণ করতে হয়েছে কী পরিমাণে? আমি যোদ্ধা, প্রাণ আমাকে দিতেই হবে। ভুলভ্রান্তিগুলো খুব বড়ো কারণ প্রেমের পুজারী আমি, অত্যাধিক সে ভালবাসা হায়! যদি নির্ব্বিকার বৈদান্তিক হতে পারতাম! ...হাল মুহূর্তের জন্যও ছাড়বো না— রাস্তায় পড়ে মরার জন্য ছ্যাকড়াগাড়ীর ঘোড়াকে যেমন রাখেন ভগবান। তার সে ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! ওয়াহি গুরুজীকী ফতে। জয় হোক গুরুজীর।... দীনাশিষ্যা আমি প্রতিজ্ঞা করলাম প্রভু... যে অবস্থাই আসুক, জগত আসুক, নরক আসুক মা আসুন, দেবতারা আসুন— আমি সংগ্রাম চালিয়ে যাবো, হার মানবো না কখনও।

হিমালয় দুহিতা
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা

জগদীশচন্দ্রের চরিত চিত্র

Is Matter Alive? By Professor Bose

[Messrs. Longmans, Green and Co. publish this day (October 15th) a scientific work by professor J. C. Bose, B.Sc., London, of Calcutta Unversity, which under the simple title of "The Response of Matter", establishes the very startling truth that what we call dead matter can be proved to be alive!

He does not go so far as to suggest that a piece of steel has either sex or soul, or heart or mind, or consciousness. But he does prove thatinorganic substances are capable of feeling to an extent which enables them to make that distinct and registrable response to external stimulus which has hitherto been regarded as the distinctive sign of life.

The following account of the discovery of professor Bose, written by a competent hand, is illustrated, by permission of the publishers, with blocks appearing in the book]

Ever since the birth of modern science men have been fascinated by the difference between the organic and the inorganic. The mystery of life, and pre-eminently of animal life, has attracted as many inquirers as ever did the quest of the philosopher's stone. For it seemed to imply a far greater miracle. Its myriad individuality; its eager movements; its peculiar forms; its growth of large from small, and back to embryo again; its persistence of species combined with its rapid evanescence of individuals; above all, its possession of consciousness, rising into thought and knowledge – these and other characteristics make up a phenomenon so complex and stupendous in its seeming unlikeness to all else in Nature, that, in the first enthusiasm of science, living things were inevitably assigned a place by themselves and a terminology of their own.

But alluring as was the task of dissecting out the mighty puzzle and putting it once more together, the scientific intellect had time after time to turn back from the attempt which it had already felt was foredoomed to failure. There were plants that moved visibly and animals that never moved at all and the very existence of the science of organic chemistry is an abiding protest in chemical regions against the arbitrary distinction between living and non-living products.

IF RESPONSE IS A SIGN OF LIFE

Yet there was one criterion of life which seemed to stand persistently alone. This was the characteristic of irritability, or power of responding

to stimulus. You pinch your arm. There is an immediate response in the feeling of pain. In response to the stimulus something is sent along the nerve to the brain, which causes the sensation. In fact, we have here something like an electric circuit, the effect of a shock in any part of the body being sent along the conducting nerve to the detecting brain. If an isolated piece of muscle or nerve be connected with a detector of electric current – a galvanometer – then each time a muscle or nerve is stimulated by a pinch or shock of any kind the thrill of response is betrayed by an electric pulsation. These electric pulses give a faithful indication of the "livingness" of the tissue. When the tissue is killed the electric pulse ceases to beat. We can thus read the history of the life-process autographically recorded before our eyes; we can watch the diminishing pulsation with the waning of life and the final arrest at the moment of death. The up and down curve of the throbbing life is replaced by a line of immobility at the moment when it passes into non-life.

THEN METAL IS A LIVING THING!

Thus the pulse of electric response is regarded as the criterion between the living and non-living. When it is not found, we are in presence of death or else that which has never lived. A living thing is responsive, a dead thing is not. The living response with the attendent phenomena of sensation were supposed to be due to the working of a mysterious "vital force" which found its dwelling place in the living.

Alas, however, for human boastfulness! Since as the result of the latest discovery it appears that this harmless little arrogance of man eager to believe that his corporeal brain and frame obey laws different from, and greatly superior to, those which govern the mineral world—this seemingly innocent morsel of ignorant vanity is about to be refused to us. For as regards response, the gulf that yawned between vital and non-vital has been bridged, and the bounds of sympathy are pushed into a new domain by proofs that the responsive processes seen in life have been foreshadowed in non-life, and that even metals respond precisely in the same way as human beings!

It is too early as yet to estimate the full significance of such a discovery. The unity proclaimed is far-reaching and marks an epoch in scientific thought.

THE DISCOVERER OF THE LIFE OF METALS

Dr. Jagadish Chandra Bose, to whom we owe this discovery, is the professor of science at the University of Calcutta.

After taking his degree in Calcutta, he own entrance as a scholar at Christ's College, Cambridge, in the year 1881. His course there ended in 1884 with his taking simultaneously the Natural Science Tripos and the London B.Sc. Degree, and he returned to India to receive—thanks to the interest of Lord Ripon, then retiring—the Chair of Physics in the Presidency College, Calcutta.

Ten years later his work won the recognition of the Royal Society, which published his paper on the "Determination of the Indices of Refraction of various substances for the Electric Ray." In the year 1896-97 Professor Bose spent nine months in this country on his first scientific deputation from the Government of India. During this period he received the degree of D.Sc. of the University of London in recognition of the value of his research. The scientific world, both in England and on the Continent,was greatly interested in his apparatus for the detection and measurement of the properties of invisible light.

Since his return to India in 1897 Professor Bose's investigating energy must have been redoubled, to judge from its results. It was therefore inevitable that he should be sent once more to Europe by the Government of India as a delegate to the international Scientific Congress held in Paris two years ago. This was specially due to the great interest taken in the cause of scientific progress by Sir John Woodburn, the Lieutenant-Governor of Bengal. The first account of Professor Bose's discovery—the Responsive Power of Inorganic Substances was thus announced before the Basis Congress, a full account of which appeared in the Transactions of the Congress. Since reaching England he has pursued the many-sided outcome of his enquiry, and his communications have been published in the Proceedings of the Royal Society. In May last year he delivered a Friday evening discourse at the Royal Institution dealing with the responsive phenomena in the living and non-living. He subsequently undertook an extensive inquiry on the respose in the transitional world of plants, and an account of this work has been published in the Journal of the Linnaean Society.

CHARACTERISTICALLY HINDU

Finally, it is not the least remarkable fact about his great theory of stress and strain that this comprehensive conception should have revealed itself to a Hindu mind. For the doctrine means simply that molecular action is one in all matter, living and non-living. And here Dr. Bose appears to have come, without intention, and working by the most modern methods, on the time-honoured goal of this people's effort. Dr. Bose's

discovery is in some special sense the contribution of his whole race. We are told of a certain Madonna of Cimabue's that it was carried in triumph about the streets, and old men in Florence wept for joy that they had lived to see such an advance in the painting of human emotion. Some such relation exists in this case between the regional thought and interest of the Hindu people and this scientific achievement of their fellow-countrymen. For if the simple ryot in his fields and the grain-seller in the Bazaar could but master that technical jargon in which the man of science feels that his ideas must be buried—could but understand the concrete picture of the creation which *Stress and Strain*—suggests they would say quietly, "yes, that *must* be true!" Surely there are few instances of the dramatic fitness in the history of science to parallel this.

HIS WORK ON ELECTRIC WAVES

It will be interesting to say a few words of Professor Bose's previous work on electric waves, from which he was unexpectedly led to his present line of investigation. It was the English physicist Maxwell who from theoretical considerations first came to the conclusions that light was a kind of electric vibration, to all but a single octave of which the human eye was blind. (Similarly with the ear, there are whole ranges of sound inaudible to us; it is probable indeed that certain notes reach the insects which we shall never hear!) Hertz, in Germany, was able to produce electric waves by rapid electric vibration and narrowly anticipated in this Sir Oliver Lodge, the eminent English physicist. It is by means of this invisible light, sweeping through space with incredible swiftness in its mighty billows, that wireless messages are sent. Thus, with the discovery of electric Vibration new realms of radiance possessing wonderful and unknown properties were opened out.

Naturally the great difficulty in investigating these rays arose from their invisibility. Some apparatus was required which would serve to detect them. Branly, in france, observed that the shock of electric waves produced changes in metallic particles by which their power of conducting the electric current became increased. What these changes might be remained a mystery, but it was evident that by this means detectors of electric waves could be made. At first, however, these detectors or receivers proved very capricious in their action, but Professor Bose succeeded in producing a type of receiver which was quite consistent in its working. He was also able to construct a very perfect electric wave apparatus with which the various properties of invisible light could be studied and measured. It was the wonderful performance of this instrument that surprised and

delighted the leading *savants* who were amongst his audience at the Royal Institution five years ago. He took various so-called opaque objects—a book, human hair, blocks of wood, and so on—and producing electric waves with the help of his apparatus was able not only to show that rays passed through these masses, but also to measure the angle at which the unseen light become bent in its transmission. With unfailing certainty also the existence of hidden strains within opaque masses was detected by the same means.

"THAT TIRED FLEELING" IN METALS

It was said that the precise nature of the changes made by invisible light on the mass of metallic particles which constitute the receiver remained a mystery. In practical application this fact had a grave drawback. After receiving a signal, the detector would become fatigued from the strain, and a tap had to be given to revive it. The whole thing went by rule of thumb. If the receiver was to be made more sensitive so that messages could be recorded from a greater distance and with greater speed, it must be self-recovering, so as to do away with the contrivance of tapping. To bring out any improvement, therefore, it was clearly necessary that the theory of the receiver should be properly understood.

In the course of a lengthy research, in which a very patient and wearisome investigation had to be made of all the elementary substances, Professor Bose lighted on several which exhibit self-recovery, and of which therefore receivers could be made which would require no further tapping. He came to the conclusion, indeed, that the whole question was one of overstrain. This is seen on some materials like lead wire, which become easily overstrained, while others, such as a steel spring, exhibit greater elasticity, and therefore more easily recover fron the effect of strain.

SENSITIVE ARTIFICIAL ORGANS

It was while working on his theory of the effect of external stimulus on matter that he was led on to a new line of investigation, the outcome of which was the construction of artificial organs which stimulated the action of our sense organs. These artificial instruments transmitted the impressions received from without to be recorded by suitable electric recorders, just in the same way as our sense organs, the eye, for example send in messages received from the outside to be recorded by the brain. It is hardly to his mind a question of similarity, but rather of identity.

For what is the distinctive characteristic of life? Is it not the power to respond to external stimulus? We pinch or pass an electric shock through the arm and a visible twitch shows that the muscle is still living. A dead body does not respond when pinched or shocked; the sudden twitch is thus an indication of life. Physiologists make the twitching muscle record its autograph on a travelling strip of paper, and the autographic record tells the history of the muscle, the story of its stress and strain. When it is fresh the writing is bold and strong, as fatigue proceeds it becomes indistinct, and when the muscle dies the record comes to a stop.

These are, however, but gross indications of the vital condition. There are other and subtler processes which can not be so easily detected. Nervous impulses, for instance, are transmitted without any visible changes in the nerve. Yet when a flash of light falls on the eye, something is sent along the optic nerve to the brain, there to be interpreted (or recorded) as visual sensation. This visual impulse, produced by the stimulus of light, is an electric impulse. Whenever a shock or disturbance impinges upon a bundle of receivers in the human body, an electric thrill is produced and courses along the nerves which are but telegraphic wires, to the central station, the brain.

THE NERVOUS SYSTEM OF METALS

These electric pulsations are regarded as the signs of life. External stress, like light and sound, gives rise to them, and the electric currents thus set up excite the brain and cause sensation. But when any organism dies, accidentally or otherwise, the living mobility of its particles ceases, the stress-pulses can no longer be sent along the nerves, and there is an end of response.

The electric switch in answer to external stress in thus the perfect and universal sign of life, and the autographic records of these electric twitches show us the waxing and waning of life. Their gradual decline shows the effect of fatigue, their exaltation the climax of artificial stimulation, rapid decline the anaesthetic action of choloroform, total abolition the end of life.

But is this electric response, the sign of life, entirely confined to what we call living things? Is it quite wanting in what we know as the inorganic?

By means of Dr. Bose's instrument this question can be answered definitely, for when the metals were stimulated by a pinch, they also made their autographic records by electric twitches, and thus, being responsive, showed that they could in no sense be called "dead"! Nay,

more, it was found that given the records for living muscle, nerves and metals, it was impossible to distinguish one record from the other for the metals also, when continuously excited, showed gradual fatigue; as with ourselves, so with them, a period of repose revived their power of response, even a tepid bath was found helpful in renewing vigour; freezing brought on cold torpidity, and too great a rise of temperature brought heat rigon.

METALS CAPABLE OF DEATH

It is said, however, that the ultimate sign of life is inevitable death. An animal is living as long as it is capable of dying. It is true that death can be hastened by poison. Then can the metals be poisoned? In answer to this was shown the most astonishing part of Professor Bose's experiments. A piece of metal which was exhibiting electric twitches was poisoned; it seemed to pass through an electric spasm, and at once the signs of its activity grew feebler, till it became rigid. A dose of some antidote was next applied; the substance began slowly to revive, and after a while gave its normal response once more!

But if the inorganic be indeed touched with this glimmer of living response, then it ought to be possible to construct artificial organs of perception. Of all the organs we possess none is so wonderful as the eye. Professor Bose therefore turned his attention to the construction of an artificial retina which would respond to light. But this particular organ has one advantage over the human eye, inasmuch as its sweep of vision is practically unlimited, detecting waves of invisible as well as visible light, whereas we are confined to a single narrow octave.

HIS ARTIFICIAL EYE

It was while he was striving to interpret the hieroglyphic records of his artificial eye that Professor Bose came upon certain hitherto unnoticed and extraordinary phenomena of human vision. For if the action of the artificial corresponded with that of the real eye, then the peculiarities of both must be present in each. It may be said that according to the stress and strain theory, the sensitive elements in the retina respond to light simply because they are strained of disturbed by it, as a wire is strained by twist. Just as on the removal of twist the wire continues to vibrate, so do the strained particles in the sensitive retiṇa go on oscillating and thus send pulsating currents to the brain. These pulsating currents, again, cause a pulsating visual sensation. For if one look at a bright object, then shut the eye, the bright object looked at will appear and disappear several times in succession. These "sight

echoes" are very persistent, and form the incipient stage of the process we call memory.

WHY WE HAVE TWO EYES

Another fact discovered from the clues given by the artificial retina is that when we look at any object the two eyes do not, at any given instant, see equally well but each takes up the work of seeing and resting alternately. One falls asleep, as it were, while the other is waking to its maximum consciousness, and then *vice versa.*

Thus Professor Bose was led to the paradoxical statement that under certain circumstances we can see much better with the eyes closed than with them open. To prove this it is only necessary to look at the light through a modified stereoscopic apparatus in which, instead of photographs, we have placed two different inscriptions.

On looking through this one finds the two images superposed, making a blurr. But on shutting the eyes the tangled writing is unravelled and the constituent parts of a sentence are read clearly by the brain.

Thus sight lends itself to interpretation by the process of strain and self-recovery amongst sensitive atoms and what is true of the complex organism of the eye is found common to all nerve, all muscle, and to that matter which we have long thought of as lifeless and insensate.

A VAST NEW FIELD OF INQUIRY

It will be seen by the least scientific reader that these experiments teem with significance. Not only do they completely destroy all barriers of a hard and fast kind between responsiveness of the organic and inorganic, showing that the one is merely some greater complexity of the other; not only do they impress us profoundly with the mystery of the sensitiveness of all things, but they are full of practical suggestions alike for the worker in wireless telegraphy and for medical science. In the last field they are of vast importance. For the effects of drugs have been hitherto capable of only vague experiment, while here we have an opportunity suddenly opened to us of arriving at the clearest data with regard to fundamental processes, quantities and the rest.

THE ALL-PERVADING UNITY OF THE UNIVERSE

Yet every step in this vast simplification—making them all appear as various rhythms and harmonies of a single fundamental sequence—only drives the question deeper—"Who is He that sits within, striking the molecules this way and that? Or what is He, 'Pure, free, ever the witness,' Who interprets the records of strain, using the brain as His

galvanometer, and discarding alike the laboratory and its instruments when these no longer please Him? Dr. Bose does well to end his lecture, given at the Royal Institution, May 10th, with the striking passage :—

"It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things; the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our earth, and the radiant suns that shine above us—it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago :—

"They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, upto them belongs Eternal Truth, unto none else,unto none else!"

Thus we see that the so-called vital response of living matter has met with the same fate as other differentiate of the organic and the inorganic—that once more there is no hard-and-fast line between the living which respond and the nonliving which do not, but that in both alike we see the spectacle of matter as a whole possessing irritability and passing out of the state of responsiveness, into that of irresponsiveness; having its response in both alike affected by external circumstances and agencies, often identical; responding in different ways in both alike, according as the stimulus is great or little, the critical degree being often the same. In metals and plants, as in animal tissues, we have been shown the phenomena of weariness and depression, together with the possibilities of recovery, of exaltation, of irresponsiveness which is death.

Who can regret this? Is it not the inevitable destiny of all conceptions which imply that a given phenomenon unique, mysterious and beyond analysis to check inquiry and thwart the advance of scientific thought? Science can grow only where the mind of the student is prepared to recognise an underlying unity amongst apparently diverse phenomena.

"They who behold but one in all the changing manifoldness of this universe into *them* belongs Eternal Truth; unto none else—unto none else"—M.N.

লণ্ডনস্থ ভারতীয়দের অভিনন্দন জ্ঞাপন

LONDON LETTER

(From Our Own Correspondent)

London, July 12

DR. J. C. BOSE

No one deserves greater honour that Dr. J. C. Bose, the eminent scientist. He has own renown all over the world and has endeared himself to the land of his birth by his services to science. India is pround to

possess such a son; for he lifts her in rank in the comity of nations. The other day, the "Sukha Samity" of London had a luncheon in honour of the distinguished scientist. Among those present were Messrs. Dadabhai Naoroji, Romesh Ch. Dutt, Nishi Sen and J. D. Dutt. Many letters of regret were read. Dr. Mullick wrote that he was sorry he could not be present as he was in Edinburgh on professional and political work. Nothing else would have prevented him from being present, as there was no one whom he should like to honour more than Dr. J. C. Bose. Mr. Sen presided, and proposed the guest's health in most eloquent terms. He eulogised Dr. Bose's services to science and hailed him as one of the greatest scientists of the day. Mr. Naoroji and Mr. Dutt also made complimentary speeches and said that any country would be proud of Dr. Bose. Dr. Bose, rising amidst cheers, said with his usual modesty that he was not worthy of the honour, conferred on him. He had in his own humble way tried to follow his instincts; and anything he had done, was but a poor subject for eulogy that had been showered on him. Such gatherings as these were compliments, indeed, and encouraged him in his duties. For nothing was more encouraging than the appreciation of one's neighbours.

SISTER NIVEDITA'S LECTURE IN CALCUTTA

Sister Nivedita's lecture commenced by the reading of the invocation to creation from the Rig Veda, the most wonderful pronouncement of the religious scientific consciousness of any age or prople.

In referring to the recent work of Dr. Bose in Europe, the lecturer pointed out the relation which his present theory of stress and strain holds to his previous accomplishment on the subject of electric waves. The wonderfully practical nature of his scientific work was shown in the fact that he had constructed by far the most perfect detector of wireless signals yet produced. The manipulative dexterity here displayed must have served him well in such later experiments as that in which he proved the

---

SISTER NIVEDITA—Our readers will be glad to learn that the same Sister Nivedita, Miss Margaret E. Noble, who once drew much of public sympathy towards her for her in defatigable work during the plague, is again amongst us here in Calcutta during this dreadful season. Nor can any of us forget her enthusiasm for Hindu religion. She will deliver an address on "The Hindu mind in modern science" at the Classic Theatre Hall, on Friday the 21st instant, at 6 p.m. The Hon'ble Justice Sarada Charan Mitter will preside. The lecture is a public one. — Amrita Bazar Patrika.

continuity of mechanical and light stimulus by balancing the effect of a sun ray on one wire by a twist of the hand on another.

The continuity of living and non-living was only one point in the great line of argument verified in experiment by which Dr. Bose aimed at establishing in scientific form the doctrine of the fundamental unity of phenomena. For all the phenomena of heat, light, electric radiance and chemical union and disruption, might be regarded at bottom as but different aspects of the single basic occurrence of the swing of molecules under stress, this way and that. A great stress produced overstrain was and overstain was apt to result in reversal or rebound past the point of equilibrium. So every given force had the power of producing not only its proper but also its opposite effect. This fact was not without interest for students of the doctrine of the Maya. Matter and the laws of matter, were one, whether manifested in physiological or in what are called "purely physical" sequences. Simple mineral matter such as metal, was just as subject to stress of any given kind as the animal body, a steel wire could be killed by poison, or brought to life by the right antidote, like a muscle or a human being.

The lecturer dealt much with the work of careful preceeding observers like Lodge and Waller. It was clear however, that even in the field of the former worker, a research so comprehensive and unexpected must be revolutionary. But it was the great glory of science to welcome truth from any quarter, and whatever its effect upon ourselves.

Improving the continuity of living and non-living, Dr. Bose had conceived the audacious idea of testing whether plant tissues would respond to a pinch or a tap by an electric disturbance, like as had long been known, the animal and like, as he was now prepared to prove the metals.

By this attempt, Dr. Bose had opened out to Western men of science an area of investigation hitherto unthought of where most accurate and simple methods would replace the system of indirect inference.

In dealing with more technical matters, the lecturer showed that our great countryman had further added to western power of research by suggesting methods of experiment on electric response which would not require the preliminary abnormalising of the specimen. Hitherto it had been thought necessary to "injure" one end of the muscle or nerve for experiments, in order to produce the necessary inequality of current on stimulation. Dr. Bose had adopted the "Block method" and the "method of exaltation" by which no less than two additional sets of an experiment might be made, without abnormal conditions of any kind, incorroboration

or disprove of any given observation.

The practical issues of these investigations were likely to prove of extraordinary utility in wireless telegraphy and also in medicine. In wireless telegraphy, Dr. Bose's discovery of molecular self-recovery and other phenomena of metals, would be sufficient to sweep away many crudities notably that of the tapping apparatus to restore sensitiveness. In medicine, we had heard for the first time a possibility of precise testing and demonstration of the influence of drugs or metals—which always remain, however continuous with the animal, less pressures from the human point of view.

Theoretically, it remained with Dr. Bose to prove his theories in face of the determined and natural reluctance of scientific men in the West—tried and faithful workers in their own paths, many of them—to accept them. But if once accepted and incorporated, there could be no doubt that this, the first voice through which the Hindu genius was speaking in science, would be heard through all time side by side, not with the patient observers of details but with such masters as Newton and Darwin and La'Place.

In the lecturer's opinion, the Hindu race had an aptitude of the strongest kind for scientific work. The brilliant imagination, the dogged persistence, and the manipulative dexterity which distinguished this worker, might be proved to be a race characteristic, not an individual inheritance.

Above all, as Dr. Bose himself had been heard to say on one occasion, Hindus had the incomparable advantage in science of freedom of thought. "They did not take God into their keeping!" One of these worst defects in their equipments was a habit of "wicked, self depreciation." The strong man must believe in himself and so must the strong people, and they must expect no help. To the soul that strives for *Gnan*, what help can be given? What conditions were necessary? A raging fever of realisation, a thirst for renunciation for *Tapasya* who could differ that soul from its path?

All direct knowledge was *Gnan*. All efforts, all concentration was *Tapasya*. Let the young men of Bengal turn to knowledge in this spirit. Let them cease from spurious limitation of foreigners out of marcenary motives and live for Truth as their fathers lived. Let them regard self as nothing, and the work in hand as all, and proving thus the actual nature of Hinduism, it was likely that they might find themselves in Science leading the world.

Babu Norendro Nath Sen said that it was a pleasure and a privilege that he should have been invited to propose a vote of thanks to the noble and gifted English Lady, who had both interested and delighted them that evening by her thoughtful animated and eloquent discourse, The large gathering that he saw before him testified to the popularity of Sister Nivedita, and the esteem in which she was held by Hindus, and, she might fitly add, by all classes of the community. Miss Margarette (Sic) Noble was an honour to English womanhood, and to the great English race itself. There was scarcely a Hindu heart in which she did not maintain a cherished place, because of the repeated, striking and convincing proofs she had given them of her deep, sincere and practical sympathy with the Indian people, with their religion, and with their history and traditions. They had been admiring as well astonished witnesses, of her philanthrophic—and to her personally dangerous—work in the backslums of Calcutta English womanhood, as exemplified in Annie Besant and Margarette Noble, went far to benefit India in various ways. It was they who were the peace-makers for all kind between divergent races and religions. It was such as they who would make enthusiastic realize the dream of a final blessed Union between the East and the West under God's dispensation.

The speaker has much pleasure also to propose a vote of thanks to the chair. No better gentleman would have been called on to preside on that occasion. They had known him as a good Hindu, who was fired with the spirit of propagating the truths of a religion in which he had utter faith. They had seen him set his whole heart on the education of their children on purely Aryan lines. A distinguished *alumnus* of the Calcutta University, a Premchand Roychand Scholar, despite his weight of Western materialistic education, his faith in the creed of his fathers, had grown with the years till that faith was steadfast as the rock of ages and could not be uprooted or shaken.

The Chairman, in replying to the vote of thanks, reminded the audience that it was due to Sir John Woodburn's personal love and fidelity to science that their distinguished countryman had been sent to the West on Government Service.

বোম্বাইয়ে বক্তৃতা

SISTER NIVEDITA gave the students of Bombay the other day a view of the discoveries of Prof. Bose. The following except from the address of the President of the Botanical Section of the British Association

whose session were held this year at Belfast, explains them from the point of view of a scientist and assigns to them their proper place in relation to previous discoveries :—

"Some very striking results were only a few months ago published by Bose on the electric response in ordinary plants to mechanical stimulation. He arranged a piece of vegetable substance, such as the petiole of the horse-chestnut, or the root of a carrot or radish, so that it was connected with a galvanometer by two nonpolarizable electrodes. The uninjured tissue gave little or no evidence of the existence of electrical currents; but if a small area of its surface was killed by a burn of the application of a few drops of strong potash, a current was observed to flow in the stalk from the injured to the uninjured area just as was the case in animal tissue. The potential difference in a typical experiment amounted to 12 volt. The tissue was then stimulated either by tapping or by a torsion through a certain angle, and at once a negative variation or current of action was indicated, the potential difference being decreased by 0.26 volt. Very soon after the cessation of the stimulus the tissue recovered and the current of rest followed as before Bose's investigations extended considerably beyond this point, and established a very close similarity in behaviour between the vegetable substance and the nerves of animals. Summation effects were observed, and fatigue effects demonstrated while it was definitely shown that the responses were physiological. They ceased entirely as soon as the piece of tissue was killed by heating. This remarkable demonstration of similar electrical properties to those possessed by nerve strengthened very greatly the view of the conduction of stimuli in the plant by means of the protoplasmic threads which have been demonstrated by Gardiner and others to exist throughout the plant, uniting cell to cell into one coherent whole."

জগদীশচন্দ্রের চিঠি নিবেদিতা ও মিসেস বুলকে

DR. BOSE TO SISTER NIVEDITA, MARCH 30, 1904

There is a very outspoken letter from a distinguished F.R.S. who has been himself in the council of referees. The letter appears in this week's Nature.

"My attention has been recently directed to the letters of Messrs Buchanon and Heaviside. What I wish to point out is that every author who feels aggrieved has a remedy in his own hands, which consists in abstaining for the future from sending papers for publication to the society. A sufficient supply of papers for publications in their Transaction or Proceedings consititute the life-blood of the societies to which I refer (R.S.) and if the supply were cut off these societies will die of inanition. (The authors) will then not be subjected to the disadvantage of having their paper referred to a *secret inquisition* composed of persons whom I can testify, from personal experience as a former Councillor of a learned society (R.S.), frequently know far less about the subject matter of the paper than the author does, and whose reports, to my personal knowledge have frequently contained errors from not understanding the papers.

The practical and common sense cause would be to boycott the society.

A. B. Basset, F.R.S.

In this week's Sanjibani there is a letter from Japan, with special reference to Conference, signed by A. K. Majumdar.

"It is very sad that there is no chance of the Congress. The gentleman who was asked by O.K. to preside has declined. The East Honganji who were said to have favoured the idea – the chief priest of this section has given out that he will have nothing to do with the Congress..."

Did you see in today's Stateman Sarala Devi's Appeal for Volunteers for Red Cross – on behalf of Japan? All communications to be addressed to S. Devi, Ballygunge.

I am glad to think that since such a noble example has been set, others will initiate in this laudable object and express their sympathy for Japan.

I hope the cold is better and in spite of yesterday's cold(ness).

Sincerely yours

J. B.

DR. BOSE TO MRS. BULL, APRIL 13, 1904

Calcutta

My Dear Mother,

Your letter came rather early – earlier than the English mail I think through Genoa.

I have not heard anything from Vines – my letter about Waller will reach him by this time. In any case I dislike the whole thing – specially Scientific matter degenerating into personalities. I think it is meant that I shall have to write the book and henceforth that would be my mode of expression.

What I am doing now is to print each paper as is completed. In this way the material of the whole book will be collected; and then I could rearrange with necessary alterations in the form of a book. This however makes the thing costly, virtually printing twice over. But otherwise I shall not get time to write the book afresh. I won't feel writing things chapter by chapter.

My nephew had another relapse and that upset the whole household. He is much better now and I am thinking of arranging a sea-voyage for him.

I am sorry the last Paper, copy of which I promised you is but partially typed and illustrated – there being so many interruptions in the meanwhile. I hope to complete them and you shall not only have these, but my new papers which I shall have printed. The great difficulty is in having illustrations as I can't get anyone who can do the illustrations. I have to get these done slowly by some of my artist friends.

Could you now spare the typed copy of the Papers which is now hanging fire before the Royal Society? I shall use them for certain chapters of the book. If all goes well, I hope to have the material for book collected by next January; and all the printed slips, suitably posted will be sent to publishers in England for speedy publication. I hope this to have the Plant book published by May, 1905.

As for the particular quotation you wanted about fatigue I do not quite understand the particular passage you want. There is a mention of it in my 'Similarity of Response in the Living and Non-Living' printed by Electrician. Unfortunately I have no copy of it except one in bound volume, Waller's copy being sent to Vines. I sent you a copy of the passage from it.

By the way I cannot tell you how very helpful your prevision has been. When Vines wanted the history of the case, I had no evidence. But on opening the desk I found Waller's letter and his copy of my paper with annotations neatly tied up and marked very precious, and these made it possible to show up Wallers through his own admission.

With much love,

Your affectionate son.

DR. BOSE TO MRS. BULL, 1905

My dearest Mother,

How good of you to say that you wish to see your bairns. I always wished to think that you would come whenever we wished for you. But the last time you came, you were so ill, that I am afraid of asking you, till some supreme occasion should rise. I am always keeping the call sacred for that occasion. When the Child (Nivedita) was ill, I would have sent for you but that there was no time. But you must at least in your mind hold yourself ready to come all at once. If I can only feel that, I shall feel so much rested.

We have done $\frac{3}{4}$ th. of the work. Then remains the last $\frac{1}{4}$ th. There is abnormal heat-wave in Calcutta. There is a talk of the college being closed for another fortnight. In that case I may be able to finish it at least the rough sketch of it.

With much love,

Yours affectionate,
Son

MRS. BULL TO NIVEDITA, JUNE 3, 1905

Dearest Margot,

I am immensely relieved by your return of the paper, and turning down, so to speak, of the whole matter. It is proof that no real necessity exists for a change of conditions for either health, life or work. A change might well cause more loss than the meeting of known difficulties. Had my anxiety been justified by reality you would have been the first to feel it and to grasp the opportunity, even though as in the past we assumed a burden heavy and seemingly not just, except that it is imposed by Providence, – and so to be shared or carried by us as well. The five years could have been taken only provided. I met the obligation the completed service, thereby securing a pension after death for one, will secure. This extreme venture on my part and its acceptance – poor as it would be as an alternative – I felt, if my proposal were accepted, some such letter were needed to preserve, to show my people in the future possibly that it was wholly my request and urgence. Your impression of

it shows me how free you are from any anxiety concerning the immediate future as regards health and the necessities of the work. You would be the first to grasp at a straw – as such an alternative would be – if necessary, and only with and by your co-operation could it have been blessed.

Please understand that I am wholly at rest about it, and shall instantly free my estate from any contingency which only an impersonal end excused me for wishing to secure at so relatively a disproportionate cost.

I enclose a note to Grindlay in London, and shall be glad if you find it convenient to allow me to take up the note. As they hold the paper for you, it will be necessary I find, to collect it in this matter. I do not feel quite warranted in sending my letter on direct to them, lest you find it inconvenient to place it and thus lose interest. I am on half interst – better than none, of course, holding it for you. I shall be glad to have your cable "pay" if you will permit me to do so. I also enclose order for you on Grindlay of Calcutta, to pay you the balance due me with them.

In March 30th 1904, it stood 1159. 1. 9.

I have been hoping to learn the amount for house-rent, nurses, physician—&c. that was advanced necessarity for you. That seems the natural thing between mother and child. Will you please let me have it?

You who have made me happy in your home and care, from whom I have accepted as from no other person in my life, have made me rich also if you never give me another thought or word. Your task is so great, and conditions so difficult you will remember that while I love your letters, they are never to be a matter of duty on any day whatsoever.

Lovingly, dearest – Margot,
Mother.

[In a separate sheet of paper –]

Will Messrs, Grindlay & Co., Calcutta, have the goodness to pay to Margaret E. Noble, the balance with them to my credit, and oblige.

Cambridge, Mass., U.S.A. Sara C. Bull
168, Brattle St. June 3rd 1905 (Mrs. Ole Bull)

Mrs. Bull to Messrs Grindlay & Co., June 3, 1905

To Messrs, Grindlay & Co.,
51, Parliament Street, London.
Gentlemen,

Mrs. Ole Bull desires to make payment of the note held by Miss Margaret E. Noble, and with you for safe keeping. The Cambridge Trust

Co. will meet the obligation if you will forward the note to your Boston correspondents with your directions to collect the amount. I am sending a copy of this to Miss Noble in Calcutta, asking her to cable me "pay" if it is convenient for her to receive it now, when I will forward this duplicate to you direct, and, meantime, she will write you her own wishes regarding the same then paid to you for her.

168, Brattle St., Cambridge, Very Truly,
Massachusetts. Sara C. Bull
(Mrs. Ole Bull)

এই চিঠির উল্টোদিকে নিবেদিতা লিখেছিলেন —

I don't understand the how when or wherefore of this. Is it not strange? I have just read, after writing this unhappy letter this wonderful quotation you send from my Guru.

I feel strangely able to believe how that the whole difference between soul and soul lies in their different capacity for various degrees of joy. I could never have foreseen myself praying – as I do now – "O God give me joy!" !!!

Mrs. Bull to Nivedita, June 12, 1905

My, dearest Nivedita,

Please find enclosed a draft for £ 100 for your personal use.

It used to be my dream that some day Swamiji would have quiet, books and the favourable conditions for writing. May I not ask you to let me try to secure these to you? And to feel that you earn these by the trained efficiency you bring to your work?

If this is the kind of work you feel it best to give yourself to in your present state of health, I shall be grateful that you are able to do so.

But after so serious an illness and the labour of the secretary you may need a complete respite.

The life of Swamiji and the same, line of publication you have already initiated, no one but yourself can contribute so – either to make conditions favourable to writing—or to use for your health until it is safely established —you will count this contribution especially sent. And the same amount I mean to respect next year and the succeeding years.

To the present moment I know of no duty that you have not fulfilled amply, generously and nobly.

During your illness your writings have been a solace and strength.

The book on Marriage. Mrs. W. feels to herself personally a great need met.

You will have received by last mail my order for the amount of my balance, with Grindlay Calcutta, for your general purposes and uses, and I will hope for your cable "pay" that I may ask Grindlay of London to collect your note from me. The money stands ready to meet it.

I do hope that you may secure a larger interest there for it.

Hoping, dear, that there is some joy in the convalescence for you and if less robust yet that you may be well.

Lovingly,
Sri Sara

MRS. BULL TO DR. BOSE, JUNE 12, 1905

My dear Son, I have read four chapters of the book — many many points I understand is related to previous work. How clearly you set aside previous conclusions of others, reg. Prof Waller's wrong current smoothly and go into these wonderful demonstration by thermal and optic and mechanical nerves.' The new instrument even more complex and marvellous than I saw, and the *applications* of current etc. *all automatic*!!! Is it strange that each sentence means so much, and yet I do not understand anything!

The secretary [Sister Nivedita] is fortunate to follow all without the laboratory work.

I have mentioned in my correspondence my desire that your records and scientific *mss.* should be safe-guarded. The uncertainty of life and, as well, the uncertainty of the right disposal of your Papers in case of your death, made this wise. All this your secretary has gone over with you she could edit properly.

If you could persuade her possibly, to put it on an understood basis of a professional kind — this would if you wish by will to empower her to act as your literary executor with full control of your notes and scientific Papers, be generally respected and understood.

Your prompt action at the time of her illness was worthy recognition of your right to make conditions for her recovery and comfort as your co-worker. And if you wish to make this privilege in your part in an emergency, cover the possible emergencies that one may reasonably prepare for, I shall be glad.

She has always from her nature itself in the freedom—her religious calling gives her, opportunities ample to give her service :—but in the matters when she earns by actual manual work, it is a satisfaction to have that part on an acknowledged basis?

It was my desire always that Swamiji should come to have the leisure for writing which he always craved. If his child can achieve this, it seems to me a continuity, to us all, of the which, one thought of for him. His life remains, to be written and much else in the same line already published by her.

I hope that she may persist me to so arrange for the conditions essential to her quiet and health that she may accomplish this and at the sametime, feel that she is *earning* her right to do this by bringing her trained efficiency to the task.

I shall be thankful if my feeling can meet the occasion and, together, we provide for her the necessary conditions;— for I presume she will not venture as in the past so much general expenditure of physical strength. The illness point to a chance of one cause of another — not the combining, as hitherto, such exacting labours with pen voice and teaching together.

Thank you for letting me know the publishing estimate.

And if for assistants and other possible expenses (instruments) etc. you require more than I have sent this year for the Plant-research—please tell me.

I enclose a draft for that publishing amount—and thank you so much for letting me have a very tiny share in the Great Work. If you can arrange £50 for secretary allow me please to send that for this year.

And above all stands radiant the love with which my life is blessed!

God grant, protect and give you strength and peace always,

Always Mother

Did I leave with you a business note of mine given you until I should make my wish secure in my will? If so, please return it to me.

DR. BOSE TO MRS. BULL, JUNE 6, 1905

Dearest Mother,

I had to postpone work for a couple of days—and am renewing it today. Just finished about 500 pages of the book, another 200 to be written yet.

I do not know what the future might bring, but I have sent a

message to the Lt. Governor that I mean to have freedom for my work, whether with or without their help. Of course you know that they have now the strongest combination. It is just as well that things should come to a crisis one way or another.

With much and much love,

from your affectionate

Son

DR. BOSE TO MRS. BULL, AUGUST 31, 1905

My darling Mother,

Your short note telling me that you are having such beautiful rest, gave me much joy. How I look forward for your letters! Tell me that you wish to look after me just as in Norway. How I dream of those days when used to sleep hours under the pines, on ground carpeted with moss, and the fierd so near. I wish I could make another such rest.

But next two months is to be strenuous work. I have got wonderful results shewing what is the true meaning of 'Constitution', why a drug affects on in one way, and another in a different way. It is wonderful that I should have been able to solve this great mystery.

With much love,

from you son.

DR. BOSE TO MRS. BULL, OCTOBER 16, 1905

CAN METALS FEEL?

Can metals feel? Last night at the Royal Institution Professor Jagadis Chunder Bose proved that they can, in much the same way as animate beings.

He struck a piece of copper, pinched a piece of zinc, gave it poison and administered an antidote, and threw light upon an artificial retina. In each case the electrical emotion, as registered by the galvanometer, was painful to witness. There is an opening for a society for the prevention of cruelty to metals.

(*Cutting from a paper*)

Darling Mother,

There is just time to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by laws, but *we* all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand and face everything.This is our true union and from today there shall be the beginning of new national life. We have turned back on relying on strangers, we for India and for ourselves. Dearest one, your heart is with us and let your prayers be also with us.

Trying to send off remaining chapters.

Yours affectionate
Son

N. (Nivedita) is just packing off the mss. for book. Her love heartfull. Please direct the enclosed.

মিসেস বুলের উইলের মামলার প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদে

VEDANTA PHILOSOPHY DEFENDED BY
ELLA WHEELER WILCOX

"The sensational statements made in the will contest case of Mrs. Ole Bull regarding the teachings of *Vedanta* are most misleading and unjust to that great philosophy. It was my privilege to be pupil of Swami Vivekananda during his two Winters in New York.

This I regard as the greatest intellectual and spiritual opportunity of my life. Neither in the lectures of Vivekananda, his books or the Vedanta philosophy are to be found any of the "wierd", "uncanny" or unwholesome teachings related by the witnesses as a part of Mrs. Bull's "lessons." The breathing exercises, inhaling, retention of the breath and exhaling, using a word which means Gall, *are* a part of Vedanta teaching.

The very first physical act of a new born child is to breathe a long breath. After a few years children, especially in our Western world, cease to breathe deep breaths, because they wear restricting garments, and live indoors, and sit and stand with indrawn chest. In the Orient the morning devotions are begun with breathing exercises. Therefore, tuberculosis and catarrhal troubles are the least prevalent of all maladies in India. Vivekananda repeatedly warned his pupils against excesses in these exercises. Properly practised, they produce physical, mental and spiritual strength. Overdone, they produce disaster. Precisely as the right use of the X and violet rays cure disease, and the wrong use kill, or as a tonic may stimulate digestion and too much tonic may induce indigestion.

In all religions, sciences, arts and professions there are too many

teachers illy prepared for their work.

Vivekananda was a master. He urged the most careful preparation and years of study and self-development before his pupils attempted to be teachers. Despite his warnings, many of them rushed into the field to impart informations which they had not yet received.

The Vedanta philosophy teaches the full development of body, mind and soul, and methods of concentration, and the realisation that *all life is one.* Christ studied this philosophy in the Orient, and it was a part of "Vedanta" when He said, "I and my Father are one."

There are many foolish women who study Vedanta and think they must cease - to be human—who strive to be disembodied spirits—while still in the earthy from.

But, properly understood, this religion teaches each human being to make the *best of life* in the position to which he or she is called.The best wife, husband, parent, friend and citizen, and to perform every duty cheerfully and perfectly, and to be happy in this life while conscious that it is only one plane of many—one room in the Father's mansion.

If Mrs. Bull feared demons and rubbed her furniture with oil to drive away uncanny influences, she did not learn these things from Vedanta philosophy. For that teaches, above all things, that each soul makes its own destiny and contains all divine powers within itself, and that through realisation of the *one life* we may all become Christ, "One with the Father."

Absolute fearlessness, absolute unselfishness, absolute kindness to all living things must result from a proper understanding of the real Vedanta philosophy. It is profound as the ocean depths; all other religions, all other philosophies, all the sciences are contained in it; and, while it has its codes and rules for those who wish to become adepts and masters, it has also its simple wholesome and helpful line of training for the man and woman who want to make happy homes and successful toilers. It teaches self-reliance, self-conquest and self-development, and these must be the [.......] of immortality."

গুরুনিন্দায় ব্যথিত নিবেদিতাকে মিস লংফেলোর রচনা

SISTER NIVEDITA

Some twelve years ago there came to Boston a young lady, a member of a Hindu religious order, to speak at one of the meetings of the Free Religious Association. Her bright, intelligent face, her earnest manner and attractive personality, enhanced by the simple white habit of her order, made a strong impression on the audience.

Miss Margaret Noble, although her home was in England, is of Irish family, and has all the ardour and fire of the Celtic temperament. She believes strongly in the universality of true religion, in all its various manifestations. The old religion of India made the strongest appeal to her intense, imaginative nature, and her ardent desire is to enlighten the Western world in regard to its many beauties and heights of spiritual thought. She has adopted the country and its life so completely that she sees everything from the Indian point of view. She knows it to be a country where the ideal is the real, and the real the ideal, and she hopes to bring some of this idealism to the hard, practical life of the West, and to carry to India the best part of this practicality as a basis for its daily life.

Miss Noble has made several visits to Boston, giving talks in private houses, and has many friends here, but her chosen life is among the Hindus in India, where she loves the simple, religious, poetic customs and people. With another sister of the order, she has opened a school in Calcutta for girls and for married women, whose husbands desire to widen their interests beyond the home life. Miss Noble has also found time to write several books about India—its legends and religion. The last one, "My Master", was most favourably reviewed by Canon Cheyne in the Hibbert Journal.

He says : "This book may be placed among the choicest religious classics on the same shelf with "The Confessions of St. Augustine," and Sabatier's life of St. Francis........There are many important ideas which might be quoted from this remarkable volume... The possiblity of finding all religious true and yet be a loyal adherent of one of them."

In Miss Noble's case she has never broken her connection with the English Church, of which she is a communicant. At Christmas time the monks of the order show their reverence for Jesus by reading the story of the Nativity, somewhat in the spirit of the early Franciscans, and the miracle plays. Several months ago, at the urgent summons of her dying friend Mrs. Ole Bull, she dropped her work and at a day's notice took the long journey to America to be with her friend and to give the comfort one may at such a time.

After her friend's death her desire was to return to her home and work as speedily as possible, but she felt bound by some promised lectures, and by the desire to be of assistance to her friend's family.

The Hindus act as if their dead were still present in the body as well as in the spirit. Their belief is that "the soul of the righteous goes back to the Father, to be poured out as love, wisdom and peace." "The human frame looses a life, which is gained by all who loved the soul, radiating as wisdom beneficence and love."

With this thought in her mind, she lingered in this country for several weeks, and then, feeling she was not longer needed, she returned to India as quietly as she came.

Her parting greeting from the steamer was a verse from the Indian Daily Prayer for the world.

In the East, and in the West
In the North, and in the South
Let all things that are,
Without enemies, without obstacles,
Having no sorrow, and attaining cheerfulness,
Move forward freely,
Each in his own path!

ALLICE M. LONGFELLOW

Craigie House

নিবেদিতার মৃত্যুর পর জগদীশচন্দ্রের চিঠি বোনকে

My dear friend

I have faced and gone through the papers left. There is a mass of material for two books, but very imcomplete. Then there are some of which two books could be made up.

And then the book which she was helping me to write is staring me in the face. I have not at present the strength to do anything with it.

And lastly there is the Women's School. She left it *entirely* under the control and guidance of Christine. When I asked N. to leave a prviso, in case Christine could not carry out the work—poor child broke down feeling her helplessness. Then we assured her that every one of her wishes will be fully carried out, and the *they shall*.

Only I don't see the way just now. Christine is nervous, and is disinclined at this moment to return to Calcutta. I don't know whether this is due to temporary 'nerve' or she does not feel herself up to it.

Only one feels that we are letting time be wasted. If she had survived us she would not have allowed a single hour go by. But then she had no body, it was all mind. There was not such thing as despondency or despair in her composition.

Why did you not have another sister? I fear I shall never live to see your children grow up.

Yours affly,
J. C. Bose

Dear Mrs. Wilson,

I am glad to see your taking so much interest in the children. I hope Miss Richard's school will be suitable. Thinking I would be interested, Miss Macleod sent me your letter to her. About little Cecily, you speak something about non-conformist conscience which I could not understand. If she wants to be a saint by all means encourage. Bless the child!

There is another reference about my desire to keep Nivedita's room like a museum, and Christine's want of freedom and scope. You were afraid I would feel hurt if you wrote to me about it. Plaese never think like that, for misunderstanding might arise on absolutely wrong basis.

I am afraid you must have misunderstood Christine's letter. You would know how impatient Nivedita was of all morbid sentimentality, and a man is still more sane in such matters. The question arose about the dispositions of the books and other things, that was in her sitting room at Bosepara. You will understand that it is a workroom with some distinction—with a few fine pictures and Ivory Crucifix and a beautiful and rare statuette of Buddha. It was used as her study and reception room—this being in the outer courtyard where the Zenana school girls do not come.

I gathered from Christine that she would like the valuable collection of books on India, to be undisturbed so that girls from the school might afterwards consult it. So I encouraged the idea, and wished Christine to use the room for her school, as a library recitation room or any other purpose; or Christine might use it to receive her men friends. It was left to her entire disposal. Lest she misunderstood me, I asked her last Sunday, whether the room has been used for the school. She said that as it was in the outer courtyard, she used it for her own reception room. I then enquired whether she would like to have the existing furniture changed and get other things. To this she said, nothing could be so distinguished as the present arrangement.

You must remember that Christine has another and better sitting room of her own. She has the entire control and management of the school.

Naturally, the Math and leading monks have the school under them. But I have arranged matters in such a way that the only thing they do

is to find money at the beginning of each month. They have no voice in the management of the policy of the school. Christine can have the school open as long as she likes, or keep it closed. There is no one to whom she has to give any account. We only hear anything she wishes to tell us. The matter, as I said is left solely and absolutely under her control.

She spoke sometime ago about the stifling atmosphere of Bose para and the heat. So we arranged that she would stay with us and go to school everyday. We have a large house, and there are we two and my sister. There is thus plenty of space. After much pressure, Christine came on a visit, but stayed only two days. She spoke of the rooms being much cooler at No. 17 Bose para! She has not come since I think she would miss her friends in the lane.

You will have an anxious time moving to the new place. You have not sent me the new address, so I am sending something to you earlier than In intended. I want the children to observe the birthday in October. My bankers will send a cheque of £10 to 5 Ashgrove. (Messers Henry King Co., London).

Darjeeling

My dear Mrs. Wilson

Your much welcome letter just received. You do not know how your letters and those of the children put me in touch with all that has been happy and beautiful in life. Though there are many who are kind to me, I am naturally reticent, and I cannot make new friends—I mean those to whom you can talk about things that matter.

We observed the 13th, but tomorrow is the Birthday. We will think of that day reminding us that her spirit is risen and is among us. Through the strength that is daily coming to me, and the way in which I am able to carry out more and more of what at one time had been like a dream, through these I realise more and more of the real meaning of immortality. If I am able to carry out that work, which everyone thinks it impossible for one man to accomplish—that will be due to the strength which comes from the life and memory of those who are living in us.

I had to work out many things, and the strain was too great. I am glad to say that my natural constitution is very strong, and two weeks rest in the hill station has made a different person of me. I hope it will not be necessary in the future to over-exert myself.

I have the good fortune of winning the love of our own people, as also the trust of the government! How long it takes for people to be properly understood! You will be astonished to hear that our present Governor Lord Carmichael is a great admirer of Nivedita. He has bought all her works, and wanted very much to have a good portrait.

The Bose Institute will also be beautiful architecturally. As you enter there is a large stone lotus on the left—that is the basin in which water lilies will grow. Just overlooking that will be a bas-relief of a woman, with prayer beads and a lamp in her hand. The Institute is the embodiment of her prayer. On the 13th, the ashes were laid in a receptacle just by the side of the lotus. There will be two stone seats, and there will be a overhanging *shefali* tree, which sheds every morning lily white flowers, and makes a white carpet on the ground. The seed she brought from the caves of Ajanta and the plant was one of several which she planted in the school grounds.

I intend to formally open the Institute on the anniversary of St. Sara's passing away—I believe about the 11th Jan. It will be a great national occasion. Other people are realising its importance, as you will see from the enclosed which some friends have printed for private circulation.

As regards the papers and correspondence, I have a good number, I also got copies of letters to St. Sara. But these may not be enough. What do you think of the following idea? I could have the letters accepted by the Modern Review and as we publish them, there will be others coming in from people who would see the [ ] in the magazine. These may afterwards be collected, rearranged (if necessary) and published in book form.

Write to me as often as you can. For I feel very solitary. I try to keep myself busy and my work finds good acceptance. The outside appreciation can never fill up that longing to have the touch of hands that met mine in comradeship or in token of blessing.

With much love to self and children.

Yours affectionately,

J. C. Bose